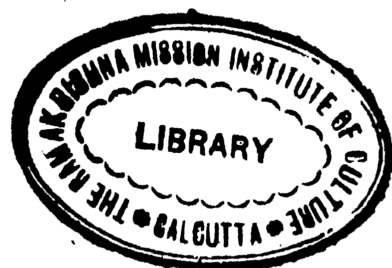


উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



১৩৯০

৮৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা



উদ্বোধন

৮৬তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯০ হইতে পৌষ, ১৩৯১ ; ইংরেজী : ১৯৮৪)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ (মাঘ, ১৩৯০—অগ্রহায়ণ, ১৩৯১)

স্বামী নির্জরানন্দ (পৌষ, ১৩৯১)

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী অত্রজ্ঞানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮৬তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯০ হইতে পৌষ, ১৩৯১)

নানাপ্রসঙ্গে

অন্যান্য : যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ-পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি/১০০ ; বড়িশায় রামকৃষ্ণ মঠের নূতন শাখাকেন্দ্র—বৃদ্ধদের জন্য একটি আবাস নির্মাণের পরিকল্পনা/১০১ ; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য-সম্মেলন/১০১ ; ভারতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়—রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যাপীঠ/১০৩ ; রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা/১৫৯ ; "দি কমিটি ফর্ দি কম্প্রিহেন্‌সিভ স্টাডি অফ্ দি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভ্‌মেণ্ট" নামে কমিটি গঠন/১৬০ ; মিশরের প্রাচীন জনপদ আবিষ্কার/২০৬ ; সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মবিশ্বাস/২৭১ ; শ্রীসোরাব মোদীর মৃত্যু/১০৪ ; পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের মৃত্যু/৩৭৪ ; জাপানে নতুন কেন্দ্র/৪৩৯ ; বিদেশিনীর)(স্টালিন কন্যা শ্রীমতী শ্বেতলানা অললিলুয়েভা) চোখে হিন্দুধর্ম/৪৪০ ; পুনেতে নতুন শাখাকেন্দ্র/৬৭৯ ; রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা/৮২৯ ; পুনে রামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্র/৮৩০ ; জাতীয় যুবদিবস/৮৩১ ; চীনা ভাষায় ভারতীয় মহাকাব্য/৮৩২

আবেদন : মালাবার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম/২০৮ ; রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ/৯ম সংখ্যা [৭] ; রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য/১০ম সংখ্যা [৮]

দেহত্যাগ : শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ/২৪৮ ; স্বামী পুণ্যব্রতানন্দ/২০৫ ; স্বামী প্রত্যয়ানন্দ/২৭০ ; স্বামী জীবানন্দ/২৭০ ; স্বামী শুভ্রানন্দ/২৭০ ; স্বামী সুরেশ্বরানন্দ/৩২৭ ; স্বামী বিদেহানন্দ/৪৩৯ ; ব্রহ্মচারী দয়াচৈতন্য/৪৮৫ ; স্বামী মেধানন্দ/৬৭২ ; স্বামী নীলকণ্ঠানন্দ/৬৭২ ; স্বামী শ্রবণানন্দ/৭১৭ ; স্বামী ধ্যানানন্দ/৭১৭ ; স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ/৭৮১ ; স্বামী নিরাময়ানন্দ/৭৮২ ; স্বামী যাদবানন্দ/৮৩১

পুনর্মুদ্রণ : উদ্বোধন, ২য় বর্ষ (১১শ-১২শ সংখ্যা)/২০৯ ; উদ্বোধন, ২য় বর্ষ (১২শ সংখ্যা)/৩৭৭ ; উদ্বোধন, ২য় বর্ষ (১২শ সংখ্যা)/৪৮৯ ; উদ্বোধন, ২য় বর্ষ (১৩শ সংখ্যা)/৭২১

চিত্রসূচী : ১। আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী/৮ (ক) ; ২। স্বামী প্রেমানন্দ/৮ (খ) ; ৩। স্বামী অখণ্ডানন্দের হস্তলিপি/৩৪ (ক—ঘ) ; কৈলাস-মানসের যাত্রাপথে কালাপানির কালীমন্দির/১২০(ক) ; গারবিণ্ডায়ের কাছে মালভূমি—ছিয়ালেখ/১২০(ক) ; জ্যোৎস্নাস্নাত মানস/১২০(খ) ; কৈলাসপতি দর্শন/১২০(খ) ; ৪। স্বামী নির্বাণানন্দ/২৪৮ (ক) ; ৫। শিল্পাচার্য নন্দলাল-অঙ্কিত শ্রীশ্রীদুর্গা/৪৯৭ (ক) ; ৬। স্বামী অখণ্ডানন্দ/৫০২ (ক) ; ৭। শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র/৫০২ (খ) ; ৮। স্বামীজীর গানের খাতার দশম পৃষ্ঠা/৫৪৪ ; ৯। জগমোহনলালকে লিখিত রাজা অজিত সিং-এর পত্রের আংশিক প্রতিলিপি/৫৪৯ ; ১০। স্বামীজী-প্রেরিত Greeting Card/৫৫০ ; ১১। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রেরিত আমন্ত্রণলিপি/৫৫০ ; ১২। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গৃহীত চিত্র/৫৮০ (ক) ; ১৩। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ/৫৮০ (ক) ; ১৪। বাউল/৫৮০ (খ) ; ১৫। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ/৬১২ (ক) ; ১৬। ঘোড়ার পিঠে/৬১২ (খ) ; ১৭। বাউল/৬১২ (খ) ; ১৮। তাওয়াং বৌদ্ধবিহার/৬৪৮ (ক) ; ১৯। বামডিলা গোম্পা/৬৪৮ (ক) ; ২০। ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হস্‌পিটালে মাননীয় দলাইলামা/৬৪৮ (ক) ; ২১। দিরাং গোম্পা/৬৪৮ (ক) ; ২২। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট্ অব্ কালচারের অতিথিভবনে আপন কক্ষে অধ্যাপক চেলিশেভ্/৬৪৮ (খ) ; ২৩। হিমালয়ের বিস্ময় —ব্রহ্মকমল পাওয়া যায় ১৪,০০০ ফুট উপরে/৭১১ ; রহস্যঘেরা রূপকুণ্ডে নীলাভ বরফের সর/৭১১ ; স্বামী নিরাময়ানন্দ/৭৮২ (ক)

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ (মাঘ, ১৩৯০—অগ্রহায়ণ, ১৩৯১) ও স্বামী নির্জরানন্দ (পৌষ, ১৩৯১) কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।



৮৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

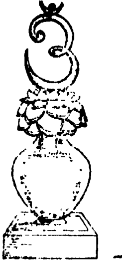
মাঘ, ১৩৯০

দিব্য বাণী

হও পুনঃ অগ্রসর,
তব সেই ধীর পদক্ষেপে
নাহি যাহে হরে শান্তি তার,
নিরুদ্বেগ পথিপার্শ্বে স্থিত
দীন হীন ধূলি-কণিকার ;
শক্তিমান্ তবু, মতি স্থির,
আনন্দ-মগন, মুক্ত, বীর ;
হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণি !
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামীজীর 'To the Awakened India' কবিতার স্বামী প্রজ্ঞানন্দ-কৃত অনুবাদের অংশ
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৯]



কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য

দীর্ঘ পঞ্চাশীতি বর্ষের বর্ণাঢ্য স্মৃতিকে পশ্চাদ্‌ভূমি করিয়া 'উদ্বোধনে'র বর্তমান আবির্ভাব তাহার জীবনের অঙ্গীকারকে আরও একবার স্মরণ করাইতেছে। বর্তমান ষষ্ঠাশীতি পদক্ষেপকালে নবীনতর বল ও প্রেরণার জন্য আমরা সর্বাগ্রে প্রণত হইতেছি তাঁহারই উদ্দেশে, যাঁহার তেজোগর্ভ আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া 'উদ্বোধন' কর্মজগতে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল। যুগনিয়ন্তা স্বামী বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন'-কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন 'সকল সম্প্রদায়'-রূপী ঈশ্বরের সেবায়,—নিয়োজিত করিয়াছিলেন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'। লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার জন্য কবচমন্ত্র : "'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে···সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধি বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য-প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।"

'উদ্বোধন' তাহার বাস্তব জীবনে উক্ত আশিস্‌বাক্যের রূপায়ণে কতখানি সমর্থ হইয়াছে, সে-বিচার আমাদের নহে;—আমাদের অধিকার শুধু নিরলস প্রয়াসে। স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আগামী দিনের 'উদ্বোধন' যেন তাহার নিজ 'শরীরকে' সর্বতোভাবে সর্বসম্প্রদায়গত নারায়ণের সেবায় 'অর্পণ' করিবার ব্রতে অবিচল থাকিতে পারে, তাঁহারই প্রেরণা বলে। আমাদের এই ব্রত-সাধনে বর্ষারম্ভে পুনর্বার চাহিয়া লইতেছি—সক্রিয় সহানুভূতি, 'উদ্বোধনে'র পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই।

'উদ্বোধন' স্বামী বিবেকানন্দেরই ধ্যানসৃষ্ট একটি যন্ত্র, যাহা প্রায় শতাব্দকালব্যাপী, তাঁহার প্রাণদ বাণীকে মানুষের ঘরে ঘরে বহন করিয়া ফিরিতেছে। সূর্য কদাপি শূন্যে তাপ বিকিরণ করে না। তাহাকে আশ্রয় করিতে হয় বাতাস, মৃত্তিকা অথবা কোন পদার্থকে, যাহাকে মাধ্যম করিয়া তাহার উষ্ণতার বিকিরণ ও সঞ্চারণ সম্ভবপর হইয়া থাকে। বিবেকানন্দ-রশ্মির তাপ-বহনের জন্য 'উদ্বোধন'-ও ঐরূপ একটি মাধ্যম,—তাঁহার অনন্ত মানব-প্রেমকে ক্রিয়াশীল রাখিতে একটি ক্ষুদ্র অথচ সঞ্চরমাণ আধার। মাধ্যমের বা আধারের মহিমায় নহে, সূর্যমণ্ডলের আপন তেজেই উত্তাপ বিচ্ছুরিত হয়। 'উদ্বোধনে'রও কৃতার্থতা এখানেই,—সুবিপুল বিবেকানন্দ-পরিমণ্ডলের ভাব-ধারণের অধিকার সে লাভ করিয়াছে।

নানা মতের ও নানা দলের সংঘর্ষ,—বিচিত্র সব ধর্মাদর্শের কুরুক্ষেত্র-সমর চলিতেছে। কেবল ভারতেই নহে, সমগ্র বিশ্বে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একবারই সংঘটিত হইয়া শেষ হইয়া যায় নাই। ইতিহাসের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহারও পুনরাবৃত্তি হইয়া চলিয়াছে—ব্যাপকতর অঙ্গনে। তবে বর্তমান যুগের সমর—যেরূপ সুবিস্তৃত এবং

সমাজ ও ব্যষ্টিজীবনকে যে-ভাবে দুঃসহ দুঃখের আবর্তে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাতে মনে হয় অতীতের কুরুক্ষেত্র বুঝি-বা নিতান্তই বালক্রীড়া। কিন্তু ভাবিতে আশ্চর্য লাগে, স্বামী বিবেকানন্দ এই কুরুক্ষেত্র-বিধ্বস্ত কালেই দণ্ডায়মান হইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতোই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ!" বাস্তবতঃ আমরা যে ভারতবর্ষকে দেখিতেছি,—দেখিয়া দেখিয়া হতাশায় বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি, স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতেও কি এই ভারতবর্ষই বিশ্ব-জাগরণের কেন্দ্র বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল? ইহাই প্রশ্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন,—এবং একটু বিশেষভাবেই দেখিয়াছিলেন। মাতৃভূমির শীর্ষদেশ হইতে পাদদেশ অবধি সর্ব-অঙ্গের সকল ঐশ্বর্য-বিভব এবং সর্ববিধ দৈন্য-দুর্দশাকে তিনি চাক্ষুষ দেখিয়াছেন,—ভক্তিতে ও বিস্ময়ে, বেদনায় ও করুণায় তিনি ঐ দেখার সূত্রে যাহা যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—আমাদের জানা নাই, অপর কোন ভারত-দ্রষ্টা তাহা করিতে পারিয়াছেন কিনা। উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পরিব্যাপ্ত এই সুবিশাল পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিটি ধূলিকণা তিনি স্বীয় দেহে স্পর্শ করিয়াছেন,—এখানকার অপার জন-সমুদ্রের এক-একটি তরঙ্গকে—প্রত্যেকটি স্রোতোধারাকে তিনি আপন বক্ষে ধারণ করিয়া, উহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বোধ করিয়াছেন! মহা-পরিব্রাজকের চরণদ্বয় তাই শান্ত গম্ভীর সমাধি-ভূমিতেই মাত্র স্থিত থাকে নাই,—উহা সদা বিচরণশীল ছিল চঞ্চল অসমতল জনমানসক্ষেত্রেও। তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে ঐরূপে গঠিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি সহায়ে তিনি মলিনবসনা, নিরাভরণা ভারত-জননীর প্রতি অঙ্গে অবলোকন করিয়াছিলেন 'সর্বার্থসাধিকা গৌরী নারায়ণী'-রূপের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। তাঁহার ঋষি-দৃষ্টিতে তাই নিছক দুর্দশার কালো মেঘমালাই গোচর হয় নাই,—ধরা পড়িয়াছে মেঘপুঞ্জের আড়ালের সূর্য-প্রভাও। যুগ-যুগ সঞ্চিত ভস্মস্তরের তলদেশে ভারতের চির-অনির্বাণ আত্মাকেই স্বামীজী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন;—ভাবচক্ষে নহে, স্বপ্নে নহে, কল্পনাতেও নহে,—দিবালোকের মতো তীক্ষ্ণ সত্য বলিয়া তিনি বাস্তবিকই উপলব্ধি করিয়াছেন। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বর্তমানের সঙ্গে যুগপৎ অতীত ও অনাগতও ভাসমান ছিল,—তাই তিনি ত্রিকালদর্শী। আর এই কারণেই তিনি বর্তমান ভারতবর্ষের ক্লিষ্ট চেহারাখানি মাত্র দেখিয়াই নিরাশা প্রকাশ করেন নাই। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"—এই বলিষ্ঠ আশা-ব্যঞ্জক বাণী উচ্চারণ করিতেও তাই তিনি মোটেই দ্বিধা করেন নাই।

আরও একটি কথা। মানব-সুহৃদ্ বিবেকানন্দ—নরসখা নরেন্দ্র। মাত্র শরীরের জন্মভূমি বলিয়াই—ভারতবর্ষ নামক দেশকে তিনি ভালবাসিয়াছেন;—নিছক স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের মহিমায় তিনি বিভোর ছিলেন,—এইরূপ চিন্তা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। অথচ, ইহাও সত্য যে ভারতের গরিমা উদ্‌ঘোষণে তাঁহাকে নিয়তই উদ্দীপ্ত দেখা যাইত। ইহারই বা সামঞ্জস্য কোথায়? প্রশ্নটি তাই অনেক কারণেই সতর্ক বিচার-সাপেক্ষ। স্বামীজীর ভারত কেবলমাত্র একটি দেশ নহে;—ভারত তাঁহার দৃষ্টিতে 'পুণ্য-ভূমি'। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জনয়িত্রী সেই ভারতই বিবেকানন্দের 'এবার কেন্দ্র'। অতি দুর্গত, ভয়ার্ত, বহু মতবাদ-শৃঙ্খলিত, কলহ-পীড়িত, অনশন-শীর্ণ এই হৃতশ্রী ভারতেই সর্বমানবের, সকল জীবনের মুক্তির সাধন সর্বাগ্রে আরব্ধ—এই ভারতাকাশেই মুক্ত আত্মার জয়গান প্রথম

উত্থিত—সুপ্ত জীবের পুনর্জাগরণের মন্ত্রোচ্চারণ এখনও ভারতের বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই ভারতবর্ষেই মহাশ্মশানকে ক্রন্দন-ক্ষেত্রে পরিণত না করিয়া, শক্তি আরাধনার পীঠস্থান জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। মানবের মাঝে মহামানবকে, নারীর মাঝে জগজ্জননীকে এবং পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে এই ভারতই শিখাইয়াছে। আত্মতুষ্টিকে নিষেধ করিয়া ভূমার জন্য সর্বস্ব-পণ করিতে উৎসাহ দিয়াছে এই ভারতবর্ষই। অর্থকে নিরতিশয় তিরস্কৃত করিয়া পরমার্থের জন্য নিরন্তর অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে এই ভারত। ঘোর তমসার পারে হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষের ঠিকানা ভারতবর্ষই জগদ্বাসীকে জানাইতে পারিয়াছে। আবার পতনের কথাও যদি ধরা যায়,—তাহা হইলেও বলিতে হইবে, ধর্ম-নীতি ও শাস্ত্র-সত্যকে অস্বীকারের ফলশ্রুতি যে চরম দুর্গতি, তাহাও এই ভারতেই যেমন সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে, কুত্রাপি তেমনটি দেখা যায় নাই। এক ভারতবর্ষের ইতিহাসেই মানবাত্মার উত্থান-পতনের চক্ররেখাটি যেন সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতি ঊর্ধ্বতম ধাপ হইতে নিম্নতম সোপান পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষের এমন পূর্ণাঙ্গ চিত্র আর কোথায় মিলিয়াছে? মানুষের উচ্চতম অধিকারের অজস্র উজ্জ্বল ছবি আমরা ভারতবর্ষের পুরাণেতিহাসে অনায়াসেই পাইতে পারি,—আবার মানুষের চরমতম অধোগতির জঘন্য উপন্যাসও এখানকার পথে-প্রান্তরে কিছু বিরল নহে। এই গতিচক্রের আবর্তন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির জীবনে অংশতঃ পাওয়া গেলেও, কোথাও পরিপূর্ণরূপে মেলা দুষ্কর। প্রাচীন এই ভারতভূমি তাই এই দিক দিয়াও অনন্যা।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের একখানি সমগ্র চিত্র অবলোকন করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি বিশ্ব-মানবকেই প্রতিফলিত দেখিয়াছেন। ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসিয়া তিনি দূরপ্রসারী দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এই মহাভূখণ্ডের দিকে,—এই মহাজাতির উভয় প্রান্তকে তিনি দেখিয়া লইয়াছিলেন। অতীতের গরীয়সী ভারতকে অপরোক্ষ করিয়া তিনি শ্রদ্ধায় সমাহিত হইয়াছেন,—আবার বর্তমানের ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়াছেন। আত্মচৈতন্যহীন পশুবৎ বিচরণশীল আধুনিক মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া তিনি তীব্র ভৎ‍সনার সুরে বলিয়া উঠিয়াছেন—উহারাই কি সেই দেশ ও জাতির বংশধর, যাহারা সর্বপ্রথম বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল?

শিবাবতার স্বামীজীর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ—"মা যাহা হইয়াছেন এবং মা যাহা হইবেন"—স্পষ্টই ধরা পড়িয়াছিল। গভীর মমতায় এবং নিবিড় প্রেমে তাই মহাযোগীর দুই নয়নে জ্যোতিঃ ঠিকরাইতে দেখিয়াছি আমরা;—করুণার বারিধারা চক্ষে ঝরিয়াছে তাহাও জানি। কিন্তু তাঁহার ললাটের তৃতীয় নয়নে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল ভারতের আর এক অদ্বিতীয়া মূর্তি—সেই ঐতিহ্যময়ী সনাতনী প্রতিমাখানি। যুগ-যুগান্তরের সেই চিরন্তন ভারতবর্ষকে দেখিয়া তিনি ধ্যান-তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। সে-ধ্যান যতই গভীর হইয়াছিল,—ততই বাহ্য প্রান্তরেখার ব্যবধান বিলোপ পাইয়াছিল—সর্বপ্রকার বিচ্ছিন্নতার অবসান হইয়াছিল। বিবেকানন্দের সম্যক্ দৃষ্টিতে তাই ভারতের এক অখণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেখ্যই নিরন্তর শোভমান ছিল,—দেবত্বের ও অসুরত্বের বৈসাদৃশ্য তাই তাঁহার দৃষ্টিতে কখনই বড় হইয়া দেখা দেয় নাই—তাঁহার দৃষ্টিকে কদাপি আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। আত্মদর্শী ঋষি ঠিকই জানিতেন,—সোনায় মাটি লাগিতে পারে, কিন্তু কলঙ্ক ধরিতে পারে না। আত্মার অবনমন প্রতীত হইলেও

সত্য নহে। কালপ্রভাবে রূপের পরিবর্তন ঘটে, —কিন্তু উহা কোন পরিণাম নহে। সাময়িক এই পরিবর্তন, নিতান্তই বিবর্তন মাত্র। ভারতীয় সমাজের যে-অধোগতি, একজন সমাজপ্রেমীকে ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলে,—পুরুষাবতার স্বামীজীকে কিন্তু তাহা তেমন করে নাই। কারণ, তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে উহা অধোগমনই নহে। তিনি জানিতেন, উহা মৃত্যু নহে,—সাময়িক মূর্ছা মাত্র। পরন্তু তিনি উহাতেই আসন্ন মোহ-ভঙ্গের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া,—মূর্ছা-অন্তে পুনর্জাগরণের আভাস বুঝিয়া, হর্ষে উদ্দীপনায় রোমাঞ্চিত হইয়াছেন। দৃপ্ত তেজে গর্জিয়া উঠিয়াছেন: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" মনুষ্যত্বের উচ্চতম হইতে অধস্তল অবস্থাকে এমনভাবে একপলকে পর্যবলোকনের সুযোগ,—দুইটি প্রান্তকে এইরূপ সংযুক্ত করিয়া পর্যালোচনার অবকাশ স্বামীজী ভারতবর্ষের সমাজ-পটেই পাইয়াছিলেন। এই কারণেও তিনি ভারতের অসাধারণ গরিমায় আবিষ্ট হইয়া বিশ্বসভ্যতার নবোত্থানের 'কেন্দ্র' বলিয়া ভারতবর্ষকেই চিহ্নিত করিয়াছেন।

আধুনিক বিশ্বের বরিষ্ঠ লোকগুরু বিবেকানন্দ। তাঁহার উপদিষ্ট 'ধর্ম' বলিতে আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা উপনিষদোক্ত আত্মার ধর্ম—মানুষের স্ব-স্বরূপের প্রকাশ সাধন। বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত ধর্মের মূলসূত্র, বা বেদান্তের সার নিষ্কর্ষ হইতেছে আত্মস্বরূপের জ্ঞান এবং জীবনে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ। সর্বজীবে এক আত্মা—সকল জীবকে অবিভাজ্য পরমাত্মা বোধে, পরার্থে জীবন উৎসর্গ;—অথবা, সরল কথায়, ত্যাগ ও সেবাই বিবেকানন্দের মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহা অতি পুরাতন ধর্মমত সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বৈদিক চিন্তাধারায় ইহাতে অভিনবত্ব কিছু ঠেকিবে না। ঠিকই বটে! আমরাও বলি, তত্ত্ব হিসাবে ইহা নূতন নহে, বরং চিরপুরাতন, সনাতন ও শাশ্বত। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সাধনমন্ত্র হিসাবে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক নূতন। স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণেই নবযুগকর্ণধার,—জড়বিজ্ঞান ও আত্ম-সত্যের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অবতীর্ণ গীতাসিংহনাদ-কারী পার্থসারথি স্বয়ং।

জড়বিজ্ঞানের মূলে আছে শক্তি, আর আত্ম-সত্যের সুর হইতেছে শান্তি। শক্তির প্রকাশে এক-দল "নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।" শান্তিপ্রিয় অপর শ্রেণী "নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন।" যদিও ভারতের মৃত্তিকায় সত্য ও শান্তিই স্বাভাবিক রস, তথাপি নৈসর্গিক কারণে পশ্চিম সমুদ্রের তরঙ্গ-ফেনার সঙ্গে সেদিকের জড়বিজ্ঞানগত শক্তি এবং ইহ-স্পৃহাও ভাসিতে ভাসিতে ভারতের তটে আসিয়া বিপুলভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। তাই প্রকৃতিগত 'অধ্যাত্ম' এবং সমাগত 'অধিভূত'—এই উভয় ভাবের অনিবার্য সংঘাতে আধুনিক সমাজ বিপর্যস্ত হইতেছে। অথচ, বর্তমান এই যুগসন্ধির কালে, একটিকে নিঃশেষে বাদ দিয়া অপরটিকে সজীব রাখাও হইবে অত্যন্ত হাস্যকর এবং অবান্তর প্রয়াস। সেই হেতু, চতুর্দিকেই কেবল অসন্তোষ, বিক্ষোভ, কলহ ও অসামঞ্জস্য। এ-হেন দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিতে স্বামীজী এই 'উদ্বোধন'-কেই মনোনীত করিয়াছেন এক বিশেষ দায়িত্ব বহন করিতে। 'উদ্বোধনে'র জন্য তাঁহার স্বলিখিত প্রস্তাবনায় সে-কথা বিশদ আলোচিত,—তাই পুনরুল্লেখ বাহুল্য। জাতির বর্তমান সমস্যায়, উক্ত উভয় ভাবের সুসমঞ্জস সমীকরণের একান্ত অপরিহার্যতা—সত্ত্ব ও রজোগুণের সমুচ্চয় বিধানকে তিনি পরম কল্যাণকর নিদানস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। আরও বলিয়া গিয়াছেন,—"এই সম্মিলন ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"

দ্বিশতবর্ষের এক গৌরব-স্মৃতি

সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীর বুকে একটি বিশেষ স্মরণীয় অনুষ্ঠান হইয়া গেল। এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বিশতবর্ষপূর্তি-উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সমাধা হইল। বিগত ১১ জানুআরি, '৮৪, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই উৎসবানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎসভার এই দ্বিশতবর্ষ অতিক্রমণের ইতিহাস নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের ও গর্বের। বাংলার উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও উন্মুক্ত আলো-বাতাসই এইরূপ একটি বিশ্ববিদ্যা-ক্ষেত্রকে এতকাল বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, লালন করিয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে বাধা দেখি না,—সে-স্বীকৃতিতে একটা মর্যাদাবোধও রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আজ সর্বাগ্রে যাঁহার কথা মনে জাগিতেছে,—যাঁহার অবদানকে ভারতবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছে, তিনি ভারতপ্রেমী মনীষী উইলিয়াম্ জোনস্।

অষ্টাদশ শতকের ইওরোপের বিশিষ্ট প্রতিভা স্যার উইলিয়াম্ জোনস্ ভারতে আসিয়াছিলেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে। কলিকাতাস্থ সুপ্রীম কোর্ট-ভবনের গ্রাণ্ড জুরি রুমে ১৭৮৪-র ১৫ জানুআরি, জন ত্রিশ বিদেশী বিদগ্ধ ব্যক্তি মিলিত হইয়া একটি অভুতপূর্ব প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন,—উহাই ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জন্মের প্রেরণা। বলা বাহুল্য, উইলিয়াম্ জোনসই ছিলেন ঐ প্রস্তাবের উত্থাপক,—পরিকল্পনার রূপকার—সর্বজনস্বীকৃত ভাবী সোসাইটির প্রথম সঞ্চালক ও সভাপতি। নামকরণ হইয়াছিল—দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। কিঞ্চিদধিক এক দশক-কাল তিনি এই দেশে ছিলেন,—তাঁহার জীবন-দীপ নিভিয়াছিল অকালে এই কলিকাতা শহরেই, মাত্র ৪৭ বৎসর ৭ মাস বয়সে—১৭৯৪-র ২৭ এপ্রিল তারিখে। সেদিনের কলিকাতাবাসী এই ভারত-বন্ধুকে সম্মান জানাইয়াছিলেন, দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটস্থ সমাধিভূমিতে তাঁহার মরদেহের শেষ-শয্যার উপরে একটি সু-উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ঐ ইষ্টক-স্তম্ভটি তাঁহার যোগ্য স্মারক নহে;—স্যার উইলিয়াম্ জোনসের উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ হইতেছে বর্তমান পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে স্থাপিত সেই এশিয়াটিক সোসাইটি নামক বৃহৎ বিদ্যাবিহার। অবশ্য ইহার নির্মাণ জোনসের মৃত্যুর অনেক পরে হইয়াছিল,—১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা একজন বিদেশী। যখন উহার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির দোর্দণ্ড রাজত্বকাল। আর ঐ কোম্পানির দ্বারাই নিযুক্ত হইয়া তিনি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে আসিয়াছিলেন। অথচ, কার্যত: ভারতবাসী তাঁহার মধ্যে লাভ করিয়াছিল একজন ভারতানুরাগী যথার্থ জ্ঞানী সুহৃদকে,—যিনি তাঁহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-কর্ম দিয়া ভারতকেই ভালবাসিয়াছিলেন,—ভারতের ভাবমূর্তিকে বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই ঔপনিবেশিক যুগে ইহা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বৈকি! অনেকে হয়তো বলিবেন, এশিয়াটিক সোসাইটিও ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক আবাদেরই উৎপন্ন ফসল,—বিজিত সাম্রাজ্যকে নিখুঁতভাবে জানিবার উদ্দেশ্যে, এবং সেখানকার মানুষজন ও প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার মতলবেই উহা সংস্থাপিত।—অতএব, এই প্রতিষ্ঠানের মূলেও ছিল বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর প্রচ্ছন্ন বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ। এইরূপ দৃষ্টিকোণ হইতে সোসাইটিকে দেখিলেও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তদুত্তরে আমাদের বলিবার ইহাই যে, বৃক্ষের সঠিক পরিচয় তাহার প্রদত্ত ফলে ও ফলের স্বাদে।

এশিয়াটিক সোসাইটিরূপ ফলবান বৃক্ষটির যথার্থ মূল্যায়ন হইবে, বিগত দুই শতাব্দব্যাপী ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারে উহার অবদানের হিসাব ধরিয়া। তদানীন্তন এবং ইদানীন্তন উভয়কালের নিরপেক্ষ বিচারে স্যার উইলিয়াম্ জোনস্ এক অসাধারণ প্রতিভা,—বিদেশাগত হইলেও তিনি ভারতেরই বাণীমন্দিরের একজন নিষ্ঠাবান্ সাধক। আজ হইতে দুই শতবর্ষ পূর্বে তন্দ্রাচ্ছন্ন এই জাতি সেদিন তাঁহারই হাতে গড়া এশিয়াটিক সোসাইটি নামক জাদুকাঠির স্পর্শে কিঞ্চিৎ নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছিল,—ঘরের সম্পদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার মতো সংবিদ্ ফিরিয়া পাইয়াছিল,—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এ-সত্যকে অস্বীকার করা চলে কি? অবশ্য সেই নবজাগরণে উইলিয়াম্ জোনসের সহযোগীরূপে দেশীয় মনীষীরাও অনেকে মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। ইঁহারাও আমাদের নমস্য। যথা—শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, আলি ইব্রাহিম খান প্রভৃতি। সংস্থাপনার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই আমরা আরও অনেক ভারতীয় গুণীজনকে ইহার সহিত প্রত্যক্ষ সংযুক্ত থাকিতে দেখি—যাঁহারা এই বিশ্ববিদ্যাতীর্থকে আন্তরিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। বোধ হয়, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক অর্থে এশিয়াটিক সোসাইটিতে ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—তাঁহারা পাঁচজন হইলেন সর্বশ্রী দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস, হরমল দত্ত ও রামকমল সেন। তাঁহারাও আমাদের শ্রদ্ধার্হ।

স্যার উইলিয়াম্ জোনসের ব্যক্তিগত মনীষাকে আমরা মোটামুটি ত্রিধারায় প্রকাশিত দেখিতে পাই। এক: প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভাষাগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট শনাক্তকরণ তথা আধুনিক ভাষা-চর্চার নূতন দিক্-নির্দেশ; দুই: গ্রীক্ ইতিহাসের ব্যাপক পর্যালোচনা; তিন: সংস্কৃত সাহিত্যের রত্ন-পেটিকার চাবির সন্ধান প্রদান—বিশেষ তাঁহার স্ব-কৃত অনুবাদ-কার্যের সাহায্যে মহাকবি কালিদাসকে তথা সংস্কৃতভাষাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃতভাষা ছাড়াও প্রাচ্যদেশীয় আরও বহু ভাষার চর্চায় তাঁহার বৈদগ্ধ্য সুবিদিত ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থের 'ইংরেজী অনুবাদ' এবং প্রাক্-ইসলামী আরবী কবিতাগুচ্ছের ইংরেজী ভাষান্তর তাঁহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক ইওরোপীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে তিনি ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ান আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাঁহার বিদ্যালয়-জীবনেই। জার্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। বহুভাষাবিদ্ জোনস্—দর্শনশাস্ত্র, গণিত ও আইনশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সব ব্যক্তিগত প্রতিভা ও অবদানের পরিচিতি ব্যতীত, তাঁহার সর্বাধিক কীর্তিসূচক কার্য হইতেছে, এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্থাপনা। সেখানে তিনি নানা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের একত্র করিয়া প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এক অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। জোনসের মনীষাজাত এই এশিয়াটিক সোসাইটি তদানীন্তনের মানবিক ও বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছিল;—আবার আধুনিক-কালেও ইহা ঐ উভয় শাখাতেই প্রেরণার উৎস স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান। ভারতে এমন সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র খুব কমই আছে, যাহারা এশিয়াটিক সোসাইটির মাতৃত্বকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত।

বিশ্ববিদ্যার সকল অঙ্গনেই এই এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান অতুলনীয়,—ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সোসাইটির জ্ঞান-দীপ সমান দেদীপ্যমান। আমাদের জানা নাই, এককভাবে এই দেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এমন গৌরব স্থাপনায় সমর্থ হইয়াছে

কিনা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহামিলনপীঠ এই এশিয়াটিক সোসাইটি তাই অনেক কারণেই একটি অনন্য বিদ্বৎসভা। ভারতের মহান্ আধ্যাত্মিক সম্পদের উৎসের সন্ধান দিতে এই সোসাইটির অবদান বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিগত দুই শতক কাল ব্যাপী অসংখ্য গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি ইত্যাদি এখানে সংগৃহীত হইয়াছে,—রচিত এবং প্রকাশিতও হইয়াছে। ঐগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় সম্পদ্। মহামতি উইলিয়াম্ জোনসের নিকট আমাদের ঋণ তাই অপরিশোধ্য।

পরিশেষে আজ আমরা এ-কথাও অসঙ্কোচে ও বেদনার সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে, স্বাধীনতার উত্তরকালে কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটিকে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখিতেছি। অবশ্য এই অনুজ্জ্বলতার একটি বড় কারণ হইতে পারে যে, বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা ও অনুশীলনের জন্য এখন আরও অনেকগুলি সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে,—বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র ও পরিধি এখন অনেক সম্প্রসারিত ও ব্যাপক—এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সক্রিয় ভূমিকাও ইদানীং যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। তথাপি আমরা বলিব,—এশিয়াটিক সোসাইটির প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই। ভারত তথা এশিয়া—এক কথায় প্রাচ্যের জ্ঞান-সমুদ্রও নিশ্চয়ই শুকাইয়া শেষ হইয়া যায় নাই। মানুষের জ্ঞান-পিপাসা এখনও অফুরন্ত। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের কি কথা, ভারত-তত্ত্বই তো অগাধ—এখনও পর্যন্ত উহা গভীর রহস্যাবৃত। প্রকৃত ভারত অদ্যাবধি অনুদ্‌ঘাটিত। সুতরাং এশিয়াটিক সোসাইটির পুনরুজ্জীবন এবং পুনঃসম্প্রসারণ কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক নহে, স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে মহান্ দায়-স্বরূপ,—পবিত্র কর্তব্যও বটে। এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় শতকে প্রবেশের প্রাক্কালে আমরা উহার নবীনতর বিকাশের সম্ভাবনার দিকেই আশান্বিত দৃষ্টি ফিরাইতেছি। এই উপলক্ষে মনে পড়িতেছে, উইলিয়াম্ জোনসের তিরোধানের শতবর্ষ পরে উচ্চারিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি তাৎপর্যবোধক উক্তি :

"চিরকালই ইওরোপ হইতে সামাজিক এবং এশিয়া হইতে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হইয়াছে—এবং এই দুই শক্তির বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণেই জগতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। মানব-জাতির ইতিহাসের একটি নূতন পৃষ্ঠা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে এবং সর্বত্র তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে। শত শত নূতন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হইবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত—সত্য ও শিব অপেক্ষা যোগ্যতম আর কি হইতে পারে?"

তিনি (জোসেফিন ম্যাকলাউড) বললেন, বিবেকানন্দ বেশির ভাগ সময়ই ছিলেন কিশোর সুলভ পরম হাস্যচপল। তাই একদিন তাঁকে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন: 'স্বামীজী, আপনি ধর্মপ্রবণ লোক নন';—বিবেকানন্দ গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন: 'আমিই ধর্ম।' কিন্তু কোন কোন দিন ভারতবর্ষ ও জগতের দুঃখ তাঁকে এমন বিদ্ধ করে তুলত; তিনি গম্ভীর ও নিঃশব্দ বেদনার ভারে কাতর হয়ে পড়তেন,—তা থেকে কিছুতেই তাঁকে যেন বাইরে আনাই অসম্ভব হত। অস্থিমজ্জায় তিনি মানুষের ব্যথা অনুভব করতেন।

—রোমাঁ রোলাঁর দিনপঞ্জী 'INDE' থেকে অনূদিত



আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী

[পৃঃ ৩৫]



স্বামী প্রেমানন্দ

[চিত্রটি এতাবৎ অপ্রকাশিত—সম্ভবতঃ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের কোন ভক্ত-গৃহে তোলা।]

স্বামীজী-প্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজ

(সংকলন)

তোমরা আগে স্বামীজীকে বুঝতে চেষ্টা কর, পরে ঠাকুরকে বুঝবে। ঠাকুর সূত্র, স্বামীজী তাঁর ভাষ্য।

জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা অতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। এ-জ্ঞান নিয়ে সেবা জীবন্ত ভগবৎ সেবা তুল্য। সেবা কি আর এক রকম? অনন্ত রকমে জীবসেবা হতে পারে—নিরন্নকে অন্ন, নিরক্ষরকে শিক্ষা, অসুস্থকে স্বাস্থ্য এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানদানও সেবা। বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে শিব-জ্ঞানে জীবসেবার কথা শুনে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অসামান্য অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা সহায়ে সেবাই বর্তমান যুগের ধর্ম বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর পুণ্য পবিত্র জীবনে দেখিয়ে গেলেন—জীবসেবাই ধর্ম।

কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? প্রেমভক্তির কথা শোনার অধিকারী কে আছে এখানে? শুনবেন? তবে শুনুন। একজন পসারী পাড়া ঘুরে ঘুরে হেঁকে হেঁকে যাচ্ছিল—'প্রেম নেবে গো? প্রেম নেবে? প্রেম চাই গো, প্রেম চাই।' রাস্তার দু-পাশের সকল বাড়ির মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো দরজা খুলে সকলে বেরুচ্ছে আর বলছে, 'হ্যাঁ, নেব। কি দর?' পসারী বললে, 'এর আবার দর কি হতে পারে? এ তো মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না, এ অমূল্য। তবে এক মূল্যে দিতে পারি—এর মূল্য হল "মাথা"। কেউ পারবেন দিতে?' মূল্যের কথা শুনে সকলে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বাড়ির ভেতর ঢুকল। তাই বলছিলাম—প্রেমভক্তির কথা শুনতে চান, উত্তম কথা। কিন্তু কেউ পারবেন আপনার মাথা দিতে? কে পারবেন বলুন? কেউ পারবেন প্রাণ বিলিয়ে দিতে? সহজ নয় প্রেমভক্তি। এ-যুগে ভুবনবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন তাই ধর্ম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

'হে বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা জগতে শ্রেষ্ঠ হবেই হবে'—সাক্ষাৎ শিব-বাক্য, বিশ্বাস কর। যুবকগণ, সাবধান! এখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তোমাদের আদর্শ, উহাই অনুসরণ কর, তবেই নব বলে বলীয়ান্ হবে, নিশ্চয় জেনো। সর্বশক্তির আধার আমাদের প্রভু। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর অভেদ, শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীও তাই।

আমাদের উপযোগী ধর্মের কথা বলে গেছেন স্বামীজী। এ-যুগে আমাদের আদর্শ হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিন। লোকে আগে স্বামীজীকে বুঝুক—তাঁর ভাব ধারণা করুক। তাঁকে না বুঝলে ঠাকুরকে বুঝবার সাধ্য নেই। রামচন্দ্রকে বুঝতে হলে আগে তাঁর ভক্ত হনুমানজীকে বুঝতে হয়। আর স্বামীজীকে বুঝলেই ঠাকুরকে বোঝা হল।

স্বামীজী ছিলেন অধমতারণ, পতিতপাবন।

ওঁর কি সর্বতোমুখী প্রতিভা! স্বামীজী পবিত্রতার আধার ছিলেন—আর তিনি ছিলেন বীর।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর পত্রাবলী পড়বি, দেখবি কি তেজ, কার সাহসে তিনি সাহসী হয়ে চলতেন! সামনে অমন অদ্ভুত, অমানুষী আদর্শ থাকতে আবার তোদের ভয়!

*

ঠাকুর বলতেন, 'একমাত্র স্বামীজীই জ্ঞানের

অধিকারী, আর সব ভক্তির।' ঠাকুর নিজ জীবনে অদ্বৈতভাব চেপে বেশির ভাগ ভক্তিই প্রচার করেছেন। আর স্বামীজী ভক্তিভাবকে চেপে অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। স্বামীজীর মতো ভক্তিমান লোক কয়টা আছে?

ঠাকুরের অদর্শনের পর, অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যা করতে চলে গেছেন। তখন বরাহনগরে মঠ ছিল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সব বৈষ্ণব-ভাব হয়েছিল। তাই দেখে স্বামীজী একদিন বললেন, 'বৃন্দাবন থেকে তোরা তেলক মাটি এনেছিস, দে আমাকে বষ্টুম সাজিয়ে দে।' এই বলে সর্বাঙ্গে ছাপ, নাকে তেলক প্রভৃতি মাখলেন। তারপর বললেন, 'দে ঝুলি মালা দে।' এই বলে ঝুলি মালা নিয়ে বিদ্রূপ করে চক্ষু বুজে জপ করতে লাগলেন, 'নিতাই ঠক্ ঠক্, নিতাই ঠক্ ঠক্।' সব হাসির রোল উঠল। খানিক পরে ঝুলি মালা রেখে বললেন, 'খোল নিয়ে আয়, এইবার কীর্তন হবে।' এই সব কথা তিনি বষ্টুম দীনতার সঙ্গে বললেন। খোল-টোল এল, বললেন, 'আমি মওড়া গাইচি, তোরা সব গাইবি।' এই বলে গান ধরলেন—'নিতাই নাম এনেছে, নাম এনেছে, নাম এনেছে রে।' আমরাও সব গাইলুম। ঐ লাইনটা দু-তিনবার বলবার পর দেখি স্বামীজীর দুই চক্ষু দিয়ে দর দর ধারায় জল পড়ছে। রাস্তার লোক পাছে আসে বলে দরজায় খিল দিয়ে খুব কীর্তন হতে লাগল। বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৪।৫ টা অবধি এইভাবে চলল। এইরূপ কীর্তন কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর থাকতে জমতে দেখতুম। আর সেদিন জমেছিল।

*

আহা মহামায়ার কি খেলা! কেমনটি করে বাহ্য চাকচিক্য দিয়ে সকলকে মায়ার মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন! মায়ার ডোরে সব বাঁধা, তাই সকলে ভুলে আছে। কিন্তু একজনকে বাঁধতে পারেননি। কাকে জানিস? স্বামীজীকে। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর বাগানে ছিলেন, স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ) একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কত স্নেহ, কত কৃপা পাচ্ছি, কিন্তু কি লাভ হল, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।' শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বললেন, 'কিছুকাল থাক, ধীরে আস্তে সময়ে বুঝবি কি লাভ হল।' নরেন বললেন, 'সময়ে বুঝব? আমি যদি কাল মরে যাই।' শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন, 'যা তোর কাল থেকেই হবে।' শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কৃপা স্বামীজীর উপর! এজন্যই কত করেও মহামায়া তাঁর ধার কাছ দিয়েও এগুতে পারেননি। স্বামীজীর কাছে এসে যেন মহামায়া কেঁচোটির মতো থাকতেন।

তাঁহার (স্বামীজীর) সম্বন্ধে ঠাকুর কত কি বলতেন, তা তোকে একদিনে কি বলব? কখন বলতেন, নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে; কখন বলতেন, ও সাক্ষাৎ শিব, জীব শিক্ষার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে; কখন বলতেন, ও আমার শ্বশুর ঘর। আবার কখন বলতেন, এমনটি জগতে কখনও আসেনি। একদিন বলেছিলেন, মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়।

ভগবান লাভ হইল না বলিয়া বরাহনগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দ সারারাত্রি ক্রন্দন করিতেন। চোখের জলে সে সময় স্বামীজীর মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইত। আমি প্রাতঃকালে উহা রৌদ্রে দিতাম।

আমি স্বামীজীর শিষ্য, স্বামীজীর ভক্ত।

কর্মযোগ ও সেবা

স্বামী গম্ভীরানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। প্রবন্ধটি গত ২১ জুলাই, ১৯৮৩ তারিখে জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে আয়োজিত ভক্তসমাবেশের প্রসঙ্গ-কথা থেকে সংগ্রথিত।

আজকে আমরা কর্ম ও সেবা সম্বন্ধে একটুখানি আলোচনা করব। আমি আলোচনা বলছি এইজন্য যে, বক্তৃতা দেবার বয়স আমার পেরিয়ে গেছে। এখানকার অধ্যক্ষ মশাই বলেছেন—আপনাকে বক্তৃতা দিতে হবে না; বসে কথাবার্তা বলার মতন কিছু বলে যাবেন। আমি তেমনিভাবেই বলছি।

যাঁরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়েছেন, তাঁরা সকলেই একটা বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত আছেন। ঘটনাটা হচ্ছে শম্ভু মল্লিক মশাইর সম্বন্ধে। শম্ভু মল্লিক মশাই ঠাকুরকে বলেছিলেন—ভাবছি, আমার যা টাকাকড়ি আছে তাই দিয়ে কিছু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল তৈরি করে দেব। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন—এ তোমার কি হীনবুদ্ধি! যদি ভগবান্ তোমার কাছে আসেন তাহলে তুমি কি তাঁর কাছে কতকগুলি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইবে, না তাঁকে চাইবে? আবার তাঁকেই বলেছিলেন—নিষ্কামভাবে যদি ওগুলো করতে পারো তো ভাল। তিনি অন্যত্র বলেছেন—কলিতে কর্মযোগ বড় কঠিন। নিষ্কামভাবে করা সহজ নয়, কোথা থেকে অহংকার এসে পড়ে। মনে করছি আমি বেশ নিষ্কামভাবে কাজ করছি, কিন্তু কোথা থেকে অভিমান—অহমিকা এসে পড়ে, বুঝতেও দেয় না। কর্মযোগ বড় কঠিন। তাহলে কর্ম বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? তিনি নিজেই বলেছেন বিভিন্ন জায়গাতে,—কথামৃতে আছে যে, কর্ম মানে হল বৈদিক কর্ম—যাগযজ্ঞ প্রভৃতি, যার বিধান বেদে দেওয়া আছে। সেই সমস্ত বৈদিক কর্ম করার পদ্ধতিও আমরা ভুলে গেছি। সে-সব জানে, এমন লোক-ও বিশেষ নেই। তাছাড়া খরচসাপেক্ষ। ঠাকুর বলেছেন—জীব কলিতে অন্নগতপ্রাণ; অন্ন ছাড়া তাদের চলে না। আর খালি পেটে ধর্ম হয় না—এ-কথাও ঠাকুর বলেছেন। অর্থ উপার্জনের জন্য লোককে খাটতে হয়। ঠাকুরের মতে এবং সত্যিকারের অবস্থা যা আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে, এটা ঠিকই যে সকলকেই খাটতে হচ্ছে। কর্ম ছেড়ে কেউ থাকতে পারছে না। তবু বললেন কিনা কর্মযোগটি সম্ভব নয় এই যুগে। তার অর্থ হচ্ছে,—বর্তমান যুগে কর্মযোগ বলতে ঠাকুর বোঝালেন যে, বৈদিক কর্ম ইত্যাদি শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী করা সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ম সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবার কথা তিনি বললেন না। এই যে বললেন—খালি পেটে ধর্ম হয় না, তাহলে পেট ভরার জন্য আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। আর যে বললেন জীব কলিতে অন্নগতপ্রাণ—অন্নের জন্য ছোটাছুটি করতেই হচ্ছে। তাছাড়া সে পারে না। অবশ্য অন্যপ্রকারের লোক বিরল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ঠাকুরের কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, নিষ্কামভাবে কর্ম করা তিনি অনুমোদন করেছিলেন। আর প্রসঙ্গতঃ বলা চলে নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করা, ধর্মশালা করা বা কূপ খনন করা ইত্যাদির এবং দান ও তপস্যার বিধানও বেদে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে আছে। এইগুলি নিষ্কামভাবে করাকেও কর্মযোগ বলা চলে। কিন্তু এই কর্মযোগও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার দেখছি, শংকরাচার্য বলেছেন—কর্মযোগ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভব,—সন্ন্যাসীর পক্ষে নয়।

প্রশ্ন জাগে, পারিভাষিক অর্থে কর্মযোগ যদি

অসম্ভব হয় তবে উপায় কি ? তখন ঠাকুর বললেন —হ্যাঁ, কর্ম তো করতেই হবে। এখানে কর্ম কথাটা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করলেন। মাস্টার মশাই একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমরা কি সংসার ত্যাগ করব ? বললেন—না, না, সংসার ত্যাগ করবে কেন ? সংসার ত্যাগ করতে হবে না। তবে এক হাতে ভগবান্‌কে ধরে আর এক হাতে সংসার কর। তারপর আবার বলছেন—আগে ভগবান্ সম্বন্ধে জেনে নিয়ে, ভগবান্ একজন আছেন, যা কিছু কর্ম আমি করছি সবই ভগবানের জন্য, সব কর্মগুলি ভগবানেরই—এরকম একটা বিশ্বাস মনের ভিতর আগে জাগিয়ে নিয়ে তারপরে সংসারে প্রবেশ করে সংসারের কাজ করতে হয়। এটা ঠাকুর বললেন মাস্টার মশাইকে উপদেশচ্ছলে। আর কি বললেন—দৃষ্টান্ত দিলেন—ধর বড় লোকের বাড়ির ঝি। সে তার মনিবের বাড়িতে সবরকম কাজই করছে। আর বলছে—আমার হরি, আমার রাম। এটা খেতে ভালবাসে, ওটা খেতে ভালবাসে না, ও বড় দুষ্টু। মনিবের ছেলেমেয়ে যেন নিজের ছেলে বা নিজের মেয়ে। কিন্তু সে মনে মনে জানে যে, এরা আমার কেউ নয়। আমার সত্যিকারের ছেলেমেয়েরা আমার বাড়িতে আছে। তেমনিভাবে মনটা ভগবানের পাদপদ্মে রেখে সংসারের কাজকর্ম করতে হয়। আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঠাকুর,—কচ্ছপ জলে ভাসছে। কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়াতে, যেখানে তার ডিমগুলো রয়েছে। তেমনিভাবে ভগবানে মন রেখে সংসারের সব কাজকর্ম করতে হয়। যতই কাজকর্ম আমরা করি না কেন সঙ্গে সঙ্গে একটা 'আমিত্ব বুদ্ধি' আমাদের এসেই যায়। আমরা চাই বা না চাই—এটা আমি করছি—আমি ফল পাব ইত্যাদি চিন্তা মনে এসেই যায়। শংকরাচার্য কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, কর্ম বলতে আমি তাকে বুঝি যেখানে 'আমিত্ব বুদ্ধি' আছে। আমি কাজ করছি, আমার কাজ —এই অভিমান রয়েছে। ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে—আমি এই কাজ করে এই ফল পাব। এইরকম দুটো জিনিস যেখানে উপস্থিত, সেখানেই কর্ম আছে। যেখানে অহংকার আছে আর যেখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাকেই বলব কর্ম। যদি এ দুটো না থাকে তাহলে যে-কর্ম দাঁড়াবে, সে-কর্মকে জ্ঞানেরই সমান বলা চলে,—সেটা যেন বিদ্যারই সমতুল্য। সেখানে কিন্তু শংকরাচার্য বলেছেন যে, তাহলে যে-অবস্থাটা দাঁড়াল—তা বিদ্যারই সমতুল্য কর্ম, সেটা দ্বারা লোকের বন্ধন হবে না। সে বন্ধনমুক্ত থাকবে। ঠাকুরও সেইভাবে বললেন যে, 'আমি' যখন কিছুতেই যায় না, তখন থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।

ঠাকুর অন্য জায়গায় বলেছেন—কলিযুগে হচ্ছে ভক্তির পথ। ভক্তি হল—ভগবানের প্রতি ভালবাসা—প্রীতি, প্রেম। এইগুলি যাতে জাগে সেইজন্য চেষ্টা করা, সারাজীবন ধরে সাধনা করা। জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান্‌লাভ। ঠাকুর পরিষ্কার করে বলেছেন—মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান্‌লাভ। এই ভগবান্‌লাভের জন্যই আমরা কর্ম করছি। কর্ম আমাদের করতেই হবে—আগেই বলা হল। কিন্তু সে-কর্মের ভিতরের ভাবটাকে আমরা বদলে দিতে পারি। এটা আমার কর্ম না ভেবে, আমি ভাবতে পারি যে, এ সংসার হচ্ছে ভগবানের সংসার। তিনি আমাকে যেন 'ট্রাস্টি' হিসাবে রেখেছেন—অছি হিসাবে রেখেছেন। যেমন নাবালকের অছি থাকে তেমনিভাবে আমাকে এই সংসার দিয়েছেন। এর পরিচালনার ভার তিনিই আমার উপর দিয়েছেন। তাঁরই হয়ে আমি তাঁর কাজ করছি। এ-পরিবার, এ-সংসার, এ-জাতি,

এ-দেশ যাকে আমার আমার করছি—সবই হচ্ছে ভগবানের, তাঁরই জন্য এ-সমস্ত করা সেবা-বুদ্ধি নিয়ে।

সংসারে কেন হবে না? ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন জনক ঋষির, রাজর্ষি জনক—তিনি রাজাও ছিলেন আবার ঋষিও ছিলেন—তিনি রাজর্ষি। তাঁর সম্বন্ধে একটা গল্প আছে—শুকদেব ব্যাসের পুত্র। তিনি ব্যাসকে বলেছিলেন—'আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিন।' বাবা তখন বললেন,—'আমি গৃহস্থ এবং তোমার বাবা। আমি যদি তোমাকে উপদেশ দিই হয়তো তুমি সেটা মানবে না। তুমি বরং রাজর্ষি জনকের কাছে যাও।' তিনি রাজর্ষি জনকের কাছে গেলেন। গিয়ে তিনদিন বসেই আছেন, রাজা কোন খোঁজ-খবরও নেন না। রাজা পরীক্ষা করে দেখছেন যে, শুকদেবের জ্ঞানলাভের মতো উপযুক্ত মন তৈরি হয়েছে কিনা। সেরকমভাবে তিনি তিনদিন বসেই আছেন, তারপর ডাক পড়ল। রাজার সভাতে তখন নাচ-গান নানারকম চলেছে। রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। শুকদেবকে দেখে জনক বললেন—'আমি জানি তুমি কেন এসেছ। তা এক কাজ কর।' একটা বাটীতে খানিকটা দুধ একেবারে পুরোপুরি ভর্তি করে—কানায় কানায় ভর্তি করে বললেন—'এটা নিয়ে তুমি একবার আমার এই সভাগৃহটা ঘুরে এসো। কিন্তু দেখো এক ফোঁটাও যেন না পড়ে।' শুকদেব সেটিকে হাতে নিয়ে গোটা সভা ঘুরে এলেন। তখন জনক জিজ্ঞাসা করলেন—'দুধ পড়েছে কি?' 'না'। 'কি করে হল?' 'না—আমি তো নাচ-গানের দিকে মন দিইনি। আমার মন সবসময় এ-দুধের উপরেই ছিল যাতে এক ফোঁটাও না পড়ে যায়।' রাজা বললেন—'তাহলে দেখ, আমারও এই অবস্থা। আমি যদিও রাজ-সিংহাসনে বসে আছি আমি কিন্তু কিছুর সঙ্গে লিপ্ত নই। আমার সর্বত্র সব আছে বটে, কিন্তু আবার আমার বলতে আমার কিছুই নেই। "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন"—গোটা মিথিলা যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।' তাই ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন যে, 'জনকরাজা মহাতেজা তাঁর কিসে ছিল ত্রুটি। / সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি॥' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন—এখন ইচ্ছা করলে সকলেই জনক ঋষি হতে পারে না। জনক ঋষিকে অনেক বছর হেঁটমুণ্ড হয়ে তপস্যা করতে হয়েছিল—তবে তিনি রাজর্ষি হতে পেরেছিলেন।

আবার আর একটা গল্প আছে এরকম—পতিব্রতার গল্প। তিনি পতিসেবাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ওদিকে একজন সাধুও অনেকদিন ধরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধাই হয়েছিল। এক বক একটা গাছে বসে তাঁর উপরে মলত্যাগ করেছিল। তিনি ক্রোধে আরক্তনয়ন হয়ে তার দিকে তাকালেন, অমনি বকটি ভস্ম হয়ে গেল। তাতে তিনি জানলেন—আমার বেশ সিদ্ধিলাভ হয়েছে। আমি বকটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু যাই করুন না কেন, তাঁরও তো পেটের খিদে ছিল। তিনি ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন। ঐ পতিব্রতার বাড়িতে উপস্থিত। দ্বারে এসে ডাক দিলেন—'মা, আমায় ভিক্ষা দাও।' ভিতর থেকে উত্তর এল—'বাবা, একটু অপেক্ষা কর। আমি পতির সেবা করছি, সেবা শেষ হয়ে গেলে তারপরে যাব।' সেই সাধু মনে মনে ভাবছেন যে আমি সিদ্ধিলাভ করেছি! আর ঐ মেয়েটি কিনা আমাকে এরকম করে বসিয়ে রাখছে অতক্ষণ ধরে। অমনি ভিতর থেকে জবাব এল—'বাবা, এ কাক বক ভস্ম করা নয়। একটু দাঁড়াও।

অপেক্ষা কর। আমি ঠিক সময়ে যাব এবং তোমায় ভিক্ষা দেব।' অবাক হয়ে গেলেন সাধু—এ কি করে জানল আমার এ সমস্ত ঘটনা। তা-হলে তো ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হয়। তাই যখন মেয়েটি ভিক্ষা দিতে এলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, তুমি এসব জানলে কি করে?' পতিব্রতা উত্তর দিলেন—'আমি একান্ত-মনে পতিসেবাই করেছি এবং তারই ফলে এরূপ জ্ঞানলাভ হয়েছে। তুমি যদি সব বুঝতে চাও তাহলে তুমি অমুক নগরে একজন ব্যাধের কাছে যাও।' ব্যাধ মানে মাংস বিক্রেতা কসাই—যে জন্তু-জানোয়ার জঙ্গল থেকে মেরে, বাজারে এনে বিক্রি করে।' সাধু আর কি করেন—তখন ভাবলেন, যখন এ-সব নানারকম অবাক ব্যাপার এখানে,তখন সেখানেও হয়তো আবার কিছু জানা যেতে পারে। ব্যাধের কাছে এসে দেখলেন—দরদস্তুর করা হচ্ছে, মাংস বিক্রি হচ্ছে। ভাবলেন, ওরে বাবা, এ আবার কোথায় এলাম! ব্যাধ তাঁর সমস্ত কাজ সেরে, কড়ি গণ্ডা সমস্ত হিসাব চুকিয়ে নিয়ে সাধুকে সঙ্গে করে বাড়ির ভিতরে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি জানতে চাও বল।' 'আমি জ্ঞানলাভের জন্য এসেছি'—সাধু বললেন। তারপর ব্যাধ যে-সব জ্ঞানের কথা বললেন তাই দিয়ে বই রচনা হয়ে গেছে। তাকে বলে 'ব্যাধ গীতা'। দেখা যাচ্ছে এখানে যে, কর্ম করেও যদি ঠিক নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারা যায়, গোটা মনটা যদি ভগবানে দিতে পারা যায় তাহলে তার দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে, ভগবান্‌লাভ হয়ে থাকে। এটা নানারকম গল্পের ভিতর দিয়ে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মনকে ফাঁকি দিলে চলবে না। আমি সবই করছি, অথচ বলছি আমি করছি না—এটা যেন না হয়। তারও সম্বন্ধে ঠাকুর একটা গল্প বলেছেন।

একজন ব্রাহ্মণ সুন্দর একটি বাগান তৈরি করেছিল। ফলফুলে সুন্দর সাজানো রয়েছে। সেখানে একদিন একটি গরু ঢুকে একটা গাছ খেয়ে ফেলেছে। তখন বাগানের মালিক সেই ব্রাহ্মণ, দারুণ চটে গিয়ে গরুটাকে এমন মেরেছেন যে, সে মরেই গেল। গরুটি মরে পড়ে আছে সেখানে। এখন গো-হত্যার পাপ এসে ব্রাহ্মণের শরীরে ঢুকতে চায়। ব্রাহ্মণ বললেন—'না, না, আমি ও গরুকে মারিনি। বলের দেবতা ইন্দ্র। তিনি মেরেছেন। তাঁর ভিতরে গিয়ে তুমি প্রবেশ কর।' তখন পাপপুরুষ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত। 'তোমাতে প্রবেশ করব'—বললেন পাপপুরুষ। 'সে কি ব্যাপার, কি হয়েছে'—জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্র। পাপপুরুষ বললেন—এই সব হয়েছে। ইন্দ্র তখন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেজে সেই ব্রাহ্মণের বাগানে এসে উপস্থিত হলেন। এসে বললেন—'বাঃ! ভারী সুন্দর বাগান তো! এটা কি আপনার বাগান?' 'হ্যাঁ, আমারই বাগান। আরো দেখবেন, চলুন। আরো আছে।' 'আচ্ছা, এ-সব গাছ, এ-সব কি আপনি লাগিয়েছেন?' 'হ্যাঁ, এ-সব আমি লাগিয়েছি।' 'এ-সব দেখাশুনা কে করে?' 'আমিই করি।' দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত গরুর কাছে। 'আরে এ গরুকে মারলে কে?'—ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ব্রাহ্মণ বললেন—'না, না, আমি মারিনি, এ ইন্দ্র মেরেছে।' 'বটে, সব জায়গাতে আমি আমি, আর গরুর মারার বেলাতে ইন্দ্র'—ইন্দ্র উত্তর দিলেন। আর পাপপুরুষকে তখন বললেন—'তা-হলে বুঝে নাও কাজটা কার।' সুতরাং মনকে ফাঁকি দিয়ে নয়। সত্যি সত্যি ভগবান্‌কে ভাল-বেসে আর আমিত্বটাকে ছেড়ে সংসারে থাকতে পারা যায়। যেমন জনক ঋষির কথা বলা হল, পতিব্রতার কথা বলা হল ও ব্যাধের কথা বলা হল। এমনকি বর্তমান যুগেও হয়তো এমন অনেকে

আছেন, আমরা যাঁদের পরিচয় জানি না। কিন্তু এরকম সৎ ব্যক্তি, সাধু ব্যক্তি সব যুগেই আছেন।

তবে সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর এ-কথাও বলে গিয়েছেন যে, সংসারে থাকবে নির্লিপ্ত হয়ে। কিন্তু সাধু-সঙ্গ দরকার। মাঝে মাঝে নির্জন বাস দরকার। ধ্যান করবে মনে বনে কোণে। আবার সঙ্গে সদসদ্ বিচার রাখবে। ঠাকুর জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, কর্ম—সব যোগের কথাই বলেছেন। ভক্তির কথা বললেন—আমি ভগবানের দাস, আমি তাঁর কাজ করছি। কাজের কথাও বললেন—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, 'আমি' বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে কাজ করা—তারও কথা বললেন। আবার বললেন বিচার রাখতে হবে—জ্ঞানেরও কথা বললেন। আবার নির্জনে ধ্যানের কথাও বললেন। তাহলে আমরা যে-কটা যোগের সঙ্গে পরিচিত আছি, ঠাকুর তার সব কটা যোগ এক-সঙ্গে মিশিয়ে করতে বলেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এইটা হচ্ছে সহজ ও স্বাভাবিক পথ। তারই কথা ঠাকুর বলে গেছেন।

আবার আর একটা ভাব আছে—সেখানে আমরা কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের মিল দেখতে পাব। এতক্ষণ যা বলা হল তাতেও সদসদ্ বিচার ইত্যাদির কথা রয়েছে। নিত্যানিত্য, ভালমন্দ—বিচার রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানের ভাব সেখানে অবলম্বন করা হয়নি। একজন ভগবান্ রয়েছেন,—আর আমি ভগবানের দাস বা সন্তান—এইরকম কোন ভাব নিয়ে আমি কাজকর্ম করে যাচ্ছি। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজকর্ম করা। সেটা কি রকম? অদ্বৈতজ্ঞান সাধারণতঃ আমরা দুরকমভাবে দেখে থাকি। একটা হচ্ছে—নেতি নেতি, এটা নয় ওটা নয়, সব ছেড়ে ছুঁড়ে এগিয়ে চললাম। সব চলে গিয়ে যা দাঁড়াল—শেষে যা রইল তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। সাধক অবস্থায় তাঁকেই আমি চিন্তা, ধ্যান, উপাসনাদি করছি। অবশেষে তাঁরই জ্ঞান লাভ করলুম। এও অদ্বৈত-জ্ঞান। আবার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা কিছু আমরা দেখছি, সবই হচ্ছেন ব্রহ্ম। এই ইতি ইতির পথও অদ্বৈতের আর একটি পথ। এটি অদ্বৈত ভিন্ন অন্য পথ নয়। অদ্বৈত বলতে যে শুধু 'নেতি'ই হবে—'জগৎ তিনকাল মে হ্যায় নেহি' এমন কোন কথা নয়। 'ইতি ইতি'র ভিতর দিয়েও পরব্রহ্মের ধ্যান করা চলে। যেমন গীতাতে (১২।৩-৪) রয়েছে—

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

—যাঁরা এরকম অব্যক্তের চিন্তা করেন তাঁরাও সর্বভূতহিতে যদি রত থাকেন তাহলে তাঁরা আমাকেই পেয়ে থাকেন। এখানে সর্বভূত রয়েছে, সর্বপ্রাণী রয়েছে, তার হিতে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা আমাকে পান। এই যে বললেন 'আমাকে',—'আমাকে' মানে কে?—যিনি অব্যক্ত, যিনি অমর, যাঁর কোনরূপ ক্ষয় হয় না, যিনি অচল, অটল, যিনি কূটস্থ—তাঁকে পাওয়া যায়। তবে কিভাবে?—'সর্বদ্বারাণি সংযম্য' আর 'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'—সর্ব ইন্দ্রিয়কে সংযম করতে হবে এবং সর্বত্র সমান বুদ্ধি রাখতে হবে। এইরকম করে যদি কেউ অদ্বৈতসাধনা করেন তাহলে তাঁর দ্বারা 'মাম্ এব আপ্নুবন্তি'—তাঁরা আমাকেই পেয়ে থাকেন।

ঐ দিকটাও ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন। কোথায়? ঠাকুর বলে গেলেন—জ্ঞানের পরও বিজ্ঞান আছে, যখন সবই ব্রহ্ম বলে বোধ হয়। আর যেমন স্বামীজী—তখনকার নরেন্দ্রনাথ,—তাঁকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কি চাস্? তিনি উত্তর

দিলেন—আমি শুকদেবের মতো হয়ে থাকতে চাই। সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে থাকব, তবে শরীর রক্ষার জন্য কখন কখন হয়তো সমাধি থেকে উত্থিত হব এবং শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু দরকার, খাব। ঠাকুর কিন্তু তাঁকে প্রশংসা না করে বললেন—তুই তো বড় হীন বুদ্ধি। আমি ভেবেছিলাম তুই একটা মস্ত বড় বটগাছের মতো হবি, যার ছায়ায় হাজার হাজার লোক এসে আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে। আর তুই কিনা এত স্বার্থপর যে নিজের মুক্তির জন্য লালায়িত! স্বামীজী অবশ্য পরে নির্বিকল্প সমাধির আস্বাদ পেয়েছিলেন এবং ঠাকুর তখন তাঁকে বলেছিলেন—যা, তুই যা চেয়েছিলি তা তো পেলি। এখন চাবিকাঠি আমার হাতে রইল। আমার কাজ যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ দরজা আর খোলা হবে না। স্বামীজীকে ঠাকুরেরই নির্দেশে কাজ করতে হয়েছিল। তার ফল কি? ইতি মার্গে সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন।

নেতি বলে জগৎকে উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। নেই বললেই জগৎ নেই হয়ে যায় না। ঐ যে একবার বললেন—'আমি' যখন কিছুতেই যাবার নয়, তখন থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। আর বললেন—যতক্ষণ 'আমি' বোধ আছে ততক্ষণ জীব, জগৎ, ঈশ্বর সবই আছে—দেখছি সবই তিনি হয়ে আছেন। ঠাকুরের জীবনে আমরা দৃষ্টান্ত পাই। একজন সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর নামে একটু কুৎসা রটেছিল। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীজী, তোমার নামে যে-সমস্ত কথা শুনছি ঐগুলি কি ব্যাপার? সাধু তাঁকে উত্তর দিলেন—আরে জগৎ তো তিনকাল মে হ্যায় নেহি। আর ঐগুলিই সত্য হয়ে যাবে! জগৎই নেই আর আমার সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি সত্য হবে। ঠাকুর তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—তোমার অমন বেদান্তে ধিক! মুখে শুধু বেদান্ত আওড়াব আর কাজে কিছু হবে না, তা ঠিক নয়।

ঠাকুর-স্বামীজী আমাদের পথ দেখালেন 'সেবা'র। ঠাকুরের নিজের কথাতেই তা আমরা পাই—লীলাপ্রসঙ্গে আছে। ঠাকুর একদিন বৈষ্ণবধর্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন—এই তিনটি হচ্ছে বৈষ্ণবধর্মের সার কথা। ভগবানের নামে রুচি থাকা আবশ্যক। তাঁর নাম কীর্তনাদি করবেন। বৈষ্ণব সাধু ভক্তের সেবা করবেন, আর জীবে দয়া। জীবে দয়া বলতে গিয়ে, বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন—জীবে দয়া! তুই দয়া করার কে? দয়া করতে পারেন একমাত্র ভগবান্। দয়া বলতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝে থাকি?—আমি বড়, আর ও লোকটি ছোট। আমার কিছু দেবার মতো আছে। আর ওর কিছু নেবার আছে। সে আমার কাছ থেকে এটা পাবে এবং সে চিরকালের মতো আমার কাছে কৃতজ্ঞ রইবে। এই যে আমি আশা করে থাকি—এইটি হচ্ছে দয়ার প্রকৃত রূপ। কিন্তু ঠাকুর বললেন—না, না, দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। শিবজ্ঞান করে জীবের সেবা করতে হবে, সেখানে সেবার কথা বললেন। তারপর বলেছেন—তাতে উপকার হবে,—যে সেবা করছে তারই। যার করছে সে তো ভগবান্। ভগবান্‌বুদ্ধিতে সেবা করছে। ভগবানের আবার কি তুমি উপকার করবে? তুমি মনে করছ কোন লোকের অভাব ঘটেছে, তার কোন জায়গাতে একটা প্রয়োজন কিছু আছে সে প্রয়োজনটা মিটিয়ে দিলে, অভাবটা দূর করে দিলে, তার দুঃখ-দারিদ্র্য যা কিছু আছে সেগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করলে—এই যে চেষ্টা করলে—এর দ্বারা উপকার হল তোমার নিজেরই। ঠাকুর কৃষ্ণদাস পাল মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখনকার দিনে বড় কংগ্রেসসেবী ছিলেন—কৃষ্ণদাস পাল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কি করতে চাও?

'আমি জগতের উপকার করব।' ঠাকুর তাতে বলেছিলেন—জগতের উপকার করবে? জগৎ কত বড় হে! আর তুমি কতটুকু মানুষ। পিঁপড়ের মতো ক্ষুদ্র প্রাণী তুমি, আর জগৎ প্রকাণ্ড বড়—তার উপকার তুমি করবে? না, না, উপকার নয়, তুমি তার সেবা করতে পার, যতটুকু তোমার ক্ষমতায় কুলোয় তুমি তার জন্য সেইটুকু মাত্র করতে পারো। তার দ্বারা উপকৃত তুমি নিজেই হবে। এই যে একটা দার্শনিক দৃষ্টি—দার্শনিক দৃষ্টি এইজন্য বলছি যে, এটা আমরা বুদ্ধিতে বুঝতে চেষ্টা করছি। কিন্তু এটা জীবন দিয়ে গ্রহণের যোগ্য বস্তু। সেইটা জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য আমার চেষ্টা করতেই হবে। এই যে দৃষ্টিটা তিনি দিয়ে গেলেন সেটা 'সর্বভূতহিতে রতাঃ' এর চেয়েও মনে হয় একটুখানি এগিয়ে গেল। সর্বভূতহিত করা নয়, আমি নিজের বুদ্ধি মতো অপরের সেবা করছি। কেন সেবা করছি—আমার নিজেরই মঙ্গলের জন্য। অপরের কি হবে না হবে—সেটা তো আমার হাতে নেই, সেটা ভগবানের হাতে। আর তফাতটা কি হচ্ছে কর্মযোগের সঙ্গে? কর্মযোগ—যা গোড়াতেই বলা হল—কর্ম বলতে বোঝায় কতকগুলি শাস্ত্রীয় কর্ম, যা শাস্ত্রকাররা সাধারণতঃ বুঝে থাকেন, ভাষ্যকাররা যেরকম ব্যাখ্যা করে থাকেন। কর্মযোগে বোঝা যায় কতকগুলি শাস্ত্রীয় কর্ম আমি করছি। আমি করার পর ফলটা নিজে না নিয়ে সেটা ভগবান্‌কে অর্পণ করছি। তাহলে কর্ম করার সময়ে ভগবানের চিন্তা আমার ভিতরে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

স্বামীজী তাঁর কর্মযোগে বুদ্ধদেবকে বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। কিন্তু বুদ্ধদেব ভগবান্ সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলেননি বরং একেবারেই বলেননি বললেও চলে। বুদ্ধ দেখেছিলেন মানুষ দুঃখে জর্জরিত। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তার দুঃখ কি করে দূর হয় সেই পথটা দেখিয়ে দেওয়া। দুঃখ দূর করার যে সমস্ত নৈতিক উপায় বা সাধন দরকার সেগুলিই তিনি শিখিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের কথা তিনি পরিষ্কার করে কাউকে বলেননি। তাহলে কর্মযোগে এটা সম্ভবপর যে ভগবান্‌কে বাদ দিয়েও কেউ কর্মযোগী হতে পারে। এবং স্বামীজী সেই হিসাবে বুদ্ধদেবকে নিষ্কাম কর্মযোগী বলেছেন। কিন্তু শংকরাচার্য প্রভৃতি কর্মযোগ বলতে বুঝেছেন—দাস বুদ্ধিতে শাস্ত্রসম্মত কর্ম করে তার ফল ভগবান্‌কে অর্পণ করা। সুতরাং এইদিক থেকে স্বামীজীর উল্লিখিত বুদ্ধদেবের কর্মযোগকে কর্মযোগ না বলে কর্মযোগের অর্থবাদ বা প্রশংসাবাক্য মাত্র বলা চলে। আবার আগেই বলে এসেছি শংকরের মতে যদি সম্পূর্ণরূপে অহংকারকে বাদ দিই এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হই তবে সেই কর্ম জ্ঞানেরই সমান। তাকে আর কর্মযোগ বলা চলে না। আমরা ঠাকুর-স্বামীজীর কাছ থেকে যে সেবাধর্মের কথা শিখেছি সে সেবাধর্ম ঠিক কর্মযোগ নয়। কারণ এখানে আমরা যার সেবা করছি তাকে সামনে ভগবান্‌রূপে দেখছি বা দেখতে চেষ্টা করছি। কেননা এটা একটা সাধনা। আমরা সিদ্ধিলাভ এখনও করিনি। কিন্তু আমাদের পথটা হচ্ছে কি? আমরা ভাবতে চেষ্টা করছি যে, ইনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্ আমার সামনে। তাঁর সেবা করে আমি নিজেই কৃতার্থ হচ্ছি। আবার আমি সেবা করছি—এটাও নয়। এটা আমাকে দিয়ে ভগবান্ করিয়ে নিচ্ছেন। অহংকার বুদ্ধি আমাকে ছাড়তে হচ্ছে। আর ফলের আকাঙ্ক্ষা তো কিছুই নেই। আমি তাঁর জন্য করছি, আমার নিজের জন্য তো কিছু নয়। আমি তাঁর কাজ করছি, তিনি করাচ্ছেন আমাকে দিয়ে—এরকম যদি করা হয়, অহংকার

বুদ্ধি ছেড়ে, ফলাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে—তাহলে সেটা জ্ঞানেরই সমতুল্য হল। তাহলে পারিভাষিক অর্থে এটাকে আর কর্মযোগ বলা চলে না। কর্মের অর্থ গীতাতে অবশ্য আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। শুধু শাস্ত্রীয় কর্মকে ধরেননি। যেমন কিনা শ্লোকে (গীতা ৯।২৭) আছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

—যা কিছু করবে, যা কিছু খাবে, যা কিছু আহুতি দেবে, যা কিছু দান করবে সমস্ত তুমি আমাকেই অর্পণ কর। ঠাকুরও কর্ম বলতে সব কাজই বুঝেছেন। আর তিনি বলেছেন যে, কর্ম ছাড়া তো কেউ থাকতে পারে না। গীতাতেও বলেছেন—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। (৩।৫)—এমন লোক নেই যে একক্ষণও কাজ না করে থাকতে পারে। ঠাকুর বলেছেন—এই যে চিন্তা করছি, আমি কাজ করছি, আমি জপ করছি—এও কাজ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—'আমিই ব্রহ্ম'—এই যে চিন্তা করছি—এও কাজ। মানুষ কাজ ছাড়া কখনও থাকতে পারে না। কাজ যখন আমাদের করতেই হচ্ছে এবং দেহমন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কাজ তো সকলকেই করতে হবে। তবে সে কাজটাকে আমরা অকাজে পরিবর্তন করতে পারি যদি তাকে সেবারূপে পরিবর্তিত করা যায়। তাহলে সেটা আমাকে অন্যরূপ ফল দেবে। একই জিনিস—মন্ত্র পড়ে যদি আমি ব্যবহার করি তাহলে একরকম ফল হবে, মন্ত্রছাড়া যদি করি তার ফল আর একরকম হবে। বিষে বিষক্ষয় হয়। রোগ হয়েছে—তাতে হয়তো বিষাক্ত ওষুধ দিল। তার দ্বারা আমার জীবন লাভ হয়ে গেল। এরকম হয়ে থাকে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বলেছেন ঠাকুর। পায়ে কাঁটা ঢুকেছে। তাকে তোলবার জন্য আর একটা কাঁটা নিলুম। তারপর দুটো কাঁটাই ফেলে দিলুম। এভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য—ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য আমরা সেবাব্রতরূপ কাজ গ্রহণ করেছি।

যেমন দেখা গেল—ভক্তির সঙ্গে, ভক্তিকে মূল হিসাবে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য ঠাকুর করলেন জগতের জন্য, তেমনি আবার কোন কোন বিশেষ অধিকারীর জন্য তিনি জ্ঞানের সঙ্গেও কর্মের সংযোগ করে দিলেন। কিন্তু মূলতঃ সকলেরই জন্য তিনি চারটি যোগেরই একসঙ্গে সাধনার উপদেশ দিয়েছেন। যেমন গোড়াতে বলে এসেছি—তিনি জ্ঞানের কথাও বলেছেন—বিচার করতে বলেছেন এটা নিত্য, এটা অনিত্য, এটা সত্য, এটা মিথ্যা, এটা ভাল, এটা মন্দ—এ বিচার রাখতে হবে। তাছাড়া তিনি অদ্বৈতজ্ঞানকে সেবার ভিত্তি করেছেন, দ্বৈতজ্ঞানকে নয়। তিনি বলেছেন অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর। এখানে সেব্য, সেবক ও সেবা—সকলেই ব্রহ্ম। যেমন গীতাতে (৪।২৪) আছে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

—যে পাত্র দিয়ে আহুতি দেওয়া হয় সেটা ব্রহ্ম, যে হবি আহুতি হয় তাও ব্রহ্ম। যজ্ঞের আগুন ব্রহ্ম, যে আহুতি দেয় সেও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মরূপ কর্ম সমাপনান্তে যে ফল পাওয়া যায় তাও ব্রহ্ম।

ঠাকুর বলেছেন—ধ্যান করবে মনে, বনে ও কোণে। ধ্যান করতে হবে, ধ্যানটা হল রাজযোগের ব্যাপার। ধ্যান করতে হবে—কোথায় করবে? মনে মনে করতে পারি বা ভোরে কোন নিভৃত জায়গায়, নিরিবিলি জায়গায় করতে পারি অথবা বনে গিয়ে। ঠাকুর বলেছেন যে, মাঝে মাঝে নির্জন বাস প্রয়োজন। আর সাধুসঙ্গ দরকার। সাধুসঙ্গ মানে কি? শুধু সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়াই নয়। সাধু ব্যক্তি গৃহস্থও থাকতে পারেন। তারপরে সৎকথা শোনা, সৎকথা আলোচনা, সৎ-গ্রন্থ পাঠ—এও একরকম সাধুসঙ্গ। এইগুলি

সমস্তই করতে হবে। তারপর কর্মের কথা তো বলেছেনই।

সুতরাং আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সাধনা চারটি যোগকে মিশিয়েই চলেছে। তবে কেউ ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেউ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেউ হয়তো প্রাধান্য কর্মকে দিচ্ছেন। কেউ ধ্যানকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। সেটা নিজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী। কিন্তু সকলেরই ভিতরে এই চারটি যোগ একসঙ্গে চলেছে। স্বামীজী তাঁর রাজযোগের গোড়াতে বলেছেন যে, ভগবান্‌লাভ সব পথেই হতে পারে। চার যোগের যে কোন-টাকে অবলম্বন করে হতে পারে। তবে আসল কথা হচ্ছে মুক্তিলাভ করা। সেই মুক্তিলাভের জন্য দুটো যোগকে একসঙ্গে কর বা তিনটিকে কর বা চারটিকে একসঙ্গে কর। আবার স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন—যে কোন যোগ অবলম্বন কর, জ্ঞানলাভ হয় বটে, মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু যে এ চারটিকে একসঙ্গে সমন্বয় করতে পারেনি তার চরিত্রটা ঠিক রামকৃষ্ণরূপ মুষায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয়নি। ভাষাটা একটু কঠিন। অর্থাৎ রামকৃষ্ণরূপ যে ছাঁচ সেই ছাঁচে ঢেলে তার চরিত্রটি গঠন করা হয়নি, যদি চার যোগকে আমরা সমন্বয় করতে না পেরে থাকি। সেই চার যোগের সমন্বয়ের কথা ঠাকুর বলে গেছেন। স্বামীজীও আমাদের বলে গেছেন। আবার তাঁরা সেবাব্রতের কথাও শুনিয়ে গেলেন এবং স্বামীজী এই সেবাকেই প্রাধান্য দিলেন। বস্তুতঃ এই সেবার মধ্যেও যোগসমুদয়ের সমন্বয় ঘটেছে। এই কথা লীলা-প্রসঙ্গে আছে।

আমি বলেছিলাম যে, কর্ম ও সেবা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা গেল। যা কিছু বলেছি ভগবানেই অর্পিত হোক তার ফল।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বাংলাসাহিত্য

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাসাহিত্যের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় অধ্যক্ষ। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির রত্ন-সদস্য। বিগত ১ এপ্রিল ১৯৮০, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আলোকে বাংলা-সাহিত্য বুঝতে হলে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, তাঁদের সাধন-ভজনের আলোকে বাংলা-সাহিত্য বুঝতে হবে। এখানে প্রথমেই একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাধন-ভজনের সঙ্গে সাহিত্যের কি সম্পর্ক। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, আধ্যাত্মিক সাধন-ভজন অলৌকিকতায় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাহিত্য প্রত্যক্ষ জীবনের বিচিত্র রূপে-রসে পরিপূর্ণ; লেখকের অনুভূতিতে তার সরস প্রকাশ হয়ে থাকে। সাহিত্য শুধুমাত্র অলৌকিকতার উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। সহজ কথায় জীবনই সাহিত্য, যে জীবন সহজ, যে জীবন প্রত্যক্ষ, তাতে সৌন্দর্য থাকতে পারে, ক্লেদ থাকতে পারে, তার কোন অংশই পরিত্যাজ্য হতে পারে না। মানুষের দুর্বলতা, মানুষের জীবনের ভুল-ভ্রান্তি অর্থাৎ জীবনব্যাপী নরনারীর যা কৃতি তাও সাহিত্যের সামগ্রী। তবে তা শিল্পরূপ দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব জনপ্রিয় সাহিত্যের বিষয় নয়, তা দর্শনের বিষয়। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সাধন-ভজনের মূল কথাই হচ্ছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভক্তি। এই বিশ্বাস এবং ভক্তির কোন

নৈয়ায়িক যুক্তি নেই। ঈশ্বর সব কিছুরই অতীত, কোন যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার সীমানার মধ্যেই তাঁকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসা যায় না, এক কথায় ঈশ্বরের অনুভূতি অলৌকিক এক অনুভূতি। সুতরাং যে সাহিত্য প্রত্যক্ষ জীবনকে একান্তভাবে আশ্রয় করেই বিকাশলাভ করে, তাতে কেবলমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাসের সম্পর্কই থাকে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসী কোন চরিত্র উপন্যাসে থাকলেও একমাত্র তার এই বিশ্বাস দিয়ে কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় না কিংবা কাহিনীর পরিণতিও নির্দিষ্ট হতে পারে না। কাহিনীর অলঙ্কার রূপে তা বর্তমান থাকতে পারে, —কাহিনীকে প্রভাবিতও করতে পারে। তবে আমাদের দেশে এককালে ভক্তিমূলক নাটক ও যাত্রা রচিত হত, বর্তমানে তার প্রবণতা লুপ্ত হয়েছে। ভক্তিমূলক সাহিত্য অলৌকিকতার উপর বিশ্বাসী, তাতে অলৌকিক সাধন-ভজনের পথে ঈশ্বরপ্রাপ্তিও স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু তাদের সাহিত্যিক মূল্য প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু এখানেও একটি কথা আছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধন-ভজনে একটি বিশেষত্ব ছিল, যার ফলে তাঁদের কিংবা তাঁদের অবলম্বন করে রচিত গ্রন্থাদি সাহিত্যগুণ বর্জিত হতে পারেনি। রামকৃষ্ণ যে বলতেন, 'খালিপেটে ধর্ম হয় না', কিংবা 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা', 'আমাকে শুষ্ক সন্ন্যাসী করিসনে, মা'। এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণার মধ্যে জীবসেবাকেই ঈশ্বরসেবা বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাতেই তাঁর ধর্মচিন্তায় সাহিত্যগুণ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, দরিদ্র-নারায়ণই তাঁদের আকর্ষণ করেছিল। দরিদ্র, মূর্খ বিপন্ন মানুষই তাঁদের সাধন-ভজনের লক্ষ্য ছিল।

রামকৃষ্ণদেব যখন দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বাংলাসাহিত্যের অবস্থা কি ছিল, তা প্রথমেই আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। এক কথায় বলতে পারা যায় যে, তখন বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমযুগ। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মাত্র দু বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তাঁর তিরোধানের পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হওয়ার সময় অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের বয়স ২৯ বছর। সুতরাং তার পূর্বেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারামে'র পূর্ববর্তী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী' শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজনীয় মাস্টার মশায় পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন, সে সম্পর্কে ঠাকুর কিছু কিছু মূল্যবান মন্তব্যও করে-ছিলেন। এই উপন্যাসখানি তাঁকে পড়ে শোনানোর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাতে শ্রীশ্রীগীতার অনুশীলন-তত্ত্বের কথা, নিষ্কাম কর্মের কথা ছিল, ঠাকুরের তা মনঃপূত হতে পারে বিবেচনায় তা তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোন উপন্যাস শ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনানো হয়েছিল কিনা জানা যায়নি, কারণ, সে সব সম্পর্কে ঠাকুরের কোন মন্তব্যও শুনতে পাওয়া যায় না।

'দেবী চৌধুরানী' বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ নয়, তা উপন্যাস; তাতে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের কথা নেই, সাংসারিক জীবনে পতিসেবায় আত্মসমর্পণের কথা আছে। তার কথা —'প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান।' তাতে পতিসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসেবা, অর্থাৎ পতিসেবাকে মুখ্য করা হয়েছে।

বঙ্কিমযুগে বাংলাসাহিত্যের ভাষা তিনভাগে বিভক্ত ছিল—প্রথমতঃ পণ্ডিতী বাংলা, দ্বিতীয়তঃ আলালী বাংলা এবং তৃতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী যে ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, যাকে এই দুয়ের মধ্যগা ভাষা বলা হয়েছে, সেই ভাষা, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁর 'কথামৃত' একটি চতুর্থ বিভাগ রচনা করলেন, তা এই তিনেরই ব্যতিক্রম।

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য বাংলা ঔপন্যাসিক সাধারণতঃ বঙ্কিমচন্দ্রেরই অক্ষম অনুকরণকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক রোমান্সগুলো বঙ্কিম আদর্শেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব কিংবা সমাজের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরও কোন কৌতূহল ছিল না।

তখনকার কাব্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন, তাঁর 'পরমেশ্বর বন্দনা' উনবিংশ শতাব্দীর নূতন আধ্যাত্মিক চেতনাতে সঞ্জাত। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব-বশতঃই 'ঈশ্বর' কথাটি সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রথম ব্যবহার করেছেন। তারপর থেকে তাঁর শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র,—এঁদের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাব সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করেছিল। তারপর সব চাইতে যা বড় কথা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর এক সম্পূর্ণ নূতন যুগ সূচনা করলেন। তাঁর কাব্যদেহের গঠন এবং ভাবনায় নূতন সৌষ্ঠব এবং শক্তি দেখা দিল। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন রীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল, ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে প্রাচীন এবং নূতনের মধ্যে তখনও একটি বোঝা-পড়ার ভাব চলছিল, কিন্তু মধুসূদন তার জন্য যে নূতন ধারা সৃষ্টি করলেন, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ধারার কোন সম্পর্ক রইল না, তবে একথা সত্য, ঐতিহ্যের ধারাকে তিনি এই বিষয়ে পরিত্যাগ করলেন না। দেশের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ তাঁর রচনার ভিত্তিরূপে তিনি তখনও রক্ষা করে চললেন। তবে একথাও সত্য, ভারতীয় মহা-কাব্য কিংবা পুরাণের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক পুরাণ কাহিনীরও কোন কোন ক্ষেত্রে সংমিশ্রণ করে তাঁর রচনার প্রাণশক্তি এবং বৈচিত্র্যকে নানাদিক থেকে বাড়িয়ে তুললেন। দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কাব্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে মধুসূদনের একবার সাক্ষাৎও হয়েছিল, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ-কার কোন দিক থেকেই ফলপ্রসূ হতে পারেনি। কারণ, তাঁর 'পেটের দায়ে' ধর্মান্তর গ্রহণের কথা রামকৃষ্ণদেব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। কেউ কেউ একথা মনে করেছেন, মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ বিরহের আর্তি কিংবা দিব্য ভক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে তাঁর বৈষ্ণবপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব মহাজন কবি ব্যতীত শ্রীরাধার দিব্য বিরহের প্রেরণা কেউ অনুভব করতে পারে না, মধুসূদনও পারেননি। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দিব্য ভক্তির ভাব মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে ফিরে আসতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে যে রাধার অন্তর্বেদনা মধুসূদন ব্যক্ত করেছেন, তা বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার পার্থিব বিচ্ছেদ-বেদনার কাতরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মধু-সূদনের কাব্যে কিংবা নাটকে কোনপ্রকার ধর্ম-চেতনা প্রকাশ পেতে পারেনি, তবে একথা সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব বাঙালীত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেই বাঙালীত্বের সঙ্গে কোন আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নেই।

তাই মধুসূদন যুগান্তরকারী প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর রচনায় যুগের আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্চারিত করতে পারেননি, তা যদি পারতেন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রতি বিমুখ হতেন না।

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনে ধর্মবোধ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়নি। তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমি যে পাপের পাহাড় করে তুলেছি। তবু গিরিশের

প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাস ছিল, কারণ, গিরিশ-চন্দ্রের রচিত 'চৈতন্যলীলা' নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের সুগভীর ভক্তির ফল্গুধারার পরিচয় পেয়েছিলেন।

তারপর সমসাময়িক বাংলা নাটকের বিষয় যদি আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, বাংলা নাট্যসাহিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক কাল থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত হতে আরম্ভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শৈশবকাল থেকেই তাঁর নিজ গ্রামে যাত্রা দেখতে ভাল-বাসতেন, পৌরাণিক যাত্রার ভক্তিভাব তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। তিনি নিজেও যাত্রার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলো গ্রাম্য পৌরাণিক আখ্যানমূলক যাত্রার সামান্য উন্নত সংস্করণ মাত্র। বাঙালীর হৃদয় যে ভক্তিরসে প্লাবিত, তা গিরিশচন্দ্র যেমন জানতেন, সে-যুগের যাত্রাওয়ালারাও তেমনই জানতেন, সেজন্য বাঙালীর মনে সেই রসই জাগ্রত করে দিয়ে তাঁরা তাঁদের যাত্রার কাহিনীকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বাঙালী হৃদয়ের সেই অনুভূতির ক্ষেত্রটির সন্ধান করে তাঁর 'চৈতন্যলীলা' নাটক রচনা করলেন। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবেও তখন তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। যাই হোক, শ্রীশ্রীঠাকুর 'চৈতন্য-লীলা'র অভিনয় দেখবার পর থেকেই গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। এই আকর্ষণের শ্রীঠাকুর নিজেই কারণ, তিনি তাঁকে আশ্বাস দিলেন, তাঁর নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে লোকশিক্ষা হচ্ছে, তাই সমাজের কল্যাণকর হচ্ছে। শ্রীঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে তাঁকে সমাজের কল্যাণের জন্যই তাঁর নিজের পথে অগ্রসর হয়ে যেতে বললেন। যে গিরিশচন্দ্র অনাচারের গভীর পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে থেকে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তিনিও নূতন জীবনের আশায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করলেন এবং নূতন উৎসাহে ঠাকুরের চরিত্র সামনে রেখে তাঁর নূতন নূতন নাটক রচনা করে চললেন। কেবলমাত্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে যে ভক্তিভাব সঞ্চারিত করতে লাগলেন তাই নয়, তিনি ঠাকুরের অলোক-সামান্য চরিত্রকেও নাটকের মুখ্য চরিত্ররূপে গ্রহণ করে নূতন নাটক রচনা করতে লাগলেন। তাঁর 'নসীরাম' নাটকের নায়ক চরিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত হল, তাঁর 'জনা' নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্র বিদূষকের মুখেও 'রামকৃষ্ণকথামৃতে'র বাণী আরোপিত হল। ক্রমে চৈতন্য চরিত্র থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁর সকল ভক্তি এবং শ্রদ্ধা স্থানান্তরিত হল।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভ করবার পর গিরিশচন্দ্র তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে নাটকগুলো রচনা করেছিলেন ক্রমে সেগুলোর মধ্য থেকে ভক্তিরস শুষ্ক হয়ে গিয়ে তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে একথাও সত্য যে, গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের নাটকগুলোতে যে তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছিল, তাও মানুষকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

সুতরাং যাঁরা সাধন-ভজনের পথের পথিক, তাঁদের স্বর্গীয় প্রভাব সৃজনশীল সাহিত্যিকের অনেক সময় স্বাধীন সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পার্থিব জীবনের কর্দমাক্ত পথ থেকে তাকে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে গিয়ে যে পথে নিয়ে যায়, সে পথে জীবনের ক্লেদ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। সেখানে তার সাহিত্যের অপূর্ণতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাও হয়নি, কারণ, শ্রীঠাকুরের প্রভাববশতঃ মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেম তাঁর চিরদিনই লক্ষ্য ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'তত্ত্বমূলক' তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ১৮৮২, 'দেবী চৌধুরানী' ১৮৮৪ এবং 'সীতারাম' ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বছর রামকৃষ্ণদেব দেহরক্ষা করেছিলেন, তার পরের বছর প্রকাশিত হয়। তাঁর এই তিনখানির একখানি উপন্যাসও শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাঠ করেননি, তবে তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসখানির কিছু অংশ মাস্টার মশায় শ্রীঠাকুরকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু যতটুকু শুনিয়েছিলেন, তাতে তাঁর মন সায় দিতে পারেনি। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীঠাকুরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ভক্তির কোন স্থান ছিল না, তিনি প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন এবং পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য দর্শনের সংমিশ্রণে তাঁর নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব 'দেবী চৌধুরানী'র যতদূর অংশ শুনেছিলেন, ততটুকুও তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

মাস্টার মশায় যখন রামকৃষ্ণদেবকে বুঝিয়ে বললেন যে, ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে বলেছে, তিনি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও ত রাজার কর্তব্য।' অর্থাৎ ভবানীর পক্ষে তা অনধিকার চর্চা।

কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে ভাবুক ব্যক্তি হলেও তিনি একথা বলবামাত্র ভবানী পাঠকের চরিত্রের ত্রুটি ধরতে পেরেছিলেন, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রাজারই দায়িত্ব, তা না হলে প্রত্যেকেই যদি নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে দুষ্টের দমনে প্রবৃত্ত হয়, তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং তা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ হতে পারে না। যাঁর জীবন কিংবা সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এই উক্তি তিনিই করতে পারেন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবানী পাঠকের এ কাজ সমর্থন করতে পারেননি, বাস্তব সমাজজীবনে কার কি কর্তব্য সে বিষয়ে তাঁর প্রখর জ্ঞান ছিল। ভবানী পাঠক যে এ কার্যে পাপ সঞ্চয় করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছিলেন। আর ভবানী পাঠকই কি তা জানতেন না? সেজন্যই তো ভবানী পাঠকও ইংরেজ-প্রদত্ত দ্বীপান্তরের দণ্ড হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ইংরেজ বিচারক যখন ভবানী পাঠককে দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ দিলেন, তখন ভবানী পাঠক 'প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।' কারণ, তিনি যে অপরাধী তা তিনি নিজে অবশ্যই জানতেন।

তারপর মাস্টার মশায় যখন 'দেবী চৌধুরানী'তে যে গীতার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার প্রশংসা করলেন, তারপর যখন প্রফুল্লকে 'সর্ব কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ' করবার কথা বলা হল, তখনও রামকৃষ্ণদেব তার সমালোচনা করে বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই।'

মাস্টার মশায়ও স্বীকার করলেন, 'এখানে এ-কথাটি বিশেষ করে বলা নাই।' তারপর ভবানী পাঠক যখন প্রফুল্লকে বললেন, কখনও কখনও কিছু দোকানদারী চাই। শ্রীঠাকুর 'দোকানদারী' কথাটাতে বিরক্তি এবং আপত্তি করলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হননি, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাও কোন দিক থেকেই শ্রীঠাকুরকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত সন্ন্যাসিচরিত্র-গুলো আলোচনা করে দেখলেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হবে। রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সম্পর্কে তদানীন্তন বাঙালীর একটা অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল। বঙ্কিম তো

সেই যুগেরই মানুষ,—সেজন্য তাঁর মনেও সেই ভাবের কিছু ব্যতিক্রম ছিল না। সন্ন্যাসিচরিত্রের সেই বিভ্রান্তিকর যুগে রামকৃষ্ণদেব এক স্বার্থত্যাগী চরিত্রবান্ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠন করলেন, ক্রমে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার যুগ শেষ হয়ে যাবার পর দেশের এই নূতন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। তাই তিনি তাঁদের তাঁর উপন্যাসে রূপ দিতে পারেননি।

এ সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, খাঁটি আদর্শবাদী কোন সন্ন্যাসী কি উপন্যাসের নায়ক কিংবা এমন কি আদৌ উপন্যাসের কোন চরিত্রও হতে পারে? যে জীবন অতি বাস্তব, অত্যন্ত লৌকিক, যে জীবন প্রত্যক্ষ, তাই তো উপন্যাসের জীবন হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে উপন্যাসের মধ্যে উচ্চ আদর্শবাদী সন্ন্যাসীর স্থান কি করে হতে পারে? সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো ইচ্ছা করেই কেবলমাত্র গেরুয়াধারী মানুষকেই তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে মানুষের দুর্বলতা, মনুষ্য চরিত্রের সকল দোষ-ত্রুটিই বর্তমান আছে কেবল এমন চরিত্রগুলোকেই সন্ন্যাসীর নামে তাঁর উপন্যাস-গুলোতে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ, তারা সাধারণ মানুষেরই আচরণ করে উপন্যাসের সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে। নয়তো প্রকৃত আদর্শবাদী সন্ন্যাসীতে উপন্যাসের কাজ হয় না।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পর থেকেই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিচরিত্র বাংলাসাহিত্যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে, কারণ, ততদিনে এই সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের আত্মত্যাগ ও আর্তসেবা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরে সমাজের সামনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং তাঁর কবিত্বের মধ্যে কিছুমাত্র ফাঁকি নেই। মনেপ্রাণে চিন্তায় ধ্যানে সর্বভাবেই তিনি কবি, সেজন্য পার্থিব জীবনের ব্যথা-বেদনা আনন্দ-উল্লাসই তাঁর অনুভূতির বিষয় হয়েছে। তিনিও রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের কোন সন্ন্যাসীকেই যে আনুপূর্বিক তাঁর কোন উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রূপায়িত করেছেন তা নয়, তথাপি একথা মনে হবে, তিনি তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে গোরার চরিত্রটির যে পরিকল্পনা করেছেন, তার মধ্যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পেয়েছে। হাবভাবে, চালচলনে, কথা বলবার ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায় গোরা-চরিত্রটি বার বার স্বামী বিবেকানন্দের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গোরা বলে, 'সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করেছে, আমি তাঁরই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই—আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ।' গোরার এই বক্তব্যের মধ্যে যেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই শুনতে পাওয়া যায়। তাঁরই মুখে দরিদ্র ভারতবর্ষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সহানুভূতির বাণী একদিন বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, তাই যেন গোরার মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক, তাই উপন্যাসের পথেই তার জীবনকাহিনী শেষ হয়েছে, তথাপি সমস্ত জীবন-ব্যাপী যে সে দরিদ্র ভারতবর্ষের সেবাব্রত গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে স্বামীজীর প্রভাবই কার্যকর হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে আর একটি কথা এই যে, তার আনন্দময়ীর চরিত্রটি শ্রীশ্রীমার চরিত্রের প্রভাবজাত। শ্রীমার চরিত্র শ্রীঠাকুরের চরিত্রের পরিপূরক বা complement, অর্থাৎ এ দুয়ে মিলে যেন একটি অখণ্ড চরিত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শই সমস্ত জীবনব্যাপী শ্রীমার উপর প্রতিফলিত হয়েছে। 'গোরা আনন্দময়ীর পা দুখানি মাথার উপরে রেখে বললে, মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা।'

রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীমার মধ্যে এই প্রতিমার রূপ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। তাই রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ী নিঃসন্তান হলেও শ্রীমায়েরই আদর্শে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকলকেই নিজের সন্তান রূপে পরিচর্যা করে নিজের মাতৃত্বকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে প্রয়াসী।

রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রও তাঁর সাহিত্যে সন্ন্যাসিচরিত্রের সামান্য একটু হলেও শ্রদ্ধার স্থান দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি চরিত্র রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিচরিত্র দিয়ে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত তা অস্বীকার করতে পারা যায় না। তাঁর নাম বজ্রানন্দ। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। সেবাধর্মে তিনি দীক্ষিত এবং সেই সেবাকর্মে তিনি আনন্দে পরিহাসে এমন একটি পরিমণ্ডল সহজেই সৃষ্টি করে তোলেন, যাতে তাঁর কর্ম সহজ হয়ে ওঠে। তাঁর চরিত্রেও স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্রের সুস্পষ্ট আভাস অনুভব করা যায়।

যে কোন কারণেই হোক ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের যুগে আমাদের দেশ থেকে সন্ন্যাসিচরিত্রের প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাভক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিম সাহিত্যই তার প্রমাণ। রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সেই বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে এনেছে এবং ত্যাগী ও দরিদ্রসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন সন্ন্যাসীদের পূর্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেজন্য বাংলাসাহিত্যে পরবর্তীকালে দু শ্রেণীর সন্ন্যাসীই দেখতে পাওয়া যায়—একশ্রেণী পূর্ববর্তী ধারার সন্ন্যাসী এবং আর এক শ্রেণী পরবর্তী ধারার ত্যাগী সন্ন্যাসী—সেবাধর্মে উৎসর্গীকৃত জীবন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে মধ্যযুগে একদিকে যেমন জীবনীসাহিত্যের প্রথম উদ্ভব এবং বিকাশ হয়েছিল, তেমনই বৈষ্ণব গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তা ছাড়াও সংস্কৃত ও বাংলায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নানা সরস ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়েছিল। তার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নামেও একটি নূতন দর্শন শাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়ে তা নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলায় বহু গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের অবলম্বন করে সেই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয়ে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে কিনা, তাও আমাদের দেখা প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ কর্তৃক রচিত চিরকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রচয়িতা রামকৃষ্ণ স্বয়ং, তা তাঁর 'কথামৃত'। তার মধ্যে রামকৃষ্ণের কবিত্ব পরিহাস-রসিকতা, মানব-জীবন সম্পর্কে সূক্ষ্ম বাস্তব জ্ঞান, গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, এ সকল সাহিত্যের উচ্চ গুণগুলো এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যা আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যেও সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে ঐহিক জীবনের কথা বহুল প্রত্যক্ষ হয়েছে, তাই 'কথামৃত' উৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপে গৃহীত হবার যোগ্য। বিশেষতঃ তার উপস্থাপনার মধ্যে একটি বিস্ময়কর

সাহিত্যিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে। তাই 'কথামৃত' বহু নূতন নূতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দিতে পারে। তবে মধ্যযুগে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুণে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে এক বিপুল সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছিল, আজ আর তা রচিত হতে পারে না। কিন্তু তাহলেও তেমনিভাবে সমাজের মনে তা তার নিজস্ব ক্রিয়া ঠিক করে চলেছে। সাহিত্যে তার রূপ নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। রামকৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করেও বহু সার্থক জীবনী রচিত হয়েছে, অগণিত প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে। কাব্য কবিতার যুগের অবসান হয়ে গেলেও পূর্ববর্তী সংস্কার অনুসরণ করে তাও রচিত হচ্ছে; তারপর নাটক, চলচ্চিত্র, যাত্রা, সঙ্গীত, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, আলোচনা ইত্যাদি কত রচিত হচ্ছে, তা হিসাব করে বলা যাবে না। চৈতন্যের সমসাময়িক কালে যা হিসাবের মধ্যে ছিল, আজ আর তা হিসাবের মধ্যে নেই। আগে চৈতন্যজীবনী রচনার যে ধারা ছিল, আজ আর সে ধারাও নেই, আজ তা আরও স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং সাহিত্য একাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত সুপ্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ-গবেষক।

১

বিবেকানন্দ ও গান্ধী প্রসঙ্গে একটি বিচিত্র ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়: ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষে বা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে গোড়ায় এমন দুইজন রাজনৈতিক পুরুষ বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, যাঁরা পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সময়াংশে রাজনৈতিক ভারতবর্ষের প্রধান নেতা। এঁদের একজনের নাম বালগঙ্গাধর তিলক, দ্বিতীয়জন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিলক স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিলকের উপর সে আলোচনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিবেকানন্দ-তিলক কথা আগে আমি অন্যত্র বিস্তারিত বলে এসেছি।[১]

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস উপলক্ষে তিলক যেমন এসেছিলেন, গান্ধীও তেমনি আসেন। তখন নাতিখ্যাত ব্যক্তি তিনি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সংগ্রাম করে কিছুটা পরিচিত, ঐ সংগ্রাম সম্বন্ধে রাজনৈতিকদের অবহিত করতে, তাঁদের সহানুভূতি সংগ্রহ করতে, তিনি কংগ্রেসে এসেছেন—ভারতের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা তিনি বোধ করেছিলেন।

মোহনদাস গান্ধীর সেই দ্বিতীয় কলকাতাবাস। এর আগে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন। সেবার কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯০১ কংগ্রেস উপলক্ষে কলকাতায় এসে তিনি সেই চেষ্টা করলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জি, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম ৮১-৮৩, ২য় ৯-১০, ৩২৫-২৬, ৪র্থ ৬-১৪, ৪৯, ৮০, ৫ম ৪১৯-৫৭।

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। ব্রাহ্ম-নেতাদের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করলেন। নববিধান সমাজের রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচনার সঙ্গে তিনি আগেই পরিচিত; সাক্ষাৎ করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে। তারপরে—গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

"ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট-কিছু দেখার পরে স্বামী বিবেকানন্দকে না দেখে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। অধিকাংশ পথ, কিংবা হয়তো গোটা পথটাই, পায়ে হেঁটেছিলাম। লোকালয় থেকে দূরে মঠের নিভৃত পরিবেশটি আমার বিশেষ ভাল লেগে-ছিল। কিন্তু খুবই আশাহত ও দুঃখিত হলাম যখন শুনলাম—স্বামীজীর দর্শন পাওয়া যাবে না, কারণ অসুস্থ অবস্থায় তিনি কলকাতার আবাসে রয়েছেন।"

"বিপুল উৎসাহের সঙ্গে" পায়ে হেঁটে বেলুড় মঠে গিয়ে যখন স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না তখন দুঃখিত গান্ধীজী অগত্যা দেখা করলেন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে।—"তারপরে আমি ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থান খুঁজে বের করলাম—চৌরঙ্গীর এক প্রাসাদোপম বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।"[২] এই সাক্ষাৎকার গান্ধীজীকে মোটেই খুশি করেনি। আত্মজীবনীতে তিনি এই সূত্রে যে অত্যন্ত দায়িত্বহীন মন্তব্য করেন, সে সম্বন্ধে সমকালে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সে বিবরণ আমরা অন্যত্র দিয়েছি।[৩] এখানে ভাব-বার চেষ্টা করা যেতে পারে—স্বামীজীর সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হলে কি ঘটত? নানামুখী অনুমানের অবকাশ আছে। তেমন কিছু করার আগে, যে-গান্ধী স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়ে-ছিলেন, তাঁর তৎকালীন মনের চেহারা, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি।

২

ব্যারিস্টার গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মামলায় সাহায্য করতে—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রমজীবী অথবা ব্যবসায়ীরূপে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর ভারতীয় হাজির

---

২ গান্ধীজীর লেখা থেকে মনে হয়, স্বামীজীর সঙ্গে দেখা না হওয়ার ঠিক পরেই তিনি নিবেদিতার সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। তা কিন্তু ঠিক নয়। নিবেদিতা পাশ্চাত্য দেশ থেকে কলকাতায় ফেরেন ১৯০২, ফেব্রুআরির প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে। সুতরাং গান্ধীজী ঐ সময়ের পরেই নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেছেন। আর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে জানুআরি মাসের একেবারে গোড়ায় সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, কারণ স্বামীজী, স্বামী গম্ভীরানন্দের "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" গ্রন্থ (৩য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৪২২, ৪৩৬) অনুযায়ী, জানুআরি মাসেই বারাণসী ইত্যাদি ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন, এবং মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ৮ মার্চ। গান্ধীজী আত্মজীবনীর মধ্যে (১ম, ১৬ অধ্যায়) বলেছেন, কংগ্রেস শেষ হবার পরে তিনি একমাস কলকাতায় ছিলেন। সেকথা ঠিক হতে পারে না, কারণ কংগ্রেস শেষ হয় ১৯০১ ডিসেম্বরের শেষে, আর নিবেদিতা ফেরেন তার দুমাসেরও পরে। গান্ধীজীর ঐ কংগ্রেসের পরে একমাস কলকাতায় থাকার কথাটা ভুল ধরে নিলে (তা ভুলই) একটা মীমাংসা সম্ভবপর। তিনি মার্চ বা এপ্রিল মাসের কোন সময়ে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন—এবং নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ঐকালে নিবেদিতা কলকাতায় "ইউ এস এ কনসুলেট ভবনে" বাস করছিলেন।

৩ বিস্ময়কর ব্যাপার হল, গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে নিবেদিতা সম্বন্ধে যখন অসতর্ক উক্তি করেছিলেন, তার কয়েক বৎসর আগে তিনিই নিবেদিতার বস্তী পরিষ্কারের কাজ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ

হয়েছিল। সেখানকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আফ্রিকাবাসী বা ভারতীয় বসবাসকারীদের মানবিক অধিকার স্বীকারে রাজী ছিল না। ইউরোপীয়দের অমানুষিক আচরণের প্রত্যক্ষ ফলভোগ গান্ধীজী করেন। অপমানের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদও শুরু করেন। তাঁর চেষ্টায় সেখানকার ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ হন। এক বছরের শর্তে গান্ধীজী গিয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা তাঁদের এই নতুন বন্ধু ও নেতাকে তখনি আসতে দেননি; গান্ধীজীর পক্ষেও আসা শক্ত হয়ে উঠেছিল কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ভারতীয়দের উপর একটি অত্যন্ত অন্যায় কর চাপাতে মনস্থ করেছিলেন। তদুপরি ভারতীয়দের ভোটাধিকার না দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গঠিত 'নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' পূর্বোক্ত করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আংশিক সাফল্যলাভ করে

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী ভারতীয় সংবাদপত্রে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সংবাদপত্রে, বড় আকারে স্থানলাভ করতে শুরু করে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। তারও পূর্বে নিশ্চয় ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ নিয়ে কিছু লেখা হয়ে থাকবে। ভারতীয়দের 'ভোটাধিকার হরণ বিল'-এর প্রতিবাদে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়গণ যে গণ-আবেদন করে, তার সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়া "এক প্রধান সম্পাদকীয় রচনায় জোরালো সমর্থন জানায়।"

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবাসীকে সচেতন করতে চেষ্টা করেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনি এ-ব্যাপারে সমর্থন পান, সেখানে প্রকাশ্য সভায় ঐ বিষয়ে বক্তৃতাও করেন, কিন্তু কলকাতায় সমর্থন পাননি। অন্ততঃ তিনি তাই বলেছেন। এমন হবার একটা হেতু, বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে সমস্যাটির সঙ্গে যুক্ত ছিল না—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ প্রধানতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে কলকাতার অমৃতবাজার ও বঙ্গবাসীর অবজ্ঞার কথা জানিয়েছেন, সেইসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনতিউৎসাহের কথা। অবশ্য কলকাতার দুই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র, স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান, এক্ষেত্রে গান্ধীজীর কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে ছেপেছিল। গান্ধীজী এমনকি এলাহাবাদের রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী পায়োনীয়ারের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলেন।

ভারত-ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে গান্ধীজীকে ১৮৯৬, ডিসেম্বর মাসে অকস্মাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যেতে হয়। তখন সেখানকার পার্লামেন্টের অধিবেশন আসন্ন। গান্ধীজী যাত্রা করেন ১ ডিসেম্বর। ২৩ দিন পরে ডারবানে অবতরণ

উল্লেখ করেছেন। নিবেদিতার ঐ কাজ তাঁর কাছে অনুসরণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। 'নবজীবন' পত্রিকায় ১৯. ১০. ১৯১৯ তারিখে লেখেন:

"I have promised to give some of my experiences in connection with village uplift. Dr. Hariprasad, describing how Sister Nivedita improved a lane in Calcutta, has illustrated by this example what one man or woman can do if he or she so wills. To do this sort of work in villages is even easier than improving lanes in a city." [*Gandhi works*, Vol. 16, p. 242]

নিবেদিতা-গান্ধী প্রসঙ্গের জন্য দেশ পত্রিকায় ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ 'নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন' দ্রষ্টব্য।

করেন—তারপরেই ইতিহাসের চিহ্নিত ব্যক্তি হয়ে যান।

ইতিহাসের বহু বিস্ময়কর বিধানের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এখানে অল্প কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ভারত-ইতিহাসের এক বিচিত্র বৎসর। এই বৎসরে এক তরুণ সন্ন্যাসী ভারতের দুর্গতি মোচনের ইচ্ছায় আমেরিকার জাহাজ ধরেছিলেন। ঠিক এই বছরই একজন তরুণতর ব্যারিস্টার গ্রাসাচ্ছাদন ও নতুন দেশ দেখার আকর্ষণে আফ্রিকার জাহাজ ধরেছিলেন। এঁরা দুইজনই আমেরিকায় ও আফ্রিকায় নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করে ভারতবর্ষের বাঁচার পথ খুলে দিয়েছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। জন্মস্থান কলকাতায় আসেন ফেব্রুআরি মাসে। স্টেটসম্যান কাগজে তাঁর কলকাতা ফেরার খবর বেরিয়েছিল ২০ ফেব্রুআরি। তার অল্পদিন পরে, ৪ মার্চ, ঐ কাগজে আর একটি সংবাদ বেরোয়—তার শিরোনামা নিম্নোক্ত প্রকার :

INDIANS IN SOUTH AFRICA
Mr. Gandhi Mobbed

৭ মার্চ তারিখে তিলক-সম্পাদিত পুনার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মরাঠা'-য় প্রকাশিত শিরোনামাটি আরও পরিষ্কার :

THE RECEPTION OF MR. GANDHI
IN NATAL
Mr. GANDHI ASHORE
MOBBED STONED AND KICKED
A NARROW ESCAPE
HOW HE EVENTUALLY
DISAPPEARED.

স্টেটসম্যান সংবাদ-সূচনায় লিখেছিল : বোম্বাইয়ের ব্যারিস্টার মিঃ গান্ধী, গত নভেম্বরে যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের পক্ষে সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য ভারত ভ্রমণ করেছিলেন—নাটালে ফিরে যাবার পরে জনতার প্রহারে মারা যেতে-যেতে বেঁচে গেছেন।"

গান্ধীজী কিভাবে লিন্চ্ড্ (lynched) হচ্ছিলেন, স্টেটসম্যানে তার বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়েছিল। সংক্ষেপে তা হল এই : গান্ধীজী ৬০০ জন ভারতীয়-সঙ্গে নাটাল বন্দরে হাজির হন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা স্থির করেছিল, ওঁদের অবতরণ করতে দেবে না—যদিও অপরপক্ষে নাটাল সরকার যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গান্ধীজী বিকাল পাঁচটার সময় সলিসিটর ল্যাংটন-সহ ঘাটে উঠে যখন স্ট্রেণ্ডার স্ট্রীট ধরে অগ্রসর হতে থাকেন তখন কতকগুলি ছোকরা গান্ধীজীকে চিনতে পেরে হল্লা শুরু করে দেয়, ফলে জনতা জুটে যায়। মিঃ ল্যাংটন ভয় পেয়ে রিক্সা ডাকেন। কিন্তু যখন চীৎকার উঠল 'গান্ধী—বু-উ-উ', তখন সেই শব্দের মারাত্মকতা বুঝে রিক্সাওয়ালা গান্ধীকে নিতে অস্বীকার করে। ফলে গান্ধী তাঁর বন্ধু-সহ পায়ে হেঁটে এগোতে থাকেন—তাঁর পিছনে আশে-পাশে উত্তেজিত জনতাও বাড়তে থাকে—তারা কাদা, পাথর ছুঁড়তে থাকে—এক মহিলা তাই দেখে ছাতা খুলে সেগুলি আটকাবার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ গান্ধীজীকে মারবার চেষ্টাও করে। পুলিশ এসে যায়। গান্ধী থানায় না গিয়ে পার্শী রুস্তমজীর বাড়িতে ওঠেন পুলিশ পাহারায়। রুস্তমজীর দোকানের সামনে ইউরোপীয় ও কাফ্রী জনতার লোকসংখ্যা কয়েকশো দাঁড়িয়ে যায়। ইউরোপীয়রা কুলিদের [অর্থাৎ ভারতীয়দের] বিরুদ্ধে কাফ্রীদের উত্তেজিত করতে থাকে। গান্ধী বাড়িতে ঢুকে পড়ায় রাগে দিশাহারা জনতা চেঁচিয়ে বলতে থাকে, গান্ধীকে না পেলে তারা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। বিপদ বুঝে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট গান্ধীজীকে পুলিশ

কনস্টেবলের ছদ্মবেশ পরিয়ে বাড়ি থেকে বার করে আনার ব্যবস্থা করেন। ছদ্মবেশী গান্ধীজী যখন জনতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা গাইছিল: 'We'll hang old Gandhi on a sour apple tree'. রাত্রি এগারোটা নাগাদ জনতা সরে যায়—যখন তারা সত্যই বুঝতে পারে—বাড়ির ভিতরে গান্ধীজী নেই।

স্টেটসম্যান কাগজে জনতার নিষ্ঠুরতার সংবাদ কিছুটা বাদ দেওয়া হয়েছিল। 'মরাঠা' কাগজের বিবরণ থেকে জানতে পারি, জনতার নিক্ষিপ্ত পাথরে গান্ধীর কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল; প্রহার একসময়ে এমন প্রচণ্ড হয়েছিল যে, তিনি টলে পড়ে যাচ্ছিলেন; কোনক্রমে যখন পথ হাঁটছিলেন তখন চড়চাপড় ও লাথি মারা হচ্ছিলই। গান্ধীজী আশ্রয় নেবার পরে রুস্তমজীর বাড়ির উপর ইঁটপাটকেল ছোঁড়া হয়েছিল, এবং কাফ্রীদের উত্তেজিত করার জন্য জনৈক ইউরোপীয় বক্তৃতা করছিল: "কাফ্রীরা আজ চমৎকার আচরণ করেছে। ইউরোপীয় ও কাফ্রী, সকলেরই জানা আছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা অবাঞ্ছিত। ঐ কুলিগুলো এমন ঘৃণ্য জীব যে, ইউরোপীয়দের হাতে মার খাওয়ার বা মারা পড়ার যোগ্য নয়, কাফ্রীরাই ওদের ঠিকভাবে শায়েস্তা করতে পারবে।" 13 | 506

মরাঠার ৭ মার্চের সংবাদ থেকে জানা যায়, দাঙ্গা ও মারপিটের জন্য চারজন কাফ্রীর অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড হয়েছে, কিন্তু কোন ইউরোপীয়ের শাস্তি হয়নি।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী আবার ভারতে ফেরেন। সেই সময়ও যে তিনি কলকাতায় গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হননি তা আগেই বলেছি। ১৯০১ কংগ্রেসই গান্ধীর জীবনের প্রথম কংগ্রেস। সকলের অবজ্ঞার মধ্যে তিনি কিভাবে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা-বিষয়ক প্রস্তাব তুলে, ক্ষীণকণ্ঠে সভয়মনে বক্তৃতা করেছিলেন, তার বিবরণ আত্মজীবনীতে দিয়েছেন।

কংগ্রেস ছাড়াও গান্ধী কলকাতায় জনসভায় দুটি বক্তৃতা করেন। তার একটির ঈষৎ উল্লেখ গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে করেছেন, যদিও সেখানে প্রদত্ত সংবাদে ভুল আছে, আর অন্য বক্তৃতাটির উল্লেখই করেননি। এখানে এইটুকু বলব, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, এমনকি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতায় গান্ধী অবজ্ঞালাভ করেছিলেন বলে তাঁর মনে এমনই তিক্ততা সৃষ্টি হয় ('তিক্ততা' শব্দটি কি রূঢ় হয়ে গেল?) যে, তিনি বাঙালীদের অবজ্ঞার কথা, এবং বিপরীত দিকে ইংরাজ সম্পাদকদের উদারতার কথা, ফলাও করে আত্মজীবনীতে বলেছেন, কিন্তু কলকাতার দেশীয় কাগজে যে তাঁর বিষয়ে অসামান্য রচনা বেরিয়েছিল, সেকথা ভুলে গিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের বাইরে কলকাতার জনসভায় গান্ধী প্রথম বক্তৃতা করেন ১৯ জানুআরি, ১৯০১—যার বিষয়ে তাঁর আত্মজীবনী বা টেণ্ডুলকরের গান্ধী-জীবনী, কোথাও উল্লেখ নেই। এই সভায় যথেষ্ট সংখ্যায় বাঙালী উপস্থিত ছিলেন, সভাপতিত্ব করেন নরেন্দ্রনাথ সেন, ধন্যবাদ-প্রস্তাব ওঠান রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়; এবং গোখলে সম্ভবতঃ এই সভাতেই প্রথম গান্ধীকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানান।

১৯ জানুআরি তারিখের এই বক্তৃতার রিপোর্ট ২৬ জানুআরি তারিখে ইণ্ডিয়ান মিরারে বেরিয়েছিল। তার সূত্রে ইণ্ডিয়ান মিরার একাদিক্রমে তিনটি সম্পাদকীয় লিখে কলকাতায় প্রায় অপরিচিত সেই যুবকটির জয়ধ্বনি দেয়। সেদিন সম্পাদক যা লিখেছিলেন—সেই কথাগুলি গান্ধী সম্পর্কে স্থায়ী বক্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। কলকাতাবাসীর কাছে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেমন তেমনি গান্ধী সম্বন্ধেও প্রথম জ্যোতির্ময় রচনা

নরেন্দ্রনাথ সেনেরই।

মিরারে সেই তিনটি সম্পাদকীয় হল :

January 21, *Mr. Gandhi On His Impressions In South Africa.* January 22, *The Self-Effacement of Mr. Gandhi —An Example To The People Of Bengal.* January 23, *The Gospel Of Love For The Indians.**

এখানে কয়েক লাইন মাত্র তুলব—আবির্ভাবের পর্বে গান্ধী কোন্ আকারে ভাবগ্রাহী কিছুসংখ্যক ব্যক্তির কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন দেখিয়ে দেবার জন্য।—

"There [at the meeting] they [the listeners] had a young man of thirty, short and seemingly weak of stature, and yet private and public report had magnified him into a hero. And he was all that···He spoke direct from his heart, and in that the secret of his mastery over his audience lay. In Mr. Gandhi, the audience recognised the man with a mission, a great mission in India and beyond the seas···Though young Mr. Gandhi is, we verily believe, one of the very few of our truly great men···Mr. Gandhi himself seems to be a deeply spiritual man. ···His maxims have ever been : Speak the truth and speak the truth under all circumstances. Return love for hate···The practice of this golden maxim has so far proved the salvation of our down trodden countrymen in South Africa."

৩

স্বামীজীর সঙ্গে এহেন গান্ধীর দেখা হয়নি। যদি হত কী ঘটত তা আমরা কেউই জানি না। নানামুখী অনুমানের অবকাশ এখানে আছে, তবে সেগুলি অনুমানই বটে।

একথা দ্বিধা না রেখে বলা যায়, বিবেকানন্দের অনেক অংশই গান্ধীর মনঃপূত না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। একটা দৃষ্টান্ত গোড়াতেই দেওয়া যায়। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি কালীঘাটে বলি সহ্য করতে পারেননি। অপরদিকে বিবেকানন্দ বলি-ব্যাপারটাকে সাধারণ প্রেম-করুণার দিক দিয়ে মোটেই বিচার করতেন না। সর্বজীবের প্রতি বিবেকানন্দের অপরিমেয় প্রেম—কিন্তু তিনি যে-মৃত্যুরূপা মাতার পূজা করতেন—যাঁর পূজার মধ্য দিয়ে ভারত শক্তিলাভ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল—সেই মৃত্যুভয়ঙ্করীর মূর্তি সম্পূর্ণ করার জন্য ঐ রক্তচিহ্নের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন। বিবেকানন্দ প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদী—শক্তি ও অভীর উদগাতা, আর গান্ধী সর্বথা দ্বৈতবাদী ভক্ত বৈষ্ণব।

গান্ধীজীর আত্মজীবনীতে দেখা যাবে, এই সময়ের পূর্ব থেকেই তিনি নিরামিষাশী—শুধু তাই নয়, আমিষ ভোজনের সক্রিয় বিরোধী। বিবেকানন্দ স্বয়ং মাংসাহারী ; আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কখন-কখন মাংসাহার ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে মাংসাহার করা যে নিতান্ত দরকার তা সদাপে বহুবার বলেছেন। এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবে নিরামিষাশী হয়ে পড়ায় ভারত শারীরিক শক্তি, পরিণামে স্বাধীনতা হারিয়েছে—একথা বলতেও দ্বিধা করেননি।

হিংসা ও অহিংসার বিষয়েও একই কথা। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর পক্ষে নির্বৈর হবার সাধনা-

* এই রচনাগুলির সন্ধান দিয়েছেন শ্রীযুক্ত সুনীলবিহারী ঘোষ।

মূল্য স্বীকার করেছেন, কিন্তু গৃহীর পক্ষে উচিত কাজ হল—অন্যায়ভাবে কেউ একটা চড় মারলে দশটা চড় ফিরিয়ে দেওয়া—তাঁর খোলা কথা। অপরপক্ষে খ্রীস্টের, 'এক গালে চড় মারলে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও'—এই নীতিকে নিজ জীবনে ও অন্যের জীবনে স্থাপন করার ব্রত নিয়েছিলেন গান্ধীজী। বিবেকানন্দ প্রেমে বিশ্বাস করতেন, শাস্তিতেও, কিন্তু সমাজজীবনে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই প্রেমের ছদ্মবেশে কাপুরুষতার প্রবেশকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে, সকল মানুষের পক্ষে অহিংস হওয়ার সম্ভাবনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

এইখানেই বিবেকানন্দ ও গান্ধীতে এক মূল পার্থক্য। গান্ধীজী রামরাজ্য অর্থাৎ আদর্শ পৃথিবীতে বিশ্বাসী। বিবেকানন্দের কাছে সৃষ্টির গতি তরঙ্গায়িত। তার ওঠা-পড়া আছে। সমষ্টি কল্যাণের জন্য মানুষ চেষ্টা করবে, সেই চেষ্টায় মুক্তি পাবে—কিন্তু 'সমষ্টি' সত্যই কোনদিন নির্দোষ আদর্শে অবস্থিত থাকতে পারবে না। বিবেকানন্দ বহুবার বহুভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন—কোন এক আপাত ভালর মধ্যে কত মন্দ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

এই কারণেই বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক কিন্তু রামরাজ্যবাদী নন। রামরাজ্যে ধনীরা সাধারণ মানুষের স্বার্থের অছি হয়ে থাকবে—এই ছিল গান্ধীজীর অভিপ্রায়। বিবেকানন্দ ধনীদের শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আবার তিনি সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্য দোষের কথাও বলেছেন। সমাজতন্ত্র-নীতি, তাঁর মতে, একটা বিশেষ সময়ের সংগ্রাম, অধিক সংখ্যক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য—তার বেশি কিছু নয়।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অবিলম্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভের উপযোগী অবস্থা তখন ভারতবর্ষে ছিল বলে স্বামীজী মনে করেননি, দেশের মানুষ প্রস্তুত নয়; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কোনমতেই অস্পষ্ট ছিল না, এবং তাদের সঙ্গে লড়াই যে, সক্রিয়ভাবেই করতে হবে, সেকথাও তিলককে জানিয়ে দিয়েছিলেন; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য তাঁর পক্ষে ঘৃণার জিনিস। অপরপক্ষে এইকালে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা কত ভিন্ন ছিল তা তাঁর রচনা থেকে দেখে নেওয়া যায়:

"ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার যে-রকম আনুগত্য ছিল, আমার জানা কোন ব্যক্তির সে জিনিস ছিল কিনা সন্দেহ। এখন বুঝতে পারি, এই আনুগত্যের মূলে ছিল সত্যের প্রতি আমার প্রীতি।...নাটালে যেসব সভায় যেতাম তার সব কটিতে [ব্রিটিশ] জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো। আমি অনুভব করেছিলাম, ঐ সঙ্গীতে আমারও অংশ নেওয়া উচিত। ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি সম্বন্ধে যে আমি সচেতন ছিলাম না তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম, সব জড়িয়ে এই শাসন গ্রহণযোগ্য। ঐ সব দিনে আমার বিশ্বাস ছিল—শাসিতের পক্ষে ব্রিটিশ শাসন সাধারণভাবে কল্যাণকর।

"দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-বর্ণবিদ্বেষ দেখেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, তা ব্রিটিশ ঐতিহ্যের একেবারে বিরোধী। বিশ্বাস করেছিলাম, ও-বস্তুটা নিতান্ত সাময়িক এবং স্থানীয় ব্যাপার। সুতরাং আমি রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ইংরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলাম। সযত্নে, চেষ্টা সহকারে, [ব্রিটিশ] জাতীয় সঙ্গীতের সুর শিখে নিয়েছিলাম এবং যেখানেই তা গাওয়া হত তাতে যোগ দিতাম। রাজানুগত্য প্রকাশের সুযোগ ঘটলেই বাইরের আড়ম্বর, হৈচৈ না করে, সেই সকল কিছুতেই তৎপর হয়ে যোগ দিতাম।

"এইভাবেই আমার বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েদের [ব্রিটিশ] জাতীয় সঙ্গীত শিখিয়েছিলাম।

স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের তা শিখিয়েছি, তাও মনে পড়ে। তবে [ভিক্টোরিয়ার] জুবিলী উৎসব বা রাজা সপ্তম এডওআর্ডের অভিষেক-উৎসব—কোন্ সময়ে তা শিখিয়েছিলাম আমার ঠিক মনে নেই।" [আত্মজীবনী, ১ম খণ্ড]

পুনশ্চ :

"[বুয়র] যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সময়ে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি ছিল বুয়রদের পক্ষে, কিন্তু তখন মনে করতাম, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে সামনে এগিয়ে আনার অধিকার আমার নেই।...একথা বললেই যথেষ্ট হবে, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আমার আনুগত্য ঐ যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে অংশগ্রহণে আমাকে প্রণোদিত করেছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে যদি আমি অধিকার দাবি করি, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষায় অংশগ্রহণ করা আমার কর্তব্য হবে। তখন আমার এ-ধারণাও ছিল—ভারত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই তার পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে।" [ঐ]

নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে গান্ধীজী অত্যন্ত তিক্ত মন নিয়ে ফিরেছিলেন। তিনি নিবেদিতার সম্বন্ধে 'ভোলাটাইল' শব্দ ব্যবহার করেন, নিবেদিতার বাসস্থানের ঐশ্বর্য, জাঁক-জমকের বিষয়ে কটাক্ষ করেন—তার বিরুদ্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'মডার্ণ রিভিউ'-এ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের 'বেদান্ত কেশরী' ও 'উদ্বোধন' পত্রিকা তীব্র প্রতিবাদ করে। গান্ধীজী সে প্রতিবাদের ঔচিত্য স্বীকার করে নেন।

কিন্তু কেন গান্ধীজীর বিরক্তি, তার কারণও গান্ধীজীর রচনা থেকেই অনুমান করা যায়। গান্ধীজী বলেছেন, নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনার সমস্ত বিষয়টি তাঁর পরিষ্কার মনে আছে। বিষয়গুলি কী ছিল তা জানাননি। তবে বলেছেন, "আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ঐক্যবস্তু প্রায় ছিলই না।"

নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনার সময়ে কোন্ কোন্ প্রসঙ্গ উঠতে পারে, তা আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। ঐ সময়ে নিবেদিতা ক্ষেত্র বিশেষে স্বামীজীর মতের প্রতিধ্বনি করেছেন তাতেও সন্দেহ নেই।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিংসা অহিংসা, কালীমন্দিরে বলি, মাংসাহারের ঔচিত্যের প্রশ্ন থাকতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, তার সঙ্গে কিভাবে সংগ্রাম চালানো যায়—নিশ্চয় তা ছিল। এইসব কথা যদি উঠে থাকে তাহলে উভয়ের মধ্যে মিলবার কোন সাধারণ ক্ষেত্র ছিল না। কল্পনা করে নিতে পারি, গান্ধীজীর শান্ত স্বভাবের উপর নিবেদিতা কি পরিমাণে অগ্নিবর্ষণ করেছিলেন। ভারতীয় যুবকদের মুখ থেকে নিবেদিতা সবচেয়ে যা অপছন্দ করতেন তা হল—সাম্রাজ্যের আনুগত্য—আর গান্ধীজীর তা ছিল। এইসূত্রে ব্রিটিশ পতাকাকে নিজের পতাকা বলে মনে করা, ব্রিটিশ জাতীয় সঙ্গীতকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বিবেচনা করা—গান্ধীজীর এই মনোভাবের কথা যদি নিবেদিতা জেনে থাকেন তাহলে তাঁর কণ্ঠনির্গত লাভাস্রোতের পরিমাণ পরিমাপের চেষ্টা না করাই ভাল। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি, স্বামীজী কিভাবে ব্রিটিশ পতাকার প্রতি নিবেদিতার অভ্যস্ত আনুগত্যকে আঘাত করেছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করার পরে অন্য দেশীয় পতাকাকে নিজ পতাকা মনে করা স্বামীজীর দৃষ্টিতে গর্হিত।

হিংসা অহিংসা ও শক্তিবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর যে-সকল কথা নিবেদিতা তাঁর "দি মাস্টার" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, তাদের অল্প উল্লেখ কিছু পরে করব। এসব বিষয়ে নিবেদিতা বা স্বামীজীর সঙ্গে গান্ধীজীর মতৈক্যের কোনই অবকাশ ছিল না। [ক্রমশঃ]

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য (উত্তরকালে স্বামী প্রেমেশানন্দ)-কে লিখিত]

শ্রীশ্রীজী সহায়

SRI RAMAKRISHNA MISSION
Asrama (Orphanage)
SARGACHHI, MAHULA P.O.
MURSHIDABAD Dist.,
4th Sept. 1918

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদয়ালবাবু,

প্রায় ২০।২২ দিন পরে আজ ৩।৪ দিন হইল, এখানে আসিয়া আমি আপনার পত্রখানি পাইয়াছি। ২।৪ ছত্র পড়িতেই আমার যে কিরূপ ভাবান্তর হয়, তাহা বোধ হয় আপনি শ্রীমান্ জিতেন বাবাজিউর পত্রে পূর্ব্বেই কিছু জানিতে পারিয়াছেন। রোমাঞ্চিত শরীরে ও দরবিগলিত ধারে আপনার পত্রখানি অনেক ক্ষণে পাঠ করিয়াছি। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ ও শ্রীশ্রীমহারাজগণ সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন, তাহা কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের "অন্তরঙ্গ" জনের পক্ষেই সম্ভবে। তাঁহার কৃপায় আপনি যে, তাঁহার "অন্দরের" কথাগুলি সব একে একে এত সহজে জানিতে পারিয়াছেন—শ্রীমানের কাছে এতদিন আপনার বহু গুণানুবাদ শুনিয়াও তাহা বুঝিতে পারি নাই। ধন্য আপনি! আপনার সেই ভাগ্য বহু-তপস্যা-লভ্য। একমাত্র আমাদের দয়াল ঠাকুরের কৃপাতেই এইরূপ সুলভ হয়।

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ যে, আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের কত আদরের ও সোহাগের ধন ছিলেন তাহা আপনি যেমন বুঝিয়াছেন,—এমন "বুঝা" একমাত্র তিনিই বুঝাইতে পারেন। আগেও পর ২ অনেকদিন হইতে আমাদের অনেকগুলি "মাথা" খসিয়াছে—লোকতঃ বড় অকালেই [,] কিন্তু এমন খসিয়া—একেবারে মরমে মারিয়া আর কেহ যায় নাই। শুনিলাম, আমাদের ১০৮ শ্রীশ্রীমহারাজও নাকি আমাদের চিরপ্রেমময় শ্রীশ্রীদাদার জন্য ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন! একথা সম্প্রতি মঠ হইতে বস্ত্র বিতরণের জন্য শ্রীমান্ ভূমানন্দ স্বামী এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার-ই মুখে শুনিলাম। এদিকে—সেই সংবাদ পাইয়া অবধি এতদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়াও কিছুতেই তাঁহার বিচ্ছেদ-দুঃখ পাসরিতে পারিতেছি না।

শ্রীশ্রীহরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ)ও যেন এই প্রায় এক বৎসর কাল "ভীষ্মের শর শয্যাশায়ী"র মত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আর একটা operation হইয়াছে এবং একটু জ্বরও হয়। কাল জ্বর নাই সংবাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত আছি। যেরূপ "ধম্" ধরিয়াছে, বলিতে পারি না শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে আরও কি আছে।

আনারস গাছগুলি পাওয়ায় আশ্রমের বিশেষ উপকার হইয়াছে। আপনি আমার বহু ২ ধন্যবাদ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবেন। অত্রত্য কুশল। মধ্যে ২ কুশল সমাচার দিবেন।

পুঃ বড়ই অসাব্যস্ত হইয়া পত্র লিখিতেছি। ইতি—

পুঃ ৫।৭—ভূমানন্দজী এখানকার অবস্থা দেখিয়া আজ মঠে রওনা হইলেন। শীঘ্রই এখান হইতেও কাপড় বিলি হইবে। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅখণ্ডানন্দ

SRI RAMAKRISHNA MISSION
Asrama *(Orphanage)*
SARGACHHI, MAHULA P.O.
MURSHIDABAD Dist.

4th Septr. 1918

[illegible]

স্বামী অখণ্ডানন্দের হস্তলিপি

[পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য]

মনেতে — যথাযথ, তবু — অবশ্য দীপ-
ঠিকানা — "মধুমতী" জানেন — এক-
টু — মধু, না উত্তম — কি নাম = আমাকে
না, উত্তর "মধুমতী" — [illegible]
নব — এক; এক; এত [illegible] —
[illegible] — [illegible] — [illegible] — এত
দিন, আমাদের — [illegible] —
[illegible] — [illegible] —
[illegible] — আমাকে। আমাদের [illegible]
[illegible] — [illegible]
[illegible] — [illegible] — [illegible]
এই-বার — [illegible] — হবে।

[illegible] — [illegible] — [illegible] —
না, আমাদের — দীপ [illegible] —
[illegible] আমাদের — এ [illegible] —
বীর ছিলেন — তবু আমাকে
এমন বুঝিয়ে — এমন
"[illegible]" একাত্ম [illegible] —

উঠিয়াছে—বাতাস সমস্ত দেহে,
সঞ্চারিত হইতে, সমস্ত অ-
ন্তর দিয়ে "মানব" লাগিয়া—
দেখাতে: এই—প্রাণরই—বিন্দু—
এমন লাগিল—সংসার—
মানব—মনোবৃত্তি—সব তাহে
যার—সৃষ্টি মিলনের, সমস্ত—
গঠিত—বিশ্বরূপ—ও তাহা—
সমস্তই—বিচিত্র মানব-দেহ
হৃদয় করে—তাহা হইতে—
উঠিতেছে উচ্ছ্বাস। এখন মনু-
ষ্য ইহা হইতে—বহু বিচিত্র
দেহের হৃদয়—মুখে—এখন
অনুভবের—উপায়—ই মনে
মুগ্ধতা—এ সকল—যেন স-
জল—জাগিয়া উঠিছে—জীবন
কাঁপিয়া উঠিছে ও বিদ্যুতে

শ্রী

[illegible]

[illegible]

৭৭ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Operation

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সহস্রদ্বীপোদ্যান-আশ্রম : অর্ধশতাব্দীর আলোকে

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবালোকে বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীর্তি গবেষক।

"আমাকে এক জায়গায় বেশিদিন আটকে রাখলে সম্ভবতঃ মারা পড়ব।" ২৬ জুন ১৮৯৫ সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকে শ্রীমতী মেরী হেলকে লিখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ আর সেই সহস্রদ্বীপোদ্যানেই তাঁকে কাটাতে হল সাত সাতটি সপ্তাহ যা শুধু আমেরিকা কেন ভারতবর্ষের কোন এক জায়গায় পরিব্রাজক বিবেকানন্দের কখনও কেটেছে কিনা সন্দেহ।

দিনের পর দিন ভাষণ আর বাদপ্রতিবাদে রণক্লান্ত বিবেকানন্দের কাছে যখন তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী সহস্রদ্বীপোদ্যানের শান্ত-শীতল পরিবেশে গ্রীষ্মকালটি বিশ্রাম গ্রহণের প্রস্তাব করল তখন তিনি স্বতঃই রাজী হয়েছেন। অবশ্য শুধু বিশ্রাম নয়—তাঁদের আরও একটা গভীর উদ্দেশ্য ছিল, তা হল, একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে আরও নিকট সান্নিধ্যে স্বামীজীকে পাওয়া। শ্রীমতী ওয়াল্ডো লিখেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের মতো একজন লোকের সঙ্গে বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ অনুভূতি লাভ" এবং তার ফলে "আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয়রাজ্যের বার্তাসমন্বিত অপূর্ব রচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করার দুর্লভ সুযোগ।"

সহস্রদ্বীপোদ্যানে শিষ্যা শ্রীমতী ডাচারের একখানি কুটির ছিল, কিন্তু স্বয়ং আচার্যদেব তাঁর অতিথি হয়ে সেখানে যাবেন জেনে তিনি স্থির করলেন, "এই উপলক্ষে একটি পৃথক কুটির নির্মাণ করা আবশ্যক—সেখানে কেবল পবিত্রভাবই বিরাজ করিবে এবং তাঁহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য হিসাবে আসল বাড়িখানি যত বড় ঠিক তত বড়ই একটি নূতন পার্শ্বসংযোজন করিয়া দিলেন।"[১] শ্রীমতী ওয়াল্ডোর বিবরণ থেকে কুটিরটির অবস্থান ও বর্ণনাও পেতে পারি :

"বাড়িটি এক উচ্চভূমির উপর অতিসুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটি (সেন্ট লরেন্স) অনেকখানি এবং উহার বহুদূর বিস্তৃত সহস্রদ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত।...বাড়িখানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল, পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর এবং উহারই ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যন্ত গিয়াছে; শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুদ্র হ্রদের ন্যায় বাড়িখানির পশ্চাতে রহিয়াছে।"

পার্সি থেকে সহস্রদ্বীপোদ্যানে বিবেকানন্দ পৌঁছলেন ১৮ জুন। সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য-শিষ্যা—জুলাই মাসের প্রথমে এঁদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল সাতে। শ্রীমতী ওয়াল্ডো জানিয়েছেন মোট সংখ্যা হয়েছিল দ্বাদশ, যদিও একসঙ্গে দশজনের বেশি কখনই ছিলেন না।

এই অবসর যাপনের কিছু সংবাদ পাই স্বামীজীর চিঠি থেকে। ২৬ জুন তারিখের একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, "সহস্রদ্বীপোদ্যানে লক্ষ্য করবার মতো কিছু ঘটেনি। দৃশ্য রমণীয় বটে। কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে ইচ্ছামতো প্রসঙ্গ হয়। ফল দুধ আহার করি, আর বেদান্ত বিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ পড়ি, এগুলি

১ শ্রীমতী ওয়াল্ডোর 'দেববাণীর' পটভূমিকা। শ্রীমতী ওয়াল্ডোর যাবতীয় বিবরণী 'পটভূমিকা' থেকে গৃহীত। স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ওরা ভারত থেকে অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছে।"

পরবর্তী একটি পত্রে (জুলাই ১৮৯৫) শ্রীমতী স্টার্জেসকে লিখেছেন, "এখানে আমাদের বেশ কাটছে।...পৃথিবীর সব ঘুম যেন আমাতে নেমে এসেছে। আমি দিনে অন্তত দু'ঘণ্টা ঘুমাই এবং সমস্ত রাত্রি জড়পিণ্ডের মতো অসাড়ে নিদ্রা যাই। মনে হয় নিউইয়র্কের অনিদ্রার এটি একটি প্রতিক্রিয়া। আমি কিছু লিখছি ও পড়ছি এবং প্রতিদিন প্রাতরাশের পর একটি করে ক্লাস নিচ্ছি এবং আমি খুব উপোস করছি।"

শান্ত পরিবেশে প্রশান্ত আচার্যের উপদেশ থেকে শিষ্য-শিষ্যারা সেদিন যা পেয়েছিলেন তা তাঁদের জীবনে কতখানি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল সেটা জানতে পারি শ্রীমতী ওয়াল্ডোর বিবরণী থেকে : "উপরতলার বারান্দাটি আমাদের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল ; কারণ স্বামীজীর সকল সান্ধ্যকথোপকথন এই স্থানেই হইত।...এইখানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্যদেব তাঁহার দ্বারের সম্মুখে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্যসত্যই পুণ্যনিকেতন ছিল।...আমাদের এই নির্জনস্থানে জনকোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীটপতঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি অথবা পাতার মধ্য দিয়া সঞ্চরমান বায়ুর মৃদু মর্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত এবং নিম্নের স্থির জলরাশির বক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত।...এই সময় প্রতিদিন সান্ধ্যভোজ সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দায় গিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না, কারণ আমরা সকলে সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদের সহিত প্রত্যহ দুইঘণ্টা এবং অনেক সময়ই তদধিককাল যাপন করিতেন। এক অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীতে (সেদিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণ অবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্র অস্ত গেল, আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজীও মনে হয় ঠিক তেমনি কিছু জানিতে পারেন নাই।...

"এই দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মানুভূতি লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের কেহ ভুলিতে পারিবে না। স্বামীজী সেই সময় তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিতেন।"

উপস্থিত শিষ্য-শিষ্যাদের ওপর এই পরিবেশ ও আলোচনার প্রভাব যে কতখানি প্রবল হয়েছিল তার প্রমাণ পাই, যখন দেখি এই সহস্রদ্বীপোদ্যানেই সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়েছেন দুজন (লিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ হয়েছেন স্বামী কৃপানন্দ এবং মেরী লুই স্বামী অভয়ানন্দ) এবং পাঁচজন গ্রহণ করেছেন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা যাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী ওয়াল্ডো (ভগিনী হরিদাসী) এবং শ্রীমতী গ্রীনস্টাইডেল (ভগিনী ক্রিস্টিন)—বাকি অন্যান্যরা পরে নিউইয়র্কে অপর শিষ্যদের সঙ্গে একত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

সকালে ক্লাস, সন্ধ্যায় আলাপচারি—এইভাবেই চলতে থাকে সহস্রদ্বীপোদ্যানের দিনগুলি। শ্রীমতী ওয়াল্ডোর মনে হত, "তাঁহার গুরুদেবই যেন স্থূলশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময় স্বামীজী যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন—তখন আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া ফেলি এই ভয়ে

যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা বলিতেন। এই সময় তিনি যেরূপ কোমল-প্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও দেখা যায় নাই; তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়তো অনেকটা সেইরূপ ব্যাপার—তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুধু শুনিয়া যাইতেন।"

সেই কথোপকথন সেখানে উপস্থিত শিষ্য-শিষ্যাদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে—শুধু পড়ে আছে অনুভূতির কিছু স্মৃতিচিহ্ন। তবে সকালের ক্লাসনোট কিছু কিছু সংগ্রহ করে রেখেছিলেন শ্রীমতী ওয়াল্ডো। পরে এগুলি একত্র সংগ্রহ করে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'Inspired Talks'—যার বাংলা অনুবাদ 'দেববাণী'।

আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান যেখানে উপস্থিত সেখানে শুধুই যে শুষ্ক শাস্ত্রচর্চা ও আধ্যাত্মিক বক্তৃতার মধ্যে সময় অতিবাহিত হত এমন কথা ভাবা যায় না। প্রভাতী ও সান্ধ্য বৈঠকগুলির অতিরিক্ত সময় কাটত বিবেকানন্দের স্বভাবজাত অফুরন্ত কৌতুকরঙ্গে। সহস্র-দ্বীপোদ্যানে বাসকালে সকলে স্থির করেছিলেন, ঘরগৃহস্থালীর কাজ তাঁরা নিজেরাই সম্পন্ন করবেন—বাইরের লোকের সংস্পর্শে এই অনাবিল শান্তিনিকেতনকে ভারাক্রান্ত করে তুলবেন না। সে কাজে এগিয়ে আসতেন স্বয়ং স্বামীজীও। তিনি 'পাকা রাঁধুনীর' মতো নানাবিধ মুখরোচক ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করতেন শিষ্য-শিষ্যাদের—তার সঙ্গে সংযুক্ত হত নানা আনন্দের উপকরণ। এ ছাড়া অবশ্যই থাকত অনেক ঘটনা যা থেকে স্বামীজী কৌতুক রস আহরণ করতেন এবং আনন্দের পরিবেশ তৈরি করতেন। একটি ঘটনার কথা নিজেই উল্লেখ করেছেন শ্রীমতী স্টার্জেসকে লেখা চিঠিতে :

"মেরী লুই নিউইয়র্ক থেকে তাঁর পোষা একটি কচ্ছপ নিয়ে এসেছেন। এখানে এসে পোষা প্রাণীটি তার স্বাভাবিক পরিবেশ পেয়েছে। সুতরাং বিপুল অধ্যবসায়ে গড়াতে গড়াতে এবং হামাগুড়ি দিতে দিতে সে মেরী লুইয়ের ভালবাসা ও আদরকে পিছনে—অনেক পিছনে ফেলে চলে গিয়েছে। প্রথমটায় তিনি কিছু দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এত জোরের সঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করতে লাগলুম যে, তাঁকে অবিলম্বে ফিরে আসতে হল।"

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে স্বামীজী যে কৌতুক-পরিবেশ রচনা করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

আরও কৌতুকের আভাস রয়েছে মেরী হেলকে লেখা ২২ জুন তারিখের পত্রে :

"এখানে আমার বাসার কাছে অবস্থিত ওয়ালডর্ফ হোটেল। আমেরিকার ধনীকন্যারা ক্রয় করবেন বলে বহু খেতাবধারী কিন্তু কপর্দক-হীন পুরুষের প্রদর্শনী ও আড্ডা এটি। আমদানী এত প্রচুর ও বিবিধ যে, ইচ্ছানুরূপ নির্বাচন বাস্তবিকই সুলভ। কেউ আছেন একেবারেই ইংরেজী বলতে পারেন না, আবার আছেন জন-কয়েক যাঁরা আধ আধ ইংরেজী বলেন, যা অন্যের বোধগম্য নয়। ভাল ইংরেজী বলতে পারেন এমন লোকও আছেন। কিন্তু নির্বাকদের তুলনায় তাঁদের আশা বড় কম। কারণ যাঁরা ইংরেজী বলতে পারেন, মেয়েরা তাঁদের ঠিক 'বিদেশী' বলে মনে করে না।"

শ্রীমতী ওয়াল্ডো লিখেছেন, "প্রতি জিনিসটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন এবং একমুহূর্তে

তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন।" এ যেন সূর্যরশ্মির সাতরঙা খেলা! মুহূর্তে মুহূর্তে একভাব থেকে ভাবান্তরে। এ থেকেই রচনা হত বৈচিত্র্যের পরিবেশ। সেদিন জানি না তিনি কি বিষয় আলোচনা করছিলেন, অকস্মাৎ সকলকে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন নিজের কক্ষে। বেশ কিছুক্ষণ কাটল—আবার ফিরে এলেন—অপেক্ষারত শিষ্য-শিষ্যাদের শোনালেন সদ্যরচিত সেই বিখ্যাত কবিতাটি। 'The Song of the Sannyasin'—স্বামী শুদ্ধানন্দকৃত যার ভাবান্তরিত রূপ—'সন্ন্যাসীর গীতি'। পরে সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকে সেটি পাঠিয়ে দিলেন সদ্যপ্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশের জন্যে—সম্পাদককে লিখছেন, "এটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম লেখা।"

এখানে অবস্থানকালে আমেরিকায় বেদান্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প বার বার উচ্চারিত বিভিন্ন-জনের কাছে লেখা চিঠিতে। সাময়িক আলোড়ন উপস্থিত করে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না—তিনি জানতেন, তাঁর কাজ রাম-কৃষ্ণ-চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার—সেখানে ব্যক্তির ভূমিকা গৌণ। ২২ জুন সিঙ্গারভেলু মুদালিয়ার (কিডি)-কে লিখেছেন :

"এদেশে আমি একটি বীজ পুঁতেছি, শীঘ্রই সেটি বৃক্ষে পরিণত হবে। হবেই হবে। তবে আশঙ্কা, যদি আমি তাড়াহুড়ো করে যত্ন নেওয়া বন্ধ করি, গাছটির বাড়ের ক্ষতি হবে।"

আবার ২৬ জুন শ্রীমতী মেরী হেলকে লিখছেন, "এ দেশে যে বীজবপন করলাম তার পরিণতি কামনা করি।"

৯ জুলাই খেতরীর মহারাজকে লেখা চিঠিতে সেই একই কামনার প্রকাশ: "আমি এদেশে একটি বীজ পুঁতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই একটি চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি, এটি শীঘ্রই একটা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েকশত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; কতকগুলি সন্ন্যাসী করব, তারপর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে দেশে ফিরে যাব।"

স্বামীজীর ঐকান্তিক কামনা আজ সার্থক—সেদিনের সেই বৃক্ষশিশুটি মহীরুহের দীপ্ত তারুণ্যে উজ্জ্বল। গোটা যুক্তরাষ্ট্রে আজ মোট ১২টি বেদান্ত কেন্দ্র পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে চলেছে। সহস্রদ্বীপোদ্যানের কেন্দ্রটি তার মধ্যে একটি। সেই একই কুটির—একই কক্ষ,: যেখানে স্বামীজীর কণ্ঠ আজও শোনা যায় তাঁর উত্তরসূরীর মধ্য দিয়ে। গত বছর এপ্রিলে (১৯৮৩) কেন্দ্রটির পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উৎসব হয়ে গেল। সেই উৎসবের বিবরণী এবং কর্মকেন্দ্রটির মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র প্রতিবেদক কেনেথ এ. ব্রিগস ২৫ এপ্রিল ১৯৮৩ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে যা লিখেছেন, তার সারমর্ম এই:

"পুষ্পসজ্জিত বেদীর উপর উপবিষ্ট স্বামীজী এবং বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা একটি হিন্দুসংস্থার উৎসবের সূচনা করলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত অর্ধ-শতাব্দীকাল ম্যানহাটনের পূর্বাংশের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মের মর্মকথা ও পদ্ধতির যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছেন।

"নিউইয়র্ক শহরস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের একটি সমাবেশে উপস্থিত হয়ে শুনেছেন ছয়জন বক্তার ভাষণ এবং প্রাচীন সংস্কৃতমন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনি। নিউইয়র্কের এই কেন্দ্রটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-প্রচারের জন্য ১২টি মঠের অন্যতম।

"কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ দীর্ঘদেহী পক্ককেশ স্বামী আদীশ্বরানন্দ বললেন, 'বেদান্ত প্রচারে এই কেন্দ্রটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।'

"এই বেদান্ত-প্রচার যে আমেরিকাবাসীর

ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তার প্রমাণ দেখতে পাই ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক মানুষ আজ আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও নির্দেশের জন্য প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। আমেরিকায় ভগবদ্গীতার মতো পুস্তকের চাহিদা তাই বেড়েই চলেছে।

"উনিশ শতকের সেই সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ আজ বিশ্ববন্দিত। তাঁর উপদেশ ও আদর্শগ্রহণে অনেক অধ্যাত্ম-অনুসন্ধিৎসু এগিয়ে আসছেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হয়ে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের বীজ নিউইয়র্ক ও অন্যান্য নগরে বপন করেছিলেন। কপর্দকহীন আচার্য বিবেকানন্দ চিকাগোতে বিশ্বমেলার সঙ্গে একত্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় যোগদান করে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তোলেন—দলে দলে শ্রোতারা তাঁর কথা শোনার জন্যে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে থাকে।

"আমেরিকার কেন্দ্রগুলি রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ রক্ষা করেও এ দেশীয় সংস্কৃতির ছাপ বহন করে। পাঁচজন ব্রহ্মচারীর অন্যতম ব্যারি জেলিকোভ, যিনি স্বামী আদীশ্বরানন্দের সঙ্গে থাকেন, বললেন, 'আমাদের সাধন পাশ্চাত্য মনের খুবই উপযোগী।' এই উপাসনালয় পাশ্চাত্যধারায় ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুশীলন কেন্দ্র।

"এই কেন্দ্রের নেতারা দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন যে, তাঁরা জোর দিয়ে থাকেন গভীরতর মনন ও স্বাধ্যায়ের প্রতি। যে-সব ধর্মীয় আচার বা সংস্কার হিন্দুধর্মের মূল সত্যকে ইদানীং কিছুটা গণ্ডীবদ্ধ করে ফেলতে চাইছে, সেগুলিকে তাঁরা পরিহার করে চলেন। শাস্ত কিন্তু সুনিশ্চিত পন্থাই তাঁরা অনুসরণ করে থাকেন।

" 'যে-সব তত্ত্ব এখানে ব্যাখ্যা করা হয় তা সদ্য সদ্যই উপলব্ধ হবে, এমন নয়—অনেকসময় লাগে অন্তরে স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়তে।'—বললেন ছাব্বিশ বছর বয়স্ক ইঞ্জিনিয়র স্টান লুমিশ, যিনি প্রতি রবিবার নিউ জার্সির বেল লেবরেটারী থেকে এখানে ছুটে আসেন।

"পঞ্চাশতম জয়ন্তী উৎসবে যাঁরা যোগদান করেছিলেন বয়স বিচারে তাঁরা শিশু থেকে আরম্ভ করে তাঁদের পিতা-পিতামহ পর্যন্ত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—ভারতীয় ও আমেরিকান, দীর্ঘকালীন ভক্ত ও নবাগত, খ্রীস্টান ও ইহুদী। হিন্দুধর্মের একটি মর্মকথা হল, সব ধর্মই ঈশ্বরলাভের পথ। হিন্দুধর্মের অন্যতম পবিত্র শাস্ত্র ঋগ্‌বেদে আছে—'সত্য একটিই—ঋষিরা তাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।' তাই এখানকার অনুগামীদের জন্মগত ধর্ম পরিত্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না।

"বত্রিশ বছর বয়স্ক মাইকেল ব্ল্যাক জন্মসূত্রে এপিসকোপ্যাল খ্রীস্টান। নিজেকে তিনি হিন্দু বলেও অভিহিত করেন না, কিন্তু তিনিও প্রতি সপ্তাহে তাঁর বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে এখানকার উপাসনায় যোগ দেন। তিনি বললেন, 'জে. ডি. জেলিঙ্গারের' গ্রন্থ 'ফ্র্যানি অ্যাণ্ড জু-ই' (Franny and Zooey) পড়ে প্রথম তিনি স্বামী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর অভিমত, 'আত্মানুসন্ধানেই এখানকার বিশ্বজনীন আবেদন'।

"এমানু-এল মন্দিরের প্রবীণ ধর্মযাজক র‍্যাবি রোলাণ্ড বি গোবেল একই সুরে, একইভাবে খোলা মন নিয়ে এখানকার বক্তাদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন—ভক্তরাও সাদরে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অন্য কেন্দ্র থেকে আগত তিনজন অতিথি স্বামীজী, একটি কলেজের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ও একজন ভারতীয় কূটনীতিবিদ।"

২৫ জুলাই ১৯৮৩ তারিখের 'ওয়াটার টাউন ডেলি টাইমস' পত্রিকায় টমাস জে. মার্টেলো

তাঁর প্রতিবেদনে সহস্রদ্বীপোত্থানের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর সম্পর্কের কথা এবং স্বামী আদীশ্বরানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ উপস্থিত করেছেন :

"পাহাড়ের উপর এই গ্রীষ্মকালীন আবাস-সমূহের মধ্যে একটি কুটির, যাকে স্থানীয় লোকেরা 'স্বামীজীর বাড়ি' বলে জানে, অন্য পাঁচটা কুটির থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। এখানকার অন্যান্য কুটিরগুলির মতোই এটিও গ্রীষ্মকালে প্রাণস্পন্দনে মুখর হয়ে ওঠে, আবার পাতাঝরা শুরু হলে শীত-ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। এর উনিশ-শতকীয় স্থাপত্যের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই—সহস্রদ্বীপোত্থানে এই ধারা এত প্রচলিত যে, জাতীয় ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নথিপত্রে পুরো জনপদটিই গৃহীত হয়েছে।

"নিউইয়র্কস্থ হিন্দুসংস্থাটির বর্তমান অধিনায়ক স্বামী আদীশ্বরানন্দের কুটিরটি কিন্তু সহস্র-দ্বীপোত্থান থেকে দশহাজার মাইল দূরবর্তী ভারতীয়দের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে চিহ্নিত।

"স্বামী আদীশ্বরানন্দ, যিনি প্রতি গ্রীষ্মে এখানে আলোচনাসভার আয়োজন করে থাকেন, কথা-প্রসঙ্গে বললেন, 'ভারতীয়রা এ স্থানটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন—এমন কি অনেকে সহস্র-দ্বীপোত্থানে তীর্থযাত্রাও করে থাকেন।'

"এই আকর্ষণের কারণ হল, ভারতীয়রা যাঁকে একজন মহাপুরুষ বলে মনে করেন সেই স্বামী বিবেকানন্দ এখানে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সাত সপ্তাহ যাপন করেছিলেন।

"তার দু-বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্ব-মেলার সঙ্গে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় যে বক্তৃতামালা শুরু করেন তা এখানে বহু উৎসাহী ভক্তকে আকর্ষণ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ এদেশে হিন্দুধর্ম প্রবর্তনায় বিশেষ সাহায্য করেছিল ; কারণ তিনি তাঁর গুরু স্বামী রামকৃষ্ণের শিক্ষাই প্রচার করেছিলেন। এখানে থাকাকালে বিবেকানন্দ বক্তৃতা, শিক্ষাদান ও উপাসনা পরিচালনা করতেন।

"স্বামী আদীশ্বরানন্দ বললেন, 'এমন কি ভারতেও বিবেকানন্দ একটানা সাত সপ্তাহ যাপন করেছেন এমন স্থান দুর্লভ। আমাদের পক্ষে নিউইয়র্ক কেন্দ্রের কাছাকাছি ক্যাটস্কিলই সুবিধাজনক, কিন্তু এ-কেন্দ্রটির প্রতি আমাদের একটা ভক্তির টান আছে। তাই এখানে থাকাটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'

"১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে স্বামীজী এখানে যেভাবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার পরবর্তীরা এখনও তাঁকে সেইভাবে অনুসরণ করে চলেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠান ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কুটিরটি কিনে নিয়েছেন এবং প্রতি গ্রীষ্মে স্বামীজীরা শতশত ছাত্রকে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান করে চলেছেন।

"'যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি কেন্দ্রের অন্যতম এই কেন্দ্রটির ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ এক বিশেষ বছর'—স্বামীজী বললেন, 'এ বছর আমাদের পঞ্চাশতম জয়ন্তী। এপ্রিলে সকল ধর্মের প্রবক্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছে।' স্বামীজী যে অন্যান্য ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুষ্ঠানে সম্মিলিত করছেন, এটা বিচিত্র কিছু নয়, কারণ সকল ধর্মবিশ্বাসকে সত্য বলে গ্রহণ করাই রামকৃষ্ণ-ভাবধারার অন্যতম মূল আদর্শ।

"স্বামী আদীশ্বরানন্দ বলেন, 'কোন বিশ্বাসকে আঘাত করে রক্ষা করা যায় না। আমরা সকল মহাপুরুষকে, সকল ধর্মপ্রবক্তাকে সমান মর্যাদা দি। খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে কৃষ্ণের শিক্ষার প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো যায় না। প্রায় ক্ষেত্রে ধর্মমতের পার্থক্য গড়ে ওঠে সংস্কৃতিগত পার্থক্যের জন্য। সুতরাং গোঁড়ামির

কোন হেতু নেই। একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার বহুবিধ পথ। এ বিষয়ে ইনটেলেক্‌চুয়াল অ্যাপ্রোচকেই আমরা গ্রহণ করেছি।'

"এই কারণেই দেখতে পেলাম, এখানে খ্রীষ্ট-ধর্মের বা ইহুদীধর্মের (Judaism) অনেক প্রতীকচিহ্ন রয়েছে। স্বামীজী অ-হিন্দু ছাত্রদের হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত করতে চান না বরং তাঁর লক্ষ্য, শিক্ষার মধ্য দিয়ে 'অধিকতর বোধশক্তি এবং নিজেদের ধর্মসম্বন্ধে মূল্যবোধ সৃষ্টি।'

"বর্তমানে যে বহু ধর্মগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হচ্ছে, সে ব্যাপারে স্বামীজীর সমালোচনা তীব্র। তিনি বলেন, 'বিনা সাধনেই চিত্তের বিকাশ হয়, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। তাতে 'কাল্ট্' গড়ে উঠতে পারে কিন্তু যে জিনিস একজনকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে তা আধ্যাত্মিকতা নয়। প্রকৃতধর্মে মানুষ ভাবপ্রেরণার দিক থেকে স্বাধীন।'

"স্বামীজী বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'সৎ সংশয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি, সমালোচনাত্মক মতামতকেও উৎসাহিত করি।'

"প্রত্যেক সেমিনারে প্রায় ১২ জন ছাত্র থাকে—তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচির মধ্যে থাকে আলোচনা ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নির্দিষ্ট সময়—স্বামীজীর ভাষণ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং নীরবধ্যানের জন্য নির্দিষ্ট সময়।

"সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ চিত্র সম্বলিত কটেজ-পারলারে আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন স্বামীজীর সঙ্গী একজন ব্রহ্মচারী ব্যারি জেলিকভস্কি টেলিফোনে অন্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পরে তিনি বললেন, 'এখানে যা শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা হৃদয়ঙ্গম হলে তা অনুসরণ না-করাটাই শক্ত।'

"জেলিকভস্কি এসেছেন নিউইয়র্ক থেকে আর স্বামীজী কলকাতা থেকে—দুজনেরই পরনে স্থানীয় পোশাক। এর কারণ নির্দেশ করে স্বামীজী বললেন, 'আমরা যে দেশের অতিথি সে দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমি ধর্মসভায় সন্ন্যাসীর পোশাক পরি, অন্য সময় এ-দেশীয় পোশাক। ভারতের একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারীকে জানি যিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীর পোশাক এবং অন্যান্য পরিধেয় ব্যবহার করেন। তিরিশ বছর আগে কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না।'

"স্বামীজী স্বীকার করলেন যে, এ-সব সত্ত্বেও ধর্মীয় বিভেদ এখনও পৃথিবীর কোন কোন অংশে প্রবল। 'অন্যসব কারণের চেয়ে ধর্মের জন্যই পৃথিবীতে অনেক বেশি রক্তপাত হয়েছে। এখন অবশ্য পারস্পরিক সহনশীলতা অনেক বেড়েছে। এই বাইবেলের রাজত্বে আমি তো বেশ সাদরেই গৃহীত হয়েছি।'

"স্বামী আদীশ্বরানন্দ ৫৯ বছর আগে জন্মগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে এসেছেন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ন'বছর পরে তিনি সন্ন্যাস পান। একটি মহাবিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন এবং একটি বেদান্ত পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নিখিলানন্দের সহকারীরূপে তাঁকে এই কেন্দ্রে এবং সহস্রদ্বীপোদ্যানে আসতে হয়। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নিখিলানন্দের শরীরত্যাগের পর থেকে তিনিই কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন।

"স্বামীজী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না, কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারলাম মানুষের মৌলিক প্রকৃতির ভিত্তি অভিন্ন। ভারতের বড় বড় শিল্পনগরীর সঙ্গে নিউইয়র্কের বিশেষ পার্থক্য নেই, 'ভারতের শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মানসিকতায় কোন তফাত নেই। এঁরা গোঁড়া এবং ভাব-প্রবণ নয় এবং দেখেছি, এঁদের একবার বোঝাতে পারলে আরও বেশি জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।'

"স্মিত হেসে স্বামীজী বললেন, 'ইচ্ছে হয়, একটু বেশিদিন থাকি।' অন্য আবাসিকদের মতোই তিনি দুজন পরিদর্শককে কটেজের সর্বত্র ঘুরে দেখার সুযোগ দিলেন। ওপরতলায় একটি ঘর, যার গুরুত্ব সর্বাধিক। এখানেই রয়েছে সেই বেদীটি যেখানে বসে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ উপাসনা পরিচালনা করতেন। অন্যান্য অংশগুলিও তখন যেমন ছিল যতদূর সম্ভব তেমনই রক্ষা করা হয়েছে।

"এ অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন সহস্রদ্বীপোদ্যান স্থাপন করেছিলেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন মেথডিস্ট ধর্মযাজক পুনরুজ্জীবন ক্যাম্প হিসাবে

'সাইরাকিউজ-হেরাল্ড-জার্নাল' পত্রিকার ১ অগস্ট ১৯৮৩ সংস্করণের প্রতিবেদনে প্রধানত সহস্রদ্বীপোদ্যানের ইতিহাস এবং এটিকে জাতীয় স্মারক হিসাবে গ্রহণের কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদকের মতে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষাই স্মারকহিসাবে গৃহীত হবার প্রধান শর্ত। সহস্রদ্বীপোদ্যান সে-শর্ত কতখানি পূরণ করেছে আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে এই আশ্রমটির কথা :

"জীবন্ত ইতিহাসের উদাহরণ আমার চোখে পড়ল যখন আমার একজন গাইড শ্রীমতী ট্রুড ব্রাউন ফিটেলসন সমস্ত পার্কটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, লোকজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন এবং স্থানটি কেন জাতীয় স্মারক হিসাবে গৃহীত হল তার হাজার রকম কারণ দেখাচ্ছিলেন। অন্য শতাব্দীর মেজাজটি রক্ষা করাই আসল কথা। ট্রুড চড়াই রাস্তা ধরে নিয়ে গেলেন অরণ্যের দিকে—একজন স্বামীজীর সঙ্গে এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন।

"সম্ভবতঃ উনিশ শতকের শেষ দশকে বিবেকানন্দ নামে হিন্দু সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের একজন গুরু যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল যাঁর এই পার্কে একটি গ্রীষ্মাবাস ছিল। জনপদের উত্তরাংশে পাহাড়-শীর্ষে অবস্থিত সেই গ্রীষ্মাবাসে থাকার জন্য তিনি বিবেকানন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ সেন্ট-লরেন্স নদীর এই পার্কে এসে ছ' সপ্তাহ[২] এই অলঙ্করণবহুল কটেজে যাপন করে ধ্যান ও শিষ্যদের উপদেশ দানে অতিবাহিত করেন। উত্তর নিউইয়র্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানে তাঁর পরিভ্রমণের ফলে আমেরিকাবাসীর সঙ্গে প্রাচ্য-ধর্মের পরিচয় সাধিত হয়েছিল।

"১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন, এদেশে যাঁদের মূলকেন্দ্র নিউইয়র্কে, অরণ্যবেষ্টিত এই কুটিরটি ক্রয় করেন এবং বিবেকানন্দের নামে মন্দির ও উপাসনালয় স্থাপন করেন। সহস্রদ্বীপোদ্যান পরিভ্রমণরত হিন্দুরা এই স্থানটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেন।"[৩]

একদা চিন্তানায়ক আর্নল্ড টয়েনবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এক সতর্ক বাণী : "আমরা বাস করছি বিশ্ব-ইতিহাসের এক যুগান্তরের অধ্যায়ে কিন্তু এটা আজ সুস্পষ্ট, যে-অধ্যায়টির আরম্ভ ছিল ইউরোপীয়, তার উপসংহার হবে ভারতীয়, যদি না আমরা আত্মহননের ধ্বংসলীলায় মানবগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দিতে চাই। বর্তমান যুগে আমরা পাশ্চাত্য যন্ত্র কৌশলের কল্যাণে জড়বাদের ভিত্তি-ভূমিতে মিলিত হতে পেরেছি। সেই যান্ত্র-নৈপুণ্য আমাদের মধ্যে দূরত্বকেই শুধু ঘুচিয়ে দেয়নি—

২ প্রকৃতপক্ষে সাত সপ্তাহ।

৩ বিদেশী পত্রপত্রিকার অনুবাদে সর্বত্র আক্ষরিকতা রক্ষা করা হয়নি। মূল বক্তব্য বজায় রেখে মাঝে মাঝে ভাবানুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে প্রধানতঃ ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষা করার জন্য।

সেই সঙ্গে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এক বিধ্বংসী শক্তি। আমরা পরস্পরের বন্দুকের নলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি অথচ পরস্পরকে ভালবাসার শিক্ষা আমরা পাইনি। মানবেতিহাসের এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে মানবসভ্যতার সামনে শুধু একটি পথই আজ উন্মুক্ত—তা হল ভারতীয়তার পথ—সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের পথ। এখান থেকেই আমরা পেতে পারি সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা যা বিশ্বমানবসমাজকে একটি পরিবারের বন্ধনসূত্রে গ্রথিত করতে পারে—এবং আণবিক যুগে এ ছাড়া আত্মহননের বিকল্প আর কোন পথ নেই।"[৪]

সহস্রদ্বীপোদ্যানের আশ্রম সেই শান্তি ও সমন্বয়ের পথে একটি অনির্বাণ দীপশিখা।

৪ World Thinkers on Ramakrishna-Vivekananda, Edited by Swami Lokeswarananda, p. 10

ম্যাক্‌লাউডকে লেখা পত্রাংশ

ভগিনী নিবেদিতা

মূল চিঠির জন্য অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত Letters of Sister Nivedita, Vol. 1, pp. 190-93 দ্রষ্টব্য। পত্রাংশের বঙ্গানুবাদ অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-কৃত।

…জানো যুম! সেদিন রাত্রে শ্রীমতী এফ ও কুমারী জি'র সাক্ষাতে স্বামীজী অনেক বিস্ময়কর কাহিনী শোনালেন। তাঁর যখন বয়স আট বছর তখন থেকেই তিনি সমাধিমগ্ন হতেন, তবে বুঝতেন না সেটা কি! আমি যখন তাঁকে মৃত্যুর কথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন বললেন, তার স্বরূপও তিনি জানেন। তারপর তিনি শোনালেন:

"বারো কি পনের বছর আগে (হৃষীকেশ) পাহাড়ের ধারে এক কুটিরে তখন তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ ও আমি থাকতাম। আমি প্রবল জ্বরে গুরুতর অসুস্থ এবং ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি—এমন মুহূর্তে এসে পৌঁছলাম যখন আমার কাঁধ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলাম। তারপর আবার ক্রমশঃ চেতনা ফিরে পেলাম। মনে হল, আমার একটা কিছু করার আছে। লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়ে দেখি তুরীয়ানন্দ চণ্ডীপাঠ করছে আর সারদানন্দ কাঁদছে।"

তুরীয়ানন্দের কাছে ব্যাপারটা উল্লেখ করাতে তিনি বললেন, "সে একটা অলৌকিক আরোগ্যের ঘটনা। সেটা ছিল একটা ঝোড়ো অন্ধকার রাত। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে যখন মনে হল, উনি চলে গেছেন তখনই দরজার বাইরে এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন, ভয় পেয়ো না ভাই। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ওঁকে সারিয়ে তোলার ওষুধ তিনি জানেন, কোথায় সেটা পাওয়া যায় তা-ও জানেন, কিন্তু তার জন্যে অনেকদূর যাওয়া দরকার। তুরীয়ানন্দ যখন স্বামীজীকে একা ছেড়ে যেতে ইতস্তত করছিলেন (সারদানন্দ তখন ঘুমুচ্ছিলেন, পরে রাত-জাগার পালার জন্য তৈরি হতে) সেই সময় আর একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়ে স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে ওষুধ আনতে যেতে চাইলেন। তিনি গিয়ে ওষুধ নিয়ে ফিরে এলে তুরীয়ানন্দ ওষুধ প্রয়োগ করার পাঁচ মিনিট পরেই মৃত্যুর বদলে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেল এবং স্বামীজী সুস্থ হয়ে উঠলেন।"

রহস্যময় তারাজগৎ

শ্রীসলিলকুমার চক্রবর্তী

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক।

"আজি যত তারা তব আকাশে
আমার মন প্রাণ ভরি প্রকাশে"—

এ শুধু কবির বাণী নয়! নির্মল আকাশের নিঃসীম নীলিমায় অগণিত রূপালী জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল উপস্থিতি যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করেছে বিজ্ঞানীদেরও। দূর-দূরান্তের তারকাদের মিটিমিটি হাসির মাঝেই যে ব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য লুকিয়ে আছে, বিজ্ঞানীদের এ অনুমানও অনেক দিনের। মহাকাশের স্তব্ধ নীল যবনিকাখানি উন্মোচনের প্রচেষ্টাও চলে আসছে তাই স্মরণাতীত কাল থেকে। বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যাই (Astronomy) বোধ করি প্রাচীনতম। মহাকাশ অনাদি অনন্ত। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য মহাকাশের বিশেষ বিশেষ অংশকে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে নামাঙ্কিত করেছেন। সে অনুসারে সমগ্র মহাকাশ তিনভাগে বিভক্ত। যথা—

১। আন্তর্গ্রহ মহাকাশ (Interplanetary space)

২। আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ (Interstellar space)

৩। আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশ (Intergalactic space).

আন্তর্গ্রহ মহাকাশের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছে সূর্য। সূর্যকে নাভিকেন্দ্রে (Focus) রেখে তার চারধারে বিভিন্ন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে চলেছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো— এই নয়টি গ্রহ, প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি সংখ্যক গ্রহাণু (Asteroids), অসংখ্য উল্কাপিণ্ড (Meteors) এবং অগণিত ধূমকেতু (Comets) গ্রহগুলোর চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে চলেছে উপগ্রহসমূহ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত উপগ্রহের সংখ্যা ৩৫।

আন্তর্গ্রহ মহাকাশের বর্তমান বিস্তার সূর্য থেকে দূরতম গ্রহ প্লুটোর দূরত্বের দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ কোটি মাইল। তবে প্লুটোর চেয়ে দূরতর কোন গ্রহ আবিষ্কৃত হলে ভবিষ্যতে এ বিস্তার আরও বাড়তে পারে।

আন্তর্গ্রহ মহাকাশের যেখানে সমাপ্তি, সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে তারকাদের রাজ্য—আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে নক্ষত্র বা তারকারাই হচ্ছে মহাকাশের প্রধান অধিবাসী। ভর, শক্তি, পরিদৃষ্টসংখ্যা সব ব্যাপারেই তারারা যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রহ, গ্রহাণু, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আর যা কিছু আছে মহাকাশে সব যেন 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক'।

সাধারণভাবে তারকারা সব আমাদের সূর্যের মতো নিজস্ব আলোয় উজ্জ্বল এবং গ্যাস ও প্লাজমা (পদার্থের চতুর্থ অবস্থা) দ্বারা গঠিত। সাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্য-প্রমাণকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়ে আমরা সূর্যকে অনন্যসাধারণ, একান্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে করলেও, বিজ্ঞানীদের কাছে সূর্য একটা মাঝারিগোছের তারা বই কিছু নয়!

তবে অন্যান্য তারার তুলনায় সূর্য পৃথিবীর অনেক কাছে (মাত্র ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ মাইল দূরে) অবস্থিত বলেই তাকে এত বড় দেখায়। তাছাড়া সূর্যের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর এক বিশেষ সম্পর্কের বন্ধন আছে যা অন্য কোনও তারার সঙ্গে নেই। মহাকাশে এমন অনেক তারা আছে যাদের তুলনায় আয়তন, উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের বিচারে সূর্য নেহাতই নগণ্য। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ—সূর্যের ব্যাস যখন ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মাইল, তখন এপসাইলন্ অরিগি (Epsilon Aurigae) নামক তারাটির ব্যাস প্রায় তার ৩০০০ গুণ! অর্থাৎ শেষোক্ত তারার আয়তন সূর্যের আয়তনের ২৭০০ কোটি গুণ! সূর্যের বাইরের দিকের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড আর শীতের আকাশের অতি সুপরিচিত কালপুরুষ (Orion) মণ্ডলের অন্তর্গত মৃগশিরা (Meissa) নামক তারাটির বাইরের দিকের তাপমাত্রা প্রায় ৩৫০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ঐ কালপুরুষ মণ্ডলের অপর একটি তারা বানরাজ (Rigel)-এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রায় ২১০০০ গুণ। সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী তারাটির নাম প্রক্সিমা সেণ্টুরি (Proxima Centuri)। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি মাইল। আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল ধরে হিসাব করলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছতে সময় লাগবে ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ড, আর ঐ তারাটি থেকে আলো পৃথিবীতে পৌছতে সময় নেবে ৪ বছর ৪ মাস।

সূর্যের পক্ষে মর্যাদা হানিকর অনেক তথ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেও, একথা সত্যি যে, মহাকাশের অনন্ত শূন্যতার মাঝে সূর্য বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ নয়, সে গ্রহ-উপগ্রহাদি অসংখ্য জ্যোতিষ্ক গঠিত একটা বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং নিজেই সেই পরিবারের একচ্ছত্র সম্রাট। এই পরিবারটির নাম সৌরজগৎ। অন্য কোন তারকার সঙ্গে সৌরজগতের মতো কোন 'তারাজগৎ' সংযুক্ত আছে কিনা সে প্রশ্নটি এখনও বিতর্কমূলক। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। বিজ্ঞানী জেম্স্ জীনস্ (James Jeans) ও তাঁর অনুগামীদের মতানুযায়ী এক মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফলে বৃহৎ এক তারা এবং তার চূর্ণীকৃত অংশসমূহ নিয়েই সৌরজগতের উৎপত্তি। এ রকম দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটা সম্ভব। কাজেই অন্য কোন তারার সঙ্গে সংযুক্ত তারাজগতের অস্তিত্ব না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিটার ভ্যান্ ডি ক্যাম্প্ (Peter Van de Kamp) এবং তাঁর সহকর্মীরা দাবী করেছেন যে, অফিউকাস (ophiucus) মণ্ডলের অন্তর্গত 'বার্নাডের তারা' নামক তারাটির চারপাশে ঘূর্ণ্যমান দুটি উপগ্রহ আছে এবং তাদের প্রত্যেকটির আয়তন সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির আয়তনের কাছাকাছি। 'এপসাইলন অরিগি' (Epsilon Aurigae) এবং সিগমা-৬১ (Sigma-61) তারা সম্পর্কেও অনুরূপ দাবী আছে।

পৃথিবীর কোন এক স্থান থেকে খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় ২ থেকে ৩ হাজার তারা। সারা বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে যত তারা দেখতে পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা হবে সর্বাধিক ৭ থেকে ৮ হাজার। আর শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে দৃশ্যমান তারাসমূহের সর্বোচ্চ সংখ্যা বিজ্ঞানীদের মতে ১০ কোটির কাছাকাছি। আমাদের অনুভূতির সীমাবদ্ধতার দরুন সরাসরি-ভাবে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক তারা দেখা সম্ভব নয়, তা সে দূরবীন যত শক্তিশালীই হোক্। কিন্তু তাত্ত্বিক গণনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশে তারকার মোট সংখ্যা হবে ১০ হাজার কোটি।

দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মহাকাশে তারকাদের বিন্যাস বা বণ্টন সুষম। মহাকাশের ভিন্ন ভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তারাদের ঘনত্বের কিছু কিছু হেরফের থাকলেও, বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে তা মোটামুটি সমান। বিজ্ঞানীদের সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী, মহাকাশ সুষম তারা অধ্যুষিত নয়। মহাকাশের

স্থানে স্থানে তারকারা আছে জোটবদ্ধ হয়ে। কোথাও জোটছাড়া নয়। জোটের মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে তারাদের ভিড়। কিন্তু জোটের বাইরে বৃহত্তর এলাকা হচ্ছে ফাঁকা। একটা জোটের অন্তর্গত দুটো পাশাপাশি তারার মধ্যবর্তী ব্যবধান যেখানে ৪ থেকে ৫ আলোকবর্ষ (১ আলোকবর্ষ $=$ ৫৮৮ $\times$ ১০^{১০} মাইল) সেখানে দুটো পাশাপাশি তারকাজোটের ব্যবধান লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ কয়েকটি তারকাজোটের নামকরণ করেছেন তাদের আপাত আকৃতি লক্ষ্য করে। তাঁদের ভাষায় এক একটা নক্ষত্রজোটের নাম এক একটা রাশি। (একরাশ তারা থেকে কথাটার উৎপত্তি।) মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশিগুলিই হল এক একটা তারকাজোটের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তারকার শ্রেণীবিভাগ : প্রায় দু-হাজার বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী হিপারকাস্ (Hipparchus) খালি চোখে অসংখ্য তারকা পর্যবেক্ষণ করে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে তাদের মোট ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করেন এবং সর্বপ্রথমে তিনিই তারকা মানচিত্র (Stellar map) প্রস্তুত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নতমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে দেখা গেল যে, দুটো ক্রমিক শ্রেণীর তারকার ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত (২.৫১২)। এই হিসাব অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত একটা তারার ঔজ্জ্বল্য ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত একটা তারার ঔজ্জ্বল্যের প্রায় ১০০ গুণ। আধুনিক কালে আরও অনুজ্জ্বল তারাদের দেখা সম্ভব হয়েছে। এবং তারকাদের শ্রেণী বাড়তে বাড়তে ২২তম শ্রেণীতে পৌঁছেছে। আশা করা যায়, আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই এই সংখ্যা ২৮তম শ্রেণীতে পৌঁছাবে এবং তার ফলে সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের ১০^{২২} ভাগের একভাগ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন তারকাদেরও দেখা সম্ভব হবে।

তারকার ভৌতধর্ম : বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে তারকাদের আলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তারকাপৃষ্ঠ অনেকটা আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর (Perfect Black Body) ন্যায় সবরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী (Continuous Spectrum) উৎপন্ন করে। তার মাঝে মাঝে থাকে অন্ধকার রেখাসমূহ, যাদের বলা হয় ফ্রনহপার রেখা (Fraunhofer lines)। এ থেকে প্রমাণ করা গেছে যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মোট ১০৩টি মৌলিক পদার্থের সবকয়টিই তারকাপৃষ্ঠে উপস্থিত আছে।

সব তারার বর্ণালী একরকম নয়। তারার আলোর বর্ণালীসমূহকে মোট সাত ভাগে ভাগ করে তাদের যথাক্রমে O, B, A, F, G, K এবং M—এই সাতটি অক্ষর দিয়ে সূচিত করা হয়। নিচের তালিকায় এই সাতটি শ্রেণীর বর্ণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

TABLE—1

বর্ণালী শ্রেণী	তারকার বর্ণ	শ্রেণীভুক্ত তারকার নাম	তারকার ভর সৌরভর এককে	তাপমাত্রা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড
O	গাঢ় নীল	থিটা অরিয়নিস্	৪০	৩৫,০০০
B	ফিকে নীল	চিত্রা	১৫	২০,০০০
A	সাদা	সিরিয়াস্	২.৩	৯,৫০০
F	সবুজ	প্রকিয়ন	১.৪	৭,০০০
G	হলুদ	সূর্য	১.০	৫,৮০০
K	কমলা	সিগ্মা এরিদানি	০.৭	৪,৫০০
M	লাল	ক্রুগের	০.৩	৩,৫০০

কোন তারার রং নির্ভর করে তার উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রার উপর। বিন্‌সের অপসরণ সূত্র (Wine's Displacement Law) থেকে এ সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, তারকাদের রাসায়নিক উপাদানের তারতম্যই হচ্ছে বর্ণালীর প্রকারভেদের কারণ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা, পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, তারকাদের রাসায়নিক উপাদান মোটামুটি এক। উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যই তাদের বর্ণালীর প্রকারভেদের কারণ।

বিজ্ঞানী সাহা প্রদত্ত আয়নীভবন তত্ত্বের (Theory of Ionisation) সাহায্যে অসংখ্য তারকাপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

কোন তারার উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয়ের পর H. N. Russel এবং তাঁর সহকারীবৃন্দের দেওয়া সূত্রের সাহায্যে তারকার উপাদানসমূহের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। অধিকাংশ তারকায় উপস্থিত পদার্থের শতকরা ৮০ ভাগই হাইড্রোজেন, শতকরা ১৯.৬ ভাগ হিলিয়াম, আর বাকী শতকরা ০.৪ ভাগ হচ্ছে অন্যান্য উপাদানসমূহ।

বেশির ভাগ তারার ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের ১০ ভাগের একভাগ থেকে শুরু করে, সূর্যের ব্যাসার্ধের ২০ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের বলা হয় ক্ষুদে তারা বা বামন (Dwarf)। নিঃসন্দেহে আমাদের সূর্য একটা বামন পর্যায়ের তারা। যে-সব তারার ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের ৫০ গুণ থেকে শুরু করে ১০০ গুণ, তাদের বলে বৃহৎ তারা (Giants), যেমন—ক্যাপেলা (Capella)। আর যে-সব তারার ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের ২০০ গুণ কিংবা তারও বেশি, তাদের বলে অতি বৃহৎ তারা (Super giants), উদাহরণ—ব্যাটেল্‌গুজ্‌ (Betelguse)।

যে তারার ভর যত বেশি, তার উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং তার ঔজ্জ্বল্যও তত বেশি। সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা যুক্ত O-শ্রেণীভুক্ত এক একটা তারকার ভর, সূর্যের ভরের প্রায় ৫০ গুণ।

পক্ষান্তরে, শীতলতম M-শ্রেণীভুক্ত তারাদের ভর, সূর্যের ভরের ১০ ভাগের এক ভাগ। তারকাদের গড় ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ১০ কিলোগ্রাম থেকে প্রতি ঘনমিটারে ৫০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

তারকার জন্ম-মৃত্যু: বিশ্বের অধিকাংশ বস্তুরই যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তারকাদেরও তেমনি জন্ম ও মৃত্যু আছে। তারকাগুলির মধ্যবর্তী স্থানে মহাকাশ জুড়ে ভেসে আছে পদার্থের এক অতি সূক্ষ্ম, হালকা বায়বীয় সত্তা। এর নাম আন্তর্নক্ষত্র বস্তু (Interstellar matter)। সূর্যের ভরের একহাজার গুণ বা তার বেশি ভরসম্পন্ন হলে, এই আন্তর্নক্ষত্র বস্তু আপন মহাকর্ষীয় আকর্ষণে ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে। তখন সঙ্কোচনের দরুন তার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। একসময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেই মেঘসদৃশ বস্তু কতকগুলি খণ্ডে চূর্ণীকৃত হয়। জন্ম নেয় কতকগুলি তারকা। সেই তারাদের প্রত্যেকের সঙ্কোচন তখনও অব্যাহত থাকার ফলে এত প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয় যে, তারা প্রত্যেকেই আলোকবিকিরণ-ক্ষমতাসম্পন্ন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়। তাদের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যখন এক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশি হয়, তখন শুরু হয়ে যায় কেন্দ্রীণ সংযোজন বিক্রিয়া (Nuclear fusion reaction)। এর ফলে চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু একত্রিত হয়ে উৎপন্ন করে এক একটা হিলিয়াম পরমাণু এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি, যার সাহায্যে তারকারা কয়েক কোটি বছর ধরে তাপ

ও আলোক বিকিরণে সক্ষম থাকতে পারে। এ অবস্থায় তারকাদের ব্যাসার্ধ থাকে অল্প। শতকরা নব্বই ভাগ তারকাই এই বামন পর্যায়ের অন্তর্গত।

এরপর, তারকাকেন্দ্রের সমস্ত হাইড্রোজেন যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাদের কেন্দ্রভাগ সংকুচিত হতে থাকলেও, বহির্ভাগ স্ফীত হতে থাকে এবং তাদের উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং ঔজ্জ্বল্যও হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে জন্ম নেয় বৃহৎ বা অতি বৃহৎ তারা। এদের আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত কম। অন্তর্ভাগের সংকোচন ও বহির্ভাগের প্রসারণ প্রক্রিয়াটি আরও কিছুকাল চলার পর অতি বৃহৎ তারকার বিস্ফারণ হয়। বহির্ভাগের পদার্থসমূহ চূর্ণীকৃত হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্নক্ষত্র পদার্থ হিসাবে। অবশিষ্ট কেন্দ্রভাগটির দশা আয়তনের তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হতে পারে :

(১) মূল তারকাটির ভর, সৌরভরের দ্বিগুণ বা তার কাছাকাছি পর্যন্ত হলে, বিস্ফোরণের পর অবশিষ্ট কেন্দ্রভাগটি হবে সৌরভরের ০'১২ গুণ ভরসম্পন্ন একটা ক্ষুদে তারা। আভ্যন্তরীণ জ্বালানী নিঃশেষিত হওয়ায় তারকাটি ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকবে। তার রং সাদা থেকে হলুদ, হলুদ থেকে লাল, এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে এক সময় কালোতে পরিণত হবে। তখন আর তার আলো বিকিরণের কোন ক্ষমতাই থাকবে না। হয়তো বা সেটা পরিণত হবে কোন গ্রহ, উপগ্রহ অথবা উল্কা পিণ্ডে।

(২) যদি মূল তারকাটির ভর সৌরভরের পাঁচগুণের কাছাকাছি হয়, তবে বিস্ফোরণের পর তার ভর হবে সৌরভরের প্রায় দ্বিগুণ। অথচ তার ব্যাসার্ধ হবে খুব কম (১০ কিলোমিটারের কাছাকাছি)। ফলে জন্ম নেবে অতি উচ্চ ঘনত্বসম্পন্ন নিউট্রন তারকা (Neutron star)। নিউট্রন তারাদের চারপাশে সৃষ্টি হয় অতি উচ্চ প্রাবল্য ($১০^{১২}$ গাউস্)-সম্পন্ন শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। যদি তাদের চৌম্বক অক্ষ (Magnetic axis) ঘূর্ণন অক্ষের (Axis of rotation) সঙ্গে আনত থাকে, তবে তারাগুলি থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ঝলকে ঝলকে শক্তি নির্গত হতে থাকবে অদৃশ্য তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে। এরকম তারকার বৈজ্ঞানিক নাম পালসার (Pulser)।

(৩) যদি মূল তারকার ভর, সৌরভরের ৫ গুণের বেশি হয়, তবে বিস্ফোরণের ধাক্কা এত প্রবল হয় যে, কেন্দ্রভাগটির সংকোচন চলতে থাকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত। কেন্দ্রটির ব্যাসার্ধ যত কমে, তার উপরিপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষীয় ত্বরণ তত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শেষে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, উপরিপৃষ্ঠের তীব্র আকর্ষণের দরুন এমনকি ফোটনের আকারেও কোন শক্তি তা থেকে নির্গত হতে পারে না। এরূপ বস্তুর নাম কৃষ্ণ গহ্বর (Black hole)। যে কোন বস্তু তার দিকে অগ্রসর হলেই প্রবল মাধ্যাকর্ষীয় আকর্ষণের দরুন তা কৃষ্ণ গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে চিরকালের মতো।

পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দিরে শক্তিশালী দূরবীনে চোখ লাগিয়ে রাতের পর রাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ আছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল। তারকারাজ্যের অনেক রহস্য আজও জানা বাকি। যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌঁছুতে পারে। নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হবে আবার। নক্ষত্রমালার অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হলে, ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যও হয়তো আরও জানা যাবে।

আকাশ ও আনন্দ

'বৈভব'

আকাশে আনন্দধারা না থাকিত যদি
কোথা হতে এত প্রাণ আসে নিরবধি ?
আকাশ স্পন্দনে জাগে আলোকের ঢেউ !
আকাশের বায়ু বিনা বাঁচিত কি কেউ ?

অসীম আকাশ ওই উদার বিস্তার
কোন পারাপার নাই নভোনীলিমার।
শ্রান্ত মন শান্ত হয়ে ফিরে আসে শেষে
কী জানি কি পায় সেথা অনন্তের দেশে !

সত্য জ্ঞান আনন্দের কী মৌন প্রতীক !
অমূর্ত সে মূর্ত তবু, পূর্ণ চারিদিক !
অন্তরে বাহিরে আছ পরিপূর্ণ করি
প্রলয় প্লাবন সম আছ সব ভরি !
হৃদয় আকাশ কেন বাজে গুরুগুরু ?
আনন্দের আতিশয্যে কাঁপে দুরু দুরু !

অভেদ-শরণ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পুরস্কার-ভূষিতা,
রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিতা বর্ষীয়সী লেখিকা।

পরমের বাণীময় সাধনার ধন।
বিষণ্ন বিশ্বের মনে পরশ রতন।
রামকৃষ্ণময় উদ্বোধন।
সর্বাঙ্গে প্রণতি মাথা পত্রে পত্রে পরমের নাম।
বুকে ভরা রূপহীন রূপময় বাণী অভিরাম।
দেহময় দেহাতীত 'কথা' বিশ্বরূপ।
জীবন-শরণ ধন নরনারায়ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ন !
বিশ্বের আশ্বাস মূর্তি রামকৃষ্ণ-উদ্বোধন অভেদ-শরণ!

সত্য

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এন্টামোল্যাজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক,—কবি ও প্রাবন্ধিক।

কোথায় সত্যের দেশ ?
সে কি সত্যেই শুধু শেষ ?
প্রথম শর্তই সাম্য, এবং সংযম আছে যার,
পরশ্রীতে কাতর যে নয়,
যে চরিত্রে মিশে থাকে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা
ও বিনয়,
ত্যাগ হয় ভূষণ সুন্দর,
অদোষদর্শী যার মহান অন্তর
জীবনের ধ্যান করে,
মর্যাদাবোধ নয় এতটুকু কম,
ধৈর্য দয়া অহিংসা
যে ব্যক্তিত্ব করে মনোরম,

এ সবেরি সমাহার কোন প্রাণে হয় যদি তবে,
সত্য তখন সত্য হবে।

সমতা

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত রবীন্দ্র-অধ্যাপক—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক। যশস্বী সাহিত্যসেবী ও কবি।

কী চাই চূড়ান্ত তবে ?—প্রভানন্দ ?—উষার আকাশ ?
এ কোন্ প্রার্থনা ?—এর বেশি-আর কী আছে চাইবার ?
নানা হাওয়া আছড়ায়, ছুঁয়ে যায় হিম ও উত্তাপ।
তাতেই মথিত মন। শান্তি তার নয় পরিণাম

শান্তির সাদৃশ্য যেন শীতের দুপুরে নীলাকাশ—
গভীর নিথর নীল—তাতেই নিয়ত ভাসমান !
সুখ নয়, দুঃখ নয়,—যেন নিত্য শুদ্ধ হরিদ্বার,
বহতা গঙ্গার ধারা স্বচ্ছতোয়া অনন্ত অবাধ।

'সময়' ছিন্নতা মাত্র ; 'দেশ' শুধু খণ্ড ও বিভাগ ;
'কারণ' কুটিল গ্রন্থি। দেশ-কাল-নিমিত্তে নিবাস—
সে নয় শান্তির স্বর্গ। শান্তি নয় উত্থান-পতন,—
নয় দীপ্ত অভ্যুদয়—ঘটে যার নিশ্চিত বিনাশ।

যা চাই তা নয় কোন আদি-মধ্য-অন্ত চিহ্নে গতি,
সে শুধু প্রসন্ন বোধ,—সাক্ষী-ভাব,—সমতা পদ্ধতি।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

নেহেরু-পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ সাহিত্যসেবী। কলিকাতা সিটি কলেজের বঙ্গ-ভাষার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক।

রামকৃষ্ণ বলেছেন : সে এক অখণ্ড লোক থেকে এসেছে নরেন—
দিব্যচক্ষে দেখেছেন নিজে, আমরা করি না অবিশ্বাস ;
দেবাধিক এক আত্মা জন্ম নিল ভুবনেশ্বরীর গর্ভে শিবশক্তিরূপে ;
তারপর শুভক্ষণে গুরুস্পর্শে রোমাঞ্চিত হল দিব্যদেহ :
    সূর্যলোকে সমুন্নত শির,
    শক্তিদৃপ্ত দুইবাহু প্রসারিত প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য ঘিরিয়া,
    ধ্যানায়ত বিশাল নয়নে লোকাতীত আশ্চর্য সুষমা,

প্রশস্ত বক্ষের তলে মহাব্রতে জ্বলে হোমশিখা :
একাধারে বুদ্ধ ও শঙ্কর, খ্রীষ্ট ও চৈতন্য, সক্রেটিস যাজ্ঞবল্ক্য—
প্রেমে স্নিগ্ধ, ধ্যানে সুগভীর, তেজে বহ্নিমান, আনন্দস্বরূপ।

হে বিশ্ববিবেক,
মেহনতী শোষিতের মৌলশক্তি শোনাইলে বিপ্লবী বাণীতে :
একমুঠা ছাতু খেয়ে দুনিয়া সে উল্‌টে দিতে পারে,
জানাইলে অন্নব্রহ্মবাণী : খালি পেটে ধর্ম হয় নাকো—
ধর্ম কভু নয় দুর্বলতা, শুভশক্তি নিত্যজাগরণ, আর
আত্মজ্ঞানে জীবসেবা ঈশ্বরোপাসনা।
শোনাইলে প্রাচ্যবাণী : এ জীবন নয় দ্বন্দ্ব নয়কো সংঘাত সাংঘাতিক,
দ্বন্দ্ব ব্যর্থ—মিলনেই পরমার্থ তার ;
মহাধাত্রী প্রকৃতিই নিখিল সৃষ্টিকে হাতে ধরে ধরে
উত্থানে পতনে নিয়ে চলেছেন শেষলক্ষ্য অভিমুখে।

বহুরূপ সত্তা তব নিখিলের বরেণ্য বিস্ময় :
উদাত্ত সুকণ্ঠ তুমি সঙ্গীতসাধক ;
বাগ্‌দেবীর বরপুত্র, বাগ্মী সুপুরুষ ;
প্রচারক কর্মবীর—রামকৃষ্ণসংঘ সংগঠক, মহাধ্যানী ;
কবি শিল্পী : বীরবাণী লেখাচিত্র বেলুড় মন্দিরে পরিচয়,
বহুমুখী ভাব-ভাষা অন্তরের উচ্চ অধিকার,
বিবেকীমনন তীক্ষ্ণ বিদ্যুদ্বিচ্ছুরণ,
প্রসারিত বক্ষে দৃঢ়বদ্ধবাহু মহাভারতের নবীন নায়ক।

বীরেশ্বর, আমাদের এ জীবনে মূর্ত হক তোমার প্রার্থনা :
জগদম্বা! আমায় মানুষ কর,
কাপুরুষতা দূর কর—দূর কর পরানুকরণ এ হীনম্মন্যতা,
আত্মশক্তি হক উদ্বোধিত—
এ জীবন হয় যেন দিব্য জাগরণ।

হে পরিব্রাজক, হে বীর সন্ন্যাসী চিরযুবা!
তুমি চলে গেছ শিবশক্তিধাম,
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জুড়ি কোটিকণ্ঠে ক্রমোদ্গীত তব প্রিয়নাম।
শিব থেকে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে ষড়যন্ত্রী যত যুদ্ধবাজ,
তাই তোমার বলিষ্ঠ মূর্তি প্রতিষ্ঠার গুরুতর প্রয়োজন আজ।

পূজাগন্ধ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

উদ্বোধন পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক,—আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

রজনীগন্ধার গন্ধ, আরো কিছু ফুলের সৌরভ
ধূপগন্ধ সনে মিলি, যাত্রা করে পূজাবেদী হতে
দেবতার আশীর্বাদ, মাখা আছে অঙ্গে তাহাদের
অটুট মিতালি সূত্রে, পরস্পর বাঁধা এক ব্রতে।

দেবতারে প্রসারিব— এই ব্রত, হৃদয় কামনা
মোহনিদ্রাগত যারা আচম্বিতে উঠিবে জাগিয়া
যে একতা রহে স্থির অগণন ভেদের গভীরে
তাহারে টানিয়া আনি মিলাইব পূজাস্পর্শ দিয়া।

স্বচ্ছন্দ পাখির মতো, তাই তারা উঠিছে উপরে
যে পথ ধরিয়া যায়, অপূর্ব সুবাসে দেয় ভরি
নৃত্যছন্দে মাতোয়ারা বিতরিছে ভক্তির বৈভব
অনন্ত আকাশে ছায় গন্ধরূপে দেবতা-মাধুরী।

যে আনন্দ রুদ্ধ ছিল, মন্দিরের মৃদু অন্ধকারে
কুসুম-সৌরভ মাখি ধূপগন্ধে তনু আচ্ছাদিয়া
আজি তাহা ছুটিয়াছে, মহাবিশ্বে নিজেরে বিলাতে
সব বাধা যায় টুটি, ধ্রুব মুক্তি আসিছে নামিয়া।

দূর দূরান্তরে ধায়, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র মণ্ডলে
ছায়াপথ অতিক্রমে, তবু নাহি গতির বিরাম
স্নিগ্ধ ধূপ-পুষ্পগন্ধে ভরি যায় সীমাহীন নভ
অনন্ত আকাশ যেন সুনির্মল চিদানন্দ ধাম।

ঊর্ধ্ব হতে অবতরি যোগ দেয় বাতাস-প্রবাহে
পর্বতচূড়ায় লাগে ব্যাপ্ত হয় বনানী-প্রান্তরে
সাগর তরঙ্গে নাচে সুরভিত করে নদীজল
তরুলতা সহ খেলে ছুটি চলে শস্যক্ষেত্র 'পরে

জীবজন্তু বিহঙ্গম রিক্ত নয় দেবগন্ধে কেহ
ছোট বড় নানারূপ মনোরম অথবা ভীষণ
এক বিশ্বপ্রাণে গাঁথা এক শক্তি সবারে কাঁপায়
জলে স্থলে এক লীলা এক মহা প্রেমের মিলন।

অবশেষে পূজাগন্ধ পশে গিয়া গূঢ় অন্তর্দেশে
চৈতন্যের ধ্রুব জ্যোতি উদ্ভাসিত ভিতরে বাহিরে
শোক-মোহ-ভয়হীন রাজে শান্তি অনির্বচনীয়
পরম চরম সত্য সদা জাগে মানব-শরীরে।

তপস্যার ফল

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

খ্যাতিমান কবি—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ কালচারের সঙ্গে যুক্ত।

প্রশান্ত মহাসাগরের বহু নাম না জানা দ্বীপে
কল্পনায় ঘুরে বেড়িয়েছি।
সাহারা মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা আজও—
আমাকে হাতছানি দেয়।
উত্তর মেরুর বরফে হাঁটি মনে মনে
পৃথিবীকে দেখি এভারেস্টের চূড়া থেকে।
দিল্লীর কুতুবমিনারে উঠে মনে হয়েছে
কোথাও মানুষ নেই।
মাউণ্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের নিস্তব্ধতা
অজন্তা ইলোরার প্রাচীন অতীত,
কন্যাকুমারীর তিন কন্যার কেশরাশি
মনে পড়ে, সবই মনে পড়ে।
কাশ্মীরের উপত্যকায় আমি হেঁটে বেড়িয়েছি
পহলগামের 'লীডার' আজও আমাকে গান শোনায়।

সারা ভারত ঘুরে ঘুরে, অবশেষে
হৃষীকেশের এক সাধুর পর্ণকুটিরে গিয়ে নিজের দেখা পেলাম
চল্লিশ বছর গুহার মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে যে মানুষ
আশ্চর্য তার সজীবতা।
জিজ্ঞেস করলাম—'কেন এখানে পড়ে আছেন,
নিজের মুক্তির জন্যে ?'
মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন :
'আমার মতো হাজার হাজার সাধু
হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় যুগ যুগ ধরে তপস্যা করছে ;
কে বলতে পারে তাদেরই তপস্যার ফলে
পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দিন পিছিয়ে যাচ্ছে না!'

উপলব্ধি

শ্রীসুনীল বসু

খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক—'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে
আমার কথা হচ্ছিল
অনেক কথার মধ্যে উনি একটা দামী কথা বললেন,
বললেন, তাঁর অঙ্গুলী হেলন ছাড়া
গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না,
আপনার কি মনে হয়

তখনই ঠিক নয়, অনেক কথাই মনে হয়েছিল পরে
অনেক অনেক অনেক কথা
অনেক চিন্তায় আমি হারিয়ে গিয়েছি
আজও হারাই
একটি মন্তব্যের কি নিদারুণ শক্তি
বুক কাঁপানো উপলব্ধি

অনেক দিন আগে একজন ট্যাক্সিওয়ালা, খুব সম্ভব
জাতিতে শিখ,
আমার খুবই এক সংশয়ের বিপদের দিনে বলেছিল
বাবুজী, দুর্গা মাই-কা নাম লিজিয়ে
কোই কষ্ট না হো…

কত তরঙ্গ যায়—সব সময়ই জলতরঙ্গ নয়—সবই
উত্থান নয়, কত পতনের মুখোমুখি
আমি সেই অনির্বচন দুর্গার-ই নাম স্মরণ করি
কেমন একটা উত্তাল শক্তি খেলে যায়

মাগো এই কি উপলব্ধি?

সমর্পণ

শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিতা উত্তরপ্রদেশের স্বনামধন্যা কবি,—প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষা। তাঁর পুরস্কৃত বিখ্যাত কাব্যসংকলন "যামা" থেকে 'নীহার' কাব্যের একটি কবিতাকে অনুবাদ করেছেন বিশ্বভারতীর বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রামবহাল তেওয়ারী। মূল হিন্দী কবিতাটিও এখানে মুদ্রিত হল।

যে চরণে নিবেদিত দেবগণ অমরার লোক,
নখ-চন্দ্র স্নিগ্ধকান্তি লজ্জা দিত এ নক্ষত্রালোক;
রবি-শশী নিবেদিত যার তরে স্ব-আভা স্ব-রাজ;
যে চরণে যায় গড়াগড়ি,—সব সুখ-শোভা-সাজ!
যার রজ ধৌত করে মেঘ তার মুক্তাসম নীরে,
যার ছবি এঁকে নেয় নভ তার অন্তস্তল চিরে;
ইচ্ছার অসীম পীড়া; ঝাঁঝরা জীবনে ভরে তারে—
বেদনার দীপ জ্বেলে পহুঁছিনু সে মন্দির দ্বারে!
এ-জীবন কী-ই বা দেবে অর্ঘ্য, মম শূন্যে ভরা-ভব!
বেহুঁশ সঁপিনু তাঁরে জীবনের মোর পরাভব!
মধুস্নিগ্ধ-হাস্যোচ্ছল নন্দন-কানন পুষ্পমাঝে
শুভ্রোজ্জ্বল হীরাসম মোর ভ্রান্তিখানি যে বিরাজে।

জিন চরণোঁ পর দেব লুটাতে থে অপনে অমরোঁ কে লোক,
নখচন্দ্রোঁ কী কান্তি লজাতি—থী নক্ষত্রোঁ কে আলোক;
রবিশশি জিন পর চঢ়া রহে থে অপনী আভা অপনা রাজ;
জিন চরণোঁ পর লোট রহে থে সারে সুখ সুষমা কে সাজ!
জিনকী রজ ধো-ধো জাতা থা মেঘোঁ কা মোতী-সা নীর,
জিনকী ছবি অঙ্কিত কর লেতা নভ অপনা অন্তস্তল চীর;
মৈঁ ভী ভর ঝীনে জীবন মেঁ ইচ্ছাওঁ কে ক্রন্দন অপার,
জলা বেদনাওঁ কে দীপক আঈ উস মন্দির কে দ্বার!
ক্যা দেতা মেরা সূনাপন উনকে চরণোঁ কো উপহার?
বেসুধ সী মৈঁ ধর আঈ উনপর অপনে জীবন কী হার!
মধুমাতে হো বিহঁস রহে থে জো নন্দন-কানন কে ফুল,
হীরক বস কর চমক গঈ উনকে অঞ্চল মেঁ মেরী ভূল!

[যামা : নীহার—৪২]



ভক্ত কবি ভন্ (Vaughan)

ডক্টর যোগীরাজ বসু

প্রয়াত লেখক গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ,—পশ্চিম জার্মানির গোত্তিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব পরিদর্শক অধ্যাপক।

নামের বানানে লেখকের স্ব-ইচ্ছাকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ডান্ (Donne), হার্বার্ট (Herbert), ক্র্যাশ' (Crashaw), ভন্, মার্ভেল (Marvell) প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম আমরা ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে পাই। এঁদের সকলকে ভক্ত কবি বলা হয়। এঁদের মধ্যে আবার হার্বার্ট, ক্র্যাশ', ভন্, মার্ভেল প্রভৃতি যুগপৎ ভক্ত ও মরমিয়া (Mystic) কবি। এই মরমিয়া বা স্বানুভূতি-সিদ্ধ কবিদের মধ্যমণি হচ্ছেন ভন্। গভীর ঐশী অনুভূতি, প্রিয়তম পরমেশের জন্য তীব্র আকূতি ভনের কবিতায় অভিব্যক্ত। মরমিয়াতত্ত্ব বা mysticism সম্বন্ধে ভূমিকারূপে দুই একটি কথা বলে আমরা ভনের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

সাধারণ লোক অনেকে যে কোন ধোঁয়াটে অস্পষ্ট রহস্যময় ভাবকে মিস্টিক ভাব বলে মনে করে, কিন্তু সে ধারণা ভুল। মিস্টিসিজম্ (Mysticism) শব্দটিকে বাংলায় স্বানুভূতি বা ঐশী অনুভূতি বা মরমিয়া অনুভূতি বলা যায়। আজকাল মরমিয়া অনুভূতি শব্দটিই প্রচলিত। যে কোন প্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা রহস্যময় ঘটনাকে মিস্টিক আখ্যা দেওয়া চলে না। মরমিয়া অনুভূতি কোন মতবাদ বা কল্পনাবিলাস নয়, একটি বিশেষ অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী, নিজস্ব উপলব্ধি। অনৈক্যের মাঝে ঐক্যের অনুভূতি, সসীমের বুকে অসীমের অনুভূতির, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভেদ উপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অনুভূতিসিদ্ধ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হল মরমিয়া বা ঐশী অনুভূতি। এই অনুভূতির উৎস হল আমাদের মনবুদ্ধির অগোচর—যুক্তিরাজ্যের গণ্ডীবহির্ভূত এক অনির্বচনীয় তীব্র আকূতি, সেই চিরসুন্দর চিরঈপ্সিত দয়িতকে, প্রাণপ্রভুকে পাবার জন্য। গীতায় শ্রীভগবানের বাণী,—

> সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
> অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্ত্বিকম্ ॥
> (১৮।২০)

—অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা, বহুরূপে বিভক্ত খণ্ড খণ্ড পদার্থরাজির মধ্যে, এক অবিভক্ত অক্ষর পরমাত্মার উপলব্ধি বা দর্শন হয়, সেই অদ্বৈত জ্ঞানকে সাত্ত্বিকজ্ঞান বলে। বহুর মধ্যে, নানার মধ্যে একের এই অনুভূতিই হল মরমিয়া অনুভূতি। এই অনুভূতিই মরমিয়াতত্ত্বের প্রাণকেন্দ্র। এই পৃথিবীতে দেহে অবস্থান কালেই ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে, ভগবৎপ্রেমের বলে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে সাধক বা কবি যে অসীম অনন্ত পরমাত্মার অনুভূতি লাভ করেন, সীমার বুকে অসীমের এই ক্ষণিক বা স্থায়ী অনুভূতিই মরমিয়া অনুভূতি। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময়ে মরমিয়া সাধক ও কবিকুলের আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁরা মরমিয়া সাধক, আর যাঁরা কাব্যে এই অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা মরমিয়া কবি। মরমিয়া কবিগণ ছন্দের মাধ্যমে সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি, এবং অসীম-সসীমের মিলনের গান গেয়ে গেছেন। এই আলোচনা থেকে সহজেই এই কথা বোঝা যায় যে, মরমিয়া কবি মাত্রই ভক্ত কবি, কিন্তু ভক্ত কবি মাত্রই মরমিয়া কবি নয়। ভগবানের জন্য অনুরাগ, আকুলিবিকুলি,

আকৃতি থাকলেও মরমিয়া উপলব্ধি যার জীবনে ঘটেনি ও কাব্যে প্রকাশ পায়নি সে ভক্ত কবি কিন্তু মরমিয়া কবি নয়। ইংলণ্ডে ভন্, ক্র্যাশ', হার্বার্ট, মারভেল্, টম্‌সন্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন্ প্রভৃতি মরমিয়া কবির সম্প্রদায়ভুক্ত।

ভনের ঐশী অনুভূতির মাধ্যম হল প্রকৃতি। রূপরসগন্ধভরা প্রকৃতির মাধ্যমে তিনি মরমিয়া-তত্ত্ব উপলব্ধি করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মরমিয়া কবিদের এক একজনের মরমিয়া অনুভূতি-প্রকাশের এক একটি বিশিষ্ট ধারা বা রং আছে। কবি ক্র্যাশের অনুভূতির রং রক্তগোলাপের মতো টকটকে লাল; কবি মারভেলের অনুভূতির রং সবুজ; এইজন্য তাঁকে বাগানের কবি (Garden poet) বলা হয়। সবুজ পৃথিবীর সবুজ বর্ণের মাধ্যমে তাঁর ঐশী অনুভূতি জাগ্রত হয়। ভনের চিত্তে শ্বেতবর্ণের বিশেষ আবেদন; তাঁর ঐশী অনুভূতির মাধ্যম শুচিশুভ্র জ্যোতি,—তাঁর ভাষায় 'White celestial ray'. তাঁর কবিতারাজিতে আলো ও অন্ধকার 'Light and night', 'দিবা ও রাত্রি'র বৈপরীত্য বার বার দেখা যায়। ভনের মতে এই শ্বেতিমা বা শুভ্রবর্ণ হচ্ছে পবিত্রতার, শুচিতার, সাত্ত্বিকতার প্রতীক। তিনি 'আলো' কথাটি পরমেশের প্রতীকরূপে এবং 'অন্ধকার' শব্দটি অজ্ঞানের প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন।

কবিবর ভন্ প্রকৃতিকে ভগবানের সুন্দর পরিচ্ছদ অর্থাৎ অসীম সৌন্দর্যের সসীম প্রকাশ-রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন প্রাকৃতিক পদার্থকেই তুচ্ছ বা অসার ভাবা উচিত নয়; এমনকি গাছপালা, পাখী পতঙ্গ, একটি জীর্ণ ফুল পর্যন্ত এরূপ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে পূর্ণ যার প্রভাব মানবজীবনে সমধিক। প্রপঞ্চের প্রতিটি নিসর্গ পদার্থ আমাদের করুণাময় স্রষ্টিকর্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; প্রকৃতি হল সেই চিরসুন্দরের দূত, তাঁর প্রেমের জীবন্ত লিপি। ভনের মতে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি এক একটি আধ্যাত্মিক পদ্ধতির স্মারক। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির এই গভীর সম্বন্ধ ব্যক্ত করা তাঁর কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ আমরা তাঁর 'Constellation,' 'Cock-crowing', 'The Lamp', প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা তুলে ধরতে পারি। 'Constellation' বা নক্ষত্র-পুঞ্জ শীর্ষক কবিতাটিতে তিনি বলেছেন,—গ্রহ, উপগ্রহ, রাশিচক্রের নিয়মানুবর্তী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গতি আমাদের আজ্ঞানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও শুচিতার শিক্ষাদান করে ও ঈশ্বরের দিকে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থই মানুষকে নীতি-শিক্ষা দিতে পারে। তাঁর 'Cock-crowing' বা 'মোরগের ডাক' নামক কবিতায় দেখা যায়,—বুদ্ধিসম্পন্ন অনুভূতিশীল শিক্ষিত মানব গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে বলে উষার আগমনী অর্থাৎ প্রতিদিন প্রভাতে পৃথিবীর বুকে আলোর প্রথম অবতরণ টের পায় না অথচ অশিক্ষিত বুদ্ধিশক্তিহীন মোরগ কি করে তা টের পায়;—সৃষ্টির ঊর্ধ্ব-স্তরের জীব মানুষ নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে অথচ অশিক্ষিত পাখী একটি, সজাগভাবে আলোর আশায় উষার আগমনের প্রতীক্ষা করে,—এই চিন্তা কবির মনে গভীর দোলা দিয়েছে। তিনি এখানে ভোরে অন্ধকার নাশ করে আলোর আগমনকে মানুষের অজ্ঞানরূপ তমসার অবসানে ভগবানের আবির্ভাবের রূপকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি পাখী যেমন সজাগভাবে আলোর প্রতীক্ষা করে, মানুষের উচিত ততোধিক আগ্রহ ও ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রিয়তম মঙ্গলময়ের আগমনের প্রতীক্ষা করা। তিনি বলছেন,—

'If such a tincture such a touch
So firm a longing in power,

Shall Thy own image think it much
To watch for Thy appearing hour ?'

—অর্থাৎ হে পরমেশ! যদি তোমার সৃষ্ট বর্ণ (রং) ও তোমার স্পর্শ একটি পাখীর প্রাণে এরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা (আলোকের স্পৃহা) সঞ্চারিত করতে পারে, তবে তোমারই প্রতিকৃতি-রূপে সৃষ্ট মানুষের তোমার আবির্ভাবলগ্নের জন্য সজাগ প্রতীক্ষায় থাকা কি উচিত নয়? Tincture শব্দের তদানীন্তন ইংরেজী ভাষায় অর্থ ছিল tint অর্থাৎ রং, পাখীটির রং ভগবানের সৃষ্টি করা এবং পাখীতে তাঁর কল্যাণস্পর্শও আছে, কিন্তু পাখী মানুষের মতন পরমেশের প্রতিকৃতি (image) নয়।

তাঁরই টেবিলে গভীর নিশীথে জলন্ত মোমবাতিকে লক্ষ্য করে কবিবর 'The Lamp' নাম দিয়ে যে কবিতাটি লিখেছেন সেটি কল্পনার ইন্দ্রজালে, ভাবসম্পদে অপরূপ হয়ে উঠেছে। মধ্যরাত্রির ঘোর অন্ধকারের মাঝে জলন্ত বাতিটি কবির কাছে মানবাত্মার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়েছে। মোমবাতিটিকে যেমন গাঢ় অন্ধকার ঘিরে রয়েছে, মানবাত্মাকেও তেমন মৃত্যুর ভয় ও অজ্ঞানরূপ আঁধার আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অন্ধকার বাতিটির আলোককে আচ্ছন্ন করতে পারছে না, বরং তার আলোর প্রভায় অন্ধকার দূরে রয়েছে। তাই জলন্ত মোমবাতিটি অজ্ঞাননাশকারী ভগবদ্ভক্তির প্রতীক; বাতিটিকে লক্ষ্য করে কবি বলছেন,—

'But still thou dost outgo me, I can see
Met in thy flames all acts of piety;
Thy light is charity, thy heat is zeal;
And thy aspiring active fires reveal
Devotion still on wing.'

বলছেন,—'হে দীপশিখা (যদিও আমি তোমার মতো ভগবদ্ভক্তির সাধনায় রত) তবুও তুমি আমাকে এ-বিষয়ে ছাড়িয়ে গেছ। আমি দেখতে পাচ্ছি,—তোমার শিখায় সকল সদাচারের মিলন ঘটেছে; তোমার আলোক হচ্ছে পরহিতব্রত; তোমার উত্তাপ হল দীপ্ত অনুরাগ, উৎসাহ। তোমার ঊর্ধ্বমুখী দীপ্তি ভগবন্মুখী ভক্তির ঊর্ধ্বগতির প্রতীক।' জলন্ত বাতিটির মুখ থেকে গলিত মোমের বিন্দুগুলি প্রিয়তমের দর্শনের জন্য ব্যাকুল ভক্তের অশ্রুবিন্দুর প্রতীক। কি অপূর্ব কবিকল্পনা! কি গভীর অনুভূতি!

ভন্ এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের উপলব্ধির মাধ্যমরূপে দেখেছেন; তাই তাঁর মতে পৃথিবীর প্রতি পদার্থে ঐশী সত্তা অনুস্যূত! পৃথিবীতে জন্ম নেবার আগে আমরা সকলেই সেই প্রিয়তম পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম ছিলাম। তাই তিনিই আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রেমিক,—ভনের ভাষায়, 'Our first Love'. প্রাকৃতিক পদার্থের মাধ্যমে সেই প্রথম প্রেমিকের, প্রিয়তমের আহ্বান সতত আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায় ও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা তাঁর কাছ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছি; 'Our first Love from whom we did swerve,' এই পৃথিবী শুধু ধুলোমাটির স্তূপ নয়; কারণ এই মাটির পৃথিবীতেই সেই চির-ঈপ্সিত প্রিয়তমের প্রেমের ফুল ফোটে। গভীর আবেগে তাঁর 'The Revival' শীর্ষক কবিতায় কবি গেয়েছেন,—

'And here in dust and dirt,—O here,
The lilies of His love appear!'

—'এই ধরার ধূলিতেই, এখানেই তাঁর প্রেমের ফুল ফোটে।'

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে ভনই হচ্ছেন প্রথম কবি যিনি শিশুর (শৈশবের) পবিত্রতার, অমরত্বের ও মাধুর্যের জয়গান গেয়েছেন। শৈশব নিয়ে রচিত 'The Childhood' ও 'The Retreat' নামক কবিতা দুটি ভনকে অমর করে

রেখেছে। এই কবিতা দুটির বিষয়বস্তু হল এই: শিশু হল চিরপবিত্র, তিলমাত্র কালিমা তাতে নেই। ভগবানের পূজোর নির্মাল্যের শুভ্র পুষ্প হল শিশুরা। শৈশবই মানুষের জীবনের সব চেয়ে নির্মল নিষ্পাপ পবিত্র কাল। শৈশব স্বর্গস্বরূপ। সংসারের তাপে ক্লিষ্ট বয়স্ক মানুষ শৈশবের সেই শান্তিময় স্বর্গরাজ্য থেকে নির্বাসিত। জন্মের পূর্বে মানুষ ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে; জন্মাবার পরও যতদিন শৈশব অবস্থা চলে, ততদিন ভগবানের দিব্যজ্যোতিতে মণ্ডিত থাকে। মৃত্যুর ভয় শিশুর চিত্তে প্রবেশ করতে পারে না। তাই শৈশব অমৃতস্বরূপ। শিশু ভগবানের কোলে থাকে, পরমেশের পূতগন্ধে সে সুরভিত, তাঁরই দ্যুতিতে সে ভাস্বর। মানব শৈশব অবস্থা থেকে যতই বড় হতে থাকে, ততই সে তার শৈশবের নন্দনকানন থেকে সরে সরে আসে ও ভগবানকে ভুলতে থাকে; যখন সে সংসারের কীট হয়ে পড়ে তখন আর প্রিয়তমের কথা তার মনে জাগে না,—প্রিয়তমের আহ্বান তার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে প্রতিহত হয়। আবার বার্ধক্যে সংসারের পাপতাপক্লিষ্ট প্রিয়জন-বিয়োগ-বিধুর চিন্তাভারে আক্রান্ত জরায় জর্জরিত মানুষের মনে শৈশবের সোনালী দিনের স্মৃতি বেশি করে জাগে; তখন সে ভাবে, 'আবার যদি আমি সেই পাপতাপহীন নির্মল শৈশবের শান্তিময় স্বর্গীয় পরিবেশে ফিরে যেতে পারতাম।' দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বাধ্য হয়ে তার চিত্তে তখন প্রিয়তম পরমেশের প্রতি শরণাগতি জাগে।

ইংরেজীতে 'Retreat' শব্দের অর্থ পশ্চাদ্‌গমন, ফিরে যাওয়া। 'The Retreat'-শীর্ষক কবিতায় ভন্—বার্ধক্যে মানুষের শৈশবে ফিরে যাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার ও সেই সঙ্গে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত শৈশবের বর্ণনা করেছেন। কবি খেদের সঙ্গে বলছেন,—

'O how I long to travel back
And tread along the ancient track!
That I might once more reach
the plain
Where first I left my glorious train.'

'সেই পুরান পথ বেয়ে ফিরে যেতে কি (তীব্র) বাসনা আমার! যেখানে আমি মহিমামণ্ডিত আমার স্বর্গীয় পরিবেশ ফেলে এসেছিলাম, সেখানে (শৈশবে) যাতে আবার পৌছাতে পারি।' কিন্তু মানুষের এ চেষ্টা বৃথা। বার্ধক্য থেকে আবার শৈশবের স্বর্গে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। তাই —'Childhood' (শৈশব) কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই আক্ষেপের সুরে বলছেন,—

'I cannot reach it, and my striving eye
Dazzles at it, as at eternity.

—অর্থাৎ (বার্ধক্যগ্রস্ত) আমি আর শৈশবে ফিরে যেতে পারছি না; আমার পরিশ্রান্ত দৃষ্টি শৈশবের দিব্যদ্যুতির ঝলকে ঝলসে যাচ্ছে, যেমন অসীম অনন্তকে দর্শন করতে গেলে সসীম দৃষ্টি প্রতিহত হয়।

[ক্রমশঃ]

অমৃত কথন

শ্রীআনন্দ বাগচী

'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট সংবাদ-সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও কবি। বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের বাঙলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

মহাপুরুষদের, অবতার পুরুষদের জীবনই তাঁদের বাণী। তাঁদের আচরণের মধ্য দিয়েই তাঁরা আমাদের জন্য পথের ইসারা রেখে যান। তাঁদের জীবনীই হয়ে ওঠে আমাদের সঞ্জীবনী, অনুক্ষণের অনুপ্রেরণা, অনুশীলনী এবং পাথেয়। কিন্তু প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে লৌকিকে-অলৌকিকে গাঁথা সেই জীবন অবিকল এবং যথাযথ হয়ে অনেক সময়ই উত্তরকালের কাছে পৌঁছতে পারে না। সেই অকথিত অলিখিত জীবন লোক মুখে মুখে ক্রমশ অতিরঞ্জিত এবং অপব্যাখ্যানে বিকৃত হয়ে ওঠে। মৌল সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে অনেক প্রক্ষিপ্ত অর্ধসত্য দ্রষ্টব্যকে ঝাপসা করে তোলে। কালের দুর্গমতা এবং অনধিকারী পরিবহন এই ব্যত্যয় ও বিমূর্তিকরণের জন্য দায়ী। এর ফলে তাঁদের জীবনরূপী বাণী অনেক সময়েই আমাদের কাছে জীবনদায়িনী হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। বিশেষ করে তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁরা লিখিত অনুশাসন রেখে যেতে পেরেছেন। এবং তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁরা বাক্‌সিদ্ধির সেই পর্যায়ে পৌঁছেছেন, সেখানে বাণীই হয়ে উঠেছে জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি এক যুগাবতার পুরুষ, বাণীই যাঁর জীবন। স্টাইল ইজ দা ম্যান (style is the man) কথাটি ঘুরিয়ে তাঁকেই দেখাতে হয়, দা ম্যান ইজ দা স্টাইল (the man is the style) এক অনন্যসাধারণ শৈলীমণ্ডিত তাঁর জীবন মানুষের সামনে মুহুর্মুহুঃ উৎসারিত হয়েছে এবং এখনও তাঁর অমৃত বাণীর মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং থাকবেন। এই জীবনেরও বয়স আগামী ২৬ ফেব্রুআরিতে একশো দু বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। তারিখটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত গ্রন্থটির ভিত্তি আসলে শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের দিনলিপি। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ এই পাঁচ বছরের নিরন্তর সাক্ষাতের ফলশ্রুতি থেকে রামকৃষ্ণদেবের শেষ দুটি বছরের কর্ম-কথার নির্যাস সঞ্জীবিত করেছেন মাস্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচ ভাগে প্রকাশিত এই দিনপঞ্জিত জীবনী গ্রন্থে। প্রায় একশো দিনের শ্রবণী সংগ্রহের সঙ্গে আপ্লুত হয়ে আছে পরম্পরাগত এক দুর্লভ স্মৃতি, সত্যবদ্ধ ঐতিহাসিকের নির্লেপ রচনায় বিধৃত এক প্রামাণ্য প্রতিকৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীমূর্তি। প্রায় একশো দু বছর আগের ২৬ ফেব্রুআরি তার প্রথম মসীন্যাস ঘটেছিল।

বাঙালীর জীবন্মুক্তির এই আকরগ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অতি প্রামাণ্য চরিতগ্রন্থ এই কারণে যে, এই সুনির্বাচিত যথাতথ্যে কোথাও অতিরঞ্জন বা ব্যক্তিক দুর্বলতার ফাঁক নেই। সন্নিকটবর্তী ইতিহাসের আবাসিক রামকৃষ্ণ আমাদের প্রায় চোখের সামনের মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনাবহুল দিনগুলির সুস্পষ্ট ছক ও ফ্রেমের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ও উন্মোচন ঘটায় কোথাও অর্বাচীন প্রক্ষিপ্তির সুযোগ ছিল না। আরও বহু মনীষী ও দিগ্বিজয়ী পুরুষের সাক্ষাৎকারে নথিবদ্ধ হয়ে, স্বীকৃত ও লিখিত হয়ে তাঁর জীবনের প্রধান অপ্রধান ঘটনাবলী সাময়িকতায় ও সংলাপে নির্ভুলভাবে বিধৃত হয়ে আছে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা রামকৃষ্ণদেবের জীবন পরিবাহী হয়ে যুক্ত হয়েছিলেন এমন এক শুদ্ধাচারী সত্যাগ্রহী আচার্য-

পুরুষ যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দও উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যোগ্যতম মাধ্যম মনে করে। এই ব্যাপারটি, এই জীবনচরিত রচনা ব্যাপারটি কিছুতেই কাকতালীয় বলা যায় না। না হলে এই যুগপ্লাবী মানুষটির আন্তরজীবনী রচনার জন্য জীবনের সায়াহ্ন পর্বটির অপেক্ষা করে থাকতে হত না। সংশ্লিষ্ট সুলেখকবর্গের তো অভাব ছিল না, তাঁর সান্নিধ্যে বহু খ্যাতকীর্তি মানুষই এসেছেন, সম্মোহিত হয়েছেন এবং বাঁধা পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু সব মহৎ কর্মেই আধার এবং অধিকারী ভেদ আছে। এমন এক নিবেদিত-প্রাণ একাগ্র মানুষের প্রয়োজন ছিল যিনি কথামৃত বিতরণের জন্যই যেন জন্মেছিলেন, এবং এই বহু শ্রমসাধ্য যান্ত্রিক ক্রিয়ার জন্যই যেন বেঁচে ছিলেন। ধ্যান এবং মননের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীকে তিনি নিজে প্রথমে সম্যক্ অনুধাবন করেছেন, ওতপ্রোত ব্যঞ্জনাটিকে চিনেছেন এবং একাত্ম করেছেন, তার পর তাকে প্রাণধর্মী করে বিকিরণ করেছেন। বাংলায় কথামৃত প্রকাশের পূর্বভাবনা এসেছিল তাঁর ডায়েরীর ইংরেজী খসড়ায়, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা থেকে ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় সেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতও হয়েছিল। তারপর কথামৃতের পাঁচটি ভাগ যথাক্রমে ১৯০২, ১৯০৪ ১৯০৮ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বিপুল দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গেই মহেন্দ্রনাথেরও জীবন-অবসান ঘটল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

কথামৃতের ভিত্তি শ্রীম-লিখিত ডায়েরী বা দিনলিপি হলেও গ্রন্থমূর্তি দেবার সময় রামকৃষ্ণ জীবনের এই অসামান্য অনুলেখক ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকতায় বন্দী করেননি। সংকলনকালে তিনি প্রবুদ্ধ ভাস্করের মতোই ছেনি ও বাটালির সাহায্য নিয়েছেন ঈপ্সিত মূর্তিকে প্রাণবন্ত করতে, যথার্থ বাণীকে লৌকিক মন্ত্রে ভাবান্তরিত করতে। যাকে বলে সম্পাদন, যাকে বলে নির্বাচন ও পরিবর্জন। অনেক সংলাপ, অনেক ঘটনা বাদ গেছে। তালফেরতার জন্য পূর্বাপরকে স্থানান্তরিত করেছেন। এর পিছনে বহু বিনিদ্র রজনীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়েছে। বাণীকে ধ্যানের দ্বারা স্বীকরণ করতে হয়েছে। মননশীল পটুয়ার মতোই পরিপ্রেক্ষিতের পটকে যথার্থ তলমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়েছে।

কথামৃতকে একটি গ্রন্থ বা জীবনীগ্রন্থ বললে কিছুই বলা হয় না। এটি যেমন, একাধারে দুর্লভ ইতিহাস ও নির্গলিত ধর্মগ্রন্থ তেমনি কথামৃত জীবনশিল্প, দর্শন এবং সাহিত্য। এটি কলিযুগের হস্তামলক নব্য গীতা। দ্বিধাদ্বন্দ্বে জটিল এই জীবনের এমন নববিধান, এমন সমন্বয় ও সরলীকরণের, আত্মবিশ্বাস উদ্দীপনের দ্বিতীয় গ্রন্থ আর আমার জানা নেই। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে কথামৃত প্রকাশের পরে। এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসেছি কথামৃতকারের তিরোধানের পরে। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কথামৃতের সব কটি ভাগ মিলিয়ে চুয়াল্লিশটি পুনর্মুদ্রণ ঘটেছিল। পরে কপিরাইট মুক্ত গ্রন্থটি অন্তত দশটি প্রকাশনা থেকে হাজার হাজার কপি প্রকাশিত এবং বিক্রীত হয়েছে। এই জনপ্রিয়তা এই অন্ধ অবিশ্বাসের যুগে, অবিদ্যার আর অহংকারের যুগে যে অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত ছিল তেমনি কার্যকারণসূত্রে এই বুঝি সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল। এই বিশল্যকরণী ছাড়া আমাদের পার্থিব যন্ত্রণার বাস্তবসম্মত মুক্তি কই? দূরের মানুষকে এত কাছের করে আগে আর কখন আমরা পেয়েছি? আপাতদৃষ্টে এক গ্রাম্য, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যে স্বরূপে সবচেয়ে সপ্রতিভ, সাবলীল ক্ষিপ্রতায় প্রাজ্ঞ পুরুষ হতে পারেন, আমাদের জীবনের চূড়ান্ত কথকতার মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণদেব সেটা প্রমাণ করে দিলেন। তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি বিজ্ঞানী। তিনি আমাদের সহবাসী বন্ধু। তাঁর হাত ধরতে আমাদের উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াতে হয়নি। তাঁর দিশারি হাত আমাদের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে আপনা হতেই। অমৃতের পথ দেখিয়েছে, কথামৃত তাঁর সেই দক্ষিণ হস্ত।

ডুডুও খাব টামাক্‌ও খাব

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকার সহসম্পাদক। 'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে সংযুক্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিক—আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত।

সেদিন এক সাধুমুখে শুনছিলাম, 'প্রত্যাশা রেখ না। তুমি যাদের জন্যে যা করছ, দু-হাতে করে যাও। কোনও প্রতিদানের আশা না রাখাই ভাল। তাতে অনেক শান্তি পাবে। কারুর কাছে কিছু আশা কোরো না। শুধু নিজের ওপর আস্থা রাখ।'

প্রত্যাশা থেকেই হতাশা। মনে মনে অনেকের কাছেই আমাদের অনেক পাওনা। এক চুল এদিক ওদিক হলেই জগৎ বিষন্ন। আমরা সকলেই অদ্ভুত এক দেনাপাওনার জগতে বিচরণ করছি। প্রতি মুহূর্তে জগৎকে নিজের মনের মতো করে সাজাচ্ছি। পরমুহূর্তেই বাস্তব এসে সে চেহারা গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বারে বারে মোহ-ভঙ্গ হলেও মোহগ্রস্ত মানুষের চেতনা হয় না।

মানুষ বিচক্ষণ প্রাণী। যুক্তিতর্কে পারঙ্গম। বিচার-বুদ্ধি আছে। তবু পৃথিবী যা নয় তাই ভেবে অকারণে কষ্ট পায়। যা অনিত্য তাকে আঁকড়ে ধরে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখার ব্যর্থ চেষ্টায় একদিন ঘুম ভেঙে যায়, তখন আর নামরূপ থাকে না। বর্তমানের পরিচয় মুছে যায়। আবার নতুন শরীর নতুন পরিচয়, নতুন পরিবেশ। জীবন্মুক্তি, সে অতি দূরের কথা।

আমার দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, নাক, কান, খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি, কিছু গ্রহণের পথ, কিছু বর্জনের পথ, ভাষা, সংলগ্ন চিন্তা, এই দেখিয়েই মানুষের ছাড়পত্র পেয়ে গেছি। প্রকৃত মানুষ কজন? ঠাকুর বলতেন, 'মানুষ' শব্দের অর্থ মান হুঁশ। হুঁশ মান তবেই না তুমি মানব। জন্মেই আমরা বেহুঁশ। চারপাশে থরে থরে মায়ার আয়োজন। বর্ণ বিপুল প্রকৃতি। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিহীন চাহিদা। ষড়্‌রিপুর অবিরত টঙ্কার। কে আমি? কোথায় আমি? চলেছি কোথায়? কিছুই জানি না। আমার একটা নাম আছে। একটা পদবী ঝুলছে নামের পেছনে। পিতা, মাতার পরিচয় জানি। বাকিটা বংশগতির ধারায় ভেসে চলা।

ঠাকুর বলতেন অন্নগত প্রাণ। মৃত্তিকার আকর্ষণে, সংসার বলয়ে বল্গাহারা জীবন ঘুরছে, চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো। উটের আহার কণ্টকাকীর্ণ পাতা। জিভ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত তবু সেই আহারেও কী আনন্দ! এত দুঃখের, এত হতাশার পৃথিবী তবু ছেড়ে যাবার সময় সে কি আকুলতা! আর একটু, আর একটু। যদি প্রশ্ন করা হয়, সবই তো হল, মামলা, মকদ্দমা, পরের উপকার, অপকার, জীর্ণ দেহ, চোখে চালশে, হার্টের কিছু নেই, সংসারে তেমন খাতির নেই, কেউ মানেও না, তবু কী সাংঘাতিক আকর্ষণ! যেতে চাই না, শমন এসে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে।

মানুষ কিছু প্রারব্ধ নিয়ে আসে। কেউ জন্মায় মুখে সোনার চামচ নিয়ে। কেউ এসে হাজির হয় ফুটপাতে উলঙ্গ রাজা হয়ে। কেউ চর্মকারের সন্তান, কেউ কর্মকারের। কেউ জাদুকর, কেউ বাজীকর। বিজ্ঞান প্রারব্ধ-ট্রারব্ধ মানে না। বিজ্ঞান অনেক রহস্যের সমাধান করেছে। করতে পারেনি জন্মমৃত্যুর রহস্য। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে এই যে জীবন উপত্যকা, এ স্বপ্ন না বাস্তব, এ প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। বিজ্ঞানের অহংকার মনে করে, আমরা অজানাকে জেনেছি, প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে

এনেছি। জীবনদায়িনী ওষুধ আবিষ্কার করেছি। মহাজাগতিক রহস্য হাতের মুঠোয়। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের অহংকারে থ মেরে যায়। ভাবে মানুষই সব। ঈশ্বর আবার কে? সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছেন না কি? সাধারণ মানুষ এমন ভাবলেও বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝেই ভাবেন, সত্যিই কি আমরা কিছু করেছি! না আমরা কারক হয়েছি! আমরা কর্তা না করণ। আমি করেছি, না আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে! অধিকাংশ আবিষ্কারই তো আকস্মিকতায় ভরা। কি করতে কি হয়ে গেছে! ইংরেজীতে বললে ভাবপ্রকাশের সুবিধে হবে, Stumbling on truth। সত্যের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়া।

বিজ্ঞান মানেই যে শুধু কলকারখানা, শিল্পজাত সস্তা সামগ্রী, কম শ্রম, এক ধরনের বিলাসিতা, আত্মবিস্মৃতি, আস্তিকতা থেকে নাস্তিকতা, তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞান যে বিশেষজ্ঞান সেই সত্যটিই আমরা ভুলে বসে আছি। আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বর না মানলেও জগৎ সৃষ্টির পেছনে বিশাল এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস ঊর্ধ্ব একটি স্তরে জমে আছে। নিচের দিকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামেনি। সাধারণ মানুষের ধারণা বিজ্ঞান হল ঈশ্বরহীন এক অস্তিত্ব। শুধু ম্যাটার, সোল বলে কিছু নেই। দেহ একটা হাড় মাসের খাঁচা। ধমনী, রক্তপ্রবাহ, হৃদয়, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, মস্তিষ্ক। প্রাণ বস্তুটি আসলে যে কি, মনই বা কাকে বলে, তার গঠন কেমন আজও জানা গেল না। কিন্তু ডেকার্ট যখন বললেন—Cogito ergo sum অর্থাৎ I think, therefore I exist, আমি ভাবি আছি, তাই আমি আছি, তখনই পশ্চিমের মানুষ চেতনায় তার অস্তিত্ব খুঁজে পেল, দেহে নয়। 'আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ'। যান্ত্রিক পশ্চিমী চিন্তায় প্রাচ্যের একোহমের ছায়া পড়ল। সেই বিশাল, বিপুল, নিস্তরঙ্গ মনের তরঙ্গই হল বিশ্ব বৈচিত্র্য। এক ছাড়া আর যে কিছু নেই। বৌদ্ধ-দর্শন বললেন, মন যখন চঞ্চল, তখন সেই মনে বহুর অস্তিত্ব, মন যখন স্থির তখন একের স্থির প্রতিবিম্ব। [অশ্বঘোষ] বৃহদারণ্যক বললেন, তিনি যিনি বহুর মধ্যে থেকেও অনন্য, স্বতন্ত্র, যাঁকে সবাই জানেন না, অথচ যিনি সকলের শরীর, যিনি সকলের ভেতরে থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তোমার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্তা, অজর, অমর।

আধুনিক মানুষকে সব শেখানো হয়। শেখানো হয় না একটি জিনিস—কি করে শান্তি পাওয়া যায়। কি কৌশলে সচ্চিদানন্দ হওয়া যায়! আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী দুঃখ করে বললেন, How strange is the lot of us mortals! Each of us is here for a brief sojourn; for what purpose he knows not, though he sometimes thinks he feels it. নশ্বর মানব! হায় কী অদ্ভুত তোমার ভাগ্য! এই ক্ষণপ্রবাসে আমরা কেউই জানলাম না, কি করতে এসেছি! কখন হয়তো মনে হয় জেনে ফেলেছি, নিমেষে সে জানা হারিয়ে যায়। আমাদের সব শিক্ষাই হল নিজেকে হারাবার শিক্ষা। নিজেকে ভাঙাও, ভাঙিয়ে বিত্তবান হও। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ কর। একদিন নিঃশেষ হয়ে মুছে যাও। পড়ে থাক তোমার বংশগতি। কে বলেছে তোমাকে অতশত ভাবতে! শান্তি সে তো সোনার হরিণ। জগতের নেশায় বুঁদ হয়ে থাক। তুমি একটা হিউম্যান মেশিন। যা ধ্যানগ্রাহ্য তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে কি করে। মন এমনিই কুরঙ্গের মতো চঞ্চল, বাসনার শেষ নেই, সেই মন আধুনিক শিক্ষায় আরও ক্ষিপ্ত। লাওৎসু বড় সুন্দর বলেছেন, He who pursues learning will increase

everyday; he who pursues Tao will decrease everyday. আধুনিক শিক্ষায় অহং বাড়তে বাড়তে ইউনাইটেড নেশনস বিল্ডিং-এর মতো সুবৃহৎ হবে, বিশ্ব-শান্তি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবে না। ক্ষুদ্র হবার বিজ্ঞান ধরা আছে তাও নির্দিষ্ট পথে। চুয়াংৎসু বললেন, The still mind of the sage is a mirror of heaven and earth—the glass of all things.

কোথায় গেল আমাদের সেই প্রাচীন তপোবনের শিক্ষা! ব্রহ্মবিদ্যার পীঠস্থান! ব্যবহারিক জ্ঞানের পাশাপাশি আর একটু গভীরে যাবার ব্যবস্থা ঋষিকুমার, রাজকুমারের গুরু-গৃহে পাশাপাশি অবস্থান। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের একই যাত্রা। একজন গিয়ে বসবে সিংহাসনে, তলোয়ার হাতে, আর একজন কলম হাতে চতুষ্পাঠিতে। যে শাস্ত্রকে আজও ফেলা গেল না, সেই হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মানব-বিজ্ঞানের শেষ কথা এইভাবে বলেছেন—জীবের চরম লক্ষ্য হল মোক্ষ। তিনটি তার পথ—কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তি। বীরের মার্গ কর্ম, ঋষির মার্গ জ্ঞান, আর সন্ন্যাসীর মার্গ ভক্তি। সকলকেই পেরিয়ে যেতে হবে চতুরাশ্রম। এই চতুরাশ্রম কী কী?

ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ।
গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ।
বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। [জাবাল উপনিষদ্]

ব্রহ্মচারী মানে ছাত্র, ছাত্র থেকে গৃহী। গৃহীর পর বনী বা আরণ্যক (anchorite)। শেষ হল প্রব্রজ্যা। সাতধাম ঘুরে সন্ন্যাসী। এক এক ধরনের জীবের এক এক ভাব। 'ত্রিবিধ জীব—কেহ বীর, কেহ ধীর, কেহ পীর।' বীরের জন্যে কর্মযোগ, ধীরের জন্যে জ্ঞানযোগ আর পীরের জন্যে ভক্তিযোগ। এর চেয়ে বড় বিজ্ঞান আর কী আছে! এখন আমরা aptitude test, psychological test, IQ, নানা কথা বলি, বলে ভড়কানো মানুষকে আরো ভড়কে দিই। তুমি অমৃতের পুত্র একথা একবারও বলি না। বলি তুমি Thinking animal. Eat, drink and be merry. প্রথমে মানুষের দাস হও, তারপর ইন্দ্রিয়ের দাস। কে তোমার ঈশ্বর? কি তোমার মোক্ষ? পূর্বজন্মও নেই, পুনর্জন্মও নেই। একদিন মরে যাবে, দেহ তোমার মিশে যাবে পঞ্চভূতে, চুকে যাবে ল্যাঠা।

বর্তমানকালে ইতরজনের বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানে ধারণাগত বিশাল এক ফারাক দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, quantum theory and relativity theory—both force us to see the world very much in the way a Hindu, Buddhist or Taoist sees it. কোয়াণ্টাম থিওরি ও আপেক্ষিক তত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আবার আড়াই হাজার বছর পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা বলছেন, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যে-সত্য আবিষ্কার করে স্তম্ভিত, সে-সত্য বহুকাল আগেই ধরা পড়েছে হিন্দুর বেদে, চীনের আই চিঙ-এ, বৌদ্ধসূত্রে। তাঁরা বলছেন, If physics leads us today to a world view which is essentially mystical, it returns in a way to its beginning 2500 years ago.

সাধুর প্রত্যাশাশূন্যতার কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল। আধুনিক মানুষের জীবন প্রত্যাশার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। ঠাকুর গান গাইতেন, "যা চাবি তা বসে পাবি দেখ নিজ অন্তঃপুরে।" "ডুব্, ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।" আমরা রূপ-সাগরে না ডুবে ভবসাগরে ডুবে গেছি। আমাদের প্রথম প্রত্যাশা পরিবারের কাছে, তারপর সমাজ, দেশ, বিশ্ব। আমাদের প্রত্যাশা শিক্ষার কাছে, রাজনীতির কাছে, প্রাকৃতিক শক্তির কাছে, রোজ যেন রোদ ঝলমলে দিন পাই, মলয় বাতাস

পাই। শিক্ষা আর জীবনচর্যা যদি মানুষের ভেতরটাকে বাইরে এনে ফেলে, তারপর যদি মিছরির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে আর সেই টুকরো সমূহে যদি ঝাঁক ঝাঁক লাল পিঁপড়ে ছেঁকে ধরে তাহলে জীবনানন্দ আর থাকে কি করে! কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কি কোনও কালে আমাদের বলবে:

তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্।
যদ্দিনং হরিসংলাপকথাপীযূষ-বর্জিতম্॥

—মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়। সেই দিনই দুর্দিন যেদিন হরিনাম করতে পারছি না। স্বামী বিরজানন্দজীর একটি উপদেশবাণীতে সেই ধ্বনি, "যে আপনি আপনার মিত্র, সে সংসারেরও মিত্র ও সমুদয় সংসারও তার মিত্র। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন: 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।' শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী (মুক্তির কারণ) এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু (বন্ধনের কারণ)।" মুক্তির শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই—আছে যেখানে, সেখানে যেতে বড় দ্বিধা, কারণ আইডেনটিটি লুপ্ত হবার সম্ভাবনা। আমরা চাই, দুধও খাব তামাকও খাব।

বিবেকানন্দ-চর্চা ঃ মানবজাতির সেবাস্বরূপ

(একটি পত্র)

ডক্টর ই. পি. চেলিশেভ

পত্র-লেখক মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স আকাদেমীর অ্যাসোসিয়েট-মেম্বার, সোভিয়েত লেখক-সঙ্ঘের সভ্য, সোভিয়েত শান্তি কমিটির সদস্য এবং জওহরলাল নেহরু শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট ভারত-তত্ত্বানুরাগী গবেষক ও লেখক। অধুনা-সংগঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সমীক্ষা-পর্ষদের আন্তর্জাতিক উপদেশক সমিতিতে তিনি সহ-সভাপতিরূপে বৃত হয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর কলকাতায় অবস্থানকালে ঐ পদ গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হলে, তিনি উক্ত সমীক্ষা-পর্ষদের সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দকে যে পত্র লেখেন, তারই সরল বঙ্গানুবাদ এখানে হুবহু প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রের তারিখ ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৩।

প্রিয় স্বামীজী,

২৮ নভেম্বর, ১৯৮৩ তারিখে লিখিত পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়নের জন্য অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসমের সভাপতিত্বে ভারত ও অন্যান্য দেশের বিদ্বজ্জনকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা সংসদ গঠিত হয়েছে, এ সংবাদে আমি খুবই আনন্দিত। সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বামী বিবেকানন্দ একটি জনপ্রিয় নাম; আমার দেশবাসীর চিত্তে তিনি গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। ভারতে জাতীয় চেতনার বিকাশে এবং ঔপনিবেশিকতা নিরোধক ভাব-সঞ্চারণায় স্বামীজীর অবদান অসামান্য; এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং মানব-প্রীতি ও দেশাত্মবোধের মহান উদ্গাতারূপে তিনি সোভিয়েত গণমানসে অতিশয় সম্মানিত। সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন যে, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বস্তুতঃ অভিন্ন; বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের গ্রাসাতঙ্কে বিপন্ন মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁদের বাণী একান্তই অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে একমাত্র তাঁদের

বাণীই বর্তমানের আতঙ্কপীড়িত বিশ্বে শান্তি, সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সক্ষম। তাঁরা সাধারণ ধর্মনেতা মাত্রই নন—আরও অনেক বেশি গরীয়ান্। শান্তি, সমন্বয় ও সৌভ্রাতৃত্বের মহান প্রবর্তক পুরুষ তাঁরা। অতীতের ভারতে ও বৃহত্তর বিশ্বে তাঁদের বাণীর কালোপযোগিতা যেমন ছিল তেমনই সাম্প্রতিক ভারতের পরিস্থিতিতে এবং সমকালীন বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতেও ততোধিক তার প্রয়োজন। এই কারণেই বহু সোভিয়েত গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমি গৌরবান্বিত যে, আমার স্বদেশে এই বিদ্যাচর্চায় আমিও একজন অগ্রণী এবং বিশ বছর আগে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume-এ) আমিও স্বামীজী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত যে কোন কর্মসূচীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াকে আমি অত্যন্ত গৌরবের মনে করি। ভারত ও অন্যান্য দেশের গবেষকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমি ও আমার সহকর্মীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার কাজ অব্যাহত রাখব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের সামগ্রিক পরিশীলনের জন্য সংগঠিত সমিতির (Committee for Comprehensive Study of Ramakrishna-Vivekananda Movement-এর) অন্যতম সহ-সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য আপনাদের আমন্ত্রণে আমি নীতিগতভাবে আমার সানন্দ সম্মতি জানাচ্ছি ; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুশীলনে ও তার উত্তরোত্তর বিকাশে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা থাকবে। আমার বিবেচনায় এই কাজ মানবজাতির সেবাস্বরূপ।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে,

আপনাদের বিশ্বস্ত,
ই. পি. চেলিশেভ

Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন-তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারত এবং আলবিরুনি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

'আনন্দ' পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক—লোকসংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত—জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

এগারোশতকের জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে আলবিরুনি একটি বিখ্যাত নাম। গজনীর লুঠেরা সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তিনি ভারতে এসেছিলেন। সেই সুযোগে ভারত সম্পর্কে একটি পুরো বই লিখে ফেলেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, তিনিই সম্ভবত প্রথম হিন্দু কাল-তত্ত্বের সঙ্গে ইসলামী কাল-তত্ত্বের মিল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার মানে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনের আলোচনার সূত্রপাত সম্ভবত আলবিরুনির হাতেই।

'কিতাব তহ্‌দিদ নিহায়েত আল-আমাকিন' বইয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং এসম্পর্কে শাস্ত্রীয় ধারণা নিয়ে আলোচনায় আলবিরুনি কোরানের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করেন। 'ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একটি দিন তোমার দিনের হিসেবে হাজার বছর' (২২ : ৪৭) এবং অন্যত্র এই ঐশ্বরিক দিন মানুষের কাছে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে বর্ণনা করা হয়েছে (৭০ : ৪)। আলবিরুনি কালচক্রের ধারণারও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য : একেকটি কালচক্রের নিজস্ব সৃষ্টিক্রম এবং আদম-ইভ আছে। ধ্বংস আছে। আবার নতুন কালচক্রের নিজস্ব আদম-ইভ অর্থাৎ সৃষ্টি এবং ধ্বংসপ্রক্রিয়া আছে।

আলবিরুনির কালসংক্রান্ত প্রত্যয় যে হিন্দু-শাস্ত্র-পুরাণাদি থেকে সংগৃহীত এবিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত। এমন কী তিনি নিজেও প্রসঙ্গত তা স্বীকার করেছেন এবং সেই আলোকে ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব ও কালপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দু সৃজন-পালন-সংহারতত্ত্বে প্রকারান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

আবার অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুধারণার সঙ্গে একমতও হননি। 'কিতাব আল-জমাহির'-এ লিখেছেন : 'হিন্দুরা মনে করেন, পর্বতমালার বর্তমান রূপ এবং অবস্থান শাশ্বত। এটা ঠিক নয়। তদন্ত এবং অভিজ্ঞতায় দেখা যাবে পর্বতমালার মতো স্থাণু অনড় বস্তুও পরিবর্তনশীল। আজ যা দেখছি, কাল তেমনটি ছিল না। আবার ভবিষ্যতেও এমনটি থাকবে না।'

আলবিরুনির মতে, হিন্দুস্থান একদা সমুদ্রের তলায় ছিল। এর প্রমাণের সপক্ষে তিনি যা সব বলেছেন, তা একালের ভূবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। সমুদ্রচর প্রাণী ও উদ্ভিদের চিহ্ন তিনি দক্ষিণভারতে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর ভারত সংক্রান্ত বইয়ে তিনি লিখেছেন : 'এখন বিজ্ঞানের যা কিছু আমরা দেখছি, তা অতীতের উন্নততর যুগের ভগ্নাংশমাত্র।' তার মানে, তিনি বিশ্বাস করতেন, অতীতে এদেশে একটা উন্নততর যুগ ছিল। তাঁর সমকালে সেই যুগের কিছু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই।

আলবিরুনির জন্ম ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের খোয়ারাজম্ (আধুনিক খিবা) শহরের শহরতলিতে। পুরো নাম আবু রায়হান মুহাম্মদ ইব্‌নে আহমদ আল-বিরুনি। ৯৯৮ থেকে ১০১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জুর্জানের রাজসভায় রাজজ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। গজনীর সুলতান মাহমুদের অভ্যুত্থানের পর ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজজ্যোতির্বিজ্ঞানী পদে যোগ দেন। জ্যোতিষচর্চাও করতেন। এরপর সুলতানের সঙ্গে ভারতে আসেন এবং গজনীতে ফিরে যান ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে। ভারত বিষয়ক বইটি লেখেন। মারা যান ১০৫১ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতে থাকার সময় বেদান্ত এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর মতে, 'হিন্দুতত্ত্বকে আধুনিক ধারণা কিংবা অ্যারিস্টোটলীয় ধারণায় দর্শন বলা না গেলেও তা যে প্রজ্ঞার বিশুদ্ধতম রূপ, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া চলে।' পতঞ্জলির যোগসূত্র তিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল আগে এই বইটি ইস্তাম্বুলে আবিষ্কার করা গেছে। যোগসূত্রের অনুবাদে তিনি নাম দিয়েছিলেন: 'কিতাব বাতাঞ্জাল আল-হিন্দি কিল-খিলাস মিন আল-আমতাল।' এটি পাণ্ডুলিপির আকারেই পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় ভাষায় পুনরনুবাদিতও হয়েছে।

আলবিরুনির অধিকাংশ রচনার ভাষা আরবি এবং কিছু ফার্সি। তাঁর মাতৃভাষা কিন্তু আরবি-ফার্সি নয়। খোয়ারাজমি ভাষা। ভারতে এসে তিনি অসংখ্য হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং সংস্কৃত শেখেন। তাঁর 'আল কানুন আল মাসুদি' বইটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু, গ্রীক, চালদীয়, জোরাস্ত্রীয় এবং ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানচর্চা থেকে সংগৃহীত তথ্যে ভরা। মূল পাণ্ডুলিপিটি অবশ্য হারিয়ে গেছে। তাঁর প্রায় সব রচনায় নানাদেশের কবিতার উদ্ধৃতি প্রচুর এবং ভারতীয় কবিতার উদ্ধৃতিও কম নেই।

আলবিরুনি নিজে সুফি মতাবলম্বী ছিলেন না। তিনিই প্রথম বলেন, গ্রীক শব্দ 'সোফোস' থেকে সুফি শব্দের উদ্ভব। 'হিন্দুস্থান' গ্রন্থে তিনি হিন্দু শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের সঙ্গে সুফিতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে প্রজ্ঞা বিষয়ে হিন্দুতত্ত্বের একটি প্রতিপাদ্যকে উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন: 'বাক্যগুলি আমাকে দর্শনের এমন একটি সংজ্ঞাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে-সংজ্ঞা অনুসারে মানুষ যতদূর সম্ভব ঈশ্বরের তুল্যমূল্য হয়ে উঠতে পারে এই প্রজ্ঞার শক্তিতে।'

মহাকাশ তথা ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচয় থাকার ফলে আলবিরুনি সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য পণ্ডিতদের তুলনায় অনেক গভীরভাবে সময় এবং সময়ের প্রকৃতি, তার পরিমাণ ও গুণগত বিন্যাস অর্থাৎ কালতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পেরেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর যা অবদান, তার একাংশে হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণাও ক্রিয়াশীল।

অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব গ্রীক, রোমান এবং হিন্দু-শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। সেমেটিক তত্ত্বেও আদম-ইভের পূর্বাবস্থাকে অর্ধনারীশ্বর অবস্থা বলে কেউ কেউ নতুন মতবাদ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। আলবিরুনি তাঁর কালতত্ত্বের আলোচনায় প্রসঙ্গটি তুলেছেন। মুসলিমতত্ত্ব অনুসারেও প্রথমে আদমের সৃষ্টি, পরে তার বাম অঙ্গ থেকে ইভের সৃষ্টি। তাহলে পূর্বাবস্থাকে অর্ধনারীশ্বর বলতেই হয়। আলবিরুনি এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, আলবিরুনি কাল-হীন অবস্থাও থাকা সম্ভব বলে মনে করতেন। অর্থাৎ চক্রে বাঁধা কালেরও জন্ম-মৃত্যু বা উদ্ভব-স্থিতি-বিনাশ আছে। তাঁর মতে, কাল সসীম। আধুনিক বিজ্ঞানও স্থান-কালসংক্রান্ত ধারণায় চতুর্মাত্রিক বিশ্বের সসীমতায় বিশ্বাসী। সুতরাং স্থানের মতো চতুর্থমাত্রা কালও সসীম।

আলবিরুনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবেও দক্ষ এক পর্যবেক্ষক ছিলেন। প্রকৃতি এবং জীবজগৎ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থও আছে। ভারত-সংক্রান্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন: 'প্রকৃতির সামগ্রিক পরিকল্পনায় যে সামঞ্জস্য রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষ-বিশেষভাবে প্রতিটি প্রাণীর বৃত্তিসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।' আলবিরুনি 'প্রকৃতির অর্থনীতি' পর্যবেক্ষণ করেছেন। বলেছেন: 'প্রকৃতিকর্তার কাজে কোন অপচয়

নেই, অযোগ্যতা নেই। প্রকৃতির অর্থনীতিতে পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

যেসব ভারতীয় গ্রন্থ আলবিরুনি অনুবাদ করেছিলেন, তার মধ্যে আছে বরাহমিহিরের একটি জাতকগ্রন্থ। সিদ্ধান্তজ্যোতিষের কিছু কিছু অংশও তিনি অনুবাদ করেন। বরাহমিহিরকৃত 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'র রোমকসিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলবিরুনি বলেছেন: এটি বরাহমিহিরের রচনা নয়, লাটদেব এটির রচয়িতা। আলবিরুনি পৌলিশ সিদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তটিও পোলিশ নামে এক গ্রীক জ্যোতির্বিদের রচনা। আধুনিক পণ্ডিতরা একথা মেনে নিয়েছেন।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসঙ্গে আলবিরুনি বহুবিষয়ে নিজের মতামত দিতে ছাড়েননি। কিমিয়াবিদ্ নাগার্জুন সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ আছে। ভারতসংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থটির নাম 'তারিখ-উল-হিন্দ।' তাঁর গণিত এবং ত্রিকোণমিতিসংক্রান্ত আলোচনার পেছনে ভারতের এতৎসংক্রান্ত বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার কথা অনস্বীকার্য। তাঁর ভেষজ এবং মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থন 'কিতাব-ই-সায়দানা'র পেছনেও হিন্দু আয়ুর্বেদের জ্ঞান কাজ করেছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে আলবিরুনি একাদশ শতকের এক আশ্চর্য প্রতিভাধর মানুষ, যিনি ইসলামে গভীরভাবে বিশ্বাসী হয়েও বিধর্মীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানসংক্রান্ত তথ্য দুহাতে গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিক পণ্ডিতের মতোই যুক্তিবাদী বিচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। সিদ্ধান্তজ্যোতিষ সম্পর্কে তাঁর বিতর্ক এবং সিদ্ধান্ত দেখে মনে হয়, তিনি যেন ভারতেরই লোক। সমকালীন ভারতের সভ্যতাসংস্কৃতি জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, গবেষণা এবং সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে এমন পক্ষপাতহীন অসাম্প্রদায়িক পণ্ডিতের সংখ্যা, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, খুবই কম দেখা গেছে।

আলবিরুনির ভূমিকা আরও বিস্ময়কর একারণে যে, তিনি যাঁর সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন, সেই সুলতান মাহমুদ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন বর্বর লুঠেরা। ভারতে তাঁর মন্দিরধ্বংসের কারণ অবশ্য ধর্মদ্বেষ নয়, ধনরত্ন হরণ। কারণ মন্দিরে প্রচুর ধনরত্ন রক্ষিত থাকে। দক্ষিণভারতে প্রাচীনকালে হিন্দু রাজারাও অন্য হিন্দু রাজ্যের মন্দির ধ্বংস এবং দেবতার ধন হরণের উদ্দেশ্যে দেবনায়ক নামে দুর্দান্ত লোক নিযুক্ত করতেন। জল্লাদের চাকরি যেমন খালি থাকে না, এ চাকরিও খালি থাকত না। এই ধ্বংসের বা হরণের পাপ সেই দুরাশয় লোকটার ওপর দিয়েই যাবে। এই বিশ্বাস কাজ করে থাকবে। মাঝ-খান থেকে শত্রু রাজার ক্ষতি করা হবে। তবে মাহমুদ হিন্দুদের কাফের গণ্য করে তাঁদের যখন বেইজ্জত করার পক্ষপাতী এবং ধর্মের ব্যাপারে খুব গোঁড়া, তখন ধার্মিক হয়েও তাঁর সভাসদ্ পণ্ডিত আলবিরুনির ভারত-অনুসন্ধান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানদর্শনের তথ্য দুহাত ভরে গ্রহণ আমাদের বিস্মিত করে বৈকি। সম্ভবত মাহমুদ তাঁর স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী সভাপণ্ডিতটিকে নিবৃত্ত করতে পারেননি।

অবশ্য একথাও সত্য, বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়ার একটি চিরকালীন ঐতিহ্য আছে, যা বিধ্বস্ত করার শক্তি কোন সম্রাটের হয়নি।

ভারতের স্ত্রীস্বাধীনতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর চিত্রা দেব

গবেষণামূলক বহু গ্রন্থের লেখিকা,—বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর গবেষণার মুখ্য বিষয়। সম্প্রতি বাংলায় নারীজাগরণের বৃহত্তর ইতিহাস-গবেষণায় নিরতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এদেশের নারীদের সামাজিক মর্যাদা শোচনীয়ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ছোট বড় নানাবিধ সামাজিক অত্যাচার ও বিধিনিষেধের পাকে পাকে নারীর জীবন-বিকাশের স্বাভাবিক পথটি রুদ্ধ হয়ে আসায় বাঙালী সমাজে সেদিন নারীর অবস্থাই ছিল সবচেয়ে করুণ। তাই দেখা যাবে, উনিশ-শতকীয় সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল কথাই ছিল নারীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, নারীপ্রগতি ও সামাজিক বিধিনিষেধের পরিবর্তন—প্রধানত এই তিনটি ধারায় উনিশ-শতকের নারী-দরদী সমাজ-সংস্কারকেরা কাজ শুরু করেছিলেন। যদিও যথার্থ স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। একথা বলছি এই কারণে যে, নারীর প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনার সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার ধারণাকে অনেক সময় মিশিয়ে ফেলা হয়,—বাস্তবে কিন্তু এদুটি এক নয়।

এদেশের নারীপ্রগতি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে ব্রাহ্মসমাজকে। হিন্দুসমাজও যে পেছিয়ে ছিল তা নয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু নারীহিতৈষী কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন নারীদের সমবেদনায় করুণ হয়ে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্যে তাঁরাও চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মদের চেষ্টা ছিল সমবেত চেষ্টা। তাঁরা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও যেমন উৎসাহী ছিলেন, তেমনি উৎসাহী ছিলেন বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ দানের ক্ষেত্রে। বহু ব্রাহ্মযুবক শুধু-মাত্র কর্তব্যানুরোধে বিধবা বিবাহ করেছিলেন। অপরদিকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরালবর্তিনী নারীদের বহির্জগতের সঙ্গে আংশিক পরিচিতিলাভের সুযোগও দিয়েছিলেন ব্রাহ্মরাই। শুধু তাই নয়, নারীদের কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত তা নিয়েও তাঁরা বহু চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

প্রশ্ন জাগে, নারীসমাজের এই দুঃসহ পরিস্থিতিকে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন? তিনি কি নারীদের দুরবস্থা লক্ষ্য করে প্রতিকারকল্পে কিছু চিন্তা করেছিলেন? উনিশ-শতকের নারীজাগরণ, তথা স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কেই বা তাঁর কী নির্দেশ ছিল?

আপাতদৃষ্টিতে কারও মনে হতে পারে, স্বামীজী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী,—তাই নারী-সমাজের উন্নতি-অবনতি তাঁর চিন্তার পরিধির মধ্যে থাকার কথা নয়—স্বাভাবিক কারণেই। তাঁর চিন্তা ও কর্ম প্রধানত পুরুষকেন্দ্রিক। কিন্তু ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা নয়, বরং স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কিত তৎকালীন যাবতীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে তাঁর মতামতই ছিল সবচেয়ে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। কারণ তিনি, একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা কাকে বলে। বিষয়টি আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

এদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণাটি গড়ে উঠেছিল উনিশ-শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক পরিচয়ের পরে। যদিও নারীদের অবস্থা তখন সবদিক থেকেই অত্যন্ত অবনত হয়ে পড়েছিল, তবু কেউ কেউ এবিষয়ে কিছু কিছু ভাবতে শুরু

করেছিলেন। 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত মন্তব্য করলেন, 'ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন অর্থাৎ সর্বত্র ভোজন, সর্বত্র গমন, সকলের সহিত কথোপকথন করুন কিন্তু আমরা এইক্ষণে সম্পূর্ণ বিপক্ষে আছি। যেহেতু অগ্রে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজরোপণ হউক এবং অগ্রে তাঁহাদিগের চিত্ত কুকর্মের প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হউক তবে স্বাধীনতার চেষ্টা করিব নতুবা তদ্দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট ঘটনের সম্ভাবনা নাই।'

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ঈশানচন্দ্র বসু। তিনি নারীদের আর একটু স্বাধীনতা দিয়ে বলেছেন, 'আমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া সতীলক্ষ্মীর ন্যায় স্বামীর বামপার্শ্ব শোভান্বিত করেন, তাহাই বা কেন অবাঞ্ছিত হইবে। কিন্তু যথেচ্ছাচারের সহিত আমাদের সম্মুখ সংগ্রাম।...যথেচ্ছচারিণী না হইয়া যদি এদেশীয় স্ত্রীগণ যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহারা যাহা চান তাহা করুন। কাহারই চক্ষে তাহা অসহনীয় হইবে না।'

'সোমপ্রকাশে'ও প্রায় একই ধরনের কথা ভিন্ন সুরে বলা হয়েছে অর্থাৎ 'স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হইয়া কুলকামিনীগণ আপনাদিগের কুলমান রক্ষা করিতে কি সমর্থা?' তাঁদের স্বাধীনতা দানের সময় 'আজিও উপস্থিত হয় নাই' অতএব 'এখন তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে অবশ্যই তাহাতে বিষময় ফল ফলিবে।'

'বামাবোধিনী' পত্রিকাও দাবি করেছিল এদেশের নারীরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ, অশিক্ষিত ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মুখাপেক্ষী। সমাজের অগ্রগতি ও নারীজীবনের পূর্ণতার জন্যও নারীদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এসব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, উনিশ-শতকের সমাজসংস্কারকেরা মনে করতেন, নারীদের প্রকাশ্যস্থানে গমন, পুরুষের সঙ্গে আলাপ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়ার আর এক নাম স্ত্রীস্বাধীনতা। সম্ভবত এই জন্যেই নারীশিক্ষার ব্যাপারেও ব্রাহ্মরা সকলে একমত হতে পারেননি। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করে নারীশিক্ষা দিতে চাননি। তাঁদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 'বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে। অতএব এ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।' এমনকি নারীকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়াও তাঁরা অপ্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন। অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার কথা কারও মনেই আসেনি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও নারীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। তাই নব্যপন্থী শিবনাথ শাস্ত্রী যখন নারীদের চিন্তাশক্তি বাড়াবার জন্য জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্স পড়াতে চেয়েছিলেন তখন কেশবচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ সকল পড়াইয়া কি হইবে?' একথা বলার কারণ তৎকালে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবতে পারেননি এঁরা। এমনকি যাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে সোচ্চার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁদের মনেও এসম্বন্ধে কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। নব্যশিক্ষিতা নারীদের প্রাত্যহিক জীবনের যেসব সমস্যা সেগুলি নিয়েই তাঁরা ঝড় তুলেছিলেন বেশি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামী বিবেকানন্দের মনে এ সম্বন্ধে প্রথম থেকেই একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। যদিও, আগেই বলেছি, আপাতদৃষ্টিতে নারীসমস্যা নিয়ে তিনি কোন মাতামাতি করেননি। যা করেছেন তাও অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় যৎসামান্য। কিন্তু কেন, ভারতের কল্যাণের কথা যিনি সতত চিন্তা করেছেন তাঁর পক্ষে কি এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব?

একবার নারীজাতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'না, কখনই নহে। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।' (বাণী ও রচনা, ৯।৪৭৯)

স্বামীজীর অন্যান্য উক্তি বা কার্যধারা বিশ্লেষণ না করেও শুধুমাত্র এই একটি কথা থেকেই বোঝা যায় স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতখানি স্বচ্ছ। ভারতীয় নারীকে তিনি যথার্থ স্বাধীন দেখতেই চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মত ছিল শুধু শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরুষেরা নারীকে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু নারীর মৌল সমস্যার প্রকৃতি নিরূপণ করে তার সমাধানের ভার পুরুষের না নেওয়াই ভাল, মেয়েরা তাদের নিজের ভাগ্য গড়বে। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, 'পুরুষ নারীর জন্য যাহা করিয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। পুরুষেরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ করাতেই নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। একটি প্রারম্ভিক ভুল লইয়া আমি কাজ শুরু করিতে চাই না। একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে এবং শেষ অবধি এত বৃহৎ আকার ধারণ করিবে যে, উহাকে সংশোধন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি যদি ভুল করিয়া পুরুষকে নারীর কর্মধারা নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, তাহা হইলে নারীরা কখনও ঐ নির্ভরতার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না—উহাই প্রথা হইয়া দাঁড়াইবে।' (বাণী ও রচনা, ১০।১৭৫)

এর পাশাপাশি পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলি স্মরণ করলেই দেখা যাবে, ব্রাহ্ম নেতাদের সাধু উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা যথার্থ স্ত্রীস্বাধীনতা চাননি কিংবা বলা যায় তাঁরা এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। হয়তো তাঁরা চেয়েছিলেন, ভারতীয় নারী হবেন তদানীন্তন পাশ্চাত্যদেশীয়া নারীর প্রতিরূপমাত্র, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাতে উগ্র সাহেবিয়ানা ফুটে না ওঠে সেজন্যই যথেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচার, আত্মনির্ভরতা, শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম নিয়ে এত সতর্কতা। কিন্তু একে কি স্বাধীনতা বলে? নারীকে যদি পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয় তাহলে তার জন্যে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেই বা কি হবে? এ যেন খাঁচার পাখিকে দাঁড়ে এনে বসানোর চেষ্টা। দাঁড়ের পাখির চারপাশটা খোলা কিন্তু পায়ের শৃঙ্খল নড়লে চড়লেই বন্দীদশাটি মনে করিয়ে দেয়।

অপরদিকে, স্বামীজী চেয়েছিলেন, নারীর সর্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তি ও সর্বাঙ্গীন অভ্যুদয়। পাশ্চাত্যসমাজেও বোধ হয় সেকালে নারীরা এতটা স্বাধীনতা পাননি। তাঁর নিজের ভাষায়, 'পাশ্চাত্যের নারীর ওপর আইনগত কড়াকড়ির অনেক বোঝা চেপে আছে, যা আমাদেরও চূড়ান্ত অজানা।' তাই স্ত্রীস্বাধীনতার নাম করে পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণকে যাঁরা সমর্থন করে নারীদের উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিতেন, স্বামীজী তাঁদের কখনও সমর্থন করেননি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি স্বামীজী রক্ষণশীলতাকেই মেনে নিতে চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন ভারতীয় নারীর সনাতন আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ, বৈধব্যপালন প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক আচার-বিচারের পুনঃপ্রবর্তন? তা তো হতে পারে না। কারণ উনিশ-শতকের

ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় নারীর স্বাধীনতা সর্বাংশে খর্ব হয়েছিল। আসলে স্বামীজী যে ভারতীয় নারীর আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় সে আদর্শ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। ভারতীয় নারীর প্রতি অসাম্য ও অসম্মান শুরু হয়েছিল বৌদ্ধযুগে। হয়তো তার কারণও ছিল কিন্তু বৈদিক হিন্দুধর্মে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। ব্রহ্মবাদিনী নারীরা রাজসভায় আসতেন, তপোবনের শিক্ষায় ছিল ছাত্র-ছাত্রীর সম অধিকার। সেজন্য স্বামীজী ভারতীয় নারীর জন্যে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য রীতি-নীতিকেই একমাত্র শিক্ষণীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি নারীদের কোন উপদেশ দিতে বা নিষেধের বেড়ি পরাতে চাননি; শুধু বলেছেন, 'ভারতীয় নারীর সব সমস্যার সমাধান সম্ভব শিক্ষা নামক শব্দের সেই মন্ত্রটির সাহায্যে।' কিন্তু 'প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে আসেনি' জেনেও তিনি একবারও বলেননি উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় নারীর প্রয়োজন নেই। নারীর নষ্ট আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ ফিরিয়ে আনবার জন্যে ঠিক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা তিনি পুরুষ হয়ে স্থির করতে চাননি বা নির্দিষ্ট কোন ছক বেঁধেও দেননি—ছেড়ে দিয়েছেন নারীদের নিজেদের ওপর।

ঠিক এমনই কথা তিনি বলেছিলেন, নারী-সমস্যার ব্যাপারেও। 'লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে—আমি বিধবাদের সমস্যা সম্পর্কে কি মনে করি? ইহাতে আমার উত্তর এই—আমি কি বিধবা যে তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছ? আমি কি নারী যে আমাকে বারবার এই সকল প্রশ্ন করা হয়? তুমি নারীদিগের সমস্যা সমাধান করিয়া দিবার কে? হাত সরাও। নারীদিগের সমস্যা নারীরা নিজেরাই সমাধান করিয়া লইবে।'

অন্যত্র তিনি বিধবাদের সমস্যাটি আলোচনা করেছেন ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে। সামাজিক নিয়ম হিসেবে এই নিয়মের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেছিলেন। বাল্যবিবাহের যৌক্তিকতাও অস্বীকার করেননি। কিন্তু এগুলি তিনি বলে-ছিলেন ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবার জন্যে। নতুবা বলপূর্বক সতীদাহ কিংবা কুসংস্কার শিখিয়ে পুণ্য করানোর চেষ্টা প্রভৃতি কোনটিই যেমন তাঁর সমর্থন পায়নি তেমনি কোনরকম রক্ষণশীল মনোভাবও তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি। চিকাগোয় শিক্ষিত ও স্বাধীন মহিলাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে পত্রে লিখে-ছিলেন, '...এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার-হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসার—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে তারা দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত! আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হ'লে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ক'রে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো, তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।' (বাণী ও রচনা, ৬।৩৮৮-৮৯) প্রায় একই সময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকেও লিখে-ছিলেন, 'এইরকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি ক'রে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে ম'রব।...মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়ব।' (বাণী ও রচনা, ৭।৮)

অপর একটি পত্রে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে কয়েকটি কথা স্মরণ রেখে কাজ করতে

বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল :

'জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুত্থান না হইলে সম্ভাবনা নাই ; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

'সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।

'সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।'

ঐ পত্রেই তিনি লিখেছেন, ভারতের দুই মহাপাপের একটি হল 'মেয়েদের পায়ে দলানো' আর স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন নারীজাতির পরিত্রাতারূপে।

গৌরী-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীর নেতৃত্বে নারীদের জন্যে একটি মঠ গঠনের চেষ্টাও স্বামীজী করেছিলেন। সেখানে অর্থসাহায্য করলেও গুরুভ্রাতাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, 'তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না ; তারা আপনারা সমস্ত করিবে ; তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না।' অর্থাৎ মঠের সন্ন্যাসিনীদের প্রতিও তিনি কোন আদেশ দিতে চাননি, নিয়মাদি নারীরা নিজেরাই তৈরি করে নেবেন এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

কিন্তু তবুও ভারতীয় নারীর জন্যে একজন নেত্রী বা আদর্শ স্থানীয়া নারীকে তিনি খুঁজছিলেন যিনি তাঁদের পথ দেখাতে পারবেন। এই ব্যাপারে তিনি যোগ্যতমা মনে করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। আলমোড়া থেকে একটি পত্রে স্বামীজী তাঁকে লিখেছিলেন,

'তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।' (বাণী ও রচনা, ৭।৪৩০)

সমাজসংস্কারের কাজের সময় স্বামীজী বাল্য-বিবাহের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন 'দশ বছরের বেটা বিউনি'দের প্রতিও তাঁর অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না, কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি সহসা কোন ধুমধাম করার বিরোধী ছিলেন। গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ছেলের বে-র বিপক্ষে শিক্ষা দিবে। বালকের বে কোনও শাস্ত্রে নাই। তবে ছোট ছোট মেয়ের বে-র বিপক্ষে এখন কিছু ব'লো না। ছেলের বে বন্ধ করতে পারলেই মেয়ের বে আপনা হ'তে বন্ধ হয়ে যাবে।' পড়তে পড়তে বিস্মিত হই এইজন্যে যে, প্রতিটি ব্যাপারে স্বামীজী কতখানি সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করে কাজে হাত দিতেন।

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গেও স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব আমাদের চমকিত করে। আশ্রম-বাসিনী নারীদের শিক্ষার কথায় তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েরা নিজেদের ভাবনাকে মূর্তিরূপ দিক।' আরও বললেন, 'কালীকে যে সব সময় একই ভঙ্গীতে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। তাঁকে নতুন নতুন ভাবে আঁকার কথা ভাবতে তোমার মেয়েদের উৎসাহ দাও, সরস্বতীর একশ রূপ কল্পনা কর।' কল্পনার ক্ষেত্রে নারীকে এতটা স্বাধীনতা দেবার কথা ভেবেছিলেন কি কেউ?

একই সঙ্গে স্বামীজী চেয়েছিলেন নারীরা আত্মনির্ভরশীলা হবে। সেজন্যও প্রয়োজন শিক্ষা এবং হাতের কাজ বা নানারকম শিল্পকর্মশিক্ষা 'লক্ষ্য রাখ প্রত্যেকটি মেয়ে যেন এমন কিছু জানে যাতে দরকার হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।' নেত্রীর অভাবে নারীদের সাময়িক ভাবে শিক্ষালাভে সাহায্য করা ছাড়া পুরুষ আর

কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। 'কোন পুরুষ নারীর উপর হুকুম চালাইবে না। কোন নারীও পুরুষের উপর হুকুম চালাইবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন। যদি কোন বন্ধন থাকে, তবে তাহা কেবল প্রীতির বন্ধন।' (বাণী ও রচনা, ১০।১৭৫)

স্বামীজী নিজে কোথা থেকে এই উন্নত দৃষ্টান্ত পেয়েছিলেন সেকথাও জানিয়েছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের নারীসমাজের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু তিনি নারীজাতির আদর্শ চরিত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর মধ্যে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সকলেরই তাঁহার (শ্রীশ্রীমায়ের) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান। তিনি কখন আমাদের উপর হুকুম চালান না।' (বাণী ও রচনা, ১০।১৭৬) সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে শ্রীমায়ের ত্যাগপূত জীবনচর্যা দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যথার্থ স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ কি এবং ভারতীয় নারীকে তাঁর আদর্শ খোঁজবার জন্যে পশ্চিমদিকে তাকাতে হবে না। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে তাঁদের নিজেদেরই, নিজেদের প্রকৃত পথটিকেও চিনে নিতে হবে নারীজাতিকেই। অপরের হাত ধরে কখনও স্বাধীনভাবে চলা যায় না, চললে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বামীজী তাঁদের সাহায্য করতে চেয়েছেন দূর থেকে।

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতিনিধি প্রশ্ন করেছিলেন, 'তাহলে, স্বামীজী, এদেশের নারীজাতির উদ্দেশে আপনি কি বলবেন?' স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন, আমি পুরুষ-গণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস সহস্রগুণ বেশী আছে।' (বাণী ও রচনা, ৯।৪৮৩)

স্বর্গভূমি কৈলাস ও তপোভূমি মানস

অধ্যাপিকা সুপ্রীতি দে রায়

ওড়িশায় আস্কা বিজ্ঞান কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা। বিশিষ্ট ওড়িয়া লেখিকা।

হিমালয় আমার ধ্যান-জ্ঞান—জীবনের সব। জীবনে কখন হিমালয়ের সঙ্গে এই নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি তা ঠিক মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে ছোটবেলা থেকে হিমালয় যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছোট-বেলায় খেলার মাঠের শেষে দূরের পাহাড়গুলো আমার বহু সময় কেড়ে নিয়েছিল। পাহাড়কে আরও নিবিড়ভাবে কাছে পেলাম কলেজ-জীবনে এক পার্বত্য শহরে। তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক। রৌদ্র ঝলমল একটি মনোরম দিনে শহরের প্রান্তে এক উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে বহু দূরের তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী দর্শন করে মনপ্রাণ সব ঐ দেবতাত্মা হিমালয়ের চরণে সঁপে দিয়েছিলাম। সেই থেকে আমার স্বপ্ন—হিমালয়ের বুকে চলতে চলতে খুঁজব আমার চির আরাধ্যা মা পার্বতীকে,—যিনি আমার হৃৎকমলে সদা বিরাজ করছেন। শুনেছি হিমালয়ে গেলে মন অন্তর্মুখ হয়, নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া যায়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বার বার সেই উদ্দেশ্যেই তো ছুটে গিয়েছি আমার মহাতীর্থ হিমালয়ে।

হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন স্বপ্ন জাগল—যাব স্বর্গভূমি কৈলাস ও তপোভূমি মানসে। কিন্তু দীর্ঘদিন সেই স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন হয়ে রইল;

কারণ ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য তিব্বতের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীদের মতো আমিও ডেকেছি কৈলাসপতিকে—বলেছি, "হে করুণাময়, দ্বার খোল—আমরা তোমার দর্শন আশায় আর কতকাল অপেক্ষা করব?" সত্যিই বোধ হয় কৈলাসপতি আমাদের ডাকে সাড়া দিলেন। দীর্ঘদিন পর ১৯৮১-র সেপ্টেম্বর মাসে সীমিতসংখ্যক ভারতীয় তীর্থযাত্রীর জন্য কৈলাসের দ্বার উন্মুক্ত হল। আনন্দে আমার প্রাণ নেচে উঠল। ঠিক করলাম ১৯৮২-তে নিশ্চয়ই যাব কৈলাস-মানস দর্শনে। ১৯৮১-র ডিসেম্বর থেকেই শুরু হল আমার তোড়জোড়। ১৯৮২-র ফেব্রুআরির মধ্যে পাসপোর্ট যোগাড় করে নিলাম। এপ্রিল মাসে খবরের কাগজ থেকে জানলাম যে, তীর্থযাত্রীদের কৈলাস যাবার আবেদন-পত্র পাঠাতে হবে।

আবেদন পাঠালাম নয়াদিল্লীর বিদেশ মন্ত্রণালয়ে। কৈলাস-মানস যাব বললেই তো আজকাল যাওয়া যায় না, তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়;—তারপর যদি মায়ের কৃপা হয় তবে যেতে পারব। আন্তরিকভাবে শয়নে স্বপ্নে সেই কৈলাসপতিকে ডেকেছি। মনেপ্রাণে তাঁর শরণাগত হয়েছি। গ্রীষ্মের ছুটি। আমি তখন আসামের বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছি আর তিলে তিলে সেই শুভক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছি—কবে ডাক আসবে। অবশেষে জরুরী তার এল আমার কাছে, "আপনি দ্বিতীয় দলের জন্য মনোনীত, ১৯ জুন বিদেশ-মন্ত্রকে দেখা করুন। আপনি ডাক্তারী পরীক্ষায় মনোনীত হবার পর কৈলাস-মানস যাবার অনুমতি পাবেন।" নির্দিষ্ট দিনে নয়াদিল্লীতে যথাস্থানে দেখা করলাম। আমাদের ডাক্তারী পরীক্ষাও হল। পরের দিন ফল ঘোষণা করা হল। আমাদের মধ্যে তিন-জন বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছেন। বহু ভাগ্যে সাড়ে নয় হাজার আবেদনকারীর মধ্যে থেকে নাম উঠেছে—তারপর ডাক্তারী পরীক্ষায় হিমালয়ের উচ্চতর পাহাড়ে যাবার উপযুক্ত বলে নির্বাচিত হয়েছি,—এ ঠাকুর ও মায়ের অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের পক্ষে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করে এমন দুর্গম তীর্থযাত্রায় বের হওয়া স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঠাকুর ও মায়ের কৃপায় আমার সে-স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের দয়ায় পঙ্গুও তো গিরি উল্লঙ্ঘন করে!

যাবার সব প্রাথমিক আয়োজন শেষ করে, ২৩ জুন ১৯৮২, সকাল ৭টায় আমরা ২৬ জন তীর্থযাত্রী দিল্লী থেকে বাসযোগে যাত্রা করলাম। প্রথম দিন ৪৩২ কি. মি. অতিক্রম করে আমরা চম্পাবতে গিয়ে রাত্রিতে পৌঁছলাম। চম্পাবতে রাত্রিবাস করে পরদিন সকাল ২৪ জুন ১৭১ কি. মি. বাসে অতিক্রম করে ধারচুলাতে রাত্রি কাটালাম তাঁবুতে। পরদিন ২৫ জুন ১৯ কি. মি. বাসে অতিক্রম করে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম তাওয়াঘাট। এই তাওয়াঘাট থেকে শুরু হল পদযাত্রা। এখানে মালপত্র ওজন করে কুলির হাতে তুলে দেওয়া হল। দিল্লী থেকে লিপুলেখ পাস পর্যন্ত আমাদের থাকা খাওয়ার সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন উত্তরপ্রদেশ সরকার, যার জন্য আমাদের প্রত্যেককে আড়াই হাজার টাকা জমা দিতে হয়েছে।

হিমালয়ে পদযাত্রার যে কী আনন্দ তা যাঁরা জীবনে একবার অন্তত ঐভাবে যাত্রা করে হিমালয়ের কোন তীর্থদর্শন করেছেন তাঁদের জানা আছে। আমাদের এ-যাত্রা আরও আনন্দের,—কারণ দীর্ঘ একমাস এমনি হিমালয়ের খুব কাছে কাছে থাকতে পারব। বহুরূপে দেখব হিমালয়ের প্রাণমাতানো রূপ। আমরা

চার-পাঁচজন করে দলবদ্ধভাবে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের দলের মধ্যে আমাকে সহ সাতজন ছিলেন মহিলা।

কৈলাসপতিকে প্রণাম জানিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। আমার পিঠে র‍্যাক স্যাক—ওতে জলের বোতল, সামান্য খাওয়ার জিনিস ও ক্যামেরা রয়েছে। এ ছাড়া আছে বায়নোকুলার ও সামান্য ওষুধপত্র। হিমালয়-ভ্রমণ যেমন আমার আনন্দ, তেমন ফটো তোলাও আমার আর এক নেশা। তাই ক্যামেরাটা কুলিকে দিতে পারিনি। যাত্রার সময় পাহাড়ী পথে এক কেজি ওজনও মনে হয় অনেক ভারী। আজ আমরা ৯ কি. মি. অতিক্রম করে পাঙ্গুতে যাব। হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে একসময় পৌঁছে গেলাম আমাদের পাঙ্গুর আস্তানায় স্থানীয় একটি স্কুলবাড়িতে। এখানে নিগমের কর্মকর্তারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। উত্তর-প্রদেশ-সরকারের তরফ থেকে লিপুলেখ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এই নিগমই নিয়েছেন। পৌঁছবার পরই এককাপ বোর্নভিটা আমাদের দেওয়া হল। তারপরই লবণমেশানো গরম জলের বালতি। এই লবণ-জলের বালতিতে পা ডুবিয়ে মনে হল সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম, —এ ব্যবস্থা খুবই আরামদায়ক পায়ে হাঁটার পর। সমতলভূমিতে ৯ কি. মি. অতিক্রম করা অতি সহজ, কিন্তু পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে ৯ কি. মি. অতিক্রম করা সত্যিই কষ্টকর। আজ পদযাত্রার প্রথম দিন, তাই কষ্ট বেশি হয়েছে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম করতে চাইলাম, কিন্তু হাজার হাজার মাছির উপদ্রবে তা আর হল না। অগত্যা বাইরে চলে এলাম হিমালয়ের নিসর্গ-শোভা উপভোগ করব বলে। এভাবে বহুক্ষণ আকাশের নিচেই কাটালাম। তারপরেই ডাক পড়ল আবার ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য। পথে আমাদের ক্যাম্প হবে শিরখা, জিপতি, বুধি, গুঞ্জী, কালাপানি ও নাভিডাঙ্। নাভিডাঙ্ ছাড়া প্রত্যেক ক্যাম্পে এরকম ডাক্তারী পরীক্ষা হবে। এই ডাক্তারী পরীক্ষার প্রধান কারণ আমরা তিব্বতের দুর্গম যাত্রার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছি কিনা তা নির্ণয় করা। তাছাড়া যদি সামান্য ভাবেও কেউ অসুস্থ বোধ করেন তার প্রতিকার করা। এখানে এসে শুনতে পেলাম, আমাদের প্রথম দলের একজন যাত্রী গুঞ্জী থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন। সংবাদটা শুনে খুব খারাপ লাগল। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল, আমরা সবাই সুস্থ। রাতের খাওয়া শেষ করে আমরা শুতে গেলাম। আজ সবাই দারুণ ক্লান্ত, তাই ঘুমিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। পরদিন ২৬ জুন ৮ কি. মি. পথ চলে সুন্দর একটি ছোট্ট গ্রাম শিরখাতে এসে পৌঁছলাম। এখানে সরকারী বিশ্রাম-ভবনে আমাদের থাকার ব্যবস্থা, তবে অনেককে এখানে তাঁবুতে থাকতে হয়েছে। শিরখার উচ্চতা ২,৪৪০ মি.। পরিবেশ অতি মনোরম।

২৭ জুন ভোরে রওনা হলাম জিপতির উদ্দেশে—যেতে হবে ১৬ কি. মি. পথ। সকালের দিকে খুব জ্বর ছিল আমার। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে যাত্রা করেছি। জ্বর হওয়াতে মনে বেশ ভয় হল—পারব তো কৈলাসপতিকে দর্শন করতে? পথ চলছি,—যত চলছি ততই পথ কঠিন হচ্ছে ক্রমে। প্রচণ্ড চড়াই। ধাপে ধাপে উঠে চলছি। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলছি। এক সময় রুংলিং টপে পৌঁছে গেলাম। উচ্চতা ৩,০৪০ মি.। এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, আবার নেমে চলছি। বনের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছি—নানা পাখীর গান ও পোকা-মাকড়ের ডাক শুনে মনে হল যেন নিস্তব্ধ দুপুরে কোন্ এক রূপকথার রাজ্যে আমরা এসে পড়েছি! ক্লান্ত দেহে

একসময় এসে পৌঁছলাম আমাদের আস্তানা ডাকবাংলোতে। রাতের বিশ্রামের পর ২৮ জুন সকালে রওনা হলাম বুধি—দূরত্ব ১৭ কি. মি.। এটাই কৈলাসযাত্রার দুর্গমতম পথ। শুনেছিলাম, আমাদের প্রথম দলের যাত্রীদের এপথ অতিক্রম করতে ১৪ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। সারাদিন পরম আনন্দে আমরা—মহিলা যাত্রীরা ধীরে ধীরে চললাম। অপূর্ব সুন্দর এই পথ—যদিও ভীষণ ভয়ালও বটে। যেদিকে তাকাই চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, যুগ যুগ ধরে বসে থাকি এখানে। এই দুর্গম পথের সব ক্লান্তি হিমালয়ের এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে নিমিষে অন্তর্হিত হয়।

বিকালের দিকে বৃষ্টি শুরু হল। পথের দুর্গমতা তাতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। চলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ডাকবাংলো এখনও ১ কি. মি. দূরে। কিন্তু আমার পা দুটি আর চলছে না। ডাকছি শ্রীশ্রীমাকে—"মা! হাত ধরে পার করে দাও এ দুর্গমপথ, আর যে পারি না।" মেঘে ও বৃষ্টিতে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। বহুকষ্টে বিকেল ৬টা নাগাদ আস্তানায় এসে পৌঁছলাম। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। ডাকবাংলোর চারদিকে মৌসুমী ফুলের শোভা মনোমুগ্ধকর। আমাদের যাত্রার ৫০ কি. মি. এই বুধিতে পূর্ণ হল। আগামীকাল থেকে সঙ্গে ঘোড়া নেব। প্রয়োজনমতো ঘোড়ায় উঠব। ২৯ জুন ঘোড়ায় চড়ে প্রথম যাত্রা করলাম গুঞ্জী। দূরত্ব ১৪ কি. মি.। পথে বিপজ্জনক চড়াই—ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলাম। উপরে উঠে দেখলাম পাথরের উপর পাথর রেখে ভগবানের উদ্দেশে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। আমিও স্তূপের উপর তিনটি পাথর রেখে অর্ঘ্য দিলাম। গাছে ঝুলছে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো। এই যাত্রাপথে যত বারই কোন শীর্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছি,—এই দৃশ্য চোখে পড়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে এখানের স্থানীয় অধিবাসীরা এই রঙিন কাপড়ের টুকরো বেঁধে রাখেন। এই রঙিন কাপড়ের টুকরোগুলো যখনই দূর থেকে দেখেছি তখনই প্রাণে জেগেছে উৎসাহ,—এ যেন বিজয়গর্ব এক-একটা চড়াই শেষে। শীর্ষে পৌঁছানোর আনন্দ! আজ কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে আরও এক স্বর্গীয় আনন্দ আমার বাক্ রুদ্ধ করে দিল। সামনেই দেখলাম—এক আশ্চর্য স্বর্গ-শোভা। ফুলে ফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মালভূমি, তার চারপাশে রয়েছে মুক্তা ঝলমল তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া। পর্বতের তলদেশ-গুলোতে ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি। সব মিলে সেই সৌন্দর্য যেন কাশ্মীরের গুলমার্গের শোভাকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রাণমাতানো এই সুন্দর পরিবেশে এলোমেলো ঘুরে বেড়ালাম,—ফটো তুললাম। এক সময় মসৃণ ঘাসের উপর বসলাম। মনে হল মায়ের কোলে এসে আশ্রয় নিলাম। এই জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না,—তবু আমাকে উঠতে হল। আমি যে সুদূরের পথিক—থামলে তো আমার চলে না—এগিয়ে আমাকে যেতেই হবে। সামনে গারবিয়াং গ্রাম। দেখলাম পুরানো দিনের ঘরবাড়ি। একদিন কৈলাস তীর্থযাত্রীদের এখান থেকে সব যোগাড় করে তিব্বতের অভিমুখে যাত্রা করতে হত। তাই এই গ্রামখানা খুব জমজমাট ছিল। আজও সেই শ্রী রয়েছে, কিন্তু আগের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ গুঞ্জী ডাক-বাংলোতে পৌঁছলাম। উচ্চতা ৩,৫০০ মি., বেশ শীত পড়েছে।

৩০ জুন ঘোড়ায় রওনা হলাম কালাপানি। দূরত্ব ৮ কি. মি.। কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। মুগ্ধ নেত্রে দৃশ্য দেখতে দেখতে একসময় কালাপানিতে এসে

পৌঁছলাম। কালাপানিতে ঢুকেই কালী-মন্দির। মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে কৈলাস-মানস দর্শনের জন্য শক্তি ভিক্ষা করলাম। মহাশক্তিময়ী মা ছাড়া কে আর এই দুর্গম পথে চলার শক্তি দেবেন? দর্শনাদি সেরে তাঁবুতে চলে এলাম। কালাপানির উচ্চতা ৩,৩৭০ মি.। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়লাম। ১ জুলাই নাভিডাঙ্ রওনা হলাম। দূরত্ব ৯ কি. মি.। পথে পাহাড়ী ফুলের অপূর্ব সমারোহ দেখে সব ক্লান্তি ভুলে গেলাম। চারিদিকে শুধু তুষারমণ্ডিত পাহাড়। মনে হচ্ছিল, আমরা তুষাররাজ্যে এসে পড়েছি।

আমাদের ভারতসীমার শেষ তাঁবু নাভিডাঙ্। সীমান্ত পুলিশ অফিসাররা আমাদের তিব্বতে ঢোকার আগে কি করণীয় তা সব বলে দিলেন। ভারতীয় এলাকায় তোলা সব ফটো ও কাগজপত্র ওঁদের কাছে জমা দিতে হবে,—অবশ্য ফেরার পথে আমাদের জিনিস আমরা ফেরত পাব। আগামী কাল প্রায় ৭।৮ কি. মি. বরফের পথ অতিক্রমকালে কি করতে হবে, তাও ওঁরা বলে দিলেন। রাতের খাওয়া শেষ করে তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। ভীষণ শীত। এখানে উচ্চতা ৩,৯৬২ মি.।

আগামীকাল চিরতুষারের দেশ লিপুলেখ অতিক্রম করব। লিপুলেখের আবহাওয়ার পূর্ব-আভাস জানতে পারা একেবারে অসম্ভব বলা চলে। কারণ যখন তখন ওখানকার আবহাওয়া বদলে যায়। তাই এই দুর্গম পথ অতিক্রম করার আগে সেই কৈলাসপতির শরণাগত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। রহস্য রোমাঞ্চে ঘেরা লিপুলেখ পাসের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর তিনটা বাজতে না বাজতে সাজ সাজ রব। আরাম-শয্যা ত্যাগ করে জিনিস গুছাতে আরম্ভ করলাম। এই তীর্থ-পথে শীতের সকালে উঠে বিছানা বাঁধা এক দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। চারটের মধ্যে আমরা কুলিকে মাল দিয়ে দিলাম। এবার সম্পূর্ণ বরফের দেশের সাজসজ্জা অঙ্গে চাপাতে হল। গায়ে হাফ্ সোয়েটার তার উপর ফুল সোয়েটার —এয়ারপ্রুফ জ্যাকেট, তার উপর লংকোট, এয়ারপ্রুফ প্যাণ্ট, হাতে গ্লাভ্স্ ও রেনকোট (বর্ষাতি)। র‍্যাক স্যাক ঘোড়াওয়ালার পিঠে দিলাম। আমার নিজের ওজনের চেয়ে বেশি ওজন গায়ে চাপিয়ে যখন উপরে যাচ্ছি, মনে হল দেহের ভারে যেন নড়তে পাচ্ছি না। তবুও এই বহু স্তরের গরম কাপড় ভেদ করে শীতল হাওয়া হাড় কাঁপাচ্ছিল। চারদিকে ঘন কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম। কিছুদূর যাবার পর ঘোড়াওয়ালা বলল, "বহিনজী, ঘোড়া থেকে নেমে পড়ুন। আর বরফে ঘোড়া যেতে পারবে না যাত্রী নিয়ে।" নেমে পড়লাম। সামনে দেখলাম, যাত্রী নিয়ে ঘোড়া বরফে ডুবে গেছে। জওয়ান ভাইরা ঐ বরফ থেকে ঘোড়া সহ যাত্রীকে তুলেছে। এই পথে লিপুলেখ পর্যন্ত জওয়ান ভাইরা আমাদের সাহায্যের জন্য রয়েছে। ওরা নরম বরফ সরিয়ে সরিয়ে রাস্তা করে দিচ্ছে। নাভিডাঙ্ থেকে লিপুলেখ ৬ কি. মি.। তখনও সামনে ৪ কি. মি. পথ। মনে হচ্ছে, বরফের সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছি; যেদিকে দেখি শুধু বরফ।

সূর্য উঠেছে। পাহাড়ে আকাশে রঙের খেলা চলছে। মনে হচ্ছে, এক নিপুণ শিল্পী আপন খেয়ালে তুলি নিয়ে রঙের খেলায় মেতেছেন। এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখতে পাব না —তাই প্রাণভরে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ ডাক্তার ত্রিপাঠীর কথায় যেন বাহ্য সংবিৎ ফিরে পেলাম। ডাঃ ত্রিপাঠী বলছেন,

"ম্যাডাম, এগিয়ে চলুন।" আবার হাঁটতে শুরু করলাম, কিন্তু এবারকার চলা আরও বেশি কঠিন বোধ হচ্ছিল। বার বার নরম বরফে ডুবে যাচ্ছি। খানিক বাদে মনে হল মাথা ঘুরছে,—আমি আর দাঁড়াতে পারব না। সূর্যকিরণে বরফের আলো বিচ্ছুরণ হচ্ছে, তাই চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছিল। আমরা সবাই রঙিন চশমা পরে নিয়েছি। এই সাবধানতা অবলম্বন না করলে স্নো-ব্লাইণ্ডনেস্ হবার আশঙ্কা। দেখলাম, অনেকে বরফের উপর বসে পড়েছেন। পুরুষ-যাত্রীদের দু-এক জনকে অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে দেখে অবাক লেগেছিল।

এই দুর্গম পথ যেন কঠিন সাধনার পথ। চোখের জলে মনের সকল গ্লানি না ধুয়ে তো কৈলাসপতির দর্শন মিলবে না। তাই দীর্ঘ সাধনার পর,—অনেক অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে নির্মল মন নিয়ে তবে পৌছানো যায় তাঁর কাছে। আমিও সহযাত্রীদের পাশে বসে পড়লাম,—চলার ক্ষমতা ছিল না আর। কিছুক্ষণ বাদে আবার উঠে পায়ে ভর করে চলতে চেষ্টা করছি,—কিন্তু যেন আর পারছি না। দেখলাম, এক-জন পুরুষ যাত্রী বরফে ডুবে কাঁদছেন। ওনাকে জওয়ান ভাইরা পিঠে তুলে নিলেন। আমার ঘোড়াওয়ালা ভগবান সিং এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, "বহিনজী, শক্ত করে হাত ধর, ডুবে যাবে।" অতি কষ্টে একসময় লিপুলেখ পাসে পৌছে গেলাম। লিপুলেখে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। আজ খুব সুন্দর আবহাওয়া,—রৌদ্র ঝলমল দিন। বহুদূরের তিব্বতকে এক স্বপ্নরাজ্য মনে হচ্ছে—দূরের পাহাড়গুলো নানা রঙে সেজেছে। ৫,২৩৪ মি. উঁচুতে দাঁড়িয়ে মেঘমুক্ত আকাশের পটে তিব্বত-ভারতের হিমালয়ের সে-দৃশ্য মানুষের ভাষায় অবর্ণনীয়। বহু ভাগ্যে সেই স্বর্গীয়রূপ আজ আমি দেখতে পেলাম। লিপুলেখ পাসের উপরে অতি অল্প জায়গা। প্রচণ্ড বাতাস বইছে। একটা পাহাড়ের আড়ালে বসে কোনমতে দুপুরের আহার সেরে নেওয়া গেল। দূরে বরফের মধ্যে তিব্বতের দিক থেকে, ছোট ছোট বিন্দুর মতো কতগুলো প্রাণী যেন লিপুলেখের দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝলাম, ওরা আমাদের প্রথম দলের কৈলাসযাত্রী। বহু পুণ্য অর্জন করে ওঁরা ফিরে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা এক-জন দুইজন করে লিপুলেখ পাসে ফিরে এলেন। আমরাও কৈলাসপতির জয়ধ্বনি দিয়ে ওঁদের অভ্যর্থনা জানালাম। ওঁরা যেন অর্ধমৃত। কথা বলার ক্ষমতাটুকুও তখন ওঁদের নেই,—তবু দু-চারটি কথায় ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানালেন।

নিগমের কর্তৃপক্ষ এখানেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পুলিশ বাহিনীর অফিসাররা আমাদের তিব্বতের পথে যাত্রা করিয়ে দিলেন। কৈলাসপতিকে স্মরণ করে দুর্গমতর চির বরফের রাজ্যে এগুতে লাগলাম। এবার উৎরাই পথে বরফের উপর দিয়ে আমরা নো-ম্যান্স্-ল্যাণ্ড পার হয়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ পেছনে চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, সঙ্গী এক মহিলা যাত্রী গড়িয়ে বহু নিচে পড়ে গেছেন। ভাষার বিভ্রাট এখানে। যে চীনা কুলিরা প্রথম দলের মাল বয়ে নিয়ে আসছে, ওদেরই আমরা বহু কষ্টে এই বিপদের কথা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝালাম। ওরা তৎক্ষণাৎ দড়ি ফেলে ঐ মহিলাকে উদ্ধার করে তুলে আনল।

চলেছি কিন্তু পায়ের শক্তিতে নয়। উচ্চতার জন্য প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তিব্বত সীমান্তে এসে পৌছে গেছি। হিমালয়ের এদিকের দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর, ভয়াল। কোথাও গাছপালা নেই, কেমন যেন পাষাণপুরী। বিরাট বিরাট পর্বত-

গুলো যেন দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে ভীষণ গর্জনে বয়ে চলেছে এক খরস্রোতা নদী। যে চিরসবুজ হিমালয়কে এই ক'দিন দেখে আসছিলাম, তা যেন যাদুমন্ত্রে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

চীনা সরকারের পাঠানো ঘোড়ায় চড়তে হল এবার। কিন্তু ঘোড়ার সাজসজ্জার অবস্থা ভারী শোচনীয়। পা রাখবার রেকাব নেই, বসবার পিলো নেই, ঘোড়ার লাগাম নেই!—এই চীনের ঘোড়া। যাক আমার কপাল ভাল—লাগাম হিসাবে এক গাছা দড়ি জুটেছিল। অতিক্রম করব ২০ কি. মি. পথ,—তারপর যাব তিব্বতে আমাদের প্রথম আস্তানা তাকলাকোট।

আমাদের ছাব্বিশটি ঘোড়া লাইন করে চলছে। ঘোড়াওয়ালারা ৪ জন পেছনে। আমরা চলছি। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। এই চাঁদ যেন আকারে অনেক বড় মনে হচ্ছে। তারাগুলো যেন খুব কাছে,—মনে হচ্ছে আরও উজ্জ্বল। পাষাণপুরী দিয়ে চলছি। ঘোড়ার গলার ঘণ্টা আর এই পরিবেশ আমাকে আরব্য উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অজানা দেশে চলতে চলতে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করে চলছি। যেন হিমালয়ের পথে আমি চির-পরিব্রাজিকা। পথের যেন শেষ নেই। অবশেষে রাত প্রায় ১১॥টা নাগাদ আমরা তাকলাকোটে এসে পৌঁছলাম। এই যাত্রাপথে যখন কতকগুলো তিব্বতী গ্রামের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই ছুটে এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে,—যেমন ওরা যুগযুগ ধরে এইভাবেই জানিয়েছে ভারতীয় তীর্থ-যাত্রীদের। [ক্রমশঃ]

সংস্কৃতভাষা ও স্বামীজী

ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী

সুপণ্ডিত লেখক হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিট্যুশনের সংস্কৃতভাষার শিক্ষক।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এই পুণ্যভূমিতেই প্রাচীন ঋষিগণ ঋগাদি বেদসমূহের অপৌরুষেয় মন্ত্র দর্শন করেছিলেন—দর্শনের ফলেই ঋষিগণের 'ঋষি' নাম। ঋষিদের দর্শন ও মননের ফলেই দৈবতমন্ত্র পরিপুষ্টিলাভ করেছিল। ঋষিগণের যা কিছু গৌরবাস্পদ মননজাতনিধি, তা সমস্তই সংস্কৃত-ভাষায় সুরক্ষিত। আর্ষ-তপস্যার ফলস্বরূপ যে সব নিধি আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি চতুর্দশ বিদ্যা আর চতুঃষষ্টি কলা। এসমস্তই সংস্কৃতের স্বর্ণপেটিকায় মধুময়ী সংস্কৃতভাষায় উপনিবদ্ধ। ভারতে শাশ্বত ঐতিহ্যের ধারিকা ও পালয়িত্রী হল বাঙ্ময়ী সংস্কৃতভাষা। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; 'অহং ব্রহ্মাস্মি'; 'তত্ত্বমসি', 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভারতাত্মার বাঙ্ময় উদ্‌ঘোষণ হয়েছে এই ভারত-ভূমি থেকেই। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থটি ঐ দেব-ভাষা সংস্কৃতেই রচিত। আমাদের ধর্ম, আমাদের ভাবধারা এবং আমাদের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের নাড়ীর যোগ—এ যোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আজ পর্যন্ত যত বন্ধন আমাদের একত্র বেঁধে রেখেছে তার মধ্যে সংস্কৃত অন্যতম। অমৃত নাকি মধুর—যদিও আমাদের অনাস্বাদিত।—সংস্কৃত নাকি অমৃত অপেক্ষাও মধুরতর—এমন কথা বলা হয়। তাই এর অপর নাম অমৃতভারতী। পুরাতনী হয়েও সংস্কৃতভাষা চিরনবীনা। কারণ

আজও সংস্কৃত রচনার গতি থেমে নেই।

সংস্কৃতের দান: সংস্কৃতের দানের কথা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে যথাযথ উপস্থাপিত করা অসম্ভব। তবুও সংক্ষেপে দু-চার কথা বলছি। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি ও মনীষিগণের বহুমুখী চিন্তাধারা বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিষয়গুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল—(ক) ধর্মগ্রন্থ—যেমন ষড়ঙ্গ বেদ, পুরাণ, শ্রীগীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি; (খ) দর্শন—বেদান্তাদি; (গ) ধর্মশাস্ত্র বা আইনবিষয়ক স্মৃতিশাস্ত্র; (ঘ) অর্থশাস্ত্র; (ঙ) মহাকাব্য ও নাটকাদি সাহিত্য; (চ) গণিতশাস্ত্র; (ছ) চিকিৎসাবিদ্যা; (জ) ব্যাকরণ-শাস্ত্র; (ঝ) অলংকারশাস্ত্র; (ঞ) কামশাস্ত্র; (ট) কলাশাস্ত্র (Fine Arts); (ঠ) ছন্দঃ ও (ড) ভাষাতত্ত্ব (Philology and Comparative Grammar)।

(ক) ধর্মগ্রন্থ—প্রাচীন ভারতীয় জীবন ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হত। ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তার ফসল হল বেদাদি বিশাল শাস্ত্র। বেদের পরবর্তীকালে পুরাণাদির জন্ম হয়। আজও হিন্দু পরিবারে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হল আমাদের ঋগ্‌বেদ। পৃথিবীর সভ্যতার উষালগ্নেই আমাদের এই প্রাপ্তি—এ এক গৌরবময় সম্পদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে। বিবিধ তন্ত্র আধ্যাত্মিক সাধনার সম্পদ—এগুলি সংখ্যায় অনেক।

(খ) দর্শন—ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের জগৎজোড়া নাম—ভারতীয় দর্শনের দান অতুলনীয়। এই ভূমিতেই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, সাংখ্য ও যোগের দ্বৈতবাদ, ন্যায় ও বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, চার্বাকের জড়বাদ— সবই উন্নত মননের ফল।

(গ) ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র—মনুসংহিতা স্মৃতি-শাস্ত্রগুলির অন্যতম। এছাড়া যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, পরাশর, ভৃগু প্রমুখ ঋষিগণের দ্বারা রচিত হয় বিবিধ স্মৃতিশাস্ত্র। আইন বিষয় পড়তে গেলে আজও মনুসংহিতা পড়তে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে মানুষের কর্তব্য কি, অকর্তব্যই বা কি তার আলোচনা আছে।

(ঘ) অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্যের রচিত অর্থশাস্ত্রের কথা সর্বজনবিদিত—এ শাস্ত্র জগদ্‌বিখ্যাত। জগদ্‌বিখ্যাত বলার উদ্দেশ্য অনেক স্বদেশী ও বিদেশী গবেষক এর উপর কয়েক শত গবেষণা পুস্তক রচনা করেছেন। অর্থশাস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক কীথ্‌ বলেছেন—"The Arthasastra is unquestionably the most interesting works in Sanskrit because it affords a vast amount of detailed information of the practical side of Indian life as opposed to the spiritual." —(সংস্কৃতের মধ্যে অর্থশাস্ত্রটি প্রশ্নাতীতভাবে কৌতূহল-উদ্দীপক গ্রন্থ, কারণ এতে আধ্যাত্মিকতার বিপরীত ভারতীয় জীবনের বাস্তব দিকেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রয়েছে।)

(ঙ) মহাকাব্য ও নাটকাদি সাহিত্য—রামায়ণ ও মহাভারত অক্ষয় সম্পদ—যা সৃষ্টি-ধ্বংসের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমান থাকবে। ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য রচয়িতৃগণের মধ্যে মহাকবি কালিদাস একাই একশো। তাঁর রচিত মহাকাব্য ও নাটক বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এছাড়া অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ভবভূতির উত্তর রামচরিত, ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্‌, মাঘের শিশুপালবধ, ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্য, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, জয়দেবের গীতগোবিন্দম্‌ —প্রত্যেকটিই অমূল্য সম্পদ। পঞ্চতন্ত্রম্‌ গল্প-সাহিত্যের এক উজ্জ্বল মণি—যা পৃথিবীর প্রায়

৫০টি ভাষায় অনূদিত হয়ে গল্পরসিকদের আনন্দ-রসের যোগান দিচ্ছে। ঐতিহাসিক কাব্য রাজ-তরঙ্গিনী এক অনন্য নাম। বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী গদ্যসাহিত্যের চরমোৎকর্ষ। এরূপ আরও কত কত কাব্য আছে তা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে হিসাব দেওয়া অসম্ভব।

(চ) গণিতবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা— (ম্যাথে-মেটিকস্, অ্যাস্ট্রোনমি ও অ্যাস্ট্রোলজি)—প্রাচীন-কালের ভারতে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক আলোচনা স্বল্প নয়। সুপণ্ডিত আর্যভট্টের নাম পৃথিবীবাসী জানেন। পৃথিবী যে গোলাকার ও পৃথিবী তার অক্ষের (Axis-এর) উপর ঘোরে তা তিনি প্রমাণ করে গেছেন। পূজনীয় আর্যভট্টের নামানুসারে বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। আর্যভট্টের শিষ্য ভাস্করাচার্য 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক মূল্যবান তত্ত্বের কথা বলেছেন। সুপণ্ডিত দিয়ে গবেষণা করালে ঐ গ্রন্থ থেকে অনেক তত্ত্ব যা আধুনিক বিজ্ঞানের উপযোগী—তা প্রকাশিত হতে পারে বলে মনে করি। বিদুষী লীলাবতীর 'বীজগণিত' সর্বজনবিদিত। 'শুল্বসূত্রে' আধুনিক জ্যামিতির বহু বিষয়ের আলোচনা আছে। জ্যোতির্বিদ্যায় অভিজ্ঞা খনার কথা সুবিদিত।

(ছ) চিকিৎসাবিদ্যা ও অ্যানাটমি—চিকিৎসা-বিদ্যায় ভারতের দান অল্প নয়। অথর্ববেদের উপাঙ্গ আয়ুর্বেদে চিকিৎসাবিষয়ক বহু গবেষণা আছে। এছাড়া 'চরকসংহিতা'র নাম প্রসিদ্ধ। ধন্বন্তরি কর্তৃক রচিত ঔষধবিষয়ক অভিধান 'ধন্বন্তরিনিঘণ্টু'র কথা সুপরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্ সুশ্রুতের নাম ভারতের বাইরেও প্রচারিত ছিল। অতি প্রাচীনকালেও Plastic surgery-র প্রচলন ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচীন কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতি আজও ভারতে প্রচলিত আছে। চরক ও সুশ্রুত নামে খ্যাত প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আছে। এই অমূল্য গ্রন্থ দুইটি খ্রীষ্টজন্মের বহু বৎসর পূর্বেই রচিত—পণ্ডিত-গণ অনুমান করেন। খ্রীষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে নাগার্জুন নামে বৌদ্ধ ভিক্ষু বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরের কাছাকাছি এক নিভৃত পাহাড়ের উপর নাগার্জুনের রসায়নাগার এখনও দেখা যায়।

(জ) ব্যাকরণশাস্ত্র—পাণিনি-রচিত অষ্টাধ্যায়ী সংস্কৃত ব্যাকরণ দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মতো। সুগভীর, সুবিস্তৃত ও সুসূক্ষ্ম বিচার সমন্বিত এরূপ ব্যাকরণ পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় আছে কিনা জানা নেই। কাত্যায়নের বার্তিকসূত্র ও মহর্ষি পতঞ্জলির মহাভাষ্য অষ্টাধ্যায়ীকে পূর্ণতা দান করেছে। ভট্টোজী দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র কথা সংস্কৃতভাষার ছাত্রছাত্রীরা জানে। এছাড়া 'মুগ্ধবোধ', 'সংক্ষিপ্তসার', 'সারস্বত' প্রভৃতি বিবিধ ব্যাকরণগ্রন্থের কথা আমরা জানি। ব্যাকরণকে বেদরূপ পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হয়— 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'। ব্যাকরণই সংস্কৃতভাষার প্রধান নিয়ামক। আর প্রথম বিদ্বান্ হলেন তাঁরা, যাঁরা ব্যাকরণ জানেন—'প্রথমে বিদ্বাংসো হি বৈয়াকরণাঃ'।

(ঝ) অলংকারশাস্ত্র—অলংকার কাব্যের শোভাবর্ধক। তাই অলংকারকে উপজীব্য করে আলংকারিকগণ বহু অলংকারবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ', ভামহের 'কাব্যালংকার', বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উদ্ভটের 'অলংকারসংগ্রহ', রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা', আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' কম প্রসিদ্ধ নয়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থটি বাংলাবিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায়

সহায়ক পাঠরূপে গণ্য।

(ঞ) কামশাস্ত্র—ভারতীয় জীবনের চারটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য—তা হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটি লক্ষ্যের কোনটিই তুচ্ছ নয়; কারণ বিশেষজ্ঞদের মত হল—ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ—সমানভাবেই গ্রহণীয়। তাই কামবিষয়ক আলোচনাও ঋষি-রচিত গ্রন্থে দেখা যায়। কামবিষয়ক শাস্ত্র ঋষি বাৎস্যায়ণের 'কামসূত্রম্' সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া জ্যোতিরীশ্বরের 'পঞ্চসায়ক' ও কবি জয়দেবের 'রতিমঞ্জরী' উল্লেখযোগ্য।

(ট) কলাশাস্ত্র (Fine Arts)—সংস্কৃতভাষায় রচিত চতুঃষষ্টি কলা গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু তা আজ কালের কবলে কবলিত। নাটক ও অভিনয়বিষয়ক গ্রন্থ ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রম্' সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন। এই গ্রন্থের উপর অনেক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গীত বিষয়ে সঙ্গীতরত্নাকর, দামোদরের 'সঙ্গীতদর্পণ', সোমনাথের 'রাগবিবোধ' ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্গীত ও রাগরাগিণী বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' নামক গ্রন্থে চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

(ঠ) ছন্দঃ —ছন্দঃ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়ক হল সংস্কৃতভাষায় লিখিত ছন্দঃ-র উপর বিবিধ গ্রন্থ। এগুলি হল—সাংখ্যায়ণের 'শ্রৌতসূত্রম্', কাত্যায়নের 'অনুক্রমণি', পিঙ্গলের 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম্', গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জুরী' ইত্যাদি।

(ড) ভাষাতত্ত্ব—সুপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় আদিভাষার পুনরুদ্ধারে সংস্কৃতভাষা সহায়ক—এ প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে (যেমন গ্রীক্, ল্যাটিন ইত্যাদি) সংস্কৃতের নিকট সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ। বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য সংস্কৃতপাঠের প্রয়োজন আছে। ভাষাতত্ত্বের গবেষণার ক্ষেত্রে সংস্কৃতভাষার অপরিহার্যতার কথা ভাষাতত্ত্ববিদ্ টি. বারো (T. Burrow) তাঁর সংস্কৃতভাষা (The Sanskrit Language) গ্রন্থে বলেছেন—"The discovery of Sanskrit Language by European Scholars at the end of the eighteenth century was the starting point from which developed the study of the comparative Philology of the Indo-European languages and eventually the whole science of modern linguistics."
—(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃতভাষার অনুসন্ধানই ছিল সূচনা, যা কালে তুলনামূলক ভারত-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানকে উন্নত করেছে এবং যার ফলশ্রুতি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান।)

(ঢ) অভিধান গ্রন্থ—সংস্কৃতে রচিত অভিধান গ্রন্থের মধ্যে অমরসিংহ-রচিত 'অমরকোষ' বিখ্যাত গ্রন্থ। এছাড়া 'শব্দকল্পদ্রুম', 'মেদিনী' ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আধুনিক কালে সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত Anglo-Sanskrit অভিধান গ্রন্থ আছে।

(ণ) ভারতের জাতীয় আদর্শবাক্য—ভারতসরকার 'বন্দেমাতরম্', 'সত্যমেব জয়তে,' 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—ইত্যাদি জাতীয় আদর্শ বাক্যরূপে গ্রহণ করেছেন—এসবই সংস্কৃতের দান।

ইউরোপীয় ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাবঃ ভারতীয় ভাষাসমূহের জননীস্বরূপা সংস্কৃতভাষা কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাগুলিকেই পুষ্ট করছে না—ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবের কথা বিদেশী পণ্ডিতের ভাষায় ভূরি ভূরি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ও

সাহিত্যিক Winternitz তাঁর 'A History of Indian Literature' (Vol. I) গ্রন্থে বলেছেন—ইউরোপীয় সাহিত্যের উপর এই প্রভাবের কথা বলতে যেয়ে আবেগে পঞ্চমুখ হয়েছেন। বিশেষতঃ জার্মান সাহিত্য ও দর্শন বিগত উনিশ শতক থেকে যেভাবে ভারতীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে—তা তিনি সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল (Macdonell) মহাশয়ও সংস্কৃতের ঋণ স্বীকার করে বলেছেন—"The intellectual debt of Europe to Sanskrit literature has been undeniably great. It may perhaps become greater still in the years that are to come."

—(সংস্কৃতভাষার প্রতি ইউরোপের তাত্ত্বিক ঋণ অনস্বীকার্যভাবে মহান। সম্ভবতঃ আগামী দিনে এটা মহত্তর হবে।)

সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজির মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার বহুমুখী প্রসারতার কথা বলতে গিয়ে মহামনীষী মোক্ষমূলার তাঁর 'ভারত: আমাদের কি শিখাতে পারে' (India : What can it teach us) গ্রন্থে বলেছেন—"Whatever sphere of human mind you may select for your special study, whether it be language or religion, or mythology or philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, everywhere you have to go to India, whether you like it or not, because some of the most valuable and instructive materials in the history of man are treasured up in India and India only."

—(মানব মনের যে-কোন দিকেই তুমি অনুসন্ধান করতে চাও না কেন, ভাষা বা ধর্ম, অথবা পুরাণ বা দর্শনশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, আইন, প্রাচীন কলা বা আদি বিজ্ঞান—সবক্ষেত্রের জন্যই তোমাকে ভারতে যেতেই হবে, এটা তুমি পছন্দ কর আর না কর। কারণ মানব-ইতিহাসের মূল্যবান এবং শিক্ষণীয় যাবতীয় সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে ভারতে—একমাত্র ভারতেই।)

সংস্কৃতের অভিযাত্রা: প্রত্নতাত্ত্বিকগণের তথ্য থেকে জানা যায়—কেবল ভারতবর্ষেই নয়—সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ও আমেরিকায় সংস্কৃতভাষার অভিযাত্রা ও ব্যাপ্তি ঘটেছিল। কিছুকাল পূর্বেও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলির—বালি, জাভা, বোর্নিয়ো, সুমাত্রা, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। আজ থেকে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব পর্যন্তও ল্যাটিন আমেরিকার একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। এটা সম্ভব হয়েছিল সংস্কৃতের সহজাত শক্তির ফলে।

সংস্কৃতভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য: সংস্কৃতভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—এ ভাষা দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। দুই বা তিন হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃত, আধুনিক কালের সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পক্ষান্তরে মাত্র পাঁচশ বছরের পুরানো বাংলাভাষা কালের বিবর্তনে (ভাষার) রূপান্তর ঘটায় যা আধুনিক বঙ্গভাষায় শিক্ষিতগণ সহজে পাঠোদ্ধার বা অর্থোদ্ধার করতে সর্বদা সমর্থ নন্। এ ব্যাপারে তাঁদের ভাষার ক্রমবিকাশের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়।

সংস্কৃতভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য—এর ধ্বনিমাধুর্য। সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে এক তেজোদৃপ্ত গৌরবের অনুভূতি ঘটে। এর আর এক বৈশিষ্ট্য—এ ভাষার অফুরন্ত শব্দভাণ্ডার। বাংলাভাষায় সংস্কৃতশব্দের বহুলপ্রয়োগ প্রচলিত। ইংরেজীর সঙ্গে গ্রীক-ল্যাটিনের যে সম্পর্ক তার থেকেও গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাংলা

ও সংস্কৃতের। বাংলা কাব্য, নাটক, গল্প প্রভৃতি রচনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য চাই সংস্কৃতের জ্ঞান। বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায়ও সংস্কৃত অপরিহার্য।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত : অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি "বনের বেদান্তকে লোকালয়ে এনে তাকে আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—প্রয়োগ করার কৌশল দেখিয়ে গেছেন—তিনি সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে কত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং সেইসঙ্গে সংস্কৃতচর্চার প্রতি কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন—তা তাঁর বক্তব্যেই পরিস্ফুট। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতোই 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' থেকে সংস্কৃত সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য এই স্বল্প পরিসরে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করছি এই কথা ভেবে যে, ভারতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হলেই প্রয়োজন হয় সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের।

স্বামীজীর মতে ভারতে চিরকাল—"ভাষাগত ঐক্য, শাসনব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।" কিন্তু বর্তমান ভারতে এর অন্যথা দেখা যায়—এখন ভাষাগত ঐক্য অনুপস্থিত, শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট এবং ধর্মের প্রতি নিতান্ত অবহেলা। বর্তমানে এই তিন সমস্যার সমাধানে সংস্কৃতভাষাই একমাত্র সহায়ক বলে মনে করি।

স্বামীজীর মতে—"এমন একটি মহান্ পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা সমস্যার) একমাত্র সমাধান।"[১]

একমাত্র সংস্কৃতভাষাই এই জাতির ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিল। স্বামীজীর কথায়—"এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই যেন কবি-কল্পনার পুষ্পবেদীতে স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম সংস্কৃত বা 'পূর্ণাঙ্গ' ভাষা। এমন কি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।"[২]

স্বামীজীর দৃঢ় অভিমত এই যে, হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলি লোকের হৃদয়ঙ্গম করাতে হলে দেশের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সংস্কৃতভাষার অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃত কঠিন হলেও একদা ব্রাহ্মণগণ অধ্যবসায়ের দ্বারা যে ভাষা অধিগত করে উচ্চশিক্ষা ও মহত্ত্বের অধিকারী হয়েছিলেন—সেই শিক্ষার ও মহত্ত্বের অধিকারী সকলেই হতে পারে—এই অভিমত ছিল স্বামীজীর। মাদ্রাজে বক্তৃতাকালে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন—"আমার সঙ্কল্প এই : প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, ঐ শাস্ত্র-নিবদ্ধ তত্ত্বগুলিকে—শুধু যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতেই বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃতভাষায় ঐ তত্ত্বগুলি রক্ষিত, সেই সংস্কৃতশব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই; আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্বসাধারণের—প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক, তা সে সংস্কৃতভাষা জানুক বা না জানুক। এই সংস্কৃতভাষার—আমাদের গৌরবের বস্তু, এই

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৭০

২ ঐ, পৃঃ ৩৮৫

সংস্কৃতভাষার কাঠিন্যই এই সকল ভাবপ্রচারের এক মহান্ অন্তরায়, আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিখিতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে। সংস্কৃতভাষা যে কঠিন, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নূতন ঠেকে। যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারো। সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

"সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষাও চলিবে। কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃতশব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবৎকালে অদ্ভুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয় তাহার কিছু কারণ আছে; এই মহান্ আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতি বন্ধ হইল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমন কি, মহান্ বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফললাভ চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন। অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন, এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; অতি দূরে দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরববোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না।"[৩]

সংস্কৃতভাষা শিক্ষা না করার জন্য স্বামীজী কৈফিয়ত চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—"তোমরা সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যখনই এইগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিলাভের ইহাই রহস্য।

"ভারতে সংস্কৃতভাষা ও মর্যাদা সমার্থক। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞানলাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর।"[৪]

স্বামীজী সংস্কৃতভাষায় কয়েকটি কবিতাও রচনা করেছিলেন, সেগুলি 'বীরবাণী' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। কয়েকটি কবিতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজগদম্বাকে অবলম্বন করে লিখিত। এই রচনাগুলির মধ্যে তাঁহার সংস্কৃত পদ্যরচনার পাণ্ডিত্য, অলংকারপ্রয়োগের নৈপুণ্য, ছন্দোব্যবহারের পটুতা ও মনোরম শব্দচয়নের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

---

৩ ঐ, পৃঃ ১৮৬-৮৭

৪ ঐ, পৃঃ ১৯৬

স্বামীজী কয়েকটি পত্রও সংস্কৃতভাষায় লিখেছিলেন। পত্রগুলির ভাষা ও যুক্তির দৃঢ়তা পাঠকের চিত্ত হরণ করে ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই পত্রগুলি শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা। পত্রাবলীর ৩২৯-সংখ্যক পত্রে তিনি মুক্তি ও জীবন্মুক্তির কথা আলোচনা করেছেন। ৩২৯-সংখ্যক পত্রটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

দার্জিলিং
১৯শে মার্চ, ১৮৯৭

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শুভমস্তু। আশীর্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ স্বস্থতরম্। অচলগুরোর্হিমনির্মণ্ডিতশিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং, তন্ময়া অনুভূতং পূর্বম্। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-হয়নায়।' জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম্। তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগ-দার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রী১০৮ রামকৃষ্ণং আবির্ভবিতুং তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্ত্বম্ আবিষ্কৃত-মহাশৌর্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যগ্ যতিষ্যসে।...ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি—

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায়, সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতভাষার যে চিরন্তন প্রয়োজন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে বলেছেন—'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"

স্বদেশে অমৃতময়ী সংস্কৃতভাষাকে নীরব করার চেষ্টা হয়েছিল মুসলিম ও ইংরেজশাসনকালে। কিন্তু সে চেষ্টা সত্ত্বেও সংস্কৃতভাষার সৃজনীশক্তি ক্ষীণ হয়নি। ঐ সময়েও কাব্য, দর্শন, অলংকার, জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থরাজিও রচিত হয়েছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল সংস্কৃতের অমর প্রাণশক্তির জন্যই। স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতভাষার যতখানি চর্চা বা সেবা হওয়ার প্রয়োজন তা হচ্ছে না—এটাই পরিতাপের বিষয়। ইংরেজরা যা করতে পারেনি—তা আমাদের স্বাধীন দেশের স্বদেশ-বাসীরা—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার—মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকা থেকেও সংস্কৃতকে দূরে সরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। সংস্কৃতভাষাকে যথাযোগ্য সেবার অর্ঘ্য দিয়ে যে সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন—তা সরকারী নীতিতে প্রতিফলিত নয়; সেইসঙ্গে তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্য শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশের উন্নাসিকতায় সংস্কৃত 'পুরুতের ভাষায়' রূপান্তরিত হতে চলেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটকালে সংস্কৃতভাষাশিক্ষা আর্থিক-সমস্যা দূর করতে পারবে না—এই মিথ্যা প্রচারণার উত্তরে বলা যায়, আমরা যে জীবিকাই গ্রহণ করি না কেন—যেমন সাহিত্যচর্চা, রাজ-নীতি, চিকিৎসা, আইনব্যবসায়, অধ্যাপনা

ইত্যাদি—সর্বস্থানেই সংস্কৃত নিশ্চয়ই আমাদের সহায়ক হবে। বর্তমান চাঁদে যাওয়ার যুগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকযুগে সংস্কৃতের স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—বিজ্ঞানবিষয়ে সংস্কৃতের দান কম নয়। মহর্ষি কণাদ, পণ্ডিত আর্যভট্ট—এঁরা তো এদেশেই জন্মেছিলেন। তাঁদের তত্ত্বের আলোচনা আমরা করলুম কবে? আমরা কতটুকু জানি ওঁদের আলোচ্য-বিষয়গুলির কথা? আর জানাবার ব্যবস্থাই বা কোথায়? আমরা জানি না আমাদের ভাণ্ডারে কি আছে। সর্বদাই দেখা যায়, মণি ফেলে কাচখণ্ডে রুচি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-শূন্যতায় এবং শিক্ষিতগণের অনাদরে ঐসব তত্ত্ব রয়ে গেল—'নিহিতং গুহায়াম্।'

পরিশেষে বলা যায়, সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। তার গুরুত্ব লঘু হয়নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাতৃভাষা, সাংস্কৃতিক আগ্রহ এবং মনস্বিতার উৎকর্ষের জন্য সংস্কৃতভাষার অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। স্বামীজী যে ভাষার চর্চার প্রতি এত আগ্রহশীল ছিলেন—সেই ভাষা সংস্কৃতের পঠনপাঠন সাগ্রহে অনুষ্ঠিত হোক। ঋষিদের মননজাত নিধি গ্রহণ করে ঋণের বোঝা আমাদের উপর—সেই ঋষি-ঋণ শোধ দেওয়া আমাদের অসাধ্য কিন্তু সংস্কৃতের চর্চা করে—সংস্কৃতের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অব্যাহত রেখে অন্ততঃ ঐ ঋণ স্মরণের পথ যেন খোলা রাখি।*

* প্রবন্ধে আলোচিত গ্রন্থ: (ক) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড। (খ) অভিনব সংস্কৃত শিক্ষাদান পদ্ধতি—শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আজ আমাদের একান্তই প্রয়োজন

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

প্রবন্ধকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশ্রুত ঐতিহাসিক,—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো এবং দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর অব্ হিস্ট্রি। খ্যাতনামা ইতিহাস-গ্রন্থকার। সম্প্রতি-গঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পরিষদের তিনি কর্মসচিব।

বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের সমস্যার অন্ত নেই। পৃথিবীর অন্য দেশের কথা বাদ দিয়ে যদি নিজেদের দেশ ও সমাজের দিকে তাকাই তাহলে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে অসংখ্য। আমরা এর জন্য দায়ী করি সরকার, বর্তমান যুগ, যুবসমাজ, রাজনীতি এবং অন্যকে। কখনও নিজেদের সমালোচনা করি না, কেন ও কিসের অভাবে এই সঙ্কটের মধ্যে আমরা পড়েছি এবং পথের সন্ধান না পেয়ে আরও দিশাহারা হয়ে পড়েছি সেই নিয়ে ধীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করছি না। একটি কথা প্রায়ই শুনি। সেটি হল—দেশে, বিশেষ করে যুব-সমাজে ও যুবমানসে, মূল্যবোধের অভাব। "মূল্য-বোধ" কাকে বলে, কোন্ "মূল্য" (value) গ্রহণ-যোগ্য সে নিয়েও প্রচুর লেখালেখি তর্কবিতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে। এর কোন শেষ নেই। অন্য দিকে জাতীয় সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার বর্জন, মানবিকতা, মানব অধিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আমরা গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করছি। উদ্বেগ-আশঙ্কা প্রকাশ করছি। কিন্তু আমরা মূল সমস্যা কোথায় তা ভাবছি না। ভাবলেও তার সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা করছি না।

যে-কোন দেশের মানুষ যখন বড় কোন কাজ করে, উন্নতি করে ও দেশের কঠোর জটিল সমস্যার সমাধান করে তার পিছনে থাকে অনুপ্রেরণা। সামনে থাকে আদর্শ। সেই অনুপ্রেরণার উৎস হল দেশের মাটি, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তারই সঙ্গে বহির্জগতের ভাল ও গ্রহণ-যোগ্য যা কিছু তা যুক্ত হলে উন্নতি ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়, জীবন ও চিন্তা সমৃদ্ধ হয়। উনিশ শতকের ভারতের নবজাগরণ এই ঐতিহাসিক ধারাই অনুসরণ করেছে। তার পূর্বের শত শত বছরের ইতিহাসও একই সাক্ষ্য বহন করে। যখনই ভারতবর্ষ এই পথ থেকে কোন কারণে সরে গিয়েছে তখনই তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমন্বয়, ঐক্য এবং সংহতি বিপন্ন হয়েছে।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—উনিশ শতকের সব মনীষী এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের সমগ্র জীবন, চিন্তা ও লেখনীতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অতুলনীয়ভাবে ভারত-ইতিহাসের মর্ম-কথা ও মূল শিক্ষার অভিব্যক্তি ঘটেছে। ভারত-জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতির শুভ্র সমন্বিত রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক কারণে দেশের ও জাতির স্বার্থে এই ভাবান্দোলনের প্রচার ও প্রসার একান্ত জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে মূল্যবোধের সমস্যায় আমরা বিভ্রান্ত তার সমাধানের পথ-নির্দেশ রয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায়।

বর্তমান ভারতের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি হল : জাতীয় সংহতি; ধর্মনিরপেক্ষতা; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা; সাংস্কৃতিক সমন্বয়; সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের অবসান; অস্পৃশ্যতা; নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষার প্রসার; নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা; অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন; শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি; মানব অধিকার ও মানবিকতার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। এই সমস্যা বা প্রশ্নগুলির প্রতিটি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনা-চিন্তার অসীম গুরুত্ব রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে এই সব কটি সমস্যা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেননি। সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ করেননি, কিন্তু তাঁর কথামৃত এবং গল্প-উপমার মধ্যে যে মত ও পথের ইঙ্গিত রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অননুকরণীয় বলিষ্ঠ ভাষায়, দৃপ্তকণ্ঠে বহু পূর্বেই আজকের সমস্যাগুলির যুক্তিবাদী বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়ের কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজও ঐ ভাবে বিবেকা-নন্দ-চর্চা আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। যুক্তি ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল বিবেকানন্দের জীবনে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী গুরুরূপে স্বীকার করেছিলেন নিজের মনের সব প্রশ্ন সব সংস্কার দূর হবার পর। আজকের যুবসমাজও ভারতীয় ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতি-হাসিক পুরুষ, মহাপুরুষদের সব কিছুকে যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করবে এবং তারই ভিত্তিতে গ্রহণ বা বর্জন করবে এটাই প্রত্যাশিত। তাদের মনে বহু প্রশ্ন আছে। সেই সব প্রশ্ন করতে দিতে হবে। সদুত্তর দিতে হবে। আমরা যদি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, গভীরভাবে পড়াশোনায় উৎসাহিত করতে পারি, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রশ্নের উত্তর পাবে এবং এই ভাব-চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।

বর্তমান পাশ্চাত্যের মানুষ সমান অধিকার, সাম্য, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-অধিকার, ধর্মসহিষ্ণুতা, বিজ্ঞানী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নতমানের জীবন, ভিন্নমত পোষণের অধিকার

প্রভৃতি আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাস করে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কাঠামো সেইভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের দেশও ঐ একই চিন্তা-ভাবনা ও উদ্দেশ্য ক্রমেই গ্রহণ করছে। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, বর্তমানে যা নতুন ও অভিনব মনে হচ্ছে আসলে তা নতুন বা অভিনব নয়। বহু পূর্বেই বিবেকানন্দ এই সব প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন, তাদের সার্থকতা ও বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন।

অপ্রিয় হলেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমান ভারতের শিক্ষিতসমাজ, এমন কি শিক্ষকসমাজও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল-ধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন। এর ফলে বৃহত্তর ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ নিজের দেশ ও সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় পাচ্ছে না। নিজের দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে, লালিত-পালিত হয়েছে এমন মতাদর্শ এবং জীবনাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তারা বিদেশী দর্শন ও জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। দেশে-বিদেশে এমন গ্রন্থ রচিত হচ্ছে যা পড়ে ভারতবর্ষ, ভারতের মানুষ, ভারত সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার হচ্ছে। এর থেকে উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাস এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনও বাদ যাচ্ছে না। এর ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে সে-বিষয়ে আমরা সচেতন নই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ সম্বন্ধে ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণায় এ দেশের মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র ও যুবসমাজকে আগ্রহী করে তোলার জন্য গঠনমূলক প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়েছে এক বিশেষ কমিটি—Committee for a Comprehensive Study of the Ramakrishna-Vivekananda Movement. বিদেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরাও সানন্দে এই কমিটিতে যোগদান করেছেন। কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়—সারা বিশ্বে এই ভাবান্দোলন ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন। হিংসা, দ্বেষ ও হানাহানিতে জর্জরিত, রক্তাক্ত পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোনও সংশয় নেই। চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলণ্ড, জার্মানী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের বহু চিন্তাবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন যে, কেবলমাত্র চরিত্র-গঠনের জন্য নয়, ব্যক্তিজীবনের উন্নতির জন্য নয়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার ও প্রসার অপরিহার্য।

বিশ্বসমস্যা ও তার সমাধান সম্বন্ধে ভারত-বর্ষের উদ্যোগ ও উদ্বেগ নতুন কথা নয়। অবশ্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত কি গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন কতখানি সহায়ক হতে পারে তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল নিজেকে আবিষ্কার করা, আত্মপরিচয় লাভ করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া। স্বাধীনতা-লাভের চার দশকের মধ্যেই ভারতবর্ষে আবার সেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেন এমন হল সেই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আজ যে আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন সেই বিষয়ে আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে।

ভাবী শিল্পাচার্যকে তাঁর গুরুর পত্র

শ্রীগৌতম হালদার

তরুণ লেখক বিশ্রুত শিল্পী শ্রীঅসিত হালদারের ভ্রাতুষ্পুত্র—ইস্টার্ন কোলফিল্ডে এগ্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার (সিভিল)-পদে নিযুক্ত। ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের নিয়ে লেখায় ও গবেষণায় উৎসাহী।

নন্দলাল বসুকে লিখিত শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের পত্রটি তাঁর সতীর্থ শিল্পী অসিতকুমার হালদারের সংগ্রহে ছিল। পরে শিল্পী-কন্যা শ্রীমতী অতসী বড়ুয়া তা সযত্নে রক্ষা করেন।

পত্রটি তারিখ-বিহীন কিন্তু অনুমান করি পত্রটি ১৯১৮-২০ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে লেখা।

১৯০৫-১৯১১ প্রায় ছয় বছর নন্দলাল-অসিতকুমারদের ছাত্রজীবন কাটে কলকাতা সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ। শিক্ষাসমাপনান্তে নন্দলাল ১৯১২-১৪ তিন বছর মাসিক ষাট টাকা বৃত্তিতে গুরু অবনীন্দ্র-সান্নিধ্যে শিল্পচর্চায় নিরত ছিলেন। অসিতকুমার ১৯১১-১৫ প্রায় একটানা পাঁচ বছর রবীন্দ্রনাথের ডাকে শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের গোড়াপত্তনে অংশ নেন। ইতিমধ্যে অসিতকুমার ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসেন এবং অভ্যর্থিত হন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু মাঝে মধ্যে কলকাতা-শান্তিনিকেতন আসা-যাওয়া করলেও নন্দলাল স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপনায় যোগ দেন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। অসিত-কুমার মাঝে কলকাতা শিল্প বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করে রবীন্দ্রনাথের ডাকে ফিরে আসেন শান্তিনিকেতন ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবতঃ ১৯১৮-র কোন সময় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় স্বচ্ছ ভাবনার এই প্রকাশ ঘটান প্রিয়তম শিষ্য নন্দলালকে লেখা আলোচ্য পত্রটিতে। নন্দলালরা শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চায় যে পরিবেশ রচনা করেছিলেন তার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি।

পত্রটি আগে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। যদি তা হয়েও থাকে, তথাপি আচার্য নন্দলালের জন্মশতবর্ষ স্মরণে পত্রটির পুনঃপ্রকাশ দোষের নয়। পত্রটির অনুলিখনে সহায়তা পেয়েছি সোদরপ্রতিম শ্রীসুনির্মল দাসের।

পত্রটি হুবহু প্রকাশিত হলে নন্দলাল-অবনীন্দ্র-নাথের ভাবসূত্রটি যেমন ধরতে সুবিধা হবে, তেমনই শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কেও ধারণা স্পষ্টতর হতে সহায়তা করবে মনে হয়। গুরু কেমন করে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে গঠন করেছেন—তাঁর সমস্ত ধ্যান-ধারণা দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তারও আভাস এই পত্রে মিলবে। পত্রটি এই :

রবিবার

প্রিয় নন্দলাল,

১। মাথা কামিয়ে উকুন তাড়ানোতে ফল পাওয়া যায় কিন্তু তাতে বাহাদুরি কিম্বা আর্ট নেই, ও শুধু ডাক্তারি, চুল কামানো চলে, কিন্তু গায়ের চামড়া চেঁচে খোস তাড়ানোর চেষ্টায় বিপদ আছে। চুল থাকবে উকুন থাকবে না, চামড়া যেমন তেমন থাকবে অথচ খোস্ থাকবে না এই হল art। ইতি সাফাই-সরদার

"হামামগীরের উক্তি"

২। চোর কাঁটার খোঁচা খেয়ে মাঠ ভাঙ্গায় সুখ নেই বলে মাঠে মাঠে ছুটোছুটি ছেড়ে ছিমেণ্ট করা টেনিস গ্রাউণ্ডে চলাতে আরাম আছে, কিন্তু আর্ট নেই, মজাও নেই, নিজের
গণ্ডির মধ্যে
পথের কাঁটা এবং পরের পথের কাঁটা তোলায় আর্ট ও পুণ্য লাভ হয়। ইতি চানক্য দি সেকেণ্ড চৌরধারমিক।

৩। যেখানে জলের অভাব সে জায়গা ছেড়ে জলাশয়ের তীরে গিয়ে বাস করলে বুদ্ধিমন্ত বলতে পারে সবাই কিন্তু এতে জল আছে ফল নেই মানুষও নেই। খরার বুকের ধারা বহানোতেই art, খরার ভয়ে ধারার দিকে সরে পড়ায় জিৎ নেই হারই আছে। ইতি—artisan R.E. R.A. etc.

উপরে যে কটা কাযের ফর্দ্দ দিলেম তা থেকে বুঝবে যে ওখানে ছবি আঁকা ছাড়াও art কে দিয়ে আরো কতখানি কার্য তোমাদের করিয়ে নিতে হবে। হার না মানা হচ্ছে আর্টিষ্ট হবার প্রথম সোপান, উকুনের কাছে হার মেনে মাথা মোড়ানো কেন সইবে artist ! অতএব তোমাদের একদল সাফাই সদ্দার হয়ে দিনে এক ঘণ্টা কাম করতে হবে ছেলেগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে
চিল কাকপক্ষ
চিকন চুল কালো চামড়া পরিষ্কার করলে সুন্দর। তাদের গায়ে মাথায় চোখে মুখে কাপড়ে চোপড়ে বাসা বাঁধবে উকুন নয়, পোকামাকড় নয়। তারপর খেলাছলে পথের কাঁটা কত সহজে পরিষ্কার হয় সেটা যেদিন ছেলেরা দেখবে সেদিন তারা দিক বিজয় করতে আপনারাই বেরিয়ে পরবে তাদের কন্টিকারির সঙ্গে। কোটালের বান হঠাৎ আসে, আশ্রম শুকিয়ে যাবে যদি বান
চিহ্ন, চরণ
না আনো তোমরা। সুরের বান যেদিন চোখের কূল ছাপিয়ে আসবে সেদিন শুকনো মাঠে জল আসতে একটুও দেরী করবে না। এজন্যে জলকে বেঁধে আনবার বা বান ছুটিয়ে দেবার জন্যে artist কোটাল একদল চাই, না হলে চলবে না।

চিহ্ন-বান

ছোট ছেলেরা চারা গাছ। তাদের যে শিকড় রস টানবে সেখানে artist কোটালের দল এমনভাবে নজর রাখবে যে গাছ যেন বোধ করে সে নিজেই রস টানছে আর বাড়ছে।

অলকের ছেলে ভাল আছে, আমি এসে দেখি ডাক্তারের কথা শুনে ছেলেটাকে পারুল আর অলক দুজনে মিলে তুলো দিয়ে মুড়ে ফেলেছে আর তার কপালে ঠাণ্ডা পটি লাগাচ্ছে [।] আমি এসে সব খুলে দিতেই ছেলেটা সুস্থ হবার দিকে আবার আস্তে আস্তে চলেছে—আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি।

তোমারই
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলক—মণীন্দ্রপুত্র; পারুল—পুত্রবধূ; ছেলেটা—সম্ভবতঃ অলকের পুত্র ডঃ অমিতেন্দ্রনাথ।

ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ

ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী

বিশ্বভারতীর বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক। হিন্দী, বাঙলা, অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষায় সুখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক।

"'আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস!' হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্যবান্, আমি মেধাবান্, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান্' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি।"—সংস্কারবিরোধী অগ্নিগর্ভ এই উপদেশ উচ্চারিত স্বামী বিবেকানন্দের মুখে— আমাদেরই উদ্দেশে। কারণ আমরা আত্মগরিমা ও অভিমানহীন, বুদ্ধিহীন, দুর্বল ও কাপুরুষ। এই বুদ্ধিহীনতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা—মানুষের তথা জাতির প্রধান শত্রু। একথা আজ আমরা জানি এবং মানি। কিন্তু এমন একসময় ছিল, যখন জানতাম না, মানতামও না।

বলবীর্যহীন নিষ্প্রভ-নিরীহ 'সবমানার দল' আধ-মরা বাঙালী তথা ভারতবাসীকে অসংকোচে 'ঘা মেরে' বাঁচানো যখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, তখনও এদেশে 'সুবোধ' বালকদেরই 'ভরা-কোটাল'। ভারতের নিস্তরঙ্গ মানসিকতায় প্রবল তরঙ্গ তুললেন প্রথমে রামমোহন রায়, পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রামমোহন 'ভারতপথিক'। যুগোচিত বলিষ্ঠ পুরুষকারের স্বরূপ বিমোচন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের আবির্ভাব হইলে বাঙালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।...দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।'

স্বদেশের এই প্রত্যাশাকে কালোচিত পূর্ণতা দান করেছিলেন কলকাতার সিমলার ভুবনেশ্বরী দেবীর 'প্রবল দুর্দান্ত' ছেলে 'বিলে'। উনিশ শতকের এই অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্বই বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। 'বিলে' বা নরেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যক্তিত্বের অঙ্কুরকে 'বিবেকানন্দে' পরিবৃদ্ধি এবং সম্প্রকাশের হোতা পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'

একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যায়—চৈতন্য-দেব, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পরমহংসদেবের সাধনা ও ব্যক্তিত্বে ভারততত্ত্ব বা ভারত-আত্মার বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে—যার একত্র সমাবেশ, সার্থক সমন্বয় এবং যুগোচিত প্রকাশ ঘটেছে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও সাধনায়।

'শচীমাতার প্রবল দুরন্ত ছেলে'টির প্রেমধর্ম ভাসিয়েছিল স্বদেশবাসীর হৃদয়। মানুষ, তা সে যে স্তরেরই হোক না কেন, পেল যথার্থ স্বীকৃতি। যার সুর ধ্বনিত হয়েছিল চণ্ডীদাসের পদে—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই॥'

স্বামীজীর প্রেমধর্ম স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে ঘটায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন। সমগ্র বিশ্ব বাঁধা পড়ে ভ্রাতৃত্বডোরে। 'যত্র জীব, তত্র শিব' স্বীকৃত হল বিশ্বময়। স্বামীজী বিশ্ববাসীকে ডেকে বললেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি,
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥'

বেদ-উপনিষদ্, ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে বিভিন্ন যুগে ভারতের যে মর্মবাণী অভিব্যক্তি লাভ করেছে, স্বামীজী তার তো মূর্ত বিগ্রহ। তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের বহু বিচিত্র ঘটনায়, তাঁর চিন্তন-মননে এবং কর্মসাধনায়। 'বসুধৈবকুটুম্বকম্' এবং মানুষ বা জীবমাত্রই অমৃতের সন্তান—ভারত-আত্মার এই শাশ্বতবাণীর বাস্তবায়ন এবং বিশ্বহৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠাই ছিল বিবেকানন্দের সাধনার মূল লক্ষ্য।

মানুষে মানুষে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়, যশ-মান-ধন, শক্তি-সামর্থ্য এবং দেশ-কালগত দুস্তর ব্যবধান স্বামীজীর মনে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। তাই কেবল ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন ছিল তাঁর সাধনমার্গের প্রথম সোপান। সুতরাং তাঁর ভারত-দর্শন এবং বিশ্ব-দর্শন দুই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপূরক।

গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচারে বিবেকানন্দ ছিলেন শঙ্করের অবতার। সুতরাং তাঁর সন্ন্যাসী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর সাধনার পীঠ মানুষ ও তার সমাজই, পাহাড়-পর্বতের গুহা-গহ্বর বা বিজন-অরণ্যের ঝোপ-ঝাড় নয়। মানুষকে দূরে রেখে, তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে মানুষের কল্যাণ-সাধন অসম্ভবের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। তাই স্বামীজীর ভারত-দর্শন না হলে অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের প্রকৃত অবস্থা এবং স্বরূপ চাক্ষুষ না হলে তাঁর সাধনার সূচনা হবে কি করে? তৎকালীন ভারতবর্ষের যে অনাহারক্লিষ্ট, রুগ্ন, অক্ষম-অসহায়, আত্ম-অবিশ্বাসী, অভিমানহীন করুণ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেন—তারই ফলস্বরূপ তাঁর অন্তরে শিব দেখা দিলেন রুদ্ররূপে। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে কঠিন ও চিরাগত বাধা—অন্ধ কুসংস্কার, জাতি ও ধর্মের জগদ্দলপাথর, আলস্য, অকর্মণ্যতা, হীনম্মন্যতা তথা সামাজিক অচলায়তনের বিষ-প্রভাবে জর্জরিত পঙ্গুতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রুদ্র-ধর্মের পালন এবং যা সুখকর, কল্যাণকর ও কালোপযোগী—তার স্বাঙ্গীকরণের পথ-নির্দেশে 'শিব-ধর্মের' 'উদ্‌যাপন' হয়ে উঠল স্বামীজীর আশু কর্তব্য। ভারতবর্ষের অধঃপতন, অতীত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা, এবং আধুনিকতার গোঁড়ামির দুঃখে-তাপে পীড়িত ও বিগলিতহৃদয় স্বামীজীর 'নিবাত নিষ্কম্প' কণ্ঠে যে অপূর্ব বাণীর উদ্‌ঘোষ ঘটল—তাই হল ভারতমুক্তির বীজমন্ত্র। তাতে যেমন অতীতের আনন্দ আছে, তেমনি আছে বর্তমানের আর্তি ও ভবিষ্যতের আশা। তিনি সহজ অথচ দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—

'তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতন পন্থার পক্ষপাতী। আমি তোমাদিগকে সনাতন আদর্শেরই আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন পন্থার অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই অধিকতর বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিবে; আর যতই তোমরা আধুনিক গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্বোধের মতো কাজ করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর, কারণ, তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেকটি বাণী বীর্যবান্ স্থির অকপট হৃদয় হইতে

উত্থিত, উহার প্রত্যেকটি স্বরই অমোঘ। তারপর জাতির অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল। উহার কারণ-পরম্পরা বিচার করিবার সময় আমাদের নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই আমাদের এই জাতীয় ব্যাধির, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়; জাতীয় বীর্যের পরিবর্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। সেই প্রাচীন কালের ভাব লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান্ হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।'

ভারতমুক্তির বীজমন্ত্র ভারত-আত্মার বাণী-রূপে সুধ্বনিত হল আর একভাবে—'হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর—তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারত-বাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারত-বাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল,—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত—"মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"'

ভারতীয় মানব-চেতনা, অধ্যাত্ম-চেতনা এবং সনাতন সংস্কারের এর চেয়ে সূক্ষ্ম, সংস্কৃত তথা যুগোপযোগী রূপ আর কি হতে পারে? সর্বোপরি যে স্বকীয় শিক্ষা ও সাধনার বিস্মৃতি ভারতের বর্তমান দুর্দশার প্রধান কারণ; তার এত সহজ এমন বলিষ্ঠ অথচ সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি অন্যত্র দুর্লভ। ভারত-চিত্তই স্বামীজীর চিত্তরূপে দেখা দিয়েছে।

আমরা জানি—বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর শুভ-সূচনা স্বদেশপ্রেম ও স্বজনমৈত্রীর মধ্যেই নিহিত। স্থান-কাল-পাত্রের অতীত যে ভারত-আত্মা বা বিশ্বাত্মার ভাবমূর্তি যুগ যুগ ধরে স্বদেশী তথা বিদেশী সাধক ও মনীষীদের হৃদয়লোকে উদ্-ভাসিত হয়েছে, তাকে যুগোপযোগী তথা বাস্তব করে তুলতে হলে 'বিবেক-বাণী'র সম্যক্ অনু-ধাবন এবং অনুসরণ ভিন্ন 'নাহি অন্য পথ'। বলাই বাহুল্য—'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী' কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, 'ছুটেছে জগৎময়'। বিশ্বের সর্বত্র তা প্রচারিত, স্বীকৃত, গৃহীত ও অনুসৃত হয়ে চলেছে। বহির্ভারতে 'ভারত-বিবেক-বাণী' প্রথম ধ্বনিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোর বিশ্ব-ধর্মমহাসম্মেলনে। সে-অধিবেশনে স্বামীজীর সামগ্রিক পরিচয় তো ভারত-আত্মারই ভাষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করে ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তন এবং জীবনাদর্শের প্রকৃত রূপচিত্রণে তিনি বিশ্ববাসীর বিরূপ মনকে ভারতের অনুকূল করে তুললেন—তা ভারত-আত্মারই বিশ্ববিজয়।

বিবেকানন্দের কাছে স্বদেশ-প্রীতি, ঈশ্বর-প্রীতিরই নামান্তর। তিনি যত বড় ত্যাগী তার চেয়েও বড় কর্মযোগী। আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যা তথা যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চায় পারঙ্গম স্বামীজীর মনে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে কোন দ্বিধা ছিল না। তার সাক্ষ্য বহন করছে বেলুড়ে স্থাপিত মঠ ও মন্দিরের পরিকল্পনা উদ্দেশ্য-নির্দেশ। বেলুড় মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপর সুশোভিত মনোগ্রামটি 'স্বামীজীর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকার-প্রকৃতির' ব্যঞ্জনাময় সূক্ষ্মবোধের অদ্বিতীয় নিদর্শন।

বিবেকানন্দের মধ্যে যেন সমগ্র ভারত খুঁজে পেয়েছে নিজেকে, অনুভব করেছে বিশ্বের

সহ-অস্তিত্ব ; আর বিশ্বের লোক চিনেছে প্রকৃত ভারতবর্ষকে। প্রতিস্পর্ধী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিত হয়েছে তাঁর চিত্তে। 'বৈপরীত্যকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধান'—ভারতের এই পরম সাধনা মুক্তি ও চরিতার্থতার পরম পথটি খুঁজে পেয়েছে স্বামীজীর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত স্মরণীয়—'বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চির-কালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'

বিবেকানন্দের এই সাধনা রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ১০৬-সংখ্যাক 'ভারততীর্থ' কবিতাতেও স্বীকৃত। যেমন—

'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার সেথা হতে সবে আনে উপহার/দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' আবার 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে' ভারত-মাতার অভিষেকের জন্য আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ ও পতিত—নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। বিবেক-বাণীর যথার্থ স্বরূপটি এখানে সমুদ্ভাসিত।

বিবেক-সাধনার মূলকথা—নীরবত্যাগ, আত্ম-বিশ্বাসে মানুষের মতো বাঁচবার স্পর্ধা। বিবেকানন্দের তীক্ষ্ণ-গভীর ও অভ্রান্ত দৃষ্টিশক্তির নিরলস বীক্ষণ, নির্ভুল কর্মপন্থা ও তার সুফল, বলিষ্ঠ চিন্তন-মনন অকুতোভয় অভিব্যক্তির সার্থক সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারত-আত্মার যে প্রকৃষ্ট মঙ্গলময় প্রকাশ, যুগ যুগ ধরে তা ভারতবাসী ও বিশ্ব-বাসীকে সত্যের আলোকে ভাস্বর পরমবাঞ্ছিত জগতের সন্ধান দেবে। ভারত-বিবেকের পরম কল্যাণকর রূপটি আমরা যত শীঘ্র ও যত বেশি করে উপলব্ধি করব ততই আমাদের মঙ্গল। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

সমালোচনা

Service and Spirituality—Swami Swahananda. Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-600004. pp. 8+211, Price : Rs. 10'00.

আলোচ্য গ্রন্থটি হলিউড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দজীর ১৭টি বক্তৃতার সংকলন। "স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সেবা" নামে প্রথম প্রবন্ধটি গ্রন্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করেছে।

গভীর সহানুভূতিই সেবাদর্শের মূল উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ শিশুকাল থেকেই গরীব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অনেকে মনে করেন "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই সেবাদর্শ স্বামীজীর মনঃকল্পিত। কিন্তু তা নয়। স্বয়ং শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তাঁকে বলেছিলেন—"ওরে জীবে দয়া নয়, বল শিবজ্ঞানে জীব সেবা।" যুবক নরেন্দ্রনাথ শুনে মুগ্ধচিত্তে বলেছিলেন যে, বনের বেদান্তকেও ঘরে আনা যায়। এর প্রতিধ্বনি তাঁরই কণ্ঠে আমরা পাই—"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এ আর নূতন কথা কি ? বহু পূর্বে আচার্য শঙ্কর ঘোষণা করেছিলেন—"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, আচার্য শঙ্কর ও তাঁর উত্তরসূরীরা "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা"র উপর যতটা জোর খাটিয়েছেন "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এর উপর ততটা জোর দেননি। এটা যেন স্বামী

বিবেকানন্দের জন্যই রক্ষিত ছিল। তিনি বললেন, কর্ম ত্যাগ নয়। প্রথমে "কর্ম ও উপাসনা", তার পর উপাসনাজ্ঞানে কর্ম ও সবশেষে "কর্মই উপাসনা" তিনটি স্তর বিন্যাস করে দেখালেন সেবা থেকে কি করে ধীরে ধীরে "সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন" অনুভূতি পর্যন্ত হতে পারে।

সেবা হচ্ছে যুগধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের সমন্বয় সেবার ভিতর রয়েছে। শুধু জ্ঞান মানুষকে শুষ্ক বিচারশীল করে আবার শুধু ভক্তির অনুশীলন চিত্তকে কোমল ও আবেগপ্রবণ করে তোলে। এ দুইয়ের সমাবেশ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পাই। জ্ঞান ও ভক্তিলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধি অপরিহার্য। সেবা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি অতি সহজে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম বা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে শুধু মানবতাবাদের ভিত্তিতে কি সেবা হয় না? "গড অর হিউম্যানিটি" প্রবন্ধে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, ভগবৎ সত্তাকে অস্বীকার করে মানবতাবাদ দাঁড়াতে পারে না। মানুষকে একটা নূতন আলোকে দেখতে শেখালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মানবকে তিনি মাধবরূপে উপাসনা করতে শেখালেন।

ধর্মের সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র, যুব-আন্দোলন প্রভৃতির সম্পর্ক কি? কয়েকটি বক্তৃতার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে কোন কিছু সাফল্য লাভ করতে পারে না। ব্যষ্টিকে নিয়েই তো সমষ্টি, ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। মৌলিক নীতিবোধ ছাড়া কোন রাষ্ট্রই দাঁড়াতে পারে না। ধর্ম ব্যতিরেকে স্থায়ী নীতিবোধ জাগানো সম্ভব নয়। ধর্মের অনুশীলন যুবকদের মধ্যেই বেশি প্রয়োজন। নয়তো যৌবনের আনন্দ বার্ধক্যে নিরানন্দ সৃষ্টি করতে পারে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শঙ্কর, খ্রীষ্ট, বিবেকানন্দ সবাই বয়সে নবীন ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যত্বে বিশ্বাস হচ্ছে ধর্মের মূল কথা। এই বিশ্বাস মানুষে মানুষে ভেদ দূরীকরণে সক্ষম বলে গণতন্ত্রেরও মূল ভিত্তি হতে সক্ষম।

আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছিলেন- "ধর্মের দিন গেছে আধ্যাত্মিকতার দিন এসেছে।" ধর্ম বলতে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মই বুঝেছেন। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন কথাটি শুনতে ভাল, কিন্তু ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সুরক্ষিত করে, যেমন ফলের খোসা বীজটিকে রক্ষা করে।

বিভিন্ন ধর্মমতকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে বেদান্তের প্রভাব অপরিসীম। কারণ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—তিনটি স্তরে বেদান্ত মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যত্বের মহিমা ঘোষণা করে। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "যত মত তত পথ" এই মহতী বাণী বহু আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথে একটি প্রবলতম পদক্ষেপ।

এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির সাধন, রক্ষণ ও প্রচারের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেমনটি হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের সময়ে, যেমনটি করেছিলেন শঙ্কর দশনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তনে। খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মেও সংঘবদ্ধতা দেখা গিয়েছে যদিও ইসলাম ধর্মে সন্ন্যাসের স্থান নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, ত্যাগ ও সেবা ভারতের চিরন্তন আদর্শ। গৃহীর অন্তরে ত্যাগ, সন্ন্যাসীর অন্তরে বাইরে ত্যাগ চাই। নিজের মুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত সন্ন্যাসীর দলকে উদ্বুদ্ধ করলেন একটা নূতন ভাবে। তিনি দেখালেন জগতের কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়েই মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধন পরস্পর বিরোধী নয় বরং পরিপূরক। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"— এই আদর্শে সঙ্ঘ নিবেদিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" এই ভাব সক্রিয়ভাবে প্রচারের জন্যই এই সঙ্ঘের সৃষ্টি। আনুগত্য, অপরিগ্রহ ও পবিত্রতা এর ভিত্তি। উদ্দেশ্যের একতানতা লাভেই হচ্ছে এর সিদ্ধি।

বর্তমান গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মূল আদর্শের একটি বিস্তৃতভাষ্য। বিভ্রান্ত যুবসমাজের নিকট বইটি একটি নূতন পথ দেখাতে সক্ষম।

—স্বামী জয়দেবানন্দ

অধ্যক্ষ, ব্রহ্মচারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেলুড় মঠ



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশে বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন : মিশনের বিশাখাপট্টনম্ কেন্দ্রের মাধ্যমে ঐ জেলার পনেরটি গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫১৮ জন নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০০ ধুতি, পুরানো বস্ত্রাদি ১১০০টি, ৪৭৫ কিলো চাল এবং ৭০০ শাড়ী বিতরিত হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব গোদাবরী জেলান্তর্গত শ্রীরঙ্গপট্টনম্ গ্রামের দুর্গত নরনারীর মধ্যে কিছু পুরানো কাপড় ও চাল বিতরণ করা হয়েছে। বিশাখাপট্টনম্ শহর থেকে ৮০ কি. মি. দূরে পার্বত্য এলাকার ৯১২ জন দুঃস্থ ধোপা ও কৃষকদের মধ্যে যথাক্রমে ২০০ সেট ধোপাদের কাপড় সিদ্ধ করার বড় পাত্র, ২০০টি কোদাল, ২০টি ছুরি, ৪৪টি কুঠার এবং ৪৪৮টি কম্বল দেওয়া হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৩-র পর এই ত্রাণকার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গত ২২ নভেম্বর, ১৯৮৩ রাজমুন্দ্রী কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শ্রীকাকুলামস্থিত রামকৃষ্ণপুরমে একটি 'রামালয়ম্' ও একটি কমিউনিটি হলের উদ্বোধনের পর বাঁশধারার ত্রাণ ও পুনর্বাসন-কার্যের সমাপ্তি ঘটে।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ : মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের মন্দাপম্ শিবিরে যথারীতি আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ পর্যন্ত রান্না-করা খাবার ৬৫,১১০ জনকে দেওয়া হয়েছে। ৫০৭৯ জনকে ওষুধ-পথ্যাদিসহ চিকিৎসা করা হয়েছে। ১,৩৮০টি জামা-কাপড়, ৩০০ কিলোগ্রাম চাল, ৩০০ কিলোগ্রাম 'রাভা' (Rava), ২৭৫ সেট বাসন-কোসন, এবং অন্যান্য জিনিস ও ওষুধপত্তর শরণার্থীদের দেওয়া হয়েছে। ১৬৪ জন শিশুর পাঠ্যপুস্তকাদি, সকালের টিফিন ও পড়াশুনার ব্যবস্থাসহ স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া ৪০ জন ছাত্রকে ছাত্রাবাসে রাখা হয়েছিল যাদের মধ্যে ১৩ জনকে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের আবাসিকরূপে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে। কোয়েম্বাটুর, সালেম এবং নাগরীতে ৭ জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কর্মসংস্থানও করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে খরাত্রাণ : বাঁকুড়া জেলার রামহরিপুর আশ্রম থেকে জেলার খরাপীড়িত ৭টি গ্রামের ২৫০টি পরিবারের মধ্যে ১৫০ খানি করে ধুতি ও শাড়ী এবং ৩৯৮টি পুরানো পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

সৌরাষ্ট্রে পুনর্বাসন : রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জুনাগড় তালুকের ১০টি গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে ৬৮টি স্বাস্থ্যবতী গরু দান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৬ জন দরজিকে ৬টি শেলাইয়ের কল, ২ জন গ্রামবাসীকে বলদটানা ২টি গাড়ি; ৭ জন চর্মকার, ৫ জন কামার, ৪ জন ছুতোরমিস্ত্রী এবং ৫ জন ক্ষৌরকারকে তাদের বৃত্তি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

জুনাগড় ও ভান্থালী তালুকের অন্তর্গত ১৮টি গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সাহায্য হিসাবে ১১৪টি গরু প্রদান করা হয়। আনন্দপুর-মীভাসা ও ইটালা-পাটাপুর গ্রামের গত ১৯৮৩-র জুন মাসের বন্যায় বাস্তুহারা ২২০টি পরিবারের পুনর্বাসনকল্পে

ভূমিপূজার মাধ্যমে দুটি নূতন কলোনি নির্মাণের প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন করা হয়।

উৎসব

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব গত ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩, এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথোপযুক্তভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। সারাদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি মঠভূমিকে উদ্দীপনাময় করেছিল। এইদিন প্রায় ১৪,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও হিমেল বাতাসের জন্য বিকালে মঠপ্রাঙ্গণে ধর্মসভা না হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাটমন্দিরে হয়। স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনকথা আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী গণেশানন্দ।

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব গত ২৪ জানুআরি ১৯৮৪, এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজন-কীর্তনাদির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। মঠভূমি সারা-দিন আনন্দমুখরিত ছিল। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে মঠপ্রাঙ্গণে স্বামী বন্দনানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠী স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের ১৩১তম আবির্ভাব-তিথি পূজা, পাঠ, ভজন ও ধর্মসভাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ-পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি

কাঁকুড়গাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ-পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে গত ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-আন্দোলনের সমীক্ষা

গত ২০ থেকে ২২ অক্টোবর ১৯৮৩, তিনদিন-ব্যাপী **হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠে** রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-আন্দোলনের উপর সমীক্ষাসূচক আলোচনার জন্য প্রথম আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন. টি. রাম রাও। আলোচনায় যোগদান করেন বহু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন। প্রথম ও শেষদিনে বহু বিদগ্ধ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

কণ্টাই (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে গত ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৩, চারদিনব্যাপী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ১৯০ জন যুবক।

তমলুক (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পরিচালনায় দ্বিতীয় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন চলে ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর দুদিন ধরে। ৬০ জন যুবক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে গত ১৮ ডিসেম্বর যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আগ্রা, বারাণসী ও এলাহাবাদ থেকে ৪৫০ জন প্রতিনিধি এসে যোগ-দান করে। এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট অতিথিও যোগদান করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্মসচিব শ্রী টি. এন. চতুর্বেদী

মঠের নূতন শাখাকেন্দ্র

২৪ পরগনা জেলাস্থিত বড়িশাতে বেলুড় মঠের নিজস্ব জমিতে "রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা"—এই নামে একটি নূতন শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। নবারব্ধ এই মঠ-কেন্দ্রে বৃদ্ধদের জন্য একটি আবাস নির্মাণের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষার সম্মান

মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী জি. কে. পার্বতী লণ্ডনের 'কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যাণ্ড ম্যাথামেটিক্স এডুকেটরস্' (CASTME) কর্তৃক ১৯৮৩-র আন্তর্জাতিক শিক্ষিকা হিসেবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীষ্টোৎসব : গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩, শনিবার উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর প্রতিকৃতির সামনে বাইবেল পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী অভজানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব : শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১৩১তম আবির্ভাব-তিথি গত ১০ পৌষ (২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩), সোমবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি হয়। মঙ্গলারতির সময় থেকেই ভক্ত সমাগমে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হয়। দুপুরে বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' সকালে ভজনের পর শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। তারপর শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও শ্রীতপন সিন্‌হা শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি পরিবেশন করে দিনের অনুষ্ঠান শেষ করেন। বিকাল চারটায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে আসেন এবং তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। সন্ধ্যারতির পর করুণাময়ী আশ্রমের ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্ম-জয়ন্তী : পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের বহু স্মৃতিধন্য উদ্বোধন কার্যালয় তথা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে ২৪ পৌষ ১৩৯০ (৯ জানুআরি ১৯৮৪), সোমবার সারাদিন ধরে আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজনগান প্রভৃতি হয়। এই দিন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি-সংলগ্ন পুনঃসংস্কৃত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে মায়ের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, এবং বেলুড় মঠ ও বিভিন্ন আশ্রম থেকে আগত শতাধিক সাধু-ব্রহ্মচারী। অগণিত ভক্ত নরনারীর সমাবেশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উৎসব : স্বামী বিবেকানন্দের ১২২তম আবির্ভাব-তিথি গত ২৪ জানুআরি ১৯৮৪, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজনকীর্তনাদির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য-সম্মেলন: উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' গত ২৬ ও ২৭ জানুআরি ১৯৮৪, নানা বিদ্বজ্জন ও

সুধীমণ্ডলীর উপস্থিতিতে ৫ম বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ জানুআরি স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (রজনী মহারাজ) গত ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩, রাত ৯-৪০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের কাজ বন্ধ হওয়ায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শরীরত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মেদিনীপুর আশ্রমে তিনি কয়েক মাস ধরে বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। সুচিকিৎসার জন্য গত জুলাই মাসে তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কণ্টাই (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে। গড়বেতা আশ্রমের অধ্যক্ষতা ছাড়াও তিনি লখ্‌নৌ, আলমোড়া, সারদাপীঠ (বেলুড়) এবং মেদিনীপুর আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সহজ সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী হিতানন্দ (হিরণ্ময় মহারাজ) গত ১ জানুআরি (ইংরেজী মতে ২ জানুআরি) ১৯৮৪, রাত ১২-২৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বহুদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে ভুগছিলেন। শরীর ত্যাগের কয়েক দিন পূর্বে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। ডাক্তারের চেষ্টায় প্রথমে সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে অল্প উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি স্বধামে গমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সাধুজীবনের প্রথম ভাগে কিছুকাল উত্তরাখণ্ডে তপস্যাদিতে অতিবাহিত করেন। মাদ্রাজ ও দিল্লীকেন্দ্রের কর্মীরূপে কাজ করার পরে ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ্য পূজারী হয়ে আসেন। তারপর থেকে প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা অথবা পূজাদির তত্ত্বাবধান করেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু শাখাকেন্দ্রের মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনিই পূজাকৃত্যাদির ভার গ্রহণ করেছেন। বর্তমানের নরেন্দ্রপুরস্থ আশ্রম যখন পাথুরিয়াঘাটায় ছিল, স্বামী হিতানন্দ তখন স্বল্পকাল সেখানকার অধ্যক্ষও ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, নিরভিমান ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। পূজা-যজ্ঞাদি বিষয়ক শাস্ত্রাদিতে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

উপরি-উক্ত সন্ন্যাসীদ্বয়ের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে নিত্যবিলীন—এই-ই আমাদের অন্তরের একান্ত বিশ্বাস।

বিবিধ সংবাদ

বেদান্তের প্রভাব সোভিয়েত রাশিয়ায়

সম্প্রতি সংবাদ-সংস্থা সূত্রে প্রকাশ যে সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে পঠন-পাঠনের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। আরও জানা যাচ্ছে যে, আজ আর রাশিয়ায় ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক, শিল্পী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের গৃহে বই-এর আলমারির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ দেখতে পাওয়াটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের প্রতি তাঁদের ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইদানীং ভারত-বিষয়ক যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। মস্কো 'মিসল প্রকাশনালয়' থেকে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'বেদান্ত ও নয়া-বেদান্ত' গ্রন্থটির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি রচনা করেছেন বিখ্যাত সোভিয়েত দার্শনিক ডি. কোসতিউচেংকো। গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে অদ্বৈত বেদান্তের উপর তাঁর বহুদিনের গবেষণাপ্রসূত তথ্যের বিশদ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।

আর একটি সংবাদ—সোভিয়েত রাশিয়ায় মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য রুশ-ভারত অন্যতম বিশেষজ্ঞা ও জওহরলাল নেহেরু পুরস্কারপ্রাপ্তা ডঃ নাতালিয়া গুসেভা বলেন: 'আমার বইটি সম্পূর্ণ মহাভারত অবশ্যই নয়। সুবৃহৎ মহাকাব্যটির মাত্র ৩৭টি উপাখ্যান আমি গদ্যে ও পদ্যে রূপান্তর করে উপহার দিতে চেয়েছি। বস্তুত, মহাভারতের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে রুশভাষাভাষীরা পরিচিত হোন, এই আমার চাওয়া।' তাঁর গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় হল আর্য সভ্যতা। ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য ও মানুষ নিয়ে তিনি বহু গবেষণামূলক কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি রাজস্থানের উপর গ্রন্থ রচনায় রত।

ভারতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যাপীঠ জয়পুর থেকে ৭৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত হীরালাল শাস্ত্রী। বিদ্যাপীঠটি ছোট বিদ্যালয় হতে আরম্ভ করে বর্তমানে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় রূপে ভারত সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শে গঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতে একমাত্র স্বয়ংশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পঞ্চমুখী শিক্ষা: নৈতিক অনুশাসন, বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন, বৃত্তিমূলক বিদ্যা, শরীরচর্চা ও সৌন্দর্য বিজ্ঞান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচিত হয় চারিত্রিক গুণাবলী দেখে, কেবলমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে নয়। এখানে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য সব রকমের রাজনীতি নিষিদ্ধ—কোন 'ইউনিয়ন' স্বীকৃত নয়।

উৎসব

বদরপুর (আসাম) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে বহু ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর ১৩১তম আবির্ভাব-তিথির স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

ভাঙ্গর (২৪ পরগনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘের উদ্যোগে ১ জানুআরি ১৯৮৪, ৬ষ্ঠ বার্ষিক কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকালে ধর্মসভায় স্বামী কমলেশানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ প্রভৃতি কল্পতরু-উৎসবের তাৎপর্য আলোচনা করেন।

১ জানুআরি ১৯৮৪, কলকাতার ৩৮ নং বিডন স্ট্রীটস্থ **বাস-ভবনে** ৭৬তম কল্পতরু-উৎসব বিশেষ পূজা ভজন-কীর্তনাদি প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসব-অঙ্গনে সজ্জিত কাশীপুর উদ্যানবাটীর পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিকালে একটি ভক্ত সমাবেশে স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীমুরারিমোহন কাব্য-বেদান্তাদিতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। দুপুরে প্রায় আড়াই হাজারের উপর ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

যুবসম্মেলন

গোয়ালিয়র রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ৪ থেকে ৬ অক্টোবর ১৯৮৩, তিনদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীমাধবশঙ্কর ইন্দাপুরকর। পৌরোহিত্য করেন ড. কৃষ্ণকুমার তেওয়ারী। ২৫০ জন যুবক এই সম্মেলনে যোগদান করে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কৃপা-প্রাপ্ত **ডাঃ শিশিরকুমার সেনগুপ্তের** দেহান্ত হয় গত ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩, বেলা ২-১৫ মিনিটে কলকাতা বলরাম মজুমদার স্ট্রীটস্থ নিজ বাসভবনে। দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী,—ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য। চিকিৎসকরূপেও তিনি সুখ্যাত ছিলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাদর্শে ভাবিত হয়ে রোগী-নারায়ণদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁর আত্মা শ্রীভগবৎপদে অনন্ত শান্তি-লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

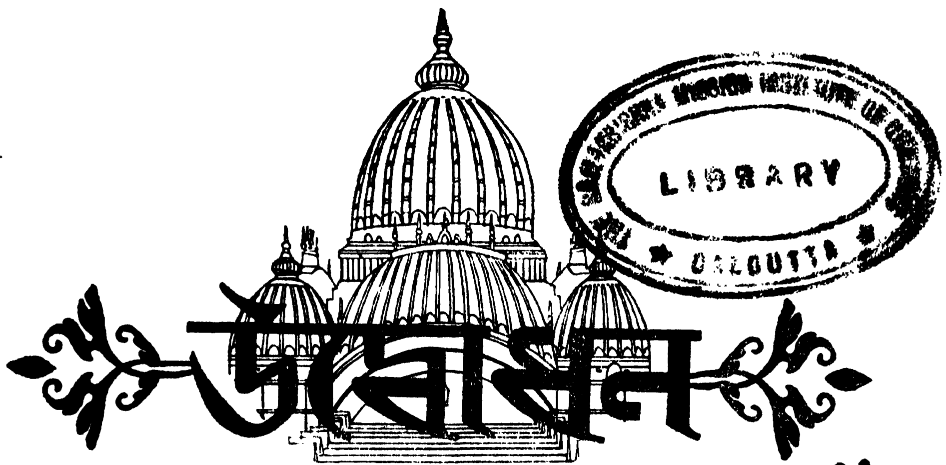
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত **শ্রীসোরাব মোদী** গত ২৮ জানুআরি ৮৬ বছর বয়সে বোম্বাই-এ পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘ-কাল ধরে ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর গুজরাটে সোরাব মোদী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পড়াশুনা করেন বোম্বাইয়ের বরদা হাইস্কুলে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই তিনি অভিনয়-জগতে প্রবেশ করেন।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতে অভিনেতারূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। চিত্র-পরিচালকরূপেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে সম্মানিত হন। অন্তর্জীবনে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মাতৃভক্ত। শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয়-লাভের স্মৃতি তাঁর চিত্তে সর্বদাই জাগরূক থাকত। মাতৃপ্রসঙ্গ আলোচনায় তিনি আবেগে ডুবে যেতেন। জীবনের শেষদিকে তাঁকে শরণাগতির ভাবে তন্ময় থাকতে দেখা যেত।

তাঁর দেহ-পিঞ্জরমুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শান্তিলাভ করুক—আমাদের এই প্রার্থনা।

বর্তমান বিশেষ সংখ্যায় স্থানাভাবে 'নানাপ্রসঙ্গে' প্রকাশ করা গেল না। পরবর্তী সংখ্যা থেকে যথারীতি থাকবে। পর্যায়ক্রমে 'পুনর্মুদ্রণ'-ও প্রকাশিত হবে।



৮৬তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯০

দিব্য বাণী

…ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

…জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।

…রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও।

…যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় ক'রো না—ভয়ের জায়গা কোথা? তোমরা তো কিছু চাও না—এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ; এখন organised (সংঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

…মেয়ে-মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নেই। তাঁকে অবতার বললেই হয় না—শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।…কুড়েমি দূর ক'রে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[পত্রাবলী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬০-৬১]



কথাপ্রসঙ্গে

আহ্বান ; প্রত্যক্ষের পূজাতে

"চল চল তাঁকে দেখবো।
'অনন্ত গুণাধার প্রসন্ন মূরতি
শ্রবণে যাঁর কথা আঁখি ঝরে !'
চল ভাই…শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে
মানবজীবন সার্থক করি !…
…আনন্দের হাট।
সত্য সত্যই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'…। দেখিতেছি
ভূলোক-দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে।…
…এখানকার সব আনন্দ দিয়ে গড়া।"

স্বচ্ছ একখণ্ড কবিতা—যাহার প্রতি পদে ধ্বনিত হইতেছে একটি শাশ্বত আনন্দ-আহ্বান। ইহার ছন্দতরঙ্গে বাহিত হইতেছে নিত্যকালের অনাহত গীতিকা—যাহা স্বতই প্রাণকে ব্যাকুল করে দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট ঘরখানির পানে—যেখানে সেই 'প্রসন্ন মূরতি' যুগ যুগ ধরিয়া আমাদেরই জন্য প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট। প্রাণকে আলোড়িত করিতে সক্ষম বলিয়াই উক্ত কথাগুলিতে রচিত হইয়াছে একটি সার্থক কবিতা। কথাগুলি কোন মহাকাব্যের উদ্ধৃতি নহে, উল্লিখিত অংশটি চয়ন করা হইয়াছে এক অনুপম গ্রন্থ হইতে, যাহা আকৃতিতে গদ্য হইয়াও স্বভাবে চিরায়ত কাব্য। গ্রন্থের নাম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ইহার অমর রচয়িতা শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত), যিনি নিজেকে একান্তই গুপ্ত রাখিয়াছেন নানা আবরণে—বিচিত্র নামে—আটপৌরে 'মাষ্টার মশায়' সম্বোধনের অন্তরালে। শ্রীম'র লেখনী-নিঃসৃত গদ্যের প্রবাহিতা-গুণ ঐ অপূর্ব রচনায় যে আমেজ আনিয়াছে, তাহাতে উহাকে কবিতা না বলিয়া পারা যায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত তাই একখানি চিরন্তন মহাকাব্য—যেন সেই আদিকবি বাল্মীকির অনবদ্য গ্রন্থনারই অতি-আধুনিকতম সংস্করণ।

আমরা কাব্য-তত্ত্ব জানি না, কবিতা-প্রসঙ্গ আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা—মূর্খের প্রলাপ। তথাপি এইটুকু বুঝিতে পারি যে, কাব্যরসের চাবিকাঠি লুকানো আছে ভাষার মধ্যে। কাব্যসৃষ্টির অনেকখানিই নির্ভরশীল ভাষার গুণের উপর—উহার সঞ্চরণশীলতায়। ভাষার স্পন্দন ও প্রবাহ যখন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রতি আমাদের হৃদয়কে টানিয়া লয়—তখনই উহা কবিতা। যে-ভাষায় কবিতার সৃষ্টি হয়, তাহার অনবদ্য বৈশিষ্ট্য বোধ হয় ইহাই। গদ্য ভাষা যখন পদ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন উহাতে এই মৌলিক গুণগত বিশেষত্বটুকু লক্ষণীয়। ব্যাকরণ কিংবা অলঙ্কার-শাস্ত্রের দৌড় অর্থ-নির্দেশ বা অর্থ-বিশ্লেষণ অবধি,—ভাষার গূঢ় প্রাণ-রহস্য কিন্তু আরও অনেক দূরে। ইহা সম্পূর্ণই অনুভূতির ব্যাপার, কথা দিয়া অথবা সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধিয়া ইহাকে বুঝানো কঠিন। ভাষা যখন কবিতা হয়, তখন সেই ভাষায় আসে এক অনির্দেশ্য শক্তি—এক আশ্চর্য চমক। ভাষার প্রকৃতিতে এই যে অনির্বচনীয় প্রকাশ-শক্তি, তাহা মানুষের প্রাণে গিয়া আলোড়ন জাগায়, মানুষের প্রাণকে উত্তাল করিয়া তোলে। কবিতার লক্ষ্য তাই সাধারণ

মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র। সহজ কথায় বলা চলে মুখের ভাষা যখন প্রাণের ভাষা হয়, তখনই সেই ভাষা হইয়া দাঁড়ায় কবিতা। কবিতা তাই ব্যাকরণের বা অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মে গড়া জিনিস নহে, উহার উপমান অনুভূতিময় প্রাণ-লোকে,—কবিতার সঙ্গে একান্ত সংযোগ মানুষের হৃৎস্পন্দনের। কবিতা হইতেছে, 'the true voice of feelings'। কবিতার ভাষাকে মানুষের হৃদয়-স্পন্দনের তালের সহিত মিলিয়া ঐকতান সৃষ্টি করিতে হয়,—হৃদয়ানুভূতির প্রতিটি ধারাকে জীবনের এক বিশেষ লক্ষ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়। উৎকৃষ্ট কবিতা তাই সর্বদেশে সর্বকালে সর্বমানবের প্রাণসঞ্চারী এক মহাশক্তি। এই কারণেই গদ্যের ভাষাও কখন কখন কবিতাধর্মী হয়—কবিতা হইয়া ফুটিয়া ওঠে, যখন উহাতে সেই প্রাণ-উদ্বেলকারী গুণটি বিলক্ষণ ব্যক্ত থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-গ্রন্থের ভাষায় এমনই কিছু বিশিষ্টতা আছে, যাহা পাঠ দূরের কথা, শ্রবণ মাত্রেই মানুষের হৃদয় উচ্ছল হইয়া উঠে, কোন ঊর্ধ্ব-লক্ষ্যে যাত্রার জন্য ব্যাকুল হয়। শুধু ভক্ত-বিশ্বাসী-জ্ঞানীর ক্ষেত্রেই নহে, অভক্ত-অবিশ্বাসী-অজ্ঞানীর জন্যও ইহা পরীক্ষিত সত্য। 'চল চল তাঁকে দেখবো'—কথামৃতকারের এই সহজ ভাষাতে যে আকুল আমন্ত্রণ অভিব্যক্ত, তাহাও কি বিশ্বের মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে না ঐ দক্ষিণেশ্বরের 'আনন্দের হাটে' যাইবার জন্য? কবিতা শব্দের প্রকৃত ও পবিত্রতম অর্থেই তাই কথামৃত একখানি শাশ্বত মহাকাব্যই বটে! কথামৃতের কথা আমাদের সংসার-ক্ষুভিত প্রাণকে স্বতই শ্রীরামকৃষ্ণমুখী করিয়া দেয়—একেবারে শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে লইয়া যায়। দূরকে নিকটে আনিয়া দেয়—কালোকে আলো করিয়া তোলে! অতীতের ঘটনাবলীকে বর্তমানে পরিণত করে,—না-জানাকে রূপান্তরিত করিয়া দেয় চিরজানারূপে। অদেখাকে কাছে আনিয়া স্পষ্ট দেখার ঝলকে আমাদের নয়ন ভরিয়া দেয়। তাই বুঝি একজন আধুনিক পাশ্চাত্য লেখক কথামৃতের ইংরেজী সংস্করণ পড়িয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ে মন্তব্য করিয়াছেন—ইহা চিরন্তন অধুনা—'Eternal Now'! কথামৃত এইজন্যই চিরদিন কবিজন-বন্দিত—'কবিভিরীড়িতং'।

'চল ভাই···শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে
মানবজীবন সার্থক করি।'

মানবজীবন সার্থক করিবার এমন প্রাণঢালা আমন্ত্রণকে অগ্রাহ্য না করিয়া, একটু চলিয়াই দেখা যাউক না কেন,—কে ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ,—আর কেনই-বা তাঁহাকে দর্শনে মানবজীবন সার্থক হইবে। চলিতে চলিতে এক-সময়ে গিয়া দক্ষিণেশ্বরের সেই উদ্দিষ্ট ঘরখানির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিব সুনিশ্চিত,—অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ-টুকুও মিলিয়া যাইতে পারে। কী দেখিব সেখানে? দেখিব—বাহুল্যবর্জিত সেই ঘরের ছোট খাটটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাসীন,—যেন কাহারও জন্য আকুল অপেক্ষায়। পরনে লাল-পাড় ছোট ধুতি—অবিন্যস্ত কিন্তু মনোমুগ্ধকর। বাম স্কন্ধে ন্যস্ত কোঁচার খুঁটখানিই মাত্র অঙ্গের পরিচ্ছদ—উহাই তাঁহার উত্তরীয়। আসনে পারি-পাট্য নাই, চতুষ্পার্শ্বেও বৈভবের চিহ্ন নাই,—মুখশ্রীতে অহংলেশশূন্যতার স্নিগ্ধ আভা। কোথাও কোন গৌরবের ইঙ্গিত নাই। কিন্তু ঘনীভূত রহিয়াছে অন্য কী এক বস্তু, যাহাকে দেখা মাত্রই বোধ হইয়া থাকে বড় আপন, অনেক কালের বন্ধু—স্নেহময়ী মাতা কিংবা সন্তানবৎসল পিতা—অথবা, একেবারেই আমাদের আত্মার আত্মা, পরমপ্রিয়-স্বরূপ। কিংবা বলিতে পারা যায়—ঐ বিগ্রহই যেন আমাদের একমাত্র 'আকাঙ্ক্ষিত

বহু-ঈপ্সিত—আমাদের সমষ্টি নিজ-মূর্তি। তাঁহার নেত্রদ্বয় অর্ধনিমীলিত—দৃষ্টির অল্পাংশই বাহিরের দিকে, বাকী সবটুকুই অন্তরেরও অন্তরে। কোন দেবতা বা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ইনি,—কিংবা মনুষ্য-দেহধারী ব্যক্তিত্বমাত্র! চক্ষু ঝলসাইবার মতো জ্যোতির ছটা তাঁহাকে ঘিরিয়া নাই বটে, কিন্তু সর্বউপাধি-রাহিত্যের এক অপূর্ব আকর্ষণীয় মাধুর্য তাঁহার প্রতি অঙ্গে। সমগ্র জ্যোতির্লোকই বুঝি দক্ষিণেশ্বরের সেই পরিচিত ঘরখানির চারি দেওয়ালের মাঝে আসিয়া জমাট হইয়া গিয়াছে!

*

তিনি কে? ভগবান বা মানুষ তাহা লইয়া বিচারের এক্ষণেই কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আগে মানুষ, পরে ভগবান,—ভগবানকে মানুষই পারে ধারণা করিতে,—মানুষের বেশেই ভগবান আসিয়া থাকেন মানুষের মাঝে, মানুষের প্রয়োজনে! ভগবানের অভাব হয় না—হইবার নহে। কিন্তু মানুষেরই অভাব ঘটিয়া থাকে সকল যুগে। এযুগেও সেই অভাবই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া সংসারকে অরণ্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে! সর্বাগ্রে এই দারুণ অভাবটিই নিঃশেষে মিটিয়া যায়, যখন আমরা পলকের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে ফিরিয়া তাকাই। সর্ব-গুণাধার ঐ মূর্তিতে আমরা সকলের আগে পাইয়া থাকি এক অত্যাশ্চর্য অবিমিশ্র মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের ধারণা মানেই 'মান হুঁশ'। খাঁটি মানুষ না হইলে শ্রীভগবানের এই মনুষ্য-লীলা অবধারণ সম্ভব নহে। বসন-ভূষণ অলঙ্কার-উপাধিতে জড়াইয়া মানুষ সাজিয়া বসেন নাই তিনি,—সর্বউপাধি-বিবর্জিত সর্বভূষণত্যাগী নিরাবরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহের বিশেষত্ব এখানেই। যেন প্রজাবৎসল জগৎসম্রাট, নিরভিমান অতি সাধারণ বেশে আপন প্রজামণ্ডলীর সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন! এই কারণেই তো তাঁহাকে এমন আপন জন—এরূপ সখা-বন্ধু-প্রিয় বলিতে ও ভাবিতেই বেশি ভাল লাগে। প্রাণ উজাড় করিয়া তাঁহাকে জানাইতে সাধ হয়: 'কামারপুকুরে তব সখাগণ সনে / আমি তব সাথে সাথে রব।' অভিমানে বলিতে ইচ্ছা হয়: 'আমার নয়ন মনে কি দারুণ তৃষা / তোমার মানুষরূপ তরে, / বুকের ভিতরে মোর বাঁধিয়াছে বাসা / তবু কেন ছিলে দূরে দূরে।' তাঁহার এই সুহৃদ্-রূপের ভাবনাতে,—তাঁহাকে বন্ধুভাবে বরণ করিতে কী যে অপার শান্তি তাহা মরমী সাধক-কবির ভাষাতেই আমরা আভাসে বুঝিতে পারি। 'কি তৃপ্তি, কি শান্তি হেথা জুড়াল জীবন, / গদাই আমারে ফিরায়ো না!' তাঁহারা এইরূপই বলিয়া থাকেন। শ্রীভগবান নিজেও তাঁহার এই সুহৃদ্-ভাবের অনবদ্য মহিমাটিকে মুখ ফুটিয়া না বলিয়া পারেন নাই: 'সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।' (গীতা, ৫/২৯)।

ঋগ্বেদীয় চতুর্থ পুরুষসূক্ত হইতে আমরা জানিয়াছি—সংসারের অতীত ব্রহ্মপুরুষ সদা ঊর্ধ্বগত থাকিয়াও কিন্তু পাদমাত্র মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া বারংবার নামিয়া আসেন,—মায়ায় আসিবার পরে তিনিই দেব-মনুষ্যাদি নানারূপী সাজিয়া চেতন ও জড় সকল কিছুকে ব্যাপিয়া বিরাজমান থাকেন।

'ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥'

বিবিধবিগ্রহবান্ এই পরমপুরুষই জগৎরূপে আমাদের সম্মুখে—আবার সেই তিনিই স্ব-স্বরূপে 'ত্রিপাদূর্ধ্ব'—পরব্রহ্ম। ভাবাতীত সংসারাস্পৃষ্ট যিনি, সেই তিনিই আবার অভাবরূপে অহর্নিশ 'সাশনা-নশনে' ব্যাপ্তবান্! ইহাই তাঁহার অসাধারণ মহিমা—এই জন্যই তিনি 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহত্তম—All-inclusive! স্বরূপতঃ নির্গুণ থাকিয়াও তিনি গুণময় সাজিয়া ঘুরিতেছেন-ফিরিতেছেন,

হাসিতেছেন-কাঁদিতেছেন, জন্ম-মরণের দোলায় দুলিতেছেন !! ইহাই যে তাঁহার অত্যাশ্চর্য মহিমা, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? কিন্তু না,—তিনি তাঁহার মহিমাতেই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকেন না। শুভ্রশির শ্রুতির ঋষি আমাদের প্রতি হাসিয়া বলিয়াছেন : তাঁহার মহিমা অপার নিরবধি। উহা দেখিয়া মুগ্ধ হও, কিন্তু তাঁহাকে মহিমান্বিত দেখিয়াই তাঁহার অনন্তত্বে অমনি ইতি টানিয়া বসিও না। যদি তাহাই করিয়া ফেল, তবে তো তোমরা তাঁহার অনন্তভাবকেই অস্বীকার করিলে,—তাঁহাকে অন্তবান্ বানাইয়া লইলে। অতীত অনাগত ও বর্তমান জগৎ,—সৃষ্টির যাবতীয় কিছু সেই পরমপুরুষের মহিমা প্রকাশ করিতেছে ঠিকই, তথাপি জানিবে উহাই তাঁহার শেষ পরিচয় নহে। কথা আরও রহিয়াছে,—গূঢ়তর অনেক কাণ্ড বুঝিতে বাকী আছে !

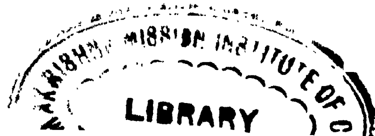
তিনি ভাবাতীত 'ত্রিপাদূর্ধ্ব' লোক হইতে নামিয়া চিৎ-জড়ময় 'সাশনানশনে' রাজ্যেও সদা বিচরণ করিতেছেন সত্য,—কিন্তু সেই তিনিই আবার 'ভাবমুখে'-ও তো অবস্থান করেন কখন কখন। নির্গুণ আর গুণময়ের সীমান্তরেখায় দাঁড়াইয়া তিনিই তো 'নির্গুণ-গুণময়' হইয়া থাকেন। ভাবলোকের দ্বারমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, স্ব-সৃষ্ট অভাব-রাজ্যের বৈচিত্র্য-পর্যবেক্ষণরত তাঁহার সেই অনিন্দ্য রূপখানি যেন পূর্বোল্লিখিত মহিমাকেও ছাপাইয়া চলিয়া যায়। পুরুষসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রেও তাই আমরা পড়িয়াছি : 'এতাবানস্য মহিমা অতঃ জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।' 'অতঃ জ্যায়ান্' —আরও অনেক, অধিক, অতল ও গভীর এই পরমপুরুষের কীর্তিকল্প।

*

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ের পূর্বপরিচিত ঘরে আমরা দর্শন পাইতে পারি সেই মূর্তির,—সেই 'ভাবমুখে' সমাসীন 'অনন্তগুণাধার' যিনি। ত্রিপাদূর্ধ্ব-লোকচারী হইয়াও যিনি স্বেচ্ছায় জগৎ সাজিয়েছেন,—আবার জগতের প্রান্তসীমায় অপেক্ষমাণ থাকিয়া সততই আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। নরেন্দ্র-বন্দিত 'নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়'ইনিই। একটি রূপ,—কিন্তু তাহাতে একই কালে পরিদৃশ্যমান হইতেছে ভাব-অভাব-ভাবাতীত। যেন একটি বাতায়ন—যাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টিগোচর হয় বন-বনস্থলী সমুদ্র-পর্বত আবার সীমাহীন নীলিমা। পরমপুরুষ যদি পরমমানুষ সাজিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তবে ইহা অপেক্ষাও প্রকৃষ্টতর রূপের ব্যঞ্জনা আর কি হইতে পারে ?

তিনি মানুষ না সাজিলে, মানুষ কেন পারিবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে তাঁহার সমীপে যাইতে ? মানুষের ব্যথা-বেদনাকে নিজ বক্ষে লইয়া মানুষেরই অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন তিনি। অবিকল বিরহী মানুষের মতোই ভগবানকে ডাকিয়াছেন,—ডাকিয়া ডাকিয়া শিখাইয়াছেন কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে,—মাটিতে মুখ ঘসিয়া ঘসিয়া কাঁদিয়াছেন, ভগবদ্-বিরহ-জ্বালা কত গভীর তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা প্রদান করিতে।

উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য সেই পরমাত্মাই মানব ইতিহাসের এই যুগ-সন্ধিকালে একেবারে ঠিক যেন মানুষের রূপে, মানুষেরই বন্ধু হইয়া এই মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—শুধু ভারতের জন্য নহে, সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। জগতের আজ সর্বাধিক প্রয়োজন একজন প্রকৃত মানুষ-বন্ধুর, যিনি মানুষের দুর্দশাকে স্বয়ং বুক পাতিয়া উপলব্ধি করিয়া, হুবহু মানুষরূপেই তাঁহার নিত্য সঙ্গী হইতে সক্ষম —'সেথোর মতো' হাত ধরিয়া তাহাকে এই সংসার-সমুদ্র উত্তরণে সাহায্য করিবেন। আমাদের এমন এক 'সেথো' বা সহচর সাথীর অভাবই বড় বেশি বোধ হইয়া থাকে এই সংসার-অরণ্যে,—



যিনি অজস্র দুর্বলতা-দৈন্যের এই অন্ধকার পৃথিবীতে নিজেই খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিবেন, কে কোথায় বিপন্ন হইয়াছে—এবং কোন্ মানুষ আন্তরিক ঈশ্বরকেই চাহিতেছে ;—আপন ঐশ্বর্য দুই হাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে সহায়তা করিতে। পরজন্মে নহে, পরকালে নহে—এখানে এই জন্মেই, তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধন করিতে সদা নিরত থাকিবেন এই পরম বন্ধু,—পরম-মানব। জীবন্মুক্তিই পরম পুরুষার্থ, এই মানব-বন্ধু উহারই পন্থা বাতলাইতে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়া আঘাত করেন। কিন্তু সেই পন্থাটি কেমন ?

মনুষ্য-জীবনকেই ভগবানের মন্দিরে রূপান্তরিত করিয়া—ঈশ্বরপ্রেমকে মানব-প্রেমে প্রবাহিত করিয়া সেই অপূর্ব পন্থাটি রচিত। পূর্ব পূর্ব আচার্য এবং ঈশ্বরাবতার সকলেই ইহা বলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু এবারকার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আর তত্ত্ব না থাকিয়া তথ্যরূপেই প্রকট হইয়াছে। নির্জন গিরিগুহায়, কিংবা অরণ্যে-নদীতটে বসিয়া যাঁহাকে সন্ধান করিবার কথাই মাত্র এতকাল জানা ছিল, আমাদের সেই তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করিতে শিখাইয়াছেন তিনি মুখর সমাজের মধ্যে, চঞ্চল জনারণ্যে। দৃশ্যমান জগৎকেই কর্মের ও ভক্তির দ্বারা শুচি করিয়া, ধ্যানের ও জ্ঞানের দ্বারা সুমার্জিত করিয়া লইয়া সেই আরাধ্য ব্রহ্মকে এখানেই সুগোচর ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা,—ইহাই হইতেছে এবারকার অভিনব পন্থা। জীবই শিব। প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা, হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢালিয়া সেই শিবত্বের উদ্বোধনই এই মানবরূপী শ্রীভগবানের পরম নির্দেশ। মানুষের জীবত্বই কিছু তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে,—তাহার পরাকাষ্ঠা পরিচিতি হইতেছে শিবত্বের প্রকাশে। মানবজীবনের উৎকর্ষ সেখানেই। প্রতিমার গড়নে কাঠ-খড় দড়ি-মাটি ইত্যাদি থাকে বটে, অনস্বীকার্যও ঠিক,—তথাপি প্রতিমাখানি সম্পূর্ণতা লাভ করে আরও অনেক পরে—বহুতর ধ্যান-ধারণা ও শিল্পকর্মের অন্তে। খল-কপট দীন-মলিন রুক্ষ-রুগ্ন অজ্ঞ-অক্ষম মানুষই এই পন্থায় চলিতে চলিতে হইয়া উঠিতে পারে আশ্চর্য সুন্দর দিব্য পুরুষ। মানুষের সেই পরিণত রূপখানিকে দেখিতে শিখিলে তাহাকে আর বিদ্বেষ করা চলে না। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সংক্ষিপ্ত নিকষ, —ইহাই 'নবযুগধর্ম'। বুঝি-বা মানুষকে এই অনবদ্য দেবপূজা শিখাইবার উদ্দেশ্য লইয়াই বিধাতা স্বয়ং মানুষের রূপ ধরিয়া মানুষেরই মাঝে আসিয়া উপস্থিত। অতীতের ঋষি ও আচার্যগণের তথা অবতারপুরুষদের প্রচারিত তত্ত্বই যেন মানবাকার ধারণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের ঐ দেব-দেউলে নবভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে,—এই পরম মানবকে দর্শনের ফলে মানবজীবন সার্থক না-হইবে কি? লোকগুরু স্বামী বিবেকানন্দও চাহিয়াছিলেন, এই অবতীর্ণ 'নরদেব'কে মানুষ তাহার নিজ হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করুক,—তাহার আপন সংসার-ভূমিতেই রচিত হউক দক্ষিণেশ্বরের আনন্দ-কানন। স্বামীজী সোচ্চারে জনসমাজকে ডাকিয়া বলিয়াছেন :

'এই নব-যুগধর্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান ; এবং এই নব-যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম-প্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ! হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর!...অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও!'

*

আহ্বানের পর আহ্বান! আমাদিগকে অলসে বসিয়া থাকিতে দিবে কি? বাস্তবিকই

যেদিন সেখানে—সেই দক্ষিণেশ্বর-দেবোদ্যানের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দ্বারপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইব—যেখানকার পথের ধূলিতেও আনন্দ-কণা,—সেদিন আমাদের অনুভূতির রূপটি কেমন হইবে? 'চল, চল…' এই ছন্দোময় আমন্ত্রণ শুনিয়া অপরূপ ঐ 'প্রসন্নমূরতি'খানিকে নয়নগোচর করিতে পারিব ঠিকই,—কিন্তু দেখিতে দেখিতেই এক নবতর আহ্বান পুনরায় আমাদের চমক ভাঙাইবে। হৃদয়ে ধ্বনিত হইবে, স্নিগ্ধ অথচ সুগম্ভীর স্বর: 'সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও।' ইহা কেবল দর্শনের আমন্ত্রণ নহে,—দর্শনান্তে প্রত্যক্ষ পূজাতে, অর্থাৎ জীবনে বরণ করিয়া লইতে আহ্বান!

সঠিক বুঝিয়া লইবার মতো তীক্ষ্ণ জ্ঞান-শক্তি আমাদের নাই। তথাপি জানি, আমাদের নিজ সামর্থ্যে না হইলেও, ঐ অমোঘ আহ্বান-শক্তিতে আমাদের সংবিৎ জাগিবে নিশ্চয়ই। স্বতই আমাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে—ঈশ্বর জগৎ-বহির্ভূত কোন লোকের বাসিন্দা নহেন। ব্রহ্ম এই জগৎ-সংসার হইতে পৃথক্‌ভাবে ঊর্ধ্বে কোথাও বিরাজ করেন না—তিনি সব জুড়িয়া, সকল কিছুতে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান,—তিনি দেশ বা কালে খণ্ডিত নহেন—সর্বতোব্যাপী অখণ্ড তিনি। যাহা কিছু 'আছে', তাহা সব তাঁহাতেই আছে, তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া আছে। 'আছে' মানেই তিনি। অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম 'অস্তি'-ই আমাদের বোধে 'ভাতি' হন—এবং 'প্রিয়' বলিয়াও উপলব্ধ হইয়া থাকেন। সর্বানুস্যূত সেই সূক্ষ্মই ঘন, ঘনতর ও ঘনতম আকারে আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির গোচর হন। ঘন আকারে তাঁহাকেই দেখিয়া থাকি সর্বভূতরূপে,—সেই তিনি ঘনতর আকারে মানুষ এবং ঘনতম-রূপে সাজেন দেব-মানব রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-শঙ্কর-খ্রীষ্ট-চৈতন্য—যাঁহাদের 'পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ'-বিগ্রহ সম্মুখস্থ ঐ ছোটখাটখানিতে সমাসীন! অর্থাৎ, সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মেরই পরাকাষ্ঠা ঘনতম মূর্তির একটি নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। বায়ুমণ্ডলে বিকীর্ণ বাষ্পকণাগুলিই যেমন ঘনীভূত হইয়া পরমশোভন জলদের রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, অথবা আকাশময় ছড়ানো রশ্মিজাল একখণ্ড আতশী কাচে সংহত হইয়া যেমন অগ্নি-সৃজনের আধার-বিন্দু হইয়া উঠে,—যেন অনেকটা তেমনই, সর্ব-মানবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি ঘনীভূত হইয়া—সর্ব-বিতত চৈতন্যই জমাট রূপ ধরিয়া অবতার-বেশে ধরায় আবির্ভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অর্থেই সমগ্র মানবাত্মার সমষ্টি-বিগ্রহ—সর্ব-জীবের ঘনীভূত চৈতন্য,—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'Sum total of individual souls'। বন্দনা-গীতিতে তাঁহার কায়াকে তাই চিদ্‌ঘন বলা হইয়াছে;—'চিদ্‌ঘনকায়' স্বামীজীরই ধ্যানদৃষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ।

বায়ুমণ্ডলের সকল স্তরে একই প্রবাহ। কখনও কোন স্তর ভারহীন হইয়া পড়িলে, নৈসর্গিক নিয়মেই সৃষ্টি হয় আলোড়ন—ঊর্ধ্বস্তরের বায়ু নামিয়া আসিয়া ভারসাম্য বিধান করিয়া থাকে। মানব-সমাজে দেব-মানবের অবতরণও যেন ঐ-রকমই এক রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। পরম-মানব—নরদেহধারী শ্রীভগবানের জীবপ্রেমে উন্মদ হওয়া বুঝি ইহাকেই বলে। 'চির-উন্মদ প্রেমপাথার' বলিয়া তিনি নিত্য বন্দিত এই কারণেই।

'চল ভাই……শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে
মানবজীবন সার্থক করি!'

শ্রীম-লিখিত এই আমন্ত্রণ-লিপি পাঠ করিয়া, আমরা যেন সত্য সত্যই প্রেরণা অনুভব করি তাঁহাকে 'দর্শন' করিয়া—অর্থাৎ তাঁহাকেই জীবনে বরণ করিয়া লইয়া 'মানবজীবন সার্থক' করিয়া তুলিতে। জীবনে বরণ করিবার উদ্দীপনা-মন্ত্র—'অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি', স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের কানে শুনাইতেছেন! তবুও কি আমরা বধির হইয়া তামসে দিন কাটাইব?

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র, মা-ঠাকুরাণীর চরণাশ্রিত সন্তান প্রয়াত রাধিকারঞ্জন কর্মকার মাকে জানিয়েছিলেন : 'মাগো ! প্রণামপূর্বক অবোধ সন্তানের বিনীত প্রার্থনা এই যে অনেকদিন হইতে আপনার নিকট পত্র লিখিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব এই ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

'আমার অবস্থা—(১) কোন সদুপদেশ শুনিলে অথবা কোন ধর্মপূর্ণ কথা শুনিলে মন শুধু সেই সময়ের জন্য ধর্মভাবাপন্ন হয়। এবং কিছুকাল পরেই সেই ধর্মভাবের আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা মন হইতে চলিয়া যায়। আর তেমন একাগ্রতা থাকে না। আমার মনের ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা কে যেন নষ্ট করিয়া দেয়।

'মা, কি করিলে আমি সেই দুষ্টটিকে দমন করিয়া অনন্য মনে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ ধারণা করিতে পারি—কৃপা করিয়া তাহা বলুন। মাগো শুধু আপনার কৃপাই ভিক্ষা চাই।

'(২) নাম করিবার সময় মন এদিক ওদিক যায়। চেষ্টা করিয়া কিছু মুহূর্তের জন্য দৃঢ় করি কিন্তু আবার চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়। দেখিতেছি আমার চেষ্টায় কিছুই হইতেছে না। এই জন্যই মা আপনার কৃপা ভিক্ষা চাই। কি করিব মা, আমি তো আপনার সন্তান। এই সময়ে আপনিই আপনার সন্তানের এই দুর্দশা দেখুন।'

শ্রীশ্রীমা তাঁর এই প্রপন্ন সন্তানকে যে অনবদ্য আশিসলিপিখানি পাঠিয়েছিলেন তা হুবহু প্রকাশিত হচ্ছে :]

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্।

কলিকাতা

১১-৯-১৮

কল্যাণবরেষু,

মনের স্বভাবই এই রূপ। কখনও ভাল থাকে, কখনও চঞ্চল হয়। এজন্য লেগে পড়ে থাক্‌তে হয়, অভ্যাস যোগ। ক্রমশঃ হয়। ভগবানকে প্রার্থনা করিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

মাতাঠাকুরাণী

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। সাধারণ চোখ দিয়া উহা দেখা যায় না। সেজন্য ভগবান তাঁহাকে প্রথমে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও যাহা অর্জুন দেখিলেন তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। সহস্র সূর্যের দীপ্তি সেই অতিবিশাল মূর্তি হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে; ভূলোক দ্যুলোক সকল দিক জুড়িয়া সেই অদ্ভুত উগ্ররূপ; সুরগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব-যক্ষগণ অতি বিস্ময়ে সেই বিশ্বরূপের স্তুতি করিতেছেন। সেই মূর্তি আবার সাক্ষাৎ জলন্ত মৃত্যু স্বরূপ—যেন চরাচর সব কিছুকে গ্রাস করিতে উদ্যত। অর্জুনের পক্ষে ভয় পাওয়া তো স্বাভাবিকই। অতিশয় বিনয় দেখাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিলেন, প্রভু, যথেষ্ট হইয়াছে এবার তুমি তোমার এই ভয়ঙ্কর মূর্তি গুটাইয়া লও। হাস্যময় তোমার মানুষরূপে ফিরিয়া এস। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থূলরূপ। ঐ স্থূলরূপ যদি অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং এক সঙ্গে একই জায়গায় দেখা যায় তাহা হইলে উহা এত অদ্ভুত এবং ভীতিপ্রদ হয় যে উহাকে সহ্য করা সুকঠিন। মা যশোদা বালক গোপালের মুখের মধ্যে উহা চকিতে দেখিতে পাইয়া মূর্ছিতা হইয়াছিলেন। অর্জুনের কথা তো গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখিতে পাওয়া যায়।

*

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপ কখনও কোথাও কোনও ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল কি? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯, শ্রীরামকৃষ্ণের দণ্ডায়মান সমাধিস্থ যে ফটো তোলা হইয়াছিল (ভাগিনেয় হৃদয় পাশে তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, ব্রাহ্মভক্তগণ নিচে বসিয়া আছেন) ভাবুকের চোখে উহা শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপ মূর্তি। ডান হাত ঊর্ধ্বে প্রসারিত। বেদবেদান্ত যে সত্যের আভাস মাত্র দিয়া মূক হইয়া যায় ঠাকুরের উন্মুক্ত আঙুল দুটি যেন সেই ত্রিকালাতীত সত্যের ইঙ্গিত দিতেছে। মুখে কি দিব্য হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বেদবাণী এবং বেদাতীত অকথিত অনন্ত সত্যের বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপের হাসির ভিতর দিয়া যেন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, পশ্য—দেখ। শ্রীরামকৃষ্ণও মরমী সাধককে বলিতেছেন—পশ্য—দেখ—উপরে দেখ—ডান হাত তুলিয়া দুই আঙুল খুলিয়া সেই সত্যকে যেন নির্দেশ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ স্থূল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একত্রিত সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপ সীমাহীন আধ্যাত্মিক সত্যের নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যক্ষ প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণের এই দণ্ডায়মান সমাধিমূর্তির বাম হাতের আঙুলগুলি ছড়ানো; বলিতে পারা যায় 'অবহেলা মুদ্রা'—অর্থাৎ সংসারে কিছু নেই—সংই সার। ডান হাতের ঊর্ধ্বপ্রসারিত অঙ্গুলিদ্বয় বলিতেছে—ভগবানের দিকে তাকাও; বাম হাতের আঙুলগুলি দেখাইতেছে সংসারের অসারত্ব।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টমখণ্ডে আনন্দের 'মীমাংসা' করিয়াছেন। মানুষের আনন্দের পরাকাষ্ঠা হয় তখন, যখন সে যুবা, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠ, বিদ্বান, বলিষ্ঠ, সকলের আশীর্বাদভাজন এবং পৃথিবীর সব সম্পদ তার করায়ত্ত। এই মানবীয় আনন্দকে আনন্দের এক মাত্রা বলা যাইতে পারে। মনুষ্যগন্ধর্বদের আনন্দ

হইল একশত গুণ বেশি। কিন্তু কোন মানুষ যদি বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং চিত্তকে বাসনাশূন্য করিতে সমর্থ হন, তবে তিনিও ঐ মনুষ্যগন্ধর্বদের আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। মনুষ্যগন্ধর্বদের পর দেবগন্ধর্বদের লোক। ইঁহাদের আনন্দ মনুষ্যগন্ধর্বদের অপেক্ষা একশত গুণ। তাহার পর পিতৃলোক, আজান-দেবলোক, কর্ম-দেবলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক। প্রত্যেক লোকে আনন্দ পূর্ববর্তী লোক অপেক্ষা একশত গুণ অধিক। দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দ অন্যান্য দেব-লোকবাসীদের অপেক্ষা একশত গুণ বেশি। দেবপুরোহিত বৃহস্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দের তুলনায় একশত গুণ। বিরাট পুরুষ প্রজাপতির আনন্দ বৃহস্পতির অপেক্ষা একশত গুণ বেশি। ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতির চেয়ে একশত গুণ আনন্দ ভোগ করেন। মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভলোক পর্যন্ত যত আনন্দ সবই মায়ার গণ্ডীর মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের দণ্ডায়মান সমাধিমূর্তির বাম হাতের 'অবহেলা মুদ্রা' তাহা ঘোষণা করিতেছে—'কিছু নয়, কিছু নয়'। হিরণ্যগর্ভের আনন্দের পর যাহা আছে তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায়—

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি॥

—"যেখান হইতে বাক্যসকল মন সহ পৌঁছিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে ব্রহ্মের সেই আনন্দ অনুভব করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও আর ভয় পান না।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৪।১)

বিভিন্ন লোকের আনন্দের পরিমাপ দিবার সময় তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতে ভুলিতেছেন না যে, অধ্যাত্ম সাধক যদি 'শ্রোত্রিয় এবং অকামহত' হন তাহা হইলে তিনিও প্রত্যেক লোকের নির্দিষ্ট পরিমাণ আনন্দ পৃথিবীতে বসিয়াই অনুভব করিতে পারেন।

উপনিষদ্ নানা স্থানে এই সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন। সকল আনন্দের উৎস মানুষেরই হৃদয়ে। যে পরিমাণে হৃদয়কে আমরা স্বচ্ছ করিতে পারি সেই পরিমাণে সেই আনন্দ আমাদের অনুভবে প্রকাশ পায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—নাল্পে সুখমস্তি—যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। —"সীমাবদ্ধে সুখ নাই—যাহা অসীম তাহাই সুখ"। (৭ম অধ্যায়)

ভক্ত, সাধু, সন্তদের জীবন অনুসরণ করিলে আমরা একথা সহজেই বুঝিতে পারি। গুরু-নির্দিষ্টপথে জপধ্যান পূজাপাঠ প্রার্থনা বিবেক-বৈরাগ্য ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি সাধনা করিয়া তাঁহারা শ্রীভগবানের আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সংসারের অসারত্ব জানিয়া সংসারের কর্তা পরমেশ্বরকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের মানবজীবন ধন্য হইয়াছিল।

*

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিমূর্তির মুখের হাসিতে যে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পরিমাপ কে করিবে?

"এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।" —ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তাঁহার দাঁড়ানো সমাধিমূর্তির ডান হাতের আঙুল দুটি এই কথাই যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঐ মূর্তির মুখের দিব্য হাসি আমাদের তাঁহার একটি কথা মনে করাইয়া দেয়—"এখানেই সব।" স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন—"বেদমূর্তি"। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদরা জানিতেন ও বলিতেন—তিনি সর্বদেবদেবী স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, বহু সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক সাধনা তাঁহার ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বরে তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের দণ্ডায়মান

সমাধিস্থ ফটোটি সত্যই তাঁহার বিশ্বরূপ। বাহ্য চোখে দেখিলে উহা স্থূল মানুষের দেহ, কিন্তু ঠাকুরের জীবন ও বাণী পর্যালোচনা করিলে এবং শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের জীবন ও উপদেশ স্মরণ করিলে ঠাকুরের ঐ মূর্তিকে ভাবঘন চিন্ময় মূর্তি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ঐ মূর্তির মধ্যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য কেন্দ্রীভূত। ঐ মূর্তিতে যাবতীয় দেবদেবী বিরাজিত। ঐ চিন্ময় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে অনুক্ষণ শ্রীভগবানের নানা নাম অনুরণিত হইতেছে। মুখের দিব্য হাসি সারা জগতে চৈতন্যলোক ও শান্তি বিকিরণ করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ বিশ্বমূর্তির ধ্যান করিলে মন স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে কারণে এবং কারণ হইতে কারণাতীতে লীন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ-গবেষক।

৪

নিবেদিতা গান্ধীজীকে যেসব কথা বলতে পারেন বলে অনুমান করেছি—সেই অনুমানকে দীর্ঘতর করে বলব—তাদের অনেক কিছুই স্বামীজী গান্ধীজীকে বলতে পারতেন—যদি উভয়ের সাক্ষাৎ হত।

যদি বলতেন—তাহলে স্বামীজীর সম্বন্ধে গান্ধীজী ভবিষ্যতে কী বলতেন? কি বলতেন, তা নিশ্চয় ঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু নিবেদিতার বিষয়ে যা বলেছেন তা বলতে পারতেন না বলেই মনে হয়। কারণ, স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল অপরিমেয়। এবং তাতে অনির্ণেয় একটা রহস্যশক্তি ছিল। স্বামীজীর সাক্ষাৎ যদি পেতেন তাহলে গান্ধীজী তৎকালীন ভারতের তো নিশ্চয়ই, হয়তো তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হতেন। বিবেকানন্দের চিরশত্রুরাও বিবেকানন্দকে কখন এই একটি মহিমা থেকে বঞ্চিত করেননি—তাঁর অনন্ত ব্যক্তিত্বমহিমা—যাতে সত্যই চৌম্বকশক্তি ছিল।

কিন্তু ভারতের একালের ইতিহাসে স্বামীজীর পরেই বড় ব্যক্তিত্ব গান্ধীজীর। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দেও সেই ব্যক্তিত্বের স্থির প্রকাশ দেখা গেছে। ব্যক্তিত্বের বড় স্তম্ভ আদর্শনিষ্ঠা—যার জন্য গান্ধীজী সর্বস্ব পণ করেছেন। বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, বহু মত জেনেছেন, মন খোলা রাখতে চেয়েছেন—কিন্তু নিজের সত্যবোধের ভিত্তিতেই সবকিছু স্থাপন করেছেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে নমস্কার জানিয়েও তাঁর পক্ষে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল।

যদি সরেও যেতেন—বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কী বলতেন—যেখানে তিনি বলেছেন—"স্যার ফিরোজ শা মেটাকে আমার মনে হল হিমালয়, লোকমান্যকে মহাসাগর।"

কোন শেষ কথা বলা এখানে সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি, মানবহৃদয়ের একেবারে গহনে প্রবেশের "ঐশ্বরিক" অধিকার ছিল বিবেকানন্দের—সে ক্ষমতা তিনি কদাচিৎ প্রয়োগ করতেন—কিন্তু ভারতের ভাবী গণ-মন-অধিনায়ককে কি তিনি চিনতে পারতেন না—এবং তাঁর ভবিষ্যতের মধ্যে নিজের দিব্যদৃষ্টিকে প্রেরণ করতেন না? তাছাড়া আমার বিশ্বাস, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ব্যারিস্টারকে

তিনি নামে অন্ততঃ জানতেন। নিশ্চয় সংবাদপত্রে তাঁর একক বীরত্বের কথা পড়েছেন। সেই মানুষটির ভিতরটা দেখে নেওয়া তাঁর পক্ষে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

আচার্য বিবেকানন্দ অবশ্যই গান্ধীজীর মধ্যে সমাদরের ও সমর্থনের বহু বিষয় দেখতে পেতেন। ধরা যাক, কংগ্রেস ব্যাপারটিই। আলোচনা কংগ্রেস নিয়েও হতে পারত। স্বামীজী কংগ্রেসের আবেদননীতি ও বক্তৃতাবাজির বিরোধী, জনগণের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতি-ঘাটতির সমালোচক—তবে ভারতবাসী কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে একত্র হয়ে একটা-কিছু বলছে, তার মূল্য-গ্রাহী। গান্ধীজীও কংগ্রেসের মূল্য স্বীকার করতেন, না-হলে নাটাল কংগ্রেস গঠন করতেন না, বা কংগ্রেসে যোগ দিতে ভারতে আসতেন না। কিন্তু কংগ্রেসের শূন্য আড়ম্বর দেখে তাঁর মনে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল :

"কয়েকদিনের মধ্যে আমি কংগ্রেসের কার্য-প্রণালী জানতে পারলাম। অধিকাংশ নেতার সঙ্গেই দেখা করলাম। গোখলে, সুরেন্দ্রনাথের মতো স্তম্ভস্বরূপ যাঁরা, তাঁদের রীতিনীতিও লক্ষ্য করলাম। কংগ্রেসে সময়ের বিপুল অপচয়ও দেখলাম। আরও দেখলাম, যার জন্য তখনি দুঃখ পেয়েছি—আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে ইংরেজী ভাষার মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য। কংগ্রেসে শক্তির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে খুবই কম মনোযোগ ছিল।" [আত্মজীবনী]

গান্ধীজী যে সময়ের কথা বলছেন, তার প্রায় একবছর আগে, ১৯০১ জানুআরি মাসে, স্বামীজীর পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতে' একই বিষয়ে তির্যক মন্তব্য করা হয় :

"This is the age of Congresses, conferences and meetings. They are the fruits of the season; for the law is that word precedes work. To question their usefulness is to betray one's lack of growth. But one should never forget that action—not talk, individual examples—not collective resolutions—impregnate the masses with ideas which bear."

কথাগুলি ধ্রুববাক্য এবং দিগ্‌দর্শক নিঃসন্দেহে। গান্ধীজীর জীবন তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে উপস্থিত আছে।

স্বামীজীর মতের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বলা উচিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—বিষয়ে উভয়ের ভাবনার ঐক্য ছিল, এবং সেই চিন্তাগত ঐক্য যখন পরবর্তীকালে কর্মে পরিব্যক্ত হতে আরম্ভ করে তখন থেকেই ভারতের যথার্থ বন্ধনমোচনের সূত্রপাত। তা হল : ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় ভারতীয় জনগণ। বিবেকানন্দের ভারতবর্ষীয় চিন্তা ও বাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস—PEOPLE. বিবেকানন্দ তাই বৃহৎ আধারে মানবাত্মার বৃহৎ প্রকাশ দর্শন করে উল্লসিত হলেও, তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দ আত্মদানের সুনিশ্চিত বীরত্বই চরম মূল্য পেয়েছে। ভারতের সকল পতন ও প্রাণহীনতার মধ্যেও শ্রমজীবি-কুলের ভিতর থেকে প্রতি মুহূর্তের যে-সেবাশক্তি প্রকাশিত হচ্ছে, তার মহত্ত্ব তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। এক মুঠো ছাতু পেলে তারা দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। তাঁর অবিস্মরণীয় কথাগুলি, যার বিবরণ নিবেদিতা দিয়েছেন :

"যত বয়স বাড়ছে, ততই আমি ছোট-ছোট কাজে মহত্ত্বের বিকাশ দেখতে চাইছি।…উচ্চপদে উঠলে যে-কেউ মহত্ত্বের আচরণ করতে পারে। পাদপ্রদীপের আলোর সামনে অতি বড় কাপুরুষও

সাহসী হয়ে ওঠে—সারা জগৎ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে! তখন কার হৃদয় না নেচে ওঠে, কার না শিরায় রক্তস্রোত দ্রুত বয়ে চলে—তখন কি কেউ সম্পূর্ণ শক্তির বিকাশ না ঘটিয়ে থাকতে পারে?

"নগণ্য কীটের মতো কাজ করে যাওয়াই আমার কাছে প্রকৃত মহত্ত্ব বলে বোধ হচ্ছে। কীট যেমন নীরবে, অবিচলিতভাবে, মুহূর্তে-মুহূর্তে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় অবিরাম কাজ করে যায়—সেই রকম।"

গান্ধীজীর চিন্তার প্রকৃতিও ছিল একই রকম। তিনি ভেবেছেন, জনগণের কাছে জনগণের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। নচেৎ জনগণের নিজস্ব মূল্যকে অস্বীকার করা হবে। গান্ধীজী কংগ্রেসে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য দেখে পীড়িত হয়েছেন, দেখতে পাই। স্বামীজীও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্ভব ক্ষেত্রে হিন্দী বলেছেন। ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে জাতীয়তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। যে-বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের ভাব গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত বাহু প্রসারিত করে রেখেছিলেন—তিনি অপর পক্ষে আত্মবোধহীন দাসসুলভ পরানুকরণ দেখে কতখানি যন্ত্রণাবোধ করেছিলেন, তার কিছু পরিচয় পাই তাঁর দেহান্তের কিছু পূর্বে নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তা থেকে। স্বামীজীর শেষ নির্দেশের মধ্যে সেগুলি পড়ে। নিবেদিতা লিখেছেন:

"হাতে করে খাওয়া ইত্যাদি হিন্দুজীবনের সহজ রীতিগুলি ইউরোপীয় শিষ্যগণকে শেখাতে তিনি অসম্ভব যত্ন নিতেন। 'মনে রাখবে, যদি ভারতকে ভালবাসতে চাও, তাহলে সে যেমন আছে সেইভাবে তাকে মেনে নিয়ে ভালবাসবে, নিজের মনোমতো ভেবে নিয়ে নয়'—তিনি প্রায়ই বলতেন। বাস্তব ভারতীয় জীবনযাত্রার মর্যাদার পক্ষে তাঁর প্রচণ্ড দৃঢ়তা পর্বতের মতো উন্নত মহিমায় বর্তমান থেকে তাঁর অনুরক্ত ইউরোপীয় শিষ্যগণের নিকটে যে-অপরূপ কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তিকে উন্মোচন করেছে—তার নাম ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনকাব্য। সদ্য দাঁত-ওঠা কোন মত বা পথের পক্ষে সোৎসাহ সমর্থন জানানোর মনোব্যাকুলতা তাঁর কখন ছিল না। প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্তু তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি পুরনো হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন। তিনি সরল জীবনের সৌন্দর্যে এতই গর্বিত ছিলেন যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেননি।—'রামকৃষ্ণকে বাদ দিলে আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী'—মৃত্যুর দুদিন পূর্বে বলেছিলেন। একথা বলার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বহুবার বলা গল্পটি আবার বললেন: কিভাবে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত ধুতিচাদর গায়ে খড়ম ঠক্‌ঠক্ করতে-করতে ভাইস্‌রয়ের আলোচনা কক্ষে হাজির হয়েছিলেন, এবং তাঁর বেশবাসে আপত্তি করা হলে বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলেছিলেন—'যদি আমার চালচলন এত অপছন্দ তাহলে আমাকে ডাকা হয়েছে কেন?'

"অন্যে যে যাই ভুল করুক, তাঁর কাছে এদেশ নবীন। ভারতের ভাষাসমূহ অকর্ষিত—সম্ভাবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে।...তাঁর মতে, ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি।"*

এর পাশে রাখা যাক গান্ধীজীর এই সময়ের মনোভাবের ও আচরণের কিছু পরিচয়। তাঁর আত্মজীবনীতে পেয়েছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় পাগড়ির জন্য তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে

* Sister Nivedita, The National Significance Of The Swami Vivekananda's Life And Work. NOW Vol. I.; নিবেদিতা লোকমাতা (১ম), পৃ: ১৩৬।

হয়েছিল। কলকাতায় কার্জন-দরবারে সমাগত ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পোশাক দেখে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা লিখেছিলেন :

"লর্ড কার্জন এই সময়ে তাঁর দরবার করেছিলেন। দরবারে আহূত কিছু রাজা ও মহারাজা এই ক্লাবের [কলকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাবের] সদস্য ছিলেন। ক্লাবে দেখতাম, তাঁরা সব সময়ে চমৎকার বাঙালী ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর পরতেন। দরবারের দিন পরলেন হোটেলের খানসামাদের উপযুক্ত ট্রাউজার ও চকচকে বুট। দেখে ব্যথা পেলাম। তাঁদের একজনকে এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমাদের দুর্ভাগা অবস্থার কথা শুধু আমরাই জানি। ধনবত্ব আর খেতাব জোগাড় করতে কত অপমান সহ্য করতে হয়, তাও হাড়ে-হাড়ে বুঝি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তাই বলে এই খানসামার পাগড়ি, আর চকচকে জুতো?' 'খানসামাদের সঙ্গে আমাদের কোন তফাত আছে মনে করেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তারা আমাদের খানসামা, আমরা লর্ড কার্জনের খানসামা। দরবারে যদি হাজিরা না দিই তাহলে তার ফল ভোগ করতে হবে। যদি আমি নিজের স্বাভাবিক পোশাকে উপস্থিত হই, সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর আপনি কি মনে করেন, এত করেও লর্ড কার্জনের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলার খানিক সুযোগ পাব? মোটে নয়'।"

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার অশুভ ফল সম্বন্ধে স্বামীজী ও গান্ধীজীর চিন্তায় আপাত ঐক্য অন্ততঃ দেখা যায়। বিদেশী শিক্ষা যে আমাদের মধ্যে পরানুকরণ বাড়িয়ে আত্মমর্যাদার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলেছে, সে সম্বন্ধে স্বামীজীর মত ছিল সুস্পষ্ট। বহুবার সেকথা বলেছেন। তাঁর থেকে বড় আন্তর্জাতিক কল্পনা করা যায় না, বাইরের দান গ্রহণে তিনি সর্বদা উৎসুক, কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিনিময়ে নয়। গান্ধীজীও জাতীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে দৃঢ়বুদ্ধি ছিলেন। তাঁর প্রত্যয়কে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কাজে পরিণত করতে গিয়ে কিছুটা সংকীর্ণতা এসে গিয়েছিল—আদর্শের বাস্তব প্রয়োগের কালে তা ঘটেই থাকে। এক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি। ১৯২১, এপ্রিল মাসে গান্ধীজী উড়িষ্যায় এক ভাষণে যা বলেছিলেন, ১৩ এপ্রিলের 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' তার সারমর্ম বেরিয়েছিল :

"উড়িষ্যায় এক জনসভায় গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, ইংরেজী শিক্ষাকে কি (অমিশ্র মন্দ না বলে) মিশ্র মন্দ বলা যায় না, যেহেতু লোকমান্য তিলক, বাবু রামমোহন রায়, এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী এই ইংরেজী শিক্ষারই উৎপাদন?

শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নের উত্তর দেন :

"'...এই শিক্ষাপদ্ধতি অনপনেয় পাপ। এই পদ্ধতিকে ধ্বংস করতে আমি শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করেছি। একথা আমি কদাপি বলতে পারি না, এই পদ্ধতি থেকে কোন সুবিধা আমরা পেয়েছি। যেসব সুবিধা পেয়েছি তা এই পদ্ধতি ব্যতিরেকেই মিলেছে। যদি ইংরেজ না আসত তাহলে ভারত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সঙ্গেই চলত। এদেশে মোগল শাসন বহাল থাকলেও কিছু লোক ইংরেজী ভাষাকে ভাষারূপে শিখত, তার সাহিত্যের জন্যও শিখত। বর্তমান পদ্ধতি আমাদের দাস করে রেখেছে—ইংরেজী সাহিত্যকে নির্বাচন করে গ্রহণ করার স্বাধীনতা তা দেয় না। আমার প্রশ্নকর্তা বন্ধু—তিলক, রামমোহন ও আমার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি হতভাগ্য বামন ছাড়া কিছু নই। কিন্তু তিলক ও রামমোহন আরও অনেক বিরাট পুরুষ হতে পারতেন যদি না তাঁদের মধ্যে এই শিক্ষা সংক্রামিত হত। (করতালি)। আমি আপনাদের বাইরের

করতালির সমর্থন চাই না, যুক্তি ও বুদ্ধির সমর্থন চাই। ইংরেজী শিক্ষাকে অন্ধ মোহবস্তু করার আমি বিরোধী। তাই বলে আমি ইংরেজী শিক্ষাকে ঘৃণা করি না। যদি আমি বলি, সরকারকে আমি ধ্বংস করতে চাই তখন আমার এই অভিপ্রায় নয় যে, ইংরেজী ভাষাকেও ধ্বংস করব। একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে আমি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করব। জনসাধারণের উপর প্রভাবের দিক দিয়ে চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর ও নানকের তুলনায় রামমোহন ও তিলক (আমার কথা ছেড়ে দিন) বামন ছাড়া কিছু নন। ঐসব বিরাট ব্যক্তিদের পাশে রামমোহন ও তিলক সত্যই বামন। একা শঙ্কর যা করতে পেরেছিলেন, ইংরেজী-জানা সকল লোক জুটেও তা করতে সমর্থ হননি। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে যেতে পারি। গুরু গোবিন্দ কি ইংরেজী শিক্ষার উৎপাদন? নানক একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন, সাহসে ও আত্মত্যাগে যার দ্বিতীয় নেই—এই নানকের পাশে দাঁড় করাবার মতো ইংরেজী-জানা একজন ভারতীয়কেও কি পাওয়া যাবে? রামমোহন রায় কি দলীপ সিং-এর মতো একজন শহীদও সৃষ্টি করতে পেরেছেন? রামমোহন ও তিলককে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বাস, রামমোহন ও তিলক যদি ইংরেজী শিক্ষা না পেয়ে জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হতেন তাহলে তাঁরা শ্রীচৈতন্যের মতো বৃহত্তর ব্যাপার ঘটাতে পারতেন।"

গান্ধীজীর এই মন্তব্য তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ—রামমোহন সম্বন্ধে বামন শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদ করেন। গান্ধীজী উত্তরে বলেন, তিনি 'সর্বাত্মক অর্থে' 'বামন' শব্দ ব্যবহার করেননি, আপেক্ষিক অর্থে অর্থাৎ চৈতন্যাদির সঙ্গে তুলনা করেই ঐকথা বলেছেন। সর্বাত্মক বা আপেক্ষিক, কোন অর্থেই রামমোহন বা তিলক সম্বন্ধে বামন শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নয়, এবং স্বামীজী যেখানে রামমোহনের মনীষা সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধা জানিয়েছেন [তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য], দূরদৃষ্টি সম্বন্ধেও —এবং তিলক সম্বন্ধে যাঁর গভীর সম্ভ্রমবোধ ছিল—সেখানে তাঁদের বিষয়ে ঐ শব্দটির ব্যবহার তাঁর পছন্দ না হতে পারে—কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট-ভাবে জানানো উচিত—চৈতন্যাদি পুরুষ, স্বামীজী যাঁদের 'আচার্য' (বা অবতার) মনে করতেন, তাঁদের তুলনায় রামমোহন প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী সংস্কারকদের স্থান সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্যের তাৎপর্যে (শব্দে নয়) তাঁর আপত্তি থাকতে পারে না। অন্ততঃ বর্তমান লেখকের তাই ধারণা। গান্ধীজীও অগণ্যবার বলেছেন, আধ্যাত্মিক নেতারাই ভারতের যথার্থ নেতা। তাঁর আদর্শ নেতা—শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, কবীর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ—সকলেই অধ্যাত্মবীর।

বিবেকানন্দের সামনে রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন। রামমোহন, বিবেকানন্দের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে পারেন (তাও সামাজিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই কেবল)—বিবেকানন্দের আত্মাকে গঠন করেছিলেন রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ—বিবেকানন্দের জন্য নিবেদিতা থেকে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অগণ্য বীরচরিত্র। গান্ধীজীর সামনেও শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র ছিল। তিনি জানতেন, পূর্বকালের চৈতন্যাদির মতো একালের রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ প্রভৃতির সৃষ্টি করেছেন। যদি গান্ধীজী ঐ বক্তৃতায় রামকৃষ্ণের নাম না করে থাকেন তার কারণ, অত্যন্ত নিকট কালের কারো নাম এই সূত্রে উল্লেখ করে অধিকতর বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাননি। [ক্রমশঃ]

স্বর্গভূমি কৈলাস ও তপোভূমি মানস

অধ্যাপিকা সুপ্রীতি দে রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ওড়িশার আস্কা বিজ্ঞান কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা। বিশিষ্ট ওড়িয়া লেখিকা।

তাকলাকোট রেস্ট হাউসে পৌছানোর পর চীন সরকারের তরফ থেকে একজন দোভাষী মহিলা অফিসার আমাদের সাদর অভিনন্দন জানালেন। এই মহিলাই আমাদের এবং চীন কর্তৃপক্ষের মাঝে যোগাযোগ-রক্ষাকারিণী। তিব্বতে থাকা কালে কিভাবে আমাদের থাকতে হবে, সেই সব রীতিনীতি ইংরেজীতে জানিয়ে দেওয়া হল। তারপর কাস্টমস্ চেকিং শেষ হবার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত ২টাতে আমরা আমাদের আস্তানায় যাবার অনুমতি পেলাম।

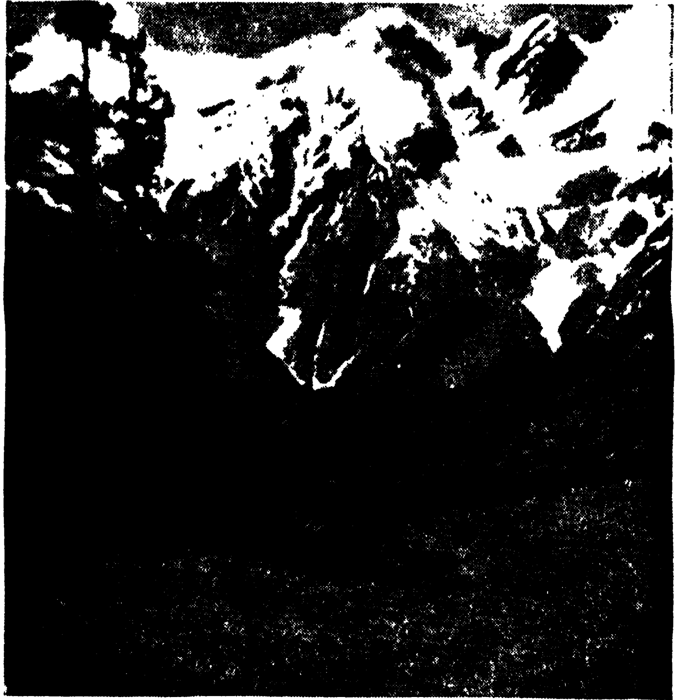
ঘরে ঢুকেই দেখলাম, আমাদের জন্য রাজশয্যা করে রাখা হয়েছে। ঘরখানি খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। ভারি ভাল লাগল। ভোর ৪টা থেকে রাত ২টা বিরামহীন চলেছি। এখন আমরা ক্লান্ত। তাই অমন রাজশয্যা আমাদের কাছে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ। এত সুন্দর ঘর, কিন্তু শৌচাগারটি যেন সে-তুলনায় নরককুণ্ড। আমাদের দেশের খাটা পায়খানার মতো। স্নানের জন্য কোন আলাদা স্নানাগার নেই। অবশ্য ঘরে বসেই টব বাথ নিতে পারা যাবে—ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জলের বালতি রয়েছে। তাছাড়া বিরাট ফ্লাস্কে গরম জল ও চীনা চায়ের আয়োজনও রয়েছে। গরম জলে গা-হাত মুছে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন যখন উঠলাম, তখন সকাল ৮টা।

আজ আমাদের বিশ্রামের দিন। তাই বিছানা বাঁধার তাড়া নেই। আমার পায়ের একটি আঙুল ফুলে গেছে ও পুঁজ জমেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম। ডাক্তার পা খুলে রাখতে ও পাউডার দিতে বললেন। তাছাড়া পায়ের বিশ্রামের জন্য শুয়ে থাকতেও বললেন। ভারত থেকে যে ডলার আমরা সঙ্গে এনেছিলাম এখানে তা চীনা মুদ্রাতে পরিবর্তন করে নিলাম। সারাদিন কোথাও না বেড়িয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলাম।

পরদিন ৪ জুলাই ট্রাকে করে আমরা কৈলাস মানস রওনা হলাম। ট্রাক চলতে শুরু করেছে—আমার মনে তখন নানা প্রশ্ন। কেন এসেছি এই দুর্গম তীর্থে? কি পাব এখানে? কৈলাসকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেনই বা বলা হয়? পুরাণে কৈলাস পর্বতকে ধরিত্রীর মেরুদণ্ডরূপে ধরা হয়েছে কি কারণে? এই তিব্বতকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয় কেন? এমনি হাজার প্রশ্নের বন্যার মধ্যে যখন আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম, সুন্দর এক শ্বেতশুভ্র আলোকোদ্ভাসিত পর্বত-চুড়া সবার উপরে শির উন্নত করে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলাম, "জয় কৈলাসপতির জয়"। দর্শন মাত্রই বুঝতে বাকী রইল না—ঐ উনিই আমার চির ঈপ্সিত কৈলাসপতি। এতকাল যাঁকে নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা, তাঁকেই প্রত্যক্ষ দেখে সব সংশয় মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। মহান্ বিশাল চিরসত্য চিরসুন্দর শিবকে অশ্রুজলের অর্ঘ্য দিলাম। অবাক মৌন বিস্ময়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাঁর চরণতলে রাখলাম। এই প্রশান্ত সৌম্য মৌন রূপ আমার প্রাণমনকে আবিষ্ট করে দিল। যেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পবিত্রতার এক বিশাল প্রতিমূর্তি! ক্ষুদ্র 'আমি'-কে হারিয়ে ফেললাম ঐ বিশালের মাঝে। আজ বুঝতে পারলাম, কেন বিজ্ঞানীরাও এসে স্থানীয়

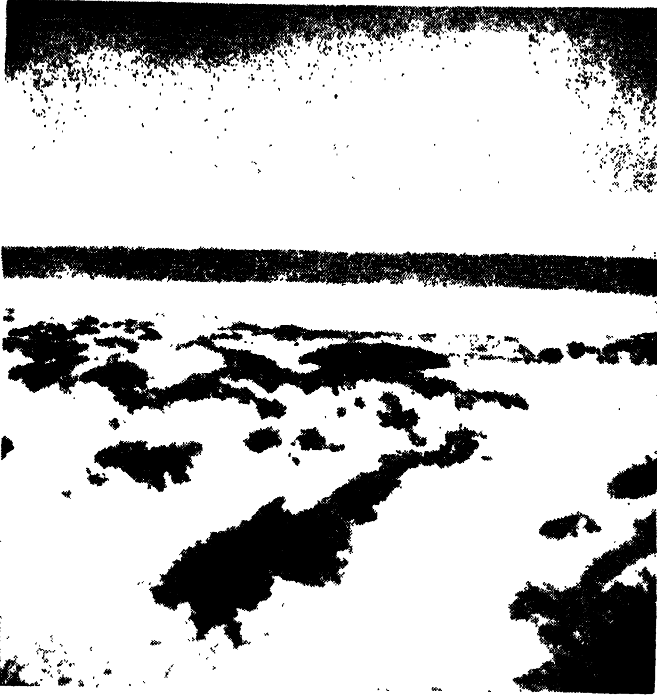


কৈলাস-মানসের যাত্রাপথে কালাপানির কালীমন্দির।



গারবিয়াঙের কাছে মালভূমি—ছিয়ালেখ। চারপাশে তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া—তলদেশে ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি।

[লেখিকার তোলা আলোকচিত্র]



'গভীর রাতে একবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্না-স্নাত মানসের মোহিনীরূপ প্রাণভরে দেখলাম। সত্যি, এই রূপ দর্শন করে প্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে ছিল,—সে আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

পৃষ্ঠাঃ ১২৩

'···বহুবার বহুভাবে কৈলাস-পতিকে দর্শন করেছি,— খুব কাছে থেকেও দেখেছি, আর বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়েছি। মুখে কোন কথা নেই— শুধু নয়ন মেলে দেখা সেই অনন্ত অসীমকে।'

পৃষ্ঠাঃ ১২৩



[লেখিকার তোলা আলোকচিত্র]

অধিবাসীর মতো সাষ্টাঙ্গ হয়ে এই দেবাদিদেবকে প্রণাম জানিয়ে গেছেন। এই মহান্ অসীমের সামনে মাথা না নুইয়ে কি উপায় আছে? আজ যে অপার্থিব সম্পদ আমি পেলাম, তা আমার জীবনের ভিক্ষার ঝুলিকে পূর্ণ করে রাখবে চিরদিনের জন্য। আমি যখন স্বার্থদ্বন্দ্বময় মাটির পৃথিবীতে ফিরে যাব, এই সঞ্চয় হবে আমার চলার পথের মূল্যবান পাথেয়। তাই একে তুলে রাখলাম মনের মণিকোঠায়। আমার মন যখন ডুবে আছে ঐ কৈলাসপতির ধ্যানে—নিজের মধ্যে, তখন এক সহযাত্রিণীর ডাকে বাস্তবে ফিরে এলাম। তিনি সোল্লাসে বলছেন, "দেখ দেখ রাক্ষসতাল!" চোখ তুলে দেখলাম, অসীম নীল জলরাশি।

প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কাতে ঢেউ তুলছে আর আছড়ে পড়ছে তীরে। রাক্ষসতালের পরিধি ১২২ কি. মি.। কোন তীর্থযাত্রী এখানে পুণ্য অর্জন করতে স্নান করেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে রাক্ষসতালে অনেক চোরাবালি আছে—তাই এখানে নামা নিরাপদ নয়। তাকলাকোট থেকে কৈলাস ৮০ কি. মি., মানস সরোবর ৫০ কি. মি.; কৈলাস পর্বতের উচ্চতা ২২,০২৮ ফুট।

একসময় আমাদের ট্রাক এসে থামল প্রথম ট্রানজিট ক্যাম্প মানসের তীরে। ধীরপদে এগিয়ে চলি সরোবরের দিকে, যার দর্শনের জন্য ছুটে এসেছি এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে। কাছে গিয়ে ভক্তিভরে মানসের জল মাথায় তুলে নিই। বহুজন্মের পুণ্যফলে এই দর্শন পেলাম মুনি-ঋষিদের তপোভূমি মানস আর পুণ্যসলিলা মানস সরোবরের। আমার সামনে অনন্ত অসীম সুনীল উচ্ছল জলরাশি—স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ। জলের নিচে নানা রঙের পাথর। অনেক রকমের মাছ খেলা করছে জলে। মানস সরোবরের সমস্তটা তীরভূমি বিচিত্র রঙের পাথরে ঢাকা। দেখতে দেখতে অশ্রুজলে ভাসছি—ধ্যানমগ্ন আমি। এই অনন্ত অসীমের সামনে দাঁড়িয়ে মন যে আকুল হয় এর অধিষ্ঠাত্রী জননীকে হৃদয়-পদ্মে পাবার জন্য। আমি ডুবে যাই সেই অতলতলে। স্থানমাহাত্ম্য উপলব্ধি বুঝি এইরকমই। তাই কি যুগ যুগ ধরে ছুটে এসেছেন অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও মুনি-ঋষিরা এই তপোভূমিতে? আমার মতো সামান্য নারী আধ্যাত্মিকতার গহনে না ডুবেও এক অননুভূত আনন্দের স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল,—এই স্মৃতিটুকু সঞ্চয়ই আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এই মানস দর্শনের পর। সহযাত্রীদের ডাক শুনে ফিরে এলাম। ট্রাকে চড়তে হবে আবার। কৈলাসের বেস্ ক্যাম্পে নেমে যাবেন কৈলাসের যাত্রীরা, আর আমরা যাব মানসের দ্বিতীয় ক্যাম্পে,—যেখান থেকে আগামী কাল আমরা মানস পরিক্রমা শুরু করব। ট্রাক একসময় কৈলাসের বেস্ ক্যাম্পে এসে পৌঁছালে কৈলাসযাত্রীরা সেখানেই নেমে গেলেন।

আমরা আটজন ফিরে যাচ্ছি মানসের ক্যাম্পে, যেখান থেকে আমরা মানস সরোবর পরিক্রমা করব। যাঁরা কৈলাসের ক্যাম্পে নেমে গেলেন ওঁরা এখন কৈলাস পরিক্রমা করবেন। পরিক্রমা-পথে ক্যাম্পগুলোতে ২৬ জন যাত্রীর থাকার মতো ব্যবস্থাদি নেই। তাই আমাদের দলটিকে দু-ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা পরিক্রমা করবেন না, তাঁরা ক্যাম্পে অপেক্ষা করবেন। যাঁরা কৈলাস পরিক্রমা করবেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মানস পরিক্রমা করবেন না। চারজন মহিলা ও চারজন পুরুষ—আমরা এই আটজন কৈলাস মানস উভয় পরিক্রমা করব বলে সংকল্প করেছি। আমাদের ট্রাক এসে নির্দিষ্ট ক্যাম্পে থামল। ক্যাম্প মানে একটা স্কুলবাড়ি। কাছাকাছি আছে কয়েক ঘর মাত্র তিব্বতী। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে

রেখে মানস সরোবরের তীরে চলে গেলাম।

সন্ধ্যা হয়ে এল। অস্ত-রবির ছটা দূরে কৈলাস পর্বতের অঙ্গে পড়ে অপূর্ব দেখাচ্ছে। মানসের জলেও শুরু হয়েছে তখন বর্ণাঢ্য রঙের খেলা। প্রাণভরে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে আস্তানায় ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন ৫ জুলাই সকালে শুরু হল আমাদের মানস পরিক্রমা। সারাদিন পথ চললাম মানসের তীরে তীরে। দেখলাম মানসকে বহুরূপে। বহু পাখি মানসের তীরে, ঘাসের মধ্যে, বালির মধ্যে বাসা করে আছে। জলেও দেখলাম আনন্দে বিচরণশীল হংসের দল। ইয়াক বা চমরী গরু দেখলাম মানসের তীরে চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের মালের জন্য যে দুটি ঘোড়া যাচ্ছে, ওরা কিন্তু আগে আগে চলছে। ওদের সঙ্গে যে দুজন ঘোড়াওয়ালা—তারাই আমাদের পথপ্রদর্শক, তবে আমাদের ভাষা বোঝে না তারা, তাই আকারে-ইঙ্গিতে কাজ চালানো হচ্ছিল। মানস পরিক্রমাকালে কয়েকটি বেগবতী নদী অতিক্রম করতে হয়। ঐদিনও আমাদের অমনি নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। নদী পার হবার সময় আমাদের জামা-কাপড় সবই ভিজে গিয়েছিল। আবার বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বাড়ছে—সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে—আকাশে চাঁদ উঠেছে। এখনও মানসের জলে রঙের খেলা চলছে। দূরে কৈলাসপতি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর রূপ যেন ধ্যানমগ্ন! আমরা তাঁবুতে পৌঁছে গিয়েছি। তাঁবুটি ঠিক মানসের তীরে,—তার পিছন দিয়ে এক ছোট্ট বেগবতী নদী মানস সরোবরে এসে মিশেছে। ভিজে কাপড় পাল্টে সামান্য খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

৬ জুলাই গুরুপূর্ণিমা। আজ সরোবরের তীরে তীরে পথ বেয়ে সারাদিন চলতে হবে,—মানস সরোবর এবং কৈলাসপতিকে একই সঙ্গে দর্শন হবে। মনে পড়ে যাচ্ছিল, এমনি এক গুরুপূর্ণিমায় দর্শন করেছিলাম অমরনাথকে। সারাদিন চলছি,—সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ভোরে মানসের যে শান্তরূপ দেখেছিলাম, এখন কিন্তু তা নেই। এখনকার রূপ উত্তাল উচ্ছল। প্রচণ্ড বেগে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সরোবরের তীরে। ঠিক অনুভব হচ্ছিল,—আমি যেন পুরীর সমুদ্রের বেলাভূমি দিয়ে চলছি। পথে এক গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। পা আর চলতে চাইছে না, তবু লাঠি ঠুকে ঠুকে কোনরকমে এগিয়ে চলেছি। প্রচণ্ড হাওয়া এগোতে দিচ্ছে না। এখানে লোকবসতির নামগন্ধও নেই,—কেবল রুক্ষ শুষ্ক পাহাড় আর পাহাড়। এমনি ভাবেই, বেস্ ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম।

মানস সরোবরের দক্ষিণ তীরে মান্ধাতার পর্বতমালা, আর উত্তরে কৈলাস। আমাদের ক্যাম্প থেকে মান্ধাতার পর্বতশ্রেণীকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। মানসভূমি এখন গুরুপূর্ণিমার চাঁদের আলোয় স্নাত। আশ্চর্য মধুময় লাগছে এই তপোভূমিকে। মনে হচ্ছে সব দেবতা নেমে এসেছেন মানস সরোবরে, এই জ্যোছ্‌না-রাতে জল-বিহারের জন্য। কেমন যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ। বড় ক্লান্ত, তাই বাধ্য হয়েই তাঁবুতে শুতে এসেছি। কিন্তু আমাদের যে সহযাত্রীরা পরিক্রমাতে যাননি, তাঁদের একজন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওঁকে নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত। এখানে ডাক্তার নেই। আজ মানস পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে যে আনন্দপূর্ণ মন ছিল, তাতে যেন খানিকটা ভাটা পড়ল। বড় ক্লান্ত ছিলাম, তাই না শুয়ে পারলাম না।

খুব ভোরে উঠেই সর্বাগ্রে মানসের জলে স্নান করে বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক করলাম। বোধ হচ্ছিল,

জীবনের সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে আমি আজ ফুলের মতো পবিত্র। সারাদিন মানস সরোবরের তীরে বসে কাটালাম। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড হাওয়া আর শীতের জন্য বাইরে থাকার উপায় ছিল না। তবুও গভীর রাতে একবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্নাস্নাত মানসের মোহিনীরূপ প্রাণভরে দেখলাম। সত্যি, এই রূপ দর্শন করে প্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে ছিল,—সে-আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

পরের দিন ৮ জুলাই আমরা রওনা হলাম কৈলাসের বেস্ ক্যাম্পের উদ্দেশে। ৯ জুলাই থেকে আমাদের কৈলাস পরিক্রমা শুরু হবে। ট্রাকে বসে বহুরূপে কৈলাসপতিকে দেখলাম। কোন্ সময়ে এসে পৌঁছলাম আমাদের বেস্ ক্যাম্পে। আমাদের তাঁবু থেকে কৈলাসপতিকে দেখতে কী মহান,—কত বিশাল লাগছিল! সারাদিন বসে কৈলাসপতিকে দর্শন করেছি,—আর প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছি। প্রচণ্ড শীত। সন্ধ্যায় তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে হল। কৈলাস পুরীতে আজ আমাদের প্রথম রাত। রাতে একবার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে অপূর্ব রূপে দেখে নিলাম, জ্যোৎস্নাকিরণে স্নাত আমার প্রাণের দেবতাকে। মনে হল আমার সব কিছুই মিশে যাচ্ছে বুঝি ঐ শিবসুন্দরে। ফিরে এলাম তাঁবুতে। নিশুতি রাত। কয়েকটা মেষপালকের তাঁবু ছাড়া আর কোন লোকবসতি এখানে নেই।

৯ জুলাই শুরু হল আমাদের কৈলাস পরিক্রমা। সঙ্গে রয়েছে চারটি ঘোড়া ও দুজন ঘোড়াওয়ালা। একটি ঘোড়াতে মাল নেওয়া হয়েছে, অন্য তিনটি খালি,—যখন যার প্রয়োজন হবে উঠবে। প্রথম আমরা তিনজন মহিলা যাত্রী ঘোড়াতে উঠলাম। কিছুদূর যাবার পর ঘোড়াওয়ালারা বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে প্রথম কৈলাসপতির দর্শন করতে হয়।" আমরা ঘোড়া থেকে নেমে হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করলাম কৈলাস-পতিকে। দেবার মতো আমার তো কিছু নেই। তিব্বতীদের প্রথানুযায়ী তিনটা পাথর, পাথরের স্তূপের উপর রেখে, আবার চলতে শুরু করলাম। এই পরিক্রমায় মোট ৩২ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। আজ ১০ মাইল অতিক্রম করে আমরা বিশ্রাম নেব। পথে এক প্রাচীন গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ এখানেও দেখলাম। যেতে যেতে বহুবার বহুভাবে কৈলাসপতিকে দর্শন করেছি,—খুব কাছ থেকেও দেখেছি আর বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়েছি। মুখে কোন কথা নেই—শুধু নয়ন মেলে দেখা সেই অনন্ত অসীমকে। আমাদের আজকের যাত্রার বিরতি হল,—সামনেই তাঁবু। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, তাই তাঁবুতে গিয়ে না শুয়ে পারা গেল না। সন্ধ্যার পর সামান্য খাবার খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। রাতে হঠাৎ দেখি তাঁবুর একটু খোলা অংশ দিয়ে তারা ভর্তি নীল আকাশ। প্রচণ্ড বাতাসে যাতে তাঁবু উড়ে না যায়, তারই জন্য মধ্যে একটু অংশ ঐভাবে খোলা রাখার ব্যবস্থা। অমন রাতে কি শুয়ে থাকা চলে? বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখলাম, জ্যোৎস্না-প্লাবিত কৈলাসপুরী। কিন্তু ঐ শীতল নিশুতি রাতে, বাইরেও বা থাকব কেমন করে? অগত্যা আবার ফিরে এলাম তাঁবুতে।

রাত ৪টা বাজার আগেই আমরা তৈরি হয়ে নিলাম—আজ ২২ মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা যাব পরবর্তী ক্যাম্পে। পথে পড়বে বেগবতী নদী, পেরোতে হবে দোলমা পাস—উচ্চতা ৬,২০০ মি.। সত্যি ভাবতে ভয় হচ্ছে। ঠাকুরকে ও মাকে স্মরণ করে পথ চলছি। তীর্থযাত্রার পথে জপ করে করে চলি বলে, আমি চলার শক্তি পাই। আমাদের মধ্যে দুজন বয়স্ক লোক রয়েছেন, যাঁদের বয়স ষাটের উপরে।

একজন দক্ষিণ ভারতের—রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং আর একজন মাদার। দুজনই আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছেন। এক গভীর ভীষণ খরস্রোতা নদী আমরা সবাই ঘোড়ায় পার হলাম। তারপর একসময় বিখ্যাত দোলমা পাসের নিকটবর্তী হলাম। এখান থেকে অপূর্বভাবে দর্শন করলাম কৈলাসপতিকে। মনে হল খুব কাছে! এই জায়গা থেকেই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। পার হলাম দোলমা পাস। তারপর পাহাড়ের শীর্ষে উঠে মা গৌরীর উদ্দেশে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করলাম। ওখানে বড় একটা পাথর রয়েছে। ওখানেই সকলে মা গৌরীর উদ্দেশে পূজো নিবেদন করেন। আমরাও তাই করলাম। কিছু দূরে নামতেই চোখে পড়ল চির তুষারে ঢাকা গৌরী কুণ্ড। আমাদের পথ থেকে প্রায় হাজার ফুট নিচে। নেমে পথ চলতে লাগলাম। পথ তো নয়—হাজার হাজার বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া। চারিদিকে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেছে। সত্যি, এ শিবের দেশ,—প্রলয় নৃত্য তো মাঝে মাঝে এখানে ঘটবেই! ক্রমশঃ নিচে নেমে এলাম। পার হলাম তুষারে ঢাকা এক পাহাড়ী নদী। এইভাবে নামতে নামতে অনেকটা নিচে এসে একটা উপত্যকা পেয়ে সেখানে বিশ্রাম নিলাম খানিকক্ষণ। তারপর ওখানে বসেই দ্বিপ্রহরের জলযোগ সেরে নিলাম আবার শুরু হল পথ চলা। বহুকষ্টে রাত ১০টা নাগাদ আমাদের শেষ তাঁবুতে এসে পৌছলাম। শেষ হল বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত কৈলাস পরিক্রমা। ভাবতে পারিনি এভাবে মানস-কৈলাস পরিক্রমা করতে পারব আমি। গুরুর কৃপায় তা সম্ভব হল। কৈলাসপুরীতে আজ আমাদের তৃতীয় ও শেষ রজনী। আনন্দপূর্ণ মন নিয়ে দেবাদিদেব কৈলাসনাথকে প্রণাম জানিয়ে সে-রাত্রের মতো শুয়ে পড়লাম।

আজ ১২ জুলাই। আমরা ঘরে ফিরে যাব। যেন স্বর্গভূমি কৈলাস ছেড়ে মর্তে ফিরব—তাই থেকে থেকে বুকটা কেমন ব্যথায় টন টন করে উঠছিল। বাইরে কৈলাসপতিকে বিদায় জানালাম বটে—কিন্তু হৃদয়ে কৈলাসপতিকে প্রতিষ্ঠিত করেই নিয়ে চললাম।

এই চলার পথে বার বার মনে হয়েছে, প্রকৃতির মুক্ত-অঙ্গনে এই স্বর্গভূমিতে যে কৈলাসপতি বিরাজমান,—সেই তিনিই আবার আমার হৃদয়মাঝেও রয়েছেন। বাইরে ও অন্তরে উভয়তঃ তাঁকে খোঁজার সাধনায় রত হব আজ থেকে,—সেটাই হবে আমার জীবন-সাধনা। ফেরার পথে বিশ্রামের স্থানগুলোতে একদিন একদিন কাটিয়ে ২২ জুলাই ভোরে এসে পৌছলাম দিল্লীতে। বাস যমুনা নদীর এপারে থেমেছে আমাকে নামিয়ে দিতে। সহযাত্রীদের থেকে বিদায় নিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সবার শুভকামনা সঞ্চয় করে ফিরে এলাম দিল্লীতে—আমার মামার কাছে।

মনপ্রাণ ভরে আছে পরম প্রাপ্তির আনন্দে। আজ এই মুহূর্তে কৈলাসপতির কাছে প্রার্থনা,—"ওগো দয়াময়, যে আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম, সেই স্বর্গীয় আনন্দ যেন তোমার কৃপায় আমার হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক থাকে।"

বসন্তরোগ কি সত্যিই মৃত?

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

কলিকাতা 'স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনে'র ভাইরলজি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বর্তমানে 'বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা'র ভাইরাস বিষয়ক বিশেষজ্ঞ।

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা (World Health Organisation) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে, সারা বিশ্ব বসন্ত (Smallpox) রোগমুক্ত। এর অর্থ এই যে, বিশ্ববাসীর আর বসন্তরোগ হবার সম্ভাবনা নেই। আফ্রিকার সোমালিয়া দেশে শেষ বসন্তরোগীকে দেখার পর দুই বৎসর ধরে সকল দেশে বিশেষ অনুসন্ধান করেও আর কোনও বসন্তরোগী খুঁজে না পাওয়ার পর এরূপ ঘোষণা করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে শেষ বসন্তরোগী দেখা গিয়েছিল বিহারের কাটিহার জেলায় ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে।* সারা পৃথিবী বসন্তরোগমুক্ত—এই ঘোষণার পর হতেই বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা তার ১৫৫টি সদস্য দেশকে বারে বারে অনুরোধ করছে বসন্তটিকা (Vaccination) দেওয়া বন্ধ করার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও বহু লোক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এমন কি কিছুসংখ্যক চিকিৎসকও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, বসন্তরোগ কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে এবং সময় বুঝে আত্মপ্রকাশ করবে। এর ফলে কোন কোন দেশের সরকার এখনও পর্যন্ত নিয়মিত প্রাথমিক টিকা দেওয়া বন্ধ করেনি, এবং কোন কোন দেশ,—বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের কাছে আজও টিকা নেওয়ার সার্টিফিকেট দাবী করে। এই বিচিত্র অবস্থার বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এখানে মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান আলোচনায় জলবসন্তের (Chickenpox) কথা আনা হচ্ছে না, কারণ এই রোগের ভাইরাস (Virus—জীবপরমাণু) সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই রোগ সকল দেশেই এখনও হয়ে চলেছে। জলবসন্ত প্রতিরোধের ভাল টিকা আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

বসন্তরোগের ভাইরাস, ভেরিয়োলা (Variola virus), আক্রান্তরোগী হতে অন্যকে আক্রমণ করে। ম্যালেরিয়ার মতো এই অসুখ মশার মাধ্যমে হয় না, অথবা জাপানীজ এনকেফালাইটিস্ (Japanese encephalitis) রোগের ভাইরাস-এর মতো ভেরিয়োলা ভাইরাস অন্য কোন জন্তুর দেহে বংশবৃদ্ধি করে না। সেইজন্য দুই বৎসরে যদি সারা পৃথিবীতে কোন বসন্তরোগী না দেখা যায়, তবে ধরে নিতে হবে যে, ভেরিয়োলা ভাইরাস কোন লোকের শরীরে নেই। তা যদি না থাকে, ভবিষ্যতে কোন লোকের বসন্তরোগ হওয়া সম্ভব নয়। আর যদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে শুধু শুধু টিকা (Vaccination) দেওয়ার কোন অর্থ হয় না, বিশেষতঃ যখন টিকা নেওয়ার ফলে কারও কারও একজিমা এবং এনকেফালাইটিস্ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া টিকা দেওয়ার প্রথা চালু রাখলে সেই দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা অনর্থক নষ্ট করা হয়। সকলের এও জানা দরকার যে, হঠাৎ প্রয়োজন হলে তা মেটাবার

* বসন্তরোগের নির্মূলীকরণের ইতিহাস উদ্বোধন পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয়েছে ('একটি ভয়াবহ রোগের মৃত্যু', পৌষ, ১৩৮৬)।

জন্য বর্তমানে বিশ কোটি লোককে দেওয়ার মতো বসন্তটিকা সঞ্চিত করা আছে পৃথিবীর দুটি ডিপোতে,—একটি দিল্লীতে, অপরটি জেনেভা সহরে। এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। কোন লোকের দেহে বসন্তরোগ-ভাইরাস না থাকলেও গবেষণার জন্য বর্তমানে পৃথিবীর তিনটি* ল্যাবরেটরিতে জীবিত ভেরিয়োলা ভাইরাস রাখা আছে, একটি আমেরিকার অ্যাটলাণ্টা সহরে, একটি মস্কোতে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ-আফ্রিকায়। কিন্তু এই তিনটি ল্যাবরেটরিতে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার তত্ত্বাবধানে এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া আছে যে, সেখান হতে ভাইরাস ছড়িয়ে গিয়ে বাইরে কারও বসন্ত হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে 'বসন্তরোগ দেখা দিয়েছে' বলে বহুবার গুজব রটেছে, কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে, তার সবগুলিই 'বসন্তরোগ নয়' বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বসন্তরোগ-ভাইরাস কোন জন্তুর দেহে থাকতে পারে না। কিন্তু এটি জানা দরকার যে, মুরগি, ইঁদুর, খরগোশ প্রভৃতি নানা জন্তুর 'বসন্ত' হয়, কিন্তু সেইসব জন্তু-বসন্তের ভাইরাস ভেরিয়োলা ভাইরাস হতে পৃথক। কিন্তু এদের মধ্যে মানুষের নিকট-সম্পর্কীয় জীব বানরের যে বানর-বসন্ত (monkey pox) হয়, তার উপর বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা গোড়া হতেই সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। বানর-বসন্ত রোগের ভাইরাস যে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, তা আগে জানা ছিল না। কিন্তু ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আফ্রিকার জেয়ারি (আগের নাম কঙ্গো) দেশে যখন দুটি লোককে বানর-বসন্তরোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেল, তখন তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বানর-বসন্ত রোগীর লক্ষণগুলি প্রায় বসন্তরোগী (smallpox)-র মতো এবং ল্যাবরেটরিতে বানর-বসন্ত ভাইরাসকে ভেরিয়োলা ভাইরাস হতে সহজে পৃথকীকরণ করা যায় না। জেয়ারি দেশে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা এই রোগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। আজ পর্যন্ত সবসুদ্ধ ৮৮ জন বানর-বসন্তরোগী পাওয়া গেছে এবং একটি রোগী হতে অন্য লোক আক্রান্ত হবার প্রমাণও পাওয়া গেছে। সেখানকার জনসাধারণকে টিকা দেওয়া চালু রাখা সত্ত্বেও, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আগের আগের বৎসরের সংখ্যা হতে বেশি হওয়ায়, চিন্তার বিষয় না হলেও অবস্থাটা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব রোগীই অবশ্য পাওয়া গেছে জেয়ারি দেশে, কিন্তু টিকা নেওয়া বন্ধ হওয়ার পর রোগটি বহির্দেশে ছড়াবে কিনা, সেটিই চিন্তার বিষয়। তবে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ সকল দিক বিবেচনা করে মনে করেন যে, বানর-বসন্তরোগ বড় রকমের একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না।

উপরের আলোচনা হতে কেউ যেন মনে না করেন যে, বসন্তরোগ (smallpox) আবার ফিরে আসবে এবং টিকা নেওয়ার প্রথা চালু করা উচিত।

* বর্তমানে দুটি, কারণ সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়েছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ল্যাবরেটরির সব ভেরিয়োলা ভাইরাস ধ্বংস করা হয়েছে।

সত্যি পাওয়া

(কথামৃতের গল্পাবলম্বনে)

শ্রীশান্তশীল দাশ

শিক্ষাব্রতী, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গীতিকার।

চোদ্দ বছর সাধন করে ফিরল সে জন বাড়ি,
বললে, 'আমি অনেক গুণের হলেম অধিকারী।'
'কী পেয়েছিস, বল্ দেখি ভাই', বললে দাদা হেসে ;
'চল তবে দেখাই', বলে নদীর ধারে এসে
সেই জলেতে নামল এবং হেঁটেই হল পার।
'দেখলে দাদা, কী পেয়েছি'—কণ্ঠে অহঙ্কার।
একটু হেসে দাদা তখন বললে, 'ওরে ভাই,
আধ পয়সা ভাড়া দিয়ে রোজই আমি যাই
ওই পারেতে ; এই পেয়েছিস্ এতদিনের পরে,
চোদ্দ বছর বনে গিয়ে সাধন ভজন করে।
কতটুকু মূল্য বা এর, আধ পয়সা সার ;
পাওয়ার তোমার অনেক বাকী, মিছেই অহঙ্কার।'
খুলল নয়ন ছোট ভায়ের, বুঝল পাওয়া চাই
তাঁকে, নইলে অন্য পাওয়ার মূল্য কিছুই নাই।

সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা

(বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাবাবলম্বনে)

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

সুপরিচিত বর্ষীয়ান্ কবি।

জগতের মাঝে আসি, লভিয়াছি সুতা-সুত,
বন্ধু-পরিজন,
লভিয়াছি কত বিত্ত যশমান, তাহাতেই
আছি নিমগন।

তাহাদের প্রিয় ভাবি, তাহাদের ভালবাসি
সুনিবিড় ভাবে,
মিটিল না কভু ক্ষুধা— বঞ্চিত হলাম শুধু
প্রিয়-বস্তু-লাভে।
আছে আছে আরো প্রিয়, আরো কাম্য, আরো শ্রেয়,
আত্মা বরণীয়,
তাঁহারে লভিলে হবে— এ জীবন-শুভপ্রদ
চির-রমণীয়।
সবার অন্তর মাঝে সর্বান্তরতর সাজে
তিনি বিরাজিত,
আমার প্রাণের প্রাণ, আমার মনের মন,
চির-আকাঙ্ক্ষিত।

চির ধাত্রী

ডক্টর জগন্নাথ চক্রবর্তী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক—সুকবি।

ধরিত্রীর ধাত্রী কেউ
বিস্ময়ের পশ্চাতে বিস্ময়
সকল স্নেহকে ঘিরে
যে-স্নেহের অধিকার।
ফলের ভেতরে মধু
মধুর গভীরে রস,
মধুৎস মধুর সেই স্নেহ।
নারীকে স্বামীর ঘরে কে পাঠায় ?
কোলে তুলে দ্যায় শিশু
দুগ্ধভাণ্ড সহ
কোন্ মা নতুন মাকে ?
সেই শুভ্র চিরন্তন মাতৃগৃহে
মঙ্গল পুষ্পের স্পর্শ
চির পুষ্প শোভি নিকেতনে।
শক্তির আধার কোন
শক্তি দ্যুতিময়ী
যার মধ্যে নম্র ভক্তি
শক্তিসহোদরা।
গিরিচূড়া থেকে জল
নেমে যায় সমুদ্রের খোঁজে
কে নামায় ?
কে সেই স্রোতের জন্য
অনন্ত বারিধি এক পেতে রাখে
ঝাঁপ দেবে বলে ?
বাক্য গড়ে, উদ্দেশ্যকে নিয়ে যায়
বিধেয়ের ঘরে ?
ধরিত্রীর ধাত্রী কেউ
বিস্ময়ের পশ্চাতে বিস্ময়
সকল স্নেহকে ঘিরে
অধিকার তার।

কথামৃতে ছোটগল্পের রূপরেখা

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবালোকে বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীর্তি গবেষক। বিগত ৩ এপ্রিল ১৯৮৩, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

১

ছোটগল্প কি, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য থাকলেও মোটামুটি একটা ঐক্যসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, "ছোটগল্পে পাওয়া যাবে এক বিশেষ প্রতীতি-ঐক্য যা অন্য কথাসাহিত্য থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।" কেউ বলেছেন, "ছোটগল্প একটি বিশেষ সমস্যা-সঙ্কটের প্রতিফলন।" আবার কেউ একটু বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন, "দ্রুত ধাবমান জীবন অভিজ্ঞতা থেকে ছোটগল্প লেখক কুড়িয়ে নেন এক বিশেষ অবস্থা অথবা অসঙ্গতির প্রকট মুহূর্তটি যা তাঁর মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়।" আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক-গবেষক ও ছোটগল্পকার বিভিন্ন মতের সমন্বয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন, "Impression বা প্রতীতি-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য কোন ঘটনা বা কোন পরিবেশ বা কোন মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্যসংকটের মধ্যে দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[১]

প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্পের আধুনিক বৈচিত্র্য কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং কালক্রমে ছোটগল্প যখন বিভিন্নতর পথে অগ্রসর হবে তখন নতুন লক্ষণ নির্দেশেরও প্রয়োজন দেখা দেবে। আমরা পণ্ডিতদের বিতর্কের মধ্যে না জড়িয়ে মোটামুটি কয়েকটি লক্ষণ স্থির করে নিতে পারি। সহজভাবে বুঝবার চেষ্টা করলে দেখতে পাব গল্পের ছোটত্বের উপর ছোটগল্পের সাফল্য নির্ভর করে না—এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রকৃতিতে। ছোটগল্পে (১) বক্তব্য হবে একলক্ষ্যমুখী (২) ফলে চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে থাকবে নিবিড় সংহতি। (৩) উপসংহারে দেখা যাবে নাটকীয় বিদ্যুচ্চমক, (৪) অথবা পূর্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে স্বাভাবিক রসপরিণতি এবং (৫) পরিণতির মধ্যে থাকবে প্রশ্নময়তা যা সমাপ্তির পরেও পাঠকমনে অনুরণন জাগিয়ে রাখবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করে জীবনের খণ্ডরূপের যে ক্ষুদ্রকাহিনী তাকেই ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায়। বলা বাহুল্য, সেই খণ্ডরূপের মধ্যে বৃহত্তর জীবনের আভাস এবং লেখকের আধুনিক জীবনবোধ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

ছোটগল্পের বিচার বিশ্লেষণ বা আঙ্গিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা আধুনিক কালের হলেও বাস্তবিক-পক্ষে ছোটগল্পের জন্ম সুপ্রাচীনকালে। মানুষ চিরকাল গল্প শুনতে চেয়েছে। যখন মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি তখন মানুষের এই গল্পশোনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল এককালে শোনা কাহিনী, গ্রাম-বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতার কিছু ঘটনা অথবা নিজেদের কামনা-বাসনা সঞ্জাত কাল্পনিক রূপকথা কাহিনী। এসব কাহিনীর সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকত নীতি বা আদর্শবাদ—যা তাকে কালজয়ী করত। আধুনিক ছোটগল্প বিচারে সঙ্গত কারণেই আমরা রূপকথা কাহিনীগুলিকে বাদ দিয়েছি, বাস্তব-জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্রের অভাবে। সেই সঙ্গে নীতি বা আদর্শবাদকে দূরে সরিয়ে আমরা

১ সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ছোটগল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমালোচকের অভিমতগুলিও উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

যখন কাহিনীকে জীবনমুখী করে তোলার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলাম, তখন কিন্তু লেখকের জীবনবোধের মধ্যে আদর্শবাদকে সম্পূর্ণ পরিহার করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হল না, গল্পের মধ্যে তার আত্মগোপনটা শিল্পসম্মত করে তোলা হল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের যে কোন শাখার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে Negative বা নেতিমূলক চিন্তার আয়ু বড় ক্ষীণ। যে কোন কালজয়ী সাহিত্যকর্মের মধ্যে আছে এক ধরনের নীতি বা আদর্শ যাকে আমরা সহজ ভাষায় বলি ধর্ম। এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক নাট্যকারের মতামত স্মরণ করতে পারি। John Van Druten অনেকগুলি নাটকের স্রষ্টা, নাট্যশিল্প সম্পর্কেও তাঁর একটি রচনাগ্রন্থ আছে। নাটকের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

I believe, that every play which seems to interpret humanity with its dreams and its mistaken searching for solution of its wishes and problems and every play that helps to free audience from the ego of their own stories, is a religious drama.[২]

কথাগুলি শুধু নাটক নয়, সাহিত্যের যে কোন শাখা সম্পর্কেই সত্য। ধর্ম নামক বস্তুকে সাহিত্য থেকে ছেঁটে দিলেই তা মানুষের কাছে সমাদর লাভ করবে অথবা মানুষের কল্যাণকর হয়ে উঠবে, এ ধারণা আগাগোড়া ভুল। কোন্ কালজয়ী সাহিত্যে অধর্মাচারী চরিত্রের জয় ঘোষণা করা হয়েছে? পাঠক বা দর্শক অধর্মাচারী চরিত্রের পতনে বা দুঃখপ্রাপ্তিতে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সহানুভূতি, সমবেদনা, অনুকম্পা কখনও অধর্মাচরণকে শ্রেয়ঃরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। মানুষের জীবন এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিণতি ও সঙ্কট সম্পর্কে একটা স্পষ্টকথা বলে দেওয়া দরকার। মানুষ, যে কোনও পশুর মতোই দেহধারী জীব কিন্তু তার প্রকৃত সঙ্কট মানসজাত এবং এই মানসসঙ্কটেই সে পশুত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার নীতিবোধ, বিবেক, আদর্শবাদ তাকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে বলেই তার চিত্তবিক্ষোভ এবং সেই চিত্তবিক্ষোভেই সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি। এই কারণেই আজ যখন আমরা সাহিত্য থেকে, জীবন থেকে, ধর্মকে বিসর্জন দেবার জন্যে নতুন নতুন মতবাদের আয়ুধ প্রয়োগ করছি, তখনও সাহিত্যের মধ্যে ধর্মচেতনা আত্মগোপন করে আছে, লুপ্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের শিল্পবোধের সঙ্গে নীতিবাদের রফার সূত্রেই আধুনিকতার সূত্রপাত: বাইবেলের গল্পগুলিকে আমরা ধর্মসাহিত্যের কোঠায় ফেলে দিতে পারি কিন্তু জীবন থেকে সেগুলিকে নির্বাসন দেব কি করে? সেই বাইবেলের কাহিনীকে ভিত্তি করেই বহু আধুনিক গল্প জন্ম নিতে পারে— টলস্টয়ই তার প্রমাণ। তাঁর How much land a man requires বোধহয় অনেকেরই জানা। গল্পটি একজন সাধারণ চাষীর ভূমিক্ষুধা কিভাবে সর্বগ্রাসী লোভে পরিণত হয়ে চাষীটির মর্মান্তিক পরিণতি ঘটাল তারই করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রচলিত লোককাহিনী থেকে গল্পটি রচিত বলে আমরা এটিকে ছোটগল্পের পরিধির বাইরে স্থাপন করে 'tale' বলে ছোটগল্পের জাত রক্ষা করতে পারি কিন্তু জেমস টি ফ্যারেল (জন্ম ১৯০৪)-এর The benefits of American life গল্পটির পরিচয় দেব কিভাবে? সংক্ষেপে গল্পটি হল: এক গ্রীক যুবক ধনী হবার স্বপ্ন

২ Religion And the Drama—John Van Druten Vedanta And the West-No. 115.

নিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিল কিন্তু প্রথমেই তার সেই স্বপ্নে প্রচণ্ড আঘাত লাগল—না, আমেরিকায় সবাই রকফেলার কিংবা হেনরী ফোর্ড নয়। তার নিজের দেশের অধিকাংশ লোকই সেখানে হোটেলের সামান্য বয়-বাবুর্চি। অনেক কষ্টে একটা হোটেলে কাজ যোগাড় করল সে—সামান্য বেতন, কনকনে ঠাণ্ডা খাবার, শোবার জন্যে নিচুতলার একটা অন্ধকার ঘরের স্যাঁতসেঁতে ন্যাড়া মেঝে। কিন্তু তাতে সে দমে গেল না। তাকে বড়লোক হতেই হবে—প্রাণপণ চেষ্টায় সে খুঁজে বেড়াতে লাগল ধনী হওয়ার সুযোগ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ঘুরে বেড়ায় আর পথ খোঁজে কিভাবে অনেক টাকা উপার্জন করা যায়! একদিন সে খুঁজে পেল সেই সুযোগ। এক জায়গায়, একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে—অবিরাম নৃত্য প্রতিযোগিতা। সব চেয়ে বেশি সময় যে ৫টি অবিরাম নৃত্য করতে পারবে সে পাবে প্রথম পুরস্কার, এক হাজার ডলার। একজন দরিদ্র, কুৎসিত সঙ্গিনী জুটিয়ে সে নাম দিল প্রতিযোগিতায়। প্রথমবার তারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পাঁচশো ডলার পুরস্কার পেল। তার মনের মধ্যে লোভের আগুন জ্বলে উঠল। যেখানে যেখানে এইরকম প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সব জায়গাতেই সে নাম দিতে শুরু করল এবং সেই সঙ্গিনীটিকে নিয়ে অবিরাম নৃত্য করে চলল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস অর্থ উপার্জনের সাধনা। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন—একের পর এক নিদ্রাহীন রাত কাটছে—তবু তাদের মুক্তি নেই। টাকা চাই—অনেক টাকা। কোথাও হাজার—কোথাও পাঁচশো ডলার—উপার্জনও হচ্ছে তাদের। এমনি করেই একদিন তার সঞ্চয় বিশ হাজার ডলারের কাছাকাছি পৌঁছল। হ্যাঁ, এবার সে বড়লোক। নিজের ঐশ্বর্যের গর্বে পুলকিত যুবকটি দেশে ফিরল—সবাইকে দেখাতে, আমেরিকা গিয়ে সে কত বড়লোক হয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরেই ধরা পড়ল এক মারাত্মক ব্যাধি তার শরীরকে আশ্রয় করেছে। আধপেটা খাওয়া, ঠাণ্ডা খালি মেঝেতে স্যাঁতসেঁতে ঘরে শোওয়া এবং অবিচ্ছিন্ন অমানুষিক পরিশ্রম—তারই স্বাভাবিক পরিণতি এই যক্ষ্মা রোগ। শেষ পর্যন্ত যখন তার মৃত্যু হল তখন কফিন কেনার মতো পয়সাও আর অবশিষ্ট নেই।

এ যেন টলস্টয়ের পূর্বোক্ত গল্পেরই নবরূপ।

আধুনিক কালে এইরকম বহু গল্পের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে নীতি বা আদর্শের বীজ, কারণ মানুষের জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে জীবনধারণার মূল সূত্রগুলি।

২

প্রচলিত মতে কথামৃতকে ধর্মসাহিত্য, জীবনী-সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা যায় এবং সেভাবে তার বিচারও চলতে পারে। এসব অভিধা সম্পর্কে সংশয়ের কোন প্রশ্ন না তুলেই বিশুদ্ধ রসসাহিত্য হিসাবে কথামৃতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সম্ভব। আমরা দেখতে পাই, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস-কারদের আলোচনায় কথামৃতের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গ্রন্থটি (পাঁচখণ্ডকে একত্রে একটি গ্রন্থ বলে উল্লেখ করছি) বাংলাসাহিত্যকে নানাভাবে শুধু প্রভাবিত নয়—সমৃদ্ধ করেছে। বিস্ময়কর যে, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্র' এমন কি 'গোলেবকাওলি'-র কথাও আলোচিত হয়েছে কিন্তু 'কথামৃত' প্রসঙ্গ সর্বপ্রযত্নে পরিত্যক্ত। ইদানীং নাট্যসাহিত্য, বিশেষ করে গিরিশ রচনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কথামৃতের ভূমিকা কিছু স্বীকৃতি পেয়েছে—এমন কি তথা-কথিত প্রগতিপন্থী মহলেও বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই কথামৃত স্থান লাভ করেছে কিন্তু সেকাল বা একালের নাট্যকারেরা যেমন কথামৃতের কাছে

তাঁদের ঋণ অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনি পারেন না ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারেরাও। কিন্তু তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিশেষ গবেষণাধর্মী পর্যালোচনা চোখে পড়েনি। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মীয় নেতা,—মানুষের কাছে তাঁর দান মূলতঃ আধ্যাত্মিক কিন্তু এখানেই তাঁর পরিচয় শেষ হয় না। জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মনুষ্য চরিত্রের মহত্ত্ব, ক্ষুদ্রতা, দীনতা, দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অসঙ্গতি, তুচ্ছতম প্রাত্যহিকতার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি যে কোনও প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারেন। তাঁর গল্প বলার মধ্যে ছোটগল্পকারের প্রার্থিত পরিমিতিবোধ, একলক্ষ্যাভিমুখী সংহতি, নাটকীয়তা বিশুদ্ধ ছোটগল্পের আঙ্গিককেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দু'একটি গল্প দেখা যাক:

"বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন। বললেন, 'ঠাকুর কোথা যান?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।' এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলেন যে?' নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকুতে দিচ্ছিল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষ্মী আবার বললেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্যে ইট তুলেছে…।'"

এ কাহিনীর জাতিবিচার করতে বসে একে ছোটগল্প বলব, না 'টেল' বলব—তা নিয়ে কূটতর্ক আপাতত থাক, কিন্তু এর কাঠামো যে ছোটগল্পের রীতি-অনুসারী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাত্র দুটি চরিত্র, অন্য চরিত্রগুলি নেপথ্যে—গল্পের মধ্যে তাদের ভূমিকা মূল বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যে। আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যে আকস্মিকতা, নাটকীয় পরিসমাপ্তি ও পরিমিতিবোধে এই কাহিনী একটি আধুনিক ছোটগল্পের উপযোগী।

প্রসঙ্গত, একটা কথা স্মরণ করিয়ে দি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গল্প বলেন তখন কাহিনী বর্ণনার মধ্যে ধর্ম বা নীতিবোধকে সাধারণত প্রশ্রয় দেন না—নিপুণ শিল্পীর মতোই কাহিনী বর্ণনা করেন। গল্প শেষ করার পর সেগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই আসে ধর্মকথা। গল্প বলার সময় তিনি যথার্থ শিল্পী —ব্যাখ্যাকালে তিনি শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকসত্তা শিল্পীর স্বাধীনতাকে কখন শাসন করে না।

এবার সামাজিক অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের এক চমৎকার নিদর্শন—আধুনিক সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য:

"একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হয়রান হয়েছে। কর্ম আর হয় না। আফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, 'এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা করো।' এইরূপে কতকাল কেটে গেল—উমেদার হতাশ হয়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে, 'তোর যেমন বুদ্ধি। ওটার কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম হবে।' উমেদার বললে, 'বটে! আমি এক্ষণি চললুম।' গোলাপ বড়বাবুর রক্ষিতা ('রক্ষিতা' অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য অন্য শব্দ ব্যবহার করেছেন)। উমেদার দেখা করে বললে, 'মা, তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহাবিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই! মা, অনেকদিন কাজকর্ম নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা বলে দিলেই আমার একটি কাজ হয়।' গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে

বললে, 'বাছা কাকে বললে হয়?' আর ভাবতে লাগল, আহা ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে। উমেদার বললে, 'বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম হয়। গোলাপ বললে, 'আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক করে রাখব।' তার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বললে, 'তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর আফিসে বেরুবে।' বড়বাবু সাহেবকে বললে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হয়েছে, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

একটি অসাধারণ সামাজিক কৌতুকচিত্র কিন্তু সে কাহিনী দেশকালের সীমায় খণ্ডিত নয়—এতে মানবচরিত্রের এক বিশেষরূপই ধরা পড়েছে। সমাজ ও জীবনের অসঙ্গতির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠলেও গল্পটির আরো একটি দিক আছে—তা হল, সাধারণ মানুষের অসহায়তা, ক্ষুদ্র বাসনা, এবং তাকে চরিতার্থ করার জন্য নিজের ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যকে সুযোগ মতো কাজে লাগানো। উমেদারের কথাগুলির দিকে লক্ষ্য করুন—তার একমাত্র গরিমা ব্রাহ্মণত্বের—বার বার এই ব্রাহ্মণত্ব-গৌরবটি ঘোষণার সময় বারবনিতার প্রতি মাতৃসম্বোধনে সে যেন নিজেই নিজেকে পরিহাস করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ যে গল্পটি বলেছিলেন—সেই ধর্ম-ধ্বজী ভণ্ড স্বর্ণকারের কাহিনীও এই পর্যায়ের গল্প। ধর্ম যখন মানুষের আত্মোপলব্ধির সোপান তখন তা মানুষের বড় সম্পদ কিন্তু সেই ধর্মই যখন সম্পদ আহরণের উপাদান তখনই তার বিকৃতি, তা তখন শোষণের অস্ত্র। আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই।

যদুমল্লিকের কাছে মোসাহেব রাখা সম্পর্কিত কৌতুক কাহিনীটিও সামাজিক ব্যঙ্গের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—তবে সেটি গল্পের কাঠামো মাত্র।

কয়েকটি রেখার টানে কোন বড় শিল্পী যেমন আশ্চর্য ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি সামান্য উপাদানে মানবচরিত্র রূপায়িত করতে পারতেন। সেগুলি যেমন মানুষের খণ্ড খণ্ড রূপকে প্রকাশ করে তেমনি সেই খণ্ডের মধ্যেই পূর্ণমূর্তিটির আভাস পাওয়া যায়। সেই রকম গল্প 'সমবয়স্কা মেয়েদের স্বামী চেনানো' কিংবা 'মাছধরা' বা 'কুমড়ো কাটা বড়ঠাকুর'। প্রথম গল্পটিতে একটি সলজ্জ বধূর অনুরাগ ও প্রেমের বর্ণচ্ছটায় বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের রূপ ফুটে ওঠে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পদুটিতে বাঙালীজীবনের অতিপরিচিত ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এগুলি শুধু বক্তার দৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার নিদর্শন নয়—প্রকাশ নৈপুণ্যে ও শিল্পীর রসবোধে মাধুর্যমণ্ডিত।

অজস্র গল্প বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রকৃতিতে ও লক্ষণে কোথাও সেগুলি ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত হবার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়, কোথাও বা রূপরেখায় পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলে। সকল গল্প স্বল্পসময়ে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, শুধু আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজ এ প্রসঙ্গ শেষ করব। শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণনায় কিভাবে ছোটগল্পের বীজ লুকিয়ে আছে এবং সেগুলির মধ্য থেকে কিভাবে আধুনিক ছোটগল্প জন্ম নিচ্ছে তারই সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেব।

বাংলাসাহিত্যের একটি বিখ্যাত গল্প:

গল্পের নায়ক বা লেখক বেড়াতে গেছেন অরণ্যময় পাহাড়ী এলাকায়। সেখানে এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়। লেখক মূলতঃ প্রকৃতিপ্রেমিক—ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি যদিও তাঁর আকর্ষণ নেই, তবু নবপরিচিত ভদ্রলোকের কথায় একদিন এক সাধুদর্শনে

গেলেন। প্রকৃতপক্ষে সাধুদর্শনের নাম করে প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শন করতেই গিয়েছিলেন তিনি; কিন্তু সাধুর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন—বিশেষ করে ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের কবিরূপে সাধুটির ব্যাখ্যা লেখক কিছুতেই ভুলতে পারেন না। সেই সাধুদর্শনের পর দীর্ঘ সাতবছর কেটে গেছে। কলকাতার প্রাত্যহিক জীবন লেখকও অন্য পাঁচজনের মতোই যাপন করছেন—এরই মধ্যে একদিনের বর্ণনা। এবার মূল রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি :

"সেদিন একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম—বড় লোকের বাড়ীর পার্টি। অনেক বড়লোকের আনাগোনা—ক্রাইসলার হাঁকিয়ে, বুইক হাঁকিয়ে, মিনার্ভা হাঁকিয়ে···কিন্তু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন লোকের সম্মেলনে সেদিন যা আশা করে গিয়েছিলুম তা পেলাম কই? শুধুই শুনলুম বৈষয়িক কথাবার্তা—যেমন,

—দেওঘরের বাড়ীটাতে এবার যাওয়া হল না। বড় ছেলের ইচ্ছে, আরো কিছু ফার্নিচার কিনে পাঠিয়ে দিলাম। কেউ গেল না গতবার—এবারও না। এটা আর রাখব না। আমার তো নিজের সময় নেই যাওয়ার। ছেলেরাও যেতে চায় না। বিষণলাল দালাল চল্লিশ হাজার দর দিয়েছিল মার্চ মাসে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে নয় বাড়ী বেচি। অথচ যাওয়াও হয় না। আপনার রিজেন্ট পার্কের জমিটাতে কিছু করলেন?

—হ্যাঁ, প্ল্যান স্যাংশন করতে দেওয়া হয়েছে। আশি হাজারের ওপর এস্টিমেট দিয়েছে বাগচি। ওরাই করবে। পি. ঘোষালের বাড়ীটা তো ওরাই করলো, চমৎকার করেছে।

অথবা

—ইলেক্‌শনের আগে এই সব মজুর শ্রমিকের গোলমাল কেমন মনে করেন?

—ভাল না। সব জায়গায় চলছে। যে সব পার্টি, মনে ভাবুন, এদের সপক্ষে যাবে না, ইলেক্‌শনের সময় তাদের মুশকিলে পড়তে হবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি···

লেখকের এসব কিছুই ভাল লাগছে না। তিনি লিখেছেন—"সেই বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত, সুবেশ, সুশিক্ষিত, ভদ্রজনসমাগমের মধ্যে বসে আমার মনে আসছিল সেই প্রাচীন সাধুর কথা।···বলেছিলেন তিনি···'যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই, বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিন রাজ্য, যে সেখানে যায়, সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। তিনি শাস্ত্রেরও পারে, বাদানুবাদেরও পারে।··· মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে সম্বন্ধে সচেতন নয় সে। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী যা তাকে পলকে মুক্তির জ্যোতির্লোকে নিয়ে তুলতে পারে! বিশ্বাস কর বাবা। মানুষ মুক্ত। সে-ই নিজেকে নিজে বেঁধেছে। সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত! সে মানুষ, সে মুক্ত।"

গল্পটি এইখানেই শেষ হয়েছে। 'কথামৃতে' পুজোর ঘরে চন্দন ঘসতে বসে কিংবা গঙ্গার ঘাটে বসে মেয়েদের বৈষয়িক বা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের গল্প যে ছোটগল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে, এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নিপুণ কথাশিল্পীকে আকর্ষণ করতে পারে—এই গল্পটিই তার প্রমাণ। তবে বিভূতিভূষণ বড়লোকের পার্টিতে আশা করেছেন গভীরতর আলোচনা যেটাকে বাস্তবসম্মত বলা যায় না আর শ্রীরামকৃষ্ণ উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক গল্পের বৈপরীত্য দেখিয়ে প্রকৃত বাস্তববাদীর পরিচয়ই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এটি বিভূতিভূষণের বিখ্যাত ছোট গল্প 'কুশল পাহাড়ী।'

এবার দেখা যাক বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প 'দি লস্ট চাইল্ডে'র সংক্ষিপ্ত কাহিনীর দিকে :

একটি শিশু বাবা-মা'র সঙ্গে মেলা দেখতে

যাচ্ছে। বহুলোকের ভিড়ে সে-ও এগিয়ে চলেছে। অদম্য কৌতূহল নিয়ে। এর মধ্যেই রাস্তায় এক জায়গায় খেলনা বিক্রী হচ্ছে দেখে সে অস্থির হয়ে উঠল—তার একটা খেলনা চাই। বাবার রক্তচক্ষুতে নিরস্ত হয়ে অনিচ্ছুক পদক্ষেপে আবার সে এগিয়ে চলল। সর্ষে ক্ষেতের অফুরন্ত ফুলের মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে মেলার গ্রামের দিকে, ক্রমশঃ পৌঁছল তারা মেলায়—লোকারণ্যের মধ্যে। এক জায়গায় মিষ্টিওয়ালা হাঁকছে "গোলাপ-জাম, রসগোল্লা, বরফি, জিলাপি!" ছেলেটির চোখ চক চক করে উঠল—আঃ বরফি! বিড় বিড় করে বলল—বরফি কিনে দেবে একটা! কিন্তু বাবা-মার কাছে সায় না পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনেই এগোতে লাগল। কত ফুলের মালা—একটা তার চাইই। কিন্তু সে জানে বাবা-মাকে বলে লাভ নেই—তাই মনের ইচ্ছা মনে চেপেই এগিয়ে চলল। এবার রঙ-বেরঙের কত বেলুন—'ইস্, সবগুলো যদি কেনা যায়!' বাঁশি বাজিয়ে সাপ খেলাচ্ছে একজন সাপুড়ে—কি মিষ্টি বাঁশি! ছুটে গেল একবার সেদিকে, তারপরই বাঁশি শোনার ইচ্ছা সংবরণ করে ফিরে এল বাবা-মার কাছে। আঃ, এবার আর সে কিছুতেই নিজেকে চেপে রাখতে পারল না—দলে দলে ছেলেরা নাগরদোলায় কাঠের ঘোড়ায় চেপে ঘুরছে। সে জোরের সঙ্গেই ইচ্ছাটা প্রকাশ করল 'বাবা, আমি চড়ব।' কিন্তু কোন উত্তর নেই—বাবা-মা কোথায়? চারদিকে দেখল—অগণিত মানুষ, তার মা-বাবা তার মধ্যে নেই। ছুটতে ছুটতে ভিড়ের মধ্যে সে ডাকছে—'বাবা! মা!' ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল—চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ভয়ার্ত ছেলেটিকে দেখে একজন এগিয়ে এল—তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। শান্ত করার জন্যে নাগরদোলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল 'চড়বে খোকা?' কিছুক্ষণ আগে যা চড়বার জন্যে ছটফট করছিল সে সেদিকে তাকাল না—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল 'আমার বাবা-মার কাছে যাব।' একে একে সেই সাপুড়ে, সেই বেলুনওয়ালা, সেই ফুলওয়ালা—সকলের কাছেই নিয়ে গেল ভদ্রলোক—কি পেলে সে শান্ত হবে—না, ছেলেটির এখন আর কিছুতেই আকর্ষণ নেই—তার মুখে শুধু একটিই কথা 'I want my mother, I want my father.'।

'কথামৃতে'র সেই গল্পটি মনে পড়ে—ছোট ছেলে খেলনা নিয়ে ভুলে আছে। সব খেলনা তার চাই—ফেলছে, ছড়াচ্ছে—তাই নিয়ে অভিমান করছে, ঝগড়া করছে কিন্তু খেলতে খেলতে মনে পড়ল মায়ের কথা—তখন আর কোথায় খেলনা! হাজার খেলনা দিয়ে তখন আর ভোলানো যাবে না। তখন তার কান্না 'মার কাছে যাব।'

'দি লস্ট চাইল্ড' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্পের মর্যাদা পেয়েছে। লেখক মুল্‌ক্‌-রাজ-আনন্দ কথামৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এটি রচনা করেছেন একথা বলার মতো তথ্য আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, মানবজীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ঘনিষ্ঠ—যে উপাদান থেকে শ্রেষ্ঠ গল্প রচিত হতে পারে।

এবার একটি অতি-আধুনিক ছোটগল্পের অবতারণা করছি, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল গত বছর (১৩৮৯) আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। গল্পটির নাম 'মধ্যিখানে বেপাড়া'—লেখক শেখর বসু। সংক্ষেপে গল্পটি হল :

স্বামী-স্ত্রী নতুন পাড়ায় ভাড়া বাড়িতে এসেছে। ভাড়া নেবার সময় তারা লক্ষ্য করেনি, সেই পাড়ার মধ্যে কয়েকঘর বারবনিতার বাস। তারা সন্ধ্যায় সেজেগুজে দরজায় দাঁড়িয়ে পথ-চারীকে প্রলুব্ধ করে। এই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে বাস করা নায়কের (বিভাস) কাছে ক্রমশঃ মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে উঠল। ঘটনাক্রমে

একদিন একটু বেশি রাতে—বাড়ি ফেরার সময় পুলিশের হাতে লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়েছে, এমন কি পুলিশ ভ্যানে সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে থানা পর্যন্ত যাওয়ার দুর্ভোগও ঘটেছে। সুতরাং নায়কের চেষ্টা, যতশীঘ্র সম্ভব এ পাড়া পরিত্যাগ করে অন্যত্র আবার বাড়ি ভাড়ার সন্ধান।

এর মধ্যে একদিন স্বামী-স্ত্রী (বিভাস ও পারমিতা) বেড়াতে গেছে দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে আকস্মিকভাবে দেখতে পেল, সেই পতিতালয়ের একটি মেয়েকে পূজারিণীর ভক্তিনম্রমূর্তিতে। তার উপস্থিতি সমগ্র পরিবেশকে নিমেষে পালটে দিল। প্রবল বিতৃষ্ণায় বিভাস তখনই পারমিতাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করল। বিতৃষ্ণা শুধু মেয়েটির প্রতি নয়—তার স্ত্রীর প্রতিও, কারণ পারমিতার কণ্ঠে যেন অতিরিক্ত সহানুভূতিমিশ্রিত কৌতূহল ফুটে উঠছে। সে রাত্রে এক অদ্ভুত মানসিকতা নিয়ে বিভাস পারমিতার পাশে শুয়ে বিদ্বেষ ও যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পারমিতার একটি হাত তার গা স্পর্শ করে আছে। এবার শেষটুকু লেখকের জবানীতে শুনি :

"বিভাস বুঝতে পারছিল না, সেই গঙ্গা এবং পঞ্চবটীর স্নিগ্ধতা পারমিতার স্পর্শে এখনো আছে কিনা, তবে ঠাকুরের একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল হঠাৎই। ঠাকুর বলেছেন, 'নিরাকার সাকার সবই মানতে হয়। কালী-ঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলাম রমণী বেশ্যা। বললাম, মা তুই এইরূপেও আছিস? তাই বলছি, সব মানতে হয়। তিনি কখন যে কি রূপে দেখা দেন, সামনে আসেন বলা যায় না।'... পরিষ্কার আকাশের নীচে একটা আধখানা বানানো বাড়ি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির মাথায় বাঁশের ডগায় বাঁধা ঝাঁটা আর ঝুড়ি। ঝাঁটা-ঝুড়ি বাঁধা থাকলে নাকি কুনজর পড়ে না বাড়ির গায়ে। ...ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র এক অনুভূতি হল ওর। এই মুহূর্তে ওর সত্যমিথ্যার বোধ কেমন যেন গুলিয়ে গেল। থানা পুলিশ আর ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে বার বার জড়িয়ে যাচ্ছিল স্নিগ্ধ গঙ্গার তীর আর পঞ্চবটীর স্মৃতি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণা এবং রামকৃষ্ণ পরিবেশকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে এগুলোর পরিণতি। যে সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে ছিল 'কথামৃতে', আধুনিক লেখক তাকেই বিকশিত করেছেন একটি ছোটগল্পে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যেই ছিল আধুনিকতা—যা আধুনিক মনকে স্পর্শ করে একটি নিটোল ছোটগল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পের আঙ্গিক ও প্রকৃতি ছাড়াও যে আধুনিকতাকে আমরা সার্থক ছোটগল্প রচনার অন্যতম শর্ত হিসাবে নিরূপণ করি সে ক্ষেত্রেও শ্রীরামকৃষ্ণ অনতিক্রমণীয়। সংস্কারমুক্ত মন, ধর্মচেতনার উদারতা, মানবজীবনের মূল্য নির্ধারণে তাঁর চেয়ে আধুনিকতর কে?

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ: আধুনিক মননে ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

বেথুন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক বিশিষ্ট গবেষিকা।

১৯৮২-৮৩ তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকাশন-সংস্থা একযোগে কথামৃত গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। অতিশয় আশ্চর্যের ব্যাপার। এই অবিশ্বাসের যুগেও আধুনিক মানুষেরাই হাজারে হাজারে ভিড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে বহু কষ্ট স্বীকার করে গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেছেন। নানারকম আকারের, সুলভ ও উচ্চমূল্যের শোভন সংস্করণের কোনটাই বাদ যায়নি, প্রত্যেকটিরই হাজার হাজার কপি প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। যাঁরা গ্রন্থখানি বহু আয়াসে সংগ্রহ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং আধুনিক কালে ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল সংশয় ও প্রশ্ন আছে, যে সকল নাস্তিক মতবাদ আছে, সে সবেরই সঙ্গে সুপরিচিত,—সে সকল সংশয় ও প্রশ্ন তাঁদের

ও অনেকের। আবার অনেকে আছেন কঠোর যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানসিকতা না থাকলে ধর্মকে আজ ঠিক ঠিক বোঝা কি সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে ধর্মও তো একটি বিজ্ঞান—স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে অন্তর্জগতে সন্ধান ও অনুসন্ধানের নাম ধর্ম ও বহির্জগতে সন্ধান ও অনুসন্ধানের নাম বিজ্ঞান। উভয়ের মধ্যে বাস্তবিকই প্রকৃতিগত বিরোধ কিছু নেই, বরঞ্চ ঐক্য আছে। এ কথার সমর্থন মেলে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী Charles Townes-এর একটি প্রতিবেদনে, যাতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পন্থায় মূলগত কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই আসে revelation বা আলোকোদয়ের পথে। সব সত্যই উদ্ভাসিত হয় মানুষের অন্তরে। একমাত্র যুক্তিবিচার সহায়ে বিজ্ঞানের সত্যে পৌঁছনো হয়, এ তিনি অস্বীকার করেছেন। আজ ধর্ম ও বিজ্ঞান একই চৌরাস্তায় এসে মিলিত হয়েছে বলে Charles Townes-এর দৃঢ় বিশ্বাস। অপর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী Dr. Wald কলকাতায় কিছুকাল পূর্বে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, জড় যে চৈতন্য হতে উদ্ভূত এ কোন অস্পষ্ট মিষ্টিসিজ্‌মের কথা নয়,—এ কথা আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের। আইনস্টাইনও মহাবিশ্বচৈতন্য সত্তার কথা বলেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিকদের ব্যক্ত অভিমতসমূহই এদিক দিয়ে ধর্মের প্রতি জনমানসে নূতন করে কৌতূহল জাগাচ্ছে। সেজন্য কথামৃতের প্রতি জনমানসে নূতন আগ্রহ জাগাই স্বাভাবিক।

কথামৃত সকল ধর্মতত্ত্বের সরল ও সরস সার-সঙ্কলন, তাছাড়া কথামৃতে ধর্ম শুধু তত্ত্বকথা নয়, বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের বস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের ক্ষেত্রে আজ সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। অন্তর্জগতের মহাকাশে সর্বাপেক্ষা কঠিন অভিযানসমূহের এ যুগে তিনিই মহানায়ক, এ জগতের বিপুল রহস্য-সমূহের উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে তাঁর কখনও কোনও ভ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না, একের পর এক অভিযান চালিয়েই গেছেন তিনি যতক্ষণ না রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট একেবারেই তত্ত্বকথামাত্র নয়—প্রত্যক্ষের বস্তু। প্রত্যক্ষ না হলে তার কোনও দাম নেই তাঁর কাছে। সেদিক দিয়ে তিনি কঠোর বাস্তববাদী। সেজন্য বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যাঁদের সঠিক দৃষ্টি আছে—তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞানী হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান। কঠোর যুক্তিবাদীর নিকটও শ্রীরামকৃষ্ণ পরম কৌতূহল উদ্রেক করেন, কারণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে প্রত্যক্ষদর্শীদের এমন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে—যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও যুক্তিবাদী, অনেকে প্রতিভার বরপুত্র ও মনীষী এবং তাঁরা সকলেই কিছু ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী নন।

সাম্প্রতিকতম কালের এই ঘটনা—আধুনিক মানসের শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, তাঁর কথামৃতের প্রতি—এই গভীর আকর্ষণের অভিব্যক্তি—আমাদের সামনে এক মহাসত্যকে নূতন করে উদ্‌ঘাটিত করল, যার প্রতি একদা স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সত্যটি হল: ভারতবর্ষের দুটি রূপ। একটি তার বাহ্য রূপ। যাকে আমরা অহরহ দেখছি—এবং আজ যার চেহারা দেখে আমরা সশঙ্কিত, যে ভারত রুগ্ন, নানা সমস্যা-জর্জরিত, বিভেদ-বৈষম্যে দীর্ণ-প্রায়, যার কথা সংবাদপত্রের সব কটি পাতা জুড়ে। কিন্তু আর একটি ভারত আছে—সেটি

তার অন্তরতম রূপ—যে রূপে সে চির-সত্য পিপাসু, যার শাশ্বত বাণীসমূহ মানবতার উৎস-মূলে প্রাণসঞ্চার করে চলেছে যুগে যুগে, যে বাণীসমূহের জন্য আধুনিক পাশ্চাত্যে—এমন কি সাম্যবাদী রাষ্ট্রেও—জাগ্রত মানুষদের চিত্ত উদ্‌গ্রীব, অধীর। রাজনৈতিক বাহ্য আবরণের অন্তরালে এই যে ভারতের একটি অভ্যন্তরীণ জীবনধারা আজও অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কোন প্রচার নেই, অথচ যা অনুস্যূত হয়ে রয়েছে সমগ্র জনজীবনের মধ্যে, বাইরের শত-সহস্র-পরিবর্তন, ক্ষয়ক্ষতি বা সমস্যাদি যার গতিপ্রবাহে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেনি—কথামৃত সম্বন্ধে জনচিত্তের এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের অভিব্যক্তি তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এটি একটি ঘটনা—সাম্প্রতিকতম ঘটনা। সুতরাং অনস্বীকার্য। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনও বৈজ্ঞানিক 'সম্পন্ন সমাজতাত্ত্বিক—যিনি ভারতের জনজীবনধারা সম্পর্কে সত্য আবিষ্কারে আগ্রহশীল, তিনিই ঘটনাটিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।

অবশ্যই তাঁরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে পারেন এবং হওয়া কর্তব্য—এই প্রশ্নটি নিয়ে—এমন কী আছে কথামৃতে, কোন্ মহাসম্পদ, যার জন্য মানুষের এই গভীর আকুতি? প্রশ্নটি সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজ-জীবনের মূলে এই গ্রন্থটির প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়। হাজার হাজার ব্যক্তির জীবনে যার প্রভাব, তার প্রতিফলন সমাজ-জীবনে পড়বেই—এ স্বতঃসিদ্ধ।

কথামৃতে আছে কোন্ মহাসম্পদ—এ নিয়ে অনুসন্ধান করলে প্রথমেই দেখা যাবে কথামৃতে আছে এক জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের জীবন্ত উপস্থিতি, যিনি আছেন এর মধ্যে অনস্বীকার্য সত্যের মতো স্বয়ম্প্রভ হয়ে। কথামৃতে আরও পাওয়া যায় প্রত্যক্ষকৃত সত্যের সহজ, সরল, সরস ও ভাস্বর প্রকাশ। কথামৃতে ধর্ম কথার কথা নয়, অত্যন্ত বাস্তব, জীবন-সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে যা বলেছেন, নিজে তার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে বিরাজ করেছেন। তিনি যা বলেছেন তা সেজন্যই তর্কাতীতরূপে প্রতীয়মান। ধর্ম তাঁর নিকট জীবন-সত্য, দিনচর্যায় ও আচরণে প্রতিফলিত, সূর্যকিরণের মতো তা তাঁর মধ্য হতে শত-সহস্র-ধারায় বিকিরিত। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণীতে প্রতিভাত সত্যের স্পর্শ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। উপনিষদ্ বলেছেন—'সত্যই সর্বভূতের মধু, সত্যই অমৃত' (বৃহদারণ্যক—২।৫।১২)। বাস্তবে কথামৃতে মানুষ যা পায়, তা এই অমৃত, সেদিক দিয়ে কথামৃত এক অমৃত-ভাণ্ডার। কি পায় মানুষ? পায় সাহস, শক্তি, তেজ, বল, আশা, ভরসা ও আনন্দ—এক কথায় পায় 'অভী' বা ভয়হীনতা। ভয়হীনতাই তো অমৃত। অর্থাৎ কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের সবচেয়ে বড় চাহিদা মেটাচ্ছেন, যা পেলে মানুষ জগজ্জয়ী হয়। আজকের মনোবিজ্ঞানই সাক্ষ্য দেয়—এটি না পেলে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। মনো-বিজ্ঞানীরা তাই আজ উপদেশ দিচ্ছেন 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোর না,' 'দুঃখে বিচলিত হয়ো না,' 'জীবনে পরাজয় হাসিমুখে মেনে নিও।' আর রামকৃষ্ণ বলছেন, 'কাম-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ কর,' 'নিষ্কাম হও,' 'ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে কাজ কর,' 'সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম, তাতে বিচলিত হয়ো না,' 'আনন্দ আছে,' 'আনন্দ কর।' নির্গলিতার্থ এক, বরঞ্চ রামকৃষ্ণ সমস্যার মূলে গিয়ে কথা বলছেন। আর তাঁর আহ্বান চিত্তের আবরণ উন্মোচনের, তিনি চেয়েছেন তার

জাগরণ, উদ্বোধন। চেয়েছেন এমন মানুষ যার উদ্যম আছে এর জন্য, যার দৃঢ়সংকল্প আছে, যার তেজ আছে, যার বিরামহীন প্রচেষ্টা আছে। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ যাকে 'Manliness' বলেছেন বা পৌরুষ তাই রামকৃষ্ণের বাণী। তাঁর ধর্ম তাই যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান, ব্রত-নিয়ম এ সবের নয়, তাঁর ধর্ম—মূলত মনুষ্যত্বের জাগরণের। সুতরাং তাঁর ধর্ম আদপেই কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়—এ হল বিশ্বজনীন মানব ধর্ম।

এ ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিসমূহ আছে, তার পূর্ণ বিকাশই ধর্ম। সুতরাং এ ধর্মের প্রয়োজন বিশ্বের সকল মানুষের। সর্ব দেশে কালেই এর প্রয়োজন—যেমন রামকৃষ্ণের কালে ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কাল যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের এতে প্রয়োজন থাকবে। আর এর মধ্যেই আছে আজকের সমাজের গুরুতর সমস্যাসকলের সমাধান—যাকে সমাজবিজ্ঞানী Ogburn ও Nimkoff 'বিচ্ছিন্নতার' সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন, কিংবা Marx-এর ভাষায় 'আত্মচ্যুতি' (alienation) সে সকলেরই সমাধান আছে রামকৃষ্ণের 'জীবই শিব'—এই বাণীর মধ্যে। যদি মানুষ নিজেকে শিব বলে অনুভব করতে পারে, আর সে দেখে যে অন্যের মধ্যেও সেই শিবই রয়েছেন তাহলে সে মুহূর্তে সবার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়, অন্যের সুখ-দুঃখ তখন তার আপন বোধ হয়। সেই মুহূর্তেই সে তাই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মচ্যুতির অবসান ঘটে; তার স্বরূপস্থিতি ঘটে। সুতরাং সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে রামকৃষ্ণের জীবন, তাঁর বাণীর—তাঁর কথামৃতের মূল্য আজ অপরিসীম।

রামকৃষ্ণের কথামৃত যিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সেই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বা মাস্টার মশায় বা শ্রীম' ছিলেন আমাদেরই মতো আধুনিক মানুষ, আধুনিক কালের সব সংশয়, সব প্রশ্ন নিয়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন মাস্টার মশায় ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে এসকল বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেন। অজ্ঞেয়-বাদ, যুক্তিবাদ, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান—এ সকলই তাঁর নখদর্পণে ছিল। আধুনিক মননের আলোয় দেখেছেন বলে তাঁর দেখা শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা চিনতে পারি। শ্রীম' যদি আধুনিক যুক্তিবাদী না হতেন রামকৃষ্ণকে আমাদের চিনবার উপায় ছিল না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ একে প্রাচীন সমাজ হতে উদ্ভূত, বেশে বাসে দিনচর্যায় আমাদের সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য, তাছাড়া তাঁর জীবনে অনেক অসাধারণ ঘটনার সমাবেশ হয়েছে যা হয়তো প্রত্যক্ষদ্রষ্টার সাক্ষ্য ব্যতীত আমরা মেনে নিতে পারতাম না। মাস্টার মশায় যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, অন্য কিছু নয়। একজন যুক্তিবাদী মানুষ যা প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং যা ঘটনা, তাকে অস্বীকার করতে পারেন না কোনমতেই। প্রত্যক্ষ দেখা—সেজন্যই ঘটনাগুলি উড়িয়ে দিতে পারেননি পরবর্তী কালের Romain Rolland, Maxmuller, Aldous Huxley, Toynbee, Christopher Isherwood প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিবর্গও যাঁদের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা বলেই কথামৃতের 'অপরিসীম মূল্য' আজ আমাদের কাছে।

শ্রীম' তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অনন্য রচনাশৈলী সহায়ে রামকৃষ্ণের অসাধারণ জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের অতি অন্তরঙ্গ চিত্রসমূহ তুলে ধরেছেন

আমাদের সামনে। চিত্রগুলি অত্যন্ত সজীব, চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত, কথামৃতে এই জীবন্ত মানুষটি অসাধারণ হয়েও একেবারে কাছের মানুষ। মাস্টার মশায় তাঁকে সেইভাবেই পেয়েছেন। মানুষটি একান্ত সহানুভূতিশীল, স্নেহার্দ্র-হৃদয়, একান্ত আপনজন, নিত্যসঙ্গী সুহৃদ্, মানুষের জন্য যাঁর ভালবাসার অন্ত নেই, বেদনারও অন্ত নেই, যিনি সকলকে অবিরাম সাহস দেন, আশা ভরসা ও আনন্দের কথা বলেন। কথামৃতে তাঁকে দেখা যায় দিনে রাতে সর্বাবস্থায়, দেখা যায় তাঁর দিন-চর্যার প্রতিটি খুঁটিনাটি—তাঁর বেশ-বাস, আহার বিহার, চলা ফেরা, কথা বলা, আলাপ-ব্যবহার—সবকিছু। সব কিছু মিলিয়ে—তাঁর অসাধারণত্ব আর তাঁর এই অতি নিকটত্ব—তিনি আশ্চর্য একটি মানুষ। কথামৃতে তিনি অত্যন্ত সক্রিয়, চলছেন, ফিরছেন, কথা বলছেন, আনন্দ করছেন। তাঁর অবারিত দ্বার, দিনে রাতে বিরাম নেই, অহর্নিশ মানুষ আসছে—আসছে প্রাণের তাগিদে, বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করতে, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেতে, যা তিনি অপরিমেয় হস্তে সবাইকে দিতে পারতেন। আবার কখনও তিনি ফিরছেন মহানগরীর দ্বারে দ্বারে, কখনও আর্তের বন্ধুরূপে, মানুষের বন্ধুরূপে, কখনও বা নবযুগের চালকদের দ্বারে গিয়ে করাঘাত করছেন, সকলকে ডেকে বলছেন 'জাগো', 'চেতন হও', 'এগিয়ে যাও', 'ডুব দাও'।

কথামৃত পাঠ শুরু করে পাঠক কখন যে এক-সময় এই চলমান মানুষদের সঙ্গে মিলে মিশে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে উপনীত হন তা তিনি জানতেও পারেন না, সবার মধ্যে তাঁর সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ অতি অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেন। আর সেই কাল,—যে কাল একজাতির নবজাগরণের প্রাণস্পন্দনে ভরা, সেই কালকেও, সেই প্রাণস্পন্দনকেও অনুভব করতে পারেন পাঠক। আর দেখতে পান সেই স্বর্ণযুগের নায়কদের যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসেছেন—সর্বোপরি দেখা যায় তাঁদের চোখ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে, আর শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ দিয়ে তাঁদের—এ দুটো দেখাই দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কথামৃত পাঠে আমরা এই দুর্লভ অভিজ্ঞতাই লাভ করে থাকি।

কথামৃতের আকর্ষণ দুর্বার হয়ে দেখা দেয় আরও এই কারণে যে কথামৃত হল সর্বোচ্চ ধর্মজীবনের জীবন্ত আলেখ্য—ধ্যান, জ্ঞান, সমাধি সব কিছুই এর মধ্যে চোখে দেখা, অত্যন্ত বাস্তব, একেবারে প্রত্যক্ষ। দেখা যায় তিনি অনুক্ষণ ঈশ্বরে মগ্ন, 'ব্রহ্মানন্দে ভরপুর', মুহুর্মুহুঃ তাঁর সমাধিমন্দিরে প্রবেশ ঘটছে। আবার কখনও তাঁর 'ভাবমুখে' অবস্থান, কখনও 'অর্ধবাহ্যদশা', কখনও বা বাহ্যদশায় কীর্তনানন্দে বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে মাতোয়ারা। প্রতিটি অবস্থারই খুঁটিনাটি বিবরণে কথামৃত সমৃদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সমাধিচিত্রের বিবরণ এখানে দেখা যেতে পারে:

—"ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা নড়িতেছে না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে···দেহ রোমাঞ্চিত। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে···না জানি 'কোটি শশী বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময় রূপ-দর্শন? আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য। শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ। স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন। আর যেন সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন।"

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্পন্ন শ্রীম' যেমনটি দেখেছেন ঠিক তেমনটি বর্ণনা করেছেন—খুঁটি-নাটি বিবরণ হতে তা স্বতঃই স্পষ্ট। সর্বোচ্চ ধর্ম-জীবনের এমন প্রদীপ্ত চিত্র, এরকম জীবন্ত আলেখ্য আর কোথায় আছে? আর সব কটি বিবরণের মধ্য দিয়েই রামকৃষ্ণের ভা স্বর ব্যক্তিত্ব

সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। রামকৃষ্ণ সম্পর্কে 'ভাস্বর' বা 'জ্যোতির্ময়' বা 'দেদীপ্যমান'—এ কথাগুলি আমাদের আরোপিত নয় বা কল্পিত নয়। যাঁরা তাঁকে চোখে দেখেছেন এ বিশেষণগুলি তাঁদেরই। যেমন ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পর তাঁর প্রতিবেদনে ঐ বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন মহাবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে। তাঁর প্রতিবেদন—"আমার মন এখনও সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে যা সেই আশ্চর্য মানুষটি যেখানে যান সেখানেই বিকিরিত হতে থাকে।" বিস্ময়াভিভূত প্রতাপচন্দ্র নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন—"আমার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য কতটুকু? আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছি···আমি শিক্ষিত যুক্তিবাদী, আর তিনি একজন নিরক্ষর, দরিদ্র মূর্তিপূজক।···আমি ডিজরেলী, ম্যাকসমূলার প্রভৃতির বক্তৃতা শুনেছি, আমি কেন তাঁর দ্বারা মোহিত হচ্ছি?" বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি প্রতাপচন্দ্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। পরিশেষে বলেছেন—"যতদিন তিনি আমাদের মধ্যে থাকবেন, ততদিন তাঁর পদতলে বসে পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর-প্রেমের কথা সানন্দে ঘোষণা করব।" মাস্টারমশায়ও একটি বর্ণনায় বলছেন—"তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে!"

প্রতাপচন্দ্র বা শ্রীম'র মতো আধুনিক যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে দেখার আর একটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে প্রাচীন সমাজ হতে উদ্ভূত হলেও দেশকে বা সমাজকে জরাজীর্ণ পুরাতনের দিকে বা পশ্চাতের দিকে ঠেলে দিতে আসেননি,—এসেছিলেন প্রাচীনের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে নূতনকে তার দ্বারা সমৃদ্ধতর করতে, তাকে সম্মুখের দিকে আরও অগ্রসর করে দিতে।

মাস্টার মশায় নব্যতন্ত্রী, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের একান্ত ভক্ত, কিন্তু যা প্রত্যক্ষ, অনস্বীকার্য তাকে অস্বীকার করেননি, সেজন্য তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। তা শুধু নয়, চিত্রগুলি বহু বর্ণময়, যেন এক দিব্য সুষমামণ্ডিত। এই দিব্য সুষমার উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে, মাস্টার মশায় তাঁর অনন্য রচনাশৈলী সহায়ে তা আমাদের সামনে মূর্ত করে তুলেছেন। এমনি একটি চিত্র:

"কালীবাড়ি আনন্দ নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা ভোগরাগাদি অতিথিসেবা। একদিকে ভাগিরথীর পবিত্র-দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানা-বর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আছেন।"

আনন্দময়ীর নিত্য-উৎসব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য 'শোভাময়ী' বা 'শ্রীনিকেতন' বিশেষণই চলত, কিন্তু সেখানে একজন আনন্দময় পুরুষের অবস্থান, যিনি ওখানকার আনন্দযজ্ঞের মুখ্য হোতা। সেজন্য 'আনন্দ-নিকেতন' বিশেষণটির ব্যবহার। এখানে 'চেতন মানুষ' কথাটিও গভীর অর্থবহ। কথা দুটির দ্বারা ব্যক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আর যেসব মানুষদের অহরহ চারপাশে দেখা যায় তাদের পার্থক্য কোথায়? এমন কি যেসব মনীষী ও প্রতিভার বরপুত্রদের কথামৃতে দেখা যায়—তাদেরও পার্থক্য কোন্‌খানে? এঁদের প্রতিভা আছে, মনীষা আছে, কিন্তু এঁরা কেউই যে অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ 'চেতন মানুষ,' সে অর্থে চেতন মানুষ নন। রামকৃষ্ণ চেতন ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে, মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং নিজের স্বরূপ সম্বন্ধেও। এই 'চেতন মানুষ' কথার দ্বারা রামকৃষ্ণ চরিত্রের উপর এক ঝলক আলো ফেলা হয়েছে।

রামকৃষ্ণের এই অনন্যতা উদ্‌ঘাটিত করে মাস্টার মশায় আর এক জায়গায় বলছেন—"মহা-

যোগী অনন্তসাগর তীরে একাকী বিচরণ করছেন।" এখানে 'অনন্ত সাগর তীর' কথাটি সব কিছুকে ব্যক্ত করছে। আত্মার মহাকাশ অভিযানে নিঃসঙ্গ যাত্রী রামকৃষ্ণ যেখানে পৌঁছেছেন—সেই অনন্ত-সাগর তীরে আর কেউ পৌঁছেছেন বলে চোখে পড়েনি মাস্টার মশায়ের। এ অনুভূতি শুধু মাষ্টার মশায়েরই নয়, সকল প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার। ভগিনী নিবেদিতার রামকৃষ্ণকে দেখা বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে, তাঁর প্রতিবেদনের সেজন্য অসামান্য গুরুত্ব। তিনি এ বিষয়ে প্রভূত আলোকসম্পাত করে বলেছেন—"বড় বড় পণ্ডিত ও প্রবল ব্যক্তিগণ এখানে এসে গৌরবান্বিত বোধ করতেন—প্রভুর কাছে তাঁদের মনে হত যেন শিশু।" নিবেদিতা আরও উদ্ঘাটিত করেছেন—"তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেরা অনুভব করত এমন সব শক্তির, যার কুলকিনারা তারা করতে পারত না; এমন জ্ঞানরাশি তাঁর মধ্যে সমুদ্ভূত হত, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তাদের।" কথামৃতে আমরা দেখি—শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাঁরা সমবেত, তাঁদের মধ্যে আছেন জগদ্বিখ্যাত বাগ্মী কেশব সেন, ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য নেতৃবর্গ—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নবজাগরণের পুরোধা মনীষিবর্গ যাঁরা তখনকার উজ্জ্বল মানসলোককে গড়েছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল, আরও আছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিগণ—নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কবি অধর সেন, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ সরকার, সিন্ধুপ্রদেশের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সাংবাদিক হীরানন্দ প্রমুখ। এমন কি তাঁর কথা জানতেন অধ্যাপক হেস্টিসাহেবও, যাঁর মুখে তাঁর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ প্রথম রামকৃষ্ণের নাম শুনেছিলেন। এঁরা অনেকেই শুদ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রামকৃষ্ণের মধ্যে সমুদ্ভূত অপার জ্ঞানরাশি এবং অনেকেই নিজের কাজের ক্ষতি স্বীকার করেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে এঁদের মুগ্ধতার একটি সুন্দর চিত্র মাস্টার মশায় আমাদের উপহার দিয়েছেন। এটি কেশব প্রভৃতির সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে জাহাজের মধ্যের।

"শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছেন তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কিনা জানিতেও পারিলেন না।··· তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন—সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমাস্রুরঞ্জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী···(যিনি) ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।"

এই মুগ্ধ আকর্ষণের বিষয়ে নিবেদিতা আলোকসম্পাত করে বলেছেন—"তিনি যেন এক মহান সঙ্গীত, তাঁর সান্নিধ্য থেকে যার স্পর্শ বহন করে এনেছে ঐ সঙ্গীত, তার আভাস যেন পেত সমাগত মানুষেরা। তারপর যখন আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তারা ফিরে যেত, তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও বলীয়ান হয়ে উঠত।" মাস্টার মশায়েরও দুটি মন্তব্য প্রভূত আলোকপ্রদ: প্রথমটি—"সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি শান্ত ও আনন্দময়?" দ্বিতীয়টি: "···ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিচিত্রবর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন, কুড়াইতেছেন—কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হইয়াছে, এত ভার বোধ হচ্ছে যে উঠা যায় না।" এই মৃত্যুময় পার্থিব জীবনে যেখানে শেষ প্রাপ্তি কেবল ঘোর নৈরাশ্য, সেখানে এঁদের মিলত এই 'আনন্দ সম্পদ' যা মহা দুর্লভ। এবং আজও তার স্পর্শ লাভ হয় কথামৃত পাঠ করলে। তাই কথামৃতের আকর্ষণ গভীর, আকর্ষণ আজও। [ক্রমশঃ]

'ওঁ নমঃ শিবায়'

(শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী-মন্ত্ররাজ-ভাষ্যানুবাদ)

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

প্রাক্ কথন

'ওঁ নমঃ শিবায়': এই শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী মহামন্ত্ররাজ ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধাসহকারে জপ ও তাহার পারায়ণ করিয়া থাকেন। শিবাবতার ভগবৎপাদ আচার্য শংকরের প্রমুখ শিষ্য আচার্য পদ্মপাদ এই মন্ত্ররাজের ত্রয়োবিংশ শ্লোকাত্মক একটি অতীব মনোরম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্যে এই মন্ত্ররাজের নয় প্রকার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতিটি ব্যাখ্যাতে তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য প্রকটিত। ভক্তগণ উহার মনোহারিতা অনুভব করিয়া পুলকিত হইবেন, সহজ বোধগম্য ভাষায় বর্ণিত শিবস্বরূপের মহিমাচিন্তনে অনুপ্রাণিত হইবেন ও অন্তে শিবতত্ত্ব স্বাভিন্নরূপে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিয়া ধন্য হইবেন।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম। সুতরাং ইহা কর্মী, উপাসক ও জ্ঞানী সকলেরই উপাদেয়। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই জগৎকারণ, সুতরাং অন্য মত মতান্তরের এখানে অবকাশ নাই। সম্পূর্ণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনের অধ্যায়-পাদ-অধিকরণসমূহের তাৎপর্যও ইহাতে সংক্ষিপ্তাকারে প্রদর্শিত হওয়ায় এই ভাষ্য সুধীগণেরও আদরণীয় হইয়াছে।

সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করিয়া পরম কৃপাবতার ভগবান শ্রীশংকরাচার্য ও তাঁহার পদানুগ শিষ্য পরম্পরায় কৃতবিদ্য মহাত্মাগণ বহু-প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহা স্বল্পকায় এবং উহাতে সংক্ষেপে পরমার্থের সাধন ও তৎ-সাধ্যবিষয়াদি বর্ণিত, যাহা সকলেই অনায়াসে পাঠ ও আয়ত্ত করিয়া সাধননিষ্ঠা সহায়ে অচিরে দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞানলাভে ধন্য হইতে পারেন।

উপনিষদ্ তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, 'ত্যাগই' পরমপদ প্রাপ্তির একমাত্র মুখ্য সাধন—'ন কর্মণা···ন প্রজয়া···ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য সমূহই এই বিষয়ে প্রমাণ। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতেই ত্যাগের মহিমা বর্ণিত। আলোচ্য গ্রন্থেরও প্রারম্ভ হইয়াছে 'ত্যাগ' শব্দ লইয়া। গ্রন্থের যাহা অপরাপর বৈশিষ্ট্য, উহা পাঠকালেই পাঠকের হৃদয়ে স্ফুরিত হইবে। ভাষ্যকার আচার্য পদ্মপাদের ব্যাখ্যান কৌশল বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

মাননীয় পণ্ডিত হরনাম দত্ত শাস্ত্রী রচিত উহার 'সুবোধিনী' নামক সুন্দর টীকা অবলম্বনে এই মন্ত্ররাজ ও তাহার ভাষ্যের বঙ্গ ভাষায় রূপান্তর প্রদানে চেষ্টা করা যাইতেছে।

নববিধ ব্যাখ্যার শ্লোক সূচী :

প্রথম ব্যাখ্যা শ্লোক ১; দ্বিতীয় ব্যাখ্যা শ্লোক ২-৩; তৃতীয় ব্যাখ্যা শ্লোক ৪-৫; চতুর্থ ব্যাখ্যা শ্লোক ৬-১২; পঞ্চম ব্যাখ্যা শ্লোক ১৩; ষষ্ঠ ব্যাখ্যা শ্লোক ১৪-১৬; সপ্তম ব্যাখ্যা শ্লোক ১৭-১৮; অষ্টম ব্যাখ্যা শ্লোক ১৯ এবং নবম ব্যাখ্যা শ্লোক ২০-২৩।

শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী ভাষ্য

শ্রীগণেশায় নমঃ

'ওঁ নমঃ শিবায়' ইতি মন্ত্রঃ।

তস্য প্রথমং ব্যাখ্যানম্।

আচার্য পদ্মপাদ **'ওঁ নমঃ শিবায়'** এই মন্ত্ররাজের প্রথম ব্যাখ্যান করিতেছেন :

শ্লোক ১

ত্যাগো হি নমসো বাচ্যঃ আনন্দঃ প্রকৃতেস্তথা।
ফলং প্রত্যয় বাচ্যং স্যাৎ ত্যাজ্যং পত্রফলাদিকম্ ॥১
ত্যজামীদমিদং সর্বং চতুর্ণামিহ সিদ্ধয়ে।

অন্বয় : নমসঃ (নমঃ শব্দের) বাচ্যঃ (বাচ্যার্থ) ত্যাগঃ (ত্যাগ) হি (নিশ্চয়) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতি শিব শব্দের—বিভক্তিহীন শব্দ বা ধাতুকে ব্যাকরণে প্রকৃতি বলে) (বাচ্য অর্থ) আনন্দঃ (আনন্দ) তথা (এবং) প্রত্যয় বাচ্যম্ (প্রত্যয় অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তির সূচক 'আয়'র বাচ্যার্থ) ফলম্ (ফল) স্যাৎ (হইয়া থাকে)। ত্যাজ্যম্ (ত্যাগযোগ্য বস্তু) পত্রফলাদিকম্ (পত্র ফল আদি)। ইহ (এই লোকে) চতুর্ণাম্ (ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) ইদম্ (এই) ইদম্ (দৃশ্য পদার্থ) সর্বম্ (সকল) ত্যজামি (আমি ত্যাগ করিতেছি)।

অনুবাদ : নমঃ শব্দের বাচ্যার্থ ত্যাগ[১], প্রকৃতি অর্থাৎ শিব শব্দের বাচ্যার্থ, আনন্দ এবং প্রত্যয় অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তির 'আয়' অর্থফল। ইহলোকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ফল-সিদ্ধির জন্য পত্র পুষ্প ফলাদি এবং যাবতীয় দৃশ্য বস্তু আমি[২] ঐ উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করিতেছি ॥১

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী ভাষ্য

শ্লোক ২।৩ ওঁ নমঃ শিবায়

অথবা নমসো বাচ্যঃ প্রণামো দৈন্য-লব্ধয়ে ॥২
দৈন্যং সেবা তথা জ্ঞপ্তিঃ সিদ্ধিঃ সর্বস্য বস্তুনঃ।
নমামি দেবদেবেশং সকামোঽকাম এব বা ॥৩

অন্বয় : অথবা (অথবা) নমসঃ (নমঃ শব্দের) বাচ্যঃ (বাচ্য অর্থ) প্রণামঃ (প্রণাম) দৈন্য লব্ধয়ে (দৈন্য লাভের জন্য)। দৈন্যম্ (দীনতা) সেবা (সেবা) তথা (এবং) জ্ঞপ্তিঃ (জ্ঞান) সর্বস্য (এই সকল) বস্তুনঃ (বস্তুর) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি)। সকামঃ (কামনা সহিত) বা (অথবা) অকামঃ (কামনা রহিত) এব (হইয়াই) দেবদেবেশং (দেবগণেরও দেব সেই ঈশ, শিবকে) নমামি (প্রণাম করিতেছি ॥২।৩

অনুবাদ : অথবা দীনতালাভার্থ নমঃ[৩] শব্দের অর্থ প্রণামও হইতে পারে। দীনতা অর্থ সেবা, জ্ঞানাদি সর্ববস্তুর সিদ্ধি বা প্রাপ্তি। সকাম বা[৪] নিষ্কাম (যে ভাবেই হউক) আমি দেবদেব মহেশ্বর শিবকে[৫] প্রণাম করিতেছি ॥২।৩

তৃতীয় ব্যাখ্যা

শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী ভাষ্য

শ্লোক ৪ ওঁ নমঃ শিবায়

নঞা নিষিধ্যতে ভাববিকৃতির্জগদাত্মনঃ।
মসনং দেবদেবেশ নেহ নানাস্তি শব্দতঃ ॥৪

অন্বয় : দেবদেবেশ (হে দেবদেবেশ) নঞা ('ন'-কারের দ্বারা) জগদাত্মনঃ (জগদাত্মার) মসনম্ (পরিণাম) ভাব-বিকৃতিঃ (অর্থাৎ ষট্ ভাববিকার—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ) নিষিধ্যতে (নিষেধ করা হইয়া থাকে)। ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা (ভেদ বা বহুত্ব) ন অস্তি (নাই) শব্দতঃ (এই শ্রুতি বাক্য প্রমাণ বলে ইহা অবগত হইয়া যায়) ॥৪

শ্লোক ৫ ওঁ নমঃ শিবায়

অয়েতি গময়েত্যর্থে তস্মাচ্ছুদ্ধোঽস্মি নিত্যশঃ।
প্রণামো দেহগেহাদেরভিমানস্য নাশনম্ ॥৫

অন্বয় : অয় ('অয়') ইতি (ইহা) গময়

১। 'নমঃ' শব্দের বাচ্যার্থ 'ত্যাগ', ইহা কর্মকাণ্ডে প্রসিদ্ধ আছে। যথা 'এতদ্ বোঽন্নং সোপকরণং নমঃ'—ইত্যাদি স্থলে ত্যাগ অর্থেই 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

২। অনাদিকালপ্রবৃত্ত সত্যরূপে গৃহীত দেহাদি সর্ব পদার্থ মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেছি। তাৎপর্য এই যে অজ্ঞানাবস্থায় সকাম কর্ম, উপাসনা ও ভোগসময়ে বিষয়সুখের অনিত্যতা জানিয়া উহা হইতে বিরত হইয়া নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্য ও প্রায়শ্চিত্ত কর্মপ্রভাবে বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন আমি মোক্ষলাভের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করিতেছি।

সকাম ভক্ত ইহপরলোকের সুখভোগার্থ ভগবানকে পত্র পুষ্প ফলাদি উপহার দিয়া থাকেন। কিন্তু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন নিষ্কাম ভক্ত মোক্ষ লাভার্থ মিথ্যা জ্ঞানে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া থাকেন।

৩। 'নম্' ধাতু সহ 'অসুন্' প্রত্যয়যোগে—(নমনন্ ইতি) নমঃ পদ নিষ্পন্ন হয়। উহা নম্র হওয়া বা নমস্কার অর্থে প্রসিদ্ধ। উহার ফল দৈন্যপ্রাপ্তি।

৪। সকাম ভক্ত ভগবানের প্রতি পরা (উৎকৃষ্টা) ভক্তি ও জ্ঞানলাভ করিবার কামনা করিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্বভোগলাভের কামনাও তাঁহার থাকে, কারণ সর্বভোগকামনা এককালে ত্যাগ তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। নিষ্কাম ভক্ত আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানলাভে নির্বাণ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য দেবদেবেশকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ঈশ্বর ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রদান করেন।

৫। ঈশ্বরকে প্রণামের ফল বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ :

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একবার প্রণাম করিলে উহা দশ অশ্বমেধযজ্ঞান্ত অবভৃথস্নান তুল্য হইয়া থাকে।'— 'একোঽপি কৃষ্ণস্যকৃতঃ প্রণামঃ, দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধে পুনরস্তি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥'

(প্রাপ্ত করাও) ইতি (এই) অর্থে (অর্থে, বলা হইয়াছে)। দেহগেহাদেঃ (দেহ গৃহাদির প্রতি অহংতা ও মমতা রূপ) অভিমানস্য (অভিমানের) নাশনম্ (নিবৃত্তিকারী) প্রণামঃ (অস্তি) (হইতেছে প্রণাম)। তস্মাৎ (অতএব) নিত্যশঃ (নিত্যই) শুদ্ধঃ অস্মি (আমি শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপ) ॥৫

অনুবাদ : হে দেব দেবেশ! নঞ্ অর্থাৎ 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই শ্রুতির 'ন'-কারের দ্বারা জগদাত্মার মসন অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভাববিকৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ 'এই ব্রহ্মে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ বা বহুত্ব নাই'—এই শ্রুতিবলে ঐ কথাই প্রমাণিত হয় বা অবগত হওয়া যায়।

'অয়' অর্থ প্রাপ্ত করাও। প্রণাম অর্থ দেহ, গৃহাদির প্রতি অহংতা ও মমতারূপ অভিমানের[৭] নিবৃত্তি। অতএব আমি নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপ ৪।৫

চতুর্থ ব্যাখ্যা

শ্লোক ৬　　ওঁ নমঃ শিবায়।

শিব ব্রহ্মাদিরূপঃ স্যাচ্ছক্তিভিস্তিসৃভিঃ সহ।
অথবা তুর্যমেব স্যান্নির্গুণং ব্রহ্ম তৎপরম্ ॥৬

অন্বয় : শিবঃ (শিব পরমাত্মা) তিসৃভিঃ (তিন) শক্তিভিঃ (শক্তি) সহ (সহিত মিলিত হইয়া) ব্রহ্মাদি-রূপ (ব্রহ্মা আদি রূপ) স্যাৎ (হইয়া থাকেন)। অথবা (অথবা) তৎ (শিব) নির্গুণম্ (নির্গুণ) পরম্ (পর, শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) তুর্যম্ এব (তুরীয়ই) স্যাৎ (হন) ॥৬

অনুবাদ : পরমাত্মা শিব[৮] শক্তিত্রয়সহ মিলিত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রাদি রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। পুনঃ তিনিই আবার সর্বশ্রেষ্ঠ তুরীয় ব্রহ্মরূপে সদা বিদ্যমান ॥৬

শ্লোক ৭　　ওঁ নমঃ শিবায়।

নমসো নমনে শক্তির্নমনং ধ্যানমেব চ।
ঙেহন্তাত্তাদাত্ম্য-সম্বন্ধঃ কথ্যতে প্রত্যগাত্মনোঃ ॥৭

অন্বয় :—নমসঃ (নমঃ শব্দের) নমনে (নমনে) শক্তিঃ (শক্তি) (বিদ্যমান)। নমনম্ (নমন) ধ্যানম্ এব চ (ধ্যানই হইয়া থাকে)। ঙেহন্তাৎ (চতুর্থী অন্ত হইতে) প্রত্যগাত্মনোঃ (জীবাত্মা ও পরমাত্মার) তাদাত্ম্য (ঐক্য রূপ) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ) কথ্যতে (কথিত হয়) ॥৭

অনুবাদ : 'নমঃ' শব্দের শক্তিগত অর্থ নমন বা নম্র হওয়া। প্রকৃত নমন ধ্যানই হইয়া থাকে। 'শিবায়' শব্দের চতুর্থী বিভক্তি প্রত্যগাত্মাসহ শিবের তাদাত্ম্য[৯] সম্বন্ধ বোধক ॥৭

শ্লোক ৮　　ওঁ নমঃ শিবায়।

অহং শিবঃ শিবোহহং চ মন্যে বেদান্তনিষ্ঠয়া।
ইত্যেবং নম ইত্যুক্তং বেদৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ সর্বশঃ ॥৮

অন্বয় : বেদান্তনিষ্ঠয়া (বেদান্ত নিষ্ঠা দ্বারা) অহং শিবঃ (আমিই শিব) শিব অহং চ (শিবই আমি) মন্যে (এইরূপ জানি) ইতি এবম্ (এইরূপ) সর্বশঃ (সর্ব প্রকারে) বেদৈঃ (বেদসমূহ দ্বারা) শাস্ত্রৈঃ চ (এবং শাস্ত্রসমূহ দ্বারা) নমঃ ইতি (নমঃ এই শব্দের তাৎপর্য) উক্তম্ (বলা হইয়াছে) ॥৮

অনুবাদ : বেদান্তনিষ্ঠা সহায়ে 'আমিই শিব', 'শিবই আমি'—এইরূপ আমি জানিয়াছি। সর্ব প্রকারে বেদ ও শাস্ত্র সমূহ দ্বারা 'নম'[১০] শব্দের এইরূপ অর্থই বর্ণিত হইয়াছে ॥৮　　[ক্রমশঃ]

৬। কোন বিকার না থাকাতে—ন মসনং—তুমি 'নমঃ; অতএব হে নমঃ! হে নির্বিকার পরমেশ্বর! দেহ গৃহাদির প্রতি অহংতা ও মমতারূপ অভিমান আমি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছি। পূর্ণাত্মা তোমার সহিত আমি বস্তুতঃ অভিন্ন। তুমিই আমার আপন স্বরূপ। কিন্তু অজ্ঞানাবরণে উহা এখন আমার সমক্ষে সম্যক্ প্রতিভাত হইতেছে না।

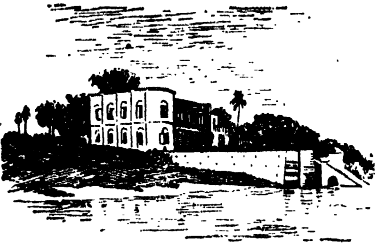
হে প্রভু, হে নমঃ (হে নির্বিকার পরমেশ্বর)! স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়া তুমি আমাকে সেই পরিপূর্ণ আনন্দৈকরস আত্মাই করিয়া লও। 'মসী' ধাতুর অর্থ, পরিণাম হওয়া। ন মস্যতি—যাহার পরিণাম হয় না। ঐ ধাতুসহ 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যোগে 'নমঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সম্বোধনে তাহার রূপ হে নমঃ!

৭। আত্মসমর্পণাত্মক ক্রিয়ার নামই প্রণাম। দেহ ও গৃহাদির প্রতি অহংতা ও মমতারূপ অভিমানের নিবৃত্তি ব্যতীত তাহা হইতে পারে না।

৮। শিব শব্দের বাচ্যার্থ সগুণ ব্রহ্ম এবং লক্ষ্যার্থ নির্গুণ ব্রহ্ম।

৯। শিব সহ তাদাত্ম্যলাভ উদ্দেশ্যেই আমি নমন বা ধ্যান করিতেছি। স্ব স্বরূপে দৃঢ়া স্থিতিলাভই আমার একমাত্র কাম্য ॥

১০। নমঃ শব্দের অর্থ নমন অর্থাৎ ইষ্ট সহ অভেদ জ্ঞানে নিদিধ্যাসন।



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম

পুরাকালে মাণ্ডব্য নামে তপোনিষ্ঠ, ত্যাগী, ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল ও সত্যবাদী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিদিন তিনি কুটিরের সামনে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, মৌনব্রত অবলম্বন করে কঠোর তপস্যা করতেন। একদিন কয়েকজন ডাকাত প্রহরীর তাড়া খেয়ে তাঁর কুটিরের সামনে চোরাই মাল রেখে দিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল।

এদিকে প্রহরীরা ডাকাতদের খোঁজ করতে করতে মাণ্ডব্যের কুটিরের সামনে এসে পড়ল। তারা ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্যকে তপস্যারত দেখে জিজ্ঞাসা করল: 'ওহে তপস্বী ব্রাহ্মণ! ডাকাতরা কোন্ দিকে গেল বলতে পার?' মৌন থাকায় তিনি কোন উত্তর দিলেন না। প্রহরীরা কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেও যখন তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর পেল না, তখন তারা কুটিরের চারপাশের জঙ্গলে ডাকাতদের খোঁজ করতে লাগল। ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্যের কুটিরের সামনে চোরাই মাল পড়ে থাকতে দেখে তারা ভাবল—নিশ্চয়ই তপস্বীর সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগ আছে। এবং ডাকাতরাও কাছাকাছি কোন জঙ্গলে লুকিয়ে আছে।—এই ভেবে তারা কুটিরের পাশের জঙ্গলে খুঁজতে খুঁজতে ডাকাতদের পেয়ে গেল। এতে প্রহরীদের সন্দেহটা আরও বেশি হল যে, ডাকাতদের সঙ্গে তপস্বীর যোগসাজশ আছে। তারা ডাকাতদের সঙ্গে তপস্যারত ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্যকেও বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

মাণ্ডব্য মৌনব্রত অবলম্বন করায় কোন কথা বললেন না। এবং প্রহরীরা যে তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, তাতেও তিনি কোন বাধা দিলেন না।

প্রহরীরা রাজার কাছে এসে সব ঘটনা বলল। রাজা সব শুনে ব্রাহ্মণকে ভণ্ড তপস্বী ভেবে ডাকাতদের সঙ্গে তাঁকেও শূলে চাপিয়ে দিতে বললেন। রাজার আজ্ঞায় প্রহরীরা ডাকাতদের সঙ্গে মাণ্ডব্যকে শূলে চাপিয়ে দিয়ে চোরাই ধনরত্ন নিয়ে রাজার কাছে চলে গেল।

শূলের উপরে দীর্ঘদিন ধরে অনাহারে থেকেও মাণ্ডব্যের মৃত্যু হল না। তিনি শূল-বেদনা নীরবে সহ্য করতে লাগলেন। তাঁর কষ্ট দেখে অন্যান্য তপস্বীরা খুব দুঃখিত হলেন। তাঁরা রাত্রে পাখির রূপ ধরে মাণ্ডব্যের কাছে এসে তাঁর ব্যথায় ব্যথী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে তপোধন, আপনি এমন কি অপরাধ করেছেন যার জন্য এই দুঃসহ কষ্ট ভোগ করছেন?' তখন ধৈর্য-ক্ষমাশীল মাণ্ডব্য বললেন: 'আমি কাকে দোষ দেব? আমার কাছে কেউ কোন অপরাধ করেনি।'

দীর্ঘকাল পরেও যখন মাণ্ডব্যের মৃত্যু হল না তখন প্রহরীরা রাজার কাছে খবর পাঠাল। শুনে রাজা চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন —নিশ্চয়ই নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে শূলে

দেওয়া হয়েছে, তপস্যার প্রভাবে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে না। অভিশাপের ভয়ে রাজা সন্ত্রস্ত হয়ে মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন—কিভাবে ঐ শূলস্থ ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করা যায়।

মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা মাণ্ডব্যের কাছে গিয়ে করজোড়ে বললেন: 'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যে ভুল করেছি তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না।' ক্ষমা-প্রার্থনায় যন্ত্রণাকাতর মাণ্ডব্য রাজার উপর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি রাজাকে কোন কটুকথা বা অভিশাপ দিলেন না। রাজা শূলের অগ্রভাগ থেকে তাঁকে নামিয়ে সেই শূলকে তাঁর শরীর থেকে বের করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শূলের মূলভাগ কেটে দিলেন। শূলাংশ শরীরে ধারণ করে, মাণ্ডব্য তার বেদনা আজীবন নীরবে সহ্য করে চলতে থাকলেন। শরীরে শূলাগ্রভাগ থাকায় তিনি অণীমাণ্ডব্য নামে সংসারে খ্যাত হয়েছিলেন। জীবনব্যাপী এই দুশ্চর তপস্যান্তে তিনি অন্তিমে নিজ আরাধিত লোকেই গমন করেন।　　[মহাভারত, আদি পর্ব।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে!'

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে আমেরিকান এক তরুণ এসেছিল বেলুড় মঠে। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে ছেলেটি ছিল ভরপুর। কলকাতায় পৌছেই সে পায়ে আর জুতো পরেনি,—একটি কচি ডাব কিনে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে, গান গাইতে গাইতে মঠে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ছেলেটি মঠে এসে পৌছানো মাত্রই, স্বামী ব্রহ্মানন্দ শশব্যস্তে নিজের ঘরে চলে যান,—ঘরে ঢুকেই ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। এদিকে আগন্তুক ঐ তরুণটিকে দেখে ও তার সঙ্গে আলাপ করে, মঠের অন্য সাধুরা খুব মুগ্ধ। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে খবর পাঠাবার চেষ্টা হল। কিন্তু মহারাজের ঘর বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরে, ঘরের ভিতর থেকেই সাড়া দিলেন,—কিন্তু ঐ ভক্ত ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে অসম্মতি জানালেন। তাঁকে বারে বারেই জিজ্ঞাসা করা হল,—তাহলে কি সন্ধ্যার পরে দেখা হবে, অথবা আগামী কাল, কি অন্য কোন দিন? ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সেই একই জবাব "না।"

অবশেষে স্বয়ং স্বামী শিবানন্দ এলেন, মহারাজকে বুঝাতে। ছেলেটির আন্তরিক ব্যাকুলতা ও ভক্তির কথা তাঁকে অনেক করে বললেন। মিনতির সুরে বলতে থাকেন: "রাজা, এ কী ব্যবহার তোমার? যারাই আসে, তুমি তো সকলেরই সঙ্গে দেখা কর। আর এই বেচারা কি দোষ করল, যার জন্য তুমি তাকে দর্শন দিতে চাচ্ছ না? কত দূর থেকে—সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে ছুটে এসেছে সে! আহা কেমন একটা ভাব নিয়ে, কি প্রবল আকর্ষণে সে এখানে এসেছে! সপ্তাহখানেকের বেশি সে এ-দেশে থাকতেও পারবে না। ভাই, দরজা খোল,—আমি তোমাকে প্রার্থনা জানাচ্ছি।"—সেই এক উত্তর—"না।" শিবানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—"তবে কি রাজা, তোমার শরীর অসুস্থ?—অথবা, ঐ ছেলেটির কোন দোষ তুমি জান—তার বিরুদ্ধে কি কোন অভিযোগ আছে?"···ঘরের ভিতর থেকে তাতেও সাড়া পাওয়া গেল না। "তাহলে, কি ছেলেটিকে আমরা অন্য কোন

দিন আসতে বলব? তুমি কি পরে কোন সময় দেবে?" একটি উত্তরই পাওয়া গেল—"না—কোন দিনই না।" স্বামী শিবানন্দ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

মঠের সাধুরা সকলেই তরুণ আগন্তুকের হতাশায় সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। নানাভাবে ভোলাবার চেষ্টা চলতে থাকল—যাতে ছেলেটি না ভেঙে পড়ে। ঠিক হল—ছেলেটি দু-একদিন মঠেই থাকুক,—দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদি তীর্থস্থানগুলি তাকে দেখানো হোক। ইতিমধ্যে মহারাজও হয়তো বা প্রসন্ন হয়ে, তাকে কাছে ডাকতে পারেন। তদনুযায়ী ঐ-দিনই বিকেলে তাকে নৌকোয় করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল!

গঙ্গাবক্ষে নৌকো চলেছে দক্ষিণেশ্বরের দিকে। আমেরিকান ভক্ত ছেলেটি নৌকোর পাটাতনে বসে, উদাস দৃষ্টিতে মঠ-বাড়ির দিকেই তাকিয়ে। নৌকোখানি চলতে চলতে, মঠ-বাড়ির সামনাসামনি ঠিক গঙ্গার মাঝখানে এসেছে তখন। সহসা দেখা গেল—মঠ-বাড়ির দোতালায় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ঘরের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। মহারাজও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।—তরুণটিও ততক্ষণে নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একেবারে সরাসরি মহারাজের নয়নপথে এসে গেছে সে! মহারাজও করুণার দৃষ্টিপাত করে, দর্শন-ব্যাকুল যুবকের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এ কী কাণ্ড! যুবক নৌকোর পাটাতনের উপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল! কাছে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, বুঝি-বা মহারাজের দর্শন পেয়ে, সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জন্যই ঐ-ভাবে পতিত হয়েছে সে। কিন্তু হায়! তার দেহ তখন সংজ্ঞাহীন। নৌকো দ্রুত চালিয়ে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হল,—সেখানে তাকে নামিয়ে এনে, কত চেষ্টাই করা হল। যুবককে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়নি,—সেবাযত্ন সবই ব্যর্থ হয়। যা হোক, পরে তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে, তার সঙ্গীদের সাহায্যে জাহাজে করে আমেরিকাতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেশে ফিরে গিয়েই ছেলেটি মারা যায়।

বেলুড় মঠে ঐ যুবকের মৃত্যুসংবাদ যখন এল, তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন: "ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য যারা পীড়াপীড়ি করছিল তারা তো কিছুই জানত না। কিন্তু আমি যে সবই জানতাম। আমি কি ওকে চিনতাম না? আমি চেয়েছিলাম, অন্তত সে দেশের মাটিতে ফিরে গিয়ে যেন শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলে। আমি যদি তার সঙ্গে এখানে দেখা করতাম,—সে সঙ্গে সঙ্গেই শরীর ত্যাগ করত। ছেলেটি এত শুদ্ধ, এত পবিত্র,—শরীরে থেকেও সে সম্পূর্ণ আলগা ছিল, কোন বাঁধনই তার ছিল না। জীবনের সঙ্গে সে বাঁধা ছিল মাত্র সামান্য এই একটু সুতোয়!"

[রমাঁ রলাঁর দিন-পঞ্জী থেকে প্রাপ্ত]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ

পৃথিবীতে বছরে বিচিত্র রোগে ভুগে মারা যায় ৫ কোটি লোক, তার মধ্যে ক্যান্সারে মারা যায় ৫০ লক্ষেরও বেশি। দুহাজার খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, অনুমান করা হচ্ছে, এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৮০ লক্ষে। বছরে ৫ লাখ ভারতীয় ক্যান্সার রোগে মারা যায়, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় আরো কয়েক লাখ। শুধু লাখের হিসাবই যথেষ্ট নয়। রোগটা যে সাংঘাতিক এবং ক্রমেই মানুষের প্রধান শত্রু হয়ে উঠছে, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা ক্যান্সার প্রতিরোধের সংজ্ঞা দিয়েছে এইভাবে—যে সমস্ত হেতু ক্যান্সার করে বলে জানা গেছে, সেগুলো দূর করা, তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং ক্যান্সারের পূর্ববর্তী অবস্থার চিকিৎসা করা।

সব আগে দরকার ক্যান্সার বিষয়ে শিক্ষার প্রসার—জনসাধারণের কাছে প্রচার—যত রকমে সম্ভব—বই, দেওয়াল-লিখন, সভাসমিতি, সেমিনার, মিটিং, গাঁয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে সজাগ করা, যা করতে পারেন আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকরা। খবরের কাগজ, রেডিও ও টিভির মাধ্যমে প্রচার তো থাকবেই। এ প্রচার চলবে সব সময়, ক্যান্সার প্রতিরোধের আশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরতে হবে।

এটা যেন সকলে নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, ক্যান্সার একটা মাত্র রোগ নয়, ক্যান্সার অনেক রোগের একটি পরিবার, সব ক্যান্সারের পরিণতি এক নয়, কোন কোন ধরনের ক্যান্সার এখন নির্ণয় করা ও চিকিৎসা করা দুরূহ হলেও অন্য অনেক ধরনের ক্যান্সার প্রথম অবস্থায় ধরা যায়—এবং চিকিৎসা করলে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে, স্বাভাবিক জীবন নিয়ে।

যেখানে ক্যান্সারের কারণ জানা আছে, সেখানে তা দূর করলেই বা তার থেকে সাবধানে থাকলেই ক্যান্সার নিবারণ সম্ভব। একথা বলা যায় বিশেষভাবে কতকগুলি রাসায়নিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেলায়। সেইরকম ধূমপান, খুব বেশি সূর্যকিরণে চলাফেরা, জর্দাদোক্তা দিয়ে পান খাওয়া, খৈনী খাওয়া, মদ খাওয়া, অতিরিক্ত গরম খাবার বা মসলাযুক্ত খাবার খাওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে।

ক্যান্সার সম্পর্কে কতকগুলো বিপদের সঙ্কেত প্রকাণ্ড জায়গায় যাতে সবার চোখে পড়ে, এরকমভাবে দেওয়ালে বা অন্যত্র বিজ্ঞাপনের আকারে লিখে রাখা যেতে পারে যেমন,

(১) কোন আঁচিল বা তিল-এ হঠাৎ কোন পরিবর্তন, (২) হজম ও পায়খানার গণ্ডগোল যখন বহুদিন ধরে একই রকম থাকে, সারে না, (৩) বহুদিন ধরে কাশি, বা গলার স্বর ভেঙে গেছে, (৪) মুখ, নাক, কান দিয়ে রক্তপাত, পায়খানা বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত, যার কোন কারণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, (৫) কোন স্ফীতি বা ঘা, যা ভাল হচ্ছে না, বরং তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে এবং (৬) ওজন কমে যাচ্ছে, যার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্যান্সার প্রতিরোধে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মুখ, চামড়া প্রভৃতির। আবহাওয়া দূষিতকরণ সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে এবং দেশের সরকারকে এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্যান্সার হবার আগে অর্থাৎ ক্যান্সার পূর্ববর্তী অবস্থার তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা কম। এইরকম, কতকগুলো অবস্থা হল—অন্ত্রের পলিপ, আঁচিল, সিস্ট বা নির্দোষ অ্যাডেনোমা প্রভৃতি। এসব রোগ-লক্ষণ দেখা দিলে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করে রোগ সারাতে হবে, নইলে এসব থেকে পরে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। এরকম আরও কিছু বিশেষ সঙ্কেত এবং রোগ-লক্ষণ মেয়েদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি সম্পর্কেও অনুরূপভাবে তাদের অবহিত করা এবং প্রয়োজনমতো স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমস্ত ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী, খাবারে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য মেশায়, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার ঐ সব বস্তু দিয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে

পারে কিনা। এরকম সম্ভাবনা থাকলে ঐ রকম ওষুধ,প্রসাধন সামগ্রী, কীটনাশক বা খাবার তাজা ও দীর্ঘদিন রাখার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। এ দায়িত্ব সরকারের।

অনেক সময় আকছার এক্স-রে পরীক্ষা করানো হয়ে থাকে। যেখানে চিকিৎসার জন্য একান্তই দরকার, সে ক্ষেত্রেই শুধু যেন এক্স-রে ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসক এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় এক্স-রের প্রয়োগ সীমিত করা যেতে পারে। আণবিক রশ্মি শরীরে যত কম যায়, ততই ভাল।

ক্যান্সার গবেষণায় নতুন সিদ্ধান্তের সন্ধানে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তৎপর। নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। মূলগত লক্ষ্য তাঁদের কোষ বিভাজন, রাসায়নিক রূপান্তর, জৈবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতির উপর,—কারণ, এই কোষই তো হঠাৎ বেড়ে ওঠে অস্বাভাবিকভাবে, তৈরি করে ক্যান্সার !

দেশ-বিদেশ

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম অধিবাসী

চারিধারে জল আর জল, মাঝখানে বিরাট অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। তার পশ্চিমে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের কোরাল ও তাসমান সাগর, উত্তর-পশ্চিমে টাইমর সাগর, উত্তরে আরাফুরা সাগর এবং দক্ষিণে বৃহৎ অস্ট্রেলীয় উপসাগর। আয়তনে অস্ট্রেলিয়া প্রায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমান, ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিগুণ এবং ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের পঁচিশ গুণ। অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ৭৬,৮২,৩০০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮১-র হিসাব অনুযায়ী বর্তমান এই মহাদেশের লোকসংখ্যা ১,৪৫,৭৪,৪৮৮।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম অধিবাসী কারা,—জানতে হলে সেখানকার ইতিহাসের কিছু ধারণা থাকা দরকার।

ভূতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশ তৈরি হওয়ার হাজার হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণভারতের পাহাড়ী উপজাতিরা সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ভিতর দিয়ে উত্তর-অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতীরে প্রথম বসবাস আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে তারা অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্রতটে ও মধ্য অস্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

খাদ্যবস্তুর অভাবের জন্য বা শক্তিশালী জাতির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে উপজাতিরা ভারতের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এশিয়াভূখণ্ডের উপর দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করেছিল। এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মাত্র একটা সরু প্রণালী দ্বারা দুই ভূখণ্ড পৃথক ছিল। কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠ তখন খুব নিচুতে ছিল। এই সরু প্রণালী দিয়ে জন্তু-জানোয়ার সহজে এশিয়াভূখণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া-ভূখণ্ডে যেতে পারত। তবে মনে হয় এই সরু প্রণালী দিয়ে উপজাতিরা অস্ট্রেলিয়ায় যায়নি। তারা গিয়েছিল সমুদ্র পার হয়ে। তবে অনেকে বলে থাকেন, ঐ প্রণালী দিয়েই তাদের প্রবেশ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়।

১৫ হাজার বছর পূর্বে যখন সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠে আসে তখন অস্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এশিয়া মহাদেশ থেকে সেখানকার

উপজাতিরা প্রস্তর-যুগের মতো জীবন যাপন করতে থাকে। যারা সমুদ্রতীরে বাস করত তারা মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করত, যারা বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে-পর্বতে থাকত তারা অরণ্য-বাসীর মতো জীবন যাপন করত এবং যারা মরুভূমিতে বিচরণ করত তারা সমতলভূমির অধিবাসীদের মতো খাবার ও পানীয় জলের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। এইভাবে তারা প্রায় ৫০০ উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বৃহদংশ অধিকার করে বসবাস করতে থাকে।

বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণা ছিল যে, ইউরোপের কোন দেশ থেকে মানুষ এসে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। এই নিয়ে বহু বছর ধরে নানা তর্ক-বিতর্ক চলে। বর্তমানে ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম এসেছিল—এই মত বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। আজ তাঁরা সবাই মেনে নিয়েছেন যে, ইউরোপ থেকে মানুষ প্রথম এসে অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন করেনি। বিভিন্ন তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এশিয়া মহাদেশ থেকে উপজাতিরা এসে প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল। বলা হয় যে, দক্ষিণভারতের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে উপজাতিরা ১০ থেকে ২০ হাজার বছর পূর্বে প্রথম এসেছিল। আবার অনেকে মনে করেন,—না, আরও অনেক পূর্বে—প্রায় ৩০ হাজার বছর পূর্বে এসেছিল। আর একটি মত আছে যে, অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে উপজাতিরা অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম এসেছিল।

ব্রিটিশরা আসার পূর্ব পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় যে ৩ লক্ষ উপজাতি ছিল তা তাদের আসার পর থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ১৭৮৮ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাদের সংখ্যা প্রায় তিন-ভাগ কমে যায়। দুটি কারণে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। প্রথম কারণ, ইউরোপীয়রা বন্দুক দিয়ে গুলি করে ও বিষ খাইয়ে তাদের মেরে ফেলে। আবার অনেকের মৃত্যু হয় বসন্ত প্রভৃতি রোগে। এইভাবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় যারা বাস করত তাদের সংখ্যা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ, ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ গড়ার সময় থেকেই উপজাতি-মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত তাদের ডেরায়। কারণ সেখানে ইউরোপীয়-মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ফলে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হয়। এইভাবে সেখানে মূল উপজাতিদের সংখ্যা কমে যায় এবং মিশ্রজাতির সংখ্যা বেড়ে চলে।

আমি নিজে যাহা কিছু হইয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যাহা হইবে, তাহার সব কিছুরই মূলে আছেন—আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ। জগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে সেই *সর্বানুস্যূত অতি আশ্চর্য এক একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা প্রচার করিয়াছিলেন।*

—**স্বামী বিবেকানন্দ**

সমালোচনা

স্বামিজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০+৩৭৮, মূল্য : ২২·০০।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে স্বামী অব্জজানন্দের 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' বইটি প্রথম বেরোয়। স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের জীবনচিত্র তার বিষয়। বইটি অবিলম্বে পড়তে শুরু করেছিলাম—তারপর সে যেন আনন্দসাগরে পাল তুলে ভেসে চলা। খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম—সত্বর শেষ পৃষ্ঠার তটে পৌঁছে যাওয়ায়। তখনি মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল—স্বামীজীর অপরাপর শিষ্য-শিষ্যাগণের (যাঁদের মধ্যে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরাও আছেন) জীবনচিত্র এই লেখক কবে আমাদের উপহার দেবেন ?

সেই 'তীব্র আকাঙ্ক্ষা' এই গ্রন্থ বিষয়ে আমার প্রশস্তির এক রূপ।

প্রায় কুড়ি বছর পরে, ১৯৮৩ অক্টোবর মাসে প্রকাশিত একই গ্রন্থের 'পুনঃ পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ' হাতে নিয়ে গভীর ক্ষোভ বোধ করছি—এখনও আমাদের পূর্বতন আকাঙ্ক্ষা লেখক পূরণ করেননি।

এই 'গভীর ক্ষোভ' বইটির বিষয়ে আমার প্রশস্তির আর এক রূপ।

ক্ষোভ কি কেবল আমার—এই বইয়ের অজস্র পাঠকের নয় ?—যাঁরা মধ্যবর্তীকালে বইটি কিনেছেন এবং পড়েছেন—নচেৎ তিনটি সংস্করণ হত না। আরও বেশি সংস্করণ হওয়াও সম্ভব ছিল, কেননা, একটি সংস্করণ শেষ হবার পরে, নতুন সংস্করণ বেরোতে বেশ কিছু সময় লেগেছে। তাছাড়া ধরে নিতে পারি—এক সংস্করণে একাধিক হাজার বই ছাপা হয়েছে

বর্তমান সংস্করণ হাতে নিলে একটা রূপগত তৃপ্তি পাঠক পাবেন। সুন্দর এর প্রচ্ছদ, ভাল কাগজ, ঝরঝরে ছাপা, ভাল বাঁধাই, আর্ট-পেপারে ১৫টি পূর্ণপৃষ্ঠার ছবি। প্রায় চারশো পৃষ্ঠার এহেন একটি বইয়ের দাম ২২ টাকা—এখনকার বাজারে মোটেই বেশি নয়।

বইটির অনেক গুণ—তার একটি এর নাট্যরস। না, অতিনাটকীয়তা নয় ; অধ্যাত্ম পুরুষদের জীবনীর ক্ষেত্রে যা সচরাচর দেখা যায় সেইপ্রকার অলৌকিকতার কল্পলোকে অঘটন সংঘটনের চমৎকৃতি-কথা নয় ; এখানে পাই ক্ষণে-ক্ষণে উদ্বোধিত চিত্তের নব নব আলোকে উদ্‌ভাসনের রূপচ্ছবি, আর তাতেই মিলেছে অভাবনীয়ের পুনঃপুনঃ সাক্ষাৎ—নাটকীয়তা তারই।

এই গ্রন্থে গবেষণারও যথেষ্ট পরিচয় আছে। লেখক নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী হিসাবে ইনি প্রবীণ সন্ন্যাসীদের স্মৃতিকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র ও অন্যান্য নথি ব্যবহার করতে পেরেছেন এবং ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস রেখে প্রতি সংস্করণে প্রাপ্ত নূতন তথ্য যোজনা করেছেন।

বইটির আর একটি গুণ—এর প্রসন্নমধুর স্বচ্ছন্দ ভাষা। সে ভাষা ঘনতা পেয়েছে গাঢ় শ্রদ্ধার রসায়নে। অধ্যাত্ম চরিত্র চিত্রায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি সন্ন্যাসী হিসাবে লেখকের আছে।

একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই—স্বামীজীর যে ১৩ জন সন্ন্যাসীর জীবনচিত্র বইটিতে আছে তাঁদের অর্ধেক সংখ্যকই পূর্বাশ্রমে একই বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঊর্ধ্বলোকের কোন পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাপারটা ঘটেছে কিনা ঊর্ধ্ব-বিশেষজ্ঞগণ বলতে পারবেন। নিম্নের মানুষ আমরা কেবল বিস্ময় বোধ করতে পারি। আবার দেখি, যদিও ওঁরা একই বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্গত

তবু সকলেই চারিত্রে বিশিষ্ট—একই মণিহারের মণি হলেও বর্ণে ও দ্যুতিতে স্বতন্ত্র এবং গৌরবান্বিত।

পেয়েছি স্বামী শুদ্ধানন্দকে। রামকৃষ্ণ সংঘের সম্পাদক থেকে সভাপতি পর্যন্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এই আত্মস্থ, স্থিরবুদ্ধি, শাস্ত্রবিৎ, কর্মনিষ্ঠ মানুষটিকে স্বামী সারদানন্দের দ্বিতীয় সংস্করণ বলতে দ্বিধা নেই। বৃহত্তর বাংলাদেশ এঁকে স্মরণ রাখবে একটি বিশেষ কারণে—স্বামীজীর ইংরেজী রচনার বড় অংশের বাংলা অনুবাদ ইনিই করেছেন, যেসব রচনা জাতীয় জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। এঁর অনুবাদের এমনই শক্তি ও মহিমা যে অনেক সময়ে তা স্বামীজীর মূল রচনা বলে গৃহীত হয়।

বৃহত্তর পৃথিবীর ক্ষেত্রে স্বামীজীর অন্য সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দের একটি বরেণ্য ভূমিকা আছে—স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলী ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ লিখিত' স্বামীজীর চার খণ্ডের সুবৃহৎ জীবনী এঁরই তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। রামকৃষ্ণ সংঘের বহু দায়িত্বশীল পদ, সর্বোচ্চ পদও, ইনি অলঙ্কৃত করেছেন। অর্থাৎ ইনি মহা কর্মী, ভার বহনে সমর্থ পুরুষ, অথচ এঁর সামগ্রিক অস্তিত্ব যেন মহানীরবতায় নিমগ্ন। ধ্যান, জপ, একান্ত সাধনা,কেবলই হিমালয়-প্রস্থান—এঁর জীবনসত্য। অতল শান্তির মধ্যে সদা নিমজ্জিত ইনি। (এঁর নয়নে করুণায়ত শান্তির কোন্ অনন্ত গভীরতা, তা দর্শনের সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে)। অর্থাৎ প্রত্যাহার ও প্রকাশ যে একই শক্তির দুই রূপ, তা এঁর জীবন দেখিয়ে দেয়।

যে যুবকগোষ্ঠীর উল্লেখ অল্প আগে করেছি তার নেতা ছিলেন স্বামী বিমলানন্দ। আযৌবন জীর্ণশরীর, অল্পায়ু তিনি—ক্ষয়রোগে জীবনান্ত হয়। কিন্তু তাঁর জীবনকথা একটি শিক্ষা আমাদের দেয়—এ-জগতে এমন মানুষ থাকেন যাঁরা নিজের শরীর ক্ষয় করেন এই জগৎকে আত্মার আলোক দান করবার জন্য।

স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘে যে-যুবকের যোগদান করাকে রত্নলাভ মনে করেছিলেন, সেই স্বামী স্বরূপানন্দ প্রথম জীবনে ডন সোসাইটি ও ডন পত্রিকার পরিচালনায় প্রখ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তুল্য মর্যাদার সহযোগী ছিলেন, পরবর্তীকালে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের সম্পাদক, কট্টর অদ্বৈতবাদী, শেষোক্ত ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শের একাংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এঁকে দেখে নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন—'ঈশ্বরপ্রেম কোন্ দারুণ তৃষ্ণার রূপ ধারণ করতে পারে!'

বিবেকানন্দের দায় পাশ্চাত্যদেশে তাঁর যে তিন শিষ্য বহন করেন, তাঁদের অন্যতম প্রকাশানন্দ—আমেরিকায় রামকৃষ্ণ সংঘের বহুল কর্মবিস্তার করেছেন। বক্তা হিসাবে তিনি বহু-প্রশংসিত। স্বামীজী কেবল তাঁর চিন্তা ও চেতনায় নয়, প্রকাশভঙ্গিকেও এমনভাবে প্রভাবিত করেছিলেন যে, বক্তৃতাকালে তিনি পরিচিতগণের মধ্যে স্বামীজীর স্মৃতি জাগরিত করতেন। পাশ্চাত্যে অপর এক প্রচারক, বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী বোধানন্দ অতীব কঠোর সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসের ভারতীয় রূপকে পুরো আকারে আমেরিকায় সংরক্ষণে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ। আর স্বামীজীর কনিষ্ঠতম সন্ন্যাসি-শিষ্য পরমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত—তিনি সার্থক করেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রদত্ত তাঁর নব নামটিকে—সে নাম 'বসন্ত'। হিল্লোলিত বসন্ত-বাতাসের মতোই তিনি আনন্দ ও সৌরভ বিস্তার করে প্রবাহিত হয়েছেন, আবৃত রেখেছেন একই কালে জীবনের কঠিন আঘাতের চিহ্ন-গুলিকে। তাঁর একটি উক্তি মহৎ জীবনের

মর্মসত্যকে আমাদের গোচর করেছে: "মানব-সংসার ও আদর্শের জন্য জীবন ত্যাগ করা অনেক সহজ—জীবন বহন করার চেয়ে।"

তেমন জীবন বহন করেছিলেন—কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ ও শুভানন্দ। এঁরা রামকৃষ্ণ সংঘের দুই প্রধান সেবাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক—বারাণসীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এবং কনখলের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। শুভানন্দ একদিন কলকাতার রাজপথে পাশ্চাত্য-প্রত্যাবৃত্ত স্বামীজীর গাড়ি টেনে চলবার সময়ে অনুভব করেছিলেন তিনি জগন্নাথের রথ টানছেন। সেই কাজ তাঁর অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত, কেননা বিবেকানন্দের মুখ তিনি প্রতিটি পীড়িত মানুষের মুখে দেখতে পেতেন। আর কল্যাণানন্দ—হরিদ্বার—কনখলের প্রতিটি সাধুর মুখে (না-সাধুর মুখেও) দেখতেন সাধুত্তম বিবেকানন্দকে। স্বামীজীর আদেশে তিনি চা-বাগানের দাস-কুলি হিসাবে বিক্রীত হতে প্রস্তুত ছিলেন, সেক্ষেত্রে নররূপী নারায়ণগণের মলমূত্র-পরিষ্কারক 'ভাঙ্গী সাধু' হওয়া তাঁর পক্ষে এমন কি কথা!—বিশেষতঃ তিনি যখন সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের মরাঠি-শিষ্য নিশ্চয়ানন্দকে—যিনি প্রতিদিন ৩৬ মাইল পথ হেঁটেছেন বছরের পর বছর ধরে—জনে জনে সেবা পৌঁছে দেবার ব্রত পালন করতে। নিশ্চয়ানন্দ পূর্বাশ্রমে বৃত্তিতে ছিলেন সৈনিক—পরেও তাই রইলেন—নিশ্চয় প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, সেবাযুদ্ধের বজ্র-দধীচি। কল্যাণানন্দ-নিশ্চয়ানন্দের সেবাশ্রম সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপূর্ব উচ্চারণ—'বিরাটের উপাসনামন্দির।'

স্বামীজীর আর দুই সন্ন্যাসী শিষ্যকে আমরা স্বামীজীর আদর্শকে অন্যক্ষেত্রে প্রজ্বলিত রাখতে দেখি। তাঁদের অন্যতম আত্মানন্দ—আত্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ—স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ এঁর সম্বন্ধে 'মহাপুরুষ' শব্দটিই প্রয়োগ করেছেন। অপরজন অচলানন্দ—বৈরাগ্যে অচলপ্রতিষ্ঠ, বহুসম্মানিত 'কেদার বাবা'—যাঁর একটি পরম সৌভাগ্যের কথা শুনে মহাযোগী স্বামী তুরীয়ানন্দ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যান। অচলানন্দ একটানা নয় মাস স্বামীজীর সঙ্গ করেছিলেন। সেকথা শুনে বিস্ফারিত বিস্ময়ে তুরীয়ানন্দ বলেন—'নয় মাস!'

আমাদের বিস্ময়ের অন্য ক্ষেত্রও আছে। সে বিস্ময় এক আশ্চর্য প্রেমের রক্ততরঙ্গে আছাড়ি-পিছাড়ি করে যখন স্বামী সদানন্দের সম্মুখীন হই। বিবেকানন্দের দিব্য শয়তানী চোখের নিষ্ঠুর টানে ইনি 'চাঁদ মুখে ছাই মেখে' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন; তারপর বুকের কলিজা দিয়ে বিবেকানন্দের আহার্য প্রস্তুত করে চলেছিলেন—সে বিবেকানন্দ যখন মুচি বা মেথর তখন তাঁকে 'আমার রক্ত আমার ভাই' বলে অনুভব করেছেন, যখন বসন্তরোগী তখন খোলাবুকে জড়িয়ে তাঁর জলন্ত যন্ত্রণা শোষণ করতে চেয়েছেন, যখন কুষ্ঠরোগী তখন তাঁর ক্ষতরস শোষণ করে রক্ত-শোধন করতে চেষ্টা করেছেন। বিবেকানন্দের আনন্দময় ইচ্ছায় তিনি কখন হয়েছেন ঝাড়ুদার, কখন-বা ঘোড়সওয়ার, আর কেঁদেছেন এই দুর্লভ সৌভাগ্যে—'আমি সেই গুরুর শিষ্য যিনি আমার জুতো মাথায় করে বয়েছিলেন।'

অপূর্ব সব কাহিনী—স্বামী অব্জজানন্দ ক্রমান্বয়ে উপস্থিত করেছেন। একালের 'মহা-বস্তুবদান' রচনার বরেণ্য অধিকার তিনি গ্রহণ করেছেন। বস্তুত তাঁর গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের উৎকৃষ্ট জীবনী—শিষ্যগণের জীবনের পটে লেখা। সে বিবেকানন্দ ভয়ঙ্কর না সুন্দর? কখন মনে হয় তিনি যেন সূর্য, অগণ্য কিরণে অগণ্য হৃদয়কে আলোকিত করছেন। কখন মনে হয় তিনি এক ঐশ্বরিক অক্টোপাস—বাহুর পর বাহু বাড়িয়ে, শিকারের কণ্ঠে পাক দিয়ে, তাদের জীবন টেনে বার করে নিচ্ছেন সংসারে ছড়িয়ে দেবার জন্য—

পৃথিবীর উর্বরতা বিধানে। কখন-বা তিনি যেন স্বয়ং পশুপতি—মানবের অন্তরস্থ নিদ্রিত বেদান্ত-কেশরীদের জাগিয়ে তোলার জন্য অমোঘ গর্জন করছেন। কল্পনাতীত সেই পুরুষ, বিবেকানন্দ, যিনি হঠাৎ শহীদ সৃষ্টির বিস্ফোরিত উন্মাদনার পরিবর্তে নির্ধারিত পুরুষদের প্রতি রক্তবিন্দুতে এমন রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন যে, তাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বলিদানের অর্ঘ্য করে তুলে-ছিলেন। কৃতার্থ জীবন যাপন করার পরে ঐ মানুষেরা বিবেকানন্দের চিত্রে নয়ন নিবদ্ধ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

স্বামী অব্জজানন্দের গ্রন্থ থেকে সাধারণ ইতিহাসেরও নানা উপাদান পেয়েছি। উনিশ শতকের শেষভাগে ধর্মাশ্রিত আদর্শবাদে আক্রান্ত বাঙালী যুবকদের মানসিক অবস্থার কথা এখানে পাওয়া যাবে; রামকৃষ্ণ সংঘের প্রাথমিক সংগঠন-পর্বের এবং সেবাধর্ম-কর্মের আদি ইতিহাসও। পাওয়া যাবে শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রভৃতির খণ্ডচিত্রও। সব জড়িয়ে নিকট কালের রামায়ণীয় আলেখ্যদর্শন। এই গ্রন্থের চিত্রশালায় আছে অজস্র চিত্র, আমি তাদের থেকে যথেচ্ছ একটি-দুটি তুলে আনব। একটি মজার ছবিই প্রথমে আনা যাক:

মিষ্ট দুষ্টামীতে স্বামী বোধানন্দ দারুণ খেপিয়েছেন সরলস্বভাব স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে। বোধানন্দকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করবার জন্য পূর্বতন সৈনিক নিশ্চয়ানন্দ তাড়া করেছেন। প্রাণের দায়ে দৌড়ে বোধানন্দ শেষপর্যন্ত ঢুকে পড়েছেন স্বামীজীর ঘরে—তারপর বিছানার তলায়। স্বামীজী ঘরে ছিলেন—সুতরাং দরজায় থমকে পড়লেন নিশ্চয়ানন্দ, সেখানে দাঁড়িয়ে ফুঁসছেন—আর ব্যাপার দেখে হাসিতে ফেটে পড়েছেন স্বামীজী। তারপর তিনি ধর্মকথা শোনালেন। 'ত্মাখ, ও শরণাগত। শরণাগতকে মারতে নেই। সুতরাং ছেড়ে দে।' একে ধর্মকথা, তারপর স্বয়ং গুরুর মুখে! অতঃপর 'নিশ্চয়ানন্দ জো হুকুম বলিয়া একগাল হাসিয়া স্বামীজীর পদতলে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলেন।'

আর একটি ছবি:

অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতাপরায়ণ আত্মানন্দ জীবনযাত্রায় বিন্দুমাত্র বাহুল্য রাখেননি, কিন্তু তিনি প্রতিদিন অতি পরিপাটি করে নিজের বিছানা সাজিয়ে রাখতেন। কেন? "একবার জিজ্ঞাসিত হইলে সজলচক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন: বেলুড়মঠে স্বামীজী মাঝেমাঝে এসে আমার বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন। তাঁর দেহান্তের পরেও একদিন স্বপ্নে দেখলুম তিনি আমার বিছানায় শুয়েছেন।··· ত্মাখো, কখন তিনি আসবেন তা তো জানা নেই। তাই তাঁর জন্য বিছানাটি তৈরী করেই রাখি।"

অন্য একটি:

স্বামী শুদ্ধানন্দের ব্রাহ্মণশরীর। তিনি কায়স্থ বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব নিয়েছেন, এই অপরাধের জন্য তাঁর পরিচিত কোন গোঁড়া মানুষ খুবই ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'হাঁ হে সুধীর, উঁচু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও তুমি কিনা শেষে এক কায়েতকে গুরু করলে?' শুদ্ধানন্দ সজল চোখে বলেছিলেন, "কায়েত কিরে ভাই—আমি শুধু এই কথাই ভাবছি যে, হায় তিনি চাঁড়ালের ঘরে কেন এলেন না?"

বিবেকানন্দকে সরিয়ে দিয়ে—যে-শক্তির চরণে তিনি সদাপ্রণত তাঁরই কথা আনা যাক প্রসঙ্গ শেষে। স্বামী বিরজানন্দ গৃহত্যাগ করে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফিরে আসতে অধীর হয়ে তিনি মাতাঠাকুরাণীকে প্রাণের

আর্তি জানিয়েছেন দীর্ঘ পত্রে। তার একাংশে আছে :

"আপনি আমাকে বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন বটে, 'বাড়িতে থাকিয়া তাঁহাকে ডাকিলে আরও শীঘ্র উন্নতি হইবে বলিয়া কতই অভয় আশ্বাস দিয়াছিলেন বটে'—কিন্তু তাহা হইল না বলিয়া কি, সেই-যে আপনি উপরে উঠিয়া গিয়া আমার জন্য কতই কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা কি মরিলেও ভুলিতে পারিব ? একদিন সন্ধ্যার সময়ে বাড়িতে আসিতে গঙ্গার উপর নৌকায় বৃষ্টি হওয়াতে, আপনি ব্যাকুল হইয়া ছাদে দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া, আমার গায়ে কত ফোঁটা জল পড়ে দেখিবার জন্য বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন—তাহাও কি জন্মে ভুলিতে পারিব ?"

ধন্য গ্রন্থ এবং ধন্য লেখক।

—অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

•

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত : প্রকাশক : শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, ৪, নস্করপাড়া লেন, হাওড়া-১। পৃঃ ২৪৮, মূল্য : বোর্ড বাঁধাই ২০·০০, পেপার ব্যাক ১৬·০০।

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম দীর্ঘ-কালের একটি প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। স্বামী শিবানন্দ এককালে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছেন। কথামৃত শতবার্ষিকীতে স্বভাবতই তাঁরা 'রামকৃষ্ণ উপনিষদ্' কথামৃত সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের সে উদ্যোগ সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশনায়।

গ্রন্থের মুখবন্ধে মঠ-মিশনের বর্তমান সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ লিখেছেন, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আজ সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মীয় ক্লাসিকসাহিত্য রূপে স্বীকৃত। জগতের বিরাট এক অধ্যাত্ম আচার্যের উক্তির সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সঙ্কলন এই গ্রন্থে আমরা পাই।...বস্তুতপক্ষে বলা যায়, এটি এই যুগের ধর্মক্ষেত্রে সর্বোত্তম গ্রন্থ।"

কথামৃতকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা চলে। এটি যেমন সর্বোত্তম ধর্মগ্রন্থ তেমনি জীবনীসাহিত্য হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম। সমকালীন জীবন ও মনীষীদের সম্পর্কে বহু সংবাদ ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থে—সুতরাং ইতিহাস বিচারেও এর একটি যোগ্য স্থান আছে। সেই কথামৃত সম্পর্কে দেশে বিদেশে সমকালে ও একালে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চিন্তাভাবনা একত্র সঙ্কলন এবং সেই সঙ্গে কথামৃতের বিভিন্ন তাৎপর্য বিচার, সমাজে ও সাহিত্যে তার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ —যা একাধিক সুবৃহৎ গ্রন্থের আকার গ্রহণ করতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত—শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত (১) শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের দৃষ্টিতে (২) ভারত ও বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে (৩) সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দৃষ্টিতে (৪) সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে এবং সবশেষ অধ্যায়ে 'শ্রীম ও তাঁর গ্রন্থ সংবাদ'। প্রথম অধ্যায়ে শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, গিরিশচন্দ্র, রাম দত্ত ও অক্ষয় সেনের রচনা ও অভিমত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন—সেই পরমপুরুষের বাণী ও কার্যাবলীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল সর্বাধিক। সুতরাং তাঁদের অনুমোদন ও মূল্যায়ন কথামৃতের ঐতিহাসিকতা এবং

নির্ভরযোগ্যতার সবচেয়ে মূল্যবান সাক্ষ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশবিদেশের মনীষীদের কথামৃত তথা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত অভিমত সঙ্কলন। প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী—যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মূল্যবান অভিমতের পাশাপাশি নিবেদিতা, ম্যাক্সমূলার, রোলাঁ, হাক্সলি, টমাস ম্যান, জিমার, ইশারউড প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী, রাজাগোপালাচারী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির অভিমতগুলির একত্র সমাবেশ গ্রন্থটির আকর্ষণের বিশেষ দিক। তৃতীয় ভাগে রামকৃষ্ণ-পরবর্তী-কালে যাঁরা প্রধানত কথামৃতের প্রভাবেই রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছেন রামকৃষ্ণমিশনের সেই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনিগণের কিছু রচনা বিন্যস্ত। এই অংশে স্বামী ওঙ্কারানন্দ, ভূতেশানন্দ, লোকেশ্বরানন্দ, গহনানন্দ, আত্মস্থানন্দ, স্মরণানন্দ, প্রভানন্দ, অজজানন্দ এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও প্রদীপ্ত-প্রাণার রচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে আধুনিক কথাসাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক ও অধ্যাপকদের বিশ্লেষণাত্মক লেখাগুলি, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যে কথামৃতের প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যবান রচনা। জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলি, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কবিতা সিংহ প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের পাশাপাশি প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নিমাইসাধন বসু, সাংবাদিক শিশির কর এবং খ্যাতিমান অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, সুভাষ বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত প্রমুখের আলোচনা কথামৃত সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার ক্ষেত্র রচনা করেছে। পঞ্চম তথা সর্বশেষ অধ্যায়ে শঙ্করী-প্রসাদ বসু, শঙ্খদীপ বসু, দিলীপকুমার রায়, সুনীলবিহারী ঘোষ কথামৃত ও কথামৃতকার সম্বন্ধে নানা তথ্য সমাবেশের দ্বারা গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। পাঁচটি পরিচ্ছেদের সূচনায়, পরিচ্ছেদ-অন্তর্গত রচনার মধ্যে থেকে কিছু কিছু পঙক্তি উদ্ধার করে মূলবিষয়বস্তুর পরিচয়দানের পরিকল্পনাটি বিশেষ আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজন মতো রচনাগুলির মূলসূত্রের উল্লেখ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বিশেষ মূল্যবান।

আলোচ্যগ্রন্থের প্রতিটি রচনাই মূল্যবান তবে তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গীতে 'সর্বশাস্ত্রসার' কথামৃতের সর্বজনীনতা এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ববাসীর কাছে এর সম্ভাব্য আবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বামী গহনানন্দ ও স্বামী আত্মস্থানন্দ কথামৃতের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ স্বামী স্মরণানন্দের মনে শুধু কথামৃত পাঠের আকাঙ্ক্ষা কিভাবে বাংলাশিক্ষার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল এবং তার মধ্যে তিনি কোন্ মৃত্যুঞ্জয়ী আনন্দের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—অমর আনন্দের পথ' রচনাটিতে। লেখকের রচনাটি তাঁর ভাষাশিক্ষার সার্থক উদাহরণ।

স্বামী প্রভানন্দের 'মহেন্দ্রনাথের সাধনার দুই নিত্যপুষ্প' শ্রীম-র ডায়েরী অবলম্বনে রচিত—নূতন তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাটি স্বভাবতই আকর্ষণীয়।

স্বামী অজজানন্দের রচনাটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্বামী প্রেমেশানন্দের ডায়েরী অবলম্বনে তাঁর জীবনে কথামৃত যে গভীর পরিবর্তন এনেছিল তারই পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে এবং বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে।

ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে কথামৃতের

অনন্ত রহস্যের আভাস দিয়েছেন প্রবীণ সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

চতুর্থ অধ্যায়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনা একটি ভক্তি স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র রচনাটি সম্পর্কেও কথাগুলি আংশিকভাবে প্রযোজ্য।

সাহিত্যিককুলের লেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সৈয়দ মুজতবা আলীর বহুপঠিত রচনাটি। সরস ভঙ্গী, সুনিপুণ বিশ্লেষণ এবং বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে নিবন্ধটি অনবদ্য—যা বহুবার পাঠ করেও কখন পুরানো হয় না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে কিছু কিছু মন্তব্য আছে যা বিশ্লেষণসাপেক্ষ। কথামৃতের ঐতিহাসিকতা ও সাক্ষাৎকার-বিবরণী সম্পর্কে সংশয় যাচাইয়ের সুযোগ নেই কারণ কোন উদাহরণ বা বিপরীত যুক্তি তিনি উপস্থিত না করেই এক তরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে একাধিক লেখক কথামৃতের ঐতিহাসিকতা ও প্রামাণিকতার উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নিমাই-সাধন বসু তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন, "সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীম-র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান।" শঙ্খদীপ বসুর রচনাটিও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। সমকালীন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা থেকে রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকারের বিবরণী উদ্ধার করে তিনি 'কথামৃতে'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সংশয় দূর করেছেন।

এইরূপ একখানি মূল্যবান সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশের জন্য আশ্রম সম্পাদক মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই সাধুবাদ লাভ করবেন এবং রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী ও সাধারণ পাঠক বিশেষ উপকৃত হবেন, সে কথা বলা বাহুল্য। নিত্যানন্দ ভকত পরিকল্পিত প্রচ্ছদ এবং পরিচ্ছন্ন অনাড়ম্বর সৌষ্ঠব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—অধ্যাপিকা রেণুকা চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা রামমোহন কলেজ

*

শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা: শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ। প্রকাশক: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলী, ৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫। পৃষ্ঠা ৩২৮, মূল্য: ২৫ টাকা।

যাঁহার পত্র সমূহের সংকলনরূপে এই পুস্তক গ্রথিত হইয়াছে, সেই মনীষী-সাধক লোকান্তরিত হরিশ্চন্দ্র সিংহ কর্মজীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের শিষ্য হেমচন্দ্রের ভাবসন্তান হরিশ্চন্দ্র যুবক বয়স হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং কর্মজীবনের শেষে তাঁহার ফলতা আশ্রমে সাধন-জীবন যাপন করেন। রামকৃষ্ণ ভক্তসমাজে উচ্চ প্রশংসিত দুই খণ্ডে রচিত, তাঁহার "গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থটি তাঁহার মনীষা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শরণের সাক্ষ্য।

যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ উপদেশ 'শরণাগতি'র কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। পুস্তকে মুদ্রিত চিঠিগুলিতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাতেই এই শরণাগতি বিষয়টি নানাভাবে বলিয়া গিয়াছেন। শরণাগতি যে ভক্তের একটি আদর্শ এবং ভক্তকে এইজন্য জীবনব্যাপী সাধনা করিতে হয়, তাহা চিঠিগুলিতে বারংবার পরিস্ফুট হইয়াছে। পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিয়া ঈশ্বরশরণাগতিতে বিশ্বাস লাভ করিবেন, ইহাই প্রত্যাশা।

চিঠির সংখ্যা (৩৪৭) কিছু কমাইয়া, পুস্তকটি কিঞ্চিৎ ছোট করিয়া, মূল্য কম রাখিতে পারিলে, পুস্তকটি সংগ্রহে আগ্রহী পাঠকের সুবিধা হইত। মুদ্রণ-তত্ত্বাবধান ভাল হইয়াছে।

—শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণসভা

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ১৫ জানুআরি, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার বেলা ৩-৩০ ঘটিকায় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৪তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ সভায় পঠিত ১৯৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে বলা হয় যে, বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মঠ ও মিশনের ত্যাগী কর্মীবৃন্দ তাঁদের সেবাদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বজায় রেখে দৃঢ়তার সহিত মিশনের বহুমুখী সেবাব্রত এবং বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিধ্বস্ত অঞ্চলে কষ্টসাধ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন-কার্য পরিচালনা করেন।

আলোচ্য বৎসরে বিতরিত বিভিন্ন দান-সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য ২৭,৩০,৫৩১ টাকা সহ মোট ৮২,৬৮,৯৩৯ টাকা নিম্নলিখিত ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্যে ব্যয় করা হয়:

(ক) বন্যাত্রাণ: রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যাতে, (খ) ঘূর্ণিঝড়ত্রাণ: আসাম, গুজরাট ও উড়িষ্যাতে, (গ) খরাত্রাণ: পশ্চিমবঙ্গে, (ঘ) দাঙ্গা-ত্রাণ: আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে, (ঙ) চিকিৎসাকার্য: পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায়, (চ) অধিকন্তু পুনর্বাসনকার্য: অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন গ্রামবাসীদের জন্য যে পল্লীমঙ্গলের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কৃষি-উন্নয়ন, কুটিরশিল্প, মাছের চাষ, গোপালন, বিদ্যালয়, ছোট ব্যবসায়, বিকলাঙ্গ ও অনাথ মহিলা ও শিশুদের জন্য প্রকল্প, সেমিনার, যুবসম্মেলন এবং কতিপয় ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। এই সকল পল্লীমঙ্গল পরিকল্পনা খাতে মোট ৩,৯৬,৯১১ টাকা ব্যয় করা হয়।

আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও বহুমুখী সেবার কার্য পরিচালনা করা হয়:

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুট অব মেডিকেল সায়েন্সের জন্য বহুমুখী গৃহের তিনটি তলা, গৌহাটিতে একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়, নরোত্তমনগরে একটি মেডিকেল ওআর্ড, চেরাপুঞ্জীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঠগৃহ সহ গ্রন্থাগার, মেদিনীপুরে একটি রান্নাঘর সহ ভোজনালয় এবং পুরীতে একটি কর্মী-ভবন ইত্যাদির উদ্বোধন করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠের জয়রামবাটীতে একটি সাধু-নিবাস, মহিশূরে প্রার্থনা-গৃহের উপরে একটি বিমান (টাওয়ার), বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দক্ষিণ ব্লকের প্রার্থনা-গৃহ সহ ত্রিতল এবং দিনাজপুরে (বাংলাদেশ) তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

উপরি-উক্ত উন্নয়ন কার্য ছাড়াও মিশন পরিচালিত ৮টি হাসপাতাল ও ৬০টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৪০,১৩৪ ও ৩৯,০২,৫৭৩ জন রোগীর সেবা করা হয়। এছাড়া ১১টি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩,৯৭,৪৬০ জন রোগীর সেবা করা হয়। উহার ৭০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১,০০,৮২৩টি ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত ২৪টি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৭,৭৪,১৯৩ জন রোগীর সেবা করা হয় এবং ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭,৮৩৬ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

তদ্‌ভিন্ন অনুন্নত ও গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দ্বারা ৫৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪৫টি হাসপাতাল ও ভ্রাম্যমাণ সহ দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু গ্রন্থাগার এবং নানা প্রকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কয়েকটি যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের প্রয়োগের জন্য "দি কমিটি ফর্ দি কম্প্রেহেন্সিভ স্টাডি অব দি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মোভ্‌মেণ্ট" নামে কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় সর্ব ভারতব্যাপী সেমিনার/কন্‌ফারেন্স পরিচালনা করা হবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বৈদেশিক কেন্দ্রগুলি যথাক্রমে শিক্ষা, চিকিৎসা, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহে নিযুক্ত আছে।

বেলুড়ে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত মিশন ও মঠের বিশ্বব্যাপী শাখার সংখ্যা হল যথাক্রমে ৭৪ ও ৬৬।

উদ্বোধন-সংবাদ

৪, ৬, ও ১৭ ফেব্রুআরি যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজ্ঞানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সপ্তদশ বার্ষিক যুব শিক্ষণ-শিবির

গত ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৩, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির প্রাঙ্গণে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সপ্তদশ বার্ষিক যুব শিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এবারের এই শিক্ষণ-শিবিরে মোট ৬২৩ জন শিক্ষার্থী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, যথা—অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, বিহার এবং নতুন দিল্লী থেকে এসে যোগদান করেন। ২৫ ডিসেম্বর, অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী অনন্যানন্দ মহামণ্ডলের পতাকা উত্তোলন করে শিবির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, স্বামী মুখ্যানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ এবং স্বামী সর্বদেবানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও তার উপযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় উন্মুক্ত অধিবেশনে আমন্ত্রিত বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন শিক্ষা, গণোন্নতি, জাতীয় সংহতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোকে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন স্বামী আত্মস্থানন্দ, ডঃ নিমাইসাধন বসু, অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী সত্যরূপানন্দ প্রভৃতি। ৩০ তারিখের বিদায়-সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। তাঁর ভাষণে তিনি শিবিরবাসীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁরা যেন স্বামী বিবেকানন্দের অন্ততঃ কয়েকটি ভাবও জীবনে গ্রহণ করেন এবং শিবিরের পাঠ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজেদের জীবন গঠন করেন এবং তদনুসারে অন্যান্যদেরও উদ্বুদ্ধ করেন।

১২৮ জন শিবিরবাসী রক্তদান করেন। ৩০ ডিসেম্বর একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে বেলুড় মঠ পরিক্রমা করে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদল পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য **রবীন্দ্রনাথ বসু** বিগত ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩, সকাল ১১-৪৫ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে কথামৃতকার শ্রীম'র সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁরই প্রেরণায় মাতৃহীন বালক শ্রীশ্রীঠাকুরকে আপন শূন্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, তাই-ই প্রার্থনা।



৮৫তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

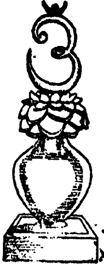
চৈত্র, ১৩৯০

দিব্য বাণী

ব্রহ্মশব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য করি নাহিক যার সম॥
সেই ব্রহ্মশব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন॥
আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥
সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিনরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥
ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥

—শ্রী শ্রীচৈতন্যদেব

[শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৪শ পরিচ্ছেদ]



কথাপ্রসঙ্গে

মানুষের সন্ধান

শহরের জন-কোলাহল সেখানে পৌঁছায় না; পল্লীগ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মাঝে দণ্ডায়মান ততোধিক প্রশান্ত-গম্ভীর প্রসিদ্ধ এক দেবালয়। দেশ-বিদেশ হইতে প্রতিদিন অগণিত ভক্ত-দর্শনার্থী সেখানে আসেন,—শান্তি প্রত্যাশায়, কত বিচিত্র পূজা-উপচার সহ!

গ্রীষ্মের নিস্তব্ধ দুপুর। মন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ। দর্শনার্থী যাত্রী কেহ কোথাও নাই। যথার্থই নিথর নিরালা পরিবেশ। দুইটি কিশোর,—প্রায় সমবয়স্ক বা দুই-এক বৎসরের পার্থক্য, দেখিতেও প্রায় সমরূপ,—খালি গলায় বড় মিঠা সুরে মন্দির সোপানে বসিয়া গান গাহিতেছিল। বাউল বালকদ্বয়ের সেই স্বরলহরী সমীপস্থ দীঘির জলে অনুরণিত হইয়া জনহীন মধ্যাহ্নের গাম্ভীর্যকে ধ্বনিময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ধ্বনির আকর্ষণ ছিল আশ্চর্য,—তাই অদূরে ভোজন-গৃহে আহার-নিরত আমরা, আসন ছাড়িয়া বাহিরে না আসিয়া পারি নাই। কিশোর বৈরাগী দুইটি প্রাণ খুলিয়া আকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছিল: 'নয়ন জলে না ধোয়ালে কেমনে পাব চরণ তোমার।'

অপলক দৃষ্টিতে বালক দুইটিকে দেখিতেছিলাম, আর তাহাদের হৃদয়-নিঙড়ানো স্বরমাধুর্যে মুগ্ধ হইতেছিলাম। মনোযোগ সহকারে সঙ্গীতের কলিগুলি শুনিতেছিলাম। যতদূর মনে পড়িতেছে, সেগুলি ছিল এইরূপ:

'কী ফুলে পূজিব হরি, বলো না আমায়
প্রেম-ফুলে পূজলে নাকি তোমায় পাওয়া যায়!
সুবাসিত নানা ফুলে, মালতী আর বেল-বকুলে,
নন্দন কাননে যত পারিজাত ফুল পাওয়া যায়।
(বলে লোকে) তুলসী আর গঙ্গাজলে,
পূজলে নাকি তোমায় মিলে,
(কিন্তু বলো) নয়ন জলে না ধোয়ালে,
কেমনে পাব চরণ তোমার?
এই হরিনাম নিতে নিতে যদি ফুল ফুটে চিতে,
(ফুল) ফুটিলেও ফুটিতে পারে নয়নের ধারে।
মুখে বলব হরি হরি, ধুলায় দিব গড়াগড়ি
রাখো বা না-রাখো হরি, যা ইচ্ছা তোমার।'

বালক দুইটির মধ্যে যেটি একটু বড়, সে-ই ছিল মূল গায়ক। আর দ্বিতীয়টি দাদার সহিত গলা মিলাইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, উহারা বাস্তবিকই দুইটি ভাই,—সন্নিকটের কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং এইরূপ মাঝে মাঝেই নাকি আসিয়া থাকে,—নির্জন নিরালায় বসিয়া আপন ভাবে গান গাহিয়া চলিয়া যায়। আলাপে বুঝিয়াছিলাম যে, উহারা আন্তরিক বিশ্বাস করে, ঐ-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহাদের কণ্ঠে গান শুনিতে ভালবাসেন, আর সেই টানেই উহারা দুই তিন ক্রোশ মাঠ ভাঙিয়া ছুটিয়া আসে গান গাহিতে,—'মাকে শুনাইতে'। বড় ছেলেটির নাম শুধাইয়াছিলাম। নাম—বাসুদেব অধিকারী। ছোটটি লাজুক,—বিশেষ কথা বলে নাই, কেবল মিষ্টি হাসিয়া দাদার কথায় সায় দিতেছিল। বুঝিতে বাকী থাকে নাই যে, বালক দুইটি

ভিক্ষাজীবী নহে। মন্দিরের প্রসাদ হাত পাতিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্য কিছু দিতে চাহিলে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কথায় কথায় প্রকাশ পাইয়াছিল, উহারা ঠিক এমন জনশূন্য দুপুর-বেলাতেই মন্দিরের দ্বারে আসিয়া বসে—যাহাতে সকলের দৃষ্টি এড়াইতে পারে। জানি না, ঐ গ্রাম্য বালক দুইটি কী উদ্দেশ্যে, কোন্ প্রেরণায়, অমনভাবে গ্রীষ্মাতপ বর্ষাবাদল অগ্রাহ্য করিয়া, ঐ দুরন্ত পথ অতিক্রম করিয়া মন্দির-দ্বারপ্রান্তে ছুটিয়া আসে,—তাহাদের সরল আর্তি শুনিবার জন্য কে-ই বা অপেক্ষায় থাকেন ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে?

যাহা হউক, ছেলে দুইটিকে বড় বিস্ময়কর ঠেকিয়াছিল,—কৌতূহল হইতেছিল উহাদের ঘরের খবর কিছু জানিবার জন্য। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তেমন কিছু জানা গেল না। উহাদের মাতা-পিতার পরিচয় ও নিবাস জানিতে ইচ্ছা ছিল। কিশোর বাসুদেব সেদিন ধীর কণ্ঠে অকপটে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিল: ঐ মন্দিরে যিনি আছেন, তিনিই জগতের মা,—ছোট-বড় গরিব-ধনী হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল মেয়ে-পুরুষ সকলেই তাঁহার সন্তান। আরও অবাক করিয়াছিল যখন সে বলিয়াছিল,—স্বর্গের দেবতারাও ঐ মায়েরই ছেলে—ইতর জীব-জন্তুরও জননী তিনি।

অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—এই সকল সংবাদ উহারা কোথা হইতে পাইয়াছে। সহজ উত্তর দিয়াছিল: বাড়িতে মা-বাবার মুখে শুনিয়াছে।

মা-বাবা বলিলেই কি তাহা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে?—এরূপ মন্তব্য করাতে বাসুদেবের চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল,—প্রতি-বাদের সুরে তৎক্ষণাৎ জানাইয়া দিয়াছিল: 'মুদের মা কেনে মিথ্যা বলবেক? আর বাপের কথা লিবনি তো কার কথা লিব?'

ক্রমে আরও জানিয়া লইয়াছিলাম, বাড়িতে মাতা-পিতার প্রেরণাতেই উহারা 'জগতের মা'-র ঠিকানা পাইয়া তাঁহার মন্দিরে আসিয়া থাকে, যখনই হাট-বাজার করিতে কিংবা ঘরের অন্য কোন কাজ-কারবারে এই গ্রামের উপর দিয়া যাইতে হয়। কেন আসে এবং কিসের জন্যই বা গান শোনায়? তাহাও ঘরের মায়ের মুখ হইতে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, সংসারের অভাব-অনটন মিটাইতে ও শান্তি দিতে পারেন একমাত্র এই মন্দিরের মা—যিনি 'সবারই মা'। চাষ-বাসের উপযোগী সামান্য জমি-জমা থাকিলেও বড় কষ্টের সংসার তাহাদের। ছেলে দুইটিকে বাপের সঙ্গে ক্ষেতের কাজ করিতে হয়—এই কারণে লেখাপড়ার জন্য স্কুলে যাওয়া আর হইয়া উঠে না উহাদের।

আলাপে আলাপে তাহাদের মনোরাজ্যের বেশ গভীরে—অনেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়া-ছিলাম। কী-ভাবে গিয়াছিলাম, সে-বিষয়ে কিন্তু উহারা মোটেই সচেতন ছিল না। অসঙ্কোচে এক-সময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—'আচ্ছা, ইহা তো দেবী-মন্দির—তোমরাই বলিতেছ "জগতের মা" থাকেন এখানে। তবে কেন তোমরা হরিকে ডাকিয়া গান গাহিতেছ?' কনিষ্ঠ ভাইটির মুখে ইহাতে এক ঝলক করুণার হাসি মাত্র দেখিয়া-ছিলাম,—যেন এ-হেন অর্বাচীন প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া বৃথা! জ্যেষ্ঠ বাসুদেব কিন্তু বিজ্ঞের মতো উত্তর দিয়াছিল,—বিস্ময়ের উত্তেজনায় মুখের উপরই বলিয়া বসিল: 'হরি বলে ডাকলে মা দূরে সৈরে যায় নাকি? তুমরা জান সে-সব হিসাব। পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু ছেলে আমরা, অত শত খপর রাখি না। আমরা জানি, হরি নামটি মার বড় ভাল লাগে। যে নামেই ডাকি, সেই মাকেই তো ডাকতিছি···মা কি তা বুঝতে লারবে? ভগবান তো আর দুইটা লয়।'

সানন্দ সাহসে তখন জানিতে চাহিলাম—'তোমরা এমন খাঁটি তত্ত্বকথা কোথা হইতে শিখিলে?' সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ উত্তর: 'শিখাবে আবার কে? এ তো সুজা কথা। ঘরের মা-বাপ্ ছাড়া আর কে আছে বটে মুদের পড়াবে শিখাবে?'

তাহারা যে-গানটি গাহিয়াছিল, উহার অর্থ বুঝিয়া গাহিয়াছে কিনা আমাদের সন্দেহ ছিল। কিন্তু বিস্মিত হইয়াছিলাম দেখিয়া যে, উচ্চ ভাবদ্যোতক ঐ সঙ্গীতের ভাব উহাদের অজানা ছিল না। আমাদিগকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছিল: চক্ষের জল অপেক্ষা পবিত্র পূজা-উপচার আর কিছুই নাই। ভগবানকে ব্যাকুল হইয়া ডাকিলে প্রাণে ভক্তি-কুসুম আপনি ফুটিয়া উঠে—অশ্রুজলের গঙ্গাও তখন না বহিয়া পারে না। দরিদ্রের পক্ষে ইহার চেয়েও সহজ-সাধ্য পূজা-উপকরণ আর কি হইতে পারে! প্রাণের আকুলতা দেখিলে ভগবান না আসিয়া পারেন না। তবে তিনি দেখা দিবেন, কি দিবেন না, ইহা তাঁহারই ইচ্ছা। দেখা যদি নাও দেন, তাহা হইলেও তিনিই আমাদের একমাত্র আপন এই সংসারে,—তাঁহাকে ছাড়া আমাদের জীবন অচল অর্থহীন অসাড়।

'ফল ফুল নবিদ্বি যতো কুছু দিয়ে পূজা কর্‌ না কেনে, ভক্তি যদি না থাকেঁ, চুঁখের জল যদি না পড়ে, তবে আর কিসের পূজা হৈল! কী আর বলব তুমাকে? তুমি তো সভি জান বটে!'

বাসুদেবের মুখে নির্ভেজাল আঞ্চলিক উচ্চারণ-ভঙ্গিমায় গ্রাম্য বুলি শুনিতে সুমিষ্ট লাগিতেছিল। তাহার কথাগুলির নির্গলিতার্থ আমাদের হৃদয়কে সেদিন বাস্তবিকই স্পর্শ করিয়াছিল। ভাবিতে-ছিলাম,—তথাকথিত শিক্ষাহীন এই সরল বালক এমন সব নিগূঢ় তত্ত্বকথা জানিল কেমন করিয়া! 'জানিল' বা 'শিখিল' না বলিয়া 'আয়ত্ত করিল' বলাই সঙ্গত এখানে। মুগ্ধ বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় ঐ মূর্তিমান বিশ্বাস-সরলতাকে,—সনাতন ভারতের একটি অতি ক্ষুদ্র নমুনা-বিগ্রহকে মনে মনে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়াছিলাম সেদিন। প্রখর রৌদ্র-তাপের মধ্যেও অন্তরে যেন হিমালয়ের তুষার-শীতলতা অনুভব হইতেছিল! প্রত্যক্ষই যেন ধর্মের একটি সহজ রূপ চোখের সম্মুখে ধরা দিয়াছিল। সেই রূপ বাহির হইতে রঙ-তুলিকার সাহায্যে গড়া নহে,—উহা ছিল স্বভাবজ লাবণ্য—অন্তর হইতে ফুটিয়া উঠা! যেমন বাগানের ফুলের শোভা। 'ডেকরেশন'-এর মনোহারিতা নহে। 'শ্রদ্ধা' মানুষকে কত মহনীয় মর্যাদায় লইয়া যাইতে পারে, তাহা শুনিয়াছিলাম,—পড়িয়াছিলামও। এবার ঐ পল্লী-বালক দুইটির মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয় হইল,—'শ্রদ্ধা'-র শক্তি কী আশ্চর্য। বাসুদেবদের স্মৃতিতে তাই মন ভরিয়া আছে। ভাবিতেছিলাম ইহারা কি হঠাৎ দেখা হওয়া কোন পথিকমাত্র? অথবা, নিতান্তই আকস্মিক আগন্তুক? না,—আমাদের নিত্যকার যাতায়াতের পথে, পল্লীর অলিগলি-প্রান্তরে চল-মান সারি সারি মুখের মেলার মাঝে উহাদিগকে খুঁজিয়া লইতে তেমন অসুবিধা হয় না, যদি খুঁজিবার ইচ্ছা থাকে। জনতার ভিড়ে উহারা হারাইয়া গিয়াছে হয়তো,—কিন্তু অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

*

চোখে দেখা আরও একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গের এক মহকুমা শহরে যাইতে হইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যশালী শহর। কলিকাতা হইতে রেলপথে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার দূরত্ব। সেখানেও দেখিয়াছিলাম একজন মানুষ—যাহাকে দেখিতে ও দেখাইতে কাতারে কাতারে লোক দূর-দূরান্ত হইতে আসিয়া শহরে

ছুটিতেছিল। যাহার কথা বলিতেছি—সে বয়সে তরুণ;—ঐ শহরেই তাহার জন্ম—সেখানকার বিদ্যালয়ে তাহার শিক্ষা—সেই শহরেরই মাঠে-ময়দানে সে একদা খেলিয়া বেড়াইত,—মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে মোটা ভাত-কাপড়ে মানুষ হইয়াছে। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, পরে মহানগরী কলিকাতার আলোক দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অতঃপর উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকতর পরিধিতে সে নিজের মেধাবলেই যাইতে পারিয়াছে। তরুণ এখন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানাধ্যাপক—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত—স্বকীয় গবেষণা-ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে সসম্মানে স্বীকৃত। আমরা কিন্তু সেদিন দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলাম, তাহার নিজের দেশের লোকের কাছে—সেই পুরাতন মফস্বল-শহরখানির ও উহার আশে-পাশের গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মেয়ে-পুরুষের চিত্তে সে যেন আপন 'ঘরের ছেলে' একটি। বিশ্বস্ত সূত্র হইতে ইতিমধ্যে জানিয়া লইয়াছিলাম, সে দেশে গিয়াছিল মাত্র দুই দিনের জন্য, কোন বিশেষ প্রয়োজনে,—ব্যক্তিগত কারণে নহে, আপন পারিবারিক ব্যাপারেও নহে। সকলের অজ্ঞাতেই গিয়াছিল—কিন্তু সংবাদ গোপন থাকে নাই। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম,—রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল—রিক্সায়, সাইকেলে, পায়ে হাঁটিয়া যে যেমন পারিয়াছে। উদ্দেশ্য,—তাহাদের রুগ্ন-পীড়িত আত্মীয়-স্বজনকে সন্তান-সন্ততিকে একটিবার ঐ 'ধন্বন্তরি'-কে দেখানো,—অন্ততঃ তাঁহার মুখ হইতে একটু সান্ত্বনাবাক্য শোনা—অথবা কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা। স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, পুরুষ-স্ত্রীলোক যুবা-বৃদ্ধ সকলেই যেন উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছিল। যাহার কাছে আসিয়াছিল, তাহাকে বুঝি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, পরমবন্ধু বা হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় জ্ঞান করিয়াই তাহারা শতে শতে আসিয়া সারা শহরময় খুঁজিয়া ফিরিতেছিল—কোথায় কোন্ গৃহে কখন্ তাহাকে পাওয়া যাইবে। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, ঐ তরুণের দুই দিন অবধি একান্ত প্রয়োজনীয় আহার-বিশ্রামের সময়টুকুও মিলে নাই—এমন কি নিজের গৃহেও রাত্রিযাপনের সুযোগ হয় নাই। প্রচণ্ড সূর্যতেজ মাথায় লইয়া পথের ধারে দণ্ডায়মান বিভিন্ন বয়সের নর-নারী দেখিয়া, আমরা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন তুলিয়া-ছিলাম,—তাহারা কাহার জন্য এবং কী প্রয়োজনে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তর শুনিয়া বিস্ময়ে চমকিত হইয়াছিলাম। আমরা পরস্পর বলাবলি করিতে-ছিলাম,—ইনি তো কোন দল-নেতা নহেন, ধর্ম-প্রচারক নহেন, পদস্থ রাজপুরুষও নহেন—কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিও নহেন—তথাপি ইঁহার জন্য কেন এরূপ ভিড়? আর তাঁহার এখানে আসিবার সংবাদ এমনভাবে প্রচার হইলই বা কিরূপে? কেননা আমরা ভালই জানিতাম—ঐ তরুণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ওখানে গিয়াছিলেন কোন্ প্রসঙ্গে। আমাদের বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা জনতার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হয় নাই। ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া একজন আমাদের মুখের উপরেই জবাব দিয়াছিল: 'আমাদের দেশে কি কাক-পাখী নাই? এদেশে কাক আছে—দাঁড় কাক, পাতি কাক। আরও আছে কোকিল,—নানা জাতের অন্য পাখীও। বাবু, আমরা ঐ পাখীর ডাকেই জানতে পেরেছি যে আমাদের ঘরের ছেলে আসছে আজ,—দেশের সোনার ছেলে।' সুরসিক কবির ভাষায় রসাল উত্তরই বটে! স্তম্ভিত হইয়াছিলাম! বুঝিয়া পাইতেছিলাম না, কি বলিব? শুধু একটি অনুভূতিতে পুলকিত হইতেছিলাম—দেশে তবে

এখনও সজীব মানুষ আছে!

অনুসন্ধানে জানিতে বিলম্ব হয় নাই, ঐ যে 'সোনার ছেলেটি'-র জন্য এত মানুষের ভিড়—সে কোন উপাধির গরিমায় বা পদের মহিমায় নহে, এমন কি দান-খয়রাতের চমৎকারিতায়ও নহে,—কুলের গৌরব অথবা বংশ-আভিজাত্যের চটকেও নহে, নিছক ব্যক্তি-চরিত্রের স্নিগ্ধতায় এবং তাহার উদার সহানুভূতিশীল হৃদয়খানির জন্যই সে আজ সকল ঘরের 'একটি ছেলে'—সকলেরই 'ঘরের ছেলে!' দেশের আবাল-বৃদ্ধ-নরনারীর সে অতি প্রিয়জন—পরম সুহৃদ্ আত্মীয়।

সেখানে দেখিয়াছি তাহাকে চিকিৎসকরূপে—যে-কেহ পীড়িত আসিয়াছে, তাহারই নিরাময়-বিধান দিতে! দেখিয়াছি তাহাকে বন্ধুরূপে,—মৃদু-মধুর দুই চারিটি মিষ্ট কথায় সকলকেই তৃপ্ত করিতে! দেখিয়াছি তাহাকে আত্মজনরূপে,—ব্যথা-বেদনার স্থানে হাত বুলাইয়া, সমবেদনার করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কষ্ট ভুলাইতে! অথবা বলিতে শুনিয়াছি—'তুমি কিন্তু কলকাতায় যেও। সেখানে আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেব।' কিংবা কখনও শুনিয়াছি—'তুমি কিছু ভেবো না মা। তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে।'

স্বল্প ঐ সময়টুকুর মধ্যে কত বিচিত্র মানুষকেই দেখিলাম তাহার কাছে আসিতে। দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, অতিশয় উগ্রপ্রকৃতির যুবকদেরও কাঁধে হাত দিয়া 'ভাই' বলিয়া ডাকিয়া উহাদিগকে বিনম্র করিতে—আবেগে নত করিয়া দিতে। একাধিক সূত্রে এমনও শুনিয়াছি যে, তাহারই প্রভাবে অনেকের উদ্ধত অঙ্গ-আস্ফালন সংযত হইয়াছে—বিবাদের অবসান ঘটিয়াছে! শুনিয়া শুনিয়া আমরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছি,—বুঝিয়াছিলাম, সে সংসারে থাকিয়াও 'সংসারী' বনিতে পারে নাই। বৃদ্ধ পিতা দৃষ্টিশক্তিহীন—পীড়িত। উপযুক্ত পুত্র নিজেই পিতার পরিচর্যা করিয়া থাকে। জননীর সেবা তাহার নিত্যকর্মের অঙ্গ। ভ্রাতা-ভগিনীদের সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান তাহারই সস্নেহ অভিভাবকত্বে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ তাহার পরিবার-সীমাই তো অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত—তাহার দেশের সকল মেয়ে-পুরুষই উহার অন্তর্গত। অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ,—তাই ছাত্র-ছাত্রীরাও তাহার নিজের পরিবারের বাহিরে নহে। অথচ শান্ত-শিষ্ট চেহারার এই 'ডকটরেট্'-ভূষিত তরুণ অধ্যাপকটি কী আশ্চর্য রকম বিনয়ী ও মৃদুভাষী! আচার আচরণে সর্বৈব বৈষ্ণব-লক্ষণ—'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরোরপি সহিষ্ণু', 'অমানী মানদ'। এক কথায় তাহাকে দেখিয়াছিলাম, একজন খাঁটি মানুষ—প্রকৃত ধার্মিক পুরুষ। তাই দেখিয়া প্রাণ জুড়াইয়াছিল। মনুষ্য-সমাজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি ফিরাইতে নূতন প্রেরণা বোধ করিয়াছিলাম।

*

মানব সমাজ যখন ক্রমবর্ধমান অমানুষের তাণ্ডবে সদা সন্ত্রস্ত, তখন. অতি স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দৃষ্টি খুঁজিয়া ফিরিতেছে—কোথাও একজন 'মানুষ' পাওয়া যায় কিনা। ধর্মের নাম লইয়া অধর্মের মত্ততা যখন মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিতেছে, তখন প্রাণ চাহিতেছে, যথার্থ ধর্মের রূপ কাহারও চরিত্রে আজিও ব্যক্ত দেখা যায় কিনা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে। এইরূপ তৃষিত দৃষ্টি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে—বিপুল জনারণ্যের মাঝে কদাচিৎ দুই-একজন মানুষের দেখা এখনও পাওয়া যায়, ধর্মপ্রাণ লোকও চোখে পড়িয়া যায়। তখনই মনে একটি সান্ত্বনা ও আশা জাগে, ভারতবর্ষ এখনও তবে আপন বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দেয় নাই,—বিশ্বাসকে বর্জন করে নাই,—নিত্য সত্যের প্রতি তাহার নিষ্ঠাকে অদ্যাবধি নিঃশেষে হারাইয়া ফেলে নাই। সংখ্যায়

নগণ্য হইলেও, মানুষের অস্তিত্ব তথা ধর্মের প্রকাশ সমাজে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নহে, ইহাই মস্ত ভরসার কথা। সংখ্যার বিপুলতাই সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হইতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র দীপশিখা অন্ধকার-বিভ্রান্ত সহস্র লোককে নীরবে পথের নিশানা বাতলাইতে পারে। আবার উন্মত্ত সহস্র কণ্ঠের আকাশভেদী আওয়াজ দুর্বিষহ কোলাহল সৃষ্টি করিয়া পথের ভ্রান্তিকে আরও বৃদ্ধি করে মাত্র। চক্ষু-ঝলসানো বিজলি-চমক গভীরতর অন্ধকারই সৃষ্টি করে,—দৃষ্টিকে শুধু ব্যাহতই করে।

*

মনুষ্যত্বের চরম দুর্যোগের দিনে—যখন ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দুশ্চেষ্টা সমাজ-দেহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে,—দলবদ্ধ দাম্ভিকতা ও ক্ষুধিত জিঘাংসার গর্জন যখন সমাজের সকল দিক দুরন্তভাবে মাতাইয়া তুলিয়াছে, তখন কোথাও ঐরূপ এক-আধটি দীপ-শলাকা দৃষ্টিগোচর হইলেও কিঞ্চিৎ ভরসা বোধ হয় বৈ কি! সমাজের সর্বস্তরে ঘনায়মান প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে—যখন ধর্ম, নীতি ও মনুষ্যত্ব ধূলায় লুটাইতেছে, তখন দেশের আনাচে কানাচে এমন দুই-চারিটি দৃষ্টান্তও আমাদিগকে ধৈর্যে অবিচল থাকিতে প্রভূত প্রেরণা দিয়া থাকে। সেই গ্রাম্য অশিক্ষিত বালক বাসুদেবকে এবং আধুনিক উচ্চশিক্ষিত শহরের তরুণটিকে খুঁজিলে এখনও মিলিতে পারে। আমাদের গ্রামে-নগরে, তীর্থে দেবালয়ে বা বিশ্ববিদ্যাগৃহে এখনও ইহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ এই 'মানুষ' 'মানুষ' বলিয়াই ডাকিয়া ফিরিয়াছেন—তাঁহার সেই ডাক আজিও আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অতি দীন-দরিদ্র অসংস্কৃত গ্রাম্য পরিবেশেও 'মানুষ' খুঁজিয়া বাহির করিতে তিনি কতই না উদ্দীপনা যোগাইয়াছেন! প্রিয় গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দকে লিখিয়া পাঠাইলেন:

"যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী ও পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম 'ধর্ম',—জটিল দার্শনিকতত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখো। আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood (মনুষ্যত্ব) এবং দয়া! 'স ঈশঃ অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপঃ'—তবে 'প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে'। এই স্থলে বলা উচিত—'সঃ প্রত্যক্ষ এব সর্বেষাং প্রেমরূপঃ'—তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান।"

সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব করার—প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজকেই যোগী নিজ কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমরা যেগুলিকে 'প্রকৃতির নিয়মাবলী' বলি, সেগুলি তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় তিনি ঐ-সব অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি আন্তর ও বাহ্য সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করিবেন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ—শুধু এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহাপুরুষ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

(শ্রীজগৎনাথ বসু রায়কে লিখিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং।

Ramakrishna Mission
Belur Math P. O., Howrah Dist.
Dated, 26 Nov 1929.

শ্রীমান জগৎনাথ

তোমার ২৪।১১ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। লিখিতে আমার হাত কাঁপে তাই নিজে লিখিতে পারি না।

মন স্থির [করিবার উপায়—] কেবল তাঁর কাছে কাতরে প্রার্থনা আর নাম জপ। ইহা করিতে ২ তাঁর দয়া হয় [,] দয়া হইলে সব সহজেই হইবে। ধ্যানের সময় ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিও [।] ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে যে তিনিই তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর তোমার অন্তরাত্মা তোমার চৈতন্য। পরম কারুণিক ঈশ্বর অবতার তিনিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অহৈতুকী কৃপাময় জীবের কল্যাণের জন্য মানবরূপে অবতার হইয়াছেন [।] এই ভাব দৃঢ়রূপে ধারণা করিবে তাহা হইলেই মন স্থির হইবে আনন্দ পাইবে শান্তি হইবে। আমি হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করি তোমার উহাই হউক।

আমার শরীর ভাল নয়। আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিও বাড়ীতেও জানাইও। হৃদয়ে কখনও হতাশ ভাব আসিতে দিও না সর্ব্বদাই আশাপূর্ণ হইয়া থাকিবে। জানিবে [,] আমার নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তাঁর সন্তানের কাছে তাঁর নাম পাইয়াছি [,] আমার নিশ্চয়ই হইবে।

ইতি
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

৫

গান্ধীজীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐতিহাসিক কালমধ্যে অবতাররূপে স্বীকৃত পুরুষদের সমতুল। তাঁর কথাবার্তা, বক্তৃতা, রচনা ইত্যাদির মধ্য থেকে যা পেয়েছি তদনুযায়ী বলতে পারি, একালে ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই তিনি প্রধান-পুরুষ বলে বিবেচনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গে গান্ধীজীর মনে প্রশ্ন ও প্রতিরোধ ছিল—যা একেবারেই ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। নিজ জীবনের মৌল সত্য-গুলির পরম প্রকাশ তিনি রামকৃষ্ণ-জীবনে দর্শন করেছেন; যেমন ব্রহ্মচর্য-ধারণা, সর্বজনীন ধর্ম-বোধ, অহিংসা, ত্যাগ, সত্যাশ্রয়।

শ্রীরামকৃষ্ণই এই যুগে অর্থ-প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রবলতম যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজীকে অনুবর্তী পেয়েছেন। গান্ধী-রচনা-বলীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাদি উল্লেখ এই বিষয়েই। এলাহাবাদের মুইর কলেজের 'ইকনমিক সোসাইটি'তে ২২ ডিসেম্বর, ১৯১৬, গান্ধীজী একটি বক্তৃতা করেন, বিষয়: "অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে কি যথার্থ প্রগতির সংঘর্ষ ঘটে?" গান্ধীজী বলেন, তিনি ধরে নিচ্ছেন, এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রগতি বলতে সীমাহারা ঐহিক অগ্রগতি এবং যথার্থ প্রগতি বলতে নৈতিক অগ্রগতি বোঝাচ্ছে। গান্ধীজীর বক্তব্য, ঐহিক উন্নতির সমমাত্রায় নৈতিক উন্নতি না ঘটলে তাকে যথার্থ প্রগতি বলা যায় না। প্রাচীন রোম, মিশর এবং মহাভারতে যদুবংশের পতন ঘটেছিল উভয় উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না বলে। "এক্ষেত্রে আমি বলতে ইচ্ছা করি [গান্ধীজী বলেছিলেন] অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক আধুনিক গ্রন্থের তুলনায় পৃথিবীর শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধিক দৃঢ় ও নিরাপদ রচনা।" গান্ধীজী যীশুখ্রীষ্টের সুপরিচিত কতক-গুলি নীতিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেন: যীশু ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিক, যিনি নিত্য-বস্তুর কথা বলেছিলেন; যিনি বলেছিলেন, ছুঁচের গর্ত দিয়ে একটা উট গলে গেলেও যেতে পারে, কিন্তু ধনী ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না ঈশ্বরের রাজ্যে। যীশুর শিষ্যরা আপত্তি তুলে তাঁকে বলেন, কিন্তু প্রয়োজন-পরিমাণে অর্থ না হলে চলবে কি করে? যীশু সেই আপত্তি সত্বেও নিত্যজীবন গ্রহণ করতেই বলেছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রেও অনুরূপ বহু কথা আছে, একথা বলার পরে গান্ধীজী বলেন:

"আমাদের সামনে যে-প্রশ্ন উপস্থিত সে সম্বন্ধে বোধ হয় সবচেয়ে ইতিবাচক দৃঢ়তম সাক্ষ্য মিলবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যদের জীবন থেকে। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবীর, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ—এঁরা সহস্র-সহস্র মানুষের জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তাদের চরিত্র গঠন করে দিয়েছেন। তাঁদের [মহাপুরুষদের] সেই যাপিত জীবনের ফলে পৃথিবীর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ওঁরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন।"

বক্তৃতার শেষে ছাত্রদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর-পর্বের মধ্যে গান্ধীজী বলেন:

"কোন মানুষের সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক সম্পদ-পরিমাণ কী হতে পারে—তার উত্তরে আমি যীশু ও রামকৃষ্ণের ভাষায় বলব—'কিছুই নয়'।"[১]

১ The Complete Works of Mahatma Gandhi (Publication Division), Vol. 13, p. 314.

বোম্বাই-এর ঘাটকোপার অঞ্চলে ডাকাতির বৃদ্ধি ঘটায় সে-বিষয়ে গান্ধীজীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি 'নবজীবন' পত্রিকায় ২৯. ৬. ১৯২৪, লেখেন, টাকা থাকলেই ডাকাতি হয়, নিঃস্বের উপরে ডাকাতি হয় না। অর্থনৈতিক অসাম্য ডাকাতির কারণ। যদি সকলে একই প্রকার অর্থের অধিকারী হয়, ডাকাতি হবে না। ডাকাতদের কর্মসংস্থান করা, ডাকাতির অনৌচিত্য তাদের বোঝানো প্রয়োজন। পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। গান্ধীজী মনের সংস্কারের উপর জোর দেন। যাঁরা ঐপ্রকার মনের সংস্কারের মূল্যকে অগ্রাহ্য করতে চান তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন :

"আধুনিককালে এই ধরনের সংস্কার ঘটিয়েছেন এমন সংস্কারকের দৃষ্টান্ত আছে। সহজানন্দ [(১৭৮১-১৮৩০), স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা], চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও অন্যরা বৃহৎ আকারে এ-কাজ করেছেন। তাঁদের কাজ স্থায়ী হয়নি। তা ডাকাতির ইতি করতে পারেনি—একথা বলে আমরা যেন তাঁদের সংস্কারকার্য সম্বন্ধে বিদ্রূপ না করি।"[২]

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন—তার দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিষয়ে তাঁর যে-ধারণা গঠিত হয়েছিল তা অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত রামকৃষ্ণ জীবনীর ভূমিকায় (১২. ১২. ১৯২৪) সুস্পষ্ট সুনির্বাচিত শব্দে সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশ করেছেন :

"রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনকাহিনী ধর্মকে বাস্তবে রূপায়ণের কাহিনী। তাঁর জীবন ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমাদের সাহায্য করে। তাঁর জীবনকথা পড়লে একথা অনুভব না করে কেউ পারবেন না যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আর সবই অনিত্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন সদ্গুণের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর উপদেশগুলি নিছক পণ্ডিতের উক্তি নয়—জীবনগ্রন্থেরই পৃষ্ঠা সেগুলি। সেগুলি তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিরই প্রকাশ। সেজন্য পাঠকচিত্তকে তা অনিবার্যভাবে অধিকার করে। এই সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ জীবন্ত জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী—যারা হয়তো আধ্যাত্মিক আলোক না পেয়েই জীবন কাটাত—তাদের কাছে রামকৃষ্ণের জীবন পরম সান্ত্বনার বিষয়। সে জীবন অহিংসার আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রেম সীমাহীন, ভৌগোলিক বা অন্যবিধ বন্ধনকে তা স্বীকার করেনি। তাঁর জীবনীর পৃষ্ঠাগুলি যাঁরা পড়বেন তাঁদের কাছে তাঁর দিব্য প্রেম যেন প্রেরণার উৎস হয়।"[৩]

অহিংসা—গান্ধীজীর জীবনের সাধ্য ও সাধনা। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অহিংসার পূর্ণ আদর্শ-রূপ স্বীকার করে তিনি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাই জানিয়েছিলেন। এবং এক্ষেত্রে কিছু সন্দিগ্ধ অত্যুৎসাহীদের কটাক্ষ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্যাদারক্ষায় অগ্রসরও হয়েছেন। অন্যত্র যেমন দেখা যায় এখানেও তাই—গান্ধী-অনুগামীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধিকতর গান্ধী। তাঁদেরই একজন (কে. এস. কারনাথ) গান্ধীজীর কথায় আপত্তি করেন এই বলে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আহারের ব্যাপারে পুরো অহিংস ছিলেন না, (তিনি মৎস্যাদি আহার করতেন), সুতরাং কিভাবে তিনি অহিংসার আদর্শ হন? গান্ধীজী ১৯. ১২. ১৯২৭, উত্তরে লেখেন :

"রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তোমার সংবাদ

২ *Gandhi Works*, Vol. 24, pp. 316-19.
৩ *Gandhi Works*, Vol. 25, p. 428.

সত্ত্বেও তাঁকে অহিংসার প্রতিমূর্তি না বলা ভুল হবে। ঐ (অহিংসা) ধর্মে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং নিজের সর্বোচ্চ ধারণামতো তার অনুসরণ করেছেন। তিনি এমন কিছু করেছিলেন—যথা, খাদ্যের ব্যাপারে তাঁর চারিপাশে প্রচলিত রীতির বাইরে যাবার চেষ্টা করেননি—যা আমাদের পূর্ণতর অভিজ্ঞতাযুক্ত অহিংসার আদর্শের দৃষ্টিতে আজ অপ্রীতিকর মনে হয়—তার দ্বারা কিন্তু তাঁর গুণমহিমা হ্রাস পায় না। ভাবীকালে হয়তো রান্না-করা খাদ্য গ্রহণ অহিংসার আদর্শবিরোধী বলে মনে হবে—তথাপি বর্তমানের অহিংসার অথরিটিরা রান্না-করা খাদ্য ভোজনের অসঙ্গতি আবিষ্কার করতে পারেননি বলে নিন্দা-লক্ষ্য হতে পারেন না। কোন মানুষের পক্ষেই পুরো অহিংসার আদর্শ পালন করা সম্ভব নয়। শরীর ধারণ করলেই কিছু না কিছু অপরিহার্য হিংসা স্বীকার করতেই হয়।"[৪]

এর বিপরীত চিত্রও আছে। কেউ কেউ (যথা, প্রেমবেন কণ্টক) গান্ধীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্ভবতঃ বলেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধপুরুষ হিসাবে ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ তুলনামুখে গান্ধীজীর কোন-কোন ভ্রান্তির ইঙ্গিত করেছিলেন। গান্ধীজী তাঁকে ৭.৫.১৯৩২, সবিনয়ে লেখেন:

"রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তা সত্য হওয়া খুবই সম্ভব। আমি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কোন স্তরে উঠেছি, একথা নিজের সম্বন্ধে ধারণা করি না। সেইজন্য আমি ভুলের পর ভুল করে যাই। কিন্তু সেগুলি নির্দোষ ভুল বলে এ-যাবৎ কোন ক্ষতি করেনি।"[৫]

সত্য ও অহিংসা ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শকেও গান্ধীজী নিজ আদর্শ করেছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের গোড়ার দিকে আলোচনা করতে আসেন বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমন—তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী ডাঃ রহম্। শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধর্মমতসমূহের সংঘাতের কথা তোলেন—কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গিতে বোঝা গিয়েছিল তিনি তার জন্য দায়ী করেন খ্রীষ্টধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মমতগুলিকে। গান্ধীজী প্রচণ্ড উত্তর দেন। তিনি বলেন, সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারে খ্রীষ্টানরাই। কিন্তু তাঁরা তা করবেন না। তাঁরা চান, সবাই খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে ফেলুক। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টের মত বিকৃত করেছেন। রোম সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টধর্ম সাম্রাজ্যবাদীদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে বোম্বাইয়ে ধর্মমহাসভা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে গান্ধীজী বললেন:

"সেদিন বোম্বাইয়ে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। যথার্থ ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের পথে প্রধান বাধা হল—পরস্পরের ধর্মাদর্শকে সমস্তরের বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি এবং অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে অনিচ্ছা। ব্যাপারটা 'ধর্ম-মহাসভা'—তা কতকগুলি ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাবেশ নয়

৪ *Gandhi Works*, Vol. 35, p. 394.

৫ *Gandhi Works*, Vol. 49, pp. 405-6.

গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিকে প্রামাণ্য উক্তি হিসাবে উদ্ধৃত করতেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার ৮. ১২. ১৯২৭ সংখ্যায় তিনি এক পত্রলেখকের দীর্ঘ ক্ষুব্ধ পত্রের বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। কোন এক স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে গীতা পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করলে জনৈক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অধিকারী-ভেদের প্রশ্ন তোলেন। তাঁর

—একথা ভুললে চলবে না। খ্রীষ্টধর্ম কি অপরের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে ধর্মমহাসভায় প্রবেশ করে? যখন খোলাখুলি পারে না তখনও গোপনে তারা আমাদের বহু দেবতা সম্বন্ধে নিন্দা করে—ভুলে যায় যে, তাদেরও অনেক দেবতা আছে।"৬

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় বৃহৎ আকারে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজীর প্রতিনিধিরূপে আসেন কাকা কালেলকর। তিনি একদিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভিক ভাষণের মধ্যে তিনি বলেন:

"ভারতের অধ্যাত্মজগতের মহাকায় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে এখানে আমরা সমবেত হয়েছি। কোনও বুদ্ধিপথে নয়, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সমূহের দ্বারা তিনিই আমাদের কাছে প্রমাণ করেছেন—সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মই সমভাবে গ্রহণযোগ্য, সকল ধর্মই সমভাবে আমাদের উন্নীত করতে সমর্থ। সেইজন্য ধর্মমহাসভা শ্রীরামকৃষ্ণের নামে আহূত হওয়াই উচিত। প্রথম ধর্মমহাসভা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় আহূত হয়—তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সুবিখ্যাত শিষ্য যান ভারতের প্রতিনিধিরূপে। আর আজ সেই ধর্মমহাসভা ভারতে ঘটছে—শ্রীরামকৃষ্ণের নামে।"

কাকা কালেলকর গান্ধীজীর একটি চিঠি সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন। তার অংশ এই:

"ধর্মমহাসভায় তুমি যাচ্ছ। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নামের সঙ্গে এর যোগ। আশা করি, এই সভা এমন কিছু করবে যা সকল ধর্মমতের মানুষের কাছে লক্ষ্য ও তার পথ নির্দেশ করবে। বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে এই ধর্মমহাসভায় বক্তব্য কী—আমরা যেরকম ভাবি তদনুযায়ী সকল ধর্মমত কি সমান? কিংবা সত্যের পুরো মালিকানাযুক্ত

বক্তব্য, ঐসব অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকেরা গীতার মতো ধর্মশাস্ত্র পাঠের অধিকারী নয়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের এই ধর্মধ্বজিতায় বিরক্ত পত্রলেখক শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করে বালকের ধর্মজীবন যাপনের অধিকারের পক্ষে যুক্তিবিস্তার করেন। গান্ধীজী ঐ "দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ পত্র", যাতে "রামকৃষ্ণ পরমহংসের কতকগুলি যথাযোগ্য উক্তি সংকলিত ছিল", এমনই পছন্দ করেছিলেন যে, তার থেকে ৫টি উক্তি অনেকখানি স্থান নিয়ে পুনরুদ্ধৃত করেন, এবং তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণে বাল্যবয়সে ধর্মজীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করেন। ব্যাখ্যাসহ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন সেগুলি হল:

বালকেরা অনুচ্ছিষ্ট ফল, তাই দেবতার ভোগে লাগার যোগ্য;

বালকদের আমি ভালবাসি, কারণ তাদের ১৬ আনা মন নিজেদের আয়ত্তে আছে। বিবাহিত হলেই ৮ আনা মন নিয়ে নেয় পত্নী, ছেলে হলে সে নিয়ে নেয় ৪ আনা, বাকি চার আনা পিতামাতা, পার্থিব মান যশ, পোশাক-আসাকে যায়। বালকেরা তাই সহজে ঈশ্বরকে জানতে পারে, প্রাচীনরা পারে না;

দুধে ছটাকভর জল মেশালে তাকে মেরে দেওয়া সহজ, কিন্তু তিন পোয়া জল মেরে ক্ষীর করা সহজ নয়। ছোটদের মনে ছটাক জল, আর বুড়োদের মনে তিন পোয়া জলের ভেজাল;

কাঁচা বাঁশকে নোয়ানো সহজ, পাকা বাঁশকে নয়;

বুড়ো তোতাকে পড়ানো যায় না, পড়াতে হলে ছোট তোতাকে পড়ানো ভালো; বুড়ো তোতার গলা মোটা হয়ে গেলে বোল ফোটে না;

মানুষের মন সরষের পুঁটুলি; পুঁটুলির কাপড় পুরনো হয়ে গেলে সরষে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের ফিরে জড় করা যায় না। তেমনি বুড়োদের মন। অন্যদিকে ছোটদের মনের নতুন কাপড়ে সরষে বাঁধা থাকে, ছড়ায় না। [Gandhi Works, Vol, 35, pp. 366-67]

৬ *Gandhi Works*, Vol, 62, p. 388.

কোন এক বিশেষ ধর্মমত আছে, এবং অন্য ধর্মগুলি হয় মিথ্যা, না হয় সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—যেমন অনেকে ভেবে থাকেন? এই ধরনের ব্যাপারে ধর্মমহাসভার মতামত আমাদের কাছে যোগ্য পথপ্রদর্শক হতে পারবে।"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের প্রতি এক্ষেত্রে গান্ধীজীর আনুগত্যের কথা আগেই জেনেছি। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ আদর্শেরই প্রচারক।

গান্ধীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বোচ্চ স্তরের ধর্মপুরুষ মনে করেছিলেন তার আরও প্রমাণ আছে। কিরবি পেজকে লেখা এক চিঠিতে (১৭. ১০. ১৯৩৭) গান্ধীজী সি. এফ. এণ্ড্রুজের গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস, মানবিকতা, পবিত্রতা, সরলতা ইত্যাদির প্রভৃত প্রশংসার পরে বলেছিলেন, "এণ্ড্রুজ হাড়ে-মজ্জায় খ্রীষ্টান, কিন্তু তাঁর খ্রীষ্ট কোন সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ট নন। তিনি তাঁর খ্রীষ্টকে অপর মতের রামকৃষ্ণ, চৈতন্য বা অন্য অনেক আচার্যের মধ্যে দর্শন করেন।"[৮]

গান্ধীজী, বিভিন্ন ধর্মাচার্যদের উল্লেখ করার সময়ে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা বারেবারেই বলেছেন। সন্দেহ নেই এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের নাম করার সময়ে বিবেকানন্দের মধ্যস্থিত রামকৃষ্ণকেই স্মরণ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে বক্তৃতাকালে (ইয়ং ইণ্ডিয়ায় বিবরণ ১৩. ১. ১৯২৭) তিনি বলেছিলেন, "অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো করে যদি দেশবন্ধুর শক্তি রাজনীতি গ্রাস করে না ফেলত—ভারতের পরাধীনতার জন্যই যা অবশ্য ঘটেছিল—তাহলে তিনি নিশ্চয় ধর্মসংস্কারে এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন।" স্বামীজীর 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি দেশবন্ধুর মতো গান্ধীজীও গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা জানি। এই বক্তৃতাতে তিনি, যে-বাংলা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সহ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে, পবিত্র হয়েছে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে—তার সৌভাগ্যের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন।[৯]

সত্যই কি জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?—গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করেছিলেন বাংলার কোন পত্রলেখক, কারণ গান্ধীজী এক লেখায় বলেন—যুবকদের মধ্যে 'জীবন্ত ঈশ্বরে' বিশ্বাস নেই। যুবক পত্রলেখক বলেছিলেন, শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়, হয়তো ঋষিরা তাঁকে জেনেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানবে কি করে? গান্ধীজী উত্তরে বলেন, আচার্যরা ঈশ্বরলাভের যেসব পথনির্দেশ করে গেছেন, তাদের অবলম্বন না করে অবিশ্বাস করা অনুচিত। উপলব্ধিবান পুরুষদের সাক্ষ্যকে কিভাবে অগ্রাহ্য করা যাবে? কান বন্ধ করে রাখলে মধুরতম সঙ্গীতও তো অশ্রুত থাকে। "সৌভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ মানুষই জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তারা এ নিয়ে তর্ক করে না, করতে পারে না। তাদের কাছে 'উনি আছেনই'। পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রই কি বৃদ্ধানারীর গালগল্প? ঋষি, আচার্যদের সাক্ষ্য কি অগ্রাহ্য করতে হবে? চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, তুকারাম, দয়ানন্দ, রামদাস, নানক, কবীর, তুলসীদাসের সাক্ষ্যের কি কোন মূল্য নেই? রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, যাঁরা আধুনিক মানুষ, জীবিতকালে

৭ The Religions of the World, Vol. 1 (Ramakrishna Mission Institute of culture, Calcutta), (1938), pp. 122-23.

৮ *Gandhi Works*, Vol. 66, p. 250.

৯ **Gandhi Works, Vol. 32, p. 65.**

বৃহত্তম পুরুষ—তাঁদের কথাই বা কি?" [হরিজন, ১৩. ৬. ১৯৩৮][১০]

কর্মীদের নৈতিক চরিত্রের অবনতিতে আহত গান্ধীজী বলেছিলেন, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, দয়ানন্দ প্রভৃতি পুরুষদের প্রভাব তাঁদের বুদ্ধিশক্তির জন্য নয়, তাঁদের থেকে অনেক বুদ্ধিমান জন্মেছেন—এঁদের প্রভাব নৈতিক শক্তির কারণেই। [হরিজনবন্ধু, ২০. ১২. ১৯৩৬][১১] হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে উদ্যোগী গান্ধীজী যখন অন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলির দাবি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন বাংলা ভাষাকে তার নিজস্ব মূল্য দান অবশ্যই করেছিলেন, কারণ "সে ভাষা চৈতন্য, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের।" [হরিজন ৩. ৪. ১৯৩৭][১২] রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জনগণের মানুষ—একথা বলেছিলেন যখন এক গ্রামকর্মী যুবক গ্রামের শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে তাঁর কাছে কর্মত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুবকের বিশেষ অভিযোগ ছিল—গ্রামে বড় মানুষদের সাক্ষাৎ মেলে না—সুতরাং বড় মনের সংস্পর্শ থেকে গ্রাম বঞ্চিত হয়। গান্ধীজী সান্ত্বনা দিয়ে লেখেন: "বৃহৎ ও মহৎ মনের অধিকারী মানুষদের সান্নিধ্য মেলে তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে—চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, তুলসীদাস, কবীর, নানক, দাদু, তুকারাম, তিরুবল্লুবর ও অনুরূপ মহান অজস্র পুণ্যবান অধ্যাত্মপুরুষরা যা দান করেছেন।…ঋষিরা জনগণের জন্যই লিখেছেন, কথা বলেছেন।" [হরিজন, ২০. ২. ১৯৩৭]।[১৩]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একটি স্মরণীয় উল্লেখ গান্ধীজীর রচনায়—৬ মে, ১৯৩৩ তারিখের হরিজন পত্রিকায়—*His Will be Done!* ভারতীয় ইতিহাসের এক সংকটলগ্নে এটি তিনি লেখেন। হিন্দুসমাজে স্থায়ী বিচ্ছেদ আনবার জন্য ঘোষিত হয়েছিল ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ড—তার প্রতিবাদে গান্ধীজী আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মারাত্মক সিদ্ধান্তের কথা শুনে সমস্ত দেশে ব্যথার্ত নিষেধের ধ্বনি উঠেছিল, কিন্তু গান্ধীজী অবিচল থাকেন। সেই ক্রান্তিকালে তিনি যেসব মৃত্যুঞ্জয় পুরুষদের স্মরণ করেছিলেন তাঁরা হলেন রামকৃষ্ণ ও দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ ও রামতীর্থ। গান্ধীজীর মূল রচনাই এখানে উদ্ধৃত করা উচিত:

"…I therefore feel confident that in the end these kindest friends will recognise the correctness of the action I am about to take. And this whether I die or live, God's ways are inscrutable. And who knows that He may not want my death during the fast to be more fruitful of beneficial results than my life? Surely it is highly depressing to think that a man's ability to serve dies with the dissolution of the body which for the moment he is inhabiting. Who doubts that the spirits of Ramakrishna and Dayananda, Vivekananda and Ramathirth are to-day working in our midst? It may be that they are more potent to-day than

১০ *Gandhi Works*, Vol. 63, p. 58.
১১ *Ibid*, Vol. 64, p. 155.
১২ *Ibid*, Vol. 65, p. 20.
১৩ Ibid, Vol. 64, p. 387.

when they were in our midst in the flesh !"[১৪]

স্বামীজীর গ্রন্থ স্বয়ং তিনি পড়েছেন, বা অপরকে তা পড়তে সাহায্য করেছেন, এমন উল্লেখ গান্ধীজীর লেখায় ইতস্ততঃ মেলে। তিনি আত্মজীবনীতে বলেছেন, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর রাজযোগ তিনি পড়েছিলেন।[১৫] পরেও তিনি বইটি সযত্নে পড়েছেন। ১৯২৩, ২৮ সেপ্টেম্বরের "জেল ডায়েরিতে" লিখেছেন, "আজ বিবেকানন্দের রাজযোগ পড়া শেষ করলাম।"[১৬] ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের একাধিক চিঠিতে, তিনি অপরের পাঠানো স্বামীজীর বই পেয়েছেন, এবং অপরকে স্বামীজীর বই পাঠিয়ে দিয়েছেন, এমন উল্লেখ করেছেন। পরাচুর শাস্ত্রীকে—স্বামীজীর বই, নিবেদিতার বই, টলস্টয়ের রচনা, ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "পরাচুর শাস্ত্রী [আমাদের] আশ্রমে একবার ছিলেন। বিরাট পণ্ডিত। এখন সদ্য জেলে গেছেন। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। তাই দ্রুত তাঁর কাছে বই পাঠাতে চাইছি। রোজ সুতো কাটেন। তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তবে তাঁকে চিঠি লিখতে পারি। তাঁর পত্নী বাইরে আছেন, কিন্তু রোগে শয্যাগত।"[১৭] গান্ধীজী পরাচুর শাস্ত্রীকে যেমন তেমনি মীরা বেনকে নিবেদিতার বই পড়তে বলেছেন। ২৫ ফেব্রুআরি, ১৯৩২, তিনি মীরা বেনকে লিখেছেন: "তোমাকে আমি সিস্টার নিবেদিতার বইগুলি পড়ার সুপারিশ করতে পারি। আর চাই, তুমি পড় দত্ত-কৃত রামায়ণ, মহাভারতের সংক্ষিপ্ত কাব্যানুবাদ, আরনল্ডের 'ইণ্ডিয়ান আইডিলস্', এবং 'পার্লস্ অব দি ফেথ্'।"[১৮]

[ক্রমশঃ]

১৪ Gandhi Works, Vol. 55, p. 121.
১৫ Ibid, Vol. 39, p. 211.
১৬ Ibid, Vol. 23, p. 185.
—রাজযোগ পড়ার উল্লেখ অন্যত্রও আছে: Vol. 25, p. 84.
১৭ Ibid, Vol. 50, pp. 180, 358.
১৮ Ibid, Vol. 49, p. 155.



কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণঃ আধুনিক মননে ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

কথামৃতে বলা হয়েছে সেই সকল আশ্চর্য আশ্চর্য কথা, যা শোনামাত্র প্রতীতী জন্মে—এ সত্য, এ ধ্রুব। বস্তুত যা সত্য, যা ধ্রুব তাকে চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না, কারও অসুবিধা হয় না। কারণ তা সোজা তীরের মতো মর্মে গিয়ে পৌঁছয়, আর তা যখন মধুরতার স্বাদ বয়ে আনে তখন তো সন্দেহের অবকাশই থাকে না। সে-সকল কথা কিভাবে ভক্তদের অন্তরের অনুভূতির দরজা খুলে দিত মাস্টার মশায় তাও লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। একদিনের বর্ণনা—"আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর-প্রেম ভক্ত-মুখ-দর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য, আনন্দ কেবল ভক্ত-মুখ-দর্পণে কেন, বাহিরে উদ্যানে, বৃক্ষপত্রে, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগিরথী বক্ষে, রবিকর-দীপ্ত নীল নভোমণ্ডলে মুরারি-চরণ-চ্যুত গঙ্গা-বারিকণাগ্রাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য, সত্য সত্যই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'।" হৃদয় মধ্যে যে সত্য উপস্থিত তাকে তো অস্বীকার করা যায় না, তা যখন উপস্থিত হয় সব সংশয় ছিন্ন করে দেয়। তাই সত্যের উদ্ভাসে বিস্ময়াহত, রোমাঞ্চিত শ্রীম যথাসাধ্য তাকে লিপিবদ্ধ করছেন—"দেখিতেছি দ্যুলোক ভূলোক সকলই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে।...সকলই যেন এক বস্তুতে নির্মিত মনে হইতেছে। যে জিনিসে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এরাও বোধ হয় সেই জিনিসে তৈরী। যেন একটি মোমের বাগান, গাছপালা, ফল, লতাপাতা, সব মোমের।" আশ্চর্য, রামকৃষ্ণের ব্রহ্মানুভূতি—"জগৎ ব্রহ্মময়"—সঞ্চারিত হয়েছে ভক্ত-হৃদয় মধ্যে, কি প্রচণ্ড শক্তি রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে বিচ্ছুরিত হত—এ তারই প্রমাণ।

রামকৃষ্ণ যে এক আনন্দময় অমৃতময় পুরুষ তা মাস্টার মশায় বারবার তুলে ধরেছেন। প্রথম দর্শনের অল্প পরেই নিজের কথা বলছেন—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁর চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি এবং তাঁহার অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন।" আর এক জায়গায় বলছেন—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দ-মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে বিজয়, বলরাম প্রভৃতি ভক্তগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।" এ-কথাগুলি কথামৃতের আজকের পাঠকের মনকেও অনুরঞ্জিত করে তোলে।

মাস্টার মশায় বর্ণনা প্রসঙ্গে আধুনিক মনের প্রশ্নটিও উপস্থাপিত করেছেন—"এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সকল গভীরতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন?" তাঁর অপার বিস্ময় সত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষ করছেন কি অনন্ত জ্ঞানরাশি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সমুদ্ভূত। প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করবেন কি করে? অবাক বিস্ময়ে তাই বলছেন—"তাঁহার (নিজের) বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে।" মহাবিস্ময়ের সঙ্গে তিনি এও প্রত্যক্ষ করেছেন যে রামকৃষ্ণ শুধু জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠই নন, ভক্তি-প্রেমেরও মূর্ত বিগ্রহ। তাই আবার বলছেন—"অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে

রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণকীর্তন করছেন।" মাস্টার মশায় প্রত্যক্ষ করেছেন অবাক বিস্ময়ে সম্মুখে যিনি তিনি একই সঙ্গে 'অনন্তজ্ঞান', 'অনন্ত প্রেম', 'অনন্ত আনন্দধাম'।—সকলই প্রত্যক্ষ, সুতরাং তর্কাতীত। এই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের তুলনাহীন বর্ণনাটি—"এমন একজনের জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহার একই দেহের মধ্যে শঙ্করের দৃপ্ত বুদ্ধি এবং চৈতন্যের উদার হৃদয় একত্রিত হইবে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একই মনোভাবকে, একই ভগবানকে যিনি কাজ করিতে দেখিবেন, যিনি সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন, যিনি গরীবের জন্য, দুর্বলের জন্য, নির্যাতিতের জন্য, ভারতের ভিতরে এবং ভারতের বাহিরে জগতের সকলের জন্য কাঁদিবেন, সেই সঙ্গে যাঁহার দৃপ্ত সুমহান বুদ্ধি এমন সকল সুমহৎ চিন্তার জন্ম দিবে, যাহা কেবল ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও সকল বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবে।…সময় ঘনাইয়াছিল, এইরূপ একটি মানুষের জন্ম একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ একজন মানুষের পদতলে বসিবার সৌভাগ্য আমি করিয়াছিলাম। ভারতীয় ঋষিদের অমর কীর্তি উপনিষদ্গুলির ভাবের মূর্ত প্রকাশ, আধুনিক কালের মহর্ষি,…মূর্তিমান সঙ্গতি তিনি আসিয়াছিলেন।"

এরকম একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের লৌকিক ও দিব্য সকল বিচিত্র দিকই মাস্টার মশায় অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করে যেমনটি দেখেছেন তেমনি মূর্ত করে তুলেছেন। সবগুলি বৈচিত্র্যের সমাহারে রামকৃষ্ণ একটি অতি মনোহর ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ এক রসিক চূড়ামণি। তার বহু চিত্রে কথামৃত সমৃদ্ধ। তার মধ্যে একটি মাস্টার মশায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, চিত্রটি রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের এ দিকটি সুন্দর উদ্ঘাটন করেছে। প্রথম দর্শনের অল্প পরেই একদিন মাস্টার মশায় উপস্থিত হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চ-হাস্য করে বললেন—"ঐ রে আবার এসেছে!" মাস্টার মশায় লিখছেন—"তিনি (মাস্টার মশায়) আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতে-ছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন—'দ্যাখ্, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর দিন ঠিক চারটার সময় উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!' (সকলের হাস্য)।…হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল মজাদার রসিক পুরুষই নন, তিনি অসামান্য সঙ্গীতরসিক এবং সুমধুর গায়ক। শ্রীশ্রীমা এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"আহা! তিনি কি গানই গাইতেন! যেন গানের উপর ভাসতেন!" সঙ্গীত তাঁর সর্বোচ্চ ধর্মানুভূতির সহায়। বহু চিত্র আমরা পাই যেখানে সঙ্গীত শুনতে শুনতে বা করতে করতে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও পরিশেষে তাঁকে সমাধি অবস্থায় উপনীত করেছে। সঙ্গীতপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণের এ চিত্রগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। একটি বর্ণনায় মাস্টার মশায় বলছেন—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ…সেই মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেছেন। সকলের বোধ হইতেছে যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।" আর রামকৃষ্ণের সঙ্গীতের ভাণ্ডার অফুরন্ত, কথামৃত লোকসঙ্গীতের ভক্তি-সঙ্গীতের এক বিরাট সংগ্রহ-শালা যা নিয়ে রীতিমত গবেষণা করা চলে।

রামকৃষ্ণের একদিকে যেমন এক মহান শিল্পী-সত্তা ও কোমলভাব, তাঁর অমেয় চরিত্রের অপর-দিকে তিনি অমিততেজা পুরুষ, যিনি প্রতিভার বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্রকেও মুখের উপর তিরস্কার করে বলতে পারেন—"এ্যাঃ তুমি তো ভারী ছ্যাচরা হে।"

সত্য সম্বন্ধে তিনি একেবারে বিগতভীঃ,—যা সত্য বলে জেনেছেন অকুতোভয়ে তা ব্যক্ত করেছেন, জগতের কে কোথায় নাসিকা কুঞ্চিত করবে—তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেননি এমন একজন বিদেশী অনুরাগীকে মুগ্ধ করেছিল,—তিনি Prof. Horrwitz। মূঢ় অজ্ঞানতার স্পর্ধাকে রামকৃষ্ণ প্রচণ্ড আঘাত করতে দ্বিধা করতেন না। মাস্টার মশায়ের দ্বিতীয় সাক্ষাতে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি যখন নিজ স্ত্রীকে 'অজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছিলেন, রামকৃষ্ণ কঠিন মন্তব্য করেন, 'আর তুমি জ্ঞানী?' মাস্টার মশায় লিখছেন—"এখন এই পর্যন্ত জানিতেন যে,লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, আর ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান।" আবার কোনও সঙ্কীর্ণতাকে তিনি বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করতেন না। নেপালী ভক্ত কাপ্তান যখন কেশবকে 'ভ্রষ্টাচার', 'স্বেচ্ছাচার' বলে অভিহিত করে ঠাকুরের কেশব সেনের নিকট যাওয়ায় আপত্তি জানান তিনি তাঁকে মহা বিরক্তির সঙ্গে বলেন—"তুমি লাট-সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে। তবে না তুমি বল 'ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ'—যিনি ঈশ্বর তিনি এইসব জীব জগৎ হয়েছেন!" তাঁর কাছে কোনও প্রশ্রয় ছিল না ধর্মের নামে লোক দেখানো ভাবের। এক ব্যক্তি প্রকাণ্ড সিঁদুর-ফোঁটা কপালে ধারণ করে তাঁর কাছে এলে তিনি পরিহাসচ্ছলে বলেন—"উনি তো মার্কামারা।" ধর্ম তাঁর কাছে বাইরের ব্যাপার নয়, অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশের ব্যাপার। তাঁর কথা—"যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু।" তেমনি তাঁর অসহ্য ছিল কপটতা। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে অপর ব্যক্তিকে বলেন—"উনি (রামকৃষ্ণ) যা বলছেন মেনে নেন না!" মহাবিরক্ত হয়ে রামকৃষ্ণ তীব্রভাবে বলেন,—"তুমি কি রকম লোক? কথায় বিশ্বাস না ক'রে মেনে নওয়া! কপটতা! তুমি ঢং কাচ দেখছি!" "মন মুখ এক না করলে ধর্ম হয় না"—এ তাঁরই উপদেশ।

কিন্তু তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান। প্রতাপচন্দ্র হাজরা পরিবারবর্গকে শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখে দক্ষিণেশ্বরে জপতপ নিয়ে থাকতেন। সে সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলছেন—"আমি বকলুম। দেখ দিকি ছেলেপিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও পাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে।" সংসারীর কর্তব্যে অবহেলাকে তিনি অন্যায় বলে মনে করেছেন। ঘটনাটি তাঁর চরিত্রের উপর প্রভূত আলোকসম্পাত করে। আর একজন গৃহী ভক্তকে তিনি সুস্পষ্ট বলেন—"তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ কি, ছেলেদের মানুষ করা;···তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জোগাড় করে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়। দয়া যার শরীরে নেই, সে মানুষই নয়।" এই শেষ কথাটি মহামূল্যবান, তাঁর চরিত্রের উপর, তাঁর প্রচারিত ধর্মের উপর প্রভূত আলোকসম্পাত করছে। তাঁর অতুলনীয় সহানুভূতির আর একটি চিত্র মাস্টার মশায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রামকৃষ্ণের সেবক ও ভাগ্নে হৃদয়রাম মন্দির-কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে বিতাড়িত হয়েছেন। তারপর একদিন দেখা করতে এসেছেন। মন্দিরের বাইরে এসে রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। মাস্টার মশায় লিখছেন—"হৃদয় হাত জোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতেছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কাঁদিতে-ছেন।" পরদুঃখে কাতর অশ্রুপরায়ণ রামকৃষ্ণের

আরও বহু চিত্র কথামৃতে পাওয়া যায়।

যাঁকে তিনি 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলতেন—সেই **dogmatism** থেকে সকলকে দূরে থাকতে উপদেশ দিতেন। তিনি বারবার বলেছেন—"মতুয়ার বুদ্ধি কোর না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এ হতে পারেন, আর এ হতে পারেন না। বলো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন।" আশ্চর্য কথা, তাঁর ধর্ম অসীম আকাশের মতো উদার ও সত্য। ঈশ্বর যদি অনন্ত হন, কি করে তাঁর ইতি করা যায়? মাস্টার মশায়ের রামকৃষ্ণের এই বিশ্বজনীন ধর্মের উপর মন্তব্য—"ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এক হয়; চারিবর্ণ এক হয়। ...ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়। তুমি সনাতনধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্তিমান করিলে। তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ। ...তুমি কেবল ছাখো—অন্তরে ভক্তি-ভালবাসা আছে কিনা। যদি তা থাকে, অমনি সে তোমার পরমাত্মীয়—হিন্দুর যদি ভক্তি থাকে অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে অমনি সেও তোমার আপনার লোক—খৃষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।"

জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট স্বপ্নবৎ নয়, তিনি দেখেছেন,—জীব-জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। মাস্টার মশায়ের বর্ণনায়—"শুনিলাম, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার লয় হইতেছে!—আনন্দসিন্ধুনীরে অনন্ত-লীলা-লহরী!" এখানে সৃষ্ট জগৎ ও জীবনের প্রতি রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক—ব্রহ্মময় জগৎ, নেতিবাচক নয়। এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে কথামৃতে। তাঁর কথা সর্বত্র বলিষ্ঠ। তেজোপূর্ণ আনন্দের কথা, নৈরাশ্যের কথা নয়।

একজন ব্যক্তির পরিচয় যেমন মেলে তার বেশে বাসে ও পরিবেশের মধ্যে এমন আর কিছুর মধ্যেই নয়। নিবেদিতা তাঁর গৃহসজ্জাটিকে অনুপম বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলে বলেছেন—"একটি ক্ষুদ্র তেলের প্রদীপের আলোয় বিছানার উপর পবিত্র আচ্ছাদনটি...শয্যার পাশে সেই চৌকিটি, একটি কোণে একটি বড় জালা, দেওয়ালে ঠাকুর দেবতার কয়েকটি ছবি, আর কিছু নেই।" অনুরূপ বর্ণনা কথামৃতেরও নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি মন্তব্য অমূল্য,—"অকিঞ্চনের এত রূপ আর দেখিনি।" অকিঞ্চনের রূপ ত্যাগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বর্ণনাটি পড়লেই আমাদের মনে রামকৃষ্ণের 'ত্যাগীশ্বর' রূপটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মাস্টার মশায় রামকৃষ্ণের পরিচ্ছদ বর্ণনা করেছেন, সবুজ বনাতের কোট আর লাল পেড়ে ধুতি—এসবই আমাদের সুপরিচিত। একটি তুচ্ছ কথা এখানে বাঙ্ময় হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ মাস্টার মশায়কে দুটি মার্কিনের জামা এনে দিতে বলছেন—যা আমাদের দেশে তখনকার স্বল্পমূল্যের দিনেও সর্বাপেক্ষা দরিদ্রেরাই ব্যবহার করতেন।

পরিবেশ বর্ণনায় মাস্টার মশায় নিবেদিতার মতোই কাব্যময়। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিব্য সুষমার মধ্যে অভিব্যক্ত রামকৃষ্ণের বাণীর সত্যতা—একটি অতুলনীয় বর্ণনায় মাস্টার মশায় তাঁর এই অনুভূতি তুলে ধরেছেন—"বিমল চন্দ্রকিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ী হাসিতেছে, আর একদিকে ভাগিরথীবক্ষে সুপ্ত শিশুর বক্ষের ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। জোয়ার পূর্ণ হইয়া আসিল। আরতির শব্দ গঙ্গার স্নিগ্ধোজ্জ্বল

প্রবাহসম্ভূত কলকলনাদ সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছিল।... আরতি হইতেছে, তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে রোশনচৌকির সুমধুর নিনাদ শুনা যাইতেছে।...আনন্দময়ীর নিত্য-উৎসব —যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কেহ নিরানন্দ হইও না—ঐহিকের সুখ-দুঃখ আছেই; থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন, আমাদের মা আছেন! আনন্দ কর।" এখানে দিব্যানন্দময় পরিবেশটি মূর্ত ও বাঙ্ময়। রামকৃষ্ণের কথাগুলি যেন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আপনি পরিস্ফুট।

আমরা কথামৃতে রামকৃষ্ণের অমেয় চরিত্রের নানা বিচিত্র দিক এতক্ষণ দেখলাম। এর মধ্য দিয়ে তাঁর সর্বোত্তম দিকটি উদ্‌ঘাটিত। সেটি একটি অতুলনীয় বর্ণনায় মাস্টার মশায় উদ্‌ঘাটন করেছেন—"ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকে আপন মনে বিচরণ করিতেছেন। আত্মারাম! সিংহ একলা থাকতে এবং বেড়াতে ভালবাসে। অনপেক্ষ!" বনে যেমন সিংহরাজ, রামকৃষ্ণ তেমনি মনুষ্যলোকে আপন বিরাটত্বে একাকী। 'আত্মারাম', 'অনপেক্ষ' কথাগুলি গভীর অর্থবহ, রামকৃষ্ণের বিরাট স্বরাট, তেজোময়, চৈতন্যময় দিব্যরূপটি এখানে চিত্রিত। আরও দুটি অপূর্ব চিত্রণে মাস্টার মশায় তাঁকে "(ঈশ্বরের) সচল প্রতিমা", "সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম" বলে অভিহিত করেছেন। স্বামীজীও তাঁকে 'সর্বধর্মস্বরূপিণে' বলে বন্দনা করেছেন।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে তিনি 'মানবতার প্রতিনিধি।' সে রূপটিও কথামৃতের ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত। যে পরম দেবতাকে একদা নানা রূপে-অরূপে তিনি উপাসনা করেছিলেন—তিনিই শেষে এক বিরাটের রূপ নিলেন, যিনি সকলের পায়ে চলেন, সকলের হাতে কাজ করেন। সে বিরাট দেবতা মানুষ। "মাটির বিগ্রহে ভগবানের উপাসনা হয়, আর মানুষের জীবন্ত দেহে হয় না"—বলেছেন রামকৃষ্ণ কথামৃতে। তাঁর 'জীবই শিব' এই মহান বাণী সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন—অনেক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষকে ভুলে গিয়েছিল বলে, মানুষও ঈশ্বরকে, ধর্মকে ভুলেছিল, রামকৃষ্ণের মহান ঐক্য দৃষ্টিতে জীবই শিব, অতএব রামকৃষ্ণ পুনরায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, ধর্মের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করলেন। সমাজ-তাত্ত্বিক দিক থেকে এ বাণী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, এর মধ্যে রয়েছে এক নূতন পৃথিবী সংগঠনের ইঙ্গিত। প্রতি মানুষে যদি একই শিব থাকেন, সকলেরই একই অধিকার থাকবে, অর্থাৎ কোনও প্রকার ভেদবৈষম্য স্বীকার করে নেওয়া চলে না। অর্থাৎ সমাজকে, রাষ্ট্রকে হতে হবে সাম্যভিত্তিক। রামকৃষ্ণ শুধু এ কথাই বলেননি যে, 'খালিপেটে ধর্ম হয় না', তিনি এদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, অমৃতত্বে সমান অধিকারের কথাও বলে গিয়েছেন। কথামৃত এ সব কথাই ধারণ করে আছে। কথামৃতে 'মানবতার প্রতিনিধি' রামকৃষ্ণের বিশ্বম্ভর মূর্তিটি দর্শন করে আজও আমরা ধন্য হই।

ঋণ-স্বীকৃতি

১) Charles Townes—The confluence of Science And Religion.

২) Report on a Lecture by Dr. Wald at the Indian Statistical Institute—Statesman Nov 1979.

৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম' (১ম খণ্ড)

৪) নিবেদিতা লোকমাতা—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু (Kali The Mother-এর অন্তর্গত রামকৃষ্ণ বিষয়ক প্রবন্ধের অনুবাদ অংশ)

৫) Ramakrishna In the Eyes of Brahmo And Christian Admirers—প্রবন্ধত্রয়: (a) Hindu Saint—P. C. Mazumdar (b) Jiva Is Shiva—Romain Rolland
(c) Ramakrishna And Vivekananda—Ernest P Horrwitz.

৬) বিবেকানন্দ জীবনী—রোমাঁ রোলাঁ।—অনুবাদ ঋষি দাস—("মানবতার মহানগরী" শীর্ষক অধ্যায়)

অপুষ্ট শিশু : একটি গ্রামীণ সমস্যা

ডক্টর জয়শ্রী ব্যানার্জী

রিসার্চ ফেলো, বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউট অব মেডিকেল সায়ান্সেস্।

ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ জুড়ে রয়েছে শিশু ও বালক-বালিকা যাদের বয়ঃক্রম ১৫ বছরের নিচে। এর মধ্যে ১৯ শতাংশ শিশুর বয়স ৬ বছরের মধ্যে। পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশুর রোগ আক্রমণের ও অপুষ্টির সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি; কারণ ঐ সময়ের ভিতর একটি মানবশিশু সবচেয়ে দ্রুতহারে বৃদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে গ্রোথ টেম্পো (growth tempo) তার সর্বাধিক বিকাশ হয়। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যু ও জন্মহার দুইয়ের পরিমাণই বেশি। এক হাজার শিশুর মধ্যে গড়ে ১২৫টি শিশুর মৃত্যু হয় এবং এই মৃত্যুহার শহরাঞ্চলের থেকে পল্লীগ্রামে অনেক বেশি। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই শিশুমৃত্যুর সরাসরি কারণ হিসাবে ডায়ারিয়া (Diarrhoea) বা ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ (Upper Respiratory Tract Infections) বলে ধরা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপুষ্টিজনিত দুর্বলতাই মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে পারগণিত হয়।

ভারতবর্ষের ৮০ শতাংশ লোক গ্রামবাসী। যদিও গ্রামগুলির আয়তন ও গ্রামবাসীদের জীবনমানের ভিতর প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তবুও যেসব গ্রামে অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা দিনমজুরী, সেইসব গ্রামের জীবনধারায় পরস্পর অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। আড়াপাঁচও পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগনা জেলায় এইরকমই একটি গ্রাম, যেখানকার ৯০ শতাংশ অধিবাসী ভূমিহীন চাষী।

কলকাতা শহর থেকে আড়াপাঁচ গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ৩১ কিঃ মিঃ। সোনারপুর জংশন থেকে ৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে অবস্থিত এই গ্রামখানি। ঐ অঞ্চলে গ্রামখানির খ্যাতি সেখানকার পল্লীদেবতা পঞ্চাননঠাকুরের মাহাত্ম্যে। দূর-দূরাঞ্চল থেকেও নরনারী এসে তাদের মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চাননতলায় মানত করে।

গ্রামটির বাসিন্দা বেশিরভাগই স্থানীয় লোক। খুব অল্পসংখ্যক লোক (সর্বসাকুল্যে ৫-৬টি পরিবার) বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। বাসস্থান বলতে মাটির বাড়ি, খড়ের চাল দিয়ে ছাওয়া। বাড়িগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো। এঁদের প্রধান উপজীবিকা দিনমজুরী। জনপ্রতি বাৎসরিক আয় গড়ে ২৫০ টাকারও কম। প্রায় ৯৬ শতাংশ মা অশিক্ষিতা। সব মিলিয়ে ১১৬টি বাড়িতে প্রায় ৭৬৮ জন লোক বসবাস করেন। এর মধ্যে ১১৬টি শিশুর বয়স ৫ বছরের ভিতর।

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ এই গ্রামে একটি শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে ১-৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সকালের জলখাবার (মুড়ি ও বাদাম) এবং দ্বিপ্রহরে বিভিন্ন রকমের তরকারি ও শাক সহযোগে খিচুড়ি সরবরাহ করা হয়। সপ্তাহের সাতদিনই এই কেন্দ্র খোলা থাকে। প্রত্যেক শিশুকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। তাছাড়া সামান্য কিছু লেখাপড়া, ব্রতচারী ইত্যাদিও শেখানো হয়। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে সপ্তাহে দুইদিন একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল গিয়ে অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা করেন ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

১৯৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দের এক সমীক্ষায় দেখা

যায় যে, এই ধরনের জনকল্যাণমূলক সেবাকার্য চালিয়েও সুস্থ সবল শিশুর সংখ্যা আশানুরূপ হয়ে ওঠেনি। প্রায় ৬৩ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। দারিদ্র্য তো নিশ্চয় এর একটি কারণ, তবে মূল কারণ হচ্ছে গ্রামের মায়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।

প্রসঙ্গক্রমে একটি শিশু যে অপুষ্ট তা কিভাবে নির্ণয় করা হয় একটু জানিয়ে দেওয়া দরকার। একটি অপুষ্ট শিশুকে দেখলে সাধারণভাবে তার মধ্যে কোন শারীরিক বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে না। কারণ পুষ্টির অভাবজনিত রোগগুলি সাধারণতঃ একেবারে শেষ অবস্থায় চোখে পড়ে এবং তখন সেই রোগাক্রান্ত শিশুকে বাঁচানো একটি দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক ক্ষেত্রে একটি শিশু অপুষ্ট কিনা তা তার বয়স অনুযায়ী ওজন দেখলে ধরা পড়ে। এই ওজনের তারতম্য অনুসারে শিশুর অপুষ্টতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগ অনুসারে অনায়াসেই নির্ধারণ করা যায় একটি শিশু অপুষ্টির কোন্ স্তরে এসে পৌঁছেছে। অপুষ্টির তৃতীয় অবস্থা-প্রাপ্ত শিশুকে (অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে Grade III malnutrition বলা হয়) শারীরিক দিক থেকে বিপজ্জনক শিশু বা 'high risk child' বলা হয়ে থাকে।

আড়াপাঁচ গ্রামে প্রায় ১৩ শতাংশ শিশু বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। অভিজ্ঞ শিশু-চিকিৎসক দ্বারা এদের পরীক্ষা করিয়ে দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ শিশুই ডায়ারিয়া (Diarrhoea), ফুসফুস-সংক্রান্ত রোগ (Upper Respiratory Tract Infections) বা যক্ষ্মা (Tuberculosis) রোগে আক্রান্ত। চূড়ান্ত অপুষ্টিজনিত দুর্বলতাই এই রোগগুলিকে শিশুর দেহে বাসা বাঁধতে সাহায্য করেছে।

যে সমস্ত শিশু এইরূপ অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, এই সমস্ত শিশুরা সামান্য পরিমাণে পান্তাভাত খেয়ে শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে আসে। ঐ কেন্দ্রে তারা খাবার পায়। পূর্বে উল্লিখিত খাদ্য সেখানে খেয়ে তারপর বাড়ি ফিরে যায়। বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ১-২ বছর বয়স্ক শিশুরা কেবলমাত্র মায়ের দুধ এবং ২ বছরের বেশি বয়সের শিশুরা সামান্য তরকারিসহ পান্তা-ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে। ১-৫ বছর বয়স্ক শিশুদের প্রয়োজন ১২০০-১৫০০ ক্যালোরি (খাদ্যগুণের পরিমাপকে Calorie বলে) খাদ্য। সেক্ষেত্রে শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে প্রায় ৬০০ ক্যালোরি মতো খাবার দেওয়া হয় অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনের অর্ধাংশ। বাকী অর্ধেক নিজ নিজ বাড়িতে পাবার কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিশুরা বাড়িতে যে পরিমাণ খাদ্য পেয়ে থাকে, তার খাদ্যগুণ অর্থাৎ ক্যালোরি অতি যৎসামান্য। এর ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। এখানে একটি উদাহরণসহ সত্যিকারের ছবিটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রামের এইরকম একটি শিশু, নাম—মীনা মণ্ডল, বয়স—৩ বছর, অপুষ্টি-জনিত দুর্বলতার যে চরম পরিণতি সেই রোগে ভুগছিল। রোগটির ইংরেজী নাম—Kwa-shiorkor। এই রোগে রোগীর হাত, পা, মুখ সমস্ত শরীর ফুলে যায়। বাড়ি গিয়ে দেখা গেল তাদের গৃহসংলগ্ন একফালি জমিতে পেঁপে ও কাঁচকলা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের শাকও হয়েছে। ভাতের সঙ্গে মেখে শিশুকে পেঁপে-সেদ্ধ, কাঁচকলাসেদ্ধ, শাকসেদ্ধ ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয় কিনা জিজ্ঞাসা করতেই তার মা আঁতকে উঠলেন। বললেন, ঐটুকু শিশুকে ঐ-সব খাবার দিলে সে সহ্য করতে পারবে কেন? বিশেষ করে শাক তো একেবারেই চলবে না, পেট খারাপ হবে। ওঁকে জানালাম, ভাতের

মাড় না ফেলে দিয়ে দুর্বল শিশুকে খেতে দেওয়া চলে। মা জবাব দিলেন, ভাতের মাড় যে খেতে পারা যায় তা তাঁরা জানেন না। অথচ বাড়িতে যা আছে, যা রান্না হয় তা দিয়েই যদি একটু মনোযোগ সহকারে শিশুকে তাঁর মা খেতে দিতেন তবে তাকে এই সাংঘাতিক অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হতে হত না। মা যেসব খাদ্যকে বড়দের খাদ্য বলে মনে করছেন, তার থেকে কিছু কিছু খাদ্য প্রয়োজন অনুসারে শিশুকে দিলে যে প্রভূত উপকার হতে পারে আসলে সে-জ্ঞানটুকুই মায়ের নেই। তাছাড়া খাদ্যের থেকে খাদকের সংখ্যা বেশি হওয়াতে শিশুরা হচ্ছে বঞ্চিত। ঐ মায়ের সঙ্গে কথা বলে এও ধারণা হল যে, শিশু বড় হয়ে রোজগার না করা পর্যন্ত ঐ সংসারে তার অস্তিত্ব অনেকটা গৃহপালিত পশুর সমান। সংসারে শিশুদেরও যে একটা অধিকার আছে, এরাই যে একদিন বড় হয়ে সংসারের দায়িত্ব বহন করবে এবং পরিবারের সর্বপ্রধান দায়িত্ব যে শিশুর লালনপালন, সেকথা অভিভাবকদের মাথায় একেবারেই নেই। এই ধরনের দায়িত্বহীনতা বা অশিক্ষার ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, পরিবারভর্তি কতকগুলি রুগ্ন শিশু। অথচ এই সমস্যার সমাধান কষ্টসাধ্য হলেও একেবারে অসাধ্য নয়। গ্রামীণ পরিবেশে ন্যূনতম ব্যয়ে জন্ম থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত একটি শিশুর খাদ্যতালিকা নিম্নে দেওয়া হল। শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই একটি সুষম খাদ্যতালিকা কিরকম হতে পারে, মাত্র তাই এখানে বলা হয়েছে।

মায়ের বুকের দুধ ১ বছর পর্যন্ত বাচ্ছাকে অনায়াসে খাওয়ানো চলে, তারপর আস্তে আস্তে ছাগল বা গরুর দুধ দেওয়া যেতে পারে। মাতৃদুধের সঙ্গে নিম্নলিখিত খাদ্য যুক্ত থাকা উচিত :

৩ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত—দিনে দুবার, অর্থাৎ, সকাল ও সন্ধ্যায় সুজি।

অল্প সুজি শুকনো কড়াইয়ে ভেজে দুধ অভাবে জল দিয়ে ফুটিয়ে পায়েসের মতো হলে তাতে আখের গুড় ও পাকা কলা মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করা চলে।

মুখেভাতের পর ৫ বছর পর্যন্ত নিম্নলিখিত খাদ্য শিশুর চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণ বৃদ্ধি করে করে দিতে হবে :

সুজি সকাল বিকাল যেমন চলছে চলবে।

দুপুরে ও রাত্রে—ভাত, ডাল, কাঁচকলা, পেঁপে, আলু প্রভৃতি যেগুলি গ্রামে হয়, এবং শাক একসঙ্গে সেদ্ধ করে খুব অল্প তেলে সম্বরা করে নিয়ে একটু নুন দিয়ে মেখে বাচ্ছাকে দিতে হবে। যদি কারুর পক্ষে মাছ দেওয়া সম্ভব হয় তবে এর সঙ্গে অল্প মাছ সেদ্ধ দিতে পারলে ভাল।

বিকল্পে

তরকারি সহযোগে খিচুড়ি করে দেওয়া যেতে পারে। খিচুড়ি করতে হলে দুভাগ চাল ও একভাগ ডাল দিতে হবে।

দাঁত ওঠার পর মুড়ি চিঁড়ে ইত্যাদি খেতে পারে। ঘরে গরু থাকলে বা দুধ জোগাড় করতে পারলে দুপুরে ঘরের পাতা দই দিলে ভাল হয়।

ভক্ত কবি ভন্

ডক্টর যোগীরাজ বসু

[মাঘ, ১৩৭০ সংখ্যার পর]

ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের পাঠকমাত্রের ভন্ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কথা মনে পড়বে। ভনের দেড়শ বছর পরে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ জন্মেছিলেন; ভনের শৈশবের অমরত্ব, প্রকৃতিনিষ্ঠ মরমিয়াতত্ত্ব (Nature—Mysticism) প্রভৃতির গভীর প্রভাব পড়েছিল ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উপর; এই জন্য তাঁকে ভনের সাহিত্যিক বংশধর (literary child) বলা হয়।

শুধু কবিতাতেই যে ভন্ ভক্তিতত্ত্ব ও মরমিয়া-তত্ত্ব কীর্তন করেছেন তা নয়, বাস্তবজীবনেও তিনি ভক্তিমার্গে অতি উর্ধ্বস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। সাধকের মতো কঠোরতায় তিনি জীবন কাটিয়েছেন,—বিষয়বাসনার মদিরা বর্জন করে ভক্তিরস পানে কৃতার্থ হয়েছেন। চিরমঙ্গলময় প্রাণ-প্রিয়তমকে পাবার জন্য তীব্র আকুতি তাঁর প্রতি কবিতায় সুব্যক্ত। একটি পদ্যে তিনি তাঁর মূল লক্ষ্য এভাবে ব্যক্ত করেছেন,—

'.. all my course, my aim and my love
And chief acquaintance be above.'

'আমার গন্তব্যপথ, আমার লক্ষ্য, আমার প্রেম ও আমার মুখ্য পরিচয় সবই ঈশ্বরমুখী।'

পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলনের জন্য জীবের চিরন্তন আকুতির, পরমপ্রিয় পরমেশের প্রতি ভক্তের তীব্র অনুরাগের বর্ণনা ভন্ ভক্তিরসাপ্লুত গম্ভীর উচ্ছ্বাসময় ভাষায় করেছেন। এই বর্ণনা বুদ্ধিপ্রসূত নয়,—কবির আত্মোপলব্ধিপ্রসূত, অনুভবসিদ্ধ। প্রকৃত ভক্তের মতো কবি ভগবানের সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতেন; ভাবসমাহিত অবস্থায় সময় সময় উজ্জ্বল বিজলীছটার মতো ঐশী সত্তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হত। তাঁর এই মরমিয়া অনুভূতির বর্ণনা এত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষনিষ্ঠ যে পাঠক স্বভাবতঃ এর সত্যতা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। বৈষ্ণবধর্মের কান্তভাব বা মধুরভাবও তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় বৈষ্ণব কবিদের মতো তিনিও নিজেকে প্রেমিকা ও পরমেশ্বরকে প্রেমিকরূপে কল্পনা করেছেন। তিনি ভগবানকে ঈপ্সিতদয়িত (Bridegroom) ও নিজেকে তাঁর বধূ (Bride) রূপে বর্ণনা করেছেন। 'The Dawning' নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতার প্রথম চরণেই কবির প্রিয়তমের দর্শন জন্য তীব্র আবেগ মর্মস্পর্শী সুরে ব্যঞ্জিত হয়েছে,—

'Oh! What time will Thou come?
When shall that cry
The Bridegroom is coming! fill the sky?'

"হে প্রিয়তম কখন তুমি আসবে? 'বর (প্রেমিক) আসছেন' এই ঘোষণা কখন সমস্ত নভোমণ্ডলকে মুখরিত করে তুলবে?"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য—ভগবানকে প্রিয়তম পতি ও নিজেকে কান্তা বা পত্নীরূপে বর্ণনা বহুকাব্যে আমরা পাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধুরভাব বা কান্তভাব সর্বজনবিদিত। মহাপ্রভুর উক্তি,—'কান্তভাব সর্বসাধ্যসার।' বল্লভাচার্য প্রবর্তিত পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণবধর্মে এই কান্তভাবকে প্রধান ভাব বলা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে পুষ্টিমার্গের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাইবেলেও ঈশ্বরকে বর বা পতিরূপে ও ভক্তকে বধূরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পারস্যের মরমিয়া সুফী কাব্যে বিপরীত কান্তভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে। সুফী

মরমিয়া কবিগণ ঈশ্বরকে প্রেমিকা এবং ভক্তকে প্রেমিকরূপে বর্ণনা করেছেন। এই কান্তভাব বৈষ্ণব কান্তভাবের বা পাশ্চাত্যের সেন্ট টেরেসা প্রভৃতি মরমিয়া সাধিকাদের, সাধকদের ও ভন্, ক্র্যাশ' প্রমুখ মরমিয়া কবিদের কান্তভাবের বিপরীত। সূফী ও বৈষ্ণব প্রভৃতি গোষ্ঠীর কান্তভাবে সাধনের মর্মকথা একই; কেবল সূফীদের মতে সেই এক প্রেমিকা কান্তার জন্য সকল ভক্ত, সকল পুরুষ অধীর, আর সূফী ছাড়া অন্যদের মতে সেই এক পরমপ্রিয় প্রাণপতির জন্য সকল কান্তা বা ভক্ত অধীর, মিলনের জন্য ব্যাকুল। রবীন্দ্রকাব্যে আমরা দুটি ভাবই পাই। অধিকাংশস্থলে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে প্রিয়তম-পুরুষরূপেই বর্ণনা করেছেন; মাত্র কয়েকস্থানে 'বিদেশিনী' ইত্যাদি সম্বোধনে পরমপ্রিয়া পরম-কান্তার রূপও ফুটে উঠেছে।

'The Dwelling Place' শীর্ষক একটি ছোট কবিতায় ভগবানের নিবাস কোথায়—এই নিয়ে ভন্ স্বীয় ভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রথমে ভগবানের নিবাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত তুলে শেষে নিজের অনুভূতির বর্ণনা করেছেন। পদ্যটির মর্ম এই-রূপ,—হে প্রভু! মানুষের অজ্ঞাত অপূর্বসুন্দর কোন সবুজবাগান বা অপরূপ পর্বতে কি তোমার নিবাস? অথবা মেঘমণ্ডল বিরচিত কোন বস্ত্রাবাসে দ্যুলোকে তুমি বিরাজ কর? অমর-পুরীর নন্দনকানন কি তোমার লীলা-নিকেতন? আমি জানি না দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষে বা ভূলোকে কোথায় তোমার নিলয়। এরপর কবিতার শেষ চারটি চরণে অনবদ্য ভাষায় এ বিষয়ে কবি তাঁর অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন,—

'But I am sure Thou dost now come
Oft to a narrow homely room,
Where Thou too hast, but the least part,
My God, I mean my sinful heart.'

'প্রভু! কোথায় তুমি থাক আমি জানি না, কিন্তু একটি সঙ্কীর্ণ অতি সাধারণ ঘরের কথা আমি জানি যেখানে তুমি প্রায়ই আস কিন্তু সে ঘর তোমার যোগ্য নয়। সে কক্ষটি বড়ই ছোট ও অন্ধকার, সে ঘর হচ্ছে আমার নিজের কালিমাভরা হৃদয়কন্দর।' এই কবিতাটির শেষ চরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবভক্ত কবির বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে একটি উক্তি স্বতই স্মৃতিতে জাগে,—

'মম মানসে ঘনান্ধতামসে নন্দনন্দন! কথং ন লীয়সে।'

বালকৃষ্ণ মাখন চুরি করায় যশোদা তাঁকে ধরতে যাওয়ায় কৃষ্ণ পালাচ্ছেন, কিন্তু দিনের আলোয় কোথায় পালাবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এই চিত্র মনে তুলে ধরে ভক্ত কবি প্রাণবল্লভ নন্দনন্দনকে সম্বোধন করে বলছেন,— 'তুমি শিগ্‌গির আমার কালিমাময় অন্ধকার হৃদয়ে লুকিয়ে পড়।' প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত ভন্ এই সত্য অনুভব করেছিলেন যে, ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের প্রকৃত নিবাস। ভক্তের হৃদয়ই তাঁর অধিষ্ঠান-বেদী, তাঁর প্রকৃত মন্দির। এক এক সময়ে, ভাবসমাহিত অবস্থায় কিভাবে তাঁর হৃদয়ে অসীম অনন্ত ঐশী সত্তা অনুভূত হত ভনের কয়েকটি কবিতায় তার স্বাক্ষর রয়েছে। এরূপ একটি মরমিয়া অনুভূতির বর্ণনা তাঁর 'The World' নামক কবিতায় আমরা পাই। কবিতাটির প্রথম স্তবকটি পাঠ করলেই পাঠকের চিত্তে সেই অনুভূতির সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে,—

'I saw Eternity the other night
Like a great ring of pure and endless light
All calm, as it was bright;

And round beneath it Time in hours,
days, years,
Like a vast shadow moved ;'

'সেদিন রাত্রে আমি পবিত্র ও অনন্ত জ্যোতির বিশাল আংটির (বৃত্তের) মতো অনন্তের দর্শন পেয়েছিলাম। সেই শান্ত জ্যোতির বলয় উজ্জ্বল-রূপে শোভা পাচ্ছিল ; সেই বিরাট জ্যোতিঃ বৃত্তের নিচে অখণ্ড মহাকাশ ঘণ্টা (প্রহর), দিন ও বৎসরের খণ্ডরূপ ধারণ করে বিশাল ছায়ার মতো আবর্তিত হচ্ছিল।'

'The other night' অর্থাৎ 'সেদিন রাত্রে' কথাটি এবং বর্ণনাশৈলী কবির মরমিয়া অনুভূতির সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। পাশ্চাত্যের মরমিয়া সাধক এবং কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'Ring of Eternity' বা অনন্তের আংটি নামে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাঁদের ধারণা মরমিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে অর্থাৎ প্রিয়তম ভগবানের সঙ্গে মিলন ঘটলে তখন তিনি সাধনা-সিদ্ধির পুরস্কারস্বরূপ এই মিলনের আংটি দান করেন। কোন কোন মরমিয়া কবি ও সাধক একে 'Ring omega' আখ্যাও দিয়েছেন ; omega অর্থাৎ শেষ, চরম। ভগবানের সঙ্গে মিলনের চরম পুরস্কারস্বরূপ আংটি। ভন্ মনে করেন, প্রেমিক ভগবানের সঙ্গে প্রেমিকার অর্থাৎ ভক্তের আধ্যাত্মিক বিবাহের প্রতীক এই আংটি। 'The World' কবিতার শেষ দুটি চরণে তিনি তাঁর এই বিশ্বাস রূপায়িত করেছেন,—

'This Ring the Bridegroom did for
none provide
But for his Bride.'

'আর কারো জন্য নয়,—তাঁর প্রেমিকার (ভক্তের) জন্যই প্রিয়তম পতি এই আংটি দান করেছেন।'

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মানুষের পাঞ্চভৌতিক দেহই ব্যবধান সৃষ্টি করে। অপূর্ণ সীমাবদ্ধ দেহ ও ইন্দ্রিয়রাজি প্রিয়তম ভগবানের অনন্তপ্রেম আস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করে। ছাকনীতে দোষ থাকলে যেমন সুস্বাদু নির্মল জলের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না তেমনই সীমাবদ্ধ দোষ-দুষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদির মাধ্যমেও ভগবানের বিমল প্রেমের প্রকৃত আস্বাদন সম্ভব নয়। তাই মিলনপিয়াসী প্রকৃত ভক্ত দেহকে বাধাস্বরূপ মনে করেন। প্রিয়তম ও ভক্তের মধ্যে যবনিকার মতো দেহ বাধা সৃষ্টি করে। তাই সকল দেশের ভক্ত দেহের বাধা অতিক্রম করার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন, কাতরভাবে প্রিয়তমের করুণা প্রার্থনা করেন। সূফী সাধকরাও এই জন্য তাঁদের ভাষায় দেহকে 'মিমের পরদা' আখ্যা দিয়েছেন। 'মিম্' মানে 'ম' অক্ষর। আরবী ভাষায় "আহদ্" মানে পরমেশ্বর এবং 'আহমদ্' মানে পয়গম্বর মহম্মদ। 'আহদ্' ও 'আহমদ্' শব্দ দুটির মধ্যে শুধু একটি 'ম' অক্ষরের ব্যবধান রয়েছে। 'আহমদের' অর্থাৎ ভক্ত নবীর 'ম' চলে গেলেই হবে 'আহদ্' অর্থাৎ ভগবান। ভক্তের তদ্রূপ দেহের পরদা ঘুচে গেলেই সে প্রিয়তমের সঙ্গে অভিন্ন হবে। প্রেমিক ভক্তপ্রবর ভন্‌ও দেহের ব্যবধান আর সহ্য করতে পারছেন না ; তিনি 'Cock Crowing' অনবদ্য পদ্যটিতে এই দেহের আবরণ ছিন্ন করার জন্য প্রাণপ্রভুর চরণে করুণ মিনতি জানাচ্ছেন,—

'This veil, I say, is all the cloak
And cloud that shadows Thee from me.
This veil Thy full-eyed love denies,
And only gleams and fractions spies.
O take it off ! Make no delay,
But brush me with Thy light.'

'অস্থি চর্মের এই দেহরূপ আবরণই আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে রেখেছে। এই

আবরণই তোমার পূর্ণপ্রেম আস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করছে, দেহ-যবনিকা ভেদ করে তোমার প্রেমের যেটুকু আস্বাদ আমার হৃদয়ে পৌঁছায় সে শুধু তোমার অনন্ত প্রেমের অংশ মাত্র। ওগো প্রিয়তম! আর বিলম্ব কোর না, এই আবরণ ঘুচিয়ে দাও; আমার সত্তা তোমার দিব্য আলোকে শোধিত কর।' ভনের বহু শতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ একই সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছেন,—

'এ আবরণ ছিন্ন হবে গো ছিন্ন হবে
এ জীবন ভূমানন্দময় হবে
এ জীবনে তোমারই নাথ জয় হবে।'

প্রকৃতিমরমিয়া তত্ত্ব (Nature—Mysticism), সৃষ্টির কোন পদার্থই তুচ্ছ নয়, সমস্ত বিশ্ব ভগবানের চিরসুন্দরের দূত, তাঁর প্রেমের লিপি এই রূপরসগন্ধময় প্রকৃতি ইত্যাদি ভনের ভক্তিকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ সবই রবীন্দ্র-কাব্যেও দৃষ্ট হয়। ছাত্রজীবনে ভনের কাব্য অনুশীলন করার সময় আমার বার বার রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কবিতাবলীর কথা স্মরণে জাগত এবং মনে হত রবীন্দ্রনাথের উপর ভনের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই। সেদিন তাঁকে ভনের প্রভাব সম্বন্ধে ঐ অনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভন্ আমার অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় কবি; তাঁর প্রভাব আমার লেখায় আছে।'

উপরের আলোচনা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ভন্ একজন উচ্চকোটির মরমিয়া সাধক ও ঐশী অনুভূতিসিদ্ধ ভক্ত কবি ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও প্রমাণিত হয় যে, ভক্তি ও মরমিয়া সাধনা, তথা আত্মোপলব্ধি দেশকালের শাসনের অতীত;—তার কোন ভৌগোলিক সীমা নেই; পৃথিবীর সকল দেশে সকলকালেই ভক্ত ও মরমিয়া কবি এবং সাধক আবির্ভূত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন।

একখানি চিত্র

ব্রহ্মচারিণী অজিতা
সুপরিচিতা কবি এবং লেখিকা।

শোভে শশী স্বচ্ছ নীলাকাশে, স্নিগ্ধ
শুভ্র সুধাধারা প্লাবিছে ধরণী,
সমীর বহিছে ধীরে,—ইষ্টমন্ত্র
জপি মৃদুস্বরে ধায় তরঙ্গিনী
বুঝি ইষ্টপদে মিলিতে সত্বরে।
নীরব গহন নিশা,—বিশ্বজন
সুপ্তি নিমগন। নহবত-শীর্ষে
শুধু জাগে একজন,—সার্থক
সে জাগরণ, বিশ্বে অতুলন।
স্থির নিষ্পন্দিত বরতনুখানি
নাহি বাহ্যজ্ঞানলেশ, আত্মলীন
আপনাতে আপনি মগন; হেরিয়া
স্বরূপ বুঝি ভাবেতে বিভোর
আজি জননী সারদা মোর।

—স্মরি' অপরূপ
সেই চিত্রখানি নমি নতশিরে
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী জননীরে
মোর—ধরেছেন দেহ যিনি
জীবহিততরে,—করুণা-পাথার।

'ওঁ নমঃ শিবায়'

(শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী-মন্ত্ররাজ-ভাষ্যানুবাদ)

স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্লোক ৯। ওঁ নমঃ শিবায়।

অথবা দাস এবাহমহং দাস ইতীরণম্।
ইত্যেব নম ইত্যুক্তং বেদৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ সর্বশঃ॥ ৯।

অন্বয় : অথবা (অথবা পক্ষান্তরে) দাস এব অহম্ (দাসই আমি) অহং দাসঃ (আমি দাস) ইতি (এইরূপ) ঈরণম্ (উক্ত হইয়াছে)। ইতি এব (ইহাই) নমঃ (নমঃ শব্দের অর্থ)। সর্বশঃ (সর্ব প্রকারে) বেদৈঃ (বেদসমূহ দ্বারা) শাস্ত্রৈঃ চ (এবং স্মৃতি আদি অন্য শাস্ত্রসমূহ দ্বারা) ইতি (এইরূপ অর্থই) উক্তম্ (বলা হইয়াছে)॥ ৯।

অনুবাদ : অথবা এই মন্ত্রে 'দাসই আমি' 'আমি তাঁর দাস'—এরূপ অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে।[১] ইহাই 'নমঃ' পদের অভিপ্রায়। বেদ ও শাস্ত্রসমূহ দ্বারা এরূপ অর্থই বর্ণিত হইয়াছে॥ ৯।

শ্লোক ১০। ওঁ নমঃ শিবায়।

অথবেদমিদং সর্বং ত্যজামি পরমাপ্তয়ে।
অর্থং ধর্মং চ কামং চ বাঞ্ছংশ্চ জগদীশ্বরম্॥ ১০।

অন্বয় : অথবা (অথবা) ইদম্ ইদম্ (এই যাহা কিছু) সর্বম্ (সব) পরম্ আপ্তয়ে (পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য) ত্যজামি (ত্যাগ করিতেছি)। অর্থং (অর্থ) ধর্মং (ধর্ম) কামং (কাম) জগদীশ্বরং চ (এবং জগদীশ্বরকে) বাঞ্ছন্ (প্রাপ্তির বাঞ্ছা করিয়াই) আমি সর্বপদার্থ ত্যাগ করিতেছি॥ ১০।

অনুবাদ : অথবা আমি ধর্ম,[২] অর্থ, কাম ও পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিবার জন্য, অথবা জগদীশ্বর ভাব প্রাপ্তির জন্য পরিদৃশ্যমান সর্ব পদার্থই পরিত্যাগ করিতেছি॥ ১০।

শ্লোক ১১। ওঁ নমঃ শিবায়।

এতন্মন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্বেদবেদান্ততৎপরৈঃ।
নির্ণীতং তত্ত্বগর্ভং যদ্ বিজ্ঞেয়ং মুক্তিলব্ধয়ে॥ ১১।

অন্বয় : মন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ (মন্ত্রার্থতত্ত্ববেত্তা) বেদবেদান্ততৎপরৈঃ (বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়নকারিগণ কর্তৃক) তত্ত্বগর্ভম্ (শাস্ত্র তাৎপর্যবোধক) যৎ (যে) এতৎ (এই) নির্ণীতম্ (সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হইয়াছে ;—তাহা) মুক্তিলব্ধয়ে (মুক্তিলাভের জন্য) বিজ্ঞেয়ম্ (জানিতে হইবে)॥ ১১।

অনুবাদ : বেদমন্ত্রার্থ[৩]-তত্ত্বজ্ঞ এবং বেদ-বেদান্ত অধ্যেতৃবর্গ শাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় এরূপই করিয়াছেন। মোক্ষলাভের জন্য তাহাই জানিতে হইবে॥ ১১।

টিপ্পনী :

১ 'আমি তাঁর দাস'—এইভাবে যে উপাসনা, তাহা মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে। উত্তম অধিকারী পরমাত্মাকে নিজের সহিত অভিন্নরূপেই জানিতে ইচ্ছা করেন।

২ ধর্ম, অর্থ ও কামের বাসনা পূর্তির জন্য এখানে সগুণোপাসনার কথা বলা হইল। পুনঃ জগদীশ্বর ভাব প্রাপ্তির উল্লেখ করাতে সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ নির্গুণোপাসনাও এখানে বিহিত হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে।

৩ মন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ম ও উপাসনা, এবং বেদান্তবিদ্‌গণ ব্রহ্মোপাসনার নির্ণয় করিয়াছেন। কর্ম ও উপাসনা চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতা উৎপাদন সহায়ে ক্রমশঃ, এবং ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ মুক্তির সাধন।

শ্লোক ১২।　　ওঁ নমঃ শিবায়।

অথবা মুক্তিলাভায় ধ্যেয়ং তত্ত্বং বিবেকতঃ।

ভিন্নং বুধ্বা হৃদা দেবং মন্ত্রেণেশং জগদ্গুরুম্ ॥ ১২।

অন্বয়ঃ অথবা (অথবা) মুক্তিলাভায় (মুক্তিলাভের জন্য) জগদ্গুরুম্ (জগতের গুরু) ঈশম্ (ঈশ্বর) দেবম্ (দেবকে) ভিন্নম্ (সর্ব উপাধি হইতে পৃথক্) বুধ্বা (জানিয়া) হৃদা (হৃদয়ে) মন্ত্রেণ (মন্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রদ্বারা) বিবেকতঃ (বিবেক-বিচার পূর্বক) তত্ত্বম্ (তত্ত্বটিকে) ধ্যেয়ম্ (ধ্যান করিতে হইবে)॥ ১২।

অনুবাদঃ অথবা মুক্তিলাভের জন্য জগদ্গুরু জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরকে শাস্ত্র সহায়ে বিচার পূর্বক সর্ব উপাধি হইতে পৃথক্ জানিয়া হৃদয়ে তত্ত্বের ধ্যান[১] করা কর্তব্য ॥ ১২।

পঞ্চম ব্যাখ্যা

শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী-ভাষ্য

শ্লোক ১৩।　　ওঁ নমঃ শিবায়।

নমেরচি নমঃ প্রোক্তো জন্তা স্যাজ্জগদীশ্বরে।

তস্মাদ্দাসোঽহমিত্যেবং মত্বা মাং প্রাপয়াত্মনি ॥১৩।

অন্বয়ঃ নমেঃ (নম ধাতু সহ) অচি (অচ্ প্রত্যয় যোগে) নমঃ (নমঃ পদ নিষ্পন্ন হয়) প্রোক্তঃ (এরূপ কথিত হইয়া থাকে)। জন্তা (জন্তা) স্যাৎ (হইতেছে) জগদীশ্বরে (জগদীশ্বরের নাম)। তস্মাৎ (সেই জন্য) অহং (আমি) দাসঃ (তোমার দাস) ইতি এবং (এই প্রকার) মত্বা (জানিয়া) মাম্ (আমাকে) আত্মনি (স্ব স্বরূপে) প্রাপয় (পৌঁছাইয়া দাও)॥ ১৩।

অনুবাদঃ 'নম্[২]' ধাতুসহ 'অচ্' প্রত্যয় যোগে নমঃ পদ নিষ্পন্ন হয়, এরূপ বলা হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের নাম জন্তা অর্থাৎ সর্বভোক্তা, সর্বসংহারক। সুতরাং আমাকে দাস জানিয়া স্ব স্বরূপভূত করিয়া লও ॥ ১৩।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা

শ্লোক ১৪।　　ওঁ নমঃ শিবায়।

অস্মিঞ্ছেতে জগৎ সর্বং তন্ময়ং শব্দগামি যৎ।

তদ্বানাচ্ছিব ইত্যুক্তং কারণং ব্রহ্ম-তৎপরাঃ ॥ ১৪।

অন্বয়ঃ সর্বম্ (সম্পূর্ণ) জগৎ (জগৎ) অস্মিন্ (ইহাতে) শেতে (শয়ন করিয়া থাকে)। যৎ (যাহা) শব্দগামি (শব্দের বিষয়) তন্ময়ম্ (তাহা তন্ময় অর্থাৎ প্রকৃতিময়)। তৎ (সেই অব্যক্ত প্রকৃতির) বানাৎ (প্রেরক বলিয়া) ব্রহ্ম-

---

টিপ্পনীঃ

১ এখানে উত্তম অধিকারীর কথা বলা হইতেছে। তিনি বিবেক সহায়ে আত্মতত্ত্বের ধ্যান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ চিত্তবৃত্তি প্রবাহ সম্পাদনে নিরন্তর সচেষ্ট থাকেন।

২ নমঃ শব্দের অর্থ প্রণাম কর্তা উপাসক, নমস্কারার্থক 'নম্' ধাতুসহ 'পচাদেরচ্' অনুযায়ী 'অচ্' প্রত্যয়যোগে 'নমঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ 'নমতীতি' অর্থাৎ প্রণামকর্তা উপাসক। আর জন্তা শব্দের অর্থ সর্বভোক্তা, সর্ব উপসংহার কর্তা, জগদীশ্বর, শিব। প্রণাম কর্তা আমি তোমার দাস, সুতরাং আমাকে স্বরূপ জ্ঞান প্রদানে কৃতার্থ কর। 'জমু অদনে' ধাতুসহ 'তৃচ্' প্রত্যয়যোগে 'জন্তা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উহার অর্থ সর্বভোক্তা, সর্বসংহারকর্তা। এই শব্দ জগদীশ্বর শিবের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ 'শিব' শব্দেরও অর্থ ঐরূপ। 'ইন্ শীভ্যাং বন্' সূত্রানুসারে 'শিব' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অর্থ—সর্ব পদার্থ ইহাতে শয়ন করে অর্থাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য তিনি শিব শম্ভু। সর্বসংহারকর্তা বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় 'শিব'। সম্বোধনে হে শিব! প্রণাম কর্তা আমি তোমার দাস। 'যাহার শ্রদ্ধা যেরূপ, সে তদ্রূপই হইয়া থাকে'—এই ভাবে আমাকে গ্রহণ করিয়া কৃপাপূর্বক আত্মস্বরূপজ্ঞান প্রদান করতঃ আমাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপই করিয়া লও ॥

তৎপরাঃ (হে ব্রহ্ম-তৎপর জনগণ) কারণং (কারণ ব্রহ্মকেই) শিব (শিব) ইতি (এইরূপ) উক্তম্ (বলা হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ।

অনুবাদ: প্রলয় কালে সমগ্র জগৎ প্রকৃতিতে শয়ন করে অর্থাৎ বিলীন হয়। বাণীর বিষয় সব কিছুই তন্ময় অর্থাৎ প্রকৃতিময় অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম[১]। সেই অব্যক্ত প্রকৃতির প্রেরক শিব। অতএব হে ব্রহ্ম-তৎপর মুমুক্ষু-গণ! সেই কারণ ব্রহ্মকেই শিব বলা হইয়া থাকে, এইরূপ জানিও ॥ ১৪ ।

শ্লোক ১৫ । ওঁ নমঃ শিবায়।

ন মা যস্যাস্তি লক্ষ্মীশ সোঽহং দেবো ন সংশয়ঃ ।
তস্মান্মে প্রাপয়েহৈব লক্ষ্মীং বিদ্যাং সনাতনীম্ ॥ ১৫ ।

অন্বয়ঃ হে দেব (হে দেব) লক্ষ্মীশ (লক্ষ্মীপতি) যস্য (যাহার) মা (লক্ষ্মী) ন অস্তি (নাই) অহং (আমি) সঃ (সেই লক্ষ্মীহীন) সংশয়ঃ (ইহাতে কোন সন্দেহ) ন (নাই), তস্মাৎ (সুতরাং) মে (আমাকে) সনাতনীম্ (সনাতনী) লক্ষ্মীম্ (লক্ষ্মীরূপিণী) বিদ্যাম্ (বিদ্যা) ইহ এব (এখানেই, এই শরীরেই) প্রাপয় (প্রাপ্তি করাও) ॥ ১৫ ।

অনুবাদ: হে দেব লক্ষ্মীপতি! আমি[২] লক্ষ্মীহীন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমাকে লক্ষ্মীরূপিণী সনাতনী অর্থাৎ ত্রিকালা-বাধিত আত্মস্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত করাও ॥ ১৫ ।

শ্লোক ১৬ । ওঁ নমঃ শিবায়।

যস্মাদানন্দরূপস্ত্বং দেবৈর্বেদৈর্নিগদ্যসে ।
তস্মান্মে দেহি যোগীশ ভদ্রং জ্ঞানং সুভাবনম্ ॥ ১৬ ।

অন্বয়: যস্মাৎ (যেহেতু) ত্বম্ (তুমি) দেবৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) বেদৈঃ চ (এবং বেদ-সমূহ দ্বারাও) আনন্দরূপঃ (আনন্দ স্বরূপ) নিগদ্যসে (বর্ণিত হইয়াছ) হে যোগীশ (হে যোগীশ!) তস্মাৎ (সেই হেতু) মে (আমাকে) সুভাবনম্ (স্বরূপাবগতিকারক) ভদ্রম্ (আত্মা-নন্দপ্রদ) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) দেহি (দাও) ॥ ১৬ ।

অনুবাদ: হে যোগীশ্বর শিব! দেবগণ ও বেদসমূহ তোমাকে আনন্দস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। অতএব আমাকে আত্মানন্দদায়ক[৩], স্ব স্বরূপাব-গতির কারণ, অপরোক্ষ আত্মাসাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞান প্রদান কর ॥ ১৬ । [ক্রমশঃ]

টিপ্পনী:

১ শব্দের বিষয় নাম রূপাত্মক সর্বপ্রপঞ্চই প্রকৃতির পরিণাম। কারণ-ব্রহ্মরূপে শিবই সেই প্রকৃতির পরিচালক। 'বা গতিবন্ধনয়োঃ' এই ধাতু হইতে 'বান' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তদ্‌বানাৎ' অর্থ—অব্যক্ত প্রকৃতিকে নামরূপে অভিব্যক্ত করেন বলিয়া তাঁহাকে শিব বলা হয়।

২ 'মা' শব্দ লক্ষ্মী বাচক। আমি লক্ষ্মীহীন, দরিদ্র। ('অহং দেবঃ' এইরূপ পাঠে) কিন্তু আমি এই দারিদ্র্য দূর করিতে ইচ্ছুক। অতএব আমি দেব। 'দিব্‌' ধাতুর অর্থ বিজিগীষা অর্থাৎ জয় করিবার ইচ্ছা। দারিদ্র্য অর্থাৎ অজ্ঞান। অজ্ঞানদারিদ্র্য দূর করিয়া আমি লক্ষ্মী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছি সুতরাং তুমি আমাকে এ জন্মেই বিদ্যারূপ ঐশ্বর্য প্রদান কর।

৩ 'ভদ্রং' অর্থাৎ স্বরূপানন্দের প্রকাশক। 'সুভাবনম্' অর্থাৎ স্বস্বরূপে স্থিতির প্রাপক। 'জ্ঞানম্' অর্থাৎ অজ্ঞান নিবৃত্তিকারী দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান।

ইহাই সর্ব মুমুক্ষুর একান্ত কাম্য বলিয়া ভক্ত তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন।

সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

স্বামী আত্মস্থানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সচিব।

৪ মার্চ ১৯৮৪, কলিকাতা থেকে প্রচারিত বেতার ভাষণ —আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য তার বুদ্ধি-বিবেচনা। মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব মেনে নিয়ে, যান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে কখনও পূর্ণতা বোধ করে না, তৃপ্তি পায় না, সাফল্যের আনন্দ অনুভব করে না। বস্তুতঃ জন্ম, শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য, জরা, মৃত্যু—আশা-নিরাশা, ভাঙা-গড়া, পাওয়া-না-পাওয়া, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, জানা-অজানা প্রভৃতির একটানা কুহেলিকাময় নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করাই তার চরম লক্ষ্য হয়ে দেখা দেয়। সমস্ত সৃষ্টিকে জড়িয়ে যে নিগূঢ় তত্ত্ব এবং অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে তাকেই সে পেতে চায়। "আত্মেত্যেবোপাসীত…তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য"—(বৃঃ, ১।৪।৭)। এই সাধনায় মানুষ সেই জন্য জীবনের সব কিছুকে পাতিপাতি করে যাচাই করে তার যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য সর্বশক্তি উৎসর্গ করে। এই জানা এবং পাওয়াতেই তার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, চারিতার্থ জীবনের সকল সার্থকতা। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" (গীতা, ৬।২২)।

এই জন্যই সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ মানবের সর্বোৎকৃষ্ট মনীষার পরিচয় পাই ভগবৎ অনুসন্ধানে, অনুধ্যানে ও সেবায়। আর দেখতে পাই চরম সাধনায় সিদ্ধ হয়ে মানুষ হয়ে যান মহাত্মা, মহামানব, বোধিসত্ত্ব, দেবতা, ভগবান। তাঁর প্রাণকেন্দ্রের ব্যাপ্তি হয় বিশ্বজুড়ে—জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, গ্রহে-নক্ষত্রে, জীবনে-মরণে, সর্বকালে। তাঁর সব আনন্দের উৎস হয় তাঁরই অন্তরাত্মা। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" (বৃঃ, ১।৪।৮)। "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥" (গীতা, ২।৫৫)।

কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র ভেদে প্রয়োজন পরিপ্রেক্ষিতে এই ভগবৎ সাধনার ভাব, রূপ ও ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভগবৎসিদ্ধির জ্ঞানালোকে দূর হয়ে যায় সকল সন্দেহ, আত্মসংবিৎ ফিরে আসে, দৃঢ় হয় আত্মবিশ্বাস। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। / ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ (মুণ্ডক, ২।২।৮)।

আপ্তকাম, স্থিতধী মহর্ষিরা এইভাবে মত ও পথের নির্দেশ দিয়ে যান। বাক্যমনাতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্ব অবশ্য নির্দিষ্ট চিহ্নিত হতে পারে না—যথা সম্ভব ইঙ্গিত পর্যন্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন, "সাকার, নিরাকার আরও কত কি। এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।" অপরপক্ষে কম-বেশি প্রত্যেক দ্রষ্টা, ধর্মাচার্য অথবা ধর্মগুরুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায়। গুরুভক্তির লক্ষণ একান্ত নিষ্ঠা। নিষ্ঠা রক্ষার অতি সতর্কতা ও ভক্তির আতিশয্য এনে দেয় একদেশী গোঁড়ামি। আর এই গোঁড়ামি পরিণত হয় হীন সংকীর্ণতায়। সংকীর্ণতা ঘটায় কোলাহল, দ্বেষাদ্বেষী, হানাহানি এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ। যে ঈশ্বর সর্বানুস্যূত, সর্বানুগ, সর্ব প্রেমাস্পদ, কি আশ্চর্য সংকীর্ণ বুদ্ধি তাঁকেই কেন্দ্র করে সৃষ্টি করে উচ্চ-নিচের ভেদ, জ্ঞানী-অজ্ঞানীর পার্থক্য, বর্ণবৈষম্য, অধিকার তারতম্য। কোথায় পরম কারুণিক, পরম দয়াল, জগৎ পিতা বা জগজ্জননী, আর কোথায় তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর

রূপ ও গুণ নির্ণয় বিষয়ে ছিংস্র বিরোধ। এর চাইতে অধিক লজ্জাকর আর কি হতে পারে?

তথাপি এও সত্য যে, এই মত ও পথের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ নূতন নয়। এও যেন একটি চিরন্তন সত্য। মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে তাই দেখা যায়, এই সংঘর্ষের ইতিহাসও যেন অবিচ্ছেদ্য হয়ে রয়েছে—কখনও কম, কখনও বেশি, কখনও উগ্র, কখনও নম্র। পরমহংসদেবের একটি দৃষ্টান্তে কথাটি সুস্পষ্ট হয়। "কতকগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল: একজন বললে, 'হাতী একটা থামের মত।' সে কানাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, 'হাতীটা একটা কুলোর মত।' সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এইরকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানা প্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি; আর কিছু নয়।"

বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে মানুষ মানুষের ঐক্য ক্রমশঃ জানতে ও বুঝতে আরম্ভ করেছে বিগত দুই শতাব্দীতে। ধর্ম একটি বিজ্ঞান। কিন্তু ধর্মের যৌক্তিকতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অস্পষ্ট হওয়ায় এই যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর সাধনা ও প্রত্যক্ষ বাস্তব অনুভূতি দিয়ে যুগোপযোগী করে, যুগ জনগণের মানসে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, মানুষ এক—'যত মত তত পথ'; সব ধর্মই সত্য, সকল ধর্মের লক্ষ্যই এক সার্বভৌমত্ব, অনন্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া, অমর হওয়া। মনুষ্য জীবনের এই উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মহামন্ত্র সম্বন্ধে লীলা-প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন:

"সর্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণবুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্মবিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্তমানকালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতার সকলের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে, ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।"

" 'সর্ব ধর্মমতই সত্য—যত মত তত পথ'—এই মহদুদার কথা জগৎ ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শুনিয়া যে মোহিত হইয়াছে, একথা আমাদের অনেকে এখন জানিতে পারিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব যুগের ঋষি ও ধর্মাচার্যগণের কাহারও কাহারও ভিতরে ঐরূপ উদার ভাবের অন্ততঃ আংশিক বিকাশ তো দেখা গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, ঐ সকল আচার্য নিজ নিজ বুদ্ধি-সহায়ে প্রত্যেক মতের কতক কতক কাটিয়া ছাঁটিয়া ঐ সকলের ভিতর যতটুকু সারাংশ বলিয়া স্বয়ং বুঝিতেন তৎ-সকলের মধ্যেই একটা সমন্বয়ের ভাব টানাটানি করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। ঠাকুর যেমন প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান অনুরাগে নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের সাধনা করিয়া তত্তৎমত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়া ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্বের কোন আচার্যই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের কথায় বলেন: "তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা বিপরীত-আচার-সংকুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

নিজ জীবনে তন্ত্র, বৈষ্ণব ও অদ্বৈত বেদান্ত সাধনায় সাক্ষাৎ অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে এবং পরে ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রভৃতির সার্থকতা প্রত্যক্ষ করে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় অনেক ভাবে এই মহান সত্যের কথা বুঝিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি সকল প্রশ্নের সুন্দর সমাধান ও সামঞ্জস্য করে, সকল ধর্মের একত্ব ও সমন্বয় উপস্থিত করে। যথা:—

(কেদারাদি ভক্তদের প্রতি)—"সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার।

"যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

"আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে বলছে জল; মুসলমানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি; ইংরেজরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার; আবার অন্য লোক এক ঘাটে বলছে aqua। এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।"

"আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 'এ কথা বোলো না—আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা ভুল।' হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।

"বিজয়ের শাশুড়ী বলে, তুমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার পূজোর কি দরকার? নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হোলো।

"আমি বল্লাম, 'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন—আর তারাই বা শুনবে কেন?'

"আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ ব'লছে সাকার, কেউ ব'লছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়, অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক,

আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল। কেন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর ব'লতো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী'।

"হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

"আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খৃষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি, 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না'; 'আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না'।

"এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি, অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়।

"সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। যেমন তোমরা কেউ গাড়ি, কেউ নৌকা, কেউ জাহাজে করে, কেউ পদব্রজে এসেছ, যার যাতে সুবিধা, আর যার যা প্রকৃতি সেই অনুসারে এসেছ। উদ্দেশ্য এক—কেউ আগে এসেছ, কেউ পরে এসেছ।"

ধর্মরাজ্যে নানান ভাবে বিবাদ-বিসংবাদ দূর করে সর্বধর্মের সমন্বয় করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি মানুষের জাতি, কুল, মান, শিক্ষা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখতেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন' তাই তিনি লক্ষ্য করতেন মানুষের অন্তর। তাঁর কাছে সমানভাবে আসা, তাঁর সঙ্গে মেলা-মেশা সর্বতোভাবে সম্ভব হয়েছিল সকলের—যেমন একদিকে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশ ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির, তেমনি অপর দিকে নরেন, রাখাল, লাটু, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গোপালের মার এবং অন্যদিকে নটী বিনোদিনী, পদ্মবিনোদ প্রভৃতি থিয়েটারের নট-নটীরা, রসিকের মতো সামান্য ঝাড়ুদার প্রভৃতির—সকলকেই তিনি প্রেমে আকর্ষণ করেছেন। ধর্মরাজ্যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের মধ্যে লড়াই সুবিদিত। তারও তিনি সমন্বয় করেছেন। প্রত্যেকটি আলাদা পথ ঈশ্বরকে লাভ করার। দক্ষিণেশ্বরে উচ্চারিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত অমৃতধারা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'তে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় মন্ত্র মানুষের জীবনে এক নূতন আধ্যাত্মিক চেতনা ও ধর্ম বিপ্লব এনেছে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর এক পরস্পর বিরোধী ভাবাদর্শ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয় করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঐ অবস্থাগুলি প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ এসে উপস্থিত হয়—অতএব তারা পরস্পর বিরোধী নয়, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ।

এক কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

যৈর্মতৈর্ধার্মিকা যস্মিন্ ধর্মমার্গে ব্যবস্থিতাঃ
তেষাং তন্মতমাদৃত্য ভক্তিস্তত্র দৃঢ়ীকৃতা।
প্রোৎসাহিতা যথান্যায়ং যেন তৎসাধনেষ্বপি
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সর্বধর্মপ্রণেতারং ধর্মগ্লানিবিনাশকম্।
সাধুমিত্রং শিবং শান্তং রামকৃষ্ণং নমাম্যহম্॥

'গঙ্গায় যমুনা বহে'

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রামাণিক

উদীয়মান লেখক। বর্তমান রচনার মূল আকর স্বামী সারদেশানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব'।

মাঘ মাসের শেষ দিন—মকরসংক্রান্তি। পূর্ণিমা তিথি। সেদিন সূর্যদেব মকররাশি হতে কুম্ভরাশিতে গমন করছেন। কত শুভদিন। গঙ্গাস্নানের পুণ্যযোগ। কণ্টকনগরীতে* ভোর রাত্রি থেকেই বহু পুণ্যার্থী নরনারী স্নান দান করতে গঙ্গার ঘাটে এসেছেন। ঘাটের কাছেই পরম ভাগবত শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ভারতীর আশ্রম। নবদ্বীপ থেকে নিমাই পণ্ডিত এসেছেন। শীতের রাত্রি হলেও সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়েছেন। সিক্তবস্ত্রে আশ্রম প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান নিমাইকে দেখে ভারতী মহারাজের বিস্ময়ের সীমা নেই।

নিমাই ভূমিষ্ঠ হয়ে ভারতীজীকে প্রণাম করলেন, তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর কাছে সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানালেন। নিরাসক্ত জ্ঞান-বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর হৃদয় তরুণ নিমাইকে দেখে ঈষৎ কোমল হয়ে গেল। তাঁর নবীন বয়স চিন্তা করে সন্ন্যাসদানে অসম্মত হলেন। নানা প্রবোধ বাক্যে নিমাইকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে ফেরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিমাই আপন সংকল্পে দৃঢ়। তিনি কাতর হয়ে ভারতীজীর চরণে মিনতি জানালেন, 'স্বামিন্, আপনি কৃপা করে আমায় সংসারপাশ, ভববন্ধন হতে মুক্তি দিন।' ভারতী মহারাজ বুঝাতে থাকলেন—'নিমাই, তুমি বৃদ্ধা জননীর একমাত্র সন্তান। ঘরে তোমার বালিকা বধূ। এখনই তোমার পক্ষে সংসার ত্যাগ তাঁদের পক্ষে বড় ভীষণ আঘাত হবে। তুমি ঘরে ফিরে যাও। গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্য পালন কর।'

নিমাই কিন্তু দৃঢ়সংকল্প। সবিনয়ে উত্তর দিলেন, 'প্রভু, মৃত্যুর কালাকাল অপেক্ষা নেই। শাস্ত্রে আছে, যখনই অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনই প্রব্রজ্যা নেবে।' নিমাইয়ের সংকল্প ও সন্ন্যাসের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখে আশ্রম-বাসীরা সকলে অবাক হয়ে গেলেন, স্বামী কেশবানন্দের মনও প্রফুল্ল হল।

ভারতী মহারাজ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে নিমাইকে সন্ন্যাসের অনুমতি সহ প্রাথমিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করার আদেশ দিলেন। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন—তাঁর চাঁচর কেশ মুণ্ডিত হবে। নিমাইর সংকল্পের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায়, অনুরাগী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সমাগত নারী-পুরুষ সকলেই নিমাইকে ঘরে ফিরে যাবার জন্য কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে কত না মিনতি করতে লাগল। নিমাই কিন্তু অবিচল। তারা সকলে করজোড়ে ভারতীজীকে অনুনয় করল, তিনি যেন নিমাইকে সন্ন্যাস না দেন। স্থির ধীর প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মবিদ্ কেশব ভারতী চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্বাক।

যথাবিধি শাস্ত্র অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হল। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর মিশ্র, শচীমায়ের নিমাই, নদীয়ার গৌরাঙ্গ হলেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানন্দ ভারতী। তাঁর বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর। শ্রীগুরুর মুখে প্রেষ ও মহা-বাক্য শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে গেলেন। নবীন শিষ্যের উচ্চতম অবস্থা দেখে ব্রহ্মবিদ্ কেশবানন্দ স্তম্ভিত। আনন্দ-পুলকিত হৃদয়ে পরম স্নেহে শিষ্যকে নিরীক্ষণ

---

* বর্তমান কাটোয়া

করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মন সেই উচ্চতম অবস্থা থেকে নিচে নেমে এলে অর্ধবাহ্যদশায় তিনি ভাব-সমাধিস্থ হলেন। প্রিয়তম পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ তিনি সর্বত্র সর্বতোভাবে দর্শন করে অদ্ভুত প্রেমভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ক্রমে মন আরও নিচে নেমে এল, স্থূলবাহ্যজগতের জ্ঞান হওয়ায় নিমাই কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হয়ে মন আবার সমাধিতে লীন হয়ে গেল। অন্তর্দশা উপস্থিত হল। এইরূপে কখন অন্তর্দশা, কখন অর্ধবাহ্যদশা; আবার মধ্যে মধ্যে বাহ্যদশায় নিমাই অবস্থান করতে লাগলেন।

প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সন্ন্যাসীরা মহাপ্রস্থানের পথে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করতেন, আর লোকালয়ে ফিরতেন না। পরবর্তীকালে আচার্যেরা সেই প্রথার পরিবর্তে তীর্থাদিতে বাস ও 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবনযাপনের প্রণালী প্রবর্তন করেন।

পরদিন সকালে শ্রীগুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করে নবীন সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে পড়লেন—উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি ব্রজধাম দর্শন। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি মধুর শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হলেন।

'এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥'
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৩।৫৮)

—পরমাত্মনিষ্ঠ প্রাচীন ঋষিরা যে ত্যাগ অবলম্বন করেছিলেন, সেই পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত পথে আমিও শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা আশ্রয় করে দুস্তর অন্ধকার এই মায়াময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হব।

নবীন সন্ন্যাসী পথে চলেছেন সত্য, কিন্তু বাহ্যজগতের দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। কখন একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে জড়বৎ পুত্তলিকার মতো হয়ে যান, কখন বা ভাবাবেশে 'কোথা প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ, কোথা বৃন্দাবন' বলে ছুটে চলেন। কোন্ দিকে চলেছেন, কোন্ পথে যেতে হবে, কোথায় ঠিক পথ কিছুই খেয়াল নেই। শুধু ভগবদ্ভাবে বিভোর, কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। এই-ভাবে সমস্ত দিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল। এর মধ্যে না ছিল আহার, না ছিল বিশ্রাম।

নবদ্বীপ থেকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত, তাঁর সঙ্গে আচার্য চন্দ্রশেখর ও দত্ত মুকুন্দ। তাঁরা সন্ন্যাসীর অদূরে থেকে পশ্চাৎ অনুসরণ করতে লাগলেন। পথশ্রান্ত পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্য রাত্রির অন্ধকারে আর চলতে পারছিলেন না। সহসা এক বটবৃক্ষের তলে উপনীত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামরত হলেন তিনি। যেখানে চৈতন্যদেব সেই রাত্রে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, আজও সেই স্থান 'বিশ্রামতলা' বলে পরিচিত।

প্রভাতেই কৃষ্ণনাম স্মরণ করে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আবার পথে নামলেন। কাটোয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তখন জনবসতি হয়নি, গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। অনাহারে, অনিদ্রায়, ক্রমাগত পথ পরিক্রমায় দেহও ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। দুর্গম পথে অধিকদূর অগ্রসর হতে পারছিলেন না। মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হয়ে গন্তব্যস্থল ও রাস্তা ভ্রম হয়ে যাচ্ছে, কখন বা বিপরীত দিকে চলতে থাকেন। চৈতন্যের প্রেমাবিষ্ট মূর্তি দর্শন মাত্রেই লোকের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত ও দিব্যভাব জাগ্রত হতে লাগল। পথের মাঝে স্থানে স্থানে গ্রামের রাখাল বালকেরা গোচারণ করছে, প্রভুর মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে তারাও আপনা হতে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম করতে লাগল। চৈতন্য তাদের মাথায় হাত দিয়ে স্নেহভরে বলতে

লাগলেন, আহা বালকেরা তোমরা আজ আমায় কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে সত্য সত্যই কৃতার্থ করলে। তোমরাই ভাগ্যবান, তোমরাই ধন্য! চৈতন্যদেব ব্রজধাম বৃন্দাবন যাচ্ছেন, ভাবাবিষ্ট হয়ে দিবারাত্র ছুটে চলেছেন। পিছনে পিছনে আসছেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও পরিকরেরা। প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে মধ্যে মধ্যে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বার মুহূর্তে নিত্যানন্দ ছুটে এসে প্রভুকে বুক পেতে ধরে রাখছেন, সে সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান তাঁর নেই। ভক্তেরাও নিজেদের আহার, নিদ্রা, দুঃখ, কষ্ট ভুলে ছায়ার মতো তাঁদের প্রাণপ্রিয় প্রভুর অনুসরণ করে চলেছেন। আজ চৈতন্যের দেহের দুর্বলতা লক্ষ্য করে নিত্যানন্দের মনে বড় চিন্তা হল। তাঁরাও শ্রান্ত ক্লান্ত। এভাবে চললে তো প্রভুর দেহরক্ষা হবে না। মনে মনে এই চিন্তা করে চন্দ্রশেখরকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বাসভবনে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন, তুমি অবিলম্বে শান্তিপুরে গিয়ে আচার্যপাদকে সংবাদ দাও, আমরা প্রভুকে নিয়ে তাঁর বাসভবনেই যাচ্ছি, তিনি যেন নৌকা নিয়ে শান্তিপুর ঘাটে অপেক্ষা করেন। তাঁকে সংবাদ দিয়ে সেখান হতে বরাবর, নবদ্বীপে গিয়ে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তদের সংবাদ দাও, তাঁরা যেন অদ্বৈত ভবনে অবিলম্বে চলে আসেন। আমি এদিকে যে কোন উপায়ে প্রভুকে ভুলিয়ে নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে ধরেই আসছি। চন্দ্রশেখর চলে গেলেন শান্তিপুরে, সেখান থেকে নবদ্বীপে গিয়ে সংবাদ দেবেন।

নিত্যানন্দ কৌশল করে পূর্ব হতে গোপনে বালকদের শিখিয়ে রাখলেন, আমাদের এই প্রভু যদি তোমাদের বৃন্দাবন যাবার পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তোমরা গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিও। চৈতন্য বালকদের জিজ্ঞাসা করলেন,

'বল দেখি শিশুগণ, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ?'

নিত্যানন্দের শিক্ষামতো তারা গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল। চৈতন্যদেব সেই পথে ধাবিত হলেন। এবার নিত্যানন্দ নিজে অগ্রসর হয়ে প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিনদিন পরে নিত্যানন্দকে দেখে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করেন,

'শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন ?'

নিত্যানন্দ বলেন, 'তোমা সনে যাব বৃন্দাবন ॥'

প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কতদূরে আছে বৃন্দাবন ?'

উত্তরে নিত্যানন্দ বলেন, 'কর এই যমুনা দরশন ॥'

(চৈ, চ)

দেখিয়ে দিলেন প্রভুকে সামনে কলনাদিনী গঙ্গা। বৃন্দাবন-ভাবাবেশে চৈতন্যের গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞানে ভাবসমুদ্র উথলে উঠল। ভাববিহ্বল চিত্তে,

—'অহো ভাগ্য, যমুনারে পাইনু দরশন ॥' এই বলে কৃতাঞ্জলিপুটে যমুনা-স্তব কীর্তন করলেন,

'চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবৎ-ব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎ ক্ষেমধাত্রী
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥'

(চৈ, চ, নাটক ৫।১৩)

চিদানন্দ সূর্যরূপ নন্দ-নন্দনের পরম প্রেম-পাত্রী এই যমুনাসলিল ব্রহ্মস্বরূপ। যমুনা আমাদের দেহ সুপবিত্র করুন। ইনি সূর্যতনয়া ও বিশ্বের কল্যাণকারিণী।

মধুর এই শ্লোক আবৃত্তি করে গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞান করে প্রণাম করে চৈতন্যদেব অবগাহন করলেন। স্নানান্তে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, সমস্তই যেন পূর্বপরিচিত মনে হচ্ছে। অঙ্গে তাঁর একমাত্র কৌপীন ও বহির্বাস সম্বল, দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। এমন সময় শান্তিপুর পথে আচার্য অদ্বৈত নৌকায় করে এসে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

আচার্যপাদকে সামনে রেখে চৈতন্যদেবের মনে এবার সংশয় উপস্থিত হল। বললেন, 'তুমি ত অদ্বৈত গোসাঞি হেথা কেন আইলা,

'আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা॥'

আচার্য সরলভাবেই উত্তর দিলেন,

'——তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥'

এতক্ষণে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হল। নিত্যানন্দের চাতুরীর কথা অদ্বৈত আচার্যকে জানিয়ে বললেন,

'—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা
গঙ্গায় আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা

আচার্য সবিনয়ে বললেন, প্রভু শ্রীপাদের কথা তো মিথ্যা নয়। তুমি এখন যমুনাতেই স্নান করেছ।

'গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্গাধার॥'

গঙ্গার পশ্চিমে যমুনাধারা প্রবাহিত। প্রভু, তুমি সেই পশ্চিমে যমুনা ধারাতেই স্নান করেছ। এখন তুমি আর্দ্র কৌপীন ছেড়ে শুষ্ক কৌপীন, বহির্বাস ধারণ করো। তারপর,

'প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস।'
(চৈ, চ, মধ্য)

নববস্ত্র পরিহিত নবীন সন্ন্যাসীর দিকে সকলে মুগ্ধ নয়নে দেখলেন,

'গৌর দেহকান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল
অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে করে ঝলমল॥'

আচার্য প্রদত্ত কাষ্ঠপাদুকা চরণযুগলে ধারণ করে মুণ্ডিতমস্তক দণ্ডধারী সৌম্যদর্শন প্রশান্ত-মূর্তি যতিরাজ যখন দাঁড়ালেন, ভক্তেরা সকলে আনন্দপুলকিত অন্তরে পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহারে নবীন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাঁর শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

সন্ন্যাসীও 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে প্রত্যভিবাদন করলেন।

শরণ

শ্রীমতী হিমানী রায়
সুখ্যাতা কবি।

কভু মনে হয় তুমি আছ বড় কাছে
কভু লাগে বহুদূর।
তোমা পাশে যেতে চাই
সাধ আছে সাধ্য নাই
বারবার ব্যর্থ হয়ে মন তৃষাতুর।
জানায়েছ কত ভাবে সে পথের দিশা;
চিত্তে চাই শুদ্ধাভক্তি, আর ভালবাসা
সে প্রেম কোথায় পাব
নাহি দিলে তুমি,
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা
করিব গো স্বামী।
অন্তরের চঞ্চলতা
সব যাবে দূরে,
যবে পাব তব দেখা
মনের মন্দিরে।
সেদিনের কথা নাথ
কল্পকথা নয়,
একদিন দেখা তব
পাব সুনিশ্চয়।
হৃদয়বীণার যন্ত্রে
যতগুলি তার,
ঝঙ্কারিবে নাম তব
তুলিয়া টঙ্কার।
সার্থক হবে গো মম
মানব জীবন,
তোমার অভয় পদে
পাইব শরণ।

বিবেকানন্দ ঃ ঘোড়সওয়ার

অধ্যাপক শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক,—কবি ও প্রাবন্ধিক।

অনন্ত তমিস্রা শেষে আদিগন্ত ভূমি জুড়ে
আলো ওঠে জ্বলে।
উজ্জ্বল উষ্ণীষ শীর্ষে
উদ্যত অসির ন্যায় তীব্র চক্ষু ;
দীপ্ত নাসা—
এ কোন্ ঘোড়সওয়ার ?
বিপ্লব-বহ্নির চিহ্নে ভরে তোলে
আকাশ বাতাস !
ঝড় ওঠে মৃত্যু-গহ্বরে,
পুরাতন ইতিহাস ভেঙে পড়ে আর্ত হাহাকারে।
অগ্নি যজ্ঞ হতে জাগে শাশ্বত বিবেক।
আনন্দ প্লাবন শীর্ষে এ কোন্ বিস্ময়
নবীন ঘোড়সওয়ার।

সমালোচনা

কৃষ্ণ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা, ১২০ ; মূল্য : ১০.০০ টাকা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে শঙ্করীপ্রসাদ বসু পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে তাঁর বিচরণ অবাধ, সাহিত্য ও ক্রীড়ানুরাগী পাঠকের কাছে তা অবিদিত নয়। পৌরাণিক পট-ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশনা সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন সার্থক পদক্ষেপ।

নিজের পিতাকে কারারুদ্ধ করে কংস মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করে। কংসের অত্যাচার ও কুশাসনে মথুরাবাসী সদাসন্ত্রস্ত। সেই কংস স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে আপন সম্পর্কিত ভগিনী দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ ব্যবস্থা করে। বিবাহ-শোভাযাত্রায় অকস্মাৎ দৈববাণী শোনা গেল, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানের হাতেই কংসের নিধন। তখনই সে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বসুদেবের প্রার্থনায় নিরস্ত হয় এবং উভয়কে কারারুদ্ধ করে। এই কারাগারের কক্ষেই দেবকীর ছ'টি সদ্যোজাত সন্তান কংসের খড়্গে প্রাণ দিয়েছে। সপ্তম সন্তান বলরাম জন্মাবার পূর্বেই দেবকীর দেহ থেকে অলৌকিক-ভাবে আকর্ষণ করে যোগমায়া তাকে পৌঁছে দিয়েছেন বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর কাছে। অষ্টম সন্তান কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তে দৈবনির্দেশে বসুদেব তাঁকে পৌঁছে দেন গোকুলে নন্দ ও যশোদার কাছে এবং তাঁদের সদ্যোজাত কন্যাকে নিদ্রিত

দেবকীর পার্শ্বে এনে দেন। পরদিন সেই কন্যাকে হত্যায় উদ্যত হলে কন্যাটি দেবীরূপ পরিগ্রহ করে অন্তর্হিত হবার সময় কংসকে জানিয়ে দিল কংস-নিধনকারী অন্যত্র বড় হয়ে উঠছে। যশোদার স্নেহে দিনে দিনে কৃষ্ণ বড় হয়ে উঠছেন এবং তাঁর নানা অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। সেই সংবাদে বিচলিত কংস তাঁকে হত্যার বহু ব্যর্থ পরিকল্পনা করে চলেছে। বিপদ থেকে পরিত্রাণের আশায় নন্দ শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনে চলে গেলেন। বার বার ব্যর্থ হয়ে কংস অবশেষে কৃষ্ণভক্ত অক্রূরকে দূতরূপে পাঠিয়েছে কৃষ্ণকে মল্লক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে। দুর্বৃত্ত কংসের মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সম্মত করে অক্রূর তাঁকে এনেছে মথুরায়। কৃষ্ণ-বলরামের সম্মিলিত চেষ্টায় একে একে কংসের মল্লরা প্রাণ হারিয়েছে এবং সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে কৃষ্ণ হত্যা করেছেন কংসকে। কৃষ্ণ নিজের মাতাপিতা এবং কংসের পিতা উগ্রসেনকে কারামুক্ত করে প্রজাদের বাঁধভাঙা আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে নবযুগের সূচনা করেছেন।

'কৃষ্ণ' রচনার প্রেরণা কিন্তু শঙ্করীবাবু লাভ করেছিলেন তাঁর মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র থেকেই। স্কুল পাঠ্যতালিকায় নিবেদিতার 'ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুইজম' তাঁকে কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে—পরে নিবেদিতার রচনা অনুবাদ করতে বসে আধুনিক মননোপযোগী করার বাসনায় কাব্যপুরাণ ও পদাবলীর সংযোগে এবং সম্ভাব্যতার শর্ত-নিয়ন্ত্রিত কল্পনার স্পর্শে 'কৃষ্ণ' রচনা করেছেন সাধারণত কিশোরদের দিকে দৃষ্টি রেখে, কিন্তু লেখকের সংহত অথচ প্রসাদগুণান্বিত ভাষা, গল্প বলার আকর্ষণীয় রীতি এবং নাটকীয় রসসৃষ্টির নৈপুণ্য সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে বইখানিকে সমাদরণীয় করে তুলবে বলে মনে করি।

শিল্পী নিত্যানন্দ ভকতের অলঙ্করণ এবং আনন্দ পাবলিশার্স'র মুদ্রণ-পারিপাট্য বইখানির অতিরিক্ত আকর্ষণ।

-অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ

শ্রীরামকৃষ্ণ — স্বামী অমৃতত্বানন্দ। প্রকাশক : স্বামী অমৃতত্বানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ। (১৩৮৮), পৃ: ৫+১২০ ; মূল্য : ১২·০০ টাকা।

লেখক বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার তাগিদ অনুভব করে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু স্বল্পপরিসর ; পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখেই তা বোঝা যায়। মাত্র ১২০ পৃষ্ঠার পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় ; সম্ভব নয় উক্ত জীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত সমুদয় তথ্যের যথাযথ বিন্যাসও। পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় উভয়েরই প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বস্তুত এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী। নতুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটি রচিত হয়নি। নতুন কোন তথ্যের সংযোজনও এতে দেখা যায় না।

সে যাই হোক, গ্রন্থটি সুলিখিত। তাঁর পিতৃপরিচয় ও জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে লীলা-বসান পর্যন্ত অনন্তভাবময় অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা পর্যায়-ক্রমে গ্রন্থটিতে ঊনত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গ্রন্থের ক্ষুদ্র আয়তন সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপর্বটি এখানে যথাসম্ভব সবিস্তারে উপস্থাপিত বলা যায়। পার্ষদ এবং ভক্তদের নিয়ে তাঁর জীবনের শেষ পর্বটি তুলনায় যেন অধিক মাত্রায় সংক্ষেপিত।

এই জীবনী রচনায় লেখক প্রধানত স্বামী

সারদানন্দ-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' অনুসরণ করেছেন। এই বিষয়ের অপর দুইখানি আকর-গ্রন্থ শ্রীম-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং শ্রীঅক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' থেকেও তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া কিছু কিছু তথ্য সমকালের গ্রন্থ থেকেও সংগৃহীত। সব মিলিয়ে তথ্যের দিক দিয়ে এই জীবনীগ্রন্থের প্রামাণিকতা প্রশ্নাতীত। লেখকের বর্ণনভঙ্গী সহজ, সুন্দর। রচনার বিষয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর এই সশ্রদ্ধ ভাবটি পাঠকচিত্তেও যেন অনায়াসে সঞ্চারিত হয়ে যায়। লেখকের রচনার সার্থকতা এইখানে।

বইটির কয়েক জায়গায় দুই-একটি শব্দের বানানে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। তাছাড়া কিছু ছাপার ভুলও আছে। আশা করা যায়, পরবর্তী সংস্করণে এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হবে।

—শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট্ অব কালচার

*

বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গল্প সংগ্রহ : সম্পাদক-অনুবাদক—ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী। প্রথম খণ্ড : রুশ সাহিত্য। পৃষ্ঠা : ২৪৬+৬, মূল্য : ২০.০০ টাকা।

দ্বিতীয় সম্ভার : সোভিয়েত সাহিত্য। পৃষ্ঠা : xii+৩৭৯, মূল্য : ৩২.০০ টাকা। প্রকাশক : (উভয় গ্রন্থ) : শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

সম্পাদক-অনুবাদক ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী দীর্ঘকাল ধরে বিদেশী সাহিত্যের, বিশেষত কথা-সাহিত্যের অনুবাদ করে আসছেন। আট খণ্ডে বিশ্বসাহিত্যের নির্বাচিত কিশোর গল্প সঙ্কলন প্রকাশের যে পরিকল্পনা অনুবাদক নিয়েছেন, সেই অনুসারে রুশ লেখকদের প্রায় সত্তরটি কিশোর-গল্পের অনুবাদ এই দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দুটি সংকলনের নাম বিভিন্ন—'রুশ সাহিত্য', 'সোভিয়েত সাহিত্য'। নামকরণের দিক দিয়ে এই পার্থক্যের কারণ প্রথম খণ্ডে বিপ্লবের পূর্ববর্তী লেখকদের গল্প সংকলিত হয়েছে; দ্বিতীয় সম্ভারে বিপ্লবের পরবর্তী সোভিয়েত শাসনের আমলের লেখকদের গল্প স্থান পেয়েছে। যেসব লেখকের সাহিত্যজীবন দুই কালেই ব্যাপ্ত, বিপ্লবসম্পর্কিত মানসিকতা অনুসারে তাঁদের লেখা প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভারের 'প্রাসঙ্গিক'-কথনে লেখক বলেছেন, 'এই গ্রন্থ কেবলমাত্র কতকগুলি গল্পই নয়, এমন কি কতকগুলি ভাল ভাল গল্পের সংগ্রহও নয়, আমি সম্পাদক-নির্বাচকের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় নির্বাচিত গল্পগুলির মাধ্যমে যতটা সম্ভব তুলে ধরতে চেয়েছি বিপ্লব ও বিপ্লব-পরবর্তী বহুরকম সোভিয়েতের জীবন ও জগতের বিচিত্র ও স্বতন্ত্র স্বরূপকে, এবং তার বহুমুখী অগ্রগতিকে।' উক্তিটি আংশিকভাবে প্রথম খণ্ডের গল্প-সংগ্রহ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ঐ সংকলনে 'বহুমুখী অগ্রগতি'র পরিচয় না থাকলেও ঐ কালের রুশদেশের জীবন ও জগতের বিচিত্র ও স্বতন্ত্র রূপ আর স্বরূপ বা প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সংগৃহীত গল্পের 'শ্রেষ্ঠত্ব' প্রধানত বা সাধারণভাবে সাহিত্যগুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করা হয়নি, একটি দেশের 'বিচিত্র ও স্বতন্ত্র' জীবনরূপ তথা জীবনচেতনার পরিচয়সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে এই সংগ্রহের বিশিষ্ট মূল্য আছে।—প্রত্যেক লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (কয়েকটি সচিত্র) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গল্প-সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি (রুশ সাহিত্য) 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড'-প্রদত্ত 'নেহেরু পুরস্কার'-লাভে সম্মানিত হয়েছে। এই সংকলনে বারোজন লেখকের তেত্রিশটি (সূচীপত্রে বত্রিশটি বলে

উল্লিখিত) গল্প আছে। লেখকদের জন্মকাল অনুসারে তাঁদের গল্পগুলি বিন্যাস করা হয়েছে। এই খণ্ডের জ্যেষ্ঠ লেখক আইভান (ইভান) ক্রিলভ (১৭৬৮-১৮৪৪), কনিষ্ঠ আলেকজান্দ্র কুপ্রিন (১৮৭০-১৯৩৮)। সংকলিত গল্পে একদিকে যেমন বাস্তব জীবনের কাহিনী আছে তেমনি প্রাণীদের নিয়ে লেখা রূপক গল্প বা রূপকথাও স্থান পেয়েছে; লেভ্ তলস্তয়ের লেখা ভ্রমণকাহিনীর একটি অংশও আছে। বিচিত্র স্বাদের জন্য প্রায় সব গল্পই আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় সম্ভারের (সোভিয়েত সাহিত্য) গল্পগুলিতেও স্বাদের বিচিত্রতা আছে, কিন্তু কোন কোন গল্প আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। অনুবাদক তথা নির্বাচক-সম্পাদকের বিশেষ উদ্দেশ্য অর্থাৎ 'বিপ্লব ও বিপ্লব-পরবর্তী বহুরকম সোভিয়েতের জীবন ও জগতের বিচিত্র ও স্বতন্ত্র স্বরূপকে এবং তার বহুমুখী অগ্রগতিকে' ফুটিয়ে তোলার সচেতন প্রয়াস এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। তবে ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যটি কিছুটা সিদ্ধ হয়েছে বলা যায়। দ্বিতীয় সম্ভারে চৌত্রিশজন লেখকের গল্প (গোর্কির দুটি, অপর সকলের একটি করে) সংকলিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), উৎকুর থাশিমভ (১৯৪১—) কনিষ্ঠ। শেষে 'অলিম্পিক-বিজয়ী জগদ্বিখ্যাত গোলরক্ষক' লেভ্ ইয়াসিনের লেখাটি ('গোলির খেলা: খেলা কি ছেলে-খেলা') আকর্ষণীয়, কিন্তু বর্তমান সংকলনের সঙ্গে সংগতিহীন। সূচীপত্রটি ত্রুটিপূর্ণ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নেই, গ্রন্থস্থ লেখকদের ক্রমও তালিকানুসারী নয়; ঐ তালিকায় কনস্তান্তিন পৌস্তভ্স্কি আর তাঁর 'ছেলেরা ও লেখক' গল্পের উল্লেখ নেই।

অনুবাদ সুপাঠ্য, তবে সম্ভবত বিষয়বস্তু অপরিচিত হওয়ায় কোন কোন জায়গায় একটু অস্পষ্ট বলে মনে হয়।—মুদ্রণ ও বহিরঙ্গ পারিপাট্য প্রশংসনীয়। মুদ্রণাশুদ্ধি বিরল।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ
সুপরিচিত লেখক

*

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা: ১২+৪৫৯; মূল্য: ৩৫·০০ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Vincent Smith ভারত ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"China excepted no region can boast of an ancient civilization so continuous and unbroken as that of India"—(The Oxford History of India, 2nd edition-p. 43) Smith-এর বক্তব্য এই যে, Egypt অথবা Babylonia-র সভ্যতা ভারত অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে, কিন্তু ঐ দুইস্থানে প্রাচীন জীবনধারার সহিত তথাকার আধুনিক জীবনধারার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতে বৈদিক যুগের চিন্তাধারা আজও জীবন্ত প্রভাবময়।

সেই সুদূর কাল হইতে ধর্ম ও দর্শন ভারতীয় মনের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বহু শতাব্দীব্যাপী ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বিস্তৃতির পটভূমিতে ভারতীয় চিন্তার সুবিশাল ও বহু বৈচিত্র্যময় বিকাশ বাংলাভাষায় কোন একটি মাত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস ইতিপূর্বে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন।

ভারতে সুপ্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত যে সকল ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচনা ৪৫০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটিতে করা হইয়াছে।

এই পুস্তক রচনায় ডঃ ভট্টাচার্য যে সুবিস্তৃত অধ্যয়ন, নিজস্ব মতামত ও নূতন কথা বলার পরিচয় দিয়াছেন, পুস্তক সমালোচনার নির্ধারিত স্বল্প পরিসরে তাঁহার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। সে আলোচনার জন্য কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন।

এইরূপ পুস্তকে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু বিতর্কমূলক উক্তি থাকে। ডঃ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহার মাত্রাধিক্য দেখা যায়। তবে নিজের মতের সমর্থনে গ্রন্থকার যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশে যথাসাধ্য যত্নবান হইয়াছেন।

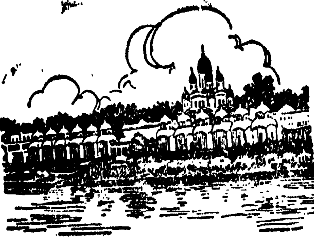
এই পুস্তকে ১২টি অধ্যায়ে প্রাক্ বৈদিকযুগ, বৈদিকযুগ, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ও প্রভাব এবং আধুনিক ভারতে বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের নানা দিক আলোচিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা—এই দুই ক্ষেত্রেই ডঃ ভট্টাচার্য আপন অধিকারের প্রমাণ রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তবে যে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের আলোচনায় গ্রন্থকার যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দান করিয়াছেন তাহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সুস্পষ্ট কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ভারতীয় চিন্তাধারার গৌরবস্থলরূপে স্বদেশে ও বিদেশে, প্রাচীন ও আধুনিক বহু মনীষী উপনিষদ্‌কে চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই উপনিষদ্ সম্পর্কে লেখকের উক্তি—"উপনিষদ্‌কে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট ফসল বলা হয়। কিন্তু এই উপনিষদের সামাজিক আদর্শ কি ?...যেখানে বলা হয়েছে এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম, এই তুমি-আমির মধ্যে কিন্তু শ্রমকারী মানুষেরা পড়েন না।" (পৃঃ ১১৪-১১৫)। অর্থাৎ উপনিষদে ব্রহ্মাতিরিক্ত আর একটি মূল সত্তার সন্ধান লেখক পাইয়াছেন। তাহা "শ্রমকারী" মানুষ। এ মন্তব্য অবশ্যই অভিনব!

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে লেখকের অবজ্ঞা-সূচক বক্তব্য—"দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আত্মাবাদীরা যত প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রমাণাভাস মাত্র, প্রমাণ নয়। অর্থাৎ সেগুলির সাহায্যে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না।" (পৃঃ ১৪৭)।

প্রাচীন ভারতে নারীদের শিক্ষা কতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল সে প্রসঙ্গেও লেখক একই রূপ অশিষ্ট উক্তি করিয়াছেন—"ব্যাপারটা শুনতে অনেকেই পছন্দ করবেন না, প্রাচীন ভারতে গণিকারাই ছিলেন মহিলাদের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিতা শ্রেণী যাঁদের চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হতে হত, শুধু তাই নয় অলঙ্কার, ছন্দ ও কাব্য সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে হত।" (পৃঃ ৩২২)।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ। বাংলা ভাষায় ধর্মসংক্রান্ত ইতিহাসগ্রন্থের যথেষ্ট অভাব আছে—লেখকের উদ্যম তাই অভিনন্দনযোগ্য। সুপণ্ডিত লেখক গ্রন্থরচনায় প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন,—তাঁহার মননশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও কিন্তু বলিতে দ্বিধা নাই যে, তিনি প্রকৃত তথ্য নিরূপণে সর্বাংশে সফল নহেন। অনেক স্থলে তথ্যের বিকৃতি চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য বৈদিক ধর্মে আস্থাশীল পাঠকের মনে পীড়া উৎপাদন করিবে, এরূপ আশঙ্কারও কারণ আছে।

শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য মন্দাপম্ শিবির থেকে গত ১৫ ফেব্রুআরি পর্যন্ত ৭৬,৮৫৪ জনকে রান্না-করা খাবার দেওয়া এবং ৭,৮৯৩ জন রোগীকে ওষুধ-পথ্যাদি সহ চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়া শরণার্থী ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন পড়াশুনা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে শীত-ত্রাণ: বেলুড় মঠ থেকে হুগলী জেলার বালী অঞ্চলের ২৪টি গ্রামের ৬০০ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয় ৬০০ পশমী কম্বল, মেয়েদের উপযোগী ১০০ পশমী চাদর, ২০০ শাড়ি, ২৫০ সেট পুরানো জামা-কাপড় এবং ৫ টিন বিস্কুট।

সৌরাষ্ট্রে পুনর্বাসন: রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম জুনাগড় জেলার ভাম্বালী তালুকের ৫টি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য হিসাবে ৫৮টি গরু ক্রয় করে দিয়েছেন। গত ১৯৮৩-র বন্যায় আনন্দপুর-মীভাসা ও ইটালা-পাটাপুর গ্রামের বাস্তুহারা ২০০ পরিবারের পুনর্বাসনকল্পে বাড়ি তৈরির কাজ চলছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

'বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম'-প্রবর্তিত ১৯৮৪-র সর্বভারতীয় বিজ্ঞান মেলায় 'সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক প্রকল্প' প্রদর্শনের জন্য রামহরিপুর বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র পুরস্কৃত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

তিরুভাল্লা (দক্ষিণভারত) রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ১ জানুআরিতে। সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে ১৪০ জন যুবক যোগদান করে। এর মধ্যে ৪০ জন হরিজন যুবকও ছিল।

ম্যাঙ্গালোর (দক্ষিণ কানাড়া) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় গত ১ জানুআরিতে তিনটি অধিবেশনের একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে ১২০ জন যুবক।

রাজমুন্দ্রী (পূর্ব গোদাবরী) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ৯ থেকে ১১ জানুআরি ১৯৮৪ তিনদিন ধরে একটি যুবসম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে ৭৮ জন যুবক। পর্যবেক্ষকরূপে উপস্থিত ছিলেন ৪৯ জন অতিথি।

ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনায় গত ১৫ জানুআরি ২,৫৫০ জন প্রতিনিধি ও ৩৭০ জন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রী এ. এন. ব্যানার্জী।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পরিচালনায় তৃতীয় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২২ থেকে ২৫ জানুআরি পর্যন্ত। এই চারদিনের সম্মেলনে ত্রিশটি গ্রাম থেকে ১৪৬ জন যুবক এসে অংশগ্রহণ করে।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে ৫ ফেব্রুআরি দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। এই সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে ১৫০ জন যুবক ও আমন্ত্রিত ৪০ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উৎসব

মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৪ থেকে ৬ মার্চ ১৯৮৪, তিনদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৮তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ হোম এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় স্বামী অমরানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন শ্রীশম্ভুনাথ রায়, শ্রীমতী সুজাতা ভৌমিক, শ্রীমতী নন্দিতা ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী আত্মদেবানন্দ ও স্বামী গিরিশানন্দ।

তমলুক (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৯তম শুভজন্মতিথি উপলক্ষে গত ৪ থেকে ১২ মার্চ ন'দিন ধরে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন থেকে ভোরে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজনগান, শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি নিয়ে শত শত নরনারীর নগরপরিক্রমা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ, ভোগরাগ, প্রসাদ বিতরণ, গীতিনাট্য, রামায়ণগান, ধর্মসভা প্রভৃতি হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় স্বামী অমলানন্দ, স্বামী অজজানন্দ ও স্বামী দিব্যানন্দের সভাপতিত্বে যথাক্রমে বক্তৃতা দেন স্বামী পুরুষানন্দ, অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুজিত ঘোষ। শেষ দিনে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয় বেলুড় সারদাপীঠের জনশিক্ষা মন্দিরের আনুকূল্যে।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি-উৎসব: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৯তম আবির্ভাবতিথি গত ৪ মার্চ ১৯৮৪, রবিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শান্ত উদ্দীপনাময় পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনসঙ্গীত হয়। সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২০ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী পুণ্যব্রতানন্দ (কল্যাণ মহারাজ) গত ৬ মার্চ ১৯৮৪, বিকাল ৩-৩০ মিনিটে বেলুড় মঠে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। শরীরত্যাগের দু-একদিন আগে থেকে তিনি পেটের অসুখে ভুগছিলেন। হৃৎপিণ্ডের কার্য ব্যাহত হওয়ায় তাঁর দেহান্ত হয়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়া তিনি ফরিদপুর, বারাণসী সেবাশ্রম, জামতারা, রাঁচি (মোরাবাদী), চণ্ডীপুর, বাঁকুড়া, কাঁথি প্রভৃতি আশ্রমের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। বিভিন্ন সময়ে শিলচর ও আগরতলায় রিলিফের কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর সহজ সরল সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁর দেহ-নির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চির-শান্তি লাভ করেছে—এটাই আমাদের বিশ্বাস।

বিবিধ সংবাদ

মিশরের প্রাচীন জনপদ আবিষ্কার

১২ জুন ১৯৮৩, মধ্য-পূর্ব সংবাদ-সংস্থার সংবাদে প্রকাশ যে, মিশরের রাজধানী কাইরো থেকে ৬৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে লাহরের কাছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো মানুষের বসতি এলাকা খুঁড়ে পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। তাঁরা মনে করেন: এটি মিশরের ১৮শ থেকে ৩০শ রাজবংশের সময়ের তৈরি। এখানে বসতি গড়ে ওঠে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ১৬০-এর মধ্যে। এটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরও বলেন যে, মানুষের এই বসতি অঞ্চল আবিষ্কারের ফলে মিশরের সেই সময়ে মধ্যবিত্তরা কি ধরনের বাড়িতে বাস করত তা আলোকিত হল। আবিষ্কৃত বাড়িগুলি ইটের তৈরি। দেখা যায়, বাড়িতে দুই স্তম্ভের উপর তৈরি এক-ছাদবিশিষ্ট হলঘর, একটি ভাঁড়ার ঘর ও একটি উঠান আছে।

স্মরণোৎসব

কল্যাণী এ ব্লক শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব (২য় বর্ষ) গত ১১ ও ১২ ফেব্রুআরি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী অমলানন্দ প্রভৃতি।

পুরুলিয়া (বাঁকুড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুআরি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী।

উৎসব

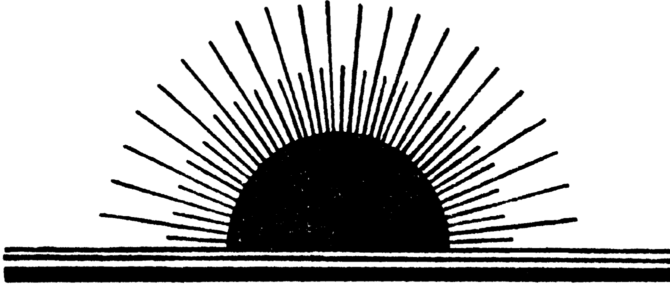
নাটাগড় (সোদপুর, ২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উৎসব গত ১১ থেকে ১৪ ফেব্রুআরি ১৯৮৪, চারদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিনে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ এবং স্থানীয় পানিহাটী হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিলি করা হয়। বিকালে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে 'বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শে যুবকদের দায়িত্ব' শীর্ষক আলোচনায় স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দান করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী দীপ্তি মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সর্বধর্মসমন্বয়' বিষয়ক আলোচনাচক্রে বিভিন্ন প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব ধর্মাদর্শ ব্যক্ত করেন। এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন স্বামী রসজ্ঞানন্দ। তৃতীয় দিন বিকালে 'বিবেকানন্দ ও সমাজতন্ত্রবাদ' বিষয়ক আলোচনায় স্বামী স্মরণানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ডঃ জলধি-কুমার সরকার। আলোচনা শেষে 'ভগিনী নিবেদিতা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। চতুর্থ দিন বিকালে ৫২ জন দুঃস্থকে বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা নিবেদিত একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

বক্রেশ্বর (বীরভূম) শ্রীরামকৃষ্ণ তপোমঠে, গত ৪ মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৯তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজনকীর্তনাদির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

গোলাঘাট (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় সুভাষ কলোনির শ্রীরাধাকৃষ্ণ কর্মকারের গৃহপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৪৯তম আবির্ভাব উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে দু হাজারেরও উপর ভক্ত নরনারী যোগদান করেছিলেন।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।
* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।



উদ্বোধন

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা ● শ্রাবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৫৫)

মালাবার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের আবেদন

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র কেরালার রামকৃষ্ণ মিশন সবাশ্রম। এই সেবাশ্রমেরই একটি শাখা মালাবার অঞ্চলের কালিকট, কুইল্যাণ্ডির শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিগত ৭০ বছরেরও অধিককাল ঐ সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারে নিযুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য এই ঐতিহাসিক কুইল্যাণ্ডিতেই ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতভূমিতে অবতরণ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার এই আশ্রমটি স্বামী নির্মলানন্দের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে সহৃদয় এক ভক্তের জমি ও বাড়ির অনুদানে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিয়মিত পূজা-অর্চনা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ ও আলোচনা, মহাপুরুষদের জন্মতিথি পালন ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি নিয়মিত চলে আসছে। একটি ছোট লাইব্রেরিও আছে আশ্রমে।

বহু পুরানো এই আশ্রমের ঘরবাড়ি অতিশয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং কিছু অংশ প্রায় ধ্বংসের পথে। এমত অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির এবং সাধুনিবাস পুনর্নির্মাণের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মন্দির ও প্রার্থনাঘর, সাধুনিবাস, অতিথিদের জন্য দুটি কামরা, রান্নাঘর, লাইব্রেরি এবং শিশুদের পড়ার ঘর তৈরির জন্য একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যার খরচ পড়বে আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। শুধু মন্দির ও প্রার্থনাঘরের কাজ যদিও শুরু করা হয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে তা অসমাপ্ত অবস্থায় আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সকলের কাছে আমরা সবিশেষ আবেদন জানাচ্ছি যে, ভারতের এই প্রাচীন ভূখণ্ডে স্থাপিত ঐতিহ্যপূর্ণ আশ্রমটিকে অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করতে তাঁরা যেন সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন এবং মন্দির-গৃহাদির পুনঃসংস্কারে ও নির্মাণে তাঁদের যথাশক্তি আর্থিক সাহায্য করেন। আয়কর আইনের ৮০-জি ধারায় এরূপ দান আয়করমুক্ত। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌ "RAMAKRISHNA ASHRAMA, CALICUT, QUILANDY"—এই নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

March 20, 1984

বিনীত

স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দ
(SWAMI SIDDHINATHANANDA)
President

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA
SWAMI VIVEKANANDA ROAD,
P. O. MELUR—QUILANDY
DIST. CALICUT, PIN-673305

আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [১৮৫ পৃষ্ঠার পর

আসামে চা ব্যবসায় থাকায়, চা-কর অপেক্ষা, ভারতবাসী অধিক লাভবান; কারণ এই বিদেশী চা-করগণই ভারতীয় দশ লক্ষ কুলিকে অন্ন বস্ত্র দিয়া বজায় রাখিয়াছেন; তাহা ছাড়া কত শত বাঙ্গালী ও আসামী লেখাপড়ার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে উদরান্ন করিয়া খাইতেছে, তাহার কি কেহ হিসাব করিয়া থাকেন? দুই হাজার, চারি হাজার, দশ হাজার একার (তিন বিঘার কিঞ্চিদধিক জমিতে এক একার—Acre—হয়) জমি ঘেরিয়া এক একটি চা-বাগিচা; আবার প্রত্যেক বাগিচায় হাজার হইতে দশ হাজারেরও অধিক কুলি খাটিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন ব্যাপার খানা কি? আজ যদি সাহেবেরা চা ব্যবসায় উঠাইয়া দেন, অথবা আসামে কুলি চালান বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এই দশ লক্ষ লোক কাহার দ্বারস্থ হইবে? হয়, তাহাদিগকে, ফিজি, নিউ গায়েনা, ডামেরেরা প্রভৃতি উপনিবেশে কুলি হইয়া যাইতে হইবে, না হয়, অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে, কিম্বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

দেশের কোন্ শ্রেণীর লোক কুলিগিরি করিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন, তথাপি কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংবাদ,—দেশীয় সংবাদ পত্রে দেখা যায় যে, রমণী মহিলা, কুলকামিনী প্রভৃতিকে প্রলোভন দেখাইয়া আসামে চালান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা চা-বাগিচায় কিছু দিবস থাকিয়াছেন, যাঁহাদিগের চা-বাগান সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না যে, ঐ শ্রেণীর মহিলা কুলকামিনী বা রমণীকে চালান দেওয়া হইয়াছে। যে সকল "মোটা" অর্থাৎ নীচ শ্রেণীর পুরুষ মানুষ ও "মাইকী" অর্থাৎ নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোক, কুলি হইয়া আসাম যায়, তাহারা স্বদেশে থাকিয়া কখনও তাহাপেক্ষা ভাল কাজ করিত না, ইহা নিশ্চয়। স্বদেশে থাকিয়া অনেক সময়ে দুইবেলা দূরের কথা, একবেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পাইত কি না সন্দেহ। আর তাহাদিগের দেশের ঘর দুয়ার বা কিরূপ, তাহাও লেখকের দেখিতে বাকী নাই। তাহার পরে কুলকামিনীর অপহরণ হওয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা দেখা যাউক। ভদ্রেতরনির্ব্বিশেষে সতী স্ত্রীলোক সহস্রবার অরক্ষিত হইলেও পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। যাহারা তথাকথিত হৃত হয়, তাহারা নষ্টা ভ্রষ্টা ভিন্ন আর কি? সতী স্ত্রীলোক আড়কাটির সংস্পর্শে আসিবার কারণ কি? যাহারা আইসে, তাহারা স্ব স্ব কু-অভিলাষ সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আসে। তবে পরে যে, সময়ে সময়ে একটা গণ্ডগোল উঠে, সে কেবল তাহার আত্মীয় স্বজনের মমতা হেতু, কিম্বা চা-বাগিচায় গিয়া তথাকার পরিশ্রম খাটুনি দেখিয়া তথা হইতে পলাইবার ইচ্ছা বশতঃ। চা-বাগিচায় অত্যাচারের কথা শ্রুত ছিলাম বলিয়া, দুই চারিটা অত্যাচার দেখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আপশোসের বিষয় এই যে, এতগুলি বাগিচা ঘুরিলাম, এবং এক এক বাগানে এক সপ্তাহ হইতে ৪/৫ সপ্তাহ থাকিয়া আসিলাম, লোক জনের সঙ্গেও মিশিয়া আসিলাম, সংবাদ পত্রে লিখিত অত্যাচার একটা দেখিতে পাইলাম না। পরন্তু চা-করগণ কুলিদিগের

অগ্রহায়ণ ১৩৯০ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

(চৈত্র, ১৩১০, পৃঃ ২০৯)

[পুনর্মুদ্রণ]

উপর কৃপাপরবশ, ইহাই আমার ধারণা হইল। দশ লক্ষ কুলির মধ্যে কোথায় কবে একটা কুলি-রমণীর প্রতি অশিষ্টাচার হইয়াছে, তাহা ধর্ত্তব্যই নহে। এ প্রকার ত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে কি তাহা হইতেছে না? তবে, দেশের জন্য যদি প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, যদি কেহ এই নিঃসহায় কুলিদিগের জন্য কখনও ভাবিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে।

চা-বাগিচা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে উহার ব্যাপার উপলব্ধি করা যায় না। এক একটি চা-বাগানের আয়তন হাজার হাজার বিঘা; এক হাজার, দুই হাজার, পাঁচ হাজার, সাত হাজার বিঘার বাগান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই সকল বাগানকে আবাদে রাখিতে হইলে, কত লোকজন, কত মূলধনের আবশ্যক তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। আসামের ন্যায় জনহীন প্রদেশে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে কুলি আমদানী করিয়া আবাদ করা যে কত টাকার খেলা, তাহা ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা একরূপ অসাধ্য। কুলি-সংগ্রহের প্রণালী ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবে তাহাতে কিরূপ ব্যয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করি নাই। এক একটি কুলি সংগ্রহ করিতে সত্তর, আশী, নব্বই টাকা খরচ পড়িয়া থাকে; ন্যূন কল্পে যদি সত্তর টাকা খরচ পড়ে, তাহা হইলে একশত কুলির জন্য ৭০০০ সাত হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়া থাকে; যে বাগানে পাঁচ হাজার কুলি আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে কত ব্যয় পড়িয়াছে, তাহা পাঠক পাঠিকাগণই হিসাব করিয়া দেখুন! কুলি-সংগ্রহ কার্যে যে এত টাকা খরচ পড়ে, তাহা কিছু অসঙ্গত নহে, কারণ সংগ্রহকালে কুলিদিগকে কিছু নগদ টাকা দেওয়া আবশ্যক, তাহার পর সংগৃহীত কুলিগণ যাবৎ না বাগানে চালান হয়, তাবৎ স্থানীয় ডিপোতে উহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিতে হয়;—কাপড় দিতে হয়, কম্বল দিতে হয়;—অনন্তর সংগ্রহের স্থান হইতে চা-বাগান পৌঁছিবার তাবৎ খরচা, মায় দুই বেলার খোরাকী দিতে হয়। পশ্চিম অঞ্চল হইতে কুলি আনিতে হইলে কলিকাতার ডিপোতে কয়েক দিবস তাহাদিগকে থাকিতে হয়;—পরে হাকিমের সম্মুখে এগ্রিমেণ্ট রেজিষ্টারী হইলে, শিয়ালদহের রেলযোগে তাহারা গোয়ালন্দে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে ষ্টিমারে আসামের নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে পৌঁছে। কুলিদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত হইলে চিকিৎসা করিবার জন্য প্রত্যেক ষ্টিমারে একজন করিয়া ডাক্তার আছেন। বার মাসই প্রত্যেক বাগানে কুলি সরবরাহ করিতে হয়। এই জন্য প্রতি ষ্টিমারেই কুলি চালান হয় এবং মফঃস্বলে বারমাস কুলি-সংগ্রহ কার্য্য চলিয়া থাকে। কুলিগণ যদি অজর অমর হইত এবং বাগিচার আয়তন প্রতি বৎসর বর্দ্ধিত না হইত, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত কুলি চালান করিবার আবশ্যক হইত না। এই ত গেল কুলি-সংগ্রহের কথা।

আসামের জমিদার—গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং। জমির পাট্টা পত্তনি বা বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের হস্তে। আসামের জনহীনতা বশতঃ গবর্ণমেণ্ট স্বল্প হারে জমির বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, এই জন্য বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা আসামের জমির হার অনেক কম এবং মেয়াদও ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত। চা-বাগানের জমি মাত্রেই উক্ত মেয়াদে প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকে। চা ভিন্ন অপর কোন আবাদ করিবার জন্য জমির আবশ্যক হইলেও, উল্লিখিত নিয়মে উহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

(৮৬তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২১০)

আবহমানকাল পতিত অথবা গভীর জঙ্গলময় স্থানই চা আবাদের উপযোগী এবং এই প্রকারের জমিই গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা যেমন ইচ্ছামত বাটী পলাইবার জন্য দেশের নিকট, রেলের বা নদীর নিকট কার-কারবারের স্থান নির্ব্বাচন করি, ইংরাজ কিন্তু তাহা যে করেন না, তাহার প্রথম প্রমাণ, তাঁহাদিগের ইংলণ্ড হইতে ভারতে আগমন এবং স্বর্গতুল্য শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের দেশে, ঘোর ম্যালেরিয়ার দেশে অবস্থান। স্থানের দূরত্ব আর হাওয়ার উপযোগিতা, যাতায়াতের সুবিধা প্রভৃতির কথা, কার-কারবার বা ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইংরাজের মনে স্থান পায় না ; সুতরাং সাহেবেরা সুদূর ও গভীর জঙ্গলে গিয়া জমি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন এবং অল্পদিন মধ্যেই সেই স্থানকে ইন্দ্রালয় তুল্য করিয়া তুলেন। যে গভীর জঙ্গল নিধন করিয়া আবাদ করিতে হয়, তাহাতে কত টাকা জলের মত খরচ করিতে হয়, কত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, কত ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার আবশ্যক, কত শীতল মস্তিষ্কের আবশ্যক, তাহা যদি বাহিরের লোক জানিতেন, তাহা হইলে কোথায় একটা কি ঘটনা হইয়াছে, তাহা লইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল এক করিতে ইতস্ততঃ করিতেন।

কুলিগণ মূর্খ ও বর্ব্বর, তাহাতে যদি তাহাদিগকে এক স্থানেই থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত মারামারি, দাঙ্গা, হল্লা ও বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারে বলিয়াই, বোধ হয় বাগানের তাবৎ কুলিকে এক স্থানে থাকিতে না দিয়া, বাগিচার স্থানে স্থানে উহাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুলিদিগের বাসস্থানকে লাইন (line) কহে। প্রত্যেক লাইনই এক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ন্যায় এবং এই সকল লাইনে ৫০।৬০ কি শতাধিক লোক বাস করিবার উপযোগী ঘর আছে। এই সকল ঘর খড়ো, এবং কাঁচা দেওয়াল বিশিষ্ট, কোন কোন বাগানের কুলিদিগের ঘরের দেওয়াল ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা। প্রত্যেক লাইনের মধ্যে দুই একজন সর্দ্দার থাকে। প্রত্যেক লাইনই একরূপ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট সর্দ্দারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকে। মারামারি দাঙ্গা না হয়, কুলিগণ না পলাইয়া যায়, এই সকল দেখিবার জন্য সর্দ্দারগণের তথায় থাকিবার ব্যবস্থা। বাঙ্গালা বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পথঘাট যেরূপ সুগম, আসামের সেরূপ নহে। তৎপ্রদেশে একে ত রাস্তাঘাট অতি কম, এবং তাহাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহ বশতঃ বিচ্ছিন্ন, আবার এতই জঙ্গলময় এবং হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ যে, সহজে পলাইয়া কোথাও যাইবার যো নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কুলিগণ এক বাগান হইতে পলাইয়া গিয়া অন্য বাগানে আশ্রয় লইত ; কিন্তু তাহাতে সকল বাগানেরই ক্ষতি হইতে দেখিয়া, এক্ষণে সকল বাগানেরই মালিকগণ মিলিত হইয়া নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন পলাতক কুলিকে কেহ ত আশ্রয় দিবেই না, অধিকন্তু পলাতক কুলিকে তাহার নির্দ্দিষ্ট বাগানে পৌঁছছিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পলাতক (এগ্রিমেণ্টের) কুলি আইনানুসারে দণ্ডনীয় ; তথাপি কিন্তু কুলি-পলায়নের কথা মধ্যে মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়।

চা-কর সাহেব কর্ত্তৃক কুলিগণ মধ্যে মধ্যে নিগৃহীত হইয়া থাকে সত্য কিন্তু দেখিতে হইবে, তৎপক্ষে প্রকৃত দোষী কে ? এক একটি কুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে কত টাকা খরচ পড়ে, তাহাদিগকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য প্রত্যেক বাগানে ডাক্তার ও ডাক্তারখানা এবং হাঁস-পাতাল রাখিতে মাসিক কত খরচ পড়ে, এরূপ অবস্থায় একটা কুলি পলায়ন করিলে বা কার্য্যে

(চৈত্র, ১৩৯০, পৃঃ ২১১)

অবহেলা করিলে কত ক্ষতি হয়, তাহা কি কেহ স্থির ভাবে বিচার করিয়াছেন? যে সকল কুলি বিনয়ী ও কার্য্যকুশল,—যাহারা কাজের সময় কাজে অবহেলা করে না, তাহাদিগের উপরে কখন পীড়ন বা অত্যাচার হওয়া কিরূপে সম্ভব? তুমি আমি যখন নিজের কাজের জন্য দুই পাঁচটা কুলি, ঘরামী বা রাজমজুর নিযুক্ত করি, তখন যদি কাজের সময় তাহারা দুই মিনিট গল্প করে, অথবা তামাকু সেবনে পাঁচ মিনিট সময় কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে যে আমরা ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ি, তাহাদিগকে যথেচ্ছা তিরস্কার করি; কখন কখন দুই এক ঘা দিতেও কি ছাড়ি? সামান্য কারণেই যদি আমরা মেজাজ হারাইয়া ফেলিতে পারি, তখন পাঁচ, সাত, কি দশ হাজার এই বন্য বর্ব্বর লোকের সহিত কারবার করিতে যে সাহেবদিগের মধ্যে মধ্যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? এই শ্রেণীর লোক লইয়া যাহাকে কাজ করিতে হয়, তাহার পক্ষে একেবারে দয়াশীল ও ধীর মেজাজ হইয়া কাজ করা কোন রূপে সম্ভব নহে। সামরিক আইনের (martial law) বিভীষিকা আছে বলিয়াই, নগণ্যসংখ্যক পদস্থ কর্ম্মচারী (officer) দ্বারা লক্ষ লক্ষ সৈন্য পরিচালিত হইতেছে; সামরিক আইন না থাকিলে সেই অসভ্য ও বর্ব্বর সৈন্যগণ একদিনে মহা বিপ্লব বা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিত। নৌবিভাগে কঠিন আইন প্রচলিত আছে বলিয়াই, একজন অধ্যক্ষ শত শত মূর্খ নাবিক লইয়া সমুদ্রে পোত চালাইতে সক্ষম হয়েন। কোন চোরকে যদি বলা যায় যে, "মহাশয়, আপনি কি, চুরি করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, বামাল কোথায় রাখিয়াছেন বলিয়া বাধিত করুন, আর আপনি গঙ্গাজল লইয়া শপথ করুন যে, আর কখন চুরি করিবেন না", ইত্যাদি সসম্মানে সম্ভাষণ করিলে কি তাহার পেটের কথা পাওয়া যাইবে, না সে অপহৃত দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া চৌর্য্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে? পিছমোড়া বন্ধন, চাবুকের আঘাত, অবশেষে ঠাণ্ডা ঘরে প্রেরণ ভিন্ন, সে কিছুতেই সকল কথা স্বীকার করিবে না, অবশেষে আইনানুসারে দণ্ড না দিলে তাহার গা মত ঔষধ হইবে না। তাহাতেই বলি যে, চা-বাগানেই বল, আর অন্য কোন কাজেই বল, যেখানে এই শ্রেণীর লোক লইয়া কাজ করিতে হয়, তথায় একটু কঠিন না হইলে সুশৃঙ্খলে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর বলিয়া মনে হয়।

অতি প্রত্যূষ হইতেই সর্দ্দারগণ প্রতি লাইনে গিয়া, মহা চীৎকার ধ্বনি করিয়া কুলিদিগকে ডাকাডাকি করিতে থাকে। কুলিগণ সহজে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে চাহে না, কাজেই প্রথম চীৎকার, পরে গালাগালি, অবশেষে বেত্র চালনা ব্যতিরেকে তাহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় না। শীতকালে কুলিগণ একেবারে আহার করিয়া প্রাতে আট ঘটিকার সময় কাজে বাহির হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রাতে সাতটার সময় বাহির হইতে হয় এবং দ্বিপ্রহর কালে দুই ঘণ্টা ছুটী পায়; সুতরাং বেলা ১টার সময় কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি করে এবং পুনরায় ২টার সময় দ্বিতীয়বার কাজে গিয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ করে। পাঁচটার ঘণ্টা বাজিলেই সে দিবসের জন্য তাহাদিগের কাজের শেষ হইল।

অপরাহ্ণে ৫ টার পর কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলে স্ব স্ব কাজে প্রবৃত্ত হয়। স্নান ও গাত্র ধৌত করণ, পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করিয়া রন্ধন কার্য্য

আরম্ভ করে। সচরাচর সকল কুলিই প্রায় রাত্রিতে রাঁধিয়া রাখে, রাত্রিতে খায় এবং পরদিন প্রাতে বা মধ্যাহ্নে আহার করে। দিনের বেলায় কাজে যাইবার পূর্ব্বে বা ছুটীর সময় দ্বিপ্রহর কালে রন্ধন করিবার সময় পাওয়া যায় না বলিয়াই, রাত্রিতে রাঁধিবার ব্যবস্থা। দুই বেলা রন্ধন করিতে খরচ কিছু অধিক পড়ে,—এক বেলা রন্ধন করিয়া দুই বেলা খাইবার ইহাও একটি কারণ।

প্রায় সকল কুলিরই (পুরুষ) বিবাহিত পত্নী অথবা অবিবাহিত ঘরণী আছে; সকল কুলিনীরও তাহাই। সময়ে সময়ে পত্নী বা ঘরণী লইয়া পুরুষ কুলি মধ্যে বিভ্রাট ঘটে, কিন্তু সে বিবাদ, হয় পঞ্চায়েত দ্বারা মিটমাট হয়, না হয়, সাহেবগণ মধ্যস্থতা করিয়া মিটাইয়া দেন। কোন কুলিনী কোন কুলিকে স্বীয় পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বলিয়া থাকে যে, "অমুক ব্যক্তি মোটা ধরিলো";—আবার কোন কুলি, কোন কুলিনী গ্রহণ করিলে, বলিয়া থাকে—"অমুক মাইকী করিলো।" এ স্থলে 'মোটা' অর্থে পুরুষ, আর 'মাইকী' অর্থে স্ত্রীলোক বা মেয়ে মানুষ। 'মাইকী' শব্দটা বোধ হয় বাঙ্গালা 'মাগী' শব্দের রূপান্তর বা অপভ্রংশ। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, কোন 'মাইকী মোটা ধরিলে', অথবা কোন 'মোটা মাইকী করিলে', উভয়কেই কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাগানে অতিরিক্ত এগ্রিমেণ্ট দিতে হয়। ঘরণী বা পুরুষ-গ্রহণে জাতিভেদ দেখা যায় না। এইরূপে সম্মিলিত স্ত্রী ও পুরুষে যথাক্রমে সন্তান উৎপন্ন হইতেছে এবং একটা বৃহৎ সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইতেছে।

রবিবার চা-বাগানের কুলিদিগের ছুটী থাকে এবং সেই দিবসই স্থানে স্থানে হাট বসিয়া থাকে। 'বড় জুলি টী এষ্টেট' সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ বাগানের মধ্যে হাট বসে, আর যেখানে দুই চারিটি বাগান কাছাকাছি আছে, তাহারই কোন সুবিধা মত স্থানে হাট হইয়া থাকে। চাল, ডাল, ঘৃত, ময়দা, লবণ, গুড়, তরি-তরকারি, হাঁস, মুরগী, ডিম্ব, প্রভৃতি যথা সম্ভব আমদানী হয়; কাপড় জামার দোকান, মনোহারীর (stationery) দোকান, জুতার দোকান, নানাবিধ কাচের জিনিসও আমদানী হয়। প্রতি হাটেই মদের দোকানও দেখিতে পাওয়া যায়।

শনিবার বৈকাল হইতেই হাট বসিতে আরম্ভ হয়, অনেকে সেই দিন, অনেকে পর দিন, হাট বাজার করে। রবিবার প্রাতে ঘরের বাহিরে রাস্তার ধারে দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক হাটে চলিয়াছে। কুলিনীরা সেই দিন হাটে যাইবার কালে, ভব্য সভ্য হইয়া, কেশবিন্যাস করত কেহ বা শুভ্র বা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা অঙ্গে জ্যাকেট আঁটিয়া, কেহ বা রৌপ্য বলয় ও পৈঁছা পরিয়া নানা গল্প বা হাস্য পরিহাস করিতে করিতে চলিয়াছে। আবার কত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সন্নিকটবর্ত্তী তড়াগ, পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিতে ব্যস্ত; কেহ বা সাবান বা ক্ষারে কাপড় কাচিতে রত, ইত্যাদি। ফিরিবার কালে সকলে, হস্তে, পৃষ্ঠে বা মস্তকে সাংসারিক দ্রব্যাদি চাল, ডাল, তরকারি, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছে। বাজারের সরাপের দোকানেও খুব ভিড়। বাটীতেও কুলিদিগের আজ খুব আনন্দ; কাজ নাই; ছুটী; দলে দলে একত্রে সকলে সম্মিলিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল বাগানেই ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, কুলির সংখ্যার ন্যূনাধিক্যানুসারে

(চৈত্র, ১৩১০, পৃঃ ২১৩

কোথাও এক বা ততোধিক ডাক্তার থাকে। প্রায় সকল ডাক্তারই পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় এবং নেটিভ ডাক্তার অথবা সে-কেলে বাঙ্গালা ডাক্তার। বড় বড় বাগানে একজন ইংরাজ ডাক্তার থাকেন। এবং তাঁহার অধীনে দুই একজন নেটিভ ডাক্তার থাকেন। ডাক্তারের কার্য্য প্রতি দিবস প্রাতে এবং আবশ্যক হইলে বৈকালেও লাইনে গিয়া সকল কুলির শারীরিক কুশল সমাচার লইতে হয়। সক্ষম রোগী হইলে তাহারা ডাক্তারখানায় আসিয়া ব্যবস্থা-পত্র ও ঔষধ লইয়া যায়। রোগ কঠিন হইলে, রোগীকে বাগানের হাঁসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ডাক্তারখানা ও হাঁসপাতাল সম্বন্ধে সাহেবদিগের নিকট রিপোর্ট পাঠাইতে হয়। বৎসরে শতকরা ৭ জনের অধিক লোক মরিলে, ডাক্তারের পক্ষে তাহা শুভ নহে এবং তাহা হইলে বাগানের নাম গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্ল্যাক বুকে (Black Book) উঠে। উপর্য্যুপরি ৩/৪ বৎসর ঐরূপ হইলে, সে বাগান অস্বাস্থ্যকর বলিয়া গণ্য ; সুতরাং সে বাগান উঠাইয়া দিতে হয়। জেলার সিভিল সার্জ্জন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে প্রত্যেক চা-বাগানে গিয়া স্থানীয় স্বাস্থ্য, কুলিদিগের অবস্থা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া আইসেন এবং যথামত রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে দাখিল করেন। জেলার ডেপুটী কমিশনারকেও সময়ে সময়ে চা-বাগিচা পরিদর্শন করিতে যাইতে হয়। চা-বাগানের কুলি ও অপরাপর লোকজনেরা যাহাতে সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এ জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা সচেষ্ট এবং তাহার জন্য বিবিধ প্রকারের আইন করিয়া দিয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[গীতার ৩য় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের ভাষ্যের শেষাংশ ও বঙ্গানুবাদ, ১৩—১৯ শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ২০ শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য এবং ভাষ্যের প্রথমাংশের অনুবাদসহ।—বর্তমান সম্পাদক]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১৫ই শ্রাবণ। (১৩০৭ সাল) [১২শ সংখ্যা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।] [১৯৩ পৃষ্ঠার পর।

আর এক কথা বোঝ,—অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে, আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট। "যত দিন বাঁচি, তত দিন শিখি।" তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এই মাত্র। আর, আসলটা সর্ব্বদা বাঁচিয়ে, বাকী জিনিস্ শিখ্‌তে হবে। বলি, খাওয়া ত সব দেশেই এক; তবে, আমরা পা গুটিয়ে ব'সে খাই, বিলিতিরা পা ঝুলিয়ে ব'সে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা বলে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাক্‌তে হবে? আমার পা যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টন্‌টনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে এদের খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মত করে,—পা গুটিয়ে, আসল জাতীয় চরিত্রটী বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান পুরুষ যে পোষাকই পরুক না কেন, লোকে মানে; আর, আমার মত আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।

এখন, গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে প'ড়লো; তবে দুদেশ তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর। এরাও ভাল,—আমরাও ভাল, "কাকো বন্দি, কাকো নিন্দি, দুয়ো পাল্লা ভারি।" তবে, ভালর রকমারি আছে, এই মাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনটা জিনিস্। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন। প্রথম, শরীরের কথা দেখা যাক্, যা সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিস্।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক, মুখ, গড়ন, লম্বা, চৌড়াই, রঙ্গ, চুল, কত রকমের তফাৎ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙ্গের তফাৎ বর্ণসাঙ্কর্য্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে; কিছু পরিবর্ত্তন, অবশ্য, হয়; কিন্তু, কাল সাদার আসল কারণ, পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লারঙ্গ-জাতি দেখা যাচ্ছে, এবং, অতি উষ্ণ দেশেও ধপ্‌ধপে ফর্‌সা জাতি বাস কর্‌ছে। কানড়া-নিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরু সন্নিহিতদেশনিবাসী এস্কুইমো খুব ময়লা রঙ্গ, আবার মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপেও সাদারঙ্গ আদিম জাতির বাস; বোর্ণিও, সেলিবিস্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত, এবং চীন, হূণ, দরদ্, পহ্লব, যবন, এবং খশ, এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এরা হ'চ্ছেন আর্য্য। শাস্ত্রোক্ত চীনজাতি এ বর্ত্তমান 'চীনেমান' নয়; ওরা ত সেকালে নিজেদের 'চীনে' বল্‌তই

না। 'চীন' ব'লে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব্বভাগে ছিল; দরদ্‌রাও যেখানে এখন ভারত আর আফগানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, ঐ খানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দুদশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারম্বার দরদ্‌রাজের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূণ নামক প্রাচীন জাতি অনেকদিন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূণ বলে; কিন্তু, সেটা, বোধ হয়, "হিউন"। ফল, মনুক্ত হূণ আধুনিক তিব্বতীও নয়; তবে এমন হ'তে পারে যে, সেই আর্য্য হূণ এবং মধ্য-আসিয়া হ'তে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে, বর্ত্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং ডুাক্‌ড় অর্‌লিআঁ নামক রুষ ও ফরাসী পর্য্যটকদের মতে, তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য্য-মুখ-চোখ-বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়। যবন হ'চ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে, যবন এই নামটা 'য়োনিয়া' নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়; এজন্ত মহারাজা অশোকের পালি লেখে 'যোন' নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশি কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে যবনশব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। যবন শব্দই আদি শব্দ, কারণ স্বধু যে হিঁদুরাই গ্রীক্‌দের যবন বল্‌ত, তা নয়; প্রাচীন মিশরী ও বাবিলরাও গ্রীক্‌দের যবন নামে আখ্যাত করত। পহ্লব শব্দে পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। খশ শব্দে এখনও অর্দ্ধ সভ্য পার্ব্বত্য দেশবাসী আর্য্যজাতি; এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশদের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্য্য-জাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্য্যদের লাল্‌চে সাদা রঙ্গ, কাল বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ্গ ভেদে, একটু তফাৎ। যেথানে রঙ্গ কাল, সেখানে অন্যান্য কাল জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে, এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দুচার জাতি এখনও পুরো আর্য্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত, নইলে কাল কেন হল? কিন্তু, ইউরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লালচুল জন্মায়, কিন্তু দুচার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

এখন পণ্ডিতরা লড়ে মরুন। আর্য্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য্য, বস্। কাল ব'লে ঘৃণা হয়, ইউরোপীরা অন্য নাম নিনূগে। আমাদের তায় কি?

কিন্তু কাল হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী, সুন্দর। একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না। কিন্তু একথা জগৎ প্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অন্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে, বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী করবার চেষ্টা। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে, ছোঁড়া বলে, ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী।

(৮৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২১৩)



৮৬তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৯১

দিব্য বাণী

উত্তমাদীনি পুষ্পাণি বর্তন্তে সূত্রকে যথা।
উত্তমাদ্যাস্তথা দেহা বর্তন্তে ময়ি সর্বগে॥
যথা ন সংস্পৃশেৎ সূত্রং পুষ্পাণামুত্তমাদিতা।
তথা নৈকং সর্বগং মাং দেহানামুত্তমাদিতা॥
পুষ্পেষু তেষু নষ্টেষু যদ্বৎ সূত্রং ন নশ্যতি।
তথা দেহেষু নষ্টেষু নৈব নশ্যামি সর্বগঃ॥

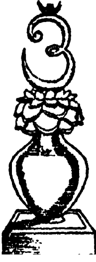
—শঙ্করাচার্য

যেমন একটিমাত্র সূত্রে ভাল-মন্দ নানা পুষ্প গ্রথিত থাকে, তেমনই সর্বত্র বিদ্যমান আমাতে (আত্মাতে) ভাল-মন্দ নানা দেহ অবস্থান করিতেছে।

পুষ্পের ভাল-মন্দ সূত্রকে স্পর্শ করে না, সেই রকম দেহের ভাল-মন্দ সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, একমাত্র আমাকে (আত্মাকে) স্পর্শ করিতে পারে না।

মালার ফুলগুলি সব নষ্ট হইলেও সূত্র বিনষ্ট হয় না,—দেহ সমুদয় নাশপ্রাপ্ত হইলেও সর্বত্র সমভাবে স্থিত আমি বিনাশ হই না।

[শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-প্রণীত 'অদ্বৈতানুভূতি' গ্রন্থের শ্লোক ৩২-৩৪]



কথাপ্রসঙ্গে

মানবপ্রেমী শঙ্কর : বেদান্ত ও উহার প্রয়োগের পটভূমিতে

"তিনি ভিন্ন তো কিছুই নাই, সবই তো তিনি। আমরা তাঁকে না দেখেই তো অন্য জিনিস দেখি—নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো তাঁ থেকেই এবং তাঁতেই। তরঙ্গ ফেন, বুদ্‌বুদ—জল ছাড়া তো কিছুই নয়।

"...তিনি মাত্র সত্য। আবার তা থেকে যে জীব-জগৎ হচ্ছে, তাও সত্য যদি তাঁকে না ভোলা যায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল। কেন? না, তারা থাকে না। কিন্তু যদি তাঁকে মনে থাকে, তবে বুঝতে পারি মাজেরই খোল, খোলেরই মাজ। 'ময়া ততমিদং সর্বং', 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং' ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়।

"আসল কথা তাঁকে দেখতে হবে। তাঁকে দেখলে আর কিছুই থাকে না। সব তিনিময় বোধ হয়ে যায়।"

—ইহাই চরম বেদান্ত-সিদ্ধান্ত,—সহজ ভাষায় স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র হইতে আমরা জানিয়াছি। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মত লইয়া। উহারই উত্তরে ঐ পত্রখানির অবতারণা। আমরা কিন্তু এখানে উক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্ত এবং উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকটির প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেছি,—শ্রীরামকৃষ্ণের মতকে আপাততঃ বিষয় করা হইতেছে না। কোন সিদ্ধান্ত তাহা যত উচ্চই হউক, যদি সমাজ-জীবনের সহিত সম্পর্কহীন হয়, তবে উহা চিন্তা-রাজ্যের একটি মহামূল্য রত্ন মাত্র,—কিন্তু অব্যবহার্য বলিয়া সংগ্রহশালার শোভা বর্ধন করে শুধু। উহা নিছক দর্শনেরই সম্পদ, সাধ্যবস্তু কখনই নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইতে বর্তমান যুগের মানুষ ইহা স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাঁহাদের শিক্ষা ও সাধনা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে, বৈদান্তিক আত্মতত্ত্বের প্রকৃত মর্মকথা কী। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত নিছক তত্ত্ব নহে। জনহীন প্রান্তরের মাঝে, কিংবা জনপদ হইতে দূরে কোন শ্মশানভূমিতে নিশ্চল আসন পাতিয়া জগৎ ও জীবনের সহিত অসঙ্গতা রক্ষা করিয়া ঐ তত্ত্বকে আত্মগত করার চেষ্টায় পুরুষার্থ নাই—ঠাকুর-স্বামীজীর কৃপায় জগৎবাসী ইহা এখন অনায়াসে বুঝিতে পারে। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, বেদান্ত-তত্ত্বের তড়িৎ-শক্তিকে প্রতি ব্যষ্টি-জীবনে ধরিয়া সমাজের ব্যাপকতর পরিধিতে সঞ্চারিত করিয়া দিতে,—আত্মার শক্তিতে মনুষ্য-জীবনকে দৃপ্ত করিয়া তুলিতে। স্বামী বিবেকানন্দের সেই বনের বেদান্তকে ঘরে আনিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা এখানে স্মরণীয়।

এই বাস্তবমুখিনতাই হইতেছে বেদান্ত-তত্ত্বের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যই বেদান্ত-বিজ্ঞানের চিরন্তন স্বভাব—নচেৎ উহা 'সার্ব-লৌকিক ও সার্বদেশিক' আদর্শ নিশ্চয়ই হইত না। বিস্মৃত এই আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব,—কিন্তু ইহার

অর্থ যেন আমরা এইরূপ না বুঝিয়া বসি যে, তাঁহারা একটি পুরাতন অচল মুদ্রাকে সচল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। জগৎ ও জীবনকে বাদ দিয়া বেদান্ত নহে,—তবে মাঝে মাঝে সমাজের মানুষই অন্ধ মোহের বশে উহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে—নানা বিপর্যয়-প্রভাবে, বিপরীত বাতাসের বেগে। ইহা মানুষেরই দুর্ভাগ্য,—বেদান্তের নিষ্করুণ্য নহে। আচার্য এবং লোকশিক্ষকগণের আবির্ভাবও বার বার হইয়া আসিতেছে, এই দুর্ভাগ্য নিরসনের উদ্দেশ্যেই। বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও 'পূর্বগ শ্রীধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ'—ইহা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দই জানাইয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর এই উক্তি হইতে সুস্পষ্ট যে, যুগ যুগ ব্যাপী প্রবহমান একটি চিরপুরাতন ও সনাতন আদর্শ-স্রোতেই মাঝে মাঝে গতিবেগ সংযোজনের আবশ্যকতা দেখা দেয়—তখনই এক নবীন আবির্ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে,—যেমন ঐ আধুনিকতম 'পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ।'

প্রবহমান সেই নিত্যধারার মূলেও তাই আমরা একই সুরকে ধ্বনিত শুনিতে পাই। যুগে যুগে উহার ব্যঞ্জনায় বিভিন্নতা থাকে ঠিকই, কিন্তু মূল সুরটি এক ও সনাতন। ছান্দোগ্য-শ্রুতির সেই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'-মন্ত্রেও বিচিত্র নামরূপাত্মক সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনার সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং সাম্প্রতিক কালের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'-রূপ বাস্তব বেদান্ত-সাধনের উপদেশের মধ্যে একটি সুন্দর ঐকতান খুঁজিয়া পাইতে অসুবিধা হয় না। গীতোক্ত 'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। / সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥' কিংবা ভাগবতের 'অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। / তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্ ॥' ইত্যাদি মন্ত্রগুলিতে শ্রীভগবানের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা,—জীব-হৃদয়স্থিত পরমাত্মার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা; সর্ব-ভূতান্তর্যামী সেই তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতি-মাদি গড়াইয়া পূজাদির প্রয়াস নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র। অতীতের এই নির্ঘোষের প্রতিধ্বনিই কি আমরা শুনিতে পাই না ইদানীংকালেও?

'ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মন-প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ-সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥'

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের মুখে 'জীবে সম্মানিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান' শুনিয়া জ্ঞানগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যের 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' এই বেদান্ত-সিদ্ধান্তেরই ভাষান্তর মাত্র বোধ হয় না কি? আরও সহজে তাহাই কি শুনি নাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'যত্র জীব তত্র শিব'!

আমরা বলিতেছিলাম, বেদান্ত-সত্য চিরকালই সমান সত্য। কালের প্রয়োজন অনুযায়ী লোক-গুরু আচার্যগণ উহাকে সমাজে উপদেশ দিয়াছেন—প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যথাপ্রয়োজন কিঞ্চিৎ হের-ফের করিয়াছেন,—কিন্তু তাই বলিয়া সত্যের রূপ কদাপি বদলাইয়া যায় নাই। নানা বিপর্যয়ের মুখে স্রোতের ক্ষীণতা দেখা গিয়াছে,—কিন্তু ধারা নিরুদ্ধ হইয়া যায় নাই। আবার শক্তিধর কেহ আসিয়া ঐ ধারাকে পুনরায় পুষ্ট ও বেগবতী করিয়া দিয়াছেন। বেদান্তে সত্যের স্বকীয় রূপটি তাই অবিকৃত,—উহার স্ব-পরিচয় চির অপরিবর্তনীয়। বেদান্ত-তত্ত্বের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে—উহার সমাজমুখিনতা, জীবকেন্দ্রিকতা। মনুষ্য-সমাজ বা জীব-জীবনকে বাদ দিয়া বেদান্তের অনুশীলন কোন যুগেই সম্ভবপর হয় নাই—হইবারও নহে৷ বেদান্তের সার্থকতাই তাহার প্রয়োগে বা ব্যবহারিকতায়,—নিপুণ বাক্‌শিল্প-সমন্বিত সিদ্ধান্তবাক্যগুলির

আবৃত্তিতে নহে। বেদান্তের বরিষ্ঠ আচার্যগণ সকলেই মানবদরদী, মানবিকতাবাদী,—মনুষ্য-সমাজপ্রেমী এই কারণেই। তাঁহাদের জীবন ও সাধন, প্রচার ও পরিশীলন সর্বদাই মানুষের সমাজকে কেন্দ্র করিয়া—মানুষকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া নহে। ইতিহাস এইরূপই সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

*

প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই উদ্ধৃত স্বামী তুরীয়ানন্দের উক্তিটি বেদান্তের তথা তাহার কর্মপরিণতরূপের একটি সর্বোৎকৃষ্ট সহজ বিবৃতি। ব্রহ্মই মাত্র সত্য, ব্রহ্ম হইতেই জীব-জগৎ—বিভিন্ন নাম-রূপাদি।

তত্ত্বদৃষ্টিকে স্থির রাখিতে পারিলে দৃশ্যমান জীব-জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ হওয়াই তো স্বাভাবিক—এবং সেই ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে জীব-জগৎও সত্যই বটে। কিন্তু অজ্ঞানবশে সেই ব্রহ্মকে—এককে বিস্মৃত হইলে জীব-জগৎ তখন মিথ্যা হইয়া পড়ে বৈকি! জগদ্গুরু আচার্যগণের দৃষ্টিতে তাই জগৎ-সংসার—মানুষ, মানুষের সমাজ, সবই ব্রহ্ম! অতএব তাঁহাদিগকে জগৎ-বিমুখ হইতে আমরা দেখিব কি করিয়া? ভগবান ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করকেও আমরা তদনীন্তন সমাজের বক্ষেই বিচরণশীল দেখিতে পাই,—সাধারণ মানুষের সংস্কারকে—তাহার দৈনন্দিন সুখ-দুঃখময় সর্ববিধ আবেগ-অনুভূতি ও বিশ্বাসকে তিনি বেদান্তের ভাস্বরতায় মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষটাকেই যেন তিনি বেদান্তের বিশুদ্ধভাবে জাগ্রত করিবার জন্য আসমুদ্র-হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছেন,—মানুষের ঘুমন্ত আত্মার রুদ্ধ দ্বারে ক্রমাগত ধাক্কা দিয়া দিয়া ফিরিয়াছেন! জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শীর্ষে অবস্থান করিয়াও মাটির পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে তিনি পায়ে পায়ে হাঁটিয়াছেন,—নদ-নদী-তীর্থ-মন্দির সর্বত্র সকলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—নিতান্ত অনাহূতের মতোই তিনি গিয়াছেন! প্রকৃত মানবপ্রেম—যথার্থ মানবতা-বোধ বুঝি ইহাকেই বলে। মানবাত্মার মহিমা-উপলব্ধি হইতেই এই মানবতাবোধের প্রকাশ হইয়াছিল।

তাই যখন কোথাও শুনিতে হয়, শঙ্করাচার্যের বেদান্ত-প্রচারের পরিমণ্ডলটি ছিল জন-সমাজের নাগালের বাহিরে, অথবা সাধারণ মানুষ হইতে বহু উর্ধ্বে, তখন আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অন্য এক ধরনের অনুযোগ আরও বেদনা-দায়ক,—বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তিরও এমন ধারণা লক্ষ্য করা যায় যে, বেদান্ত কেন নিযুক্ত থাকিবে সমাজ এবং সমাজের মানুষের হিত-চিন্তায়? ইঁহাদের কল্পনায় বেদান্ত তথা শঙ্কর-অনুগামী বেদান্তান্বেষী হইবেন সদা আকাশচারী;—জন-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যে কিংবা পর্বত-গুহায় উঁহারা ঠাঁই লইবেন! প্রসঙ্গতঃ মনে পড়িতেছে—কাশীর বিশ্রুত পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ও একদা এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। অমন শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তিরও ধারণা জন্মিয়াছিল, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরা থাকিবেন সমাজ-সংসার হইতে বহু দূরে; তাঁহাদের একান্ত ধ্যান-সমাধি-মূলক জীবনই হইবে গৃহস্থ নর-নারীর পক্ষে দূর-স্থিত সজীব আদর্শ! এদিকে তখন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাগ্নিতে তপ্ত অখণ্ডানন্দ হিমালয় হইতে নামিয়া পল্লীর দরিদ্র মানুষের কুটির-অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! প্রমদাবাবুর ঐ সংশয় নিরসন কল্পে স্বামী অখণ্ডানন্দ যে দুইখানি পত্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, উহার মূল্য অপরিসীম,—বেদান্ত-বিজ্ঞানের রাজ্যে দুইটি অসামান্য প্রমাণ-লিপি। একখানির শেষাংশে এইরূপ ছিল :

'আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে

আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা—দেখছিস্‌নি? এ-কথা যে শোনে তার কি স্থির থাকিবার জো আছে? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন দিতে হইবে বলিতে পারি না।'

ঠিক ইহাই বৈদান্তিক সত্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ইহারই নাম 'Practical Vedanta'—কর্মপরিণত বেদান্ত। ভগবান শঙ্করাচার্য এই বাস্তব বেদান্তকে লোকপ্রিয় করিতে তাঁহার অতি স্বল্পায়ু—মাত্র অষ্টবিংশতি বর্ষের জীবনকে—নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি কি আমরা বলিব—তাঁহার বেদান্ত সর্বজীব-রূপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকে নাই? লোকহিতৈষণা তাঁহাকেও স্থির থাকিতে দেয় নাই? বিবেকানন্দের গুরু বিবেকানন্দকে নিরন্তর সমাধিতেই বুঁদ হইয়া থাকিতে অবসর দেন নাই,—শঙ্করের গুরুও তাঁহাকে আত্মারাম একচর হইয়া পরিভ্রমণের অবকাশ প্রদান করেন নাই। আচার্য গোবিন্দপাদ মহাসমাধিতে বিলীন হইবার প্রাক্কালে বালক শিষ্য শঙ্করকে কাছে ডাকিয়া ইহাই বলিয়া গিয়াছিলেন: বেদান্ত-মর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিয়া ধর্মসংস্থাপন কর। সন্ন্যাসীর মোক্ষ-সিদ্ধির পরে, পরোপকার অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ধর্ম নাই। অতএব যাও বৎস, উহাতেই আত্মনিয়োগ কর।

বস্তুতঃ আচার্য গোবিন্দপাদই শঙ্করকে লোক-কল্যাণে প্রযুক্ত করেন। অতঃপর শঙ্করাচার্যের সীমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে যাবতীয় কর্ম,—সর্বাংশেই তো মানব-সমাজের হিতার্থে উৎসৃষ্ট। তাঁহার ভাষ্য রচনা, মঠ স্থাপনা, তীর্থোদ্ধার, দেবদেবীর লীলা-খ্যাপক স্তব-স্তুতি গ্রন্থনা,—এমন কি তাঁহার বিচার ও পর্যটন পর্যন্ত সকল কিছুরই লক্ষ্য ছিল, তদানীন্তন ভারতের জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক উন্নতি-বিধান,—তাহাদিগকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল হইতে টানিয়া আনিয়া যথার্থ ধর্মের ও সত্যের পথ-নির্দেশ।

সেই যুগেও ভারতবর্ষে ধর্মীয় কুসংস্কার কী বীভৎস আকারে চলিতেছিল, তাহার পরিপূর্ণ চিত্র আধুনিক মানুষের জানা নাই,—তাহাদের কল্পনারও বাহিরে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, উত্তর ভারতের শ্রীনগর (প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র) তখন অনেক কারণেই বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল—ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রাজন্যবর্গের রাজধানী বলিয়া এবং বহু দেবস্থান ও মন্দিরাদির জন্যও বটে। কিন্তু সেখানে বামাচারী তান্ত্রিকগণেরও খুব প্রাধান্য তখন। দোর্দণ্ড প্রতাপ ঐ-সকল তান্ত্রিকগণ কালিকাদেবীর মন্দিরে নরবলি সহকারে পূজা করিতেন,—কোন রাজশক্তির সাধ্য ছিল না ঐ নরবলি প্রথা নিবারণ করিতে। দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ অগত্যা পরিব্রাজক শঙ্করাচার্যের নিকট কাতরে প্রার্থনা জানাইয়া-ছিলেন, ধর্মের নামে ঐরূপ ভয়ঙ্কর নৃশংসতা চির-তরে যাহাতে বন্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে। নির্ভীক যতিরাজ উহাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়াছিলেন,—স্বয়ং ঐ তান্ত্রিকগণের পীঠভূমিতে গিয়া, উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যুক্তিসহ বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া সেই নিষ্ঠুর নরঘাতী ধর্মাচরণ হইতে উহাদিগকে বিরত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। উহাদের রোষাগ্নিতে নিজের জীবনের ক্ষতিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বলির জন্য নির্দিষ্ট বিশাল শিলাখণ্ডকে স্বহস্তে উৎপাটন করিয়া গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে ক্ষণমাত্রও দ্বিধা করেন নাই। উত্তরাখণ্ডে নরবলি চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তখন হইতেই। শঙ্করাচার্য জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—সমাজ হইতে বহু দূরে আপন আনন্দ-লোকেই মাত্র বিরাজ করিলে নিশ্চয়ই এই অসাধ্য সাধন তাঁহার দ্বারা সাধিত হইত না!

অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যাইতে পারে, যাহাতে আচার্য শঙ্করের প্রখর জ্ঞান-দীপ্তির সহিত অপূর্ব স্নিগ্ধ লোকহিতৈষণায় এবং কোমল হৃদয়বত্তায় আশ্চর্য সমন্বয় দেখিয়া অভিভূত হইতে হয়। যেমন, শ্রীশৈলে সেই উগ্রভৈরবের অতি সাংঘাতিক আবদারকেও শঙ্কর সস্নেহে মঞ্জুর করিয়া বসিয়াছিলেন! লোকটি ছিল কাপালিক। তাহার প্রতি নাকি কোন দেবতার স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল যে, কোন নৃপতির, অথবা বিকল্প হিসাবে কোন সর্বজ্ঞ মহাত্মার মস্তক সহ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিলে সে শিবলোকে শিবসন্নিধানে অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে। অতি বিনীত শিষ্যের ন্যায় আচার্যের চরণতলে প্রণত হইয়া তাঁহার সকাশে এমন জঘন্য স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিল ঐ উগ্রভৈরব। বিস্মিত আচার্য স্নেহমাখা ভাষায় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ঐ স্বপ্নাদেশের অবাস্তবতা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,—প্রকৃত সুখলাভের জন্য ঐরূপ বিকৃত বীভৎস ধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া যথার্থ ধর্ম কি তাহা উপদেশ দিয়াছিলেন! কিন্তু উগ্র-ভৈরব নয়নজলের অর্ঘ্য সাজাইয়া আচার্যদেবের পাদবন্দনা করিয়া সেই একই মিনতি বার বার জানাইতে থাকে—তাহার ঐ সুখ-সাধ মিটাইবার জন্য আকুল হইয়া আবদার জানায়। দয়াল শঙ্কর শরণাগত সুখাভিলাষী উগ্রভৈরবকে বলিয়া বসিলেন: 'আচ্ছা তাহাই হইবে। এত উপদেশ শ্রবণের পরেও যদি তোমার ইহাই একান্ত অভীষ্ট হয়, তবে উহা পূর্ণ হউক। কিন্তু আমি তোমাকে মস্তক দিলেও তুমি অতি সংগোপনে কাজ সারিতে পারিবে তো? অন্যথায় যে তোমারই বিপদ হইবে।' যাহা হউক, উগ্রবুদ্ধি উগ্রভৈরব শেষপর্যন্ত কাজ সারিতে পারে নাই। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে নিজেকেই প্রাণ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে-কথা ভিন্ন। আমরা জানিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি যে, জীবদুঃখকাতর মহাজ্ঞানী শঙ্কর একটি অতি হীন-বুদ্ধি পাষণ্ডের সুখবিধানের উদ্দেশ্যেও আপন দেহ বিসর্জনে প্রস্তুত ছিলেন! জীবতরে এত অনুকম্পা! অতি নিকৃষ্ট এক প্রাণীর জন্যও মহামূল্য প্রাণের এমন নিঃশর্ত উৎসর্জন,—মানবেতিহাসে কয়টি নজির আছে তাহা আমাদের জানা নাই!

মূর্তিমান বেদান্ত শ্রীশঙ্কর নিরন্তর জগদতীত চিদানন্দলোকে বিচরণশীল থাকিয়াও এই জড় মলিন সমাজ-সংসার হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, বরং উহার কল্যাণ-প্রয়াসে সদা নিরত ছিলেন,—ইহা তাঁহার আত্যন্তিক মানব-প্রেমেরই পরিচায়ক নহে কি? অবশ্য তাঁহার ঐ মানবপ্রেম ভগবদ্‌প্রেমেরই নামান্তর মাত্র,—পরমাত্মনিষ্ঠারই অপর এক রূপ। সমাজের সর্ব-স্তরের প্রতিই তাঁহার কল্যাণ-দৃষ্টি ন্যস্ত ছিল,—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই তাঁহার মঙ্গল-ভাবনা অবিরাম ব্যাপৃত থাকিত।

কেরলরাজ্যে তখন নানাবিধ সামাজিক অনাচার ধর্মের নামে চলিতেছিল। যেমন সমাজের প্রতিপত্তিবান পুরুষ নানা অছিলায় কুলনারীর দুশ্চরিত্রতার অপবাদ রটনা করিয়া দিয়া তাহার গর্ভজাত নাবালক সন্তানকে ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া বিষয়-সম্পত্তি ভোগদখল করিত। শুধু তাহাই নহে, অপবাদ-কলঙ্কিতা ঐ-সকল নারীর এবং উহাদের হতভাগ্য সন্তানদের ব্রাহ্মণের গৃহে আজীবন দাস্যকর্ম ছাড়া অন্য কর্মে অধিকার থাকিত না এবং ইহারা সমাজে জলাচরণীয় ছিল না। রাজার দৃষ্টি সমাজের প্রতি থাকিলেও তিনি একক শক্তিতে দীর্ঘ-প্রচলিত বহু-অনুসৃত কোন প্রথা রদ করিতে—সমাজ-শরীরের দুষ্ট ক্ষতকে নিরাময় সাধনে সমর্থ ছিলেন না। সমাজ-পতিরাই রাজদ্রোহ করিতেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়া থাকে যে, রাজা রাজশেখর ভগবান শঙ্করাচার্যের শরণাপন্ন হইলে তাঁহারই প্রদত্ত উপদেশ সহায়ে ঐ কঠিন সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ

করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সমাজ-শিরোমণি পণ্ডিতের দল নির্বোধ প্রজা-মণ্ডলীকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া নানা-ভাবে সারা দেশময় রাজদ্রোহিতার আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। সেই দুর্দিনে আচার্য শঙ্করই তাঁহার প্রখর মনস্বিতা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পণ্ডিতকুলকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া দেশব্যাপী নৈরাজ্যকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধগণের তর্কজালকে শঙ্কর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সমাজ হইতে নির্মম কদাচারকে চির-দিনের জন্য মুছিয়া দিয়া সাধারণ জন-চিত্তে শান্তি, স্বস্তি ও ভরসা আনয়ন করিয়াছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে শঙ্করাচার্যকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কঠোর মনে হইলেও ভারতের তদানীন্তন সমাজের মানসিকতা এবং প্রচলিত রীতি-নীতি ও সংস্কারাদির পর্যালোচনা করিলে উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না যে, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়হস্তে ঐ-কালের সমাজ-রথের রজ্জুকে না ধরিলে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সনাতন বৈদিক ধর্মের পরিণতি কি দাঁড়াইত তাহা ভাবিলেও আতঙ্কিত হইতে হয়। মানবের পরম সুহৃদ্রূপেই আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মানুষ প্রকৃত অর্থেই 'মানুষ' হউক,—মনুষ্য-ধর্ম হইতে সে যেন কোন অবস্থাতেই চ্যুত না হয়। শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিতে ছিল, ভারতের চিরপুরাতন সেই সনাতন ঔপনিষদিক শ্রী,—তাঁহার শ্রবণে নিরন্তর অনুরণিত হইত, প্রাচীন ঋষি-কণ্ঠোদ্গীত সেই চিরন্তন ধ্বনি,—স্বামী বিবেকানন্দও যাহাকে বলিয়াছিলেন 'জাতীয় তান।' বর্তমান যুগের মানবমিত্র বিবেকানন্দকেও যাহারা চিনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন, ভারতেতিহাসের দুই প্রান্তে দণ্ডায়মান এই উভয় ব্যক্তিত্বের মাঝে কোথায় যেন এক অপূর্ব অবর্ণনীয় সাদৃশ্য! বোধ হয় তাহা ঐ মানব-মঙ্গলচিন্তায়। মনে পড়িতেছে ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' ভ্রমণ-চিত্রের একটি অসাধারণ অংশ, যেথানে ভগিনীর অনবদ্য বর্ণাঢ্য লিখন :

'তিনি (স্বামীজী) বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে ; আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তার পর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীন-কালে আমরা যে সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।"···আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, "শঙ্করাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, আমার চিরন্তন ধারণা"—বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগময় হইয়া আসিল, এবং দৃষ্টি যেন সুদূরে নিবদ্ধ হইল—"আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মতো কোন এক অলৌকিক দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি ঐরূপে সেই প্রাচীন তানকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, বেদ ও উপনিষৎসমূহের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করাই তাঁহার সমগ্র জীবনের কাজ।" '

বেদান্তই বেদ ও উপনিষৎসমূহের সার সৌন্দর্য,—আর জীবনে বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগ—সমাজে বেদান্তের ব্যবহারিকতাই সেই সৌন্দর্যের প্রকৃত স্পন্দন। এই পটভূমিতে শঙ্করাচার্যকে অবশ্যই দেখিব মহান্ মানবপ্রেমী-রূপে।

শ্রীবিবেকানন্দ-প্রশস্তিঃ

অধ্যাপক শ্রীরামপ্রসন্নভট্টাচার্য-বিরচিতম্

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-লেখক ও কবি। আসাম সংস্কৃত পরিষদের সদস্য। ধুবড়ী ভোলানাথ কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক। বর্তমানে ধুবড়ী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ।

জয় বীরেশ্বর ভারতভাস্কর
সকলকলুষমোহহরণ।
যোগিযুগন্ধর বীর্যপুরন্দর
দুঃস্থপীড়িতজনশরণ॥
ভ্রমণমিতস্তত উত্তরমিচ্ছত
ঈশ্বর ঈক্ষ্যতে কুত্র।
অপগতসংশয় রামকৃষ্ণময়
সারদামানসপুত্র॥
পরিস্রুততামস বিচলিতমানস
নয়নপতিতদেশচিত্র।
জীবকল্যাণ- ধৃতমহাপ্রাণ
নিখিলপৃথিবীচিরমিত্র॥
পরিত্যক্তগৃহ যশসে নিঃস্পৃহ
অনারতকর্মসু যুক্ত।
অকিঞ্চনেশ্বর- সেবাতৎপর
নবজাতশঙ্কর, মুক্ত॥
একবিশ্বচর কাষায়াম্বর
নিষ্কামকাঞ্চনবন্ধ।
প্রেমসুধার্ণব ধৃতজয়গৌরব
বিদূরিত বিত্তাগন্ধ॥

প্রবলশত্রুগণ শস্ত্রহীনরণ
বিজিতবিদ্বেষদ্বন্দ্ব।
গৃহীতবন্ধন কৃতনরবন্দন
শমধন, বিবেকানন্দ॥
বিশ্বধর্মসভ- বিকীর্ণসৌরভ
ধনমদগর্বিতদেশে।
শ্রাবিতভারত- পুণ্যকথামৃত
বিকটিতবিলাসবেশে॥
জ্ঞানামৃতকর জড়তামপহর
যাচতি কাতর জনতা।
ভাবমূর্তিধর পুনরপি অবতর
রোদিতি বসুধাবনতা॥
দবয় সকলভয়- মভয়বরালয়
চরতু দেশেবিদেশে।
অভীরভীরিতি ধৃতদীপ্তাকৃতি-
বাণী জাতক্লেশে॥
নয়নসলিলচয়- মপনয় মোচয়
দুর্গতি জলধৌ মগ্নান্।
জ্যোতির্ময় জয় দর্শয়, চালয়
সৎপথমসৎসুলগ্নান্॥

বিবেকানন্দঃ ব্যক্তি ও আচার্য

স্বামী বোধানন্দ

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য স্বামী বোধানন্দজী নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে 'Vivekananda—The Man and Master' বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'Vedanta Darpan' পত্রিকায় ঐ ভাষণটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দের সহায়তায় এটি সংগৃহীত। মূল ইংরেজী থেকে সরল বঙ্গানুবাদ করেছেন স্বামী চৈতন্যানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে আবির্ভূত, কিন্তু আসলে তিনি সারা পৃথিবীর। তিনি মর্তলোকে ছিলেন মাত্র চল্লিশ বছর, কিন্তু তারই মধ্যে যা তিনি কাজ করে গেছেন, তাতে যেন তিনি চারশ' বছরের এক দীর্ঘ জীবন যাপন করেছেন।

'আমরা বেঁচে থাকি কর্মের মাধ্যমে,
বছরের মাপে নয়;
চিন্তার মাধ্যমে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাপে নয়,
আবেগ-অনুভূতির মাধ্যমে,
ঘড়ির কাঁটার মাপে নয়।
জীবনকে মাপতে হবে হৃদয়ের স্পন্দনে।
দীর্ঘায়ু তারাই যাদের চিন্তা যত গভীর
যাদের ভাব যত মহান্, কর্ম যত নিখুঁত।'

তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত আবির্ভাবের এখনও অনেক বাকী। শাস্ত্র বলেন: এরকম মহাপুরুষের আগমনে কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন্ এবং বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়ে থাকে।* অতএব এহেন মহাপুরুষের,—এমন এক মহান্ আচার্যের আবির্ভাবতিথি স্মরণে আমাদের আজ প্রভাতে এখানে সম্মিলিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা অত্যন্ত পবিত্র কর্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর। তিনি ছিলেন খেলোয়াড়, গায়ক, কবি ও বাগ্মী। আবার তিনি দার্শনিক, দেশপ্রেমিক এবং মহাযোগীও বটে। তাঁকে প্রথম দর্শনের দিনটি এখনও স্পষ্ট স্মরণ আছে আমার। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পক্ষে আমি তখন নিতান্তই বালক। সেটা ছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। খুব সম্ভবতঃ তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির আগে অথবা অল্প কিছু পরে হবে। তিনি একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন—আর আমার মহাসৌভাগ্য হয়েছিল, ঐ স্কুলেরই ছাত্র হতে পেরেছিলাম। অবশ্য মাত্র কয়েক মাসের জন্যই তিনি ঐ পদে ছিলেন,—হয়তো বা কয়েক সপ্তাহ। আমি তাঁকে দেখতাম, আমাদের শ্রেণীকক্ষের জানলা দিয়ে। তখন আমার বয়স ছিল বছর পনের। আমার চোখে তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট অতিমানব, যদিও আমি তাঁর সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কিছুই জানতাম না। কিন্তু শুধু তাঁর ব্যক্তিত্ব, দুটি উজ্জ্বল চোখ—উদাস অথচ মাধুর্যমণ্ডিত গতিবিধি—আমার মনে ঐরূপ রেখাপাত করেছিল। প্রতিদিন সকালে তিনি যখন স্কুলচত্বরে ঢুকতেন তখন আমি তাঁকে লক্ষ্য করতাম। যদিও তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি, তবুও তিনি আমাকে মোহিত করে ফেলেছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধুদের সংস্পর্শে আসি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দই হয়েছিলেন ঠাকুরের সন্তানদের নেতা। কলকাতার উপকণ্ঠে

* কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।

—প্রায় চার মাইল উত্তরে (বরাহনগরে) একটা বাড়ি ভাড়া করে তাঁরা থাকতেন। বাড়িটা এমন ভগ্নদশায় ছিল যে, কেউ সেটা ভাড়া নিতে বা সেখানে থাকতে সাহস পেত না। অনেকের ধারণা ছিল যে, ওটা একটা ভুতুড়ে বাড়ি। যাই হোক, কোন চোর, ডাকাত, ভূত-প্রেত বা জন্তু-জানোয়ারের দ্বারা উপদ্রুত না হয়েই ঐ গৃহ-ত্যাগী সাহসী তরুণরা ঐ বাড়িটা ভাড়া নিয়ে সেখানেই আশ্রম করলেন। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, ঠিক ঐ সময় স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না,—তিনি প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছিলেন। খুব সম্ভব তখন তিনি হিমালয়ের কেদার-বদরী তীর্থাদি পর্যটনে ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি তখন আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছিলেন—কেউই সঠিক জানতেন না, তিনি সে-সময়ে ভারতের কোন্ দিকে পরিভ্রমণ করছেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত ছেড়েছিলেন চিকাগোতে ধর্মমহাসভায় বেদান্ত-ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে। চার বছর তিনি এই দেশে ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি আবার ভারতে ফিরে যান। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে—তাঁর ভারতে পৌঁছানোর ঠিক কয়েক সপ্তাহ পরে আমি তাঁকে প্রথম দর্শন করি। সময়টা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবতিথি। ফেব্রুআরি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ তখন কল-কাতায় গঙ্গাতীরে এক সম্পন্ন বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। মঠ ছিল আরও প্রায় তিন মাইল উত্তরে। জন্মতিথির ঠিক আগের দিন আমি মঠেই রাত্রিবাস করেছিলাম এবং পরের দিন ভোর পাঁচটা নাগাদ মঠ থেকে যাত্রা করে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে গিয়েছিলাম। তিন মাইল পথ আমাকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল এবং যখন গিয়ে ঐ বাড়িতে পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে প্রায় ছটা। জানলার কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন,—আমার প্রথম দর্শন। তিনি খুব ভোরে উঠতেন। আমার দেখার চেয়েও জানলা দিয়ে স্পষ্টতরভাবে তিনিই আমাকে দেখেছিলেন। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছি—দেখি তিনি নিজেই তিনতলা থেকে চুপচাপ নেমে আসছেন। দরজা খুলে দিয়ে তিনি বললেন যে, এই ভোরে অপর কাউকে তিনি বিরক্ত করতে চান না। আমি প্রণাম করতেই তিনি বললেন: 'এস বাছা, খুব খুশি হয়েছি তুমি আসাতে।' সাধুদের মধ্যে কেউ হয়তো কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলে থাকবেন যে, কিছু যুবক তাঁদের কাছে আসা-যাওয়া করছে এবং তাদেরও ইচ্ছা সাধু হবার। তাই মনে হল, তিনি যেন ধরে নিয়েছিলেন যে, আমিও ঐ দলেরই একজন। অবশ্য তাঁর ধারণাটাই ঠিক। আমাকে তিনি বললেন: 'আমি মুখ ধোব, তুমি একটু জল আনতে পারবে? পরে তুমি আমার সঙ্গে প্রাতরাশ করবে—একটু থাক।' আমি উত্তর দিলাম: 'আমরা তো সকালে কিছু খাই না।' শুনে তিনি বললেন: 'বেশ তো, শুধু এক কাপ কফি খেতে পারবে।' উত্তরে আমি বললাম: 'কফির জন্য নয়,—আমি এমনিই থাকব।' খানিক বাদে আমরা মঠে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে স্নান ইত্যাদি সেরে কয়েকজনকে তিনি দীক্ষা দিলেন। প্রায় বেলা ১১টার সময় আমি মঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে চলে গেলাম, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। ঐ সময় সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ ছিল এবং পরে আরও হাজার পঞ্চাশেক এসেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিটাই ছিল সেখানে প্রধান আকর্ষণ। তিনি সাত-আট বছর দেশে ছিলেন না, তাই ঐ বিপুল জনতা তাঁকে দর্শন করার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু

বেলা একটা বাজতে না বাজতেই জনতার ভিড় এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তিনি এক পাও অগ্রসর হতে পারছিলেন না। বাধ্য হয়ে আমাদের একটা গাড়ি ভাড়া করে স্বামী বিবেকানন্দকে মঠে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। বেশ গরম ছিল, যদিও তখন ফেব্রুআরি মাসের শেষ সপ্তাহ। সেদিন সারাটা বিকাল তাঁর সান্নিধ্যে থাকার এক মহা সুযোগ আমার হয়েছিল। পরের দিন বাড়ি ফিরে আসি।

দীর্ঘ সে-কাহিনীকে সংক্ষেপে বলছি—বছর দুই পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আমি সংসারত্যাগ করে মঠে চলে এলাম। তখনই তিনি আমাকে দীক্ষা প্রদান করেছিলেন। দীক্ষার পূর্ব দিনটির কথা এখনও আমার স্মরণ আছে। আমার শ্রদ্ধাকে যাচাই করার জন্য আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'ধর, আমি তোমাকে নদীতে নেমে কুমির ধরে আনতে বললাম, তুমি তা পারবে তো? অথবা আমি যদি তোমাকে বলি কামানের মুখে যেতে তুমি কি তাও পারবে? আবার এমনও যদি ঘটে,—আমি হয়তো কাল খুব অসৎ হয়ে গেলাম, তবুও কি তুমি আমাকে ভালবাসবে?'

আমি অবশ্য একটুখানি চিন্তা করেই জবাব দিয়েছিলাম: 'স্বামীজী, আপনি যদি কখনও কামানের মুখে যেতে আমাকে আদেশ করেন, আমি নিশ্চয়ই তাতে উদ্দীপিত হব, কিন্তু যদি এক্ষুনি আদেশ করেন, তাহলে হয়তো নাও পারতে পারি।' তিনি বললেন: 'তোমার উত্তরে আমি খুশি। আমি জানি, তুমি আবেগপ্রবণ নও।' তাঁর অপর একটি প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম: 'আপনার দোষগুণ বিচার করতে আমি চাই না। আমি আপনাকে ভালবাসি এবং মনে করি এই ভালবাসা অব্যাহতই থাকবে—এমনকি বিপরীত কিছু ঘটলেও।' তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব,—প্রতি পদক্ষেপে তিনি ছিলেন রাজা। তারপর মেধা এবং করুণায়,—যদি সঠিক শব্দেই অভিহিত করতে হয়, তাহলে বলতে হবে, তিনি ছিলেন অতি-মানব।

বন্ধুগণ, আমি বোধ হয় আপনাদের কাছে অনেকবারই বলেছি যে, কোন রকম অতীন্দ্রিয় সত্তায় অথবা কাল্পনিক বিষয়ে,—যেমন মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বা ঈশ্বরে আমি একটু সন্দেহ-প্রবণ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আমি ও-সবে বিশ্বাস করি না,—তবে তা প্রত্যক্ষ করিনি। আমার কাছে ঐগুলি বরং নিছক অনুমান মাত্র। যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কিনা। সত্যি কথা বলতে কি,—'ঈশ্বর থাকলে থাকুন, কিন্তু আমি তো এখনও তাঁর দর্শন পেলাম না।' যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী অথবা যদি কোন ব্যক্তি বলেন, তিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁদেরও বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমি কিন্তু সব সময় বলব: 'আমি জানি না; তিনি আছেন হয়তো—আবার নাও থাকতে পারেন। ভবিষ্যতেও আমার ঐ একই মনোভাব থাকবে। তবে একথা আমি সুনিশ্চিত বলতে পারি যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতো পুরুষই আমার কাছে মূর্তিমান ঈশ্বর। শুধু ঐসব মহান্ ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের ধারণা করতে পারি। যাক, ঐসব অনুমান নিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমি যা দেখেছি এবং প্রত্যক্ষ করেছি আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। একদা শ্রীরামকৃষ্ণ এই গল্পটি বলেছিলেন: একটি লোক শুঁড়ির দোকানে মদ কিনতে গিয়েছিল। সে শুঁড়িকে জিজ্ঞাসা করল তার দোকানে কত মদ আছে। শুঁড়ি বলল: 'প্রচুর মদ আছে। তুমি কতটা খেতে চাও—এক বা দু বোতল? তা আমি তোমাকে দের দিতে পারব।'

আমার যা দরকার, তা আমি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই পেয়ে গেছি। তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতে আমার অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা তৃপ্ত হয়েছে। আর যা আমার প্রয়োজন নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামানোরও দরকার মনে করি না। আমি ব্যক্তিত্বের পূজারী বা সগুণ উপাসক। ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে উচ্চতর সত্যগুলি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। আমার কাছে স্বামী বিবেকানন্দ মানব—অতি-মানব—একজন দেব-মানব।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি কাশীতে এসেছিলেন। আমি তখন হিমালয়ের পাদদেশে হৃষীকেশের এক কুঠিয়ায় ছিলাম। যখনই শুনলাম তিনি কাশীতে রয়েছেন, তখনই তাঁকে দর্শন করতে নেমে গেলাম। একজন রাজা সেখানে একটি আশ্রম তৈরি করতে স্বামীজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, ঐ কাজে আর্থিক সাহায্য করবেন। স্বামীজী রাজার ঐ দান গ্রহণ করে আমাকেই ঐ আশ্রমের ভার নিতে আদেশ করেছিলেন। আমি কিন্তু নিজের অক্ষমতা ও অসামর্থ্য সম্বন্ধে এত সজাগ ছিলাম যে, মুখ ফুটে 'হ্যাঁ পারব' বলার সাহস তখন মোটেই পাইনি। আমি বলেছিলাম: 'কাশীতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন, বহু প্রতিষ্ঠানও আছে,—সেখানে আমা হেন একজন কি কাজ করবে?' তিনি তাতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন: 'হ্যাঁ, আমি জানি কাশীতে অনেক পণ্ডিত আছেন। কিন্তু আমি চাই তুমিই নিজেকে প্রকাশ কর এবং তুমি যা জান তাই লোককে বল। যদি তোমার নিজস্ব কোন ভাব থাকে এবং তা সুস্পষ্ট প্রকাশ করতে পার, তাতেই লোক প্রভাবিত হবে।'

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব শুধু মৌলিকই ছিল না—তিনি মৌলিকতার প্রেরকও বটে। তিনি অন্যের মধ্যে মৌলিকতাকে প্রশংসা করতেন। একবার একজন বেশ শিক্ষিত—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। (আপনারা জানেন, এ ধরনের কিছু নবীন, একটু ফিটফাট ধরনের এবং পণ্ডিতি মেজাজের হয়ে থাকে।) শিক্ষিত যুবকটি বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি তুলে তুলে খুব পাণ্ডিত্য জাহির করছিলেন। তাঁর কথা শেষ হওয়ার পরেই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: 'আচ্ছা বাবা, তুমি তো দেখছি বেশ পণ্ডিত লোক, তবে তুমি কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করনি যা তোমার নিজস্ব।'

এবার বলছি, তাঁর কী ভালবাসা! তাঁর জ্ঞানের চেয়েও ভালবাসা আমাকে বেশি মুগ্ধ করেছিল। তিনি ক্লাস নিতেন। তাতে মঠের সাধুরা যোগ দিতেন। এটা নয় যে, আমি তাঁর ক্লাসে কখনও যেতাম না। তবে ক্লাসে যাওয়া অপেক্ষা আমি তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতাম বেশি,—যেমন তাঁর বিছানা পাতা বা তাঁর জন্য কিছু রান্না করা অথবা তিনি যেখানে হাঁটতেন সেখানটা ঝাঁট দিয়ে সাফ্ করা ইত্যাদি। ঐ কাজগুলি আমি করতাম বরং তাঁর ক্লাসে না গিয়ে।

আহা, সেই অন্তিম দিনটির স্মৃতিও এখনও মনে জেগে রয়েছে। অভ্যাসবশে তিনি খুব ভোরেই উঠেছিলেন। তিনি মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়ম করেছিলেন যে, ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রত্যেককে ভোর ছটা ও সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত ধ্যান-ধারণা করতে হবে। তিনি নিজেও উপস্থিত থাকতেন। একবার (তাঁর শরীর ত্যাগের আগের দিন) আমাদের মধ্যে কয়েকজন একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়াতে সকালে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করতে দেরী করে ফেলেছিল। আমরা যখন ঠাকুরঘরে ঢুকেছি, ততক্ষণে সবার ধ্যান-ধারণা শেষ হয়ে গেছে। আঃ! স্বামী বিবেকানন্দের কী ভালবাসাই না ছিল আমাদের

প্রতি! তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'তোমাদের দেরী হল কেন?' আমরা তিনজন ছিলাম। বললাম যে, বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তক্ষুণি তিনি বললেন: 'তোমরা আজ খেতে পাবে না। আজ তোমাদের বাইরে ভিক্ষে করে খেতে হবে। কিসের জন্য তোমরা এখানে এসেছ? বাড়িতে থেকেই তো বেশ ঘুমিয়ে ও খেয়ে দিন কাটাতে পারতে! নিশ্চয়ই তোমরা এই জন্যই এখানে আসনি।' আমরা ভিক্ষের জন্য বাইরে চলে গেলাম,—কিন্তু অন্য সাধুদের মুখে জেনেছিলাম যে, যতক্ষণ আমরা বাইরে ছিলাম, তিনি কেবলই উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ করছিলেন: 'ছোঁড়াগুলো কোথায় গেল? ওরা খাবে কোথায়?' যখন ফিরে এলাম, তিনি বললেন: 'দেখ, তোদের ভিক্ষে করতে আদেশ করেছিলাম, তোদের ভালর জন্যই।'

একবার তিনি বলেছিলেন: 'যখন আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসি, তখন দুঃখে আমার এক চোখে জল পড়েছিল, যেহেতু মা-দিদিমা-ভাই-বোনেদের ছেড়ে যেতে প্রাণ চাচ্ছিল না; আর এক চোখে জল গড়িয়েছিল আমার আদর্শের টানে।'

তাঁর মহাসমাধির দিন কয়েক আগে, ছোটবেলার এক বন্ধু তাঁর কাছে এসেছিলেন কিছু টাকার জন্য। আমি ঐ সময় স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সেবকের কাজ করতাম। তাঁর সামান্য টাকার তহবিলটি আমিই রাখতাম। বন্ধুটিকে দুটি টাকা (প্রায় পঁয়ষট্টি সেণ্ট) দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে বললেন। আমি তাতে উত্তর দিয়েছিলাম: 'দুটাকা দিয়ে দিলে হাতে আর বেশি থাকবে না।' তিনি বলে উঠলেন: 'তুই কি ভাবছিস্, আমি তার জন্য চিন্তিত? তুই দুটাকার সঙ্গে ওকে আরও কিছু বেশিই দিয়ে দে।' তারপর তিনি বলে চললেন: 'ঘরের একটা জানলা যদি খোলা থাকে এবং বিপরীতদিকের জানলাটি বন্ধ থাকে তাহলে বাতাস চলাচল করে না। সুতরাং একটা জানলা দিয়ে বাতাসকে যেতে দে, অপর একটা দিয়ে দেখবি ঠিক আসবে।'

সেই শেষ দিন, তিনি বেলা একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত—দু ঘণ্টা ক্লাস নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন ইতিহাস, ব্যাকরণ, দর্শনের উপর আলোচনা করেছিলেন। পরে বিকাল প্রায় পাঁচটার সময় তিনি অপর একজন সাধুর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। প্রায় ছটা-সাড়ে ছটা নাগাদ যখন আমরা চা খাচ্ছি (রাতের খাবার নয়) তখন তিনি ফিরে আমাদের কাছে এসে বললেন: 'আমাকে এক কাপ চা দিতে পার?' চা খাওয়ার পর তিনি দোতলায় চলে গেলেন এবং আমি একতলার সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জুলাই মাস তখন। তারতে প্রচুর মশা এবং তা এমন ভয়ঙ্কর যে ওর কামড়ে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। মশারি ছাড়া রাত্রে কেউ ঘুমাতে পারে না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সাধুদের অনেকেরই মশারি ছেঁড়া। ছেঁড়া জায়গা দিয়ে মশা ঢুকলে তাদের আর বের করতে পারা যায় না। আমার প্রতি তাঁর শেষ আদেশ ছিল: 'দেখো, তারা যেন সবাই নতুন মশারি পায়।' তারপর তিনি সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় ধ্যান করতে বসলেন। একজন ব্রহ্মচারী তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল। ব্রহ্মচারীকে ঘরে ডেকে বলে দিলেন,—ঘরের বাইরে গিয়ে বসতে যতক্ষণ তিনি তাকে না ডাকেন। রাত নটা নাগাদ তিনি ব্রহ্মচারীকে ডাকলেন—বললেন: 'খুব গরম লাগছে, সব জানলা খুলে দাও।' তারপর তিনি শুয়ে পড়েন, কিছুক্ষণ বাদে তাঁর শরীরটা যেন কেঁপে উঠল এবং সহসা সব নিশ্চল হয়ে গেল। ব্রহ্মচারী আগে কখনও তাঁকে ঐ রকম অবস্থায় দেখেনি। তাই সে পাশের ঘরের একজন বয়স্ক সাধুকে ডাকল। তক্ষুণি তিনি ছুটে এসে তাঁর

বুকের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে এবং হাতের নাড়ি পরীক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু হায়, তখন কোন শ্বাসই বইছিল না। ঐ প্রবীণ সাধু তখন অন্যান্য সকলকে ডেকে আনলেন। আমি রান্নাঘরে স্বামীজীর জন্য রাত্রের আহার তৈরি করছিলাম। আমিও এসে তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলাম—চলছে না। কৃত্রিম উপায়ে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জন্য চেষ্টা আমরা করেছিলাম। ডাক্তারও এসে পরীক্ষা করলেন এবং তাঁকে বাঁচানোর জন্য সব রকম চেষ্টাই করা হল। কিন্তু তিনি সেই সমাধি থেকে ফিরে আর এলেন না।

এইভাবেই সেই নাটকের যবনিকাপাত হল। আপনাদের কাছে আগেও বলেছি যে, যদিও আমরা তাঁকে স্থূল শরীরে হারিয়েছি, কিন্তু তবুও আমরা সুনিশ্চিত জানি, তিনি তাঁর সন্তান, তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন এবং তিনিই আমাদের পরিচালনা করছেন, সাহায্য করছেন এবং রক্ষাও করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মহান্ শক্তির দূত। তাঁর বাণী থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমি আমার প্রসঙ্গের উপসংহার টানছি:

'আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি। দরিদ্ররা যখন ধনীদের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ওষুধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই শক্তিই মূর্খের একমাত্র ওষুধ আর যখন পাপীরা অন্য পাপীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখনও শক্তিই একমাত্র ওষুধ। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যা আমাদের মানুষ করতে পারে।...যা তোমাকে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তা বিষবৎ পরিহার কর। তাতে প্রাণ নেই, তা সত্য নয়।...সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দেয়; হৃদয়ে বল দেয়।'

'উপনিষদের শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তিবর্ধক বাণীতে ফিরে যেতে হবে। আমাদের প্রয়োজন—শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্‌সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে। তার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও বীর্যশালী করতে পারা যায়।...দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি বা স্বাধীনতাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।'

...তাঁর প্রবল দেশাত্মবোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও বহিরাগত আক্রমণকারী, বিজেতাদের দোষ দেখেননি, কিন্তু তিনি স্বদেশের জনগণকেই দোষারোপ করেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল মানুষকে উন্নত করা, মানুষের ভিতরের অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তিকে বিকাশিত করা। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অদ্ভুত। নব্য ভারতের প্রতি তাঁর সতর্ক বাণী: 'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"'

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ নেতা। আমি তাঁকে অনুসরণ করি,—তাঁর পূজা করি,—আমার প্রেরণাদাতারূপে, আমার পথপ্রদর্শক বলে,—আমার জীবনাদর্শ ও ত্রাতা বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

৬

গান্ধীজী কিন্তু বিবেকানন্দকে দার্শনিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধীপক্ষ রূপে দেখেছিলেন যখন তিনি ভারতীয় জনজীবনে নিজের বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। গান্ধীজীর পক্ষে অন্য সকলকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হলেও বিরাট অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বিবেকানন্দ ও তাঁর বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। শ্রীকৃষ্ণও তাঁর প্রতিপক্ষ হতে পারতেন, যাঁর সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক দৃষ্টিকে স্বামীজী প্রধানাংশে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। গীতার অভিনব রূপকার্থ আবিষ্কার করে গান্ধীজী সেই সংঘর্ষ এড়িয়েছেন, কিন্তু নিকট কালের ঐতিহাসিক পুরুষ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তা করা সম্ভব হয়নি—বিশেষতঃ যখন বিবেকানন্দ-অনুগামীদের কেউ-কেউ সুস্পষ্টভাবে স্বামীজীর অন্যতর সামাজিক আদর্শের কথা তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে উপস্থিত করেছিলেন। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর সেই বিতর্ক কেবল চিত্তাকর্ষক নয়, ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ।

তর্ক উঠেছিল হিংসা-অহিংসা, আমিষ-নিরামিষ ভোজন এবং কুটীর ও যন্ত্রশিল্প নিয়ে। হিংসা-অহিংসা প্রশ্নে বিবেকানন্দের মত গান্ধীজীকে দীর্ঘদিন ব্যস্ত ও বিব্রত করেছে। গান্ধীজীর ভাবগুরু টলস্টয় স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ ও অন্য রচনা পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন।[১] কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে তিনি যখন আপসহীন অহিংসাপন্থী, তখন সামাজিক মানুষের জন্য বিবেকানন্দ-সমর্থিত শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ, যা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সমর্থন করে— তাকে অনুচিত বিবেচনা করেছিলেন। আমেরিকায় আশ্রয়গ্রহণকারী ভারতীয় বিপ্লবী তারকনাথ দাস 'ফ্রি হিন্দুস্থান' বলে একটি পত্রিকা চালাতেন। তিনি টলস্টয়ের অহিংস প্রতিরোধ নীতিকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিপন্থী মনে করে তাঁকে এক চিঠি লেখেন। সেই সঙ্গে মানবতাবাদী টলস্টয়ের সমর্থন চেয়েছিলেন ভারতীয় সশস্ত্র সংগ্রামে। টলস্টয়ের বন্ধু ও জীবনীকার পল বিরুকফ জানিয়েছেন, অনেক সন্ধানেও তারকনাথ দাসের পত্রটি [বিরুকফ ভুল করে চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন] পাওয়া যায়নি।[২] তবে টলস্টয়ের উত্তর থেকে বোঝা যায়, তারকনাথ দাস তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করেছিলেন। অশীতিবর্ষীয় টলস্টয় তার এক দীর্ঘ উত্তর লেখেন—সেটি ঐকালে বহুল প্রচারিত হয়। গান্ধীজী টলস্টয়ের উক্ত চিঠির গুজরাটি অনুবাদের একটি দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন—সেটি প্রকাশিত হয় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকার ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৯ সংখ্যায়।[৩] গান্ধীজী ঐ ভূমিকায় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক ভূমিকা, এবং অহিংসার ঋষি-ভূমিকার ভূয়সী প্রশস্তির পরে, অহিংসার আদর্শের পক্ষে টলস্টয়ের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর

---

১ বিবেকানন্দ টলস্টয় প্রসঙ্গের জন্য 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ২য় খণ্ড (পৃঃ ৩০-৩৮) দ্রষ্টব্য।

২ Tolstoy and Gandhi, by Dr. Kalidas Nag (1950), p. 76.

৩ Gandhi Works, Vol. 10, pp. 1-5.

কাছে টলস্টয়ের রচনাটি অসাধারণ মূল্যবান; কারণ ঐ আদর্শেই ট্রানস্‌ভালে ভারতীয়রা অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে। টলস্টয়ের রচনা বিপ্লবপন্থীদের বক্তব্যের উপযুক্ত উত্তর হবে বলেই তিনি মনে করেছিলেন। "যেসব ভারতীয় ভারত থেকে শ্বেতাঙ্গদের বিতাড়িত করতে অধীরতা বোধ করছে, [গান্ধীজী লিখেছেন] তাদের কাছে টলস্টয় একটা সহজ উত্তর দিয়েছেন। টলস্টয়ের মতে, আমরা নিজেই নিজেদের দাস, ব্রিটিশের দাস নই। শ্বেতাঙ্গদের যদি আমরা না চাই তাহলে তারা থাকতেই পারবে না। যদি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তাঁদের বিতাড়িত করার চিন্তা জাগে তাহলে প্রতিটি ভারতবাসী যেন ভেবে দেখে—ঐ পদ্ধতিতে ইউরোপ কী তুচ্ছ ফললাভ করেছে।"[৪]

টলস্টয় নিজের রুশ রচনাটির ইংরেজী অনুবাদ নিজেই করেছিলেন। তা যে খুব স্পষ্ট স্বচ্ছ অনুবাদ তা বলতে পারব না। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "টলস্টয় তারকনাথ দাসের মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যান; তিনি বিবেকানন্দ ও অন্যান্যদের দোষ দেন এই বলে—তাঁরা বুদ্ধ ও কৃষ্ণের দেশ-বাসীকে অহিংসার পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন।"[৫] টলস্টয় তাঁর নানা অধ্যায়ে বিভক্ত এই রচনাটির শীর্ষে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির সঙ্গে বিবেকানন্দের উক্তিও একবার উদ্ধৃত করেছেন শ্রেয়ঃ বাণী হিসাবে। আবার তিনি, যতদূর মনে হয়, বিবেকানন্দের সমালোচনাও করেছেন। আমি টলস্টয়ের প্রাসঙ্গিক রচনা উদ্ধৃত করছি:

"From your letter and the articles in *Free Hindustan* as well as from the very interesting writings of the Hindu Swami Vivekananda and others, it appears that, as in the case in our time with the ills of all nations, the reason lies in the lack of a reasonable religious teaching which by explaining the meaning of life would supply a supreme law for the guidance of conduct and would replace the more than dubious precepts of pseudo-religion and pseudo-science with the immoral conclusions deducted from them and commonly called 'civilization'.

"Your letter, as well as the articles in *Free Hindustan* and Indian political literature generally, shows that most of the leaders of public opinion among your people no longer attach any significance to the religious teachings that were and are professed by the peoples of India, and recognise no possibility of freeing the people from the oppressions they endure except by adopting the irreligious and profoundly immoral social arrangements under which the English and other pseudo-Christian nations live today."

টলস্টয় সরলচিত্তে বলেছিলেন—ইংরেজের দ্বারা ভারতের পরাধীনতার একমাত্র বা মুখ্য কারণ—ভারতীয়দের আচার আচরণে ধর্মচেতনার অভাব। তারকনাথ দাসদের দ্বারা উপস্থাপিত বিবেকানন্দের মত টলস্টয়ের কাছে এই বিশেষ

৪ *Ibid*, Vol. 10, p. 4.

৫ Bhupendra Nath Datta, *Swami Vivekananda : Patriot-Prophet* (1954), p. 113.

ক্ষেত্রে কতখানি বিরক্তিকর ঠেকেছিল তা তাঁর নিজের রচনা থেকেই বোঝা যায় :

"Yes, in our time all these things must be cleared away in order that mankind may escape from self-inflicted calamities that have reached an extreme intensity. Whether an Indian seeks liberation from subjection to the English or anyone else struggles with an oppressor either of his own nationality or of another···or any man seeking the greatest welfare for himself or for everybody else—they do not need explanations and justifications of old religious superstitions such as have been formulated by your Vivekananda's, Baba Bharatis, and others, or in the Christian world by a number of similar interpreters and exponent of things that nobody needs; nor the innumerable scientific theories about matters not only unnecessary but for the most part harmful."[৬]

নবমত প্রবর্তনের বা অনুসরণের উত্তেজনার কালে পুরো তথ্যসন্ধানের চেষ্টা থাকে না, তখন কাল্পনিক প্রতিপক্ষ বা প্রতিপক্ষের উপর আরোপিত অর্ধ-সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজ মতের সত্যতা প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। টলস্টয়ের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। তাঁর স্তুত শ্রীকৃষ্ণের পথই যে অবলম্বন করবার জন্য বিবেকানন্দ আহ্বান করছিলেন, তা তিনি বুঝে উঠতে চাননি—তারকনাথ দাস প্রভৃতির দ্বারা উদ্ধৃত বিবেকানন্দের উক্তিগুলি তাঁকে এমনই বিচলিত করেছিল। গান্ধীজীর মনও এক্ষেত্রে টলস্টয়ের সঙ্গে একতারে বাঁধা ছিল। তদনুযায়ী তিনি বিবেকানন্দ-বিষয়ে টলস্টয়ের উক্তির ঔচিত্যে প্রশ্ন তো করেননিই—বরং রচনাটির ব্যাপক প্রশস্তি করেছেন। গান্ধীজীর মনোভাব পরেও বদলায়নি। ভারতীয় বিপ্লবীরা টলস্টয়কে সামান্যই বিব্রত করতে পেরেছিলেন—গান্ধীজীকে অপরপক্ষে তাঁর ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে বহু সময়ই এই বিপ্লবীদের মত ও পথের প্রতিরোধের জন্য প্রবল চেষ্টা করে যেতে হয়েছে। ভারতীয় বিপ্লবীরা বিবেকানন্দের রচনাংশ উদ্ধৃত করে তাঁকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন।

জনৈক বিপ্লবী, গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে এক পত্র লেখেন; গান্ধীজী তার উত্তর দেন ৭ মে, ১৯২৫, সংখ্যায় 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়'। উক্ত বিপ্লবী গান্ধীজীকে কয়েকটি সরাসরি প্রশ্ন করেন। প্রথমে বলেন, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলার বিপ্লববাদের জন্ম হয়; বিপ্লবীরা ইংরেজদের ভয়ে থরহরি ভারতবাসীর মনের ভয় ভাঙাতে পেরেছিলেন। 'বিপথগামী' লোকেরা একাজ করতে পারলেন কি করে? দ্বিতীয়তঃ, ইনি টেরেন্স ম্যাকসুইনি এবং তাঁর ৭১ দিন উপবাসের উল্লেখ করে বলেন—ঐ ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য তথাকথিত ষড়যন্ত্র, রক্তপাত ইত্যাদির সমর্থক ছিলেন—তিনিও বিপথগামী? তৃতীয়তঃ, গান্ধীজী বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাসী—যে-প্রথায় ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রনীতির সমর্থন আছে—আর সেই ক্ষত-নিরাময়কারী ক্ষত্রিয়দের সর্বাধিক প্রয়োজন তো এখনই। গান্ধীজী কি বলেন? এই সূত্রে উক্ত বিপ্লবী স্বামীজীর উক্তির দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেন। তিনি সব শেষে বলেন, গান্ধীজী তো দাবি করেন, অহিংসা শক্তিমানের ধর্ম। তাহলে তিনি পরিষ্কার করে বলুন, তাঁর অহিংস শিষ্যগণ কোন্ শক্তির

৬ Quoted in Tolstoy and Gandhi, pp .76, 82-83, 97-98.

সাহায্যে বিদেশী আমলাতন্ত্রী সরকারকে দূর করবেন? গান্ধীজীর স্বাধীন সরকারে কি সৈন্য-বাহিনী থাকবে? সৈন্যরা কি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবে না? না কি তারা শত্রুর সামনে সত্যাগ্রহের পথ ধরবে? বিপ্লবী আরও বলেন, গান্ধীজী যেন স্পষ্ট উত্তর দেন, দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় যেন বিষয়টিকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন।

গান্ধীজী উত্তর দেন। বলেন, বিপ্লবীর রচনায় বিশৃঙ্খল মনের পরিচয় আছে। স্বামীজীর উদ্ধৃত রচনাংশ গান্ধীজীকে খুশি করেনি। "আমি বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি, [গান্ধীজী লেখেন] ঐ মহাপুরুষের রচনায় যে গাঢ় সংক্ষিপ্তি এবং সতেজ ভাব থাকে, তা এখানে নেই। এই অংশগুলি তাঁর রচনার অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক, আমাকে সন্তুষ্ট করছে না।"

এখানে উল্লেখ্য, উদ্ধৃত রচনাংশ রচনাগুণে গান্ধীজীকে তুষ্ট না করলেও তা বিবেকানন্দেরই রচনা, অর্থাৎ তাঁর বক্তৃতার অনুলিপি—এবং তাঁর বিখ্যাত 'কর্মযোগ' গ্রন্থের অন্তর্গত। একথা স্বীকার্য, উল্লিখিত বিপ্লবী স্বামীজীর বিস্তারিত রচনা থেকে এক বিশেষ অংশ নির্বাচন করেছিলেন বলে তাতে সামগ্রিকতার চেহারা ছিল না, এবং দু-একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লাইন বাদ পড়ায় কিছু অর্থভ্রান্তিও ঘটেছিল। তাহলেও মূল বক্তব্য ঠিক আছে, এবং এই ধরনের কথা স্বামীজী কেবল উদ্ধৃত অংশেই নয়, অন্যত্রও বলেছেন।

স্বামীজীর উক্তিতে ছিল; "সকল মহান আচার্যই শিক্ষা দিয়েছেন—অশুভের প্রতিরোধ করো না—অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায়, যদি মানুষ এই নীতি কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করে তাহলে সমাজের কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়বে, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, হিংস্র দুষ্ট লোকেরা আমাদের সম্পত্তি গ্রাস করে নেবে, আমাদের মালিকও বোধহয় তারাই হয়ে উঠবে। মাত্র একটি দিনও যদি ঐ অপ্রতিকার নীতি চালু করা হয় গোটা দেশ বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

এই অংশ উদ্ধৃত করার পরে বিপ্লবী শ্লেষের সুরে লিখেছিলেন, "এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আপনি কী করবেন জানি—আপনি ব্যাপারটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করবেন, স্বামী বিবেকানন্দ ঐ প্রকার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কোন সুযোগই রাখেননি, কারণ তিনি অবিলম্বে বলেছেন—।"

স্বামীজীর পরবর্তী বক্তব্যের কিছু অংশও বিপ্লবী উদ্ধৃত করেছিলেন:

"তোমরা কেউ-কেউ বোধহয় ভগবদ্গীতা পড়েছ। পাশ্চাত্যদেশে তোমরা অনেকেই বোধহয় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে বিস্মিত হয়েছ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভণ্ড ও কাপুরুষ বলেছেন, কেননা অর্জুন তাঁর বিপক্ষে বন্ধু ও আত্মীয়রা দণ্ডায়মান বলে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, অজুহাত—অপ্রতি-কারই সর্বোচ্চ প্রেমাদর্শ। এখানে একটি মস্ত শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্ত প্রায় একই রকম দেখতে—চূড়ান্ত অস্তি ও চূড়ান্ত নাস্তি—সদৃশ। আলোক-স্পন্দন অতি মৃদু হলে তা আমরা দেখতে পাই না, অতি দ্রুত হলেও নয়। শব্দের ক্ষেত্রেও তাই সত্য—অতি নিম্নগ্রাম বা অতি উচ্চগ্রাম—কোন ক্ষেত্রেই শব্দ শোনা যায় না। প্রতিকার ও অপ্রতিকারের ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখা যায়। [বিপ্লবীর উদ্ধৃতিতে বাদ দেওয়া হয়: 'দেখা গেল, কোন একজন প্রতিরোধ করছে, যেহেতু সে অলস, দুর্বল; বস্তুতঃ সে প্রতিকারে অসমর্থ। আর একজন জানে যে, সে ইচ্ছা করলেই দুর্নিবার

আঘাত হানতে পারে, কিন্তু সে শত্রুকে আঘাত নয় আশীর্বাদ করছে। যে-লোকটি দুর্বলতার কারণে অশুভের প্রতিরোধ করল না, সে পাপ করল, সে তার 'অপ্রতিকার' থেকে কোন সুফলই পেল না। অন্যদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রতিরোধ করতে চায়, সে পাপ করবে। বুদ্ধ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করেছিলেন, যথার্থ তাঁর ত্যাগ; কিন্তু নিঃস্ব ভিখারীর ত্যাগের কোন কথাই ওঠে না: সুতরাং অপ্রতিকার বা প্রেমের আদর্শ ইত্যাদির কথা বলবার সময়ে আমাদের সর্বদাই সাবধান হতে হবে।'] আমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে—অপ্রতিরোধের শক্তি আমাদের আছে কিনা? সেই শক্তি যদি থাকে, তখন ত্যাগ করলে বা অপ্রতিরোধ করলে আমরা বিরাট প্রেমের আদর্শ দেখাব। [বাদ ছিল, 'কিন্তু যদি অপ্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকে, অথচ আত্মপ্রতারণা করে ভাবি যে, আমরা সর্বোচ্চ প্রেমাদর্শের দ্বারা চালিত, সেক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো আচরণ করছি।'] অর্জুন বিপক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী সৈন্যসমাবেশ দেখে ভীরু হয়ে পড়ছিলেন, তাঁর তথাকথিত 'প্রেম' তাঁকে দেশ ও রাজার সম্বন্ধে কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভণ্ড বলেন—'তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছ, অথচ কাজ করছ কাপুরুষের মতো। ওঠো, দাঁড়াও, যুদ্ধ করো'।"

বিপ্লবীরা, বিশেষতঃ বাংলাদেশের বিপ্লবীরা, বিবেকানন্দের কর্মযোগকে জীবনাদর্শের উৎস-গ্রন্থ বিবেচনা করতেন। সুতরাং তাঁদের একজন সহজেই নিজ মতের পক্ষে সেই গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। গান্ধীজী তার যে-উত্তর দিয়েছিলেন, তা উক্ত বিপ্লবীকে তুষ্ট করার যোগ্য ছিল বলে মনে হয় না—কেননা তার মধ্যে অজস্র ফাঁক ছিল। তবে বিবেকানন্দের সুপ্রচারিত কথার উত্তরে গান্ধীজীর বক্তব্য কী ছিল জেনে নেওয়া উচিত। গান্ধীজী বলেন, হাঁ, তিনি বর্ণাশ্রমী হিসাবে ক্ষত্রিয় আদর্শকে গ্রহণ করেন। তবে তাঁর কাছে 'যে যুদ্ধে অর্থাৎ বিপদে পরাঙ্মুখ নয় সেই ক্ষত্রিয়।' কালের পরিবর্তনে সামাজিক নীতি বদলায়—সুতরাং ক্ষত্রিয়ের আদর্শও বদলে গেছে ইত্যাদি। গান্ধীজী কিন্তু কিভাবে, কতখানি তা বদলেছে, ঐ লেখায় বিশেষ বলেননি। বিবেকানন্দের বক্তব্য গ্রহণে অনিচ্ছা জানিয়ে গান্ধীজী তারপর বলেন, "যদি বিরাট সংখ্যক মানুষ অপ্রতিরোধের আদর্শকে গ্রহণ করে তাহলে পৃথিবীর বর্তমান হাল থাকবে না। যারা অহিংসাকে গ্রহণ করেছে তারা কিছুই হারায়নি; হিংস্রদের বা দুষ্টদের দ্বারা তারা নৃশংসভাবে খুন হয়নি। উল্টোদিকে উত্তমস্বভাব অহিংসপন্থীদের সান্নিধ্যে দুর্বৃত্তরা হিংসা ও বজ্জাতি ত্যাগ করেছে।"

গান্ধীজী আরও বললেন, "আমি গীতার কোন্ অর্থ করি তা আগেই বলেছি। আমার কাছে ওর মধ্যে আছে শুভ ও অশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্ব-কথা। যখন ভাল আর মন্দের মধ্যে পার্থক্য-রেখা অতি সূক্ষ্ম, সঠিক সিদ্ধান্ত করা যখন অতীব কঠিন, তখন অর্জুনের মতো কে-না ভীত বা সংকুচিত হবে? অবশ্য আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি—সেই যথার্থ অহিংস, আঘাত করবার সামর্থ্য থাকলেও যে অহিংস থাকে। তাই দাবি করি, আমার শিষ্য (আমার শিষ্য কেবল একজনই আছে—সে আমিই) আঘাত করতে সমর্থ, হয়তো সামান্যভাবেই, কিংবা নিষ্ফলভাবে, তাও স্বীকার করি, কিন্তু তার সে কাজ করবার ইচ্ছা নেই। শত্রুপক্ষকে গুলি করার অনেক সুযোগ জীবনে এসেছে, তার দ্বারা শহীদের মুকুট আমি শিরোভূষণ করতেও পারতাম, কিন্তু মন থেকে সে কাজ করে উঠতে পারিনি।… দুর্ভাগ্য, আমার আজকের স্বরাজে সৈন্যদলের

স্থান আছে। আমার বিপ্লবী বন্ধু জেনে রাখুন, জনগণকে নিরস্ত্র করে পৌরুষহীন করে ফেলাকে আমি বৃটিশ-কৃত জঘন্যতম পাপ বলে বর্ণনা করেছি। দেশের জন্য সর্বাত্মক অহিংসা প্রচারের সামর্থ্য আমার নেই। আমি দৃঢ়ভাবে অহিংসাকে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারেই আবদ্ধ রেখেছি, তদনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ধারণের ব্যাপারেও অহিংস পদ্ধতির প্রচারক। কিন্তু আমার অসামর্থ্যকে যেন অহিংস পদ্ধতির অশক্তি বলে বিবেচনা করা না হয়।...সর্বজনীন অহিংসাকে সক্রিয়ভাবে প্রচারের অধিকার আমি এখনও অর্জন করে উঠতে পারিনি। সেই বিরাট কাজের যোগ্য আমি এখনও নই। আমার মধ্যে এখনও ক্রোধ আছে।...আমি (ক্রোধের) উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারি, কিন্তু সর্বাত্মক অহিংসাকে ফলদায়ীরূপে প্রচার করতে হলে তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কোনপ্রকার পাপ করার ক্ষমতা থাকবে না, আমাকে এমন হতে হবে। বিপ্লবী বন্ধু আমার সঙ্গে প্রার্থনা করুন, আমি যেন সেই রকম হতে পারি।"[৭]

'বিপ্লবী বন্ধু' গান্ধীজীর জন্য কী প্রার্থনা করেছিলেন জানি না। তবে জানি যে, গান্ধীজীর এই যথার্থই আন্তরিক ও ভাবময় রচনাটি যুক্তি বিচারে টিকবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো বৃহৎ গণযুদ্ধে অহিংস সেনানী কি করে মিলবে যেখানে গান্ধীজীর শিষ্য মাত্র গান্ধীজীই, যাঁর সিদ্ধিও অসম্পূর্ণ!! অহিংসাকে কেবল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্যবহারের ইচ্ছা, বাকি অংশে তার প্রয়োগের জন্য পরবর্তী তপস্যার প্রতীক্ষা—অবশ্যই গুরুতর এবং সুমহৎ আত্ম-বঞ্চনাত্মক ব্যাপার। সে যাই হোক, বিবেকানন্দের রচনার দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার ইতি এখানেই হল না। বছর দেড়েক পরে মাংসাহারী পরিবারের এক নিরামিষাশী যুবক বিবেকানন্দের রচনা পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে গান্ধীজীকে পত্র লিখলেন। গান্ধীজী ৭ অক্টোবর, ১৯২৬ সংখ্যার ইয়ং ইণ্ডিয়ায় তার উত্তর দেন। যুবকটি বহুদিন ধরে মাংসাহারের জন্য পিতামাতার তাগিদ ঠেকিয়েছিল কিন্তু বিচলিত হল স্বামীজীর বই পড়ে। "এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত পড়ে আমার বিশ্বাস বিশেষ নাড়া খেয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর পক্ষে মাংসাহার প্রয়োজনীয়, এবং তিনি তাঁর বন্ধুকে স্বচ্ছন্দে মাংস খেতে বলেছেন। তিনি এমন-কি এ-পর্যন্ত বলেছেন, 'তাতে যদি পাপ হয়, সে পাপ আমার।' এখন আমি বিভ্রান্ত—মাংস খাব কি খাব না?"

গান্ধীজী কড়া ভাষায় লিখলেন, "এই ধরনের অন্ধ অথরিটি-আনুগত্য দুর্বল মনের লক্ষণ।" কেউ যদি কোন বিশ্বাস গড়ে তোলে তাকে ধরে থাকতে হবে কঠিনতম প্রতিরোধের মধ্যেও। "মহান স্বামীজীর মূল লেখা আমি দেখিনি। আশঙ্কা হয়, পত্রলেখক ঠিকভাবেই তাঁর কথা উদ্ধৃত করেছেন। আমার মত সুপরিচিত। মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার পক্ষে কোন সময়ে কোন পর্যায়ে আমি রক্তমাংসাহারকে প্রয়োজন বোধ করি না।...আমরা যখন নিম্ন শ্রেণীর জীবদের থেকে নিজেদের উচ্চে অবস্থিত মনে করি তখন তাদের এই ক্ষেত্রে অনুকরণ করলে ভুল করব। যারা বাসনা কামনা দূর করতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষে মাংসাহার অনুপযোগী তা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়।"

---

৭ Gandhi Works, Vol. 27, pp. 48-52.
বিপ্লবী স্বামীজীর যে-রচনাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন তা স্বামীজীর "কমপ্লিট ওআর্কস্"-এর (১৯৫৭) ২য় খণ্ডের ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠায় আছে।

গান্ধীজী এর পরে কিছুটা ঠাণ্ডা স্বরে বলেছিলেন, চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্য খাদ্যের উপরে বেশি গুরুত্ব অর্পণ করা উচিত নয়। ভারতে ধর্ম আর খাদ্যকে বাড়াবাড়িরকম মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি না বলে পারলেন না, নিরামিষ ভোজন হিন্দুধর্মের 'অন্যতম অমূল্য দান।' গান্ধীজী 'অন্ধ অথরিটি-আনুগত্যের' বিরুদ্ধে বলেও জানালেন—শঙ্করাচার্য বা দয়ানন্দের মতো শক্তিশালী সংস্কারকরা নিরামিষাশী ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্যের বিপুল পরিমাণ নিরামিষ ভোজন-সমর্থক সাহিত্যপাঠ করে উপকৃত হবার অনুরোধও করেছিলেন।[৮]

বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদী আত্মঘোষণা, পাপবাদের বিরুদ্ধে আঘাত ইত্যাদি বিষয়ও গান্ধীজীর স্বভাবানুকূল ছিল না। বৈষ্ণব হিসাবে তিনি ভক্তের দীনতা পছন্দ করতেন। এইসব বিষয়ে সম্ভবতঃ প্রশ্ন করে তাঁকে প্রেমবেন কণ্টক পত্র লেখেন—গান্ধীজী তার উত্তর দেন ৫ জানুআরি ১৯৩১। তিনি লেখেন, "আমার মতে বিবেকানন্দ ও ধুরন্ধরের বক্তব্য একপেশে।…সুরদাস, তুলসীদাস ও অন্যান্য ভক্তরা নিজেদের চতুর, কামময় ইত্যাদি বলেছেন। এইরকম বলার সময়ে তাঁরা কেবল বিনয়ের ভাষা ব্যবহার করছিলেন না, হৃদয় থেকেই বলছিলেন। বস্তুতঃ আমরা দুই ধরনের অনুভূতিই লাভ করি। উচ্চতর উপলব্ধির আলোকে আমরা নিজেদের ব্রহ্ম বলে অনুভব করি, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় করুণাময় ঈশ্বরের কাছে নিজেদের দীনহীন বোধ হয়। যাঁরা সেরকম মনে করেন না, নিজেদের পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান করেন, তাঁরা ঈশ্বর-করুণার জন্য ভজন করতে না পারেন। তবে এই প্রকার মানুষ লক্ষেও একজন মিলবে না।…সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন সমুদ্রের জলবিন্দু শুকিয়ে যাবে যদি সে মনে করে—সে এখনও সমুদ্রেই আছে। আর যদি সে স্বীকার করে, সে বিন্দু ছাড়া কিছু নয় তখন সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হবে, তাতে পতিত হয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে যাবে।"[৯]

[প্রেমবেন কণ্টক স্বামীজীর কোন্ কথাগুলি উপস্থিত করেছিলেন জানি না। হয়তো উদ্ধৃত করেছিলেন নিম্নের মহান কথাগুলি—পাপবাদের বিরুদ্ধে মানবতার বজ্রভাষা :

"'Children of immortal bliss'—what a sweet what a hopeful name !…Heirs of immortal bliss—yea, the Hindu refuses to call you sinners. Ye are the Children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, Ye divinities on earth—sinners ! It is a sin to call a man so ; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep ; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal." [C. W. I. p. 11]

স্বামীজী, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অভিমানের রূপ বোঝাতে প্রায়ই একটি উপমা ব্যবহার করতেন। এক বিন্দু জল সমুদ্রের উপর পড়বার সময়ে কেঁদেছিল—কারণ তার নিজস্ব সত্তার বিনাশ ঘটবে। সমুদ্র সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—ভয় নেই, অতঃপর তুমি স্বয়ং সমুদ্র হয়ে যাবে।

স্বামীজীর এইসব উক্তি প্রেমবেন কণ্টক গান্ধীজীর কাছে উপস্থিত করতেও পারেন, নাও পারেন। তবে এখানে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়—কোন বিরাট হৃদয় ও মনীষা যখন গভীর সত্যকে উন্মোচন করেন তখন তার বিশেষ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে 'নীতি কথা' রচনা করতে গেলে গোটা ব্যাপারটি স্থূল অসাড় হয়ে দাঁড়ায়—স্বামীজীর বিষয়ে বিচারের কালে প্রায়শঃই তা হয়—এখানেও হয়েছে। [ক্রমশঃ]

৮ Gandhi Works, Vol. 31, p. 477. ৯ Ibid, Vol. 45, p. 63.

ভগবান বুদ্ধ ও পূর্ণিমা তিথি

অধ্যাপক লামা চিম্পা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইন্দো-টিবেটান্ স্টাডিজ' বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও তিব্বতী দর্শনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। দিল্লী ও নাগপুরস্থ ইন্টারনেশনাল আকাদেমী অব্ ইণ্ডিয়ান কালচারে মঙ্গোল ও তিব্বতী ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক। চীনা, মঙ্গোল, তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত গ্রন্থকার; বাংলা কথ্যভাষাতেও অভ্যস্ত।

বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে সুপরিচিত। এই পূর্ণিমার দিনে ভগবান বুদ্ধের তিনটি মহত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। তাই এই দিনটিকে "ত্রয় মহত্ব সম্পন্ন দিবস" বলা হয়।

প্রায় দুই হাজার ছয়শত বৎসর পূর্বে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের রানী মহামায়া বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে এমন একটি সুপুত্রের জন্মদান করেন, যাঁকে এখনও পৃথিবীর সকল মানুষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। তাঁর নাম সিদ্ধার্থ। পৃথিবীর সকল লোকের নিকট তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত, যদিও তাঁর শৈশবের নাম বুদ্ধ নয়। বুদ্ধ অর্থে বোধি লাভ করা মহাপুরুষ।

আর একটি কারণে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন জগৎবাসীর নিকট স্মরণীয়। বুদ্ধের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন তিনি নিরঞ্জনা (ফল্গু) নদীর তীরে গয়াধামে ছয় বৎসর কাল প্রাণীকুলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করার পরে একটি বটগাছের তলায় পাথরে আসীন হয়ে বোধি লাভ করেন। তখন থেকে এই জায়গার নাম হয় বুদ্ধগয়া বা বোধগয়া। গাছটির নাম বোধিবৃক্ষ এবং আসনটির নাম বজ্রাসন।

অন্য একটি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে জন্মমরণ পারঙ্গত বুদ্ধ মহানির্বাণ লাভ করেন (দেহত্যাগ করেন) এবং জগৎবাসীকে তাঁর সেই বজ্রবাণী স্মরণ করিয়ে দেন যে, পৃথিবীতে যারা জন্মে তাদের মৃত্যুও অনিবার্য। এই সব কারণে বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট অত্যন্ত স্মরণীয় পবিত্র দিন। এই দিনে নানান রকম উৎসব অনুষ্ঠান, দান দক্ষিণা, পূজা পাঠ ইত্যাদি পুণ্যাত্মিক কাজ করা হয়। এ ছাড়া নানান রকম সামাজিক আনন্দ উল্লাস, মেলা ইত্যাদিরও আয়োজন করা হয়।

অবশ্য শুধু বৈশাখী পূর্ণিমাই নয়, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদিও বৌদ্ধদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র তিথি।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা: এই দিনে বুদ্ধের জননী তাঁর সেই বিখ্যাত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁর গর্ভে এক শ্বেত হস্তী প্রবেশ করেছে। এটা মহামায়ার বুদ্ধকে গর্ভে ধারণ করার লক্ষণ মাত্র।

আষাঢ়ের পূর্ণিমায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী যশোধরা, পুত্র রাহুল ও সকল রাজকীয় সুখবিলাস ত্যাগ করে জ্ঞানের অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। পরবর্তী কালের আরও একটি ঘটনা—সেটাও আষাঢ়ী পূর্ণিমায়। বারাণসীর ঋষিপতনে (সারনাথে) বুদ্ধ তাঁর সদ্ধর্ম দীক্ষা পাঁচ জন সুপাত্রকে দান করেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে—কৌণ্ডিন্যর, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম, ভদ্রিকা।

ভাদ্র পূর্ণিমা: এই পূর্ণিমাকে বৌদ্ধরা মধু পূর্ণিমাও বলে থাকেন। যখন বুদ্ধ তপস্যারত ছিলেন সেই সময় একদিন হঠাৎ একটি বাঁদর কিছু মধু এনে তাঁকে দেয়। সেই সময় তিনি সামান্য অসুস্থ বোধ করছিলেন এবং তার চিকিৎসার জন্য মধুর প্রয়োজনও ছিল। এই

কারণে ভাদ্রের এই পূর্ণিমা মধু পূর্ণিমা নামে খ্যাত। ঐ দিনে বৌদ্ধরা ভিক্ষু সংঘকে মধু ও ঔষধ অর্পণ করে, পূজা করে।

আশ্বিনী পূর্ণিমা : এই দিনটিকে "প্রবারণ" (বন্ধনমুক্তি, অর্থাৎ চলাফেরায় স্বাধীনতা) পূর্ণিমা বলা হয়। কারণ ঐ দিনে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের আদেশ দেন যে, কেবলমাত্র ধ্যান-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করলেই চলবে না। এখন থেকে তোমরা মাঝে মাঝে গ্রামে নগরে গিয়ে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নিজেদেরকে নিযুক্ত কর। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে যে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি মানুষকে শুধু পতনের পথেই নিয়ে যায়। তাই তারা যেন এই সকল থেকে বিরত থাকে। সেইজন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনটিতে তাঁদের তিনমাসব্যাপী "বর্ষাবাস" (বর্ষাকালে কোথাও না গিয়ে বিহারগুলিতে পুণ্য কর্মে লিপ্ত হয়ে বসে থাকার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান) সমাপ্ত করে নানারূপ জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেন। ঐ দিনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা "কঠিন চীবর" দান নামক উৎসব পালন করেন। এই উৎসবে গৃহস্থরা ভিক্ষুদের উদ্দেশে মোটা কাপড় কম্বল ইত্যাদি অর্পণ করেন। এই সময় থেকে সামান্য শীতের প্রকোপ দেখা যায়। আর ভিক্ষুদের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতে হয়। তাইজন্য তাদের মোটা কাপড়ের প্রয়োজনও হয়।

মাঘী পূর্ণিমা : ঐ দিনে বুদ্ধ তাঁর ত্রিকাল জ্ঞানের দ্বারা নিজের মহানির্বাণের দিনটি ঘোষণা করেন। অর্থাৎ তিনি বলেন যে, "যখন আমার বয়স আশী বৎসর পূর্ণ হবে তখন আমি অমুক দিনে অমুক সময়ে দেহত্যাগ করব।" তাই এই দিনটি বৌদ্ধদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা : এই দিনটিও একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে বুদ্ধ তাঁর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পিতা শুদ্ধোধন ও পুত্র রাহুলকে ধর্মদীক্ষা দান করেন। তাঁর নূতন দৃষ্টি ও জ্ঞানলাভের কথা শোনান।

এই সব কারণে শুধু এই কয়েকটি পূর্ণিমাই নয়, বৌদ্ধরা প্রত্যেক পূর্ণিমাকেই পবিত্র বলে মনে করেন। এবং প্রতি পূর্ণিমাতেই কিছু না কিছু দান দক্ষিণা, পূজা পাঠ ইত্যাদি পুণ্য কার্যে লিপ্ত হন।

এখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বুদ্ধ তাঁর জীবনের মহৎ কার্যগুলির জন্য পূর্ণিমার দিনটিকেই কেন বেছে নিয়েছিলেন। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে আমার মনে হয়, যেহেতু পূর্ণিমাই মাসের মধ্যে এমন তিথি যখন দিবারাত্র সকল সময়েই পৃথিবী উজ্জ্বল থাকে। সকলেরই ঐ দিনটিকে সেজন্য ভাল লাগে। বোধ হয় বুদ্ধও ঐ কারণে পূর্ণিমা তিথিকে পছন্দ করতেন। এ ছাড়াও পূর্ণিমাকে পছন্দ করার আরও কয়েকটি কারণ সম্ভব,—যেভাবে পূর্ণিমায় পৃথিবী আলোকময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে তিনি চাইতেন সেইভাবে পৃথিবীর প্রাণীকুলের জীবনও আলোয়, আনন্দে ভরে উঠুক। মানুষের অজ্ঞান মুছে গিয়ে জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠুক। পৃথিবী থেকে অশান্তির অন্ধকার কেটে যাক,—শান্তির আলো বর্ষিত হোক। সকল অন্ধকার ধরা থেকে মুছে যাক, তাই প্রার্থনা—

"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জঙ্গীপুর কলেজ ও ত্রিপুরা কৈলাসহর মহাবিদ্যালয়। সংস্কৃত, বাংলা এবং পালিভাষা তথা বৌদ্ধ ইতিহাস-দর্শনে গবেষক পণ্ডিত। নেতাজী ইনস্টিট্যুট ফর্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো। বিগত ২ এপ্রিল ১৯৮৩, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

লোককল্যাণের জন্যই অবতারের আবির্ভাব: অধর্মের গ্লানি দূরীকরণ, ধর্মের সংস্থাপন—তথা লোককল্যাণ-ই অবতার পুরুষের আবির্ভাবের হেতু। অবতারে বিশ্বাসী সকল মানুষেরই এই সিদ্ধান্ত। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম-পন্থীরা দশ অবতারে বিশ্বাসী। দশ অবতারের মধ্যে গৌতমবুদ্ধই শেষ পূর্ণ দেব-মানব যাঁর জীবন-চর্যা ও বাণী আমাদের কাছে ঐতিহাসিক বাস্তব-রূপে এখনও বিরাজ করছে। যাঁর দিব্য জীবন এখনও কোটি কোটি মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করছে।

মানুষ বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ: আধুনিক যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ দশ-অবতারের হিসাবের 'ফরমুলার' মধ্যে না পড়লেও তিনি অবতার-বরিষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের লোককল্যাণ পরিকল্পনা বুদ্ধাবতারের লোককল্যাণের সঙ্গে বহুলাংশে সদৃশ। নিজ জীবনে উপলব্ধ আধ্যাত্মিক চরম উপলব্ধিকে বিশ্বকল্যাণে প্রয়োগ করার দৈবী অনুপ্রেরণা এই উভয় অবতারে সমভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য অবতারে দৈবীভাব, ঐশ্বরিক শক্তি ও ঐশ্বর্য প্রকাশ আজন্ম সিদ্ধ। লোক-সংগ্রহে ঐ শক্তি জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সমভাবেই প্রযুক্ত।

শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে দৈবী-ঐশ্বর্যভাব প্রথমে প্রচ্ছন্ন। বিচার, বিবেক ও বুদ্ধির বিশ্লেষণে মানব জীবনে ত্যাগের পন্থাকেই একমাত্র শ্রেয়: পন্থা বলে নির্ণয় এবং মানবীয় সাধনার ধাপে ধাপে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। উভয় অবতারের জন্মকাহিনীর সঙ্গে দৈবী স্বপ্ন ও দেবতার মানব-রূপে অবতরণের কথা স্মরণ রেখে ও তাঁরা মানবীয় ভাবসাধনায় আমাদের নিকট-আত্মীয়, —আমাদের দুঃখে কাতর এবং দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবার পথপ্রদর্শক।

মহাকরুণায় লোককল্যাণ ইচ্ছা: শ্রীবুদ্ধ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উভয় অবতারই নিজ নিজ জীবনে কঠোর মানবীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ব্রাহ্মীস্থিতি, বিমুক্তি, সমাধি বা নির্বাণশান্তি অনুভব করেছেন। এই নিষ্কাম নির্বাসনায় অবস্থাই মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এই অবস্থায় পৌঁছালেই মানুষ কৃতকৃতার্থ,—এই অবস্থায় পৌঁছালেই মানুষ জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করে। সাধারণ মোক্ষকামী মানুষের এটাই চরম আকাঙ্ক্ষা,—সেটাই পরমাগতি।

কিন্তু অবতার পুরুষগণ নিজের মুক্তিকে সিদ্ধ ও সহজলভ্য করে লোককল্যাণে ব্রতী হন। নির্বাণ বা বিমুক্তি-আরূঢ় হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে এক মহাকরুণার বা বোধিচিত্তের উদয় হয়। এই করুণাই লোককল্যাণের প্রেরণা। ব্রাহ্মী-স্থিতির "অলৌকিক আনন্দের ভার"—তাঁদের বক্ষে এক "অপার বেদনার" সঞ্চার করে। এই বেদনায় কাতর হয়ে তাঁরা দুঃখী জীবের দ্বারে দ্বারে যান তাঁদের আধি-ব্যাধি দূর করতে,—মহাশান্তির পথে টেনে নিতে।

নির্বাণলাভের পর শ্রীবুদ্ধ ব্রহ্মার প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হয়ে সদ্ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণও সমাধির আনন্দের পর জীব-দুঃখ-কাতর হয়ে দক্ষিণেশ্বরের কুঠির ছাদ থেকে কেঁদে কেঁদে ডাকতেন—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্, আয়।"

জীবদ্দশায় শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই আধ্যাত্মিক শান্তি বিতরণের জন্য জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশ্য ভাগ্যবান্ ধর্ম-জিজ্ঞাসু কোন কোন ব্যক্তি তাঁদের কাছে নিজে থেকে গিয়েও ধর্মদেশনা করে মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের অপ্রকট হওয়ার পর কিন্তু সঙ্ঘই তাঁদের ভাববিগ্রহ।

লোককল্যাণে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাঃ শ্রীবুদ্ধ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ নিজ ধর্ম প্রচার এবং লোক-কল্যাণের জন্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য অবতারে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব-পূর্ব অবতারেরা এককভাবেই বা মুষ্টিমেয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তৎকালিক ধর্মগ্লানি দূর করে গেছেন। শ্রীবুদ্ধ সচেতন এবং সক্রিয়ভাবেই নিজে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর সময়োপযোগী নিয়মকানুন বেঁধে সঙ্ঘকে ধর্মের সিদ্ধির পথে বিশেষ অবলম্বনীয় বলে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সঙ্ঘ-গঠন ও প্রাথমিক পরিচালনায় শ্রীবুদ্ধের ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও নির্দেশ বিশেষ কার্যকর ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পরোক্ষ, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং শিষ্য-নির্ভর। কাশীপুর উদ্যানে রোগশয্যা পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাবী ত্যাগী সন্ন্যাসী ও ভাবানুরক্ত গৃহী ভক্তদের সমবেত করে তাঁর দেহাবসানের পর কিভাবে তাঁর ভাবকে জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে তার ইঙ্গিত দিয়ে যান। "নরেন শিক্ষে দেবে"—তাঁর স্বহস্ত লিখিত এই চাপরাসও ভাবীকালের মানুষের জন্য এক পরম নিদর্শনলিপি স্বামী বিবেকানন্দকেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম বার্তাবহরূপে উপলব্ধির পথে। তাই, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রত্যাদিষ্ট ও নির্ধারিত বলে আমরা মেনে নিয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তভিত্তিক ত্যাগ ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সঙ্ঘের আদর্শকে এবং কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান-মার্গ সম্বলিত সকল মত ও পথের সাধনাকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণেরই সমন্বয়ভাবের যথার্থ অভিব্যক্তি বলে ধারণা করতে সক্ষম হয়েছি।

সঙ্ঘই ধর্ম বা আদর্শের মূর্তরূপঃ শ্রীবুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় সদ্ধর্ম প্রচারের সময়েই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেন। নির্বাণলাভের পর শ্রীবুদ্ধ সারনাথে তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। আর্য-সত্যের বিশ্লেষণ, মধ্যপন্থা অবলম্বনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনায় নির্বাণলাভই শ্রীবুদ্ধের ধর্মদেশনার মূল কথা। দুঃখের অনুভব আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই লব্ধ। দুঃখের হেতু এবং দুঃখের নিরোধের উপায় হিসাবে সম্যক্ বাক্, কর্ম, জীবিকা, প্রচেষ্টা, স্মৃতি, দৃষ্টি, সংকল্প এবং সমাধি যে আমাদের অবশ্য পালনীয়—এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। শ্রীবুদ্ধের ধর্মদেশনা—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিপূর্ণ এবং ভারতীয় যোগশাস্ত্র-সম্মত। তবে এই সাধনা গুরুনির্ভর, আচার্য-সহায়। সঙ্ঘে আচার্য-সান্নিধ্যেই এই সাধনা সহজতর। এই জন্যই সঙ্ঘের প্রয়োজন। সাধারণ অধিকারীর পক্ষে সঙ্ঘই ধর্মজীবন গঠনের সহায়ক—একথা স্বামীজীও উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীবুদ্ধ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজন অনুভব করেন তাঁর সদ্ধর্ম শীঘ্র দেশ-দেশান্তরে প্রচারের জন্য। সারনাথে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর সদ্ধর্ম গ্রহণের পর শ্রীবুদ্ধ-সান্নিধ্যে যশ নামে জনৈক বণিক এবং তাঁর চুয়ান্ন জন অনুচরও বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে যশের পরিবারবর্গও গৃহী উপাসক হিসাবে শ্রীবুদ্ধের সদ্ধর্মকে গ্রহণ করেন। এই ষাট জন ভিক্ষুকেই শ্রীবুদ্ধ দিকে দিকে লোক-কল্যাণের জন্য সদ্ধর্ম প্রচারে প্রেরণ করেন। মহাবগ্‌গে-(১:১১) উল্লিখিত আছে তিনি তাঁর ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করে বলেন—"চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।" "হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য তোমরা ভ্রমণ কর। একসঙ্গে দুইজন যেয়ো না। তোমরা আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অন্ত-কল্যাণ ধর্ম উপদেশ কর।" স্বামী বিবেকানন্দও সঙ্ঘকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবঘনীভূত বলে বর্ণনা করেছেন। "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সঙ্ঘ।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অন্য হেতু ভিক্ষু-শরণার্থীর সংখ্যাধিক্য: শ্রীবুদ্ধ প্রথমে ধর্মপ্রচারের জন্য নিজেই উপসম্পদা এবং প্রব্রজ্যা দিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর ষাট জন অর্হৎ শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে গিয়ে বহুলোককে বুদ্ধের সদ্ধর্মের প্রতি অনুগত করান। তাঁদের সকলেই বহু অনুগতকে নিয়ে শ্রীবুদ্ধের কাছে উপসম্পদার জন্য আসেন। তখন বর্ষাকাল। বর্ষাকালে ভিক্ষুদের পক্ষে পথ চলাচল কষ্টকর। ভিক্ষুশরণ প্রার্থীদের সংখ্যাও ছিল অস্বাভাবিক। সুতরাং তখন শ্রীবুদ্ধ তাঁর অর্হত্বপ্রাপ্ত শিষ্যদেরই নিজ নিজ প্রচার স্থানে উপসম্পদা দানের অধিকার দিয়ে দেন। বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে বা দূরদেশে বুদ্ধের অবর্তমানে আধিকারিক ভিক্ষু বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নকে শরণ করিয়ে উপসম্পদা দিতেন। বুদ্ধরহিত উপসম্পদার স্থলে "এহি ভিক্ষু"—বলে সম্বোধন করে—ত্রিরত্নের তিনবার শরণ নেওয়াই ছিল বুদ্ধের নির্দেশ। সঙ্ঘের গুরুত্ব তখন থেকেই।

সঙ্ঘের গুরুত্ব: শ্রীবুদ্ধ নির্বাণ সাধনার আরম্ভে এবং সমগ্র ভিক্ষু জীবনেই সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ সঙ্ঘই ধর্মের বিমূর্তরূপ। বুদ্ধত্বই জীবনের কাম্য;—শ্রীবুদ্ধ নির্ধারিত ধর্মদেশনাকে অবলম্বন করেই বুদ্ধত্বলাভ করতে হবে;—আর বুদ্ধের ধর্মদেশনা যে সকল অর্হৎ ও ভিক্ষুগণের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—তাঁদের সমবেতরূপই বৌদ্ধ-সঙ্ঘ। সুতরাং ভগবান্ বুদ্ধ—উদ্দেশ্য, উপায় এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণাগত হয়ে চলার ব্রতকে ভিক্ষুজীবনে সর্বদা স্মরণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমে উপসম্পদা সময়ে শ্রীবুদ্ধ "এহি ভিক্ষু"—বলে শরণাগতকে গ্রহণ করতেন। তখন ধর্মগ্রহণকারীর পক্ষে শুধু "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"—ব্রতই ছিল যথেষ্ট। পরে দ্বিশরণ "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।" সর্বশেষে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের—ত্রিশরণের ব্যবস্থা। সঙ্ঘ ধর্ম ও বুদ্ধেরই বিমূর্তরূপ। বুদ্ধের দেহা-বসানের পর, এবং কালক্রমে ধর্মানুশাসনের পরিবর্তনের পর—সদ্ধর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করতে হলে, সঙ্ঘের আশ্রয়ই নিতে হয়। মহা পরিনির্বাণ সূত্রে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর শিষ্য আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে বিনয় বা ধর্মদেশনাই হবে পরিচালক। সঙ্ঘ এই বিনয়ধর্মের ধারক ও বাহক। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-ঘনীভূত শরীর।

প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগে সঙ্ঘ ও সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রা: শ্রীবুদ্ধই সুনিয়ন্ত্রিত ধর্ম-সঙ্ঘের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক সন্দেহ নেই। বৈদিককালে আরণ্যক সন্ন্যাসীদের কোন সঙ্ঘ ছিল বলে জানা নেই। তবে গুরুগৃহে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্য সম্প্রদায় একত্র বাস করে ধর্মশিক্ষা লাভ করতেন—এইরূপ "আচার্য-অন্তেবাসী" সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের কথা আমাদের জানা আছে। বিশেষ বিদ্যা বা বেদের বিশেষ শাখাকে

প্রজন্ম পরম্পরা সঞ্জীবিত রাখার জন্য আচার্য বা গুরুভিত্তিক গোত্র বা শ্রেণী ছিল।

শ্রীবুদ্ধের সমসাময়িক কালেও প্রব্রজিত ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের বহু শাখা বা গোষ্ঠী ছিল। তাঁদের অনেকে একত্র বসবাস ও অধ্যাত্ম সাধনা করতেন। শ্রীবুদ্ধ এইরূপ বহু "গণাচার্য" বা সম্প্রদায়-গুরুর সঙ্গ করেছেন। অনেকের মতবাদ ও সাধন-প্রণালী থেকে কিছু গ্রহণও করেছেন। আবার অনেকের মতবাদকে খণ্ডনও করেছেন। গণাচার্য পরিব্রাজক সঞ্জয়ের ২৫০ জন অনুগামী শিষ্য ছিল। প্রথমে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ছিলেন সঞ্জয়ের শিষ্য। পরে তাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কঠোর জীবনযাত্রা — ন্যূনতম আহার পরিচ্ছদে তুষ্টি এই সব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রীবুদ্ধ এই সকল সম্প্রদায়ের কঠোরতা ও যদৃচ্ছা পরিচ্ছদ বা নগ্নতাকে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। (উ মহাবগ্‌গ ১:২০) ভিক্ষুজীবন যাপনে আহার বিহারে "মধ্যপন্থা" অবলম্বন শ্রীবুদ্ধের নব অবদান। স্বামীজী রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘেও এই "মধ্যপন্থা"র অনুসরণ করেছেন।

জটিল সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ ও লোককল্যাণ ব্রত : উরুবেলা-কাশ্যপ নামে এক জটিল (জটাধারী) সন্ন্যাসী আচার্যকে তাঁর শিষ্যসহ শ্রীবুদ্ধ সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই জটিল সম্প্রদায় অগ্নি-উপাসক এবং কর্মবাদী বেদপন্থী ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। বহু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে এবং দ্বারা সদ্ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে তবে জটিলদের তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন।

জটিলরা বনবাসী সন্ন্যাসী হলেও লোক-সমাজের বহু জনহিতকর সেবাকার্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন বলে জানা যায়। প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগে জনসেবার এবং আত্মমুক্তির জন্য সাধনারত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হিসাবে জটিলদের অবদান বিশেষ স্মরণীয়। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে জটিলরা সাগ্নিক বৈদিক ঋষির-ই উত্তরসূরী। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের জনসেবার পরিকল্পনা পরবর্তীকালে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে দেখতে পাব। বোধিসত্ত্ব আদর্শের নিজের মুক্তির বিনিময়েও অপরের মুক্তির সহায়তা—স্বামীজী গ্রহণ করেছেন।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা—উদ্দেশ্য ও সঙ্ঘের গুরুত্ব : "ধর্মগ্লানি" বলতে আমরা যা বুঝি তা শ্রীবুদ্ধের সময়ে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সময়ে একরকম ছিল না। শ্রীবুদ্ধ তাঁর সময়কার ধর্মগ্লানিকে দূর করে সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন নিঃসন্দেহ। যে ধর্মচক্র তিনি প্রবর্তন করে গেছেন তার গতিবেগ স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কমে এসেছে—বা গতির প্রকৃতি সরল না থেকে নানামুখী হয়েছে। তবে অবতার পুরুষের উদ্দেশ্য এক—লোককল্যাণ,—মানুষের আত্যন্তিক শান্তির পথপ্রদর্শন। শ্রীবুদ্ধ মানুষের আত্যন্তিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের উপরই জোর দিয়েছেন। দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য একেবারে নির্বাণের পথে আহ্বান। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম ও নীতিকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে বোধিসত্ত্বগণ জগতের কল্যাণের জন্য নিজেদের বিসর্জন দিয়েছেন—এ দৃষ্টান্ত এবং আদর্শও প্রচুর আছে। অশোক প্রমুখ গৃহী বৌদ্ধ উপাসকগণ জীবের কল্যাণের জন্য বহু জনহিতকর কার্য করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুহুর্মুহুঃ নির্বিকল্প সমাধি বা ব্রহ্ম চিন্তায় লীন থাকলেও জগতের অন্নকষ্ট, ব্যাধিকষ্ট এবং অধ্যাত্মবিমুখতাজনিত কষ্ট—সর্বকষ্ট-লাঘবের কথাই যুগপৎ চিন্তা করেছেন। "খালি পেটে ধর্ম হয় না", "কলিতে অন্নগত প্রাণ", "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" প্রভৃতি কথা তিনি নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের সম্মুখে বহুবার

উচ্চারণ করেছেন। নরেন্দ্রনাথকে নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের সন্ধান দিয়েছেন নরনারায়ণ-সেবার আদর্শের মধ্যে। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ যখন ১ মে ১৮৯৭, বলরাম বসু মশায়ের বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন বা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কথা ঘোষণা করেন তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের উচ্চতম আধ্যাত্মিক ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে সর্বাশ্রয়ী জীবসেবার, জীবকল্যাণের আদর্শকেও বিস্মৃত হননি।

স্বামীজী ঐ দিন গৃহী ও সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামীদের উদ্দেশ করে বললেন—"নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না।···আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।" (বাণী ও রচনা, ৯।৮০)

উদ্দেশ্য: মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং কার্যে তাঁর জীবনে প্রতিপাদিত হয়েছে, তাদের প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি-কল্পে যাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই মিশনের উদ্দেশ্য।

ব্রত: জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তর মাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করেছিলেন তার পরিচালনাই এই মিশনের ব্রত।

কার্যপ্রণালী: মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতীয় কার্য: ভারতের নগরে নগরে আচার্য-ব্রত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রমস্থাপন, এবং যাতে তারা দেশান্তরে গিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করতে পারে তার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগ: ভারতবহির্ভূত প্রদেশসমূহে "ব্রতধারী" প্রেরণ এবং সেই সকল দেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের সঙ্গে ভারতীয় আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে বৈষয়িক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমন্বয়: শ্রীরামকৃষ্ণের মনোনীত নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুগের,—উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ধর্মগ্লানিকে শুধু আধ্যাত্মিকতা-বিমুখীরূপেই দেখেননি। তিনি প্রাচ্যের বৈষয়িক উন্নতি এবং পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্বজনীন "ভগবৎপ্রেরণা-প্রসূত-সমাজসেবা" মূলক মানবীয় আদর্শের কথাও প্রচার করেছেন। স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের আদর্শে "নিজের মুক্তি, এবং বিশ্বের মঙ্গল"—ব্রতটি যুগপৎ গৃহীত হয়েছে। "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"—বুদ্ধও বলে-ছিলেন—"বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।" স্বামীজীর চিন্তায় এবং যুগ প্রয়োজনে "হিত"—এবং "সুখের" ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ যুগ প্রয়োজনে এই "হিত এবং সুখের" বাস্তব রূপায়ণ করছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বুদ্ধের যুগে আধ্যাত্মিক মুক্তির কথাই মুখ্য প্রয়োজন ছিল। তবে অনধি-কারী মোক্ষপ্রার্থী হওয়ায় দেশের বৈষয়িক ক্ষতি হয়েছে—একথা স্বামীজীও একাধিক ক্ষেত্রে

বলেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘের পরিণাম দেখে স্বামীজী সাবধান হয়েছেন। এবং সঙ্ঘ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে এমন সব দৃঢ় বন্ধন রাখতে চেয়েছেন—যাতে ত্যাগের আদর্শ ক্ষুন্ন না হয়,—আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্য প্রশ্রয় না পায়।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সন্ন্যাসী ও গৃহীর সমান দায়িত্ব : শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগীশ্রেষ্ঠ (ত্যাগীশ্বর হে নরবর!) হয়েও বাহ্যতঃ গৃহবেশধারী। ত্যাগী-গৃহীর অপূর্ব সমন্বয়মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে মিশনের ভাবে ত্যাগদৃঢ় জীবন গঠন করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে তাঁর ভাবরাশিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য ত্যাগী এবং গৃহী উভয়কেই সমানভাবে আহ্বান করেছেন। বৌদ্ধ-সঙ্ঘে গৃহী উপাসকদের ভূমিকা সঙ্ঘের ভিক্ষু ও বিহারের সেবা ও পোষকতার মধ্যেই মুখ্যতঃ সীমাবদ্ধ। পঞ্চশীল বা দশশীলসম্পন্ন গৃহী উপাসক নিত্য শীলচর্যা করে সঙ্ঘের সেবায় রত থাকবেন, এতেই তাঁর অর্হত্বলাভ। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে গৃহস্থের ভূমিকা আরও সক্রিয়। গৃহস্থদের সচেতন করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মহাসম্মেলন।

সঙ্ঘ চালনায় গণতন্ত্র : শ্রীবুদ্ধ শাক্যকুলের ক্ষত্রিয় সন্তান। শাক্যদের শাসনব্যবস্থায় অধিকাংশের মতের প্রাধান্য ছিল। গার্হস্থ্য জীবনে ক্ষত্রিয় কুমার গৌতম শাক্যদের গণতান্ত্রিক শাসনপ্রথার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সঙ্ঘ গঠনের পর—যাতে অধিকাংশের মতকেই সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা হয়—সেই নির্দেশ শ্রীবুদ্ধের ছিল। অবশ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘে এবং সর্বধর্মীয় সঙ্ঘেই আধ্যাত্মিকতায় উন্নত বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীর সম্মান আছে। এইরূপ চারিত্রিক উদারতা, ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসীর উপদেশ এবং নির্দেশ সঙ্ঘের অনেক সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বুদ্ধ নিজে যেখানে উপস্থিত থাকতেন—সেখানে তাঁর সমুন্নত ব্যক্তিত্বই সব নির্ধারণ করত। যেখানে শ্রীবুদ্ধের উপস্থিতি সম্ভব ছিল না—বা শ্রীবুদ্ধের দেহাবসানের পর কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ছিল শ্রীবুদ্ধের নির্দেশ। এখনও বৌদ্ধ বিহারে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দও সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে বহুর মতকেই সঙ্ঘের মত বলে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে বলেছেন। তবে প্রথমে তিনি গণতন্ত্রে খুব আস্থাবান ছিলেন না। সঙ্ঘ-পরিকল্পনা ঘোষণার সেই প্রথম দিনেই (১ মে, ১৮৯৭) তিনি বলেছেন—"তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক হবে ব'লে মনে হয় না।" (বাণী ও রচনা, ৯।৩০) যা হোক স্বামীজীও শেষ পর্যন্ত ভোটেই বিশ্বাসী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘেও অধিকাংশের মতেই কার্য নির্বাহ হয়ে থাকে। বৌদ্ধ-সঙ্ঘেই সর্বপ্রথম গোপন ভোটের ব্যবস্থা হয় (vote by ballot)।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘে সাম্যবাদ : শ্রীবুদ্ধ জাতি ও বর্ণবিভেদ স্বীকার করতেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্ণ এবং আশ্রমকে তিনি সাহসের সঙ্গে অস্বীকার করেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলকেই উপসম্পদা দান করেন। গৃহী উপাসক হিসাবে শরণার্থী হলে তিনি জাতের বিচার করেননি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শাসিত সমাজে শ্রীবুদ্ধের এই বিপ্লবকারী প্রেমের আন্দোলন তাঁর ধর্ম ও ব্যক্তিত্বকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণীয় করেছিল।

তিনি সকলকেই ভিক্ষু হবার অধিকার দিয়েছিলেন। চতুরাশ্রমের ক্রম তিনি স্বীকার করেননি। যে কোন অবস্থা থেকেই তিনি

ভিক্ষুত্বে উন্নীত করে দিয়েছেন। তিনি নিজে ক্ষত্রিয় হয়ে যে ব্রাহ্মণ্য বিরোধী আন্দোলন করে-ছিলেন—তা তখনকার দিনে অকল্পনীয়। শ্রীরাম-কৃষ্ণ-সঙ্ঘেও যে কোন বর্ণের যে কোন ধর্মের ব্যক্তিকে সঙ্ঘের সন্ন্যাসী বা গৃহী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘের অনুমোদন—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্কতা : ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের অনুমোদনে শ্রীবুদ্ধ খুব আগ্রহী বা উৎসাহী ছিলেন না। প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং মাতা প্রজাবতী গৌতমীর বিশেষ অনুরোধে তিনি ভিক্ষুণীদের প্রব্রজ্যা দেন এবং পৃথক সঙ্ঘ বিশেষ নিয়মে ও সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনার নির্দেশ দেন। সাধারণ মানুষের দুর্বলতার প্রতি শ্রীবুদ্ধ সচেতন ছিলেন। ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ ভিক্ষু-সঙ্ঘের বিশেষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘের পক্ষ-পাতী ছিলেন। তবে তিনি বৌদ্ধ-সঙ্ঘ থেকে শিক্ষাও নিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে সম্পূর্ণ পৃথক নারী মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়ে লোককল্যাণে একই উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়েছে।

সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে শাসন,—নিয়মাবলী : বুদ্ধ-সঙ্ঘ নিবাসী (সঙ্ঘারাম বা বিহার নিবাসী) সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অধ্যাত্ম জীবনযাপনের সহায়ক কতকগুলি বিধি এবং নিষেধমূলক নিয়মা-বলীর প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘের নিয়মাবলীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নিয়মাবলীর অনেক সাদৃশ্য আছে। স্বামীজী সঙ্ঘশাসনের মূল কাঠামো বৌদ্ধ-সঙ্ঘ পরিচালনা পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই।* বিনয় বা ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিয়মাবলী এবং আচার আচরণ বিধির খুঁটিনাটি উল্লিখিত আছে। সঙ্ঘে সমাজের নানা স্তর থেকে ভিক্ষুরা যোগদান করেন। সকলের গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা সমান ছিল না। লোকব্যবহার শিক্ষা এবং নিজের চিত্তবৃত্তিকে নির্বাণলাভের উপযোগী করার জন্যই বিনয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বহুলোকের একত্র আহার বিহারাদির জন্যও সুশৃঙ্খল সময়ানুবর্তী জীবনযাত্রার বিশেষ প্রয়োজন। রুগ্ন, রাজদণ্ডে অপরাধী, দৈহিক ক্ষতবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পলাতক সৈনিককে সঙ্ঘে স্থান দেওয়া হত না। প্রব্রজ্যা সন্ন্যাস প্রদান কালে বয়োজ্যেষ্ঠ ও আচার্যকল্প নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষুর সম্মতি আবশ্যক ছিল।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান : বৌদ্ধ-সঙ্ঘ বা বিহারগুলি দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শ্রমণের, সদ্ধিবিহারিক—ব্রহ্মচারী প্রবেশনারদের আধ্যাত্মিক এবং নীতি-শিক্ষার জন্য যেমন ব্যবস্থা ছিল,—তেমনি সাধারণ শিক্ষার্থীরাও বৌদ্ধ-সঙ্ঘে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন। শুধু ধর্ম, দর্শন বা নীতি-ই শিক্ষা দেওয়া হত না,—সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাও বৌদ্ধ বিহারে ছিল। পরবর্তীকালে নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিহারগুলি শিক্ষার বিশিষ্ট ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। স্বামীজীর পরিকল্পিত সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, কৃষিবিদ্যা, বেদান্ত, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

সংযতচিত্ত, ত্যাগী ও জ্ঞানী আচার্যের সান্নিধ্যে অধীত বিদ্যা জীবনে সহজেই কার্যকরী হয়। ত্যাগী বা সন্ন্যাসীই ভারতীয় শিক্ষার আচার্য। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের বিহার বা সঙ্ঘারামে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সহিত বস্তুজাগতিক এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম ব্যতিরিক্ত নানা বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা

* এই মন্তব্য লেখকের অনুমান-ভিত্তিক।—সঃ

ছিল। স্বামীজীও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের মধ্যে শিক্ষাকে বিচিত্র জ্ঞানমুখী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠের এবং খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের উপর বৌদ্ধ-সঙ্ঘের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সঙ্ঘের মহাসম্মেলন: সন্ন্যাসী ভিক্ষুর ত্যাগময় জীবনের আদর্শকে এবং শ্রীবুদ্ধের অনুশাসনকে বিশুদ্ধ এবং আদর্শানুগ রাখার জন্য বৌদ্ধ-সঙ্ঘের বিভিন্ন সময়ে চারটি মহাসম্মেলন হয়। এই মহাসম্মেলনগুলিতে শ্রীবুদ্ধের বাণী এবং বিনয় ধর্মকে বিশেষভাবে আলোচনা করা হত। মতভেদ দূর করার চেষ্টা করা হত। সঙ্ঘ যাতে আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত না হয়—সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘেও এই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ৮০ বৎসরের মধ্যেই দুটি মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের অবক্ষয়ের কারণগুলি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাবধানী সংকেত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রীবুদ্ধ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ: বুদ্ধের অবতার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এবং সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণায় শ্রীবুদ্ধের আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীবুদ্ধের প্রতি তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যে শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি বিশ্বের সমক্ষে প্রকাশ করেন তাঁর অংশবিশেষ এখানে স্মরণ করলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও বুদ্ধ-সঙ্ঘের আদর্শ ও ভাব-গত ঐক্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হতে পারে। স্বামীজী বলেছেন—"আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ।...শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত—স্থায়সঙ্গত বিকাশ।" "শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয় এত উদার ছিল যে লুকানো বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্রলোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক; শুধু তাহাই নয়, ধর্মান্তরিতকরণের ভাব তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হইয়াছে।"

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলনই ভারতের শক্তি: "বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না।...ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শন-শাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। অতএব এস, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব-ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান্ আত্মা এবং অসাধারণ লোককল্যাণ শক্তি যুক্ত করিয়া দিই।" (বাণী ও রচনা, ১।৩০-৩২)। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলিত শক্তির সহায়ে—স্বামীজীর এই আহ্বান-বাণীকে অনুসরণ করে যুগোপযোগী রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অনুগামী হয়ে বর্তমান ভারতের নব উদ্বোধনে আমরা—বিনম্র কণ্ঠে উচ্চারণ করি:

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

রামকৃষ্ণং সারদাং চ স্বামিনং বিবেকানন্দম্।
ত্রিরত্নং সততং বন্দে ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কম্॥

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দের মহাপ্রয়াণ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ (সূর্য মহারাজ) গত ২২ চৈত্র, ১৩৯০ (৬ এপ্রিল, ১৯৮৪) বৃহস্পতিবার রাত একটা আট মিনিটে, বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে লীন হয়েছেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বার্ধক্যজনিত অন্যান্য উপসর্গ ছাড়াও, দীর্ঘকাল ব্যাপী তাঁর শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছিল—এবং সেটাই তাঁর দেহত্যাগের অব্যবহিত কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত শান্ত ও ধীর পদেই অন্তিমক্ষণটি নেমে এসেছিল। শ্বাসকষ্টের জন্য ঐদিন তিনি প্রায় সারাক্ষণই শয্যায় আসীন অবস্থায় কাটান,—অথচ তাঁর চোখে-মুখে কোন ক্লান্তি বা বেদনার চিহ্ন দেখা যায়নি। একটা নিরুদ্বেগ প্রসন্নতা ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিপাতে। দর্শনার্থী সাধু-ব্রহ্মচারী যাঁরাই কাছে গেছেন, সকলের উদ্দেশেই বার বার দু-হাত তুলেছেন,—কখনও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আসীন অবস্থা থেকে শায়িত করে দেওয়া হয়েছিল চিকিৎসকের নির্দেশে। কিন্তু দুই চোখে নিদ্রার লেশও ছিল না। রাত একটা থেকে নিঃশ্বাসের প্রকৃতি অকস্মাৎ পালটাতে থাকে,—ক্রমেই মন্থর ও শান্ত হয়ে আসে। স্বাভাবিক কণ্ঠে নিকটবর্তী সেবকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমাকে বসিয়ে দাও'। সেবকরা আদেশ পালন করেছিলেন। অনেকটা অর্ধশায়িত-ভাবে শয্যায় বসে তিনি করজোড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রণাম করেন—বুঝি শ্রীশ্রীঠাকুরকে শেষ প্রণামটি নিবেদন করেছেন এইভাবেই। অতঃপর অত্যন্ত ধীরে তিন-চারবার শ্বাস নিয়েই তিনি মহানিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে যান। প্রায় শতাব্দকাল বিস্তীর্ণ অনুপম বিশ্বাস, ভক্তি ও কর্মময় একটি জীবন-পথের অবসান হল,—কিন্তু ভাবীকালের পথিকদের জন্য প্রেরণাপ্রদ অনেক চিহ্নও সেখানে রক্ষিত থাকল, যা তাদের পথ চলতে প্রভূত সহায়তা করবে।

স্বামী নির্বাণানন্দের পূর্বাশ্রমে নাম ছিল গিরীন্দ্রকুমার সেন—ডাক নাম সূর্য, যাতে তিনি সমধিক পরিচিত। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় (অধুনা বাংলাদেশের পালঙ জেলায়) তুলাসর গ্রামে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে (১২৯৭ সনের ১৭ বৈশাখ) এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়াতে, তাঁর স্কুলের পাঠ্যজীবন বহুলাংশে বিঘ্নিত হয়েছে। বালক সূর্য সেই কৈশোরেই 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য। বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ স্বদেশী যুগের নেতারা ছিলেন তাঁর আবাল্য সহচর ও বন্ধু।

তরুণ বয়সেই অন্যান্য সহচরদের সঙ্গে তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাবলীর পাঠ ও চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তরুণ সূর্য ঐ-সব গ্রন্থাবলী সূত্রেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-তনয় শ্রীশ্রীমহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অলক্ষ্য দিব্য সংস্পর্শ অনুভব করতে থাকেন। চোখের দেখা-শোনার সুযোগ তখনও পর্যন্ত না মিললেও চিঠিপত্রাদিতে যোগাযোগ উত্তরোত্তর নিবিড় হচ্ছিল। অবশেষে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে কোন এক সময়ে তিনি কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানেই তাঁর বহু প্রতীক্ষিত শ্রীমহারাজের দর্শনলাভ হয়ে যায়। রাজা মহারাজ তখন কাশী সেবাশ্রমে অবস্থান করছিলেন। আর গৃহে ফিরে যাওয়া হয়নি,—সূর্য মহারাজের সঙ্ঘে যোগদান তখন থেকেই কাশীধামস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে।



শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ

সেখানেই শ্রীমহারাজ কৃপা করে তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজ গুরুর কাছেই তিনি ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন, পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে তাঁরই কাছে সন্ন্যাসলাভ করেন।

কাশীধামে থাকা কালেই তিনি শ্রীশ্রীমার দর্শনলাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। ক্রমে স্বামী প্রেমানন্দজী, স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদদেরও ঘনিষ্ঠ সেবা ও সাহচর্যের সুযোগ সূর্য মহারাজ প্রচুর পেয়েছেন। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ব্যক্তিগত সেবার দুর্লভ যোগাযোগ। শ্রীশ্রীমহারাজের মহাসমাধিতে লীন হবার প্রাক্‌ক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর সেবাধিকার পেয়েছেন এবং এই একনিষ্ঠ সেবা-বলেই তিনি স্বীয় গুরুর অমোঘ কৃপা ও আশীর্বাদ জীবনে ভূয়োভূয়ঃ সঞ্চয় করেছেন। রাজা মহারাজ স্নেহভরে তাঁকে কখন কখন গণেশ বলে ডাকতেন। শরীর ত্যাগের পূর্বে শ্রীমহারাজ নিকটবর্তী সকল সেবককেই কাছে ডেকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর আদরের গণেশকেও গভীর আবেগের সঙ্গে অধ্যাত্মরাজ্যের চরম আশীর্বাদ তখন জানিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বামী নির্বাণানন্দ মঠ ও মিশনের সেবা ও ত্রাণকার্যে নানা সময়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছেন। পূর্ত ও গৃহনির্মাণ কর্মে তাঁর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বেলুড় মঠে ও ভুবনেশ্বর মঠে অনাগত আরও বহুকাল বিদ্যমান থাকবে। সঙ্গীতে ও তবলাসঙ্গতে তাঁর কুশলতার স্মৃতি কোনদিনই মুছে যাবে না। রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষরাও তাঁদের স্নেহের 'সুয্যি'র ভজনগীতে মুগ্ধ হতেন—তবলা ও পাখোয়াজ বাদনে অভিভূত হয়েছেন।

নির্বাণানন্দজী দীর্ঘকাল ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষতা ছাড়াও, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন। বেলুড় মঠের একজন সুদক্ষ ম্যানেজার রূপেও তাঁর কর্মজীবন স্মরণীয় হয়ে রইবে। যে-কোন পদে বা কর্মে অধিষ্ঠিত থেকেও তাঁর নিয়মিত সাধনভজনে আন্তরিক নিষ্ঠা সর্বাবস্থায় অক্ষুণ্ণ ছিল আজীবন। সময়ানুবর্তিতা ছিল তাঁর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হলিউড্‌ বেদান্ত কেন্দ্রের সান্তা বারবারা শাখায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন সূর্য মহারাজও তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ঐ সময়ে আমেরিকা ব্যতীত ইউরোপ ও ইংলণ্ডের কয়েকটি শাখাকেন্দ্র তিনি মাধবানন্দজীর সাহচর্যে পরিদর্শনের সুযোগ পান। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষের আসনে বৃত হন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৫-র এপ্রিল থেকেই তদানীন্তন মঠাধীশ স্বামী মাধবানন্দজীর ইচ্ছাক্রমে তিনি উপযুক্ত প্রার্থীকে দীক্ষা দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অতঃপর অধ্যাত্ম-পিপাসু বহু নর-নারীর জীবনে তিনি পথনির্দেশক গুরু, স্নেহময় পিতা বা সমব্যথী সুহৃদ্‌রূপে সম্মানিত।

স্বামী নির্বাণানন্দ—সমগ্র রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভক্তিভাজন সূর্য মহারাজ একটি ব্যক্তিত্ব যা বর্তমানের ও আগামী দিনের সবার চিত্তেই সমান সমুজ্জ্বল হয়ে রইবে,—একটি নাম যা কোনদিনই বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে যাবে না। তাঁর দীর্ঘ ভজনশীল কর্মোজ্জ্বল জীবনের সকল দিক ছাপিয়ে যে চিত্রখানি আমাদের মানসপটে সর্বাগ্রে ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে—তাঁর অসাধারণ গুরুভক্তি, অনন্যসাধারণ শরণাগতি। লোকান্তরিত এই মহনীয় সন্ন্যাসীর উদ্দেশে আমাদের ভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শান্তি অন্বেষণে

স্বামী নির্বাণানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্প্রতি প্রয়াত অন্যতম সহাধ্যক্ষ। প্রবন্ধটি উদ্বোধনের ২৩তম বর্ষ ১৩২৮ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

প্রভাত-অরুণ প্রতিফলিত শুভ্র হিমগিরি, কুলু কুলু নিনাদিনী স্রোতস্বিনী, সুদূর প্রসারিত অচল নীলাম্বুরাশি, অগণন তারকা মণ্ডিত অনন্ত আকাশ, জ্যোৎস্নার বিমল হাসি, নির্মল উষার স্নিগ্ধ সমীরণ, পত্রাভ্যন্তরচারী পবনের মৃদু মর্মর-ধ্বনি, বিহঙ্গের সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা, সুন্দর কুসুমরাশি বিতরিত মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ এবং ধন জন যৌবন, প্রকৃতির এ সবই সুন্দর এবং সুখকর। প্রকৃতির এ সৌন্দর্যের উপবনে সুখের আশায় সকলেই আকৃষ্ট ও বিমোহিত। সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা হইতে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী সকলেই জগতে সুখের অন্বেষণে নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। সুখসম্ভোগই মানুষের চির ঈপ্সিত এবং স্বভাবসিদ্ধ। সুখের বাসনা মানব মনে নিরন্তরই জাগরূক, স্থূল, সূক্ষ্ম অনন্ত অনন্ত বাসনাশ্রেণী একটির পর একটি করিয়া মানব-হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাসনার তৃপ্তি সাধনেই জগতে কর্মের অনুষ্ঠান। বাসনার বশবর্তী হইয়াই মানুষ জগতে কত কি করিতেছে, মনোহর পুষ্পোদ্যান, মণিরত্ন খচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা, পণ্যবীথিকা সুসজ্জিত বিপুল নগরী, বৈজ্ঞানিক কর্মপটুতা এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার, এ সমস্তই মানবের বাসনাপ্রসূত।

এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাহাতে আমরা এত আসক্ত, তাহা নিয়ত পরিবর্তিত এবং বিনাশী। উহার বর্তমানতা বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় চকিত দৃষ্টিতে অন্তর্হিত। সুখের বলিয়া যাহা গ্রহণ করিলাম, শান্তির আশায় যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি কালপ্রভাবে তাহা যেন দুর্ভেদ্য তমসাবরণে বিলীন হইতেছে। আজ যাহা দেখিতেছি, পাইতেছি কাল তাহা ধ্বংসীভূত। এইরূপে সৃজন প্রলয়, জন্ম মৃত্যু অনাদি কাল হইতে জগতে পরিলক্ষিত ও অপরিহার্য এবং অনন্তকাল এইরূপে চলিবে ইহাও সিদ্ধান্ত। এই অনন্ত সত্যের অপ্রতিহত নিয়মনে ভোগ্য পদার্থের অবর্তমানতা বা অভাব চিরকালই লক্ষিত হইবে। একে একে সমস্ত জগৎ সম্ভোগও যদি সম্ভাবিত হয়, এ অভাব আকাঙ্ক্ষা ফুরাইবে না, বাসনার তৃপ্তি হইবে না।

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

কামনার উপভোগে বাসনার তৃপ্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় দিন দিন বাড়িতে থাকে। বিষয় সম্ভোগে বাসনা অতৃপ্ত এবং অভাব আকাঙ্ক্ষা থাকিবেই। যেখানে অভাব, দুঃখও সেখানে ছায়ার ন্যায় পরিলক্ষিত। জগতে ভোগও অনন্ত—দুঃখও অনন্ত। এ জগৎ দুঃখ-পূর্ণ। আপাত রমণীয় জাগতিক মোহে দুঃখই যেন সুখের মূর্তি পরিগ্রহণে পরমাত্মীয়রূপে প্রকাশিত; সুখের মুখস পরিহিত হইয়া দুঃখই যেন জগৎ-রঙ্গমঞ্চে লীলাখেলা করিতেছে। ভ্রমবশতঃ আমরা যাহা সুখের মনে করিতেছি, বাস্তবিকপক্ষে তাহা দুঃখপূর্ণ। জগতে দুঃখের সতত বিদ্যমানতা ধ্রুবতারার ন্যায় নিরন্তর পরিলক্ষিত। অনাদিকাল হইতে জগতে এই দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু দুঃখ যেমন তেমনই রহিয়াছে। উহা যেন সুদৃঢ় শৈলমালার ন্যায় সুখের চরম উৎকর্ষরূপ প্রবল আবর্তের নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাতেও অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান। দুঃখের সুদৃঢ় শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করা বড়ই দুঃসাধ্য। অনুল্লঙ্ঘনীয় দুঃখের তীব্র দংশন বিষে জর্জরিত হইয়াও মানুষ মিথ্যা নশ্বর বিষয় গ্রহণে খাদ্যদুষ্ট কুকুরের ন্যায় দ্রুত

গতিতে ধাবমান। জীবনসংগ্রামে দুঃখই জয়ী এবং উহার অপ্রতিহত প্রভাব জগতে অনিবার্য জানিয়াও মানুষ তল্লাভে ভূয়োভূয়ঃ চেষ্টা করিতেছে এবং অশান্তি সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। কেন আমাদের এই অশান্তি? কিসে আমরা এত অসুখী? বাসনা হইতেই উহার উৎপত্তি। একটু কিছু অভাব বোধ হইতেছে, উহা পূর্ণ না হইলেই অনন্ত দুঃখ আসিবে। অভাব না থাকিলে, বাসনা না থাকিলে, দুঃখও থাকিবে না। এখানে একটা আপত্তি হইতেছে এই যে, বাসনা না থাকিলে জীবন ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। শরীর এবং ইন্দ্রিয়গত আমাদের এই জীবন সমুদ্রগামিনী পার্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় বিষয়মুখী। উহা নিয়ত গতিতে বিষয় অভিমুখে চলিতে থাকিবেই। বাসনা ত্যাগ বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? বিষয় সম্ভোগ পরিহার। বিষয় বিমুখ ইন্দ্রিয় দাহিকাশক্তিহীন আগুনের ন্যায় অসম্ভব কল্পনা মাত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয়গত আমাদের এই জীবনে বিষয় বাসনা থাকিবেই। এই বাসনার সংহার করিতে হইলেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা ভিন্ন সংসার ত্যাগের আর উপায় কি। এ আপত্তি ভ্রান্তিমূলক। সংসার পরিত্যাগ করা অর্থ মৃত্যু বা আত্মহত্যা নহে। সত্যকে জানিতে হইলে অসত্যকে ত্যাগ করিতে হইবে, ভাল জানিতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে। এখানে যেমন অসত্য বা মন্দ ত্যাগ করা—সত্য কিংবা ভাল জানা বুঝায় সেইরূপ সংসার ত্যাগ অর্থে ভগবানকে জানা বুঝায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, পশ্চিমদিকে এগুলে পূর্বদিক আপনিই পিছনে পড়ে থাকবে, ভগবানকে জানলে সংসার আপনিই ত্যাগ হয়ে যাবে।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এখন আমাদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত এবং যেভাবে আমরা অনুমান করিতেছি তাহা নাট্য রঙ্গমঞ্চের ন্যায় আপাত রমণীয় এবং সর্বৈব মিথ্যা। উহার কোনই অস্তিত্ব নাই। উহা আমাদিগের মরীচিকার জল সন্দর্শনে প্রধাবিত হরিণের ন্যায় ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে। এই ভ্রম দূর কর। জগতের প্রকৃত-স্বরূপ, সেই ভগবানকে অবগত হও। "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি"—ঈশ্বরই সর্বভূতের হৃদয়ে রহিয়াছেন। মানুষেও তিনি, পশুপক্ষীতেও তিনি রহিয়াছেন। বৃক্ষ পাষাণাদি স্থাবর জঙ্গমেও তিনিই অধিষ্ঠিত। সুখে দুঃখে তিনিই বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ড ভরা ব্রহ্মতে, জগৎ ভরা জগন্নাথে, তিনিই এই জগদ্রূপে প্রকাশিত। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ইত্যাদি

এইরূপে জগৎ ঈশ্বরে আচ্ছাদিত এবং ভূতে ভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রতিভাত হইলে তোমার সমস্ত ভাব, সমস্ত চিন্তা বদলাইয়া যাইবে; তখন দেখিতে পাইবে তোমার অভাব আকাঙ্ক্ষা ফুরাইয়াছে, বাসনা কামনা নষ্ট হইয়াছে। বাসনা না থাকিলে কি হইবে? দেয়ালের ত বাসনা নেই। দেয়াল সুখ দুঃখও ভোগ করে না। একথা স্বীকার করি কিন্তু দেয়াল উন্নতিও করে না, যে দেয়াল সেই দেয়ালই থাকে। মানুষ উন্নতিশীল। সুখ-দুঃখের সমষ্টিরূপ শিক্ষার ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ নিয়তই উন্নতির শিখরদেশে ক্রমশঃ আরোহণ করিতেছে। যে যত উন্নত তার সুখশান্তিও সেই পরিমাণে অধিক। উন্নতির চরম উৎকর্ষে চির সুখ, চির শান্তি বিরাজিত। এই আনন্দ সমুপস্থিত হইলে, ভক্তি-সূর্যের কিরণ বিকিরণে চিদাকাশ উদ্ভাসিত হয়। তখন পত্রান্তরে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ নিরন্তর ভগবৎ স্মৃতি সমুৎপন্নে, বিষয় বাসনা, অভাব আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি জাগতিক, অতি ঘৃণ্য লীলাভিনয় স্মৃতির অতীত পথে গমন করে এবং "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অনুভূত হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

'ওঁ নমঃ শিবায়'

(শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষরী-মন্ত্ররাজ-ভাষ্যানুবাদ)

স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সপ্তম ব্যাখ্যা

শ্লোক ১৭। ওঁ নমঃ শিবায়।

যস্মাত্ত্বং নেতিনেতীতি নঞর্থং মাসি বেদজম্।
তস্মান্নমোঽসি ভদ্রং মে যতো জাতোঽনমো নমঃ ॥ ১৭।

অন্বয়ঃ যস্মাৎ (যেহেতু) ত্বম্ (তুমি) নেতি-নেতি (ন ইতি, ন ইতি) ইতি (এই প্রকার) বেদজম্ (বেদোক্ত) নঞর্থং ('নঞ' অর্থাৎ 'নেতি' শব্দের 'ন' কারের অর্থ) মাসি (পরিমাপ করিয়া থাক) তস্মাৎ (সেই হেতু) নমঃ অসি (তুমি নমঃ হও), মে (আমার) ভদ্রং (কল্যাণ) (হউক), যতঃ (যেহেতু আমি) অনমঃ (অনম হইতে) নমঃ (নমঃ) জাতঃ (হইয়াছি) ॥ ১৭।

অনুবাদঃ হে প্রভো! যেহেতু তুমি 'নেতি নেতি'[১]—বেদের এই বাক্যস্থ 'ন' কারের অর্থ পরিমাপ করিয়া থাক, অতএব তুমি 'নমঃ'। আমার কল্যাণ হউক, কারণ আমি 'অনম' ভাব ত্যাগ করিয়া এখন 'নম' ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৭।

শ্লোক ১৮। ওঁ নমঃ শিবায়।

শিবং শিবমথাপ্রাপ্তঃ শিবায়েতি নিগদ্যসে।
শিবায় মে তথা প্রাপ্ত্যা শিবায়ং কুরু সর্বদা ॥ ১৮।

অন্বয়ঃ (হে প্রভু, তুমি) শিবম্ (সর্বোপদ্রব রহিত) শিবম্ (নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ) অথ (এবং) আপ্রাপ্তঃ (পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপে সদা বিদ্যমান বলিয়া) শিবায় (শিবায়) ইতি (এই নামে) নিগদ্যসে (কথিত হও)। শিবায় (হে শিবায়!) মে (আমাকেও) তথা (ঐ প্রকার) প্রাপ্ত্যা (প্রাপ্তি দ্বারা, প্রাপ্তি করাইয়া) সর্বদা (সর্বদা) শিবায়ং (পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ) কুরু (করিয়া লও) ॥ ১৮।

অনুবাদঃ সর্বপ্রপঞ্চরূপ উপদ্রব রহিত নিরতিশয় আনন্দৈক রস স্বরূপে তুমি 'আপ্রাপ্ত' অর্থাৎ সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 'শিবায়' এই নামে অভিহিত হইয়া থাক অর্থাৎ শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাক। হে শিবায়[২]! ঐরূপ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ 'শিবায়' ভাব প্রাপ্তি করাইয়া আমাকেও তুমি 'শিবায়' করিয়া লও ॥ ১৮।

১ দুটি 'ন'-কারের দ্বারা ব্রহ্ম, মূর্ত ও অমূর্ত অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট ও রূপহীন কোন বস্তুই নহেন, এরূপ বলা হইল। মাপপাত্রে যেমন বস্তু গ্রহণ ও নিঃসারণ দ্বারা সেই বস্তুর পরিমাণ মাপ করা হইয়া থাকে; মাপপাত্রটি কিন্তু নিষ্ক্রিয় নির্বিকারই থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম-বিবর্তরূপ এই জগৎ ব্রহ্মেই প্রতিভাসিত হইয়া পুনঃ তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম সর্বাবস্থায় নির্বিকারই থাকেন। এই নির্বিকার ব্রহ্মই যেন সর্বপ্রপঞ্চকে পরিমাপ করতঃ ব্যবহার-যোগ্য করিয়া থাকেন, সেই হেতু তাঁর নাম 'নমঃ', তিনিই সর্বাশ্রয়, সর্বাধিষ্ঠান। এই অপরিচ্ছিন্ন, স্ব-স্বরূপে স্থিতিই 'নমঃ'-ভাব। পরিচ্ছিন্ন অবস্থাই 'অনম'-ভাব। আমি এখন 'অনম' অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব ত্যাগ করতঃ 'নম' অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি।

২ 'শিবায়' শব্দের অর্থ—যিনি নিরতিশয় অখণ্ড আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিও ঐরূপ স্থিতিই কামনা করি।

প্রভু! আমাকেও তুমি কৃপা করিয়া ঐরূপ করিয়া লও।

অষ্টম ব্যাখ্যা

শ্লোক ১৯। ওঁ নমঃ শিবায়।

শিবাং যাতো মহাভদ্র নমোঽহং মায়য়া ধ্রুবম্।
ততো নমায় মহ্যং মঃ শিবায়ং কুরু সর্বথা ॥ ১৯।

অন্বয়ঃ মহাভদ্র (হে মহাভদ্র) মায়য়া (মায়া দ্বারা) ধ্রুবম্ (নিশ্চিতরূপে) নমঃ (বিদ্যাহীন) অহম্ (আমি) শিবাং (এখন ব্রহ্মবিদ্যা সমীপে) যাতঃ (আসিয়াছি, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী হইয়াছি)। ততঃ (অতএব) নমায় (বিদ্যাহীন) মহ্যম্ (আমার প্রতি) সর্বথা (সর্বপ্রকারে) মঃ (সর্ব দৃশ্য বস্তুসমূহ) শিবায়ং (আত্মস্বরূপে প্রকাশমান) কুরু (কর) ॥ ১৯।

অনুবাদঃ হে পরম কল্যাণরূপ! তুমি 'শিবা' প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার শরণ লইয়া স্ব-স্বরূপে স্থিত হইয়াছ, 'শিবায়' হইয়াছ। আমি কিন্তু মায়াবশে 'নমঃ' অর্থাৎ—ন মা—লক্ষ্মীরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন হইয়াই পড়িয়া আছি। ইহা নিশ্চিত যে আমি ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন। বিদ্যাবিহীন হইলেও আমি ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী। তুমি পূর্ণজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল (কৃপা করিয়া) 'নমায়' অর্থাৎ বিদ্যাহীন আমাকে 'শিবায়'[1] অর্থাৎ স্ব-স্বরূপজ্ঞান প্রদানে চরিতার্থ কর। সর্ব দৃশ্যবস্তুসমূহ (মঃ)[2] আত্মস্বরূপে প্রকাশমান কর (শিবায়ং কুরু)। ১৯।

নবম ব্যাখ্যা

শ্লোক ২০। ওঁ নমঃ শিবায়।

শিবমেষি যতো জ্ঞপ্ত্যা শিবায়স্তং প্রপঠ্যসে।
ন তে মায়া যতো জ্ঞপ্ত্যা নমো বেদৈঃ প্রপঠ্যতে ॥২০॥

শ্লোক ২১।

নমোঽহং চ শিবায়োঽহং নমো মহ্যং নমো নমঃ।
নমো নমায় শুদ্ধায় মঙ্গলায় নমো নমঃ ॥ ২১।

অন্বয়ঃ জ্ঞপ্ত্যা (জ্ঞান সহায়ে) শিবম্ (আনন্দস্বরূপকে) এষি (তুমি জান) ত্বম্ (অতএব তুমি) শিবায়ঃ (স্বরূপ দ্রষ্টা) প্রপঠ্যসে (এইরূপ কথিত হও)। তে (তোমার) মায়া (মায়া) যতঃ (যেহেতু) ন (নাই) যতঃ (সেই কারণবশতঃ) জ্ঞপ্ত্যা (অর্থাৎ জ্ঞপ্তিবশতঃ) বেদৈঃ (বেদসমূহ দ্বারা) নমঃ (নমঃ এই নামে তুমি) প্রপঠ্যতে (পঠিত হও) ॥ ২০।

অন্বয়ঃ অহং (আমি) নমঃ (নমঃ) অহং (আমি) শিবায়ঃ (শিবায়) মহ্যম্ নমঃ (আমাকে নমস্কার) নমো নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার) নমায় (নমকে) নমঃ (নমস্কার) শুদ্ধায় (শুদ্ধ) মঙ্গলায় (মঙ্গলের প্রতি) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ২১।

অনুবাদঃ স্ব-স্বরূপবোধ সহায়ে তুমি আনন্দ স্বরূপকে জানিয়াছ, এ জন্যই তুমি 'শিবায়'[3] অর্থাৎ স্বরূপ দ্রষ্টা নামে কথিত হও।

টিপ্পনীঃ

১ 'সকলমিদং অহং চ ব্রহ্মৈব'—দৃশ্যমান সর্বপ্রপঞ্চ এবং আমিও এক ব্রহ্মই। এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনলাভই জ্ঞানের পরম কাষ্ঠা বা অবধি। অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

'শিবায়ং কুরু সর্বথা'—এই প্রার্থনা দ্বারা সাধক ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্তির আবেদনই শ্রীভগবৎসমীপে করিতেছেন।

২ দিবাদিগণীয় 'মসী পরিণামে' ধাতুর 'কিপ্' প্রত্যয়যোগে 'মঃ' এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। 'মস্যতি' অর্থ যাহার পরিণাম হয়, যাহা বিকারভাব প্রাপ্ত হয়। সেই 'মঃ' অর্থাৎ দেহ গৃহাদি সর্ব পরিণামী জগৎ প্রপঞ্চ তোমার প্রকাশেই প্রকাশমান, ইহা জানাইয়া দাও।

৩ জ্ঞান অর্থ স্ব-স্বরূপের আবির্ভাব। সেই জ্ঞান সহায়ে যিনি 'শিব' অর্থাৎ আত্মতত্ত্বকে জানিয়াছেন তিনিই 'শিবায়' বা মায়াবিহীন স্বরূপ দ্রষ্টা। 'নমঃ' শব্দেরও অর্থ তাহাই।

ঐ স্বরূপ-সাক্ষাৎ-কারত্ববশতঃই তোমাতে মায়া নাই। এই কারণেই বেদসমূহ তোমাকে 'নমঃ,' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ২০ ।

অনুবাদ: (তোমার অনুগ্রহে) আমি 'নমঃ'[১] বা অবিদ্যারহিত হইয়াছি, 'শিবায়' হইয়াছি। অতএব আমাকে নমস্কার। অবিদ্যা-রহিত, শুদ্ধ, নির্বিকার, আনন্দদায়ক ভগবান শিব শম্ভুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২১ ।

শ্লোক ২২। ওঁ নমঃ শিবায়।
নমো ন মসনং শম্ভো নিরাকারায় তে নমঃ।
নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ো জগুঃ ॥ ২২ ।

অন্বয়ঃ শম্ভো (হে শম্ভো!) তে (তোমার) মসনম্ (কোন বিকার) ন (নাই) নমঃ (তোমাকে নমস্কার) শ্রুতয়ঃ (বেদসমূহ) (তোমাকে) নির্গুণং (নির্গুণ) নিষ্ক্রিয়ং (নিষ্ক্রিয়) শান্তম্ (শান্ত) ইত্যাত্মাঃ (ইত্যাদি) (বর্ণন করিয়া থাকেন) নিরাকারায় (এইরূপ নিরাকার) তে (তোমাকে) নমঃ (প্রণাম) ॥ ২২ ।

অনুবাদ: হে শম্ভো! তোমাতে কোন মসন অর্থাৎ বিকার নাই বলিয়া তুমি 'নমঃ'[২] নামে বর্ণিত হও। বেদসমূহ তোমাকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। এবম্বিধ নিরাকার তত্ত্বরূপী তোমাকে প্রণাম ॥ ২২ ।

শ্লোক ২৩। ওঁ নমঃ শিবায়।
নমো ব্রহ্ম নিরাকারং শিবায়ং শিব সর্বদা।
অতোঽহং চ নমা ভদ্র শিবায়োঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ।

অন্বয়ঃ শিব (হে শিব) (তুমি) নিরাকারং (নিরাকার) শিবায়ং (পরিপূর্ণ) সর্বদা (সর্বদা) ব্রহ্ম অসি (ব্রহ্ম হও)। অতঃ (অতএব) ভদ্র (হে ভদ্র) অহং চ (আমিও) নমা (পরিণামরহিত)। অহং (আমি) শিবায় (পরিপূর্ণ স্বরূপ)। সংশয়ঃ (এ বিষয়ে কোন

টিপ্পনী:

১ পূর্বোক্ত বিষয়েরই বর্তমান শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। প্রভু! তোমার কৃপায় অবিদ্যাপাশ মুক্ত হইয়া আমি সর্বত্র এক আত্মদর্শনই করিতেছি। তোমা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অতএব এরূপ দুর্লভ আত্মদর্শী আমাকে নমস্কার।

ইহা তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের অন্তরে অনুভূত আনন্দের কিঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশ বা আনন্দোদ্গার। 'যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যাঃ বেদান্ত গুরুরীশ্বরাঃ। আদৌ বিদ্যানিক্রয়ার্থং কৃতঘ্নত্বাপহৃত্তয়ে ॥'

—বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর আমৃত্যু বন্দনীয়। জ্ঞানলাভের পূর্বে ইহারা জ্ঞানলাভের সহায়ক বলিয়া পূজ্য। জ্ঞানলাভের পরও এই তিন বন্দনীয় কারণ তাহা না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে।

পরং-পরাপ্রাপ্ত এই রীতি অনুসারে জ্ঞানতৃপ্ত কৃতকৃত্য সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতেছেন—'হে নমঃ, অবিদ্যারহিত! হে শুদ্ধনির্বিকার! হে মঙ্গলস্বরূপ, আনন্দদায়ক! হে শিব শম্ভু! তোমার কৃপায় এখন আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি, তোমার শ্রীচরণে আমার বার বার (অসংখ্য) প্রণাম।

২ পূর্ব ব্যাখ্যাত নামসমূহ পুনরায় উল্লেখপূর্বক বর্তমান শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন। তোমার কোন বিকার বা আকার বিশেষ নাই, অতএব তুমি 'নমঃ'। হে নমঃ! নিরাকার তোমাকে প্রণাম।

সন্দেহ) ন (নাই)॥ ২৩।

অনুবাদ: হে শিব! তুমি 'নমঃ'[১] শব্দ বর্ণিত সদা নিরাকার, 'শিবায়' অর্থাৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপ, একরস। হে ভদ্র (কল্যাণস্বরূপ)! আমিও নির্বিকার পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ২৩।

টিপ্পনী:

১ পুনরায় এখানে পূর্বোক্ত বিষয়েরই বিশেষরূপে বিশদীকরণ হইতেছে: 'নমো ব্রহ্ম নিরাকারং...' ইত্যাদি বচন দ্বারা। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্ব-স্বরূপানন্দে বিভোর হইয়া স্বানুভূত আনন্দোল্লাস পুনঃ পুনঃ নানাভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না।

তাঁহাদের এই আনন্দোদ্গার শ্রবণে মুমুক্ষুগণের চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং তাঁহারা নিজেরাও ঐরূপ অবস্থা লাভের জন্য আকৃষ্ট ও সচেষ্ট হন।

শিব-স্তুতি

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ কবি।

বর্ষান্তের দিনশেষে আঁকিয়া রঙীন ছবি
পশ্চিম দিগন্তে যবে মিলায় মৌন রবি,
কালের বীণায় বাজে যেন শেষের রাগিনী
দিনশেষ বর্ষশেষ দুই শেষের কাহিনী।
বরষের বিদায় বেলায় তব পূজা দিন,
মহাকাল, অঙ্গে তব শেষে হয় সব লীন।
যদ্যপি তোমার রুদ্র কঠোর আহ্বানে
তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে ভীতি জাগে মনে,
তথাপি তুমি, হে শিব, সার্থক আপন নামে
শুচিশুভ্র সমাসীন ধ্যানের পরম ধামে।
তুষারেতে সদা শুভ্র কৈলাসে বিরাজ, ভব,
'পুঞ্জীভূত অট্টহাসি' কালিদাস মতে তব।
স্থির নহে কিছু বিশ্বে বিরাম জানে না গতি,
ছন্দহারা হত তুমি না করিলে সংহতি।
সবার শিবের তরে পান করিলে গরল,
জটিলতা যেথা যত তব কৃপাতে সরল।
উদাসীন মহাদেব, সুখ দুখ সম জ্ঞান
আদর্শ ত্যাগী হয়ে শিক্ষা দিতেছ মহান।
নতুবা, হে দেবদেব, হয়ে অন্নপূর্ণা-পতি
কেন কর ভিক্ষা তুমি, শ্মশানেতে রতি?
ভোলানাথ, শিখাইছ সদা সব কিছু ভোলা,
উপায় একটি মাত্র মিটাতে ভবের জ্বালা।
কামনা বাসনা মূলে করি কুঠার আঘাত
করে দাও তব সব নির্বিকার, উমানাথ।
মহামায়া নৃত্য করে তব বক্ষে পদ ধরি,
শক্তির সকল লীলা শিবে উপলক্ষ করি।
পুষ্পদন্ত নহি আমি, নারি স্তোত্র রচিবারে,
আশু তব তোষ জেনে সঁপি পদে আপনারে।

লহ ত্রিশরণ

'আনন্দ'

জরা-ব্যাধি-মৃত্যুভয়ে ভীত অনিবার,
ভয়-ত্রস্ত সদা চাহি যেতে তার পার।
বাসনার চক্রজালে নিত্যবদ্ধ আমি,
নিজবর্ত্মে ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে থামি,—
অসহায় মৃগপ্রায়, ব্যাধ-পাশে ধৃত।
কে শুনাল মৃতজনে বচন অমৃত,—
"আছে বুদ্ধ, আছে ধর্ম, আছে সঙ্ঘ ত্রয়,—
মৃত্যুভীত সবাকার চরম নির্ভয়"?
রাজ্যধন দেহসুখ বিবেকবিচারে,—
ছাড়ি যিনি উত্তরিলা মৃত্যুপারাবারে,—
সেই বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম, তাঁর সঙ্ঘ আর,
শরণ-বিহনে নাহি পথ অন্য আর।
ভোগরত, মৃত্যুভীত রে প্রমত্ত মন!
মুক্তি যদি পেতে চাও,—লহ ত্রিশরণ।

আবার বলো

শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য

উদীয়মান কবি।

আবার বলো
আমায় তুমি অন্ধকার থেকে
আলোয় নিয়ে যাবে!

এ আলো প্রদীপ্ত সূর্যের রশ্মিপাত নয়
এ আলো চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল রজত শুভ্রতা নয়
নয় শুধু তমসা-ভাঙা কলকাকলির উষাকাশ;
এ যে ফুলের চোখে ঘুম তাড়ানো
পুষ্পাঞ্জলির পূত আয়োজন।
হৃদয়-বৃন্তের গুহাবাসে
তলিয়ে তলিয়ে এক অতল পারাবার
আদি-অন্তহীন আনন্দের
অব্যক্ত অনুভূতির উপস্থিতি।

আবার বলো
আমায় তুমি অন্ধকার থেকে
আলোয় নিয়ে যাবে।

এই শ্যামলিত পৃথিবীর
সকল সবুজ চোখে মেখে
প্রতি পলকের প্রতি পদক্ষেপে
সুখ-দুঃখের স্বাদ নিয়ে
বিগলিত বেদনায় বহমান
জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গে ডুব দিয়ে
দুর্লভ রত্ন আহরণ;
তারপরে বলো
সেই অটুট বিস্ময়ের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে
আমাকে তুমি জ্যোতির্ময় জীবনের ব্যাপ্তি
দেখাবে?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

(পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান—১৯৮৪)

ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির বর্তমান সচিব।

গত ২৬ ও ২৭ জানুআরি, ১৯৮৪ উদ্বোধন কার্যালয়-আয়োজিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান চারটি অধিবেশনে মোট আটটি প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

২৬ জানুআরি বেলা তিনটায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী বৈদিক শান্তি পাঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং ভাষণ দেন। তিনি জীবন দিয়ে লেখা সাহিত্যের কথা বললেন—যে জীবন দেখে লোকে জীবন গড়তে শেখে। স্বামী সারদানন্দ নিজে প্রত্যক্ষ করে বিশ্লেষণ করে যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখে রেখে গেছেন তাই পড়ে কত ছেলে সাধু হল। ঠাকুর বলে গেলেন—'শিবজ্ঞানে জীব সেবা', আর স্বামীজীর কথা—'বনের বেদান্তকে ঘরে আনব', 'দরিদ্র দেবো ভব মূর্খ দেবো ভব'—তারই ফলে স্বামী অখণ্ডানন্দের ঘাস পাতা খেয়ে দুর্ভিক্ষে সেবা—এই সব জীবন আর এঁদের লেখাই তো সাহিত্য—যা থেকে জীবন গড়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া ভগবানের নামই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের চরম কথা, স্বামীজী লিখেছেন—'কৃত্যং করোতি কলুষং…', আর শ্রীশ্রীমা বলছেন—'দেখ বাবা, ঠাকুর বলেছেন, যে দিনান্তে দশবার এর (নিজ শরীর দেখিয়ে) নাম করবে সে মুক্ত হয়ে যাবে।' এই সব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বেশি করে অনুধ্যান হোক, ঠাকুরের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

এর পূর্বে উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডঃ তপনকান্তি ঘোষ ও স্বাগত ভাষণ দেন উদ্বোধনের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজী।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর একান্ত বোধের মধ্যে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এসেছিলেন তারই কিঞ্চিৎ আভাস দেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর তো নিকটেই আছেন, আমাকে একটু হাতটা তুলতে হবে।—একটু দিলে তাঁর কাছে অনেক মেলে। বছর কুড়ি আগে ঈশ্বর মানতাম না; এক বন্ধুর সাহচর্যে কিছু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়ি ও লেখা আরম্ভ করি, কিন্তু দীক্ষা নিতে সংকোচ হল—আর লোক ঠকাব না। এখন শোবার আগে প্রার্থনা করি—তোমার যা ইচ্ছা তাই হক। মা ও ঠাকুরকে অভিন্ন দেখি। আগে ভাবতাম ওঁরা আমাকে নিল না—এখন ভাবি আমার কি দেবার আছে? ঈশ্বর মানব না কেন? এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটা কি করে চলছে ভাবলে আর জড়বাদী হতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ যেন আমাদের ছেয়ে ফেলে—এই মারামারি হানাহানির যুগে আবার যেন আবির্ভাব হয়—রাম ও কৃষ্ণের যৌথ বিগ্রহের,—স্বামীজীর বাস্তব কর্মযোগের প্রভায় প্রজাত নেতাজীর মতো সন্তানের—মানুষ যাতে মানুষ হয়—আর আমার মতো অধমের ঠাঁই মেলে।

প্রথম অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধ "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের জাতীয়তাবোধ" পাঠ করেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। তিনি বলেন—১৮৯৩-৯৭ খ্রীঃ বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামীজী যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তা থেকেই এ দেশে ভারতবোধের সূচনা। জাতি-চেতনা আসে আত্মবিশ্বাস, আত্মশ্রদ্ধা থেকে। যা সুপ্ত ছিল, তাতে তিনি গতি দিলেন।—অগ্নিময় ভাষায় সংগ্রামের পথে এগুতে বললেন ব্যক্তিগত

ভাবে, সমষ্টিগত ভাবে। যুবশক্তিকে আহ্বান করে বললেন, বিস্তৃতিই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। আগে জাতীয়তাবোধ তার পর তো আন্তর্জাতীয়তা। আবার সমন্বয়বোধও জাগালেন, বললেন—মানুষ তৈরি করাই আমার ধর্ম। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, অতীত-ভবিষ্যতের সমন্বয়ে গৌরবময় ভারত গড়াই ছিল স্বামীজীর mission (ব্রত)। সমগ্র দেশের সংস্কৃতি, শিল্পকলার সঙ্গে অধ্যাত্ম বস্তুর মিলনই ছিল স্বামীজীর জাতীয়তা বোধ।

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় বলেন,—অখণ্ডতার চেতনা প্রাচীন যুগেও ছিল, রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ উনিশ শতাব্দীর দান, স্বামীজী তাতে গতি সঞ্চার করলেন, ব্রিটিশ শাসনের মোহ ভেঙে দিয়ে। তাঁর মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মুক্তির প্রথম শর্ত। ১৯০২-১৯ খ্রী: পর্যন্ত স্বামীজীই ভারতীয় বিপ্লবী-দের প্রেরণার উৎস ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি সব সময়ে তৈরি থাকতে বলতেন। সারা বিশ্বের মুক্তির কথাও ভেবেছিলেন।

অধ্যাপক জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বামীজী ভারতকে স্বমহিমায় স্থাপন করে দেখালেন ভারতেরও অনেক দেবার আছে। এই জাতীয়তাবোধকে তিনি আপামর জন-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন।

সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দজী বক্তাদের প্রশংসা করার পর বলেন—আজকের বিষয় জাতীয়তাবাদ (Nationalism) নয় জাতীয়তা-বোধ (National Consciousness)। এ বোধ একসময় শ্রীশঙ্করাচার্যও দিয়েছিলেন—তা না হলে মুসলমান যুগে দেশ ও জাতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। দেশাত্মবোধ জাগাতে স্বামীজী Magic Lantern নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে বলেছেন, আর বলেছেন ভগবানকে ভাল না বাসলে দেশকেও ভালবাসা যায় না, আবার জাতিকে বাঁচাতে হলে জাতীয়তা-বোধকে ধর্ম হিসাবে নিতে হবে।

প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পুরাণ ও মহাকাব্য" পাঠ করেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন—স্বামীজী পুরাণকে এক চিরন্তন দৃষ্টিতে দেখতেন। পৃথিবীর সব ধর্মই এক এক মহাপুরুষের জীবন ও বাণী অবলম্বনে, কিন্তু ভারতের ধর্ম বেদ অবলম্বনে—অপৌরুষেয় প্রকৃতিমুখী ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট, সৃষ্ট নয়—এতে সংকীর্ণতা নেই, ব্যক্তিপূজা নেই। প্রকৃতির সাধনা অব্যক্ত, কিন্তু মানুষ চায় পুরুষের সাধনা, ব্যক্ত সাধনা। তাই বেদের তত্ত্বগুলিকে কিছু ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করে আখ্যায়িকার সাহায্যে, রূপকের সাহায্যে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে পুরাণ—তাই পুরাণ পঞ্চম বেদ। পুরাণে ঘটনা অবলম্বনেই পুষ্পিত, পল্লবিত, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদর্শ, রামেরই অনুসরণ—রাবণের নয়। বেদ নিত্যসত্য, আর স্মৃতি-পুরাণের সত্য বিশেষ দেশকালের উপর নির্ভরশীল। বিরোধে বেদই প্রামাণ্য, স্মৃতি-পুরাণের তত্তটুকুই গ্রাহ্য যতটুকু বেদের সঙ্গে মেলে। কিন্তু পুরাণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হতে হবে, স্বামীজী বলতেন, কারণ অবনত বৌদ্ধ-ধর্মের নাস্তিকতার স্রোত থেকে পুরাণই আমাদের রক্ষা করেছে। মানুষ ব্যক্তিগত আদর্শ চায়—পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ মেলে, মেলে সাধু, রাজর্ষির জীবনের দৃষ্টান্ত। পুরাণে বহু প্রসঙ্গের মধ্যে আছে জাতিভেদ সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক গুণভেদ, দর্শন, ভক্তি, শক্তি, দেহের শক্তি থেকে উচ্চতর নীতির আদর্শ, বীরদের জীবন। রামের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি বা না-পারি, রামের আদর্শের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। মানুষকে উন্নীত করার জন্য পুরাণের প্রয়োজন চিরকালই থাকবে।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অধ্যাপক

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেন—স্বামীজী পুরাণের সবটুকু নেননি, আবার কোথাও সামগ্রিকভাবে গ্রহণের কথা বলেছেন—তাই খটকা থেকে যায়।

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী বলেন,—স্বামীজীর মন্তব্যগুলি বুঝতে হলে—কি পরিস্থিতিতে তা বলেছেন, তা বিচার করতে হবে। আর একটি কথা, পুরাণ জীবনধর্মী—একে mythology বলা যায় না; Greek mythology-র বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ নেই। পুরাণে গীতার মতো শাশ্বত তত্ত্বও আছে।

সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দজী বলেন,—স্বামীজী পুরাণকে গল্প বলে খাটো করেননি। পাশ্চাত্যে দ্বিতীয়বার যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা প্রায়শঃই পুরাণভিত্তিক। বেদ-উপনিষদের পরই শাস্ত্রে পুরাণের স্থান। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ভাগবতপুরাণকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়। পুরাণে জীবন গঠনের মালমসলাগুলির বহুল প্রচার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধ "স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ও ভারত সংস্কৃতি" পাঠ করেন ডঃ হরিপদ আচার্য। তিনি স্বামীজীর কথাতেই বলেন—ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা— যা ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির মাধ্যমে প্রবাহিত—তার চাবি সংস্কৃত ভাষার রত্নপেটিকা হতে বার করতে হবে। সংস্কৃতভাষাই সংস্কৃতির বাহক। অতীতের দিকে তাকাও। প্রাচীনের কোলেই নবীনের জন্ম। সংস্কৃতি হল এমন এক মানসিক উৎকর্ষ যা নিজ সংস্কার ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মানসিকতার মিলনে সৃষ্ট হয়। স্বামীজীর আবাল্য সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চার উপর যেমন, তেমন দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার আহরণের উপর ঝোঁক ছিল। তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, আত্মোন্নতির সঙ্গে দেশসেবার সমন্বয় দেখা যায়। স্বামীজী তাই বলেছেন—সাধারণ ভাষায় কৃষ্টির প্রসার কর আর সাধারণ লোককে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ দাও। বিদেশী শিষ্যদের বলতেন, ভারতকে জানতে হলে সংস্কৃত শিক্ষা কর। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনেও তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন।

পরিপূরক আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর বলেন—স্বামীজী বলতেন, সংস্কৃতের মধ্যেই ভারতের সংস্কৃতি, জাতীয় সম্পদ অনুস্যূত। একটু কঠিন হলেও সংস্কৃত চালাতে হবে। নিম্নজাতি যদি উঠতে চায় তার সংস্কৃত শেখা উচিত। সংস্কৃতকে কেন্দ্র করে জাতির ঐক্য দৃঢ়তর হবে। ভারত কি হতে চায়, তার সংস্কৃতি জীবন কিরূপ হবে—রামমোহনাদি তা দেখাতে পারেননি; তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার পোশাককেই সংস্কৃতি মনে করেছিলেন। স্বামীজীই প্রথম ভারত সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় আলোচক শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ বলেন—প্রবন্ধটি সার্থক গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ। স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য পাশ্চাত্যে সুস্থ মিলন ঘটাতে—ইউরোপের রাজনীতি না শিখে সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাচীন গরিমাকে উপলব্ধির চেষ্টা করতে। সংস্কৃতের মধ্যে—সামান্য জলশুদ্ধি মন্ত্রেই—ভারতের ঐক্য চেতনা আমাদের মধ্যে চিরকাল আছে। স্বামীজী সংস্কৃতকে সহজ করে নিয়ে ব্যবহারের কথা বলেছেন, তা হলে generation gap দূর হত—এত দুর্দশা হত না। মনুষ্যত্বহীন মানবতা বা রাজনৈতিকবোধের স্থলে—ধর্মের পথে—সংস্কৃতকে সর্বভারতের জাতীয় ভাষা করে অগ্রসর হওয়া আমাদের একমাত্র পথ।

সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দজী বলেন—সংস্কৃত মানে যার সংস্কার হয়েছে। বিপরীত কথা প্রাকৃত। দুধ প্রাকৃত, ঘৃত সংস্কৃত—দুধ পচে যায়, ঘি খারাপ হয় না। কথা বলার ভাষা



পুরাতন হলে ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে যায় যেমন চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা, কিন্তু গীতার ভাষা দুর্বোধ্য মনে হয় না। আমরা সংস্কৃত ছাড়ছি, আর ইউরোপ সংস্কৃত শিখছে। সংস্কৃত শিখলে দেশে যোগাযোগ সহজ হবে, সর্বভারতীয় ভাব স্পষ্ট হবে, ভারতীয় সংস্কৃতি দৃঢ় হবে। স্কুলে সংস্কৃত উঠে যাচ্ছে, বাড়িতে যেন ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত শেখাবার চেষ্টা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রসারে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী" পাঠ করেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। তিনি বলেন —ধর্মজগতে মেয়েদের প্রভাবের কথা শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর পূর্বে এক খ্রীষ্টধর্মে মেরীমাতায় দেখি। শ্রীশ্রীমা সকলের মা, বহুজন পূজিতা, শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা-সরস্বতী, বিবেকানন্দের জ্যান্তদুর্গা, নারীর নেতৃত্বের এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী সকলের কাছেই শ্রীশ্রীমার নির্দেশই শেষ কথা। শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ বহন করায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রকাশন সহজ হল—অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের প্রতিকৃতি রাখার সমস্যারও সমাধান হল—মাকে কেন্দ্র করে মঠে নিবিড়তম ঐক্য সাধিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীমার বাহ্য প্রকাশ নেই—তবু তাঁর মহিমার খবর চাপা থাকত না—দলে দলে ভক্ত ও দীক্ষার্থীরা আসত। ঠাকুর তো বাছাই করতেন—মা কদাচিৎ ফেরাতেন। শ্রীশ্রীমার উপস্থিতিই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রসারে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অধ্যাপিকা চামেলী বসু বলেন—তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে স্বামী অভেদানন্দ-কৃত মাতৃস্তোত্রে মার স্বরূপ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন—'তোমাকে ইষ্টপথে সহায়তা করতে এসেছি'। ভাবমুখে ষোড়শীপূজা গ্রহণ করে মা ঠাকুরকেই সেবা করলেন। আনন্দমেলা বসত দুদিকে—ঠাকুর ভক্তদের মনের রসদ যোগাতেন, আর মা নহবতে ভক্তদের শরীরের রসদ যোগাতেন। মা বলতেন—'ঠাকুরের মাতৃভাবের বিশেষ প্রকাশের জন্যই আমাকে তিনি রেখে গেছেন, কলকাতার লোকগুলোকে দেখতে হবে বলেছিলেন'—তাই দীক্ষাদির মাধ্যমে মা নিরবচ্ছিন্ন ভক্তসেবা করে গেছেন। ঠাকুরের মতো ভক্তদের সহনশীলতার ওপর জোর দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করে বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব বলতে বুঝি—ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, ব্যাকুলতা ও ত্যাগবৈরাগ্য ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবন হল উপায়। ঠাকুর জীবনে তা দেখালেন। এ পথে অন্তরায় ভেদদর্শন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সব মতে সাধন ও সমন্বয় প্রদর্শন ও লোকশিক্ষা। এ কাজে সহায়ক নিলেন স্বামীজীকে—বহির্জগতের জন্য, আর শ্রীশ্রীমাকে বসালেন অন্তর্জগতে। মা দেখালেন সংসারের সব অবস্থায় কি করে ঈশ্বরকে ধরে থাকা যায়, ঘরোয়াভাবে আপন করে নিয়ে তাঁর সেবা করা যায়। মার কথাতেও পাই সত্য, সংযম, ত্যাগ, ব্যাকুলতার উপদেশ। ঠাকুরের বহুভাবের মধ্যে মা মাতৃভাব অবলম্বন করেই সমন্বয় সাধন করেছেন—জাতিধর্ম, উচ্চনিচ, দেশ-বিদেশ, সৎ অসৎ, জীবজন্তু নির্বিশেষে সকলকে ভালবেসে। লজ্জাপটাবৃত থেকে সহজ সরল কথায় লোকশিক্ষা দিয়েছেন।

সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দজী সকলকে শ্রীশ্রীমায়ের কথা, মাতৃ-সান্নিধ্যে, শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা আবার পড়তে বলেন।

তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় পরদিন বেলা সাড়ে তিনটায় শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গীত দিয়ে

প্রথম প্রবন্ধ "সমাজজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব" পাঠ করেন অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন। তিনি বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মচেতনায় তৃপ্ত ছিলেন না, সমাজজীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিনিই সমাজে জাতিভেদ, নারী মর্যাদা, বিবাহিত জীবন প্রভৃতি বিষয়ে সংসারী মানুষের আদর্শ রেখে গেছেন। ঠাকুরের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। সমাজের সর্বস্তরের লোক তাঁর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, আজও হচ্ছে। বুদ্ধ, যিশুর তুলনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব খুব শীঘ্র সমাজে প্রবেশ করেছে।

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন—মানবিক দিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তৎকালীন সমাজকে তার অস্থিরতা, বিভেদ প্রভৃতি সমস্যায় দিঙ্‌নির্ণয় করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন জীবনভিত্তিক। প্রবন্ধাদি না লিখেও তিনি সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করে মননশীল মানুষকে সজীব করেছিলেন। ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। মানব জীবনের প্রয়োজনে সমাজ জীবন ও সামাজিক আদর্শের বিবর্তন ঘটে—তার মধ্যে শাশ্বত সুরটি কি—তা ঠাকুরের জীবন ও বাণীর মধ্যে পাই।

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেন—ধ্যান-ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। প্রভাবের পরিমাপের আরও দৃষ্টিকোণ আছে—যেমন থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। নবরূপে সমাজকে রূপায়িত করাও প্রভাবের আর একটি মাপকাঠি—ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' তাই করেছে। সমাজে সাম্য স্বাধীনতা সৌভ্রাতৃত্বের যুগে স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদকে সমাজমুখী করলেন—এও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব।

সভাপতির ভাষণে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী বলেন—ঠাকুরের কথায় যত মত তত পথ বটে, কিন্তু লক্ষ্য এক। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ত্যে এলেন দর্শনের মূল সিদ্ধান্তকে জীবনে প্রতিভাত করতে, ব্যক্তিজীবনকে রূপায়িত করতে। সাধারণ মানুষ যেভাবে সাধনা করবে তাই করলেন। মানব সমাজকে মেনে নিয়ে পূর্ব পূর্ব সাধনাকে জীবনে প্রতিফলিত করলেন—ভগবান্‌লাভরূপ চরম আদর্শে উপনীত হতে। উপলব্ধির দ্বারা মানুষ তৈরি হবে—আর মানুষ নিয়েই তো সমাজ। নিজে উপলব্ধি করে সমাজ জীবনে ছড়িয়ে দিলেন। আদর্শ রূপায়িত হলেই প্রভাব সজীব সচেতন বলে বোঝা যায়। নতুন সমাজ গড়ে উঠবে সেই ভাবে রূপায়িত হয়ে।

তৃতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "ভগিনী নিবেদিতা ও ভারত সংস্কৃতি" পাঠ করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন—নিবেদিতা তাঁর নির্বাচিত মাতৃভূমি ভারতকে—ভারতীয় মনটিকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। এতে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কারণ সন্ধান-অনুসন্ধানের কঠিন বৈজ্ঞানিক পথেই ভারত-মনকে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার নিদর্শন তাঁর Web of Indian Life গ্রন্থটি। নিবেদিতার একই সঙ্গে স্থূল ও সূক্ষ্মকে দেখবার, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় করবার শক্তি ছিল, তারই সহায়ে তিনি বস্তুসমূহের মর্মে পৌছাতে পেরেছিলেন। নিবেদিতার মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল। ভারতকে জানবার জন্য তিনি গ্রন্থের মধ্যে বিচরণ করেননি—প্রবহমান জীবনের মধ্যেই খুঁজেছেন প্রকৃত ভারতকে। তাঁর মতে শুধু রাজাদের কথাতেই ইতিহাস হয় না—জনসমাজেই তা পাওয়া যায়। কোন পূর্বপোষিত ধারণা না নিয়েই তথ্য সংগ্রহ করে মর্ম নির্ণয় করাই ছিল তাঁর ইতিহাস রচনার পদ্ধতি। স্বামীজীর দেওয়া এই পদ্ধতিতে তিনি ভারতের

গরিমা মহিমা আবিষ্কার করে যেমন দেখিয়েছেন তেমনি প্রাচীন জীবনধারাকে আধুনিকীকরণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর পদ্ধতি ছিল—অভারতীয় থেকে ভারতীয়কে চিহ্নিত করে স্থানের প্রভাবে ধীরে ধীরে কতটা জীবনের ঐক্য সাধিত হয়েছে তা নির্ণয় করা।

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য বলেন—নিবেদিতা ভারতের ধর্ম, দর্শন ও জীবন-যাত্রার মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন—ভারতকে ভালবেসেছিলেন। রাজনীতিক বা সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে ভারতের জাগরণে মানবসেবায় তাঁর অমূল্য জীবন নিবেদন করেছিলেন।

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ তারকনাথ ঘোষ বলেন—সংস্কৃতির অর্থ যার সংস্কার করা হয়েছে। ভারতসত্তার যুগে যুগে যে সংস্কার হয়েছে নিবেদিতা তা উপলব্ধি করে Footfalls of Indian Life গ্রন্থে লিখেছেন।

সভাপতির ভাষণে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী বলেন—শিল্প, কলা, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য নিয়েই সংস্কৃতি। স্বামীজীর শিল্পচেতনা ভগিনীর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। ঐক্যের কথা বলা হয়েছে; ঐক্য কি? তা আত্মোন্নতি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে কিছু হতে পারে না। শুধু economic betterment দিয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। স্বামীজী শ্রীরাম-কৃষ্ণের কাছে জেনেছিলেন, আত্মশক্তির সন্ধান না জানলে কিছু হবে না। ভালবাসা বড় কঠিন পথ। বিচার পথ ভিন্ন হলেও কেন্দ্র আত্মবস্ত। নিবেদিতা ভালবেসে ভারতের আত্মকথা জেনে নিয়েছেন গুরুর কাছে। দেশের স্বাধীনতার মধ্যে আত্মস্বাধীনতা, ভারত সংস্কৃতির মধ্যে আত্মারই অনুসন্ধান- ছিল নিবেদিতার সাধনা।

চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষের গান দিয়ে। প্রথম প্রবন্ধের বিষয় "স্বামী বিবেকা-নন্দের বাক্‌শিল্প"—পাঠ করেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন স্বামীজী কিরূপে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ বাক্ ব্যবহারে বাক্‌কে প্রাণবন্ত ভাষায় পরিণত করতেন। বাংলা চিঠিতে স্বামীজী পাশ্চাত্য মেয়েদের যখন প্রশংসা করছেন—নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেই যেন বাংলাভাষা নিয়ে পরীক্ষা করছেন। ইংরেজী চিঠিতেও তাই। ভালবাসা ও চরিত্রই বাক্‌কে পথ দেখিয়ে দেয়। গুরুভাইদের স্বামীজী লিখছেন—ভাল চাওতো সব ফেলে দিয়ে জ্যান্ত ঠাকুরের পূজা কর। অন্যেরাও হয়তো সুষ্ঠুভাবে বাক্যের ব্যবহার করেছেন—কিন্তু স্বামীজীর কথাই লোকে মনে রেখেছে—কারণ স্বামীজীর কথার মধ্যে তাঁর শক্তি সঞ্চারিত হত—লোককে প্রেরণা দিত। স্বামীজীর হরিদ্বারের বর্ণনা মনকে বহু উচ্চে নিয়ে যায়। স্বামীজীর কবিতা কয়টিও গভীর ভাবব্যঞ্জক, আবার না-লেখা কবিতাগুলি প্রাণের সঞ্চার করে বাংলা গদ্যের মোড় ফিরিয়েছে। স্বামীজীর যৌগিক ভাষা যেন ধ্যান থেকে উঠে এসে লেখা—তাই ভাববার কথা সংক্ষিপ্ত হলেও মূল কথা প্রকাশ করেছে। আবার দুটি বিরাট বিষয়কে একটি কথা—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—দিয়ে মিলিয়েছেন। বিশ্বকে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত করে স্বামীজী বাংলায় এক নতুন বাক্‌শিল্প উপহার দিয়েছেন।

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার বলেন—এ যুগের বেশির ভাগ সাহিত্যই ফাঁপা—স্বামীজীর সাহিত্যে মহত্ত্বের প্রকাশ। সহজ সরল নিগূঢ় সাহিত্যকে কৃষ্টিমূলক ইতিবাচক করতে স্বামীজীর কাছেই প্রেরণা নিতে হবে—তাঁর ভাব ও ভাষায় যেন হরগৌরীর মিলন।

দ্বিতীয় আলোচক ডঃ রামবহাল তেওয়ারী বলেন—প্রণববাবু শুরু থেকে স্বামীজীর বাক্‌শিল্পের

উন্মেষ দেখিয়েছেন। পড়ার ভঙ্গিতেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কবি বা ছান্দসিক ছিলেন না; তাঁর অধ্যাত্ম চেতনাই সহজ সরল বা গম্ভীর শব্দে ভাষাকে মূর্ত করে তুলত। বঙ্কিমের মতে মঙ্গল এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারলে লেখ। আর স্বামীজীর মতে স্বাভাবিক ভাষায় ভাব আত্মপ্রকাশ করুক, ভাষার উন্নতি হক। স্বামীজী ছিলেন বাক্‌চিন্তক।

সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দজী বলেন—কথা, লেখা, সঙ্গীত বাক্‌শিল্পের তিনটি মাধ্যমেই স্বামীজীর ভাব প্রকাশিত হয়েছে। আবার তাত্ত্বিক দিক দিয়ে চার রকমে ভাব প্রকাশ পায়—পরা পশ্যন্তী বাক্ বৈখরী। ভাব প্রথমে অন্তরে, ক্রমশঃ মনে, কণ্ঠে, উচ্চারণে প্রকাশ পায়। বাক্ ঈশ্বরেরই প্রকাশ—যেমন বৈদিক মন্ত্রে, কথামৃতে, আবার খ্রীষ্টীয় সুসমাচারে।

চতুর্থ অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তা" পাঠ করেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। তিনি বলেন—বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ব্যাপক—সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া চলেছে—কোপারনিকাস থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত আধুনিকত্বের সীমারেখা টানা বড় কঠিন। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যও সরে যাচ্ছে। গত এক দশকে এক একটি শাখায়—যেমন কোষ-বিভাজন—এত দ্রুত প্রসার হচ্ছে যা একজনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবু বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারা অব্যাহত আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করে সহজবোধ্য করেছেন। তাঁর সমাজ-চিন্তায় বিজ্ঞানের বাক্য প্রয়োগ দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক মেজাজেই তিনি চিন্তা করেছেন। লৌকিক অর্থে বৈজ্ঞানিক না হলেও স্বামীজীর বিজ্ঞানের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল—বিদেশে ও স্বদেশে বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপও ছিল। বিদেশে কারিগরি বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করা তাঁর ঝোঁক ছিল। কিন্তু এ সবের উৎস—শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি শিখিয়েছেন কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে, শেষের ব্যক্তিই বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানেরও শেষ কথা উপলব্ধি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে স্বামীজী বৃহৎ শিল্প প্রবর্তনেও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ও রামকৃষ্ণ মিশনে গণমুখী বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যার প্রসার ও হাসপাতালের উদ্যোগ নিতে বলেছেন। তাত্ত্বিক বিজ্ঞান যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে—তার লক্ষ্যও এক্ক ধারায় পৌছানো যার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি প্রহেলিকা বুঝা যাবে—এখানে এসেই যেন বিজ্ঞান ও ধর্মে মিলন সূত্র পাওয়া যায়। স্বামীজীর মতে অধ্যাত্ম চেতনা ও বিজ্ঞান চেতনা মেলাতে হবে।

পরিপূরক আলোচনায় ডঃ ধ্রুব মার্জিত বলেন,—বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন চলেছে, তাতে এর কর্ণধারগণের মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভারসাম্য যদি বজায় না থাকে তবে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এই দুই ভাবের মিলন ঘটাতে হবে, দর্শনকে বিজ্ঞানমুখী আর বিজ্ঞানকে জনকল্যাণমুখী করে।

সর্বশেষ আলোচক ডঃ জলধিকুমার সরকার বলেন—স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই তাঁর লেখায় অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে অনেকগুলিই প্রমাণিত সত্য,—এবং বেশ কতকগুলি ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি-প্রসূত যা পরবর্তী কালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ জড়বিজ্ঞানের একতত্ত্ব আর অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অদ্বৈতবাদকে মেলাতে চেয়েছিলেন।

সময়ের অল্পতা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুটিকে অত্যন্ত আলোকপ্রদ ভাবে উপস্থাপিত করায় সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দজী ক্ষেত্রপ্রসাদবাবুর প্রশংসা করেন ও অন্যান্য যাঁরা এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দেবালয়ে দেবালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ— দেবব্রত বসু রায়। প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা ৮+১২৩, মূল্য: ১২.০০ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং আরও কত হবে। তাঁর অলৌকিক জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা চলছে। অজস্র প্রবন্ধ এবং কবিতারও অন্ত নেই। এরই মধ্যে দেবব্রত বসু রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের একটি নতুন দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহু দেবালয়—মন্দির, গির্জা, মসজিদ পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর পদধূলিতে ঐসব দেবালয় আজ তীর্থে পরিণত। ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিভিন্ন দেবস্থান-উপাসনাক্ষেত্রগুলি তাই অত্যন্ত মহিমান্বিত—শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপক। কোন্ কোন্ মন্দির, গির্জা, মসজিদ তাঁর স্মৃতি-পূত, তা সাধারণের পক্ষে বইপত্র ঘেঁটে খুঁজে সন্ধান পাওয়া এবং সেই সব স্থান দর্শন করা খুবই আয়াসসাধ্য। ফলে একটা দারুণ অভাববোধ ছিল সাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে। সেই অভাব বহুলাংশে দূর করেছেন শ্রীযুক্ত বসু রায় তাঁর 'দেবালয়ে দেবালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি আমাদের উপহার দিয়ে। বহু পরিশ্রম করে নিজে সেই সব স্থানে গিয়ে, অনুসন্ধান করে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তথ্যগুলিকে একত্রিত করে তিনি আমাদের সামনে একটি স্তবক সাজিয়ে তুলে ধরেছেন। সেই দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত পরিমণ্ডলের কাছে তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

যে-সব মন্দির, গির্জা ও মসজিদে শ্রীশ্রীঠাকুর গিয়েছিলেন, তাদের স্থাপনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেবালয়-বিবরণীতে সংযোজিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের কৌতূহল বৃদ্ধি পাবে ঐ সব স্থান সম্বন্ধে আরও জানবার এবং ভক্ত-অনুরাগীদের অনুপ্রাণিত করবে নবীন তীর্থদর্শনে।

মন্দির, গির্জা ও মসজিদের বেশকিছু আলোক-চিত্র থাকাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ভগবদ্‌ভক্তগণ তাঁর লীলাক্ষেত্র পরিক্রমায় কতই না শ্রম স্বীকার করেন। এই পরিক্রমায় কষ্ট আছে ঠিকই, কিন্তু যে পরিমাণ শান্তি মেলে তা অপরিমেয়। আবার অনেক ভক্ত বিশ্বাস করেন, নর্মদা বা গঙ্গা কিংবা ক্ষেত্র পরিক্রমায় ইহজন্মেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। তাই যুগ যুগ ধরে সাধুসন্ত ও ভক্তগণ অশেষ দুঃখ বরণ করেও তীর্থপরিক্রমায় ব্রতী হয়ে থাকেন। আজও এমন পরিক্রমা-দৃশ্য বিরল হয়ে যায়নি।

যুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র পরিক্রমার জন্যও ভক্তগণ তাই সতত ইচ্ছুক। আলোচ্য এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় পরিক্রমা-অভিলাষী ভক্তদের পক্ষে খুবই সহায়তা হবে,—একখানি তীর্থ-নির্দেশিকা তাঁরা হাতে পাবেন।

শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই গ্রন্থের উপযোগী সুন্দর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি এই গ্রন্থের পরিচয় হিসাবে মূল্যবান।

গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। বাঁধানো ও ছাপা ঝকঝকে। প্রচ্ছদ মনোরম। বহুল প্রচার কামনা করি।

—স্বামী চৈতন্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার

Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Convention 1980: Report. Published by Swami Lokeswarananda, Secretary Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Convention 1980; Belur Math, Howrah, West Bengal; Page: 373+8 +86, pages of photographs+2 Maps & a plan. Price: Rs. 100·00

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর হতে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের

যে দ্বিতীয় সম্মেলন (convention) হয়েছিল, রিপোর্টটি তারই একটি সম্পূর্ণ বিবরণী। রিপোর্টটি এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, যে-সব প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা তো এর মাধ্যমে সম্মেলনের কথা স্মরণ করে আনন্দ পাবেনই, তাছাড়া যাঁরা এতে যোগ দিতে পারেননি, তাঁদের মনেও সম্মেলন সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠবে।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে আছে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দের বাণী যাতে তিনি বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে এসেছিল একটি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত। এই শক্তিধারাকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে একদল ত্যাগী শিষ্য গড়ে তুলেছিলেন, যাদের কাজ হল শাশ্বত ভারতের মর্মবাণীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই বাণীর যুগোপযোগী অর্থ করা, যাতে এটি বর্তমান যুগের দিশেহারা মানুষের একটি আশ্রয় হয়। বাণীতে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন দেহত্যাগ করেন তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র ছিল মাত্র আটটি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন সারা পৃথিবীতে সেই সংখ্যা দাঁড়াল ৬৪, তখন সন্ন্যাসী, ভক্ত ও অনুরাগীদের নিয়ে 'প্রথম সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপরে প্রায় ৫৪ বৎসর পরে, যখন মঠ-মিশনের কেন্দ্র বা আশ্রমের সংখ্যা ১৩৮, তখন অর্থাৎ ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে হচ্ছে এই 'দ্বিতীয় সম্মেলন'। উদ্দেশ্য—দেশ ও বিদেশে অবস্থিত শাখা কেন্দ্রগুলির সমস্যা ও তার সমাধানের আলোচনা এবং ভক্ত ও অনুরাগীদের মধ্যে একত্বভাব আনা।

সম্মেলনের পটভূমিকা বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়েও যে-সব স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান মঠ ও মিশনের অনুগামী হয়ে ঐ একই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে কাজ করে চলেছে, তারাও এতে আমন্ত্রিত হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে দশ হাজারের উপর এবং বিদেশ থেকে ২৬৩ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। উক্ত স্বতন্ত্র আশ্রমের সংখ্যা ছিল ১১২।

এর পরেই আছে উদ্বোধনী ও বিদায়কালীন অধিবেশন সমেত দশটি অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ এবং অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণগুলি। পঞ্চম ও সপ্তম অধিবেশন কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এবং অন্যগুলি বেলুড় মঠে নবনির্মিত বিরাট মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৩ ডিসেম্বর সকাল নটায় সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। কার্যকরী সমিতির সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও সহকারী সভাপতি স্বামী বন্দনানন্দের স্বাগত ভাষণের পর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, ধর্মকে অবহেলা করে জড়বাদের উপর জোর দেওয়াতেই শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের অবনতি ঘটেছে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা বিশ্বের জন্য। এবং তিনি আবেদন জানান, ভারত যেন তার শতশত বৎসরের সঞ্চিত নিজ-ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কার্যকরী সমিতির সেক্রেটারী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সকলকে যথোচিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঐদিন বেলা তিনটায় দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'রামকৃষ্ণ আন্দোলন' এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। স্বামী বুধানন্দের মূল বক্তৃতার পর আটজন প্রতিনিধি ঐ বিষয়ে ভাষণ দিলে সভাপতি রামকৃষ্ণ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। স্বামী নিরাময়ানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৪ ডিসেম্বর সকাল নটায় অনুষ্ঠিত তৃতীয়

অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভূতেশানন্দ। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের মূল ভাষণের পর ছয় জন প্রতিনিধি এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি সঙ্ঘের আদর্শ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'-এর বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বিজ্ঞানন্দ। ঐদিন বেলা তিনটায় স্বামী তপস্যানন্দের সভাপতিত্বে চতুর্থ অধিবেশনের বিষয়-বস্তু ছিল 'ব্যবহারিক বেদান্ত'। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মূল বক্তব্য রাখলে নজন প্রতিনিধি ভাষণ দেন। স্বামী ব্যোমানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২৫ ডিসেম্বর পঞ্চম অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী' এবং সভাপতি ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের মূল বক্তব্য রাখার পর নজন ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী গণানন্দ। ২৬ ডিসেম্বর স্বামী গহনানন্দের সভাপতিত্বে বেলা নটায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী'। স্বামী মুক্তানন্দ মূল বক্তব্য রাখলে,সাতজন প্রতিনিধি ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী গোকুলানন্দ। ঐদিন বেলা তিনটায় সপ্তম অধিবেশন হয় কলকাতায় নেতাজী স্টেডিয়ামে। বিষয়বস্তু 'বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভাববিনিময়' এবং সভাপতি—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদি, শিখ ও পার্শি ধর্মের প্রত্যেকটির উপর ঐ ধর্মের এক একজন প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণের পর স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২৭ ডিসেম্বর সকালের অধিবেশনে বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের বাইরে আমাদের কাজ' এবং সভাপতি ছিলেন স্বামী স্বাহানন্দ। নজন প্রতিনিধি যাঁরা বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশন বা বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী কীর্তিদানন্দ। ঐদিন বিকালে নবম অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'রামকৃষ্ণ সংস্থাগুলি যে-সব সমস্যার সম্মুখীন' এবং তাতে সভাপতি ছিলেন স্বামী বন্দনানন্দ। স্বামী আত্মস্থানন্দ মূল বক্তব্য রাখলে আটজন প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী গৌতমানন্দ। ২৯ ডিসেম্বর বেলা নটায় অনুষ্ঠিত দশম অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'ভক্ত ও বন্ধুগণের কর্তব্য'। মূল বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রভানন্দ এবং বিষয়টির উপর বারজন ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের ভাষণের পর স্বামী শক্রানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঐদিন বেলা তিনটায় বিদায়কালীন অধিবেশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সকলকে দেশের জনসাধারণের বিশেষতঃ গ্রামীণ দরিদ্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। সভায় আরও পাঁচজন বক্তৃতা করেন। স্বামী আত্মস্থানন্দ বিশেষ ভাষণ দেন ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রিপোর্টে এর পরে আছে প্রদর্শনীর বিবরণ, বিভিন্ন কমিটির সদস্যের তালিকা ও স্বকীয় আশ্রমগুলির বিবরণী। এতে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ছাড়া আছে ১৭৩টি প্রশংসনীয় ফটোগ্রাফ, যাতে ভারতের বাইরের রামকৃষ্ণ সংস্থাগুলি ও তাদের কার্যাবলী প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে, এই রিপোর্টটির মাধ্যমে পাঠকের মনে সংস্থাগুলির সঙ্গে সান্নিধ্যবোধ জাগায়। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও এর সামগ্রিক রূপ আকর্ষণীয়। সত্য কথা বলতে কি, প্রয়োজনের খাতিরে এটির নাম 'রিপোর্ট' দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যথার্থ বিচারে একে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান 'পুস্তক' বলা যায়, যেটি প্রতি রামকৃষ্ণ-অনুরাগীর ঘরে রাখবার যোগ্য। এতে বিশিষ্ট সাধু ও স্বনামধন্য প্রতিনিধিদের প্রদত্ত ভাষণগুলি পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হওয়ায় এটি একটি জ্ঞানের আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়, সম্মেলনে যোগ-দানকারী অনেকের ধারণা ছিল না যে, 'রিপোর্ট' ঠিক এভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার

ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'

Atish Dipankar Millennium Birth Commemoration Volume. Published by: Atish Dipankar Millennium Birth Celebration Committee, 1, Buddhist Temple Street, Calcutta-700012. P. 74+23. Price: Not mentioned.

অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের সহস্রবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক-গ্রন্থটি একজন মহামানবের স্মৃতিকে পুনরুদ্বোধিত করে জনগণের এবং সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

ভারতে উদ্ভূত যাবতীয় ধর্ম, মতবাদ, দর্শন-এর সার-নির্যাস সর্বাঙ্গীণ মানুষ হওয়া এবং সেই ভাবে অপরকে গড়ে তোলা। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক আচরিত এবং প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল লক্ষ্য—'আত্মদীপো ভব' অর্থাৎ ত্রিতাপতাপিত নিখিল মানবের পার্থিব বাসনা কামনা-রাহিত্যের দ্বারা ক্লিষ্ট চৈতন্যের বিশুদ্ধি সম্পাদন এবং সর্বজীবে প্রেম, মৈত্রী ও করুণার প্রস্ফুটনে পরিশেষে নির্বাণ অর্থাৎ বেদান্তোক্ত 'ব্রহ্মলীন'-অবস্থার প্রাপ্ত।

বহু উত্থান-পতন এবং ভাগ্য-বিপর্যয়ে অবসন্ন বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ দীপশিখাটি পরবর্তী ভারতবর্ষে যে কয়জন মুষ্টিমেয় মনীষীর অক্লান্ত অধ্যবসায়, ত্যাগ ও ঐকান্তিকতার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁদের সর্বাগ্রণী বাঙালী মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর। প্রেম করুণায় আলোড়িত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী এই জ্ঞানাচার্য আজ থেকে এক হাজার বছর আগে ধন্য করেছিলেন বাংলার মাটিকে। ভগবান তথাগতের সার্থকতম উত্তরসূরীরূপে তিনি তাঁর বিশ্বমানবতা ও শান্তির জ্যোতির্ময় বর্তিকা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সুদূর তিব্বতে, রচনা করে গেছেন এক অপূর্ব মহামিলনের একতান, যা আজও ভারতের মহিমাকে বহির্বিশ্বে দীপ্ত করে রেখেছে। তাঁরই পুণ্যজন্ম সহস্রবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত আলোচ্য স্মারক-গ্রন্থটি আজকের মহিমাচ্যুত বাঙালী জাতির পক্ষে অসামান্য দিগ্-দর্শনের কাজ করবে—সন্দেহ নেই। এই স্মারক-গ্রন্থটিতে প্রদত্ত দুটি স্তোত্র এবং অতীশের নিজস্ব রচনা 'বোধিপথ-প্রদীপ' অতি মূল্যবান সংযোজন। ৮০টি শ্লোকে রচিত প্রশস্তিটি অতীশের জীবনেতিহাসের আদিমতম উপাদান। দ্বিতীয় স্তোত্রটি নামা চিম্পা এবং অলকা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত।

ভোটভাষায় রচিত ছন্দোনিবদ্ধ 'বোধিপথ-প্রদীপ' শ্রীমৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংস্কৃতে একই স্তোত্রাকারে অনূদিত। শ্রেষ্ঠ শিষ্য বোধিপ্রভের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই পুস্তিকা রচনা করেছেন।

'পুণ্যং চ বোধিচিত্তস্য যদি রূপান্বিতং ভবেৎ।
আকাশং পূরয়িত্বাপি ন হি নিঃশেষতাং ব্রজেৎ ॥'

বোধিচিত্তের পুণ্যরাজিকে যদি রূপায়িত করতে হয় তাহলে সমগ্র অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেও সে রূপের শেষ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এই ভূমিকা করে বৌদ্ধ এই মহাচার্য তথাগতের সাধনা ও বোধিচিত্ত লাভের সাধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত এই পুস্তিকায় সংস্কৃত ও ইংরেজী অনুবাদে এই মূল রচনাটির অনুপ্রবেশ ভোটভাষায় অনভিজ্ঞগণের করায়ত্ত হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নীহাররঞ্জন রায় এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দীপঙ্কর সম্বন্ধে রচনাটিও সংযোজিত হওয়ায় ভাষাচার্য ও ঐতিহাসিকগণের তথ্যগুলি অনুধাবন করার সুযোগ সাধারণের গোচর হল। সুরেশচন্দ্র নন্দী, শশাঙ্কমোহন বড়ুয়া এবং ইংরেজী ভাষায় শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর দীপঙ্কর ও বিবেকানন্দের তুলনামূলক আলোচনা ও কুশক বকুলের 'পারমাণবিক যুগে দীপঙ্করের বাণীর উপযোগিতা' সম্বন্ধে রচনারাজি সংকলিত হয়েছে। বৌদ্ধ মহাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দুটি ছবি, বঙ্গীয় বৌদ্ধ-সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কৃপাশরণ মহাস্থবিরের ছবি এবং মনোরম প্রচ্ছদ শোভা দ্বারা পত্রিকাটির আকর্ষণ বর্ধিত হয়েছে। ডক্টর অলকা চট্টোপাধ্যায় এবং অতীশ দীপঙ্কর-সহস্রবৎসর-পূর্তি জন্মোৎসব অনুষ্ঠান-সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক ধর্মপাল মহাথের মহামূল্যবান এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করে দলমতনির্বিশেষে বঙ্গদেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদার্হ হলেন—এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

—ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য
বাঙলা বিভাগ, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য মন্দাপম্ শিবির থেকে প্রাথমিক ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া রোজ সকালে প্রায় ১১০ জন স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী ও শরণার্থীদের শিবিরে পৌঁছানোর দিন থেকে জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন: রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম জুনাগড় জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে আর্থিক সাহায্য হিসাবে সবশুদ্ধ ৪৫৩টি স্বাস্থ্যবতী গরু দান করেছেন।

গৃহনির্মাণকার্যের জন্য প্রস্তুতি চলছে।

বেলুড় মঠে উৎসব

গত ৪ মার্চ ১৯৮৪, এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৯তম আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ২০,০০০ নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে মঠ-প্রাঙ্গণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১১ মার্চ, ১৯৮৪। ঐদিনে সমাগত ২৫,০০০ নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। দিনের শেষভাগে জনসমাগমের আধিক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উৎসব

মোরাবাদি (রাঁচি) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৯ থেকে ২৩ মার্চ ১৯৮৪, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৯তম আবির্ভাবতিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় সিতুমৃদি, দিবাদি, বারেন্দ, বুন্দু, বেরো ও চুণ্ড অঞ্চলে। এই সব আদিবাসী অঞ্চলের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিখিলাত্মানন্দ, স্বামী অধ্যাত্মানন্দ, স্বামী মুক্তিকামানন্দ, স্বামী মেধানন্দ ও শ্রী ডি. এইচ. নায়ক।

প্রধানমন্ত্রীর ইটানগর কেন্দ্র পরিদর্শন

গত ৪ ফেব্রুআরি ১৯৮৪, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অরুণাচলপ্রদেশের ইটানগরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর শ্রী টি. ভি. রাজেশ্বর এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগেগোং আপাং।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ১০ এপ্রিল ১৯৮৪, রামনবমী তিথিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবতিথি যথাযথভাবে পালিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

আবির্ভাবতিথি ও পূজাদির সূচী

বাংলা ১৩৯১ সাল, ইংরেজী ১৯৮৪-৮৫ খ্রী

তিথি-কৃত্য

১।	শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২৩ বৈশাখ	রবিবার	৬ মে	১৯৮৪
২।	শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	১ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	১৫ মে	
৩।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১০ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	২৬ জুলাই	
৪।	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	২৬ শ্রাবণ	শনিবার	১১ অগস্ট	
৫।	শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	৩ ভাদ্র	রবিবার	১৯ অগস্ট	"
৬।	স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৯ ভাদ্র	শনিবার	২৫ অগস্ট	"
৭।	স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	৩ আশ্বিন	বুধবার	১৯ সেপ্টেম্বর	"
৮।	স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	৯ আশ্বিন	মঙ্গলবার	২৫ সেপ্টেম্বর	"
৯।	স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১৯ কার্তিক	সোমবার	৫ নভেম্বর	"
১০।	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২১ কার্তিক	বুধবার	৭ নভেম্বর	"
১১।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১৫ অগ্রহায়ণ	শনিবার	১ ডিসেম্বর	"
১২।	শ্রীশ্রী·	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	২৯ অগ্রহায়ণ	শনিবার	১৫ ডিসেম্বর	"
১৩।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	৩ পৌষ	মঙ্গলবার	১৮ ডিসেম্বর	"
১৪			৯ পৌষ	সোমবার	২৪ ডিসেম্বর	"
১৫।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১৩ পৌষ	শুক্রবার	২৮ ডিসেম্বর	"
১৬।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২২ পৌষ	রবিবার	৬ জানুআরি	১৯৮৫
১৭।	শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	২৯ পৌষ	রবিবার	১৩ জানুআরি	"
১৮।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	৯ মাঘ	বুধবার	২৩ জানুআরি	"
১৯।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১১ মাঘ	শুক্রবার	২৫ জানুআরি	"
২০।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	২২ মাঘ	মঙ্গলবার	৫ ফেব্রুআরি	"
২১।	শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৯ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	২১ ফেব্রুআরি	"
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১২ ফাল্গুন	রবিবার	২৪ ফেব্রুআরি	"
২২।	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২৩ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	৭ মার্চ	"
২৩।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২৬ ফাল্গুন	রবিবার	১০ মার্চ	"
২৪।	শ্রীরামচন্দ্র	চৈত্র শুক্লা নবমী	১৭ চৈত্র	রবিবার	৩১ মার্চ	"

পূজা-কৃত্য

১।	শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	১৫ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	২৯ মে	১৯৮৪
২।	স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৩০ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	১৩ জুন	"
৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	১৫ আশ্বিন	সোমবার	১ অক্টোবর	"
৪।	শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	৬ কার্তিক	মঙ্গলবার	২৩ অক্টোবর	"
৫।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১২ মাঘ	শনিবার	২৬ জানুআরি	১৯৮৫
৬।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৫ ফাল্গুন	রবিবার	১৭ ফেব্রুআরি	"

দেহত্যাগ

স্বামী প্রত্যয়ানন্দ (বিভূতি মহারাজ) গত ১৪ মার্চ ১৯৮৪, রাত ১০-৪৫ মিনিটে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। বহুদিন ধরে তিনি বহুমূত্ররোগে ও হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন। গত ১ মার্চ তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। গত দু বছর ধরে তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও (অধুনা বাংলাদেশ) আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ (অধুনা বাংলাদেশ), বেলুড় মঠ, রহড়া, কাটিহার, জামতারা, কাশীপুর, দেওঘর, পাটনা, সারদাপীঠ (বেলুড়) এবং বাঁকুড়া আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সুগায়ক এবং ভাল তবলাবাদক ছিলেন। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর উপর বহু গান তিনি রচনা করে সুর দিয়েছিলেন। তাঁর 'সুরে কথামৃত' শুনে সবাই মুগ্ধ হত। মধুরালাপ ও সঙ্গীত নৈপুণ্যের জন্য তিনি সুখ্যাত ছিলেন।

*

স্বামী জীবানন্দ (গণপতি মহারাজ) গত ২৭ মার্চ ১৯৮৪, রাত ১১-১০ মিনিটে হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের কার্য বন্ধ হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তাঁর ডান পায়ে একটি ক্ষত ছিল, সেটি বেড়ে যাওয়াতে তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। সেখানে দুমাস ধরে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা হয়। কিন্তু তাঁর কঠিন বহুমূত্ররোগ থাকায় ঐ ক্ষতস্থানে ধীরে ধীরে পচন শুরু হয়ে যায় এবং অনন্যোপায় হয়ে জীবন-রক্ষার আশায় হাঁটু থেকে পায়ের নিচের অংশটি অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। এই অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি দেহের ব্যাপক পচন থেকে নিষ্কৃতি পেলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীরের সাধারণ অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জীবনাবসান হয়।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে। দেওঘর বিদ্যাপীঠের শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। গভীর নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি উদ্বোধনের কাজে সহায়তা করেন। তিনি সুলেখক ছিলেন,—তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ উদ্বোধন পত্রিকায় এবং অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। বেলুড় মঠস্থ ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্যের কাজও তিনি বেশ কয়েক বছর করেছিলেন। তারপর শারীরিক অসুস্থতার জন্যই তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরে বিদ্যাচর্চা করেছেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর উপর বহু স্তোত্র তিনি রচনা করেন। তাঁর সহজ সরল ব্যবহার এবং নিরভিমান সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

*

স্বামী শুভ্রানন্দ (গোবিন্দন্ মহারাজ) গত ২৮ মার্চ, রাত ৮-২০ মিনিটে ত্রিবান্দ্রম্ হাস-পাতালে ৮৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ১৮ মার্চ বৃক্কের ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু

পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁর পাকস্থলীতে একটি পিণ্ডাকার টিউমার রয়েছে—যেটি পরে ফেটে যায়। এতেই তাঁর দেহান্ত হয়।

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিরুভাল্লা আশ্রমে যোগদান করেন এবং এই বছরই তাঁর গুরুর কাছ থেকেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন। তিরুভাল্লা এবং পালাই আশ্রমের অধ্যক্ষতা ছাড়া তিনি ত্রিবান্দ্রম্, ব্যাঙ্গালোর, আলেপ্পী এবং ত্রিচূড় আশ্রমের কর্মী ছিলেন বিভিন্ন সময়ে। তিনি ৮ বছর ধরে ত্রিবান্দ্রম্ আশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অনাড়ম্বর এবং তপস্যাময় সাধুজীবনের জন্য তিনি বহুজনের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

উপরি-উক্ত সন্ন্যাসীত্রয়ের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করেছে—এটাই আমাদের অন্তরের একান্ত বিশ্বাস।

সংবাদ

সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মবিশ্বাস

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থোডক্স চার্চের আর্চ বিশপ (ভ্‌লাদিমির কোৎলিয়ারভ্) সম্প্রতি এই তৃতীয়বার ভারতে এলেন। ১৬টি চার্চের ঊর্ধ্বতন এই ধর্মযাজকের বয়স ৫৫। তিনি ত্রিবান্দ্রম্ হয়ে কলকাতায় এসেছেন। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারের পক্ষ থেকে গত ২৬ মার্চ ১৯৮৪, স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে তাঁকে একটি ঘরোয়া পরিবেশে সংবর্ধনা জানানো হয়।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয় অক্টোবর বিপ্লবের পরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ধর্মের প্রতি কেন আকৃষ্ট হলেন। উত্তরে আর্চ বিশপ বলেন : 'ধর্মযাজকের পরিবারে আমার জন্ম। ১৯৫২ সালে চার্চে যোগদান করি। ৩২ বছর ধর্মোপাসনা করছি।' তিনি আরও বলেন : 'আমাদের দেশের মানুষ বেশি করে ধর্মমনস্ক হচ্ছেন। ক্রাসনোডোরে আমাদের ছোট চার্চে প্রতি রবিবার প্রায় দশ হাজার মানুষ প্রার্থনা সভায় আসছেন। তরুণরাও আসছেন। তবে বয়স্ক ও মহিলাদের সংখ্যাই বেশি।

'ধর্ম সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। এবং এই ব্যক্তিস্বাধীনতায় রাষ্ট্র কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করে না। আমাদের দেশের নিয়ম হল আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগে কাউকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া চলে না। এমনকি ব্যাপটিস্ট চার্চের ধর্মযাজকও তাঁর নিজের ছেলেকে আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগে দীক্ষা দিতে পারেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের কোন সম্বন্ধ নেই। চার্চ চলে ধর্মবিশ্বাসীদের অর্থে।' ধর্মের প্রতি মানুষের আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে আর্চ বিশপ বলেন : 'তাঁরা ক্রমে বুঝতে পারছেন, পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যই জীবনের শেষ কথা নয়।'

মার্কস বলেছিলেন, ধর্ম হল মানুষের আফিম। তবে এই ধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে কেন?— এই প্রশ্নের উত্তরে আর্চ বিশপ বলেন : 'মার্কস ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। তাছাড়া যখন তিনি একথা লিখেছিলেন তখন চার্চ ছিল শোষণের যন্ত্র।' তিনি মনে করেন : 'ভারত এবং সোভিয়েত—এই দুই দেশের মধ্যে আরও বেশি ধর্মীয় আদান-প্রদান প্রয়োজন।'

উৎসব

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (কলিকাতা)

গত ২৪ জানুআরি ১৯৮৪, স্বামী বিবেকানন্দের ১২২তম আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। এই উৎসব শেষ হয় ২৫ ফেব্রুআরি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই দুদিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী

নির্বৃত্যানন্দ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু।

যুব-শিবির

পশ্চিম রাজাপুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে গত ১২ ফেব্রুআরি ১৯৮৪, ২য় বার্ষিক যুব-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের মূল লক্ষ্য যুবকদের স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করতে প্রেরণা সঞ্চার। শিবিরে যোগদান করে ১২১ জন যুবক-যুবতী। সারাদিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা, ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেন শর্মা প্রমুখ।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত সন্তান, বিশ্রুত দার্শনিক **ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** গত ২৬ মার্চ ১৯৮৪, বিকাল ৪-১০ মিনিটে তাঁর কলিকাতাস্থ হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘকাল ভারত ও ভারতেতর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্ম ও দর্শনের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে আসীন ছিলেন এবং তাছাড়াও তিনি ছিলেন আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর। ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল্ কংগ্রেসের সভাপতিরূপেও তিনি বৃত হয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের উপর ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর গ্রন্থগুলি দেশ-বিদেশে সমাদৃত এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পাঠ্যরূপে স্বীকৃত। 'Classical Indian Philosophies: Their Synthesis in the Philosophy of Sri Ramakrishna'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ মনস্বিতার অন্যতম নিদর্শন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শন-সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সরল অনাড়ম্বর এবং মাতৃগতপ্রাণ বালকের অনুরূপ। জ্ঞান ও ভক্তির এক আশ্চর্য সামঞ্জস্য তাঁর ব্যবহারিক জীবনকে খুব মধুর করে তুলেছিল। শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁর চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠত—মাতৃস্মৃতিতে তিনি ভরপুর ছিলেন জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত। বেলুড় মঠের সঙ্গে,—মিশনের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ আজীবন অব্যাহত ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের এই জ্ঞানী সন্তানের আত্মা দেহ-পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরই শ্রীপদে পরম শান্তি-লাভ করেছে,—এই আমাদের বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সুহৃদ্, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার **শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র** দত্ত তাঁর কলিকাতার বাসভবনে গত ১৪ মার্চ, ১৯৮৪ মধ্যরাত্রে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল কাটে আসামে। রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারার সঙ্গে সর্বত্রই তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের শিলং শাখার সঙ্গে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং অকুণ্ঠ বদান্যতার জন্য সেখানে তিনি যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষিত।

তাঁর দেহমুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক, এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।



৮৬তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১

দিব্য বাণী

ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! ···ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।··· চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তর ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়।

শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন—জগতে যত প্রাণী আছে, সকলই তোমার আত্মার বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[পত্রাবলী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬]



কথাপ্রসঙ্গে

সাম্যবাদ ও সাম্যবোধ

১

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বা পুষ্প-প্রেমী না হইয়াও পুষ্পশোভায় মুগ্ধ হইতে কোন বাধা থাকে না। আমরাও কাব্যরসিক কিংবা সাহিত্যামোদী না হইয়াও হঠাৎ কোন ভাল রচনায় বা কবিতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। যেমন সেদিন সম্প্রতি-প্রকাশিত একখানি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থের পাতা উলটাইতে উলটাইতে উহার কয়েকটি ছত্রের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া পারি নাই। গ্রন্থে প্রকাশিত এমন কিছু কিছু কবিতার কলি, যাহা সেদিন আমাদের দৃষ্টিকে টানিয়া লইয়াছিল এখানে তাহাই মনে পড়িতেছে। যথা—

'কিছুতেই পারি না শান্তিতে থাকতে/আত্মার যেখানে নিমজ্জন,/কোন কিছুই সহজে পারে না হতে,/আমি অবশ্যই দিতে পারি বিশ্রাম বিসর্জন।/ ...সমস্ত কিছুই আমি চাই জয় করতে,/ঈশ্বরের মুগ্ধ আশীর্বাদ ; /জ্ঞানের অস্তিমে নিহিত/শিল্প ও সঙ্গীতের আস্বাদ।...তা হলে এসো, আমরা পার হই নির্মম সাহসিকতায়/ঈশ্বরের সেই স্থির-পূর্ব প্রান্তর,/দুঃখ এবং আনন্দের উচ্ছলতায়/ঐশ্বর্যের সঙ্গীত বাজে নির্ঝর।'

পড়িতে ভাল লাগিতেছিল,—কবির মর্মকথা সব বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া নহে, বরং স্পষ্ট না বুঝিয়াই। এই কারণেই আরও আশ্চর্যজনক। আবার অন্য আর একটি পৃষ্ঠায় চোখে পড়িয়াছিল :

'সৈন্য-দুর্গ গেছে ডুবে/যা দাঁড়িয়েছিল স্তম্ভিত মিনার ; /অগ্নিময় জলুস তার গেছে নিভে/শূন্য হয়ে যায় হৃদয়ের আধার।/

'তখন শুধু তোমার দ্যুতি ছড়ায়/আত্মার শুভ্রতম বিভাস/নৃত্যের পর নৃত্যের পাখায়/পৃথিবীকে ঘিরে স্বর্গের আকাশ।/

'সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই,/স্বচ্ছ হয় কল্পনা,/আমি আপন করে খুঁজে পাই/আমার সংগ্রামের সীমানা।/

'হৃদয় আরও গম্ভীর হয়ে বাজে, আরও স্বাধীন/আন্দোলিত বুকের গভীরে/বিজয়ের আনন্দে উড্ডীন/প্রশান্তির তীব্র সুখে।'

কিছু পরে এক জায়গায় দেখিয়াছিলাম :

'বাতিদান আলো দেয়,জ্যোতিঃ ছড়ায় নক্ষত্র,/ হৃদয়ের গভীরে আছে দ্যুতি, ঝিকমিক করে সৌন্দর্য,/আত্মার প্রভা, উজ্জ্বল দীপ্তি—/কখনই যায় না দেখানো। /সত্যের সূর্যকে যেমন পারো।'

অনূদিত কবিতাংশগুলির মূল রচয়িতা যিনি, তাঁহার অন্তরের নিভৃতে কোথায় যেন একটি আস্তিক্য ভাবের গোপন নির্ঝর চাপা ছিল, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আর এ-কথাও স্বীকার না করিয়া পারা যাইবে না যে, ঐ কবির মানসিকতায় ছিল প্রখর দার্শনিকতার দীপ্তি—যাহাকে অনধ্যাত্ম বলা যায় না মোটেই। অথচ ইহাই গভীর তাজ্জবের বিষয় যে, ঐ মরমী কবির জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা কিন্তু অন্য পরিধিতে। তাঁহার জীবনের অনুদ্ঘাটিত এই দিগন্তরেখার প্রকাশ পাইয়াছে,

মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে,—তাঁহার জীবদ্দশায় আদৌ নহে যাহা হউক, এখানে আমরা ঐ জটিল বিতর্কে যাইতেছি না,—কাহারও কবি-পরিচয় বা কোন বিশেষ কাব্য-দর্শন আমাদের আলোচ্য নহে,—যোগ্য ব্যক্তিরা উহা লইয়া গবেষণা করিবেন।

উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি যাঁহার লেখনী-নিঃসৃত তাঁহার খ্যাতি আধুনিক নিরীশ্বর-মতবাদের পরিমণ্ডলে,—লোকায়ত জড়বাদে বিশ্বাসী নবীন সমাজের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ রূপে। বিশ্বময় তাঁহার অজস্র অনুগামীরা তাই এই বিশেষ ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবেই নীরব,—তাঁহার কবিতা, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি রচনাসম্ভারকে দিবালোকে আনিবার কোন প্রয়াসই এতাবৎ দেখা যায় নাই ঐ তরফ হইতে। বরং কখন কখন উক্ত রচনাবলীকে নিতান্তই 'ছেলেমানুষী',—তাঁহার রচিত কবিতাবলীকে অপরিণত বয়সের 'প্রেমের কবিতা' বলিয়া কিঞ্চিৎ লঘুদৃষ্টিই করা হইয়াছে। অনধিকারী আমরাও উহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছি না এখানে। অতি স্বাভাবিক কারণেই, উল্লিখিত বিদেশী দার্শনিক কবি এবং তাঁহার কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে আমরা নীরব রহিলাম।

যে-মনস্বী লেখকের সাহিত্যকৃতিকে আমরা সম্প্রতি দেখিবার জানিবার সুযোগ পাইলাম, তিনি সাহিত্যিক বা কবিরূপে স্বীকৃতি পান নাই, তাঁহার একান্ত বিশ্বস্ত অনুগামীদের দ্বারা,—ইহার পশ্চাতে কিছু রহস্যময় কারণও অবশ্যই থাকিবে। জানা যায়, তাঁহার শ্রেষ্ঠ জীবনীকাররা মন্তব্য করিয়াছেন—ঐ সকল কবিতার বা রচনার সাহিত্যমূল্য অতি নগণ্য,—জীবনীগত তাৎপর্য কিছু আছে মানিয়া লইলেও। আমাদের মনে হয়, এ-হেন অস্বীকৃতির প্রধান কারণ, উল্লিখিত রচনায় বা কবিতায় আত্মা, ঈশ্বর, সত্য, জ্যোতিঃ ইত্যাদি শব্দের প্রায়শঃ উপস্থিতি,—অর্থাৎ রচয়িতার অন্তরে ঐ-সকল শব্দের প্রতিপাদ্য যিনি, তিনি সম্পূর্ণ গোপন থাকেন নাই। যুক্তিনিষ্ঠ অনুগামীরা আত্মায় বিশ্বাসী নহেন,—ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তাঁহারা মানেন না। তথাকথিত 'ঈশ্বর-বিরোধী' ভাবাদর্শের মহান উদ্গাতার লেখনীতে ক্বচিৎ কখনও অস্তিমূলক কিছু ব্যক্ত হইয়া পড়িলেও উহা তাঁহার জীবনের এক অপরিণত পর্যায়ের সৃষ্টি—ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র! ইঁহারা, অর্থাৎ উল্লিখিত অনুগামিগণ খাঁটি সমাজবাদী,—ধর্ম তথা ঈশ্বর, ভগবান, আত্মা ইত্যাদি লইয়া কোন প্রকার চিন্তা, ইঁহাদের সমাজ-সাম্যে নিতান্তই অবান্তর—একটি কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নহে। ইঁহাদের 'মুক্তদৃষ্টিতে' ধর্মের মূলে কোন সত্য নাই। যাহা আছে—তাহার নাম 'অন্ধতা' ও 'ভয়'। তাঁহারা ধর্মকে জ্ঞান করেন, জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সমাজের ধনিকশ্রেণীর আবিষ্কৃত এক ধরনের অহিফেন স্বরূপ। ইঁহারা আরও মনে করেন, মানব-সমাজের প্রকৃত 'মুক্তির' বা সাম্যের জন্য ধর্মের বিলুপ্তি ঘটানো প্রয়োজন। তবে এই বিলুপ্তি প্রাকৃতিক নিয়মেই একদিন হইবে, অদূর ভবিষ্যতে যখন প্রকৃত সাম্য অথবা 'শ্রেণীহীন সমাজের' অভ্যুদয় হইবে। ধর্মহীন সেই 'আদর্শ সমাজে' ভগবানও তখন মানে মানে আপনিই বিদায় লইতে বাধ্য হইবেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা, বিশুদ্ধ সাম্যাদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজে 'চিরন্তন সত্য' (Eternal Truth), যাহার অপর নাম ধর্ম, তাহার আর কোন উপযোগিতা থাকিতে পারে না। প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনার ইহাই নাকি সার-সংক্ষেপ,—ধর্ম তথা ঈশ্বর-ভগবান ইত্যাদিরও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নাকি এইরূপই অনেকটা। কিন্তু প্রকৃতির এক নিদারুণ পরিহাস এই যে, নবীন এই প্রাণোন্মাদক মতবাদের মহান অনুপ্রেরক হইতেছেন তিনিই,—যাঁহার 'অপরিণত' মনের কিছু বিরল কাব্য-শৈলী আমরা পূর্বে

উল্লেখ করিয়াছি! ঐ-সকল রচনায় ঈশ্বরও নানা ছলে ও ছদ্মবেশে উপস্থিত !! আরও নিষ্ঠুর তামাশা, এযাবৎ অসঙ্কলিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের মাঝে উচ্চারিত হইয়াছে : 'ভগবানের ভাষা নীরব কিন্তু নিশ্চিত' ("God speaks quietly, but surely')। জানা গিয়াছে, উক্ত প্রবন্ধের রচনাকাল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

উল্লিখিত 'নিরীশ্বরবাদী' মহান বিপ্লবী ও সাম্যবাদী নেতা আর কেহই নহেন, স্বয়ং কার্ল মার্কস্,—যাঁহার যৌবনের ভাবাবেগ-প্রেরিত 'অপরিণত মানসিকতা'র আভাস আমরা কিছু উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনের শেষ প্রান্তেও অবশ্য অমন ইঙ্গিত একেবারে অমিল হইবে না। স্নেহের কন্যা এলিনর মার্কস্কে লেখা প্রবীণ পিতার একখানি পত্রে দেখা যায় : 'সব কিছু সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মকে আমাদের কতকটা মানিতেই হইবে, কেননা উহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে ঈশ্বর-সন্তানদের ভালবাসিতে' ('Inspite of everything we must forgive much to Christianity, for it has taught us to love children')। চূড়ান্ত ধর্মদ্রোহিতার পরেও ধর্মের নিকট মানব-প্রেমের শিক্ষাগ্রহণকে মার্কস্ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মার্কসের ছিল কবি-মন,—তাই সংবেদনশীল ও অনুভূতি-প্রবণ। তাঁহার সমাজ-প্রেম, নিপীড়িত মানবের প্রতি সমবেদনা সর্বাংশেই আন্তরিক ছিল,—আর এই কারণেই তাঁহার প্রচারিত নীতির কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া কদাপি কোন আধ্যাত্মিক আলোক আদৌ প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই, এ-কথা সত্য নহে,—বরং উহাই ঐতিহাসিক তথ্য,—তাঁহার অনুগামী নীতিনিষ্ঠগণের নিকট তাহা যতই কেন অগ্রহণীয় এবং অপ্রিয় হউক।

২

পশ্চিমবাহিনী নদীতটে বিচরণ করিতে করিতে বেশ কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্তনের পথে আমাদের চিরপুরাতন সুপরিচিত পূর্ববাহিনী নদীকূলে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। নদীর কলধ্বনিতে কান পাতিলে যেন শোনা যাইতেছিল : 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং দিশম্ অনু···।' একটি অত্যাশ্চর্য মন্ত্রধ্বনি—কাব্যতরঙ্গ! পুস্তকের পৃষ্ঠায় কবিতার আভাস নহে, বোধ হইতেছিল যেন কবিতার অণুপরমাণুমণ্ডিত এক অনির্বচনীয় লোকেই অবস্থান করিতেছি! শুভ্র-শির ক্রান্তদর্শী এক কবির রচনা,—স্বয়ং শ্রুতি-কণ্ঠোচ্চারিত স্বরলহরীই বহুদূরাগত ধ্বনির ন্যায় কানে আসিয়া বাজিতেছিল। এ-কবিতা স্বপ্রকাশ। ইহাকে মানিয়া লইবার জন্য জনমত গঠনের অবকাশ নাই,—ইহা স্বয়ং প্রকাশিত।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয়াধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বাচক্নু-কন্যা গার্গীকে সস্নেহে উপদেশ দিয়াছিলেন—'এই অক্ষরেরই প্রশাসনে হে গার্গি, কোন কোন নদী পূর্ববাহিনী হইয়া আবার কোন কোন নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া যাহার যে-দিক্, সেই নিজ নিজ দিকে বহিয়া চলিতেছে···।' অপূর্বসুন্দর একটি চিরন্তন কাব্য-গাথা,—অথচ বলিষ্ঠ ব্রহ্ম-নির্ঘোষ। সকল ধারা, সকল প্রবাহ—সকল মত ও বাদের গতিপথে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, উহাদের প্রত্যেকেরই উদ্ভব-কেন্দ্র কিন্তু এক 'অক্ষর'। অতএব একত্ব বা সমত্ব উহাদের জন্মগত অধিকার।

সর্ববেদোপনিষদ্ সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা। সেখানেও এই 'সম' এবং সাম্য-মন্ত্র বহুধা কথিত। 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।/ নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥' —যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিত, তাঁহারা এই জীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন—কারণ ব্রহ্মই সম এবং

দোষমুক্ত—সমদর্শিগণ সেই ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।

'সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।'—সর্বভূতে সমদর্শনেই আমার (শ্রীভগবানের) প্রতি পরাভক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও সর্বত্র এই সাম্যেরই জয়গাথা। 'সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্'—সমদর্শী হইয়া সংসারে বিচরণ কর। আমরা সবিস্ময়ে স্মরণ করি, ভাগবতের সেই সুকঠিন সংসার-নীতিকে, যেখানে উক্ত হইয়াছে—যে পরিমাণ বিত্তে নিজের ভরণপোষণ চলিয়া যায়, তাহাতেই একজন দেহধারীর ন্যায্য স্বত্ব। উহার অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তির অভিলাষ একপ্রকার চৌর্যাপরাধ,—দণ্ডনীয় তো বটেই। 'যাবদ্ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্। / অধিকং যোঽভিমন্যতে স স্তেন দণ্ডমর্হতি॥' আধুনিক সমাজতন্ত্রে ইহা অপেক্ষাও কঠোর বাক্য আছে কিনা আমাদের সঠিক জানা নাই।

এই সকল চিন্তাতরঙ্গ কিন্তু কোন আধুনিক সমাজতন্ত্রীর মনীষা-সঞ্জাত নহে,—অতি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মতত্ত্বেরই সার নিষ্কর্ষ এই মন্ত্ররাজিতে অভিব্যক্ত। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, ইদানীন্তনের সাম্যবাদ-ঘোষক কোন গণনায়কের অনুশাসন-বাণীকে আমরা সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিয়া লইয়াছি এখানে! অবশ্য একটু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হইয়াছে,—আধুনিক সমাজতন্ত্রে যাঁহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করা হইয়া থাকে, সেই তাঁহাকেই প্রাচীন ধর্মাদর্শের কেন্দ্রমণিরূপে সাদরে শিরোধার্য দেখা যাইতেছে!! অর্থাৎ, ভারতীয় সাম্য-দৃষ্টি ঈশ্বরময়,—নব্যমতে যাহা সম্পূর্ণই উপেক্ষিত।

বলিতে বাধা নাই, 'সম' বোধ হইতেই সাম্য। 'সাম্য' তাই একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, যাহাকে ভুলবশতঃ নব্য সমাজতন্ত্রীরা ভাবিয়া বসিয়াছেন, কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তির গবেষণাজাত একটি অবদানমূলক নীতিমাত্র।—উপনিষদে ও পুরাণে 'সম' বলিতে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে,—সরল কথায় ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। সেখানে আত্মোপলব্ধির স্বাভাবিক ফলশ্রুতিস্বরূপ দৃষ্টির নাম সাম্য। তাই সাম্যবাদকে আত্মার সংস্পর্শলেশহীন করিয়া প্রচারের চেষ্টা যত সুপরিকল্পিত ভাবেই হউক না কেন, কোথাও ফলপ্রসূ হইতে পারিতেছে না। কারণবিহীন কার্যে মনোহারিত্ব থাকিলেও উহা দ্বারা কখন অভীষ্টলাভ হইতে পারে না। স্বপ্নের মেঘে যে বর্ষণ হয়, তাহা খরাক্লিষ্ট জমিতে চাষের সহায়তা করে না—গ্রীষ্মের দহনেও শান্তি আনে না! তবে স্বপ্নকে শীতল ও মধুর করে। ভাবিবার বিষয় ইহাই।

আমরা জগতের যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করি,—আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে কোন দুইটিতে বা দুই জনে মিল নাই, ইহাই স্পষ্ট দেখিতে পাই। বাস্তবিক সর্বত্রই যদি এই বিপুল ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সাম্য বা সমত্ব কোথায়? যতকাল মানুষের প্রকৃতির অধীনতা থাকিবে, ততকাল দৃষ্টিতে আমাদের বৈষম্যই বিরাজ করিবে,—সাম্য কেবল একটা মতবাদ বা নীতিমাত্র। তথাপি ভারতীয় ঋষিগণের উপলব্ধ সত্য হইতেছে ইহাই যে, নানা ভেদযুক্ত জগতের ও সমাজের মূলে রহিয়াছেন প্রকৃতিজাত সর্ব উপাধিশূন্য, সর্বপ্রকার নাম-রূপ-বর্ণের অতীত, সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানই,—যিনি সর্বকালে সমান, সর্বসাধারণ বস্তু। ইহাই যথার্থ সাম্য। আর এই সাম্যই সকল বৈষম্যকে, মালার সূত্রের ন্যায় ধরিয়া রাখিয়াছে।

অসম প্রকৃতিজাত নাম ও রূপকে,—দেশ-কালানুযায়ী বিভিন্ন সংস্কারকে ও প্রবৃত্তিকে বল-প্রয়োগ করিয়া কিংবা ছাঁটিয়া কাটিয়া সমান করিয়া

লওয়া চলে না। তাই ভারতীয় সাম্যবোধের মধ্যে ঐরূপ কৃত্রিম প্রচেষ্টার কোন স্থান নাই। সমান আহার সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টনের দ্বারা যে সমান ভোগের আয়োজন, তাহাতে সাম্যবাদ যথেষ্ট প্রচারিত হইতে পারে,—কিন্তু সাম্যবোধ সেখানে নিতান্তই দুরাশা। কারণ, খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ সমান হইলেও, প্রত্যেকের ভোজন-ক্ষমতা ও হজম-সামর্থ্য নিশ্চয়ই সমান হইতে পারে না, কোন অবস্থাতেই। তাই সাম্য সেখানে বোধে বা উপলব্ধিতে আসে না কাহারও জীবনে, যদিও 'বাদ' হিসাবে উহা বহুল প্রচারিত থাকিতে পারে।

আত্মা বা ঈশ্বর হইতেছেন জীবের সত্তা, যিনি সর্বকালে অপরিবর্তিত সমান এক। এই সর্বসমান সত্তাকে উপেক্ষা করিয়া যে সাম্য স্থাপনের চেষ্টা,—উহা নেহাতই নিষ্প্রদীপ সাম্য। কোন অমানিশায় বিশাল জনপদের উপরে যখন নিষ্প্রদীপের অন্ধকার নামিয়া আসে, তাহাতেও একপ্রকার তমসাচ্ছন্ন 'সাম্য' সৃষ্টি হইয়া থাকে,—সকল কিছুকেই সমান বলিয়া ঠাহর হয়;—কিন্তু পায়ে হাঁটিয়া চলা সমূহ বিপজ্জনক। চলিবার স্বল্প চেষ্টাতেই জ্ঞান হইয়া যায়, যাহা সমান বলিয়া ধারণা হইতেছিল, উহা আসলে সমান নহে। নিরীশ্বর জ্যোতিঃহীন সাম্যবাদের গতিও অনেকটা ঐ-রকমই,—প্রকৃত সাম্যের বোধ উহাতে হয় না।

ভারতের ঐতিহ্য আমাদিগকে আবহমানকাল ধরিয়া এই সাম্যবোধেই উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। মনে পড়িতেছে, খেতড়ি-রাজকে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের সেই কঠোর অনুশাসন:

'জানিবেন রাজাজী, আপনার পূর্বপুরুষগণের দ্বারা আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য—বিশ্বজগতের একত্ব। ...সমুদয় সৃষ্ট জগতের এই পূর্ণ সাম্যের বিরুদ্ধে যে কোন চেষ্টা ভয়ানক ভ্রমাত্মক; আর যতদিন না এই সাম্যভাব আয়ত্ত হইতেছে, ততদিন কেহ কখনই মুক্ত হইতে পারে না।...অতএব হে রাজন্, আপনি বেদান্তের উপদেশাবলী পালন করুন—।...এই সর্বভূতে সর্ববস্তুতে সমজ্ঞানরূপ মহান উপদেশ পালন করুন—সর্বভূতে সেই এক ভগবানকে দর্শন করুন। ইহাই মুক্তির পথ; বৈষম্যই বন্ধনের পথ। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি বাহিরের একত্বজ্ঞান ব্যতীত বাহিরের স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, আর সকলের মানসিক একত্ব-জ্ঞান ব্যতীত মানসিক স্বাধীনতাও লাভ করিতে পারে না।'

ইহা কোন সাম্যবাদী দলনেতার উক্তি নহে,—সমদর্শী আত্মবিদ্ ঋষির সাম্যবোধ হইতে উৎসারিত বাণী। ভগবান এখানে 'বাদ' হইয়া যান নাই, 'বোধ'-রূপে প্রকাশিত। ইহারই নাম সাম্যবোধ।

৩

সমাজে মানুষকে বাঁচিতে হয় সংগ্রাম করিয়া। বিরামহীন সংগ্রামেরই আর এক নাম জীবন। তাহার সংগ্রাম প্রধানতঃ ত্রিমুখী: বহিঃপ্রকৃতির সহিত, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সহিত এবং সর্বোপরি নিজ অন্তঃপ্রকৃতির সহিত।

বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে শিখিতে হয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি। সমকালীন সমাজ, উহার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত রূপে মানুষকে প্রতিনিয়তই সংগ্রামে নিযুক্ত রাখিতেছে,—যাহার জন্য তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইতেছে সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল ইত্যাদি। অথবা এই দ্বিতীয় সংগ্রামকে এড়াইয়া চলিতেও তাহাকে জানিতে হয় অনেক রকম কূট-কৌশল ও জটিল ছলা-কলা—কিন্তু যাহার ফলশ্রুতি ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-বিদ্বেষ ও সংঘাত। সর্বশেষে মানুষের তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠতম সংগ্রাম-ক্ষেত্র তাহার নিজেরই অন্তঃপ্রকৃতি,—যাহার জন্য

তাহাকে সাধিতে হইতেছে সঙ্গীত-সাহিত্য-দর্শন-মনোবিজ্ঞান-শিল্প,—তাহাকে আশ্রয় খুঁজিতে হইতেছে আপন অন্তরের অন্তঃক্ষেত্রে,—সন্ধান করিতে হইতেছে শাস্ত্রের ও আচার্যের দ্বারে। ইহারই প্রচলিত নাম ধর্ম—আত্মানুসন্ধান। মানুষের ধর্ম-সাধনের অপরিহার্যতা এখানেই,—এই তৃতীয় ও সর্বগরিষ্ঠ সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্যই।

'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' যিনি, তাঁহাকেই মানুষ ডাকিয়া থাকে ভগবান, ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া—অথবা সত্য, শিব ও সুন্দর নামে। এই ভগবানকে পাশ কাটাইয়া জীবন-সংগ্রাম চালাইবার কোন বাস্তবতা আছে কি? যদি উহাকে একান্ত সম্ভব করিতেই হয়, তবে সর্বাগ্রে মানুষের মন-বুদ্ধিকেই স্তব্ধ করিতে হইবে—তাহার বিবেককে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। কিন্তু হায়, তাহা কি আদৌ, সম্ভব? মনের দৌলতেই তো মানুষ 'মানুষ' নামে পরিচিত,—নচেৎ, সে একটি প্রাণী মাত্র।

ধর্মসংস্রবশূন্য নির্ভেজাল সাম্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা স্বয়ং স্তালিনকেও বোধ হয় তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায়, স্বীয় বিশ্বাসের ধারাকে কিঞ্চিৎ মোড় ফিরাইতে হইয়াছিল। ডীন্ অব্ ক্যাণ্টারবেরী হিউলেট্ জন্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে তিনিই বলিয়াছিলেন,—'না, ধর্মকে থামানো যাইবে না, যেমন পারা যাইবে না বিবেককে রুদ্ধ করিতে। ধর্ম হইতেছে বিবেকের ব্যাপার—যে বিবেক হইতেছে মুক্ত। পূজা-অর্চা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাও তাই অব্যাহত থাকিয়া যাইবে।' ('Religion cannot be stopped, conscience cannot be stilled. Religion is a matter of conscience and conscience is free. Worship and Religion are free.')।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র রুশ ও চীনের মানুষ আজ নূতন করিয়া এই বিষয় লইয়া ভাবনা শুরু করিয়াছেন! তাঁহারাও আজ উদ্বিগ্ন,—'বোধ'-কে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র 'বাদ'-ই পারিবে কিনা সমাজে শান্তি আনিতে! মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, সোভিয়েত সায়েন্স্ আকাদামীর প্রবীণ সদস্য ডক্টর চেলিশেভ্ এই সেদিনও কলিকাতায় বলিয়া গিয়াছেন,—'সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন যে, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বস্তুতঃ অভিন্ন,... বিপন্ন মানব-সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে তাঁহাদের বাণী একান্তই অপরিহার্য।' অধ্যাপক চেলিশেভ্ এবং অন্য আরও সূত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, সোভিয়েতের চিন্তাশীল নর-নারী আজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চা তথা ভারতীয় বেদান্ত-বিষয়ক পঠন-পাঠনাদির বিশেষ প্রয়োজন সেখানেও দেখা দিয়াছে। চীন দেশেও ইদানীং বেদান্ত এবং ভারতীয় দর্শন-পুরাণাদি লইয়া প্রভূত আলোড়নের সূচনা সুস্পষ্ট। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের চীন সংস্করণ এখন আর মোটেই দুর্লভ বস্তু নহে। সোভিয়েত অর্থোডক্স চার্চের আর্চবিশপ ভ্লদিমির কোৎলিয়ারভ্ কিছুদিন পূর্বে মস্কো হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনিও স্পষ্টই জানাইয়াছেন,—সোভিয়েত রাজ্যে এখন প্রতি রবিবারে সহস্র সহস্র নারী-পুরুষ ভজনালয়ে গিয়া থাকেন প্রার্থনাদির জন্য। নিজ নিজ বিশ্বাস-অনুযায়ী ধর্ম-আচরণে রাষ্ট্রীয় কোন বিধি-নিষেধ সেখানে সম্প্রতিকালে নাই। যদিও, সরকার এ-ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে কোথাও সমর্থন জানায় না,—কিন্তু কোন রকম বাধাও দেয় না। তিনি আরও বলেন,—'সোভিয়েতের মানুষ এখন ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই জীবনের শেষ কথা নহে।'

বিশ্বের সাম্যবাদ-তীর্থ দেশগুলির ইদানীন্তনের চিন্তার গতি দেখিয়া মনে হইতেছে, সেখানকার

জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনায়করা যেন বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া—সমত্ব বা সাম্যকে নিছক একটি 'বাদ' বলিয়া ঢক্কা নিনাদ অপেক্ষা, উহাকে আগে অন্তরে 'বোধ' করায় উদ্যমী হওয়াই সমধিক ফলপ্রদ। আর সেই সাম্যবোধই হইতেছে ধর্মোপলব্ধি,—যাহা কদাপি ঈশ্বর-ভাবনা-বর্জিত হইতেই পারে না।

৪

কার্ল মার্কসের আস্তিক্য-ভাবনামূলক রচনাদিতে তাই আমরা বিস্ময়ের কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। বরং ভাবিতে অবাক লাগে, দীর্ঘ ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, একমাত্র জার্মানভাষী বাদে, বিশ্বের সকলেই, এমন কি মার্কসের অজস্র গুণমুগ্ধমণ্ডলীও ঐ সাহিত্য-সম্পদ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন! অথচ এই দোর্দণ্ড নিরীশ্বরবাদী সাম্য-প্রচারকের শ্রেষ্ঠ জীবনী-সমালোচক রবার্ট পেইন্ তাঁহার 'দ্য আন্‌নোন্ কার্ল মার্কস্' ('The Unknown Karl Marx')-গ্রন্থে অত্যন্ত দুঃসাহসিক উক্তি করিয়াছেন—যাহাকে অতিশয়োক্তি বলা যাইতে পারে: 'তিনি (মার্কস্) ছিলেন অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন একজন আধিকারিক,—প্রবক্তা, সর্বপ্রকার মানবিক বিদ্যায় ও ধর্মে…' ('He was a prophet, a seer, an authority on all the arts and religion…')।

আমরা মার্কসের ভাববাদমূলক কবিতার কথা লইয়া প্রসঙ্গ শুরু করিয়াছিলাম, যে-গুলিকে তাঁহার অনুগামীরা সতর্কতার সহিত এতকাল দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। রবার্ট পেইন্ কিন্তু সে-সম্পর্কেও চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থে। তিনি বলিয়াছেন,—'সারাজীবনব্যাপী মার্কস্ নিজেকে শুধু উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন কবিতার কাছে…।' মার্কস্‌বিদ্‌গণ তাঁহাদের মহান্ নেতার প্রচারিত 'বাদ'-কে বোধের পর্যায়ে উন্নীত দেখিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই হয়তো ঐ-সকল রচনা, যাহাতে ঈশ্বরীয় ভাবের নাম-গন্ধটুকুও প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলিকে নীতিগত কারণেই পরিহার করিয়া আসিতেছিলেন। মার্কস্-ভক্তগণের আশঙ্কা, ঈশ্বর-আত্মা-ভগবান বা এক কথায় ধর্ম সংযুক্ত হইলেই উক্ত 'বাদ'-এর লোকায়ত রূপের হানি হইবে! অহিফেনের আচ্ছন্নতা অপেক্ষা সুরার মত্ততা আরও সর্বনাশা! কিন্তু ঈশ্বরকে ঠেলিয়া, সত্যকে দূরে রাখিয়া 'বাদ'-এর বহুল প্রচার হইলেও, প্রয়োগের ও প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা উহাতে দূরপরাহত হইবে না কি? লোকরঞ্জন হইলেও, 'বোধ' শূন্য কোন 'বাদ' জগতের ইতিহাসে কদাপি স্থায়ী হইয়াছে কি? একদা কুমারী মেরী হেলকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন,—

'সমাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ, আর যে তাহা করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোক-মতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।'

সাম্যবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তাই একান্তই আবশ্যক উহাকে সর্বান্তরিক বোধের দিকেই অনুপ্রেরিত করা। কিন্তু প্রত্যাশিত সেই সাম্যবোধ ধর্মলেশহীন হইবে, এ-হেন চিন্তা নিতান্তই বাতুলতা। বিশ্বমানবের পরম সুহৃদ্ এবং সমত্বদর্শনের বরিষ্ঠ ঋষি বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন,—

'ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছে—এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা।'

'এখন "ধর্ম" বলতে বুঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে।'

অতএব সুস্থ সাম্য-চিন্তায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন সকলের আগে—তারপর একান্ত আবশ্যক ধর্মাতঙ্ক হইতে মুক্ত হওয়া।

ফলহারিণী কালীপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী।

জগজ্জননী মহাশক্তিকে যে-সব বিভিন্ন মূর্তিতে আরাধনা করা হয়, কালীরূপ তার অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে শক্তি বা কালীর উপমা।"[১]

তন্ত্রমতে কালী আদিরূপিণী, আদ্যাশক্তি সব কিছুরই কারণ। ইচ্ছামাত্রে তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করছেন। আবার প্রলয়কালে তিনিই সংহার করছেন। জগৎসংহারক মহাকাল তাঁরই একটি রূপমাত্র। মহাকাল বিশ্ব গ্রাস করেন। আর তিনি গ্রাস করেন মহাকালকে। তাই তিনি কালী।[২] সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ—এই তিনভাবের একত্র প্রকাশ কালীরূপের বৈশিষ্ট্য। কালীরূপও অনেক। "তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।"[৩] ফলহারিণীও এই বহুরূপিণী কালীরই অন্যতমা একটি রূপ।

সাধকের কর্মফল হরণ করেন, তাই তিনি ফলহারিণী। তাই অনুমান হয়, পূজায় দেবীকে নানাবিধ ফল উপহার দেওয়ার বিধান। "জৈষ্ঠ-পঞ্চদশ্যাং বহুফলাদ্যুপহারৈঃ পূজনীয়াঃ"[৪]—অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসের পঞ্চদশীতে সাধক নানাবিধ ফলের উপহার সহযোগে দেবীর পূজা করবেন। অপর একটি বিধানেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছে, "জ্যৈষ্ঠে মাসি তথামায়াং সফলং কালিকার্চনম্। সফলম্ ফলসমন্বিতম্ ফলদ্বারা পূজনম্ ইতি যাবৎ"[৫]—জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় বিশেষভাবে নানাবিধ ফল দিয়ে কালিকাদেবীর পূজা করতে হয়। এর একটি বাহ্য ব্যবহারিক দিকও আছে। জ্যৈষ্ঠমাস আমাদের দেশে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের মরসুম। সাধক নিজের ইষ্টদেবীকে—যিনি আপনার হতেও আপনার, জীবনের ইহসর্বস্ব, তাঁকে এই সময় সময়োপযোগী উপাদেয় নানাবিধ ফল দিয়ে আপ্যায়িত করবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। যাই হোক, দেবী একদিকে যেমন ফলহারিণী, সাধকের কর্মফল হরণ করেন, বিনাশ করেন, অপরদিকে আবার ফলদায়িনীও। কর্মফল হরণ করে সাধককে তার অভীষ্টফল, মোক্ষফল দান করেন।

ফলহারিণী কালীর পূজা হয় জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যার মহানিশায়। "জ্যৈষ্ঠে মাসি অমায়াং বৈ মধ্যরাত্রে মহেশ্বরি। / পূজয়েৎ কালিকাং দেবীং নানাদ্রব্যোপহারকৈঃ॥" (মায়াতন্ত্র, ১৭ পটল)। জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যার মহানিশায় সাধক নানাদ্রব্যের উপহার সহযোগে শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর পূজা করবেন। উক্ত তন্ত্রেই আবার এই পূজার অনুরূপ বিধানও আছে। "তত্রৈব সিতপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং নিশার্ধকে। পূজয়েচ্চ ফলৈর্লক্ষৈঃ শক্তিতো বাপি কালিকাম্॥"

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, সমগ্র সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃঃ ১২৯

২ মহানির্বাণতন্ত্রম্, ৪।২৯-৩১ ভাবানুবাদ

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, সমগ্র সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃঃ ৩৪-৩৫

৪ শব্দকল্পদ্রুম্ ৫ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪

এই মাসেরই (জ্যৈষ্ঠমাসের) পূর্ণিমার অর্ধরাত্রে লক্ষফল উপচারে অসমর্থ হলে যথাশক্তি ফল নিবেদন পূর্বক কালিকাদেবীর পূজা করবেন। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত বিধানেই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় পূজার রীতি সর্বত্র প্রচলিত। কোন কোন তান্ত্রিক সাধক হয়তো বা পূর্ণিমায়ও এই পূজা করে থাকেন। তবে তা আমাদের অবিদিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ফলহারিণী কালীপূজার দিনটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১২৮০ সালের[৬] ফলহারিণী পূজার পুণ্য দিনটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধক জীবনের একটি বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। ব্রতটি উদ্‌যাপিত হয় বিশেষভাবে বিচিত্র এক পূজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ঐদিন তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে "আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।...মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।"[৭] এই দিনে কালীপূজা তো হয়ই। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দেহাবলম্বনে আদ্যাশক্তিকে ষোড়শীরূপে পূজা করার বিচিত্র ঘটনাই ফলহারিণী কালীপূজাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে একটি বিশেষ তাৎপর্য এনে দিয়েছে। আর শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজার পুণ্য এই ঘটনার অনুসরণে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে স্মরণ করে কালীপূজাই যে এই দিনটির প্রধান আকর্ষণ, তা বলা বাহুল্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ষোড়শী দশমহাবিদ্যার[৮] অন্যতমা রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার বিভিন্ন রূপের দর্শনলাভ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "ঐ মূর্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্ব-স্বরূপা হইলেও শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শী মূর্তির সৌন্দর্যের সহিত তাঁহাদিগের রূপের তুলনা হয় না।" আরও বলতেন, "ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম।"[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ফলহারিণী পূজার দিনটির আরও একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে। দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর প্রতিষ্ঠা দিবস। শুভ অভিষেকের দিন। তাই লক্ষ্য করা যায়, সেদিন পূজাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রপূত জল দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করলেন। প্রার্থনা করলেন, "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"[১০] সেদিক থেকে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' উৎসর্গীকৃত ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সতত অধিষ্ঠিতা থেকে সর্বকল্যাণ সাধন করবেন, দিনটি তারই সূচনা।

জীবনে যাঁরা ঈশ্বর বৈ আর অন্য কিছু জানেন

৬ লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ৩৭৪

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ৩৭৬-৭৭

৮ আদ্যাশক্তির দশবিধ রূপ দশমহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ২৩২

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ৩৭৬

না, এ-হেন অবতার পুরুষের আচরণ বিধিবদ্ধ করা সীমিত বুদ্ধি মানুষের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। তাঁদের জীবনই একদিকে যেমন শাস্ত্রকে সমর্থন করে,[১১] অপর দিকে তাঁরা শাস্ত্রবিধিরও পার। সাধকের অনুভবেই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা।[১২] তথাপি "ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি।"[১৩]—স্বামী সারদানন্দজীর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে 'সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর প্রতিষ্ঠাদিবস'-এর তাৎপর্যটি আমাদের বোধসামর্থ্য অনুযায়ী বুঝবার চেষ্টা করব। তত্ত্বটি বুঝবার জন্য আমরা আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শীপূজার ঘটনায় ফিরে আসি।

পূজার দুটি ব্যতিক্রম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সাধারণ রীতি অনুযায়ী সুপ্রচলিত প্রতীকে, অর্থাৎ ঘট, পট, মূর্তি বা যন্ত্রে দেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করে পূজা না করে পূজা অনুষ্ঠিত হল এক মানবীর দেহ অবলম্বনে তাঁতে আদ্যাশক্তির অবতরণ ঘটিয়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যে মূর্তি বা বস্তুতে পূজ্য দেবতা বা দেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয় সেই মূর্তি বা বস্তু পূজ্য সেই দেবতা বা দেবীর প্রতীক। যন্ত্রও দেবতার প্রতীক। শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিভিন্ন রেখার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট আধার অঙ্কন করে সেই আধারে পূজ্য দেবতার অধিষ্ঠানকে যন্ত্র বলে। মানব-প্রতীকে পূজার রীতি একেবারে অপ্রচলিত না হলেও বহুল প্রচলিত নয়। মানব-প্রতীকে কুমারী পূজা একটি সুপ্রচলিত শাস্ত্র অনুমোদিত রীতি। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণাকালীর পূজা না করে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করলেন সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ত্রিপুরাসুন্দরী ষোড়শীর। কালীর ফলহারিণী-রূপের কোন ধ্যানমন্ত্র বা পৃথক পূজাবিধি নেই। "অর্ধরাত্র পূজার মুখ্য কাল, এস্থলেও দীপান্বিতাবৎ পূজাপ্রকরণ ও ব্যবস্থা গ্রাহ্য।"[১৪] স্বাতন্ত্র্য শুধু উপচার নিবেদনের বেলাতে। অন্যান্য বহুবিধ উপচার নিবেদনের সঙ্গে নানাবিধ গোটা ফল দেবীকে নিবেদন করাই এই পূজার বৈশিষ্ট্য।

সর্বার্থক প্রকৃত বৈদিক ধর্মের প্রবক্তা আচার্য শঙ্কর ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে শুধু ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি। পরন্তু তার রক্ষণেরও একটি স্থায়ী সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকরী করবার মানসে ভারতের চার প্রান্তে—দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে শৃঙ্গেরীমঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্ধনমঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় শারদামঠ এবং উত্তরে বদরিকাশ্রমের নিকট জ্যোতির্মঠ—চারটি মঠ স্থাপন করে তাঁর চারজন সুযোগ্য শিষ্যের উপর মঠগুলি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই চারজন মঠাধীশের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীদের চারভাগে বিভক্ত করে ভারতের চার অংশে তাদের কর্মক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করে দেন। এই সব সন্ন্যাসীদের পরিচিতি হিসাবে দশটি আখ্যাহেতু—পুরী, গিরি, ভারতী, তীর্থ, বন, অরণ্য, পর্বত, আশ্রম, সাগর ও সরস্বতী—তারা 'দশনামী সন্ন্যাসী' নামে পরিচিত। শিষ্যদের প্রতি

---

১১ তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি। নারদীয় ভক্তিসূত্র, ৬৯

১২ এখানকার অবস্থা (আমার উপলব্ধি) বেদ বেদান্তে যা লেখা আছে, সে সকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫১

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৪২

১৪ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪

আচার্যের নির্দেশও আছে—"দ্বারকাধাম, পুরীধাম, জ্যোতির্ধাম ও রামেশ্বর ধামের চার মঠের নাম হবে যথাক্রমে শারদামঠ, গোবর্ধনমঠ, জ্যোতির্মঠ ও শৃঙ্গেরীমঠ, আর শারদামঠের অধীন তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়, গোবর্ধনমঠের অধীন বন ও অরণ্য সম্প্রদায়, জ্যোতির্মঠের অধীন গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায় এবং শৃঙ্গেরীমঠের অধীন সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় থাকবে। সন্ন্যাসীদের এই দশ সম্প্রদায় চার মঠের অধীন থেকে ঐ সকল মঠের নিয়ম ও নির্দেশানুসারে ধর্মানুষ্ঠান ও প্রচার করবে।"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসগুরু পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরী। সেই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা গুরুপরম্পরাক্রমে পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরী সম্প্রদায়ের মূল মঠ শৃঙ্গেরীতে। শৃঙ্গেরীমঠের তথা পুরী সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কামাক্ষী। কামাক্ষীদেবীর মন্দির রয়েছে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিপুরমে। সেখানে দেবীর ষোড়শী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। আচার্য শঙ্কর সেখানে শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যন্ত্রোপরি এক মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং দেবীর বিধিসম্মত নিত্যপূজার প্রবর্তন করে যান।

আগেই বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পুরী সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কামাক্ষী। যাঁর অপর নাম ষোড়শী, ত্রিপুরাসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী বা শ্রীবিদ্যা। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, "দক্ষিণ-ভারতে এই শ্রীবিদ্যার উপাসনা বিশেষ প্রচলিত। বঙ্গদেশে যে উপাসনা প্রচলিত তাকে বলা হয় কালীকুলের উপাসনা। আর দাক্ষিণাত্যের যে উপাসনা তাকে বলা হয় শ্রীকুলের উপাসনা।"[১৬] আচার্য শঙ্কর যে-দেবী শ্রীবিদ্যাকে কামাক্ষী নামে কাঞ্চিপুরমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শৃঙ্গেরীমঠে তিনিই বিরাজমানা শ্রীযন্ত্রে, মঠের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে। আর তাঁকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এ-যুগে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীরূপে জীবন্ত প্রতিমাতে, ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে সতত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবেন বলে। এখানেই পূজার পূর্বউল্লেখিত আপাতদৃষ্ট ব্যতিক্রম দুটির সামঞ্জস্য এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করবার সার্থকতা।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মন্তব্য আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।…এ জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!"[১৭] কাজেই এই মহাপূজায় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীরূপ জীবন্ত প্রতিমা যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, তাতে সন্দেহ নেই। বিচিত্র পূজার বিচিত্র প্রতিমা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এত সব চিন্তা করে কোন পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী ষোড়শী পূজা করেননি। আর করবেনই বা কিরূপে? "ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনে প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন কার্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ-সাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্রবুদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট

১৫ আচার্য শঙ্কর, স্বামী অপূর্বানন্দ, পৃঃ ২৩৩

১৬ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ফলহারিণী-কালী পূজার তাৎপর্য, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, উদ্বোধন শ্রাবণ, ১৩৮৫

১৭ শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১৫০

বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন।"[১৮] কাজেই শ্রীভগবানের ইচ্ছায় স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এ-সব ঘটেছে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকলেও তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই যে বিশেষ তাৎপর্যবহ তার অন্যতম নিদর্শন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করার ঘটনা। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে যেমন তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী বিচিত্র সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন, অপরদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন শ্রীবিদ্যাস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে। তাই ফলহারিণী কালীপূজার দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে বিশেষ তাৎপর্যবহ একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় বরণীয় দিন।

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ৩৮৯

তোমার এই বিশ্ব-রচন

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

সুপরিচিত বর্ষীয়ান্ কবি।

তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন,
নাহিকো ইহার কোনই ভুবনে অন্য কারণ।
　বিরাজো বিশ্বমাঝে—
　কত কি রূপের সাজে,
আমারে ডাকছো শুধু বিথারি' কোটি নয়ন!
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন!

তোমারি কৃপা দিয়ে এ ধরা আছে ভরা,
সবারি মাঝে গো তাই দিতেছ নিত্য ধরা!
　তুমি গো কবির কবি,
　রচিছ কতই ছবি,
মিটাতে সকল অভাব করিছ সুধা-সেচন!
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন!

রয়েছ স্থলে জলে, রয়েছ নভোতলে,
রয়েছ দুঃখে সুখে, রয়েছ অশ্রুজলে,
　রয়েছ আলোর রূপে,
　আড়ালে চুপে চুপে,
তোমারে জানার তরে অরূপে রূপ-ধারণ
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন!

আছ গো সকল ব্যাপি' প্রাণেরি পরশ দিয়ে,
আছ গো মিলন-মেলায় সবারে সঙ্গে নিয়ে!
　আছ গো বিশ্বমূলে,
　জীবনের নদী-কূলে,
আছ গো বাড়িয়ে সদা তোমারি শরণ-চরণ!
তোমারে পাব বলেই তোমার এই বিশ্ব-রচন!

জ্ঞান মহারাজ প্রসঙ্গে

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক

লেখক দীর্ঘকাল স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ জ্ঞান মহারাজের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভে ধন্য।

মহাজনসংশ্রয় বা সাধুসঙ্গ আমাদের মনকে ভগবৎমুখী করে, মহৎ জীবনদর্শন আমাদের অন্তর-চেতনায় সঞ্চিত থেকে ধীরে ধীরে আমাদের মনের নির্মলতা সাধন করে। মহাজন-সংসর্গের স্মৃতি তাই আমাদের জীবনপথে বৃক্ষচ্ছায়া। পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজের দুর্লভ সঙ্গলাভের ভাগ্য আমার হয়েছিল। তারই স্মরণ-মনন উদ্দেশ্যে আজকের এই নিবন্ধ।

সে আজ অনেকদিনের কথা। পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী তখন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ। কয়েকজন বন্ধু মিলে মঠে গেছি। পুরাতন মঠ-বাড়ির নিচে গঙ্গার দিকে 'ভিজিটরস্ রুমে' চুপ করে বসে আছি। এমন সময় একজন সাধু সেখানে এলেন। পরনে গেরুয়া কিন্তু খালি গা, চোখমুখে বেশ একটা তেজের ভাব। হাতে কতগুলি ছোট বই। আমাদের কাছে এসে কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বই পেয়েছেন?' 'না' বলায় আমাদের হাতে একটি করে বই দিয়ে চলে গেলেন। মনে প্রশ্ন জাগল এই তেজস্বী সাধুটি কে? পরে জেনেছিলাম, ইনি স্বামীজীর শিষ্য—বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর উপদেশ সংকলন করে পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সকলকে বিলি করেন। পুস্তিকাটির উপর লেখা ছিল,—প্রকাশক ব্রহ্মচারী জ্ঞান।

তারপর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। তখন মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ। তাঁর কাছে একদিন অনেকের সঙ্গে বসে আছি; হঠাৎ তিনি বললেন, "জ্ঞানের সঙ্গে আলাপ আছে? জ্ঞানের সঙ্গে আলাপ করে তবে যাবে।" তাঁর কথামতো গিয়ে দেখি পুরাতন মঠবাড়ির উঠানে জ্ঞান মহারাজ পায়চারি করছেন। গেরুয়াপরা, চোখে চশমা, হাতে লাঠি। সামনে যেই গিয়েছি প্রণাম করব বলে, উনি পিছন ফিরলেন। আবার সামনাসামনি হতেই উনি ঘুরে গেলেন। কিছুক্ষণ এমনি করার পর সুযোগমতো তাঁকে প্রণাম করতেই বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আমাকে প্রণাম করবেন বলে কি আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি? কেন প্রণাম করলেন? বলুন।' বললুম, 'আপনি সাধু, আপনাকে প্রণাম করলে কল্যাণ হবে, তাই।' তখন মহারাজ অতি আপনজনের মতো আমার কাঁধে হাত দিয়ে মিষ্টি করে বললেন, 'এই আমিও আপনাকে স্পর্শ করেছি, আমার কল্যাণ হোক্।'

এমনি করে মহারাজের সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর তাঁকে কতভাবে কতরূপে দেখেছি, কত নিবিড় করে পেয়েছি। তাঁকে বেশি পেয়েছি স্বামীজীর ঘরের ঠিক নিচের সেই রোয়াকে, গঙ্গার দিকে এক কোণে, যেখানে বসে তিনি নিয়মিত ভক্তসঙ্গ করতেন। বলতেন, 'এখানে আমি অনেকদিন ধরে বসেছি। কত চিন্তা করেছি। সন্ধ্যার সময় এখানে বসে থাকি, আর ওপারে মন্দিরে পূজা আরতি হয়, শাঁখ কাঁসর ঘণ্টার বাজনা শুনতে পাই। মনে হয় যেন কাশী। স্বামীজী মঠ প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন, "গঙ্গার পশ্চিমতীরে মঠ হ'লো।

গঙ্গার পশ্চিম কূল
বারাণসীর সমতুল।" '

জ্ঞান মহারাজের মুখে শুনেছি, তিনি একান্ত মাতৃ-অনুগত ছিলেন। কৈশোরে মাতৃবিয়োগ হলে সমস্ত জীবন বিষাদ হয়ে গিয়েছিল—তীব্র বৈরাগ্য, সংসার আর ভাল লাগে না। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল 'উদ্বোধন' পত্রিকায় স্বামী

বিবেকানন্দের নাম, তিনি তাঁর কাজের জন্য বাংলার বলিষ্ঠ যুবকদের আহ্বান করেছেন। মহারাজ পথের সন্ধান পেলেন। একবার ঘর ছাড়লেন—কিন্তু বাবা ফিরিয়ে আনলেন। তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন। এবার সোজা আলমোড়ার পথে—স্বামী বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায়। অনশনে, অর্ধাশনে, অতিকষ্টে যখন আলমোড়ায় পৌঁছলেন তখন তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন। তীব্র শীত, বরফ ও ঠাণ্ডায় শরীর অসাড়—মাদার সেভিয়ার গরম দুধ খাইয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন।

পূজ্যপাদ বিরজানন্দ মহারাজের কাছে খবর পেলেন স্বামীজী বেড়াতে বেরিয়েছেন ঘোড়ায় চেপে,—এখনই ফিরবেন। তিনি বললেন, 'তুমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথায় ছাতা ধরে নিয়ে এস।' জ্ঞান মহারাজ আদেশ পেয়েই এগিয়ে চললেন, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘোড়ার পিঠে স্বামীজী। বিস্তৃত বক্ষ, উন্নত ললাট, তেজোদৃপ্ত নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, হাতে লাগাম, —ঠিক যেন রাজপুত্র। অভিভূত জ্ঞান মহারাজ ইতি-কর্তব্য ঠিক করতে না করতেই স্বামীজী কাছে এসে পড়েছেন, চলন্ত ঘোড়ার লাগামটা তক্ষুণি তিনি ধরে ফেললেন। স্বামীজীও টপ করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। স্বামীজী স্পর্শ করলেন জ্ঞান মহারাজের বুকে হাত দিয়ে। সেইভাবে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে স্বামীজী তাঁকে বললেন, 'কিরে বিয়ে করতে চাস না বলে পালিয়ে এসেছিস ?' মহারাজ স্তম্ভিত; ভাবলেন, ইনি কি অন্তর্যামী ? এই ঘটনাটি উল্লেখ করে পরবর্তী কালে জ্ঞান মহারাজ এক ভক্তকে দীক্ষার তাৎপর্য বুঝিয়েছিলেন—'দেখুন, দীক্ষা শুধু অনুষ্ঠান বা কানে মন্ত্র ফোঁকা নয়। কত রকমে হয়—চিন্তায়, ছুঁয়ে, দেখে, দীক্ষা হয়ে যায়। সে এক-আধ মিনিটের ব্যাপার। এই সময়টুকুর মধ্যে এমন কিছু গুরুর কাছে পাওয়া যায় যা আজীবন বুকের কাছে ধ্যানের বস্তু হয়ে বেঁচে থাকে। তা স্মরণ হলে ভাব, শক্তি জেগে ওঠে।' এই বলে তিনি আরও বলেছিলেন, 'স্বামীজী আমার বুকে হাত রেখে স্পর্শ করেছিলেন, আজও তা মনের মাঝে সজীব হয়ে আছে। I feel that touch even now.'

কিছুদিন বাদে জ্ঞান মহারাজ বেলুড় মঠে চলে এলেন ও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগ দিলেন। রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, প্রেমানন্দ স্বামী ও সারদানন্দ স্বামী প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদদের ভালবাসার মধ্যে পুষ্ট হতে লাগল তাঁর সাধক জীবন ও ভাবধারা। ত্যাগ, তপস্যা ও স্বাবলম্বন হল তাঁর ব্রত। নিজের জন্য কারও কাছে কিছু চাননি। এমন কি পরমবস্তু যে মন্ত্রদীক্ষা, তাও নয়। স্বামীজী হঠাৎ একদিন তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, 'জ্ঞান, দীক্ষা নে।' পরে কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান মহারাজ একদিন জনৈককে বলেছিলেন, 'কি বললেন ? অমুক আপনার হাতে চাঁদা পাঠিয়েছেন ? বলেছেন, আমি চেয়েছিলুম ?' এই বলে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কই দিন।' তারপর, 'এখন এটা কার ? আমার তো ? আমি এটা আপনাকে দিচ্ছি, তাঁকে দেবেন। আর বলবেন যে, আমি জীবনে কারও কাছে কোনও দিন চেয়ে কিছু নিই নি। ভালবেসে নিজে ইচ্ছে করে যে যা দিয়েছে। এমন কি মন্ত্ররূপ পরমবস্তু, তাও চেয়ে নিই নি।'

স্বামীজী জ্ঞান মহারাজকে বলেছিলেন, 'তুই আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবি। সংসারীরা এসে তোর কাছে ত্যাগ বৈরাগ্য শিখবে। তোকে সন্ন্যাস নিতে হবে না।' আমরা মহারাজকে দেখেছি ব্রহ্মচারীর বেশে, মাথায় শিখা, গলায় পৈতে। কিন্তু গেরুয়া পরতেন। সেই প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, 'মা-ঠাকরুনের বাড়ি থেকে

সেবার এসেছি, কৌপীন ও আধখানি কাপড় মাত্র সম্বল। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "জ্ঞান, স্নান করবে না?" বলেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কাপড় আছে?" আমি চুপ করেছিলুম। তিনি তাঁর গেরুয়াবস্ত্র একখানি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আমি দিচ্ছি, তুমি পর।" সেই থেকে গেরুয়া পরি।'

জ্ঞান মহারাজের বাবার অনুরোধে স্বামীজী একবার তাঁকে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দেন। ফিরে আসতে তাঁর একদিন দেরী হয়েছিল। স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে পাঠালেন—'ছোঁড়াটাকে' দেখে আসতে। পূজ্যপাদ নিরঞ্জন মহারাজ যাচ্ছেন জ্ঞান মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে,—তিনিও আসছিলেন। পথে দেখা হলে দুজনে একসঙ্গে ফেরেন। নিরঞ্জন মহারাজ আগে গিয়ে স্বামীজীকে বললেন, 'এনেছি'। জ্ঞান মহারাজ বললেন, 'আমি নিজেই এসেছি।' স্বামীজী জ্ঞান মহারাজকে দুইহাতে জড়িয়ে বুকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। স্বামীজী একবার প্রিয় সন্তান জ্ঞানকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সকলে সব জায়গায় বিজয় আকাঙ্ক্ষা করে। আমি চাই আমার শিষ্যরা আমার চেয়ে বড় হবে।'

স্বামীজীর ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে জ্ঞান মহারাজ বলতেন, 'যখন বকতেন চোখ দিয়ে জল বার করে ছাড়তেন, আবার ভিতরে এমনি ভালবাসা ছিল যে, মা-বাপের ভালবাসাও সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়।'

একেবারে স্বামীজীময় ছিলেন জ্ঞান মহারাজ। একদিন বলেছিলেন, 'দেখুন, এখন লোকের কত ভিড়-ভাড়। স্বামীজীর শরীর থাকলে তাঁর সঙ্গে আর কতটুকু দেখা হত? কিন্তু এখন দেখার বিরাম নেই। চোখ চেয়ে দেখছি, চোখ বুজে দেখছি, দাঁড়িয়ে দেখছি, শুয়ে দেখছি, যত বলি তার চেয়ে বেশি দেখছি।'

উপরে স্বামীজীর ঘর। তারই নিচের ঘরে জ্ঞান মহারাজ থাকতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, 'স্বামীজীর ঘরের নিচে পড়ে আছি। গুরুকে ঘরমে গোকা মাফিক্ পড়ি রহো।'

এক সময় কয়েকটি ছেলে নিয়মিত স্বামীজীর মন্দিরে যেত। সেখানে তারা আপন মনে জপ ধ্যান করে যে যার বাড়ি চলে যেত। একদিন পথে জ্ঞান মহারাজ তাদের দেখতে পেয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি রোজ এখানে আসেন? মঠে কোনও সাধুর সঙ্গে আলাপ আছে?' তাদের উত্তর শুনে বুঝলেন তারা স্বামীজীর ভাবেই মগ্ন—অন্য কোনও দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। তখন তিনি ভাবের সঙ্গে বলেছিলেন, 'ওরে তোদের ডেকে ডেকে আর কত আলাপ করব? তোরা নিজে কি আসতে পারিস না?' মহারাজ যে কতদূর আনন্দে অভিভূত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন তা আমরা কতকটা বুঝতে পারি তাঁর 'তুই' সম্বোধন দেখে। সাধারণতঃ মহারাজ ছোট বড় সবাই-কেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন।

একবার মহারাজের কাছে একজন প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি স্বামীজীর শিষ্য?' মহারাজ উত্তর দেন, 'একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার কি দরকার জেনে? দোহাই আপনার, জোড় হাত করছি, গুরুর দোহাই দিয়ে আমাকে জাহির করবেন না। আমাকে দেখে, আমার কাজ দেখে, আমায় যা বোঝেন, আমি তাই। "তিনি" যা ছিলেন তিনি তাই। এ শালার মধ্যে কি স্বামীজীর "স" খুঁজে পাচ্ছেন?'

বলরাম মন্দিরে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ তখন অন্তিম শয্যায়। জ্ঞান মহারাজকে ইসারা করে নিজের কাছে ডেকে বললেন, 'জ্ঞান, এক কাজ করতে পারবে?' জ্ঞান মহারাজ বললেন, 'কেন পারব না, আশীর্বাদ করুন।' বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, 'ভক্তসেবা'। এই সেবা জ্ঞান মহারাজ তাঁর সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কি ভাবে যে করতেন, তা কথায় বলা যায় না।

জ্ঞান মহারাজ সম্বন্ধে স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত যেন শেষ কথাটি বলে গেছেন। একদিন আমাদের ডেকে বলেছিলেন, 'জ্ঞান বিরক্ত সাধু। মুক্ত পুরুষ। জ্ঞান কি জানিস? A single drop in the ocean, seeking another drop, loses itself.'

'শ্রমিকগণ—সমান অধিকার অর্জন করুন'

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

বেথুন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। স্বামী বিবেকানন্দ ও
ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক বিশিষ্ট গবেষিকা।

বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য একখানি সম্প্রতি-প্রকাশিত ছোট বই—Proletariat! Win Equal Rights।* পুস্তিকাটি স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনাবলী হতে সঙ্কলিত। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দ শোষিত শ্রমজীবীদের স্বাধিকার অর্জন ও আগামী সমাজে তাদের প্রাধান্যলাভ সম্পর্কে যে-সকল অগ্নিস্রাবী বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলি একত্রিত করে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন প্রকাশক অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনন্যানন্দজী। তাঁর সুলিখিত নিবেদনটি ও মনীষী সন্ন্যাসী স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর মুখবন্ধটি পুস্তিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। আজকের সমাজের অগ্নিময় প্রশ্ন—শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার লাভ বিষয়ে স্বামীজীর এই উক্তি সঙ্কলনকে অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজ স্বাগত জানাবেন সন্দেহ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পপরিসর ঝটিকার মতো চলমান জীবনে সবকিছু বলেছেন সূত্রাকারে। তাঁর বক্তব্য সেজন্য বিশ্লেষণ ও ভাষ্যের অপেক্ষা রাখে। দেশে বিদেশে বহু গবেষক আজ এ কাজে ব্যাপৃত। রোমাঁ রোলাঁ এ বিষয়ে বহু আলোকসম্পাত করেছেন, অধ্যাপক Horrwitz অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁকে এদেশে সমাজতন্ত্রবাদের জনক বলে অভিহিত করেছেন, সম্প্রতি রুশ দেশের চেলিশেভ ও চীনের হুয়াং কিম চুয়াং তাঁকে মানুষের মুক্তির বার্তাবহ চিন্তানায়ক রূপে অভিহিত করেছেন। দুঃখের বিষয় এদেশে কোন কোন লেখক ভাষ্যকার তাঁর বাণীর ভাষ্য রচনায় অতিরিক্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করছেন যা বাঞ্ছনীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা মিত্র কৌটিল্য রচিত 'বিবেকানন্দের বিপ্লব-চিন্তা' গ্রন্থের উল্লেখ করতে পারি। গ্রন্থকার ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় বলছেন—"স্বামীজীর মতে, মানব সমাজে চার রকম শোষণ দেখা যায়। প্রথমত, জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যে শোষণ।···দ্বিতীয়ত, অস্ত্রশক্তির সাহায্যে শোষণ।···তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক শোষণ। চতুর্থত, সংগঠিত শক্তির জোরে শোষণ করা।" এ প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁর Vedanta and Privilege শীর্ষক ভাষণে যা বলেছেন তা হল নিম্নোক্তরূপ—"Of course, there is first, the brutal idea of privilege, that of the strong over the weak.···There is the privilege of wealth. If a man has more money than another, he wants a little privilege over those who have less. There is still subtler and more powerful privilege of intellect because one man knows more than others, he claims more privilege. And the last of all, and the worst, because the most tyrannical, is the privilege of spirituality." [অবশ্য প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের

---

* Proletariat! Win Equal Rights—Swami Vivekananda. Published by Advaita Ashrama, Mayavati, Himalayas, pp, 12+68; Price: Rupee One.

চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী, তাহাদের উপর সে একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অধিকার-লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য সে অধিকতর সুবিধা দাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ইহা নিকৃষ্টতম, কেননা ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক। (বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৭-৩৮)]

স্পষ্টতঃই স্বামীজী শারীরিক শক্তির তারতম্য, ধনবৈষম্য, বুদ্ধি ও বিদ্যার তারতম্য ও আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশেষ সুবিধার দাবী—যার ভিত্তিতে সাধারণ ও দরিদ্রকে মানবসমাজে শোষণ করা হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। মিত্র কৌটিল্যের বর্ণনায় স্পষ্টত: স্বামীজীর উক্তির সঠিক বর্ণনা নেই। মিত্র কৌটিল্যের গ্রন্থে এরূপ পরিবর্তন আরও করা হয়েছে কোথায়ও বা স্বামীজীর বক্তব্য আরও সেকুলার করে দেখানোর জন্য, কোথাও বা আধুনিকতম সমস্যার সমাধানকল্পে। বস্তুত স্বামীজী অত্যন্ত সেকুলার। বিনয় সরকার তাঁকে, 'Father of modern materialism in India' বলে অভিহিত করেছেন। আর অতি আধুনিক সব সমস্যা সম্বন্ধেই স্বামীজী আলোকপাত করেছেন। এজন্য স্বামীজীর মূল বক্তব্যে কোনও পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন হয় না। সবচেয়ে বড় কথা এরকম পরিবর্তন করা অত্যন্ত অন্যায়। এতে আমরা সত্যচ্যুত হব, স্বামীজী ছিলেন সত্যের পূজারী—নগ্ন সত্য যেরূপই হোক তিনি তাকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন, অন্য কোন কিছু নয়। স্বামীজীর প্রতিটি কথাই সত্যোপলব্ধি প্রসূত, তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি কথাই গভীর অর্থবহ। তাকে বিকৃত করা অপরাধ, আমাদের তা করার কোনও অধিকার নেই। স্বামীজী যদি কোন কথা না বলে থাকেন, সেও ভাল। তবুও তাঁর বলা কথার কোনও পরিবর্তন করা কখনও উচিত নয়। সত্যের অপলাপ কখনও করা উচিত নয়।

এরূপ যথেচ্ছ পরিবর্তন ঘটানোর অপপ্রয়াস বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বামীজীর নিজস্ব উক্তিগুলি অবিকৃত ভাবে জনসমাজের নিকট উপস্থাপিত করা। আলোচ্য সঙ্কলন পুস্তিকাটির সেদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এজন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা এটি সঙ্কলিত করে এ প্রয়োজন মেটাতে অগ্রসর হয়েছেন।

আমাদের দেশে স্বামীজী হলেন প্রথম সমাজতন্ত্রবাদী,—Karl Marx-এর চিন্তা এ-দেশকে প্রভাবিত করেছে তার অনেক পরে—পূজনীয় রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ তাঁর মুখবন্ধে সুভাষচন্দ্রের এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি চিঠিতে ঘোষণা করেন—"I am a Socialist not because I think it is a perfect system but half a loaf is better than no bread." (p.8) ১৮৯৯-তে তিনি 'বর্তমান ভারত' বা 'Modern India' রচনা করেন। তাতে তিনি স্পষ্টত: বলেন, —"সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪১)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের কিছু পরে স্বামীজী সমগ্র ভারত পরিভ্রমণে বের হন। অর্থ স্পর্শ করবেন না এই প্রতিজ্ঞার জন্য দীর্ঘ পথ তাঁকে পদব্রজে ভ্রমণ করতে হয়, যার ফলে তি নি

সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। তিনি তাদের আতিথ্য গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে বাস করে তাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ সমস্যা, দারিদ্র্য, উচ্চ শ্রেণী কর্তৃক শোষণ, নিপীড়ন, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক সংগঠন—সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। এই সময় ইংরেজ শাসকদের ভূমি-রাজস্ব নীতির ফলে ভারতে শতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটে চলেছিল, যার ফলে ক্ষুদ্র চাষী ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছিল। অপরদিকে বিদেশী আধুনিক কারখানা শিল্পের প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটির ও ছোটবহরের শিল্পগুলি অবক্ষয়ের পথে চলেছিল, ফলে দলে দলে একদা শিল্পনির্ভর মানুষ শহর থেকে গ্রামে চলে গিয়ে ভূমিনির্ভর হয়ে পড়ে ভূমির উপর জনচাপ বৃদ্ধি করছিল। এইরকম নানাভাবে অর্থনৈতিক শোষণের সমন্বিত ফল হয়েছিল দারিদ্র্যের প্রসার। ইংরেজ শাসকবর্গের এই অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে যুক্ত ছিল অভিজাত জমিদার ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী কর্তৃক শোষণ ও নিপীড়ন, যার ভিত্তি ছিল বর্ণবৈষম্য। অপরদিকে ভূমিহীন কৃষকদের একাংশ শহরে এসে নব-প্রতিষ্ঠিত কারখানা শিল্পে শ্রমিক হিসাবে যোগদান করে। তাদের মধ্যেও ধূমায়িত হচ্ছিল ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। এই সমস্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে বিবেকানন্দ গণ-মানসের তলদেশ অবধি প্রত্যক্ষ করবার সুবর্ণ সুযোগ পান যা এদেশে অন্য কোন সংস্কারক তখন পাননি। বিবেকানন্দের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের স্মৃতিচারণায় লিপিবদ্ধ করেছেন, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মতোই বিবেকানন্দের ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে ছিল পরিপূর্ণ দখল। এ সকলের সমন্বিত ফলে, বিশেষ করে জনজীবনের মহাগ্রন্থ থেকে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তারই ফলে তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন :

১। শ্রমশক্তিই সমাজ-জীবনের মূল শক্তি যার ভিত্তিতে সভ্যতা গড়ে ওঠে (১ম পৃঃ ১ম উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

২। ভারতীয় শ্রমিকদের নীরব অবদানই ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, পারস্য, ইংলণ্ড, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি সভ্যতার মূলে রয়েছে।

৩। কোন কালেই শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের পূর্ণ মূল্যের সম পারিশ্রমিক পায়নি (p.1)। বৈশ্যযুগে তাদের অবস্থা মৌমাছির মতো। তারা শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করে, কিন্তু ধনবান হয় বৈশ্য বা ধনিক শ্রেণী (Modern India, C.W. Vol. IV P. 466) এ বিষয়ে 'বর্তমান ভারতে'র উদ্ধৃতিটি এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলে এটি আরও সমৃদ্ধ হত। উদ্ধৃতিটি হল যেন বৈশ্য শ্রেণী বলছে—

"এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে ?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৯) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ এখানে পূর্ণ উদ্ঘাটিত।

৪। পূর্ব পূর্ব কালে সমাজের প্রাধান্যে এসেছে সমাজের অপর ৩টি শ্রেণী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রমান্বয়ে, বর্তমানে শূদ্রগণের প্রাধান্য ঘটতে চলেছে—বৈশ্য প্রাধান্যের অবসানে।

৫। অন্যান্য শ্রেণীশাসনের অবসানের কারণ শ্রমজীবী জনগণ হতে তাদের বিচ্ছিন্নতা, বিশেষ অধিকার দাবী ও জনগণকে বঞ্চিত ও শোষিত করা। স্বামীজী এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বর্তমান ভারত' (Modern India) গ্রন্থে যা বলেছেন

তা নিম্নোক্তরূপ—

"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪২-৪৩)

এ কথাগুলিও আলোচ্য পুস্তিকার অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে।

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে স্বামীজী ধনতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে যে সকল কথা বলেছেন সেগুলি অতি সুন্দরভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী পাশ্চাত্যে প্রথম পদার্পণ করে পাশ্চাত্যের ধনোৎপাদন দক্ষতায় মুগ্ধ হন, পরবর্তীকালে ধনতন্ত্র ও তার শেষ পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর স্বরূপ লক্ষ্য করে ঘৃণায় কঠোর সমালোচনা করেন। ধনতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে তিনি বলেন—"The wealth and power of a country are in the hands of a few men who do not work, but manipulate the work of millions of human beings. By this power they can deluge the whole earth with blood." (p. 5)। [দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হাতে; তাহারা নিজেরা কোন কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাবলে তাহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে। (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫০)]

ধনিকেরা অপরের শ্রমের ফল লুণ্ঠন করে, নিজেরা শ্রম করে না—এ কথাটি এখানে সুন্দররূপে পরিস্ফুট। এই শ্রম-দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য হতে মুনাফা লাভের জন্য তাদের চাই বিদেশের বাজার এবং তা কুক্ষিগত করবার জন্য তাদের প্রয়োজন হয় সাম্রাজ্য বিস্তারের, অপর দেশকে পদানত করে রাখার। তারই জন্য তাদের প্রয়োজন যুদ্ধ করার। সাধারণ শ্রমিকেরা শুধু তাদের শ্রমের ফল হতেই বঞ্চিত হয় না, তারা অন্য দেশ জয়ের জন্য ও সেগুলিকে পদানত করে রাখার জন্য যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়, পরাজিত দেশের সাধারণ মানুষেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়। ধনতন্ত্র যখন এরূপ পরিণত সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয় তখন তার যা রক্তস্নাত ভয়াবহ স্বরূপ তা উদ্‌ঘাটিত করে স্বামীজী বলেন—

"যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের

ঘর ভরে ধনধান্য আসবে।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬২)

মনে রাখতে হবে লেনিন তখনও তাঁর Imperialism গ্রন্থের স্বপ্নও বোধ হয় দেখেননি। অথচ বিবেকানন্দ তার সারকথা এখানে আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন!

যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনগণ এভাবে শোষিত হয়, সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে গণতন্ত্র মিথ্যায় পর্যবসিত বিবেকানন্দ সে সত্যটিও উদ্ঘাটিত করে বলেন—"পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় 'শাইলকে'র শাসনে পরিচালিত হইতেছে। আপনারা যে প্রণালী-বদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেন্ট-মহাসভা প্রভৃতির কথা শোনেন—সেগুলি বাজে কথামাত্র।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১)

ধনতান্ত্রিক সমাজে যে গণতন্ত্র দেখা যায় তা নামেই গণতন্ত্র, কার্যত সেখানে সব অধিকার ও ক্ষমতা ধনিক বা "Shylock"দের করায়ত্ত, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা কোন অধিকারই ভোগ করতে পারে না। বিষয়টি উদ্ঘাটিত করে তিনি আরও বলছেন—"ও তোমার 'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬১) [ক্রমশঃ]

আশীর্বাদঃ

(স্বামী বিবেকানন্দের 'A Benediction' কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ)

স্বামী জীবানন্দ

প্রয়াত অনুবাদক উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন,—সুকবি ও লেখক।

ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশ্যে রচিত শ্রীশ্রীস্বামীজীর মূল আশীর্বাণীটি নিম্নরূপ :

The mother's heart, the hero's will,
The sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars, flaming, free;
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before—
Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one.

সঙ্কল্পো বৈ সুদৃঢ়হৃদয়ে বীরলোকস্য পৃথ্ব্যাং
স্নেহস্নিগ্ধং শুচিসুখময়ং মাতৃচিত্তং সুদিব্যম্।
প্রাণস্পর্শী মধুরপবনো দক্ষিণস্যা দিশো বৈ
বেদিস্থাগ্নৌ মুনিগণচিতে শুদ্ধহোমপ্রদীপ্তিঃ॥
যৎসৌন্দর্যং তদপি সততং পূর্ণশৌর্যেণ সাকং
স্বপ্নাতীতং হৃদি যদপি তৎ সর্বকালে ভবেত্তে।
একাধারে ভব ভুবি সুহৃৎ সেবিকা ত্বঞ্চ ধাত্রী
সন্তানানাং হিতসুখকৃতে ভারতে ভাবিনাম্॥

তারাদের কথা ও কাহিনী

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গণিতাধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থান : মফস্বল শহরের ছোট এক বাড়ি।

কাল : সন্ধ্যাবেলা

পাত্র-পাত্রী : এক মধ্যবিত্ত পরিবারের চার জন—বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে।

মেয়ে : (দুলে দুলে ইংরেজী কবিতা পড়ছে)

Twinkle twinkle little star

How I wonder what you are.

(হঠাৎ লোড্ শেডিং)

ছেলে : যা:, আবার গেল! এ রকম রোজ রোজ আলো নিভে গেলে পড়াশুনা করা যায়?

বাবা : চল্, সবাই মিলে বাইরের বারান্দায় বসি গে।

মেয়ে : (আকাশের দিকে তাকিয়ে) চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এলে আকাশটা কি সুন্দর দেখায়! তাই না বাবা?

বাবা : হ্যাঁ। ছাখ্, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা ভাল দিক আছে। লোড্ শেডিংয়ের খারাপ দিকটা আমরা সবাই জানি। সেটা বিশদ বলার দরকার করে না। কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আজকাল দেখতে পাচ্ছি। আমরা আকাশের দিকে তাকাতে বাধ্য হচ্ছি। আপন পরিবারের ছোট গণ্ডীর বাইরে বড় কিছুর দিকে তাকাতে শিখছি। নিজের নিজের ছোট ছোট সুখ, দুঃখ, স্বার্থ ভুলে কিছুক্ষণের জন্য আমরা নক্ষত্র-খচিত আকাশের অপার্থিব সৌন্দর্যের মুখোমুখি হচ্ছি। এটা কম লাভ নয়।

(কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ)

মেয়ে : বাবা, একটা ধাঁধা বল তো?

"এক থালা সুপারী

গুণতে না পারে ব্যাপারী।"

ছেলে : আমি এর উত্তর জানি। বলব? তারা। আকাশের তারা। আচ্ছা বাবা, তারার সংখ্যা কি সত্যিই গুণে শেষ করা যায় না?

বাবা : ঠিক তা নয়। জ্যোতির্বিদরা গুণে দেখেছেন যে, আমাদের নক্ষত্রজগতে মোট দশ হাজার কোটি তারা রয়েছে।

মেয়ে : দ—শ—হা—জা—র—কো—টি। এত তারা খালি চোখে দেখা যায়?

বাবা : তাই কখনও যায়? খালি চোখে আমরা মাত্র ছ হাজার তারা দেখতে পারি। তার মধ্যে দিগন্তের কাছের তারাগুলো দেখার একটু অসুবিধা হতে পারে। আর তাছাড়া একই সঙ্গে পৃথিবীর ওপরের আকাশের ও নিচের আকাশের তারাও তো দেখা সম্ভব

নয়। সুতরাং কোন বিশেষ জায়গা থেকে বিশেষ সময়ে আমরা খালি চোখে ছ হাজারের বেশি তারা দেখতে পাই না। খালি চোখের দৃষ্টি সীমানার বাইরের তারাগুলো দেখতে হলে সাহায্য নিতে হবে দূরবীনযন্ত্রের।

ছেলে : দূরবীন দিয়ে কি এই দশ হাজার কোটি তারা চোখে দেখা সম্ভব ?

বাবা : না, তা সম্ভব নয়। দূরবীন দিয়ে আমরা মাত্র তিনশ কোটি তারা চোখে দেখতে পাই।

ছেলে : বাকী তারাদের যদি দূরবীন দিয়ে চোখেই দেখা না যায়, তাহলে তাদের খবর পাওয়া গেল কি করে ?

বাবা : দূরবীন দৃষ্টির অতীত তারাদের আলো সাধারণত এত ক্ষীণ যে দূরবীনে তাদের ধরা যায় না। তখন জ্যোতির্বিদরা দূরবীনের সঙ্গে ক্যামেরা লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঐ তারাদের ফটো তুললেন। ক্যামেরার প্লেট থেকে সন্ধান পাওয়া গেল কোটি কোটি তারার।

ছেলে : সেদিন সন্ধ্যায় কলেজের অব্‌জারভেটরীতে দূরবীনে চাঁদ দেখলাম। কি বিরাট, বিশাল দেখাল। চাঁদের ভিতরের গর্তগুলো পর্যন্ত কি পরিষ্কার দেখা গেল। অথচ দূরবীনের মধ্যে দিয়ে যখন তারা দেখলাম সেটা তো বিরাট বড় করে দেখা গেল না ? সেটা ছোটই দেখা গেল। এর কারণ কি ?

বাবা : কারণ, তারাগুলো এত দূরে রয়েছে যে, তাদের বড় করে দেখানোর জন্ম আমাদের সবচেয়ে জোরালো দূরবীনও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাই তারাগুলো বিন্দুর মতো দেখায়।

ছেলে : দূরবীন যদি তারাদের আয়তন বাড়াতেই না পারে, তবে তার দরকারটা কি ?

বাবা : তারাদের আয়তন বাড়াতে না পারলেও দূরবীন তাদের ঔজ্জ্বল্যের তীব্রতা বাড়ায়। সুতরাং দৃষ্টিগোচর তারার সংখ্যাও বাড়ায়।

মেয়ে : আচ্ছা, বাবা, তোমরা যে এই তারার সম্বন্ধে এত কথা বলছ, সেই তারা জিনিসটা কি ?

বাবা : তারাগুলো আমাদের সূর্যের মতোই এক একটি প্রকাণ্ড জলন্ত গ্যাসের গোলা।

ছেলে : এই গ্যাসের মধ্যে কি কি উপাদান আছে ?

বাবা : প্রধানতঃ হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। প্রতিটি তারার মধ্যেই চলছে এক দুর্নিবার প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। এর থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বিপুল তেজ আর সেই তেজই তারাগুলোকে অপরিসীম দীপ্তিমান করে রাখছে।

(রান্নাঘরের কাজ সেরে মা এসে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন)

মা : খুকী যে ইংরেজী কবিতাটা পড়ছিল, রান্নাঘর থেকে সেটা শুনছিলাম। সত্যি, আকাশের তারাগুলো সব সময়েই ঝিকমিক করে কেন বল তো ? এটা কি ওদের আলোর নিজস্ব কোন গুণ বা ধর্ম ?

বাবা : না। চৌবাচ্চার জলের মধ্যে একটা লাঠি ডুবিয়ে একটু হেলানোভাবে ধর, দেখবে, জলের মধ্যে লাঠিটা একটু বাঁকা দেখাচ্ছে। জল ও বায়ুর ঘনত্ব পৃথক বলে আলোর গতিপথ বায়ু থেকে জলে ঢোকার সময় দিক পরিবর্তন করে। ফলে লাঠিটা বাঁকা

দেখায়। এই গতি পরিবর্তনকেই আলোর প্রতিসরণ (Refraction) বলে। এখন তারার আলো-কে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ঘনত্বের স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়। আসার সময় প্রতিসরণের ফলে তারা থেকে আসা আলোর গতিপথ বদলে বদলে যায়। আমাদের চোখে একটা ঝিকিমিকির অনুভূতি জাগে। আমরা যদি বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে আটশ মাইল উঁচুতে উঠতে পারতাম, তবে দেখতাম তারারা আর ঝিকমিক করছে না, শান্ত, স্থির, আলো দিচ্ছে।

আচ্ছা এবার আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করছি। আমরা আকাশে নানারঙের, নানাবর্ণের তারা দেখছি। কারও রঙ নীল, কারও বা সাদা, কারও হলদে, আবার কারও বা লাল। এটা কি করে হয় বল তো?

মা : আমরা মেয়েরা তো বেশির ভাগ সময় রান্নার আগুনের কাছেই বসে থাকি। তার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে-তারার তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি সেটা হয় নীল রঙের, আর যার তাপমাত্রা সবচেয়ে কম সেটা লাল রঙের হয়।

বাবা : বাঃ ঠিক বলেছ তো তুমি। পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রার তারতম্যের জন্যই তারাদের এই রঙের বৈচিত্র্য। তোমার জলন্ত স্টোভের তাপমাত্রা যেখানে পাঁচশত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড সেখানে আকাশে এমন সব তারাও আছে যাদের তাপমাত্রা ত্রিশ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশি। তাদের রঙ নীল। কুড়ি হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রার তারা হয় নীলাভ সাদা। তাপমাত্রা কমতে কমতে দশহাজার ডিগ্রী হলে তারার রঙ ধবধবে সাদা হয়। তারাদের ভিড়ে এরা যেন নবীন যুবার দল। হলদে রঙের তারার তাপমাত্রা আরও কম—ছয় হাজার ডিগ্রী। এরা যেন সব প্রৌঢ় তারার দল। আমাদের সূর্য এদের মধ্যে পড়ে। তেজের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ করে বার্ধক্যের শেষ দশায় এসে ঠেকেছে কমলা এবং লাল রঙের তারাগুলি। তাদের তাপমাত্রা যথাক্রমে চার হাজার ও তিন হাজার ডিগ্রী মতো। আকাশে অবশ্য সাদা ও কমলা রঙের তারার সংখ্যাই বেশি।

ছেলে : আকাশে দেখছি সব তারার উজ্জ্বলতা সমান নয়। কোন তারা কি সুন্দর দপ্‌দপ্‌ করে জ্বল জ্বল করছে। আবার কোন কোন তারা ম্লান, মিটমিট করে জ্বলছে।

বাবা : এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, তারার যে উজ্জ্বলতা আমাদের চোখে পড়ে সেটা কিন্তু তার আসল উজ্জ্বলতা নয়। সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়াতে আমরা যখন রাস্তার ধারের আলোকস্তম্ভগুলি দেখি, তখন কাছের আলোগুলো দূরের আলো থেকে উজ্জ্বলতর লাগে, যদিও জানি আলোকস্তম্ভগুলি সব সমান উজ্জ্বল।

আমরা জানি তারারা সবাই সমান দূরে নয়। আসল উজ্জ্বলতা কম এমন ম্লান তারা আমাদের কাছাকাছি থাকলে তাকে চোখে উজ্জ্বল দেখাতে পারে আবার অনেক দূরের সত্যিকার উজ্জ্বল তারাও চোখে অনুজ্জ্বল দেখাতে পারে। তারাদের যে আপাত উজ্জ্বলতা আমাদের চোখে পড়ে, আমরা এখন শুধু তার কথাই বলব।

প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদরা খালি চোখে যে সব তারা দেখতে পেতেন, উজ্জ্বলতা

অনুসারে তাদের ছয়ভাগে ভাগ করেন। সূর্যাস্তের পরেই সন্ধ্যার আকাশে সর্বপ্রথম যে তারাগুলি ফুটে উঠতে দেখলেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। এদের বলা হল প্রথম প্রভার তারা। তেরশ ফুট দূরে অবস্থিত একটা বড় মোমবাতিকে যে রকম উজ্জ্বল দেখায়, প্রথম প্রভার তারা সে রকম সমান উজ্জ্বল। এরপর আকাশে যে তারাদের উদয়—তাদের বলা হল দ্বিতীয় প্রভার তারা। তারপর ক্রমান্বয়ে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভার তারার উদয়। খোলা চোখে ষষ্ঠ প্রভার থেকে ম্লানতর কোন তারা দেখা সম্ভব নয়। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রথম প্রভার তারা দ্বিতীয় প্রভার তারা অপেক্ষা আড়াইগুণ উজ্জ্বল। দ্বিতীয় প্রভার তারা আবার তৃতীয় প্রভার তারা থেকে আড়াইগুণ উজ্জ্বল—এই রকম।

ছেলে : তার মানে প্রভার মাপ যত বাড়বে, উজ্জ্বলতা তত কমবে।

বাবা : হ্যাঁ। প্রাচীনেরা যে-তারাদের উজ্জ্বলতম ভেবেছিলেন, তার থেকেও উজ্জ্বলতর তারা আকাশে আছে, কিন্তু সেগুলো তাঁদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল।

ছেলে : তাহলে যে-তারার ঔজ্জ্বল্য প্রথম প্রভার তারার আড়াইগুণ, তাকে কোন্ প্রভার তারা বলা হবে ?

বাবা : তাকে শূন্য প্রভার তারকা বলতে হবে। আবার যে তারাটি আরও আড়াইগুণ বেশি উজ্জ্বল তার প্রভা হল বিয়োগ এক অর্থাৎ –১। খালি চোখে যে ছ হাজার তারা দেখা যায় তার মধ্যে কুড়িটা প্রথম প্রভার, পঞ্চাশটা দ্বিতীয় প্রভার, দেড়শ তৃতীয় প্রভার, দেড় হাজার পঞ্চম প্রভার এবং চার হাজার ষষ্ঠ প্রভার তারা।

ছেলে : অর্থাৎ তারারা যত বেশি ম্লান হচ্ছে, তাদের সংখ্যাও তত বেশি হচ্ছে।

বাবা : হ্যাঁ। এই হিসাবে সূর্যের প্রভা বিয়োগ ছাব্বিশ দশমিক আট আর পূর্ণিমার চাঁদের প্রভা বিয়োগ বারো দশমিক ছয়।

এতক্ষণ তারাদের যে উজ্জ্বলতার কথা বলা হল, তা একান্তই চাক্ষুষ বা আপাত উজ্জ্বলতা, সত্যিকারের উজ্জ্বলতা নয়। কেননা তারারা সবাই সমান দূরের নয়। এখন এটাও জানা প্রয়োজন যে বিভিন্ন তারা সমান দূরে থাকলে তাদের আসল উজ্জ্বলতা কি রকম হত। তবেই তো দুটো তারার উজ্জ্বলতা তুলনা করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন যে, পৃথিবী থেকে ১৯২×১০^{১২} মাইল দূরে থাকলে তারাদের যে প্রভা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে, তাকেই বলা হবে প্রতি তারার ঔজ্জ্বল্যের পরম মাত্রা। প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের এটাই হবে মাপ। এই হিসাবে সূর্যের পরম মাত্রা দাঁড়াবে চার দশমিক আট।

মেয়ে : তুমি বললে তারারা সমান দূরে নয়। কিন্তু তারারা কতদূরে থাকে ? কেমনভাবেই বা সে দূরত্ব মাপা হয় ?

বাবা : ছোটখাটো কিছু মাপতে গেলে—যেমন বই, বাক্স, বা ঘরের দৈর্ঘ্য, ইঞ্চি বা ফুটের মাপ হলেই চলে যায়। কিন্তু বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে যেমন কলকাতা থেকে দিল্লীর দূরত্ব মাপতে গেলে মাইল বা কিলোমিটারে হিসাব করতে হবে। ইঞ্চি বা ফুট দিয়ে হিসাব করতে গেলে আমরা দিশাহারা হয়ে যাব। এখন তার থেকে অনেক অনেক

বেশি দূরত্ব মাপতে হলে আমরা মাপের কোন্ একক ব্যবহার করব? আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে ঘরের তারাটি কে? সে এমন এক আশ্চর্য জাতের তারা, যাকে আমরা রাতের আকাশে দেখি না, তার সন্ধান মেলে দিনের আকাশে।

ছেলে : সেই তারাটি হল সূর্য।

বাবা : পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হল ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। সূর্যের পর আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী থাকে ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে। অসীম দূরত্বের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এই সব তারার দল। শূন্যের এই দীর্ঘ সারি কাগজের পাতার বিপুল জায়গা জুড়ে অঙ্কের বোঝাকে দুর্বহ করে তুলল। তাই জ্যোতির্বিদেরা দৈর্ঘ্যের বড় এককের সন্ধানে বেরুলেন।

তারাদের সঙ্গে আমাদের যোগ-সম্বন্ধ হয় চোখ দিয়ে। তারা থেকে আকাশ পেরিয়ে আলো এসে আমার চোখে পড়ে, তবেই তো আমি তাকে দেখতে পাই। দেখা যাচ্ছে আলো পথ চলে এবং চলে সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে। প্রচণ্ড ও অবিশ্বাস্য এই গতিকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরত্বের এককের ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলেন। ঐ বেগ নিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছয় আট মিনিটে। তাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বলতে পারি আট আলো মিনিট। এক বছরে আলো যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ অষ্ট আশি হাজার কোটি মাইল তাকে বলা হল এক আলোকবর্ষ। সূর্যের পরই নিকটতম তারার দূরত্ব দাঁড়াল এই হিসাবে চার আলোকবর্ষ। এই আলোকবর্ষই এখন তারার দূরত্ব মাপার একক হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।

মা : তাহলে আজ আকাশে যে ঐ তারাটিকে দেখছি সে আসলে চার বছর আগেকার তারা। ওর আলো চার বছর আগেই যাত্রা শুরু করে আজ এখানে পৌঁছল। তাহলে এই মুহূর্তে ওই তারাটা ওখানে নাও থাকতে পারে?

বাবা : সে তো বটেই, এমন কি এই মুহূর্তে ওই তারাটি যদি কোন কারণে নিভে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায় তবে সে খবরও জানতে পারব আরও চার বছর পরে।

মেয়ে : তার মানে আকাশে এমন তারাও থাকতে পারে, যার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারেনি বলেই আমাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। কী মজার না?

বাবা : আমরা দেখলাম, একটা তারার থেকে আর একটা তারার কত দিক দিয়েই না তফাত —রঙে, দীপ্তিতে, দূরত্বে। আবার আয়তনের দিক থেকেও তারারা পরস্পর থেকে কত না আলাদা।

ছেলে : সূর্যের থেকেও বড় তারা কি আকাশে আছে?

বাবা : হ্যাঁ। আয়তন অনুসারে তারাদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—মহাদানব, লালদানব, প্রধান পর্যায়, আর শ্বেতবামন। এই শ্রেণীবিন্যাসে সূর্যের আয়তনকে মাপের একক ধরা হয়েছে।

মেয়ে : আচ্ছা বাবা, সূর্যের আয়তন কি রকম? পৃথিবীর থেকে কত বড়?

বাবা : তা ধর, সূর্য পৃথিবীর থেকে প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। সূর্যের ব্যাস যেখানে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল সেখানে পৃথিবীর ব্যাস হল মাত্র আট হাজার মাইল। এখন সাধারণভাবে বলা চলে যে তারার পৃষ্ঠতাপ যত বেশি, তার উজ্জ্বলতাও তত বেশি। আবার যে তারার পৃষ্ঠতাপ যত কম তার ঔজ্জ্বল্যও তত কম। যে সব তারা এই নিয়ম মেনে চলে তাদের "প্রধান পর্যায়ের তারা" বলে। এদের আয়তন মাঝারি, সূর্যের মতোই মোটামুটি আয়তন সবার। আকাশের শতকরা আশিটি তারা এই শ্রেণীতে পড়ে। সূর্যও তাদের মধ্যে একজন। যে সব তারার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা খুব কম অথচ সেই তুলনায় উজ্জ্বলতা অনেক বেশি, স্বাভাবিকভাবেই তাদের আয়তন হতে হয় প্রকাণ্ড যাতে বিশালায়তন দেহের সম্মিলিত আলোকের দরুন তারা খুব উজ্জ্বল দেখাতে পারে। এই তারাদের ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে ১০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। বর্ণে লাল ও আকৃতিতে বিরাট বলে এদের বলা হয় লালদানব। এদের চেয়েও বড় তারাদের বলা হয় মহাদানব।

ছেলে : এরকম তারাও কি আকাশে আছে যাদের উপরিতলের তাপমাত্রা খুব বেশি হওয়া সত্ত্বেও উজ্জ্বলতা অনেক কম।

বাবা : নিশ্চয়ই। এর কারণ এদের আয়তন অত্যন্ত ছোট। সূর্যের ব্যাস থেকে এদের ব্যাস অনেক ছোট। বর্ণে সাদা ও আকারে ছোট বলে এদের বলা হয় শ্বেতবামন। কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা আয়তনে ছোট হলেও অন্যান্য তারার তুলনায় শ্বেতবামনের ওজন কিন্তু খুব বেশি। এমন শ্বেতবামনও আছে যার ছোট দেহের মধ্যে বিপুল পরিমাণ বস্তু আছে এবং সেই বস্তুর ঘনত্ব জলের চেয়ে ৬০,০০০ গুণ বেশি। এর বস্তু পদার্থ দিয়ে একটা দেশলাই বাক্স ভরলে তার ওজন হত ৫০ মণের কাছাকাছি।

ছেলে : এ তো আমাদের কল্পনারও অতীত। আমাদের জানা সবচেয়ে ভারী জিনিস হল প্ল্যাটিনাম, তার ঘনত্ব জলের চেয়ে আরও ২৪ গুণ বেশি।

বাবা : তাহলেই বোঝ। নাও এখন আর কোন কথাবার্তা নয়। অনেক রাত হয়েছে। আজ এই পর্যন্তই রইল। এবার ঘরে চল। আবার পরে হবে। [ক্রমশঃ]

কিসের দ্বারা প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়? এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন-কি প্রকৃতি নিজেও জড়—অচেতন। উহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য করিতেছে—সমুদয়ই বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ এবং অচেতন। মন, মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি—এ-সবই অচেতন। কিন্তু এগুলি এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যিনি এই সবের অতীত, আর সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ ইহাকেই 'পুরুষ'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। জগতের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে যে সকল পরিণাম হইতেছে, এই পুরুষ সেগুলির সাক্ষিস্বরূপ কারণ, অর্থাৎ এই পুরুষকে যদি বিশ্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

রোমাঁ রোলাঁর একখানি পত্র

(জাঁ এরবেরকে লেখা)

স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ গ্রন্থের জাঁ এরবের (Jean Herbert)-কৃত ফরাসী অনুবাদ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রোমাঁ রোলাঁর পত্রখানি ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধ স্বরূপ সন্নিবিষ্ট। মূল ফরাসী পত্রখানিকে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করেছেন স্বামী বেদরূপানন্দ এবং পরে বঙ্গানুবাদ করেছেন ব্রহ্মচারিণী অজিতা।

ভিলন্যভ্, ভিলা অল্‌গা

প্রিয় মহাশয়,

বিবেকানন্দের বাণী ফরাসী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গুরুতর সংকটময় যন্ত্রণা-জর্জর এ-যুগে এই বাণীর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ-বাণী আমাদের বহু সমস্যার সমাধানের পথ দেখায়।

প্রথমতঃ এ-বাণী আনে যুক্তিতে বিশ্বাস। এ-বাণী সেই সব ধর্মীয় মতবাদের মতো নয় যা আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, আর নির্ভর করে এমন সব নীতির উপর যার মূলে কেবল অযৌক্তিকতা ও অবাস্তবতা। এ-বাণী মানবমনের ঋজুতা ও শক্তির উপর বিশ্বাসের বাণী।

'মানুষের মহিমা তার মননশীলতায়'......

বিবেকানন্দের বাণীর এমন এক ঔদার্য আছে যে, সত্যানুসন্ধানের বিবিধ উপায়ের কোনটিকেই তা অগ্রাহ্য করে না। এ-বাণী সবগুলিকেই গ্রহণ করে, সকলকেই আলিঙ্গন করে ভ্রাতৃপ্রেমে। এ এমন এক বিশ্বজনীনতা যার মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে থাকে বিজ্ঞান ও ধর্ম, ঘোর অবিশ্বাসী এবং ঈশ্বরদ্রষ্টা। অসহিষ্ণুতা ছাড়া এর আর কোন শত্রু নেই।

এ-যুগের মানুষকে যে-সব সমস্যা উদ্বেজিত করছে, এবং বিভেদ নিয়ে আসছে,—বিশেষতঃ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে যে-সব সমস্যা, তার প্রত্যাশিত উত্তর আমরা পাই এই বাণীতে। 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ' পড়তে পড়তে ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির বিমুগ্ধ প্রশংসা করছিলাম,—অজান্তেই এর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সাম্যবাদের মহান প্রবক্তাদের বলিষ্ঠ যুক্তি। 'সকলের মাঝে যিনি বাঁচেন, একমাত্র তিনিই বাঁচেন।'—বিবেকানন্দের এই মহৎ বাণীকে মার্কস ও লেনিন উভয়েই স্বকীয় বলে মেনে নিতে পারতেন।

এঁরা কেউ যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী হন, তবে তা হল আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যই। বিবেকানন্দ বলেছেন—'যদি ব্রহ্মের (Absolute) কথা বলা হয়, লোকে আতঙ্কিত হয়। তারা জিজ্ঞেস করে—আমার ব্যক্তিসত্তার কি পরিণাম হবে? এদের "ব্যক্তিসত্তা" বস্তুটি কি তা আমি দেখতে চাই। বস্তুতঃ পৃথক ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু নেই। আমরা কেউ এখনও ব্যক্তি নই। আমরা ব্যক্তিসত্তা লাভের আপ্রাণ প্রয়াসমাত্রই করে চলেছি, আর তা হল চৈতন্যময় পরম ব্রহ্ম, যাতে আমাদের যথার্থ প্রকৃতি নিহিত। তিনিই একমাত্র জীবিত যিনি সর্বভূতে আপনাকে অনুভব করেন। এই বিশ্বজগতে যখন আমরা অপরের মধ্যে বাঁচি সেটিই হল প্রকৃত জীবন।'

মহান স্বামীজী পরমসত্তার সঙ্গে মানবের একাত্মতা—সেই বিশ্বজনীন একত্বকে—সেই সত্যকে স্বয়ং উপলব্ধি করেছেন। সত্য তাই,—যা নিত্য এবং ক্রিয়াশীল।

'মিশি সত্যে যাও এক হয়ে,
মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক—
কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার,
আর থাক প্রেম নিরবধি।'

ভিলন্যুভ্, 　　　　　　(স্বাক্ষর) রোমাঁ রোলাঁ
ডিসেম্বর, ১৯৩৫

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীমতী উমাশশী বসু

ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর দৌহিত্রী (কৃষ্ণময়ীর কন্যা), শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের দুর্লভ সান্নিধ্যে ধন্যা। এটি তাঁর লিখিত রচনা নয়—স্মৃতিচারণা থেকে শ্রুতলিখিত।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি আমার অনেক ছোট বয়স থেকে। আমি তখন কত ছোট তা মনে নেই। মা বাগবাজারের বাড়িতে আসতেন; থাকতেন,—বড়মা, দিদিমা সকলের সঙ্গে গল্প করতেন। একটা খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। 'মা' বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন আর অনেক লোক তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে একে একে প্রণাম করছেন। আমারও তাই দেখে ইচ্ছে হয়েছিল ঐ রকম ফুল দিয়ে প্রণাম করব, আমি এগিয়ে এসে অন্য একজনের দেওয়া একটি লাল পদ্ম দিয়ে প্রণাম করতে গেলুম। মা বললেন, "ওটি আর দিও না, এমনিই কর।"

আর মনে আছে, শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে আসবেন বাগবাজারে, যোগীন-মা বাইরে এসে বসে আছেন। মা এলেন। আমরা প্রণাম করলুম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরে গেলেন। মা থাকতেন ভেতরের ঘরে।

এত ছোট থেকে এতবার শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি তখন জানতুম না তার কি মূল্য। এখন যখন সবাই শুনতে চায় তখন বলি। আমারও তাতে ধ্যান হয়—সেই পাদপদ্ম দুখানি স্মরণ করতে কোনও অসুবিধে হয় না।

একদিন দুপুরবেলা শ্রীশ্রীমা দিদিমার সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। আমি বসে মা'র চুলগুলি ফুলিয়ে দিচ্ছিলুম। আমার হাতে কতকগুলি চুল উঠে এসেছিল, দিদিমা বলেছিলেন, "ওগুলি রেখে দে।" আমার দুর্ভাগ্য, তা আর রাখা হয়নি। কি করলুম মনে পড়ে না।

আমার দীক্ষা হয় আমার বিয়ের পর। প্রায় ১৫।১৬ বছর বয়সে। আমার বাবা আমায়

শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আমার দীক্ষা হয় এই মায়ের বাড়িতে। মায়ের ঐ ঘরটিতে।

সেদিন চারজনের দীক্ষা হয়েছিল। আমরা গঙ্গায় চান করে মায়ের বাড়ি গেলুম। আমার দিদিমা আমাদের নিয়ে গেছলেন। শ্রীশ্রীমা একজন একজন করে ডেকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। নিজেই ফুল দিলেন, জল দিলেন, দীক্ষা দিয়ে নিজেই নিজের শ্রীচরণ ছুটি পূজা করালেন। কে আগে কে পরে নিয়েছি, তা আর এখন মনে নেই। তাঁর কৃপায় সেই চরণ দুটি এখনও চোখ বন্ধ করে দেখতে পাই—কোনও অসুবিধে হয় না। আমার এক মাসী তখন ছোট, সে এসে মায়ের দরজার সামনের চৌকাঠে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বললে, "মা ওদের তুমি দীক্ষা দিলে আমাকে কেন দেবে না?" সে ছোট ছিল বলে মা তাকে তখন দেবেন না বলেছিলেন। কান্না দেখে, নিজেই এসে তাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "কেন দেব নারে?" এখন ভাবি, ও মার কাছে নিজে কেঁদে চাইল, আর আমি তো নিজে ইচ্ছে করে ওরকম কিছুই চাইনি,—অমৃতসাগরে আমার দিদিমা ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। ঐ মাসীরও (রাজলক্ষ্মী বসু) সেদিন দীক্ষা হয়।

আর মনে পড়ে, শ্রীশ্রীমাকে দেখতে গেছি বড়মা ও দিদিমাদের সঙ্গে। তখন উদ্বোধনের বাড়ি হয়নি। বাগবাজারে অন্য একটা বাড়িতে মা ছিলেন। মায়ের কাছে লক্ষ্মীদিদি ছিলেন, যোগীন-মা গোলাপ-মা সবাই ছিলেন। সেদিন লক্ষ্মীদিদি একটি বাক্স থেকে পেশোয়াজ ইত্যাদি সাজ-পোষাক বের করে, সেগুলি পরে আমাদের নেচে গান শুনিয়েছিলেন। তিনি পরম ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর গান পরে আরও একবার শুনেছিলুম বাগবাজারেই। আমার বোন উষার স্বামী মারা যাওয়ার পরে আমি বাগবাজারে এসে ছিলুম কিছুদিন। লক্ষ্মীদিদির গানের দুটি লাইন এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে—

ঠমকি ঠমকি রাধা চলে যায়।
চমকি চমকি চারিদিকে চায়॥

শ্রীশ্রীমাকে কতবার দেখেছি, কিন্তু কথা কিছু বলতে পারিনি। শুধু চেয়ে দেখতুম। একবার মাত্র কথা বলেছিলুম সেই উদ্বোধনের বাড়িতে, কি জানি কেন। মা ঐ উদ্বোধনের দোতালায় তাঁর ঘরে পা দুখানি ছড়িয়ে বসেছিলেন। আমরা আর মা'র কি সেবা করেছি! উনি তো নিজেই উঠতেন, শিকে থেকে মিষ্টি পেড়ে দিতেন, জল গড়িয়ে দিতেন, পান দিতেন। আবার কখন গাল টিপে আদর করে বলতেন, "মুখখানি শুকিয়ে গেছে।" সব সময়ে এমনিই তো হত। মাকে সেবা করার সুযোগই পাইনি। সেদিন কি ভাগ্যি বললুম, "না মা আপনি উঠবেন না, আপনি বসুন, একটু আপনাকে দেখি।" মনে পড়ছে, মায়ের শ্রীচরণে হাত বুলিয়েছিলুম। ভক্তি ছিল না আমার। কিছু ভক্তি করে সেই পাদপদ্ম পাইনি। তাঁর অহৈতুকী কৃপা…।

স্বামীজী

স্বামীজীকেও দেখেছি। রাজা মহারাজের সঙ্গে আমাদের ছোটদের খুব ভাব ছিল,—তাঁকে আমার একটুও ভয় করত না। কিন্তু স্বামীজীকে আমার খুব ভয় করত। খুব বড় বড় চোখ, এটা বেশ ভালই মনে আছে। তিনি খুব লম্বা ছিলেন না—গায়ের রঙ্ ছিল ফর্সা, আর বড় বড় টানা চোখ। তখন যেটা ভয় ভাবতুম, এখন মনে হয় তা ঠিক ভয় নয়—বরং সমীহ। বোধহয় ওঁর চেহারা দেখলে একটা সমীহ আপনিই আসত। একবার মনে আছে, আমার মামাবাবু ওঁর সঙ্গে বাগবাজারে ওপরের হলে বসে গান গাইছেন—

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা
বম্ বব বাজে গাল।

একবার স্বামীজীর কাছে স্যাণ্ডুইচ খেয়েছি। বলরাম মন্দিরের বড় ঘরে স্বামীজী স্যাণ্ডুইচ খাচ্ছিলেন। আমাকে হাতে ভেঙে দিয়েছিলেন। আমি নিয়ে বারান্দায় গিয়ে খাচ্ছি, স্বামীজীর সামনে খেতে লজ্জা আর ভয় করতুম তো। আর মহারাজ দেখতে পেয়েছেন—উনি এসে বললেন, "কিরে, কিসের হাড় চিবোচ্ছিস?" মহারাজের ঐরকমই মজার কথা ছিল।

একবার বেলুড় মঠে বেড়াতে গেছি। স্বামীজী সবুজ চা খাচ্ছিলেন, আমাকে কাছে ডেকে একটা কাপে একটু ঢেলে দিলেন। আমিও বাইরে গিয়ে প্রসাদ খেলুম। সব সাধুদের সঙ্গেই বেশ কথা বলতুম, স্বামীজীর সঙ্গে কিন্তু তেমনটা পারা যেত না। কিসের যেন ভয় এসে পড়ত। আমি তাঁর চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। কত লোক আসতেন বাগবাজারে, কত কথা আলোচনা হত। আমি তখন খুবই ছোট, কিছু বোঝার মতো বুদ্ধি ছিল না। একবার মনে আছে, একজন জাপানী (পরে জেনেছি ওকাকুরা) এসে স্বামীজীর সঙ্গে ভাত খাচ্ছিলেন ছুটো কাঠি দিয়ে, আমি দূরে দাঁড়িয়ে খুব অবাক হয়ে দেখছিলুম।

আরও একবার বড়মা (স্বামী প্রেমানন্দের মা); দিদিমা সকলের সঙ্গে মঠে গেছি। স্বামীজী বড়মাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠাকুরঘর ইত্যাদি সব দেখাচ্ছিলেন মনে আছে। আগেই বলেছি, বাগবাজারের বাড়িতে মানে বলরাম মন্দিরে খুব সভা সমিতি হত। স্বামীজী ছিলেন। একবার এক সভায় লম্বা চওড়া চেহারা—খোঁচা খোঁচা চুল একজন সাহেবকে দেখে খুব অবাক লাগছিল। আমার এক মামা ছিলেন টুকুমামা,—আমি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, উনি কে? ছেলে না মেয়ে?" শুনলুম মেয়ে—'অভয়ানন্দ' নাম।

আর একবার বাগবাজারে বলরাম মন্দিরের সদরে খুব গোলমাল। স্বামীজী একটি অল্পবয়সী ছেলেকে খুব বকছেন,—অন্য মহারাজরা ঘিরে আছেন। কিন্তু তাঁকে কেউ কিছু বলবেন, এমন সাহস তাঁদের কারও ছিল না। ছেলেটাকে বকেছেন বলে আমার মনও খুব খারাপ হয়েছিল সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা বাইরের ঘরে উঁকি মেরে দেখি, স্বামীজী সেই ছেলেটিকে দিয়ে, সব সাধু মহারাজরা বসে আছেন তাঁদের সবাইকে প্রণাম করাচ্ছেন—"ওঁকে প্রণাম কর"—এইরকম বলছেন। অনেক দিন পরে আমার বোনপোর কাছে শুনলুম, সেই ছেলেটি স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন দত্ত। স্বামীজীর আর একটি ছবি মনে পড়ে: স্বামীজী বাগবাজার বাড়ির সামনে ল্যাণ্ডো গাড়িতে উঠছেন। স্বামীজী, সিস্টার নিবেদিতা ও আর একজন সাধু। পরে জেনেছি তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দ। স্বামীজী তখন দ্বিতীয় বার আমেরিকা যাচ্ছেন। আমি তখন খুবই ছোট, বারান্দার রেলিঙের ওপরে মাথা যায় না। নিচ দিয়ে দেখছি।

আর একবার রাজা মহারাজ আমায় একদিন বললেন, "মঠে যাবি?" আমি মাকে জিজ্ঞেস করে গেলুম। সারাদিন মঠে রইলুম। স্বামীজীর ঘরেও একবার গেছলুম। স্বামীজী খাটের ওপর বসে,—ডাক্তার দাদার সঙ্গে (ডাঃ বিপিন বসু) কথা বলছিলেন। সন্ধ্যার আগে মহারাজ গিরিশবাবুর সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকেও তো খুব ভয় করতু—কী লম্বা চওড়া চেহারা গম্ভীর মানুষ! [ক্রমশঃ]

আন্ত্রিক রোগ

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

কলিকাতা 'স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনে'র ভূতপূর্ব পরিচালক ও ভাইরলজি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার ভাইরাস রোগ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য।

সম্প্রতি গত এপ্রিল থেকে সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই 'আন্ত্রিক রোগ', অথবা 'আমাশয়' এই শিরোনামায় পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিনে কতজন আক্রান্ত, কতজন মৃত, এই জাতীয় পরিসংখ্যানমূলক সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় লোকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি হতে চলেছে। এর কারণ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যাপারে সরকার ও জনগণের উৎকণ্ঠার সীমা নেই, কিন্তু এগুলির সম্বন্ধে বহু রকমের মতামত প্রকাশিত হওয়ায় বেশ খানিকটা বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে গরমের প্রকোপ, পানীয় জলের অভাব, লোডশেডিং (load-shedding) চলতে থাকায় এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের এই কালীন আমাশয় রোগের প্রকোপ না জানায়, ঠিক সমস্যাটির রূপ প্রথমে ধরা যাচ্ছিল না। সে যাই হোক, আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এবং আক্রান্ত অঞ্চলের বিস্তৃতি বিবেচনা করলে রোগটিকে মহামারীই বলতে হবে। 'আন্ত্রিক রোগ' বলতে কি বুঝায়, কি কি কারণে এবং কিভাবে এই রোগের সৃষ্টি হয়, এগুলির একটু ধারণা থাকলে সাধারণের পক্ষে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার মোকাবিলা করা সহজ হবে।

মুখ থেকে আরম্ভ করে মলদ্বার পর্যন্ত যে একটানা খাদ্যনালী আছে, তার পাকস্থলীর নিম্নভাগ হতে মলদ্বার পর্যন্ত অংশকে 'অন্ত্র' (চলতি কথায় নাড়িভুঁড়ি) বলে। এটি লম্বায় ২৬।২৭ ফিট। এর বিভিন্ন অংশগুলি যথাক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্র (ডিওডিনাম, জেজুনাম, আইলিয়াম), বৃহদন্ত্র (সিকাম, ঊর্ধ্বগামী কোলন, আড়াআড়ি কোলন, নিম্নগামী কোলন, সিগময়েড কোলন), মলনালী বা রেক্টাম এবং মলদ্বার। অন্ত্রের কাজ হল খাদ্য পরিপাক করা এবং পরিপক্ক খাদ্যের উপকারী খাদ্যরস রক্তের মধ্যে টেনে নেওয়া। অন্ত্রের যে কোন অংশের রোগকে আন্ত্রিক রোগ বলা যেতে পারে। তবে সাম্প্রতিক আন্ত্রিক মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য নানারূপ আন্ত্রিক রোগ—কলেরা, কৃমিজনিত রোগ, টিউমার—এসব বাদ দিয়ে, আমাশয় রোগ নিয়েই আলোচনা হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে সচরাচর হজমের গোলমাল, পাতলা দাস্ত প্রভৃতি আন্ত্রিক রোগে বহুলোক ভোগেন। এঁদের দাস্ত পরীক্ষা করলে কারণ হিসাবে অনেকের (বিশেষতঃ পল্লীবাসীর) কৃমিজাতীয় পরজীবি (হুকওয়ার্ম, রাউণ্ডওয়ার্ম, জিয়ার্ডিয়া প্রভৃতি) ধরা পড়ে, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সেরকম কিছু পাওয়া যায় না। শেষোক্তদের অনেকে 'কোলাইটিস' (Colitis—বৃহদন্ত্রের প্রদাহ) রোগী, কারও কারও বা মানসিক কারণে পেটের গোলমাল।

আমাশয়—বৃহদন্ত্রে প্রদাহ ও ঘা হওয়ার ফলে এই রোগের সৃষ্টি। এতে বারে বারে পাতলা দাস্ত, জ্বর এবং পেট কনকনানি থাকে। মলে আম বা মিউকাস (mucus—অন্ত্রের গ্রন্থিরস) এবং কম-বেশি রক্ত থাকে। শুধু চোখে রক্ত দেখা না গেলেও অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকণিকা দেখা যায়। এদেশে আমাশয় সাধারণত দুই প্রকার: (১) ব্যাক্টিরিয়া (Bacteria) বা জীবাণুঘটিত, যার নাম ব্যাসিলারি (Bacillary) আমাশয় (২) অ্যামিবা (amœba—এককোষী ক্ষুদ্র

প্রাণী) ঘটিত। যদিও দ্বিতীয় প্রকার আমাশয়ে এদেশে বহুলোক ভোগে, কিন্তু বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে না। তাছাড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দাস্ত পরীক্ষা করলেই রোগনির্ণয় সহজেই হয়ে যায়।

ব্যাসিলারি আমাশয়: চলিত কথায় ব্যাকটিরিয়ার অপর নাম ব্যাসিলাস (Bacillus)। এই আমাশয়ের প্রধান কারণ যে জীবাণু সেটি শিগেলা (Shigella) শ্রেণীতে (Genus) পড়ে, যার তিনটি উপশ্রেণী (species) আছে—শিগা (Shiga), ফ্লেক্সনার (Flexner) এবং সোনি (Sonne)। এই আমাশয় পৃথিবীর সর্বত্র হয়, তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ও গ্রীষ্মকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। তাছাড়া, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলির যখন অভাব হয় (যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে), তখন এর প্রাদুর্ভাব বাড়ে। এই রোগের জীবাণুরা খাদ্য বা পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে বৃহদন্ত্রে বংশ বৃদ্ধি করে রোগসৃষ্টি করে। জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার এক থেকে সাত দিনের মধ্যে (অনেক ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টায়) রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দাস্তের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ জীবাণু বার হয়ে পানীয় জল বা খাদ্যকে দূষিত করে—কখনও মাছির পায়ে মল লেগে, কখনও বা শৌচের পর ভালভাবে হাত না ধোয়ার ফলে, আবার কখনও বা পানীয় জলের পুকুরে মললাগা বস্ত্রাদি ধোয়ার ফলে। এর মধ্যে শিগা উপশ্রেণীর জীবাণুরা (বিশেষ করে এদের দশ রকমের টাইপ বা প্রকারভেদের মধ্যে একনম্বর টাইপটি) মহামারী সৃষ্টি করতে পারে এবং এদের শরীর থেকে বিষাক্ত দ্রব্য টক্সিন (toxin) নির্গত হয়ে রক্তে মিশে রোগীকে কাবু করে ফেলে, এমন-কি মৃত্যুও ঘটাতে পারে। এই টক্সিন একদিকে স্নায়ুকে দমিত করে, অন্যদিকে উদরাময় করে। যদিও বিনা ওষুধে এই রোগ ভাল হওয়া সম্ভব, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অ্যাম্পিসিলিন (ampicillin) বা অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক অথবা সালফোনামাইড জাতীয় ওষুধের প্রয়োজন হয়। দাস্ত খুব বেশি হলে তার সঙ্গে লবণ ও ধাতব পদার্থ (electrolytes) বার হয়ে যায়, এবং সে ক্ষেত্রে রোগীকে ঐ জাতীয় পদার্থ-মিশ্রিত সরবত খাওয়ানো কর্তব্য। এই রোগে তিন চার মাস পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর হার খুব বেশি, তবে তিন চার বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের পক্ষেও এই জীবাণু সাংঘাতিক। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বার হওয়ার আগে শিশুদের মৃত্যুর হার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি ছিল। যদিও ভাল হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অধিক ক্ষেত্রে অন্ত্র জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়, কারও কারও ক্ষেত্রে শিগা জীবাণু দীর্ঘকাল অন্ত্রে থেকে গিয়ে পেটের গোলমাল (Chronic colitis) সৃষ্টি করতে পারে এবং দাস্তের মাধ্যমে জীবাণু ছড়াতে পারে (carrier state)।

পানীয় জল ফুটিয়ে নিলে বা তাতে জীবাণু-নাশক ওষুধ (যেমন ক্লোরিন) মিশিয়ে নিলে, শৌচের পর সাবান দিয়ে হাত ধুলে, খাদ্যে মাছি বসতে না দিলে, বাজারের খোলা খাবার না খেলে, এই আমাশয় হবার আশঙ্কা থাকে না। প্রায়ই অপরিষ্কৃত জল থেকে বরফ তৈরি হয়, এবং সেই জলে থাকা শিগা জীবাণু বরফের ঠাণ্ডায় ভালভাবে বেঁচে থাকে। দুধে বা আইসক্রীমে জীবাণুরা অনেকদিন বেঁচে থাকে।

'ফ্লেক্সনার' উপশ্রেণীর জীবাণুরাও আমাশয় রোগের সৃষ্টি করে, তবে এদের শিগার মতো মহামারী করতে দেখা যায় না। 'সোনি' জাতীয় জীবাণুরা উদরাময় সৃষ্টি করে।

এবার এই সাম্প্রতিককালের আন্ত্রিক মহামারীর কথায় আসা যাক। এর বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গেছে—(১) সাধারণ মহামারীতে

যেমন আরম্ভ ও বিস্তারের স্থানগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে সেরূপ নয়। (২) কারণ হিসাবে কেউ কেউ অন্য একটি জীবাণু নির্দেশ করেছেন—এন্ট্যারোপ্যাথজেনিক ই. কোলাই (enteropathogenic E. Coli)। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের সকলের অন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে ই. কোলাই (বা বি. কোলাই) বাস করে এবং এরা কিছু কিছু উপকারও করে; তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন কারণবশতঃ পরিবর্তিত হয়ে রোগকারক রূপ নেয়। এই পরিবর্তিত জীবাণু সাধারণত উদরাময় সৃষ্টি করে, আমাশয় নয়।

জীবাণু-জগতে দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে, হয়তো বা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য, তারা স্থায়ীভাবে রূপ-পরিবর্তন করে (variation)। রূপ পরিবর্তনের ফলে, পূর্বে যে অ্যান্টিবায়োটিক কাজে লাগত, তা কার্যকর হয় না, অথবা আগের রূপের বিরুদ্ধে রোগীর শরীরে যে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা (resistance)-র সৃষ্টি হয়েছিল, তা নূতন রূপের বিরুদ্ধে কার্যকর হয় না। যে শিগা জীবাণু পশ্চিমবঙ্গের মহামারীর কারণরূপে পাওয়া গিয়েছে, সেটিও চিরপরিচিত শিগার পরিবর্তিত রূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই জীবাণু নাকি আগে বাংলাদেশে বহুলোকের জীবন নাশ করেছে। সাদৃশ্য দেখে ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে, দুই বাংলায় লোকজনের যাওয়া আসার ফলে ঐ দেশ থেকেই এটি পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। তবে এই অনুমানের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। যাইহোক, 'অ্যান্টিবায়োটিক' কাজে লাগে না বললে বুঝায় যে, আগেকার কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক এখন কার্যকর নয়, অন্যপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে; অবশ্য তার জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন দরকার। তাছাড়া, সালফোনামাইড জাতীয় ওষুধ—যা আগে এই অসুখের প্রতিকারক ও প্রতিরোধক রূপে ব্যবহৃত হত, তা হয়তো এখনও সমানভাবে কার্যকর। যদি বাংলা দেশ থেকে এই নবরূপী শিগেলা পশ্চিমবঙ্গে এসে থাকে, তবে আশঙ্কা হচ্ছে যে, এটি এখানে থেকে যাবে (যদিও অন্যান্য নবাগত জীবাণুর মতো এর ভীষণতা ক্রমে ক্রমে কমে যাবে) এবং এখান থেকে আশপাশের প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে যাবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ যে ভাইরাস (Virus—জীবপরমাণু), কয়েক বৎসর আগে সেও হংকং-এ নূতন রূপ গ্রহণ করে সারা পৃথিবীতে মহামারীর সৃষ্টি করেছিল এবং বহুদেশে (ভারতেও) স্থায়ী বাসা বেঁধে ফেলেছে।

শিগা জীবাণু সম্বন্ধে এত আলোচনা সত্ত্বেও উল্লেখ করা দরকার যে, এইটিই যে আমাশয় মহামারীর কারণ বা একমাত্র কারণ, এ সম্বন্ধে আরও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। আর এই মহামারীর পরিসংখ্যানে 'আমাশয়' ছাড়া বহু গ্যাস্ট্রো-এন্ট্যারাইটিস (Gastro-enteritis) বা বহুবার পাতলা দাস্ত হওয়া রোগীও ঢুকে গেছে। অবশ্য এদের সবগুলিই 'আন্ত্রিক রোগ'।

ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ।...গরীবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারের খাদ্যদ্রব্যে কিছুই নেই, একদম উলটো আছেন বিষ—বিষ—বিষ।...খিদে পেলেও কচুরি জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আত্ম-জিজ্ঞাসা

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বেদের কর্মকাণ্ডে নানা যাগযজ্ঞের বিধান আছে। একদিন ভারতে এই কর্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করত। আজও আমাদের পূজার্চনা এই কর্মকাণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলতে উপনিষদ্ বুঝি। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি দ্বাদশ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-দর্শন পরবর্তীযুগে ভারতের চিন্তাধারা ও কৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় মন বাইর হতে অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতি থেকে বিশ্বের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সন্তুষ্ট না হয়ে অন্তর্জগতে অনুসন্ধান করতে শুরু করল, জড় থেকে চৈতন্যে। মানুষের প্রশ্ন—মৃত্যুর পর তাঁর অস্তিত্ব থাকে কিনা।' 'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে' (কঠ, ১।১।২০), অর্থাৎ কেউ বলে মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে, কেউ বলে থাকে না। হে যমরাজ! এর মধ্যে সত্য কি? এইভাবে খুঁজতে গিয়ে নিজের মধ্যে আত্মার সন্ধান পেল। উপনিষদগুলি আমাদের আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেয়। কী সেই বস্তু যাকে জানলে সব কিছু জানা যায়, 'কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।' 'উপনিষদের লক্ষ্য বহুর মধ্যে একত্বের আবিষ্কার—এই চরম জ্ঞান-লাভ। প্রথমে দ্বৈতবাদ, উপাসনার উপদেশ, আত্মা বা ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা আমাদের উপাস্য, শাস্তা, বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা, তবু তিনি যেন প্রকৃতির বাইরে। পরে আবার উপদেশ পাই ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে নন, ভিতরেই আছেন। শেষে উভয়ভাব পরিত্যক্ত, যা কিছু সত্য সবই তিনি, কোন ভেদ নেই—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। যিনি সর্বত্র জগতের ভিতরে, তিনিই মানুষের আত্মার মধ্যেই বর্তমান।—এই অদ্বৈতবাদ। 'আত্মা সকল বস্তুর আশ্রয়।' উপনিষদে আত্মার অপর নাম ব্রহ্ম। কঠ উপনিষদে ব্রহ্ম 'সর্ব-ভূতান্তরাত্মা'। মাণ্ডুক্য উপনিষদে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম,' যিনি আত্মা তিনিই সর্বাধার, বৃহৎ বস্তু। ছান্দোগ্যে আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছেন—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' অর্থাৎ 'সব বস্তু তুমি।' এর শাণ্ডিল্যবিদ্যায় পাই (৩।১৪)—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' নিশ্চয়ই এই সমুদয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্ববস্তু হলেও আমরা নিজের আত্মাতেই তাঁর সাক্ষাৎ প্রকাশ পাই। মাণ্ডুক্যে ব্রহ্ম 'একাত্ম-প্রত্যয়-সারম্'—একমাত্র আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বলা হয়েছে। আত্মজ্ঞানই মূলে ব্রহ্মজ্ঞান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।১৫) পাই—'যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং/দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।/অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং/জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥' অর্থাৎ যখন যোগী সাধক দীপতুল্য আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি জন্মরহিত, ধ্রুব এবং সর্ববিষয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ঈশ্বরকে জেনে সমুদয় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল। আত্মাকে না জেনে অন্য কিছুই জানা যায় না। কঠ উপনিষদে (২।২।১৫) বলে—'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং/নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।/তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং/তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥' 'সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি কেউ তাঁকে (আত্মাকে) প্রকাশ করতে পারে না, সমুদয় বস্তু সেই প্রকাশ স্বরূপের অনুপ্রকাশমাত্র। এই সব কিছু তাঁর দ্বারাই প্রকাশিত।'

এখন আত্মা সম্পর্কে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের বক্তব্য আলোচনা করি। ভারতে চার্বাক বলে পুরাতন সম্প্রদায় ছিল খাঁটি জড়বাদী। তাঁদের

মতে আত্মা নেই, ঈশ্বরও নেই। দেবতা, বেদ ও ধর্ম পুরোহিতদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্ভাবিত কুসংস্কারমাত্র। নৈতিকতা ও সততা অনাবশ্যক কুসংস্কার। তারা বিশ্বাস করত শুধু ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান। আত্মা দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন। দেহের নাশে আত্মারও নাশ। 'যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—ইন্দ্রিয়জ সুখ জীবনের সার। মৃত্যুর পর সব ভস্মসাৎ। তাই আত্মচিন্তা বাতুলতা। 'ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। / নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥' তাই পরলোক, জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ সব অবিশ্বাস্য।

বৌদ্ধমতে অন্তঃ ও বহির্জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব ছাড়া পারমার্থিক অস্তিত্ব কিছু নেই। যা দেখি তা শুধু ভিত্তিহীন ক্ষণিকবিজ্ঞানের সমষ্টি। বাহ্য ও আন্তর জগৎ যদি ক্ষণিকবিজ্ঞানের সমষ্টি হয়, আর যদি তাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক না থাকে, তা হলে সকল ক্ষণিকবিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ দেখি কেন? বেদান্ত এই প্রশ্নের উত্তরে একটা অনির্বাচ্য, অবশ্য উপলব্ধির অগম্য নয়, 'আত্মা'-র অস্তিত্ব স্বীকার করে। বৌদ্ধরা দেহ ও মনকে একটি জড় স্রোত বলে মনে করেন। মানুষ শুধু তরঙ্গ-পরম্পরামাত্র। একটি তরঙ্গ যাবার সময় অন্য একটির জন্ম দিয়ে যায়। এর জন্য সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অবশ্য তাঁরা কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব চারটি আর্যসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, একটি এই বিশ্বজগৎ দুঃখময়। যে নাম ও রূপ নিয়ে অন্তঃ ও বহির্জগৎ, প্রতীয়মান বিশ্ব, তাদের পরস্পর আদানপ্রদানের একমাত্র ফল দুঃখ। প্রতীত্য-সমুৎপাদ-তত্ত্বে এই দুঃখের হেতু নির্ণীত হয়েছে। তাঁর আবিষ্কৃত 'অষ্টাঙ্গিক-মার্গ' ভবব্যাধির মহৌষধি। নাম ও রূপকে এবং তজ্জন্য দুঃখকে মিথ্যা বলে জানাই সম্যক্-সম্বোধি, যার ফলে 'নির্বাণ' লাভ হয়। মোট কথা, বৌদ্ধদর্শনে 'আত্মা' বলে কিছু নেই। জীবনটা হচ্ছে নিছক বিভিন্ন অবস্থা-পরম্পরা যাদের মধ্য দিয়ে কার্যকারণ-ভাব বিদ্যমান। প্রতি মুহূর্তের আলোর শিখাটি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করে প্রকাশিত হয়। একটি অন্যটি থেকে পৃথক, যেহেতু অন্যটি নিজ-শর্তসাপেক্ষ। তবু বিভিন্ন আলোকশিখার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। একটি থেকে অন্যটি প্রজ্বলিত হতে থাকে। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে। তেমনই একটি জন্মের অন্তে অন্য একটির আরম্ভ হয়। তাই তাঁরা পুনর্জন্ম বলতে একই আত্মার অন্যদেহ ধারণ মনে করেন না। তাঁদের মতে একটি জন্ম পরবর্তী জন্মের কারণ-মাত্র।

জৈনদের মতে জীব বা আত্মা চৈতন্যময় সত্তা। গুণরত্ন বলেন—'চেতনা-লক্ষণো জীবঃ', অর্থাৎ চৈতন্যই আত্মার লক্ষণ —যা প্রতি জীবে, অবশ্য বিভিন্ন পরিমাণে, বিদ্যমান। কোন আত্মা কর্মকে জয় করে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং সর্বজ্ঞতা পেয়েছে। আবার অপূর্ণ আত্মা ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি, বায়ু বা বনস্পতির বিভিন্ন দেহে প্রকাশমান। আত্মা-ই জানে, কাজ করে, সুখদুঃখ ভোগ করে এবং নিজেকে ও অন্যান্য বিষয়বস্তুকে আলোকিত করে। আত্মা নিত্য কিন্তু পরিবর্তনশীল। দেহব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কেবল চৈতন্য। আত্মার অস্তিত্বের জন্যই জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। আলোর মতো আত্মা যে দেহ আশ্রয় করে তাকে আলোকিত করে এবং মূর্তি না থাকলেও সেই দেহের আকার ধারণ করে। দুটি আলো যেমন একই দেশকে আলোকিত করে, তেমনই দুটি আত্মা একই দেশকে ব্যাপ্ত করে থাকে। 'আমি সুখ অনুভব করি' এই অবাধিত প্রত্যক্ষ অনুভূতি-ই আত্মার

অস্তিত্বের প্রমাণ। তাছাড়া, দেহকে যেমন পরিচালনা করে এমন এক সত্তায় আমরা বিশ্বাস করি, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালক এক সত্তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। দেহের নির্মাতা নিমিত্তকারণরূপে জৈনরা আত্মায় বিশ্বাস করেন। গুণরত্ন বলেন, 'যন্নিষিধ্যাতে তৎ সামান্যেন বিদ্যতে এব'—অর্থাৎ কোন সত্তায় অবিশ্বাস করলে সেই অস্বীকৃতি-ই কোন না কোন আকারে কোন জায়গায়, তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি বোঝায়। যাই হোক, জৈনদর্শন কর্ম ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

আত্মা সম্পর্কে ন্যায়-বৈশিষিকদের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টত বাস্তব (realistic)। আত্মা একটি অসাধারণ সত্তা যার জ্ঞান, অনুভূতিগুলিকে তার গুণ বলে মনে করি। সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষাদি আত্মারই গুণমাত্র, যেহেতু এগুলি বহিরিন্দ্রিয়গম্য কোন গুণ নয়। এই দর্শনে বিভিন্ন দেহে আশ্রিত বিভিন্ন আত্মার স্বীকৃতি শোনা যায়। তাঁদের বিশ্বাস, বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা আলাদা। তবে এঁরা আত্মাকে নিত্য ও অবিনাশী বলেন, দেশ-কাল-অপরিচ্ছিন্ন বলে 'আত্মা' 'বিভু'। দেহ বা ইন্দ্রিয় আত্মা হতে পারে না, যেহেতু এদের চৈতন্য-গুণ নেই। তবে আত্মা মানে নিছক চৈতন্য নয়, চৈতন্য-গুণ-বিশিষ্ট বিশেষ সত্তা। দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় আত্মায় চৈতন্যধর্মের প্রকাশ হয়। দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ সম্পর্কে প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা মনে করেন, আত্মার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সম্ভব নয়, শাস্ত্র থেকে অথবা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখদুঃখাদি অনুভূতি থেকে অনুমান দ্বারা আমরা আত্মাকে জানতে পারি। কোন কিছুর ইচ্ছা করার পিছনে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব মানতেই হয়, যেহেতু আত্মা-ই অতীতে কোন বস্তুজন্য সুখ অনুভব করেছিল এবং বর্তমানেও সেই সুখ পাবার আশায় তা পেতে চেষ্টা করে। নবীন নৈয়ায়িকেরা অবশ্য আর এক ধাপ উঠে মন্তব্য করেন যে, মানস-প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মাকে জানা যায়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তিকেই তাঁরা অপবর্গ বা মোক্ষ মনে করেন, যখন আত্মা 'শুদ্ধ সত্তা' রূপে বিরাজ করে সুখদুঃখাদির অতীত তীরে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের মাধ্যমে তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হলেই আত্মাকে সম্যক্ জানা সম্ভব।

নৈয়ায়িকেরা 'ঈশ্বর' বিশ্বাস করেন, যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কর্তা বা আদি-কারণ। তিনি অবশ্য শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেননি, নিত্য অণু-পরমাণু, দেশকাল, ইথর, মন ও আত্মা সব কিছুর সংযোগ সাধন করে। মোট কথা, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এই অর্থে তিনি নিমিত্তকারণ, উপাদান-কারণ নহেন। ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার আর উপাদানকারণ মাটি। সৃষ্টি বলতে ঈশ্বরের মতো নিত্য-বস্তু-নিচয়ের সুশৃঙ্খল সমাবেশ। এখানে জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করতে আসে এবং যাবতীয় পদার্থ তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফলপ্রাপ্তির সহায় হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতের স্থিতি আবার প্রলয়। ঈশ্বর এক, অসীম ও নিত্য। দেশকালাবচ্ছিন্ন মন ও আত্মাময় জগৎ তাঁকে সীমিত করতে পারে না। আমাদের দেহের সঙ্গে আত্মার যেমন সম্বন্ধ,তেমনই জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিত্যচৈতন্যবান্। অদ্বৈতবেদান্তে নিত্য চৈতন্য ঈশ্বরের সার (essence), কিন্তু ন্যায়মতে তা নিছক অবিচ্ছেদ্য গুণ-মাত্র। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, আবার জীবকুলের কার্যকলাপের প্রেরণাদাতা কারণ। তাঁর ইচ্ছাধীন জীবের কর্ম। মানুষকে কার্যের 'করণ'-রূপ কারণ বলা যেতে পারে, তাহলে ঈশ্বর হল প্রযোজক-কর্তা। ঈশ্বর তাই আমাদের নিরপেক্ষ-কর্মফল-দাতা এবং সমগ্র জীবজগতের নৈতিক শাস্তা। পিতা যেমন তার পুত্রের শক্তি ও পূর্বলব্ধ গুণ অনুযায়ী তাকে কোন কাজ করতে

প্রবৃত্তি দেয়, তেমনই ঈশ্বর সকল জীবকেই কাজে প্রেরণা দেন এবং অতীত কর্ম ও আচরণ অনুযায়ী সেই কাজের ফলভোগ করতে দেন। মোট কথা, কর্মক্ষেত্রে জীব বা এমনকি মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, ঈশ্বরের পরিচালনাধীন।

সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও পুরুষ দুটি পরমতম নিত্যসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। দুই-ই নিত্য। 'বুদ্ধি' নামক মনের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাটি মহৎ বা বিরাট মনের পরিণাম। মহৎ-ই স্পন্দনশীল চিন্তায় রূপান্তরিত হয়, তা এক অংশে পরিবর্তিত হয়ে 'ইন্দ্রিয়' ও অপর অংশে 'সূক্ষ্মভূত' বা 'তন্মাত্র' হয়। তাদের সমবায়ে বিশ্বসৃষ্টি। মহৎ-এরও পরে যে 'অব্যক্ত' অবস্থা তাকে 'প্রকৃতি' বলা হয়। মোট কথা, প্রকৃতির পরিণাম এই জগৎ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনগুণের তারতম্যের ফলে জগৎ সৃষ্টি আর পুরুষ সচেতন আত্মা, সর্বদা জ্ঞাতা, কখনই জ্ঞেয় নয়। এ চৈতন্যগুণযুক্ত সত্তা নয়, কিন্তু বিশুদ্ধচৈতন্য। অর্থাৎ চৈতন্যই এর সার, নিছক গুণ নয়। অদ্বৈতবেদান্তের মতে আত্মা আনন্দস্বরূপ, কিন্তু সাংখ্যমতে আনন্দ ও চৈতন্য দুই ভিন্ন বস্তু একই সত্তার সার হতে পারে না। পুরুষ বা আত্মা বিষয়াতিগ জ্ঞাতা আর এর সার হচ্ছে বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই চৈতন্যের আলো সর্বদা সমান থাকে, যদিও জ্ঞানের বিষয় পরিবর্তিত হয়। পুরুষকে স্থির ও নিত্যচৈতন্য বলা যেতে পারে যার কোন পরিবর্তন বা ক্রিয়া থাকে না। এর কোন কারণ নেই, নিত্য ও সর্বব্যাপী সত্তা, বিষয়ের আকর্ষণ থেকে মুক্ত। সব কিছু যার পরিবর্তন ও ক্রিয়াশক্তি থাকে, সুখদুঃখ, দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে আত্মা এক সর্বব্যাপী সত্তা, যা সমস্ত দেহকে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান। কিন্তু সাংখ্যকার মনে করেন, পুরুষ বা আত্মা বহু, প্রতিটি দেহকে আশ্রয় করে এক একটি আত্মা। প্রকৃতির চৈতন্য নেই, কিন্তু চেতন পুরুষ বা আত্মার সংযোগে জগৎ-রূপে পরিণত হয় মাত্র। পুরুষ কর্তা নন, সাক্ষী-মাত্র। পুরুষ যেন বর্ণহীন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, তার সামনে বিভিন্ন বর্ণ রাখলে তাকে সেই সেই বর্ণে রঞ্জিত বলে মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ফটিক তাতে রঞ্জিত হয় না।

উপরে আত্মা সম্পর্কে যে বিভিন্ন দার্শনিকদের অভিমত আলোচিত হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবার বেদান্তের বিভিন্ন ভাবধারার পরিচয় দিতে চাই। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং সর্বশেষ অদ্বৈত মতে আত্মার স্বরূপ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সকলেই উপনিষদের ব্রহ্ম বা পরমাত্মা-ই চরম সত্তা স্বীকার করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি উপদেশ আমরা সর্বাগ্রে আলোচনা করি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস নেবার সময় স্ত্রীকে বললেন—'প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আমি সংসার ত্যাগ করতে যাচ্ছি, আমার যা কিছু অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নাও।' মৈত্রেয়ী বললেন—'ভগবন্, ধনরত্নে পূর্ণা সমুদয় পৃথিবী যদি আমার হয়, তা হলে তা দিয়ে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—' "না", তা হয় না, ধনী লোকের মতো তোমারও জীবন হবে, ধনের দ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।' মৈত্রেয়ি তখন বললেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্' অর্থাৎ 'যা দিয়ে আমি অমৃতত্ব পাব না, তা দিয়ে আমি কী করব? যদি সে উপায় আপনার জানা থাকে, আমাকে তা বলুন।' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—'তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া ছিলে, এখন এই প্রশ্ন করাতে তুমি আমার প্রিয়তরা হলে। এস, তোমাকে যা উপদেশ দেব, তা ধ্যান করতে থাক।' তিনি বলতে লাগলেন—'হে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, সে স্বামীর জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্য স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, কারণ সে আত্মাকে ভালবেসে থাকে,

স্ত্রীর জন্যই কেউ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু সে যেহেতু আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু স্ত্রীকে ভালবেসে থাকে।' এইভাবে যেহেতু মানুষ আত্মাকেই ভালবাসে, তাই সে নিজ সন্তান, অর্থ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি, জগৎ, দেবগণ এবং যে কোন বস্তুকে ভালবাসে, অতএব এই আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করতে হবে। হে মৈত্রেয়ি, এইভাবে আত্মার শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা এই সবই জানা যায়। এই উপদেশের মর্ম—আমরা জগৎ বলতে যা বুঝি, সবের ভিতর দিয়েই আত্মা প্রকাশ পায়। সব প্রেমই কি স্বার্থপরতা? না, আমাদের এই 'আমি' সেই প্রকৃত 'আমি' যা পরমাত্মার ছায়া মাত্র, যিনি আমাদের পিছনে রয়েছেন। তাই সব ভালবাসাই স্বার্থপরতা নয়, প্রকৃতপক্ষে তা আত্মপরতার-ই অংশবিশেষ। এই আত্মাকে জানতে হবে। যাঁরা আত্মার স্বরূপ না জেনে তাকে ভালবাসে, তাদের ভালবাসা-ই স্বার্থপরতা। যাঁরা আত্মাকে জেনে ভালবাসেন তাঁদের ভালবাসায় কোন বন্ধন নেই। তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী। এইভাবে ভালবাসা বলতে যাজ্ঞবল্ক্য বোঝালেন যে, আমরা যখনই প্রেমকে কোন বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ করি তখনই গোলমাল। যখনই আমরা কোন নারীকে ভালবাসি, যদি তাকে আত্মা থেকে পৃথকভাবে দেখি, তখন তা শাশ্বত প্রেম হয় না। তা নিছক স্বার্থপর ভালবাসা, দুঃখই এর পরিণাম। কিন্তু যখনই ঐ নারীকে আত্মারূপে দেখি, তখনই ঐ ভালবাসা প্রকৃত প্রেম; আর তার কোন বিনাশ নেই। আসল কথা, আত্মা ছাড়া যা কিছু আমরা ভালবাসি, তার ফল শোক ও দুঃখ। প্রশ্ন, এই আদর্শ কীভাবে রূপায়িত করি? এই জগৎ অনন্ত, আত্মাকে না জেনে জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তুতে 'আত্মা'-দর্শন কেমন করে করি? দুন্দুভি বাজলে তার শব্দতরঙ্গকে পৃথকভাবে গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু তার সাধারণ ধ্বনি গৃহীত হলে ঐ সব শব্দতরঙ্গ বুঝা যায়। তেমনই শঙ্খ ও বীণা বাজালেও সাধারণ সুর গৃহীত হলে ওদের বিভিন্ন উত্থিত সুরও গৃহীত হয়। 'যেমন সমুদয় জলের একায়ন সমুদ্র, সমুদয় স্পর্শের একায়ন আশ্রয় ত্বক্, সমুদয় গন্ধের একমাত্র আশ্রয় নাসিকা, সমুদয় রসের একমাত্র আশ্রয় জিহ্বা, যেমন সমুদয় রূপের একমাত্র আশ্রয় চক্ষু, সমুদয় শব্দের একায়ন কর্ণ, সমুদয় চিন্তার একায়ন মন, সমুদয় জ্ঞানের একায়ন হৃদয়,···যেমন সমুদ্রজলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত থাকে, অথচ চোখে দেখা যায় না, হে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকে সেইরূপ চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি জগৎ ব্যাপ্ত করেই আছেন। তিনি-ই সব কিছু, তিনি বিজ্ঞানঘন, সমগ্র জগৎ তাঁর থেকে উৎপন্ন, তাঁর দ্বারা বিধৃত, তাঁতেই লয়।' ব্রহ্মসূত্রে পাই—'যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব।' কারণ তাঁর কাছে পৌঁছলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলে যাই। স্ফুলিঙ্গের মতো আমরা সবাই সেই 'এক আত্মা' থেকে এসেছি, আবার তাঁকে জানতে পারলে তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হই, মৈত্রেয়ী শুনে ভয় পেলেন যে তখন 'আমি'-জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য আশ্বাস দিলেন যে, 'ভয়ের কোন হেতু নেই।' আত্মা অবিনাশী, স্বরূপত নিত্য। যে অবস্থায় 'দুই' থাকে তখন নিম্নতর অবস্থায় একজন অপরজনকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, ঘ্রাণ করে এবং অপরকে জানে, কিন্তু উচ্চতর অবস্থায় যখন তাঁকে জানা যায়, তখন দুইয়ে মিলে এক হয়ে গেলে, কে কাকে জানবে? তাই 'আত্মাকে' 'নেতি নেতি' দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনি অচিন্ত্য, অপরিণামী, অক্ষয়, অনাসক্ত, প্রকৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হন না, তিনি পূর্ণ, সুখ-

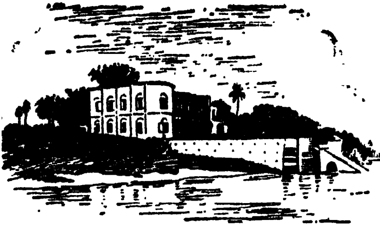
দুঃখের অতীত। সব জ্ঞানের অতীত অবস্থায় গেলে তাঁকে লাভ করা যায়। তখনই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'—বাক্য মন তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। সীমাবদ্ধ মন দিয়ে তাঁকে জানা অসম্ভব। তবে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন তাঁকে উপলব্ধি করা যায় ধ্যানের দ্বারা। কী ধ্যান? এই জগৎ সব প্রাণীরই কল্যাণকারী আর সব প্রাণীই জগতের কল্যাণকারী। উভয়ে পরস্পরকে সাহায্য করে। কিন্তু স্ব-প্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী কেউ হতে পারে না। কারণ আত্মা পূর্ণ ও অনন্তস্বরূপ। সবই তাঁর প্রকাশমাত্র। কোথাও অল্প, কোথাও স্পষ্টতর। প্রকাশ অল্প হলে বলি মন্দ, আর বেশি হলে বলি ভাল; কিন্তু আত্মা স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। তাই যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিচ্ছেন—'এই জগৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুময় আর সব প্রাণীই তার নিকট মধুময়, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম। বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ সবার সঙ্গে প্রাণীর এই মধুর সম্পর্ক। কারণ ব্রহ্মের প্রকাশ সর্বত্র। এইভাব মানুষের হিতকর, ধ্যানের যোগ্য। এক ব্রহ্ম বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র। এই একত্ব উপলব্ধি করাই ধ্যানের চরম লক্ষ্য।'—এই-ই যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

গীতায় কৃষ্ণের মুখে আমরা আত্মার অবিনাশিত্ব শুনি। 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ' (২।১৮), অর্থাৎ দেহের বিনাশ হয় কিন্তু দেহী অর্থাৎ আত্মা নিত্য। একই কথা আবার পাই গীতায় (২।৩০)—'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত', অর্থাৎ এই দেহেই নিত্যবস্তু আত্মা বিরাজমান। আরও স্পষ্ট করে কৃষ্ণ বলেছেন—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ/নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ। / অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো / ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥' অর্থাৎ আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, এ অজ, নিত্য শাশ্বত ও পুরাতন। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না। (২।২০), তাছাড়া আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। / ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥' (গীতা, ২।২৩)। 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। / নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ (গীতা, ২।২৪)। [ক্রমশঃ]

অবন্ধনের আনন্দ

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার
চারুচন্দ্র কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান।

মহানন্দে গুঞ্জরিছে মন
আকাশের পটে পটে তারি আলাপন।
ভেসে গেছে সব—আত্মীয় বান্ধব—
জাতি, গৃহ, পরিচয়, বংশের গৌরব—
এমন যে যজ্ঞসূত্র—তাও গেল ভেসে
মানসে ঘনায় সুরা—মেঘে মেঘ মেশে—
নামে বৃষ্টিধারা
উদারা মুদারা তারা
বাজায়ে বাজায়ে শুধু করে দিশেহারা—
নাই উৎস, নাই তার শেষ
ভাঙে যতি, ফোটে গতি, জাগে অবন্ধন
শুষ্ক খাতে বয়ে আসে উল্লাসে প্লাবন!
আকাশে তারারা হয়—আমার সোদর
মুক্তির মূর্ছনা হানে—সবে সহচর॥
নাই আর সংকীর্ণ সীমানা
নাই ক্ষুদ্র পরিচয়—
নাই কোন বিশেষণ-ভূষা
চারিপাশ গাহিছে অভয়!
মৃত্যুরে যে পূজা করে
জীবনে করেছে মুক্তিস্নান—
ছন্দ-বন্ধ চূর্ণি পায়
সীমান্তেই অসীম সন্ধান!



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

'যে করে গুরু বর্জন সে হয় বর্জন'

বারাণসী থেকে এক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলায় গিয়েছিল,—সেখানকার বিখ্যাত এক আচার্যের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। অধ্যয়ন শেষ হয়ে গেলে সে দেশ পর্যটনে যাত্রা করে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক চণ্ডাল-গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। এই গ্রামে এক পণ্ডিত ও সদাশয় ব্যক্তি বাস করতেন—তিনি চণ্ডাল বংশজাত। তাঁর নাম ছিল মহাসত্ত্ব। সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। তিনি একটি বিশেষ মন্ত্র জানতেন, যার দ্বারা ইচ্ছামাত্র যে-কোন সময়ে গাছে আম ফলানো যেত এবং তা বৃষ্টির মতো মাটিতে ঝরে পড়ত। আর সেই আম খেতে সুস্বাদুও বটে। ঐভাবে আম ফলিয়ে এবং তা বিক্রি করে তিনি সংসার-নির্বাহ করতেন।

ব্রাহ্মণকুমার এই গ্রামে এসে মহাসত্ত্বের কথা শুনতে পায় এবং তিনি কি করে ইচ্ছামাত্রেই গাছে অমন আম ফলান তা দূর থেকে লক্ষ্য করতে থাকল। সে ভাবল: এই ব্যক্তির কাছ থেকে আম ফলানোর মন্ত্রটি আমাকে শিখে নিতে হবে। —এই রকম ভাবতে ভাবতে একদিন সে মহা-সত্ত্বের অনুপস্থিতিকালেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়, যেন কিছু জানে না এইভাবে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল: 'আচার্য কোথায় গেছেন?' স্ত্রী উত্তর দিলেন: 'তিনি বনে গিয়েছেন।' ব্রাহ্মণকুমার তাঁর আসার অপেক্ষায় বাড়িতেই বসে রইল। কিছু সময় পরে সে দূরে দেখতে পেল, মহাসত্ত্ব বাড়ির দিকে আসছেন। দেখা-মাত্রই ছুটে গিয়ে রাস্তা থেকে মহাসত্ত্বের কাঁধের আমের থলিটি সে নিয়ে নিল এবং নিজে কাঁধে করে বয়ে এনে, ঘরে যথাস্থানে রেখে দিল। মহাসত্ত্ব কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই স্ত্রীকে বললেন: 'এই ব্রাহ্মণকুমার মন্ত্র শেখার মতলবে এখানে এসেছে। কিন্তু মন্ত্র পেলেও সে রাখতে পারবে না, কারণ এ কপট।'

এদিকে ব্রাহ্মণকুমার মহাসত্ত্বের সংসারের সমস্ত কাজ ভৃত্যের ন্যায় করতে লাগল। একদিন মহাসত্ত্ব তাকে বললেন: 'মাণবক, আমার পা রাখার জন্য একটা আসন নিয়ে এস।' ব্রাহ্মণ-কুমার ঘরে কোথাও আসন খুঁজে না পেয়ে, নিজের কোলের উপর তাঁর পা নিয়ে সারা রাত বসে রইল। মহাসত্ত্বের স্ত্রীর পরিচর্যাও গৃহভৃত্যের মতোই সে করতে থাকে। তাঁর সেবায় প্রসন্ন হয়ে একদিন স্ত্রী মহাসত্ত্বকে বললেন: 'স্বামিন্, এই ব্রাহ্মণকুমার উচ্চবংশজাত হয়েও আমাদের বাড়ির চাকরের মতো দিনরাত পরিশ্রম করে। সে অসৎ হলেও, মন্ত্র রক্ষা করতে না পারলেও আপনি দয়া করে তাকে মন্ত্র শিখিয়ে দিন।' মহাসত্ত্বও স্ত্রীর কথায় রাজি হয়ে ব্রাহ্মণকুমারকে মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। দেবার সময় তাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন: 'এ মন্ত্র মহা মূল্যবান। এর দ্বারা তুমি বহু ধন উপার্জন করতে পারবে। তোমার সংসারনির্বাহের কোন অসুবিধা হবে না। কখন কোন রাজাও যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন—এই মন্ত্র তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ,

চণ্ডাল বলে ঘৃণা করে যদি আমার নাম না বলে কোন ব্রাহ্মণ আচার্যের নাম কর, তাহলে তোমার অশ্রদ্ধা ও মিথ্যাচারের জন্য মন্ত্রেরও কোন ফল হবে না জেনো। কখনও আমাকে চণ্ডাল বলে অস্বীকার করো না।' সে সলজ্জভাবে বলল: 'না না, আমি কখনও আপনাকে প্রত্যাখ্যান করব না।' এই বলে সে চণ্ডাল-গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ব্রাহ্মণকুমার বারাণসীতে এসে উপস্থিত হল। এখানে এসে সে মন্ত্রের সাহায্যে গাছে আম ফলিয়ে এবং সেই আম বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে লাগল।

একদিন রাজার বাগানরক্ষক তার কাছ থেকে আম কিনে নিয়ে রাজাকে দিল। রাজা সেই আম খেয়ে খুব খুশি হলেন। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি এই সব আম কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?' সে বলল: 'মহারাজ, এক মাণবকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।' রাজা বাগানরক্ষককে নির্দেশ দিলেন যে এবার থেকে তার সমস্ত আম যেন রাজভবনে নিয়ে আসে।

বাগানরক্ষক ব্রাহ্মণকুমারকে এই রাজ-আজ্ঞা জানিয়ে দিল। সেও সেই অনুসারে সব আম নিয়ে এসে রাজভবনে বিক্রি করতে লাগল। একদিন রাজা আম খেয়ে খুশি হয়ে তাকে রাজ-কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। এইভাবে সে তখন রাজার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগল।

কিছুদিন বাদে রাজা ব্রাহ্মণকুমারকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন: 'মাণবক, তুমি অকালে এই-রকম সুন্দরবর্ণ, সুগন্ধ ও মধুর রসযুক্ত আম কোথায় পাও? এগুলি কি কোন নাগ বা দেবতা তোমাকে দিয়ে থাকেন, না, এসব তোমার মন্ত্রবল-লব্ধ?' সে উত্তর দিল: 'মহারাজ, আমার কাছে একটি অমূল্য মন্ত্র আছে—তারই প্রভাবে এমন সব আম আমি গাছে ফলাই।' তখন রাজা তাকে বললেন: 'বেশ। তোমার মন্ত্রশক্তি একদিন আমাদের দেখাও। আমরা তা চাক্ষুষ দেখতে চাই।' পরদিন ব্রাহ্মণকুমারকে নিয়ে রাজা তাঁর উদ্যানে গিয়ে আদেশ করলেন তার মন্ত্রের ক্ষমতা দেখাবার জন্য। সেও 'যে আজ্ঞা' বলে একটি আমগাছের থেকে সাত পা দূরে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ল এবং গাছের গায়ে কিছু জল ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাছের পুরানো পাতাগুলি ঝরে পড়ে নতুন পাতা গজাল। ক্রমে ফুল ফুটল, আবার ঝরে পড়ল,—আম হল এবং মুহূর্তের মধ্যে তা সব পেকে গাছতলায় পড়ে গেল। রাজা এই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি বাপু এই অদ্ভুত মন্ত্র কার কাছ থেকে শিখলে?' ব্রাহ্মণকুমার ভাবল: আমি যদি এখন চণ্ডালের কাছ থেকে শিখেছি বলি, তাহলে লজ্জার কারণ হবে, লোকে আমাকে নিন্দা করবে। আর আমি তো এখন মন্ত্র খুব ভালভাবেই আয়ত্ত করেছি, তাই ভুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।—এই চিন্তা করে সে জবাব দিল: মহারাজ, এই মন্ত্র আমি শিখেছি তক্ষশিলার এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ আচার্যের কাছ থেকে।' গুরুকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশক্তি তার কাছ থেকে অন্তর্ধান করে গেল। এদিকে রাজা তার উত্তর শুনে খুশি হলেন এবং তাকে নিয়ে নগরে ফিরে এলেন।

এরপর একদিন রাজার আবার আম খাওয়ার ইচ্ছা হল। তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে নিয়ে উদ্যানে গেলেন এবং আম নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন। সেও যথাবিধি মন্ত্র আবৃত্তি করতে গিয়ে দেখে মন্ত্র কিছুতেই মনে পড়ছে না। বার বার মনে করতে চেষ্টা করল, কিন্তু মন্ত্র আর মনেই পড়ল না। তাকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি হে মাণবক, তুমি

পূর্বে ছোট বড় কত আম আমাকে যখন তখন এনে দিয়েছ। সেই মন্ত্রে তুমি এখন কেন পারছ না আম এনে দিতে? এ তো বড় অদ্ভুত!' রাজার প্রশ্ন শুনে সে দুশ্চিন্তায় পড়ল: এখন যদি আমি বলি গাছে আম ফলাব না, তাহলে রাজা আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বিনাশ করবেন। তার থেকে আম ফলানোর ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য একটু না-হয় মিথ্যা কথাই তাঁকে বলি।—এই চিন্তা করে সে বলল: 'মহারাজ, এখন নক্ষত্র ও যোগ অনুকূল নয়। নক্ষত্র, যোগ ও শুভলক্ষণ হলে তখন আপনাকে প্রচুর আম এনে দেব।' উত্তর শুনে রাজা ভাবলেন: পূর্বে তো কখনও মাণবক এই রকম বলেনি। তবে এখন এই রকম বলছে কেন? এর রহস্য জানতে হবে।—এই ভেবে তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন: 'পূর্বে তো কখনও এই রকম নক্ষত্র ও যোগের দোহাই না দিয়ে প্রচুর আম তুমি এনে দিয়েছ, যখনই আমি চেয়েছি। ব্রাহ্মণকুমার, পূর্বে তুমি মন্ত্রজপ মাত্র গাছে আম ফলত, আর এখন তুমি বার বার মন্ত্রজপ করা সত্ত্বেও কেন গাছে আম ধরাতে পারছ না? এর কারণ বল।'

রাজার প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মণকুমার মুশকিলে পড়ে যায়। রাজাকে মিথ্যা বোঝাতে পারল না। বাধ্য হয়ে সে রাজাকে সত্য কথাই বলল: 'হে রাজন্, এক চণ্ডাল আমাকে কৃপা করে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। দেবার সময় তাঁর নামগোত্র কারো কাছে গোপন করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু লজ্জাবশে আমি সত্য ত্যাগ করে তাঁর নাম গোপন করেছিলাম। ফলে তক্ষুণি মন্ত্র আমার কাছ থেকে অন্তর্ধান করে। আমি মূঢ়, কপট,—জেনে শুনে মিথ্যা বলেছিলাম আপনাকে। বলেছিলাম তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণ আচার্যের কাছ থেকে আমি মন্ত্রলাভ করেছি। আর তক্ষুণি আমি মন্ত্র-হীন হয়ে পড়েছি।

রাজাও শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। মনে মনে ভাবলেন: এই পাপিষ্ঠ এই রকম অমূল্য মন্ত্রলাভ করেও সাবধানে রক্ষা করতে পারল না। এমন শক্তিমান মন্ত্রদাতার জাতিতে কি এসে যায়? তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণকুমারকে বললেন: 'মধু সঞ্চয়ের জন্য নিম, পলাশ প্রভৃতি যে কোন গাছে মৌচাক থাকে, তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চণ্ডাল—যিনিই গুরু হোন না কেন, তিনিই পূজনীয়।' তারপর রাজা নগর-রক্ষকের দিকে লক্ষ্য করে বললেন: 'এই গুরু-বর্জনকারী নিচ ব্যক্তিকে বধ কর অথবা একে বেশ কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম দিয়ে রাজ্য থেকে দূর করে দাও। বহু কষ্টে অমূল্য মন্ত্রলাভ করেও এই নরাধম অভিমানে তা বিসর্জন করল।'

নগররক্ষকরা তাকে বিশেষ লাঞ্ছনা দিয়ে বলল: 'যাও, গুরুর কাছে ফিরে গিয়ে, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে আবার যদি মন্ত্রলাভ করতে পার তবে এদিকে আসবে, না হলে এদিকে ফিরেও তাকাবে না।'

ব্রাহ্মণকুমার আবার মন্ত্রলাভের আশায় গুরুর কাছে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু দূরে তাকে আসতে দেখেই মহাসত্ত্ব স্ত্রীকে বলেন: 'ঐ দেখ, পাপিষ্ঠ মন্ত্র হারিয়ে আবার আমার কাছে আসছে।' ব্রাহ্মণকুমার ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এসে অতি বিনীত হয়ে বলল: 'আমি মূঢ়, মিথ্যা কথা বলে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তাতে আমার সর্বনাশ হয়েছে। আপনি আমাকে কৃপা করে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি পুনরায় প্রসন্ন হোন।' শুনে মহাসত্ত্ব উত্তর দিয়েছিলেন: 'বৎস, একি কথা তুমি বলছ? তোমাকে তো আমি বার বার সাবধান করে দিয়েছিলাম। এখন আবার আমার কাছে কেন এসেছ? দূর হও আমার সামনে থেকে। গুরুবর্জনকারীকে দেখলে আমার আপাদ-মস্তক ঘৃণায় জ্বালা করে। দূর হও।'

গুরুর দ্বারাও এইভাবে পরিত্যক্ত হয়ে, অনাথ অবস্থায় সে অগত্যা এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। আত্মগ্লানিতে ভাবল : 'কোথাও যখন স্থান নেই, তবে আর এই জীবন রেখে কি লাভ ?' এই চিন্তা করে সে ঐ জঙ্গলের মাঝে স্বেচ্ছায় প্রাণ-ত্যাগ করে।

গুরুবর্জনকারীদের পরিণতি এই রকমই হয় শেষ পর্যন্ত !

পূর্বজন্মে দেবদত্ত ছিল এই অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-কুমার, আর চণ্ডালরূপী মহাসত্ত্ব আর কেউই নন্, —স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ।

[আম্র-জাতক অবলম্বনে।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'ডাকতে থাক—তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন'

অনেকদিন আগের কথা,—তাই স্মৃতিই বটে! কিন্তু বড় প্রেরণাময় এবং আবেগ-মধুর কথা—পুণ্যস্মৃতি। দুটি আধুনিক যুবক বেলুড় মঠে গিয়ে তদানীন্তন মঠাধীশ স্বামী মাধবানন্দজীর দর্শনপ্রার্থী হয়। দর্শন কেন, বেশ কিছু আলাপের সুযোগও তারা পেয়েছিল। যুবকদ্বয় যখন মহারাজজীর কাছে যায়, তখন যেমন উচ্ছল মনে হয়েছিল তাদের চালচলনকে,—যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে, তখন কিন্তু তাদের প্রকৃতি বড় শান্ত ও সুস্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল। যুবকদের কি জিজ্ঞাসা ছিল, জানা নেই,—তবে তাদের সকল জিজ্ঞাসার সমাধান যে অনেকটাই হয়ে গিয়েছিল, এটা কিন্তু তাদের মুখ-চোখ বলে দিচ্ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজজীর মুখে তারা সেদিন শুনেছিল :

"অনেকে বলে ঈশ্বর নেই। কিন্তু দ্যাখ, ঠাকুর এলেন, সব প্রত্যক্ষ দেখালেন—তবে সকলে বিশ্বাস করল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি,—তখনকার দিনে, অর্থাৎ যবে থেকে স্টিমার প্রথম চলতে শুরু করে তারও আগে, জলের ওপর দিয়ে স্টিমার চলবে এই কথা শুনে লোকে বলত, জলের ওপর দিয়ে অত বড় ভারী জিনিস কখনই যেতে পারবে না। তা ছাড়া মাটির মতো সলিড্ (solid) কিছু একটা না পেলে চলবেই বা কি করে! কিন্তু সত্য সত্যই যেদিন এক ইঞ্জিনিয়র এসে জলের উপর দিয়ে স্টিমার চালিয়ে দেখিয়ে দিলে, সেদিন থেকে লোকের ঠিক ঠিক বিশ্বাস হল। আমাদের ঠাকুরও তেমনি এসে সব প্রত্যক্ষ দেখিয়ে গেলেন,—ব্যস্, আর অবিশ্বাস করার জো নেই।

"এখনও পর্যন্ত বহু লোককে দেখা যায়, যারা ঈশ্বরকে নিয়ে মতভেদ করে। একজন বলে, আমাদের ইনি ঠিক। আর একজন বলে—না, আমাদের ইনিই ঠিক। এমনটি হয় কেন জান ? তারা জানে না ঈশ্বর কেমন—ঈশ্বর কে, এবং কী। ঠিক ঠিক ধারণা না জন্মালে এই রকম সংশয়ের দোলায় দুলতেই হয়। আসলে কিন্তু বিন্দুমাত্র ভেদ নেই। যেমন ধর—একজন খুব বড় নেতা, উনি সুফি সম্প্রদায়ের লোক,—তাঁর একবার খুব ভারী অসুখ করেছিল। নানা দেশ থেকে সব বড় বড় ডাক্তার আনা হয়েছিল। কেউ ফ্রান্স থেকে, কেউ জার্মানী থেকে, কেউ বা এলেন জাপান থেকে। ডাক্তাররা সকলেই রোগীকে পরীক্ষা করে, যে যার ভাষাতে প্রেস্‌ক্রিপশন্ (prescription) করে দিলেন। এদিকে সেই নেতার যাঁরা নিজের লোক—যাঁরা তাঁর দেখাশোনা সেবা ইত্যাদি করতেন, তাঁরা তো পড়ে গেলেন মহা ফ্যাসাদে। তাঁরা তো ভেবেই অস্থির একই রোগীকে একই সময় চার-পাঁচ রকম ওষুধ কিভাবে খাওয়ানো হবে! এমনি

ভাবে ঐ বাড়ির লোকজন যখন মহা সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছেন আর খুব ইতস্ততঃ করছেন, ঠিক সেই সময়ে একজন লোক—যিনি বহুভাষাবিদ্—খুব পাকা লোক,—তিনি সব প্রেস্‌ক্রিপশন্‌গুলো দেখে নিলেন,—নিজেই ডাক্তারখানায় গিয়ে ঠিক ওষুধটি কিনে নিয়ে এলেন। বেশ মজার কাণ্ড তখন। লোকটি কেবল বহুভাষাবিদ্‌ই ছিলেন না—বেশ রসিকও ছিলেন নিশ্চয়ই। তিনি কি করলেন জান? ওষুধের শিশিটি খুলে যতগুলো প্রেস্‌ক্রিপশন্ ছিল, ওষুধের বড়িগুলিকে ততগুলো ভাগ করে ফেললেন। পরে রোগীর সেবকদের বুঝিয়ে দিলেন, এটা অমুকের প্রেস্‌ক্রিপশনের ওষুধ, ওটা অমুকের ইত্যাদি। আসলে কিন্তু একই ওষুধ। বিভিন্ন ভাষায় প্রেস্‌ক্রিপশন্ লেখা হয়েছিল মাত্র। ঠিক তেমনি—ঈশ্বর এক। তাঁকে যে-নামেই ডাক না কেন, তিনি সাড়া দেবেনই।

"আবার ছাখ, একই গুরু বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন মন্ত্র দেন বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে একই। বিভিন্ন ভাষায় প্রেস্‌ক্রিপশন্ হয় বটে—কিন্তু ওষুধ একটিই। তা তোমরা বোঝ আর না বোঝ, যিনি ডাক্তার তিনি ঠিক বুঝে নেবেন। তাই বলছিলাম, ঈশ্বরকে যে যে-নামেই ইচ্ছা ডাকুক না কেন, তাতে অপর আর একজনের কিছু বলা উচিত নয়।

"যে যে-রূপে ভাবে, তিনি সেই রূপেই তার কাছে প্রকাশিত হন। যেমন, ঘটিতে জল ভরলে ঘটির আকার ধারণ করবে, গেলাসে রাখলে গেলাসের আকার ধারণ করবে, যদি আবার কোন চামড়ার পাত্রে জল ভরে রাখ সেই পাত্রের আকারই ধারণ করবে। তাঁকে যেভাবে পেতে চাও তিনিও সেই ভাবেই তোমার কাছে ধরা দেবেন। একান্তভাবে ঠাকুরকে ডাকতে থাক, তিনি নিশ্চয়ই ডাক শুনবেন।"

পূজ্যপাদ নির্মল মহারাজ বা স্বামী মাধবানন্দ-জীর মুখের ঐ সহজ কথাগুলির দ্যোতনা উল্লিখিত তরুণ বন্ধুদ্বয়ের মনে কত গভীর বা কতকাল স্থায়ী হয়েছিল সে-সন্ধান রাখা হয়নি। তবে নিকটবর্তী অন্তরের হৃদয়ে আজও মহারাজজীর সেদিনের সেই কণ্ঠস্বর অনুরণিত,—এখনও সেই দৃঢ় প্রত্যয়ান্বিত উক্তি: 'ঠাকুরকে ডাকতে থাক, তিনি নিশ্চয়ই ডাক শুনবেন', শত নিরাশার মাঝেও আশার সঞ্চার করে। নির্মল মহারাজ একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব,—যাঁর আধ্যাত্মিক বিভা ছিল সর্বতোপ্রসারী,—এমন কি স্বল্পভাষী এই সন্ন্যাসীর মুখের বিরল দুই-চারটি কথাতেও ছিল অমিত শক্তি।

জ্ঞান-বিজ্ঞান

জাতীয় সর্পদংশন-নিবারণের কর্মসূচি গ্রহণ করায় আহ্বান

যদিও বিষ হিসাবে সাপের বিষ অন্য সকল প্রকার জানা বিষের মধ্যে প্রাচীনতম, তা সত্ত্বেও সর্পদংশনের সংখ্যা যে কত তা সঠিক জানা নেই। কিন্তু যেটুকু খবর পাওয়া যায়, তা এশিয়া মহাদেশের স্বাস্থ্যদপ্তরগুলির উদ্বিগ্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য এর কারণ আছে। এই মহাদেশে সকল প্রকার বিষাক্ত সাপ—এমন কি থুতু-নিক্ষেপকারী সাপ যা তিন চার মিটার দূরের প্রাণীর মুখে থুতু নিক্ষেপ করতে সক্ষম এবং গেবুন (Gaboon) সাপ যার দংশন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আনে, তাও আছে।

সর্পদংশনের ধারা (epidemiology) এবং এর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে—'জাপান সর্প ইন্‌স্টিট্যুট্ (Japan Snake Institute) এবং বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা (WHO)-র উদ্যোগে যে আলোচনা-চক্রের আহ্বান করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে যে, প্রতি বৎসর এশিয়ার দেশগুলিতে সর্পদংশনের

ফলে প্রায় দশ হাজার লোক প্রাণ হারায়। যেহেতু এই সংখ্যার প্রত্যেকটি, হাসপাতালের হিসাব থেকে গৃহীত, সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, মৃতের প্রকৃত সংখ্যা এই সংখ্যার কয়েক গুণ বেশি।

পৃথিবীর সবদেশের চেয়ে বর্মাদেশে সর্প-দংশনে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। এখানে প্রতি বৎসর যে দশ হাজার লোকের সর্পদংশনের খবর পাওয়া যায়, তার প্রায় দশ-শতাংশের মৃত্যু হয়। বর্ষা কিংবা বন্যায়, যখন সাপেরা উঁচু জমির সন্ধান করে, তখনই বিপদ বেশি। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ লোককে সাপে কামড়ায়, বেশির ভাগ সন্ধ্যা ছ-টা থেকে রাত্রি বারটার মধ্যে। দংশিত ব্যক্তিগণের বেশির ভাগই কৃষক, কিন্তু মালয়েশিয়া ও থাইল্যাণ্ডে সমুদ্র-সর্পের (sea-snake) দংশনও মৎস্যজীবিগণের একটি সমস্যা।

উপরি-উক্ত এবং অন্যান্য ঘটনার জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অফিসের (South-East Asia Regional office) আহ্বানে বিশেষজ্ঞগণ দেশগুলিকে সর্প-দংশন নিবারণের কর্মসূচি গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। তিনদিনের আলোচনায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন, শুধু যে সর্পদংশনের সঠিক খবর পাবার ব্যবস্থা করতে হবে তা নয়, দংশনের পর অসুখের লক্ষণগুলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে।

বিশেষজ্ঞগণ সব দেশের স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষকে বিষনাশক ওষুধের (antivenom) অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত সরবরাহের যে সমস্যা তার সমাধানের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেন। তাঁরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের (Primary health care worker) এবং চিকিৎসকদের প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) শিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণেরও সুপারিশ করেন। তাঁদের উপদেশ: "ভীত রোগীকে সাহস দাও, দংশিত স্থানের অবশিষ্ট বিষকে ধুয়ে মুছে ফেল, দংশিত শরীরাংশকে কাষ্ঠ-খণ্ড দিয়ে (splint) বা কাপড় জড়িয়ে বেঁধে তার নড়াচড়া বন্ধ কর, যত শীঘ্র পার রোগীকে যত্নসহ নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাও। বাঁশের দোলনা তৈরি করে তাতে কম্বল পেতে রোগীকে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক এবং তাতে রোগীর নড়াচড়া খুব কম হবে। টুর্নিকে (tourniquet) বাঁধা, ক্ষতস্থান চিরে দেওয়া বা শুষে নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে।"

[*Countries Urged to Set Up Programme Against Snakebite:* World Health, May 1982, অবলম্বনে।]

দেশ-বিদেশ

অস্ট্রেলিয়া: আদিবাসীর জীবনযাত্রা

ইউরোপীয়দের আসার পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী উপজাতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০। এরা এক এক দল আলাদা আলাদা সীমানার মধ্যে বসবাস করত। প্রত্যেক উপজাতি দলের লোকসংখ্যা ছিল ১০০ থেকে ১,৫০০ পর্যন্ত—গড়ে ধরা হয় ৫০০ থেকে ৬০০। একটা দলের লোক একই ভাষায় কথা বলত এবং একটা এলাকায় এক সঙ্গে বাস করত। তাদের সামাজিক রীতিনীতিও ছিল একই।

উপজাতিদের সীমানা নির্ভর করত অঞ্চলের প্রকৃতির উপর। উর্বর সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলে যেখানে প্রচুর খাদ্যবস্তু পাওয়া যেত সেখানে তারা ডেরা বাঁধত। সেই সব অঞ্চলের আয়তন মোটামুটি ১,৭০০ বর্গ মাইলের মতো ছিল। আবার মরুভূমি অঞ্চলের যেখানে তারা বাস করত তার আয়তন সীমিত থাকত ৪০,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে। নদী, ক্ষুদ্র উপসাগর, গিরিখাত, পর্বতশ্রেণী প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমানা

দ্বারা এলাকাগুলি বিভক্ত ছিল।

উপজাতিদের নামকরণ হত সাধারণতঃ ভাষা অনুযায়ী। আবার অনেক সময় অঞ্চলের নাম অনুসারেও তাদের নাম শোনা যেত।

প্রত্যেক উপজাতি দলের আবার অনেক আঞ্চলিক দল আছে। তারা যাযাবর জাতি বিশেষ। এই আঞ্চলিক দলের লোকসংখ্যা খুবই কম—১৫ জনের মতো। আঞ্চলিক দলগুলি ছিল স্বশাসিত। দল পরিচালিত হত জীবন-যাত্রায় অভিজ্ঞ এবং আচার-অনুষ্ঠান জানা বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধদের দ্বারা। তাদের সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হত এই সব বৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতির মাধ্যমে। প্রত্যেক আঞ্চলিক দলের বৃদ্ধদের মধ্য থেকে তারা একজন মোড়লকে নির্বাচন করত। এই মোড়লের সৎ পরামর্শে সমিতি পরিচালিত হত। অবশ্য এই জন্য সে বেশি কিছু সুযোগ-সুবিধা পেত না। তাকেও সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হত। সমাজে সবার যেমন অধিকার তারও তেমনি।

এই আঞ্চলিক দল গঠিত হয় দু-তিনটি অথবা নিকটবর্তী কয়েকটি পরিবার নিয়ে। একটি পরিবারভুক্ত—একজন পুরুষ, তার এক বা একাধিক স্ত্রী এবং তাদের ছেলেমেয়ে। তাদের সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। পরিবারের স্বামী স্ত্রী উভয়কেই বেঁচে থাকার জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করতে হত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে অনেক সময় আঞ্চলিক দলের কয়েকটি পরিবার একত্র আহার সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত থাকত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা চাষবাস করে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করতে জানত না। বিরাট দেশ তাই নিষ্ফলা হয়ে ছিল বহুকাল। কৃষিকাজ যদি তারা জানত তাহলে তাদের খাবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে বন থেকে বনান্তরে শিকারের সন্ধানে খুঁজে বেড়াতে হত না নিশ্চয়ই। অন্য কোন দেশের সঙ্গে কোনরকম সংযোগ-ব্যবস্থা না থাকায় তারা কৃষি-পদ্ধতি বা কি করে গৃহপালিত পশু পালন করতে হয় তা তারা জানত না। অবশ্য বন্য শিকারী কুকুর তাদের রাখতেই হত আত্মরক্ষার্থে এবং শিকারে সহায়তার প্রয়োজনে।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজে পুরুষরা মেয়েদের নিতান্তই অস্থাবর সম্পত্তির মতো অথবা ক্রীতদাসী করে রাখত না, যদিও প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানীরা সেইরকমই মনে করতেন। তাদের সমাজ পুরুষ-শাসিত হলেও সমাজে মেয়েদের একটা বিশেষ স্থান বরাবরই রয়েছে। মেয়েরা স্বামীর ঘরে গিয়ে আহার সংগ্রহ তো করতই, আর গর্ভে সন্তান ধারণ করে পরিবারকে সুখময় করে তুলত। যে-সব মেয়ে ভাল খাবার-সংগ্রহ করতে এবং বহু সন্তানের জননী হতে পারত সমাজে তারা বিশেষ মর্যাদা পেত। বৃদ্ধা হয়ে গেলেও মেয়েদের সম্মান অক্ষুন্ন থাকত। কনিষ্ঠদের সবার কাছে সে শ্রদ্ধা পেত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী পরিবার বিস্তৃত আত্মীয়তার (elaborate-kinship system) ভিত্তিতে গঠিত, যার বিস্তার এলাকার উপজাতি ছাড়িয়ে অন্য এলাকা পর্যন্ত। বাস্তবিক কোন আদিবাসীর সঙ্গে যদি অন্য এলাকার আদিবাসীর সংযোগ ঘটে তাহলে তাদের মধ্যে প্রথমে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং দ্বিতীয় তাকে সেইভাবে আদর-যত্ন করে। ফলে তাদের মধ্যে সীমানা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ কমে যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুযায়ী এদের পারস্পরিক শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে। এইভাবে তাদের আত্মীয় জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এক জাতির যা পরিভাষা অন্য জাতির

পরিভাষাও তাই। যেমন একজনের বাবা আছে এবং বাবার যত ভাই, তারাও সবাই ঐ 'বাবা' নামে পরিচিত। সেইরকম কারও মা আছে, এবং মায়ের যত বোন আছে সবাই ঐ 'মা' নামে পরিচিত। প্রত্যেক জাতিশ্রেণীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রীতিনীতি আছে, যা প্রত্যেককে কঠোরভাবে মেনে চলতে হত। এই আত্মীয়ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু কিছু ভিন্নতা লক্ষণীয়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী উপজাতিরা যাযাবরের মতো আহার সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াত। তবে তারা খাবারের সন্ধানের জন্য নিজেদের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যের সীমানায় বড় একটা যেত না। তবে একটি দলের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যের সীমানায় যেতে হলে অনুমতি নিয়ে যেতে হত। অনুমতি ছাড়া গেলে শাস্তি পেতে হত।

পুরুষরা পশুপাখি শিকার করত ও মাছ ধরত। মেয়েরা বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা জাতীয় খাবার সংগ্রহ করত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গে খাবার সংগ্রহ করতে যেত। ছেলে বড় হয়ে গেলে বাবার সঙ্গে শিকারে বা মাছ ধরতে যেত।

পুরুষরা শিকার করত ক্যাঙ্গারু ও ভল্লুক। শিকারের সময় বন্য কুকুর তারা সঙ্গে করে নিয়ে যেত। তবে এই সব শিকার যথেষ্ট মিলত না। ফলে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নির্ভর করতে হত পাখি শিকারের উপর। তবে পাখির মাংসের চেয়েও পালকের পরিমাণ বেশি। মেয়েরা সংগ্রহ করত রাঙা আলু, বৈঁচি জাতীয় বীচিশূন্য এক ধরনের রসাল ফল, বাদাম, এক ধরনের গাছের ছাল, পিঁপড়া, শুঁয়োপোকা প্রভৃতি। এই সব সংগ্রহ করতে তারা ঘর থেকে সকালে বেরিয়ে পড়ত আর ফিরত সেই সন্ধ্যায়। পুরুষরা যদি শিকারে কিছু না পেত, তাহলে মেয়েদের সংগৃহীত খাবার দিয়ে তাদের সেদিন চালিয়ে নিতে হত। আর পুরুষরা যদি কোন ভাল শিকার পেত, তাহলে অন্য পরিবারের সবাইকেও ভাগ দিত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ঘুরে ঘুরে ডেরা বাঁধত। কারণ তাদের প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হত। ঋতু অনুযায়ী কোথায় গেলে ভাল শিকার মিলবে তা তারা জানত। সেই অনুসারে তারা ডেরা স্থানান্তরিত করত। এই অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে শত শত বছর দুঃসহ পরিবেশে থাকতে থাকতে।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা সব সময় ঘুরে বেড়াত বলে এবং তাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান না থাকায় তাদের গৃহস্থালি জিনিসপত্র থাকত খুবই কম। যে-সব জিনিসপত্র তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হত এবং যেগুলির আশু প্রয়োজন সেগুলি ছাড়া তারা আর কিছু সঙ্গে রাখত না। এই সব ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিভিন্ন এলাকার আদিবাসীদের বিভিন্ন রকম ছিল। তবে অস্ট্রেলিয়ার সব আদিবাসীদের সঙ্গে কাঠের বর্শা, পাথরের কুড়াল, কাঠের গামলা, গাছের ছালের থলে ও ঝুড়ি, ছোড়া লাঠি, আগুন ধরাবার লাঠি প্রভৃতি থাকত। যে-সব অঞ্চলে মাছ ধরার সুযোগ আছে সেই সব অঞ্চলের উপজাতিদের সঙ্গে থাকত হাড়ের বঁড়শি ও গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি জাল। কোন কোন আদিবাসীদের কাছে এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রও থাকত। তারা ধাতুর জিনিসের বা তীর ধনুকের ব্যবহার জানত না।

আদিবাসীদের গৃহ দেখতে পাওয়া যেত না। সব সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তারা সময় নষ্ট করে কয়েক মাসের জন্য আর গৃহনির্মাণ করত না। ডালপালা এবং গাছের ছাল দিয়ে ছাউনির মতো করে তার তলায় তারা বাস করত। সাধারণতঃ তারা খোলা জায়গায় থাকতে

অভ্যস্ত। খুব শীতের সময় তারা আগুন জ্বালাত ডেরায়। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অঞ্চল কুইন্সল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরবর্তীর আদিবাসীরা মশার কামড়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সারা রাত ধোঁয়া করে এবং তারা বেঁধে তার উপর থাকত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা উলঙ্গ অবস্থায় থাকত। তারা কাপড়ের ব্যবহার জানত না। যখন খুব প্রচণ্ড শীত পড়ত, তখন তারা ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি পশুর চামড়া কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে গায়ে জড়িয়ে রাখত। বিবাহযোগ্য মেয়েরা কোমরে গাছের ছালের বেল্ট পরত। উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে তারা সারা গায়ে নানা রকমের নকশা আঁকত এবং নৃত্য করত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবন প্রকৃতি এবং স্বকীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। 'ধর্ম' বলতে অবশ্য তাদেরই নিজেদের সংস্কার ও বিশ্বাস। তারা ঐ ধর্মকে বিশেষভাবে মেনে চলত। প্রকৃতি যাতে তাদের উপর সদয় থাকে তার জন্য তারা নানা রকমের অনুষ্ঠান করত। তবে তাদের ধর্ম ছিল বড় গোপনীয় জিনিস। মেয়েদের ঐ ধর্মের অনুষ্ঠানাদি করার কোন অধিকারই ছিল না। ধর্মের অনুষ্ঠানাদি পুরুষরাই শুধু করতে পারত। তারা যেখানে ডেরা বাঁধত তার থেকে বহু দূরে গিয়ে তারা নানা রকম ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করত। মেয়েদের সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। নিষেধ না শুনে যদি কেউ সেখানে যেয়ে পড়ত—তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। পুরুষরা এই সব অনুষ্ঠান-ক্রিয়াদি করত সমগ্র দলের জন্য—অবশ্য মেয়েরাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান তারা কখনও করত না।

ইউরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে 'সভ্যতার উন্নতি'র (Progress of Civilization) মানে কি ? তার মানে এই যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধি—অনুচিত উপায়কে উচিত করে। চুরি, মিথ্যা এবং ফাঁসি অথবা স্টানলি (Stanley) দ্বারা তাঁর সর্মভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত মুসলমান রক্ষীদের এক গ্রাস অন্ন চুরি করার দরুন চাবকানো, এ-সকলের ঔচিত্য বিধান করে ; 'দূর হও, আমি ওথায় আসতে চাই'-রূপ বিখ্যাত ইউরোপী নীতি, যার দৃষ্টান্ত—যেথায় ইউরোপী-আগমন, সেথাই আদিম জাতির বিনাশ—সেই নীতির ঔচিত্য বিধান করে। এই সভ্যতার অগ্রসরণ লণ্ডন নগরীতে ব্যাভিচারকে, প্যারিতে স্ত্রীপুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে এবং আত্মহত্যা করাকে 'সামান্য ধৃষ্টতা' জ্ঞান করে—ইত্যাদি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

শ্রীউদ্ধব গীতা—অনুবাদক স্বামী বেদান্তানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা-৮০০০০৪ থেকে অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত। (প্রাপ্তিস্থান : 'উদ্বোধন' কার্যালয়।) পৃঃ ৬+৩৭২ ; মূল্য : আট টাকা (কাগজের মলাট), দশ টাকা (কাপড়ে বাঁধাই)।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অন্তর্গত ষষ্ঠ থেকে একোনত্রিংশ এই চব্বিশটি অধ্যায় 'উদ্ধব গীতা'-রূপে পরিচিত। শ্রীউদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মীয়ই শুধু ছিলেন না, তাঁর সচিব এবং সখাও ছিলেন। বুদ্ধিমান্ ও পরাক্রান্ত উদ্ধব দৌত্য প্রভৃতি নানা কাজে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা করতেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের অভিপ্রায় অনুমান করে উদ্ধব তাঁর সঙ্গী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁকে অনাসক্ত ভাবে জীবনযাপন করার জন্ত পরামর্শ দেন। এই সময় উদ্ধবের সঙ্গে ভগবানের কথোপকথনই 'উদ্ধব গীতা'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উদ্ধবকে যে-উপদেশ দেওয়া হয় অনুবাদক তাকে যথার্থই "মানবসাধারণের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত শেষশিক্ষা"-রূপে বর্ণনা করেছেন।

সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ মুখবন্ধে অনুবাদক 'উদ্ধব গীতা'র তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং নানা অবস্থায় বর্তমান মানবগণের অধিকারানুরূপ ধর্মাচরণের নির্দেশের সহিত জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মানুভবের জন্ত অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন সাধনের নির্দেশ এই উদ্ধব গীতায় উপলব্ধ হয়। এই কারণে, জ্ঞান, ভক্তি এবং ক্রিয়াযোগের সাধকগণের দ্বারা ইহা সমভাবে আদৃত। অনাসক্তি, সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন এবং আত্মসমর্পণের শিক্ষা ইহাতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়।"

এই শিক্ষা অবশ্য 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'তেও আমরা পাই। 'উদ্ধব গীতা'র অনেক শ্লোক আমাদের 'গীতা'র শ্লোকের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দুই গীতার তুলনামূলক আলোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে; পণ্ডিতেরা ও গবেষকেরা এই দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন।

যে-সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে আছে—দেহাভিমানবশতঃ জীবের জন্মমরণ, সাধুসঙ্গের মহিমা, কল্যাণের উৎস-রূপে ভক্তির ভূমিকা, ঈশ্বরের বিভূতিসমূহ, ব্রহ্মচারীর ও গৃহস্থের ধর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগ, তিরস্কার সহনের উপায়, মনের মোহ নিবারণ প্রভৃতি। একোনবিংশ অধ্যায়ের ২৫-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন, "যখন কাহারও সত্ত্বগুণযুক্ত এবং চাঞ্চল্যরহিত চিত্ত পরমাত্মা-আমাকে আশ্রয় করে তখন (বিনা চেষ্টায়) তাহার ধর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-সমন্বিত বিবিধ বিভূতি লাভ হয়।" অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রাবল্যই চিত্ত স্থির করার উপায় এবং চিত্তের স্থিরতা না থাকলে অনন্তের সুরে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী বাজবে না। সত্ত্বগুণই আমাদের স্বর্গাভিমুখী করবে এবং তমোগুণ আমাদের নরকের দিকে টানবে। এ-পরম সত্য মনে রাখলে আমরা অনেকেই ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হব না।

স্বামী বেদান্তানন্দের সরল সুন্দর অনুবাদ মূলানুগ অথচ সাবলীল। যেখানে প্রয়োজন, তিনি টীকা-টিপ্পনীও যোগ করেছেন। তাঁর অনুবাদে তিনি টীকাকার শ্রীধরস্বামীকে অনুসরণ করেছেন। একটি প্রয়োজনীয় পরিশিষ্টও আছে। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। এজন্য সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ অনুবাদক সকলের ধন্যবাদার্হ।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Life of Sri Ramanuja—Swami Ramakrishnananda, Translated from Bengali by Swami Budhananda. Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-600004, 3rd Edition, pp. 10+279, Price : Ordinary Rs. 12·00, Deluxe Rs. 22·00

দক্ষিণভারতে আচার্য রামানুজের জীবন ও দর্শন বহুল-প্রচারিত হলেও বাঙালী পাঠকের কাছে দীর্ঘকাল তা সুপরিজ্ঞাত ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহচর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ-জীবন ও ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে যান তখন তিনি রামানুজাচার্যের জীবনবৃত্তান্ত ও দর্শন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। তাঁর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় আট বছর নব-প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীরামানুজচরিত' প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ বাঙালী পাঠক সেই প্রথম রামানুজাচার্য ও তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পান। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণানন্দজীর তিরোভাব রচনাটির গ্রন্থাকারে প্রকাশ বিলম্বিত করে—অবশেষে তাঁর তিরোভাবের প্রায় এক বছর পরে 'শ্রীরামানুজচরিত' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীরামানুজচরিত' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বিপুল পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার যোগ্য নিদর্শন। ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতের ইংরেজী-ভাষী পাঠকদের কথা স্মরণ করে এই মূল্যবান গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেন স্বামী বুধানন্দ এবং প্রথম ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। সমালোচ্য গ্রন্থটি সেই ইংরেজী অনুবাদেরই তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীরামানুজের জন্ম ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত শ্রীপেরুম্বুদুর গ্রামে। বাল্যকাল থেকে অপূর্ব মেধা ও চিন্তাশক্তির অধিকারী সমকালে প্রচলিত গুরুকুল বিদ্যালাভ করেন এবং সর্বপ্রথম মহাত্মা মহাপূর্ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থাতেই তখনকার রীতি অনুযায়ী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন কিন্তু সাংসারিক জীবন তাঁকে সঙ্কীর্ণ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং গুরুর কাছে ন্যাসতত্ত্ব, সিদ্ধিতত্ত্ব, গীতার্থ-সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাসসূত্র এবং পঞ্চরাত্রাগম অধ্যয়ন শেষে মহাপূর্ণের আদেশে গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষালাভের জন্য উপস্থিত হন। অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যানের পর গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁকে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং সিদ্ধমন্ত্র দান করেন। যে কোন নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। রামানুজের জীবনেও সে বিপদ এসেছে—এমন-কি তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা হয়েছে। সমস্ত বিপদ অতিক্রম করে রামানুজ বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ও প্রবক্তারূপে শ্রীভাষ্য রচনা করেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী শ্রীসম্প্রদায় নামে অভিহিত।

সাধারণত অনুবাদের দুটি পথ আছে, (১) আক্ষরিক (২) ভাবানুবাদ। স্বামী বুধানন্দ গ্রহণ করেছেন এর মধ্যপন্থা। ফলে মূলগ্রন্থের সব রসটুকু লভ্য হলেও আক্ষরিক অনুবাদের আড়ষ্টতা বর্জন করা সম্ভব হয়েছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মূলতঃ সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকেই আকর-রূপে গ্রহণ করেছিলেন—তামিল গ্রন্থগুলির জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল সেই ভাষার পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার ওপর। অনুবাদক 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্' নামক তামিল পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দের সাহায্যে মূল তামিলগ্রন্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার ফলে কিছু কিছু নতুন পাদটীকা সংযুক্ত হয়েছে এবং দু-এক স্থানে গ্রন্থের সামান্য পরিবর্তনও ঘটাতে

হয়েছে। এতে রচনাটি সম্পূর্ণতর হতে পেরেছে। রামকৃষ্ণানন্দজী গ্রন্থের অবয়বে যে বিপুল পরিমাণ সংস্কৃত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন অনুবাদক পাঠকের সুবিধার জন্য সেগুলি পাদটীকায় স্থাপন করে গ্রন্থের মধ্যে তার ভাবানুবাদ দিয়েছেন— ইংরেজী পাঠকের পক্ষে তা সহজবোধ্য হয়ে উঠবে। গ্রন্থ শেষে নির্ঘণ্ট ও সংযোজনা অংশটিরও কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে সংস্কৃত নামের সঙ্গে তামিলনামের পারিভাষিক সংযোজনে এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচিতি প্রসঙ্গে স্বামী আদিদেবানন্দের রচনাটি গ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ।

সব মিলিয়ে এই অমূল্য ইংরেজী অনুবাদটি শুধু সুখপাঠ্য হয়নি, সাধারণ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের উপযোগী হয়েছে। বইখানি যে ইংরেজী-ভাষী পাঠকের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে, অনুবাদের তৃতীয় সংস্করণই তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। স্বামী বুধানন্দের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিরলস প্রয়াস 'রামানুজচরিত' ইংরেজী সংস্করণকে একখানি মূল্যবান আকরগ্রন্থরূপে পরিগণিত করবে, সন্দেহ নেই।

—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ

অন্তঃপুরের আত্মকথা—চিত্রা দেব। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। (১৯৮৪), পৃঃ ১৬৬, মূল্য : ২৫·০০

গবেষণাধর্মী আলোচ্য গ্রন্থটি উনিশ শতকের খ্যাত অখ্যাত কয়েকজন বঙ্গবধূর আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, আত্মবিবরণ ও দিনলিপিতে বিন্যস্ত খণ্ডচিত্র ও স্বীকারোক্তি অবলম্বনে রচিত নারী জীবনের অন্তর্গূঢ় বেদনা ও মানসিক ক্রম-বিবর্তনের এক অন্তরঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। সীমায়িত পারিবারিক জীবনবৃত্তে আবদ্ধ থেকেও এঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর সমমর্মিতার আলোয় অনুভব করেছিলেন সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজের পঙ্কিলরূপ, মূল্যায়ন করেছেন আশেপাশের ও কাছের মানুষদের, সেইসঙ্গে নিজেদেরও।

উদ্ধৃত জীবনবৃত্তের খণ্ডচিত্রগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের মূল্যবোধের সুনির্দিষ্ট ভাবনা। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলে বেষ্টিতা এই অন্তঃপুরচারিণীদের মনোলোকে বহির্জগতের বিপুল আলোড়ন-সংঘাত যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তার বিশ্বস্ত অনুরণন তাঁদের স্মৃতিলিপিতে পরিস্ফুট।

লেখিকা ডঃ চিত্রা দেব প্রথম নারী-আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণময়ী দেবী, মীরা দেবী, উমা দেবী, প্রতিমা দেবী, অনুরূপা দেবীর পাশাপাশি উপস্থিত করেছেন প্রায়-অখ্যাতা মনোদা দেবী, অতি সাধারণ নির্যাতিতা গৃহবধূ অমিয়বালা দেবী প্রভৃতিদের। সামাজিক বহিরঙ্গে এঁদের মধ্যে পরিবেশগত বা কৌলীন্যগত বৈষম্য থাকলেও সচেতন ভাবনার দিক দিয়ে এঁরা সকলেই ছিলেন সমধর্মী। অমিয়বালা দেবীর মতো অতি সাধারণ গৃহবধূর সমস্যা ও মনোবেদনা তৎকালীন বঙ্গসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ঠাকুর পরিবারের অন্দর-মহলের উমা দেবী, প্রতিমা দেবী, ইন্দিরা দেবী বা অনুরূপা দেবীর সমস্যা ও ভাবনার সঙ্গে একই সুতোয় গাঁথা হয়ে গিয়েছে।

আত্মবিবরণ ও স্মৃতিলিপিগুলিতে একদিকে ধ্বনিত হয়েছে অমানবিক সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ নীরব প্রতিবাদ, অন্যদিকে সূচিত হয়েছে নারী জাগৃতির অরুণোদয়ের পূর্বাভাস। পুরুষ-শাসিত ক্ষয়িষ্ণু সমাজে বহুপত্নীক পুরুষের স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব, নিষ্ঠুর সতীদাহের পৈশাচিক ঘৃণ্য আনন্দ, এমনকি মাতাপিতার আপন কন্যা সন্তানের প্রতি বিরূপ মানসিকতা— সব কিছু মিলেমিশে এক কলঙ্কময় অভিশপ্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। আধুনিক

প্রজন্মে বাংলার নারী-জাগরণের ইতিহাসের এই হল আদি পটভূমি,—আর বন্ধনমুক্তির তীব্র, ব্যাকুল প্রয়াসে এর পরিণতি।

ডঃ দেব অন্তঃপুরচারিণীদের আত্মকথা অবলম্বনে অন্তঃপুরের ইতিহাসের পাশাপাশি সেকালের জীবনচর্যার এক অন্তরঙ্গ ও প্রামাণ্য দলিল-চিত্র অপূর্ব নিষ্ঠাসহকারে নতুন করে কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু পাঠককুলের সামনে উপস্থাপিত করে এক মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করলেন, সন্দেহ নেই। লেখিকার অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। তবে বিবরণধর্মিতার সঙ্গে বিশ্লেষণধর্মিতাও এক্ষেত্রে সমভাবে কাম্য ছিল। তথ্যের সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তিমানসের সার্বিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ যুক্ত হলে গ্রন্থটির গৌরব আরও বাড়ত, সন্দেহ নেই। সবশেষে বলতে হয়—গবেষণামূলক এ জাতীয় গ্রন্থে অপ্রকাশিত রচনার (যা লেখিকা উল্লেখ করেছেন) উপস্থাপন না থাকলেও, তথ্যশুদ্ধির কিছুমাত্র হানি ঘটত বলে মনে হয় না।

ডঃ দেবের নিষ্ঠা ও প্রয়াসকে আবার সাধুবাদ জানাই।

—ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য
বাঙলা বিভাগ, লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ

ভাগবতের কাহিনী — শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। প্রকাশক : স্বামী মৃগানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ সেবায়তন, ১ ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০০৩২। পৃঃ ১৬+১৩৯ ; মূল্য : বারো টাকা।

পরাশরপুত্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্যাসদেব ভাগবতের রচয়িতা। ভাগবতে ভগবানের লীলামাধুর্য—তাঁর মহিমা—যা তৎসৃষ্ট পুরাণ, ইতিহাস, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদিতে অবর্ণিত—যার জন্য তিনি স্বয়ং আত্মতুষ্টি তথা কর্মে অপূর্ণতাবোধে কাতর ও ব্যথিত ছিলেন—তারই সার্থক ফলশ্রুতি এই ভক্তিতত্ত্ব-সমন্বিত সৃষ্টি।

ভাগবতে ১২টি স্কন্ধ ও ১৮ হাজার শ্লোক। ভাগবতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। ভক্তিই মূলকথা, সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান—ভাগবতের সর্বত্র তা পরিপ্রেক্ষিত। অর্থাৎ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—তিনিই সব। বিভিন্ন দেবরূপে ও জীবাত্মায় তিনি—সেই পরমব্রহ্মই অধিষ্ঠিত। তাঁকে যে যেভাবেই ভজনা করুক না কেন তাঁকে তিনি সেইভাবেই কৃপা করেন। গীতার (৪।১১) উক্তি :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২৯।২২) একটি শ্লোকে আছে :

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব
জুহোতি সঃ॥

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক কর্তৃক ভাগবত থেকে সংগৃহীত মাত্র ১৫টি কাহিনীতে ভক্তিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বিধৃত। ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা অনুবাদের সঙ্গে মূল সংস্কৃত উদ্ধৃতি এবং টীকার বঙ্গানুবাদ দেওয়ায় পাঠক সাধারণ অর্থোপলব্ধি এবং মূলগ্রন্থের ভাব ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ বোধ করবেন। তবে কঠিন ও সাধারণ পাঠকের অবোধ্য আরও বহু শব্দের অর্থ টীকা-অংশে দেবার অবকাশ ছিল—হয়তো লেখকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। গ্রন্থটি মূলতঃ হিত্ববর্জিত বানানে লিখিত হলেও সর্বত্র তা রক্ষিত হয়নি।

আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে এই সব সাধারণ ভুল-ক্রটি সংশোধন করে লেখক গ্রন্থটিকে সর্বাংগ-সুন্দর করবার চেষ্টা করবেন। ছাপা, বাঁধাই যথোপযুক্ত। প্রচ্ছদ হৃদয়গ্রাহী। ভাগবতকাহিনী প্রচারে লেখকের সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য মন্দাপম্ শিবির থেকে প্রাথমিক ত্রাণকার্য চলছে। ১৯৯ জন শিশুকে পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং ২৭৫ সেট বাসনপত্র, ৪৭৩টি ঝুড়ি, ৩০০টি মাদুর এবং প্রচুর নতুন ও পুরানো জামাকাপড় বিতরণ করা ছাড়াও ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৮৮,৭৬৮ জনকে খাওয়ানো এবং ১০,৫৩০ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে।

গত ২৩ এপ্রিল ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল মন্দাপম্ শিবির পরিদর্শন করেন।

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ; আর্থিক পুনর্বাসন ও গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা অগ্রগতির পথে।

পশ্চিমবঙ্গে অগ্নিত্রাণ: বাঁকুড়া জেলায় ২ নম্বর খাতরা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত রঙ্গমেটিয়া ও বাসুদেবপুর গ্রামের বহু বাড়ির চাল আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত এই চালগুলি পুনরায় তৈরি করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

অক্ষম ব্যক্তিদের কল্যাণে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমস্থ 'ব্লাইণ্ড বয়েস্ অ্যাকাডেমি'র বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। নিউ দিল্লীতে গত ১৬ এপ্রিল, রাষ্ট্রপতি আশ্রম-সচিবকে একটি প্রশংসাপত্র ও এক লক্ষ টাকার একটি ড্রাফ্‌ট্ প্রদান করেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির পরিচালনায় গত ২০ ফেব্রুআরি ১৯৮৪, দ্বিতীয় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জামশেদপুরের ৪০টি স্কুল-কলেজের ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। ঐ-সব স্কুল-কলেজের প্রায় সমসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

কালাডি (দক্ষিণভারত) রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল, তিন-দিনব্যাপী এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ১৩২ জন যুবক-যুবতী ও প্রায় সমসংখ্যক অন্যান্য প্রতিনিধি।

উৎসব

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৪ থেকে ১১ মার্চ, আটদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনা-সভায় ভাষণ দেন ড: রাধানাথ রথ, ড: সত্যব্রত শাস্ত্রী, শ্রীহৃদানন্দ রায়, শত্রুঘ্ন নাথ, শ্রীদেবীপ্রসাদ বাগচী, শ্রীমতী পদ্মিনী ত্রিপাঠী, স্বামী ভক্ত্যানন্দ, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ প্রমুখ বক্তাগণ। ওড়িশ্যার রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বম্ভর পাণ্ডের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ৬ মে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য ও ১৫ মে ভগবান শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' প্রতি রবিবার স্বামী

নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও গীতা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামী অজজানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী সুরেশ্বরানন্দ (বিধু মহারাজ) গত ১২ এপ্রিল ১৯৮৪, বৃহস্পতিবার (বাংলা মতে বুধবার ২৮ চৈত্র) রাত ২-৩০ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি বহু দিন ধরে জ্বর, বুকে ব্যথা, কাশি এবং উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। দুর্বলতার জন্য তিনি গত প্রায় ন-মাস ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দীক্ষা-প্রাপ্ত তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে যোগদান করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। রেঙ্গুন ছাড়া তিনি মেদিনীপুর আশ্রমের কর্মী ছিলেন স্বল্পকালের জন্য এবং তারপর কনখল ও বারাণসী সেবাশ্রমে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তাঁর সহজ সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

অশোকনগর (২৪ পরগনা) শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী উৎসব বিগত ১৭ থেকে ২০ ফেব্রুআরি ১৯৮৪, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী নিবৃত্তানন্দ।

আরারিয়া (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৯তম আবির্ভাবতিথি-উৎসব গত ৪ মার্চ মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। ৮ থেকে ১২ মার্চ—নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে হিন্দি ও বাংলায় ভাষণ দেন স্বামী প্রত্যগানন্দ, স্বামী ব্রহ্মেশানন্দ ও স্বামী জিনানন্দ।

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সদস্যদের উদ্যোগে গত ২৪ ও ২৫ মার্চ ১৯৮৪, দুদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন-ভাষণান্তে কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ। দুদিনের সান্ধ্য ধর্ম-সভার বক্তাগণ ছিলেন স্বামী অজজানন্দ, স্বামী অনাময়ানন্দ, শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন, ডঃ অমিয়কুমার হাটি, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর প্রমুখ। রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ পাঠচক্রের যুবকদের সেবামূলক কাজে প্রেরণা দিতে ডঃ হাটি বিনা পারিশ্রমিকে প্রায় ১৫০ জন পীড়িতের চিকিৎসা করেন। সভান্তে স্বামী অখণ্ডানন্দ গুচ্ছ সমিতির সদস্যরা এবং বিবেকানন্দ পাঠচক্রের শিল্পী যুবকরা বিবেকানন্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন।

বসিরহাট (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের নবনির্মিত মন্দিরে গত ৮ এপ্রিল, সারাদিনব্যাপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের শুভ আবির্ভাব-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীরাম-

কৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন স্বামী পরেশানন্দ এবং ধর্মসভায় স্বামী যতীন্দ্রানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দ।

নববারাকপুর (২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ সংস্কৃত পরিষদের উদ্যোগে ১২২তম স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাবতিথি-উৎসব গত ২২ থেকে ২৪ এপ্রিল, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিকালে তিন-দিনের ধর্মসভায় যথাক্রমে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায়, স্বামী ক্ষমানন্দ ও প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণার পৌরোহিত্যে ভাষণ দান করেন স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী শান্তিদানন্দ ও বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপনের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে নিম্নলিখিত স্থান হতে:

চাকদহ (নদীয়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ

খগৌল (পাটনা) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন

আগরতলা (ত্রিপুরা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ২৪ ও ২৬ ফেব্রুআরি, 'ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার পরিষদে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন ভজন, কীর্তন, পাঠ ও জপধ্যানের দিব্য আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ২৬ ফেব্রুআরি, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ প্রায় পাঁচ হাজারেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী ও ভক্তবৃন্দের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। পরিক্রমান্তে স্থানীয় শিশু উদ্যানে সমবেত তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী গহনানন্দ ও স্বামা প্রভানন্দ। পরিশেষে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও 'বসে রচনা লেখা' প্রতিযোগিতায় তরুণ-তরুণীদের পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২০ থেকে ২২ এপ্রিল, তিনদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার পরিষদে'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। তিনদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে স্বামী গহনানন্দ এবং স্বামী প্রভানন্দ। এই সম্মেলনে উত্তরাঞ্চলের অনুমোদিত ২৪টি কেন্দ্র থেকে পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্মসভায় প্রায় ছ-সাত হাজার শ্রোতা প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত থাকতেন।

তারাপদ বসু পুরস্কার

গত ২২ এপ্রিল '৮৪ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে "তারাপদ বসু বক্তৃতা ও পুরস্কার সভা" অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" এই বিষয়ে তারাপদ বসু স্মারক বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের তারাপদ বসু পুরস্কার পান বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং সাহিত্য-ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরস্কার প্রদান করেন আশ্রম সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতা করেন ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ডঃ নিমাইসাধন বসু ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। আবৃত্তিতে অংশ নেন অধ্যাপক সুহাস বিশ্বাস, অধ্যাপক ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ ঘোষ ও শ্রীমতী গৌরী ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅমিত ঘোষ।



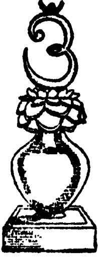
৮৬তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯১

দিব্য বাণী

…শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত আস্বাদ জগৎ পূর্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? …যাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্মকে জ্বলন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং সর্ব ধর্মমতের অন্তরে এক অপরিবর্তনীয় জীবন্ত সনাতন ধর্ম-স্রোত প্রবাহিত দেখিতেছে—সে শক্তির অভিনয় জগৎ পূর্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে? পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ুসঞ্চরণের ন্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্য-জীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্মনসোগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে—এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে? …ভারতের এবং…ভারতভিন্ন দেশের ধর্মাচার্যেরা ধর্মজগতের যে একদেশী-ভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণবালক নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই ভাব বিনষ্ট করিয়া বিপরীত ধর্মমতসমূহের প্রকৃত সমন্বয়রূপ অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইল—এ চিত্র আর কখনও কেহ কি দেখিয়াছে? হে মানব, ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উচ্চাসন যে কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা নির্ণয়ে যদি সক্ষম হইয়া থাক, ত বল; আমরা কিন্তু ঐ বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, নির্জীব ভারত তাঁহার পদস্পর্শে সমধিক পবিত্র ও জাগ্রত হইয়াছে এবং জগতের গৌরব ও আশার স্থল অধিকার করিয়াছে—তাঁহার মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করায় নর ও দেবকুলের পূজ্য হইয়াছে এবং যে শক্তির উদ্বোধন তাঁহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র লীলাভিনয়ের কেবল আরম্ভ মাত্রই শ্রীবিবেকানন্দে জগৎ অনুভব করিয়াছে।

—স্বামী সারদানন্দ

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৩৬—৩৭]



কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোত

দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির সেই পরিচিত ঘরখানি। একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জনকয়েক ভক্ত, কেহ মেঝেতে বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া আছেন। কথা হইতেছিল,—কেন এত আকর্ষণ। সরল জিজ্ঞাসা: "আচ্ছা, লোকে যে এত আকর্ষণ হয়ে আসে এখানে, তার মানে কি?" প্রশ্নকর্তা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ,—আবার উত্তরদাতাও তিনিই। বিভিন্ন ভাবের লোকের বিচিত্র সব আকর্ষণ-কেন্দ্র। তাব অনুযায়ী টান। সমীপাগত ভক্তরা মুগ্ধচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিতেছিলেন। সহসা মাস্টার মহাশয়—শ্রীম কথার পৃষ্ঠে বলিয়া বসিলেন:

"এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয়, তা হলে বেশ হয়। সে স্রোতের টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে, সে ত আর একঘেয়ে হবে না।"

একটি অভিনব কল্পনা,—আন্তরিক কল্যাণ-প্রস্তাব। না, একটি মঙ্গল-সঙ্কল্প,—সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রার্থনা। অবতীর্ণ ভগবান সম্মুখে আসীন,—তাঁহার নিকট ভক্তের আকুল আকুতি কোন কিছু বৈভব নহে, শুধু একটি 'স্রোত',—এক অনবদ্য 'স্রোত', যাহা সকল কিছুকেই প্লাবিত করিবে, অথচ নবীনতায় সদাপ্রাণবন্ত থাকিবে। ভগবান কি তাহা শুনিয়াছিলেন? আমরা জানি, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিয়াছিলেন:

"আমি যার যা ভাব, তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 'এ কথা বোল না,—আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভুল।' হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।"

এইরূপ একটি অনবদ্য অভূতপূর্ব স্রোত সত্যই বহিয়া চলিয়াছে, ইহা দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আজ। আরও লক্ষণীয় যে, এই স্রোত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া অনিশ্চিত অতলে ডুবাইয়া দিতেছে না,—বরং যাহারা ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, ডুবিতে বসিয়াছিল, দিশাহারা হইয়া মরিতেছিল,—এই স্রোতকে আশ্রয় করিয়া তাহারা কূল পাইতেছে—স্ব-স্ব ভাবেতে পুনরধিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে। যাহারা আপন পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, তাহাদিগকে নিজ লক্ষ্যগামী পথে,—নিজ নিকেতনে পৌঁছিবার সরল সরণিতে তুলিয়া দিতেছে এই স্রোতের বেগ। আবার আন্তরিক স্রোতাপন্ন হইলে, যাহার যাহা স্ব-ভাব তাহারই সর্বতঃপুষ্টি হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই যে বলিয়াছিলেন: "যাহার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি" এবং "আন্তরিক ডাকলে ভগবান লাভ হবে।" মনে হয় এই দুই বৈশিষ্ট্যই এবারকার স্রোতের অভিনবত্ব। দিকে-দিগন্তে সারা বিশ্ব জুড়িয়া স্রোত

বহিয়া চলিয়াছে। প্রবহমান এই স্রোতের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে একটি পুরাতন মসজিদ। অজ্ঞাতপরিচয় কে একজন মুসলমান ফকীর সন্ধ্যাবেলায় ঐ মসজিদের সম্মুখে পথের ধারে একাকী দাঁড়াইয়া আর্তস্বরে ডাকিতেছেন—"প্যারে আ-যাও, আ-যাও।" ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রুর প্লাবন বহিতেছে। ফকীরের ব্যাকুল রোদনে সন্ধ্যার শান্ত আকাশ তারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল,—যেন সমবেদনার প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল, "প্যারে আ-যাও, আ-যাও।" সহসা দক্ষিণ দিক হইতে একখানি ঘোড়াগাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসিয়া ঐ পথের প্রান্তে—একেবারে সেই মসজিদ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। গাড়ির দরজা খুলিয়া তীরবেগে নামিয়া আসিলেন তিনি—স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রেমে করুণায় উদ্বেল হইয়া সেই ক্রন্দন-ব্যাকুল ফকীরকে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ফকীরও সেই দিব্য আলিঙ্গন-স্পর্শে অকস্মাৎ কেমন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। একটি স্বর্গীয় দৃশ্য! কেহ জানিল না, কে সেই মুসলমান সাধক? আর তাঁহার নয়ন জল মুছাইতে কোথা হইতে কে ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রেমিকের হৃদয় লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন?

রামলাল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘাট হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতেছিলেন সেই ঘোড়াগাড়িতে। প্রেমিক ভক্তের আন্তরিক ডাক তাঁহার প্রাণের 'প্যার'-কে ঠিক মিলাইয়া দিয়াছিল—বেগে ধাবমান গাড়িখানিকে রুখিতেই হইয়াছিল। পথ এখানে বাধ সাধিতে পারে নাই,—মত প্রতিবন্ধক হয় নাই। কালীঘাট হইতে দক্ষিণেশ্বর অবধি বিস্তৃত পথের মাঝে ঐ অখ্যাত জীর্ণ মসজিদের অবস্থানটি যাত্রায় যতি আনিয়াছিল,—কিন্তু ছন্দঃপাত ঘটায় নাই। বরং সমগ্র যাত্রাটিকে কী অপূর্ব সুন্দর দ্যোতনাময় করিয়া তুলিয়াছিল! শ্রীরামকৃষ্ণের অনিন্দ্য একখানি আলেখ্য—তাঁহার প্রণয়বিগলিত মধুর রূপের প্রকাশ দেখিয়া নিকটবর্তীরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা দেখিয়াছিল, হিন্দুর দেবালয় হইতে নির্গত একটি আলোক-স্রোত ইসলামী ভজনালয়ের প্রাচীরে ঠেকিয়া রুদ্ধ হইয়া পড়ে নাই, পরন্তু উহাকেও ঘিরিয়া বেষ্টন করিয়া অধিকতর গতিবেগ লইয়া পুনরায় আর এক দেবমন্দিরের দিকেই প্রধাবিত! স্রোতপথে দণ্ডায়মান, আন্তরিক আকুল সকলকেই নির্বিচারে স্পর্শ করিয়া আলিঙ্গন দিয়া, সে আপন ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোত। এই স্রোত চৈতন্যালোকের, তাই যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাতেই চৈতন্যের সাড়া জাগে।

এই আশ্চর্য ভাবস্রোত সর্বপ্রকার মত-পথের বাধাকে অতিক্রম করিয়া জড় ব্যক্তিসত্তার ক্ষীণ-ধারাগুলিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে এক চৈতন্য-সমুদ্রের লক্ষ্যাভিমুখে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল দেহ থাকিতে থাকিতেই এই অভূতপূর্ব উত্তাল ভাবতরঙ্গলীলা তদানীন্তনের মানুষ চাক্ষুষ করিয়াছে কলিকাতা মহানগরীর রাজপথে, শহরের উপকণ্ঠে রানী রাসমণির দেবালয়-উদ্যানে, পল্লীর প্রাঙ্গণে-প্রান্তরে, তীর্থক্ষেত্রের পুণ্যপীঠে। তাহারা সবিস্ময়ে দেখিয়াছে, সকল মত ও পথের মানুষ সেই এক স্রোতের টানে একই কেন্দ্রে আসিয়া জুটিতেছে! বৈদান্তিক তাঁহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে,—সচ্চিদানন্দঘন পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য মানিয়াছেন। বৈষ্ণবভক্ত আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে পুনরাবির্ভূত শ্রীচৈতন্য বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। শাক্ত সাধক তাঁহাকে দেখিয়া সত্যই অনুভব করিয়াছেন শিব-শক্তি একাধারে লীলারত। শৈব আসিয়া দেহধারী শিবের দর্শনলাভে কৃতার্থ

হইয়াছেন। নানকপন্থী সাধুর দৃষ্টিতে তিনি গুরুরূপে প্রকট হইয়াছেন। ভগবৎপরায়ণ সকলে তাঁহাকে দেখিয়াছেন—একই দেহে রাম ও কৃষ্ণের যুগ্ম প্রকাশ। রক্ষণশীল খ্রীষ্টান ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে নতজানু হইয়াছেন,—তাঁহাকে দেখিয়াছেন ঈশামসি যীশুর সহিত অভিন্ন। ইসলামপন্থী আরাধক তাঁহার মধ্যে ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শকে ঘনীভূত দেখিয়া মাথা নত করিয়াছেন। যুক্তিবাদী দেখিয়াছেন কঠোর যুক্তিনিষ্ঠ এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বকে,—নাস্তি-মতের কেহ আসিয়াও চমৎকৃত হইয়াছেন সরল সত্যের দৃঢ় প্রত্যয়ান্বিত রূপ দেখিয়া। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অভিভূত হইয়াছেন এক অপরিসীম বিরাটত্ব দেখিয়া—স্বতই তাঁহারা না বিশ্বাস করিয়া পারেন নাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হইতেছেন পূর্ব পূর্ব ধর্মাচার্যগণের সমষ্টীভূত জীবন্ত বিগ্রহ,—"পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর তখন কঠিন রোগজ্বালায় দীর্ণ-জর্জর। কাশীপুর উদ্যান-ভবনে ভক্তগণের মন বিষাদে মলিন,—কেবলই আশঙ্কা, আনন্দের হাট ভাঙিতে বুঝি-বা আর বিলম্ব নাই। কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এত উৎকণ্ঠা, তাঁহার নিজের কিন্তু ব্যাধি-শয্যাতেও ভাবের বিরাম ছিল না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ডাক্তার কোট্‌স তদানীন্তন কালের খ্যাতনামা চিকিৎসক। ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে ডাক্তার কোট্‌সকেই অনুরোধ করা হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসাভার গ্রহণের জন্য—তিনিও সাগ্রহে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রোগের গতি ও পরিস্থিতি পরীক্ষান্তে উহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। রোগ চিকিৎসাতীত বুঝিলেও, যাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া ঐ দুরারোগ্য রোগ, সেই আশ্চর্য রোগীকে দেখিয়া তিনি হতবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার কোট্‌স সবিস্ময়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন,—বাইবেলে বর্ণিত যীশুর সঙ্গেই মাত্র ইঁহার অবস্থা তুলনীয়। খ্রীষ্টধর্মী ইংরেজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী রোগী পরীক্ষা করিতে আসিয়া, দেখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার নিজ উপাস্য যীশুখ্রীষ্টকে! আবিষ্ট হইয়াছিলেন সমাধিমগ্ন আশ্চর্য রোগীর অঙ্গ-বিচ্ছুরিত অপরূপ ভাবস্রোতে!

পাশ্চাত্য দেশীয় ভক্ত উইলিয়ামস্ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরতনয় খ্রীষ্ট বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুযায়ী বাকী জীবন তিনি হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে কঠোর সাধন-তপস্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে, নরেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরের ঐ দিব্যপুরুষের ঠিকানা জানাইয়াছিলেন একজন বিদেশী দার্শনিক পণ্ডিত—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ রেভারেণ্ড হেস্টি, যিনি তখন জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যক্ষ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভূতির চরমে যে ভাব-তন্ময়তা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কবিদের জীবনে লক্ষ্য করা যায়, ছাত্রদিগের নিকট তাহাই বুঝাইতে গিয়া অধ্যক্ষ হেস্টি বলিয়াছিলেন: "মনের পবিত্রতা এবং বিষয়-বিশেষের প্রতি একাগ্রতার ফলে ঐরূপ অনুভূতি আসিয়া থাকে। অবশ্য ইহা অতি দুর্লভ, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে; আমি কিন্তু এমন একজনকে দেখিয়াছি যিনি মনের ঐ অতি সূক্ষ্ম উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। সেখানে গিয়া তোমরাও দেখিয়া আসিলে ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

নানা সংস্কার, বিশ্বাস, ভাষা ও ধর্মের পথচারী মানুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোতে অবগাহন করিয়াছেন—অভিস্নাত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনে কোন্

বস্তু লাভ হইয়াছে? তাঁহারা স্ব-স্ব ভাবকেই স্পষ্টতর বোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন—আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। ইহাই চরম লাভ। ইতিহাসে অনন্যসদৃশ এই শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোত। তখনকার দিনের অতিশয় সংরক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-উন্নয়নবাদী প্রসিদ্ধ 'বেদব্যাস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই অভূতপূর্ব স্রোত-প্রবাহের চমৎকার একটি ছবি পাওয়া যায়। উহাতে ছিল:

"আমরা প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিতাম। আমরা এই সময় তাঁহার নিকট নানা ধর্মাবলম্বী দর্শকে পূর্ণ দেখিতাম। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন,—হিন্দু তো আছেই; আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত নববিধানী ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রবর্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তিগদগদভরে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীকার বিশ্বমনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার অতুলনীয় লেখনীতে যে অনবদ্য সর্বভাব-সংরক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণকে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের আলোচনীয় বিষয়টি কবিতার ভাষায় ব্যক্ত দেখা যায়। রোলাঁ লিখিয়াছেন: "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাঁহার চারিদিকে আনন্দ ও মুক্তির বায়ু বহিতে দিতেন। গ্রীষ্মদগ্ধ আকাশের ভারে মুহ্যমান আত্মাগুলি আবার তাহাদের দল মেলিয়া ধরিত। তিনি চরম হতাশকেও আশ্বাস দিতেন। 'ভয় কি, ধৈর্য ধর। বৃষ্টি আসিবেই! আবার তুমি সবুজ হইয়া উঠিবে।'"

মহাদেবের জটা-উৎসারিত লোকপাবন গঙ্গার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-নির্গত এই স্রোতধারা আজিও বহিয়া চলিয়াছে নিকটে, দূরে ও দূরান্তরে,—দেশ-কাল ও জাতি-বর্ণের সকল বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার গতি এখনও অপ্রতিহত,—এবং উত্তরোত্তর বেগ আহরণ করিতে করিতে প্রবহমান রহিয়াছে। ইতিহাস আরও বলিতেছে, এই স্রোতধারাকে যুগযুগব্যাপী গতিমুখর রাখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থাটিও শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং করিয়া রাখিয়াছেন—তাঁহারই দ্বিতীয় বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত চাপরাশ প্রদানের দ্বারা। "নরেন শিক্ষে দিবে…" ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে লেখা এই ফরমান সাহায্যে তিনি বিবেকানন্দকে ঐ ভাবস্রোত পরিবহণের প্রধান যান্ত্রিক-পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল দেহ অন্তর্ধানে সেই স্রোতধারার গতি তাই কেবল অবিরাম নহে, উত্তরোত্তর প্রবলতর আকারে ধাবমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরে একদিন কামার-পুকুরে শ্রীশ্রীমায়ের সেই যে এক আশ্চর্য দর্শন: সম্মুখের রাস্তা দিয়া ঠাকুর আসিতেছেন, আর তাঁহার পাদপদ্ম হইতে বিপুল জলস্রোত নির্গত হইয়া তরঙ্গাকারে পুরোভাগে সবেগে প্রবাহিত হইতেছে—নরেন্দ্রনাথ প্রমুখরা ঠাকুরের পশ্চাতে চলিয়াছেন,—তাহাই উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোতের অলৌকিক ভাবরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগমনকারী নরেন্দ্রনাথই যে ঐ স্রোত-বারিকে বিশ্বময় সিঞ্চন করিবেন, তাহারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত শ্রীমায়ের দেখা আরও একখানি ভাবালেখ্যের মাঝে আমরা পাইয়াছি। দিব্য সেই দৃশ্যটি এইরূপ:

সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। মা তখন বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-ভবনে অবস্থান করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আকাশ প্লাবিত,—মৃদু বাতাসে হিল্লোলিত গঙ্গা-বক্ষে ঐ জ্যোৎস্নারাশি যেন গলিত রৌপ্যের ন্যায় আলোড়িত। শ্রীমা গঙ্গায় নামিবার সোপানে বসিয়া আবিষ্টচিত্তে জাহ্নবী-দর্শনে বিভোর হইয়া আছেন।

সহসা স্পষ্টই দেখিলেন, তাঁহার পিছন দিক হইতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অতি দ্রুতপদে গঙ্গায় অবতরণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই চিন্ময় দেহখানি ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে গলিয়া মিলাইয়া গেল। মা অপলক নেত্রে দর্শন করিতেছেন—তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন এক মুহূর্তে সেখানে নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব মায়ের মুগ্ধ নেত্রকে আরও চমকিত করিল। আচার্য বেশে বিবেকানন্দ 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি সহকারে দুই অঞ্জলি ভরিয়া সেই পূত বারিকে গঙ্গাতীরস্থ অগণিত নরনারীর উদ্দেশে ছিটাইতে থাকিলে বিপুল জনমণ্ডলী মস্তক অবনত করিয়া উহা ধারণ করিতেছে এবং সদ্যোমুক্তির আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিতেছে!

শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট এই অলৌকিক দৃশ্যটি তাঁহার কাছে এমন বাস্তব ছিল যে, তিনি অতঃপর কিছুকাল পর্যন্ত স্বীয় চরণস্পর্শের আশঙ্কায় গঙ্গায় নামিয়া অবগাহন করিতে পারেন নাই। বহমান গঙ্গার স্রোতকে মা সত্যসত্যই দ্রবীভূত শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। জগজ্জননীর এই দিব্যদর্শনের মর্মার্থ অত্যন্ত গূঢ়,—এবং তাৎপর্য দূরপ্রসারী। শ্রীনরেন্দ্র-বাহিত এই ভাবগঙ্গার সর্বলোকপরিপ্লাবী সূক্ষ্ম রূপ—অনাগত কালের মানুষের জন্য উহার কল্যাণ-চিত্রখানিই যেন মায়ের ঐ দর্শনের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা শান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। বর্তমান বিশ্বের সকল স্তর এবং সর্ব-শ্রেণীর মানুষের জন্যই উহা আজ শান্তিপ্রদ তীর্থ-বারিস্বরূপ। ত্রিতাপ-দগ্ধ মানুষ যখন উগ্র ঐহিক মাদকতায় ঘরে বাহিরে বিপর্যস্ত, হিংসা-বিদ্বেষ ও কাম-লালসায় পশুপ্রায় অস্থির, তখন তাহার জন্য এই পুণ্য স্রোতরাশিই জীবনের একমাত্র নিদান, ইহা পৃথিবীর মনীষীরা আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের এই সর্বাত্মক কল্যাণকর প্রভাবে বিশ্বের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিমুগ্ধ—তাঁহারা অকপটে ঘোষণা করিতেছেন, যুদ্ধ-জর্জর এই পৃথিবীকে যদি মানব-বাসোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে এই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাশ্রয় ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বিকল্প নাই। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যই নহে, আধুনিক পৃথিবীর মানুষকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতেও বাঁচিতে ও বাঁচাইয়া রাখিতে ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত অন্য পন্থা নাই। নোবেল-পুরস্কারে সম্মানিত বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান্ তাই আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন যে, এই নূতন স্রোতধারা ভাবী পৃথিবীর গঠনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিবে। আমাদের দেশেরও প্রবীণ মনীষী—রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও দার্শনিকগণের চিন্তায় ঐ একই সুরের অনুরণন আমরা পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়াছি। চক্রবর্তী রাজাগোপালকে অবশেষে বলিতে শুনিয়াছিলাম: "যতপ্রকার রাজনীতি আছে সকলের মধ্য দিয়া যাইবার পরে, দেশের যতরকম দুঃখকষ্ট আছে তাহা প্রত্যক্ষ জানিবার পরে, আমাদের দেশের যাবতীয় যন্ত্রণাকে অপরের মুখেও শুনিবার পরে, আমি এখন এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই মহাদেশের ভাগ্যের উন্নতি করা আদৌ সম্ভবপর নহে, যদি-না আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা উত্তম হিন্দু হই—মুসলমান এবং খ্রীষ্টানরা উত্তম মুসলমান এবং খ্রীষ্টান হন। আর উত্তম হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টান হইতে গেলে, দেশকে বাঁচাইতে হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করা অপেক্ষা শ্রেয়তর পথ কিছু নাই।"

জাতি-ধর্ম, বর্ণ-কর্ম এবং শ্রেণী-গোষ্ঠী নির্বিশেষে বিশ্বের সকল প্রান্তেই এখন এই এক তৃষ্ণা—যে-তৃষ্ণার নিবারণ অন্য কোন কিছুর দ্বারা আর সম্ভব হইতেছে না—সকলেই তাই সন্ধান করিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোতবারির। বিশ্বের সমাজতন্ত্রী

দেশগুলির মানুষ যাঁহারা দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ইদানীং কিছু একটা সুস্থির অবলম্বনকে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যেও নবীন চিন্তার আলোড়ন জাগিয়া উঠিতেছে। চীন বা রাশিয়ার চিন্তাধারা স্পষ্টতঃই পুষ্ট হইতে চাহিতেছে বৃহত্তর এই ভাবস্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়া,—তদ্দেশীয় মনীষিগণ এখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবস্রোতের গতি-প্রকৃতি লইয়া গবেষণায় মন দিয়াছেন।

কম্যুনিস্ট চীনের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক হুয়াং জিন্ চুয়ান্ তাঁহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিষয়ক বিশ্রুত গবেষণা-গ্রন্থে বার বারই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিশিষ্ট ভাবস্রোত কেবলমাত্র ভারতবাসীর জন্যই নহে, সমগ্র মহাচীন তথা বিশ্বমানবের জন্যই শান্তি ও মুক্তির নিদান। তিনি তাই সম্প্রতি সগর্বেই জানাইয়াছেন: "চীনের জনগণ স্বামী বিবেকানন্দকে ভুলিতে পারে না এবং তাঁহার প্রতি ইহারা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকে।" আরও উল্লেখ্য পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মনস্বী গবেষক এক পত্রে তাঁহার অতি সুচিন্তিত সঙ্কল্পকে প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন: "চীনে ও বহির্বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবরাশির প্রচারণায় আমি নিশ্চয়ই আরও উদ্যোগী হইব।"

রাশিয়াতেও উত্থিত নবীন চিন্তা-তরঙ্গ এই শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোতের সহিত মিলনোন্মুখ,—তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন আমাদের গোচরে আসিতেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কোস্থ সায়েন্স আকাদেমীর প্রবীণ সদস্য ডক্টর ই. পি. চেলিশেভ ইতিমধ্যেই যশস্বী ভারত-তত্ত্ববিদ্ তথা বিবেকানন্দ-গবেষকরূপে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখনী হইতে জানিয়াছি: "মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—যাহা তত্ত্বতঃ এক ও অভিন্ন—তাহার বহুল চর্চা একান্তই প্রয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষ আন্তরিক বিশ্বাস করে যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব ও বাণীই পারে নিপীড়িত ধরণীতে শান্তি, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে। ...সেই কারণেই আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ার বহু পণ্ডিত গবেষক ও মনস্বী ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুশীলনের দিকে বিশ্বমানবের প্রবণতা যে উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, ইহা এখন বহুবিদিত সংবাদ। সকল মতের ও পথের মানুষ চাহিতেছে এমন একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শকে, যাহাকে বরণ করিয়া লইলে জীবনে স্থিতি আনিবে, শান্তি দিবে,—অথচ স্ব-ভূমিকে, স্বীয় বিশ্বাস-কেন্দ্রকে হারাইবার বেদনা সহিতে হইবে না। স্ব-স্বভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই—আপন আপন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলিকে আলো-বাতাসযুক্ত স্বাস্থ্যকর করিয়া গড়িয়া লওয়াই সাধারণ মানুষের কাম্য। এক কথায় মানুষের আজ সর্বাধিক প্রয়োজন একজন পরম দরদী বন্ধুর—যে তাহার সর্ববিধ বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার ত্রুটিকে স্নেহভরে ক্ষমা করিবে,—আবার তাহাকে হাতে ধরিয়া আগাইয়া লইয়াও চলিবে পূর্ণতার পথে—শান্তি ও স্বস্তির লক্ষ্যে,—ভারতীয় ঋষিদের পরিভাষায় বলিতে গেলে আত্মস্বরূপের আনন্দ-নিকেতনে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে সর্বদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ পরম বন্ধুরূপে পাইয়া থাকে, তাহাদের নিজ নিজ ঘরের মাঝেই—আপন আপন কর্মক্ষেত্রে সহযোগী সঙ্গীবেশে। একজন বিশিষ্ট বিদেশী পণ্ডিত, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহম্মদ দাউদ্ রহ্‌বার একখানি ইংরেজী সংস্করণ কথামৃত হাতে পাইয়া তাই সাহ্লাদে মন্তব্য করিয়াছিলেন: "এই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া ইহাই বুঝিলাম যে, জীবনের বহু-অপেক্ষিত একজন

বন্ধুকেই চিনিয়া লইতে পারা যাইবে এই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।"

দক্ষিণেশ্বরের গোমুখী হইতে উদ্‌গত ভাব-গঙ্গার বৈশিষ্ট্য বুঝি এখানেই। ইহাই শ্রীরাম-কৃষ্ণ-স্রোতের অপূর্বতা। স্মিতমুখে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন: "আমি যার যা ভাব, তার সেই ভাব রক্ষা করি।" আর পরম আশ্বাসও দিয়া-রাখিয়াছেন: "নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান লাভ হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্রোতধারা বহিয়া চলিয়াছে। উহার শান্ত কল্লোলে কোলাহল নাই,—আছে অমৃত-নিস্যন্দী পরমানন্দের গান। উহার নীরব গতি মৃত্যুকে জয় করিবার নূতন পথ দেখাইতেছে। স্নিগ্ধ-সুন্দর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে মানুষকে দেবত্বের প্রতি-শ্রুতি দিতেছে। এমন স্রোত-ধারার তটে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভিড়ের মাঝে দাঁড়াইয়া শুধুমাত্র 'ধন্য, ধন্য' বলিয়াই কি আমরা আত্মতৃপ্ত থাকিব? অথবা, লোকপাবন এই স্রোত-সলিলে নামিয়া অবগাহনেও উদ্যোগী হইব? ভাবিবার বিষয় আমাদের ইহাই।

আমার এ দেহরথে

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইন্‌স্টিটিউট ফর্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

হইয়া সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ-পাদ,
রচিয়া বিচিত্র বিশ্ব লভিছ আস্বাদ—
প্রতিরূপে, প্রতিরসে,—প্রতিসত্তামাঝে।
বিশ্বরূপ!—বিশ্বদেহ তোমাতেই রাজে।
হইয়া জগৎ-স্বামী বিশ্বকৃৎ-কারু,
একি লীলা পঙ্গুদেহ! ব্রহ্মরূপী দারু?
হে বিরাট! জগন্নাথ! রচি' চরাচরে,—
অঙ্গুষ্ঠ হইয়া নিত্য বিরাজ অন্তরে।

আমার মলিন বুদ্ধি ধরিতে তোমায়
অন্তর ছাড়িয়া সদা বিশ্বপানে ধায়।
তোমার অসীম রূপের দশাঙ্গুল খেলা
না বুঝিয়া করিয়াছি কত অবহেলা!
আমার এ দেহরথে বিরাট বামন!
সদা তিষ্ঠ পূর্ণ করি' ভঙ্গুর জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[বৈশাখ, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

৭

গান্ধীজীর রাজনৈতিক অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক চরকা আন্দোলন অঙ্গাঙ্গি সংশ্লিষ্ট। গান্ধী-আন্দোলনকালে চরকাকেন্দ্রিক অর্থনীতি ভারতবর্ষে প্রায় ধর্মনীতির রূপ ধরেছিল। এই বিষয়ে গান্ধী-নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করেন প্রবুদ্ধ ভারতের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ। তিনি এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক ধারণার কথাই তুলে ধরেন, যা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়নকে সমর্থন করেছে। ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে অশোকানন্দ কমপক্ষে আটটি প্রবন্ধ এই সূত্রে লেখেন। অশোকানন্দ অত্যন্ত সাহসী পুরুষ (না হলে তিনি গান্ধীজীর প্রভাব যখন ভারতবর্ষকে একেবারে অভিভূত করে রেখেছে তখন প্রবন্ধগুলি লিখতে পারতেন না), তিনি শক্তিশালী তীক্ষ্ণধী লেখক (যিনি এইকালে একদিকে প্রবুদ্ধ ভারতে রোমাঁ রোলাঁর মতো বিশ্বমনীষীর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনকথা প্রকাশ করে গেছেন, অন্যদিকে প্রায় প্রতি সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে যেখানেই রোলাঁর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি সেখানেই যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন)—তাঁর রচনাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। স্মরণ করিয়ে দেব, মেঘনাদ সাহা গান্ধীজীর কুটীরশিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন অশোকানন্দের রচনাগুলির বেশ কয়েক বছর পরে, এবং স্বীকার্য অশোকানন্দের রচনায় মনস্বিতার দীপ্তি ছিল উজ্জ্বলতর। সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদ আরও পরবর্তীকালের।

অশোকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী-সংঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ গান্ধীজীর কাছে আদর্শপুরুষ, সুতরাং মিশনের মুখপত্রে গান্ধী-নীতির প্রতিবাদ (যা অনেকের কাছে অনাধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হয়েছিল) গান্ধীজীকে এমনই বিচলিত করে যে, তিনি তাঁর অতি ব্যস্ততার জীবনেও দুবার নিজ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে অশোকানন্দের মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন। উদ্বোধনের বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিস্তৃত প্রসঙ্গের মধ্যে আমি প্রবেশ করতে চাই না, কারণ এই স্বল্প পরিসরে তা আলোচনা করা যাবে না। ভবিষ্যতে উভয়ের মতের মোটামুটি বিস্তৃত পরিচয়দানের পরেই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে। গোটা বিষয়টির বিস্তৃত পর্যালোচনা থাকবে প্রস্তুয়মান 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে।

৮

বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর মতপার্থক্যের ক্ষেত্র ছিল,—ঐক্যের ক্ষেত্রও কম ছিল না। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমই বিবেকানন্দ ও গান্ধীর প্রধান ঐক্যভূমি। গান্ধীজী স্বামীজীর সম্বন্ধে বলবার সময়ে এই দিকগুলিতে বিশেষ জোর দিয়েছেন—এবং এসব ক্ষেত্রে নিজ জীবনে স্বামীজীর প্রভাবও স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ৩০ জানুআরি ১৯২১, বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মোৎসবে সানুচর গান্ধীজীর উপস্থিতি ও বক্তৃতার কথা। বক্তৃতাটির নানা বয়ান সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে বেরিয়েছিল, তা নিয়ে কিছু বিতর্কও হয়েছিল।

প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার মার্চ ১৯২১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণে স্বামীজীর প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বক্তব্য প্রায় নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সবিশেষ

আগ্রহের কথাই আছে। ঐ বিবরণে আছে, গান্ধীজী ৬ ফেব্রুআরি মঠে এসেছিলেন [না, তিনি ৩০ জানুআরি মঠে আসেন], তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মহিলা ছিলেন, "তাঁরা এসেছিলেন ভারতের দেশপ্রেমিক-ঋষি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। মহাত্মা ও তাঁর সঙ্গীরা বহু প্রশ্ন করেন; যথা—মিশন কতগুলি প্রতিষ্ঠান চালায়, কতসংখ্যক কর্মী আছেন, হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কিভাবে যেতে হয়, ইত্যাদি। তারপর তাঁরা মন্দির-কক্ষে যান। কক্ষটি সুসজ্জিত, গোলাপ ফুলে এবং ভক্তদের প্রদত্ত পূজাদ্রব্যে ভরা। তাঁরা পূজা-পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত মহাবীরের প্রতিকৃতি তাঁদের চোখ এড়ায়নি। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর প্রতিকৃতি মহাত্মার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি প্রশ্ন করলে তাঁকে সারদাদেবীর মাতৃভাবের কথা, আজন্ম পবিত্র জীবনের কথা বলা হয়। তারপর তাঁরা সংলগ্ন 'শয়ন ঘরে' যান। সেখানে গভীর শ্রদ্ধা ও যত্নে রক্ষিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিস। মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত তোষকটি স্পর্শ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-লিখিত 'মহাবীর পালা'-র পুঁথি মহাত্মা গান্ধীকে দেখানো হয়। মহাত্মাজী ও তাঁর সঙ্গিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রূপ দেখে বিস্মিত হন। যিনি নাকি ভাল করে নাম সই করতে পারতেন না, এবং অশিক্ষিত প্রজ্ঞা থেকেই কথা বলতেন, তাঁর লেখা এইপ্রকার।" [অনূদিত]।

উদ্বোধনে ১৩২৮, বৈশাখ মাসের সংবাদ :

"স্বদেশসেবক মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক এই দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন এবং [স্বামীজীর] উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু, মৌলনা মহম্মদ আলি এবং অপরাপর দেশনায়করা আগমন করেন। জনসাধারণের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী হিন্দীতে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'আচার্যের বাক্যাবলী তাঁহার জীবনে নূতন আলোক আনয়ন করিয়া নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তোমরাও এই পুণ্যদিবসে তাঁহার মন্দির হইতে নূতন ভাব ও আলোক লাভ করিয়া স্বদেশসেবায় নিযুক্ত হও'।"

উদ্বোধনের সংবাদে আরও পাই—গান্ধীজীর বক্তৃতা বিষয়ে "অনেক অলীক কথা" সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, যার প্রতিবাদ তাঁরা করেছেন। হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্যই ঐ প্রকার ঘটেছিল।

বেঙ্গলী ও অমৃতবাজারের রিপোর্টে অবশ্যই কিছু 'অলীক কথা' ছিল। এই সংবাদপত্রগুলি তখন গান্ধীজী বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কী বললেন তা নিয়ে ব্যস্ত ছিল না—অসহযোগ আন্দোলনের সেই দারুণ আলোড়নের ক্ষণে গান্ধীজী কোন্ রাজনৈতিক কথা বলেছিলেন, তাই জানতেই উদ্‌গ্রীব ছিল, তারই ঝোঁকে হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞতার সুবিধা গ্রহণ করে, গান্ধীজী যা বলেননি, তাও তাঁর মুখে বসিয়ে দেয়। ১ ফেব্রুআরি ১৯২১ বেঙ্গলী ও অমৃতবাজারে যে একই রিপোর্ট বেরোয় তার মধ্যে স্বামীজী-প্রসঙ্গে গান্ধীজী যা বলেছিলেন তার উল্লেখমাত্র ছিল না—ছিল এই কথা—তিনি ছাত্রদের কলেজে ফিরে যেতে নিষেধ করেছেন এবং পুলিশকে তাদের কর্মত্যাগে প্ররোচিত করেছেন। বলা বাহুল্য গান্ধীজী বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মোৎসব সভায় স্বামীজীর বিষয়ে কোন কথা না বলে ঐ রকম প্ররোচক রাজনৈতিক কথাবার্তা বলতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর এই বিষয়ে প্রতিবাদ পত্র ৩ ফেব্রুআরির বেঙ্গলীতে বেরিয়েছিল। তিনি আরও জানিয়ে দেন—বেঙ্গলীর রিপোর্টমতো মতিলাল নেহরু বা মহম্মদ আলি

বেলুড়ে বক্তৃতা করেননি।[১]

গান্ধীজী বেলুড়ের সভায় কী বলেছিলেন, তার পুলিশী বিবরণের মধ্যে দেখা যায়, তিনি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং শ্রোতারা হিন্দী সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী নয় বলে তিরস্কার করেন। তিনি পুলিশকে অত্যাচার করতে নিষেধ করেন। পুলিশকে তিনি নিজের-নিজের কাজ করে যেতে বলেন; তাদের এখন চাকরি ছাড়ার দরকার নেই; তবে সে ডাক দিলে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। সরকারের চাকরি না চাইতে এবং কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে সাহায্য করতেও তিনি আবেদন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্যের এই সারসংক্ষেপ গোয়েন্দা রিপোর্টে ছিল :

"He began by saying that he bore great respect for the Late Swami Vivekananda. He had studied many of his books and said that his ideals agreed in many respects with that great man. If Vivekananda were alive it would have been a great help for their national awakening. However his spirit was amongst them and that they should do their best to establish Swaraj. He said that they should learn to love their country before anything else and they should be of one mind."[২]

আরও দুটি সূত্র থেকে এই বক্তৃতায় স্বামীজী-প্রসঙ্গ পাই। রামকৃষ্ণ মিশনের দপ্তরে অবশ্যই প্রয়োজনীয় কিছু কথা সংগৃহীত ছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দ 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থ থেকে তথ্য গ্রহণ করে 'হিস্টরি অব দি রামকৃষ্ণ মঠ অ্যাণ্ড মিশন' গ্রন্থে লিখেছেন :

"The Mahatma said···that he had come that day to pay his respects and homage to the sacred memory of Swami Vivekananda;···that he had carefully read the works of the Swami, as a result of which his love for the country had become intensified; and that his request to the young men was that they should not leave that day without imbibing some inspiration from the place where Swami Vivekananda had lived and breathed his last."

রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীতে এই প্রসঙ্গে পাই :

"বিবেকানন্দের কক্ষের বারান্দা থেকে গান্ধী ঐ মহান হিন্দুর সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধার কথা ঘোষণা করেন, যাঁর বাণী তাঁর মধ্যে ভারতপ্রেমের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুলেছে।"

অন্য এক জায়গায় রোলাঁ লিখেছেন :

"গান্ধী প্রকাশ্যভাবে একথা স্বীকার করেছেন যে, বিবেকানন্দের গ্রন্থপাঠে তিনি প্রভূত উপকার পেয়েছেন—গ্রন্থগুলি ভারত সম্বন্ধে তাঁর বোধ ও প্রেম বর্ধিত করেছে।"

এখানে প্রসঙ্গতঃ জানাই, রোমাঁ রোলাঁর বই গান্ধীজী পড়েছিলেন, এবং তার সমাদরও করেছিলেন। কুসুম দেশাইকে ৩০. ৫. ১৯৩২ পত্রে লিখেছেন, তিনি তখনও রোলাঁর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বইগুলি পড়ছেন।[৩] ৩. ৬. ১৯৩২

১ বেঙ্গলীর ১ ফেব্রুআরির সংবাদ আমি ১৩৭৬ 'শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় "বিবেকানন্দ ও গান্ধী" রচনার মধ্যে উদ্ধৃতি করেছি।

২ Gandhi Works, Vol. 19, pp. 307—08 ৩ Ibid, Vol. 49, pp. 502—03

ডি. বি. কালেলকরকে লিখলেন, বই দুটি পড়ে শেষ করে ফেলেছেন।[৪] ৬ জানুআরি ১৯৩৩, অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে মাদলিন রোলাঁকে লিখলেন, তাঁর ভাইকে অর্থাৎ রোমাঁ রোলাঁকে 'মঁসিয়ে রোলাঁ', বা 'আপনার ভাই', এইভাবে সূচিত করতে তাঁর বাধছে, ঐ কথাগুলি অত্যন্ত অকাব্যিক, এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশে অসমর্থ। তিনি ভবিষ্যতে রোলাঁকে 'ঋষি' বলেই সম্বোধন করতে ইচ্ছুক। তারপর লেখেন: "অনুগ্রহ করে ঋষিকে জানাবেন, কয়েক মাস আগে আমি প্রথম তাঁর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বই দুটি পাই। সেগুলি পড়ে গভীর আনন্দ পেয়েছি।"[৫]

বই দুটি শেষ করার পরেই কিন্তু গান্ধীজী এদের বিষয়ে কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন—নবজীবন প্রেসের ম্যানেজার স্বামী আনন্দানন্দের কাছে লিখিত পত্রে (১. ৭. ১৯০২)। মনে হয়, স্বামী আনন্দানন্দ গান্ধীজীকে বই দুটির কোন-কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তিসূচক প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁর উত্তরে যা লেখেন, তার মধ্যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর ধারণার স্পষ্ট পরিচয় মেলে তিনি লিখেছিলেন:

"রোলাঁর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিষয়ে গ্রন্থগুলি পড়ে শেষ করেছি। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি সর্বদাই ভক্তি বোধ করছি। তাঁর সম্বন্ধে আমি খুব কমই পড়েছি। [অন্ততঃ তিনি অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-জীবনীটি পড়েছিলেন, যার ভূমিকা লিখেছেন।]। কিন্তু তাঁর ভক্তগণের কাছ থেকে যেসব জিনিস কিছু কিছু শুনেছি তাতে আমার ঐ [ভক্তির] অনুভূতি জেগেছে। রোলাঁর বই তাতে অধিক কিছু যোগ করেছে তা বলতে পারি না। বস্তুতঃপক্ষে রোলাঁর দুটি বইই পাশ্চাত্য পাঠকদের জন্য লিখিত। একথা বলব না, বইগুলি থেকে আমাদের কিছুই পাবার নেই। তবে আমার ক্ষেত্রে অন্ততঃ লাভের অঙ্ক সামান্যই। [রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর] যেসব জিনিস আমাকে প্রভাবিত করেছে তা রোলাঁর বইগুলিতেও আছে। বাড়তি যে-জিনিস আছে তা মনে অধিক ছাপ ফেলেনি। আমার কাছে প্রতীয়মান হয়ে ওঠেনি, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের মতোই ভক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দের প্রেম বিরাট। ভাবাবেগে পূর্ণ তিনি—তারই টানে ভেসে যেতেন। [ঈশোপনিষদের] হিরণ্ময় পাত্রের মতো তা তাঁর জ্ঞানকে আবৃত করে রাখত। রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে তিনি যে পার্থক্য করেছেন, তা করা ঠিক হয়নি! কিন্তু এরকম বিরাট পুরুষের সমালোচনা করার অর্থই হয় না, আর সমালোচনার মুখ খুলে দিলে আমরা যথেচ্ছ যে-কোন মানুষের সমালোচনা আরম্ভ করে দিতে পারি। আমাদের কর্তব্য হল, ঐ ধরনের পুরুষের কাছ থেকে যা পারি তাই শিক্ষা করা। তুলসীদাসের একটি দোঁহা আমার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তদনুযায়ী আমি সমালোচনা করতে ইচ্ছুক নই। ["বিধাতা এই পৃথিবীতে সজীব বা জড় সবকিছুকেই ভাল-মন্দ মিশিয়ে তৈরি করেছেন। হাঁস যেমন নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করে তেমনি ভাল লোক মন্দকে ত্যাগ করে ভালকেই বেছে নেয়।"] কিন্তু যেহেতু তুমি জানতে চাইবে, [রোলাঁর বই সম্বন্ধে] আমার সমালোচনা করার কিছু আছে কিনা তাই এই পর্যন্ত লিখলাম। আমার এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই—বিবেকানন্দের দান বিরাট। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি—তিনি যাকে সত্য বলে মনে করেছিলেন তার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে

৪ Ibid, Vol. 50, p. 11 ৫ Ibid, Vol. 52, p. 377

আমি যখন বেলুড় মঠ দেখতে গিয়েছিলাম, তখন বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মঠের এক সন্ন্যাসী আমাকে জানান, তিনি অসুস্থ, কলকাতায় আছেন, তাঁর সঙ্গে কারও দেখা হওয়া সম্ভব নয়।"[৬]

গান্ধীজী ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক শাখা-প্রতিষ্ঠানে গেছেন, সেখানকার কার্যাবলীতে সন্তুষ্ট হয়েছেন, এবং স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও করেছেন। সিংহল ভ্রমণকালে কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ১৩ নভেম্বর ১৯২৭, বলেছিলেন :

"...যে অল্প সময় পেয়েছি তার মধ্যে আপনাদের মুদ্রিত কার্যবিবরণীতে চোখ বুলোবার চেষ্টা করেছি। আপনাদের কার্যাবলীর জন্য অভিনন্দন জানাই। বিবেকানন্দের নাম জাদুমন্ত্র-স্বরূপ। ভারতবর্ষের জীবনে তিনি অনপনেয় প্রভাব রেখে গেছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁর নামে স্থাপিত সমিতি দেখা যায়—রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাগুলির কথা বাদ দিয়েই বলছি।...আপনাদের সমিতির সাফল্য কামনা করি। সেই সঙ্গে আরও বলি আপনাদের কার্যাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না আপনারা যে-কাজের দ্বারা দরিদ্রনারায়ণের সেবা হবে, তাকে এই সঙ্গে গ্রহণ করেন। চরকার মর্মবাণীর সম্বন্ধে আপনাদের সমাদরের নিদর্শন আপনাদের প্রদত্ত এই টাকার তোড়া। বিবেকানন্দের নামে যখন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম তখন আপনারা কদাপি ভারতের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে উপেক্ষা করতে পারেন না, আর সর্বত্র এ বিশ্বাস জেগেছে যে, চরকা ভিন্ন ভারতের কোটি-কোটি মানুষের সেবা করা সম্ভব নয়।"[৭]

রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনের আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সভায় গান্ধীজী ১৪ মার্চ, ১৯২৯ যোগদান করেন ও বক্তৃতা করেন। তাঁর সঙ্গে মৌলনা মহম্মদ আলী ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর আলী ভাইকে যে সঙ্গে পেয়েছেন তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করার পরে বলেন :

"এখন আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলব। তিনি এক বিরাট কর্তব্য আমাদের উপর ন্যস্ত করে গেছেন। তাঁর জীবনাদর্শে আমি বিশ্বাসী—সেই আদর্শ অনুসরণ করতে আপনাদের আহ্বান করছি। যেখানেই আমি যাই না কেন, রামকৃষ্ণের অনুগামীরা আমাকে তাঁদের মধ্যে আমন্ত্রণ করেন। আমি জানি, তাঁদের আশীর্বাদ আমার কাজের উপর বর্ষিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত সেবাশ্রম ও হাসপাতালগুলি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাঁরা ছোট বা বড় আকারে কাজ করে যাচ্ছেন না। তাঁরা হাসপাতাল খুলছেন, দরিদ্রদের চিকিৎসা করছেন, ওষুধ দিচ্ছেন।... রামকৃষ্ণের নাম যখন আমার মনে পড়ে তখন বিবেকানন্দের কাজের কথা আমি বিস্মৃত হতে পারি না। বিবেকানন্দ তাঁর আচার্যকে পৃথিবীর গোচর করেছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এমন সেবাশ্রমের সংখ্যাবৃদ্ধি হোক। আশা করি, হৃদয়ে যাঁরা পবিত্র এবং ভারতবর্ষের প্রতি যাঁদের ভালবাসা আছে, এমন মানুষেরা এতে যোগদান করবেন। ভারতবর্ষের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা কাজ করে যান।"[৮]

৬ Ibid, Vol. 50, pp. 126—27

৭ Ibid, Vol. 35, pp. 233—34

৮ Ibid, Vol. 40, p. 144

—[এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি, উপরের তিনটি তথ্য আমি পেয়েছিলাম বিখ্যাত গান্ধী-বিশেষজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর কাছ থেকে।]

আমরা দেখি ২৪ এপ্রিল ১৯২৯, গান্ধীজী পোতুমুরুতে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরি'-র ভিত্তিস্থাপন করেছেন।[৯] এই বৎসরই নভেম্বর মাসে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দর্শন করেন।[১০]

গান্ধীজীর স্মরণীয় তীর্থদর্শনের মধ্যে পড়ে ১৯২৭ মার্চ মাসে কন্যাকুমারী দর্শন। পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত-ভ্রমণের অন্তে স্বামী বিবেকানন্দের কন্যাকুমারিকার সমুদ্রশিলায় ধ্যান এবং উপলব্ধি ভারত-ইতিহাসের এক মহামুহূর্ত—সেকথা আমরা আগেই জেনে এসেছি। বিবেকানন্দের হিমালয়-ধ্যান কন্যাকুমারিকায় লোক-করুণায় বিগলিত হয়েছিল। গান্ধীজী সেই করুণাধারা দিকে দিকে প্রবহনের ভগীরথ। কিন্তু কি বিচিত্র, অথবা সেটাই স্বাভাবিক—কন্যাকুমারিকায় গান্ধীজী এসে বিবেকানন্দ যাকে ফেলে এসেছেন তাকেই পাবার জন্য সমস্ত মনপ্রাণকে সংহত করেছিলেন। কন্যাকুমারিকায় গান্ধীজী হিমালয়ের ধ্যান সন্ধান করেছিলেন !!!

কন্যাকুমারিকা দর্শনের পরে গান্ধীজী 'নবজীবন' পত্রিকায় ২৭ মার্চ ১৯২৫, যে প্রবন্ধ লেখেন সেটি গান্ধীজীর প্রচলিত ধীর রীতির রচনার তুলনায় যথেষ্টই কাব্যিক ও ভাববিহ্বল। গোটা ভারতের রূপচিত্র তিনি দিয়েছিলেন—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, করাচী থেকে আসাম। ভারতের পাদমূল ধৌত করছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর। কন্যাকুমারী অন্য কেউ নন, স্বয়ং পার্বতী—শিবের সঙ্গে বিবাহের তপস্যায় নিরত। দুই সমুদ্রের মিলন এখানে। এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। গান্ধীজী এসবই লিখেছিলেন।

তারপর :

"কী অসাধারণ স্থাপত্য রচনা করেছেন ঋষিরা! প্রাচীনদের কি-না আশ্চর্য সৌন্দর্যবোধ! ভারতের সর্বনিম্ন প্রান্তে, আমাদের পৃথিবীর সমাপ্তিবিন্দুতে, ঋষিরা নির্মাণ করেছেন কন্যাকুমারীর মন্দির, আর পুরাণকারগণ রূপের ছবিতে তাকে সাজিয়েছেন। নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের বাসনা আমার নেই, তবু স্থানটিতে সৌন্দর্য উপচে পড়েছে। এখানে আমি ধর্মরহস্যের অমৃতপানই করেছি। সুন্দর ঘাটটিতে যখন আমি পা ডুবিয়েছি তখন আমার এক সঙ্গী আমাকে বললেন, 'ঐ শিলাখণ্ডের উপরে গিয়ে বিবেকানন্দ ধ্যান করতেন।' সে কাজ তিনি করুন বা না-করুন—তিনি তা করতে পারতেনই; ভাল সাঁতারু ওখানে সাঁতরে যেতে পারেন। ঐ শৈলদ্বীপের মতো পূর্ণ শান্তির স্থান আর কিছু নয়। সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গীত কোমলমধুর বীণাধ্বনির মতো—ধ্যানের আবাহন-গীতি কেবলই বাজিয়ে যাচ্ছে। তদনুযায়ী এখানে প্রবলতর হয়েছে আমার ধর্মব্যাকুলতা। ঐ শৈলদ্বীপের উপরে সমতল স্থানটিতে স্বচ্ছন্দে শতশত মানুষ উপবেশন করতে পারে। আমার ইচ্ছা হল, ওখানে গিয়ে বসি, আর গীতা আবৃত্তি করি। শেষ পর্যন্ত সেই পবিত্র বাসনাকেও আমি সংযত করেছি, নীরবে বসে থেকেছি, গীতার আচার্যের চিত্র আমার হৃদয়কে পূর্ণ করেছে।"

বিবেকানন্দ-শৈলের উপরে আছড়ে-পড়া তরঙ্গ-শব্দে গান্ধীজী বীণাধ্বনি শুনেছেন বা শুনতে চেয়েছেন, সেই একই অনুভূতি অন্যের নাও হতে পারে, সুগম্ভীর সমুদ্রশব্দে হয়তো মৃদঙ্গধ্বনি তাঁরা শুনবেন, যা কিন্তু একই পরিণতি দেবে—ধ্যান ও সমাধি। সে যাই হোক, কন্যাকুমারিকায় গিয়ে বিবেকানন্দের যন্ত্রণার উত্তরাধিকার থেকে

৯ Ibid, Vol. 40, p. 277
১০ Ibid, Vol. 42, p. 156

গান্ধীজী অবশ্যই অব্যাহতি পেতে পারেন না কন্যাকুমারীর মন্দিরে ঢুকবার আগে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে ভাঙ্গী মনে করেন, তাঁকে কি মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে? তিনি অবশ্য মূর্তিপূজার বিরোধী নন; ঈশ্বরকে নানা আকারে পূজা করা সম্ভব; খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা যখন গির্জা বা মসজিদের বিশেষ পবিত্রতার কথা বলেন তখন তাঁরা কার্যতঃ মূর্তি-পূজক (গান্ধীজীর এই কথাগুলি বিবেকানন্দেরই অনুসারে)—গান্ধীজীর এই মনোভাবও জানা গিয়েছিল। তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলেও গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, কারণ তিনি কালাপানির পারে গেছেন! সেই কৃতকর্মের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা। আর অস্পৃশ্যদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না তাদের জন্মের অপরাধে! কন্যাকুমারিকায় ধ্যানে শান্তি যিনি চেয়েছিলেন তাঁকে বড় বেদনায় লিখতে হয়েছিল:

"আমার সুখের সঙ্গে দুঃখও জড়িয়ে গিয়েছিল। আমাকে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়েছি বলে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধের কারণ ভিন্ন—তাদের জন্ম। কি করে এ জিনিস সহ্য করা যায়? কন্যাকুমারী কি কলুষিত হতে পারেন? প্রাচীনকাল থেকে কি এই রীতি চলে আসছে? আমার হৃদয়ের স্বর বলে উঠল—না না, তা হতে পারে না। আর যদি তা ঘটেও থাকে তবু তা পাপ। যা পাপ—প্রাচীনত্বের কারণে পাপক্ষয় হয়ে তা পুণ্যবস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে না। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিটি হিন্দুর উচিত, এই কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য প্রবল চেষ্টা করা।"[১১]   [ক্রমশঃ]

১১ Ibid, Vol. 26, pp. 424—25

ভ্রম-সংশোধন

বৈশাখ ১৩৯১ সংখ্যায়, ২৬৯ পৃষ্ঠার ১৭ ক্রমিক সংখ্যায় ৯ পৌষের স্থানে ২৯ পৌষ এবং ১৮ ক্রমিক সংখ্যায় ২৯ মাঘের স্থানে ৯ মাঘ পড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বামীজীর জন্মতিথি ২৯ পৌষ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি ৯ মাঘ।—সঃ

'শ্রমিকগণ—সমান অধিকার অর্জন করুন'

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে ধনিকেরা আরও সমৃদ্ধ হয়। শ্রমজীবী জনসাধারণ হয় দরিদ্রতর—অর্থাৎ ধনতন্ত্রের পরিণাম হল দারিদ্র্যের প্রসার ও ধনবৈষম্যের চরম। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি দিয়ে স্বামীজী বলছেন—"Machines are making things cheap, making for progress and evolution, but millions are crushed, that one may become rich ; while one becomes rich, thousands at the same time become poorer and poorer, and whole masses of human beings are made slaves" (p. 5—6)। [শিল্পযন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ হইতেছে, কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে ; একজন ধনশালী হইতেছে, একই কালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে, দলকে দল মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে। (বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২)]।

এই দারিদ্র্যের প্রসার—শ্রমজীবী জনসাধারণকে যে ধনিকদের দাস মাত্রে পরিণত করে বিবেকানন্দ তা এখানে সুস্পষ্ট উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

এই নির্দয় শোষণ, এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চিরদিন কখনই চলতে পারে না। স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এর মৃত্যু অনিবার্য, এর মৃত্যু আসন্ন—"The present mercantile civilization must die, with all its pretensions and humbug" (p. 6) [দম্ভ এবং অহমিকাপূর্ণ বর্তমান বণিক্‌-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। (বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮)]

কিন্তু জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কোন্ পন্থায় ? বিবেকানন্দ স্পষ্ট করে কি বলেছেন যে রক্তাক্ত বিপ্লবই এর একমাত্র উপায় ? তাঁর দু-একটি কথা থেকে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে তিনি রক্তাক্ত বিপ্লবের কথাই বলেছেন। এরকম দুটি কথা—(i) "The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China. I can't quite see which, but it will be either Russia or China." (p. 6) (ii) "We (in India) are to solve the problems of the Shudra,…but oh, through what tumults ! through what tumults !" (p. 6) এবিষয়ে কিন্তু অধ্যাপক Earnest Horrwitz-এর ধারণা ভিন্ন। তিনি মনে করেন, বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত বিপ্লব সংঘটিত হবে—"Through cultural means" এবং তা খানিকটা আপনা থেকেই ঘটবে, অক্ষম পরগাছা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশই অসহায় বোধ করবে, শিক্ষা বিস্তারের ফলে শ্রমিক শ্রেণী আপন শক্তি উপলব্ধি করবে, এ সময়ে অর্থ হবে 'মৃত মূলধন,' জীবন্ত মূলধন শ্রমিকের শ্রম, সেই মূলধন সহায়ে শ্রমিকগণ প্রাধান্য লাভ করবে ("Ramakrishna through the Brahmo and Christian Admirers, pp. 113—15)। তাঁর মতে রুশ বিপ্লব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবতা-দর্শনের বাস্তব রূপায়ণ এবং বিবেকানন্দ ও Lenin সমগোত্রীয়। বিবেকানন্দের স্বপ্নই লেনিনের প্রচেষ্টায় সফল (ঐ পৃঃ)। কিন্তু লেনিন ও বিবেকানন্দের পন্থায় প্রভেদ আছে, বিবেকানন্দের হল "cultural means" সহায়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারতে' (Modern India) যে আলোচনা করেছেন তাতে মনে হয়, তিনি বিপ্লব বলতে কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণীক্ষমতার পরিবর্তনকে বোঝাননি। 'বিপ্লব' আরও ব্যাপকতর ব্যাপার —এক আমূল রূপান্তর। এবং ভারতের ইতিহাস তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেছে এই সত্য যে ভারতে এই বিপ্লব যুগে যুগে ঘটেছে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে। এ বিষয়ে তাঁর নিজ মুখ-নিঃসৃত কথা হল—"ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ-দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ-দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭) এ প্রসঙ্গে তিনি 'জৈন-বিপ্লব' ও 'বৌদ্ধ-বিপ্লব'—কথা দুটিও ব্যবহার করেছেন। এখানে সুস্পষ্ট যে, সে ধর্মকে তিনি এক বৈপ্লবিক ভূমিকায় দেখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজ-বিপ্লব ঘটছে ধর্ম-বিপ্লবের মাধ্যমে—এ অনস্বীকার্য সত্য, এ ইতিহাস, ভারতে এর প্রমাণ মিলেছে। ইতিহাসকে তিনি সম্মান দেখিয়ে সেজন্য বলেছেন—এই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পথই ভারতের নিজস্ব পথ। এ পথেই ভারতের পরবর্তী বিপ্লব ঘটবে—উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ধর্ম-বিপ্লব ব্রাহ্ম আন্দোলন, আর্যসমাজের আন্দোলন, রামকৃষ্ণের আবির্ভাব, সবই তার সূচনা—এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ভারতে ধর্ম-দর্শনের শীর্ষ চূড়া বেদান্ত। এই বেদান্ত-দর্শনের সার কথা প্রতি জীবে ব্রহ্ম আছেন, অথবা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই অনন্ত শক্তি সুপ্ত আছে, অতএব সকলেরই বড় হবার ও মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। বেদান্তকে বাস্তব করে তুলতে হলে সেই সমাজ, সেই রাষ্ট্র, সেই ধর্ম চাই যা হবে এই সত্যের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সেখানে কোন বিশেষ সুবিধা থাকবে না। তাঁর সুদৃঢ় মত—"The work of the Advaita is to break down all privileges." বেদান্তের কাজ হল সকল প্রকার বিশেষ সুবিধা—তা ধনবৈষম্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে থাকুক বা বিদ্যা-বুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে থাকুক —তাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। তাঁর বিপ্লব-দর্শনের ভিত্তি এই বেদান্ত-দর্শন, বেদান্তের এই অগ্নিময় সাম্য-শিক্ষাকে তিনি দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রাম ও রক্তপাত ঘটেছে, কিন্তু তার দ্বারাই সমাজে স্থায়ী সাম্য আসতে পারে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে—বিবেকানন্দ এইরূপ ইঙ্গিতও প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে পরবর্তী সমাজ—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা অবশ্যম্ভাবী, যাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, তারও আধ্যাত্মিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে নতুবা তা স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না। এখানে মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন—"Everything goes to show that Socialism or some form of rule by the people, call it what you will, is coming on the boards. The people will certainly want the satisfaction of their material needs, less work, no oppression, no war, more food. What guarantee have we that this, or any civilisation, will last, unless it is based on religion, on the goodness of man? Depend on it, religion goes to

the root of the matter. If it is right, all is right." (C. W., Vol. V, p. 204) [ভাবগতিক দেখে বোধ হয় যে, সোশ্যালিজম্ বা অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম যাই দিন না কেন, শীঘ্র প্রচলিত হবে। লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা চাইবে—যাতে তাদের কাজ পূর্বাপেক্ষা কমে যায়, যাতে তারা ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় জানবেন যে, ধর্ম সকল বিষয়ের মূলদেশ পর্যন্ত গিয়ে থাকে। যদি ঐটি ঠিক থাকে তবে সব ঠিক। (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩)।]

মার্কস ব্যবহারিক জীবনে স্থূল প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত সম্পদ বণ্টনের সাম্যের উপর জোর দিয়েছেন। তার তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানুষকে যা মানুষ করে তোলে তার সেই আত্মিক পরিচয় ব্যতীত সাম্য-ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারে না। এ বিষয়ে অধ্যাপক সোরোকিনও বলেন—ইন্দ্রিয়ানুগ সভ্যতা মানুষের অধঃপতন ঘটায়, মানুষকে দেহসর্বস্ব, আত্মসর্বস্ব পশুতে পরিণত করে, মানুষকে মহৎ সুন্দর সত্যকারের মানুষ করে তুলতে হলে চাই অধ্যাত্মবাদ যা বিশ্বাস করে মানুষের পূর্ণত্বে, মানুষের মধ্যে মহৎ সম্ভাবনায় (The Social and Cultural Dynamics Pp.628)। স্বামীজীও বলেছেন—"ধর্ম পশুকে মানুষ করে, মানুষকে করে দেবতা।"

পাশ্চাত্যে সাম্যবাদীদের সঙ্গে স্বামীজীর যোগাযোগ ঘটেছিল। কাদের সঙ্গে ঘটেছিল তা পুরো আমাদের জানার সুযোগ দেননি তাঁর জীবনীকারেরা, আমরা একমাত্র যুবরাজ ক্রোপোট্‌কিন্-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ তথ্য পাই। তাও তাঁদের মধ্যে আলোচনার কোনও বিশদ বিবরণ পাই না। কিন্তু স্বামীজীর নিজের উক্তি হতে আমরা জানতে পারি যে, তাঁরা অনেকে একথা উপলব্ধি করেছিলেন (স্বামীজীর বক্তব্য শুনে) যে সাম্যবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত বেদান্ত। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি—"All the social upheavalists, at least the leaders of them, are trying to find that all their communistic or equalising theories must have a spiritual basis, and that spiritual basis is in the Vedanta only. I have been told by several leaders, who used to attend my lectures, that they required the Vedanta as the basis of the new order of things." (C. W. Vol. V, p. 212—13) [সব সমাজ-সংস্কারকেরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছেন—আর সেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন, নূতনভাবে সমাজ গঠন করতে হলে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার। (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩)]

উক্তিটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা গবেষকদের নিকট নিষ্প্রয়োজন। মার্কসবাদ মানুষের যে গভীরতম দেশে যেতে পারেনি বেদান্ত সেখানে পৌঁছেছে; সেজন্যই স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদীরাও বেদান্তের ভিত্তি চেয়েছেন। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রের যে ধারণা আমরা স্বামীজীর মধ্যে পাচ্ছি তা পূর্ণতর, তা শ্রমিকের অধিকারকে

আরও দৃঢ়ভিত্তিক করে গড়তে সহায়তা করবে। এ উক্তিটিও সেজন্য আলোচ্য গ্রন্থ মধ্যে স্থান পেলে ভাল হত।

সমাজতন্ত্রকে দৃঢ়ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হলে "আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ, শক্তিমান", স্বার্থলেশহীন মানুষ চাই যারা নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস করবে "সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির কল্যাণ।" এইরূপ বলিষ্ঠ মানুষ গড়ে তুলতে না পারলে সমাজতন্ত্রের স্থায়িত্ব লাভ করা মুশকিল। জীবদেহে যেমন প্রতিটি অণুকণা দৃঢ় ও সবল হলে সম্পূর্ণ জীবদেহটি সবল ও দৃঢ় হয়, তেমনি প্রতিটি মানুষ পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে উঠলে সমাজদেহ সবল হয়, দীর্ঘজীবী হয়। এর জন্য যেমন একদিকে চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ, অপরদিকে চাই স্বাধীনতা। বিবেকানন্দের মতে—"Freedom is the first condition of growth." স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। এজন্য তিনি চেয়েছেন পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা। সেজন্য তাঁর সমাজতন্ত্রের দুটি ভিত্তিপ্রস্তর—একটি ধর্ম, অপরটি ব্যক্তি-স্বাধীনতা। বার্নস্ বলেছেন, যদি এমন কোনও আদর্শ থাকত যা একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সমন্বিত করে অবস্থিত, তাহলে তাই হত বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের গ্রহণযোগ্য আদর্শ। সেই পূর্ণ আদর্শের প্রবক্তা স্বামীজী। মার্কসবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান নেই।

স্বামীজী তিনটি বৈপ্লবিক ধারণা আমাদের দিয়েছেন। একটি 'মানুষের স্বরূপ' সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি 'ধর্ম' সম্পর্কে, তৃতীয়টি 'বিপ্লব' সম্পর্কে। প্রতি মানুষে অনন্ত সুপ্ত শক্তি আছে, তার বিকাশের সম্ভাবনাও অনন্ত। প্রতিটি মানুষের তাই বড় হবার ও মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা—সেজন্য সকল সুযোগ, সকল অধিকার প্রতিটি মানুষকে দিতে হবে। এই হল তাঁর প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত ধর্ম তাঁর মতে ক্রিয়াকলাপ, আচার নিয়ম মাত্র নয়, ধর্ম মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ, ধর্ম জাগরণ, ধর্ম হল 'হওয়া'। মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি মার্কসের ধারণার সঙ্গে মেলে না—মার্কসের মত জড়বাদভিত্তিক। ধর্ম সম্বন্ধেও মার্কসের মত—ধর্ম মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা-প্রসূত কুসংস্কার মাত্র, ধর্ম মানুষের পক্ষে আফিম স্বরূপ, ধর্ম মানুষকে ভীতিগ্রস্ত করে তোলে, ধর্ম শোষণের সহায়। স্বামীজী ঠিক বিপরীত ধারণা দিলেন—'ধর্ম' জাগরণ, মানুষকে তা ভয়হীন করে তোলে, ধর্ম শোষণের অবসান ঘটায়, সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটায়।

স্বামীজীর বিপ্লবের ধারণাও পৃথক। রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামই বিপ্লব নয়, যদিও তা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। স্বামীজী ইতিহাসকে এখানে অস্বীকার করেননি, বলেছেন—"ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭) কিন্তু প্রকৃত 'বিপ্লব' যার উপর সাম্যবাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তা আসে বিকাশের পথে, হঠাৎ হিংসাত্মক কার্যকলাপ বা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নয়। আসে ধর্মীয় আদর্শের প্লাবনে, মনুষ্যত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে। একমাত্র এপথেই আসতে পারে আমূল রূপান্তর—সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধার মূলোৎপাটন।

সেজন্যই তিনি বলেছেন বারবার—"I want man-making religion", "I want man-making education." অন্ধ অজ্ঞ মানুষদের কোনও লক্ষ্যের দিকে তাড়িত করে নিয়ে গেলেই যে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়—এ তিনি বিশ্বাস

করতেন না। তিনি চেয়েছেন, শিক্ষার দ্বারা জনগণের চোখ খুলে দিতে। তিনি আরও চেয়েছেন, নেতৃত্ব জনগণের মধ্য হতে গড়ে উঠুক। মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিতদের তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি জানতেন, তাদের অস্ত্র রাজনীতি, তারা জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য নিয়ে—রাজনীতি করে নিজেরা ক্ষমতায় আসীন হবে। 'মুক্তি' সবসময় স্বোপার্জিত হলে তা সত্যিকারের 'মুক্তি' হয়, না হলে তা একসময় পায়ে শৃঙ্খল হয়ে ওঠে। জনগণ সত্যই জাগরিত হোক, শিক্ষার দ্বারা তাদের অভ্যুদয় ঘটুক, নিজের মুক্তি নিজেরা তারা অর্জন করুক—এই তিনি চেয়েছেন। তাই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"Put the chemicals together, the action will take care of itself." অখণ্ডানন্দ মহারাজকে লিখেছেন—"প্রতি গ্রামে একটি চাষীর ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে তার হাতে গ্রামের ভার ছেড়ে দাও, তার চেয়ে বেশী কিছু করতে চেও না।"

এখানে একথাও উল্লেখনীয় যে, তিনি দেখে-শুনে পাশ্চাত্যে উন্নতির মাধ্যম বলে গৃহীত পন্থা রাজনীতিকে বর্জন করেছিলেন। কারণ, তিনি পাশ্চাত্যের ইতিহাসে তার ব্যর্থতা প্রমাণিত দেখেছিলেন। আলোচ্য পুস্তিকায় এ প্রসঙ্গে একটি উক্তিতে তিনি বলছেন—"On the other hand, the political systems that we are struggling for in India, have been in Europe for ages, have been tried for centuries, and have been found wanting. One after another, the institutions, systems have been condemned as useless; and Europe is restless, does not know where to turn." তিনি তথাকথিত গণতন্ত্রের স্বরূপ পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে দেখেছেন, যার ভিত্তিতে আছে—'ঘুষের রাজত্ব' 'দিনে ডাকাতি', দেখেছেন ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতা, দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর মূর্তি। রাজনীতি মানুষের অধঃপতন ঘটায়, মানুষের অধঃপতন ঘটিয়ে তার কোনও মঙ্গল করা যায় না। তাঁর কথা—"কাদা দিয়ে কি কাদা ধোওয়া যায়।" রাজনৈতিক পন্থার এই ব্যর্থতা নিয়ে পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যেও অনেকে লিখেছেন। বিবেকানন্দের আগে লিখেছেন এমার্সন পরবর্তী কালে কার্ল জেস্পার যাঁর বিশ্বাস রাজনীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে মানুষের মঙ্গলসাধনে। রাজনীতি যে 'নগ্ন ক্ষমতার উপাসনা' একথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। সেজন্য রাজনৈতিক পন্থায় বিপ্লব মানুষের কল্যাণ আনবে—এ তিনি মনে করেননি। সেজন্য তিনি চেয়েছেন সর্বাগ্রে আধ্যাত্মিক বিপ্লব। বলেছেন—"Before flooding India with socialistic or political ideas, deluge the country with spiritual ideas"; বলেছেন—"বেদান্তের 'অভীঃ' মন্ত্রে এদের জাগাব।" বলেছেন—"সর্বত্র জনসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখানো হইয়াছে—ক্রমশঃ তাহারা সত্যসত্যই পশুস্তরে নামিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এখন আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক; তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে—নিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রহিয়াছেন; সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তরবারি তাঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না; তিনি অবিনাশী অনাদি অনন্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী। অতএব আত্মবিশ্বাসী হও। (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১৪)।

আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রমিক ও জনগণের যুগ যুগ ধরে উচ্চশ্রেণী কর্তৃক শোষণ, তদুপরি ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলি স্থান পেয়েছে। এই দুইপ্রকার শোষণকেই তিনি বর্তমানে জনগণের দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন। স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন—"জন-সাধারণকে অবহেলা করাই ভারতের জাতীয় অবনতির কারণ।" উচ্চশ্রেণীকে তিনি সাবধান করেছেন যে, "তাঁরা আর জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারবেন না।" (p. 25) সবচেয়ে সে যুগের পক্ষে বৈপ্লবিক ও আশ্চর্য উক্তিটি তিনি করেছেন—"The only hope of India is from the masses. The upper classes are physically and morally dead." (p. 25) আমরা তাঁর অনুরাগিবৃন্দ একথার তাৎপর্য গ্রহণ করতে পেরেছি কি? জনগণের উন্নতি বিনা ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। আজ আমাদের একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত জনগণের যাতে উন্নয়ন ঘটে—সেইরকম কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়া। উন্নয়ন শুধু 'অর্থ সাহায্য দান' বা দরিদ্রনারায়ণ সেবা বলতে আমরা যা বুঝে এসেছি তা নয়, শিক্ষার মাধ্যমে পূর্ণ বিকাশ, তার সঙ্গে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা এনে দেওয়া—এরূপ গঠনমূলক কাজই প্রয়োজন। তবেই তাঁর স্বপ্নের 'নূতন ভারতের' অভ্যুদয় ঘটবে, যে ভারতকে তিনি আহ্বান করেছেন—"...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে।" (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২)।

সে যুগে এদেশে সকল সংস্কারকদের মধ্যে একমাত্র স্বামীজীরই একটি বাস্তব গণশিক্ষার পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধেও গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলি আলোচ্য পুস্তিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লব আনবে 'তরুণেরা', তাদের উদ্দেশে উচ্চারিত তাঁর অগ্নি-আহ্বান, তাদের যে শক্তি-মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত করতে চেয়েছেন সেই শক্তি-মন্ত্রও গ্রন্থ মধ্যে লভ্য।

অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত 'Proletariat! Win Equal Rights' পুস্তিকাটি তাই যে-কোনও সমাজসেবীকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাঁর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

কামারপুকুরে শ্রীমন্দির-দর্শনে

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রূপের মন্দির তলে
অরূপের ধ্যানশিখা জ্বলে।
রূপান্বিত হে পাষাণ! প্রণাম প্রণাম।
প্রাণান্বিত হে বিগ্রহ, নয়নাভিরাম,
ফোটাও এ প্রাণপদ্ম করুণার প্রেমস্পর্শভরে
জ্বলুক নিমেষে আলো লক্ষবর্ষ অন্ধকার ঘরে!

যোগোদ্যানে শতবর্ষ

অধ্যাপিকা অপর্ণা রায়

ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ।

ভক্তের বিরহদুখে
কেঁদেছেন ভগবান
'কে কোথায় আছিস রে আয়'
হৃদয় মথিত সেই
প্রেমপূর্ণ সতৃষ্ণ আহ্বানে
কত মহানদ-নদী
শুনেছেন সাগরের ডাক,
দিয়েছেন সাড়া
শ্রীচরণে সমর্পণ
হয়ে আত্মহারা।
ধরাতলে ত্রিতাপ সহিতে
অবহেলে এসেছেন
সপ্তর্ষির ঋষিশ্রেষ্ঠ
স্বয়ং শিবের অবতার,
সদানন্দ ব্রজের রাখাল,
আরও কত দিকপাল
ভক্তবৃন্দ তাঁর।

আজও বাজে বিশ্বজুড়ে
অনাহত গভীর আহ্বান,
ভক্তকে খুঁজিছে প্রেমে
পূর্ণ ভগবান।
'যোগোদ্যানে ধূলিমাঝে
শুধুমাত্র পদচিহ্ন নয়,
আপনারে রেখেছি মিশায়ে
ভকত পরশ পাব বলে
রব চির আশাপথ চেয়ে।'
সেই বাণী যে শুনেছে,
আপনার হৃদয় বীণায়
তরঙ্গিত রক্তস্রোতে
প্রবাহিত শিরায় শিরায়।
সে সুর মন্দ্রিত দূর
অরণ্য-পর্বত-নীলিমায়,
ফুটে ওঠা ফুল হয়ে,
সীমাবদ্ধ গৃহ আঙ্গিনায়।

সে ডাক ব্যাকুল হাতে
মুছে দেয় ব্যথীর বেদন,
বিচলিত, দীর্ণ প্রাণ হতে
সকল আর্তির নিরসন।
আশার আশ্বাস দীপ
ওই দুটি আঁখির আলোকে
শত বরষের সীমা
পার হয় অগণিত লোকে,
শুচিতার শুভ্র ধারাস্রোতে
অবগাহি আনন্দে পুলকে,
উৎসব অঙ্গনে
উপনীত আজি শুভক্ষণে,
নিবেদনে ধন্য মানি
কত শত প্রাণের প্রণাম,
শ্রীপ্রভুর দিব্য উপস্থিতি,
বুকে ধরি রচে পুণ্যধাম
ধন্য ভক্ত রামচন্দ্র নাম।

'চীনের জনগণ স্বামীজীকে ভুলতে পারে না'

(একটি চিঠি)

অধ্যাপক হুয়াং জিন্ চুয়ান্

অধ্যাপক হুয়াং জিন্ চুয়ান্ কমিউনিস্ট চীনের এক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। দক্ষিণ এশিয়া সম্বন্ধে চীন প্রজাতন্ত্রে যে গবেষণা চলেছে তার পরিচালনার ভার অধ্যাপক চুয়ানের উপর রয়েছে। ভারতবর্ষে তিনি সুপরিচিত। তিনি একাধিকবার এদেশে এসেছেন। অধ্যাপক চুয়ান্ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সমীক্ষা-পর্ষদের আন্তর্জাতিক উপদেশক সমিতির সহ-সভাপতি হতে সম্মতি জানিয়ে সমীক্ষা-পর্ষদের সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দকে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই চিঠিটিরই বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর চিঠি আর একবার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা দেশ-কাল, ভৌগোলিক সীমানা, ধর্ম-রাজনীতি প্রভৃতি সকল সীমানা অতিক্রম করে। এই ভাবান্দোলনের আবেদন সর্বজনীন। সোভিয়েত রাশিয়ার খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. ই. পি. চেলিশেভ্ ইতিপূর্বেই সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি হতে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন যে, বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রয়োজন অসীম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পণ্ডিত-মনীষীরাও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম এই সমিতির উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি।

ইন্স্টিট্যুট অব্ সাউথ্ এশিয়ান স্টাডিজ্,
চাইনিজ্ আকাদেমী অব্ সোশ্যাল সায়েন্সেস্
এবং
পিকিং ইউনিভার্সিটি
মে ৫, ১৯৮৪

প্রিয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ,

সর্ব প্রথমেই আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি আপনার ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ তারিখের চিঠির উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্য। এই চিঠি থেকে আমি জানতে পারলাম যে, আপনারা (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সমীক্ষা-পর্ষদের) উপদেশক সমিতির সহ-সভাপতি করে আমাকে মহা সম্মানিত করেছেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার গবেষণা ও পরিচিতি এতই সামান্য যে, এই সংবাদে আমি বিস্মিত। নিঃসন্দেহে এটি ভারত ও চীন দুদেশের বিদ্বৎসমাজ তথা জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতীক।

অতীতে স্বামী বিবেকানন্দ চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় দৃঢ় সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন সারা বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে। চীনের জনগণ এইরকম এক ব্যক্তিকে ভুলতে পারে না এবং সব সময় তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সমীক্ষা-পর্ষদ এই দুই মহান্ ভারতীয়ের সম্বন্ধে গবেষণায় অগ্রণী হয়ে এবং তাঁদের ভাবধারা প্রচারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আমি

আশা করি যে, আমরা এইভাবে ঘন ঘন সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধন আরও দৃঢ় করব।

পদটি গ্রহণ করে এবং আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্ত ধন্তবাদ জ্ঞাপনের স্বযোগ গ্রহণ করে আমি আনন্দিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে চীনে ও বহির্বিশ্বে প্রচার করতে আমি আরও সচেষ্ট হব।

গভীর শ্রদ্ধাসহ,

একান্ত ভবদীয়
(স্বাঃ) হুয়াং জিন্ চুয়ান্

গুরু

স্বামী গম্ভীরানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। মোরাবাদী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিগত ১৯৭৯-র গুরু-পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত ভক্ত সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ থেকে শ্রুতলিখিত।

ধন্ত সেদিন যেদিন বেদব্যাসের জন্মদিন। তিনি কি করেছিলেন?—সমস্ত বেদের বিভাগ করেছিলেন। মহাভারতও রচনা করেছিলেন—যার ভিতরে হচ্ছে সমস্ত ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা। আর তিনি লিখেছিলেন ব্রহ্মসূত্র—যাতে সমস্ত উপনিষদের বাক্যগুলিকে সমন্বিত করা হয়েছে, সুশৃঙ্খলিতভাবে দেখানো হয়েছে সব উপনিষদ্ কি বলতে চায়। তার উপরে একই সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, সনাতন ধর্মকে যদিও তিনি প্রতিষ্ঠিত না করে থাকেন তাহলেও তিনি তাকে সুশৃঙ্খলিত এবং সুবিন্যস্ত করে এক হিসাবে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন—সে দাবী তিনি রাখতে পারেন। সুতরাং বেদব্যাসকে হিন্দুরা গুরু বলে স্বীকার করেন। কেননা, তিনি হিন্দুকে, হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম বলতে ঠিক কি বুঝা যায়,—তার ভিত্তি কোথায়, দার্শনিক দৃষ্টি কেমন,—কাকে অবলম্বন করে হিন্দুরা এগিয়ে চলেছেন,—হিন্দুধর্মটা দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর তিনি বিশদ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর রচিত গ্রন্থের ভিতর দিয়ে। সুতরাং তিনি হিন্দুদের গুরু।

বর্তমানকালে পাশ্চাত্য জগতে আলোচনা চলেছে ব্যাস বলতে আমরা কাকে নেব? কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং বাদরায়ণ ব্যাস—কি একজনই, অথবা দুজন আলাদা ব্যক্তি? সে আলোচনার ভিতরে আমরা যেতে চাই না। কেননা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সেটা নয়। আবার এমনও শোনা যায়,—অনেকে বলেন,—যেমন নাকি আদি শংকরাচার্য ছিলেন। এবং তাঁর পরবর্তী আরও অনেকে শংকরাচার্য নাম ধারণ করেছেন—পরেও করবেন। শঙ্করাচার্য যেমন একটি উপাধি তেমনি ব্যাসও যেন একটি উপাধি। তখনকার যুগে অনেকেই ব্যাস নামে পরিচিত হতেন। সুতরাং কোন্ ব্যাস? যদি ব্যাস একাধিক হন, তাহলে বাদরায়ণ ব্যাস বা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,—কে মহাভারত লিখেছিলেন, কে ব্রহ্ম-

সূত্র লিখেছিলেন ইত্যাদি নিয়ে বিচার হতে পারে। আমাদের সে বিষয়ের প্রয়োজন নেই। আমরা সেই ব্যাসদেবকেই চাই যিনি হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, হিন্দুধর্মকে যিনি রূপ দিয়েছিলেন এবং এখনও যাঁর কথা শুনে হিন্দুরা চলেন। আমাদের বিচার্য বিষয় হচ্ছে গুরু কে? তিনি কি করেন? ইত্যাদি।

আচ্ছা, আমরা ধরে নিই যে, আমরা সাধারণ মানুষ। আছি এই জগতে, কতকটা যেন অন্ধকারে ডুবে আছি। এই জগতের মূল কি? কোথা থেকে সে এল? আমরা কি? কোথায় যাব? কেন আছি, কি করছি?—তার সমস্ত কিছু যেন আমরা বুঝে উঠতে পারি না। এই সমস্ত জিনিস যাতে করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাকে আমরা বলি জ্ঞান বা তাকে আমরা অনেক সময় বলি ভক্তি বা বলি যোগ বা অন্য নামে। আছি আমরা অন্ধকারে। অন্ধকার নিজে কখনও আলো নিয়ে আসতে পারে না। অন্ধকার দূর করার জন্য আলো আসে, বিচ্ছুরিত হয় বাইরের থেকে। আমরা যে এই আধ্যাত্মিক অজ্ঞান-অন্ধকারে আছি—এটিকে দূর করতে পারে কে? না—জ্ঞান, বা ভক্তি বা যোগ। সেটি আসে অন্ধকারের বাইরে থেকে। থাকে কোথায় সে? আমরা বলছি যে, সেটি স্বয়ং ভগবান ব্যতীত আর কিছু নন। তিনি হচ্ছেন জ্ঞান-স্বরূপ, সত্য-স্বরূপ তিনি, আনন্দ-স্বরূপ তিনি। তিনিই মানুষকে জ্ঞান দিয়ে থাকেন। সেই জ্ঞান আমরা কি আকারে পাই? সেটি বেদের ভিতর দিয়ে পাচ্ছি। বেদ হচ্ছে নিত্য। বেদ বলতে কতকগুলো লিখিত পুস্তক নয়। বেদ বলতে আচার্য শংকর বলেছেন জ্ঞানরাশি। স্বামীজীও বলেছেন তাই—বেদ বলতে আমরা জ্ঞানরাশিকে বুঝে থাকি। সেই বেদের খানিকটা গদ্যে লেখা আছে, খানিকটা পদ্যে, খানিকটা হয়তো গীতরূপে আছে—ঋক, যজু, সাম, ইত্যাদি। সেই বেদজ্ঞান থাকে ভগবানেরই কাছে। সেটা ভগবানেরই স্বরূপ। তিনি পরমকারুণিক, তাঁর কাছে তিনি রেখেছেন। যখন নূতন সৃষ্টি হয়, তখন তিনি বিশেষ বিশেষ মানুষের হৃদয়ে সেই জ্ঞান উদ্ঘাটিত করেন। তাঁরা আবার অন্যকে সেইমত জানান। তখন তাঁরা কি বলেন? আমি শিক্ষা দিচ্ছি এই বুদ্ধিতে তাঁরা বলেন না—যেমন উপনিষদে রয়েছে, "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে" (ঈশ উপনিষদ্, শ্লোক-১৩ দ্রষ্টব্য)—ধীর কিংবা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে যেসব জ্ঞানের বিষয় আমরা শুনছি, সেই সব কথাগুলোই আমরা আবার বলছি। কারণ, তাঁরা দাবী করছেন না যে তাঁরা নিজের কথা বলছেন বা তাঁরা সে সমস্ত নূতন সৃষ্টি করেছেন।

ঋষিদের বলা হয়েছে মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্র আছে জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের কাছে। যেটা আছে সেটাকেই তাঁরা দর্শন করেন। তাঁরা যে নূতন মন্ত্র সৃষ্টি করেন বা নূতন দর্শন সৃষ্টি করেন, নূতন জ্ঞান নিয়ে আসেন তা নয়। যে জ্ঞান চিরকাল আছে, যে ভক্তি, যোগ চিরকাল আছে তাকে তাঁরা দর্শন করেন, দেখেন,—দেখে তাঁরা অপরকে বলেন। সবটা অবশ্য বলা চলে না; কেননা ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—বাক্য মনের অতীত। যতটা পারেন, যেমনভাবে পারেন, তাঁরা ততটা বলেছেন বেদের ভিতর দিয়ে, উপনিষদের ভিতর দিয়ে। তাই, যাঁরা আমাদের এভাবে বলেছেন তাঁরা হলেন আমাদের গুরু।

এই পর্যন্ত গুরুর সম্বন্ধে ধারণা কি পাওয়া গেল? প্রথমেই—গুরু বলতে আমরা বুঝব স্বয়ং ভগবানকে। যেমন ঠাকুর বলেছেন, "সচ্চিদানন্দই গুরু"। কিন্তু ভগবান স্বয়ং এসে তো আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন না—তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন ঋষিদের ভিতর দিয়ে; অথবা শাস্ত্রে আমরা যেমন দেখতে পাই যে কাউকে কাউকে বলা হয়েছে আধিকারিক

পুরুষ। তাঁরা যেন একটি অধিকার নিয়ে এসেছেন—তাঁরা জ্ঞানলাভ করেছেন। ভগবান তাঁদের আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এ সমস্ত জিনিস লোকহিতের জন্য জগতে প্রকাশ কর, প্রচার কর। তাঁরা হচ্ছেন—আমাদের গুরুস্থানীয়। অথবা ভগবান স্বয়ং অবতার হয়ে আসেন লোকশিক্ষার জন্য। এসে তাঁরা প্রেম, ভক্তি, যোগ ইত্যাদি লোককে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তারপরে আছে মানুষ-গুরু। এই দুই শ্রেণীর ভিতরে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই—শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, "জগৎ-গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে আর মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কানে।" জগৎ-গুরু প্রাণে দেন। কি রকম? যাকে আমরা বলতে পারি inspiration বা অনুপ্রেরণা—সেটা কিভাবে, কোথা থেকে এল, আমরা পরিষ্কারভাবে জানি না। মনে হঠাৎ একটি প্রেরণা জাগল, উদ্দীপনা জাগল—একটি সত্যের আভাস যেন আমাদের সামনে এসে পড়ল। সেটিকে সকলে আঁকড়ে ধরল যে এই হচ্ছে পথ, এইভাবেই চলতে হবে এই যুগে। যেমন বর্তমান যুগের কথা যদি আমরা ধরি, মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী একদিন,—একদিন কেন তিনি বহুবার বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জগতে অবতীর্ণ হলেন তখন জগতের কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মানুষের ভিতরে একটি শক্তি রয়েছে, সেটি কুণ্ডলীকৃত হয়ে আছে—নড়ছে না চড়ছে না কিন্তু সেটি শক্তি। তাকে জাগানো হলে সে জাগে—জেগে মানুষকে শক্তিমান করে জ্ঞান ভক্তির অধিকারী করিয়ে দেয়। তেমনি জগতেরও একটি কুণ্ডলিনী শক্তি আছে। সেটি কুণ্ডলীকৃত হয়ে আছে। সে জাগেনি, তাকে জাগাতে হবে। তাকে জাগালেন ঠাকুর নূতন ভাবধারা দিয়ে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন। তিনি জগতে প্রেম বিতরণ করলেন। শংকরাচার্য এসেছিলেন। তিনি জ্ঞান বিতরণ করলেন। এমনিভাবেই আরও বহু অবতার এসেছেন যাঁরা বিশেষ বিশেষ কার্য করে গেছেন। ঠাকুর তেমনি এসেছেন, তাঁর মন্ত্র-পাঠ করেছেন স্বামীজী: "ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। / অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"—তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এসেছেন ইত্যাদি তাঁকে বলা হয়েছে। তারপরে স্বামীজী নিজের বক্তৃতাবলীতে বলেছেন, তিনি সমন্বয়-অবতার। সমস্ত ধর্মের তিনি সমন্বয় করেছেন; শুধু ধর্মের নয় বিভিন্ন মতবাদেরও। প্রত্যেককে সম্মান দিয়ে তাকে সার্থক করে তোলা, তার নিজের পথে তাকে চলতে দেওয়া, তার সঙ্গে কোন রকম বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত না হয়ে সে যাতে নিজের পথে চলে এগিয়ে যেতে পারে, নিজের অভীষ্ট লাভ করতে পারে সেজন্য তাদের সম্মান দিয়ে সাহায্য করে তাদের সেই পথে চলতে দেওয়া—এই যে একটি মৌলিক কথা সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে নিজের সাধনার দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা যেমনভাবে বলেছেন বা দেখিয়ে গেছেন, পূর্ব পূর্ব যুগে সেভাবে হয়নি।

সমস্ত জগৎ জানুক বা না জানুক, সে এই ভাবধারাকে গ্রহণ করছে। বৈচিত্র্যের ভিতরে একত্ব থাকবে—যেমন স্বামীজী বলেছেন, তাঁরই কথানুযায়ী এযুগে কথা উঠেছে co-existence—সহাবস্থান। সকলকে একসঙ্গে থাকতে হবে। তুমি কমিউনিস্ট, আমি ডেমোক্র্যাট, তুমি রিপাব্লিকান, আমি অমুক-তমুক, আমি সোশ্যালিস্ট—কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতবাদকে সম্মান দিয়ে, তার মতটাকে যথাস্থানে থাকতে দিয়ে একসঙ্গে চলতে হবে; কেউ কারও উপর মতবাদ চাপাবে না। ঝগড়াঝাটি করা ঠিক নয়, ঝগড়াঝাটি করা কোন কাজের কথা নয়। এই যে মৌলিক ভাবটি—এটি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে পেলাম। কাজেই দাঁড়াল—জগৎ-গুরু যিনি তিনি

মানুষের প্রাণে মন্ত্র দেন। মন্ত্র দিয়ে তাদের জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু মানুষ-গুরু যিনি তিনি মন্ত্র দেন কানে। ঠাকুর এক জায়গায় বলেছিলেন, "আমি দিলাম মন্তর, এখন মন তোর।" মানুষ-গুরু মন্ত্র দিলেন। কিন্তু শিষ্য কি করলেন? —তার মন তখন সেটাকে গ্রহণ করে নিল। সে নির্জনে সাধন করল, করে সেটাকে গুরু যেমন বলে দিয়েছেন তাঁর উপদেশ অনুসরণ করে সেটাকে ফলালে, জীবনে প্রতিফলিত করলে। এর ফলে সে জ্ঞানলাভ করবে, মুক্তিলাভ করবে। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যেমন ঝিনুক বা ঐ-জাতীয় কোন জীব। তারা জলের উপর ভাসছে—তা দৃষ্টান্ত মাত্র। আমি এটি বিজ্ঞানের কথা বলছি না। তারা জলের উপর ভেসে বেড়ায় চোখ মুখ খুলে যাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়ে। যেই এক ফোঁটা জল সেখানে পড়ল অমনি মুখ বন্ধ করে নিচে চলে গেল—জলের তলায় ধ্যানে ডুবে গেল। তারপর সেখান থেকে মুক্তো তৈরি হল। তেমনিভাবে মানুষ-গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে মানুষ সেটাকে সাধন করে, করে সেটাকে জীবনে প্রতিফলিত করে ভগবানকে লাভ করে। এই হল মানুষ-গুরু এবং জগৎ-গুরুর পার্থক্য।

গুরু-করণ কি উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নানারকম বিচার পাই। আমরা আস্তিক পথে যেতে চাই। আস্তিক মানে কি? না—যারা নাকি শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, তাদের বলা হয় আস্তিক। নাস্তিক কারা? যারা বেদ মানে না। আমরা আস্তিকের দলে আছি। সুতরাং "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" 'তদ্বিজ্ঞানার্থং'—সেই যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাকে জানবার জন্য অবশ্যই যেতে হবে। 'গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ'—গুরুর কাছে অবশ্যই যাবে। 'এব' বলেছেন। 'এব' কথাটি হচ্ছে জোর দেবার জন্য—অবশ্যই যেতে হবে 'গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ'। কিভাবে? 'সমিৎপাণি'—যজ্ঞ করার জন্য কাঠ হাতে নিয়ে বা গুরুর সেবার জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন—সেইগুলোকে নিয়ে—শিষ্য হবার যা প্রয়োজন—সেগুলোকে হাতে নিয়ে যাবে। কেমন গুরুর কাছে? যিনি 'শ্রোত্রিয়' এবং 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। দুটো বিশেষণ দিয়েছেন। 'শ্রোত্রিয়' মানে কি? যিনি হচ্ছেন বেদাচারী। শাশ্বতকাল ধরে যে সমস্ত গুণাবলীকে আমরা ভাল বলে জেনেছি, সমাজ যাকে স্বীকার করে নিয়েছে—সেই সমস্তকে তিনি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন, রূপায়িত করেছেন, যিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে তার মর্ম বুঝেছেন এবং শুধু মর্ম বুঝা নয়, সেগুলোকে তিনি নিজের জীবনে লাগিয়েছেন। এমন যিনি বেদাচারী তিনি হলেন শ্রোত্রিয়। আর কি? তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ—তিনি সর্বদা ব্রহ্মে লিপ্ত আছেন এবং ব্রহ্মের কথা চিন্তা করছেন, ব্রহ্মলাভের জন্য জীবনপাত করছেন। অন্যত্র আছে, তিনি হবেন অবৃজিন এবং অকামহত অর্থাৎ অকপট এবং কামনাশূন্য—এইরূপ অনেক গুণ চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, একজন মানুষ নিজেকে মারবার জন্য সামান্য নরুনের মতো কিছু একটি হলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু অপরকে যদি মারতে হয় তাহলে ঢাল তরোয়াল দরকার। সুতরাং সাধারণ মানুষ যদি বলে যে, অপরকে শিক্ষা দেবো তবে সেটা হবে তার অহমিকা মাত্র। তাকে অনেক কিছুই করতে হবে, কাঠ-খড় পোড়াতে হবে, সারা জীবন ধরে তাকে তপস্যা করতে হবে, তাকে ভগবানকে জানতে হবে কথার ভিতর দিয়ে, শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে ও অপর গুরুর কাছ থেকে। অপরে যাতে বুঝে, তেমন ভাষায় তাকে কথা বলতে হবে। সুতরাং ঢাল, তরোয়াল ইত্যাদি তার অনেক কিছু দরকার। অমনি শুধু আমি গুরু বললাম, আর গুরু হয়ে গেলাম

—এ হয় না। তেমনি আবার শিষ্যের দিক থেকেও কর্তব্য আছে। শাস্ত্র বলেছেন, "আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধা/আশ্চর্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।" —যে শিষ্য হবে সেও বিরল ব্যক্তি, সেও আশ্চর্য। তাকে দেখলে মনে হবে a wonderful man—অপূর্ব ব্যক্তি। হাজারে হয়তো একজন হবে। কাজেই গুরুর যেমন জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ গুণ থাকা দরকার, শিষ্যের পক্ষেও তেমনি নানারকম সদ্গুণের প্রয়োজন হয়। এই সদ্গুণের ভিতরে আবার নিশ্চিত করে বলেছেন ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শংকরাচার্য এবং সেগুলো নিয়েছেন তিনি উপনিষদ্ থেকে। কি সেগুলো? শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। অর্থাৎ শিষ্যের মন এবং তার শরীর উভয়ের উপর তার (শিষ্যের) একটি সংযম থাকবে। তার মন তার (শিষ্যের) ইচ্ছামতো চলবে। তার শরীর তার (শিষ্যের) ইচ্ছামতো চলবে। চোখ কোন একটি জিনিস দেখতে চাইলে, তার পিছনে মনও ছুটল—তখন শিষ্য বলবে, না, হবে না; তোমাকে আমার কথামতো চলতে হবে।" নিজের অধীনে রাখতে হবে, মন এবং শরীর এই দুটোকেই। এই হল শম, দম। তারপর উপরতি—খানিকটা মন তুলে নিতে হবে। "জাগতিক ভোগসুখগুলির দিকে না গিয়ে ভগবানের দিকে আমি যাব"—এই ইচ্ছাটি তার ভিতর জাগবে এবং সেই ইচ্ছানুযায়ী সে খানিকটা চেষ্টাও করবে। এটিকে বলা হচ্ছে উপরতি; মনটিকে তুলে নেওয়া সংসারের ভিতর থেকে। সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাসী সাজা এক লাফে তো হয় না। স্বামীজী বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের শেষ দিকে—অবনতির দিনে এই সন্ন্যাসের ওপর বেশি জোর দেওয়ার ফলেই ভারতবর্ষের অবনতি হয়েছিল। কেননা মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, সমাজকে বেঁচে থাকতে হলে ওর ভিতরে রজোগুণেরও দরকার হয়, সত্ত্বগুণেরও দরকার হয়—সবই দরকার হয়। সুতরাং সকলেই সন্ন্যাসী সাজবে এটি যেমন সম্ভব নয় বিচারের দিক থেকে, তেমনি কার্যতঃ এটি ফলবতী হতে পারে না। "আমি সংসারটা করছি ভগবানের জন্য"—এরকম একটি ভাব শিষ্যের ভিতরে আসা দরকার।

তারপর, বলেছেন তিতিক্ষা। "সহনং সর্বদুঃখানাং অপ্রতিকারপূর্বকম্"—নানারকম দুঃখ এসে পড়ছে; তার প্রতিকারের জন্য যদি আমি সবসময় লেগে থাকি তাহলে আমাকে লড়াই করেই জীবন কাটাতে হবে, ভগবানকে ডাকব কখন? কাজেই খানিকটা সহ্য করে যাওয়া দরকার। অপরে একটি খারাপ কথা বলল, কি একটি দুঃখের কথা বলল; আমি অমনি তাকে মারতে গেলাম বা গালাগালি করতে গেলাম এটি কোন কাজের কথা নয়। সহ্য করে যাওয়া—তিতিক্ষা শাস্ত্র বলেছেন।

শিষ্য হবে শ্রদ্ধাচারী। শাস্ত্রের প্রতি, গুরুর প্রতি, দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাচারী।

তারপর সমাধি। সমাধি মানে মনের একাগ্রতা।

তারপর বলেছেন "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ"। এটি হচ্ছে নিত্য বস্তু, ওটি হচ্ছে অনিত্য বস্তু, এটি ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে, এটি ভগবানের বিপরীত দিকে নিয়ে যাবে—এই বিবেক, বুদ্ধি, বিচার থাকা দরকার।

আর আছে "ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ"। এই জগতে বা পরজগতে ইচ্ছামতো ভোগ করব—এই ইচ্ছা না রেখে ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করা। "আমার জগৎ চাই না, আমার ইহলোক চাই না, আমার স্বর্গ চাই না, কিছুই চাই না। আমার চাই ভগবানকে, আমার চাই ঈশ্বরকে, আমার চাই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ইত্যাদিকে।" এই একটি ভাব নিজের ভিতর রাখতে হবে।

আর কি?—মুমুক্ষুত্ব। এইগুলির সঙ্গে যদি মুমুক্ষুত্ব না নিই অর্থাৎ আমি জগৎ থেকে উদ্ধার পেতে চাই, এই দুঃখের সংসার থেকে আমি মুক্ত হতে চাই, আমি ভগবানকে পেতে চাই—এই ইচ্ছা যদি নিজের মনে না থাকে তাহলে এটি spirituality—আধ্যাত্মিকতা হল না; এটি হয়ে গেল নৈতিকতা—Morality.

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ইত্যাদি যা কিছু হল ওসব নীতিবাচক বিষয় নিয়ে হল। নিত্যা-নিত্য বস্তুবিবেক তবুও খানিকটা না হয় মুখে মুখে করলাম, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে মুমুক্ষুত্ব—আমি মুক্তিলাভ করতে চাই, ভগবানকে আমি পেতে চাই, তাঁর প্রতি যে আমার আগ্রহ, তাঁকে যে আমি জানব, তাঁর প্রতি আমার ভক্তি, ভালবাসা আসবে, তাঁর জন্য আমি ধ্যান-ধারণা করব—এইরকম একটি ব্যাকুলতা শিষ্যের ভিতরে আসা চাই। তবেই সে শিষ্য হবার উপযুক্ত হবে।

গুরু সম্বন্ধে একটি কথা উঠে, যে বিষয়ে ঠাকুর বলেছেন, "চাপরাস না পেলে কেউ তার কথা শোনে না, গুরু সে হতে পারে না। ভগবান যাঁকে আদেশ করেন তিনিই গুরু হতে পারেন।" একথার প্রতিবাদ কেউ করতে সাহস করে না; অন্ততঃ আমি তো নই। তারপর আমরা যাঁদের সাধারণভাবে গুরু বলে স্বীকার করে নিই বা যাঁরা গুরুর মতন মন্ত্রাদি দিয়ে থাকেন তাঁদের অবস্থা তাহলে কি? তাঁরা কি সকলেই ঈশ্বর দর্শন করেছেন? সকলেই কি ঈশ্বরের কাছে আদেশ পেয়েছেন?—আমি জানি না। কেন-না, শাস্ত্র বলে গেছেন এই ভগবানলাভ বা জ্ঞান হওয়া—তা হচ্ছে স্বয়ংবেদ্য জিনিস। It is a subjective realisation—নিজের মন নিজে বুঝবে; বাইরে তাকে প্রকাশ করে বলা যায় না এবং বললেও আপনারা বিশ্বাস করবেন কি? আমি যদি বলি, আমি ভগবানলাভ করেছি—বিশ্বাস করবেন? হাজারের ভিতর একজনও করবে কিনা সন্দেহ। কাজেই এটি হল আমার Subjective জিনিস,—আমার একটি স্বয়ংবেদ্য অনুভব। নিজে যেটি জানতে পারি, লোককে সেটি বলতে পারি না, বললেও কোন লাভ নেই। তাহলে তাঁরা আমাদের গুরু হন কি করে? ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমি কারোর গুরু নই। মা তাঁকে *দিয়ে যেমন করাচ্ছেন* তিনি তাই করছেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীকে আমরা বলতে শুনেছি, দেখেছি যে, তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ঠাকুরের ছবি রয়েছে দেওয়ালে—তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছেন, নিজের বুকে হাত দিয়ে, "এ হচ্ছে তাঁর কুকুর," আর নিজের একটি কুকুর ছিল, তাকে খুব ভালবাসতেন, তার দিকে তাকিয়ে বললেন "ও বেটা হচ্ছে এর কুকুর।" ঠাকুরও বলতেন যে, আমি গুরু হয়েই যে কাউকে মন্ত্র দিচ্ছি তা নয়। তবে কি? না, মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, "ঠাকুর আমাদিগকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন, বলিয়ে নিচ্ছেন। আমি ঠাকুরের পাদপদ্মে শিষ্যদের অর্পণ করে দিচ্ছি। 'আমি গুরু' এ অভিমান রাখছি না। আমি কারও গুরু হতে পারি না।" গুরু হতে পারেন স্বয়ং ভগবান। গুরু হতে পারেন অবতার পুরুষ, গুরু হতে পারেন আধিকারিক পুরুষ। গুরু হতে পারেন তাঁরা, যাঁরা ভগবানের কাছে আদেশ পেয়েছেন; সিদ্ধিলাভের পর তাঁরা হতে পারেন গুরু। সাধারণ গুরুরা তাহলে কি করতে পারেন? তাঁরা হতে পারেন শিক্ষা-গুরু। তাঁদের মনোভাব এই, "গুরু পরম্পরায় আমরা যা পেয়ে এসেছি সেই পথ তোমাদের বলতে পারি। সেই পথেই চলেছি, এই পথে চলে দেখেছি আমার উপকার হয়; আমি তোমাকেও বলছি এই পথে চললে তোমারও উপকার হবে।"

তাহলে দাঁড়াল কি?—আমি গুরু বলে একটি

অভিমান নিয়ে বলছি না, কিন্তু গুরুজনের কাছ থেকে যে সাধনপথ পেয়েছি তাই অপরদের বলছি। অপরেরা সেই পথে চলুক তাতে তাদের লাভ হবে। আমরা এইরূপই ভেবে থাকি।

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধটা কিরকম? গুরু বলতে স্বয়ং ভগবান। তিনি অপরের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। যেভাবে যাঁকে দিয়ে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু। সব গুরুই কিন্তু সমান নন। তাঁদের শক্তির নানারকম তফাত রয়েছে। ভগবান যাঁকে যতটুকু দিয়েছেন তিনি ততটুকু শক্তি প্রকাশ করতে পারেন। তিনি প্রকাশ করছেন ভগবানের অনুগ্রহে বা ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী। আদেশ লাভ করার কথা যেটা আমরা বুঝি অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং এসে আদেশ করবেন যে, "তুমি মন্ত্র দাও, তুমি এ কাজ কর"—এ নাও হতে পারে। কিন্তু গুরুর মনের ভিতরে হয়তো একটি অনুভূতি জাগল যে আমার দ্বারা এ কাজ করা সম্ভব এবং অপর দশজন চাইছে যে, "আমি এ কাজ করি।" এ-কাজ করছি কিভাবে? আমি তাঁর দাস হয়ে। আমি নিজের কিছু একটি শিষ্যকে দিচ্ছি—এ নয়। অপরের কাছে যেটি "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে" —আমরা শুনে এসেছি যেমন কথা যেমনভাবে ঠিক তেমনিভাবেই সে-সব কথা আমরা আবার অপরের কাছে বলে থাকি। ঠাকুর বলেছেন, "অভিমান না থাকলেই হল। আমি লেকচার দিচ্ছি, আমি মন্ত্র দিচ্ছি—এরূপ অহংকার না থাকলেই হল।"

এখন শিষ্যের তাহলে ভাবটি কি হবে? শিষ্য গুরুকে ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশরূপেই দেখবে। তেমনিভাবে মন্ত্রও রয়েছে, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। / গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ / অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। / চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"—গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি বলা হয়েছে। তিনি আবার জ্ঞান-শলাকার দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করেছেন, আমাদের জ্ঞানলাভের পথ তিনি খুলে দিয়েছেন। এই যে সমস্ত শিষ্যের মনের ধারণা, এগুলো তাহলে কি? এইভাবে শিষ্য নিজে বিচার করবে, গুরুকে সে কিভাবে গ্রহণ করবে। ঠাকুর একটি জায়গায় বলেছেন, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

শিষ্য গুরুর প্রতি যে দৃষ্টি অবলম্বন করবে সেটিও তার Subjective—তার একান্ত নিজের মনের জিনিস। ঐ যে বলা হল,"আমি দিলাম মন্তর, এখন মন তোর।" শিষ্য শুধু গুরুর শরীরটিকে দেখবে? না, গুরুর আচরণকে দেখবে? না, গুরুর কাছ থেকে যে মন্ত্রটি পেল, তার অর্থের দিকে দৃষ্টি দেবে বা যে ভগবানের কথা তিনি বললেন সেই ভগবানকে বুঝবার জন্য চেষ্টা করবে, তাকে ভালবাসার জন্য চেষ্টা করবে? কোন্‌টা সে করবে? শাস্ত্রকাররা বলেছেন যে, যে-গুরুর কাছ থেকে তুমি মন্ত্র লাভ করেছ সেই গুরুর সমালোচনা করা ঠিক নয়। শিষ্য প্রথমে গুরুকে যাচাই করেই গুরু করেছে। এখন তাঁর কাছ থেকে যে-মন্ত্র পেয়েছে, সেটি হচ্ছে শিষ্যের নিজস্ব জিনিস। সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে। শিষ্য গুরুর ভিতরে কি দেখছে?—সেই আদিগুরু বা ভগবান মানুষের হৃদয়ে থেকে তিনি সমস্ত মানুষকে পরিচালিত করছেন। গুরুকেও তিনি পরিচালিত করছেন। শিষ্যকেও তিনিই পরিচালিত করছেন।

তাহলে ধর্ম জগতে আসলে একটি মাত্র দেখবার জিনিস হলেন ভগবান। ভগবানের প্রতি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, ভগবানকে জানবার উপায় প্রভৃতির জন্যই সাধন করা—এগুলোই আসল জিনিস। গুরুর বাইরের রূপ, গুণ, আচার, আচরণ দেখা—এবং সেই সব নিয়েই আলোচনা করা,

শিষ্যের কর্তব্য নয়,—সে-সবে তার প্রয়োজনও নেই। শিষ্যের ভাব এই হবে যে, গুরুর কাছ থেকে পাওয়া সেই সারবস্তুকে গ্রহণ করে, তাকেই জীবনে প্রতিফলিত করা। কে কতটা জীবনে নিতে পারবে—চিন্তা করবে বা না করবে, তা নির্ভর করছে শিষ্যের নিজের বিশ্বাসের উপর, নিজের শক্তির উপর। নিজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার কথাও ভাবতে হবে। এসবের ভিতর দিয়ে শিষ্যকে এগিয়ে যেতে হবে। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে মন প্রভৃতির সঙ্গে। একটু আধটু না করতেই মনে নানা প্রশ্ন জাগে,—এই এত সব করলাম তো কই কোন ফল তো পাচ্ছি না? মনে পড়ে, শ্রীশ্রীমাকে একজন সাধু পত্রে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "মা, এতদিন ধরে ঠাকুরকে ডাকলাম, আর তাঁর জন্য তো ধ্যান ইত্যাদিও করছি, কিন্তু কই কিছু তো লাভ হল না।" চিঠি শুনে মা বললেন, "দাও তো ওকে লিখে—'তোমার কাজ হচ্ছে ভগবানকে ডাকা। তুমি সাধু হয়েছ তাঁকে ডাকবে বলে। ভগবান কখন আসবেন না আসবেন সে তাঁর মর্জি'।" শিষ্য যে হয়েছে সে ভগবানকে লাভ করার জন্যই। যদি সে হতাশ হয়ে পড়ে যে, "আমার ভগবান লাভ হল না—তাহলে মন্ত্র নিয়ে কি হল? গুরু করে কি হল?"—এর নাম অতিব্যস্ততা। কিরকম সেটি? যেমন বাচ্চা ছেলেটি গাছ পুঁতেছে, পুঁতে খানিকক্ষণ পরে পরে তুলে দেখছে এতে শিকড় গজালো কি না? এরকম করলে গাছটিই মরে যাবে! তেমনিভাবে আসল কথা হচ্ছে সাধনা। "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি"। সাধনাই হল আসল জিনিস। সাধনা যদি ঠিক ঠিক থাকে, সিদ্ধি আপনা আপনি আসতে বাধ্য।

তাহলে শিষ্যের কর্তব্য হল—অমুক গুরু বড়, ইনি ছোট ইত্যাদি আলোচনা নয়। গুরু-শক্তি বলে একটি শক্তি আমরা সাধারণভাবে মেনে নিচ্ছি। সেটি হচ্ছে, ভগবৎ-শক্তিরই একটি বিকাশ। গুরুর আচারগুলি গুরু নন। তাঁর ভিতরে ভগবানের যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিটিকেই আমি গুরু বলে স্বীকার করছি এবং সেই শক্তিকেই আমি প্রণাম করতে গিয়ে বলছি, "গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ..." ইত্যাদি। শরীরটাকে নয় বা তাঁর মনটিকে নয়, তাঁর আচারটাকে নয়, তাঁর সামাজিক অবস্থাকে নয়—কোন কিছুকে নয়। তাঁর ভিতরে যে ভগবান রয়েছেন তাঁকেই আমি গুরু বলে স্বীকার করছি এবং তাঁকেই আমি প্রণাম করছি এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি যাতে তিনি আমার মঙ্গল করেন—এই হবে ঠিক ঠিক মনোভাব।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক; আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কর্ষিত থাকা প্রয়োজন। যেখানে এই দুইটি বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। 'ধর্মের প্রকৃত বক্তা অবশ্যই আশ্চর্য পুরুষ হইবেন, শ্রোতাও সুনিপুণ হওয়া চাই।' যখন উভয়েই আশ্চর্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যত্র নয়। ঐরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এবং এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু সাধক।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আত্ম-জিজ্ঞাসা

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপরে উক্ত মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে এবং জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আমরা জানি যে, জগৎ আত্মাশ্রিত এবং আত্মার জন্যই স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়, পরমাত্মাই একমাত্র সাধনার বস্তু। যাজ্ঞবল্ক্য পরমাত্মার আশ্রয়ে জীব ও জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করেননি, বিষয়-বিষয়ীর ভেদকে মিথ্যা বলেছেন। জাগ্রৎ ও স্বপ্নেই এই ভেদ দেখা যায়, সুষুপ্তিতে নয়—এই কথা বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অভেদই আত্মার মূলস্বরূপ। বাসনাক্ষয় হলে দেহান্তে জীব ও আত্মার অভেদ সিদ্ধ হবে। এই-ই তাঁর মতে অমৃতত্ব। যাজ্ঞবল্ক্য থেকেই অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি।

আবার ছান্দোগ্য (৮ম অধ্যায় ৭-১২ খণ্ড)-এ প্রজাপতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে শরীরে মগ্ন আত্মার অবস্থাত্রয় বলেছেন। আত্মা নিজের অশরীরত্ব উপলব্ধি করতে পারলে মনরূপ দৈবচক্ষু দিয়ে সমুদয় লোক দেখতে ও কাম্যবস্তু ভোগ করতে পারে। এইভাবে ইহলোকেই আত্মা ব্রহ্মলোকে বাস করতে পারে যেখানে মুক্ত আত্মার ভোগ ও বিশেষ বিজ্ঞান সবই অব্যাহত থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর উপাস্য-উপাসক ভেদও থাকে। এইভাবে দ্বৈতবাদের উদ্ভব।

কৌষীতকী উপনিষদে (৩য় অধ্যায়ে) ইন্দ্রের মত পাই। তিনিও নির্বিষয় অদ্বৈতবাদের বিরোধী, স্পষ্টত ভেদাভেদবাদী। প্রথম অধ্যায়ে চিত্র নামে রাজর্ষি ব্রহ্মলোকের কথা বলেছেন। মুক্ত আত্মা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্ম সন্নিধানে উপাসনারূপিণী নদীর তীরে চিরবাস করেন। ব্রহ্মের প্রশ্নের উত্তরে জীবাত্মা বলেছেন, 'তুমি যা আমিও তাই' (যৎ ত্বমসি সোঽহমস্মীতি)। এখানে মূলত অভেদ মেনেও 'তুমি-আমি'-র ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। চিত্ররাজার ব্রহ্মলোক দেহান্তে গম্য বিশেষ লোক বলে বর্ণিত, কিন্তু তা একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা যা দেহ থাকতেও পাওয়া সম্ভব। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর 'আর জন্ম গ্রহণ করতে হয় না' (ন চ পুনরাবর্ততে) ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ কথা।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে সুষুপ্তির কথা বলি যখন আমাদের না থাকে বিষয়ের জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। সুষুপ্তির পূর্ব ও পরে জাগ্রৎ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে মধ্যবর্তী সুষুপ্তির বিজ্ঞানশূন্যতা ও ক্লেশ-শূন্যতা উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিতে আমাদের ব্যষ্টিগত জ্ঞান থাকে না, তবে সুষুপ্তির পর পূর্বেকার জ্ঞান ফিরে পাই বলে বুঝতে পারি যে সেই জ্ঞান অবিনষ্ট অবস্থাতেই ছিল। জ্ঞান-মাত্রই আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি জানি এই তত্ত্ব দ্বারা জড়িত। তাই সুষুপ্তির সময়ে আমাদের ব্যষ্টি-আত্মজ্ঞান সমষ্টি-আত্মজ্ঞানের আশ্রিত ছিল যে আত্মজ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না। মোট কথা আত্মজ্ঞানের দুটি দিক, ব্যষ্টি ও সমষ্টি। প্রথমটি কাল ও অবস্থার অধীন, দ্বিতীয়টি তাদের ঊর্ধ্বে। আত্মজ্ঞানের এই সমষ্টি দিকটিই ব্যষ্টির সুষুপ্তিকালে জেগে থাকে এবং ব্যষ্টিকে নিজ আশ্রয়ে রক্ষা করে ('য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ'—কঠ, ২।২।৮)। ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদ অনস্বীকার্য। ব্যষ্টি নিদ্রিত হয়, সমষ্টি কখনও নিদ্রিত হয় না। ব্যষ্টির বিষয়জ্ঞান দেশ-কালের সীমার অধীন, কিন্তু সমষ্টি-আত্মা সমুদয় জানেন ও সব সময় জানেন, তাঁর জ্ঞান দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ব্যষ্টি-আত্মা জাগ্রৎ-দশায়ও সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে না, কখনও বিলুপ্ত হয় যেমন সুষুপ্তি বা বিস্মৃতির সময়। কিন্তু সমষ্টি-আত্মাতে বিস্মৃতি

নেই, বিলুপ্তি তো দূরের কথা। তাঁর কাছে সব বিধৃত থাকে বলেই তো আমাদের কের স্মরণ হয়। ব্যষ্টি-আত্মা মানে জীবাত্মা আর সমষ্টি-আত্মা বলতে পরমাত্মা বোঝায় যাঁকে আমরা ঈশ্বরও বলি।

এখন প্রশ্ন আত্মার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক কী? বিভিন্ন উপনিষদে সৃষ্টির ধারা একরূপ না হলেও সবাই একমত যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম আদি-কারণ। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ইচ্ছা হল 'একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।' সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি শুরু হল। প্রথম প্রকাশ আকাশ, তা থেকে প্রাণ এবং ক্রমশ স্থূলতর বস্তু। তাই সৃষ্টিকে নিছক মায়া বা মিথ্যা বলা যায় না। বরং ব্রহ্মই প্রকৃত স্রষ্টা, কিন্তু অনেক জায়গায় শ্রুতিতে আছে, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', অর্থাৎ বহু নেই, যে বহু দেখে সে মৃত্যু লাভ করে, 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'। নাম ও রূপ বাদ দিলে সব অলংকারই মূলধাতু সোনা বা রূপা। নাম-রূপেই একের বহুত্ববোধ। কোথাও আবার ব্রহ্ম বা পরমাত্মা'কে স্রষ্টা বলা হয়নি। তা অনির্বচনীয় সত্তা। তা জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় কোনটিই নয়। তাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, বরং তার দ্বারা বাক্ প্রকাশিত হয় (কেন, ১।৪।৫)। তাই জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে বিরোধী উক্তি আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কি জগতের প্রকৃত স্রষ্টা? জগৎ কি প্রকৃত বস্তু? অথবা জগৎ-সৃষ্টি বলে কিছু নেই। বিষয়-জগৎ আপাত-প্রতীতি মাত্র। ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ? এই সম্পর্কে উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর ও রামানুজের যথাক্রমে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই সব সমস্যার সমাধান দেয়। উভয়েই বিশ্বাস করেন না যে, জগৎ শুধু অচেতন অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত অথবা অচেতন বস্তুর পরিণামমাত্র। অর্থাৎ পূর্বে আলোচিত সাংখ্য, ন্যায় ও চার্বাকদের বিরোধী। বৌদ্ধদের ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদও বেদান্ত স্বীকার করে না। সৃষ্টি বললেই কারণ-কার্য-পরম্পরা বোঝায়। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ এই কার্য-কারণ-তত্ত্বের অনুকূল নয়। বিজ্ঞানবাদীদের মতে জগৎটা নিছক স্বপ্নবৎ মায়া বা কল্পনার সৃষ্টি। এমনকি শৈব বা পাশুপতদের দ্বৈতমতও এঁরা খণ্ডন করেন, যাঁদের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ আর বিষয় বা বস্তু উপাদান-কারণ। উভয়েই উপনিষদের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগৎ ব্যাপ্ত করে বিরাজমান ('ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—ঈশ উপ. ১ম), কিন্তু শুধু বিশ্বানুগ নয়, বিশ্বাতীত। তা হলে ঈশ্বর মানে কি বিষয়-সমষ্টি (pantheism)? না, বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত (panentheism)? বেদান্তের মতে শেষ অর্থই গ্রাহ্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (১০।৪২)।

এখন ব্রহ্মের স্বরূপ ও সৃষ্টি-শক্তি সম্পর্কে শঙ্কর ও রামানুজের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটুকু বিশ্লেষণ করি। উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করের সংশয়, ব্রহ্মকে নির্গুণ ও অনির্বচনীয় বলা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা বলা যায় কীভাবে? ব্রহ্মজ্ঞান হলে সব বহুত্ব দূর হয়ে একত্বে পরিণত হয় তাই বা কী করে সম্ভব? জগৎ যদি প্রকৃত সৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে এর নানাত্ব তিরোহিত হয় কী করে? একমাত্র অপ্রকৃত প্রকৃতবৎ প্রতীত হলেই সত্যজ্ঞানের আবির্ভাবে তা বিলীন হতে পারে। তাই ঋক্ (৬।৪৭।১৮) এবং বৃহঃ উপ. (২।৫।১৯)—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' -এর ভিত্তিতে শঙ্কর বিশ্বাস করেন যে, এই জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা প্রতীতিমাত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে জগৎ-বোধ তিরোহিত হয়। শ্বেতাশ্বতর উপ. (৪।১০) পরিষ্কার বলেছে—'মায়াং তু প্রকৃতিং

বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্' অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি বিশেষ মায়াই জগতের প্রকৃতি বা উৎস। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতো ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি মায়া তাঁর থেকে অভিন্ন। ঐন্দ্রজালিক যেমন যাদুবিদ্যাবলে একটি টাকাকে বহু টাকা বানিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে, তেমনই ঈশ্বরও মায়া-বলে জগৎ-রূপে নিজেকে দেখিয়ে জীবকে মুগ্ধ করেন। বিমূঢ়চিত্তরাই জগৎকে প্রকৃত সৃষ্টি বলে মনে করে, কিন্তু জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগে জগৎকে ঈশ্বর বলে উপলব্ধি করেন। রজ্জুতে সর্পভ্রম নিছক অন্ধকারবশত অজ্ঞানকৃত। রজ্জুকে রজ্জু বলে দেখলে তো সর্পভ্রমের উদয়ই হয় না। কিন্তু নিছক রজ্জুজ্ঞানের অভাব ভ্রান্তি আনতে পারে না। যেহেতু, তা না হলে যার রজ্জুজ্ঞান নেই সে সর্বত্র সাপই দেখত। যে অজ্ঞান ভ্রান্তি আনয়ন করে তা প্রকৃত বস্তুকে আবরণ ও অন্য বস্তুতে বিক্ষেপ করেই করে। এই আবরণ ও বিক্ষেপ দুটি কাজই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের, যার ফলে আমাদের ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই মায়া ঈশ্বরের প্রতীয়মান বস্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছামাত্র, তা ঈশ্বরকে প্রভাবিত বা প্রবঞ্চিত করে না। আমাদের মতো অজ্ঞ লোকেই মায়া দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। তাই মায়াই আমাদের কাছে ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখে এবং বিক্ষেপ দ্বারা জগদ্রূপে প্রতিভাত দেখায়। তাই তা 'ভাব-রূপমজ্ঞানম্' (positive ignorance) এবং জগতের কোন আদি বা উৎস নেই বলে মায়া অনাদি। কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর আদৌ মায়াবী নন। রামানুজও মায়ার কথা বলেন, যা ঈশ্বরের আশ্চর্যময় 'প্রকৃত সৃষ্টি'-র ক্ষমতা বা যা ব্রহ্মেরই অন্তর্নিহিত নিত্য ও অচেতন আদি বস্তুসত্তা যা জগদ্রূপে পরিণত হয়। মোটকথা, শঙ্কর মায়ায় বিশ্বাস করলেও তাঁর কাছে মায়া রামানুজের মতো ঈশ্বরের স্থায়ী সত্তা নয়, নিছক স্বাধীন ইচ্ছামাত্র আর এই ইচ্ছা ইচ্ছামাত্রই পরিত্যক্ত হতে পারে। তাছাড়া, শক্তি হিসেবে গৃহীত হলেও মায়া ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্তা নয়, মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি। শঙ্কর মায়াকে প্রকৃতি বলেন এই অর্থে যে মায়া মূঢ়দের কাছে জগৎ-প্রতীতির উৎসমাত্র। অর্থাৎ রামানুজের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত শক্তি জগদ্রূপে পরিণত, আর শঙ্করের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অবিকৃত, যেটুকু বিকার বা পরিবর্তন হয়, তা নিছক প্রতীতিমান, কখনই সত্য নয়। রজ্জুর সর্পভ্রমকে বলা হয় বিবর্ত আর দুধের দধিতে বিকারকে বলা হয় পরিণাম। তাই শঙ্কর বিবর্তবাদী আর রামানুজ পরিণামবাদী। উভয়েই কিন্তু সৎকার্য-বাদী অর্থাৎ কার্য কারণের মধ্যেই অবস্থিত, নতুন উদ্ভব নয় এইমতে বিশ্বাসী। মনে রাখব শঙ্কর বা রামানুজের প্রকৃতি পূর্বে আলোচিত সাংখ্যের 'অচেতন প্রকৃতি' নয়। এ ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের-ই শক্তি এবং সর্বদা তাঁর অধীন।

রামানুজের মতে নিত্যপদার্থ ঈশ্বর ও জীব-জগৎ। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে চিরকালই পৃথক। জগৎও তাই। ঈশ্বর যেমন সত্য, জীব ও জগৎ-প্রপঞ্চ তেমনই সত্য। ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী। তাই রামানুজ কখন কখন পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন বা জীবাত্মার স্বরূপ বলেছেন। প্রলয়কালে জীবাত্মা ও জগৎ সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। ফের কল্পারম্ভে তাঁরা বের হয়ে পূর্বকর্মের ফলভোগ করে। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় জীব মুক্তি পায়। পরমাত্মা বা ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। জগতের সৃষ্টি বলতে শুধু কল্পারম্ভ বোঝায়। সৃষ্টির আরম্ভ নেই। গীতায় (২।১২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। / ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥' দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মা অমর।

দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর সগুণ। ঈশ্বর মানুষের মতো মানবোচিত গুণবিশিষ্ট আবার অসীম শক্তিমান্। ঈশ্বর দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও সর্বশক্তিমান্। আধুনিক ক্রিশ্চিয়ানরাও ঈশ্বরকে বিশ্বের বাইরে স্বর্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট 'জিহোবা' মনে করেন। তিনি দুষ্টদের দমন করতে দণ্ড ধারণ করেন। তাঁর কৃপা পেতে হলে তাঁকে উপাসনা করা চাই। কেউ বলেন, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং মানুষ তাঁর মূর্তি এবং যিশুখ্রীষ্টই তাঁর প্রকৃত মূর্তি। যিশু ভিন্ন অন্য মানুষ নয়। যিশু এ রকম কথা বলেছিলেন কিনা প্রমাণসাপেক্ষ। সব মানুষই যদি ঈশ্বরের মূর্তি হয় তা হলে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের নিষ্ঠুর দণ্ড দেন কেন? শূন্য থেকে ঈশ্বর জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং জন্মকণে মানুষের আকার দিয়েছেন এই মত যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন জীবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সৃষ্ট-স্রষ্টা বা দাস-প্রভুর মতো থাকবে। ভারতের দ্বৈতবাদীরা অবশ্য সগুণ ঈশ্বর কল্পনা করেন, যিনি সর্বব্যাপী ও সকলকে ভালবাসেন। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন শূন্য থেকে নয়, কিন্তু প্রকৃতির উপাদান থেকে। ঈশ্বর প্রকৃতির অতীত নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি সৃষ্টির উপাদান কারণ। কেউ বা বলেন প্রকৃতি, জীবাত্মা ও ঈশ্বর নিত্য; জীবাত্মারা প্রকৃতির মধ্যে কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে, পরে কল্পারম্ভে কারণ অবস্থা থেকে বের হয় এবং বিবর্তন-বশে বাসনা অনুযায়ী নানা দেহ ধারণ করে যতদিন না পূর্ণতা পায়। তাঁরা মনে করেন, প্রতিটি জীবের কর্তব্য ঈশ্বরের আরাধনা করা সৎকর্ম, সৎচিন্তা ও প্রেমের মাধ্যমে। দ্বৈতবাদীর মতে প্রেম বা ভক্তিই জীব ও ঈশ্বরের মিলনসেতু। প্রেমের মাধ্যমেই জীব ক্রমশ পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বাস করে। দুবৃত্তরা অসৎকর্মের ফল ভোগ করতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। ঈশ্বরকে দায়ী করে না, মানুষ নিজ কর্মফল ভোগ করে মাত্র। 'ভোগেন ক্ষীয়তে কর্ম'। দ্বৈতবাদীদের মতে যত ক্ষুদ্রতম হোক না, প্রাণীমাত্রেই ঈশ্বরের চৈতন্যের প্রকাশ। তাই তাঁরা কাউকে ঘৃণা করেন না। সূর্যের সঙ্গে তার আলোর মতো জীবাত্মা ও ঈশ্বরের সম্পর্ক, কেউ বলেন ঈশ্বর বিরাট চুম্বক, আর জীবাত্মাগুলি সূচের শীর্ষদেশ। চুম্বকশক্তি যেমন সূচকে আকর্ষণ করে, এই জীবাত্মাগুলিও ঈশ্বর কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে ভগবৎ-প্রেমের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। মোট কথা জীবাত্মা পৃথক হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত, পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত পৃথক-সত্তা-বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কিন্তু ঈশ্বরকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে থেকেও বিশ্বের নিয়ন্তা, আবার প্রকৃতির অন্তরেও বিদ্যমান। অর্থাৎ তিনি বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতীত। তিনি বিশ্বশাসক। এই বিশ্ব তাঁর শক্তির প্রকাশ। বিশ্ব তাঁর শরীর। তিনি শূন্য থেকে বিশ্ব সৃষ্টি করেননি। তিনি বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি তাঁর থেকে পৃথক নয়, তাঁরই অবিচ্ছেদ্য শক্তি। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কল্পারম্ভে দৃশ্য জগৎ-রূপে যখন তিনি বিবর্তিত বা পরিণত হন, তখনই তাঁর শরীরে বিদ্যমান অসংখ্য জীবাত্মা দেহ ধারণ করে এবং জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। তিনি সগুণ আবার অসীম। বিশ্বের অণুপরমাণু সর্বত্র তিনি বিরাজমান, আবার বিশ্বকে অতিক্রম করে থাকেন। তিনি রূপাতীত দেশ-কাল-অপরিচ্ছিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈতের মতে প্রতি জীবাত্মার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আছে এবং অন্য জীবাত্মা থেকে পৃথক, অথচ তাদের ঈশ্বর এক। তাঁরা ভেদের মধ্যেও অভেদ সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। সব জীবাত্মা ঈশ্বরের সর্বব্যাপী শরীরের

মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু তারা ঈশ্বর নয়। ... আত্মাকে ঈশ্বর বলা যায় না। মুক্তির পর জীবাত্মা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়, ঠিক তা নয়। ঈশ্বর এমন একটি বিশিষ্ট সত্তা যা কোন জীবাত্মার পক্ষে লাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বর যেন বৃক্ষ, আর আমরা তার শাখা। ঈশ্বর সমগ্র সত্তা আর আমরা অংশমাত্র। আমাদের বুদ্ধি স্বধ্যাত্মবুদ্ধির অংশমাত্র। আমাদের দেহ ও মন আছে আর আমাদের আত্মাই দেহের নিয়ন্তা। আমাদের দেহের মৃত্যুর পর আত্মার শক্তি সংকুচিত হয় এবং সূক্ষ্মশরীরে বীজ-রূপে থাকে। মৃত্যুর পর সেই বীজ সম্প্রসারিত হয়ে নতুন দেহ ধারণ করে। মৃত্যুতে দেহ ছাড়া আত্মার আসল বস্তুটি নষ্ট হয় না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলতে আমরা বুঝি যে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় সত্তা, তবে তা চিৎ ও অচিৎ দুই অংশ দ্বারা বিশিষ্ট। ভেদ বলতে বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত তিন রকম ভেদ বোঝায়। রামানুজের মতে ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নেই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। চিৎ ও অচিৎ অংশ তাঁর মধ্যেই রয়েছে এবং তারা পরস্পর ভিন্ন।

পরবর্তী যুগে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে আবার 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-এর কথা জানা যায়। ব্রহ্ম শক্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্যময় সাকার, তিনি ঈশ্বর বা ভগবান্। তাঁর তিনটি অন্তরঙ্গা শক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। তাছাড়া, দুটি বহিরঙ্গা শক্তি—জীবশক্তি ও মায়া। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরাশক্তির পরিচয় পাই—'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে। / হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥' অর্থাৎ সকলের আশ্রয়-স্বরূপ তোমাতে (ভগবানে) হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ তিনশক্তির একত্র সমাবেশ। গীতার ৭ম অধ্যায়ে আট প্রকারের অপরা প্রকৃতি এবং জীবভূতা পরা প্রকৃতির কথা পাই। এখানে মায়ার কথা বলে মায়াকে অতিক্রম করার উপায় ঈশ্বরের শরণ-গ্রহণ নির্দিষ্ট হয়েছে—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। / মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি আর তটস্থা জীবশক্তি এই তিনশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-তত্ত্ব। জীব বা মানুষ ঈশ্বরের চিদংশ থেকে আবির্ভূত। তাই সে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনীশক্তির অধিকারী। কিন্তু মায়ার বশে সে নিজের স্বরূপ জানে না এবং বিষয়কে আপনার বলে মনে করে এবং সংসারে দুঃখভোগ করে এবং জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়। জীবকে এই দর্শনে ব্রহ্ম থেকে পৃথক আর ব্রহ্মের অংশ বলে অভিন্ন বলা হয়েছে। অদ্বৈতমতে জীবকে প্রকারান্তরে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, কিন্তু ভক্তিমতে প্রবল পার্থক্য, জীব মায়াবশ আর ব্রহ্ম মায়াধীশ। শক্তির দিক দিয়ে আবার জীব ব্রহ্মের অভেদ। শক্তিমান ব্রহ্মের সঙ্গে জীবশক্তির এই অভেদ অচিন্ত্য। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই—'ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জলিত জ্বলন। / জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ॥' এঁদের মতে ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, শক্তির পরিণাম হয়, তাই ব্রহ্ম বিকারী হচ্ছেন না। পরিণত ব্রহ্মের সঙ্গে অপরিণত ব্রহ্মের কোন ভেদই ঘটছে না। দুধ যেমন দধিতে, তেমনি ব্রহ্ম অবিকৃত থেকেও পরিণত হচ্ছেন। ভাগবতে অদ্বয় ব্রহ্মকেই ভগবান্ বলা হয়েছে—

'বদন্তি তৎ-তত্ত্ববিদ-স-তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥'

গীতাতে (২।২৫)-ও আমরা আত্মার তিনটি বিশেষণ পাই — 'অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥'

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীমতী উমাশশী বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজীকে ছোট থেকে দেখলেও যেমন একটা ভয় বা সম্ভ্রম ছিল, মহারাজের সঙ্গে কিন্তু উলটো। মহারাজকে একদম বাড়ির কেউ ভাবতুম, যেমন মামাবাবুরা। যেমন বল লোফালুফি করে—মনে পড়ে, ছোটবেলায় মহারাজ তেমনি করতেন আমাদের নিয়ে। উনি যখন বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে থাকতেন আমরা সব সময়ই ওঁর কাছে থাকতুম। মাঝে মাঝে ছোট ঘটি নিয়ে মহারাজের সঙ্গে গঙ্গায় যেতুম ভোরবেলায়। শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল দিয়ে ফিরতুম। এক একদিন হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে দেখে মহারাজ কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরেছেন। এখন সেইসব কথা ভেবে লজ্জা হয়, মনে মনে মহারাজকে প্রণাম করি। একবার মনে আছে মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'মহারাজ আপনার বাবা কে?' আমি আমার বাবাকে খুব ভালবাসতুম, তাই বোধ হয় জিজ্ঞেস করেছিলুম। উনি ঠাকুরের ছবিটি দেখিয়েছিলেন, আমি দেখে মহারাজের দিকে চেয়ে বললুম, 'হ্যাঁ চেহারা এক রকম।'

মহারাজের কাছে আমি ইংরেজী পড়েছি। আমার বাবা একেবারে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে। আমি মাস্টার মশায়ের কাছে পড়তে যাচ্ছি বই নিয়ে—'ফাস্ট বুক'-খানি মা লুকিয়ে কিনে দিয়েছেন তো, বাবা বইগুলি আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। ওপর থেকে এক এক করে 'ফাস্ট-বুক' খানি দেখে—'অ্যাঁ, ইংরেজী' বলে একেবারে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। 'মেয়ে মানুষ ইংরেজী পড়বে কি!' যাই হোক্, পরে আমার মা 'ফাস্ট-বুক' লুকিয়ে কিনে দিয়েছিলেন, আমি মহারাজের কাছে ইংরেজী পড়তুম। মা কিন্তু চাইতেন আমি ইংরেজী শিখি।

আমার বিয়ে হয় এগার বছর বয়সে। আমি যখন বাসিবিয়ের দিন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, আমার বাবা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, 'দুঃখে পড়লেই মহারাজকে স্মরণ করো।' এর কিছুদিন পরে আমার মামাবাবু কোঠারে মহারাজকে নিয়ে যান, বাবা-মা সকলে গেলেন। আমি তখন শ্বশুরবাড়িতে। আমার বাবা রোজ বর্ণনা দিয়ে আমায় একটি করে চিঠি দিতেন। তখন ভদ্রকে নেমে তারপর কোঠারে যেতে হত। সমস্ত রাস্তা দেবদারু, কলাগাছ এইসব দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এক মাইল দূরে মহারাজের সম্মানের জন্য তোপ দাগা হয়েছিল। মামাবাবু একটি গান রচনা করেছিলেন, তার প্রথম লাইন—

'মরি কি আনন্দ মরি কি আনন্দ
হেরি ব্রহ্মানন্দ
রামকৃষ্ণ নিত্যানন্দ মন্দিরে'

আর শেষ লাইনটি মনে আছে: 'রাখাল রাজা এল রে।' আর মনে নেই। ভোরবেলায় মহারাজ উঠে জঙ্গলে চলে যেতেন। গাছ থেকে একটি কলাপাতা ভেঙে নিয়ে তাতে বসে ধ্যান করতেন। পরে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে কথা বলতেন।

মহারাজ একবার আমার মা, দিদিমা এবং আমাদের অনেককে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। সেখানে গিয়ে আমার দিদিমা বলছিলেন, 'সব আছে, তিনি কৈ?' দিদিমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। দক্ষিণেশ্বরে মহারাজ সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, —শ্রীশ্রীঠাকুর কোথা থেকে ভবতারিণীকে দেখতেন, —এইসব অনেক কথা বলেছিলেন।

মহারাজের সঙ্গে একবার 'শঙ্করাচার্য' নাটক দেখতে গিয়েছিলুম। পরিবেশ এমন হয়েছিল

যে মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ কৈলাসে পৌঁছে গেছি।

একবার আমার খুব অসুখ করে আমার বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে। খুব বেশি অসুখ বোধ হয়—বাঁচার আশা ছিল না। তা আমার মনে পড়ল মহারাজ আমার কাছে খুব কই মাছ খেতে চাইতেন—মানে ক্ষ্যাপাতেন, 'এই কবে বড় কই মাছ খাওয়াবি?' আসলে আমার ঠাকুমা একবার মহারাজদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন, তখন নানা জিনিসের মধ্যে বড় কই মাছও ছিল। যাই হোক, আমি আমার বাবাকে বললুম, 'বাবা, মহারাজকে আমার কই মাছ খাওয়ানো হল না যে!' বাবা একদিন তাই মহারাজকে নেমন্তন্ন করেন। মহারাজ আমায় বললেন, 'ওরে এই নারায়ণগঞ্জ ঘুরে আসছি। সেখানে খুব বড় বড় কই মাছ খেয়েছি।' উনি আমার অসুখ দেখে মা সিদ্ধেশ্বরী না ভবতারিণী কার কাছে আমার জন্য ডাব চিনি মানেন। সেই জন্যই ত্যাখ আজ এই এত বছর হল বেঁচে আছি,—আয়ু আর শেষ হচ্ছে না। এখন মহারাজকে জিজ্ঞেস করি—আরও কতদিন আছে!

আর একটি মহারাজের ছবি মনে পড়ে। মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে বলরাম মন্দিরে (এখনকার) এসেছি। ওপরে ছাদে বসে মহারাজ ধ্যান করছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছোট ছাদে মহারাজ ধ্যানস্থ,—লাল আকাশ, মহারাজের কাপড় লাল, মুখের ওপর সেই লাল আভা! সে কি সুন্দর! পেছনে ছিল তিনজন ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে। সে দৃশ্য ভুলতে পারি না। চোখ বন্ধ করে এখনও সেই ছবি ধ্যান করি।

একবার তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি বাপের বাড়িতে এসেছি। স্বামীজীর মাকে ও আমাকে নিয়ে আমার মা বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। আমরা নৌকো করে গিয়েছিলুম। স্বামীজীর মা আমার মাকে নৌকোয় যেতে যেতে বলছিলেন, 'আমাকে বিলেত থেকে, আমেরিকা থেকে, কলম্বো থেকে লোক দেখতে আসে। কিন্তু যার জন্যে আসে সে আজ কই?'

নৌকো ঘাটের সামনে লাগতেই, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এসে স্বামীজীর মায়ের হাত ধরে নৌকো থেকে নামালেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের তিনজনকে ওপরে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সবাই বসে কিছুক্ষণ স্বামীজীর ধ্যান করলুম।

আর একবার—আমি তখন খুব বাচ্চা। ভোরবেলা দুই হাত ভরে অনেকগুলি ফুল তুলেছি। মহারাজ আমার হাতে ফুলগুলি দেখে বললেন, 'চল্ আমার সঙ্গে শ্মশানেশ্বর ঘাটে, ওখানে শিবের মাথায় ফুলগুলি দিবি।' তা আমি মহারাজের সঙ্গে চলে গেলুম। ঘাটে নেমে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে শিবের মাথায় ঢাললুম—ফুল দিলুম। ফেরার সময় আমি আর হাঁটতে না পারায় মহারাজ আমায় কাঁধে তুলে নিয়ে অতখানি পথ এলেন। মজা করে একটি গানও গাইছিলেন—আমাকে ভোলাবার জন্য—

'যদি খাবে বিলাতি বিস্কুট,
ভক্তিভরে ঠাকুর ঘরে দিয়ে হরির লুট।'

সিস্টার নিবেদিতা

সিস্টার নিবেদিতাকে চিনি ছোট্টবেলা থেকে। খুব ভালবাসতুম তাঁকে। বাগবাজারের বাড়ির উঠানে এসেই বাইরে থেকে "কু-উ-উ" করে এক সুর করে আমায় ডাকতেন। আর আমিও যেখানেই থাকতুম সেই ডাক শুনে দৌড়ে এসে ওঁকে জড়িয়ে ধরতুম। বাইরের ঘরে মহারাজরা সকলে থাকতেন। সিস্টার ভেতরে দিদিমা, বড়মা এঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, আর মাঝে মাঝে ছুটে এক একবার বাইরে গিয়ে মহারাজদের সঙ্গে কথা বলে যেতেন। বাড়ির ভেতরে উনি ওদের সঙ্গে বাঙলায় কথা বলতেন তো, তাই

যেখানে আটকে যেত, তক্ষুণি ছুটে মহারাজদের কাছে গিয়ে সেই ইংরেজী কথাটির বাঙলা কি হবে, তা জেনে যেতেন। আবার ভেতরে ফিরে বাঙলায় কথা বলতেন। এইভাবেই উনি সব বাঙলা কথা শিখে ফেলে, চমৎকার বাঙলায় কথা কইতেন।

ছেলেবেলায় আমি খুব দুষ্টু ছিলুম। মা আমায় স্কুলে ভর্তি করে দিলেন সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে। স্কুলে তো ভর্তি হলুম। সকালবেলায় স্কুল বসত। রোজ রোজ অত সকালে যেতে আমার দেরী হয়ে যেত। বাড়িতে বড়মা শিবপূজা করাতেন, সেই শিবপূজা করে যাওয়ার জন্যই আমার রোজই সকালে দেরী হয়ে যেত। একদিন সিস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'রোজ রোজ দেরী হয় কেন?' আমি বললুম, 'কী করব সিস্টার? রোজ শিবপূজা করে আসতেই আমার দেরী হয়ে যায়।'

সিস্টার বললেন, 'কি বলে শিবপূজা কর? নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়!' আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

সিস্টার নিবেদিতা সেই প্রথম বোধ হয় সরস্বতী পূজা করলেন ঐ বাগবাজারের বাড়িতে। কোন্ সাল মনে নেই। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন এখানে। সিস্টার নিবেদিতা এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাগবাজারের পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করেছিলেন। এক জায়গায় আমার জলতেষ্টা পেল, তারা গেলাসে জল দিল, আমি আলগোছে খেলুম। তাই দেখে সিস্টারের কী উৎসাহ! উনিও জল নিয়ে ঐরকম করে খাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক জল পড়ল, ঠিক মতন হল না।

সরস্বতী পূজা হয়—বাগবাজারের বাড়িতে, বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পুবের ঘরে। স্বামী শুদ্ধানন্দ—সুধীর মহারাজ তখন ব্রহ্মচারী, উনি হয়েছিলেন তন্ত্রধারক, আর কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) হয়েছিলেন পূজক। উনি তখন ব্রহ্মচারীও হননি।

সিস্টার নিবেদিতা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, পরম ভক্তিমতী—তাঁর সেই ভক্তি-বিহ্বল মুখচ্ছবি এখনও আমার মনে আছে।

পাড়ার মেয়েরা, যারা সব এসেছিল সকলকে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হল। প্রসাদ খাওয়ার পর উনি সকলকে কি সব যন্ত্রপাতি দেখাচ্ছিলেন, কী যেন সবাইকে বোঝাচ্ছিলেন, সেটা ঠিক কি—তা আমার মনে নেই।

একবার আমার বিয়ের পর মামার বাড়ি এসেছি। মামাতো বোনকে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেছি। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি, কি করি? বাড়ি ফিরতে পারলুম না, তখন এ ক্লাস ও ক্লাস ঘুরে দেখছি। দেখি, একটি ঘরে সিস্টার পড়াচ্ছেন—'আমরা সবাই আর্য—সবাই আমরা এক। আমরা শীতের দেশে বলে ফরসা আর তোমরা গরমের দেশে বলে—অন্ধকার! অন্ধকার!' বলে নিজের গালে হাত বুলোচ্ছিলেন। একটি মেয়ে বলে উঠল—'কালো'। উনি বললেন,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ কালো—ঠিক!' বোধ হয় dark এর মানেটা মনে করতে পারছিলেন না, কি কালো বলতে বাধছিল—কী জানি।

সিস্টারের সঙ্গে সব সময়ে থাকতেন সন্তোষিণী দিদি। সিস্টারের চেহারা তো ছবিতে যে রকম দেখা যায় ঐরকমই কিন্তু সে ভক্তিভাব না দেখলে বোঝা যাবে না। সাক্ষাৎ পার্বতী। বিয়ের পর উদ্বোধনে একবার দেখা হয়েছে,—আমায় বললেন, 'তোমার ওপর আমি রাগ করেছি।' আমি বললুম, 'কেন, সিস্টার? কেন আমার ওপর রাগ করেছেন?' উনি বললেন, 'তুমি স্কুল যাওনা কেন?' আমি বললুম, 'আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে আর আমি কী করে স্কুল যাব?'

ঠাকুর-স্বামীজীর অন্তরঙ্গ কয়েকজন

কামারহাটির গোপালের মাকে দর্শন করেছি। তিনি গোপালকে কাঁধে রাখতেন, পা ছুটি বুকের কাছে থাকত। ঠাকুরকে গোপাল দেখতেন। তাঁকে ছোটবেলায় দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়। বাগবাজারে এসেছেন, দোলের সময় দিদিমা বললেন, 'ওঁর পায়ে ফাগ দে।' পায়ে ফাগ দিলুম। উনি ছোট্ট ছেলে মানুষের মতন হাসছিলেন আর লাফিয়ে লাফিয়ে আনন্দে নাচছিলেন! আমার সেই ছোট বয়সে সেটা এত আশ্চর্য আর এত ভাল লেগেছিল যে আর কি বলব! এখনও সেটা স্পষ্ট আমার মনে আছে। সাধারণত এই আমার মতন বুড়ো মানুষ ঐরকম নাচছেন,—ছোটদের তো হাসিই পায়। কিন্তু তাঁরই কৃপা যে আমার হাসি পায়নি। মনে হচ্ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য দেখছি।

যোগীন-মা গোলাপ-মা সকলকেই তো ঘরের লোকের মতন দেখেছি। গৌর-মাকে আমার মা পিসিমা বলতেন। গঙ্গাধর মহারাজ, লাটু মহারাজদের খুব জ্বালাতন করেছি। গঙ্গাধর মহারাজকে এক চোখ দেখালে খুব রাগ করতেন বলে মহারাজই শিখিয়েছিলেন আমাদের, আর বলতুম এক চোখ বন্ধ করে—'গঙ্গাধর মহারাজ, ভাল আছেন?' তিনি বলতেন, 'এইসব রাজার কাণ্ড।'

লাটু মহারাজের জালের আলমারি খুলে আচার, নুন—সব নিয়ে নিতুম। তখন এইরকমই সব করতুম,—কিছু বুঝতুম না, কোন ভক্তিও ছিল না।

স্বামী ত্রিগুণাতীত একবার দুষ্টুমির জন্য বসিয়ে করে জপ শেখালেন তারপর বললেন, 'আমি তোর গুরু হলুম' আর আমি তাঁকে বললুম, 'কেন আপনি আমার গুরু হবেন, আমার বিয়ে হবে শ্বশুরবাড়ি যাব—তারপর অন্য গুরু হবে।' এইসব বলে খুব ঝগড়া করেছি। এখন ভাবি কি বোকামিই ছিল। অনেক দিন পরে আমার বাবা আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি কয়েক দিনের জন্য নিয়ে এসেছেন তখন সংসারের অনেক দুঃখ, অনেক জ্বালা! আমার হঠাৎ তাঁর কথা মনে পড়ল। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বাবা এখন স্বামী ত্রিগুণাতীত কোথায় আছেন?' বাবা বললেন, 'এতদিনে তোর তাঁর কথা মনে পড়ল, তিনি তো দেহ রেখেছেন।'

স্বামী ত্রিগুণাতীতের মুখে তাঁর সেই গল্পটি আমি শুনেছিলুম। সেই যে ওঁর গভীর রাত্তিরে শ্মশানে তপস্যা করতে যাওয়ার গল্প।

একবার বাগবাজারে—আমি তখন একদম ছোট। খুব কাঁদছিলুম। স্বামী সদানন্দ—গুপ্ত মহারাজ, আমায় কোলে করে নিয়ে বাগবাজারে ঘোরালেন, সিস্টার নিবেদিতার কাছে এবং পরে গিরিশবাবুর বাড়ি নিয়ে গেছলেন। মনে আছে, একটা বাঁদর দেখিয়েছিলেন। এখন সেই কথা মনে করে ভয় হয় কি কাণ্ডই করেছি! কত বড় সাধু তাঁর কোলে উঠেছি—গায়ে পা লেগেছে!! ছিঃ ছিঃ! স্বামীজীর প্রথম শিষ্য।

একবার বিনোদিনী—তখন ষাটের ওপর বয়স—আমার দিদিমার কাছে এসেছিলেন। দিদিমা তাঁকে গান করতে বলেছিলেন, তিনি গেয়েছিলেন। দুটি লাইন মনে আছে—

'ধিয়াতা ধিয়াতা নরমালী
ঘোরাননা, রক্তদশনা কালবদনা করালী।'

সে যে কি গান, কি গলা আর কি ভাব—বলতে পারব না! দিদিমা শুনতে শুনতে শিউরে উঠছিলেন।

মঠের পুরানোদের অনেকেই আমাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি এইসব কথা লিখে রাখতে পার না?' আমি তাঁদের বলতুম, 'আমি তো মুখ্যু, তাই আমি কি করে লিখব?' তাঁরা বলেছিলেন, 'তুমি না লিখতে পার অন্য কাউকে দিয়ে লিখিও।' সবাই শুনতে চায়। তাই এখন সেইসব ধ্যান করি। আমার নিজের তো কিছু নেই, খালি 'সম্বল আমার ও রাঙাপদ শিব ধরেন যা হৃৎকমলে!'

সমালোচনা

The story of Sarada Devi—Swami Smarananda. Illustrated by Biswaranjan Chakravarty. Published by Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta-700014. (1983), pp. 2+31, Price : Rs 7·90.

ইংরেজীতে ছোটদের মতো করে সহজ ভাষায় লেখা পাতায় পাতায় সজীব ছবি সহ সারদাদেবীর গল্প এই ধারায় একটি অনন্য সংযোজন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩, সারদার জন্ম থেকে ২১ জুলাই, ১৯২০ তাঁর প্রয়াণ অবধি তাঁর অপরূপ জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট কাহিনী অতি সাবলীল-ভাবে তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে। যাদের জন্য এ বই লেখা, তারা বইটি দেখলেই আকর্ষিত হবে, এর ভিতর ডুবে যাবে, যে-সব মণিরত্ন আছে তার সঙ্গে পরিচিত হবে, তাদের চিন্তাভাবনা-চেতনা উন্মেষিত হবে। এর জন্য লেখকের এবং শিল্পীর যে যুগ্ম প্রচেষ্টা এক কথায় তা অসাধারণ।

গ্রাম-বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক বালিকা কী ভাবে জগতের জননী হয়ে উঠলেন, তার ধারা-আলেখ্য বিধৃত রয়েছে। তাঁর সাধনা, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কঠিন কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁর জীবনের ভিতর অনুপ্রবেশ করলে, অনুধাবন করলে দেখা যায়, যা যত সহজ, তা ততই কঠিন। ছোট বেলা থেকেই তিনি সূর্যের মতো প্রকাশিত। পঙ্গপালে যখন শস্য নষ্ট করে গেছে, তখন মাঠ খুঁটে বালিকা শস্য যোগাড় করেন, মাঠে যখন কৃষকরা কাজ করে, তাদের জলখাবার বয়ে নিয়ে যান, ১১ বছর বয়সে দুর্ভিক্ষের সময় ছোট দুটি হাতে পাখা করে গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করেন ক্ষুধার্ত লোকরা যখন খেতে বসে তখন। কতই বা বয়স ছিল তাঁর! মাঠে সন্ধ্যায় একাকিনী ডাকাত এবং তার স্ত্রীকে দেখে এক মুহূর্তে তাদের আপন করে নেন, তারা মেয়ের মতো তাঁকে ঘরে নিয়ে আদর-যত্নে রাখে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় অনুপ্রেরণা তিনিই। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে ব্যবসায়ীর দশহাজার টাকার লোভ ছুঁড়ে ফেলে দেন শ্রীরামকৃষ্ণ—তাও তো সারদাদেবীরই অলৌকিক ত্যাগের খ্যাপক।

তখন তিনি অসাধারণা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের সময় তাঁকে বলে গেছেন, তাঁকে অনেক কিছু করতে হবে। সে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের জন্য মঠের কল্পনা তাঁরই চোখে প্রথম উদ্ভাসিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা যাত্রা করেন, তার আগে মার অনুমতি ও আশীর্বাদ চান এবং পান, তখন বিবেকানন্দের সমস্ত সংশয় দূর হয়, চিকাগো ধর্মসভায় তিনি বিশ্ব-জয় করেন। বাংলা তথা ভারতের নারীশিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁর নামই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—নিবেদিতার আমন্ত্রণে তিনি গিয়েছিলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলকাতায় মেয়েদের একটি বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটনে। তাঁর ছেলেদের জন্য কী ছিল তাঁর দরদ! গিরিশ ঘোষের বিছানার ও বালিশের চাদর নিজে কেচেছেন জয়রামবাটীতে পুকুরে, ডাকাত আম-জাদও পেয়েছে তাঁর ছেলের মর্যাদা, তাকে ডেকে খাইয়েছেন আদর করে, পরিষ্কার করেছেন তার এঁটো পাতাও। দেশ-কালের উর্ধ্বে ছিল তাঁর অমলিন স্নেহপ্রবাহ, সে-স্রোতে ভেসেছে আমজাদ, রেলের কুলী এবং বিদেশী বিদুষীরা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন নিবেদিতা, মিস জোসেফাইন ম্যাকলীয়ড প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর মেয়ের মতো—ভাষা বাধা হয়নি। এবং কী ছিল তাঁর শেষ বাণী? "ছেলে আমার, কেউই এখানে আগন্তুক নয়—সমস্ত জগৎটা তোমার নিজের।"

সারদাদেবীর জীবনের ঘটনাগুলির উপস্থাপনা বইটির আর একটি গুণ। ছোটদের চিত্তবৃত্তি

মহান অনুভূতিতে ভরে উঠবে। তাদের জীবন গঠনে সাহায্য করবে। ছায়াছবির আকারে দৃশ্যগুলি গেঁথে থাকবে তাদের স্নায়ুকোষে; লেখক এবং শিল্পী উভয়েই তাঁদের মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়েছেন।

মানবিক প্রয়োজনেই আমরা এমন একটি অনিন্দ্যসুন্দর বই-এর বহুল প্রচার কামনা করি।

—ডক্টর অমিয়কুমার হাটি
অধ্যাপক, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন্

পঞ্চতন্ত্রের গল্প—সম্পাদনা শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। প্রকাশক: ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, দ্বিতল, কলিকাতা-৭০০০০৭। পৃষ্ঠা ১৯৫, মূল্য: বারো টাকা।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে বর্তমান কালের শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তর পার্থক্য। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল কি উপায়ে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করবে। এই দুই দিকে লক্ষ্য রেখে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য শুধু অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা। কিভাবে অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় তার জন্য নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে—ফলে মানুষের চাহিদা দিন দিন আকাশছোঁয়া হয়ে পড়ছে, পরিণামে দেখা দিচ্ছে দুঃখ, অশান্তি। কিন্তু প্রাচীনকালের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ছিল—কিভাবে আত্ম-সংযম করা যায়, কিভাবে নিঃস্বার্থপর হওয়া যায়। বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা দেখলে মনে হয়, ভারত তার চিরন্তন আদর্শকে বর্জন করে চাকচিক্যময় পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুকরণ করতে সচেষ্ট। এই পরানুকরণকে স্বামীজী দাসসুলভ মনোভাবের পরিচয় বলেছিলেন।

প্রাচীন ভারত পারমার্থিক জ্ঞানলাভ ও পার্থিব জীবনের উন্নতিসাধনের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করেছিল। নৈতিকতা যে ঐ দুইয়ের উন্নতিসাধনের প্রথম সোপান সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের নৈতিক চরিত্র কিভাবে গড়ে তোলা যায় তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। ফলে তখনকার শিশুরা ভবিষ্যতে একটা সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে প্রথম থেকেই নীতিশিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পেত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়াতে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষের দিকে আর তেমন দৃষ্টি রাখা হয় না। ফলে শিশুরা চরিত্র গঠন করার জন্য যে-শিক্ষার প্রয়োজন, তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে এবং এর পরিণামে কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না—বর্তমান বিশৃঙ্খল সমাজের দিকে তাকালেই সে-চিত্র পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

এ-হেন প্রতিকূল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও সমাজের কল্যাণে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মূল সুরটিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কোন কোন চিন্তাশীল প্রকাশক নীতিশিক্ষামূলক সৎগ্রন্থাদি শিশুদের জন্য প্রকাশ করছেন। এই রকমই একজন আদর্শবাদী প্রকাশক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। তাঁর সম্পাদনায় প্রাচীন কালের বহুল প্রচারিত মহামতি বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের নীতিশিক্ষামূলক গল্পের সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিয়াল্লিশটি সুন্দর গল্প আছে। তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। শিশু-মনকে গঠন করার এমন সুন্দর একটি সংকলন প্রকাশের জন্য তিনি দেশের কল্যাণকামী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। ভারত সরকার এই গ্রন্থটিকে জাতীয় পুরস্কার দিয়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

প্রায় পাতায় পাতায় রঙিন ছবি, স্বচ্ছ সাবলীল ভাষা ও সুন্দর ঝকঝকে ছাপায় বইটি শিশুদের পক্ষে অতি আকর্ষণীয় হয়েছে।

পুস্তকখানি পড়ে তারা খুব আনন্দ উপভোগ করবে তো বটেই এবং সেই সঙ্গে তাদের নৈতিক চরিত্র-গঠনের স্পৃহাও জাগবে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

হলুদ পাহাড়—এনিড ব্লাইটন, অনুবাদক: অমিয়কুমার হাটি। প্রকাশক: গ্রন্থালোক, ৯৩, বি. কে. রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯। (১৯৮৩), পৃঃ ১০৪, মূল্য: দশ টাকা।

চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বাবা-মা উড়োজাহাজের পাইলট। উড়োজাহাজ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজন কাজে বেরিয়ে পড়ল—ফিরে আসবে সেই এক সপ্তাহ পরে। বাচ্চারা বিদায় জানাতে এসেছে বিমানবন্দরে। আরও অনেকে এসেছেন বিখ্যাত এই দুজন পাইলটকে বিদায় জানাতে। 'সাদা হাঁস' উড়োজাহাজটি নিয়ে সবার শুভেচ্ছা সহ পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ পাইলট দূর আকাশে উড়ে গেল।

কয়েক দিন যেতে না যেতে ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজে দেখল ক্যাপ্টেন আর্নল্ড ও মিসেস আর্নল্ডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আফ্রিকার একটি জায়গায় তাদের উড়োজাহাজটিকে শুধু পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের কোন সন্ধান মিলছে না।

চার ভাইবোনের ছোট্ট একটি যুবরাজ বন্ধু ছিল। তার নাম পল। তারও একটি নিজস্ব উড়োজাহাজ ছিল। তারা পাঁচজন মিলে ঠিক করল, যেমন করেই হোক, বাবা-মাকে তারা খুঁজে বের করবে। এই পাঁচজন শিশুকে নিয়ে চলল পলের অনুগত সুদক্ষ দুই পাইলট। প্রথমে এই দুজন পাইলট তাদের বিপজ্জনক পরিকল্পনাকে তেমন স্বাগত জানায়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ছোট্ট যুবরাজের ইচ্ছায় সম্মতি না জানিয়ে পারেনি।

লণ্ডন থেকে তারা উড়োজাহাজে করে চলল আফ্রিকায়। সেখানে গিয়ে পায়ে হেঁটে বনজঙ্গল-পাহাড়-পর্বতের অজানা-অচেনা জায়গায় খুদে অভিযাত্রীর দলটি চলল। কী দুঃসাহসিক অভিযান তা তারা জানে না! বিপদের ফাঁদ পাতা আছে সর্বত্র। নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, বহু বাধা অতিক্রম করে অবশেষে তারা তাদের বাবা-মাকে উদ্ধার করে লণ্ডনে ফিরে এল।

শিহরণ জাগানো একটি অভিযান। বইটির পাতায় পাতায় খুদে অভিযাত্রীদের দুঃসাহসের পরিচয় আছে। বইটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে খুদে অভিযাত্রী দলটি যেভাবে এগিয়ে চলেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। পড়তে আরম্ভ করলে রুদ্ধশ্বাসে শেষ না করে পারা যায় না। মনে সদা ভয়, সন্ত্রস্ত ভাব—কখন কী হয়—এই বুঝি কিছু একটা ঘটে গেল! এই শিহরণ জাগানো অভিযানের কাহিনীটি ছোটদের দারুণ লাগবে, বড়দেরও ভাল লাগবে।

এনিড ব্লাইটনের এই বইটি অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. অমিয়কুমার হাটি। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ পর্বতাভিযাত্রীও বটে। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত। এটি যে একটি অনুবাদ সাহিত্য তা বোঝাই যায় না পড়লে মনে হয়, বইটি মূল বাঙলাভাষাতেই লেখা। অপূর্ব অনুবাদের জন্য তাঁর এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। বইটি বাংলার শিশুদের মনকে দুর্জয়কে জয় করার প্রেরণা জোগাবে, সাহসে ও তেজে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা সেটাই দেখতে চাই।

—স্বামী চৈতন্যানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণ: উত্তর ত্রিপুরায় বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্যের জন্য গত ৩০ মে বেলুড় মঠ থেকে সন্ন্যাসি-সেবকগণ চলে গিয়েছেন। কৈলাসহর ও কমলপুরের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যাপীড়িতদের মধ্যে বিতরণের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিমানযোগে আগরতলায় পাঠানো হয়েছে:

১০০০ ধুতি, ১০০০ শাড়ি, ১০০০ তুলার চাদর, ৪০০০ জামা-প্যাণ্ট শিশুদের, ১০০ খানা উলের কম্বল, ২৮৮টি লণ্ঠন এবং ১৮২টি প্লাস্টিকের গ্লাস।

মহারাষ্ট্রে হাঙ্গামাত্রাণ: গত ২২ থেকে ২৮ মের মধ্যে মহারাষ্ট্রের থানে ও ভিবান্দি অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রাথমিক সেবাকার্য হিসাবে ৭৭০০টি খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

আসামে বন্যাত্রাণ: শিলচর ও করিমগঞ্জের বন্যার্তদের ত্রাণের কার্য শুরু হয়েছে যথাক্রমে শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতির মাধ্যমে।

শ্রীলঙ্কায় শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে মন্ডাপম্ শিবির থেকে প্রাথমিক ত্রাণকার্য অব্যাহত রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: গত ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। শিমুলতলা, দে-পাড়া ও নৃসিংহতলা—এই তিনটি গ্রাম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বারো দিনের মধ্যে ৬৮টি খড়ের ঘর পুনর্নির্মিত হয়েছে 'নিজের বাড়ি নিজে কর' পরিকল্পনার মাধ্যমে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পনেরটি বাড়ি মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। দশ টিন বিস্কুট শিশুদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে। ২৪ মে, ১৯৮৪ তারিখে এখানকার ত্রাণকার্য শেষ হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

মোরাবাদি (রাঁচি) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় গত ৬ থেকে ৮ মে ১৯৮৪, যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল ৩৮০ জন যুবক-যুবতী।

বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় গত ৭ মে, ৮০ জন তরুণ-তরুণীর উপস্থিতিতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারের উদ্যোগে গত ২০ মে, যে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগদান করেছিলেন ১০০০ ছেলে-মেয়ে ও ১০০ জন পর্যবেক্ষক।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সমীক্ষার জন্য গঠিত জাতীয় সমিতি এবং বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ উদ্যোগে বোম্বে (খার) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৪ থেকে ৬ মে তিনদিনব্যাপী এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম. এস. গোরে এবং সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. ভি. কে. আর. ভি. রাও। আলোচনার বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে ছিল 'ভারতের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব',

'স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান', 'ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর স্বামীজীর নতুন আলোকপাত', 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়', 'বিবেকানন্দের সর্বজনীনতা', 'ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য' প্রভৃতি। এই আলোচনা-চক্রে বোম্বে, পুনা, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী ও কলিকাতার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় সমীক্ষা সমিতির সম্পাদক ড. নিমাইসাধন বসু, ড. উষা মেহেতা, ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ড. এস. উপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, ড. এন. এন. ভালিচা, ড. জে. ভি. নায়েক, ড. মহাদেবন্ প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি। উল্লেখ্য যে, এই আলোচনা-চক্রে কয়েক শ যুবক-যুবতীও যোগদান করে। প্রথম ও শেষ দিনের অধিবেশনে প্রায় ৬০০ সম্ভ্রান্ত নরনারী অংশগ্রহণ করেন। ভারতের নানা প্রান্ত, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই ধরনের আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জাতীয় সমীক্ষা সমিতির কাছে এসেছে। সমিতির সম্পাদক ড. নিমাই-সাধন বসু জানান যে, পরবর্তী আলোচনা-চক্র কেরালায় ত্রিচুরে অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ১৭ জুন ১৯৮৪ তারিখে।

উৎসব

নিম্নলিখিত স্থান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে :

বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

বাগেরহাট (বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

উদ্বোধন-সংবাদ

মায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীফলহারিণীকালীপূজা (২৯ মে ১৯৮৪, মঙ্গলবার) সারারাত্রব্যাপী এক শান্ত গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

সংবাদ

উৎসব

হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল '৮৪ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে সভানেত্রী প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বক্তৃতা করেন শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণা ও স্বামীজী সম্বন্ধে প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা। স্তোত্র ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন ব্রহ্মচারিণী যশোদা।

দ্বিতীয় দিনে সভাপতির ভাষণে স্বামী আত্মস্থানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি সুন্দর আলোচনা করেন। শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী স্বামীজী সম্বন্ধে এবং স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বাত্মানন্দ ও স্বামী অনন্তানন্দ। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ভাষণে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন। স্তোত্র ও সঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন আশ্রমকর্মীরা। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়।

নিম্নলিখিত স্থান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাবতিথি উৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে :

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, **মারণাই** (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সেবাসঙ্ঘ, গান্ধী কলোনি. (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আরিট (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ঢাকুরিয়া (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

হুগলী-চুঁচুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব উৎসব-পর্ষদের উদ্যোগে গত ২০ মে ১৯৮৪, বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ৩০০ যুবক-যুবতী এবং কিছুসংখ্যক বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা যোগদান করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্যা **সরযু কর** গত ১৬ এপ্রিল ১৯৮৪, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ ক্ষণের আগে পর্যন্ত তিনি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

তিনি ছিলেন অসাধারণ সেবাপরায়ণা ও ভক্তিমতী। সেবাশ্রম বা অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিটি অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাসহ যোগদান করতেন। পরোপকারই ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রতিবেশী সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীবিশ্বনাথ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বনামধন্য পণ্ডিত **বিধুভূষণ ভট্টাচার্য,** সপ্ততীর্থ গত ১০ জুন, ১৯৮৪ রবিবার (ভারতীয় মতে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, শনিবার) রাত ৩-৩০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। ৬ ফেব্রুআরি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর (অধুনা বাংলাদেশ) জেলার সামন্তসার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বারাণসীর পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্যের আচার্য নবীন তর্করত্ন। তিনি পিতার কাছে, ৺হরিনাথ ব্যাকরণ-তীর্থের কাছে এবং বিশিষ্ট নৈয়ায়িক তারানাথ তর্কতীর্থের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি আশৈশব কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রতিটি উপাধি পরীক্ষাতে প্রথম স্থানলাভ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের টোলে তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। পরে মুন্সিগঞ্জে হরগঙ্গা কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসাবে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সূত্রে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের বিশ্বধর্মীয় সম্মেলনের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য ছিলেন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক, বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যাকার এবং কয়েকটি দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর 'ক্ষণভঙ্গবাদ' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের যে সংস্কৃত অনুবাদ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতম্' প্রকাশিত হয়, তার অনুবাদ ও সম্পাদনায় তাঁরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তিনি বহু দার্শনিক প্রবন্ধ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা প্রভৃতির সম্বন্ধে বহু স্তব রচনা করেছেন। উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত লেখকও ছিলেন তিনি। উদ্বোধন কার্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলুড় সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাধু-ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্র অধ্যাপনায় তিনি বহু বছর নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর বিদেহ-আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।



পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ● শ্রাবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৫৫-৩৬৬)

অবশ্য এরা ভাল খায় ভাল পরে, দেশ ভাল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে, অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের যে দু একটা বলবান জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, কত বয়সে বে করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্ব্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর, শাস্ত্র পড়ে দেখ,—৩০, ২৫, ২০,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বের বয়স। আয়ু, বল, বীর্য্য, এদের আর আমাদের অনেক ভেদ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা, তিন পেরুলেই ফরসা; এরা তখন সবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদ্রোগে, ফুসফুস্ রোগে, এদের বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা প্রায়ই নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান হয়। হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে, আশা বিশ্বাস পুরো থাকে। ওলাউঠা রুগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারুগী মরবার সময় পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সেই জন্যেই কি, ভারতের লোক সর্ব্বদাই মরণ মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করছে? আমি ত এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাববার বটে। আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত, আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুড়ছি, কান ফুড়ছি, গহনা পরবার জন্য। এরা এখন, ভদ্রলোকে বড়, নাক কান ফোড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পীলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট ক'রে শরীরটাকে বিশ্রী করে গড়ন গড়ন করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দী কাপড়ের উপর গড়ন রাখ্‌তে হবে। এদের পোষাক—কাজ-কর্ম্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোষাক ছাড়া মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া। আমাদের মেয়েদের শাড়ী, আর পুরুষদের চোগা চাপকান পাগড়ীর সৌন্দর্য্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোষাকে যত রূপ, তত আঁটাসাটায় হয় না। আমাদের পোষাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজ-কর্ম্মের পোষাক নেই; কাজ কর্ত্তে গেলেই কাপড় চোপড় বিসর্জ্জন যায়। এদের ফ্যাসান্ কাপড়ে, আমাদের ফ্যাসান্ গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে। ফ্যাসান্‌টা কি, না—ঢঙ্গ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ্গ—পারিস্ সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের—লণ্ডন থেকে। আগে পারিসের নর্ত্তকীরা এই ঢঙ্গ—ফেরাত। একজন বিখ্যাত নটী যা পোরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই কর্ত্তে। এখন দোকানিরা ঢঙ্গ করে। কত ক্রোর টাকা যে, এই পোষাক কর্ত্তে লাগে প্রতি বৎসর, তাহা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এ পোষাক গড়া একপ্রকার বিদ্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের, চুলের রঙ্গের সঙ্গে, কোন্ রঙ্গের, কাপড় সাজন্ত হবে; [illegible]র শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্‌টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি, অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরী হয়। তারপর, দু চারজন উচ্চপদস্থ মহিলা যা করেন, বাকি সকলকে তাই পরতে হয়,—না পরলে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাসন্। আবার, এই ফ্যাসন্ ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে; বছরে চার ঋতুতে চার বার বদ্‌লাবেই ত, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে। যারা বড় মানুষ তারা দরজি দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্যবিৎ ভদ্রলোক, তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুটকো ছাট্‌কা মেয়ে দরজি দিয়ে, নূতন ধরণের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্ত্তী ফ্যাসান্ যদি কাছাকাছি রকমের হয়, ত পুরাণ কাপড় বদ্‌লে-সদ্‌লে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষরা

চৈত্র, ১৩১০ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

(আষাঢ়, ১৩১১, পৃঃ ৩৭৭)

ফি ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইয়োরোপী লোকেদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে,—আফ্রিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায়,—সেথায় গিয়ে হাজির হয় এবং তারা পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় পারিস্ হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকিরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে। কিন্তু, মেয়েদের টুপিটী আসল ফরাসী হওয়া চাইই চাই। যার তা নয়, সে লেডি নয়। ইংরেজের মেয়েদের আর জর্ম্মাণ মেয়েদের পোষাক বড় খারাপ; ওরা বড় পারিস্-ঢঙ্গে পোষাক পরে না,—দু দশ জন বড়মানুষ ছাড়া; এই জন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা কিন্তু খুব ভাল পোষাক পরে,—অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙ্গসই পোষাক পরে। যদিও আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট পারিস্ বা লণ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে—তথাপিও এরা মাশুল দিয়েও, মেয়েরা পারিস্ ও পুরুষরা লণ্ডনের তৈয়ী পোষাক পরে। নানা রকমের, নানা রঙ্গের, পশমিনা, বনাত, রেসমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে ছেঁটে পোষাক ক'রছে। ঠিক ঢঙ্গের পোষাক না হলে, জেণ্টলম্যান্ বা লেডির রাস্তায় বেরুনই মুস্কিল। আমাদের দেশে এ ফ্যাসানের হাঙ্গাম কিছু কিছু গহনায় ঢুকছে। এ সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতিদের নজর দিন রাত—কি বদ্লাচ্ছে বা না বদ্লাচ্ছে—লোকে কি রকম পসন্দ করছে—তার উপর, অথবা, নূতন একটা ক'রে লোকের মন আকর্ষণ ক'রবার চেষ্টা করছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই, সে ব্যবসাদার বড়মানুষ। যখন তৃতীয় নেপ্‌লেঁঅ ফরাসী দেশের বাদ্শা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁর কাশ্মীরী শাল বড় পছন্দ ছিল। কাজেই লাখো টাকার শাল ইউরোপ প্রতি বৎসর কিনত। তাঁর পতন অবধি সে ঢঙ্গ বদ্‌লে গেছে। শাল আর বিক্রি হয় না। আর, আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়; নূতন একটা কিছু ক'রে, সময় মত, বাজার দখল কর্ত্তে পারলে না; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে; বড় বড় সদাগর গরীব হয়ে গেল। এ সংসার—দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর; কেউ কি কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দুশ হাত দিয়ে দেখ্‌ছে, খাট্‌ছে; আমরা—"গোঁসাইজি যা পুঁথিতে" লেখেননি—তা কখনই ক'রবো না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা ত অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হ'চ্চে; বস্। কোণ্ থেকে বেরোও না দুনিয়াটা কি চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধি শুদ্ধি আসবে। দেবাসুরের গল্প ত জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে, পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোক এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হ'চ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই ত দেখি, মনিষ্যির মত; দেবতাগুলো ত অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে, তোমরা দেবতার বাচ্ছা, আর পাশ্চাত্যরা অসুরবংশ, তা হ'লেই, দু দেশ বেশ বুঝতে পারবে।

দেখ শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধি হচ্ছে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়। উত্তম; দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নাই, যাদের শরীর হিঁদুদের মত সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোনও জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের, চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে

(৪৬তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৭৪)

শিখিয়েছে,—কিছু বাঁচোয়া। স্নানও নেই বল্‌লেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে, স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যে সব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, স্নানের কি কষ্ট। যারা স্নান করে—সে সপ্তায় এক দিন—সে দিন ভেতরের কাপড়, অণ্ডার-ওয়ার বদলায়। অবশ্য, এখন পয়সাওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকানরা একটু বেশী। জর্ম্মণ—কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিন্‌কালেও না!!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লসুন খাওয়া, দিন রাত ঘর্ম্মাক্ত, আর ৭ জন্মে জলস্পর্শও না। সে গায়ের গন্ধে ভূতের চোদ্দপুরুষ পালায়—ভূত ত ছেলেমানুষ। 'স্নান' মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোওয়া—যা বাইরে দেখা যায়। আবার কি? পারিস্, সভ্যতার রাজধানী পারিস্, রঙ্গ ঢঙ্গ ভোগ বিলাসের ভূস্বর্গ পারিস্, বিদ্যা শিল্পের কেন্দ্র পারিস্, সেই পারিসে, এক বৎসর, এক বড় ধনী-বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আন্‌লেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন,—রাজভোগ খাওয়া দাওয়া; কিন্তু,—স্নানের নামটী নেই। দু'দিন ঠায় সহ্য ক'রে—শেষ আর পারা গেল না। শেষ, বন্ধুকে বলতে হলো—দাদা তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি" হয়েছে। এই দারুণ গরমীকাল, তাতে স্নান কর্‌বার জো নাই; হন্তে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বল্‌লেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল যায়গা খুঁজে নিইগে। ১২টা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হলো, স্নানের স্থান কোথাও নাই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকেলে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ি স্নান কর্ত্তে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে!! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ির চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাৎ!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুষ-রুস্‌গুলো ত আসল ম্লেচ্ছ; তিব্বৎ থেকেই ও ঢং আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসাবাড়িতে একটা করে স্নানের ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু তফাৎ দেখ। আমরা স্নান করি কেন?—অধর্ম্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যরা হাত মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে ব'লে। আমাদের—জল ঢাললেই হলো, তা তেলই বেড় বেড় করুক, আর ময়লাই লেগে থাকুক। আবার, দক্ষিণী ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, ঝামারও সাধ্য নয় তাঁকে ঘসে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হু'ক ডুব লাগালেই হ'ল। ওদের সে এক বস্তা কাপড় খুল্‌তে হবে, তার বন্ধনই বা কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই; ওদের বেজায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই—বাপ বেটার সাম্‌নে উলঙ্গ হবে—দোষ নাই। মেয়েছেলের সাম্‌নে আপাদ মস্তক ঢাক্‌তে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর সম্বন্ধী সমস্ত কার্য্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি ত দূরের কথা; লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা। খেয়ে আঁচান সকলের সাম্‌নে, অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে, খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে;—ক্রমে দাঁতের সর্ব্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার।

(আষাঢ়, ১৩৯১, পৃঃ ৩৭৯)

আমাদের আবার, দুনিয়ার লোকের সাম্‌নে, রাস্তায় বসে, বমির নকল কর্ত্তে কর্ত্তে মুখধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচান,—এটা অত্যাচার। ও সমস্ত কার্য্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার, দেশ ভেদে যে সকল কার্য্যগুলো অনিবার্য্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়। আমাদের গরমদেশে খেতে বসে আদ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু, ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্যদেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু, খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে নাক না ঝেড়ে মধ্যে মধ্যে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা ক'রে, আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে, ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দো'রের পাশে পচ্‌তে দিই। না ছুঁলেই হল। এদিকে যে, নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়ীতে ময়লা, সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে ম'রে পেতে হবে না,—অপেক্ষাও বড় বেশী কর্ত্তে হবে না।

আমাদের রান্নার মতো পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মত পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নাই। আমাদের রাঁধুনী স্নান করেছে; কাপড় বদ্‌লেছে; হাঁড়ি পাত্র, উনুন, সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে, মুখে, গায়ে, হাত ঠেকলে, তখনি হাত ধুয়ে, তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলিতি রাঁধুনীর চোদ্দ পুরুষে কেউ স্নান করেনি; রাঁধতে রাঁধতে চাখ্‌ছে, আবার সেই চাম্‌চে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে। রুমাল বার করে, ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার ক'রে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগলো। কিন্তু, ধপ্‌ধপে কাপড়, আর টুপি পরেছে। হয়ত, একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে ছুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে, রাশীকৃত ময়দার উপর নাচ্‌ছে,—কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমীকাল দর-বিগলিত ঘাম, পা বেয়ে, সেই ময়দায় সেঁদুচ্ছে। তারপর, তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে, পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পাতা, কনুই পর্য্যন্ত সাদা দস্তানা পরা চাকর, এনে সাম্‌নে ধর্‌লে। কোনও জিনিষ হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্য্যন্ত দস্তানা।

আমাদের স্নান করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে, পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে, গোময়সিক্ত মাটির উপর থালশুদ্ধ অন্ন ব্যঞ্জন ঝাড়্‌লে; বামুনের কাপড়ে থাম্‌চে ময়লা উঠ্‌ছে। হয় ত, মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল, কলাপাতা ছেঁড়ার দরুণ, একাকার হয়ে এক অপূর্ব্ব আস্বাদ উপস্থিত করলে!!

আমরা দিব্যি স্নান ক'রে, এক খানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম; আর ইউরোপে, ময়লা গায়ে, না নেয়ে, একটি ধপ্‌ধপে পোষাক পরলে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগা

(৮৬তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৮০)

গোড়ার তফাৎ—হিঁদুর সেই যে অন্তর্দৃষ্টি, তা আগা পাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলিতী, সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হক্‌। বিলিতীর কাপড় সাফ থাক্‌লেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরক-কুণ্ড থাকুক না কেন! বিলিতীর মেজে কারপেট মোড়া ঝক্‌ঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাক্‌লেই হল!! হিঁদুর পয়নালী রাস্তার উপর—দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না! বিলিতীর পয়নালী রাস্তার নীচে—টাইফয়ড্‌ ফিবারের বাসা!! হিঁদু কর্চ্ছেন ভেতর সাফ! বিলিতী কর্চ্ছেন বাইরে সাফ!

চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে, পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখ ধোয়া, দাঁতমাজা, সব চাই—কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই, রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই, পরিষ্কার রঁাধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই; আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে, পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই। আচারঃ প্রথমোধর্ম্ম; আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া, সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচারভ্রষ্টের কখন ধর্ম্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখ্‌ছো না, দেখেও শিখ্‌ব না। এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া; কার দোষ?—আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী! [ক্রমশঃ।]

হীরক-তত্ত্ব

বাবু অনুকূলচন্দ্র ঘোষ।] [১৭৮ পৃষ্ঠার পর

হীরকের রাসায়নিক গবেষণা।

একখণ্ড কয়লার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কখন কি মনে হয় যে, ঐ সামান্য পদার্থ হইতেই, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে হীরকের উৎপত্তি হইয়াছে? বস্তুতঃ হীরক আর কিছুই নহে, ইহা বিশুদ্ধ কয়লার রূপান্তর মাত্র। এই অভিনব প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের এক বিশেষ পরিচ্ছেদের অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের বিজ্ঞানসভার পণ্ডিতেরা বিশেষরূপে নির্ম্মিত দর্পণের সাহায্যে সূর্য্যের উত্তাপ সংগৃহীত করিয়া, কয়েকখণ্ড হীরক ভস্মীভূত করেন। টেনান্ট সাহেব এক স্বর্ণনির্ম্মিত নলের মধ্যে সোরা গলাইয়া, তাহাতে একখণ্ড হীরক নিক্ষেপ করেন। দ্রব সোরার সংস্পর্শে হীরক উজ্জ্বলরূপে জ্বলিয়া অদৃশ্য হইল। কিন্তু, সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ পাত্রে যখন হীরক উত্তপ্ত করা হইল, তখন উহা পরিবর্ত্তিত হইল না। এই সকলের কারণ নির্ণয় করিতে, কেহই সমর্থ হইলেন না।

পটাসিয়াম ক্লোরেট্‌ নামক যৌগিকপদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে, অক্সিজেন গ্যাস্‌ উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস্‌ পরিষ্কার কাচনির্ম্মিত পাত্রে সংগ্রহ করিয়া, যদি তাহাতে একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা রাখা যায়, তাহা হইলে কয়লাখানি অধিক দীপ্তিশালী হইবে। একণে ঐ পাত্রে কিঞ্চিৎ বর্ণহীন চুণের জল নিক্ষেপ করিলে, উহা দুগ্ধের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হইবে। ইহার কারণ কি? জ্বলন্ত কয়লা ও অক্সিজেন্‌

(আষাঢ়, ১৩১১, পৃঃ ৩৮১)

পরস্পরের সংসর্গে আসিয়া রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে মিলিত হইয়া, এক নূতন গ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন গ্যাসের নাম কার্ব্বণিক্ এসিড্ বা কার্বন্-ডাইঅক্সাইড্। আবার পাত্রে নিক্ষিপ্ত চুণের জলের সহিত, এই নূতন গ্যাস্ মিশ্রিত হইয়া, আর এক নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নূতন পদার্থই চুণের জলের শ্বেতবর্ণের কারণ। ইহা আর কিছুই নহে, ইহা অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত খড়ি।

বর্ত্তমান রসায়নশাস্ত্রের স্থাপনকর্ত্তা, প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত লাভোয়াসিয়ে একখণ্ড হীরক বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কাচপাত্রে স্থাপিত করিয়া, ঐ পাত্রটীকে পারদের উপর রাখিলেন। আতস-কাচের সাহায্যে সূর্য্যকিরণ হীরকের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রচণ্ড উত্তাপে হীরকখণ্ড জলিয়া উঠিল ও ভস্মে পরিণত হইল। এইরূপে কাচপাত্রে যে গ্যাস উৎপন্ন হইল, তাহা পরিষ্কার চুণের জল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট করিল। কিন্তু, কেবল কার্ব্বণিক্ এসিড্ গ্যাস এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট হওয়ায়, এই অনুমান করা গেল যে, কাচপাত্রস্থিত বিশুদ্ধ বায়ু হইতে উত্তপ্ত হীরকখণ্ড অক্সিজেন্ আকর্ষণ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া, কার্ব্বণিক্ এসিড্ গ্যাসে পরিণত হইয়াছে। আবার পূর্ব্বের পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, জলন্ত কয়লা ও অক্সিজেন, কার্ব্বণিক্ এসিড্ গ্যাস্ উৎপন্ন করে। অতএব, এ স্থলে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, হীরকে কয়লা বর্ত্তমান। কিন্তু এই পরীক্ষা হইতে হীরক যে কয়লার রূপান্তর মাত্র, তাহা নিরূপিত হইতে পারে না।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক সার্ হাম্ফ্রিডেভি ইটালির অন্তর্গত ফ্লোরেন্সের গ্র্যাণ্ড ডিউকের বিশেষরূপে নির্ম্মিত আতস-কাচের সাহায্যে কয়েকখণ্ড হীরক দগ্ধ করেন। লাভোয়াসিয়ে পূর্ব্বেই হীরকে কয়লার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেভি হীরকে হাইড্রোজেন্ আছে কি না, দেখিতে লাগিলেন। অগ্নিশিখার সংস্পর্শে হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ প্রজ্বলিত হয়। প্রজ্বলিত হাইড্রোজেন্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে, জলের উৎপত্তি হয়। সেই জন্য ডেভি বিশুদ্ধ অক্সিজেনে একখণ্ড হীরক দগ্ধ করিলেন। কিন্তু, বিন্দুমাত্র জল দেখিতে না পাইয়া, তিনি স্থির করিলেন যে হীরকে হাইড্রোজেন্ নাই।

কিন্তু এখনও রসায়নবিদেরা স্থির হইলেন না। আরো অনেক পরীক্ষা হইতে লাগিল। অবশেষে বিশুদ্ধ অক্সিজেন্ পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সমান ওজনের হীরক, কয়লা ও গ্রাফাইট্ (পেন্সিলের সিস্) দগ্ধ করিয়া দেখা গেল যে, প্রত্যেক পাত্রে একই ওজনের কার্ব্বণিক্ এসিড্ গ্যাস্ উৎপন্ন হইয়াছে। তখন হীরক, কয়লা ও গ্রাফাইট্ যে পরস্পরের রূপান্তর মাত্র, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না।

এইখানেই যে হীরক সম্বন্ধে গবেষণা শেষ হইল তাহা নহে।

কৃত্রিম হীরক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিলাতের রয়াল ইন্ষ্টিটিউসনে প্রফেসার ম্যাস্কেলিন হীরকের বিষয় বক্তৃতা করেন; তিনি উপসংহারে বলিয়াছিলেন যে, হীরক প্রস্তুত করা মানবের সাধ্যাতীত। কিন্তু, হীরক প্রস্তুত করা এখন আর স্বপ্নকল্পিত'র বিষয় নহে; কারণ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা কার্য্যে পরিণত

হইয়াছে। সুবিখ্যাত ফরাসি রসায়নবেত্তা সোয়াসাঁ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সুমিষ্টতার জন্য চিনির বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু কয়লা, অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ গ্যাস, রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া, ভিন্ন গুণবিশিষ্ট এই সুমিষ্ট বস্তু উৎপাদন করিয়াছে। চিনির মধ্যে যে কয়লা বর্ত্তমান, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। অল্প পরিমাণ চিনির সহিত, অর্দ্ধভাগ ক্লোরেট্-অফ্-পটাস্ মিশ্রিত করিয়া, তাহার উপর সাবধানে এক বিন্দু সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ ফেলিয়া দিলে, ঐ মিশ্রিত দ্রব্য প্রজ্জলিত হইবে। তৎপরে দৃষ্ট হইবে যে, ঐ দুই দ্রব্যের স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পদার্থ কয়লা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্লোরেট্-অফ্-পটাস্ নামক যৌগিক পদার্থ, পটাসিয়াম্ নামক ধাতু ও ক্লোরিন্ ও অক্সিজেন্ গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত। সল্‌ফিউরিক্ এসিড্, গন্ধক, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ হইতে উৎপন্ন। এই দুই পদার্থে কয়লার লেশমাত্র নাই। অতএব, ঐ কয়লা যে চিনির অংশীভূত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সল্‌ফিউরিক্ এসিডের সংযোগে যে রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবে চিনি ও ক্লোরেট্-অফ্-পটাসের অন্তর্ভূত, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন ও ক্লোরিন্ পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজ্জলিত হইয়াছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ, ঐ সকল বস্তু হইতে কয়লা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সোয়াসাঁ এই কয়লা বিশুদ্ধ করিয়া চাপের প্রভাবে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে সোয়াসাঁ ইলেক্‌ট্রিক্ ফার্নেস্ নামক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তাড়িতের সাহায্যে ইহাতে যে প্রচণ্ড উত্তাপ উৎপাদিত হয়, তদ্দ্বারা প্লাটিনাম্, ইস্পাত, লৌহ প্রভৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্রবীভূত হয়। হীরক প্রস্তুতের নিমিত্ত, বিশুদ্ধ কয়লা ও লৌহ এক কার্বন নির্ম্মিত পাত্রে মিশ্রিত করিয়া, পাত্রটী ইলেক্‌ট্রিক্ ফার্নেসে স্থাপিত হইলে, লৌহ শীঘ্র দ্রব হইয়া কয়লার সহিত মিলিত হয়। চারি সহস্র ডিগ্রি উত্তাপে কয়েক মিনিট রাখিয়া, পরে ঐ রক্তবর্ণ পাত্রটিকে শীতল জলে ডুবাইতে হয়। দ্রব লৌহ সহসা শীতল হইয়া কঠিন হইয়া যায়। কঠিন হইবার সময় লৌহ ভিতরের কয়লার উপর এরূপ চাপ প্রয়োগ করে যে, ঐ কয়লা হীরকে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক সকল লৌহের সহিত এরূপ সংলগ্ন হইয়া যায় যে, তাহাদিগকে বিভিন্ন করা সহজ নহে। এই জন্য সাবধানে সল্‌ফিউরিক্, নাইট্রিক্, হাইড্রোক্লোরিক্ ও হাইড্রোফ্লুওরিক্ এসিডের সাহায্যে লৌহাদি গলাইয়া ফেলিতে হয়, এবং পরে, জলে বারম্বার ধৌত করিয়া শুষ্ক করিলে, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড পতিত থাকে। এই সকল হীরক এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহাদিগকে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণের সাহায্য লইতে হয়। বহু চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ আণুবীক্ষণিক হীরক প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমে উৎকৃষ্ট যন্ত্র উদ্ভাবিত হইলে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুবৃহৎ হীরক প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে।

সমাপ্ত

(আষাঢ়, ১৩১১, পৃঃ ৩৮০)

কোন্ পথে যাই ?

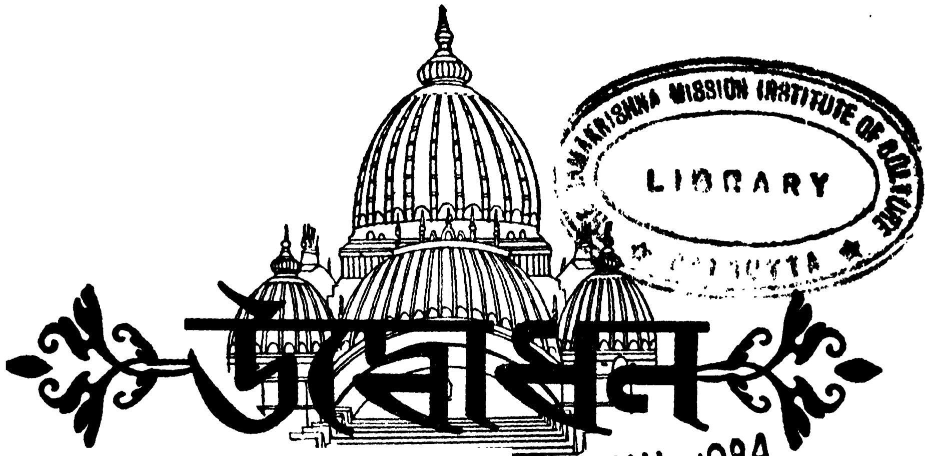
(ভিক্ষু দেবী দাস লিখিত।)

ছেলেবেলা হইতেই আমার মনে উদয় হইত—ঈশ্বর কি, আমি কে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে কোন্‌টীতে কতদূর সত্য, ইত্যাদি। হয়ত স্কুলে যাইতেছি, মনে উদয় হইল, আমি কে,—সে যে কিরূপ ভাব, তাহা আমি মুখে বলিতে পারি না, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম। এক দিন স্কুলে ভাবিতে লাগিলাম, 'যথার্থ কি ঈশ্বর আছেন ?' মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিলাম—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। সেই সময়ে স্কুলের কোন রচনা লিখিতে হইলে, পদ্ধতিমত এইরূপে আরম্ভ করিতাম, 'ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে জগতে কত কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে।' 'ঈশ্বর নাই' এই সিদ্ধান্ত স্থির করিবার পর মনে মনে ভাবিলাম, আর ঈশ্বরের নাম এই-রূপে লেখা হইবে না। কিন্তু, এইরূপ সিদ্ধান্তে স্থির হইতে পারিলাম না। সে দিন পড়া শুনা নাম-মাত্র হইল। সমস্ত দিন এই চিন্তা—যদি ঈশ্বর বলি। কেহ নাই, তবে ঈশ্বরচিন্তারই বা প্রয়োজনীয়তা কি ? সেই সময়ে একটী স্বাভাবিক বিশ্বাস এই ছিল যে, চরিত্র ভাল করা দরকার। স্কুল হইতে বাটী যাইতে যাইতে সিদ্ধান্ত করিলাম,—ঈশ্বর না থাকিলেও, ঈশ্বর চিন্তা করিবার কারণ এই,—সাধুসঙ্গ ব্যতীত চরিত্র উন্নত হয় না। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা দুর্লভ। সুতরাং, ঈশ্বর অর্থাৎ একজন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুরুষ কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার চিন্তা করিলে, দিবারাত্রি সাধুসঙ্গের কার্য্য হয় ; সুতরাং চরিত্রেরই উন্নতি হইতে থাকে। এই সিদ্ধান্তেই তখন কতকটা মন স্থির হইল।

আর এক দিনের কথা—স্কুল হইতে রাস্তায় যাইতে যাইতে মনে হঠাৎ উদয় হইল, কালী নাম করা যাক্, কোন বিপদ্ হইবে না। এই মনে করিয়া 'কালী কালী' মনে মনে জপ করিতে লাগিলাম। এইরূপে খানিক দূর গিয়াছি,একজন ঢিল খেলিতেছিল ; তার একটা ঢিল পায়ে এমন জোরে লাগিল যে, তাহাতে অনেক দিন ভুগিতে হইল। সেই অবধি কালী আদি দেবতাতে একেবারে অবিশ্বাস হইল।

এ সব বলিলাম, বালকের স্বপ্নের কথা—জগতের ভিতর নূতন আসিয়াছি—অপরিপক্ক-বুদ্ধি। ক্রমশঃ অল্প বয়সেই নানারূপ অবস্থার সংঘর্ষণে পাপ-পুণ্যের ঘাত প্রতিঘাতে, সদ্‌বন্ধুর পরামর্শ ফলে, ঈশ্বর, পরকাল ও আত্মার অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী হইলাম,—হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিতে লাগিলাম—উপনিষৎ, বেদান্ত, গীতা, পাতঞ্জল, পঞ্চদশী, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, চৈতন্যচরিতামৃত, বাইবেল, বুদ্ধচরিত, এবং আজকালকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক পত্রিকা পড়িতে লাগিলাম। ধার্ম্মিক লোক আসিলেই, তাহার সহিত আলাপ করিতাম। নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিক ঈশ্বরোপাসনাদিও করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা অনেক দূর হইতে লাগিল।

এই সময়ে অনেকে, এমন কি, পিতা মাতা পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দিতেন ; কিন্তু সকলেই ভিতরে ভিতরে আমাকে একটা শ্রদ্ধা করিত, বুঝিতাম চিত্ত কতকটা নির্ম্মল হইলেও, চিত্তমধ্যে কখন কখন সদসৎ প্রবৃত্তির তুমুল সংগ্রাম বাধিত। আবার, ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে একরূপ বিশ্বাস স্থির হইলেও, ধর্ম্মের ভিতরকার অন্যান্য অনেক বিষয় লইয়া নানাবিধ সংশয় আসিতে লাগিল। বেদান্তাদি পড়িয়া মনে হইত—জ্ঞানই প্রকৃত সত্য ও আমাদের লক্ষ্য, ভক্তি—চিত্তশুদ্ধির সাধনমাত্র, বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠে ত উহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতই রহিয়াছে।



৮৬তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 31 JUL 1984 শ্রাবণ, ১৩৯১

দিব্য বাণী

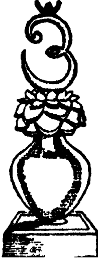
…সাংসারিক উন্নতির জন্য মধুরভাষী হওয়া যে কত ভাল, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মিষ্টভাষী হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যখন অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা ভয়ঙ্কর আপস করিতে হয়, তখনই আমি থামিয়া যাই। আমি বিনম্র দীনতায় বিশ্বাসী নহি—সমদর্শিত্বের ভক্ত।…

সমাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ, আর যে তাহা করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্তশক্তিসম্পন্ন জারক (corrosive) পদার্থের সহিত তুলনা করি; উহা যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়—নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট পাথরে বিলম্বে; কিন্তু পথ করিয়া লইবেই।…ভগিনি, আমি যে প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টবাক্যে আপস করিতে পারি না, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।…সারাজীবন এজন্য ভুগিয়াছি, তবু ঐরূপ করিতে পারি না।…ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে মিথ্যাচারী হইতে দিবেন না।…'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম-যশও নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়; বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী।' হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র পথ-প্রদর্শক হও। …হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথ-প্রদর্শক হও।…আমার হৃদয়স্থিত সত্যের বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? …আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ইহাই আমার ধর্মের শিক্ষা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[পত্রাবলী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৯৩—৯৫]



কথাপ্রসঙ্গে

সত্যস্বরূপ ামকৃষ্ণ

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, কোন মহামানব বা অবতার-পুরুষদের অনুগামীরা প্রচার করিয়া থাকেন: 'তোমরা তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর বা না-কর, উহা নিতান্তই তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার—তাহাতে এমন কিছু যায় আসে না। অথবা উহা ক্রমে ক্রমে হইবে—এখনই ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু তুমি আমাদের উপাস্য দেবের অনুরাগী বলিয়া নিজেকে এখনই দলভুক্ত কর এবং তাঁহার নামে আয়োজিত সর্বপ্রকার পূজানুষ্ঠানাদিতে সক্রিয় অংশ লইতে সচেষ্ট থাকিও—তবেই তোমার সব হইয়া যাইবে—তাহাতেই তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা পাকাপাকি হইবে। অন্যথায় তোমার মুক্তি নাই। তাঁহার পর্ব-উৎসবাদিই মুখ্য,—তাঁহার উপদেশ অনুসরণ বা জীবনে বরণ করা নেহাত গৌণ ব্যাপার।' কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন অন্যরূপ। তিনি তীব্র ভৎর্সনার ভাষায় বলিয়াছেন: 'তাঁহার আদর্শ অনুসরণ কর—নিজের ভাবে সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হও।' স্বামীজী সতর্ক করিয়া দিয়াছেন: 'তিনি গ্রাহ্য করেন না, কে তাঁহাকে প্রশংসা করিল বা করিল না। তিনি দোকানদার নহেন—ধর্ম লইয়া ব্যবসা জমাইতে আসেন না—তাঁহার অনুগামীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে বিন্দুমাত্রও পুলকিত বা উৎসাহিত বোধ করেন না। তিনি আসেন সত্য শিক্ষা দিতে। যাহারা সত্যকে ধরিয়া চলে—সত্যের অনুসরণ করে তিনি তাহাদেরই প্রতি প্রসন্ন থাকেন।' স্বামীজীর শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যে আমরা তাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে একটি উপদেশকেই সর্বাধিক উচ্চারিত শুনিয়াছি: 'সত্য স্বয়ং ঈশ্বর।' স্বামীজী তাঁহার প্রাণপ্রিয় 'আত্মারাম' শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে গিয়াও এই সত্যেরই জীবন্ত বিগ্রহরূপে তাঁহাকে জগৎসমক্ষে স্থাপনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সত্যস্বরূপ— 'ঋতং' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তাঁহার আশৈশব যাবতীয় কর্ম-লীলা-সাধনাবলী এবং সর্বপ্রকার ভাবের মূল উপাদানই হইতেছে এই সত্য। আমরা উপনিষদ্ হইতে জানিয়াছিলাম ব্রহ্মের এক নাম সত্য,—সত্যেরও সত্য তিনি। 'সত্যস্য সত্যং'। সেই ব্রহ্মই যখন নররূপে মানবের নয়নগোচর হন—তখন নিশ্চয়ই তাঁহার এই 'সত্য' পরিচয়টিকে কোথাও ছাড়িয়া আসেন না। তিনি সত্য-স্বরূপটিকে সঙ্গেই রক্ষা করেন—সত্যেরই প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার ব্রত লইয়া ধরাধামে মানুষের মধ্যে অতিবাহিত করেন,—কার্যশেষে স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ সত্যেতেই লীন হন। তাঁহার আদি-মধ্য-অন্ত সবটাই সত্য। অতএব তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপতা এবং মায়া-মনুষ্যরূপ—এই উভয় ভাবই সত্য। স্বামীজী বুঝি এই হেতুই সর্বদেববদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের স্তবে আমাদিগকে সর্বাগ্রেই গাহিতে শিখাইয়াছেন 'ওঁ হ্রীং ঋতং' ইত্যাদি। প্রতি সন্ধ্যায় তাই সারা

পৃথিবীর মানুষ—কণ্ঠ মিলাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে সত্য-স্বরূপ বলিয়াই স্তুতি করিয়া থাকে,—ইহাই তাঁহার জগৎ-প্রসিদ্ধ অভিধা। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃষ্টতম নাম ও পরিচয়—তিনি সত্য। ছান্দোগ্য শ্রুতিও (৮।৩।৪) বলেন:

'তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-লীলায় সত্যান্বেষণ—সত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, ইহাই যেন প্রধান সুর। শৈশবে পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হইতে শুরু করিয়া উত্তর-লীলায় তাঁহার যাবতীয় কর্মের ও সাধনার অবতারণা, যাহা আমরা জানি, সেই সকলকে যদি বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে অবলোকনের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের চোখে পড়িবে,—যাহা সত্য, প্রমাণ-প্রয়োগ সহায়ে তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে; যাহা বুঝিব তাহা কার্যে পরিণত করিবই; অসত্য বলিয়া না বুঝিলে জগতের কোন কিছুকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিব না; এবং যাহা অসত্য, তাহা সমাজে যতই প্রচলিত থাকুক বা প্রচারিত হউক, উহার সহিত কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না;—এই চারিটিই তাঁহার আবাল্য চরিত্র-নীতি। যে-বালক অত্যন্ত মেধাবী, তাহার লেখাপড়ায় টান থাকাটাই স্বাভাবিক বলিয়া আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। কিন্তু বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা অন্যরূপ দেখিয়াছি। মেধা ও শ্রুতিধরত্ব ছিল তাঁহার সহজাত গুণ—জন্মগত প্রতিভা। তথাপি পাঠশালার 'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা'—অর্থাৎ, অপরাবিদ্যা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই—ঐ নিছক ডাল-ভাত সংস্থানের শিক্ষায় বালকের আদৌ টান দেখা যায় নাই। কারণ, অপরাবিদ্যার দ্বারা সত্য লাভ হয় না—'চাল-কলা বাঁধা'-ই মাত্র উদ্দেশ্য উহার,—ভাল খাওয়া ও ভাল পরার বন্দোবস্তটুকুই হইতে পারে ঐ শিক্ষায়। বালক গদাধরের তাই দৃঢ় পণ ছিল,—পরাবিদ্যা শিখিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে এই অসাধারণ 'সত্যের আঁট' লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ-বিস্ময়ে একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'ঠাকুর সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন, বা সাধনা দ্বারা তাঁহার সত্যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল,—ইহা ঠিক নহে। তিনি স্বয়ংই সত্যস্বরূপ। ইহা উপলব্ধি করিতে আমার দীর্ঘ ছয় বৎসর লাগিয়াছিল।' একটি অপূর্ব ভাবদ্যোতক উক্তি! শ্রীরামকৃষ্ণই সত্য, কিংবা সত্যেরই আর এক নাম শ্রীরামকৃষ্ণ,—ইহাই স্বামীজীর কথার ব্যঞ্জনা। উপনিষদের ঋষিও তাহাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন: 'এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্'—এই ব্রহ্মেরই নাম সত্য। 'আদি-অন্তহীন' সেই ব্রহ্ম মায়া অবলম্বনে যখন 'মানব-কায়' ধারণ করেন, তখনও তাঁহার স্বীয় স্বরূপের বিলুপ্তি ঘটে না,—ইহাও যেন স্বামীজীর উল্লিখিত কথায় সুব্যক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে বিভিন্ন লীলা-বৈচিত্র্যের ফাঁকে ফাঁকে আমরা দেখিব,—সমুজ্জ্বল সত্যই বার বার উঁকিঝুঁকি দিতেছে! শ্রীরামকৃষ্ণের সত্য-উজ্জ্বল সেই সকল মূর্তি মানবেতিহাসে পরম বিস্ময়,—যাহার চিন্তা ও মনন আমাদের একান্তই প্রয়োজন, বর্তমান অসত্যের ঘন জাল হইতে মুক্তির পথ-সন্ধানে।

সরল—একেবারে শিশুর ন্যায় সরল সহজ ভাবই সত্যের পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিশু-সুলভ সরলতাই তাঁহার দিব্য জীবনলীলাকে অসাধারণ মাধুর্যমণ্ডিত করিয়াছে—কুটিল সংসারে সকলেরই মনোমুগ্ধকর হইয়া রহিয়াছে। এই সহজ সত্যের দৃষ্টিতে কোথাও পক্ষপাত নাই—রাগ-দ্বেষের স্থান নাই, অথচ অসত্যকে চোখ বুজিয়া মানিয়া লইবারও প্রশ্ন নাই! যেমন, একটি সাংসারিক কিন্তু স্বর্গীয় সুষমান্বিত উদাহরণ, যাহা শ্রীরামকৃষ্ণের এই সরল-সত্য ভাবটিকে

চমৎকার স্মরণ করায় :

রানী রাসমণি বিষয়-সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিয়াছেন। একদিন মথুর-গৃহিণী তাঁহার অন্য ভগিনীর অংশের পুষ্করিণীর ধারে সুষনি শাক দেখিয়া, হাতের মুঠিতে কিছু শাক তুলিয়া লইয়াছেন! আপন ভগিনী,—কিন্তু আইনের রাজত্বে পুষ্করিণীটি তো আর আপন নাই তখন। সত্বাধিকারিণীর অগোচরে, ঐ পুষ্করিণীর সামান্য শাক-পাতাও 'আমার' বলিয়া গ্রহণ করা তাই সত্যের অমর্যাদা বৈ কি! লোভেরও প্রশ্রয় বটে! শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে তাই উহা 'অন্যায়' বোধ হইয়াছিল! রানী রাসমণির উভয় কন্যাই বালকস্বভাব ঠাকুরের এবম্বিধ অভিযোগকে কপট গুরুত্ব প্রদান করিয়া তাঁহাদের পরমাদরের 'বাবা'-কে লইয়া বেশ কিছুক্ষণ রগড় করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ, একটি উপভোগ্য অভিনয়ের অবতারণা হইয়াছিল উক্ত 'অন্যায়' ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া। মথুর-গৃহিণীর 'অন্যায়' কর্মটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া রানীর অপর কন্যার গোচরে আনিয়াছিলেন।—এক বিশাল গুরুগম্ভীর নালিশ! নালিশ শুনিয়া রাসমণির সেই কন্যা, অবিকল তাঁহারই ন্যায় গম্ভীর হইয়া সায় দিয়াছিলেন: 'তাই তো বাবা, সেজদি বড় অন্যায় করিয়াছে।' কিন্তু খুবই ভারী চালে কথা বলিলেও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই মোটেই। ঐ-কালে মথুর-গৃহিণীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, 'গুরুতর নালিশ' যে তাঁহারই বিরুদ্ধে উঠিয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিয়াই মহা অপরাধিনীর মতো তিনিও অনুযোগ তুলিলেন: 'আচ্ছা বাবা, এই কথাটিও কি তোমার উহাকে বলিয়া দিতে হয়? ও পাছে দেখিয়া ফেলে, তাই গোপনে কিছু শাক চুরি করিয়াছি,—আর তুমি কিনা আমার বোনকে নালিশ করিয়া আমাকে অপদস্থ করিলে!' দুই ভগিনীই অভিনয়-কুশলী! অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠ বালককে এইভাবে তাঁহারা দুই জনেই বেশ উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়া মজা উপভোগ করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ,—আবার রঙ্গনাথও বটে। সরল বালকের অকপট উত্তর: 'তা কি জানি বাপু, যখন বিষয় সব ভাগাভাগিই হইয়া গেল, তখন আর ঐ-ভাবে লওয়াটা ভাল নয়। আমি তাই জানাইয়া দিলাম—এখন ইনি শুনিয়া যাহা হয় ব্যবস্থা করিবেন।' রানীর কন্যাদ্বয় তাঁহাদের 'বাবা'-র এই কথায় হাসিতে আরও ফাটিয়া পড়িলেন।

একখানি সাদামাঠা রেখাচিত্র,—সহজ সত্যকে বুঝাইবার জন্য যেন শুধুমাত্র কালির আঁচড়ে আঁকা, বর্ণ-বৈচিত্র্যবিহীন মুগ্ধকর ছবি। সত্যের বড়-ছোট ভেদ নাই,—ঘটনার ব্যাপকতায় বা বস্তুর মূল্যে সত্যের পরিমাপ হয় না। সত্য অমেয় অপরিমাপ্য। এক মুষ্টি তৃণ বা এক মুঠি শাক,—অথবা বিপুল অর্থ-বিত্ত,—উভয় ক্ষেত্রেই সত্য সমান ও একরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাচর্যাতে তাই সত্যের মর্যাদা সর্বক্ষেত্রেই সমরূপ দেখি আমরা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এই অত্যাশ্চর্য সত্য এমন দৃঢ়মূল ছিল যে, তাঁহার জীবনী পাঠক-পাঠিকার জানা আছে,—তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদক্ষেপ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সবই যেন সত্য দিয়া গড়া, সত্য দ্বারাই সঞ্চালিত ছিল। সত্য তাঁহার স্ব-ভাব। অনুগত শ্রেষ্ঠ 'রসদদার' শম্ভু মল্লিকের অনুপস্থিতিতে, কর্মচারীর নিকট হইতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের এক পুরিয়া ঔষধ হাতে লওয়াও তাই তাঁহার পক্ষে স্ব-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। শম্ভুবাবুর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া অসাধ্য হইয়াছিল;—ভাবিয়া চিন্তিয়া বা চেষ্টা করিয়া নহে, চরণদ্বয়কে কে যেন পিছন দিকে টানিতেছিল! সহসা মনে উদয় হইয়াছিল,—শম্ভুবাবু বলিয়াছিলেন বটে ঔষধ দিবেন,—কিন্তু ঔষধ তো লওয়া হইয়াছে কর্মচারীর হাত হইতে।

যাহার জিনিস যে-ভাবে লইবার কথা, উহা ঠিক তাহারই নিকট হইতে কথানুযায়ী না লইলে তো সত্যের অপলাপ করা হয়। দপ্ করিয়া অনুভব হইয়াছিল—'মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না এই জন্যই।' অতএব ফিরিয়া গিয়া চিকিৎসাগারের কক্ষমধ্যে একখানি পদ-স্থাপনা করিয়া ঔষধের পুরিয়াটিকে ফেরত দিতেই হইয়াছিল,—তবে নিষ্কৃতি মিলিয়াছিল ঐ নিদারুণ অসত্যের তাড়না হইতে! অতঃপর অঙ্গের চলচ্ছক্তি ফিরিয়া পাইতে আর বিলম্ব হয় নাই—অচিরেই তিনি দ্রুতপদে কালীবাড়িতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বুঝি এই কারণেই তাঁহার মুখে প্রায়শঃ শুনা যাইত: 'মা আমার এতটুকুও বেচালে পা পড়িতে দেন না।'

প্রিয় বালক-ভক্ত যোগীনের আনীত লেবুও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই—অনেক চেষ্টা সত্বেও। কারণ,—অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, যেদিন বাগান হইতে ঐ লেবু আনা হইয়াছিল, সেদিন আর সেই বাগান আইনতঃ যোগীনদের ছিল না—মাত্র একদিন পূর্বে অন্য এক ব্যক্তিকে ঠিকা দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। আমাদের জানা নাই, সারা বিশ্বের ইতিহাসে এইরূপ সত্যময় জীবন আর কোন যুগে কোথাও প্রকট হইয়াছে কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সত্যের মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চে স্থিত। পাঞ্চভৌতিক শরীরের প্রকৃতিগত অতি সাধারণ বা তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকেও তিনি সত্যের পরখ হইতে সরাইয়া রাখেন নাই। অকপটে সরল শিশুর মতোই সকলের কাছে ঐ-সকলও ব্যক্ত করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই,—কেননা সার্বজনিক সত্যকে অন্যথায় উপেক্ষা প্রদর্শন হয়। শোকাহত পিতাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন,—নিজ-জীবনে ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে যে অসহ্য শোকের দহন অনুভূত হইয়াছিল তাহাই আবেগ-ভরে প্রকাশ করিয়া। অশোক, অকাম অপিপাস যিনি, তিনিও মানুষের শোক-তাপ কামনা-পিপাসার আলোকে—অবধারিত সংসার-সত্যকে সম্মান না দেখাইয়া পারেন নাই। পূর্ণ কামজিৎ আত্মারাম পুরুষ—রিপু-তাড়িত যুবকের মর্মবেদনার সমব্যথী হইয়াছেন! তাহার সমবয়সী বন্ধু বা সখার মতো তাহাকে প্রবোধ দিয়াছেন—তাহার নিকট মূর্তিমান ভরসা ও সাহসরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া থাকেন নাই, অথবা ভর্ৎসনায় কশাঘাত দিয়া বিদায় করিয়া দেন নাই! জননীর মমতা লইয়া পতিতজনকেও তিনি কাছে টানিয়া লইয়াছেন—বুঝাইয়া দিয়াছেন, দেহধারণ করিলে জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, মৃত্যু ইত্যাদি বিকারগুলিকে যেমন বরণ করিয়া লইতে হয়; তেমনই রোগ, জ্বালা, ব্যথা, বেদনা; আবার সুখ, হর্ষ, মিলন, অভ্যুদয় এই সকলকেও মানিতেই হয়। দেহের সর্দি-কাশি-শৌচক্রিয়াদির ন্যায় দেহস্থ কাম-ক্রোধাদিও নৈসর্গিক নিয়মেই আসে যায়—উহাই প্রাকৃতিক সত্য—শরীরের রীতি। কিন্তু এই সত্যকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করাও অসত্যেরই পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের সুহৃদ্—লোকগুরু মানবমিত্র! তাই জীবের সকল প্রকার দুঃখ-বেদনাকে, অভাব-অপূর্ণতাকে—উহার জৈব সত্যকে সস্নেহে আপন করিয়া তাঁহাকে লইতেই হইবে। ইহাও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এক অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব—তাঁহার বাস্তব ও লোককল্যাণকর সত্য-স্বীকৃতি। তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ—তাই জীবের সর্ববিধ ব্যাধি-বিকার ও দুর্বলতাকেও তিনি আপন বক্ষে তুলিয়া লইয়া, সকলের ব্যথার ব্যথী হইবেন, তাহাতে আর কী আশ্চর্য? শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনলীলা ব্যতীত এমন অকপট অসঙ্কোচ সত্য-সন্ঘোষণও আমরা ইতিহাসে আর কোথাও দেখিতে পাই না।

মানুষের ক্ষুদ্রত্ব, তাহার অশেষ দুর্বলতা, অজস্র ত্রুটি—ইহাই সত্য হইতে পারে না, আবার অসত্য বলিয়া সর্বদা তিরস্কৃত হইলেও সত্যের উপলব্ধি

হইবে না। একটি চিরন্তন সত্য—সকল কিছুর পশ্চাতে, সমস্ত ভ্রান্তি ও অসত্যের অধিষ্ঠানরূপে সদাবিদ্যমান রহিয়াছেই। তাহারই নাম পারমার্থিক সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি একতিলের জন্যও এই পারমার্থিক সত্য হইতে সরিয়া থাকিত না,—এই কারণেই যাবতীয় ক্ষুদ্রতা বা 'অসত্য'-ও তাঁহার নিকট সত্যেরই ভিন্নতর বিচিত্র রূপ বলিয়া ধরা দিত। সত্যকে বাদ দিলে 'অসত্য'-ও দাঁড়াইতে পারে না। সত্যের প্রতি দৃষ্টি যখন অন্ধ থাকে,—মাত্র তখনই অসত্য আমাদিগকে পাইয়া বসে, ক্ষুদ্রতা গ্রাস করে। এক বিন্দু জল ততক্ষণই মিথ্যা ও ক্ষুদ্র, যতক্ষণ উহা অনন্ত সমুদ্র হইতে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। কিন্তু সমুদ্রকে আশ্রয় করিলে—কেবলমাত্র একটি বিন্দু কেন, অযুত কোটি জলকণাও সত্য এবং মহৎ হইয়া উঠে। মানুষের মধ্যে দ্বিধা-দুর্বলতাগুলিকেই মাত্র দেখিলে সত্যতা নাই বটে—সবই অসার অসত্য ধিক্কারজনক মনে হইবে। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লালসাতুর মানুষের অন্তরাত্মার দিকে লক্ষ্য স্থির করিলে,—তাহার ঐ-সকল ক্ষুদ্রতা বা মিথ্যাগুলিকেই চরম বলিয়া বোধ হইবে না, মানবাত্মার চিরভাস্বর সত্য রূপই তখন অনুভূত হইতে থাকিবে। মানুষের দুর্বলতা তাহার আত্মার মহিমা অপেক্ষা বড় হইতেই পারে না—গ্রহণের ছায়া কিছু সূর্য অপেক্ষাও সত্য নয়। ছায়া সাময়িক, সূর্য চিরকালিক। শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে এই সত্য-সূর্য অনুক্ষণ উদ্ভাসিত থাকিত বলিয়াই, গ্রহণের ছায়াকেও তিনি সূর্যেরই এক অপরূপ মন-ভুলানো কাণ্ড বলিয়া দেখিতেন। কিন্তু 'ও-সব কিছুই নহে', তাই দেখিয়াও 'দেখি নাই' ভাবেন নাই,—কিংবা উদাস-উপেক্ষায় মুখ ঘুরাইয়াও থাকেন নাই। তাঁহার পারমার্থিক সত্য ছিল, সহজ সত্য—শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক। তাই তাঁহার নজরে জীব ও জগৎ কিছু অপরমার্থ নহে, অর্থাৎ পরমার্থ হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। ঈশ্বর, জীব, জগৎ—শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে অদ্বয় আত্মসত্যেরই এক-এক রূপ। এই কারণেই তাঁহার সত্যে কদাপি ভেদ প্রকাশ পায় নাই—উহা অবিতথ সনাতন ও চিরন্তন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে আগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা এবং ভক্তগণ অনেকে বহুদূর হইতে আসিয়াছেন—উৎসব উপলক্ষে তো বটেই, বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভার্থে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ আরও কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন—তিনিও সহাস্য বদনে নানা কথা কহিতেছেন। জনৈক সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ভক্তের কথা উঠিল,—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে থাকিলেন: '···যেন ভক্তি-রসে ডুবে আছে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইহাও স্পষ্ট বলিলেন যে, '···একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোনও খবরও পাঠায় নাই; ওটা ভাল নয়।' অতি বড় একজন মান্যগণ্য ভক্ত! তাঁহার সদ্‌গুণের ও ভক্তির অনেক তারিফ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠার অভাবকে মোটেই স্নেহচক্ষে দেখেন নাই। তাই ঐ ভক্তের 'ভারি দোষ' উল্লেখমাত্র করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই,—সমীপবর্তী ভক্তগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সত্যই এ-যুগের শ্রেষ্ঠ সাধন—'কলির তপস্যা।' সেদিন আরও বলিয়াছিলেন:

'সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।'

কথাটি ছোট হইলেও উহার ইঙ্গিত অত্যন্ত সুতীব্র—কঠিন শাসনও বটে। ভক্তদের জীবনে ইহা অবশ্যই একটি গুরুতর সাবধান-বাণী—যাহা

আমরা প্রায়শঃ ভুলিয়া বসি, অথবা লঘুভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। সেদিনের আনন্দোৎসবে উপস্থিত সমাজের খ্যাতনামা ভক্তবৃন্দের মনে ঐ ভগবদ্‌-বাক্য কিরূপ প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল জানি না, —তবে আমরা সাধারণভাবে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভগবান সত্যপ্রিয়,—ভক্তের ভক্তিতে ও আবেগে মুগ্ধ হইয়া তাহার অসত্যকে তিনি অনুমোদন করেন না কদাপি। শ্রীভগবান তাঁহার এই সত্যপ্রীতি তথা সত্যস্বরূপতা বুঝাইতে গিয়া সেদিন নিজ-জীবনের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন:

'আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। যখন এই সব বলেছিলুম, তখন একথা বলতে পারি নাই, মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম, "সত্য" মাকে দিতে পারলুম না।'

—একটি অসাধারণ অতুলনীয় আত্মকথন, —সত্য-সংস্থাপকের স্ব-মুখোচ্চারিত উপনিষদ্‌! 'সব মাকে দিতে পারলুম, "সত্য" মাকে দিতে পারলুম না।' সত্যবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবানুরাগিগণের পক্ষে একটি নিগূঢ় সাধন-মন্ত্র ইহা। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবকে ভালবাসিয়া জীবনে বরণ করা মানে, ঐ-ভাবকে সর্বান্তঃকরণে অনুসরণ—অনুসরণ করিতে করিতে তদ্‌ভাবময় হইয়া উঠা। অনন্তভাবময় তিনি—কিন্তু সকল ভাবের মূল কথা সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন: '...ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর যাঁহার চরিত্র, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী।' সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবানুরাগী ভক্তগণের দায় তাই অত্যন্ত সুকঠিন; —তাহাদের দায়িত্ব শুধু ভাব-প্রচারে নহে,—ভাব-সাধনে। সে-সাধনরাজ্যের আকাশে জলজল করিতেছে যে ধ্রুবনক্ষত্রটি—তাহার নাম সত্য। সংসারান্ধকারে পথহারা মানুষের উহাই একমাত্র ভরসা। আমাদিগকে নিরন্তর স্মরণ রাখিতে হইবে,—'সত্যের আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।' আবার যে-হেতু সত্যই তাঁহার স্বরূপ,—সত্যকে ধরিয়া রাখা মানে তাঁহাকেই অবলম্বন করা। 'সত্যকে আঁট করে থাকলে ভগবান লাভ হয়,'—ভাবানুরাগী আশ্রিত জনের জন্য ইহাই সত্যরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পরম আশ্বাস।

হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

চরম বিশ্রাম

(অষ্টাবক্র সংহিতা হইতে)

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার
স্যাক্রামেণ্টো বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

কোথা মোহ কোথা বা জগৎ
কোথা ধ্যান কোথা মুক্তিধাম
সকল সঙ্কল্প পারে গিয়া
যে মহাত্মা করেন বিশ্রাম ?
বিশ্ব যিনি দেখিছেন চোখে
'নাহি বিশ্ব' করুন অভ্যাস
নিষ্কামের কিবা করণীয়
দেখিলেও না কিছু আভাস।
পরব্রহ্ম যাঁর দৃষ্টিগত
'আমি সেই ব্রহ্ম' তাঁর ধ্যান
নিশ্চিন্তের কিবা চিন্তা আছে
দ্বিতীয়ের যাঁর নাহি ভান ?
যাঁর রয় চিত্তের বিক্ষেপ
নিরোধ তো তাঁহারি সাধনা
অবিক্ষিপ্ত মহোদার যিনি
তাঁর কিবা সাধন-ভাবনা ?

ক মোহঃ ক চ বা বিশ্বং ক তদ্ ধ্যানং ক মুক্ততা।
সর্বসঙ্কল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ॥
যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি॥
দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপে নিরোধং কুরুতে ত্বসৌ।
উদারস্তু ন বিক্ষিপ্তঃ সাধ্যাভাবাৎ করোতি কিম্॥

(অষ্টাবক্র সংহিতা, ১৮।১৪—১৭)

বালাকির ব্রহ্মজ্ঞান

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসমূহের একটি সংকলন করিয়াছিলেন। উহা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' নামে একটি ছোট পুস্তকাকারে ভক্ত সমাজে বহুল প্রচারিত। শোনা যায়, যখন তিনি শ্রুত উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন তখন ভ্রমবশতঃ কিছু স্খলন বা ত্রুটি ঘটিয়া থাকিলে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিতেন—'ওরে, ওরূপ লিখেছিস্ কেন ? আমি তো ওরূপ বলিনি, আমি এইরূপ বলেছি'—এইরূপে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। সুতরাং এই উপদেশ-সমূহের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। ঐ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের নাম রাখা হইয়াছে 'আত্মজ্ঞান'। তাহাতে সর্বপ্রথম উপদেশটি এই প্রকার—'মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে।' তৎপর তিনি বলিয়াছেন—'"আমি কে" এটি বিচার করলে আমি বলে কোন জিনিস পাওয়া যায় না। শেষে যা থাকে তাই আত্মা বা চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দর্শন দেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে।' বিষয়টি বিচার্য। চিনতে পারা অর্থ জানা। তাহা হইলে কথাটার অর্থ হইল এই যে, মানুষ নিজেকে জানিলেই ভগবানকে জানিতে পারে। নিজেকে জানা অর্থাৎ 'আমি কে' তাহা জানা। আর ভগবানকে জানা অর্থ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি জগৎকর্তা পরমেশ্বরকে জানা। প্রথমটিকে জানিলেই যদি দ্বিতীয়টিকেও জানা যায়, তাহা হইলে এই দুইটির পরস্পর সম্বন্ধ কি ? দুইটি বস্তু যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় তবে ঐ দুইটির একটিকে জানিলেই অপরটির জ্ঞানও হইবে, একথা কেহই স্বীকার করিবে না। একটি গরুকে জানিলে তাহা হইতে ভিন্ন একটি বৃক্ষেরও জ্ঞান হইয়া যাইবে, ইহা একান্তই অযৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ প্রমাণবিরুদ্ধ কথা। কিন্তু যদি দুইটি বস্তু অভিন্ন হয় তবে তার একটিকে জানিলে অপরটিও জানা হইয়া যায়—একথা বলিলে কোন দোষ হয় না। একটা অভিন্ন বস্তুই কোন কারণবশতঃ দুইরূপে প্রতীত হইতেছে মাত্র—এরূপ হইলে দুইরূপে প্রতীয়মান বস্তু দুইটির মধ্যে একটির যথার্থ জ্ঞান হইলে ঐ ভেদের উপস্থাপক নিমিত্তটিও বিনষ্ট হইয়া যায় ও দ্বিতীয় বস্তুটিরও জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়, ইহা যুক্তিসঙ্গত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই বাণীতে কি ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন ?

'আমি কে ?' 'ঈশ্বর বা ব্রহ্ম কি ?' 'জগৎটা কি'—এই সব প্রশ্ন সনাতন। উপনিষদে এই সব প্রশ্নের সমাধান ঋষিরা নানা উপায়ে করিয়াছেন দেখা যায়। 'কৌষীতকী' উপনিষদে এই বিষয়-গুলির সমাধান মনোরম আখ্যায়িকার সহায়ে কিরূপে আলোচিত হইয়াছে তাহা আমরা দেখিব।

বাগ্মী ব্রাহ্মণ 'বালাকি' বেদাদি শাস্ত্র যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছেন। উপাসনাতেও তিনি সুনিপুণ। নিজের জ্ঞানের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন এবং সেজন্য তাঁর যথেষ্ট গর্বও ছিল। তপঃ, স্বাধ্যায় ও উপাসনাবলে বালাকির মন বিষয়বাসনারহিত হইয়া শুদ্ধ থাকিলেও একটু গর্বরূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন

প্রাণোপাসক। সমষ্টিপ্রাণ বা সূত্রাত্মাকেই তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও ব্যষ্টি শরীরে নাসিকাদি দেহসঞ্চারী প্রাণবায়ুকেই তিনি জীবাত্মা বলিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গর্বিত লোকের স্বভাবই এইরূপ যে, সে সকলকে নিজের জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বালাকির ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। সেই সময়ে কাশীরাজ অজাতশত্রুর দেশ-বিদেশে খুব নাম। তিনি বিদ্বান্, অশেষ শাস্ত্রপারঙ্গম, বিনয়ী, সেবা-পরায়ণ, সৎসঙ্গী, বিদ্যোৎসাহী, সর্বভূতহিতে রত ও তত্ত্বজ্ঞ। তাঁর প্রশংসা সকলের মুখে। শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানও কাশীরাজের করায়ত্ত ছিল। তিনি ছিলেন সার্থকনামা। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া অন্তরেও কাম ক্রোধ মোহ অজ্ঞানাদির লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না এবং আপন শৌর্যবীর্যাদি প্রভাবে বাহিরেও সর্বশত্রুগণকে তিনি পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই বাহিরেও তাঁহার শত্রু কেহই ছিল না। তাঁহার অজাতশত্রু নাম যথার্থই সার্থক হইয়াছিল

গর্গগোত্রোৎপন্ন প্রাণোপাসক এই 'দৃপ্ত' স্বীয়জ্ঞানগর্বিত উদ্ধত ব্রাহ্মণ বালাকি একদিন কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'মহারাজ! শুনিয়াছি তুমি তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু, আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব।' শ্রদ্ধা ও বিনয়ান্বিত রাজা বালাকিকে যথাযথ সম্মানপূর্বক আচার্যের আসনে বসাইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বালাকি বলিলেন—'এই দৃশ্যমান আদিত্য-মণ্ডলান্তর্গত পুরুষই ব্রহ্ম। তুমি তাহার উপাসনা কর।' রাজা স্বীয় হস্তোত্তোলনপূর্বক বালাকিকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—'এই উপাসনা আমি পূর্বেই অবগত আছি। ধ্যেয় আদিত্যপুরুষের এই উপাসনার ফলও আমি সম্যগ্‌রূপে জানি। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান নহে। অতঃপর যদি আর কিছু উচ্চতর বিষয় আপনার জানা থাকে তবে তাহা বলুন।' তখন বালাকি আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, মেঘমণ্ডল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল, দর্পণ, ছায়া, প্রতিধ্বনি, শব্দ, স্বপ্ন, দেহ, দক্ষিণাক্ষি, বামাক্ষি—এই ষোড়শ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার কথা পর পর বলিলেন। প্রতিবারই রাজা 'এই উপাসনা ও তাহার ফল আমি পূর্ব হইতেই অবগত আছি। অতঃপর যদি কিছু জানেন তবে তাহা বলুন'—এই বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। বালাকি কিন্তু এতদতিরিক্ত আর কিছু তত্ত্ব জানিতেন না। তখন তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরব্রহ্মবিদ্ রাজা অজাতশত্রু তখন বালাকিকে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে বৃথাই উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। আপনার ব্রহ্মবিত্ত্বের অভিমান বৃথা। আপনি পরমতত্ত্ব না জানিয়াও নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ মনে করিয়া বৃথাই গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন ও "আমি ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব" এইরূপ ইচ্ছা প্রকটিকরিয়াছেন। হে বালাকি! ইহা নিশ্চিত-রূপে জানিবেন যে, জীবজগতের কারণ একমাত্র ব্রহ্ম।' বালাকির মনমুখ এক ছিল। তিনি নিজের ভুল বুঝিয়া অনুতপ্ত হইলেন ও সবিনয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে রাজার নিকট ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন—"তাহা হইতে পারে না। আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর আমি ক্ষত্রিয়। আমি কখনই আপনার গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি আপনি সরল, নিষ্কপট ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু। তাই আপনাকে আমি ঐ বিষয়ে বলিব স্থির করিয়াছি। ইহা যদিও বিপরীত রীতি, কিন্তু যথার্থ শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসুকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। আপনি আচার্য হইয়াই থাকুন। আমি আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে বলিব।'

এতদনন্তর বিশ্বাস উৎপাদনার্থ লজ্জাবনতদৃষ্টি বালাকিকে রাজা হাতে ধরিয়া উঠাইলেন ও তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বালাকির দৃঢ়জ্ঞান ছিল যে, সমষ্টি প্রাণ বা সূত্রাত্মাই ব্রহ্ম ও ব্যষ্টি জীবদেহস্থ প্রাণই জীবাত্মা। তাঁহার এই ভ্রম দূর করিবার জন্ম বালাকিসহ রাজা অন্তঃপুরে একটি সুষুপ্ত পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হে বালাকি! সুপ্ত পুরুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বিলীন হইয়া গেলেও তার প্রাণ কিন্তু স্বকর্ম করিতে থাকে, উহা বিলীন হয় না। ঐ দেখুন, এই সুষুপ্ত পুরুষটি দর্শনশ্রবণরহিত হইয়াও কেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে। যদি প্রাণই জীব হয় তবে নাম ধরিয়া ডাকিলে প্রাণ নিশ্চয়ই জবাব দিবে।' এই বলিয়া রাজা প্রাণের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নামসমূহ (সোম, রাজন্, বৃহন্, পাণ্ডরবাস ইত্যাদি) দ্বারা প্রাণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। লোকটি কিন্তু তাহাতে জাগিল না, বরং পূর্বের ন্যায় নাসিকা গর্জন করিতে লাগিল। তখন রাজা তাহাকে একটি যষ্টি দ্বারা তাড়না করাতে সেই ব্যক্তি বায়ুর তাড়নায় ভস্মাবৃত বহ্নির জলনের ন্যায় শীঘ্রই জাগিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন—'দেখুন, প্রাণ বোধহীন, তাই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকাতেও সে জাগিয়া উঠিল না। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত চেতন আত্মাই জীব। চিত্তের আভাস-সহ অহংকারই জাগ্রতে সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। উহাই ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। তাহাকেই আপনি কর্তা ভোক্তা জীবাত্মা বলিয়া জানুন।' প্রাণাত্মবাদী বালাকি ইহা শুনিয়া অতি বিস্মিত ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ মনে করিয়া আর কিছু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। রাজা কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িলেন না। কারণ বালাকিকে ব্রহ্মোপদেশ করিতে তিনি প্রতিশ্রুত। শ্রদ্ধালু বিনয়ান্বিত মেধাবী জিজ্ঞাসু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিলেও তাহাকে বিদ্যোপদেশ কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রের বিধান।

রাজা নিজেই এখন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—'হে বালাকি! যে কর্তা ভোক্তা জীব সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইল, সে এতক্ষণ কোথায় ছিল এবং কোথা হইতেই বা সে আগত হইল, সুষুপ্তিতে তো বুদ্ধি ছিল না, কোথা হইতে উহা ফিরিয়া আসিল?' বালাকি ইহার উত্তর জানিতেন না। তখন রাজা স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন:

দেহ মধ্যে কমলাকার হৃদয়প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া নাড়ীসমূহ সর্বশরীর পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। অহংকার উপাধিক আত্মা জীবরূপে এই হৃদয়েতে অবস্থান করেন। তিনি নাড়ী সহায়ে সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জাগ্রৎকালে বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। জাগ্রতের বাহ্য ভোগপ্রদ কর্ম ক্ষীণ হইলেও সংস্কারবশে সূক্ষ্ম ভোগদায়ী কর্মভোগ প্রদানে উন্মুখ হইলে উক্ত জীবই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন। স্বপ্নভোগপ্রদ কর্মও ক্ষয় হইলে ঐ জীব পুনরায় হৃদয়ে সংকুচিত হইয়া থাকেন। ইহাই সুষুপ্তি অবস্থা। তখন ইন্দ্রিয়সমূহ নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া পড়ে। পরমাত্মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনিই অজ্ঞানকার্য অহংকার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবরূপে প্রতীয়মান হন। তখন সেই জীবই নানা কর্মের কর্তা ও ফলভোক্তা হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ফলদ কর্ম ক্ষয় হইলে ঐ অহংকারই স্বকারণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া পড়ে এবং জীব পরমাত্মাসহ একতা প্রাপ্ত হয়।

সুষুপ্তিকালে সর্ববাহ্য ও আন্তরদৃশ্য প্রাণে লয় হয়, এরূপও বলা হইয়া থাকে। প্রাণ শব্দ বায়ু ও পরমাত্মা উভয়েরই বাচক। দৃষ্টিভেদে সর্বদৃশ্য প্রাণ বা পরমাত্মাতে লয় হয়, এরূপ বলা

যাইতে পারে। সুষুপ্ত পুরুষের ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকল প্রাণে লয় হয়, নিকটে উপস্থিত ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করেন। কারণ তখন একমাত্র প্রাণেরই ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি মনে করেন যে, ঐকালে এক অদ্বৈত পরমাত্মাতেই সর্বদ্বৈত বিলয় ঘটিয়াছে। কারণ তাহার দৃষ্টিতে তখন প্রাণও ছিল না। সুষুপ্ত পুরুষের অভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়াই সর্বশাস্ত্রে পরমাত্মাতেই জগতের লয়ের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং 'সুষুপ্তিকালে জীব কোথায় বিলীন হইয়াছিল এবং কোথা হইতে আগত হইল'—পূর্বোক্ত প্রশ্নের ইহাই উত্তর হইল যে, সুষুপ্তি কালে জীব পরম আত্মা-সহ একাকার (তাদাত্ম্যাপন্ন) হইয়াছিল। অহংকারসহ জগতের অজ্ঞানে বিলয়ের নামই সুষুপ্তি· সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানাবৃত পরমাত্মা হইতেই পুনরায় জীব জাগ্রদ্দশায় আগমন করিয়া থাকে। অগ্নি হইতে বিচ্ছুরিত বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জাগ্রতে সেই পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াভিমানী অগ্ন্যাদি দেবতা সকল ও বিষয়সমূহ উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই প্রতি জীবের প্রাতিস্বিক (নিজ নিজ) সৃষ্টি।

সর্বসাধারণস্বীকৃত আর এক প্রকার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথাও শ্রুতি বলিয়া থাকেন। উহা আকাশাদিক্রমে বর্ণিত। পরমাত্মা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী,—এই ক্রমে সূক্ষ্ম ভূতসৃষ্টি। তৎপর উহারা পঞ্চীকৃত হইলে স্থূল, ভূত ও ভৌতিক বিষয় সকল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। সর্ব-প্রাণীর কর্মক্ষয়ে মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে। পুনরায় জীবকর্মের সমুদ্ভব হইলে পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা এক মত। সর্বসাধারণ এই প্রকার সৃষ্টিক্রমের বিষয়ই অবগত আছেন।—পূর্বোক্ত মতে প্রতি জীবের জাগ্রত স্বপ্ন ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় হইলে সুষুপ্তি নামক প্রলয় হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রে নিত্যপ্রলয় নামে কথিত। পুনরায় ভোগপ্রদ কর্মের উদ্ভবে জাগ্রদবস্থা ও তৎসহ সর্বপদার্থের নিত্যই সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টিক্রম বর্ণনা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। মিথ্যা সৃষ্টি কি প্রকারে হইল তাহার প্রতিপাদনে শ্রুতির আগ্রহ নাই। সর্বত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্ব প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য। অদ্বৈততত্ত্ব বোধনের জন্যই সৃষ্টির কথা পূর্বোক্ত দুই প্রকারে কল্পনা করা হয় মাত্র। জীবের প্রাতিস্বিক সৃষ্টিই হউক বা সর্ব-সাধারণস্বীকৃত মহাসৃষ্টিই হউক তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ শ্রুতির নাই, অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব, ইহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশাল রাজপুরীতে প্রবেশের জন্য সম্মুখে একটি বিরাট আকারবিশিষ্ট ফটক বা সিংহদ্বার থাকে। পুরীর পশ্চাতেও একটি ছোট দ্বার থাকে। সম্মুখের দ্বার সর্বসাধারণের প্রবেশের জন্য। পশ্চাতের ছোট দ্বারটি অন্তঃপুরস্থ বিশিষ্ট রাজসেবকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরীর সম্মুখদ্বারে রাজদর্শনার্থ নিত্য বহু জনসমাগম এবং প্রবেশপথে নানাস্থানে সিপাহীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকায় অনেকের ভাগ্যেই রাজদর্শন সহজে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু স্বামিভক্ত কেহ কেহ পুরীর পশ্চাতে অবস্থিত ছোট দ্বারাবলম্বনে অবিলম্বেই রাজদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। সেইরূপ 'প্রাতিস্বিক সৃষ্টি' বা 'দৃষ্টি-সৃষ্টি' প্রক্রিয়াবলম্বনে জিজ্ঞাসু অতি সহজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। অপর সর্বসাধারণ-পরিজ্ঞাত মহাসৃষ্টি প্রক্রিয়াবলম্বনে প্রথমতঃ 'ত্বং' পদার্থের শোধন অর্থাৎ তাৎপর্য-নির্ণয় ও তৎপর 'তৎ' পদার্থের শোধনানন্তর মহাবাক্যের বিচার-সহায়ে জ্ঞানলাভ বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং রাজা অজাতশত্রু বালাকিকে অনায়াসে অতি অল্পকালের মধ্যে প্রত্যগ্-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করাইবার

উদ্দেশ্যে এই 'দৃষ্টিসৃষ্টি' প্রক্রিয়াই অবলম্বন করিলেন।

দৃষ্টি—অর্থাৎ অহংকার মনোবুদ্ধির উদয়ে অজ্ঞান ও পূর্বসংস্কারবলে আন্তর বিষয়াকার বৃত্তির উদয় ও তৎকালেই বাহ্যদেশে প্রতীতিকালমাত্র-স্থায়ী ভূতভৌতিক বিষয় সকলের সৃষ্টি। সর্ব জগৎ ও বিষয় সকল কেবল একটা মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। সত্য একমাত্র সদাবিদ্যমান জীবের সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি যাহা জীব মন-বুদ্ধি-অহংকারাদির বিলয়ে পূর্ণতাদ্বারা অনুভব করিয়া থাকে।

রাজা অজাতশত্রু বালাকিকে ব্রহ্মতত্ত্ব বোধনের নিমিত্ত একমাত্র সুষুপ্তি অবস্থার বিচারই পর্যাপ্ত মনে করিয়া সাক্ষাৎ স্ব স্ব অনুভব স্মরণপথে আনয়নপূর্বক ইহাই দেখাইলেন যে, সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান বিদ্যমান, সেই অজ্ঞানেই তৎকালে সর্বদৃশ্য পদার্থ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি বিলীন বা সুপ্ত হইয়া থাকে। পুনঃ ভোগপ্রদ কর্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া জাগ্রতে সেই অহংকারাদিরই পুনঃ আবির্ভাব হয়। অহংকার দ্বারা অবচ্ছিন্ন চেতন আত্মাও তখন কর্তা ভোক্তা-রূপে প্রকট হন। ভোক্তা আত্মা হইতেই ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা সকল, ভোগায়তন দেহ ও বাহ্য জগৎ বিস্তার লাভ করে। ইহারই নাম 'প্রাতিভিক-সৃষ্টি বা 'দৃষ্টিসৃষ্টি'। নিত্যই এই সৃষ্টি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানাবৃত পরমাত্মাতে বিলীন হইতেছে ও জীবকর্মবশে নিত্যই উহা জাগ্রতে পুনঃ সৃষ্ট বা আবির্ভূত হইতেছে। সুতরাং জীবই স্বয়ং এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। ইহাই বেদান্তোক্ত 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' বা 'একজীববাদ'।

সর্বৈশ্বর্যশালী অন্য একজন পরমেশ্বর জগৎ-কর্তা, যিনি জীব হইতে ভিন্ন ও সর্বজীবজগতের নিয়ামক—পূর্ব পূর্ব সংস্কার প্রভাবে এই ধারণা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের চিত্তেও বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেও অজাতশত্রু তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া সুষুপ্ত অবস্থাতেই পরমাত্মাসহ বালাকির পরিচয় করাইয়া দিলেন। সুষুপ্তিকালে এক অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই অনুভূত হন। মায়িক অহংকার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াই সেই আত্মা জাগ্রতে সবশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজা বলিলেন—সুষুপ্তিকালে এই অহংকার, কর্তা ভোক্তা জীব যাঁহাতে একাকার হইয়া, বিলীন হইয়া থাকে ও যাঁহা হইতে জাগ্রতে পুনরায় আবির্ভূত হয়, তাহাই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, ইহাই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ। বালাকিকেও তিনি এই তত্ত্বই নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে উপদেশ দিলেন। এবং বালাকিও স্বীয় বিদ্যাগর্ব পরিত্যাগ পূর্বক নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া কৃতকৃত্য হইলেন।

দেখা যাইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণও এই কথাই বলিয়াছেন—'বিচার করে "আমি" বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা-চৈতন্য। "আমার" "আমিত্ব" দূর হলে ভগবান দেখা দেন।'

মন-বুদ্ধি-অহংকারাদির বিলয় ঘটিলে এক অদ্বিতীয় আত্মাই থাকেন। তাঁহাকে জানাই নিজেকে জানা। উহাই ভগবদ্দর্শন বা ব্রহ্ম-দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

৯

গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাব নির্ণয় করতে হলে প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যার দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর বিপুল প্রভাবের কথা গান্ধীজীর সহকর্মী ও জীবনীকারেরা স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীকে অহিংসার ঋষি হতে বিবেকানন্দ সাহায্য করেননি, সেবাভাবও গান্ধীজীর মধ্যে পূর্ব হতেই ছিল; কিন্তু ভারতের দুটি মূল সমস্যা—জাতিভেদজাত অস্পৃশ্যতা এবং দারিদ্র্য—এই দুই ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের যন্ত্রণাময় চিন্তার উত্তরাধিকার গান্ধীজী নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের সামাজিক অংশ প্রধানতঃ এই দুই সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত ছিল। তাঁর হরিজন আন্দোলন ও চরকাতত্ত্ব এই জন্যই। এর সঙ্গে গান্ধী-আন্দোলনের ফলে নারী-জাগরণের কথা ভাবলে আমাদের মনে পড়বে শেষোক্ত প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তা ও চেষ্টার কথা। ভারতের অভ্যুত্থান ভারতীয় জনগণের অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে সম্ভবপর নয়—একথা তাঁর তুল্য প্রত্যক্ষ শক্তিতে আর কে বলেছেন? [এসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে তৃতীয় খণ্ডে]। তাঁর বাণীপ্রবাহের পলিমাটির উপরে পরবর্তী প্রজন্মের চেতনা ও কর্মের ফসল উৎপন্ন হয়েছিল।[১]

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজী সংগ্রাম শুরু করেছিলেন—অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। বারে বারে তিনি এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার উল্লেখ বা প্রতিধ্বনি করেছেন।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে গান্ধীজী কিভাবে বছরের পর বছর স্বামীজীর ভাব-ভাষাকে নিজ কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন, তার অল্প নমুনা আমি উপস্থিত করব—গান্ধীজীর রচনাবলীতে যে-ইংরেজীতে তা প্রকাশিত হয়েছে তা বহাল রেখেই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ২৭ অক্টোবর ১৯২০, গান্ধীজীর দীর্ঘ প্রবন্ধ "ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস্"। এর

১। গান্ধী-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ শুভফলের অন্যতম যে ব্যাপক নারী-জাগরণ, তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন সুভাষচন্দ্র। দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত সমাজকর্মী ডাঃ এস মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী তথাপি জাতীয় আন্দোলনের দোষ ধরেছিলেন—তা যথেষ্ট পরিমাণে নারীমুক্তি ঘটাচ্ছিল না বলে। তিনি গান্ধীজীকে লেখা এক পত্রে নারীশিক্ষার ব্যাপারে পুরুষদের অবহেলার কথা বলবার সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করেন, যাতে স্বামীজী বলেছিলেন, যে-জাতি নারীকে সম্মান না করে সে কখনও বড় হতে পারেনি বা পারবে না; ভারতীয় জাতির পতনের কারণ, তা শক্তির প্রতীক নারীর অসম্মান করেছে। যতদিন না নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে ততদিন ভারতের উত্থানের সম্ভাবনা নেই। ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী এই প্রসঙ্গে কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর অনুরূপ উক্তির উল্লেখ করেছিলেন। [ভারতীর এই বিষয়ক ধারণা বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার প্রভাবে গড়ে উঠেছিল]।

গান্ধীজী ডাঃ রেড্ডীর সকল কথাই স্বীকার করে নেন। কিন্তু সেইসঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয় নারীর এই বিষয়ক দায়িত্বহীনতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন, যাঁরা নিজেরা শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার গর্বে পরিস্ফীত থেকে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এসে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন না, অপরদিকে সব দোষ পুরুষদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। বলাবাহুল্য ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী এখানে স্মরণীয় ব্যতিক্রম।

মধ্যে তিনি হরিজনদের নিপীড়িত অবস্থার করুণ ছবি তুলে ধরেন। পরিত্রাণের পথ কি? শাসক ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণ? সদলে ধর্মান্তর গ্রহণ? গান্ধীজী তার অনুমোদন করতে পারেননি। অব্রাহ্মণদের উপরে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারকে "শয়তানী কাণ্ড" বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু পারস্পরিক ঘৃণায় মুক্তি নেই, তাও বলেন। আত্মশোধনের আবেদনই তিনি জানিয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধের সূচনার এই কয়েক লাইন :

"Vivekananda used to call the Panchamas 'Suppressed Classes.' There is no doubt that Vivekananda's is a more accurate adjective. We have suppressed them and consequently become ourselves depressed. That we have become the 'Pariahs of the Empire' is, in Gokhale's language the retributive justice meted out to us by a just God. A correspondent indignantly asks me in a pathetic letter reproduced elsewhere, what I am doing for them··· Should not we the Hindus wash our blood-stained hands before we ask the English to wash theirs? This is a proper question reasonably put. And if a member of a slave nation could deliver the suppressed classes from their slavery without freeing myself from my own, I would do so today. But it is an impossible task. A slave has not the freedom even to do the right thing."[২]

আমেদাবাদে "সাপ্রেসড্ ক্লাসেস্ কনফারেনস্"-এ গান্ধীজী ১৩ এপ্রিল ১৯২১ বক্তৃতা করেন, ইয়ং ইণ্ডিয়ায় তার বিবরণ বেরোয় ২৭. ৪. ১৯২১ এবং ৪. ৫. ১৯২১ তারিখে। এই বক্তৃতায় গান্ধীজী অস্পৃশ্যতাকে "হিন্দুধর্মের সর্ববৃহৎ কলঙ্কচিহ্ন" বলে অভিহিত করেন। বাল্যাবধি তিনি অস্পৃশ্যতার কিরূপ বিরোধী, তা বলবার পরে যেসব কথা বলেন তা গান্ধী-পথে বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়।—

"So long as the Hindus wilfully regard untouchability as part of their religion, so long as the mass of Hindus consider it a sin to touch a section of their brethren, Swaraj is impossible of attainment···We are guilty of having suppressed our brethren; we make them crawl on their bellies; we have made them rub their noses on the ground; with eyes red with rage, we push them out of Railway compartment—what more than this has British Rule done? ···Swami Vivekananda used to say that the untouchables were not depressed, they were suppressed by the Hindus who in turn had suppressed themselves by suppressing them···I [pray]···to-day that if I should die with any of my desires unfructified, with my service of the untouchables unfinished, with my Hinduism unfulfilled, I may be born again amongst the untouchables to bring my Hinduism to its fulfilment···

I have come in contact with the

২ Gandhi Works, Vol. 18, p. 375

untouchables all over the country; and I have observed that immense possibilities lie latent in them of which neither they nor the rest of the Hindus seem to be aware···Their intellect is of virginal purity."[৩]

কুইলনে পৌর সংবর্ধনার উত্তরে গান্ধীজী ১২ মার্চ ১৯২৫, বক্তৃতা প্রসঙ্গে মালাবারে ছুৎমার্গের জঘন্য রূপের উল্লেখ করেন—বাইকমে মন্দির প্রবেশের সুবিখ্যাত সত্যাগ্রহের কথাও এসে যায়, এবং বিবেকানন্দের বক্তব্যও। বিবেকানন্দ মালাবারকে 'পাগলা গারদ' বলেছিলেন—তাঁর সে উক্তি বহুল উদ্ধৃত। গান্ধীজী বলেন:

The question of untouchability expresses itself in all its evil form in Malabar. I must confess to you that before the struggle started in Vykom, I never knew that approachability was a crime. Travancore is one of the few forward places in India where education seems to be almost universal ···This State, I know, has done a great deal for what are miscalled the depressed classes. I say the depressed classes miscalled, because the proper term is suppressed classes. It was Swami Vivekananda who reminded us that the upper classes had suppressed a portion of themselves and had thereby been depressed themselves, you cannot lower the members of your own species without lowering yourselves. It surpasses comprehension that any human being should be prohibited from making use of roads which are semi-public or altogether public."[৪]

১৯২৭ জাতীয় সপ্তাহে গান্ধীজী গুজরাটিদের কাছে একলক্ষ টাকা প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বলেন, ঐ টাকা গুজরাটিদের কাছে ছেলের হাতে খেলনার মতোই সামান্য। টাকাটা তিনি হরিজনদের সেবায় লাগাবেন।—

"This amount···is required for work among the suppressed classes, which include *Antyajas* and the Raniparaj community. From now on we will describe *Antyajas* too as *dalit*. The term was first used by Swami Shraddhanand. Swami Vivekananda chose an English word having the same meaning. He described the untouchables not as 'depressed' but as 'suppressed', and quite rightly. They became, they remain, what they are because they were suppressed by the so-called upper classes. The Hindi word for this is *dalit*. Among all the suppressed classes, the untouchables are the most suppressed."[৫]

গান্ধীজী যখন হরিজন-স্বার্থে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি দয়া করতে চাননি, সেবা করতেই চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মানবিক মর্যাদার পুনরুদ্ধার। সে মর্যাদা আসতে পারে

৩ Ibid, Vol. 19, pp. 573–74

৫ Ibid, Vol. 33, p. 11

Ibid, Vol. 26, p. 290

অবশ্যই সমানাধিকারে—কিন্তু সেই চেষ্টার অর্থ নয় কিছু মানুষকে নামিয়ে সব মানুষকে সমান করা—তার অর্থ পতিতদের উত্তোলন করে সমতা বিধান। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে তাই চাই সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। বিবেকানন্দের মতো করে গান্ধীজীরও ধারণা হয়েছিল—দেশীয় ভাষার বিকাশের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার মর্ম গ্রহণ করুক। সংস্কৃত ভাষা জাতিচিত্তে 'সংস্কার' সৃষ্টি করবে—উভয়েই এই বিশ্বাস করেছেন। হরিজনদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মেলে না—এক ব্রাহ্মণজাতীয় হরিজন-কর্মী গান্ধীজীর কাছে এই দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন। গান্ধীজী পত্রের উত্তরে বলেন (২২. ৪. ১৯৩৩), ব্রাহ্মণ না গেলে ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে হরিজনরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করতে পারে। তিনি হরিজনদের কিছু কিছু সংস্কৃত শেখার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন, সেই সূত্রে বিবেকানন্দের চিন্তা তুলে ধরেন :

"What he [the Harijan Sevak] says about the ignorance of many priests and the show that they make of learning is unfortunately only too true. The remedy for it is a general levelling up of the character of the people and the spread of the right stamp of education, including a workable knowledge of Sanskrit. I believe in the great power which Vivekananda used to ascribe to Sanskrit. We are unnecessarily frightened by the difficulty of learning Sanskrit. For a persevering student it is no more difficult than any of the other languages."[৬]

জাতিভেদের একান্ত বিরোধী গান্ধীজী কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধী ছিলেন না। তিনি নিজেকে বর্ণাশ্রমী বলেই চিহ্নিত করেছেন। তার অর্থ, মানুষের ব্যক্তিচরিত্র তার কর্মচরিত্রের নিয়ামক হোক—তিনি চেয়েছেন। ব্রাহ্মণেরা অনেক দোষ করেছেন, কিন্তু নির্বিচারে সকল দোষ তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। "সব ধর্মেরই নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছে।··আমাদের ব্রাহ্মণেরা অন্যদের তুলনায় ভালই দাঁড়াবেন।" কিছুদিন থেকেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্যকে দায়ী করা হচ্ছিল ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়নের জন্য, [অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক শঙ্করাচার্যের কটু সমালোচনার চেহারা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে আগেই দেখে এসেছি]—গান্ধীজী তা স্বীকার না করে লিখলেন (২৭. ১০. ১৯৩২): "বিবেকানন্দের মতোই আমারও বিশ্বাস, শঙ্করাচার্য ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মকে কদাপি বিতাড়িত করেননি, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'। তিনি কেবল যেসব মন্দ বস্তু তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তাদেরই ছাঁটাই করেছিলেন। আমার মতে, ভারতে বুদ্ধদেবের শিক্ষা যেভাবে বলবৎ রয়েছে, পৃথিবীর আর কোথাও তা নেই।"[৭]

গান্ধীজী এখানে পুরোপুরি বিবেকানন্দের মতানুবর্তী।

গান্ধীজী রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কাজে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কোন শাখায় হরিজন উন্নয়নের কাজ চলছিল ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে। [এ বিষয়ে আমার উল্লিখিত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ৫১০—১৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে]—যে কাজ গান্ধীজীর সাধুবাদ অর্জন করেছিল। স্মর্তব্য, গান্ধীজীর

৬ Ibid, Vol. 52, p. 489

৭ Ibid, Vol. 51, p. 304.

মন্দিরপ্রবেশ আন্দোলন শুরু হবার আগেই রামকৃষ্ণ মিশন নিজস্বভাবে সে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। গান্ধীজী ১৯৩৩ ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক সংগঠিত অস্পৃশ্য-সেবার এক সংস্থা দর্শন করে খুশি হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে তিনি "হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধির আন্দোলন" নামে চিহ্নিত করেন।[৮]

১০

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝঞ্ঝার মধ্যে গান্ধীজীর একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা বহুলাংশে আবৃত থেকেছিল—হিন্দুধর্মের ত্রাণকর্তার ভূমিকা। এক্ষেত্রে আধুনিককালে বিবেকানন্দের পরেই তাঁর স্থান। প্রধানতঃ হিন্দু-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে হিন্দু-সমাজের সংহতি সাধন এবং সেই সমাজকে শুভ গতির পথনির্দেশের তুল্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাজ অল্পই সম্ভব। এই ভূমিকায় গান্ধীজী বিবেকানন্দের অনুসরণ করে প্রথমত: অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বাস্তব সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, দ্বিতীয়ত: স্বার্থসন্ধ অন্য ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুসমাজে ভাঙন চেষ্টার প্রতিরোধ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ কিভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে প্রচণ্ড চেষ্টা করেছেন (এখনও করছেন), তার কিছু বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে দিয়ে এসেছি। নবার্জিত বিশ্বাসের দ্বারা যদি কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অবশ্যই কিছু বলার ছিল না, কিন্তু বিশেষ স্বার্থে তা করলে, সেই ঘৃণ্য ধর্মের বেসাতিকে তিনি ধিক্কার না দিয়ে পারেননি, কারণ তাঁর কাছে ধর্ম হৃদয়ের বস্তু। অন্য সচেতন মানুষদের মতো করে গান্ধীজী বুঝেছিলেন—বহুধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে যদি ধর্মান্তরের টানাটানি কাণ্ড চলে তাহলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অন্ত থাকবে না, যার পরিণতি ভয়াবহ।

ধর্মান্তর প্রসঙ্গে গান্ধীজী বহু কথা বলেছেন। তার প্রায় সবটাই বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি। পার্থক্যের অংশে দেখি—ধর্মান্তর ব্যাপারে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি কঠোরতর। ২ ফেব্রুআরি ১৯২১ তারিখের নবজীবন পত্রিকায় "সনাতনী হিন্দু কে" রচনায় তিনি বলেছিলেন: "খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের মতো হিন্দুধর্ম অপর ধর্মাবলম্বীদের

৮ During his short stay in Madras, Mahatma Gandhi responded to the call of the Harijan inhabitants of three cheris in which the Thondor Sangam, organised by the R. K. Math, Madras has been doing reconstruction work on the lines laid down by Swami Vivekananda. …At about 9 a.m. on the 21st. of December 1933, Mahatmaji motored to the place and was received by the Swamis, the members of the Sangam and the Harijans. An address was presented and the Mahatma gave a fitting reply which will be enshrined in the hearts of all those present on the happy occasion. He congratulated the Mission on the good work it is doing throughout India, and stressed that Ramakrishna Mission is a 'movement for self-purification within Hinduism.' In the end he exhorted young men to take part in large numbers in this noble work." [*Vedanta Kesari*, January, 1934].

এই সূত্রে জানানো ভাল, গান্ধীজী অন্য অনেক মহান নেতার মতো রামকৃষ্ণ মিশনকে রাজনীতিতে নামতে না দেখে ক্ষুণ্ণ ছিলেন—তিনি পুরোপুরি প্রচলিত সমাজসংস্কার কর্মে মিশনকে নিয়োজিত দেখেননি; তবে মিশনের কাজের প্রতি তাঁর অটুট শ্রদ্ধা ছিল। ১৯৩১ ডিসেম্বরে

নিজ আশ্রয়ে আহ্বান করে না। তা সকলকে নিজ ধর্মাচরণের জন্য উৎসাহ দেয়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, সিস্টার নিবেদিতা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁকে হিন্দু বলে মনে করি না, তাই বলে তাঁকে বয়কট করি না বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি না। কারো হিন্দুধর্ম গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না, তবে সকলেই হিন্দুধর্ম চর্চা করতে পারে।"৯

বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রে গান্ধীজীর বক্তব্য সকল হিন্দুর বক্তব্য নয়। ধর্মান্তরে হিন্দুধর্ম উৎসাহী না হতে পারে, কিন্তু কেউ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলে তাকে হিন্দু বলা হবে না, এমন অদ্ভুত ইতিহাস দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় অবশ্যই। দূরবর্তী শক-হূনদের হিন্দু হওয়া বাদ দিচ্ছি, কয়েক শ বছর আগে নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক বৌদ্ধদের বৈষ্ণবকরণের সফল প্রয়াসের কথা ইতিহাস থেকে নিশ্চয়ই মুছে দেওয়া যায় না।

সে যাই হোক, গান্ধীজীকে বিশেষ ব্যক্তির ধর্মান্তর এবং সমষ্টিগত ধর্মান্তর, উভয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একবার এক হিন্দু যুবক তাঁর কাছে অত্যন্ত নৈরাশ্যতিক্ত একটি পত্র লেখে। যুবকটির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, বৃহৎ সংসারকে কষ্টে চালাতে হয়, বিয়ে করার জন্য তার মনে দারুণ তাগিদ, কিন্তু প্রয়োজনীয় ৫০০০ টাকা সে জোগাড় করতে পারেনি, শরীর মনের জ্বালায় অস্থির হয়ে সে গান্ধীজীকে চিঠি লিখেছিল, জ্বালা জুড়োবার জন্য সে কোন্ কোন্ পথ ধরতে পারে তাও জানিয়েছিল—গণিকাগমন থেকে ধর্মান্তর গ্রহণ, সবই তার মধ্যে ছিল। ছেলেটি চিঠিতে নাম দেয়নি, গান্ধীজী তার সেই কাপুরুষতাকে ধিক্কার দেন, আরও ধিক্কার দেন এইজন্য যে তার কাছে বিবাহ কামবাসনা চরিতার্থ করার উপায় ছাড়া কিছু নয়। গান্ধীজী যুবকটিকে দশ দফা কর্তব্য উপদেশ দিয়েছিলেন—অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদৃঢ় সেই বক্তব্য। ছেলেটির ধর্মত্যাগের হুমকিতে ক্রুদ্ধ গান্ধীজী লেখেন :

"[যুবক লিখেছে] যদি অবশ্য এইসব ব্যাপার [বিবাহ বা ব্যভিচার] ঘটাতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে শেষ পর্যন্ত ধর্মত্যাগের বাসনাও পোষণ করে। এ হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত। ধর্ম সম্বন্ধে যার সামান্যতম বোধ আছে সে ধর্মত্যাগের কোন হেতুই দেখতে পাবে না। ধর্ম পোশাক পরা বা

ইউরোপে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে গান্ধীজী রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা বলেছিলেন, তারপর বলেন :

"রামকৃষ্ণ মিশন খুবই শ্রদ্ধেয়। মিশনকে সব সময়ে নিজের কাজে সহযোগী হিসাবে পেয়েছেন। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মে তা অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ, [যথা] বিশেষ করে সেবা শুশ্রূষার কর্মে। এই কর্মে গোটা ভারতবর্ষে মিশন অনেক মঙ্গল করেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের চিত্তের ঔদার্য বজায় রাখা থেকে অনেক দূরে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম থেকে খুব ভয়ে-ভয়ে দূরে সরে থাকে।" ['রম্যাঁ রলাঁ : ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী,' পৃঃ ৩৬৩। অনুবাদক অবন্তীকুমার সান্যাল]।

গান্ধীজীর শেষোক্ত কথার অর্থ অস্পষ্ট। সেবাকর্মে জাতিধর্মবর্ণ পার্থক্য না করে রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণের চিত্তের ঔদার্য অবশ্যই রক্ষা করেছিল। আর রামকৃষ্ণ তো প্রচলিত সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক কার্য করতে বলেননি। রামকৃষ্ণ মিশন মোটেই 'ভয়ে ভয়ে' রাজনীতি থেকে দূরে থাকেনি—নীতির জন্যই সরে থেকেছিল। তথাপি মিশনকে বিপ্লবীদের সংঘভুক্ত করার সাহস দেখানোর জন্য কঠোর ফলভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু মিশন পেছিয়ে আসেনি।

৯ Gandhi Works, Vol. 19, p. 330

ছাড়ার মতো বস্তু নয়। এই শরীরের চেয়েও তা মূল্যবান। শরীর আসে শরীর যায়। ধর্ম আমাদের পরিষ্কার শিখিয়েছে—আত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক, যার পরিবর্তন নেই। ধর্ম যে-সকল আবর্জনা সৃষ্টি করে তাকে বর্জন করা যায়, কিন্তু ধর্মকে বর্জন করা যায় না। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ যে-ধর্মের গঠন করেছে, যার অধীনে অগণিত মানুষ আমৃত্যু তপস্যা করে গেছে, যার অনুগামীদের অস্থি গৌরবোজ্জ্বল করেছে হিমালয়কে, রক্তসিঞ্চনে বর্ধিত ও প্রস্ফুটিত হয়েছে তরু-লতা ও পুষ্প—সে ধর্মকে ত্যাগ করা যায়? ধর্ম-সংস্কারকেরা গতানুগতিকতার জীর্ণশাখা ছেদন করে ধর্মের গৌরবমহিমা সংরক্ষণ করে থাকেন। প্রথাবদ্ধতার বিরোধিতা করে বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ এবং অন্যান্যরা আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। এই সংস্কারকেরা ধর্মত্যাগ তো করেননি উল্টো-পক্ষে মন্দ প্রথার উচ্ছেদ করে ধর্মকে সৌরভে ও শক্তিতে রক্ষা করেছেন।"[১০] [ক্রমশঃ]

১০ Ibid, Vol. 41, pp. 142—44

যত মত তত পথ

অধ্যাপক শ্রীউমাপদ নাথ

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান, কে. ডি. কলেজ, মেদিনীপুর।

যত মত তত পথ : শ্রীমুখেরই বাণী।
কিন্তু সব পথ এসে তোমাতেই মিশে
এক পথে পরিণত : নাম তার জানি
ঈশ্বরের আনুগত্য। যুগার্জিত বিষে
জগৎ জর্জর হলে প্রেমময় দেহে
সমাগত হন তিনি, তাঁকে ভালবেসে
বিশ্বকে যে ভালবাসে, সর্বহৃদি-গেহে
শ্রীমন্দির আছে তাঁর রকমারি বেশে—
এই ভেবে চলে যারা, তাহাদের পথ
দেশে দেশে কালে কালে যেমনি হোক না
সেই পথে ধর্ম মূর্ত। জীবনের রথ
ঈশ্বরকে বয় সেথা। ঈশ্বর-বোধনা
সেইখানে কর্মে জ্ঞানে প্রীতিতে সেবায়
বহু রঙে শুদ্ধ শুভ্র। বর্ণহীন তাই
ধর্ম সদা ধৃতিময়, এক অভিধায় :
সর্বকালে সত্য যাহা তাতে ভেদ নাই।

অথচ ধর্মের নামে আজ এত ভেদ!
ধর্মের শিকড় প্রেমে, প্রেমের প্রসাদে
মানুষ আপন হয় : এই নিত্য-বেদ
রামকৃষ্ণে পুনর্মূর্ত। তার মধু-স্বাদে
মত-পথ মধু হোক, ঘুচুক বিদ্বেষ,
ধর্ম হোক প্রেমসত্র : হিংসা হোক শেষ।

তারাদের কথা ও কাহিনী

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

পরের দিন। রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পর। লোড শেডিংয়ের অন্ধকারে।

ছেলে : সেদিন কলেজের অবজারভেটরিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, বাবা।

বাবা : কি ব্যাপার ?

ছেলে : খালি চোখে দেখছি, মেঘমুক্ত আকাশে একটা নিঃসঙ্গ তারা শান্ত, স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। অন্য কোন তারার থেকে আলাদা কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ছে না। কি খেয়াল হল দূরবীন দিয়ে যেই তারাটা দেখলাম—অমনি কি আশ্চর্য ব্যাপার,—যেন ম্যাজিক—একটা তারা দুটো তারা হয়ে গেল !

বাবা : আসলে ওখানে দুটো আলাদা আলাদা তারাই আছে। কিন্তু এরা খুব কাছাকাছি থাকে বলে খালি চোখে ওদের তফাত বোঝা যায় না। তাই একটা তারার মতোই দেখায়। কিন্তু দূরবীন দিয়ে দেখলে ওদের মাঝখানের দূরত্বটা স্পষ্ট হয়,—তফাতটা ধরা পড়ে। এদের বলে যুগ্মতারা বা দুইসঙ্গী তারা। এরা প্রায় একই দূরত্বে থাকে। মহাকর্ষের টানে এদের মধ্যে যার বস্তুপরিমাণ কম সেই তারাটি অপর তারাটির চারদিকে প্রদক্ষিণ করে।

মেয়ে : কিন্তু যখন তারা দুটির বস্তুপরিমাণ প্রায় সমান, তখন তো একটি অপরটিকে টানের জোরে নিজের চারদিকে ঘোরাতে পারবে না। তখন কি হবে ?

বাবা : তখন মহাকর্ষের প্রভাবে সাধারণ ভারকেন্দ্রকে ঘিরে তার চারদিকে তারা দুটি প্রদক্ষিণ করবে।

মা : কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, তারা দুটো কাছাকাছি না থেকে অনেক দূরেই রয়েছে, তাদের মধ্যে কোন সম্পর্কও নেই, কিন্তু একটি অপরটির প্রায় পেছনে থাকায় দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখলে মনে হচ্ছে দুটো তারা কাছাকাছি ?

বাবা : হ্যাঁ, হতে তো পারেই। এ রকম দুটো তারাকে বলা যেতে পারে আপাত যুগ্মতারা। এরা প্রকৃত যুগ্মতারা নয়।

ছেলে : আচ্ছা, দুটো তারার মাঝখানের দূরত্বকে বাড়াবার যে-ক্ষমতা দূরবীনের আছে, তারও তো একটা সীমা আছে ?

বাবা : হ্যাঁ, তাতো আছেই।

ছেলে : তাহলে, এমন দুটো তারাও তো থাকতে পারে যারা এত বেশি কাছাকাছি যে পৃথিবীর শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলেও পৃথক দুটি তারা রূপে দেখা যাচ্ছে না ? একটা তারার মতোই লাগছে ?

বাবা : হ্যাঁ, তাতো পারেই।

ছেলে : সেই সব যুগ্মতারার অস্তিত্ব মানুষ কি করে জানল ?

বাবা : ব্যাপারটা একটু জটিল। পুরোপুরি বুঝতে পারবে কি ?

ছেলে, মেয়ে : বলেই দেখনা। যেটুকু পারব, সেইটুকুই বুঝব।

বাবা : বেশ, শোন মন দিয়ে। সেদিন পিসীমাকে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিলে। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, কোন রেলগাড়ি যখন বাঁশী বাজাতে বাজাতে স্টেশনের দিকে ছুটে আসে, তখন স্টেশন থেকে ঐ বাঁশীর আওয়াজটা শুনলে খুব তীক্ষ্ণ ও চড়া বলে মনে হয়। আবার ঐ রেলগাড়িই যখন বাঁশী বাজাতে বাজাতে স্টেশন থেকে দূরে চলে যায়, ঐ একই বাঁশীর আওয়াজ তখন মোটা শোনায় আমাদের কাছে।

ছেলে : (সগর্বে) একে বলে ডপ্‌লার এফেক্ট।

মেয়ে : দেখ্‌ দাদা, বেশি কলেজি বিদ্যা ফলাস্‌ না। এ রকম কেন হয়, বাবা ?

বাবা : আমরা জানি শব্দ বায়ুতে ঢেউ তুলে চলে। গাড়ি নিশ্চল থাকলে বাঁশীর শব্দ হাওয়াতে প্রতি সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঢেউ তুলে নির্দিষ্ট স্থানের ওপর দিয়ে আমাদের কানে এসে পড়ে, তাই আমরা বাঁশীর স্বাভাবিক শব্দ শুনি। কিন্তু ঐ গাড়ি যদি আমাদের দিকে ছুটে আসে, তাহলে শব্দের উৎস থেকে আমাদের দূরত্ব ক্রমশই কমে আসবে, ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কমে যাবে এবং বেশিসংখ্যক ঢেউ আমাদের কানে এসে পড়বে। আর এই বেশিসংখ্যক ঢেউগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে কানে চড়া স্বরের অনুভূতি জাগায়। আবার শব্দের উৎস যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, তখন ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে এবং কমসংখ্যক ঢেউ কানে এসে লাগবে। ঐ কমসংখ্যক ঢেউগুলি বিকীর্ণ হয়ে বাঁশীর আওয়াজে মোটা সুর এনে দেবে। তাই একটা চলন্ত গাড়ির বাঁশীর তীক্ষ্ণ বা মোটা সুর থেকে আমরা বুঝতে পারি সে কাছে আসছে বা দূরে যাচ্ছে।

ছেলে : এর সঙ্গে যুগ্মতারার কি সম্বন্ধ ?

বাবা : বলছি, বলছি, ব্যস্ত হয়ো না। এখন এই ডপ্‌লার তত্ত্ব আলোর ঢেউ সম্বন্ধেও খাটে। কোন তারা যদি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তবে তার আলোর ঢেউগুলি ঠেসাঠেসি ভীড় করার ফলে তাদের দৈর্ঘ্য আমাদের কাছে ছোট মনে হয়। আবার তারাটি যদি দূরে সরে যায়, তাহলে ঢেউগুলির দৈর্ঘ্যও খানিকটা বেড়ে যাবে।

ছেলে : অতদূর তারা থেকে আসা এই আলোর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি আমরা টের পাব কি করে ?

বাবা : এর জন্য বৈজ্ঞানিকরা তিন পিঠওয়ালা কাচ বা প্রিজ্‌মের সঙ্গে একটা দূরবীন যোগ করে তৈরি করলেন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র। সূর্যের বা তারার আলো এই প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে এসে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গের সৃষ্টি করে। দৈর্ঘ্যভেদে সৃষ্টি হয় রঙের ভেদ। সাদা আলো প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে ভেঙে এসে সাতরঙের আলো ছড়িয়ে দেয়—বেগুনী, অতিনীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। একেই বলে আলোর বর্ণালী। বেগুনী রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম আর লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখা যায় সারা বর্ণালী জুড়ে রয়েছে কিছু কালো কালো রেখা—এদের বলা হয় বর্ণরেখা।

এখন কোন তারা যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, আলোর ঢেউগুলি দৈর্ঘ্যে কম হওয়ায় বর্ণালীর সব বর্ণরেখাগুলিই বেগুনী আলোর দিকে সরে যাবে, কারণ বেগুনী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।

ছেলে : তারাটি যদি দূরে সরতে থাকে, তাহলে ঐ একই কারণে ঐ বর্ণরেখাগুলি সরে যাবে সবচেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের লাল আলোর দিকে।

বাবা : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এইভাবে বর্ণরেখাগুলির স্থান পরিবর্তন তারার গতির সংকেত বহন করে। এখন দূরবীন দিয়ে যে যুগ্মতারাকে পৃথক করা যায় না, কক্ষপথে ঘোরার কোন এক সময়ে তার একটি সঙ্গীতারা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসবে, অন্য সঙ্গী-তারাটি পৃথিবী থেকে সরে যেতে থাকবে। এখন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ঐ যুগ্মতারার আলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বর্ণরেখাগুলি দ্বিগুণ হয়ে গেছে—তার একভাগ বেগুনী আলোর দিকে সরে যাচ্ছে আর একভাগ লাল আলোর দিকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু একক তারার আলো বিশ্লেষণ করলে এসব কিছু হবে না। এইভাবে যে যুগ্ম-তারাগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তাদেরকে বলা হয় বর্ণালীগত যুগ্মতারা। যুগ্ম-তারা ছাড়া আমরা তিনসঙ্গী, চারসঙ্গী, ছয়সঙ্গী তারা বা জোড় সংখ্যার বহুসঙ্গী তারাও অনেক দেখতে পাই।

মা : এ ধরনের কত তারা আকাশে রয়েছে ?

বাবা : প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তারাই হয় যুগ্মতারা, না হয় বহুসঙ্গী তারা। তার মধ্যে খালি চোখে দেখা তারার এক-চতুর্থাংশ যুগ্মতারা। এ তো গেল ষষ্ঠ প্রভা পর্যন্ত তারার কথা। নবম প্রভা পর্যন্ত তারার মধ্যে যুগ্মতারার সংখ্যা ৩০,০০০, যাদের দূরবীন দিয়ে পৃথক করতে হয়। আর বর্ণালীগত যুগ্মতারার সংখ্যাও কম নয়, প্রায় ৩৩,০০০।

ছেলে : যুগ্মতারাদের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আছে ?

বাবা : হ্যাঁ আছে। যখন কোন যুগ্মতারার কক্ষপথগুলি দূরবীনের চোখের সমতলে থাকে এবং সঙ্গীদের মধ্যে একটা উজ্জ্বল, অপরটা অনুজ্জ্বল হয়, তখন একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, প্রদক্ষিণের পথে কখনও সঙ্গীতারা দুটো পাশাপাশি রয়েছে, কখনও একটি আর একটিকে আড়াল করে রাখছে। কিন্তু খালি চোখে যখন দেখছি তখন একটি মাত্র তারা এবং কি আশ্চর্য, তার উজ্জ্বলতা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাড়ছে আর কমছে !

মেয়ে : সেটা কি করে সম্ভব, বাবা ?

বাবা : যখন সঙ্গীতারা দুটো পাশাপাশি, তখন যুগ্মতারাকে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখায়, কারণ, সঙ্গী দুটি তারার উজ্জ্বলতা যোগ হয়ে গিয়ে যুগ্মতারাকে সবচেয়ে বেশি দীপ্যমান করে তোলে। আবার উজ্জ্বলতর সঙ্গীটি যখন অন্য সঙ্গীকে সম্পূর্ণ আড়াল করে সামনে আসে তখন যুগ্মতারার দীপ্তি আগের থেকে সামান্য একটু কমে যায় ; কারণ, তখন একটি মাত্র উজ্জ্বল প্রভার তারা আমাদের গোচরে আসে। কিন্তু যখন অনুজ্জ্বল তারাটি সামনে আসে, আর উজ্জ্বল তারাটি আড়ালে যায়, তখন যুগ্মতারার দীপ্তি অনেক

কমে ম্লান, নিষ্প্রভ দেখায়, কারণ তখন উজ্জ্বল প্রভার তারাটি আমাদের গোচরে আসে না। পর্যায়ক্রমে এইভাবে উজ্জ্বলতার পরিবর্তন হতে থাকে। এই আড়াল করাকে গ্রহণ বলা যেতে পারে। প্রদক্ষিণের সময় যেন ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে আর গ্রহণ ছাড়ে। এই রকম যুগ্মতারাকে বলা হয় গ্রহণপন্থী যুগ্মতারা।

ছেলে : আমরা দেখছি, আকাশে বেশ কিছু তারা রয়েছে যাদের দ্যুতি বা উজ্জ্বলতা স্থির নয়, কখনও বাড়ে, কখনও কমে। তাদের কি বলব ?

বাবা : সাধারণভাবে তাদের অস্থিরদ্যুতি তারা বলা চলে। অস্থিরদ্যুতি তারার একবার উজ্জ্বল হওয়া থেকে শুরু করে তারপর ম্লান হয়ে আবার আগের মতো সমান উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানকে স্পন্দনকাল বলে। এখন যাদের স্পন্দনকাল নিয়মিত, তাদের বলা হয়, নিয়মিত অস্থিরদ্যুতি তারা, আর যাদের স্পন্দনকালের কোন স্থিরতা নেই, অনিয়মিত, তাদেরকে বলা হয় অনিয়মিত অস্থিরদ্যুতি তারা।

নিয়মিত অস্থিরদ্যুতি তারার মধ্যে প্রথমে আমরা পেয়েছি গ্রহণপন্থী যুগ্মতারাদের। এদের কথা আগেই বলেছি। মনে আছে নিশ্চয়ই সেখানে একক তারা নেই। দুটো ঘনিষ্ঠ তারা রয়েছে, আর তার দ্যুতির হ্রাসবৃদ্ধি হয় গ্রহণের বা আড়ালের ফলে।

ছেলে : তাহলে এমন তারাও কি আকাশে আছে একক অবস্থাতেই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে যার দীপ্তি পরিবর্তন হয় ? আর সেটা হয়ই বা কিভাবে ?

বাবা : আছে বই কি। ঠিক কি কারণে একটা নিয়মিত অস্থিরদ্যুতি তারার দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, আজও তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাবে তারাটি সংকুচিত হয়ে পড়ে। আয়তন সংকুচিত হলেই তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং সেটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর এই অতিরিক্ত তাপমাত্রার দরুণই আবার তারাটির দেহের আয়তন বেড়ে যায়। আয়তন বাড়লেই তাপমাত্রা যায় কমে। সঙ্গে সঙ্গে তার দীপ্তিও যায় কমে। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে এলে, মহাকর্ষের ফলে আবার সংকুচিত হয়ে যায়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এই তারাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয়।

[ক্রমশঃ]

আমাদের চরম লক্ষ্য কি ? আজকাল প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছে—ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। এই 'ক্রমাগত নিকটবর্তী হওয়া অথচ কখনই লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছানো'—ইহার অর্থ যাহাই হউক, আর এ তত্ত্ব যতই অদ্ভুত হউক, ইহা যে অসম্ভব, তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় কি কখন কোন প্রকার গতি হইতে পারে ? একটি সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত হয় ; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেখানেই আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, সেখানেই অবশ্য শেষ করিতে হইবে ; আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবশ্যই ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পশুপতিনাথ

শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত

ভ্রমণকাহিনী, পৌরাণিক আখ্যান ও প্রবন্ধ-লেখিকা।

আমরা ৩২ জন মহিলা চলেছি দুজন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে পশুপতিনাথ দর্শনে। বাস থামল এসে দক্ষিণেশ্বরে। কোজাগরী পূর্ণিমার পরদিন, ১৪ অক্টোবর ১৯৮১, কলকাতা থেকে একটি ট্র্যাভেলিং এজেন্সীর বাসে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। ভোর সাড়ে ছটায় বাস ছাড়ে। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীকে দর্শন ও প্রণামের সুযোগ পেলাম আমরা। সকালবেলা মন্দিরে ভিড় মোটেই ছিল না। তাই খুব ভালভাবেই দর্শন হয়েছিল। মা সবুজপাড় ফিকে নীল বেনারসীতে সেজেছেন। ওখানেই জলযোগ সেরে নিয়ে আবার যাত্রা চলতে থাকল। পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে বিহার,—বিহারের রাজগীরে আমাদের যাত্রার প্রথম বিরতি।

রাজগীরে একদিন থেকে নালন্দা ও পাওয়াপুরী দর্শন ও গরমজলের কুণ্ডে স্নান হল। পাওয়াপুরী জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীরের জন্ম এবং মহাসমাধির স্থান। এক বিরাট সরোবরের মাঝখানে মহাবীরের সমাধিমন্দির—শ্বেতপাথরে তৈরি, সুন্দর মন্দির। চূড়া সোনার—অর্থাৎ সোনার জলে রং-করা।

নালন্দা বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধবিহার। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এর সন্ধান পাওয়ার পর ২৫ বছর ধরে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান কানিংহামের নির্দেশে এর খননকার্য চলে এবং এই বিরাট বিহার আবিষ্কৃত হয়। নালন্দাবিহার প্রথমে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তরাজারা তৈরি করান। তারপর ধর্মপাল ও হর্ষবর্ধন পর পর বিহারগুলির সংস্কারসাধন করেন। সারিপুত্ত ও মৌগল্যায়নের স্মৃতিচিহ্নের উপর যে স্তূপ সেটিই ভজনগৃহ। এই বিহার নির্মাণ পরিকল্পনা এবং স্থাপত্যে বিশ্বের বিস্ময়। রাজগীর সংগ্রহশালাটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। পোড়ামাটির অতিসূক্ষ্ম কাজ, বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা পোড়ামাটির মূর্তিতে দেখানো হয়েছে। তা ছাড়া আছে কিছু পোড়া চাল—ঠিক শ্লেটের মতো রং। বক্তিয়ার খিলজী বিহার আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দিলে গৃহে গৃহে সঞ্চিত খাদ্য ধান-চাল পুড়ে যায়। মাটি খুঁড়ে ঠিক এই অবস্থায় চালগুলো পাওয়া গেছে

পরদিন সকাল সাতটায় আমরা রওনা হলাম বীরগঞ্জের উদ্দেশে। পাটনা শহরের পাশ দিয়ে এসে মোকামার সার কারখানা, মতিহারী, মজঃফরপুর, ছাপরা প্রভৃতি জেলা পার হয়ে শেষে সন্ধ্যায় বীরগঞ্জ পৌঁছলাম। বাসে বসে বৃথা সময় নষ্ট না করে আমরা সাধুমায়ের নির্দেশে নামগান, গীতাপাঠ, শিবনাম, সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন—এ সব করছিলাম।

বীরগঞ্জে পৌঁছে কলেরার টিকার সার্টিফিকেট দেখাতে হল। যাঁরা কর্পোরেশনের সার্টিফিকেটের বদলে, এমনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালেন তাঁদেরটা গ্রাহ্য হল না। তা বলে যে তাঁদের কলেরার টিকা নিতে হল তা কিন্তু নয়—শুধু এক টাকা করে জরিমানা দিতে হল। বীরগঞ্জ হল নেপালের প্রবেশদ্বার। রাতটা ওখানে কাটিয়ে পরদিন শুরু হল নেপালের পাহাড়ে ওঠা। কাঠমাণ্ডু যেতে পরপর সাতটা পাহাড় অতিক্রম করতে হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। একদিকে খাদের মধ্যে উপলময়ী ফেনোচ্ছলা নদী, অপরদিকে খাড়া পাহাড়। কোথাও বা খাদের ওধারে পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে ফসল ফলানো হয়েছে। পাহাড়টা ঐ রকম ধাপকাটা সবুজ ফসলে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মনে হচ্ছে সবুজ কর্ডের কাপড়ে কে যেন পাহাড়টাকে ঢেকে দিয়েছে।

সাধুমার নির্দেশমতো গীতাপাঠ,—নামগান করতে করতে চলেছি। সবাই একই ভাবের যাত্রী। দুপুরে পথের ধারে এক নেপালী হোটেলে খাওয়া হল। পরিষ্কার করে নিকানো মাটির ঘর, টিন বা টালির চাল। কাঠের চেয়ার ও বেঞ্চি পেতে খেতে দিল। নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের থালা, গেলাস,—ভাল চালের গরম ভাত, ডাল ও আলুর তরকারী। দলে শিলং-এর কটি মেয়ে ছিল। তাদের মুখে দু-একটি নেপালী কথা শুনে পরিবেশনকারিণী নেপালী মেয়ে দুটি খুব হাসতে লাগল। এমনিতেই ওরা হাস্যময়ী

জল এখানে সুলভ। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট্ট ছোট্ট ঝরনা নামছে—সেখানে একটা বাঁশের নল বসিয়ে দিলেই হল। তবে সঙ্গে যে দুজন মহিলা ডাক্তার ছিলেন, তাঁরা সতর্ক করে দিলেন—এ জল দেখতে স্বচ্ছ হলেও জীবাণু-দূষিত,—সুতরাং অপেয়।

খাওয়ার পর আবার চলা। পথের দুধারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করব, কিন্তু ক্লান্ত শরীর আপত্তি জানাতে লাগল। 'আমার' শরীর বলি বটে সে কিন্তু মোটেই আমার বশ নয়। আমি যখন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ইচ্ছুক সে তখন ঘুমোতে চায়। আবার আমি যখন ঘুমোতে ইচ্ছুক তখন সে জেগে থাকে। শরীরের সঙ্গে না পেরে একটু তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ 'পিক, পিক' (peak) কলরব শুনে চমকে তাকিয়ে দেখি বাসের জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নগাধীশ হিমালয়ের কটি চূড়া—এভারেস্ট, অন্নপূর্ণা, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা ইত্যাদি। আকাশের অনেকখানি জুড়ে বড় মহিমান্বিত উজ্জ্বল সে-দৃশ্য। বাস বাঁক নেয়, তখন ডানধারের লোকেরা দেখতে পায়, আবার উল্টোদিকে বাঁক নেয়—তখন বাসের বাঁ ধারে বসা লোকেরা দেখতে পায়। সকলেই অনেকক্ষণ ধরে খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন। জায়গাটার নাম দমন। সেখানকার উচ্চতা ৮০০০ ফিট। বরফঢাকা চূড়াগুলো দেখেই মনে এল "ধ্যায়েন্নিত্যং রজতগিরিসন্নিভং" ইত্যাদি। এমন সুন্দর দর্শন হল—আমরা বিভিন্ন স্তবে ও শ্লোকে মহাদেবকে প্রণাম জানালাম। দমনে হিমালয় দেখার জন্য এক জায়গায় একটা টাওয়ার আছে।

কাঠমাণ্ডু ওখান থেকে প্রায় ৪০০০ ফিট নিচে। সন্ধ্যাবেলা "খণ্ডন-ভব-বন্ধন" গাওয়া হল। অন্ধকারের মধ্যে এক জায়গায় বেশ অনেক আলো জ্বলছিল—ঐ হল কাঠমাণ্ডু। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা কাঠমাণ্ডু পৌঁছলাম। চেকিং যা করার বীরগঞ্জেই করেছিল—সেও নাম-মাত্র। রিক্সাগাড়ি যেই ঢুকছিল টর্চ ফেলে দেখছিল। কাঠমাণ্ডুতে আর কিছু দেখলে না। হয়রান করেছিল ফেরার পথে। সেকথ যথাস্থানে।

পরদিন ১৮ অক্টোবর, কেউ কেউ পশুপতি-নাথ দর্শনে গেলেন। ব্যস্ততার কিছু ছিল না। ২০ তারিখ অবধি কাঠমাণ্ডু থাকা হবে। ১৯ তারিখ পশুপতিনাথের পুজো দেওয়া হবে—সেই সঙ্গে শিবসহস্রনাম পাঠ হবে। সুতরাং আমরা কেউ কেউ শিবসহস্রনামটা পড়া অভ্যাস করতে বসলাম। তা ছাড়া বিশ্রামও দরকার। দুদিন দুরাত ঠায় গাড়িতে বসা।

নেপালে টয়োটা (জাপানী) গাড়ি ভর্তি,—সব ট্যাক্সি টয়োটা। অনেক সময়ই যাত্রীকে ঠকিয়ে বেশি আদায়ের চেষ্টা করে।

পশুপতিনাথ মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকেই বিরাট এক ধাতব নন্দী মূর্তি—আকারে রামেশ্বরের নন্দীর মতো হবে। সোনার বলেই বলা হয়—কিন্তু মনে হয় সোনার জলে রং-করা। এটা জানতে

পেরেছিলাম দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুরমে গিয়ে। দক্ষিণে তো প্রায় সব মন্দিরের চূড়া সোনার—অন্ততঃ দেখতে তাই মনে হয়। কিন্তু কাঞ্চীপুরমে কামাক্ষী মন্দিরে গিয়ে দেখেছিলাম তথাকথিত সোনার চূড়া বিবর্ণ,—তাতে রং দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং রং দেবার পরই চূড়া ঠিক সোনার মতো দেখাচ্ছিল।

মন্দিরের সিঁড়ির দুপাশে দুটি পেতল বা অষ্টধাতুর সিংহ। মন্দিরের চালের কোণাগুলো প্যাগোডা ধরনে বাঁকানো। দেয়ালে কারুকার্য আছে,—গঙ্গা, হরগৌরী, ড্র্যাগন।

পশুপতিনাথ কষ্টিপাথরের আন্দাজ দেড় হাত উঁচু লিঙ্গ—ওপরের দিকে, চারদিকে চারটা মুখ খোদাই-করা। সেই সোনার রং-এ মুখচোখ রেখাঙ্কিত। রাজবেশ অর্থাৎ মাথায় পাগড়ী, তাতে সোনার কারুকার্যময় পাত বসানো। পাগড়ীর ওপরে টোপরের মতো সরু সোনার মুকুট, তার ওপর রূপোর বাঁটওয়ালা সোনার ছাতা। লিঙ্গটি রূপোর তারের জালে জড়ানো—ছবিতে রাণা প্রতাপসিংহের মাথায় যেরকম জালের বর্ম ঝোলানো দেখা যায় সেরকম।

মন্দিরের দরজা রূপোর। গর্ভমন্দির ঘিরে যে যে বারান্দা রয়েছে তাতে তারে গাঁথা রুদ্রাক্ষের তৈরি সুন্দর সুন্দর ঝাড় ছাদ থেকে ঝুলছে।

মন্দিরে ভাল করে পূজো দিতে হলে ভারতীয় মুদ্রায় ১০০ টাকা লাগে। আমরা সবাই মিলে তেমনি পূজোই দিলাম। জল, দুধ, দই, ঘি,—এ সব দিয়ে স্নান করানো হল। এ ছাড়া, চাল, পঞ্চশস্য, তিল—এ সবও আছে—কর্পূরের আরতি, গাঁদাফুলের সাজ হল। টকটকে লাল কাপড়-পরা পুরোহিত আমাদের বললেন, পূজোর আগে উপকরণগুলো একবার স্পর্শ করে দিতে। আর বললেন, যতক্ষণ পূজো হচ্ছে আমরা যেন "নমঃ শিবায়" জপ করি—অর্থাৎ পুরোহিতকে তার দিলেই হয়ে গেল তা নয়, তোমারও কিছু করণীয় আছে। এই ভাবটি বেশ ভাল লেগেছিল আমাদের। সাধারণতঃ দেখা যায়, পুরোহিত পূজো করছেন আর বাড়ির লোকেরা বসে এন্তার বাজে গল্প করে চলেছেন। লক্ষ্মীপূজো, সরস্বতী পূজোয় হামেশা এরকম দেখা যায়। আবার আমরা যে রকম মন্দিরে গিয়ে ঠকাং করে বিগ্রহের পায়ে ডালা ঠেকালুম আর হয়ে গেল, এখানে তা নয়। নেপালী মহিলারা একমনে বারান্দায় বসে স্তবপাঠ বা স্তোত্র আবৃত্তি করে চলেছে। একজন প্রৌঢ়া দর্শন করে এসে আমাদের সবাইকে আলিঙ্গন করলেন। বেশ একটা ভক্তির ভাব, সসম্ভ্রম গাম্ভীর্য আছে।

মন্দির-প্রাঙ্গণের একধারে বসে আমরা স্তব-পাঠ ইত্যাদি করছিলাম—এমন সময় এক বৃদ্ধ কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ নেপালী ভদ্রলোক এসে একমনে শুনতে লাগলেন। তারপরে আমাদের প্রশ্ন করে যখন জানলেন যে, আমরা রামকৃষ্ণ-ভাবধারার—তখন তিনি আবেগভরে বলে উঠলেন "রামকৃষ্ণদেব! তাঁর কাছে আমি অশেষ ঋণী। তাঁর কৃপার তুলনা নেই। তাঁর গস্‌পেল, আমি রোজ পড়ি। ১৮ বার পড়েছি—প্রতিবারই একটা কিছু নূতন উপলব্ধি হয়েছে।"

বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখে অশ্রু দেখা দিল। আমাদের দলের একটি মেয়ে নেপালী আইন সম্বন্ধে কি একটা গবেষণা করছে। এজন্য সে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে ভাবছিল। যখন কথায় কথায় জানা গেল ঐ ভদ্রলোক—রুদ্ররাজ পাণ্ডে, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব আচার্য, তখন তাঁকে ব্যাপারটি জানানো হল। তিনি সাগ্রহে বললেন, "ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করব।"

আমাদের সবাইকে তাঁর বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ

জানিয়ে সপরিবারে সাধুমাকে প্রণাম করে তিনি বিদায় নিলেন।

পুজো হয়ে গেলে পুরোহিত আমাদের ঠাকুরের মণিরত্ন, একমুখী রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি সব দেখালেন। যারা ভাল করে পুজো দেয় তাদের এসব দেখানো হয়।

এখানে ধুনো, পঞ্চপ্রদীপ, জলশঙ্খ, কর্পূর, ফুল, চামর, ময়ূরপাখা দিয়ে আরতি হল। শেষে আয়নায় মুখ দেখানো হল। ফুল দিয়ে আমরা যেরকম আরতি করি সেরকম না করে দুহাতে ফুল নিয়ে শিবের মাথায় দিলেন।

পশুপতিনাথমন্দিরের পাশে চামুণ্ডা দেবী (মতান্তরে পার্বতী), বিশাল মূর্তি—ধাতুনির্মিত। আর রয়েছেন মহাকাল। ছোট ছোট আরও কয়েকটি মূর্তির মধ্যে আছেন নটরাজ—খুব প্রশান্ত মুখভাব। মনকে টানে সত্যই। মন্দির-চত্বরে বসে আমরা দক্ষিণাকালীস্তোত্র পাঠ করলাম।

এরপর আমরা গেলাম বোধনাথ দর্শনে। এটি বৌদ্ধস্তূপ। চূড়ার নিচে বিরাট দুটি আয়ত নেত্র। নেপাল-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে এই স্তূপটির ছবিই খুব বেশি দেখা যায়। স্তূপের চারধারে ধর্মচক্র সাজানো রয়েছে। আশপাশে নতুন পুরানো নেপালী মূর্তি, ধর্মচক্র,—এসবের দোকান বসেছে।

গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় স্বয়ম্ভুনাথ দেখা হল না। অনন্তশয়ন বালাজী দেখলাম। সেটি একটি চমৎকার রকমারী গোলাপের বাগানের মধ্যে। ঢুকতে টিকিট লাগে। কিন্তু পরে জানলাম ওটি নকল বালাজী। আসল বালাজী একটু দূরে। সেখানে রাজপরিবারের কেউ যান না। একবার নেপালের কোন রাজা নাকি সদলবলে ওখানে আসেন। তখন কোন প্রয়োজনে মাটি খুঁড়তে গেলে কোদালে রক্ত এবং সাপের লেজের একটা অংশ উঠে আসে। অনন্তনাগের লেজে নাকি কোদাল লেগেছিল। তারপরে কটি দুর্ঘটনা হয় রাজপরিবারে, এরপর থেকে ভয়ে কেউ ওঁরা বালাজীদর্শনে যান না। তাঁদের জন্য এই নকল বালাজী তৈরি হয়েছে। আমরা যে ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে গিয়েছিলাম, তাঁরা এটি জানতেন না।

পরদিন দক্ষিণাকালী ও পাটন দর্শনে গেলাম। এই দক্ষিণাকালীর পাহাড় কাঠমাণ্ডু থেকে ১৮ কিলোমিটার। পাহাড়ী রাস্তা, ঘুরে ঘুরে একটি তোরণের সামনে বাস থামল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সমতল রাস্তা। সরু পাহাড়ী নদী বাগমতী বয়ে চলেছে। ওপরে পোল, সেটা পেরিয়ে দক্ষিণা-কালী। প্রচুর শ্বেতাঙ্গ পর্যটক।

দক্ষিণাকালী একটা খোলা জায়গায়, দেয়ালে খোদাই-করা ষড়্ভুজ দেবীমূর্তি। কাছে ঐ রকম আরও প্রতিমা রয়েছে—সব রক্তে মাখামাখি। আগেই আমাদের সাবধান করা হয়েছিল, "কেউ ভাল কাপড় পরে যাবেন না—সব রক্তে মাখামাখি হয়ে যাবে।" দেখলাম বাস্তবিকই তাই। সমানে পাঁঠা ও মুরগী বলি হয়ে চলেছে। সেই রক্ত দেবীর গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে; আবার ডিম ভেঙে প্রতিমার মুখে মাখিয়ে দিল। প্রতিমা ছোটই, মুখখানা প্রমাণাকার বাঙালী মেয়ের বদ্ধমুষ্টির মাপে, অপটু হাতে তৈরি। মুরগী বলি দেখে মনে হয় উপজাতীয় দেবী মা-কালীর সঙ্গে মিশে গেছেন। দেবীর চাঁদোয়া হচ্ছে পেতলের তৈরি দুটো ড্র্যাগন ক্রুশচিহ্নের মতো করে স্থাপিত। দেবীর মাথায় রূপোর মুকুট, রূপোর পদ্মে উপবিষ্ট।

এর মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গ ক্যামেরাধারী স্তূপীকৃত পাঁঠার ছালের ছবি তুলতে গেলে আমাদের দলের দু-চারজন মহিলা প্রতিবাদ জানালেন। ক্যামেরা-ধারী আমতা আমতা করে সরে গেলেন। সম্ভবতঃ হাজার হাজার পাঁঠাবলির লোমহর্ষক বিবরণসহ ছবিটি কোন বৈদেশিক পত্রিকায় স্থান পেত।

দেবীর পুজো নিয়ে কালীঘাটের মন্দিরের মতো ঠেলাধাক্কা ; পড়লে তো সর্বাঙ্গে রক্ত মাখামাখি। খানিক পর পর অবশ্য রবারের নলে করে জল দিয়ে প্রতিমাসমেত সব ধুয়ে দিল। আমরা ততক্ষণে পাহাড়ের গায়ে কাটা সিঁড়িতে বসে দক্ষিণাকালীস্তোত্র পড়ছি।

কাঠমাণ্ডু থেকে পাহাড়টা উঁচু—সুতরাং সেখান থেকে হিমালয় বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

এরপর আমরা পাটনে গেলাম পুরানো রাজধানী দেখতে। সময়াভাবে সব দেখা হল না। কৃষ্ণ, সত্যভামা ও রুক্মিণী আছেন এক মন্দিরে। দশাবতার মূর্তি দেয়ালে খোদাই-করা। একটি মন্দিরে দশভুজ, ত্রিমুণ্ড গণেশ চোখে পড়ল।

এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য হল হিরণ্যবর্ণমহাবিহার। বুদ্ধের সুসজ্জিত সালঙ্কার মূর্তি রয়েছে ; উপবিষ্ট অবস্থায় হাত দুই উঁচু—মুখখানা ভারী সুন্দর। সোনার জলে রং-করা, বেশ বড় মন্দির। দেয়ালে হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি খোদিত। মন্দির কাঠ, পেতল ও পোড়ামাটির তৈরি।

বিকালের দিকে সেই রুদ্ররাজ পাণ্ডে পাঁচখণ্ড একত্রে বাঁধানো বিরাট এক 'গসপেল' নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। নেপালী আইনজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ এক পণ্ডিতকে তিনি বাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছেন। তাঁর মেয়ে-নাতনী এরা সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের যেতে হবে—এবং রামকৃষ্ণদেব যে সব গান গাইতেন, "আমি মুক্তি দিতে কাতর," "দে মা পাগল করে" ইত্যাদি মূল বাংলা গানগুলো শোনাতে হবে। 'গসপেল' খুলে তিনি গানগুলো দেখালেন।

আমরা সবাই খুব ক্লান্ত, তাই এড়াবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু ভদ্রলোক এমন আন্তরিকতা সহকারে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে এড়ানো গেল না। "দে মা পাগল করে" তাঁর শুনতেই হবে। আমাদের মধ্যে একজন আড়ালে মন্তব্য করলেন, "মন্দিরে একটু দেখা—সেই সূত্রে 'গসপেল'-বগলে হোটেল অবধি ধাওয়া করেছ। তোমার পাগল হতে আর বাকি কি ?"

রুদ্ররাজ পাণ্ডের জামাতা নেপালের অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রকের একখানা স্টেশন ওয়াগনে আমাদের বসিয়ে তিনি নিজে একখানা টয়োটা গাড়িতে বসে আমাদের নিয়ে চললেন তাঁর মেয়ের বাড়ি। গাড়ি থেকে নামতেই দ্বারবান থেকে শুরু করে সকলের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা। ওপরে ঠাকুরঘরে আসনে হরপার্বতী, কৃষ্ণ রাম রয়েছেন, আর শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের দুখানা বড় ছবি ফুলের মালায় সাজানো। রুদ্ররাজ পাণ্ডে ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে আমি সর্বদা প্রার্থনা করতাম, 'দেখা দাও, কৃপা কর। তোমার মতো কাউকে আমার কাছে পাঠাও।' ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমি গুরু পেয়েছি—যিনি ঠিক রামকৃষ্ণদেবেরই মতো ইষ্টের সঙ্গে কথা বলেন, আবদার করেন। পাহাড়ের গুহায় থাকেন।"

তাঁর ১৯ বৎসর বয়স্কা পত্নী, তাঁর বেয়ান, পুত্রবধূ, মেয়ে, নাতনী—সবাই মিলে অতি সুন্দর ভাবপূর্ণ হিন্দী ভজন গাইলেন। এক একটা গান শেষ হলে আমরা যেমন জয় দিই সেরকম "গোপাল গোপাল", "পরমহংসদেবকী জয়", "সারদামাইকী জয়"—বলছিলেন। বোঝা যায় এঁরা নিয়মিত এরকম ভজন গেয়ে থাকেন,—তান, লয়; সুর সব নিখুঁত।

তারপর আমাদের তরফ থেকে রুদ্ররাজ পাণ্ডের নির্দিষ্ট গানগুলো গাওয়া হল। তিনি গসপেল থেকে গানগুলো বের করে তাঁর মেয়ে ও নাতনীর সামনে রাখলেন। তিনি নিজে বাংলা বোঝেন। কলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। "খণ্ডন-ভব-বন্ধন" দিয়ে শুরু। শেষে একটি ভজনগান হল, সেটিও ঐ মহিলারা শুনে

শুনে অতি সুন্দরভাবে সঙ্গে সঙ্গে গাইলেন।

সব শেষে চা, প্যাঁড়া ও 'সিয়েল' বলে এক-রকম নেপালী মিষ্টি—বালার মতো গড়ন, ভাজা মিষ্টি-ডাল দিয়ে তৈরি—খাওয়ালেন আর প্রসাদী ফল। দোকানে দোকানে সাইনবোর্ড দেখে-ছিলাম, "সিয়েল পাওয়া যায়।" তার মানে সিয়েল নেপালের বিখ্যাত মিষ্টি।

সবাই মিলে আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে এসে অনেকক্ষণ কথা বলতে লাগলেন। ছাড়তে যেন ইচ্ছে নেই। রুদ্ররাজ পাণ্ডে বলে দিলেন, "রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, সাধুই হোন আর গৃহীই হোন, কাঠমাণ্ডু এলে যেন তাঁর ওখানেই ওঠেন।" তাঁর জামাতা অর্থমন্ত্রীও এসে সাধুমাকে প্রণাম করলেন।

ঠাকুরের লীলা! এখানে যে এমন একজন ভক্ত রয়েছেন—যিনি ঠাকুরের নাম শুনে বলতে গেলে প্রায় রাস্তা থেকে সমাদরে ঘরে ডেকে নেবেন তা কে জানত? আমরা পরদিনই কাঠমাণ্ডু ছাড়ছি, কাজেই ভদ্রলোকের আপসোস রইল, ভাল করে সাধুসঙ্গ ও ভক্তসেবা হল না। তাঁর ঠিকানা—"Ram Sadan, Round House, Kalimati, Kathmandu।"

কাঠমাণ্ডু শহরটা ঠিক আমাদের দার্জিলিং বা শিলং-এর মতো নয়। রাস্তা কোথাও কোথাও ঢেউখেলানো হলেও মোটামুটি শহরটা সমতল। শহরে ট্রলিবাস চলে। ট্রলিবাস মানে লাইনছাড়া ট্রাম। এমনি বাসের মতো, শুধু বাসের ছাদটা বিজলীর তার ছুঁয়ে থাকে। দোকানগুলো নানারকম লোভনীয় বিদেশী জিনিসে সাজানো। দু-একখানা ফোল্ডিং ছাতা, নকল সোনার গহনা নেওয়া চলে কিন্তু কৃত্রিম তন্তুজ শাড়ি, প্যাণ্টের কাপড়, ক্যাসেট, ইলেকট্রনিক ঘড়ি ইত্যাদির ওপর মোটা ট্যাক্স দিতে হয়—না হলে রাস্তায় চেকপোস্টে ওগুলো বাজেয়াপ্ত অর্থাৎ পুলিশ কর্তৃক ছিনতাই হয়ে যায়। লোভ সামলাতে না পেরে কেউ কেউ ছাতা, গহনা এবং একজন একটা ইলেকট্রনিক ঘড়িও কিনলেন।

কাঠমাণ্ডুর বাড়িঘর বেশিরভাগ কাঠের, কিন্তু তার মধ্যে বেশ শিল্পসুষমা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই কাঠ বেশ কারুকার্যখচিত। ডাকবাক্সের গায়ে লেখা 'পত্রমঞ্জুষা' বেশ কাব্যময়।

অক্টোবর মাসে নেপালে রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে, কিন্তু রোদ উঠলেই রীতিমতো গরম। পাহাড় ঠাণ্ডা, কিন্তু হাওয়া হাল্কা বলে রোদের তেজ বেশি লাগে। মানসসরোবর অত ঠাণ্ডা কিন্তু রোদের নাকি প্রচণ্ড তেজ।

আমরা কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা, গোরখপুর হয়ে কাশী যাব। এপথের সৌন্দর্য আরও মনোহর। মালেখু, গণ্ডকী নদী (যাতে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়) পেলাম। পোখরায় কিছুদিন আগে বন্যায় শ চারেক লোক মারা গিয়েছিল। তার ফলেই সম্ভবতঃ রাস্তা অনেক জায়গায় একপাশে ভাঙা, কোথাও বা অপরদিকে পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে রাস্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। গাড়ি খুব সাবধানে চালাতে হয়। বিকালে পোখরা পৌঁছলাম—যদিও বলা হয়েছিল ১২টায় পৌঁছে যাব। ছোট ছোট পাহাড়-ঘেরা স্বয়ম্ভু সরোবরটিতে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার—কারণ আকাশে মেঘ। পাশেই বারাহী দেবীর মন্দির। পাথরের মূর্তি, আনাড়ী হাতে তৈরি। দরজার দুপাশে পেতলের সিংহ। নেপালে ভাস্কর্যে পাথরের চেয়ে যেন পেতলের ব্যবহারটাই বেশি।

বাসের সারথি রাগারাগি করছিলেন যে, পোখরায় সবাই রাতে বিশ্রাম করে অথচ তাঁকে বিকালেই পোখরা ছাড়তে হবে এবং রাতেও অবিশ্রাম গাড়ি চালাতে হবে। ভ্রমণসংস্থাগুলো লাভের লোভে এমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে থাকেন যে, এই বিপজ্জনক পাহাড়ী রাস্তায় কেবল একজন

চালক সম্বল করে তাকে দিয়ে সারারাত্রি বাস চালিয়েছেন। টাকা তো আগেই নিয়ে নেওয়া হয় যাত্রীদের কাছ থেকে ; তারপরই চেষ্টা—কি করে খরচ কমানো যায়। পোখরায় রাত্রে থাকতে গেলে হোটেল খরচা দিতে হত। তাই সে খরচ বাঁচাতে একজন 'গুড়াকেশ' সারথি সম্বল করে আমাদের চলতে হল—যদিও আইন হচ্ছে দুজন চালক থাকবে। কেদারবদ্রীফেরত কয়েকজন বললেন, এ রাস্তা কেদারবদ্রীর চেয়েও বিপজ্জনক এবং কেদারবদ্রীর পথে রাত্রে গাড়ি চালানো একেবারেই নিষেধ। নেপালের পথে কেন যে এরকম আইন নেই জানি না। মধ্যরাত্রের ক্ষীণ চাঁদের আলোতে দেখতে পাচ্ছিলাম, বাসের চাকা অতি বিপজ্জনক ভাবে গভীর খাদের ধার ঘেঁসে চলেছে। এক চুল এদিক ওদিক হলেই বাস খাদে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। রাত্রে চালকের ঢুলুনি, ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক—একথা মনে হতে আর তাকাতে পারছিলাম না।

সকাল হতে দেখলাম, বন্যার ফলে রাস্তার অবস্থা ভীতিপ্রদ। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এমন যে মোহিত করে রাখে।

সীমান্তে পৌঁছে নেপালী শুল্কবিভাগ নেপালী পুলিস পোস্ট (বেলহিয়া) ভারতীয় পুলিস, ভারতীয় শুল্কবিভাগ, এগুলো পার হতে আমাদের চারঘণ্টা লেগে গেল, যদিও দূরত্ব খুবই কম। এগুলো চেকপোস্ট না ছিনতাইপোস্ট সেটা চিন্তনীয়। এরা জানে, ভারত ও নেপালের মধ্যে যেসব বাস চলাচল করে সেগুলো মূলতঃ চোরাই মাল আমদানী করে ; কাজেই মোটা টাকা ঘুষ আদায় হবে। যাত্রীদের নির্দোষ ফোল্ডিং ছাতা ইত্যাদি আটক করে, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে। নেপালে তবু দু-পাঁচশো টাকা চায় কিন্তু ভারতীয় শুল্কবিভাগ দাবী করলেন এক হাজার টাকা। নইলে বাস ছাড়া হবে না। সাধুমা বললেন, "টাকা আমরা দিতে পারব না।"

তখন মালপত্র ঘাঁটাঘাঁটি ও ভয় শুরু হল। প্রথমেই সন্ন্যাসিনীদের মালপত্র। শেষ পর্যন্ত ওদের কি মনে হল জানি না—ঠাকুর ও মায়ের ছবিকে প্রণাম করে সন্ন্যাসিনীদের কাছে মাপ চেয়ে বলল, "আপনারা চলে যান। কিছু দিতে হবে না।"

পরে আরও জানলাম, ড্রাইভারের কাছ থেকে—প্রথামতো ওদের পাওনা ত্রিশ টাকা ওরা ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

গোরখপুরে পৌছে ডিজেল কিনতে গিয়ে দেখা গেল ডিজেল নেই। মহাবিপদ! রাতটা ওখানেই বাসে বসে কাটাতে হল। পরদিন এক-জায়গায় ডিজেল পাওয়া গেল, কিন্তু সারি বেঁধে সব লরী দাঁড়িয়ে। কি হবে? আমাদের ম্যানেজার এগিয়ে গেলেন পেট্রল পাম্পের মালিকের কাছে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে। দলের কয়েকজন মহিলা ভাবলেন, মেয়েরা গিয়ে বললে হয়তো কাজ হতে পারে। তাই তাঁরা এগোচ্ছিলেন, কিন্তু পাম্পের মালিক হাত নেড়ে বললেন, "আপনাদের আসতে হবে না। আপনারা এতজন মহিলা সাধুমায়ের সঙ্গে তীর্থ করে ফিরছেন! ডিজেল এলে আমি সবচেয়ে আগে আপনাদের দেব।"

সত্যিই ডিজেল এলে সর্বপ্রথম আমরা পেলাম ন্যায্য দামে—এক পয়সাও বেশি চায়নি। ডিজেল নিয়ে কাশী রওনা হলাম। বিশ্বনাথদর্শন করে কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

বেলুড় মঠ

শ্রীমতী হিমানী রায়

সুখ্যাতা কবি।

শ্রীমুখের বাণী
"নরেন লইবে যথা, তথা আমি রহিব আপনি।"
লয়ে মাতৃ-আশীর্বাদ মিলি পুত্রগণ,
আসন পাতিল হেথা করিয়া যতন,
এই সে বেলুড় মঠ!
এ এক অপূর্ব স্থান।
জ্ঞান, ভক্তি কর্ম সমন্বয়ে
আনিল নূতন এক আলোর সন্ধান।
কেন্দ্রবিন্দু হতে দিকে দিকে
চলে নব যজ্ঞের সাধনা,
শিবজ্ঞানে জীবসেবা,
হয় একসাথে সেবা, আরাধনা।
শীর্ণ স্রোতস্বতী নব ভাবধারা
ধরেছে বিপুলকায়,
দেশদেশান্তরে জিজ্ঞাসু অন্তরে
সমাধান এনে দেয়।
ভারতের চির শাশ্বত বাণী,
সহজ সরলভাবে,
শোনালেন যিনি তাঁহারি পরশ
হেথা এলে অনুভবে।
গঙ্গার তীরে পুণ্যপীঠস্থান
তাঁহারি গাহিছে জয়,
শরণাগতের অবারিত দ্বার
মিলিবে পরম অভয়।

ম্যাক্‌লাউড-প্রসঙ্গে

স্বামী বিজয়ানন্দ

আরজেনটিনা রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দ (পশুপতি মহারাজ) শেষবার যখন ভারতে আসেন, তখন বেলুড় মঠে ঠিক ম্যাক্‌লাউডের কক্ষে বসেই একদিন (২২ জানুআরি, ১৯৬৮, স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি) অপরাহ্নে, অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে যে-সব স্মৃতিচারণা করছিলেন বর্তমান প্রবন্ধটি তা থেকেই সংকলিত। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৃগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু), অধ্যাপক শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু এবং স্বামী অব্জজানন্দ। শ্রুতলেখক—শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু।

মিস্ ম্যাক্‌লাউডের কাছ থেকে স্বামীজীর কথা যেমন শুনেছি, তাই বলছি :

"আমি স্বামীজীকে প্রথম দেখি নিউইয়র্কে (ম্যাক্‌লাউড সাল বলেননি।) তখন আমার দিদি মিসেস স্টার্জিসের সঙ্গে মিঃ লেগেটের ভাবের পালা চলেছে। দিদির তখন এক মেয়ে (অ্যালবার্টা) ও এক ছেলে (হলিস্টার)। সেই সময়ে আমি মোহিনীমোহন চ্যাটার্জীর ইংরেজী গীতা পড়তুম। একদিন আমরা দু-বোনে হাডসন নদী দিয়ে নিউইয়র্কে এলুম। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় গেলুম। বক্তৃতার বিষয় ছিল গীতা। একশোর উপর লোক, সর্বত্র ছড়িয়ে বসে। স্বামীজী বক্তৃতা করছেন, হঠাৎ চোখ তুলে দেখি —সেই আমার প্রথম অত্যাশ্চর্য দর্শন—(নিজের চোখ দেখিয়ে) এই চোখ দিয়ে দেখলুম, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতার কথা বলছেন। আমি আচ্ছন্ন—অভিভূত। ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি কী বলছেন মনে নেই—সেই মূর্তিই দেখে যাচ্ছি—কী বলছেন কিছু খেয়াল নেই —তাকিয়েই আছি।—

"বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর মিঃ লেগেট, যিনি পরে আমার ভগিনীপতি হবেন, লাফ দিয়ে চেয়ার টপকে স্বামীজীর শেকহ্যাণ্ড (করমর্দন) করে বললেন :

'Swamiji, when are you coming to dine with us?' (স্বামীজী, কবে আপনি আমাদের সঙ্গে আহার করবেন?)

স্বামীজী : 'Why not to-night?' (আজ রাত্রে নয় কেন?)

স্বামীজী তখনও তাঁকে চিনতেন কিনা জানি না।"

বুড়ি (ম্যাক্‌লাউড) এই বারান্দায় বসে কথা বলতেন। উনি মুড়ি ও দুধ খেতে ভালবাসতেন। অনেক সময়ে তাই খেতে খেতে কথা বলতেন। মনে পড়ছে, একবার আমাকে বলছিলেন :

"প্যারিসে আমার বোনের সঙ্গে মিঃ লেগেটের যখন বিয়ে হয় তখন স্বামীজীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেকথা হয়তো তুমি বইতে পড়েছ। তার পরে স্বামীজী আবার আমেরিকায় ফিরে আসেন। মাঝে মাঝে ক্যাটস্‌কিল মাউন্‌টেনে কয়েকদিনের জন্য লেগেটের আতিথ্য নিতেন। নিজেই নিমন্ত্রণ নিতেন : 'When am I coming?' (কবে আসছি আমি?)

"সেখানকার দু-এক দিনের ঘটনা :

"একদিন স্বামীজী সকালে ব্রেকফাস্টের আগে ছোট একটি সংস্কৃত গীতা হাতে করে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন। আমি পিছনে আছি; আমাকে কাছাকাছি দেখে বললেন, 'Joe, I am going to sit under that (দেখিয়ে দিয়ে) Pine tree and read Bhagabat Gita. See that, breakfast will be sumptuous to-day.' (জো, আমি ঐ পাইন গাছটির তলায় বসতে

যাচ্ছি এবং ভগবদ্গীতা পড়ব। দেখো, আজকের সকালের জলখাবারটি যেন বেশ ভাল হয়।) আধ ঘণ্টা বাদে আমি ঐ পাইন গাছের নিচে গিয়ে দেখি, স্বামীজী স্থির হয়ে বসে আছেন—গীতা হাত থেকে পড়ে গেছে এবং বুকের জামা ভেজা। কাছে গিয়ে দেখি, তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে না। ভয় পেয়ে কেঁদে ফেললুম—স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন। সেখানে চীৎকার করলুম না—ছুটে গিয়ে আমার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে বললুম—'Come quick, Swami Vivekananda has left us.' (তাড়াতাড়ি এস, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।) কথা শুনে দিদি চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল; আমার ভগিনীপতির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—তবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছিলেন না। স্বামীজীকে ঐ অবস্থায় আমার দেখা, এবং এঁদের আসার মধ্যে সময় কেটেছে ৭-৮ মিনিট। তখনও স্বামীজী একই-ভাবে স্থির। আমার ভগিনীপতি ফ্রান্সেস দেখে বললেন: 'He has a trance, I will shake him up.' (তাঁর ভাব হয়েছে—আমি তাঁকে একটু ঝাঁকানি দিচ্ছি।) তাতে আমি চেঁচিয়ে বললুম: 'Never do that.' (না না, তা করো না)। স্বামীজী বলেছিলেন, গভীর ধ্যান হলে আমার দেহ যেন কেউ না ছোঁয়। আরও আন্দাজ মিনিট পাঁচেক কাটার পরে স্বামীজীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অল্প অল্প শুরু হল। তাঁর চোখ পূর্ব থেকেই অর্ধেক খোলা ছিল—এখন আরও খুলতে লাগল। ঐ অবস্থায় স্বামীজী (Swamiji) যেন নিজেই নিজেকে বলছেন: 'Who am I, where am I!' (কে আমি! কোথায় আমি!) এইভাবে তিনবার বলার পরে স্বামীজীর চোখ সবটা খুলল। তখন তিনি যেন বিশেষ লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের অবস্থা দেখে বললেন: 'I am sorry to frighten you all. But I have this state of consciousness now and then. I shall not leave my body in your country. Betsy, I am very hungry, let's hurry.'" (আমি দুঃখিত, তোমাদের সকলকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার এই রকম অবস্থা যখন তখনই হয়। তোমাদের দেশে আমি শরীর ছাড়ব না। খুব ক্ষিদে পেয়েছে—তুমি তাড়াতাড়ি কর।)

মিস ম্যাক্‌লাউডকে আমরা ট্যান্টিন বলতাম। আন্টি>টান্টি/তাস্তে জার্মান>ট্যান্টিন। ম্যাক্‌লাউড নিজেই এটা করেন। ট্যান্টিন আর একদিনের কথা বলেছিলেন, উনি নিজে সে-কাহিনী জেনেছিলেন হলি ও ফ্রান্সেসের কাছ থেকে। যাহোক, আমাকে ট্যান্টিন বলেন:

"স্বামীজী হলিকে (হলিস্টার) নিয়ে ফ্রান্সেসের গলফ্‌ কোর্সে বেড়াতে গেছেন। ফ্রান্সেসের প্রাইভেট গলফ্‌ কোর্স ছিল—মাঝারি আকারের, কিন্তু অতি সুন্দর, সুরক্ষিত। সেখানে ভাল ভাল খেলোয়াড়রা আমন্ত্রিত হয়ে খেলতে আসতেন। ওটা Nine hole কোর্স (অর্থাৎ নাতিবৃহৎ আকারের)। স্বামীজী হলিকে দূরে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—'ওটা কি—ওখানে ঐ পতাকাটা ফট্‌ফট্‌ করে উড়ছে কেন?'

"হলি: 'স্বামীজী, এটা গলফ্‌ কোর্স। এখান থেকে ওখানে—তোমাকে স্টিক এনে দেখাচ্ছি—স্টিক দিয়ে বল পিটিয়ে গর্তে ফেলতে হবে।'

"হলি স্টিক আনলে সেটি নাড়াচাড়া করতে করতে স্বামীজী বললেন: 'Holli, how many strokes are needed to put the ball there?' (হলি, বলটিকে কতবার পিটতে হয়, ওখানে ফেলতে?)

"হলির বয়স তখন দশ এগারো বছর। হলি বলল: 'I have heard, it needs about

seven strides.' (আমি শুনেছি, প্রায় সাত কদমের মধ্যে যতটা হয়, ততটাই দরকার হয়।)

"স্বামীজী বললেন: 'Holli, let's have a bet. How much money you have in your pocket?' (হলি, বাজী ধর। তোমার পকেটে কত টাকা আছে?)

"হলি একটা হাফ ডলার বার করে বলল: 'This is what I have.' (এই মাত্র, যা আমার কাছে আছে।)

"স্বামীজীও পাতলুনের পকেট থেকে একটি ডলার বের করে বললেন: 'If I lose, the dollar is yours, and if I gain you must part with your half dollar.' (যদি আমি হারি, এই ডলারটি তোমার হবে, আর যদি আমি জিতি তাহলে তোমার আধ ডলারটি আমাকে দেবে।)

"এই সময়ে ফ্রান্সেস সেখানে উপস্থিত—ব্যাপার কী জানতে চাইলেন।

"স্বামীজী বললেন: 'This is between me and Holli.' (এটা হলি ও আমার দুজনের মধ্যে।)

"ফ্রান্সেস জানতে চাইলেন, 'What was the great and deep subject between these two people!' (কী এমন বিরাট ও গভীর বিষয়—এই দুজনের মধ্যে!)

"স্বামীজী হেসে—'I am going to take half dollar from Holli.' (আমি হলির কাছ থেকে অর্ধ ডলারটি নিতে যাচ্ছি।)

"হলি লাফাতে লাফাতে বলল: 'Swami, you have lost.' (স্বামীজী, আপনি হেরে গেছেন।)

"তখন ফ্রান্সেস তাগিদ দিয়ে বলল: 'But let me know what is the bet?' (কিন্তু আমাকে বলুন কিসের জন্য এই বাজী?)

"স্বামীজী বললেন: 'If you want to know, put on your money. I have told Holli that in one stride I would put the ball in the hole.' (যদি তুমি জানতে চাও, আগে তোমার টাকা বের কর। আমি হলিকে বলেছি যে, আমি বলটিকে এক কদমেই ফেলব।)

"ফ্রান্সেস: 'Sometimes I bring very good players here, but they can never make it under four strides. And you want to do it in one? Is it mesmerism or hypnotism?' (আমি কখন কখন এখানে ভাল খেলোয়াড়দের নিয়ে আসি, কিন্তু তারা কেউ চার কদমের কমে ফেলতে পারে না। এবং আপনি তা একবারেই ফেলবেন? এটা জাদু নাকি?)

"স্বামীজী (হাসতে হাসতে): 'Never mind, what is your bet?' (আচ্ছা, কিছু মনে করো না। তোমার বাজী কত বল?)

"ফ্রান্সেস পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে: 'Here's ten dollar.' (এই দশ ডলার।)

"স্বামীজী বললেন: 'Holli, bring out your half dollar. I am putting my dollar, and Frances, bring out your ten. I am going to rob you of all your money.' (হলি, তোমার আধ ডলার বের কর। আমার ডলারটি রাখছি, আর ফ্রান্সেস, তোমার দশ ডলার বের কর। তোমাদের সব পয়সা আমি লুটে নিচ্ছি।)

"এই কথা বলে স্বামীজী যেখানে পতাকা নড়ছে সেদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর কোটের আস্তিন গুটিয়ে হলিকে বললেন: 'Holli, be near the hole, but not very near—the ball is going flying.' (হলি, গর্তের কাছে যাও, কিন্তু খুব কাছে নয়,-

এবার উড়ে যাচ্ছে।)

"হলি শুনেই ছুটল। ফ্রান্সেস মজা দেখছে

স্বামীজী আরও দু-তিনবার তাল করে দেখে দেখে নিয়ে—He hit the ball. It made an arch and as he said just got into the hole. (তিনি বলে আঘাত করলেন। অমনি ধনুকের মতো বেঁকে এবং তিনি যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনি গর্তে গিয়ে পড়ল।)

"হলি বলটা কুড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল: 'Swami, I have lost! Swami, I have lost!' (স্বামীজী, আমি হেরে গেছি! স্বামীজী আমি হেরে গেছি!)

"আমার ভগিনীপতি স্তম্ভিত হয়ে বললেন: 'Swami, I have been told that you are a great Yogi. Has your yoga got anything to do with it?' (স্বামীজী, আমি শুনেছিলাম যে, আপনি একজন মহাযোগী। এতে আপনার যোগের কোন তুকতাক আছে কি?)

"স্বামীজী: 'I don't use yoga as you have thought for this trifling thing. What I did I will tell you in two sentences. I measured the distance by sight. I know perfectly the strength of my biceps, and told my mind that I would be richer by ten dollars and a half. And I won.' (এই তুচ্ছ ব্যাপারে, যেমন তুমি ভাবছ—আমি যোগশক্তি ব্যবহার করি না। যা করেছিলাম তা তোমাকে দুটি কথায় বলছি। চোখে দেখেই আমি দূরত্বটা বুঝে নিলাম। আমার নিজের হাতের মাংসপেশীর শক্তি আমি ভালই জানি,—আমি আমার মনকে বললাম যে, আমাকে সাড়ে দশ ডলারের ধনী হতে হবে। আর আমি জয়ী হলাম।)

"এই ঘটনা, ফিরে এসেই ফ্রান্সেস আমাদের বলেছিল।"

*

"আর একদিনের ঘটনা। পুরুষদের ড্রইংরুমে তখন কেউ থাকার কথা নয় জেনে (সাধারণভাবে কেউ থাকলে নক্ না করে ঢোকা রীতিবিরুদ্ধ) ঢুকে পড়েছি, ভিতরটা আবছা; দেখি যে,—অবশ্য আমার দেখার ভুল—ফ্রান্সেসকে ভূমিতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর স্বামীজীর মাথা তলার দিকে, পা উপর দিকে। My child, what happened was this—Swami was walking on his hands and told Frances to bring a chair and stand on his legs. Just at that moment without knocking I entered. (ঘটনাটি কি হয়েছে শোন বাছা। স্বামীজী নিজের হাতে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন এবং ফ্রান্সেসকে বললেন একটি চেয়ার নিয়ে আসতে এবং তাঁর পায়ের উপর তাকে দাঁড়াতে। ঠিক এমন সময়ে দরজায় টোকা না দিয়ে আমি ঘরে ঢুকে পড়েছি।) (মহিলা উপস্থিত, এধারে ঐ রকম খেলা দেখাবার জন্য পোশাক বিস্রস্ত, প্যান্ট হাঁটুর কাছে গুটিয়ে এসেছে, অবস্থাটা লজ্জাজনক)। As soon as I entered Swami kicked Frances and I found him lying flat—his backbone almost broken. (যেই আমি ঢুকেছি, তক্ষুণি স্বামীজী লাথি মেরে ফ্রান্সেসকে ফেলে দিলেন এবং আমি দেখলাম বেচারা চিৎপাত হয়ে মাটিতে শুয়ে রইল—মনে হচ্ছিল তার শিরদাঁড়া বুঝি ভেঙেই গেছে।)

"স্বামীজী গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর-স্বরে বললেন: 'This is men's drawing room. Why didn't you knock?' (এটা পুরুষদের বসবার ঘর। তুমি দরজায় ঘা দাওনি কেন?) তারপরে একটু থেমে: 'Joe, let us

pick up what is left of Frances'." (জো, এস তো ফ্রান্সেসকে তুলে দেখি তার কি হল।)

*

ম্যাক্‌লাউড সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি কিছু বলি শোন :

একদিন সন্ধ্যেয় কিছু জপ-তপ করার পরে বুড়ির ঘরে এলুম। দেখি, তিনি usual মোড়ায় বসে নেই। তাঁর খোঁজে সমস্ত বারান্দা ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম।

পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা কুলুঙ্গি; সেখানে সোমানন্দ স্বামীর (স্বামীজীর এক শিষ্য) পাঠানো একটা ছোট্ট কাঠের মন্দির ছিল। বাঙ্গালোর জেলের কয়েদীর তৈরি। তাতে ফরাসী শিল্পী লালীক্‌-এর তৈরি ক্রিস্টালের স্বামীজীর পরিব্রাজক মূর্তি। সেখানে দেখি—দেখে একেবারে স্তম্ভিত—তিন-চারটে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ট্যান্টিন স্বামীজীর আরতি করছেন—কিছুক্ষণ ঘোরাবার পরে ধূপগুলি অতি যত্নে ধূপদানিতে রেখে আস্তে আঙুল দিয়ে স্কার্টের প্রান্ত একটু তুলে নাচতে আরম্ভ করলেন। অভিভূত হয়ে দেখছি, নাচ মিনিট তিন-চার চলল, তারপর ঘুরেই আমাকে দেখে খট্‌খট্‌ করে এগিয়ে এসে বললেন, চোখে জল : 'Who cares about that nigger!' (ঐ কৃষ্ণকায় লোকটিকে কে তোয়াক্কা করে!) আমিও জবাব দিলুম, 'Yes, who cares!' (হাঁ, কে তোয়াক্কা করে!) তারপর ট্যান্টিন জীবনে সেই প্রথম আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় অজস্র অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন; তারই মাঝে বললেন : 'My child, He is God. Hear me well. He *is* God, not *was*.' (বাবা, তিনি ভগবান। ভাল করে আমার কাছ থেকে শুনে রাখ—তিনিই নিত্যকালের ভগবান, ভগবান ছিলেন, তা নয়।) বলেই খুব ধীরে তাঁর মোড়ায় বসে বললেন : 'Let's go to the Abbot' (চল, মঠাধীশের কাছে যাই। (স্বামী শিবানন্দ—তাঁকে উনি ঐ কথা বলতেন)। তারপর উঠে মহাপুরুষ-জীর ঘরে সটান গিয়ে তাঁর খাটে বসে পড়লেন পা ঝুলিয়ে। আমি দরজার বাইরে থেকে এইটুকু শুনলুম : 'My dear Abbot, this child of ours to-night has taken out a great secret from me.' (দেখুন মহারাজ, আমাদের এই ছেলে আজ রাত্রে আমার এক দারুণ গোপন ব্যাপার ফাঁস করেছে।) আমি তখনি সরে পড়লুম।

উপেন মহারাজ (বিমুক্তানন্দ) তখন অদ্বৈত আশ্রমে। শ্রদ্ধেয় যোগেশ মহারাজ (স্বামী অশোকানন্দ) বিমুক্তানন্দকে সানফ্রান্সিসকোতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। ট্যান্টিনের তা ইচ্ছা নয়। বিমুক্তানন্দকে অদ্বৈত আশ্রম থেকে আসতে বললেন মঠে। সন্ধ্যের সময় এলেন। দেখেই ট্যান্টিনের প্রথম প্রশ্ন : 'How shall I call you?' (তোমাকে কি বলে ডাকব?)

বিমুক্তানন্দ : 'Call me Upen.' (উপেন নামে ডাকবেন।)

ট্যান্টিন : 'I am watching you. Don't go to the West, I want you to do the grand work of the Swami. When shall you start his big educational scheme?' (আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি। তুমি পাশ্চাত্যে যেও না। আমি চাই তুমি স্বামীজীর বড় কাজ কর। কবে তুমি আরম্ভ করবে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার কাজ?)

উপেন নম্র হয়ে বললেন : 'But I am in charge of the Advaita Ashrama.' (কিন্তু আমি যে অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছি।)

ট্যান্টিন—'When will your term be over?' (কবে তোমার সে দায়িত্ব শেষ হবে?)

উপেন: 'It may be within a year.' (বছর খানেকের মধ্যে মনে হয়।)

ট্যাপ্টিন: 'Too long, I shall request the Abbot about it.' (সে তো অনেক কাল। আমি অধ্যক্ষকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে।)

উপেন: প্রভু মহারাজকে লিখুন, উনিই অদ্বৈত আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট।

ট্যাপ্টিন: 'I am going right after talking to the boss of your boss. For the West, fools like Vijoy will go. (আমি ঠিক করছি তোমার প্রভুরও প্রভু যিনি, তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর। বিজয়ের মতো বোকা ছেলেরাই পাশ্চাত্যে যাবে।) তুমি স্বামীজীর ঐ কাজ করবে।' এই বলে আমাদের দুজনকে মুড়ি খেতে দিলেন। নিজে দুধ খেয়ে নিলেন। তারপর চললেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে, আমরা দুজনে পিছনে। উপেন চিন্তিত। অত গুরুভার! বুড়ি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে বললেন, 'Abbot, how soon can you release Upen?' (মহারাজ, কত তাড়াতাড়ি আপনি উপেনকে ছাড়তে পারবেন?)

মহাপুরুষ মহারাজ: 'How soon you want him?' (কত শীঘ্র তুমি চাও?)

ট্যাপ্টিন: 'From to-morrow, if possible. Let him come and stay at Belur Math. I am going to Delhi and talk with the Viceroy. He must help us.' (যদি সম্ভব হয় কাল থেকেই। সে এসে বেলুড় মঠেই থাকুক। আমি দিল্লী যাচ্ছি এবং সেখানে বড়লাটের সঙ্গে কথা বলব। তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।)

এই হল সারদাপীঠের পত্তনের পটভূমিকা।

শিল্প-সাধক নন্দলাল

ডক্টর বিমলকুমার দত্ত

প্রাক্তন প্রধান গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক, বিশ্বভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

শিল্পই জাতির চেতনা ও চিন্তাধারার শাশ্বত স্বাক্ষর। রাজনৈতিক বিপর্যয় কাহিনী, কূটনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের জোয়ার ভাটার ইতিবৃত্ত বিশ্বমানসে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না—পট পরিবর্তনের সঙ্গে তাদেরও স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু জাতীয় শিল্পধারা চিরন্তন সুরে দেশবাসীর অন্তরের মর্মকথা, ধ্যানধারণা ও সাধ্যসাধনার কাহিনী উদ্ভাসিত করে।

অধ্যাত্মশক্তি ও অধ্যাত্মবাদ প্রকাশ ভারতীয় শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও শিল্পস্রোতের সঙ্গে মিশরের ও চীনের সভ্যতা ও শিল্পধারার মিলনের ফলে পৃথিবীর শিল্প ও সভ্যতার ক্ষেত্রকে উর্বর ও বীর্যশালী করে তুলেছে।

প্রাচীন মিশরীয় শিল্পের আদর্শ ছিল শিল্পকে মৃত্যুঞ্জয়ী ও চিরস্থায়ী করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা; গ্রীক শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল নকলনবিশীর চূড়ান্ত পর্যায়ে বাহ্য সৌন্দর্যের দীপকে বস্তুতান্ত্রিকতার বিস্তার করে সুন্দরের পূজা করা। কিন্তু ভারতের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতের সাধনা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রবেশ—দেহমনের অতীত যে আধ্যাত্মিক সত্তা—সেই সত্তার বিকাশ ও আরাধনা। যে আধ্যাত্মিক শক্তি ভারত-শিল্পকে এই উচ্চ আসন দান করেছে

—তার প্রস্রবণ ও প্রধান সঞ্জীবনী ধারা হচ্ছে—সত্য, শিব ও সুন্দরের বাণী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে ভারত পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে জর্জরিত হয়ে ওঠে। ভারতীয় ধ্যানধারণা সেদিন প্রায় কেন্দ্রচ্যুত হয়ে তার বহুযুগ-সঞ্চিত আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে হারাতে বসেছিল—চটকদারী অশুভ প্রভাব সেদিন ভারতের যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গল ও যা কিছু পবিত্র সব কিছুকেই গ্রাস করতে চাইছিল।

জাতীয় জীবনের সেই মহাসন্ধিক্ষণে অবনীন্দ্র-নাথের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যাঁরা শিল্পে নবজাগরণের আন্দোলনকে সার্থক ও পূর্ণ করে তোলেন—শিল্পাচার্য নন্দলালের নাম তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম মনে হয়। সেদিনের সেই জীবনমরণ সংগ্রামে নন্দলাল ছিলেন তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সহায়ক—বিশ্বস্ত ভরসা।

মুঙ্গের-খড়্গপুরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নন্দলালের জন্ম। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নন্দলাল শিক্ষা সমাপনান্তে শান্তিনিকেতন কলাভবনে স্থায়িভাবে যোগ দেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বর্ধনা করে লেখেন :

"তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতার আশিস্ মন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে—
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে।
চির-সুন্দরে করগো তোমার
রেখা বন্ধনে বন্দী
শিব জটাসম হোক্ তব তুলি
চির-রস নিষ্যন্দি।"[১]

প্রাচীন ভারতীয় সাধকদের ন্যায় নন্দলাল ছিলেন একান্ত নিষ্ঠা, কঠিন সংযম ও নিরাসক্ত কর্মযোগের সেবক ও পূজারী। সে-কারণেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল সুর যে সরলতা, আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ—তারই অপরূপ মূর্ছনা দেখা যায় তাঁর শিল্পে।

নন্দলালের জীবন-ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর শিল্পী-জীবনের উপর অবনীন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যেমন সমুজ্জ্বল তেমনি তাঁর অন্তর্জীবন আলোকিত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের স্নিগ্ধ ভাব-জ্যোতিতে। শেষ জীবনে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শও তাঁকে প্রভূত প্রভাবান্বিত করেছিল। তাঁর সমগ্র শিল্পধারাই উক্ত সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাধক-শিল্পী তাঁর তুলির স্পর্শে মানবদেহের বহির্মুখী বাহ্য-সৌন্দর্যকে পূজা না করে, বিদেশী শিল্পের প্রভাব ও কোলাহলের মধ্যে আত্মহারা না হয়ে, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় সত্যকে এবং চিরসুন্দরকে জাগিয়ে তুলেছেন। বহুদিন পরে ঐ-সকল শিল্পকর্মের মধ্যে ভারত ফিরে পেল তার অন্তরাত্মাকে। সেদিন দিকে দিকে মঙ্গলধ্বনি হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, সেদিন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে এক মহামঙ্গলের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল।

শিল্পী নন্দলালের বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত চিত্রাবলী; শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলা চিত্র; পৌরাণিক ও অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র এবং সাধারণ আদিবাসী মানুষের সহজ সরল প্রেম-ভালবাসা, হাসিকান্না ও আশা নিরাশার চিত্রধারা ভক্তিস্রোতের মাধুর্যে, ধ্যানের গম্ভীর রসে, সংযমের সুস্থিরতায়

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৩ (নন্দলাল সংখ্যা)

এবং সত্যের ঋজুতায় ও সারল্যের অভিব্যক্তিতে অপূর্ব সম্পদ হয়ে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন, কৃষ্ণ-সুদামা, সাবিত্রী-যম, সতী, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারী, যম ও নচিকেতা, একলব্যের গুরুদক্ষিণা, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি চিত্র তাঁর আত্ম-সমর্পণ, জীবনানুভূতি ও একান্ত সংযত চিত্তের পূর্ণ পরিবেশ-প্রসূত।

একবার নন্দলাল রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকছেন —পিছনে এসে দাঁড়ালেন ভগিনী নিবেদিতা। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন বৃন্দাবনের সেই অপরূপ প্রেমিকযুগলকে, কিন্তু কৈ, তাঁদের নয়নে স্বর্গীয় সুষমা নেই তো, দ্যুলোকের দিব্যজ্যোতিতে দীপ্ত হয়নি তো সুঠাম শ্যাম তনুবর। নিবেদিতা শুধালেন, "কার ছবি আঁকছ, আর্টিস্ট?" "রাধা-শ্যামের," নন্দলাল বললেন। "তা তো নীলাভ অঙ্গলাবণ্য দেখেই বুঝেছি, কিন্তু এতে যে যৌবন-সুলভ আত্মোচ্ছ্বাস তোমার। পঞ্চাশ অতিক্রম না করে রাধাকৃষ্ণের লীলা আর এঁকো না, বুঝলে?" নন্দলাল সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।[২]

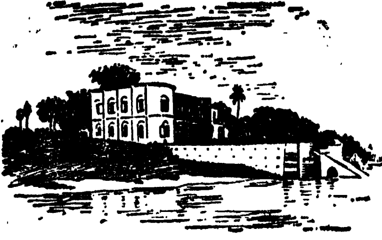
নন্দলাল কেবলমাত্র যে ভারতীয় ধারা ও গতির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন—সেকথা সত্য নয়। কাল ও দূরত্বের ব্যবধান না রেখে তিনি সব শিল্পভূমিতে যাতায়াত করেছেন।···সকল তীর্থক্ষেত্র থেকে তিনি সঞ্চয় করে এনেছেন মুঠো মুঠো ধুলো, কিন্তু ভারতীয় ভাবধারা থেকে কখনও ভ্রষ্ট হননি। আধুনিক ভারতীয় শিল্পস্রোত সাধনা ও সংযমের অভাবে ক্রমশঃ গতি, তেজ ও আবর্ত হারাতে বসেছে। ভারতের আদর্শ ও সাধনার জাত সোনাকে সরিয়ে কেমিক্যাল সোনা চলনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু কেন এমন হল? এর কারণ হচ্ছে একদিকে সাধনার অভাব, ভোগের স্পৃহা-বৃদ্ধি ও সংযমের দৈন্য আজ শিল্পীদের জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সত্যের ইঙ্গিত পাই কবিগুরুর নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র থেকে—

"প্রথমে দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর (নন্দলালের) সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তা হলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চা-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্প-সাধকদের তপস্যার সম্মুখে রজতনূপুর নিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তি-বর দেন। সেই মুক্তি-লোকে বিরাজ করেন—নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।"[৩]

২ ঐ, পৃঃ ২১ ৩ ঐ, পৃঃ ৭

বিজ্ঞপ্তি

গত মাঘ মাস থেকে উদ্বোধনের নিয়মাবলীতে দেওয়া হচ্ছে যে, কেবলমাত্র বার্ষিক গ্রাহক হতে হবে। তা সত্ত্বেও অনেকেই ভুলবশতঃ ষাণ্মাসিক গ্রাহক হওয়ার জন্য চাঁদা পাঠাচ্ছেন। সেইজন্য সবার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, বার্ষিক গ্রাহকের ১৮'০০ টাকা পাঠাতে হবে, ষাণ্মাসিক গ্রাহকের কোন চাঁদা গ্রহণ করা হবে না। যাঁরা ইতিমধ্যে ষাণ্মাসিক হিসাবে টাকা পাঠিয়েছেন, তাঁরা বাকী টাকা অবিলম্বে পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক তালিকাভুক্ত হবেন—এই অনুরোধ।—সঃ



নানা প্রসঙ্গে

চরন্তন কাহিনী

শরণার্থীর প্রাণ রক্ষা রাজধর্ম

পুরাকালে শিবিবংশীয় রাজা উশীনর যজ্ঞ করে কীর্তিতে ইন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর যেমন ছিল ধর্মজ্ঞান, তেমনি দানধ্যানে তাঁর সমতুল তখন পৃথিবীতে কেউ ছিলেন না। তাঁর যশঃকথা সবার মুখে মুখে। তখন একদিন ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁর ধর্মবুদ্ধি পরীক্ষার জন্য যথাক্রমে শ্যেন ও কপোতের ছদ্মবেশে রাজধানীতে তাঁর যজ্ঞ-ভূমিতে গিয়ে হাজির হলেন।

শ্যেন পাখির ভয়ে শরণাগত হয়ে কপোত উড়ে এসে রাজা উশীনরের উরুর উপর বসে। সেখানে শ্যেন উপস্থিত হয়ে বলল: 'রাজন্! এ কপোত আমার ভক্ষ্য। আপনি ধর্মলাভের জন্য একে আশ্রয় দেবেন না, একে ছেড়ে দিন।' উশীনর শান্ত কণ্ঠে বললেন: 'পক্ষিরাজ! তোমার ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য এ আমার কাছে শরণার্থী। ভীত এই পক্ষীকে তোমার কাছে সমর্পণ করা আমার ধর্ম নয়। দেখ, তোমার ভয়ে শঙ্কিত এই কপোত কেমন কাঁপছে। এই অবস্থায় একে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। গো-ব্রাহ্মণ হত্যায় যে পাপ হয়, শরণার্থীকে পরিত্যাগ করায় সেই একই পাপ হয়ে থাকে।'

শ্যেন বলল: 'হে মহীপাল! আমি ক্ষুধার্ত। আমার আহার্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে এক্ষুণি আমার প্রাণ ত্যাগ হবে। আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবার মৃত্যু হবে। আপনি এই কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য বহু প্রাণীর জীবন বিনষ্ট করবেন।

'হে রাজন্! যে ধর্ম অন্যের ধর্মকে বাধা দেয় তা ধর্ম নয়—কুধর্ম। কিন্তু যে ধর্ম অন্যের ধর্মের বিরোধী নয় তাই প্রকৃত ধর্ম। অতএব আপনি ধর্মাধর্ম নির্ণয় করার জন্য পাপ ও পুণ্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিষয়ে দৃষ্টি রেখে বিচার করবেন। কপোতকে আপনি আমার কাছেই সমর্পণ করুন।'

উশীনর জবাব দিলেন: 'পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ধর্ম-বিষয়ে তোমার অজানা কিছু নেই। কিন্তু তুমি আমাকে কি করে এই শরণার্থীকে ত্যাগ করতে বলছ? তোমার প্রয়োজন আহারের। তুমি অন্য কিছু মাংসদ্বারা তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পার। আমার রাজ্যে গরু, মহিষ, শূকর, মৃগ প্রভৃতি প্রচুর আছে, তুমি যার মাংস ইচ্ছা কর তা গ্রহণ করতে পার।' উত্তরে শ্যেন বলল: 'মহারাজ! আমি কোন পশুর মাংস খাই না। বিধাতা আমার ভোজনের জন্য এই কপোতকেই বিধান করেছেন। আর শ্যেন কপোতের মাংস খায়—এই তো চিরকাল চলে আসছে। সুতরাং আপনি একেই দিন আমাকে।'

রাজা উশীনর বললেন: 'পক্ষিন্! আমি তোমাকে শিবিদেশের এই সমৃদ্ধ সমগ্র রাজ্য দান করব অথবা তুমি যদি অন্য কিছু চাও তাও

তোমাকে দেব। কিন্তু এই শরণার্থীকে তোমাকে দিতে পারব না। পক্ষিরাজ! তোমাকে এমন কি প্রদান করলে, এই কপোতকে দিতে হবে না? তাই তুমি আমাকে বল।' তাতে শ্যেন বলল: 'হে রাজন্! কপোতের প্রতি যদি আপনার এমনই স্নেহ হয়ে থাকে, তবে কপোতের পরিবর্তে আপনার শরীর থেকে মাংস কেটে আমাকে দিন। মাংস যখন কপোতের ওজনের সমান হবে তখন আপনি তা আমাকে প্রদান করবেন। আমি তাতেই সন্তুষ্ট হব।' এই কথা শুনে উশীনর বললেন: 'পক্ষিন্! তুমি যে কপোতের পরিবর্তে আমার মাংস চাইলে—এ আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ। আমি এক্ষুণি আমার দেহমাংস কপোতের সমপরিমাণ তুলাদণ্ডে ওজন করে তোমাকে দিচ্ছি।'—এই বলে রাজা উশীনর তুলা-দণ্ডের একটি পাল্লায় কপোতকে বসিয়ে অপর পাল্লায় নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে কেটে দিতে থাকলেন। কিন্তু তাঁর দেহ থেকে যতই মাংস কেটে দিচ্ছেন কপোত ততই তা থেকে ভারী হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু কিছুতেই যখন কপোতের ওজনের সমান মাংস তাঁর শরীর থেকে কেটে দেওয়া যাচ্ছে না, তখন অগত্যা তিনি নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে বসলেন। এই সময় শ্যেন সহর্ষে ঘোষণা করল: 'হে রাজন্! তুমি যথার্থই ধর্মজ্ঞ। তোমার ধর্মবুদ্ধিকে পরীক্ষা করার জন্যই আমি ইন্দ্র আর এই কপোত অগ্নি, এই যজ্ঞভূমিতে এসেছিলাম। হে রাজন্! সামান্য এক কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য তুমি নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে দিয়েছ, এতে তোমার উজ্জ্বল কীর্তি সমস্ত লোকে সমাদৃত হবে।'

ভারতের চিরন্তন একটি আদর্শ—শরণার্থীর প্রাণ রক্ষা করা নিজ জীবনের বিনিময়েও।

[মহাভারতের বনপর্ব থেকে।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

আমাদের ধর্ম

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুআরি—শনিবার ছিল। তিব্বতের ধর্মগুরু মহামান্য দালাই লামা বেলুড় মঠ পরিদর্শনে এসেছেন। সঙ্গে মাননীয় পাঞ্চেন্ লামাও ছিলেন। দালাই লামা তিব্বতের সর্বেসর্বা—রাষ্ট্র অধিনায়কও বটে। পাঞ্চেন্ লামা ঠিক তাঁর পরেই—যেন মন্ত্রী। ওঁদের সঙ্গে দলবল প্রচুর—সংখ্যায় জন চল্লিশেক। তা ছাড়া ভারত ও তিব্বত সরকারের পদস্থ ব্যক্তিরা তো আছেনই। দালাই লামা ও পাঞ্চেন্ লামা মঠে আসছেন শুনে—প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়েছিল সেদিন সকাল থেকে। বেলুড় মঠে প্রায় আট হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিল সম্মানিত অতিথি-দ্বয়কে দর্শন করতে। অভ্যর্থনার আয়োজনও হয়েছিল খুব। মঠের সাধুরা মন্দিরের প্রবেশ পথের দুধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সকাল ৯টায় দালাই লামা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মঠভূমিতে এসে পৌঁছোছিলেন—অমনি স্কুলের ছেলেদের ব্যাণ্ড বেজে উঠেছিল তাঁদের স্বাগত জানাতে। মঠের তরফ থেকে সর্বাগ্রে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন তদানীন্তন সঙ্ঘ-সচিব স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। অতিথিরা প্রথমেই গেলেন বড় মন্দিরে—গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে দালাই লামা ও পাঞ্চেন্ লামা তাঁদের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহের পাদ-মূলে। তিব্বতীয় প্রথানুযায়ী—শ্রীবুদ্ধকে যেভাবে ভক্তি-অর্ঘ নিবেদিত হয়, ঠিক সেই রীতিতেই

তাঁরা নিজ হাতে দুখানি শ্বেত উত্তরীয় শ্রীরাম-কৃষ্ণকে উৎসর্গ করলেন—পরে করজোড়ে মাথা নত করে বহুক্ষণ শ্রীমূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান রইলেন। উভয় লামাকেই, বিশেষ করে দালাই লামাকে তখন বড়ই সুন্দর সৌম্যভাবাপন্ন দেখাচ্ছিল।

অতিথিদ্বয় শ্রীমন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন অতি ধীর সন্তর্পিত পদক্ষেপে। ক্রমে তাঁরা গেলেন মঠবাড়িতে,—দোতালায় উঠে গিয়ে স্বামীজীর শয়নকক্ষের দরজার সামনে। সেখানেই মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল পূজ্যপাদ মঠাধীশ স্বামী শঙ্করানন্দজীর সঙ্গে। মঠাধীশ মহারাজ সহাস্যে দালাই লামা ও পাঞ্চেন্ লামা দুজনকেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন—উভয়ের হাতে দুটি পুষ্প-স্তবক উপহার দিলেন তিনি। দালাই লামা সসম্ভ্রমে উক্তি করলেন: 'ইনিই মঠের প্রধান?' স্বামী মাধবানন্দজী জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, ইনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট।'

স্বামীজীর ঘরের সামনে গঙ্গার দিকের বারান্দায় অতিথিদের বসার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। দালাই লামা অত্যন্ত সমীহ সহকারে স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের হাত ধরে তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসালেন—পরে নিজে চেয়ারে বসলেন। একে একে সকলেই আসন গ্রহণ করেন। বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দালাই লামার সঙ্গেই এসেছিলেন। তিনি মঠাধীশ মহারাজকে অনুরোধ করলেন, দালাই লামার সঙ্গে কথা বলার জন্য। দুজন লামার সঙ্গে পৃথক দুজন দোভাষী রয়েছেন—তাঁরা ইংরেজী থেকে তিব্বতীতে এবং তিব্বতী থেকে ইংরেজীতে তর্জমা করে যাচ্ছেন। কথা উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে। সে এক অপূর্ব ভাব-গম্ভীর পরিবেশ। শঙ্করানন্দজী মহারাজ ধীর-কণ্ঠে বলে চলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা—তাঁর কঠোর সাধনার কথা, আশ্চর্য সব উপলব্ধির বর্ণনা,—ডান হাতখানি তুলে দূরে গঙ্গার ওপারে দক্ষিণেশ্বরের দিকে দেখাচ্ছেন—ঐ সেই পুণ্য-ক্ষেত্র! ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া তখন বেশ ঝলমল করছে। দালাই লামা স্তব্ধ-বিস্ময়ে সমাহিত চিত্তে মহারাজজীর কথার মর্ম বুঝতে চেষ্টা কর-ছিলেন—একটিও কথা বলেননি, একেবারেই নির্বাক, কিন্তু একাগ্র। মহারাজজী খুব সরল ইংরেজীতে ছোট ছোট বাক্যে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে পাঞ্চেন্ লামা প্রশ্ন করেন—'আপনাদের ধর্ম কী?'

শঙ্করানন্দজী জবাব দেন: 'আমরা হিন্দু, আমাদের ধর্ম—"হিন্দুধর্ম"। হিন্দুধর্ম বলতে সর্বজনীন ধর্মকে বুঝায়। আমরা বেদ মানি। বেদই আমাদের শাস্ত্র। এই শাস্ত্র জগতের সকল মত ও পথকে গ্রহণ করেছে। কোন মতকে বাদ দেয়নি। জগতে যত ধর্ম আছে, সব এর মধ্যে পড়ে। আমরা সবাইকে গ্রহণ করি, সকলকে স্বীকার করি।'

পাঞ্চেন্ লামা: 'আপনারা কার উপাসনা করেন?'

শঙ্করানন্দ মহারাজ: 'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসক। যাঁর মন্দিরে আপনারা সর্বপ্রথমে ঢুকেছিলেন—আমরা তাঁরই পূজা করি। শ্রীরাম-কৃষ্ণের মূর্তিতে উপাসনা করি আমরা। তিনিই আমাদের গুরু।' তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন: 'আপনাদের কি তাহলে দুজন গুরু? স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ই আপনাদের গুরু?'

মঠাধীশ মহারাজের উত্তর: 'শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের গুরু—ইনিই আমাদের আরাধ্য ইষ্ট দেবতা। *স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সর্বস্ব ইনিই,—শ্রীরামকৃষ্ণই বিবেকানন্দের অন্তরের নিধি!* শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশেই স্বামী বিবেকানন্দ

এই বিরাট ধর্ম-সঙ্ঘ—রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন।'

দীর্ঘ সময় চলে যায়, এই সব কথাবার্তায়। দালাই লামা সারাক্ষণই ছিলেন প্রশান্ত মৌন। পাঞ্চেন্ লামা জানতে চাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহা-সমাধি হয় কত বয়সে? স্বামী মাধবানন্দজী বলে দিলেন—একান্ন বছর বয়সে।

পাঞ্চেন্ লামা মাঝে মাঝে ইংরেজীতেও প্রশ্ন করছিলেন—বিদায়কালেও খুব সাবধানে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলেছিলেন: 'I hope to meet you again'—'আশা রাখি আবার আমাদের দেখা হবে।'

জ্ঞান-বিজ্ঞান

কঠিন অসুখ হলে রোগীকে কি জানানো উচিত?

কারুর কোন বড় বা ভারী অসুখ হলে তাকে তা জানানো উচিত—না উচিত নয়? এ নিয়ে মতভেদ আছে, তর্ক-বিতর্কের আজও শেষ হয়নি। রোগী যখন চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে আসেন, তখন তিনি স্বভাবতই জানতে চান, কী অসুখে ভুগছেন তিনি, কত কঠিন তাঁর অসুখ, কতদিনে সারবে অথবা আদৌ সারবে কী না! এদেশে এ নিয়ে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই, হয়তো পৃথিবীর কোথাও নেই। সহজ অসুখ হলে সাধারণতঃ ডাক্তাররা রোগীকে অসুখটা কী সেটা বলে দেন, কোন কোন শল্য চিকিৎসার সময়েও—যেমন টনসিল, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, গলব্লাডার, নানা জায়গায় কিডনীতে (বৃক্ক) বা গলব্লাডারে (পিত্তথলি) পাথর হলে প্রভৃতি। অসুখ ছোট বা মারাত্মক না হলেও যে সেরে যাবে এমন অবশ্য বলা যায় না। ধরা যাক পৈটিক ব্যাধি—কোলনের প্রদাহ (কোলাইটিস) বা ইরিটেবল কোলন (উত্তেজিত বৃহদন্ত্র)-এর কথা—এ রোগ নিয়েই লোকে প্রায় সুস্থ লোকের মতোই বাঁচে। কিন্তু রোগ কিছু কঠিন হলেই তখন চিকিৎসকদের মুখ এবং মনও বোধ হয় ভারী হয়ে ওঠে। কে আর ইচ্ছা করে মৃত্যু-পরোয়ানা লিখে দিতে চায়? গুরুতর হৃদযন্ত্রের অসুখের পর ই. সি. জি. কী রকম সে প্রশ্ন করলে, ই. সি. জি. রিপোর্ট খারাপ থাকলে চিকিৎসক অনেক সময় বলতে চান না বা পাশ কাটান। আর ক্যানসার হলে তো কথাই নেই। যদিও এখন লোকে জানছেন যে, সব ক্যানসারই ভয়ানক নয়—কোন কোন ক্যানসার সারে।

সেইরকম হার্ট-অ্যাটাকের পর সঠিক অবস্থা রোগী যদি জানতে পারেন, তাহলে আধুনিক চিকিৎসা নির্দেশ মতো করলে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। আবার কতকগুলো রোগের কথা ধরা যেতে পারে—যক্ষ্মা কিংবা টাইফয়েড। আগে কোন ওষুধ ছিল না—তাই ওসব অসুখ হলে বাঁচা মরাটা ছিল ভাগ্যের হাতে। তখন কারুর যক্ষ্মা হলে তাই তাকে তা বলাটা তার মৃত্যু-পরোয়ানা জারী করার মতোই শোনাত। এখন চিকিৎসকরা সাধারণতঃ বলে দেন, কারণ চিকিৎসায় যক্ষ্মা সারে। তবে বহু চিকিৎসক এখনও বলেন শুধু যে বুকে একটু সর্দি জমেছে। আসল অবস্থা বলতে চান না, এই জন্যই যে রোগী ভয় পাবেন। কুষ্ঠ সম্বন্ধেও এই কথা—রোগটি হয়েছে জানলে কেউ কেউ আত্মঘাতী হতে যান, অথচ বেশির ভাগ কুষ্ঠই সারে, চিকিৎসা করতে হয় অবশ্য নিয়মিত বহুদিন ধরে।

আর রোগীরা কী চান? এ নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে অতি সম্প্রতি, ফ্রান্সে ১০০০ জনকে

প্রশ্ন করে। প্রশ্নটা ছিল—"যদি আপনার ক্যানসার হয়ে থাকে, তাহলে কি আপনি পছন্দ করেন যে, আপনার চিকিৎসক আপনাকে না লুকিয়ে সেটা জানিয়ে দেবেন?" ঐ ১০০০ জনের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বলেছেন যে, হ্যাঁ তাঁরা চান যে সেটি তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হোক, ১৩ শতাংশ বলেছেন যে, না, তাঁরা জানতে চান না, আর ১২ শতাংশ কোন মতামত দেননি।

দেশ-বিদেশ

অস্ট্রেলিয়া : সাদা কালোর দ্বন্দ্ব

ইউরোপীয়রা যখন প্রথম অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে বসবাস করার জন্য আসে তখন আদিবাসী উপজাতিরা ছিল ব্যবহারে লাজুক ও নিরীহ। তারা যখন অস্ট্রেলিয়ার ভূমিতে এসে পদার্পণ করে শিবির স্থাপন করল তখন আদিবাসীরা তাদের কোন বাধা দেয়নি। বরঞ্চ ধীরে ধীরে আদিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ ইউরোপীয়দের মিষ্টি ব্যবহারে ভুলে তাদের শিবিরনির্মাণের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল। প্রথমে তাদের ধারণা ছিল যে, ইউরোপীয়রা এখানে সাময়িকভাবে বসবাস করতে এসেছে। কিন্তু সময় যত গড়িয়ে যেতে লাগল ইউরোপীয়দের এখান থেকে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং আদিবাসীরা লক্ষ্য করল যে, তাদের এখানে আসার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং তাদের নিজেদের আহার-সংগ্রহের জমি দখল করে নিয়ে এরা শিবিরনির্মাণ করছে। সেই সময় থেকেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে আদিবাসীদের ব্যবহারের পরিবর্তন হতে থাকল।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশের আদিবাসীদের সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়েছে। এই সভ্যতা তাদের উপর খুব জোর করে না চাপানো হলেও পরিণামে পরোক্ষভাবে তাদের উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে। এটা ইউরোপীয়রা প্রথম থেকেই চেষ্টা করে আসছিল। তবে ইউরোপীয়রা যখন তাদের সংস্কৃতিতে সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করল তখন তারা প্রচণ্ড বাধা দিল। ইউরোপীয়দের ইচ্ছামাত্রই তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে চায়নি।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা নিজেদের জীবনযাত্রায় খুশি ছিল। তারা চাইত না ইউরোপীয়রা তাদের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক। তারা ইউরোপীয়দের চাকচিক্যময় জীবনযাত্রার প্রতি আদৌ কোন কৌতূহল প্রকাশ করত না। তারা মোটেই ইউরোপীয়দের অনুকরণ করতে চাইত না। ইউরোপীয়রা নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে বড় বেশি গর্বিত ছিল। তারা যখন দেখল আদিবাসীরা এই সভ্যতার প্রতি অনীহ তখন তারা মিথ্যা ধারণা করে বসল যে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সভ্য হওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। তারা অক্ষম, ইউরোপীয় সভ্যতায় সভ্য হতে। তারা বুঝতে পারল না যে, আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতিতে আস্থাবান এবং তারা অপরের সংস্কৃতি অনুকরণ করতে চায় না। আদিবাসীরা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। তাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের জীবনধারার বিস্তর পার্থক্য। ইউরোপীয়দের ছিল বসে বসে কাজ করার দিকে ঝোঁক, আর আদিবাসীদের ছিল নিরন্তর ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর দিকে ঝোঁক। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইউরোপীয়রা পার্থিব সম্পদকে বেশি মূল্য দিত, কিন্তু আদিবাসীরা তা দিত না। ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত,

জগতের সব দেশের মানুষ পার্থিব সম্পদকে বেশি গুরুত্ব দেয়, কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে এটারই অভাব দেখে তারা ধারণা করে বসল যে, এরা অসভ্য, অপদার্থ—মানুষ নামের অযোগ্য। তাই দেখা যায়, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সিডনিতে একটি জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় যে, এই অপদার্থ অসভ্য মানুষগুলোকে গুলি করে মেরে ফেলা হোক। কুকুরকে গুলি করে মারলে যেমন কোন অপরাধ হয় না তেমনি এদের মারলে কোন দোষ নেই।

ইউরোপীয়ের সঙ্গে আদিবাসী-সংস্কৃতির কোন মিল নেই। ফলে উভয়ের একত্র মিলেমিশে বসবাস করা মুশকিল হয়ে পড়ল। ইউরোপীয়রা জোর করে আদিবাসীদের বসত-জমি দখল করে নিয়ে তাদের সেই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে লাগল অথবা মেরে ফেলতে লাগল। আদিবাসীরা যে-সব স্থানে আহার-সংগ্রহ করত সেই সব জায়গা কৃষিকাজ করার জন্য ইউরোপীয়রা নিয়ে নিতে লাগল। ফলে আদিবাসী উপজাতিরা তাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দূর দূর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে জীবনরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে লাগল।

এইভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াতে এবং তাদের যাযাবর জীবনযাপনের জন্য এবং উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় তারা সবাই একত্র মিলিত হয়ে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত না। ইউরোপীয়রা তাদের বহু লোককে মেরে ফেলাতে ও আহার-সংগ্রহের জমি কেড়ে নেওয়াতে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। কিভাবে এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় তা তারা জানত না।

ইউরোপীয়রা আদিবাসীদের জায়গাজমি দখল করে কেবল ক্ষান্ত হয়নি, তারা আদিবাসী-মেয়েদের জোর করে ধরে বা চুরি করে নিয়ে যেত তাদের শিবিরে। এই অত্যাচারে আদিবাসীরা হিংস্র হয়ে উঠল। প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য তারা সব সময় ওত পেতে থাকত। সুযোগ পেলে তারা ইউরোপীয়দের হত্যা করত। কিন্তু মজা হচ্ছে, ইউরোপীয়রা যদি আদিবাসীদের হত্যা করত তাহলে তারা ভাবত উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর আদিবাসীরা যদি তাদের হত্যা করত, তাহলে তারা ভাবত বেটারা সাহেবদের বিনা দোষে হত্যা করছে। উভয়ের মধ্যে সব সময় দ্বন্দ্ব লেগেছিল।

এই সব কারণে আদিবাসীরা ইউরোপীয়দের থেকে দূরে দূরে থাকত, তাদেরকে সব সময় এড়িয়ে চলার মনোভাব পোষণ করত।

এই সব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস আদিবাসীদের উপর ইউরোপীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা ও অত্যাচারের এবং আদিবাসীদের প্রতিহিংসা গ্রহণের ইতিহাস।

মানুষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ; আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই সেই ঐশী চেতনা হইতে প্রসূত। মানব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু বীর্যবান্, যাহা কিছু মঙ্গলময় এবং যাহা কিছু ঐশ্বর্যবান্, সে-সবই ঐ ব্রহ্মসত্তা হইতে উদ্ভূত ; এবং যদিও তাহা অনেকের মধ্যেই সুপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই সমভাবে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। যেন এক অনন্ত মহাসমুদ্র পশ্চাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা সকলে সেই অনন্ত মহাসমুদ্র হইতে একটি তরঙ্গরূপে উত্থিত হইয়াছি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

Avadhuta Gita of Dattatreya—Translated and annotated by Swami Ashokananda. Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-600 004. pp. 8+168, Price : Rs. 6·00 (Ordinary), 14·00 (Deluxe).

বেদান্তের যে-অদ্বৈতবাদে জীবাত্মা বা জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের অভিন্নত্ব বা ঐক্য স্বীকৃত হয়েছে সেই দার্শনিক ভাবধারা দত্তাত্রেয়-রচিত 'অবধূত গীতা'র মর্মবাণী। এটি অদ্বৈতবাদীদের কাছে একটি মহামূল্য গ্রন্থ। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ এ-থেকে অনেকবার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

'এই গীতা যিনি লিখেছেন তাঁদের মতো লোকেরাই ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁদের সত্যিকারের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে; কোন কিছু নিয়ে তাঁদের চিন্তা নেই, শরীরের কোন আঘাতের বোধ নেই, উত্তাপ, শৈত্য, বিপদ, কিংবা কোন-কিছু নিয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁরা স্থিরভাবে বসে আত্মার গভীর আনন্দ উপভোগ করেন, এবং জলন্ত অঙ্গারে দেহ দগ্ধ হলেও তাঁরা সেটা অনুভব করেন না।'

অত্রি-পুত্র দত্ত অর্থাৎ দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না; এমন-কি তাঁর কাল-সম্পর্কেও আমাদের সঠিক কোন ধারণা নেই। মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি কয়েকটি পুরাণে তাঁর উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই সব পৌরাণিক বিবরণের ঐতিহাসিকতা বিতর্কের বিষয়। প্রসিদ্ধি আছে, তিনি বীর যোদ্ধা-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, কিন্তু পরে সংসার ত্যাগ করে যোগাভ্যাসী এবং জীবন্মুক্ত হন। তাই তিনি 'অবধূত'—বর্ণাশ্রমধর্মহীন সংসারাসক্তিরহিত বৈরাগী :

'যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমবর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥'

অশোকের মতো, দত্তাত্রেয়ও চণ্ডদত্ত থেকে ধর্মদত্ত হতে পেরেছিলেন।

গ্রন্থের আটটি অধ্যায়ে মোট ২৫৬টি শ্লোক আছে; দীর্ঘতম প্রথম অধ্যায়ে ৭৬টি ও ক্ষুদ্রতম অষ্টম অধ্যায়ে ১০টি। অবধূত-শব্দের অর্থের সঙ্গে বৈরাগ্য জড়িত থাকলেও মহান্ অবধূতের মধ্যে এমন একটি বৃত্তি আছে যার দ্বারা তিনি শুধু আসক্তিকেই জয় করেন না, বৈরাগ্যকেও জয় করেন। পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকারের কোন বিধিনিষেধ মানার কোন প্রয়োজন এই অবধূতের নেই। তিনি কিছু গ্রহণ করেন না, আবার কিছু বর্জনও করেন না। আমাদের মতো চাওয়া-পাওয়ার পথের তিনি পথিক নন। তিনি নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন না, অজ্ঞও মনে করেন না। নিজেই অনন্ত আত্ম-শক্তির স্বরূপ,—এই উপলব্ধি হওয়ার পর থেকে তিনি এই বোধে বিভোর হয়ে থাকেন। দত্তাত্রেয় কবিকে এই চরম ও পরম উপলব্ধির প্রতীকরূপে গণ্য করা হয়। এই উপলব্ধিই তাঁর 'গীতা'র দৃপ্ত ও উদাত্ত শ্লোকগুলিতে জ্ঞানময়ী বাণীতে ঝংকৃত :

কিং নাম রোদিষি সখে ন জরা ন মৃত্যুঃ
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ জন্মদুঃখম্।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিকারো
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ (৩/৩৪)

('বন্ধু, বিলাপ করছ কেন? তোমার জরা নেই, মৃত্যু নেই। বন্ধু, বিলাপ করছ কেন? তোমার জন্মগ্রহণের যন্ত্রণা নেই। বন্ধু, বিলাপ করছ কেন? তোমার পরিবর্তন নেই। আমি জ্ঞানের অমৃত, সমস্বরূপ অস্তিত্ব, আকাশের মতো।') অন্তিম অষ্টম অধ্যায়ে মুনি ও অবধূতের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। মুনির প্রথম লক্ষণ হচ্ছে 'কামৈরহতধীঃ' —যাঁর বুদ্ধি কামনাদি দ্বারা পরাহত হয়নি। 'অবধূত' শব্দটির চারটি অক্ষরের তাৎপর্য পৃথক-

ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: আশাপাশ তাঁকে বাঁধতে পারে না, তিনি বাসনাবিবর্জিত, ধূলিধূসর তাঁর গাত্র, এবং তত্ত্বচিন্তায় তিনি মগ্ন।

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দের এই ইংরেজী অনুবাদ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'The Voice of India' (Northern California) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; গ্রন্থাকারে প্রকাশ মরণোত্তর। অনুবাদ মূলানুগ অথচ স্বচ্ছন্দ এবং সুন্দর; এর সঙ্গে অত্যাবশ্যক কিছু টীকাটিপ্পনীও যুক্ত আছে। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনের সময় প্রকাশক একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রয়োজনীয় মুখবন্ধ যোগ করেছেন। সুমুদ্রিত ও সুলভ এই গ্রন্থের বহুল প্রচার পাঠকসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

The Child: A Symposium—Published by Ramakrishna Mission Ashrama, Ramakrishna Avenue, Patna-800004. pp. 2+116, price: Rs. 5·00.

The Child একটি সর্বাঙ্গসুন্দর, সুপরিকল্পিত, সুখপাঠ্য অথচ প্রয়োজনীয় পুস্তক। এর প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সমগ্র পুস্তকটিতে একটি পবিত্রতার সুপ্রকাশ সকলকেই পরম তৃপ্তি দেবে। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দটি ছিল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। সেই শিশুবর্ষ উদ্‌যাপনের একটি ফলশ্রুতি হল শিশুসংক্রান্ত মূল্যবান প্রবন্ধাদির দ্বারা গ্রথিত এই পুস্তকটি। পুস্তকটির মুখবন্ধে পূজনীয় স্বামী বেদান্তানন্দ সুমিষ্ট ভাষায় বলেছেন, সকল মানবপ্রেমী যাঁরা উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় শিশুর যথোপযুক্ত লালন-পালনে যত্নবান, তাঁদের উদ্দেশেই এই পুস্তক উৎসর্গ করা হল। পূজনীয় স্বামীজীর এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এই পুস্তকটির পাঠান্তে শিশুদের মন ও তাদের প্রতি আমাদের সতর্ক সহানুভূতি সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে দীক্ষা হবে—এবং এইখানেই পুস্তকটির প্রকাশের চরম সার্থকতা।

প্রথমেই বলেছি—পুস্তকটি সুপরিকল্পিত। মোটামুটি চারটি অংশে পুস্তকটি বিভক্ত। সূচনায় —স্বামীজী ও ভগ্নী নিবেদিতার দুটি অতি মূল্যবান রচনা মুদ্রিত হয়েছে। ভারতীয় 'মাতৃত্বের' সুমহান আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর রচনাটি তাঁর অপরাপর সব লেখাগুলির মতোই বলিষ্ঠ ও উদ্দীপক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীর আদর্শ সম্বন্ধে এমন তুলনামূলক রচনা যথার্থই বিরল। বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রাঞ্জল তুলনামূলক আলোচনা স্বামীজীর রচনাকে সব সময় বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে। যে স্বর্গীয় মাতৃত্বের মাধ্যমে শিশুর আগমন তার রূপটি প্রকাশ করার সার্থকতা সকল শ্রেণীর পাঠককেই মুগ্ধ করবে।

সূচনার পরে প্রথম অংশে—পঞ্চ মহাপুরুষের বাল্যলীলা বা বাল্যকাল বর্ণিত হয়েছে। এই অংশটিও প্রয়োজনীয়। এই বাল্যলীলা পাঠে দেখা যাবে—মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুকূল পরিবেশেই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশ যে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত অপ্রত্যক্ষভাবে এই রচনাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ ক্ষুদিরামের গৃহে গদাধরের আবির্ভাব সর্বতোভাবে সঙ্গত। স্বল্প-কলেবর এই রচনাগুলি লিখিত হয়েছে সুপণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকার দ্বারা। তাই পরিধি স্বল্প হলেও লেখাগুলি মূল্যবান। ভগবান যিশুর বাল্য-জীবন সম্বন্ধে অধ্যাপক দেবীদাস চ্যাটার্জীর ক্ষুদ্র নিবন্ধটি সযত্ন রচনার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। স্বামী কীর্তিদানন্দের বিশ্লেষণমূলক রচনা 'বালক রামকৃষ্ণ'—বিশেষ মূল্যবান ও কালোপযোগী।

দ্বিতীয় অংশে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, সুলিখিত প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতে শিশুশিক্ষা'

স্থান পেয়েছে। এই তথ্যনির্ভর সযত্ন রচনাটি পুস্তকটির প্রয়োজন বর্ধনে সাহায্য করেছে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা তথা শিশুশিক্ষাকে কতটা মূল্যবান রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হত আধুনিক ভারতের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সে সম্বন্ধে তথ্যাভিজ্ঞ নন্। এই রচনাটি সেদিক থেকে মূল্যবান চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমষ্টির চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের মধ্যে তা নিহিত ছিল। আর প্রাচীন ভারতে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই ছিল এই ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন।

পুস্তকটির তৃতীয় অংশে আছে শিশুমনের ক্রমবিকাশ ও শিশুশিক্ষা সম্বন্ধীয় ৯টি বিজ্ঞান-ভিত্তিক, তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ—যেগুলির রচয়িতারা প্রত্যেকেই হলেন এক একজন বিশেষজ্ঞ। বলা বাহুল্য, প্রতিটি রচনাই অবশ্য-পাঠ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রতিটি প্রবন্ধের যথার্থ মূল্যায়নের পারদর্শিতা বর্তমান সমালোচকের নেই, তবু নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রচনাগুলি সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদরে গৃহীত হবে। শিশুমনের সৃষ্টিধর্মিতা সম্বন্ধে ডঃ বিমলেশ্বর দের প্রবন্ধটিতে সরস পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বহুস অভিজ্ঞতার একটি সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। ডঃ অনিমা সেন, শ্রীমতী কোকিলা কলন্ত্রী, শ্রী কে. আর. রাও ইত্যাদির প্রতিটি রচনার বিষয়বস্তু যেমন আকর্ষণীয়, রচনাগুলিও তেমনই মূল্যবান। এই রচনাগুলির বহুল প্রচার ও পাঠ আমাদের সমাজ-জীবনকে নানাভাবে উপকৃত করবে সন্দেহ নেই।

পুস্তকটির চতুর্থ অংশে পবিত্র বাৎসল্যরসের অবতারণার উদ্দেশ্যে তিনটি নিবন্ধ সংযোজিত হয়ে পুস্তকটির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। তিনটি রচনাই সুমধুর রসসিঞ্চিত। বাৎসল্যরস যে ঈশ্বর-সাধনার অঙ্গীভূত সেকথা শ্রদ্ধেয় স্বামী হর্ষানন্দ স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। 'গোপাল ও গোপালের মা' প্রবন্ধটিতে স্বামী প্রভানন্দ বাৎসল্য-রসের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে একটি দুরূহ বিষয়ে তাঁর রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে আমাদের অভিভূত করেছেন।

পরিশেষে পুস্তকটির মুদ্রণ কর্মের প্রশংসা না করলে ত্রুটি থেকে যাবে। এ ব্যাপারে তপন প্রিন্টিং প্রেসের কর্মনৈপুণ্য পুনরায় প্রমাণিত হল।

এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পবিত্র পুস্তকের বহুল প্রচার একান্তভাবে কামনা করি।

—অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন
ইতিহাস বিভাগ, আশুতোষ কলেজ

সহাস্য বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)—শংকরীপ্রসাদ বসু। প্রকাশক : নবভারত পাবলিশার্স', ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা ৩২০, মূল্য : আঠার টাকা।

বিবেকানন্দ বিশ্বখ্যাত বাগ্মী, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং আরও অনেক পরিচয়েরই অধিকারী যা যে কোন মানুষকে ভয়াবহরূপে গম্ভীর করে তুলতে পারে। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জগতের নেতাদের সঙ্গে হাস্যরসের বিরোধটাই সাধারণের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান। শুষ্ক বৈরাগ্যের সঙ্গে যাঁর চিরকালের বিরোধ, সেই রসিকোত্তম মানুষটির যোগ্যশিষ্য বিবেকানন্দের হাস্যরসিক পরিচয়ই আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন বিবেকানন্দ জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার গবেষক-অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

বিবেকানন্দের হাসির জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শঙ্করীবাবু বলেছেন, "উইট বা বাকচাতুরীতে তিনি পারদর্শী ; কথার পিঠে কথা বলতে, দ্রুত চোখা উত্তরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল

করতে তাঁর তুল্য ক্ষমতা অল্পই দেখা যায়। কিন্তু উইটের তরবারি-ঝলক দেখানোর চেয়ে তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল স্যাটায়ারের কোপ বসাতে—অনাচারের বুকে যা কেটে বসবে। কিন্তু আঘাত নয়, প্রেমই বিবেকানন্দের প্রধান অস্ত্র। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের অসঙ্গতির রূপ দেখতেন, কঠিন হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠত, কিন্তু অবিলম্বে সে হাসি কোমল হয়ে যেত, যখন এই মানব-প্রেমিক দেখতেন—ব্যক্তিজীবনের অসঙ্গতি আসলে সামগ্রিক মানবজীবনের অসঙ্গতিরই অংশ। তখন জন্ম নিত গভীর হিউমার।" এই হিউমারিস্ট বিবেকানন্দের মধ্যেই মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ঘাটিত। তাঁর প্রেমিকসত্তার একপিঠে বেদনার অশ্রু, অন্যপিঠে হাসির সূর্যদ্যুতি।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট ১৭টি পরিচ্ছেদে বিবেকানন্দের রসিকতার বিচিত্ররূপ সঙ্কলিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রথম দুটি অধ্যায়—'বিবেকানন্দের হাসির উপর বিতর্ক' এবং 'আমরা আনন্দের অমৃতের সন্তান' মূল বক্তব্যের ভূমিকাস্বরূপ। 'খোলা মাঠের মানুষটি' অধ্যায়ে বালক নরেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পরবর্তী কাল পর্যন্ত জীবনকে নিয়ে তিনি কিভাবে খেলা করেছেন সেই পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাণোচ্ছলতায় নিত্য ক্রীড়ামুখী, মরণপ্রেমিক বিবেকানন্দের স্বরূপ প্রকাশিত। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছ থেকেই নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন জীবনবোধের প্রাথমিক পাঠ। শৈশবে পুত্রের দুরন্ত খামখেয়ালকে সহাস্যে সমর্থন করতেন বিশ্বনাথ দত্ত। তাঁর শাস্তি ও শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল অভিনব। নরেন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে মানুষের জীবনের সুখদুঃখের শিক্ষা কিভাবে লাভ করেছিলেন তার পরিচয় পাই 'পিতার হাসি' অধ্যায়ে এবং পরবর্তী কৈশোর ও যৌবন-আরম্ভের কালের কথা 'উজ্জ্বল দিনগুলি'-তে। এর পরেই এসেছে প্রধানত রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের কাল এবং সেই সূত্রেই রামকৃষ্ণের রসিক-সত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পরম রসিক' অধ্যায়ে সংযোজিত। রামকৃষ্ণের জগৎ এক অনাবিল আনন্দের জগৎ। একঘেয়েমিতে তাঁর প্রবল অনাসক্তি। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, লোকচরিত্র সম্পর্কে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতায়, অনুকরণের অসাধারণ ক্ষমতায় হাস্যরসের নিত্যপ্রবাহ। সেই প্রবাহে অবগাহন করেছেন নরেন্দ্রনাথ, লাভ করেছেন সে রসের উত্তরাধিকার। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের জীবনে—সংলাপে ও আচরণে এই রসবোধ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তারই ধারাবাহিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে মোট ১৩টি পরিচ্ছেদে।

শঙ্করীবাবু বলেছেন, "বিবেকানন্দের হাসি একটা চ্যালেঞ্জ বা চ্যালেঞ্জের উত্তর।…পুঞ্জীভূত দুঃখের সামনে দাঁড়িয়ে ধার্মিকেরা বিমর্ষ হয়ে পড়েন, পৃথিবীর মুগ্ধ মায়ার সম্বন্ধে বিতৃষ্ণায় ভরে যায় তাঁদের মন…কিন্তু বিবেকানন্দ বলেন, 'মানুষ অমৃতের সন্তান, তাই সে আনন্দে থাকবে হাসবে।' স্বামী তুরীয়ানন্দ দেখেছিলেন, নির্জন ছাদে পায়চারি করতে করতে স্বামীজী আপনমনে বলছেন—ওরে আমার দুঃখ কেউ বোঝে না—তারপর আলসেয় মাথা রেখে কাঁদছেন—জগতের জন্য অশ্রুর রক্তনিষেক করছেন—সেই বিবেকানন্দই, অপূর্ব এই হাসির আলো মাখিয়ে তাঁর বেদনাবিন্দুগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।" হাসির আলো-মাখা দুঃখের অশ্রু-বিন্দুগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করে লেখক বিবেকানন্দের হাস্যরসে তাৎপর্যের গভীরতার সন্ধান দিয়েছেন। 'সহাস্য বিবেকানন্দ' নিছক হাসির সঙ্কলনমাত্র নয়—ব্যাখ্যার সরসতায়, উপস্থাপনার নাটকীয়তায়, বিশ্লেষণের সকৌতুক ভঙ্গীতে, এমন-কি শীর্ষনাম নির্বাচনে গ্রন্থটি

বিবেকানন্দের জীবনবোধের রসভাষ্য হয়ে উঠেছে এবং এইখানেই লেখকের প্রধান কৃতিত্ব। গুরু-গম্ভীর গবেষণার কাজে শঙ্করীবাবুর দক্ষতা ইতিপূর্বেই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে—এবার তাঁর প্রবেশ দৈনন্দিন জীবনের লঘু মেজাজের আসরে। সে প্রবেশ স্বচ্ছন্দ এবং অভিনন্দিতও—গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত অদ্বৈত আশ্রম থেকে সংগৃহীত স্বামীজীর সহাস্য চিত্রটির নির্বাচনও গ্রন্থটির পক্ষে যথার্থ হয়েছে।

—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ

শাশ্বতী—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী। প্রকাশনা: শ্রীসমীর সান্যাল ও শ্রীজয়ন্তী সান্যাল, ১৫।৩, বড়ালপাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬। পৃষ্ঠা ৭৯, মূল্য: ছয় টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার জগতে যখন অধ্যাত্ম কবিতার ধারা বিলুপ্তপ্রায় তখন শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর 'শাশ্বতী' কাব্যগ্রন্থটি পাঠকমহলে আশার সঞ্চার করে। বস্তুতান্ত্রিকতা, রোমান্টিক সর্বস্বতা ব্যতীত কবিতার যে আর একটি ধারা আছে, যেখানে অধ্যাত্মচেতনার উদ্ভাসন—'শাশ্বতী' তারই প্রতীক। প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব-মহিমা কবিচিত্তে যে অনিঃশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছে তারই ছন্দঃস্পন্দিত রূপায়ণ সমালোচ্য কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় প্রত্যক্ষ করা যায়। কবিতাগুলি শুধুমাত্র ভারতের গৌরব-মহিমা কীর্তনে সমাপ্ত হয়নি; একটি পরম আশাবাদী সুরও আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবির 'মনশ্চক্ষে মূর্তি এক অনুভূতিময়'—তাই কবি শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী বিশ্বাস করেন—'বিশ্ব যদি চাহে ধ্বংস, ভুলে যায় মৈত্রী অন্তরের'—তবে 'এ ভারত দাঁড়াইয়া একপার্শ্বে বিশ্ব-প্রাঙ্গণের/দিবে শান্তি-ছায়াতল প্রসারিয়া মহাবনস্পতি'। আর কবির এই বিশ্বাসের উৎস ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি; তাই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই ঘুরে ফিরে আসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্রকল্প। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট একচল্লিশটি কবিতা আছে। এই একচল্লিশটি কবিতা নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করা গেলেও, কাব্যগ্রন্থটির মূলকেন্দ্রবিন্দু হল ভারতের গৌরব-মহিমায় বিশ্বাস ও আগামী ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জ্বল রূপচিত্রাঙ্কন। আর ভারতের এই অধ্যাত্ম সংস্কৃতির বিশ্বাসের মূল উৎস ভারতের অধ্যাত্ম সাধকদের জীবন-সাধনার প্রতি কবির অকম্পিত বিশ্বাস-নিষ্ঠা। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবির উল্লিখিত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় 'চাই শুধু আত্মসমর্পণ', 'শ্রীগৌরাঙ্গ,' 'উর্ধ্বে চল মন' (শ্রীরামকৃষ্ণ), 'দুঃখসুখের মালায় গাথা' প্রভৃতি কবিতায়। ভারত সংস্কৃতির অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বই নয়; কবি উদ্বোধিত হয়েছেন অধ্যাত্ম-সাহিত্যের দ্বারাও—এর পরিচয় আছে 'সত্যং পরং ধীমহি', 'যোগঃ ভবতি দুঃখহা', 'চাওয়া আর দেওয়া,' 'মহামানব' প্রভৃতি কবিতায়। বিবেকানন্দ অনুভাবে ভাবিত বলেই কবি বিশ্বাস করেন 'মৃত্যু নাই আমাদের, মৃত্যু নাই এ পুণ্য দেশের/মৃত্যুরে করিব জয়—আমাদের আছে আত্মবল'। কবির মধ্যে এ বোধ সঞ্চারিত অত্যন্ত তীব্রভাবে—'আমরা নিখিলে অমৃতের সন্তান।' তাই তাঁর কাছে 'আলোহারা অন্ধকার জড়ত্বের কায়া'। অধ্যাত্ম-কবিতার মধ্যে ছন্দঃস্পন্দনের যে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করা যায় পরিচিত চিত্রকল্পের মাধ্যমে শ্রীচক্রবর্তীর আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি তার অন্যতম প্রমাণ। কবির লেখনীতে উল্লিখিত মন্তব্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—'চিদাকাশে তব হবে বিম্বিত সত্য জ্যোতির্ময়/মিথ্যার ভীতি দূর করে দাও—গাহ সত্যের জয়।'

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সত্যের ও সাধনার কাব্যরূপায়ণ বর্তমান ব্রতভ্রষ্ট জাতীয় চিত্তে নতুন চেতনার সঞ্চার করবে বলে আশা করা যায়। জাতীয় চিত্তের পরম অবিশ্বাসের ক্ষণে 'শাশ্বতী' কাব্যগ্রন্থটি বিশ্বাসের সম্পদে পাঠককুলকে সমৃদ্ধ না করলেও অন্ততঃ বিশ্বাসী করবে—আশা করা যায়। পরিশেষে বলি, শ্রীচক্রবর্তীর বেশ কয়েকটি কবিতায় কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবুও 'শাশ্বতী' কাব্য-গ্রন্থের কবিতাগুলি আঙ্গিকে—পারিপাট্যে উপস্থাপনায় ও বক্তব্যে অনুজ্জ্বল নয়। মুদ্রণের দিকে দৃষ্টি দিলে কাব্যগ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হত বলে মনে হয়।

—অধ্যাপক শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
বাঙলা বিভাগ, হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ

অধ্যাত্মমার্গ-প্রদীপ (হিন্দী)— স্বামী বাগীশ্বরানন্দ। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মঠ, ধন্তোলী, নাগপুর—৪৪০০১২। পৃষ্ঠা, ৪+২২২, মূল্য: দশ টাকা।

নিত্যকর্ম প্রকাশ (হিন্দী)—সংকলক: রুদ্রপ্রসাদ পাঠক। প্রকাশক: সীকরিয়া ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনম্, কলিকাতা—৭০০০৭০। পৃষ্ঠা ২২+১৬+৭৬০; মূল্য... ?

কথায় বলে 'সাধুদর্শন পুণ্যের ফল।' সেই দর্শন যদি কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠে সম্ভব হয়, তবে সে গ্রন্থ-পাঠও নিঃসন্দেহে পুণ্যেরই ফল। সাধুর অবর্তমানেও পুণ্যভাক্ ব্যক্তি সার্থক সদ্‌-গ্রন্থে সাধুর দর্শন লাভ করেন। নাগপুরের রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ স্মৃতি গ্রন্থমালার ৭৭তম পুষ্প 'অধ্যাত্মমার্গ-প্রদীপ' এমনিই একটি সার্থক সদ্‌গ্রন্থ। নামেই যার পরিচয়। অধ্যাত্ম-জীবীদের তো কথাই নেই, কৌতুহলী নবীন পথিকও এ গ্রন্থের আলোকে উদ্দিষ্ট পথটি চিনে নিতে পারবেন।

মানুষ যা পায় বা পেয়েছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। আরও পেতে চায়। এই পাওয়ার পাওয়া তাকে চরম অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে, আবার আধ্যাত্মিকতার পথে চালিত করে জীবনের পরম-পাওয়া ও চরম গৌরবের অধিকারী করে তুলতে পারে। কাঁচা বুদ্ধির মানুষ বুঝে উঠতে পারে না, কোন্‌টি তার মঙ্গল পথ,—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। নানাপ্রকার ভালমন্দ প্রশ্ন এসে ভিড় করে তার মনে। হতভম্ব মানুষটি প্রশ্নের জাল কেটে বেরিয়ে আসার পথই পায় না খুঁজে। এই ধরনের প্রশ্নরাজি তুলে ধরা হয়েছে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে বেশ সহজ ও সঙ্গতভাবে। স্বামীজীও বেশ সহজ-সরল-সুন্দর আটপৌরে ভঙ্গিতে ভক্তমনের সমস্যার সমাধানটি নির্দেশ করেছেন। এখানেই সাধু, সদ্‌গ্রন্থ ও ব্যাকুলচিত্ত ভক্ত হৃদয়ের সুসামঞ্জস্য দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়েছে সাফল্যমণ্ডিত।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সরল, সুবোধ আটপৌরে কথাবার্তায় তাঁর ধর্মজীবনের অতিগূঢ় গভীরতত্ত্ব সহজ হয়ে দেখা দিত। তাঁর ভাগ্যবান সহচর বা পার্শ্বচরদের কেউ কেউ স্বীয় দিনলিপিতে প্রয়োজনীয় কথা লিখে রাখতেন। অনেক দিন আগে 'উদ্বোধন' পত্রিকারই পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক-ভাবে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুন থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ পর্যন্ত প্রায় ছয় বছরে তুরীয়ানন্দ-সংলাপ প্রকাশিত হয়। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বামী তুরীয়ানন্দের সেই অমূল্য শিক্ষায় যাতে হিন্দীভাষী ব্যক্তিগণও উপকৃত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে রায়পুরের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রমের হিন্দী ত্রৈমাসিক 'বিবেক জ্যোতি' পত্রিকায় উক্ত সংলাপটির হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয় পর্যায়ক্রমে। সেই অনুবাদই 'অধ্যাত্মমার্গ-প্রদীপ' গ্রন্থের আকারে আমাদের হাতে এসেছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ

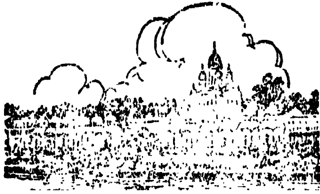
মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর মনোজ্ঞ ভাষান্তর পড়তে পড়তে অবলীলাক্রমে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং বেদ-উপনিষদের বাণীর পবিত্র সরোবরেও অবগাহন স্নান হয়ে যায়। এই পরিসরে ক্ষুদ্র কিন্তু বিষয় গৌরবে মহৎ গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এখানেই। বিশেষভাবে হিন্দীভাষী পাঠককুলের কাছে। ভাবের মহত্ত্ব ও ভাষার মাধুরীর সঙ্গে গ্রন্থটির প্রচ্ছদও সুন্দর স্নিগ্ধ এবং আকর্ষণীয়। তাই মুদ্রণ ও তিথিবিন্যাসের কিছু বিচ্যুতি সহজেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।

বেদ-উপনিষদের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। আমাদের ধর্ম সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম। কিন্তু তা এমন ব্যাপক এবং গভীর যে তার সহজ সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ দুঃসাধ্য। এই ব্যাপকতা ও গভীরতার মূলে আছে তার অতুলনীয় উদারতা। যুগে-যুগে কালে-কালে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক জ্ঞানী-মহাত্মাদের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম সমৃদ্ধি ও গৌরবের অধিকারী হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শেও অল্প-স্বল্প অভিনবতার সংযোজন ঘটেছে। ফলে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্র হয়েছে বিশাল, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান হয়েছে সহজ এবং উদার। কিন্তু অতিমাত্রায় সহজ এবং উদারতায় আমাদের ভ্রান্তি ঘটেছে, সুপথ মনে করে আমরা বিপথের আশ্রয় নিয়ে আত্মতোষ এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। দূরগামী হয়ে পড়েছি। আমাদের যথার্থ জীবন-চর্যা ধর্ম-কর্ম এবং শাস্ত্রাদির সঙ্গে হয়েছি সম্পর্করহিত। ভুলেছি দেবভাষা সংস্কৃত। সুতরাং ফল যথোচিতই ফলেছে। হয়েছি—'ধোবী কা কুত্তা, ন ঘরকা ন ঘাটকা।'—অবশ্য সকলের জন্য এক বাক্যে একথা প্রযোজ্য নয়। আমাদের আপন জীবন-চর্যার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব কে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারে? তাই তা ফিরে পাবার জন্য অনেকের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ছট্‌ফট্ করে। এই কাতরতা প্রশমনের প্রবল অন্তরায় সংস্কৃত-ভাষায় অজ্ঞতা। এমত অবস্থায় নিজ নিজ মাতৃভাষার সাহায্যেই বিস্মৃত এবং বিচ্যুত ঐতিহ্যে পৌঁছানো সম্ভব। অনুরূপ ব্যবস্থা করে লোক-কল্যাণ ব্রতে ব্রতী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভাব নেই আমাদের দেশে। নৈমিত্তিককর্ম, কাম্যকর্ম, বিবিধ স্তোত্রাদি, আরতি এবং দেবপূজা-বিষয়ক যথাসম্ভব যাবতীয় বিষয় নানা উৎস থেকে রুদ্রপ্রসাদ পাঠকের সংকলিত; ড. নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, পণ্ডিত নলিনীকান্ত মিশ্র, পণ্ডিত সাঁওরমল মিশ্র ও পণ্ডিত ঋষভদেব ত্রিপাঠী দ্বারা সম্পাদিত এবং কালীপ্রসাদ সীকরিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত হিন্দীভাষ্য মণ্ডিত 'নিত্যকর্ম প্রকাশ' গ্রন্থটি এইরূপ স্বধর্ম, স্বকর্ম ও স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরেছে। গ্রন্থটি সচিত্র এবং বৃহদায়তন। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। উষাকালে শয্যাত্যাগ থেকে শুরু করে, রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত—স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, পঞ্চদেব পূজা, হোম, নিত্যশ্রাদ্ধ, বলি, বৈশ্ব দেবাদি প্রভৃতি—সকল প্রকার কর্তব্যই ব্যাখ্যাত হয়েছে নিত্যকর্ম অংশটিতে। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ থেকে শুরু করে পুরো বছরের বিশেষ বিশেষ ব্রত ও পূজার্চনার বিধি-নিয়ম ও সার্থকতা বিবেচিত হয়েছে নৈমিত্তিক কর্মখণ্ডে। তৃতীয় খণ্ডে অর্থাৎ কাম্যকর্মের মধ্যে আছে স্নান এবং নানাপ্রকার দান-ধ্যান, বিশেষ বিশেষ কামনা-পূর্তির জন্য বিশেস বিশেষ দেবদেবীর আরাধনা, পূজা এবং কাম্য প্রয়োগের মন্ত্র ও প্রক্রিয়া, তারই সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্তোত্রের সংকলন ও দেবপূজাবিষয়ক জ্ঞাতব্য ও বিধান তথা নানা পূজা-পার্বণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা দেওয়া আছে।

ভারতীয় জনজীবনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের এমন সহজ, সুন্দর, সুষ্ঠু ও উপযোগী আর্যশাস্ত্র-মথিত গ্রন্থ ধর্মপ্রাণ সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবে। স্বল্প সংস্কৃত জানা বা সংস্কৃত না-জানা হিন্দী জানা ব্যক্তি মাত্রেই উপকৃত হবেন। গ্রন্থটির সর্বভারতীয় উপযোগিতা বিবেচনায় বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া দরকার। তাতে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যপূর্তি সহজতর হবে মনে হয়।

'নিত্যকর্ম প্রকাশে'র প্রয়াস সৎ এবং মহৎ, তবে আত্মপ্রচারমানসিকতার ছাপ এবং মুদ্রণপ্রমাদ প্রভৃতি গ্রন্থখানির শোভনতায় হানিকর হয়েছে। তা সত্ত্বেও এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ সর্বৈব অভিনন্দনযোগ্য।

—ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী
বাঙলা বিভাগ, বিশ্বভারতী



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ: (ক) সম্প্রতি প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়েন। দক্ষিণ-পূর্ব কলিকাতার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব্ কালচার গত ৫ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ জলবন্দী মানুষের মধ্যে খাদ্য ও দুগ্ধ বিতরণ করেন।

(খ) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত ৯ ও ১১ জুন দক্ষিণ কলিকাতার জলবন্দী বহু মানুষকে চিকিৎসা করেন।

(গ) বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের পরিচালনায় গত জুন মাসে হাওড়া জেলার নিশ্চিন্দা অঞ্চলের চারটি গ্রামের ১৪৮টি পরিবারের মধ্যে ৬০০ কিলো চাল, ১৪৫ কিলো ডাল, ৫৮০ কিলো আলু এবং ৩৮ কিলো লবণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২৫ কিলো জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার বিভিন্ন জলা অঞ্চলে ছড়ানো হয়।

(ঘ) মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে গত জুন মাসে মেদিনীপুর জেলায় ময়না অঞ্চলের তিলখোজা, বন্ধি, চোংরা এবং উত্তর অমুখা গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫৪টি পরিবারের ১৬৬০ জনের মধ্যে ৩৬০ কিলো চিঁড়া, ২৬০ কিলো গুড় এবং ১৬০ পাউণ্ড পাউরুটি বিতরণ করা হয়।

ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণ: উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর, ধর্মনগর ও কমলপুর অঞ্চলের ৪৫টি গ্রামের ২০১টি বন্যাপীড়িত পরিবারের মধ্যে ১৬১০খানা ধুতি, ১১৪০খানা শাড়ি, ৪০০০টি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা, ১০০০খানা তুলোর চাদর, ১৪০খানা উলের কম্বল, ২৫০ সেট বাসনপত্র, ২৮৮টি লণ্ঠন, ১৮২টি প্লাস্টিকের গ্লাস বিতরণের পর গত ২২ জুনে সেখানকার ত্রাণকার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আসামে বন্যাত্রাণ: করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতির মাধ্যমে বন্যার্তদের মধ্যে শাড়ি, ধুতি এবং জামাপ্যাণ্ট বিতরণের কার্য অব্যাহত রয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় শরণার্থী ত্রাণ: ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে মন্দাপম্ শিবির থেকে প্রাথমিক ত্রাণকার্য অব্যাহত রয়েছে।

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ: আর্থিক পুনর্বাসন ও গৃহনির্মাণের কার্য যথারীতি চলছে।

দ্বারোদ্ঘাটন

কাঁথি (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির গত ১৩ জুন, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ করেন।

গত ২০ জুন, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠস্থ তত্ত্বমন্দিরের নব-সংস্কৃত প্রার্থনাকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন পূজ্যপাদ মঠাধীশ মহারাজ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৩-র বি. এস্‌সি. পরীক্ষায় বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা রসায়ন

বিভাগে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

নিউদিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক ১৯৮৪-র পরীক্ষায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের একটি ছাত্র ১২শ স্থান লাভ করেছে। মেঘালয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদের এইচ. এস. এল. সি. পরীক্ষায় চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ছাত্রী ১০ম স্থান অধিকার করেছে।

১৯৮৪-র পূর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাবের পরিচালনায় যাদবপুর বিজ্ঞান-চক্রে বিজ্ঞানের 'মডেল' (model) প্রদর্শনীতে মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ১ম স্থান অধিকার করেছে।

যুবসম্মেলন

মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ২২ এপ্রিল ১৯৮৪, একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৫০ জন যুবক যোগদান করে। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মরিশাসের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী মি. জেম্‌স্ কেভিন্ গ্লোভার।

জাপানে নতুন কেন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে জাপানী ভক্তবৃন্দ টোকিওতে জাপান বেদান্ত সোসাইটি ('নিপ্পণ বেদান্ত ক্যোকাই') নামে একটি কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছায় কেন্দ্রটিকে বেলুড় মঠের শাখা-কেন্দ্র রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তদনুযায়ী স্বামী সিদ্ধার্থানন্দকে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি গত ২৭ জুন টোকিও পৌছে গেছেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

২৬ জুলাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয় এবং সন্ধ্যায় 'সারদানন্দ হলে' তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারাদানন্দ হলে' প্রতি রবিবার স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও গীতা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামী অজজানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বিদেহানন্দ (গঙ্গাচরণ মহারাজ) গত ২৫ জুন ভোর ৬ টায় মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল আকস্মিক বন্ধের ফলে হৃদ্‌যন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর কিছু শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয় এবং তাঁকে গত ২৩ জুন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কনখল সেবাশ্রমে যোগদান করেন। স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। তিনি রাঁচি (মোরাবাদি), কাঁথি, বোম্বে, উদ্বোধন, দিল্লী, বারাণসী সেবাশ্রম, রেঙ্গুন, জামতারা, কাঁকুড়গাছি, পুরী মঠ, শ্যামলাতাল, আলমোড়া, কামারপুকুর, রাজকোট প্রভৃতি আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে কর্মী ছিলেন। তাঁর সহজ সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।



বিবিধ সংবাদ

বিদেশিনীর চোখে হিন্দুধর্ম

সংবাদপত্র-সূত্রে জানা গেছে যে, স্টালিন-কন্যা শ্রীমতী শ্বেতলানা অললিলুয়েভা তাঁর সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'সুদূরের সঙ্গীত' গ্রন্থে অকপটে লিপিবদ্ধ করেছেন : ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি হিন্দুধর্ম, ভারতীয় দর্শন এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট। এমনকি ভারতেই স্থায়ী-ভাবে বসবাস করার প্রবল ইচ্ছা ছিল তাঁর। তারপর মস্কোতে একজন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ভারত ও ভারতের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পায় এবং সেই থেকেই তাঁর মধ্যে এক অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়। তাঁর নিজের ভাষায় : 'জড় মনন, আত্মমর্যাদাহীনতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা—এই সবকে মুছিয়ে দিয়েছিল ভারতের উষ্ণ শ্বাস, এবং আমি হঠাৎই শক্তি-শালিনী হয়ে উঠলাম, সেই ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই যেন গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াতাম। আর গান্ধীজীর সেই বাণীগুলি আমি মনে মনে চিন্তা করতাম।'

শ্রীমতী শ্বেতলানা বর্তমানে রয়েছেন ইংলণ্ডে। তাঁর উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব সম্পর্কে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন : 'ভারতের হিন্দুধর্ম আমার মনকে মুক্ত করেছে, চিন্তাশক্তিকে করেছে বিস্তৃত, ভারতমাতা—আমার প্রিয় পথ-প্রদর্শিকা মা।'

উৎসব

শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

রাউরকেলা (উড়িষ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ২ থেকে ৬ এপ্রিল ১৯৮৪, পাঁচদিনব্যাপী এক আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। এই আশ্রমের নবনির্মিত 'বিবেকানন্দ সন্ত ভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটনও তিনি করেন। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্র থেকে অনেক সাধু এবং দূর দূর অঞ্চল থেকে বহু ভক্ত নরনারী এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ধর্মসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী ভি. সুব্রহ্মণ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা

পাণ্ডু (আসাম) বিবেকানন্দ-পাঠচক্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ৮ থেকে ১১ এপ্রিল ১৯৮৪, চারদিনব্যাপী নানা আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৯ এপ্রিল, নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত নরনারীর সমাগম হয়েছিল।

বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থের ব্যবস্থাপনায় গত ৮ থেকে ১১ জুন, ১৯৮৪ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী বিকাশানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী আত্মদেবানন্দ, শ্রীপ্রভাতকুমার গাঙ্গুলী প্রমুখ।



৮৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৯১

দিব্য বাণী

শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস? সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাঁকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর central idea (মুখ্যভাব)-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

…শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি?

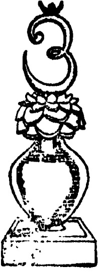
…সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার central idea (মুখ্যভাব), দেহ, জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

—যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যার আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪১৪—১৫]



কথাপ্রসঙ্গে

'করিষ্যে বচনং তব'

ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি মানবেতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন। কত সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইল, আরও কত যুগ চলিয়া যাইবে, মানুষ তথাপি দিনটিকে ভুলিয়া যায় নাই—ভুলিতে পারিবেও না। বহিঃপ্রকৃতিতে যেরূপ দিনের আলোক এবং রাত্রির অন্ধকার অবধারিত নিয়ম,—মানবের সমাজ-প্রকৃতিতেও সেইরূপ দিবস ও তিমির যেন এক চিরায়ত ধারা। মনুষ্যসমাজ একদা যখন গভীর তমসাবৃত—জীবনের সকল দিক ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঠিক সেই কালেই নিশানাথ চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার উদয়ে মানব পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। বর্ষণ-শ্রান্ত মেঘ-মলিন অষ্টমীর নিশাকাশে সহসা উদিত এই চন্দ্রিমা মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের যুগ-যুগব্যাপ্ত জমাট অন্ধকারে এক সুনিশ্চিত দিশারীস্বরূপ,—তাঁহার জীবন-কর্ম-শিক্ষা, আচরণ-উপদেশই আমাদের নিত্যসহচর গীতা। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়:

'দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥'

—পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই সর্বান্তর্যামী বিষ্ণু দেবরূপিণী দেবকীর ক্রোড়ে উদিত হইয়াছিলেন।

সঙ্কটাপন্ন মানবসমাজকে,—মানুষের মনুষ্যত্বকে চরম বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। হিংসা ও হানাহানিতে সমগ্র ভারত-মৃত্তিকাই যখন রুধিরাক্ত কুরুক্ষেত্র—ভারতের আকাশে বাতাসে যখন ধ্বংস-ধ্বনি নিয়ত অনুরণিত, ঠিক সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠোদ্‌গীত গম্ভীর সিংহনাদ—মানবকে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করিয়াছিল। শান্ত মধুর সেই সিংহনাদই শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা নামে জগতে প্রসিদ্ধ—'সর্বশাস্ত্রময়ী'রূপে যাহা সর্বকালে সর্বদেশে পূজিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত হইতেও আমরা জানিয়াছি, 'গীতা সব শাস্ত্রের সার।' গীতা শুধু শ্রীকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত বাণীমাত্রই নহে,—বস্তুতঃ গীতাই তাঁহার সঠিক জীবনবৃত্ত—তাঁহার জীবনের অন্তঃসৌরভ—তাঁহার হৃদয়স্বরূপ। 'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে সারমুত্তমম্।'

গীতা জ্ঞানের আকর। সংসার-মায়ায় বিভ্রান্ত অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ উপদেশ—যাহা সংগ্রাম-ক্লিষ্ট অর্জুনের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাই ভগবদ্গীতা। গীতা কেবল অর্জুনেরই নহে, সমগ্র মানবজাতির চিরন্তন জীবন-গীতিকা। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্য-ভূমিকায় এই গীতাকে অখিল বৈদিক জ্ঞানের সার-নিষ্কর্ষ এবং ইহার শিক্ষাকে মানবের সর্ব-পুরুষার্থসিদ্ধি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতম্…', 'তদর্থ-বিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ…'—ইহাই গীতা সম্পর্কে ভাষ্যকারের সঠিক উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সংসার-রণে হতবিহ্বল অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বটে, —কিন্তু একমাত্র উপলক্ষ করিয়া নহে। গীতা উদ্দিষ্ট হইয়াছে জগৎ-কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামশীল প্রতি মানবের জন্য। বিশেষভাবে যাহারা অর্জুনের ন্যায় স্ব-রাজ্য হইতে বঞ্চিত বিতাড়িত হইয়া বিষণ্ণ, বিভ্রান্ত—হৃতরাজ্য উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু মোহ-বশে পুরুষার্থ অবলম্বনে পশ্চাৎপদ, গীতা তাহাদের জন্য পরম পথপ্রদর্শিকা—প্রেরণাসঞ্চারিণী রণ-সঙ্গীত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে-সকল পথ-সঙ্কেত করিয়াছেন, বিষাদভারগ্রস্ত যে-কোন মানুষের পক্ষেই সেইগুলি দুঃখনিবৃত্তির পরম নিদান। দুঃখের নিরসন-পন্থাই মাত্র গীতার বক্তব্য নহে,—গীতা আনন্দলোকের বার্তাবহ। তাই দেখি, গীতার সূচনা বিষাদ-যোগে, কিন্তু পরিসমাপ্তি মোক্ষযোগে —পরমানন্দপ্রাপ্তিতে।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের ভয়াবহতা—স্ব-পরিজন ও আত্মীয়দের যুদ্ধার্থী ভূমিকা অর্জুনকে দারুণ বিষণ্ণ ও অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। গাণ্ডীবী অর্জুন ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া সহসা ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। অর্জুনের সেই তৎকালিক মোহ ও কর্মবিমুখতা দূর করিয়া তাঁহাকে স্বধর্মপালনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ-মুখোচ্চারিত এই গীতা,—মানবের আত্ম-দর্শনের রাজ্যে যাহা অমূল্য সম্পদ বিশেষ। বিষাদে দিশাহারা অর্জুন তাঁহার হিসাব-নিকাশের শেষ পর্যায়ে আসিয়া অনন্যোপায় হইয়া নিজ ভ্রান্ত অহঙ্কারকে মুখ ফুটিয়া স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ' ইত্যাদি অকপট স্বীকৃতির পরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া মিনতি জানাইয়াছিলেন, 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' অর্জুন তাঁহার 'বিষাদ'কে এইভাবেই 'যোগে' পরিণত করিয়াছিলেন। দুঃখে-বিপদে শোকে-বিষাদে আর্ত-বিলাপকে ভগবৎ-আর্তিতে পরিণত করাই যোগ। এই শরণাপত্তিযোগই বিষাদ হইতে ত্রাণের উপায়। সংসারে বিপন্ন সকলকেই ইহা জানিতে হইবে—অধ্যাত্মপথের যাত্রীর পক্ষেও ইহা অতিশয় তাৎপর্য-পূর্ণ শিক্ষা। এইরূপ বিষাদযোগীই শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণের ও ধারণের যথার্থ যোগ্য অধিকারী। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীভগবানও অর্জুনকে অতঃপর ক্রমে ক্রমে সকল উপদেশ দিয়াছেন—যাহা গীতার অষ্টাদশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত থাকিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে মোক্ষযোগে।

গীতার এই প্রারম্ভিক বিষাদযোগ—অন্যান্য শাস্ত্রপুরাণাদিতেও একটি বহু-উপদিষ্ট তত্ত্ব। শ্রীরামচন্দ্র যখন বিষাদাচ্ছন্ন তখনই গুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে জ্ঞানের কথা শুনাইয়াছেন,—যোগবাশিষ্ঠ যাহার নাম। যোগবাশিষ্ঠের পটভূমিও এই বিষাদ। শ্রীমদ্ভাগবতের মূলেও সেই বিষাদ-যোগেরই মূর্ছনা শুনিতে পাই আমরা। সম্রাট পরীক্ষিৎ বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াই বাদরায়ণি শুকমুখে ভাগবতকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন—যে-শ্রবণের সার্থক ফলশ্রুতি আমরা দেখিয়াছি তাঁহার মৃত্যু-ভয় অতিক্রমণে। সংসারের দুঃখ-শোক-ভয়-আতঙ্ক হইতে নিষ্কৃতির জন্য তাই গীতোক্ত বিষাদ-যোগ আমাদের নিকট এক অনির্বাণ আলোক-বর্তিকাস্বরূপ।

বিষাদযোগের অন্তর্নিহিত সাধনটি কিন্তু সংসারের উপর বিরক্তি,—অথবা 'আমি' 'আমার' ভাবকে ত্যাগ। ভাষান্তরে বলা চলে, সংসারের মায়িক রূপকে ত্যাগ করিয়া উহার সত্যস্বরূপে গমনের উদ্যোগই প্রকৃত অর্থে বিষাদযোগ। সরল কথায় বলিতে হয়—গীতার মর্ম নিহিত রহিয়াছে ত্যাগে, তাই উহার প্রথম যোগই বিষাদযোগ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালীন সমুত্থিত আবহ-গীতের প্রধান সুর—ত্যাগ। গীতার উপক্রমে ও উপশমে তাই

আমরা নিরন্তর ধ্বনিত শুনিতে পাই,—ত্যাগ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও এই কথাই সরল ভাষায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন : 'গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। "গীতা" "গীতা" দশবার বলতে গেলে "ত্যাগী" "ত্যাগী" হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা—"হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা কর।" সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।'

অধ্যায়ের পর অধ্যায় কর্ম-ভক্তি-ধ্যান-জ্ঞান-সম্বলিত বিচিত্র যোগসোপান বাহিয়া চলিতে চলিতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে উপনীত হইয়া শ্রীভগবান অর্জুনকে চরম উপদেশ দিয়াছেন—মোক্ষযোগ। সেখানেও সর্বস্বত্যাগের কথা। পার্থসারথি সেখানে সোচ্চারে জানাইয়াছেন—মোহবশে স্বভাবজ কর্মমাত্র ত্যাগ করিলেই ত্যাগ হয় না—উহা নিতান্তই সাময়িক। কারণ স্বভাব-প্রেরিত মানুষ কর্মবিহীন থাকিতেই পারে না—কর্ম তাহাকে করিতেই হয়। বিবেক ও বিচার সহায়ে সর্বতোভাবে অহঙ্কার ও বাসনাদি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। প্রকৃতির বা স্বভাবের আশ্রয় ত্যাগ তখনই সম্ভবপর হয়, যখন অন্তরে স্থির প্রত্যয় আসে যে সর্বভূতান্তর্যামী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন—তিনিই মায়াসূত্র-সহায়ে দেহাভিমানী জীবকে পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করাইতেছেন—সংসারের ঘাটে ঘাটে পরিভ্রামিত করাইতেছেন। জীবনে শান্তি বা মুক্তি লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির আনুগত্য ত্যাগ করিয়া ঐ সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের সম্যক্ শরণ লওয়া কর্তব্য। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার সর্বশেষ সুরটি যেন এই : হে জীব, 'মন্মনা' হও। যদি তাহা না পার, তবে 'মদ্‌ভক্ত' হইতে চেষ্টা কর। তাহাও না পারিলে, সংসারের সকল কাজের মধ্যে আমার পূজাপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর। উহাও যদি অসম্ভব মনে কর, তবে তোমার প্রতিটি কর্মই হউক আমার উদ্দেশে প্রণতি। তুমি আমারই শরণ লও—আমাতে শরণাগতিই সকল ধর্মের সারমর্ম—ধর্মাধর্মের মূল রহস্য।

গীতায় সনাতন ধর্মতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের মুখে সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মরাজ্য হইতে বিতাড়িত, সংসার-মোহে বিভ্রান্ত জীবকে তাহার হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইতে এই গীতা যেরূপ প্রেরণা দিয়াছে, বিশ্বের ধর্মসাহিত্যে উহার তুলনা মিলিবে না। মানুষকে তাহার সর্ববিধ ক্লীবতা পরিহার করিয়া পুরুষার্থ আশ্রয় করিতে গীতা পুনঃ পুনঃ শক্তি যোগাইয়া আসিতেছে। গীতার বাণীপ্রবাহ যেন নিরবচ্ছিন্ন এক প্রাণস্রোত, যাহা পৃথিবীর সকল স্তরের হৃতমান নিরাশ্রয় মানুষকে চিরদিনই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি দিবে,—আত্মরাজ্যে পুনর্বাসনে তাহাকে নিরন্তর সহায়তা করিতেই থাকিবে।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক,—কোথায় সেই আত্ম-রাজ্য? আর উহাকে হারাইবার কারণই বা কী? যাহা একবার হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে কি আবার ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব? শ্রীভগবান গীতামুখে এই সকলেরই জবাব দিয়াছেন, অতি সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায়। মোহাবিষ্ট গুড়াকেশকে তাঁহার হৃতরাজ্যের ঠিকানা শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বাতলাইয়া দিয়াছেন,—অধিকন্তু জানাইয়াছেন যে উহা হারায় না কদাপি, কিন্তু মোহের ঘোরে স্মৃতিভ্রংশ হইলে ঐরূপ হারাইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র। দৃষ্টি হইতে বাসনার ধূলি-আস্তরণকে বিবেক ও বিচারের দ্বারা সরাইতে পারিলে দেখা যাইবে আত্মার কোন অংশই হারায় না, হারাইবার নহে। সংসারের অজস্র রণ-কোলাহল, অস্ত্রের ঝনৎকার, গোলাবারুদের ধূম্রজাল, বিবেকী শাস্ত্রধী ব্যক্তিকে আদৌ পরাভূত করিতে পারে না—যদি সে আপন

দেহরথের সারথ্য শ্রীভগবানকেই আন্তরিক সমর্পণ করিতে পারে। সংসার-কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথির নির্দেশ অনুসরণ করিলে, সেখানে পরাভব অসম্ভব। ভগবৎশরণ—তাঁহাতেই মন-বুদ্ধি অর্পণ এবং সংসারেও বীরের ন্যায় প্রবল পুরুষকার সহ সংগ্রাম,—আত্মরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট কৌশল। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের ইহাই শিক্ষা। 'মামনুস্মর যুধ্য চ'—সংক্ষেপে ইহাই সর্বকালের গীতা।

গীতা-শ্রবণান্তে অর্জুন মোহ-বিমুক্ত হইয়া সহর্ষে বলিতে পারিয়াছিলেন: হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার যাবতীয় মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি আত্মসাম্রাজ্যের স্মৃতিকে ফিরিয়া পাইয়াছি;—তোমার উপদেশ আমার জীবনে স্থিতি আনয়ন করিয়াছে—আমার সকল সংশয় তিরোহিত এখন। আমি তাই অকপট হৃদয়ে বলিতেছি—তোমার কথাকেই জীবনে প্রতিপালন করিব। 'করিষ্যে বচনং তব'।

সংসার-সংগ্রামে আমাদেরও জীবন বহুধা-বিধ্বস্ত,—শ্রীকৃষ্ণকে আমরাও জানি, কিন্তু তাঁহাকে মানি কতখানি ইহাই কঠিন প্রশ্ন। আমাদেরও জীবন-রথে দণ্ডায়মান পার্থসারথির দিকে একটি-বারও ফিরিয়া তাকাইবার অবসর বা ইচ্ছা আছে কি? গীতা সকলেই আমরা পাঠ করি বা শ্রবণ করি,—কিন্তু গীতাকে বরণ করি কি? উদাত্ত কণ্ঠে বলিতে কি পারি: 'করিষ্যে বচনং তব'? শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে এই জিজ্ঞাসাই আমাদিগকে উদ্বেল করিয়া তুলুক।

হিয়ার মাঝে দিলে ধরা

শেখ সদরউদ্দীন

প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ,—সুপরিচিত কবি ও গীতিকার।

কেমন করে পূজব তোমায় জগন্মাতা তুমি বলো—
তোমার দেখা না পেয়ে মা, আঁখি করে ছলোছলো।
মন্দিরেতে ঢুকতে আমায় দেবে কিনা আশঙ্কায়—
দুয়ার থেকে বারে বারে ফিরে গেছি ক্লান্তকায়।

আমার মনের ব্যথা তুমি জানি নাক বুঝবে কিনা,
দুঃখ-ভরা করুণ রাগে ঝরে আমার হৃদয়-বীণা।
পথে পথে কেঁদে ফিরি মা-জননী দেখা দাও,
আমার কাতর কান্না শুনে বলো মাতা কী সুখ পাও?

চলার পথে হঠাৎ মাগো দৃষ্টি আমার হল একী!
যে দিকেতে তাকাই আমি সেই দিকেতে তোমায় দেখি!
মানুষ-গড়া দেবালয়ে ঢুকতে সাহস হয়নি হায়,
বিশাল নিখিল-মন্দিরেতে হেরি তোমার প্রতিমায়!

অসীম উদার নীলাকাশে তোমার রূপের নেইক তুল—
কাল-বোশেখের কালো মেঘে ওড়ে তোমার এলো চুল।

আলোয় ভুবন ভরে দিতে তোমার নয়ন-তপনটায়
উঠতে দেখি পুব গগনে, পশ্চিমে যে অস্ত যায়।

তোমার মধুর সুধার হাসি ঝরায় দেখি চন্দ্র ওই—
বৃক্ষ-লতায় সবুজ ঘাসে তোমার রূপে অবাক হই।
যে মহিমা বিপুলাকার গিরি-মরু-সিন্ধুতে,
সে মহিমাই ধরো তুমি একটি শিশিরবিন্দুতে।

সারা বিশ্ব-প্রকৃতিতে আকৃতি মা, হেরি তব—
নীল-সবুজে মিশে আছে কী মহিমা অভিনব।
তোমার হৃদয়-সুবাস নিয়ে ফুল-বাগিচায় ফুটছে ফুল—
তোমার গানের কূজন তুলে বিহগেরা আজ আকুল।

তোমার প্রাণের বাতাস নিয়ে বাঁচে জীব, মানুষ-জন,
তোমার উছল জীবন-স্রোতে নেচে চলে ঝরনা-মন।
শস্যক্ষেতে বসুন্ধরা-অন্নপূর্ণা তুমি হাসো—
ঘরে ঘরে লক্ষ্মীরূপে থাকতে তুমি ভালোবাসো।

নয়ন যখন অন্ধ ছিল মনে ছিল ব্যথা-দুখ,
তোমার আলোয় আঁখি মেলে হেরি আহা, তোমার মুখ।
দেখতে আমি চেয়েছিলাম মূর্তি তোমার, মৃন্ময়ী,
হিয়ার মাঝে দিলে ধরা নিখিল-মাতা চিন্ময়ী।

তুমি আমি

শ্রীমতী চিত্রা মিত্র
কবি ও লেখিকা।

অস্তাচলে দিনমণি, এখনি সন্ধ্যায়
জীবন-আকাশ হতে তারকার মতো
ঝরে যায়, চলে যায় আরো একদিন,
অর্থহীন ব্যর্থতায়—আরো কত শত।
কত যে বাসনা আছে হিয়ায় হিয়ায়,
কামনার অন্ত নাই—শুধু চাই চাই
না জানি কেমন করে তারে পাব শেষে
যারে পেলে এ সংসারে সব পাওয়া যায়।
তবু যা দিয়েছ মাগো, সে তোমারি দান;
ভুলায়েছ দিয়ে মোরে রঙীন খেলনা।

সারা দিন তাই নিয়ে ভুলে আছি আমি,
তবু কেন যামিনীতে কেঁদে ওঠে প্রাণ?
সব কিছু দিয়েছ মা, পুত্র পরিবার
ধন-জন-সুখ-শান্তি তবু কিছু আরো
চাহি মা যাহাতে পাই চরণ তোমার;
দাও মোর বক্ষ ভরে বেদনা অপার।
সে বেদনা বক্ষে লয়ে অশ্রু যাবে ঝরে।
সব পাওয়া তুচ্ছ হবে কামনার শেষে;
আর কেহ নাই সেথা শুধু তুমি, আমি
অমানিশা শেষ হবে আলোকের ভোরে।

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীজগৎনাথ বসু রায়কে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

BELUR MATH P. O.
DT. HOWRAH
24/1/30

শ্রীমান্ জগৎনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বাবা জপ করিতে বসিলে অনেক সময় শুধু মুখে বলা হয় লিখিয়াছ—তা হোক তার জন্য চিন্তিত হইও না—জপ করতে করতে তাঁর দিকে লক্ষ্য হবে—তখন আনন্দ পাইবে। ঠাকুরের কাছে আনন্দ ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিবে। তিনি যখন ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন তখন আনন্দ ভক্তি বিশ্বাস নিশ্চয় দেবেন—কোন চিন্তা নাই। বিষয়মুখী মন কি বাবা শীঘ্র তাঁর দিকে যেতে চায়—কত প্রার্থনা করতে হয়—তবে ত তাঁর দয়ায় সরস হয়। কোন ভাবনা করো না—তিনি ঠিক তোমাদের নিয়ে যাবেন।

আমার শরীর তত ভাল নয়—তবে তিনি এক প্রকার চালিয়ে দিচ্ছেন। মঠের অন্যান্য সব কুশল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি।
সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

BELUR MATH P. O.
DT. HOWRAH
8/6/30

শ্রীমান্ জগৎনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তোমার মনে যেসব কথা উঠিয়াছে তাহা স্বাভাবিক। তুমি যে এসব বিষয়ে চিন্তা কর—এত খুব ভাল। বুদ্ধিতে না নিলে কি হৃদয় সর্ব্ববিষয়ে সাড়া দেয়। তুমি খ্রীষ্টানদের কথা যা লিখিয়াছ—তাহাদের সহিত আমাদের মেলে না—উহারা বলে যীশুই ভগবানের সন্তান—আর সব ভগবানের প্রতিকৃতি অনুযায়ী তৈয়ারী। সেইজন্য যীশুই কেবল অবতার অর্থাৎ ভগবানের অংশ তাঁতে আছে। আমরা ত তা বলি না—তিনিই সর্ব্বভূতে জীব-জন্তুতে রয়েছেন—সকলেই তাঁর অংশ। এবং যার মধ্যে তাঁর বেশী প্রকাশ বা যার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে বেশী প্রকাশিত করেন—তিনিই অবতার, মহাপুরুষ—ঋষি, মহাত্মা ইত্যাদি। মানুষ যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে রয়েছে—তাহাকে যদি নিজের স্বরূপ জানতে হয় তাহা হইলে আবেষ্টনের বহির্ভূত মানবের প্রয়োজন। তাঁকে

দেখে—তবে, মানুষ নিজের স্বরূপের ও ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারে। তাই ভগবান্ মাঝে মাঝে লোককল্যাণের জন্য মানবরূপ ধরে অবতীর্ণ হন। নিজের জীবনে যুগোপযোগী সাধনপ্রণালী দেখিয়ে মানুষকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে যান। মানুষ যদি বিশ্বাস করে তাঁর জীবনাদর্শ অবলম্বন করে তাহা হইলে অনায়াসে মানবজীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে শান্তি ও চির আনন্দের অধিকারী হয়।

তাঁরা মানবশরীর ধারণ করে এলেও তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ এত দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবের ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ যে ধারণা আছে তদপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁদের সংস্পর্শে এসেই মানবের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার স্ফূর্ত্তি হয়। অতএব মানুষ যে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিবে বা মানবশরীর আছে বলিয়া অবতার বলিবে এবং ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবে—ইহাতে বিচিত্র কি। মানব যাহা হইতে চায়—যাহাকে পাইতে চায়—তাহা যদি সে তাঁহাতে পায় তাহা হইলে তাঁহাকে নিজ ইষ্ট গন্তব্য লক্ষ্য, প্রভু আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া করে কি বল।

যীশু কি ঠাকুর অবতার ছিলেন না স্বয়ং ঈশ্বর—মহাপুরুষ ছিলেন না সাধারণ মানব ছিলেন—তাহা বুঝিয়া ত কোন লাভ নাই। আর প্রথমে বোঝাও যায় না। ইন্দ্রিয় ও বিষয়াসক্ত বুদ্ধি নিয়ে কি তা বোঝা যায়। ভগবৎকৃপায় তাঁদের জীবনী ও শিক্ষা অবলম্বনে তোমার কল্যাণ হইবে—এইটীই যে স্থির করিতে পারিয়াছ—তাহাই জানবে যথেষ্ট। এই পুঁজিটুকু নিয়ে সাধনভজনে লেগে যাও—এগিয়ে পড়—চিত্ত শুদ্ধ হইবে—শুদ্ধ মন বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিবে তিনি কে—তুমি কে—তোমাতে ও তাঁতে কি সম্বন্ধ। আমি বলি[লে] ও বুঝিবে না। তাঁদের অবতার না বল—মহাপুরুষ না বল—ভগবান না বল কিছুই এসে যায় না—কিন্তু তাঁর শিক্ষাদীক্ষা যেন ছেড়ো না—ধরে থাকতে পার[লে] শান্তি নিশ্চয়ই পাইবে—তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। কোন চিন্তা নাই। তবে এটা বলে রাখি—ঠাকুরকে অবতার বলিলে ছোট করা হয়—স্বয়ং ভগবান বা ঈশ্বর বলিলেও ঠিক ব্যাখ্যা করা হয় না। তিনি অভূতপূর্ব্ব—কল্পনাতীত লোকোত্তর চরিত্র ছিলেন।

প্রার্থনা করি—তোমার সকল সন্দেহ তিনি দূর করে দিন ও তুমি শান্তির অধিকারী হও। ভগবান মানবশরীর কেন—তিনি যখন ইচ্ছা যেকোন রূপ ধরতে পারেন। একই সময়ে এক—বহু [,] সব হতে পারেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে ও বাড়ীতে সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জঙ্গীপুর কলেজ ও ত্রিপুরা কৈলাসহর মহাবিদ্যালয়। সংস্কৃত, বাংলা এবং পালিভাষা তথা বৌদ্ধ ইতিহাস-দর্শনে গবেষক পণ্ডিত। নেতাজী ইন্‌স্টিটিউট ফর্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

শ্রীকৃষ্ণ ভারতের সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র : শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ হিসাবে, ভগবানের অবতার হিসাবে অথবা আদর্শ মানুষ হিসাবে—ভারতবর্ষে সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করে আসছেন। কেউ হৃদয়ের আবেগ দিয়ে, কেউ বুদ্ধি দিয়ে,—কেউ বা আবেগ-শ্রদ্ধা-বুদ্ধি-মিশ্র বিচার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকে উপলব্ধি করে মুগ্ধ ও ধন্য হন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বহু বক্তৃতায়, পত্রাবলীতে এবং কথোপকথনে ভারতসংস্কৃতির প্রতিভূ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ সশ্রদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণভাবে উল্লিখিত হয়েছেন।

"আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবিপ্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান।" (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, সং ১৩৬৯, পৃঃ ৪২৮)

স্বামীজীর দৃষ্টিতে বিচার করতে না পারলে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ জেনে শুধু তাঁর পূজা করলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। তিনি যে আমাদের ভারতবর্ষের বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ধর্মশাস্ত্র প্রতিপাদ্য জীবনচর্যার নির্যাস,—এ-কথাটাই স্বামীজী বহুস্থানে, বহুভাবে আমাদের বুঝোবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সামঞ্জস্য-পূর্ণ জীবনাদর্শকে নিয়েই আবার নবভারতের অভ্যুদয় সম্ভব—স্বামীজী এ-কথাও স্পষ্ট বলেছেন।

ভারতের সনাতন শাস্ত্র বেদ,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বেদমূর্তি : আমরা যে কোন পন্থাকে অবলম্বন করেই ধর্মাচরণ করি না কেন, অথবা যে কোন অবতার বা মহাপুরুষকে আশ্রয় করে অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি না কেন,—আমাদের বিচার করে দেখতে হবে আমাদের উপাসনা পদ্ধতি এবং মূল লক্ষ্য বেদানুগ কিনা। সনাতন তত্ত্বসমূহই আমাদের ধর্মসাধনার মূল ভিত্তি।

বেদ আমাদের সনাতন শাস্ত্র। বেদ সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা। বেদানুমোদিত ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্ম বলতে আমরা বিশেষ কোন স্থানের, কালের বা মানবগোষ্ঠীর ধর্মকে বুঝি না। সনাতন ধর্ম সর্বকালের সর্বমানবের ধর্ম। এই ধর্মের কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করেছেন। তাই তিনি ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতিভূ। স্বামীজীর চিন্তায় : "সনাতন তত্ত্ব-সমূহই যেন তোমার ধর্মসাধনের মূল ভিত্তি হয়। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য হইবে—যে-কোন অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ বলিয়াই তিনি আমাদের মান্য। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩)

শ্রীকৃষ্ণ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা নিজস্ব কোন মত প্রচার করেননি। তিনি ছিলেন বৈদিক ধর্মেরই প্রবক্তা। বৈদিক সনাতন ধর্ম যখন কালবশে

বিশেষ গণ্ডীবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে যাচ্ছিল তখনই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে ভারতের বৈদিক সনাতন ধর্মের বৈচিত্র্য এবং অধিকারী ভেদে তাকে বিভিন্নভাবে গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন। স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণের এই মহৎ উপলব্ধি এবং প্রচারের কথাকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন :

"'ধর্ম' এক তবে 'সম্প্রদায়' অনেক।...সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই (প্রচার করে), ঘোষণা করিতে ছাড়ে না যে, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে 'ধর্ম' বিশ্বাস করে যে, জগতে একটি মাত্র ধর্মই চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও আছে। দুইটি ধর্ম কখনও ছিল না।...আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁহার বিশাল হৃদয় সর্বপ্রথম, সকল মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কথা প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।" (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)

শ্রীকৃষ্ণ-উপদিষ্ট ধর্মই সকল ধর্মের মূল উৎস : শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক সনাতন ধর্মকেই প্রচার করেছেন। এই সনাতন ধর্মই পরবর্তী কালে ভারতে এবং ভারতেতর দেশের অবতারকল্প পুরুষের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। বিচার করে দেখতে গেলে পরবর্তী ধর্মে নূতনত্ব কিছুই নেই। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগ—অথবা যে কোন উপায়েই অধ্যাত্ম সাধনা উপদিষ্ট হোক না কেন —সর্বপ্রকার উপাসনার সিদ্ধির কথাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতায় বলে গেছেন। আর গীতা হল বেদেরই ভাষ্য,—শ্রীকৃষ্ণ বেদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। এই সম্পর্কে স্বামীজীর উক্তি :

"কৃষ্ণের প্রাচীন বাণী—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ—এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয়। এই তিনজনের প্রত্যেকেই এক একটি মত প্রবর্তন করিয়া চূড়ান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মহাপুরুষগণের পূর্ববর্তী। তবু আমরা বলিতে পারি, কৃষ্ণ পুরাতন ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, যদিও তাঁহার বাণীই প্রাচীনতম, বৌদ্ধধর্মের প্রগতি-তরঙ্গে তাঁহার বাণী সাময়িকভাবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী।" (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৬)

শ্রীকৃষ্ণই বেদের গুহানিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে সাধারণ লোকের উপযোগী করে প্রচার করার প্রয়োজন অনুভব করেন। পুরাণগুলি গৌণভাবে কাহিনী বিশেষকে অবলম্বন করে—সেই বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্মবোধকেই সাধারণ লোক-চেতনাগ্রাহ্য করেছে। আর লোকনায়ক শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধারণীকরণের প্রথম উদ্গাতা। আধ্যাত্মিকতার গূঢ়তম তত্ত্বকে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করার জন্যই স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—"মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" পুরাণের উৎপত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের অবদান সম্পর্কে স্বামীজীর উক্তি :

"হিন্দুধর্মের সু-উচ্চ ভাবগুলি জনতার কাছে পৌঁছিয়া দিবার চেষ্টা হইতেই পুরাণগুলির উৎপত্তি। ভারতবর্ষে একজনই মাত্র এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, এবং সম্ভবতঃ তিনি মানবেতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" (বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩)

শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবানের অবতার? অবতার সম্পর্কে সাধারণ হিন্দুর যে ধারণা এবং ভারতে দশ অবতারের যে বর্ণনা আছে শ্রীকৃষ্ণ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন। অবতারের প্রয়োজন সম্পর্কে সকল হিন্দুই সচেতন। ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থানের যুগে ভগবান্ স্বয়ং ধরাধামে অবতীর্ণ হন দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য এবং ধর্মকে পুনঃ সংস্থাপনের

জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতায় বলেছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" (গীতা, ৪।৮) শ্রীকৃষ্ণকে আমরা 'অবতার' বলি বা না বলি, তিনি যে ভারতের সনাতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধর্ম সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য, যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত এবং সর্বসাধারণের আচরণযোগ্য বিধান এবং উপায়গুলি শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট গীতা থেকেই আমরা পেয়ে থাকি। সুতরাং ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য বা প্রবক্তা হলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—"আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ"—(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।২৬)।

স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বা আচার্যরূপে সর্বাধিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করে বলেছেন—অন্যান্য অবতারগণ ভগবানের অংশ বা কলা,—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।"…যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' (শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।২৮)—অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯)

অন্যান্য অবতারগণ স্থান এবং কাল বিশেষে যেভাবে ধর্ম সংস্থাপন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা ব্যাপকতর ভাবে ও চিরন্তন কালে গ্রহণযোগ্য ধর্ম (বেদ) নিজ জীবনে আচরণ করে দেখিয়েছেন। স্বামীজী স্থানান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারই বলেছেন—"ঈশ্বর তোমাদের নিকট মানবরূপেই আবির্ভূত হন।…ভারতেও এই অবতারবাদ রহিয়াছে। ভারতে মহান অবতারগণের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ…।" ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১)

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিকতা : শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীজী বহুস্থলেই মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং অবতারগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই বর্ণনা করেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিষ্য, বন্ধু এবং অনুগামিগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে স্বামীজী সময় ও ব্যক্তি উপযোগী সদুত্তর দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের উপর তিনি কখনও গুরুত্ব দেননি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এবং অনাসক্ত বলিষ্ঠ চরিত্রগুণের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কল্পিত হলেও এইরূপ পূর্ণ জীবনই মানবজাতির আধ্যাত্মিক চিন্তার পরাকাষ্ঠা। ইহাই স্বামীজীর বক্তব্য।

পুরাণ গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে স্বামীজী মাদুরায় কথোপকথনে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা এখানে স্মরণীয়ঃ "কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। আর যদিও সেগুলিতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ।…রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮) শ্রীরামকৃষ্ণের পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নরেন্দ্রনাথ আমবাগানে পাতাগণনা করা অপেক্ষা ফল খাওয়া যে বুদ্ধিমানের কাজ—সেটা শাস্ত্রের অবান্তর বিচার না করে তত্ত্বজ্ঞানকে গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েই বুঝিয়ে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিকতার কুহেলিকায় প্রবেশ না করে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সর্বপ্রকার লীলারই যে অপরূপ ব্যাখ্যা স্বামীজী দিয়েছেন—

তা একমাত্র তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামীজীর ব্যাখ্যারই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বর্তমান ভারতের নবজাগরণের একমাত্র আদর্শ চরিত্র রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই বর্তমান ভারতের একমাত্র আদর্শ জাতীয় দেবতা। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যদি "মানবতা" বা "মানবধর্ম" বলে কিছু থাকে—সেখানেও আমাদের শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিষ্ঠিত করলে ঠিক ঠিক মানানসই হবে। যথার্থ মানবতা বা মানবধর্মের একমাত্র আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। স্বামীজীর দৃষ্টিতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ সত্তা এবং মানবীয় রূপ উভয়ই যথার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝা ভুল হবে।

শ্রীকৃষ্ণ—গৃহী এবং সন্ন্যাসীর সমন্বিত আদর্শ : গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই ভারতের চিরন্তন আদর্শ নিহিত। গীতায় নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এবং যোগসাধনার যে কোন একটি বা কয়েকটির সহায়ে চরম অধ্যাত্ম উপলব্ধির কথা উপদিষ্ট হয়েছে। মানুষের রুচিভেদে বিভিন্নভাবে সাধনার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যেকটি পন্থাসহায়ে চরমসত্য লাভের কথা শ্রীকৃষ্ণই সর্বপ্রথম বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য বেদের "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—এই মহাবাক্যের মধ্যে গীতাকারের উক্তির বীজ নিহিত আছে। কিন্তু এই সত্যকে নিজ জীবনে উপলব্ধি করে প্রচার করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর উপদেশ তাঁর নিজ জীবনে মূর্ত হয়েছিল বলেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রবক্তা। স্বামীজী আমাদের কাছে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের এই সর্বজনগ্রাহ্য রূপটিই প্রকট করে তুলে ধরেছেন :

"কৃষ্ণ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর কথা লইয়া সময় নষ্ট করিও না; তাঁহার জীবনের মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অবলম্বন কর।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)

"তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণ-চরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন।...তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা,—যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই।" (ঐ, পৃঃ ১৫০) "গীতা পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত গীতার বাণীর কি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৬) "কৃষ্ণের মধ্যে আমরা পাই...তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাব: প্রথম —বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও চরম লক্ষ্য—পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে। ফলতঃ কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।" (ঐ, পৃঃ ৩১০)

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার স্বরূপ উপলব্ধি : শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা,—বিশেষতঃ গোপীপ্রেম সাধারণ ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকের কাছে দুর্বোধ্য। গীতিকাব্য, পদাবলী, নাটক ও যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে আমরা যে বৃন্দাবনলীলার লৌকিক চিত্রটি পাই—তার রসোপলব্ধি আমাদের কাছে যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়। স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত রাসলীলা বা গোপী-প্রেমের 'ঐতিহাসিকতা'কে উপেক্ষা করেননি। নিজে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন প্রত্যক্ষ করে গোপীপ্রেমের যথার্থ উপলব্ধি কিভাবে সম্ভব তা আলোচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের বিরাট ব্যক্তিত্ব থেকে তিনি বৃন্দাবনলীলাকে বর্জন করতে চাননি। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয়োচিত রজোগুণের কথা এবং তাঁর অনাসক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা যুগপৎ স্মরণ রেখেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেমলীলা এবং মধুর-ভাবকে উপলব্ধি করতে উপদেশ দিয়েছেন। স্বামীজীর মূল বক্তব্য,—ইন্দ্রিয়াসক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেই গোপীপ্রেম,—ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী আকর্ষণ অনুভব করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়াসক্তির জগতে অবস্থান করে বৃন্দাবনের প্রেমলীলা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

"শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোপীরা—সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সব কিছু ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের সুখদুঃখ ভুলিয়া—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ; তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পারো; তোমার কি মন মুখ এক? 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না; এই দুইটি কখনও একত্র থাকে না।" (বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৪)

"মহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগে ও প্রেমে অহংজ্ঞানশূন্য ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন"। (ঐ, পৃঃ ১১)

"বাল্যকালে যে শ্রীকৃষ্ণ সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি সেই সরল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।"..."এই গোপী-প্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫০)

"এই প্রেমের মহিমা আর কি বলিব!...গোপী-প্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বোধের অভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে পারে না।...আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহারা গোপী-প্রেমের নাম শুনিলে উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে শুধু এইটুকু বলিতে চাই—নিজের মন আগে শুদ্ধ কর।" "প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড়ো দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ জিনিস যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা।" (ঐ, পৃঃ ১৫১—৫২)

স্বামীজী গোপীপ্রেমের এতই মূল্য দিয়াছেন যে তিনি বলেন,—"কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া।" (ঐ, পৃঃ ১৫২)

মধুরভাব-সাধন-সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারক, বেদান্তবাদী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষেই গোপীপ্রেমের উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা সম্ভব। স্বামীজীই নবযুগের গোপীলীলার শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা এবং ব্যাখ্যাতা। কারণ এই শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি বর্তমান ভারতের আদর্শ-রূপে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উদার আদর্শই ভারতের আদর্শ : অধ্যাত্ম সাধনার মতবৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধনে, পুরুষকার হৃদয়বৃত্তির সুষম বিকাশ সাধনে,

—অন্যায় প্রতিরোধের সাহসিকতায়—এবং পরিশেষে সর্বত্যাগের আদর্শে উন্নীত হবার জন্য—বর্তমান ভারতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রই একমাত্র আদর্শ—এবং ভগবদ্গীতাই একমাত্র শাস্ত্র। স্বামীজী দেশে-বিদেশে ভারতের যে মর্মবাণী প্রচার করেছেন—এই বাণীর মূর্তরূপ শ্রীকৃষ্ণ। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি গীতামূর্তি শ্রীকৃষ্ণকেই আদর্শ করতে উপদেশ দিয়েছেন ঃ শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের মধ্যেই স্বামীজী বর্তমান রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজসংস্কার এবং অধ্যাত্ম সাধনা—সব কিছুরই সমন্বয়ধর্মী সমাধান আবিষ্কার করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকার করে তাকে উন্নতির চরম শীর্ষে উত্তোলনের পন্থার দিশারী শ্রীকৃষ্ণ। "গীতার বাক্যসমূহ—শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর মহতী বাণী সকলের বন্ধন, সকলের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরমপদলাভের অধিকার ঘোষণা করে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬)

"যদি ভারতে নূতন কোন ভাব আসে, আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তাকে আত্মসাৎ করে নিই, অন্যান্য ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, কারণ আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণই প্রথম এই পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন।" (ঐ, পৃঃ ৪১৪)। (শ্রীকৃষ্ণ) "তাঁর অপূর্ব উদারতা দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন।" (ঐ, পৃঃ ৪১৫) "শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি।" (ঐ, ৮ম, খণ্ড, পৃঃ ৪২৮) "তারপর হৃদয়বত্তা! বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।" (ঐ, পৃঃ ৪২৯) "যেদিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect (সর্বাঙ্গসুন্দর)। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই।...এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা।...তবে তো লোকে মহা উদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে।...মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল,না আছে পরকাল।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৬) "গীতা সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।" (ঐ, পৃঃ ১৪৫)

উপসংহার — শ্রীকৃষ্ণের বাণীরই নবরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ স্বামীজীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয়েছিল "সেই শ্রীকৃষ্ণই ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ।" শ্রীরামকৃষ্ণের যে বৈদিক সনাতন ধর্ম "নানা-মত-পথে" সমন্বিত হয়েছে,—শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেও ঠিক তাই হয়েছিল। গীতা শাস্ত্রে এবং শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে যে অনাসক্তি ও ত্যাগের বাণী এবং চর্যা মূর্ত হয়েছিল,—শ্রীরামকৃষ্ণেও তা-ই হয়েছে—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। স্বামীজীর বিচারে শ্রীকৃষ্ণ "সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেও বেদ-বেদান্তের "মত-পথ"গুলি শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মতোই আচরিত এবং ব্যাখ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও পথ—বেদমূল এবং শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে ব্যাখ্যাত ধারারই অনুরূপ। তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কালের ব্যবধানে অস্পষ্ট,—শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে বলে আদর্শরূপে সহজগ্রাহ্য। শ্রীকৃষ্ণ যদি জাতির আদর্শ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আদর্শেরই মূর্ত প্রেরণা।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বাধীনতা আন্দোলনকালে অনুন্নত হিন্দুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর। তাঁর প্রতিভা ছিল, তার থেকে কম ছিল না তাঁর জ্বালা। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন, এবং তা অনুন্নতদের অনুভব করাতে চেয়েছেন। এই কাজে তিনি সবচেয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন শাসক ইংরেজদের কাছ থেকে; বলা বাহুল্য, অনুন্নত হিন্দুদের প্রতি ভালবাসায় ডোবানো ছিল না ঐ সাহায্যের হস্ত। আম্বেদকর সাগ্রহে সেই পাণি গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুটা নিজের শক্তিতে, বেশিটা শাসকদের শক্তিতে, অনুন্নতদের নেতা হয়ে বসেছিলেন। ঐকালে দেখা যায়, আম্বেদকর প্রবলভাবে হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের নিন্দা করে যাচ্ছেন। এবং নিন্দাতেই তিনি কর্তব্য শেষ করছেন না, সদলবলে ধর্মত্যাগের হুমকিও দিচ্ছেন। নিন্দনীয় বস্তুকে নিন্দা করলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আপত্তি থাকতে পারে না, কিন্তু যদি দেখা যায়—তার দ্বারা যথেষ্ট বিভক্ত ভারতীয় সমাজ আরও বিভেদের সম্মুখীন হচ্ছে তাহলে সে-কাজকে আপত্তিকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্য গান্ধীজীকে আম্বেদকরের ভেদনীতির প্রতিবাদ বারে বারে করতে হয়েছে।

"ডাঃ আম্বেদকরস্ ইনডাইট্‌মেন্ট্"—এই নামে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় ১১. ৭. ১৯৩৬ এবং ১৮. ৭. ১৯৩৬—পরপর দুটি প্রবন্ধ লেখেন। "জাত-পাত-তোড়ক-মণ্ডল"-এর লাহোর অধিবেশনে আম্বেদকর সভাপতিত্ব করবেন, এমন কথা ছিল। কিন্তু তাঁর লিখিত ভাষণ অভ্যর্থনা সমিতির মনঃপূত না হওয়ায় সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়। গান্ধীজী বলেন, এটি অত্যন্ত অনুচিত কাজ হয়েছে। আম্বেদকরকে ভাষণ পড়তে দেওয়া উচিত ছিল। সকলেই জানেন, ডাঃ আম্বেদকর হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে বিরূপ, এমন কি তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতেও ইচ্ছুক। "ভবিষ্যতে যে-চিহ্নই তিনি গ্রহণ করুন, ডাঃ আম্বেদকর বিস্মৃতিতে হারিয়ে যাবার মানুষ নন।" গান্ধীজী আম্বেদকরের মুদ্রিত ভাষণটি সম্বন্ধে বলেন, "কোন সংস্কারকই এটিকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।" "ডাঃ আম্বেদকর হিন্দুধর্মের কাছে চ্যালেঞ্জ।" আম্বেদকর দেখাতে চেয়েছেন, অস্পৃশ্যতার মতো অমানবিক প্রথার সমর্থন আছে হিন্দুশাস্ত্রে ইত্যাদি। গান্ধীজী উত্তরে বলেছেন, আম্বেদকর যেসব বইকে হিন্দুশাস্ত্র বলেছেন, বস্তুতঃ সেগুলি সবই শাস্ত্র নয়। "স্মৃতিকে ঈশ্বরবাক্য বলা যায় না। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর মূল শাস্ত্র।" শাস্ত্রের নানা রূপ, মানুষভেদে তাদের ভিন্ন আবেদন। "কিন্তু এমন কোন কিছুকেই ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ করা যাবে না যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কিংবা আধ্যাত্মিকভাবে যাকে উপলব্ধি করা যায় না।" "জাতিভেদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই; [গান্ধীজী আরও বলেন]···আমি জানি, জাতিভেদ জাতীয় জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের প্রতিবন্ধক। বর্ণ এবং আশ্রম—এই দুই জিনিসের সঙ্গে জাতিভেদের কোন সম্পর্ক নেই। বর্ণপ্রথা বলে, আমাদের প্রত্যেককে বংশগত রীতি অনুযায়ী অন্নসংস্থান করতে হবে। এর মধ্যে আমাদের অধিকারনীতি নয়, কর্তব্যনীতিই রয়েছে।···এতে আরও পাই—কোন কাজই অতীব নিম্ন বা অতীব উচ্চ নয়। সকলই উত্তম,

বৈধ এবং সমমর্যাদার। ব্রাহ্মণের এবং ঝাড়ুদারের বৃত্তি সমমর্যাদার, উপযুক্তভাবে তারা কর্তব্যপালন করলে ঈশ্বরের কাছে সমমূল্য লাভ করবে।... কোন একটি বর্ণ কর্তৃক অন্য বর্ণের উপর আধিপত্যদাবি নীতিগর্হিত। আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে কোথাও অস্পৃশ্যতার সমর্থন নেই।"

গান্ধীজী বললেন, যেসব শাস্ত্রের প্রামাণিকতা সন্দেহজনক তেমন অনেক শাস্ত্র থেকে আম্বেদকর নিজপক্ষে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এবং তিনি শাস্ত্রবাণী বিকৃতও করেছেন। তাঁর বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করলে কেবল হিন্দুধর্ম নয়, অন্য ধর্মগুলিও ব্যর্থ প্রতীয়মান হবে। তিনি আরও বললেন,

"শ্রীচৈতন্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম, তিরুবল্লুবর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ প্রমুখ বহুজন (এবং আরও অনেকে যাঁদের নাম স্বচ্ছন্দে এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়) যে-ধর্মের প্রচার করেছেন, সেই ধর্ম কি ডাঃ আম্বেদকর তাঁর ভাষণে যেভাবে উপস্থিত করেছেন সেই প্রকারে সম্পূর্ণ অসার? ধর্মের গুণবিচার হওয়া উচিত তার মন্দ নমুনা থেকে নয়, সর্বোচ্চ সৃষ্টিগুলির দ্বারাই।"[১]

কোট্টায়ামে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার মহারাজা দান করেন। জায়গাটি খ্রীষ্টান মিশনারিদের বড় ঘাঁটি। হরিজনদের ধর্মত্যাগ করানোয় ওঁদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। মন্দিরের সামনে এক বৃহৎ জনসভায় ১৯. ১. ১৯৩৭, গান্ধীজী বলেন,

"অনুন্নত সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মানুষ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক, এই শুনে আমি দুঃখবোধ করেছি। সমপরিমাণে দুঃখ পেয়েছি এই শুনে যে, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরা এইসব লোককে ছিপে গাঁথবার জন্য তৈরি হয়ে আছে।...তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একথা মনে করো—তেমন মনে করার মানুষ আছেই—হিন্দুধর্ম জঘন্য আচার ও কুসংস্কারের আকর, হিন্দুধর্ম মানবসমাজে বিরাট প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়, তাহলে তোমরা অবর্ণ বা সবর্ণ হিন্দুদের কাছে ঐ 'প্রতারণা' উদ্ঘাটন করে দেওয়ার চেয়ে বড় সেবা আর কিছু করবে না।... কিন্তু আমি সারা ভারতের বহু খ্রীষ্টানের কথা জানি যাঁরা হিন্দুধর্মকে মানবসমাজে প্রতারণা বলে কিংবা কেবল মন্দ আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের আকর বলে মনে করেন না। যে-ধর্ম রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, শঙ্কর এবং বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে তা কেবল কুসংস্কারের আকর হতে পারে না। তোমরা জানো, আর যদি না জানো তাহলে শোনো, আমি ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবীর সকল ধর্মনীতিকে কেবল সত্য মনে করি না, তাদের সমপর্যায়ের মনে করি।"[২]

কয়েক মাসের মধ্যে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকার এক প্রবন্ধে (৬. ৩. ১৯৩৭) খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্মান্তর-চেষ্টার কঠোর সমালোচনা করলেন। এক ব্যক্তি ধর্মান্তর সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানিয়ে চিঠি লেখেন। তিনি মিশনারিদের লোকসেবার বিশেষ প্রশংসা করেন। ওঁরা টাকার হিসাব দেন, ওঁদের উপাসনালয় সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত; অন্যদিকে হিন্দু-মঠে লক্ষ-লক্ষ টাকা জমে আছে, কিন্তু তার হিসাব নেই, এবং সাধারণের উপকার তাতে ঘটে না, এক্ষেত্রে হরিজনেরা চঞ্চল হবেই; কেবল তত্ত্বে চলে না, তার বাস্তব রূপায়ণ চাই, ইত্যাদি। পত্রলেখক অবশ্য বিবেকানন্দ ও রাধাকৃষ্ণণ-প্রতিপাদিত হিন্দুধর্মতত্ত্বের মহিমা স্বীকার করেছিলেন।

১ Gandhi Works, Vol. 63, P. 154

২ Ibid., Vol. 64, P. 289

গান্ধীজী উত্তরে বিরোধী সমালোচনার অনেক কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সত্যই অনেক মঠের লজ্জাজনক অবস্থা। সেখানকার অর্থ লোক-সেবায় ব্যয় করা হয় না, তাও ঠিক। মিশনারিদের জনসেবার কার্যের মূল্যও স্বীকার্য। কিন্তু এই স্বীকৃতির দ্বারা পত্রলেখকের সিদ্ধান্তে গান্ধীজীর সায় ছিল, এমন না মনে করা হয়। তিনি আরও বলেছিলেন, অন্য দরিদ্র হিন্দুদের মতো হরিজনদের আর্থিক ও শিক্ষাগত সাহায্য প্রয়োজন। সামাজিক কারণে হরিজনদের অবস্থা অন্য দরিদ্র হিন্দুদের চেয়ে অধিক মন্দ। "যে-শৃঙ্খলে হরিজনরা বাঁধা আছে, যদি তারা সে শৃঙ্খলকে আঁকড়ে থাকেও, উচ্চতর হিন্দুদের কর্তব্য তাকে ছিন্ন করা।"

এর পরে গান্ধীজী হিন্দুসমাজ ও ধর্মের সপক্ষে যে সুদৃঢ় সমর্থন জানালেন তা যে বহুলাংশে বিবেকানন্দেরই কথা তাতে সন্দেহ নেই :

"পত্রলেখক বিবেকানন্দ ও রাধাকৃষ্ণণ-প্রতিপাদিত হিন্দুধর্মের সমুচ্চ মহিমা স্বীকার করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতি তাঁকে একটি আবিষ্কারে পরিচালিত করতে পারত—কিভাবে হিন্দুধর্ম জনসাধারণের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। আমি সাহসের সঙ্গে একথা বলব, গ্রামের মানুষদের স্থূলতা সত্ত্বেও, মানবপ্রকৃতির সর্বোত্তম গুণগুলির হিসাব নিলে বলতে হবে—ভারতের এই গ্রাম্য মানুষগুলি পৃথিবীর যে-কোন গ্রামের মানুষের তুলনায় একটুও পিছিয়ে নেই, বরং অগ্রণী। হিউ-এন-সাং-এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব বিদেশী পর্যটক এদেশে এসেছেন, তাঁরাই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ভারতীয় গ্রাম্য মানুষদের জীবনগত সংস্কৃতি, তাদের কুটীরের শিল্পসুষমা, তাদের সংযত আচার-আচরণ—এই সকলই নিশ্চয় ধর্মপ্রভাবে, যা তাদের স্মরণাতীত কাল থেকে আবদ্ধ রেখেছে।

"হিন্দুধর্মকে তুচ্ছ করার প্রয়াসকালে লেখক একটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ-তথ্য উপেক্ষা করেছেন—এই ধর্ম এমন একদল সংস্কারকের জন্ম দিয়েছেন যাঁরা সাফল্যের সঙ্গে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও অপরাপর দোষের উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পেরেছেন। ঢাক না পিটিয়ে হিন্দুধর্ম দরিদ্রসেবার এমন এক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পেরেছে যা অনেক বিদেশী অনুরাগীর কাছে ঈর্ষাজনক বলে মনে হয়েছে।··· যাঁরা ঘুরে দেখতে চান তাঁরাই দেখতে পাবেন—কিভাবে দেশীয় পদ্ধতিতে [দরিদ্রদের জন্য] খয়রাতি আহার্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

গান্ধীজী বললেন, মঠ বন্ধ করে দিয়ে স্কুল খুলে দিলেই জনসাধারণের আলস্য বা শৈথিল্য দূর হবে না; লোকে মঠে টাকা দেওয়া বন্ধ করলেই অনাহার ঘুচবে না, কিংবা গ্রামে-গ্রামে স্কুল গজিয়ে উঠবে না। গ্রামবাসীকে কাজ করার শিক্ষা দিলেই ঐসব ব্যাপার ঘটতে পারে। তারপর বললেন,

"শেষতঃ মনে হচ্ছে, আমরা যে মিশনারিদের মানবসেবার সুবিধা গ্রহণ করি, তাতে পত্র-লেখকের আপত্তি আছে। পত্রলেখক কি এইসব মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন? মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি কেন অ-খ্রীষ্টান সাহায্য গ্রহণ করবেন? এই মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি তো ভারতবাসীকে তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ছাড়াবার জন্যই স্থাপিত—যে ধর্মের [মহান রূপের] প্রচার করেছেন বিবেকানন্দ এবং রাধাকৃষ্ণণ। পত্রলেখক ও তাঁর সমর্থকরা ঐসব মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের দুমুখো নীতি ছাড়াবার চেষ্টা করুন না!···আমি এইটাই বলতে চাই, যদি খ্রীষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি অ-খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে সাহায্য না নেন তাহলে অ-খ্রীষ্টানদের অনুভূতিতে আঘাতকারী তাঁদের [ধর্মান্তরকরণের] উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অভিযোগ

থাকবে না।"৩

একদা যেমন বিবেকানন্দের তেমনি এখন গান্ধীর এই সমালোচনা মিশনারিদের কাছে মারাত্মক বলে মনে হয়েছিল। মিশনারি-তরঙ্গকে বিবেকানন্দ কিভাবে ও কি পরিমাণে প্রতিহত করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। মিশনারি পত্র-পত্রিকায় তাঁর উদ্দেশে কোন্ ঘৃণার নৈবেদ্য নিয়মিত নিবেদন করা হয়েছে, তাও দেখেছি। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে একই আকারে তা করা সম্ভব ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে কাল বদলেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্তবর্ণ কিছু ফিকে হয়েছে, এবং গান্ধীজী তাঁর ধর্মীয় প্রবণতা সত্ত্বেও প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে খাতিরে কথা বলতে হয়েছে। মিশনারিরা রাজনীতি বুঝতেন। হরিজন পত্রিকায় ১৭. ৪. ১৯৩৭ গান্ধীজীর সঙ্গে এক ভারতীয় খ্রীষ্টানের দীর্ঘ আলোচনার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রভাবশালী কিছু ভারতীয় খ্রীষ্টান এক যুক্ত ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করলে গান্ধীজী তার সমালোচনা করেছিলেন, (হরিজন ৩. ৪. ১৯৩৭)—সেইসূত্রেই এই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা। গান্ধীজী ১৪ জন প্রভাবশালী উচ্চশিক্ষিত খ্রীষ্টানের পূর্বোক্ত ম্যানিফেস্টোটিকে এমনই দুর্ভাগ্যজনক মনে করেছিলেন যে, হরিজন পত্রিকায় সেটি প্রকাশ করতে চাননি; কারণ তিনি তার বিরূপ সমালোচনা ছাড়া আর কিছু করতে পারতেন না। তবে শেষ পর্যন্ত সেটি প্রকাশ করেন। ম্যানিফেস্টোটির নাম "আওয়ার ডিউটি টু দি ডিপ্রেসড্ অ্যাণ্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস্।" এর মধ্যে লড়াকু খ্রীষ্টানদের মতো 'বেশ করছি ধর্মান্তর করছি' ভাব নেই। কৌশলে তার সাফাই গাওয়া হয়েছে। এতে ধর্মান্তরকরণের 'অধিকার' দাবি করা হয়েছিল, বলা হয়েছিল: "যীশুখ্রীষ্টের অন্তর্গত সত্যের সন্ধানীদের গ্রহণ করা ভারতের খ্রীষ্টান চার্চগুলির কর্তব্য—সেইসঙ্গে তাঁদের কর্তব্য—ধর্মোপদেশ ও আধ্যাত্মিক আহার্য দান করা। ঐ ধরনের মানুষ যে-ধর্মের মধ্য থেকেই আসুক তাদের গ্রহণ করার অধিকার চার্চের আছে।" গান্ধীজী ওর উত্তরে পূর্বোক্ত লেখায় বলেছিলেন: "ভারতের নরনারী খ্রীষ্টান চার্চের অঙ্গ-সঙ্গ কামনা করে না। হতভাগ্য হরিজনদের সম্বন্ধেও একই কথা। হরিজনদের মধ্যে যথার্থ আধ্যাত্মিক ক্ষুধা আমি আকাঙ্ক্ষা করি। তা আছে, এবং তার নিবৃত্তির জন্য, তারা যতই স্থূল স্বভাবের হোক, মন্দিরে যায়। অন্য ধর্মের প্রচারক যখন তার কাছে যান—তাঁরা যান মাল বিক্রির ফিরিওয়ালা রূপেই। যাদের কাছে ওঁরা ধর্মপ্রচারে যাচ্ছেন তাদের থেকে ওঁদের অধিক আধ্যাত্মিক সম্পদ নেই। অধিক ঐহিক সম্পদ আছে বটে—তারই লোভ ওঁরা দেখান—নিজেদের গণ্ডীতে লোক টানবার সময়ে। তারপর লক্ষ্য করুন, ভারতের খ্রীষ্টান চার্চের 'কর্তব্য' এখন চেহারা বদলে 'অধিকার' হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু কর্তব্য যখন অধিকার হয়ে দাঁড়ায় তখন তা আর কর্তব্য থাকে না।··· অধিকারের চেহারা ধরলে তা সহজেই অনিচ্ছুক মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।" গান্ধীজী বলেছিলেন, এই ব্যাপারটি অতীব কুরুচিকর এবং তিক্তস্বাদ।

এই ছিল গান্ধীজীর পূর্ব রচনার বক্তব্য। এর প্রতিবাদে ভারতীয় মিশনারি বলেন, তাঁরা আইনগত অধিকারের কথা বলেননি, নৈতিক অধিকারের কথা বলেছিলেন। গান্ধীজী বললেন, নৈতিক অধিকারের কথাও এক্ষেত্রে আপত্তিকর।

৩ Ibid., Vol. 64, p. 426.

তিনি যোগ করলেন, পূর্বোক্ত মিশনারিরা বস্তুতঃ আইনগত অধিকারের কথাই বলেছিলেন; কারণ তাঁরা "মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে করাচী প্রস্তাবের উল্লেখ করেছেন।"

খ্রীষ্টান পত্রলেখক গান্ধীজীকে লিখেছিলেন, "আমরা ভারতীয় জনসাধারণের কাছে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার করি না। আমরা কেবল খ্রীষ্টের জীবনের কথাই বলি—আমাদের কাছে তাঁর জীবন ও উপদেশ কোন্ শান্তি ও সান্ত্বনা দান করে সেই কথা। খ্রীষ্ট আমাদের পথপ্রদর্শক—তাঁকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করতেই আমরা অপরকে বলে থাকি।"

গান্ধীজী উত্তরে লেখেন:

"হাঁ অবশ্যই, আপনারা অবশ্যই সেকথা বলে থাকেন। কিন্তু আপনারা যখন বলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, তখনি আপনারা গভীর জলে পড়ে যান। আমি তাই বলি, আপনাদের জীবনই কথা বলুক আমাদের কাছে, যেমন কথা গোলাপ বলে কেবল তার সৌগন্ধ্যের দ্বারা, শব্দে নয়। যে অন্ধ মানুষ গোলাপকে দেখতে পেল না, সেও তার গন্ধ পায়। গোলাপের বাণীর গোপন রহস্য তাই। আর যীশুর বাণী গোলাপের বাণীর চেয়েও সূক্ষ্ম ও সুরভিত। গোলাপের যদি কোন তল্পিবাহক দরকার না হয়—যীশু-বাণীরও তা দরকার নেই।"৪ [ক্রমশঃ]

৪ Ibid., Vol. 65, p. 80

তারাদের কথা ও কাহিনী

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাবা : এখন এই তারাদের মধ্যে যাদের স্পন্দনকাল অল্প অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদের বলা হয় অল্পস্পন্দনকাল অস্থিরদ্যুতি তারা। সিফিউস্ তারামণ্ডলীতে এদের প্রথম খোঁজ পাওয়া যায়—তাই এদের আর এক নাম সিফাইড। আর যাদের স্পন্দনকালের ব্যাপ্তি বেশ দীর্ঘ—কয়েক মাস থেকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত, তাদের বলা যেতে পারে দীর্ঘস্পন্দনকাল অস্থিরদ্যুতি তারা। সিফাইড তারাদের মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচদিন যাদের স্পন্দনকাল তাদের সংখ্যাই বেশি। এই সিফাইড তারার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এদের স্পন্দনকাল ও উজ্জ্বলতার মধ্যে এক সম্পর্ক পাওয়া গেছে—যার স্পন্দনকাল যত বেশি, তার উজ্জ্বলতা তত বেশি।

মেয়ে : এই সম্পর্ক জেনে কোন সুবিধে হয় কি?

বাবা : হয় বৈ কি, মা। পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা সিফাইড তারার স্পন্দনকাল বার করতে পারি এবং তার থেকে তারাটির প্রকৃত উজ্জ্বলতা বার করতে পারি এই সম্পর্কের সাহায্যে। এই উজ্জ্বলতার সঙ্গে আপাত উজ্জ্বলতার তুলনা করলেই তারাটির দূরত্ব বেরিয়ে পড়বে। এইভাবে আমরা বহু দূর দূর তারাদের দূরত্ব বার করতে পারি।

ছেলে : দীর্ঘস্পন্দনকাল অস্থিরদ্যুতি তারাগুলির সঙ্গে সিফাইড তারাদের কি তফাত?

বাবা : প্রথমতঃ যে-সব অস্থিরদ্যুতি তারার স্পন্দনকাল বেশি, সবই লাল রঙের তারা এবং

স্বাভাবিকভাবেই তাদের তাপমাত্রা বেশ কম। সবচেয়ে মজার বৈশিষ্ট্য হল স্পন্দনকাল ও ঔজ্জ্বল্যের মধ্যের সম্পর্কটা সিফাইডের নিয়ম থেকে একেবারে উল্টো— যার স্পন্দনকাল যত বেশি, তার উজ্জ্বলতা তত কম।

ছেলে : অনিয়মিত অস্থিরদ্যুতি তারার দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণও কি সেই তারার মধ্যেকার সংকোচন ও প্রসারণ ?

বাবা : না। তা নয়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করছেন যে, এই ধরনের তারার গা থেকে এমন কিছু পদার্থ বেরোয় যা থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। চারদিকে মেঘের আবরণের মধ্যে তারাটি থাকে। কোন কারণে মেঘটা একটু ফাঁক হলেই, তারাটির দীপ্তি বেড়ে যায়। আবার মেঘ এসে আড়াল করলেই দীপ্তি কমে যায়।

এদের থেকে আলাদা আর এক ধরনের অনিয়মিত অস্থিরদ্যুতি তারা আছে। হঠাৎ হঠাৎ তাদের ঔজ্জ্বল্য খুব অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যায়—কখন কখন সূর্যের অপেক্ষা ৫০,০০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল হয়। এই অবস্থায় কয়েকদিন থাকার পর ঔজ্জ্বল্য আবার ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। এদের বলা হয় নোভা বা নতুন তারা। প্রাচীনেরা এই তারাদের অস্তিত্বের কথা জানতেন। কিন্তু তাঁরা ৬ষ্ঠ প্রভার থেকে নিষ্প্রভ তারা খালি চোখে দেখতে পেতেন না বলে ভাবতেন, এই অত্যুজ্জ্বল তারাটি বুঝি আকাশে নতুন আবির্ভূত হল—তাই নোভা নাম। অনেকে বলেন যে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মকালে বেথলেহেমে যে-তারাটি দেখা দিয়েছিল তাও একটা নোভা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বছরে ২০টি করে নোভার সন্ধান পান।

ছেলে : নোভার এত অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি ?

বাবা : নোভা তারার অভ্যন্তরে পরমাণু বোমার অনুরূপ একটা প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে তারার বাইরেকার আবরণটা খুলে আসে ক্ষিপ্রগতিতে। তারার ভিতরের অত্যুত্তপ্ত ও অত্যুজ্জ্বল অংশটা বাইরে থেকে দেখা যায়। তখনই তারাটিকে অত্যন্ত দীপ্তিমান দেখায়।

মা : আকাশে অস্থিরদ্যুতি তারার সংখ্যা কত ?

বাবা : খালি চোখে যত তারা দেখা যায় তার ৩% হল অস্থিরদ্যুতি। ১৭শ প্রভার তারার মধ্যে বৈজ্ঞানিকরা মোট ১৫,০০০ অস্থিরদ্যুতি তারার সন্ধান পেয়েছেন। (মেয়ের দিকে চেয়ে) মা মণি, তুমি এতক্ষণ চুপচাপ কেন ?

মেয়ে : আমার কাছে তো সব তারাই অস্থিরদ্যুতি মনে হচ্ছে। সব তারাই তো মিট মিট করছে, আর ঝিকমিক করছে।

বাবা : না, মা। তারার উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে, তারার ঝিকমিকি গুলিয়ে ফেলো না। স্থিরদ্যুতি তারারা মিট মিট করলেও উজ্জ্বলতা একই থাকবে। কারণ ঝিকিমিকির অনুভূতিটা আসে বায়ুমণ্ডলের জন্য। আগেই বলেছি যে, বায়ুস্তরের উপরে উঠলে এই তারাগুলিকে স্থির ও শান্ত দেখতে পাব অথচ অস্থিরদ্যুতির তারাগুলি একবার উজ্জ্বল হচ্ছে, পরের বার ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

ছেলে : আচ্ছা বাবা, তারারা কি সত্যিকারের নিশ্চল, স্থির ?

মেয়ে : কি বোকার মতো কথা বলিস, দাদা, যার কোন মানে হয় না। আকাশে একটু কষ্ট করে তাকালেই দেখতে পাবি—সূর্য, চন্দ্র, তারা সকলেই বৃত্তাকারে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে, তাহলে ওরা স্থির কি করে হয় ?

বাবা : হয়, মা, হয়। এই যে তারাদের গতি এটা ওদের নিজস্ব গতি নয়, আপাতগতি। মনে আছে নিশ্চয়ই গতবারে পুজোর ছুটিতে ট্রেনে চেপে হরিদ্বার যাচ্ছিলে। তুমি তো সারাক্ষণই জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছিলে। কি দেখলে ?

মেয়ে : বাইরের মাঠ-ঘাট, গরু-বাছুর, গাছ-পালা সব গাড়ির গতির উল্টোদিকে ছুটে চলেছে।

বাবা : তারাদের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে। তোমরা হয়তো জানো যে, পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে, অর্থাৎ ১ দিনে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসে। এখন ঘূর্ণমান পৃথিবী থেকে দেখে আমাদের মনে হয় আকাশের সব তারা প্রত্যেকদিন পৃথিবীর গতির উল্টোদিকে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে। তারারা আসলে একেবারেই ঘুরছে না, ঘুরছে আমাদের পৃথিবী।

ছেলে : এবং এটাও আমরা দেখতে পাই যে তাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। পরস্পরের আপেক্ষিকে ঠাঁই বদলও করে না ওরা। সুতরাং তারাদের অচল বা স্থির বলতে বাধা কোথায় ?

বাবা : বাধা আছে। এর থেকে ভুল ধারণা আর নেই। আসলে প্রত্যেক তারাই প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। বেশিরভাগ তারাই প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে চলছে। কোন কোন তারা সেকেণ্ডে কয়েকশ কিলোমিটারও যায়। জ্যোতির্বিদেরা এমন উড়ন্ত তারার সন্ধানও জানেন যারা সেকেণ্ডে ৬০০ কি. মি. বেগে ওড়ে। এটা তারাদের নিজস্ব গতি।

মা : কিন্তু দৃষ্টিগোচর সমস্ত তারা যদি প্রবল বেগে পাগলের মতন বছরে কোটি কোটি কিলোমিটার পথ দৌড়ে বেড়ায়, তাহলে তাদের এই উন্মত্ত যাত্রা আমরা দেখতে পাই না কেন ? কেন মনে হয় আকাশ ভরা তারা একটা নিশ্চলতার ছবি ?

বাবা : কারণটা সহজ। তারাদের বিরাট দূরত্ব। একটা উঁচু জায়গা থেকে কখনও দূর-দিগন্তের কাছ দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেন যেতে দেখেছ ?

ছেলে : মনে হয় ট্রেনটা কি আস্তে আস্তে যাচ্ছে—কচ্ছপের মতো খুট-খুট খুট-খুট করে চলেছে।

বাবা : তারার গতির বেলাতেও ঠিক তাই ঘটে। তফাতটা হল এইটুকু যে সচল তারারা আমাদের থেকে কল্পনাতীত দূরে আছে। ফলে গতির দরুন এদের অবস্থানের পরিবর্তনটা চোখেই পড়ে না। স্থির মনে হয়। হাজার হাজার বছর লেগে যায় এই পরিবর্তনটা উপলব্ধি করতে। এবং সে পরিবর্তনও অতি সামান্য। ৬ আলোকবর্ষ দূরের একটা তারা ১০০ বছরে যতখানি স্থান বদল করে, তা চাঁদের আপাত ব্যাসার্ধের সমান মাত্র। ৮ কোটি কি. মি. দূরের একটা তারা বছরে ১০০ কোটি কি. মি. সরে যায়। তার ঠাঁইবদল কি আমরা দেখতে পাব ?

ছেলে : দূরে থাকার দরুন তারাদের গতি যদি আমরা বুঝতেই না পারি, তাহলে এরা যে আদৌ ছুটে বেড়াচ্ছে তার কি প্রমাণ ?

বাবা : এটা তো আগেই বলেছি—তারাদের গতি ধরা পড়ে গেছে তার আলোর বর্ণালী পরীক্ষায়। কোন তারার আলোর বর্ণালীর বর্ণরেখাগুলি বেগুনী আলোর দিকে সরে গেলেই বুঝব, তারাটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর বর্ণরেখাগুলি লাল রঙের দিকে সরে গেলে বুঝব তারাটি দূরে সরে যাচ্ছে।

ছেলে : দেখছি আকাশের সব তারাই নিঃসঙ্গ নয়। অনেক তারারই নিকটসঙ্গী আছে আকাশ-পথে।

মেয়ে : যেমন যুগ্মতারা ও বহুসঙ্গী তারা। এরা খুব কাছাকাছি থাকে আর মহাকর্ষের টানে একে অন্যের চারধারে ঘুরে বেড়ায়।

বাবা : কিন্তু এরা ছাড়াও আকাশে বেশ কিছু তারকা রয়েছে যারা অল্প একটু জায়গার মধ্যে অনেকে মিলে ভীষণ ঠেসাঠেসি করে রয়েছে—যেন এক গোষ্ঠীভুক্ত পরিবার। এদের বলা হয় তারাপুঞ্জ। পরিবারের সভ্যরা যেমন রক্তের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, তারাপুঞ্জের তারারা তেমনি এক প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এরা সংখ্যায় এত বেশি যে, জোর করে বলা চলে না যে মহাকর্ষের প্রভাবে এরা একজন অন্যজনার চারিধারে ঘোরে।

ছেলে : তবে অন্য কি নিয়ম এদের মধ্যে কাজ করে চলেছে ?

বাবা : সেটা হচ্ছে তারাপুঞ্জের তারাগুলি সকলেই সাধারণ একটা নিজস্ব গতিতে সমান্তরাল-ভাবে একই দিকে ছুটে চলেছে। মনে হয় গোটা পুঞ্জটাই চলেছে। আকারের দিক দিয়ে বিচার করলে এই তারকাগুচ্ছকে দুভাগে ভাগ করা যায়—মুক্ত তারাপুঞ্জ ও গোলাকার তারাপুঞ্জ। এক একটা মুক্ত তারাপুঞ্জে কয়েকশ মাত্র তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবিন্যস্তভাবে থাকে। তাই পুঞ্জের সীমানা সাধারণতঃ অসমান ও অনির্দিষ্ট, কোন বিশেষ আকারের মধ্যে তাদের বাঁধা যায় না—তাই মুক্ত তারাপুঞ্জ। পুঞ্জগুলির ব্যাস ৫ থেকে ২৫ আলোকবর্ষ পর্যন্ত। এ পর্যন্ত ৫০০টা এ রকম তারাপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটা খালি চোখেও দেখা যায়।

ছেলে : আর গোলাকার তারাপুঞ্জগুলি কি রকম ?

বাবা : হাজার হাজার তারা মিলে যেন একটা উজ্জ্বল গোলকের সৃষ্টি করেছে। এর কেন্দ্রে তারার সংখ্যা খুব বেশি আর কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে তারার সংখ্যা খুব কমে গেছে। এ পর্যন্ত ১০০টা মাত্র গোলাকার তারাপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে। এবং আশ্চর্যের কথা দু শতাব্দী ধরে দূরবীন যন্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও এই সংখ্যাটির কোন পরিবর্তন হয়নি। এর থেকে মনে হয়, এই পুঞ্জগুলি পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। বস্তুতঃপক্ষে নিকটতম গোলাকার তারাপুঞ্জের দূরত্ব দূরতম মুক্ত তারাপুঞ্জের দূরত্ব থেকে সামান্য কম। গোলাকার তারাপুঞ্জগুলির ব্যাস ২০০ থেকে ৩০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত হয়। সুতরাং মুক্ত তারাপুঞ্জ থেকে অনেকগুণ বড়।

(ঝপ করে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল)

মা : সে কি ! রাত বারটা বেজে গেল !

বাবা : নাও, নাও আর কথা নয়। সব শুয়ে পড়। পাখা চলছে। সকাল সকাল উঠে আবার সব পড়াশুনা করতে হবে।

মেয়ে : (বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে) বাবা, বাবা দেখ কি সুন্দর ! হঠাৎ একটা তারা খসে পড়ল। তবে যে তুমি বললে, তারারা এত দূরে থাকে যে তাদের স্থান পরিবর্তন খালি চোখে দেখা যায় না ? এই তো আমি দেখলাম।

বাবা : দূর বোকা মেয়ে। এটা কিন্তু তারা নয়। তার সঙ্গে কোন সম্পর্কও নেই। এগুলি হচ্ছে ছোট-বড় নানা আকারের নিরেট বস্তুপিণ্ড—পাথর, লোহা, নিকেল দিয়ে তৈরি। এদের বলে উল্কা। কোন আলোই নেই এদের মধ্যে। শুধু সূর্যের আকর্ষণে তার চারদিকে ঘুরে চলেছে।

মেয়ে : তবে যে দেখলাম একটা আলোর ফুলকি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে গেল—সেটা কি মিথ্যে ? তুমিও তো দেখলে।

বাবা : দেখেছি বই কি, মা। ঐ উল্কাগুলি ঘুরতে ঘুরতে দৈবাৎ কখনও পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। তার আকর্ষণ হেতু সেকেণ্ডে ৫০/৬০ কি. মি. বেগে ছুটে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকে। বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে এরা ভীষণ গরম হয়ে গিয়ে জ্বলে ওঠে। এবং মাটিতে পড়বার আগেই ২/৩ সেকেণ্ডের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই জ্বলন্ত উল্কাকেই বেশিরভাগ লোক ছুটন্ত তারা বলে ভুল করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ এদের দেখা যায় না। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে জ্বলে গেলে তবে এদের দেখা যায়।

মা : কত উঁচুতে এদের দেখা যায় ?

বাবা : সাধারণতঃ ৭০ মাইল উচ্চতায় প্রথম দেখা যায়, তারপর পৃথিবীর দিকে ৩৫ মাইল আসার পর পুড়ে যায়। তবে কোন কোন বড় উল্কা জ্বলন্ত অবস্থায় পুড়ে যাওয়ার আগেই মাটিতে পড়ে বিরাট বিরাট গর্ত সৃষ্টি করে। তখন বলি উল্কাপাত। ঘণ্টায় ৪টে থেকে ১০টা উল্কা সকলেই দেখতে পাবে। রাত্রি ১২টার পর বেশি উল্কা দেখা যায়। আবার নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে বেশি বেশি উল্কা দেখা যায়। সারা বিশ্বে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১০ কোটি উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকছে—খালি চোখেই দেখা যাবে। ১০০ টন ওজনের ভারী বস্তুপিণ্ড প্রতিদিন পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়ছে। এরা যদি সটান সবেগে পৃথিবীর বুকের ওপর পড়ত, তাহলে কত ক্ষতি হত ভাবো তো ?

মেয়ে : ভাগ্যিস বায়ুমণ্ডল ছিল, তাইতো রক্ষে। মাটিতে পড়বার আগেই বায়ুর সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই না বাবা ?

বাবা : হ্যাঁ, মা। তবে আশ্চর্যের বিষয় উল্কাপাতের ফলে কেউ মারা গেছে এ-কথা শোনা যায়নি। তারার এই বিচিত্র পরিচয় পেয়ে কি মনে হয়, জানিস্ মা ?

We are such little men when the stars come out.

না, না, আর কথা নয়। অনেক রাত হয়েছে, শুতে যাও।

অনুসন্ধান

শ্রীপ্রবীর মিত্র

সাহিত্যসেবক ও কবি।

গোধূলির স্নিগ্ধ ক্লান্ত পটে
আনন্দ বেদনা ঘন রেখা ফুটে ওঠে
কত স্মৃতি আসে ভিড় করে
কারও অর্থ জানা আছে
কেহ নত অহেতুক ভারে।
ছোট কোন ভাল লাগা
কোন ব্যথা পাওয়া
অহেতুক সুখ জাগা
বেদনা ব্যাকুল সুরে চাওয়া।
এ সবই মনের তারে
সুর তোলে বারে বারে
কভু হাসি কভু অশ্রু
জীবন বীণারে বাঁধে তানে।
কোথা থেকে হল শুরু ?
কোথা এর শেষ ?
মেঘ ডাকে গুরু গুরু
বক্ষ জুড়ে আনন্দের রেশ।
আলো কোথা ? কোথা মোর
সত্যে ঘেরা বাণী ?
কালো মেঘে বারে বারে
বিদ্যুৎ দিয়েছে হাতছানি।
হিয়া মোর তৃপ্তি নাহি মানে
শূন্য থেকে শূন্য পথে
পূর্ণতার টানে।
লক্ষ্য মোর চিরচলা
প্রত্যয় নিশানা করে
পথেরে প্রশস্ত করে তোলা।
আলো আছে আছে রঙ
আশা আছে আঁধারের পারে
কালো রাত্রি ধ্যানমগ্ন
প্রসন্ন প্রদোষের তরে।
মোর পশ্চাতে জড়ায়ে আছে
সম্মুখের গতি
রূপে রসে ফুলে ফলে
সম্ভাষিছে প্রীতি।
কার প্রীতি ? কারে সম্ভাষিছে ?
প্রকৃতির ঐকতানে
সত্যেরে চিনিব কেমনে ?
জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, মর্ত্য সময়ের জালে
আত্মার অমৃতরূপ ভাসে যেন জলে।
বক্ষে যদি সত্য স্পর্শ জাগে
দখিনের মলয়ানিল বাজে নিজ রাগে।
সত্যের প্রদীপ শিখা
দৃপ্ত করে দগ্ধ নাহি করে
মায়ালোকে আলো ফেলে
অনন্তেরে স্পষ্ট করে তোলে।
আত্মার আপন আলোতে
জাগরণে পুলকিত হিয়া
যামিনীর শেষ প্রান্তে এসে
উষার আভাসে হরষিয়া
আমারে চিনেছি আমি
তব ধ্যানে নিজ ধ্যান দিয়া।

তীর্থ-প্রসঙ্গ

স্বামী ধ্যানেশানন্দ

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে সেবা-নিযুক্ত।

ধর্ম ভারতের প্রাণ। ধর্ম ভারতবাসীর রক্তের প্রবাহে, শিরায় উপশিরায়। ধর্মের জন্য মানুষ এখানে নিজ জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ করে, অতি আপনজনের মায়া ত্যাগ করে। এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তাঁর অভিজ্ঞতার এক সুন্দর চিত্র এঁকেছেন, যাতে আমরা ভারতবর্ষের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করতে পারি।—"অরণ্যসঙ্কুল তুষারময় পার্বত্য পথ। পরিব্রাজক সন্ন্যাসিদ্বয় বদরিকাশ্রম দর্শনান্তে দুর্গম বন্ধুর পথ বাহিয়া নামিয়া আসিতেছেন। সহসা একদল মহিলা তীর্থযাত্রীকে ঐ পথে উঠিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, মহিলাগণ চিৎকার করিয়া বলিলেন, যদি পথহারা কোন মহিলার সহিত তাঁহাদের কোথাও দেখা হয়, তবে যেন বলেন যে, তাহার সঙ্গীরা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সে যেন নির্ভয়ে এই পথেই আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। ঐ নারীর ক্রোড়ে একটি শিশুসন্তান থাকিবে—দেখিলেই সন্ন্যাসীরা চিনিতে পারিবেন। কিছুদূর আসিয়া সন্ন্যাসিদ্বয় অনুরূপ একজন মহিলা যাত্রীকে দেখিতে পাইলেন। সবিস্ময়ে আরও দেখিলেন, একটি তিন-চার মাসের শিশু পরম নিশ্চিন্তে মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইতেছে, আর ঘুমন্ত শিশুক্রোড়ে তীর্থান্বেষী ঐ মাতা অতি সন্তর্পণে পিচ্ছল বরফের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন।...ভাবিতে লাগিলেন, এই নারীর কি নিজের সন্তানের প্রতিও এতটুকু মমতা নাই! গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্র জন্তুজানোয়ারের আবাসস্থল এই ভয়াল প্রদেশে, দুস্তর বিপজ্জনক এই পথে, এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, তুষার ঝঞ্ঝায় শিশুসন্তানকে বক্ষে লইয়া কিসের আকর্ষণে সে ঘর ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছে!"[১] এ-প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর: ধর্ম, যা ভারতের চিরন্তন আদর্শ।

যে জিনিস বাদ দিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, যার সত্তায় সত্তাবান হয়ে মানুষ বেঁচে থাকে, সেই সত্তাকে জানার ইচ্ছাও মানুষের স্বভাব। তাকে জানার জন্য মানুষ সচেষ্ট হয়, অন্বেষণ চালায়, স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করে, জেনে বা না জেনে।

এক অনন্ত আনন্দময় সত্তা দেশকালনিমিত্তের আড়ালে দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে আপাত-ক্ষুদ্র সীমিত দুর্বল মানুষে পরিণত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র মানুষ নিয়তই তার ভিতরের অনন্ত আনন্দময় সত্তাকে বিকশিত করার প্রয়াস করে চলেছে। স্বামীজীও তাই বলেছেন, "The apparent man is merely a struggle to express, to manifest this individuality which is beyond."[২] এই কারণেই মানুষ এমন পরিবেশে যেতে চায়, যেখানে গিয়ে সে তার ঐ বিস্মৃত স্বরূপকে—তার প্রকৃত সত্তাটিকে ফিরে পেতে সুবিধা পায়। আকাঙ্ক্ষিত এই পরিবেশকেই মানুষ তীর্থ নামে অভিহিত করে থাকে। তীর্থ কথাটির অর্থ হচ্ছে যেখানে গেলে বা যার সংস্পর্শে এলে পাপ মোচন হয়। অবশ্য আভিধানিক অর্থ আরও অনেক রকম করা চলে,—যেমন, দেবতাদের অধিষ্ঠান বা তপস্যাদির কারণে পবিত্র স্থান; পুণ্যক্ষেত্র; পারাপারের জায়গা; অবতরণ-ক্ষেত্র;

---

১ স্বামিজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৫—৪৬

২ C. W. Vol. II, p. 81

নিদান ; উপায় ইত্যাদি। তবে মূল সুরটি সব অর্থেই সমান।

তীর্থের প্রকারভেদ : অতি প্রাচীনকাল থেকে আমরা চার ধাম ও সপ্ততীর্থের কথা শুনে আসছি। বদরীনারায়ণ, রামেশ্বর, দ্বারকা ও পুরী চার ধাম এবং অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী, দ্বারবতী সপ্ত তীর্থ। এই সকল স্থান গভীর আধ্যাত্মিক চেতনায় বা শ্রীভগবানের ভাবে ভরপুর। যুগ যুগ ধরেই মানুষ এইসব স্থানে গিয়ে সেখানকার পবিত্র ভাবধারায় নিস্নাত হয়ে আসছে, শান্তি পাচ্ছে। আবার কত মহাত্মা ব্যক্তি ঐ সকল স্থানে গিয়ে ভগবৎ আনন্দ আস্বাদন করে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ-মহিমাকে আরও বর্ধিত করেছেন। তাই দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন, "তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি"—তীর্থসমূহ ভক্তগণের সংস্পর্শে তীর্থের মর্যাদা লাভ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনবদ্য সহজ সরল ভাষায় তীর্থ সম্বন্ধে বলেছেন, "ওরে, যেখানে অনেক লোকে অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগ-যুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ! যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে, সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না—যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেই রকম।"[৩]

মানুষের অনন্ত আনন্দময় সত্তার প্রকাশে স্থানবিশেষই যে কেবলমাত্র সহায়ক হয় তা নয়, মানুষও ঐ কাজে সহায়ক হতে পারে। তীর্থকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। স্থাবর বা নিশ্চল তীর্থ, মানস তীর্থ, এবং জঙ্গম বা সচলতীর্থ।

স্থাবর বা নিশ্চল তীর্থ। স্থান বিশেষেই এই তীর্থ রূপ নেয়,—এতক্ষণ আমরা যেমন আলোচনা করলাম। কিন্তু কালে এইসব তীর্থস্থানের উচ্চ জমাট আধ্যাত্মিক ভাবের পরিবর্তন সম্ভাবনাও থাকে। এক সময় যে স্থানের উচ্চ-ভাব মানুষকে জাগতিকতা থেকে উত্তরণে সহায়তা করত, তেমনটি আর না করতেও পারে। আবার ভগবৎ-প্রভাবে কালক্রমে ঐরকম তীর্থস্থল গড়েও ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে এ-যুগে নূতন তীর্থ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন,—কামার-পুকুর, জয়রামবাটী, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এদের 'নব যুগের মহাতীর্থ' বলেছেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজী লিখেছেন :

"যারে খুঁজ লীলাস্থলে, তীর্থে তীর্থে পুণ্যজলে
সে তোমারে খুঁজে সদা অন্তরে বাহিরে।

*

তীর্থযাত্রা যাঁর তরে, রামকৃষ্ণ রূপ ধরে
এবার আবার বঙ্গে তাঁর আগমন।
আর কেন তাঁরে দূর দেশে অন্বেষণ।"[৪]

এখন আর দূর দুর্গম প্রদেশে তীর্থযাত্রা করতে হবে না। তীর্থ আমাদের সমীপবর্তী। সশক্তিক শ্রীভগবানের এবং তাঁর পার্ষদদের স্মৃতি-জড়িত লীলাস্থানগুলি তাঁদেরই ভাবধারায় ভরে রয়েছে। দেশবিদেশের মানুষ এইসব স্থানে

৩ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১১৮

৪ চারিধাম

গিয়ে শান্তি লাভ করছেন। একবার এক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যারা খুব গরীব, কাশী কি অন্য কোন ধামে যেতে পারে না, তাদের ঐ রকম ফল আর কিসে হয়? তদুত্তরে মা যা বলেছিলেন তা থেকে উপরি-উক্ত নূতন তীর্থেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। তিনি বলেছিলেন, "তারা দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড়ে গেলে সে ফল হয়, যদি সে রকম বিশ্বাস থাকে! যাঁর জন্য কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে আছেন।"[৫]

এ-ছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থ, শ্রীভগবানের লীলাগ্রন্থ-সকল মানুষের মনে শান্তি, আনন্দ ও নির্ভয় এনে দেয়, মনকে সংসারের ঊর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে। পাণ্ডবগীতায় উল্লেখ দেখা যায় যে, যেখানে শ্রীভগবানের লীলা ও তত্ত্বের আলোচনা হয়, সেই স্থান তীর্থের পর্যায় উন্নীত হয়—'সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ' আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে সেখানকার উপাসনা-বেদীতে প্রণাম করতেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীম লিখেছেন, "বেদী হইতে ভগবানের কথা হয়—তাই তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইয়াছে।"[৬]

মানসতীর্থ। বহু অর্থ ব্যয় করে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করে দূরের তীর্থে যেতে না পারলেও প্রত্যেক মানুষই অনায়াসে তার মানসতীর্থে যাতায়াত করতে পারে। সত্য, ক্ষমা, দয়া, সংযম, দান, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য, ইত্যাদি—চারিত্রিক গুণগুলি বিকাশসাধনের ফলস্বরূপ মানুষ নিজেই তীর্থস্বরূপ হয়ে ওঠে। এইসব গুণের অনুশীলনকে নিছক নৈতিক অনুশাসন বলেই অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার নৈতিক অনুশাসনই উচ্চতম জীবন গঠনের সোপানশ্রেণী। আবার গীতায় এইসব গুণকেই দৈবীসম্পদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন, "দৈবী-সম্পদ-বিমোক্ষায়"—দৈবী বা সাত্ত্বিক সদ্‌গুণাবলী সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ। আচার্য শঙ্কর তাঁর 'মণিরত্নমালা'য় উল্লেখ করেছেন, 'স্বমনো বিশুদ্ধম্'—স্বীয় বিশুদ্ধ মন অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্তই শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

সচল বা জঙ্গমতীর্থ। মলিনচিত্ত মানুষ আপন দৈবীসত্তাকে বিস্মৃত হয়ে সংসার-চক্রে পাক খাচ্ছে। কখন কখন জগতে এমন পুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁদের উন্নত ব্যক্তিত্ব মানুষকে আকর্ষণ করে। তাঁরা যে-পথে চলেন সে-পথে আনন্দ বিকীর্ণ হয়, যেখানে থাকেন সে-স্থান আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয়, যে-সব কথা বলেন তাতে মধু ঝরে।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অবতার পুরুষরাই এই স্তরের মানুষ। আবার যাঁরা আপন সাধন ও তপস্যার বলে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁদের প্রভাবেও অপরের জীবনে শুভ প্রেরণা জাগে। এঁরাও তাই সচল তীর্থস্বরূপ। এইসব অবতার এবং মুক্ত পুরুষরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করুন কিংবা কোন এক স্থানে অবস্থান করুন, এঁদের সংস্পর্শে এসে সাধারণ মানুষের মলিন সংস্কার বা ভাবরাশি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর জীবনের একটি ঘটনা মাদাম কালভের

৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ পৃঃ ৩৬১

৬ কথামৃত, ১।১২।১

স্মৃতিকথা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামীজী দ্বিতীয়বার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে কায়রোতে এসেছেন। সেখানে সঙ্গীরা তাঁকে শহর দেখাতে দেখাতে একটা কদর্য রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলেন পথ-ঘাট জানা না থাকায়। একদল স্বৈরিণী অতিশয় অশালীনভাবে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রঙ্গ পরিহাস করছিল। স্বামীজীর সঙ্গীরা বুঝতে পারলেন যে, ভুলক্রমে তাঁরা একটা খারাপ জায়গায় এসে পড়েছেন—নিজেদের এই অসতর্কতাজনিত লজ্জায় ও ক্ষোভে তাঁরা খুবই অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকেন। তক্ষুণি তাঁরা স্বামীজীকে নিয়ে অন্য পথের দিকে ঘুরতে যাবেন, এমন সময়ে স্বামীজী দল থেকে সরে এসে ঐ রমণীদের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, "আহা বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওরা তাদের সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বলি দিয়েছে! এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা!" এই বলে স্বামীজী অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। নারীরা নীরব ও লজ্জিতা হল এবং একজন বলে উঠল, 'ইনি ঈশ্বরজানিত পুরুষ,' 'ইনি ভগবানের লোক!' আর একজন লজ্জায় ও ভয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিল, নিজেকে পবিত্রাত্মার কাছ থেকে আড়াল করার জন্য। যে নারীরা আপন দেবীত্ব থেকে দূরে কোন অতলে বাস করছিল, তারাও এই সচলতীর্থের দৃষ্টিপথে এসে নিজ নিজ স্বরূপের স্মৃতিতে জেগে উঠল।

স্বামীজীর সচলতীর্থ সম্বন্ধে একটি ছোট্ট উক্তি এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য। বলছেন, "যে আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতার পুরুষ।"[৭] শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এ-রকম উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাভাগবত বিদুরকে বলছেন,

"ভবদ্‌বিধা ভগবতাঃ তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥"

(ভাগবত, ১।১।১০)

—হে প্রভু, আপনার ন্যায় ভগবৎভক্তিপরায়ণ মহাত্মারাই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তীর্থভ্রমণে আপনাদের কিছুমাত্র স্বার্থ দেখা যায় না, বরং তাতে তীর্থের স্বার্থ বলতে হয়। কেননা, যে-সমস্ত তীর্থ কলুষজন সংস্পর্শে অতীর্থ হয়ে পড়ে, আপনাদের হৃদয়-মন্দির অধিষ্ঠিত গদাধর ভগবানের দ্বারা সেই সকল তীর্থ পূত হয়ে তীর্থত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার পূজ্যপাদ সারদানন্দজীও অনুরূপ কথা বলেছেন, "শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম পুরুষেরা তীর্থে যাইয়া ঐ সকল স্থানের তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সকল স্থানে ঈশ্বরের বিশেষ দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে আগমন ও অবস্থান করেন বলিয়া সেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা ঐ ভাবের পূর্ব প্রকাশ সমধিক বর্ধিত হইয়া উঠে এবং মানব-সাধারণ সেখানে উপস্থিত হইলে অতি সহজেই ঈশ্বরের ঐ ভাবের কিছু না কিছু উপলব্ধি করে। সিদ্ধ পুরুষদের সম্বন্ধেই যখন শাস্ত্র এ-কথা বলিয়াছেন তখন তদপেক্ষা সমধিক শক্তিমান ঠাকুরের ন্যায় অবতার পুরুষদের তো কথাই নাই।"[৮]

তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্য : দুরকম মহাত্মা বা সাধু দেখা যায়—বহূদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন—যাঁর মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাঁকে বহূদক বলে। যে যোগী মন স্থির করেছেন, যাঁর ঘোরাঘুরির শান্তি হয়ে গেছে—তিনি এক জায়গায় আসন করে বসে

৭ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, উত্তর খণ্ড, পৃঃ ৭৭
৮ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১১৭—১৮

আর নড়েন না। সেই স্থানে বসেই তাঁর আনন্দ। তাঁর আর তীর্থের কি প্রয়োজন? যদি তিনি তীর্থে যান তা কেবল উদ্দীপনের জন্য। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই রকম উক্তি একাধিক স্থলে পেয়ে থাকি। শেষোক্ত ঐ শ্রেণীর সাধু-মহাত্মার কাছে কালবশে লুপ্ত তীর্থের উচ্চভাব ধরা পড়ে। শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনে গিয়ে ঐ স্থানের দিব্যভাব অনুভব করেছিলেন। পরবর্তিকালে তাঁরই আদেশে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনের বিলুপ্ত মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবনের দিব্যভাব অনুভব করেছিলেন এবং নবদ্বীপেও শ্রীগৌরাঙ্গের সূক্ষ্ম আবির্ভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ নীলগিরি পর্বতের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব অনুভব করে বলেছিলেন, "এ স্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অতি চমৎকার। মন স্বতঃই অসীমের দিকে ছুটে যায়। এখানে যে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব আছে তা আমার ধারণাই ছিল না। এখন যত দিন যাচ্ছে, ততই সব আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।···এখানে প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই অনেক মুনি-ঋষি কঠোর তপস্যা করেছিলেন; তাই এখনও এমন একটা জমাটবাঁধা ভাব রয়েছে। এ স্থান তপস্যার খুবই অনুকূল।··· এখানকার জঙ্গলে নানা প্রকার ফল রয়েছে। ঋষিরা বোধহয় ফলমূল খেয়ে এখানে তপস্যা করতেন।"[৯] আর যাদের মন শান্ত বা স্থির হয়নি, তারা তীর্থ ভ্রমণ করে আনন্দলাভের জন্য। নানা জায়গায় ঘুরে বুঝতে পারে যে আনন্দ বাইরে নেই, আনন্দের উৎস তার আপন হৃদয় মাঝে। এই ঘোরাঘুরি কেবল ঐ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য।

তীর্থদর্শনের মানসিকতা : তীর্থে উদ্দীপনালাভের বাসনা থাকলে বা সরল কথায় তীর্থের মাহাত্ম্য অনুভব করতে চাইলে প্রাথমিক যে জিনিসটির দরকার তা হচ্ছে ভক্তিভাব। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্বামী সারদানন্দজীর লেখনীতে আমরা পাই, "ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তিভরে হৃদয়ে পূর্ব হইতে পোষণ না করিয়া তীর্থাদিতে যাইলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, সে সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেকবার আমাদের বলিয়াছেন। তাঁহার বর্তমানকালে আমাদের অনেকে অনেক সময়ে তীর্থাদি ভ্রমণে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি অনেক সময় বলিয়াছেন, 'ওরে যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নেই, তার সেথায়ও নেই।' আবার বলিতেন, 'যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপন হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়; আর যার প্রাণে ওই ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? অনেক সময় শোনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অন্য কোথায় পালিয়ে গেছে। তারপর আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা-বেষ্টা করে একটা চাকুরী যোগাড় করে নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখেছে ও টাকা পাঠিয়েছে।"[১০]

তীর্থ দর্শন করে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে: মানুষ জীবন-পথে চলতে চলতে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং এই অভিজ্ঞতাগুলিই আবার তার ভবিষ্যৎ-জীবনের চলার পাথেয় হয়ে ওঠে। তাই এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় যাতে সজাগ সতর্কভাবে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রত্যেক স্থানেরই একটা বাহ্য রূপ আছে,—আর আছে সেখানকার অন্তর্নিহিত একটি সূক্ষ্মভাব। বাইরের আকর্ষণে ভুলে থাকলে ঐ সূক্ষ্মভাব দৃষ্টিতে আসে না। তাই তীর্থদর্শনে গিয়ে সজাগ থাকতে হয় সেখানকার যা আসল রহস্য—মূল

৯ শিবানন্দ বাণী, ২য়, পৃঃ ৫১
১০ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১১৯—২০

স্বভাব সেই দিকে যাতে দৃষ্টি থাকে। তীর্থ-দর্শনান্তে প্রকৃত তীর্থফল কিভাবে উপলব্ধি হয়, তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আমরা কথামৃত থেকে জানতে পারি। তিনি বলেছেন, "গরু যেমন পেট ভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসে সেই সব খাবার উগ্‌রে ভাল করে চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে-সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে জেগে ওঠে সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সে-সব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপ-রসে মন দিতে নাই; তা হলে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।"[১১]

তীর্থের ভূমিকা: বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য: বিশাল দেশ ভারতবর্ষ ছোট ছোট রাজ্যে, নানা জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন স্তরের মানুষে বিভক্ত। যদিও সকলে এক ভারতবর্ষের মানুষ, তথাপি রাজ্য বা অঞ্চল ভেদে পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্য, আচার-আচরণাদি ভিন্ন হওয়ায় একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র, তাও অস্বীকার করা চলে না। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় দেশেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্যের দরুন ঝগড়া-বিবাদ-বিদ্বেষেরও কারণ যথেষ্ট দেখা দিচ্ছে। এত সবের মধ্যেও তথাপি এ-কথাও সত্য যে, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বহুত্বের মধ্যে একত্বের সুরটি ঠিক খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাঁরাই সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন, "একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

যাঁরা ঐ একত্বের সুরকে শুনেছেন বা অনুভব করেছেন, তাঁদের কাছে আর ভেদ কোথায় থাকবে? ঋষিরা তাই অভেদদর্শী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে,—সাধারণ মানুষের কাছে অভেদজ্ঞান বা ঐক্যের অবকাশ আছে কিনা।—তাদের পক্ষে তাই তীর্থ হচ্ছে এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, ঐক্য-সাধনস্থল। ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষই যখন তীর্থস্থানে যেত, তখন তারা পরস্পরের প্রতি বিরোধ ভুলে সকলে এক শ্রীভগবানের সন্তান বলে নিজেদের মনে করত। তাই শত্রু-রাজ্যে বা শত্রুরাজ্যের উপর দিয়ে দূর প্রদেশের তীর্থযাত্রাকালে রাজারা তীর্থক্ষেত্রের ঐক্য-বিধায়ক শক্তির কথা বিস্মৃত হতেন না। অনেক সময় রাজা স্বয়ং তীর্থ করতে যেতে না পারলেও, তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন ঐ-সব তীর্থ-দর্শনে। আভিজাত্য, অভিমান এবং সর্বপ্রকার সাংসারিক বিরোধ তীর্থদর্শনে এসে লোকে ভুলে যায়, তার পরিচয় আজও কাশী, পুরী ইত্যাদি তীর্থক্ষেত্রগুলিতে গেলে বিলক্ষণ বোঝা যায়। তীর্থভূমিতে সকলেই যাত্রী—সবারই এক পরিচয়।

"ভক্তের জাত নেই"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির মর্ম তীর্থক্ষেত্রেই ভাল উপলব্ধি করা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থে' কবিতায় এই ঐকতানেরই অনুরণন আমরা পাই। মহামানব-সমুদ্রতীরে অবস্থিত 'ভারত'-রূপী মহাতীর্থে কবির সেই এক অনুভূতি—সবাই যেন "এক দেহে হল লীন।"

---

১১ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১১৮—১৯

অসুরদলনী মহামায়া

শ্রীমতী বেলা দাশগুপ্তা
শান্তিনিকেতনে প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণাদির চর্চায় নিরতা।

বারবার আসুরী শক্তির বিনাশ সাধন করে সুরলোক নিঃশঙ্ক করেন বলেই মহামায়ার অসুর-দলনী রূপে খ্যাতি। মহামায়ার প্রকৃত তত্ত্ব কি এবং কী তাঁর মহাস্ত্র যার কাছে বার বার অসুর শক্তিকে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে—তার পরিচয় জানতে হলে আমাদের হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র বেদ-বেদান্ত ও পুরাণ শাস্ত্রে প্রবেশ করতে হবে।

হিন্দুধর্মমতে এক ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। কখনও তিনি ভীষণ ভয়াল—তখন তিনি রুদ্র; যখন তিনি মঙ্গলময়—তখন তিনি শিব; যখন জগৎপালনের জন্য তিনলোক বিচরণ করেন—তখন তিনি বিষ্ণু। ভক্ত মনের অভীপ্সানুযায়ী যে-কোন রূপের ঈশ্বরোপাসনায় কোন বাধা নেই। ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের এই তত্ত্ব ছাড়াও আছে শক্তিতত্ত্ব। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—'যো একোঽবর্ণ বহুধা শক্তিযোগাৎ'—এক অপ্রকাশ ঈশ্বর শক্তিযোগেই বহু হয়েছেন। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে ঈশ্বরের দু-রকমের তত্ত্ব। বহু হতে গেলে তাঁকে ব্যক্ত বা প্রকাশিত হতে হবে—এই প্রকাশ হয় শক্তিযোগে, আর যে শক্তিতে বহু হওয়া যায় তা হল তাঁর মায়াশক্তি। বহু হবার বাসনায় ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই মায়াশক্তির সাহায্যেই তাঁর বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি। পরমেশ্বর শিবের মায়াশক্তির কথা উপনিষদের ঋষি বলেছেন—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"—মহেশ্বর মায়িন্, মায়া তাঁর প্রকৃতি বা শক্তি। ঋগ্বেদ থেকেও পরিষ্কার জানা যায়, আগে ভগবতীর আবির্ভাব পরে তিনি ভগবান হলেন (১।১৬৪।৪০)। এখানেও ভগবতীকে শক্তিরূপেই বুঝতে পারি এবং সে শক্তিই মায়াশক্তি যার দ্বারা বহু হয়ে সৃষ্টি কাজ করা যায়। বেদ-বেদান্তের পরে পুরাণের যুগে শক্তিমান থেকেও শক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। তাই জগৎস্রষ্টারূপেই মহামায়া মহাশক্তির স্তব—"সর্বরূপময়ীং দেবী সর্বদেবীময়ং জগৎ। অতোঽহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরী"—সর্বরূপে দেবী বিরাজিতা, দেবীময় এ জগৎ, রূপে রূপে বিশ্বরূপা পরমেশ্বরীকে নমস্কার। পুরাণে মহামায়া—সতী, কালী, গৌরী, উমা, পার্বতী ইত্যাদি বহুনামে অলংকৃতা।

কেবলমাত্র ঈশ্বরের তাত্ত্বিক পরিচয়ে মানুষের মন পরিতৃপ্ত হয় না। পুরাণ রচয়িতারা তাই দেবলোকের জীবনযাত্রা আমাদের সামনে তুলে ধরে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেছেন। পুরাণ শাস্ত্রে প্রথমে মহামায়াকে দেখতে পাই দক্ষকন্যা সতীরূপে। মহাদেবের সাথে বিয়ে হবার পরে পিতা দক্ষের এক যজ্ঞানুষ্ঠানে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। সতীর দেহত্যাগে মহেশ্বর প্রচণ্ড ক্রোধে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করেন, তারপর শোকোন্মত্ত হয়ে সতীদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিলেন। সৃষ্টি রসাতলে যাবার উপক্রম হলে দেবতাদের পরামর্শে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করেন। শিব তখন ধ্যানমগ্ন হলেন। তারপর দেবসভায় স্থির হল শিবের ধ্যান ভঙ্গ করা প্রয়োজন, কারণ তা না হলে তাঁর বিয়ে ও শক্তিধর বীর সন্তান সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। তাঁরা শিবের জন্য পাত্রী ঠিক করে রাখলেন গিরিরাজ ও মেনকার এক পরমাসুন্দরী কন্যা হবেন,—তাঁরই সঙ্গে বিয়ে হবে মহাদেবের। যথাসময়ে সর্বসুলক্ষণা কন্যার জন্ম

হল, পিতামাতার সেই আনন্দের সঙ্গে আরও আনন্দ যোগ হল যখন তাঁরা জানলেন—এই সুলক্ষণা কন্যাই হবেন শিব-জায়া। কিন্তু শিব তো তখন তপোমগ্ন যোগেশ্বর। দেবতাদের পরামর্শে যথাসময়ে গিরি-সুতা শিব-পরিচর্যায় নিয়োজিতা হলেন। পরে শুরু করেন কঠোর তপস্যা। পরিশেষে বাঞ্ছিত ফল লাভ হল। শিব গিরিজাকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন।

গিরিগৃহে শিব পার্বতীর বিয়ে হবে মহাসমারোহে। বিশ্বকর্মা স্বয়ং এসে বিয়ের মণ্ডপ তৈরি করে দিলেন। এদিকে সমাগত বেদ-পারঙ্গম ঋষিগণ বেদবিধানে মঙ্গলক্রিয়া সমাধা করেন। শুভলগ্নে বরবেশী শিবকে বিবাহ সভায় আনা হল। মেনকা শিবকে বরণ করলেন, জামাই দেখে খুশি হলেন। লগ্ন মিলিয়ে গর্গমুনি মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। তাঁর নির্দেশে বধূবেশী পার্বতী শিবকে অঞ্জলি দান করেন। লাজাঞ্জলি শিবের মাথায় বর্ষিত হল। দধি, খৈ, কুশাদি দ্বারা অর্চিত হলেন মহেশ্বর। তারপর হল শুভদৃষ্টি। রুচিরাননা পার্বতী পরম প্রীতিভরে শম্ভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এরপরে শিবকেও বধূবেশী গিরিজাকে প্রতিপূজা করতে হল, তম্বী গিরিজা শিব দ্বারা অর্চিত হলেন। তখন লক্ষ্মী, সাবিত্রী, অরুন্ধতী—এয়োতীগণ মিলে বর ও বধূকে বরণ করলেন। অলঙ্কারভূষিতা মেনকা সোনার কলস নিয়ে গিরিরাজের কাছে বসলেন। শিবের গোত্রাদি জেনে নিয়ে কন্যা সম্প্রদান করলেন গিরিরাজ। এরপরে হোমক্রিয়া হল। হোমশেষে সঙ্গীত, বরণ ইত্যাদি স্ত্রী-আচার শেষ হল। জামাতাকে বহুমূল্য রত্ন পরিচ্ছদ দান করেন গিরিরাজ। নব-দম্পতীকে দেখে সকলেই খুশি।

শিব-শিবানীর নতুন সংসার শুরু হল। আনন্দ, মান, অভিমান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন-ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। এরপরে ষড়ানন কার্তিক ও গজানন গণেশের জন্ম হল। শিবানী হলেন মাতৃকা।

এবার আবার তত্ত্বকথায় ফিরে যাই। শিবজায়া শুধু কার্তিক ও গণেশের জননী নন। তিনি জগন্মাতা। শিব-পার্বতী দেব-দম্পতীকে বন্দনা করে নারদ বলেছিলেন—"আপনারাই এই চরাচরের বীজ-স্বরূপ, আপনারাই যে এই নিখিল ভারতের বীজভূত পিতামাতা, এ তত্ত্ব অদ্য আমার যথাযথ বিদিত হল।" স্বয়ং ত্রিদিবেশ শিব বলেছেন—"ইয়ং মম মহাশক্তি গৌরীর্মায়া জগৎপ্রসূ"—গৌরী আমার মহাশক্তি, ইনিই মায়া এবং জগৎ প্রসবিতা। গৌরীর এই 'মহাশক্তি' ও 'মহামায়া'—এই দুই রূপেরই পরিচয় পাই তাঁর অসুরদলনী লীলাতেও।

সুরলোকের সুরপতি ইন্দ্রের সঙ্গে মাঝে মাঝেই অসুরদের যুদ্ধ হয়, কারণ তাদের আকাঙ্ক্ষা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করে তারা হবে স্বর্গের অধিপতি। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, এই অসুরেরা আবার আশুতোষ মহাদেবের কাছে বরপ্রাপ্ত, সহজে তারা বধের অযোগ্য। নারীশক্তি ভিন্ন এদের বিনাশ সাধন অসম্ভব। সেই কারণেই কোটি সূর্য-সমপ্রভা, বিদ্যুন্ময়ী, মহাবলা, মহাতেজা মহেশ্বরীর মহাশক্তি মহাদেব থেকে আরম্ভ করে সব দেবতার বন্দিত। দেবতাদের অপরাজেয় ঘোর নামের দৈত্যকে দেবী মহামায়া তাঁর পাশ-দ্বারা বদ্ধ করে শূল-শক্তি প্রহারে বধ করেছিলেন। বলাসুর নামের এক অসুর বিষ্ণুর অনুরোধে দেবতাদের যজ্ঞের জন্য তাঁর দেহ আহুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র সুবলাসুর সহজে দেবতাদের ছেড়ে দিল না। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। দেবতারা সমরসাজে সজ্জিত হয়ে সুবলাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন তাঁরা সবাই শরণাপন্ন হলেন মহামায়ার। মহামায়া অসুর বধে স্বীকৃত

হলেন। তিনি বুঝলেন সুবলাসুরকে মারতে হলে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে, তাই তিনি তাঁর যৌবনরূপ ত্যাগ করে বৃদ্ধারূপ ধারণ করে অসুরের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। দয়াপরবশ হয়ে অসুর তাঁর হাত ধরে তুলতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে ধরাশায়ী হল। স্কন্দপুরাণ, দেবীপুরাণ মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ইত্যাদি পুরাণে দেবীর অসুরদলনীরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অসুর-বধ কাহিনীগুলির মধ্যে মহিষাসুর-বধ কাহিনীটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। মহিষাসুর-মর্দিনীরূপেই সুরথ রাজা ও সমাধিবৈশ্য মেধস ঋষির আশ্রমে সর্বপ্রথম মহা-মায়ার পূজা করেছিলেন। সেই থেকেই শারদীয়া দেবীপূজার প্রচলন হয়েছে। মেধস ঋষির কাছে সুরথ রাজা যে কাহিনী শুনেছিলেন তা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। পুরাকালে সুরপতি পুরন্দরের রাজত্ব সময়ে প্রবলপ্রতাপ মহিষা-সুরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ লেগেই থাকত। তম-প্রধান অসুর, সত্ত্বপ্রধান সুর, সুরলোক জয় করে সুরদের সব কেড়ে নিল মহিষাসুর। দেবগণ মহাদেব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। মহিষাসুরের স্বর্গ বিজয়ের কথা শুনে মহেশ ও বিষ্ণুর চতুর্মুখ থেকে তেজ নির্গত হল। সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরাদি অন্যান্য সব দেব অঙ্গ থেকেও তেজ নির্গত হল। জলন্ত পর্বত সমান তেজোরাশি থেকে মহাতেজ-পূর্ণা, দশভুজা নারীর উৎপত্তি হল। দেববৃন্দ সেই শক্তিময়ীকে আত্মশক্তি অস্ত্র দিয়ে আর স্বর্গবাসিগণ অলঙ্কার দিয়ে নারীশক্তিকে সজ্জিত করেন। দেবীশব্দ ওঁকারকে হুঙ্কার মনে করে সেই পশু-বৃত্তি অসুর পরাপ্রকৃতির মুখোমুখী হল রণাঙ্গনে, দেখতে পেল—দেবীর অঙ্গ-জ্যোতিতেই ব্যাপ্ত ত্রিভুবন'। যাই হোক্, দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল। দেবীর নিঃশ্বাস থেকে সদ্যোজাত শত-সহস্র সৈন্য আবির্ভূত হল। অসুরপক্ষেও সৈন্য সংখ্যা কম ছিল না। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। অসুর নানারূপ মায়াশরীর ধারণ করে। মহামায়া নিজ শক্তিতে সকলকে বিনাশ করেন। তারপরে মহিষাকৃতি শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অসুর যুদ্ধ শুরু করে দিলে অসুরনাশিনী তখন খড়্গাঘাতে মহিষাসুরের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। সুরলোকে দেবগণ মহোল্লাসে দশভুজা ভগবতীর পূজা করেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে আবার মহামায়া-শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—দেবী জগজ্জননী, সুরাসুর সবই তো তাঁর সৃষ্ট, তবে তাঁর কেন এই অসুরদলনের লীলাখেলা। এর সদুত্তর পেতে হলে আমাদের শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার ষোড়শ অধ্যায় স্মরণ করতে হবে। দৈবী ও আসুরী সম্পদ ব্যাখ্যা করেই শ্রীভগবান সেখানে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। অহিংসা, অক্রোধ, ত্যাগ, অদ্রোহ, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা—ইত্যাদি হল দৈবী সম্পদ; আর দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, চাঞ্চল্য, অজ্ঞান—এসব হল আসুরী সম্পদ। অসুর ভাবাপন্নরাই জগতের অশুভ, অমঙ্গল ও ক্ষতির কারণ। এজন্যই দেবীর অসুর-নিধন একথা সত্যি। কিন্তু এই অসুর-নিধন অর্থ অসুরের মৃত্যু সাধন নয়। আসুরিক বা পশুবৃত্তির সংস্কার সাধন করে তাকে দৈবী সম্পদ দান করা। এজন্যই দেবীর হাতে অসুরের মৃত্যু হলে বলা হয় অসুরের মুক্তি হল। দেবীর তেজ মহিষাসুরকে ভস্ম করেনি, তাঁর জ্যোতি অসুরকে অন্ধ করেনি, তাঁর পশুত্বনাশী মহাশক্তি তাকে দেবত্ব দান করেছে, তাই অসুর মুক্ত।

যুদ্ধে সমবেত সকল দেবশক্তিই মহামায়ার বিভূতি। নিশুম্ভের মৃত্যুর পরে শুম্ভাসুর বলেছিল—সকলের শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে কোন গৌরব নেই। শুম্ভাসুরের এই অভিযোগের উত্তরে তিনি বলে-ছিলেন, সব শক্তিই তাঁরই বিভূতি। তিনি যে-সব শক্তিরূপিণীকে সৃষ্টি করেছিলেন সকলের শক্তি সংহরণ করে দেখালেন যে, তিনি একা যুদ্ধ করলেও

তাঁর মধ্যে সব শক্তির সমাবেশ হয়েছে। মহামায়ার যে শক্তি এককে বহু করতে সমর্থ সেই মায়াশক্তিই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে বহু সৈন্য ও বহু শক্তিরূপিণীর সৃষ্টি করে থাকে, আবার সব শক্তি একত্রে মিলিত হয়ে মহামায়ার আত্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অতএব মহামায়া তাঁর মায়াশক্তি বলেই অসুর-বৃত্তির বিনাশ করে দেবতাদের দুর্গতি দূর করেন, তাই তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অসুরদলনী মহামায়া। এই মায়াশক্তিকে ইন্দ্রজাল বা মিথ্যা বলা যায় না, এ এক অচিন্ত্য, অভিনব শক্তি।

সব জীবে যে দেবীশক্তি অন্তর্নিহিত, প্রয়োজনে সেই শক্তির জাগরণের জন্য মহাশক্তিকে বার বার নমস্কার করি—"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। / নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ

ডক্টর ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা

স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক। ভক্তি-গ্রন্থ প্রণেতা ও গীতিকার।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মনুষ্যত্বের যাবতীয় বৃত্তি চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পেয়েছে,—তাই তিনি আদর্শ মানবও বটে। তিনি একাধারে ত্যাগী, কর্মী, ভক্ত, ধ্যানী,—আবার গৃহী, জ্ঞানী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দক্ষ বিচারক, দণ্ডপ্রণেতা, সুরসে রসিক এবং ধর্মসংস্থাপক। তাঁর জীবনে বীর্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, যশ, এবং তৎসহ বৈরাগ্য বা অনাসক্তির সংমিশ্রণ,—সর্বকালের, সর্বদেশের পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।

সমাজ যখন অনাচারে ছেয়ে গেছে,—ক্ষমতাশীল কতিপয় শাসকের নৃশংসতায় যখন সাধুচিত্ত, ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত, তখনই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পরিত্রাণের জন্য এবং সর্বোপরি ধর্মের রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা৪।৮)

বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ভগবানের মাধুর্যময় লীলার দিক অথবা তাঁর জ্ঞানদাতা আচার্যরূপের প্রসঙ্গে আমরা যাচ্ছি না। ধর্মসংস্থাপন উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য তাঁর অত্যাশ্চর্য বিচারবিচক্ষণতা, তৎপরতা, তেজ ও পরাক্রমের কাহিনীই স্বল্পকথায় আলোচনার চেষ্টা করা যাচ্ছে। দেহাত্মবাদী ভগবদ্দ্বেষীকেই শাস্ত্রে-পুরাণে অসুর বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই সে-যুগে কংস, জরাসন্ধ, দুর্যোধন ও তাদের অনুচরবৃন্দ নিঃসন্দেহে অসুরপর্যায়ভুক্ত। অসুরগণই প্রকৃত অর্থে দুষ্কৃতকারী। অতএব ইহাদের নিধনই শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

বাল্যকালে ব্রজলীলায় অসুরনিধন— এ লীলা বড় অদ্ভুত। তেজের বিকাশ নেই এ লীলাতে। হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে নিধন করেছেন অসুরদের। "ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কর্তৃক কংসনিধন হবে,"—এ দৈববাণীতে দিশেহারা হয়ে কংস বসুদেব-দেবকীকে কারাগারে রুদ্ধ করে পর পর সাতটি পুত্র সন্তান ও গোকুল থেকে আনীত নন্দ-যশোদা-নন্দিনীকে তাদের জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হত্যা করে যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর প্রকৃত নিধনকারী ব্রজে রয়েছে, তখন তিনি বিভিন্ন অনুচর ব্রজে পাঠাতে লাগলেন কৃষ্ণকে খুঁজে

বার করে হত্যার উদ্দেশ্তে। এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম দিবস বয়সে পুতনা বধ, তিন মাসে শকটাসুর বধ, এক বৎসরে তৃণাবর্ত বধ, পাঁচ বৎসর বয়সে বকাসুর ও অঘাসুর বধ, ছয় বৎসর বয়সে ধেনুকাসুর বধ ও কালীয়দমন এবং আট বৎসরে অরিষ্টাসুর ও কেশী দৈত্য বধ করেন। তবে এসব নিধন-লীলায়—বীর্যের চেয়ে ঐশ্বর্যেরই প্রকাশ বেশি। কারণ সাধারণ মানব-শিশুর পক্ষে খেলার ছলে সব মায়াবী প্রবলপরাক্রম অসুরদের নিধন করা সম্ভব নয়।

এতগুলি অনুচর বালক কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হওয়ায় কংস তো ভয়ে এবং ক্রোধে আগুন। মত্তহস্তীর পায়ের তলায় পিষিয়ে মারতে এবং তাতেও বিফল হলে মল্লবীরদের দ্বারা কৃষ্ণহত্যার চক্রান্ত করে, অক্রূরকে ব্রজগোকুলে পাঠালেন কৃষ্ণ-বলরামকে মল্লক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করতে।

*

তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৮ বৎসর ১১ মাস কয়েকদিন। অক্রূরের কাছে কংসের আসল উদ্দেশ্য জানতে পেরেও নির্ভয় কৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরের রথে আরোহণ করে মথুরায় এলেন। কংসানুচর রজক বধ ও কংসরক্ষিগণকে বিনাশ করে অবলীলাক্রমে কুবলয়াপীড় নামে মত্তহস্তী বধ করলেন এবং চাণুর ও মুষ্টিক নামক দুর্ধর্ষ-মল্লবীর-দ্বয়কে বধ করলেন।

বালক কৃষ্ণ কর্তৃক দুর্ধর্ষ সব অনুচর নিহত হওয়ায় কৃষ্ণের মাতুল কংস ভয়ে সর্বদা সর্বদিকে কৃষ্ণকেই দেখতে লাগলেন। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে তখন কংস আদেশ দিলেন কারাগারে অবরুদ্ধ বসুদেব-দেবকীকে সেখানেই হত্যা করার জন্য। কিন্তু কংস স্বয়ংই নিহত হলেন,—অমিততেজ কৃষ্ণ সিংহবিক্রমে মাতুলকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে সর্বসমক্ষে হত্যা করলেন। কংসনিধনের পরই কারাগার থেকে নিজ পিতামাতা বসুদেব-দেবকীকে মুক্ত করলেন এবং বৃদ্ধ কংস-পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসালেন।

সদ্য বিধবা দুই কংসজায়া তাদের পিতা জরাসন্ধকে পতিহন্তা কৃষ্ণের এসব খবর জানালে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করলেন। তাঁর বিশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের তুলনায় যাদব সৈন্য নগণ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় সেনাপতিত্বে আঠার বার জরাসন্ধকে পরাস্ত হয়ে ফিরে যেতে হয়। অবশ্য তাঁর বিরাট সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে সৈন্যক্ষয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন এইরূপ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হতে থাকলে যাদবদের প্রভূত ক্ষতি হবে, তাই সাগরদ্বীপ দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করে এবং রৈবতক পাহাড়ে পুরী রক্ষার্থে দুর্গ তৈরি করে সমস্ত যাদবকে নিয়ে দ্বারকায় চলে যান।

জরাসন্ধ বিক্রমশালী কালযবনকে পাঠালেন পুনঃ মথুরা অবরোধের জন্য। সৈন্যক্ষয় যাতে আর না হয় সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ এবার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করলেন। একাকী নিরস্ত্র হয়ে কালযবনের কাছে যেতেই শত্রুকে হাতের মুঠোতে পেয়েছেন মনে করে সোল্লাসে যেই কৃষ্ণকে করায়ত্ত করতে যাবেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন অদ্ভুত কৌশলে কালযবনকে বহুদূর নিয়ে গিয়ে নিজ বাহুবলে তাঁকে অনায়াসে বধ করলেন। সৈন্য-দল অগত্যা পলায়ন করে।

*

সম্রাট জরাসন্ধ ছিয়াশি জন রাজাকে বলি প্রদানের জন্য বন্দী করে রেখেছিলেন; বাকি চৌদ্দজন হলেই তাঁর সঙ্কল্পিত একশত নরবলি সার্থক হবে। ইষ্ট মহেশ্বরের প্রসন্নতার জন্যই নাকি যজ্ঞে পশুর মতো সবাইকে তিনি বলি দেবেন। উৎকট ধর্মধ্বজী জরাসন্ধকে বিনাশ করলে এতগুলি প্রাণ রক্ষা পাবে, প্রপীড়িত ভারত-ভূমির জনসাধারণ স্বস্তি পাবে এবং যুধিষ্ঠিরও

সম্রাটের যোগ্যতা লাভে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী হতে পারবেন,—এই চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ভীমার্জুনকে সঙ্গে নিয়ে মগধে জরাসন্ধের কাছে হাজির হলেন। অতঃপর দ্বৈরথ গদাযুদ্ধে ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ নিহত হলেন।

*

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নির্দেশে সর্বপ্রধান আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকেই উপযুক্ত মর্যাদায় শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করাতে চেদিরাজ শিশুপাল ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের, ভীষ্মের ও যুধিষ্ঠিরের অবমাননা করতে লাগলেন। নীরব, অচঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ পরিশেষে শিশুপাল কর্তৃক দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হওয়ায় ও একশত একটি অপরাধ পূর্ণ হওয়ায় অবলীলাক্রমে শিশুপালকে সেখানেই নিধন করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করলেন। রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির সম্রাট হলে দুর্যোধন ঈর্ষায় জ্বলে উঠলেন; শকুনির পরামর্শে কপট পাশা খেলায় তাঁকে হারিয়ে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করালেন।

অজ্ঞাতবাসের পরে পাণ্ডবরা ফিরে এলে দুর্যোধন তাঁদের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার না করে অন্যায়ভাবে বললেন—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" আসন্ন যুদ্ধে লোকক্ষয় নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে কৌরব-পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরু-পাণ্ডব মিলনের জন্য সন্ধির প্রস্তাব রাখলেন এবং জানালেন অন্ততঃ অর্ধেক রাজ্য পেলেও যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে। মদমত্ত দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে অমিতশক্তিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে অর্জুন ও দুর্যোধন এলেন দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব ও কৌরব—দু পক্ষেরই হিতকারী—কিন্তু ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদের তিনি একান্ত সুহৃদ্। ন্যায়বিচারক ও দূরদর্শী কৃষ্ণ প্রস্তাব রাখলেন,—"এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সশস্ত্র নারায়ণী সেনা থাকবে ও অপর পক্ষে তিনি নিজে থাকবেন কিন্তু অস্ত্রধারণ করবেন না।" ধার্মিক ও ভক্ত অর্জুন নিরস্ত্র কৃষ্ণকেই বেছে নিলেন; কারণ ভাবলেন,—কৃষ্ণ যাদের সহায়, তাদের জয় অনিবার্য, দুর্যোধন কিন্তু এক অক্ষৌহিণী সশস্ত্র নারায়ণী সেনা পেয়ে মহাখুশি হয়ে চলে গেলেন ও মনে মনে ভাবলেন—"অর্জুন কি বোকা! নিরস্ত্র কৃষ্ণকে পেয়ে কি লাভ? আমিই জিতে গেছি।" শ্রীকৃষ্ণের সুদক্ষ পরিচালনায় যুদ্ধে ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ অর্থাৎ পাণ্ডবদের জয় ও কৌরবদের বিনাশ হল এবং যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন হল।

আত্মীয় বিনাশরূপী অধর্মের সম্ভাবনায় যুদ্ধে নির্বেদপ্রাপ্ত অর্জুনকে সারথীরূপী শ্রীকৃষ্ণ ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন,—সে-সব কথাই সর্বশাস্ত্রসার "গীতা"।

দেহ অনিত্য, আত্মা অবিনাশী, ফল পূর্ব-নির্ধারিত, জীবের কর্ম নিমিত্তমাত্র, ফলের ভার শ্রীভগবানের উপর দিয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করে যাওয়া এবং শ্রীভগবচ্চরণে ঐকান্তিক ভক্তি ও শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ পথ,—এইসব উপদেশ অর্জুনকে উপলক্ষ করে সারা জগদ্বাসীকে দিয়ে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র

ডক্টর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও সুদীর্ঘ। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন বেদকেই একমাত্র উৎসরূপে গণনা করা হয়ে থাকে, দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেও বেদই অনুরূপভাবে প্রাচীনতম উৎসরূপে ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত। বৈদিক বাঙ্ময় অতি বিশাল—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভেদে এর বিস্তৃতি ও গভীরতা বিস্ময়কর। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'পস্পশা' আহ্নিকে এই সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে :

"মহান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। সপ্তদ্বীপা বসুমতী, ত্রয়ো লোকাঃ, চত্বারোবেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা বহুধা ভিন্নাঃ—একশতমধ্বর্যুশাখাঃ, সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ, একবিংশতিধা বাহ্‌বৃচ্যং নবধা আথর্বণো বেদঃ, বাকোবাক্যম্, ইতিহাসঃ, পুরাণং বৈদ্যকমিত্যেতাবান্ শব্দস্য প্রয়োগ-বিষয়ঃ।..."[১]

অর্থাৎ বেদ চারিটি—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ নিয়ে বেদ গঠিত। প্রত্যেকটি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আবার শাখা ভেদে ভিন্ন হয়ে গুরুশিষ্য সম্প্রদায়-পরম্পরা-ক্রমে প্রচারিত হয়ে আসছে। ঋগ্বেদের শাখা-সংখ্যা একবিংশতি, যজুর্বেদের একশত এক শাখা, সামবেদ সহস্র শাখায় বিভক্ত, অথর্ববেদের শাখা নয়টি। প্রত্যেকটি বেদের প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রচলিত ছিল, যদিও তাদের মধ্যে প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও বহুলাংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হত। এইসব বৈদিক শাখার সঙ্গে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অংশ যুক্ত ছিল। তাদেরও কতই না বৈচিত্র্য ও বিশালতা। এর থেকেই প্রাচীন আর্য সাহিত্যের বিস্তৃতি, ও দুরবগাহ গাম্ভীর্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কিছুটা ধারণা জন্মাতে পারে। এখন যেমন লৌকিক সাহিত্যের রূপগত ও বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য দেখে আমরা মুগ্ধ হই, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও একই রকম বৈচিত্র্য ছিল। তাতে যেমন ধর্মবিষয়ক আলোচনা স্থান পেত, ঠিক সেইভাবেই যজ্ঞসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, ব্যাকরণ, শব্দার্থ নির্বচন, ছন্দোবিচার, জ্যোতির্বিষয়ক আলোচনা, ইতিহাস, পুরাকল্প, বাকোবাক্য, ব্রহ্মোদ্য, জ্যামিতিক বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে অজস্র উপাদানও সেই বিশাল বাঙ্ময়ের পরিধির মধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং মনু যে বেদকে সকল জ্ঞানের আকর বলে নির্দেশ করেছেন "সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ", তা নিছক অত্যুক্তি বা শ্রদ্ধাজাড্যের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করলে নিতান্তই ভুল করা হবে। আর 'বেদ' এই শব্দটিও জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হওয়ায় জ্ঞানেরই বাচক। ফলে মনুর উক্তি যে 'ভূতার্থব্যাহৃতি' মাত্র, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না।

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।"

'বেদ' শব্দের এইভাবে যে নির্বচন শাস্ত্রকারেরা করে থাকেন, তাও মনুর উক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

১ মহাভাষ্য : ১ম খণ্ড, পস্পশা, পৃঃ ৫৭ (Motilal Benarasidass, 1st Edition, 1967)

২

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভেদে বেদের যে চারপ্রকার ভাগ নির্দেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে মন্ত্রভাগেরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতা স্বীকৃত হয়ে থাকে। বৈদিক সাহিত্যে 'ঋক্ সংহিতা'-ই প্রাচীনতম মন্ত্রসংহিতা এবং ঋগ্বেদেই সকল বেদের মধ্যে অভ্যর্হিততম—একথা সর্ববাদি-সম্মত। এই ঋগ্বেদের সংহিতা গ্রন্থে যে সহস্রাধিক সূক্ত একত্র সংকলিত হয়েছে, তাতে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, আদিত্য, উষা, পর্জন্য প্রভৃতি কত বিচিত্র দেবতার উদ্দেশে ঋষিদের স্তুতি উচ্চারিত হয়েছে! শুধু স্তুতিই নয়,—আশীর্বাদ, শপথ, অভিশাপ, কোনও তত্ত্বের উপলব্ধি, পরিদেবনা, নিন্দা, প্রশংসা —বৈদিক সূক্তের বিষয়বস্তুও বিচিত্র। আচার্য যাস্ক মন্ত্রের এই বৈচিত্র্য নির্দেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন:

"যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্য-মিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি। অথাপি স্তুতিরেব ভবতি নাশীর্বাদঃ অথাপ্যাশীরেব ন স্তুতিঃ।...অথাপি শপথাভি-শাপৌ।...অথাপি কস্যচিদ্ ভাবস্যাবচিখ্যাসা।... অথাপি পরিদেবনা কস্মাংশ্চিদ্‌ভাবাৎ। অথাপি নিন্দাপ্রশংসে। এবমুচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি।"[২]

বৈদিক মন্ত্রের এই বিচিত্র অভিপ্রায়ের মধ্যে সর্বত্রই 'তত্ত্বদর্শন' অনুস্যূত হয়ে আছে। বিশেষ করে যেসব সূক্তে কোনও গম্ভীর রহস্যের উপলব্ধি আত্মপ্রকাশ করেছে—যেমন ঋগ্বেদের বাগাম্ভৃণীয় সূক্ত, নাসদীয় সূক্ত বা অথর্ববেদের কালসূক্ত, যেগুলি বেদবিৎসম্প্রদায়ে 'ভাববৃত্ত' বলে পরিচিত, সেগুলির মধ্যেই যে দার্শনিক জিজ্ঞাসার সর্বপ্রথম উন্মেষ আমরা লক্ষ্য করে থাকি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া বৈদিকসূক্তে যেমন দেবতার বহুত্ব সকলেরই দৃষ্টিগোচর, অনুরূপভাবে এমন মন্ত্রেরও অভাব নেই যার মধ্যে একদেববাদ, এমনকি বিশুদ্ধ আত্মাদ্বৈতবাদও স্পষ্টভাবেই উদ্‌ঘোষিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সূর্যসূক্তে বলা হয়েছে—'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থু-ষশ্চ'। একইভাবে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা যে একই পরম তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তা—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে। এইভাবে নৈরুক্ত সম্প্রদায়ের দেবতাত্রিত্ববাদের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত আত্মৈকত্ববাদ বেদের বহুস্থলে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আচার্য যাস্ক তাই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন:

"মহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। অপি চ সত্ত্বানাং প্রকৃতিভূমভির্ঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ। প্রকৃতি সার্বনাম্যাচ্চ। ইতরেতর জন্মানো ভবন্তি। ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ। কর্মজন্মানঃ। আত্মজন্মানঃ। আত্মৈবৈষাং রথো ভবতি। আত্মাশ্বঃ। আত্মায়ুধম্। আত্মেষবঃ, আত্মা সর্বং দেবস্য।"[৩]

অচেতন পদার্থকেও যে বেদে দেবতারূপে স্তুতি করা হয়ে থাকে, তার কারণ একই আত্মা সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। দেবতার আয়ুধ, শকটাদি বাহন, রথ প্রভৃতি সর্ববিধ পদার্থই সেই আত্মারই বিলাসমাত্র। আচার্য শৌনক তাই মহর্ষি যাস্কের প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন:

২ দ্রঃ নিরুক্ত, দৈবত কাণ্ড, অধ্যায় ৭।১-৩
৩ নিরুক্ত, ৭।৪

"আয়ুধং বাহনং চাপি স্তুতৌ যস্যেহ দৃশ্যতে।
তমেব তু স্তুতং বিদ্যাৎ, তস্যাত্মা বহুধা হি সঃ॥"[৪]
এছাড়াও বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যানপদ্ধতিও আচার্যভেদে ভিন্ন ছিল। যাস্কাচার্য তাঁর 'নিরুক্ত' অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, নৈরুক্ত, ঐতিহাসিক প্রভৃতিভেদে মন্ত্রব্যাখ্যানের নানাবিধ পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন, এবং একই মন্ত্র কিভাবে ব্যাখ্যাতৃগণের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে সমর্থ হয়ে থাকে তারও নানা উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে বৈদিক সংহিতার যুগেই বিচিত্র দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও তার সমাধানের প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করে থাকি। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি। মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ॥" এই ঋক্‌মন্ত্রটির অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যা যেমন হতে পারে, তেমনি বৈয়াকরণ দৃষ্টিতে বাগ্‌দেবতার স্তুতিরূপেও এর ব্যাখ্যা যে সম্ভব, তা মহাভাষ্যের পস্পশা আহ্নিক আলোচনা করলেই আমরা জানতে পারি।

৩

মন্ত্রযুগের পর ব্রাহ্মণযুগের সূচনা। এই পর্বে যা কিছু আলোচনা, জিজ্ঞাসা, বিচার তা সবই প্রধানতঃ শ্রৌতযজ্ঞকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শতপথ, জৈমিনীয়, গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নানা স্থলে বিচিত্র দার্শনিক জিজ্ঞাসার আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করে থাকি। সেখানে বৈদিক ঋষিগণের জিজ্ঞাসা শুধুই উপলব্ধির স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, যুক্তিনির্ভর বিচারপদ্ধতিও ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখা যায়। বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে দার্শনিক জিজ্ঞাসার অঙ্গাঙ্গিভাব—সম্পর্ক ঋক্‌সংহিতার যুগ থেকে লক্ষিত হয়ে থাকে। অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাবিধ উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে যজ্ঞের নিগূঢ় রহস্যের পাশাপাশি এই বিশ্বসৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্য সম্বন্ধেও আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় বাকোবাক্য বা উক্তি-প্রত্যুক্তিকে শ্রৌতসূত্রকারগণ 'ব্রহ্মোদ্য' এই আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন। এবং এই 'ব্রহ্মোদ্যে' যাঁরা অংশগ্রহণ করে থাকেন তাঁরা 'ব্রহ্মবাদী' বলে পরিচিত। অথর্ববেদের গদ্যাংশের মধ্যেই এই 'ব্রহ্মোদ্যের' সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। মহাভারতের যুগে এই ব্রহ্মোদ্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের সংলাপের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। যজ্ঞ ও সৃষ্টি সম্পর্কে উত্তর-প্রত্যুত্তরের সাহায্যে গভীর রহস্যের উন্মোচন ও তার সমাধান খুঁজে বার করাই ছিল এই জাতীয় বিচারের প্রধান লক্ষ্য। এই বিচারকে বলা হত 'মীমাংসা'। যজুর্বেদের 'কাঠক-সংহিতা', সামবেদের 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ', কৃষ্ণযজুর্বেদের 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থের নানা স্থলে বিভিন্ন যজ্ঞীয় ও দার্শনিক বিষয় অবলম্বন করে এই জাতীয় মীমাংসার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতা থেকে একটি বাক্য উদ্ধার করতে পারি: "উৎসৃজ্যাৎ স নোৎসৃজ্যাৎ স্ ইতি মীমাংসান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ। তদ্বাহুঃ—উৎসৃজ্যমেবেতি।" (তৈ সং ৭.৫.৭.১) মীমাংসা শব্দটির উৎস এইসব ব্রাহ্মণবচন। "পূজিতবিচার বচনো মীমাংসাশব্দঃ"—মীমাংসা শব্দের অর্থ 'পূজিতবিচার' বা নানাযুক্তিসমৃদ্ধ সমীক্ষা। যজ্ঞীয় বিষয় সম্পর্কিত এই জাতীয় বিচার—'অধ্বরমীমাংসা' বা 'কর্মমীমাংসা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। [ক্রমশঃ]

৪ বৃহদ্দেবতা ৪।১৪৩

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে—স্বামী চেতনানন্দ। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং—৭৯৩-০০৩, (মেঘালয়)। পৃষ্ঠা ১১৫+৩, মূল্য : ৫'৫০ টাকা।

'শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে' কথাটি শুনলেই মনে হয় যে, বইটির লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক যুগের এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসার স্মৃতিচারণই বোধহয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। লেখক অর্থাৎ আমেরিকার বেদান্ত সোসাইটি অব্ সেণ্ট লুইস-এর অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ অনেক পরবর্তী কালের হয়েও সুচিন্তিত পাঁচটি প্রবন্ধের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, সর্বকালের মানুষ ইচ্ছা করলে কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারে। বইটির ভূমিকায় লেখক এক নিষ্ঠাবতী ক্যাথলিক আমেরিকান মহিলাকে এই পথনির্দেশ কিভাবে দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে : "দেখুন, রোজ দুবেলা ধ্যানাভ্যাস করুন। ধ্যানের বিভিন্ন প্রণালী আছে, যেমন রূপের ধ্যান, গুণের ধ্যান, বাণীর ধ্যান, লীলার ধ্যান। এর মধ্যে লীলার ধ্যানটি বড় সুন্দর, সহজ ও সরস।...আপনি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করুন—ঐ যীশু চলেছেন পথ ধরে। অগণিত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করছে। যীশু সাইমনের বাড়ীতে ঢুকলেন। পতিতা মেরী ম্যাগডোলেন যীশুর পা ধুইয়ে দিলেন নিজের চোখের জল দিয়ে। তারপর মাথার লম্বা চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিলেন। মেরী তারপর অ্যালাবাস্টারের বাক্স থেকে সুগন্ধি ক্রীম বের করে তাঁর পায়ে মাখিয়ে দিলেন। করুণাময় ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট মেরীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। খ্রীষ্টের জীবনলীলার এই দৃশ্যগুলি একটার পর একটা দেখতে থাকুন।...দেখবেন, আপনি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে পনের কুড়ি মিনিট যীশুর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন।"

এই প্রকার সান্নিধ্যের কথাই বলা হয়েছে পুস্তকটির পাঁচটি প্রবন্ধে যার মধ্যে চারটি উদ্বোধন পত্রিকাতে পূর্বে প্রকাশিত। প্রথম প্রবন্ধ 'কথামৃত প্রবেশ'-এ কথামৃত সম্বন্ধে চারটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন—'কথামৃতের মঙ্গলাচরণ', 'কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র', 'কথামৃতের পরিবেশ', 'কথামৃতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য' এবং বক্তব্যগুলিকে সুস্পষ্ট করতে এনেছেন 'শ্রীম-দর্শন' এবং অন্যান্য গ্রন্থ হতে কালোপযোগী উদ্ধৃতি। কথামৃতের আরম্ভে যে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের কথা মাত্র উল্লিখিত আছে, তার বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকা হতে। দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলা, বিল্ববৃক্ষ, পঞ্চবটী প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা এবং তৎসহ লেখকের বিষয়োপযোগী মন্তব্যের জন্য উল্লিখিত স্থানগুলি নতুন ভাবে পাঠকের চোখে ভেসে উঠবে। এর ফলে যাঁরা বহুবার কথামৃত পড়েছেন বা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন তাঁরাও প্রবন্ধটি পড়ে উপকৃত তো হবেনই, প্রভূত আনন্দও লাভ করবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'কথামৃতের জন্মশতাব্দী' পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছেন এবং তা শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করবে। 'পথে প্রান্তরে' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরে, তীর্থযাত্রায় এবং কলিকাতার নানা স্থানে পদার্পণের চিত্রগুলি আঁকা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ঘটনা কথামৃত হতে নেওয়ার জন্য এবং লেখকের "আমরা বিভিন্ন পথ ধরে বেড়াতে যাব, কিন্তু কোন বাড়ীতে ঢুকব না"—এই নীতি অনুসরণ করার জন্য (অবশ্য বাড়ির ভিতরের কথাবার্তার সারাংশ দেওয়া হয়েছে।) বর্ণনাগুলি যেন পাঠকের মনে বিশেষ দাগ কাটতে পারছে না। 'কৃপাপ্রাপ্ত রসিক' প্রবন্ধটি

দক্ষিণেশ্বরের মেথর রসিকের ঘটনা, যা লেখক নানা জায়গা থেকে আহরণ করতে পেরেছেন। 'রহস্যময় কল্পতরু'তে রূপক ও গল্পের সাহায্যে, কাশীপুরের কল্পতরু উৎসবে কত রকম কামনা-বাসনা নিয়ে লোকে যায় তার বাস্তব বর্ণনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় সেইসব বাসনা-কামনার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেছেন লেখক।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'আনন্দের হাটের মাণিক' শ্রীরামকৃষ্ণকে কথামৃতে এমনভাবে ধরে রাখা হয়েছে যে, ডাক দিলেই তিনি বেরিয়ে এসে 'সওদা' (অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি ইত্যাদি) 'বিক্রী' করবেন। হয়তো ভাবটি অন্যভাবে প্রকাশিত হলে আরও ভাবদ্যোতক এবং শ্রুতি-মধুর হত। 'কথামৃতের জন্মশতাব্দী'তে অনেক স্থলে যথাযোগ্য পরিচিতি (reference)-র অভাব লক্ষ্য করা গেল। পুস্তকটির দু-এক জায়গায় অর্থ করার অসুবিধা হয়, যেমন পৃঃ ৭৭-তে শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যাওয়ার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের ও মহাভারতে হস্তিনাপুর গমনের মিল দেখানো হয়েছে। কখনও বা লেখকের মন্তব্য একটু হালকা ধরনের লাগে যেমন মন্তব্য পৃঃ ৮৮-তে সিনেমা থিয়েটার সম্বন্ধে করা হয়েছে।

এইসব ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি গৌণ। পুস্তকটির যে মুখ্য উদ্দেশ্য বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে চারিদিকে নানা অশান্তি ও সংঘাতের মাঝেও কি করে তাঁর সান্নিধ্যে আসা সম্ভব—তারই কিছু ইঙ্গিত প্রদান,—তা বহুলাংশে সার্থক হয়েছে। দরদী লেখক ভক্ত সমাজের ধন্যবাদার্হ।

প্রচ্ছদপট সুন্দর, ছাপা মনোরম, মূল্যও কম। পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার
ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ডিরেক্টর, স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা।

'শ্রমিকগণ—সমান অধিকার অর্জন করুন'—অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত-লিখিত, 'উদ্বোধন' জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত সমালোচনা-প্রবন্ধে উত্থাপিত একটি অনুযোগের উত্তরে 'বিবেকানন্দের বিপ্লব-চিন্তা'-গ্রন্থের রচয়িতা মিত্র কৌটিল্য জানাচ্ছেন :

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তের লেখাটিতে আমার প্রসঙ্গে 'সত্যের অপলাপ' করার যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার উত্তরেই এই চিঠি। স্বামীজীর মত প্রসঙ্গে আমি চাররকম শোষণের উল্লেখ করেছিলাম : (১) জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যে; (২) অস্ত্রশক্তির সাহায্যে; (৩) অর্থনৈতিক শোষণ; (৪) সংগঠিত শক্তির জোরে। লেখিকা এ-প্রসঙ্গেই আপত্তি তুলেছেন। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি।

"পৌরোহিত্যশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ২৩১) "ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিনকতক তাহাই হইল।" (ঐ, পৃঃ ২৩৯) স্বামীজীর এই দুই উক্তিতে 'জ্ঞান বা বুদ্ধির সাহায্যে শোষণ' সমর্থিত হয় না?

"ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ।' কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে [উহা] গ্রহণ করিল।" (ঐ, পৃঃ ২৩৯) এই উক্তির মাধ্যমে 'অস্ত্রশক্তির সাহায্যে শোষণের' চেহারা স্বামীজী বলেননি কি?

"বৈশ্য বলিতেছেন, 'উন্মাদ!...এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান্ আমার হস্তে।...হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার

অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ··· অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু-সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে? —আমি।'" (ঐ, পৃঃ ২৩৯) এই উক্তির মাধ্যমে স্বামীজী 'অর্থনৈতিক শোষণ' বোঝাননি কি?

"ও তোমার 'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র। সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।" (ঐ, পৃঃ ১৬১) পার্লামেণ্ট-সেনেট ইত্যাদিতে যদি জনবিরোধী বিল পাশ করানো হয় তবে তা কিসের ভিত্তিতে হয়? সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। একেই বলে brute majority। একে কি 'সংগঠিত শক্তির জোরে শোষণ' বলা যায় না? লক্ষ্যণীয়, স্বামীজীও 'মেজরিটি' শব্দটি লিখেছেন।

আরেকটি কথা, ঐ বইয়ে দাবী করিনি যে আমি স্বামীজীকে বুঝে ফেলেছি। ভূমিকাতে স্পষ্টই লিখেছি—"বিবেকানন্দকে পুরোপুরি চিনেছি এই দাবী করি না। বরং বলা যায়, আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বিবেকানন্দের মধ্যে যেমন পেয়েছি তা-ই লিখেছি। এ আমারই ব্যাখ্যা স্বামীজী সম্পর্কে। তাঁর সম্বন্ধে আমার এই মূল্যায়নে অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া, মানুষের চেতনারও তো পরিবর্তন ঘটে! ভবিষ্যতে স্বামীজীর চিন্তায় নতুন আলো পাব—এমন কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।" (বইটির ৮ পৃষ্ঠায়) গবেষকদের মধ্যে তো মতভেদ থাকবেই। শাস্ত্রাদির ভাষ্য লেখার সময় বিভিন্ন ব্যাখ্যাতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন।

এ-সত্ত্বেও লেখিকার প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি বিতর্ক তোলার জন্য। বিতর্কের মধ্য দিয়েই তো চিন্তার স্বচ্ছতা আসে স্বামীজীকে বুঝে ফেলেছি, এ-দাবী আমি কখনই করব না। তিনি তো নিজেই বলে গেছেন, "আরেকটি বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতো এ-বিবেকানন্দ কি করে গেল।" আমার জীবনদর্শন খুবই সরল—আমি নিজেই প্রশ্ন তুলি, উত্তর খুঁজি, কিন্তু কোনও উত্তরকেই 'শেষ উত্তর' মনে করি না। অধ্যাপিকা দাশগুপ্ত বিবেকানন্দ-গবেষকদের কাছে উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই মতভেদ বজায় রেখেও।

—মিত্র কৌটিল্য

মুণ্ডকোপনিষদ্ : অনুবাদক—ব্রহ্মচারী শিশির-কুমার। প্রকাশক: সন্ত আশ্রম, কল্যাণী, নদীয়া। পৃষ্ঠা ৩২+৫৮+৮, মূল্য: ছয় টাকা

হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারতীয় সমাজে বেদ বিদ্যমান রয়েছে। কে কোন্ সময়ে বেদমন্ত্র রচনা করেছেন, তা কেউ জানে না। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যেই গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে বেদের মন্ত্রসমূহ চলে আসছে। যুগ যুগ ধরে তাঁদের প্রখর স্মৃতিশক্তিই মন্ত্রসমূহকে বহন করে নিয়ে এসেছে যতদিন পর্যন্ত না উপযুক্তভাবে সংকলিত ও সংগ্রথিত হয়েছে। শ্রবণের দ্বারা গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে চলে আসছিল বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি।

হিন্দুদের বিশ্বাস এই বেদ কোন মানুষ রচনা করেননি। মুনি-ঋষিরা বেদের মন্ত্রগুলিকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছিলেন—স্বয়ং পরমেশ্বরই তাঁদের উপদেষ্টা। তাই মুনি-ঋষিরা মন্ত্রের দ্রষ্টা, কিন্তু রচয়িতা নন।

ভারতীয় সমাজ বেদের অনুগামী। তাই বলা হয় বৈদিক ভারত। হিন্দুর জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতির সময় যে-সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি হয় তা সর্বাংশেই বেদবিহিত। হিন্দুরা যে-সব

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করে তাও বেদের অনুশাসন অনুসারে। হিন্দুর জীবনযাত্রার সবকিছুই বেদকে অবলম্বন করে। বর্তমান শতাব্দীতেও এই প্রভাব কিঞ্চিৎ ক্ষীণ প্রতীয়মান হলেও অক্ষুণ্ণ। বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ষড়্‌দর্শনের সৌধ নির্মিত হয়েছে। বেদের প্রামাণ্যই সর্বাধিক এই সব দর্শনের ক্ষেত্রে।

হিন্দু-ভারত বিশ্বাস করে আসছে, বেদ নিত্য হলেও প্রতিকল্পে এই বেদ পুরুষনিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে ঈশ্বরের বাণীরূপে প্রকটিত হয়। কল্পারম্ভে শ্রীভগবান প্রজাপতিরূপে বেদের প্রচার করে থাকেন, নতুন কল্পের পূর্বে তিনি অনাদি বেদকেই পুনর্বার উচ্চারণ করেন এবং সেইভাবে সৃষ্টি হতে থাকে।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের মন্ত্রসমূহকে সংকলন করে বিভাগ করেন চারভাগে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। প্রতি বেদে দুটি বিভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের অপর নাম 'সংহিতা'। সংহিতাভাগে মন্ত্রসমূহ সমষ্টীকৃত হয়েছে। আর যে অংশে শ্রুতি নিজেই নিজের অপ্রকাশিত অর্থ প্রকাশ ও সংহিতার প্রয়োগাদি প্রদর্শন করেছেন বেদের সেই অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ আছে বিধিনিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা। এই অংশ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণের অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই দুই অংশেই উপনিষদ্‌সমূহ বিন্যস্ত রয়েছে। সেজন্য সংহিতোপনিষদ্ বা ব্রাহ্মণোপনিষদ্ নামে উল্লিখিত হয়ে থাকে। যেমন—ঈশোপনিষদ্‌টি সংহিতোপনিষদ্ এবং ঐতরেয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণোপনিষদ্। তবে এইগুলির একটি পারম্পর্য আছে। যেমন—প্রথমে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তারপর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তারপর তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং সবশেষে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।

বেদব্যাস বেদকে চারভাগে ভাগ করে তাঁর চার শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ শিক্ষা দেন।

উল্লিখিত বেদ চতুষ্টয়কে আবার কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই দুইভাগেও ভাগ করা যায়। আরণ্যক ও উপনিষদ্ ছাড়া, সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, কারণ তারা মুখ্যতঃ যজ্ঞাদি কার্যে প্রযুক্ত। আরণ্যক ও উপনিষদ্‌সমূহের বিশেষ উদ্দেশ্য উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদন। কর্মকাণ্ড জীবকে স্বর্গাদি ও লৌকিক ফলভোগের অধিকারী করে, আর জ্ঞানকাণ্ড তাকে চিত্তশুদ্ধিক্রমে মুক্তির ভাগী করে।

এই চারভাগে বিভক্ত বেদ শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে পরে আরও বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ঐ শাখা-প্রশাখার অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

আমাদের আলোচ্য মুণ্ডকোপনিষদ্‌টি অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত। মুণ্ডকের ধাতুগত অর্থ মস্তকমুণ্ডনকারী। এই উপনিষদের নির্দেশ—তীক্ষ্ণ ধারাল ক্ষুর যেমন কচ্ কচ্ করে কাটে তেমনি জীব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তার ভ্রান্তি এবং অজ্ঞানতা ছিন্ন করবে। এই মুণ্ডক শব্দ দিয়ে মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীদেরও বোঝায়, যাঁরা গৃহস্থাশ্রমের সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্যই সচেষ্ট হবেন। এই মুণ্ডক শব্দের অর্থ শির বা মস্তকও বোঝায়। দেহের মধ্যে যেমন শির শ্রেষ্ঠ তেমনি উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে এই উপনিষদ্‌টি শ্রেষ্ঠ বলে নামকরণ হয়েছে মুণ্ডকোপনিষদ্।

মুণ্ডকোপনিষদের তিনটি মুণ্ডক আছে। প্রত্যেক মুণ্ডকের আবার দুটি করে খণ্ড আছে। প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে : ব্রহ্মা

থেকে শুরু করে যে সমস্ত আচার্য-পরম্পরায় ব্রহ্মবিদ্যা জগতে প্রচারিত হয়েছে—তার নির্দেশ, ব্রহ্মবিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে অঙ্গিরা ঋষির কাছে জিজ্ঞাসু শৌনকের গমন এবং প্রশ্ন—কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি—'হে ভগবন্! কোন্ বস্তুটি জানলে সবকিছুই জানা যায়?' অঙ্গিরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ;—পরা ও অপরা বিদ্যার স্বরূপ নিরূপণ করে তিনি ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরা বিদ্যার বিষয় অক্ষর ব্রহ্মের সর্বকারণত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে: অপরা বিদ্যার বিষয় অগ্নিহোত্রাদি কর্মের উপদেশ এবং অঙ্গহানিতে দোষের কথা, শেষে সাংসারিক কর্মফলে বৈরাগ্যলাভের পর ব্রহ্মবিদ্ গুরুর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের জন্য যাওয়ার কথা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে: সত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম থেকে জীবের উৎপত্তি, অবিদ্যার নিবৃত্তি, অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় প্রভৃতি।

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে: দেহকে বৃক্ষরূপে এবং জীব ও পরমাত্মাকে দুটি পক্ষিরূপে বর্ণনা, ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মসারূপ্যলাভ, ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চিত্তশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, কামনাশূন্য মুমুক্ষুর পক্ষেই একমাত্র আত্মদর্শন সহজ, দেহত্যাগের পর আত্মবিদ্ পুরুষের কি হয় প্রভৃতি।

শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার-কৃত মূলের অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল। প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয় এবং ব্রহ্মচারিজী-লিখিত সুচিন্তিত অনুধ্যান পাঠকের পক্ষে উপনিষদের অর্থ বুঝতে খুবই সহায়ক হবে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই 'উপনিষদ্ কি' ও 'প্রাক্-কথন' নামে দুটি প্রাঞ্জল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সংযুক্ত হওয়াতে পাঠক অনায়াসে উপনিষদ্ বলতে কি বোঝায় এবং মুণ্ডকোপনিষদের বিষয়বস্তু কি সে-সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবেন।

বর্ষীয়ান এই বিদগ্ধ সাধু বঙ্গদেশে সুলভে শাস্ত্রপ্রচারণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং বহুমানিত। বাংলার ঘরে ঘরে বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-যোগদর্শন-ভাগবতাদি শাস্ত্র এবং পুরাণাদি ভক্তিগ্রন্থকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা কখন নামমাত্র মূল্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া এই বৈষ্ণব-মহাজনের জীবনব্যাপী এক নীরব সাধনা বিশেষ। আমরা তাঁর এই সাধু প্রয়াসকে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে অভিনন্দন জানাই। আলোচ্য মুণ্ডকোপনিষদ্‌কেও চিত্তাকর্ষক পকেট-সংস্করণরূপে প্রকাশ করে তিনি শাস্ত্রানুরাগী সকলেরই পুনরায় কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

পুস্তকখানির প্রচ্ছদ মনোরম এবং ভাবদ্যোতক, কাগজ ও ছাপা চমৎকার। তবে প্রুফ্ সংশোধনের অনবধানতায় কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে, এই জাতীয় গ্রন্থে যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তা সত্ত্বেও বর্তমান অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজে এমন একখানি শ্রুতি-গ্রন্থের সহজ সুলভ প্রকাশ আমাদের সকলেরই পরম বাঞ্ছিত।

—স্বামী চৈতন্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ: প্রাক্-মৌসুমী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদা এবং ২৪ পরগনা ৬টি জেলায় ব্যাপকভাবে ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে। নিচে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল : (ক) গত ২ থেকে ১০ জুলাই বেলুড় মঠ থেকে একাদিক্রমে হাওড়া ও হুগলী জেলার উদয়নারায়ণপুর, পুরশুরা ও খানাকুল অঞ্চলের ১৯টি গ্রামের জলবন্দী ৩,০৬৭টি পরিবারের ৩৭,৯৫৭ জনকে রান্না-করা খাবার দেওয়া হয়।

(খ) বেলুড়মঠের বর্ধমান শিবির থেকে গত ৬ থেকে ১০ জুলাই চানক ও গুদকরা অঞ্চলের ১১টি গ্রামের ৭৬৭টি পরিবারের ১৪,১৭২ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়।

(গ) বেলুড়মঠের কামারপুকুর শিবির থেকে গত ২ থেকে ১৫ জুলাই হুগলী জেলার রাজহাটি (১ ও ২) এলাকার ১৭টি গ্রামের ১,৪৮৪টি জলবন্দী পরিবারের ১৯,৬৩৬ জন দুর্গত নরনারীকে রান্না-করা খাবার দেওয়া হয়।

(ঘ) গত ৪ থেকে ১৫ জুলাই কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক ইউনিট দ্বারা ৪,৮০০ জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

(ঙ) গত ২২ থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তত্ত্বাবধানে কুমেদপুর ও হরিশ্চন্দ্রপুর শিবির থেকে রান্না-করা খাবার বিতরণ করা হয়। কুমেদপুর শিবির থেকে বন্যাবিধ্বস্ত ২৮টি গ্রামের ১,০৭৮টি পরিবারের ১০,৭৫৫ জন চরম দুর্গত নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর শিবির থেকে জলবন্দী ৭টি গ্রামের ১৮,৮৮৫ জনকে রান্না-করা খাবার দেওয়া হয়। এছাড়া ঐ শিবির থেকে গুঁড়া দুধ ২,২৫৭ জনকে গত ১৯ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত দেওয়া হয়।

(চ) বেলুড়মঠ থেকে গত ৭ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত হাওড়া জেলার আমতা ২নং ব্লকের উত্তর ভাতোরা ও বেরাল অঞ্চলের ১৩টি গ্রামের ১,৫৫৫ জন দুর্গত পরিবারের মধ্যে ৫,০০০ কিলো চাল, ৪,৮৯৪ কিলো আলু এবং ৫২৫ কিলো লবণ বিতরিত হয়।

(ছ) গত ২৩ জুন থেকে ৩ জুলাই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে ২৪ পরগনার সোনারপুর অঞ্চলের ৮টি গ্রামের ২৩১টি পরিবারের মধ্যে ৫৫০ কিলো চিঁড়া ও ৯০ কিলো গুড় বিতরণ করা হয়।

দেহত্যাগ

ব্রহ্মচারী দয়াচৈতন্য (দীপেন) গত ১১ জুলাই ১৯৮৪, সকাল ৭-১০ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। তিনি গত এক বছর ধরে সেবাপ্রতিষ্ঠানে সুষুম্না কাণ্ডে টিউমার (Spinal cord tumour) সহ দু-পায়ে পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন। একবছর পূর্বে কাটিহার আশ্রমে থাকাকালীন তাঁর মেরুদণ্ডে কিছু উপসর্গ দেখা দেয়, তখন তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। সকল প্রকার সুচিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যায় এবং প্রশান্তির মধ্য দিয়ে অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যগ্রহণ করেন। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সঙ্ঘের সেবা করেন। পরিশ্রমী এবং সহজ সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন

কেরালার এরনাকুলামে গত ১৬ ও ১৭ জুন স্থানীয় ভারতীয় বিদ্যাভবন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন সমীক্ষার আন্তর্জাতিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। দুই শতাধিক প্রতিনিধি এই আলোচনা-চক্রে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি বাল গঙ্গাধর নায়ার। মূল ভাষণ দেন আন্তর্জাতিক কমিটির সম্পাদক ঐতিহাসিক ডঃ নিমাইসাধন বসু। শেষ দিনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন কোচিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কে. গোপালন্। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যা-ভবনের সচিব ডাঃ পি. শ্রীকুমার, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন প্রমুখ। আন্তর্জাতিক কমিটির উদ্যোগে পরবর্তী আলোচনা-চক্র আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায়।

যুবসম্মেলন

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট সংস্থা কুমারটুলি ইনস্টিট্যুটের শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ৮ জুলাই ১৯৮৪, বিবেকানন্দ-যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন সংগঠনে সহযোগিতা করেন গোলপার্ক (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব্ কালচারের বিবেকানন্দ-পাঠচক্র। সম্মেলনের উদ্বোধন করে স্বামী অজজানন্দ তাঁর প্রাণস্পর্শী ভাষণে যুবকদের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণে আহ্বান জানান। সম্মেলনের সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ উদাত্তকণ্ঠে যুবকদের আত্ম-বিশ্বাসী হতে বলেন এবং দেশ ও জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে ডাক দেন। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন ডঃ নিমাইসাধন বসু, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ সুভাষ ব্যানার্জী প্রমুখ। নানা অনুষ্ঠানে মণ্ডিত এই সম্মেলন স্থানীয় যুবকদের মধ্যে এক উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং তারই ফলে কুমারটুলি ইনস্টিট্যুট শতবর্ষের স্মারক হিসাবে স্বামী 'বিবেকানন্দ-পাঠচক্র' সংগঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সম্মেলন পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী।

*

আগামী ২ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার রাণাঘাটে রবীন্দ্রভবনে জেলাভিত্তিক সারাদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ-যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। গোটা জেলা থেকে আটশত যুব প্রতিনিধি (১৬ থেকে ৩৫ বছরের যুবক-যুবতী) নেওয়া হবে। সামান্য সংখ্যক বয়স্ক প্রতিনিধিও নেওয়া হবে। প্রতিনিধি ফি পাঁচ টাকা। এ ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য সম্মেলন-সংগঠক শ্রীরামকৃষ্ণ-পদার্পণ স্মারক সমিতি (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভবন, রাণাঘাট)-তে পাওয়া যাবে।

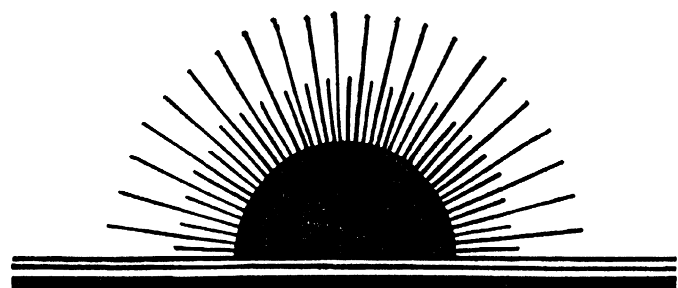
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসমাধি উৎসব

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেব যদুলাল মল্লিকের ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটস্থ ঠাকুরদালানে সিংহবাহিনী দেবীর সন্ধ্যারতি দর্শনকালে ভাবসমাধিমগ্ন হন। তারই স্মরণে যদুলাল মল্লিক স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে 'বিশ্বধর্ম সমাবেশ'-এর আয়োজন করা হয়। স্বামী হিরণ্ময়া-নন্দের পৌরোহিত্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি যাঁরা এই সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ফাদার পিয়ের ফাঁলো, প্রব্রাজিকা প্রদীপপ্রাণা, শ্রীভক্তিবিকাশ সজ্জন মহারাজ, বিচারপতি এস. এ. মাসুদ, গণেশ লালওয়ানি, শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া আরও নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী নিরাময়ানন্দ ও ডঃ শশাঙ্ক-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

" পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।



উদ্বোধন

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ● শ্রাবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৬৬—৩৮৪)

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

স্বামীজী চেয়েছিলেন: উদ্বোধনের মাধ্যমে **'ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে।—ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।'**

'উদ্বোধন' ৮৫ বর্ষ অতিক্রম করে ৮৬ বর্ষে পড়েছে, তবু আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। বিবেকানন্দ-অনুরাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, স্বামীজীর এই মহতী ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁরা যেন নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারে সহায়তা-প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন: **'...তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি,... সাহায্য করিস্‌ ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।'**

উদ্বোধন পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক	১৮'০০ টাকা
ভারতের বাইরে সি-মেল-এ	৮০'০০ টাকা
বাংলাদেশ	৩৫'০০ টাকা
এয়ার-মেল-এ	২২৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা	২'০০ টাকা

আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরের জন্য) ৩০০'০০ টাকা

মাঘ হতে বৎসর আরম্ভ। যে-কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।

আবার চৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে, এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত, এবং জ্ঞান অতি নিম্ন অবস্থা ও মুক্তি অতি তুচ্ছ লিখিত রহিয়াছে দেখিতাম। এই সব বিষয় লইয়া অনেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতাম। কিন্তু কেহই এ বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিত না। বিষয়ী লোকে কি করিয়াই বা দিবে?

যাহা হউক, ধর্ম্মে, বিশ্বাসের প্রথম অবস্থা হইতেই, এইরূপ একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছিল যে, সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া কোন মহাপুরুষ যোগীর শিষ্য হওয়া ব্যতীত, দুর্লভ মুক্তিমার্গে আরোহণ, সাংসারিক অবস্থার মধ্যে একেবারে অসম্ভব। ক্রমশঃ এই ভাব বদ্ধমূল হইতে হইতে, একদিন বাটী হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া নিঃসম্বলে একবস্ত্রে প্রস্থান করিলাম। সময় হইলে পাঠক বর্গের নিকট সেই সকল ভ্রমণকাহিনী বর্ণিব। তাহাতে সংসারের নানাবিধ বিষয় দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। এই ভ্রমণে অনেক কষ্টও পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে যে এক স্থিরজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহা অনেক পুস্তক পড়িয়াও লাভ করি নাই। যাহা হউক, আমি একটী বিষয় আপনাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেইটী আমার পরম পূজনীয় গুরুদেবের বিষয়, আর তাঁহার কৃত জ্ঞান ভক্তির অদ্ভুত মীমাংসা। এই দুইটী বিষয় ভাল করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। আজকাল, বাঙ্গালায় ধর্ম্মের আন্দোলন বিশেষ দেখা যাইতেছে; কিন্তু এক আধটী সম্প্রদায় ও দুই চারিজন ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত মহাপুরুষ ব্যতীত, সকলেই কেহ জ্ঞান বড়, কেহ ভক্তি বড় বলিয়া, পরস্পরে বিবাদ করিতেছেন। এই বিবাদ যে একেবারেই একটী ভ্রমপ্রসূত, ইহা আমি গুরুদেবের কৃপায় প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি এবং আমার এই বিষয়ে যে ঘোর সন্দেহ ছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছে।

আমি প্রথমে নবদ্বীপ গেলাম। সেখানে অনেক শাস্ত্রবিৎ ভক্ত গোস্বামী ও অন্যান্য অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল—সকলেই ভক্তির প্রাধান্য বর্ণনা করিলেন; কিন্তু আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলাম এই দেখিয়া যে, এই সকল ভক্তগণ গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাঁহার প্রধান শিক্ষা যে বিনীতভাব, তাহার বিপরীত ভাবের পরিচয় দিলেন। আরও অনেকের চরিত্র বড় অনুকরণীয় দেখিলাম না। তাঁহারা জ্ঞানকে নিন্দা করিলেন, শুষ্ক তর্কপ্রধান বলিয়া; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই জ্ঞানকে খণ্ডন করিবার সময় শুষ্ক তর্কের উপর বিলক্ষণ অনুরাগ দেখিলাম। মোট কথা, দেখিয়া শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইল না। তারপর, জ্ঞানের কেন্দ্র, হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র বারাণসীধামে গমন করিলাম। এখানেও আমি ভগ্নাশ হইলাম। অধিকাংশ সাধুই এখানে জ্ঞান-প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন এবং ভক্তিকে দুর্ব্বলতা, অথবা নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন; কিন্তু দেখিলাম, তাঁহাদেরই অনেকের বিলক্ষণ দুর্বলতা রহিয়াছে। এই সকল কথা বলিলাম বলিয়া, এমন কেহ বিবেচনা করিবেন না যে, নবদ্বীপ একেবারে ভক্তশূন্য, বা কাশী একেবারে জ্ঞানিশূন্য, অথবা সকল সাধুর চরিত্রই আদর্শ হইতে অনেক নিম্নে। কিন্তু অনেক উন্নতচরিত্র সাধু থাকিলেও, জ্ঞান বা ভক্তি এই উভয়ের একের উপর গোঁড়ামি নাই, এমন একটীও সাধু দেখিলাম না।

বারম্বার এই সকল নৈরাশ্যের পর একদিন ভগ্নমনে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতেছি, এমন সময়ে একটী বেশ দিব্য লাবণ্যশালী সাধু উপযাচক হইয়া, আমার সহিত আলাপ করিলেন। ইনি

আষাঢ়, ১৩১১ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ　　　　(ভাদ্র, ১৩১১, পৃঃ ৪৮৯)

বাঙ্গালী, ইঁহার প্রকৃতি অতি মধুর দেখিলাম—একদিনেই মন কাড়িয়া লইলেন ; শুনিলাম, ইনি শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। এই সম্প্রদায়ের গুরু রামানুজ। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কাশীতে থাকিবে, না আর কোথাও যাইবে? আমি বলিলাম, কাশীতে থাকিবার আর ইচ্ছা নাই। হিমালয়ের দিকে কোথাও যাইব, গিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পরমাত্মার চিন্তা করিব। দেখি, কিছু তত্ত্ব পাই কি না। মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, বেশ, আমারও ঐ দিকে যাইবার ইচ্ছা। বিশেষতঃ শীঘ্রই হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইবে, তাহাতে অনেক সাধু সন্তের সমাগম হইবে, পূর্ব্ব পরিচিত অনেক সাধুও তথায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইব বড় ইচ্ছা ; তোমার ইচ্ছা হয় ত, আমার সঙ্গে চল। আমি এই প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার আনন্দিত হইবার দুইটী কারণ ছিল। এক,—এতদিন ঘুরিয়া, বুঝিয়াছিলাম, একলা ঘোরা ঠিক নয়, তাহাতে নানারূপ প্রলোভন আছে ; দ্বিতীয়—ইনি শ্রীসম্প্রদায়ী, ইঁহার নিকট রামানুজের মতাদি বিশেষরূপে জানিতে পারিব। আমি রামানুজের নাম মাত্র শুনিয়াছিলাম। তাঁহার মতাদি বিশেষ কিছুই জানিতাম না, কারণ বঙ্গদেশে তাঁহার মত বা জীবন বিশেষ প্রচার নাই। এই উদ্বোধনেই, আমি প্রথম তাঁহার জীবনী ও তাঁহার দর্শন পড়িতেছি। আর, এ লোকটীর সহিত সামান্য কথাবার্ত্তায়ই বোধ হইল, ইনি কোন পণ্ডিত ; বিশেষ, বড় মধুর প্রকৃতি। মধুর প্রকৃতির কারণ এই বুঝিলাম, ইনি শুধু পণ্ডিত নন, ইঁহার সাধনার প্রতিও কিছু লক্ষ্য আছে। যাহা হউক, ইঁহার সহিত পদব্রজে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম। পথে রামানুজের মত দর্শনাদি সম্বন্ধে অনেক অবগত হইলাম। দেখিলাম, ইনিও বাগে পাইলে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার মতের উপর কটাক্ষ করেন ; তবে অনেকটা গোঁড়ামি কম, বেশ সত্যানুসন্ধিৎসু, অপর সকলের মত নেয়েআঁকড়ে তর্ক করেন না ; আর ইঁহার ভগবানের প্রতি বেশ প্রেমও আছে। মধ্যে মধ্যে ভজন করিতেন, তাহাতে অনেক সময় প্রেমাশ্রু ঝরিত।

তিনি বলিতেন, দেখ, শঙ্করের মত শুষ্ক—'অহং ব্রহ্মাস্মি' একরূপ বাতুলতা, ইহাতে অহঙ্কারাদিই বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু মনে মনে ইঁহার ভাবে মুগ্ধ হইলেও, ইঁহার সব মতে সায় দিতে পারিতাম না।

হরিদ্বারে পঁহুছিলাম। হরিদ্বার বেশ জায়গা, নির্জ্জন, সাধন ভজনের বেশ অনুকূল। কুম্ভমেলার এখনও কিছু দেরি আছে। দিন কতক বেশ গঙ্গাস্নান, বিল্বকেশর মহাদেব দর্শন, ও নিকটবর্ত্তী চারিদিকে ভ্রমণাদি করিলাম। গঙ্গা এখানে খুব সরু। আর একটী প্রীতিকর দৃশ্য—গঙ্গায় সব মাছ খেলিতেছে—নির্ভয়—এখানে হিংসার নিয়ম নাই। কত লোকে মাছগুলিকে ময়দার গুলি পাকিয়ে দিতেছে—মাছগুলি নির্ভয়ে তাহা খাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। মনে হইল, যদি সকল মানুষ যথার্থ প্রাণে প্রাণে—মনে কোন কুটিলতা না রাখিয়া, অহিংসা অবলম্বন করিতে পারে, তবে এই সংসারই সত্বর কৈলাসপুরী রূপে পরিণত হয়—ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত মানুষের কাছে হিংসা ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্তু সে আশা এখনও বহু দূরে। এখনও মানুষ, বিনা কারণে বা সামান্য কারণে তাহার ভ্রাতা অপর মানুষের গলায় ছুরী দিতে কুণ্ঠিত হয় না,—সে আবার ইতর জন্তুর প্রতি হিংসাশূন্য হইবে?

(৮৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৯০)

আসামের কথা

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [২০৬ পৃষ্ঠার পর

৩১ শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তেজপুর হইতে জাহাজ ছাড়িল। আজ বৎসর শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা শতাব্দীও চলিয়া গেল। এই একশত বৎসরে পৃথিবীতে কত প্রলয় বিপ্লব, কত মহামারী, কত খণ্ড প্রলয় হইয়া গেল, কত কোটী কোটী নরনারী জন্মগ্রহণ করিল, কত কোটী কোটী মরিয়া গেল, তাহার ঠিকানা রাখে কে ? এই ভারতেই বা কত পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই এক শত বৎসরে, ভারতে কত রাজনৈতিক, কত সামাজিক, অধিক কি, কত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার হিসাব করিতে গেলে, রাশি রাশি পুস্তক হইলেও লিখিয়া শেষ করা যায় না! প্রবল প্রতাপ মুসলমান সাম্রাজ্য কোথায় ভাসিয়া গেল,—সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণের আধিপত্য কোথায় লুক্কায়িত হইল—তাহা ভাবিয়া দেখুন! সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে রেলবিস্তার, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতির সাহায্যে, দেশ মধ্যে কেবল যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নহে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত ধনবৃদ্ধিরও সহায়তা হইয়াছে—পুরাতন শিল্প অনেক লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সে স্থান আধুনিক অপরাপর শিল্প দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। বলিবার, লিখিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু আপনার "উদ্বোধনে" সে স্থান কোথা ? আর আমারই বা সে বিদ্যা কোথায় ?

কোকিলা-মুখে আসিতে দুই দিন লাগিল। কোকিলা-মুখের নাম শুনিয়াই সেই শুকরমনির নাম মনে পড়িল। ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে, নাকি এই খানের কোন বাগানে শুকরমনিনাম্নী কুলিনীর উপর অত্যাচার হয় এবং সেই হেতু তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। বাঙ্গালা দেশে সংবাদপত্র মহলে এই বিষয় লইয়া তখন বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়।—আজ এখানে আসিয়া বৃষ্টি পাইলাম—বৃষ্টি অবিশ্রান্ত। যাহা হউক, শীতকালের বৃষ্টিতে জর জর হইয়া, আরও দুই দিন জাহাজে কাটিল, পরে ডিব্রুগড়ে বেলা প্রায় দুইটার সময় আসিয়া পৌছিলাম। এটা সহর ডিব্রু নহে, ডিব্রুগড় ঘাটও নহে, কারণ, নদীর—ব্রহ্মপুত্র নদের—জল হটিয়া যাওয়াতে, ঘাট পর্য্যন্ত জাহাজ আসিতে পারে না, সুতরাং উক্ত ঘাট হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করিল। এইখানে আসিয়া বিষম বেগ পাইলাম। জাহাজ হইতে নামিয়া সহর প্রায় পাঁচ মাইল—সঙ্গে মাল পত্র—মুটে মজুর দুষ্প্রাপ্য—ভাবনার কথা। যে কয়েক জন কুলি ছিল, তাহারা সাহেবদিগের মাল পত্র লইয়া চলিয়া গেল; আমি ও আরও কয়েকটী ভদ্রলোক কুলির অভাবে বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম। ৪।৫ মাইল পথের জন্য কিছুমাত্র ভীত হই নাই, কারণ ১০।১২ মাইল পথ হাঁটিতে কখন ক্লেশ অনুভব করি নাই; ভাবনা—মালপত্র লইয়া। আমরা তিন চারিটী বাঙ্গালী বাবু ভিন্ন অপরাপর সকলে চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। একে শীতকাল, তাহাতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; কাজেই শরীর হি হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সাত দিন ক্রমান্বয়ে জাহাজে থাকিয়া, শরীরটা যেন জাহাজওয়ালাদের বলিয়া মনে হইতে লাগিল,—মেজাজ খারাপ, শরীরও টল্‌টলায়মান,—তাহার উপর এই রূপ অসুবিধাগ্রস্ত হওয়ায়, প্রাণটা ভারি চটিয়া গিয়াছে। এইরূপে একান্ত নিরুপায় ও বিচিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, ভগবান রাজি হইলেন; জাহাজের

মেল-বাবু (ডাক-বাবু) আমার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, কিছু যেন ব্যথিত হইলেন, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং দুই একটা কুলির জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুলি পাওয়া গেল না। অবশেষে জাহাজের একজন জমাদার (ওরফে মেথর) সহরে আসিতেছিল,—ডাক-বাবু তাহাকে বলিয়া কহিয়া এবং আর্থিক লাভের কথা বুঝাইয়া দিলে, সে কৃপা করিয়া (এস্থলে কৃপা ভিন্ন আর কি বলিব?) আমার বিছানা ও ট্রাঙ্কটি লইয়া চলিল; আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। চলিলাম, সাহারার উপর দিয়া :—ষ্টীমার হইতে ঘাট পর্য্যন্ত যে তিন মাইল জমি, তাহা চড়া বা চর,—বালি ধূ ধূ করিতেছে। চরের উপর দিয়া চলিতে চলিতে, যে দিকে দেখি, সব বালি ধূ ধূ করিতেছে, এই জন্ম উহাকে সাহারা বলিলাম। এই তিন মাইল বালি ভাঙ্গিতে যে কষ্ট হইয়াছিল, এক টানে দশ ক্রোশ সাদা রাস্তা চলিতে সে কষ্ট হয় না; প্রতি পদে পা বালিতে বসিয়া যায় এবং চেষ্টা করিয়া উঠাইতে হয়, এইজন্য এত কষ্ট!

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময়ে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া একটী ভদ্রলোকের বাসায় গিয়া উঠিলাম, তিনি বাসায় না থাকিলেও, তথায় মালপত্রগুলা রাখিয়া ডিব্রুগড় সহরের দিকে রওনা হইলাম। এখানকার দুইটী বাবুর নাম পূর্ব্বেই ভালরূপ জানিতাম; সাক্ষাৎ আলাপ না থাকিলেও, সংসারক্ষেত্রের বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে চিঠি পত্রাদিতে তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, সুতরাং ভরসা করিয়া সেইখানেই গেলাম। এই স্থানে আসিবার কালে পথে নানারূপ চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। ভাবিতেছিলাম—রাত্রি হইয়া গেল, যদি ভদ্র-লোকদিগের সহিত না সাক্ষাৎ হয়, তবেই বিষম গোলের কথা। একে বিদেশ—বাঙ্গালীর দেশ নহে যে, যেখানে হউক বাঙ্গালীর বাটী গিয়া অতিথি হইয়া পড়িব, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, রাত্রিকাল, অন্ধকার, বৃষ্টি পড়িতেছে, শরীর অবসন্ন, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আর কি চাহেন? আবার ইহাও ভাবিতেছি যে, সেই ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও, যদি তাঁহারা আশ্রয় দিতে স্বীকৃত না হন। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের বাসায় আসিয়া প্রথমে ল—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং পরিচয় পাইয়া, তিনি আমায় চিনিলেন ও যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসাইলেন। ক্ষণকাল পরে, অন্তঃপুর হইতে, ম—বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া আমার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। ল—বাবু ও ম—বাবু যে, এক বাসাতেই থাকিতেন, তাহা আমি জানিতাম না। সুতরাং উভয়কেই এক স্থানে পাইয়া, আমার সাতিশয় আহ্লাদ হইল। আমি যে তথায় আসিব, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কোন সংবাদ দিই নাই বলিয়া, উভয়েই অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহারা সংবাদ পাইলে, ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় আমাকে এত ক্লেশ পাইতে হইত না।

ইঁহাদিগের উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। বাঙ্গালাদেশের অনেক কথা হইল—আসামদেশেরও অনেক কথা হইল। তাঁহারা অনেক দিন বাঙ্গালাদেশ ছাড়া, সুতরাং বাঙ্গালাদেশের কথায় তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ ছিল,—আর আমি নূতন ডিব্রুগড়ে গিয়াছি, সুতরাং স্থানীয় কথায় আমারও বিশেষ স্বার্থ ছিল,—এতন্নিবন্ধন তাবৎ কথাবার্ত্তাই বড় প্রীতিকর হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রথম অভ্যর্থনা পান-তামাক,—আর এদেশটা বড় শীতপ্রধান বলিয়া,

(৮৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৯২)

প্রথম অভ্যর্থনা চা,—পরে পান-তামাক, সুতরাং তাঁহারা অতি যত্ন সহকারে আমাকে চা খাইতে দিলেন। চা পান করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম—শরীরে একটু বল পাইলাম,—হৃদয়ে উদ্যম ও উৎসাহ আসিল। কথায় কথায় কৃষি ও উদ্যান বিষয়ক প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। এতদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সখ ও যত্ন,—আর আমার পেশা, সুতরাং আলাপ ও কথোপকথন শীঘ্র বড়ই ঘনীভূত হইয়া পড়িল। যথাক্রমে আহারের সময় হইল,—সকলে আহার করিয়া রাত্রের মত বিরামদায়িনীর শরণাগত হইলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া চা, বিস্কুট প্রভৃতি দ্বারা বাল্যভোগ বা ছোট হাজিরা (breakfast) করিয়া, ল—বাবুর সহিত সহর পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম।

ডিব্রুগড় সহর বিস্তৃত, রাস্তা ঘাট বড় ও পরিষ্কার,—তবে কিছু বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ বাড়ী ঘর তত নিকট নিকট নহে—দূরে দূরে, সুতরাং গলি ঘুঁজি বেশী নাই। সাহেব-পল্লী—নদীর (ব্রহ্মপুত্র) কিনারায়; নদীর কিনারার রাস্তাটী কলিকাতার গড়ের মাঠের রেড রোডের (red road) ন্যায়, লাল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিকটেই সাহেবদিগের ক্লাব,—বৈকালে তথায় অনেক সাহেব-সুবার আগমন হয়, খেলাধুলা হয়, ইত্যাদি। স্থানীয় বাজার খুব সরগরম, বিস্তর দোকান পাট,—সকল জিনিষ পত্র পাওয়া যায়। মারবারদেশী বিস্তর কেঁয়ের দোকান আছে,—কতকগুলি মুসলমানের নানাবিধ সাহেবী জিনিষ পত্রের দোকান আছে। খাস বাঙ্গালীর কোন কার কারবার দেখিলাম না। নিজ ডিব্রুগড়ে দুইখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আছে—"ইষ্টার্ণ হেরল্ড" ও "টাইম্‌স্ অব আসাম।" প্রথমোক্তখানি বাঙ্গালী-সম্পাদিত, এবং দ্বিতীয়খানি আসামী-সম্পাদিত। আমি নিজে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালী সম্পাদিত "ইষ্টার্ণ হেরল্ড" কাগজ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে গেলে, পাছে আত্মম্ভরিতা আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ইষ্টার্ণ হেরল্ডেরই সম্পাদকের উৎসাহ ও উদ্যোগে, এবং সম্পাদকীয়তায় আসাম টাইম্‌স্ প্রকাশিত হয়। আমি, যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, আসাম টাইম্‌স্ বাঙ্গালীর বড় বিরূপ—বাঙ্গলা ভাষার প্রতিও নারাজ। "আসাম টাইম্‌সের" এই যে বাঙ্গালীর প্রতি ঈর্ষা বা বিদ্বেষভাব স্বজাতিপ্রেমের ফল। আসামীদিগের মধ্যে শিক্ষা অতি অল্পই বিস্তারিত হইয়াছে এবং যে দুই পাঁচ জন শিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই স্বদেশ ও স্বজাতি বাৎসল্যবশতঃ, বাঙ্গালীদিগের প্রতি এত নারাজ। বাঙ্গলা ভাষাটাকে তাঁহারা একটা ভাষার মধ্যেই গণিতে চাহেন না। তাহাতে বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের কিছু আসিয়া যায় না; যে জাতির একটা নিজের ভাষায় ইতিহাস নাই, ব্যাকরণ নাই, অধিক কি বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় শিশুবোধক, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, বা বিদ্যাসুন্দর পুস্তকও নাই, সে জাতির আবার ভাষা কি,—আর সে জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বই বা কোথায়? আসামীগণ বাঙ্গালী হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করিলে,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,—আসামীগণ নিজে ঠকিবেন। যদি কিছু মাত্র উন্নতি করিবার বাসনা থাকে, আসামীদিগকে এখনও অনেক দিন বাঙ্গালীর নিকট অনেক জিনিষ শিক্ষা করিতে হইবে। আর আসামী ভাষাও পরিপুষ্ট করিতে হইলে, বাঙ্গলা ভাষার অনুকরণ করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় প্রথম হইতে

(ভাদ্র, ১৩১১, পৃঃ ৪৯৩)

অনুবাদ না করিলে, আসামী ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। সেই জন্য বলি, যাহাদিগকে প্রতিপদে বাঙ্গালীর উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে এক্ষণে স্বাতন্ত্র্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে দেশের লোক প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সুসভ্য হইয়া দশজনের একজন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা ভাল নয় কি? বুদ্ধিমানের কাজ নহে কি? এই স্বাতন্ত্র্য-ভাবের জন্যই ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে। স্বাতন্ত্র্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, তাবৎ ভারতবাসীর ভাব যে দিন এক হইবে,—সকলের ধর্ম্ম ও সমাজে যখন এক ইতরেতর সহানুভূতি হইবে,—একের অভাব যখন সকলে অনুভব করিবে—তখনই ভারতবাসী এক জাতি হইতে পারিবে।

ডিব্রুগড়ে একটী লিমিটেড্ কোম্পানী আছে—তাহার নাম Assam Railways and Trading Co. Ld. উক্ত কোম্পানীর ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে,—১ম, রেলওয়ে লাইন ও অন্যান্য তদানুসঙ্গিক। উক্ত রেলওয়ে লাইন ডিব্রুগড় হইতে মাকুম পর্য্যন্ত গিয়া দুইদিকে গিয়াছে। ইহার এক দিকে 'টালপ'—অপর দিকে 'মার্গেরেটা'। টালপের সন্নিকটে 'সদিয়া,'—এবং এইখানে ইংরেজের ভারতসাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমার শেষ (Frontier)। এই সদিয়াতে ইংরাজের একজন রেসিডেন্ট থাকেন,—ইংরাজরাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং বর্ব্বর মিস্‌মী, আবর প্রভৃতি জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য। সম্প্রতি যে মিস্‌মী অভিযান (Expedition) গিয়াছে, তাহা উল্লিখিত সদিয়া নামক সীমান্ত হইতে। মাকুম হইতে আর একটী শাখা গিয়াছে, মার্গেরেটা অবধি। এই-খানে উক্ত কোম্পানীর কয়লার খনি ও তৈলের (Petroleum) কূপ আছে। এখানে যে কয়লা উৎপন্ন হয়, তাহা বিলাতী কয়লা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, সুতরাং সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবহারের উপযোগী। বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায় অল্প খরচায় এই কয়লা পাঠাইবার সুযোগ থাকিলে, এতদিনে রাণিগঞ্জ বরাকরের কয়লার কাট্‌তি যে বিশেষ কমিয়া যাইত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আসামের রেলওয়ে কোম্পানীগণ এবং ষ্টিমার-কোম্পানীগণ ঐ কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে বা অন্যত্র যেরূপ বিস্তর কোম্পানী ও বহুব্যক্তি কয়লার খনি ইজারা লইয়া ব্যবসা করিতেছেন, আসামে তাহা হইতে পায় নাই, তাহার কারণ, আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানীর সঙ্গে গবর্ণমেন্টের বন্দোবস্ত এই যে, গবর্ণমেণ্ট আর কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা কোম্পানীকে ইহার জন্য অনুমতি বা ইজারা দিবেন না। বাস্তবিক উক্ত ট্রেডিং কোম্পানীর জন্যই এই রেলওয়ে লাইন সৃষ্টি হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন স্থানীয় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা।

"হিন্দু থিইসম্" ;—অর্থাৎ "হিন্দুধর্ম্ম ও আস্তিক্য" ; বাবু সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত, এবং ৩০ নং গোয়াবাগান লেনস্থ "সোম ব্রাদার্স" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। একখানি ইংরাজী ক্ষুদ্র পুস্তক —১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; কিন্তু পড়িবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল এবং ভাবপ্রচারী,—তবে দার্শনিক শব্দ প্রয়োগে স্থানে স্থানে সাধারণের পক্ষে কিঞ্চিৎ নীরস হইয়া উঠে। যাহা হউক, দর্শনের ভাষা নভেল নাটকের ভাষার মত কখনই হইতে পারে না এবং দার্শনিক শব্দ সাহায্যে দর্শন লেখাই সহজ, কারণ অল্প কথায় অধিকভাব প্রকাশ করা যায়, এজন্য গ্রন্থকারকে আমরা বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তবে পড়িতে পড়িতে এ কথাটি স্বতঃই প্রাণে উঠে যে, ইংরাজী পরিচ্ছদে না আসিয়া, সীতানাথ বাবু যদি ধুতি উড়ানি পরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, দেশীয় অনেক লোক তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে এবং ভাব বিনিময় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিত। যাহা হউক, বিদেশীয় আবরণে দেশীয় ভাবের কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই, সেজন্য দেশীয় পাঠকের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ—ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। ইহাতে স্বীয় ধর্ম্মের অনেক কূটবিষয় সুযুক্তিসহায়ে এবং নূতন আলোকে আলোকিত দেখিতে পাইবেন।

পুস্তকখানি একাদশটি প্রবন্ধে বিভক্ত। প্রত্যেকটি গভীর ভাবপূর্ণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধের স্বাধীন এবং শাস্ত্রাধীন তর্কের প্রভেদ ও সমন্বয়, চতুর্থ প্রবন্ধের মায়াবাদী এবং পরিণামবাদীর চিরবিরোধের মূলীভূত নিজ নিজ সত্যালোক নির্ণয় এবং সপ্তম প্রবন্ধের পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধীয় যুক্তি সমূহ, আমাদের বিশেষ ভাল বোধ হইয়াছে।

'বন্ধন এবং মুক্তি' শীর্ষক দশম প্রবন্ধটিতে গ্রন্থকারের নিজমত বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; ঔপনিষদ আস্তিক্যের চরম সীমায়, মানুষ প্রেমের সহায়ে ভগবানের সহিত একতা অনুভব করিলেও, কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিয়া যায়। শরীর এবং তদঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্বন্ধের ন্যায়, মস্তিষ্ক এবং তদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপাদক অংশ সকলের সম্বন্ধের ন্যায়, একত্বের ভিতরেও বহুত্ব থাকে—ইহাই উপনিষদ সকলের অভিমত, গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করের প্রতিও কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবে গ্রন্থকার উদারভাবে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, উপনিষদের কোন কোন অংশ পূর্ণৈকতা প্রতিপাদক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, সেগুলির তাহাই উদ্দেশ্য কি না, এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই গ্রন্থকারের অভিমত।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদের উপনিষদ্ভাগ নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে, তাহাতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং পূর্ণাদ্বৈত, এই তিন মতের প্রতিপাদক বাক্যসকল নয়নগোচর হয়। আবহমানকাল ধরিয়া, দেশীয় টীকা এবং ভাষ্যকারেরা ঐগুলিই একমত প্রতিপাদক বলিয়া, ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সকলেই নিজ নিজ মত হইতে ভিন্নার্থ প্রতিবাদক বচনগুলিকে, ধাত্বর্থসহায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আপনার দিকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে কাহারও চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। এই সন্দেহ কলহের বিষয়ে, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের অমৃতময়ী বাণী আমাদিগকে বিশেষালোক প্রদান করিয়াছে। তিনি বলিতেন, এ বিষয় বুদ্ধি সহায়ে বুঝিবার নয়, কিন্তু প্রেম, সাধন এবং জীবন সহায়ে বুঝিবার কথা। ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির তারতম্যে, প্রত্যেক মানবেরই এই তিন মত বা অনুভব পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম্মজীবনের প্রথম উন্মেষে দ্বৈত—যৌবনে বা মধ্যকালে বিশিষ্টাদ্বৈত—এবং সর্ব্বশেষে উন্নতির চরমসীমায়, পূর্ণাদ্বৈত অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব 'ইহা অবস্থার কথা'। সেইজন্যই বেদে এই তিন প্রকার অবস্থা সূচক বচনই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মতভেদ থাকিবেই এবং থাকিলেও হানি নাই—কারণ, অবস্থার উন্নতি অনুসারে, মানুষ সত্য বলিয়া স্বতঃই একটির পর আর একটি অবলম্বন করিবে। পূজ্যপাদ পরমহংসদেবের এই সুন্দর সামঞ্জস্যময়ী মীমাংসা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আর কোন আচার্য্যের নিকট হইতেই শুনা যায় নাই।

পরিশেষে পরমহংসদেবের নিকট শ্রুত একটি গল্প বলিয়া, আমরা সমালোচনার উপসংহার করিব। এক গরিব কাঠুরিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, নিকটস্থ বনে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া, দিনান্তে সহরের বাজারে আসিয়া বিক্রয় করিত এবং সেই সামান্য আয়ে দিনপাত করিত। দৈবযোগে একদিন পথিমধ্যে এক দয়ালু সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুও তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলেন, "অগ্রসর হও, তোমার দুঃখ দূর হইবে।" কাঠুরিয়াও সাধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া, অন্য দিবসাপেক্ষা বনমধ্যে কিছু বেশী দূর অগ্রসর হইল এবং চারিদিকে চন্দন বৃক্ষরাজি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল, 'দয়াল সাধু এই জন্যই আমায় অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন—এতদিনে আমার কষ্ট দূর হইল।' অন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা চন্দন কাষ্ঠের মূল্য অধিক; সেও সেদিন হইতে অনেক অধিক উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইল। কিছুদিন পরে তাহার মনে হইল, "সাধু ত আমায় চন্দন-বন অবধি আসিয়াই থামিতে বলেন নাই। 'অগ্রসর হও', খালি এই কথাই বলিয়াছিলেন। দেখি আরো অগ্রসর হইয়া—যদি অন্য কিছু পাই।" এইরূপে অগ্রসর হইয়া, সে ক্রমে ক্রমে তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ এবং হীরকের খনি সকল স্বল্পকালের মধ্যে আবিষ্কার করিল এবং চিরকালের মত, দারিদ্র্যদুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল। সীতানাথ বাবুও বিশ্বস্তহৃদয়ে অগ্রসর হইয়া অনেক দূর আসিয়াছেন এবং ফলস্বরূপ, নূতন সত্যালোকে ভগবানের সহিত আংশিক একতা ও তজ্জনিত আনন্দানুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু, এখনও শেষ ভূমিকা দূরে আছে। আরো অগ্রসর হউন—পূর্ণৈকতার পরমানন্দ লাভে কৃতকৃতার্থ হইবেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি · তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বং আত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ···কেন কং বিজানীয়াৎ।"

ভগবদ্‌গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৩য় অধ্যায়ের ২০ শ্লোকের ভাষ্যের শেষাংশ ও বঙ্গানুবাদ ২১—৩২ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদসহ—বর্তমান সম্পাদক]

(৮৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৯৬)



শিল্পাচার্য নন্দলাল-অঙ্কিত শ্রীশ্রীদুর্গা



৮৬তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৯১



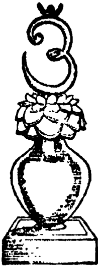
দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ : একটি চিত্র

হৃদয়…পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তুই দুঃখ করিতেছিস কেন ? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি।…" সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমীবিহিতা পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যে জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"

—স্বামী সারদানন্দ

["শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ"—সাধকভাব, অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]



কথাপ্রসঙ্গে

পুজার বোধন

বৎসরান্তে মা আবার আসিতেছেন। আমাদের অশান্তির অন্ধকার গৃহে আনন্দময়ীর আগমন হইবে—তাই কয়টি দিন আমরা সকল দুঃখ ভুলিয়া থাকিব, সমস্যাগুলিকে সরাইয়া রাখিব,—আলপনায়, আলোকমালায় ও মাঙ্গলিক রচনায় আমাদের গৃহ-দ্বার অন্তর-বাহির সুসজ্জিত করিব। কিন্তু মাকে বরণ করিব কোন্ মন্ত্রে? কোন্ বর প্রার্থনা করিব? ভাবহীন, প্রাণহীন কতগুলি শব্দে আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া তুলিব বটে—কিন্তু উহা তো মাত্র কলরব আর কোলাহলই মাতাইয়া তুলিবে, যাহা চাহিতেছি তাহা ব্যক্ত হইবে কি? মণ্ডপে মণ্ডপে মায়ের আরাধনার জন্য মূর্তি গড়িব—কিন্তু উহাও তো আমাদের বিক্ষিপ্ত বিকারগ্রস্ত মনেরই অভিব্যক্তি হইবে,—দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতিমাকে সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি?

বাৎসল্য-বিহ্বলা জননী তাঁহার বাতুল সন্তানদের রুচি-বিকারকে উপভোগ করেন কিনা জানি না, তবে ক্ষমায় উপেক্ষা করেন নিশ্চয়ই। নচেৎ তিনি বিরূপ হইলে উন্মত্ত পুত্র-কন্যাদের দশা আরও ভয়ঙ্কর হইত নিঃসন্দেহে। অজ্ঞান আমরা। কিন্তু জ্ঞানী বিদগ্ধ সন্তানরাও জননীর স্বরূপ কতখানি জানিতে পারিয়াছেন? 'হরি-হর-আদিভিঃ অপি অপারা' যিনি, তাঁহাকে কে জানিবে? তাই তো ইন্দ্রাদি দেবতারাও সভয়ে স্বীকার করিয়াছেন—'মা তুমি সমগ্র বিশ্বের মূল কারণ হইলেও সংসার-দোষযুক্ত ব্যক্তি তোমাকে কদাপি জানিতে পারে না আমাদের পক্ষে সান্ত্বনা মাত্র এই

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা বস্তুতঃ মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা। বঙ্গদেশের পূজামণ্ডপগুলিতে দেবীর যে-প্রতিমা আমরা দেখি, তাহা দশভুজা দুর্গার মহিষাসুরদলনী রূপ। ইদানীং ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই দশভুজা মূর্তিরই পূজা বহুল প্রচলিত। অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি দক্ষিণভারতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা এবং প্রাচীন কোন কোন দেবীমূর্তি দ্বাদশভুজাও বিরল নহে। যাহা হউক, বাংলায় দুর্গাপূজা বলিতে দশভুজা মহিষমর্দিনীর মূর্তিতে পূজাই ব্যাপক। বাংলার আবালবৃদ্ধ নরনারী দুর্গাদেবীর এই মহিষাসুর রূপ পরিগ্রহের কাহিনী সম্যক্ জানেন। মুখ্যতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীই এই কাহিনীর উদ্ভব-গ্রন্থ। উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক এখানে।

দুর্গাপ্রতিমার ভাবরূপের মধ্যে হিন্দুর ধর্মবোধ ও সমাজচেতনার পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের অন্তরের অব্যক্ত ভাবধারাকে ব্যক্তরূপ দিতে হইলে মূর্তিগঠন ছাড়া গতি নাই। দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রে যে নানা দেবদেবীর চিত্রণ দেখা যায়, উহাও নিরর্থক নহে। সেখানে যেন তাৎপর্য এই যে, সমস্ত দেব-শক্তি সমষ্টিভূত হইলেই অসুর বা অবিদ্যা-বিনাশিনী দেবীর—অর্থাৎ বিদ্যা-শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। চণ্ডীতে বলা

হইয়াছে 'নিঃশেষ-দেবগণশক্তি-সমূহ মূর্তি'—অর্থাৎ সকল দেবতার শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত রূপই হইতেছেন দেবী দুর্গা। এই আত্মাশক্তি দেবী যেখানে আবির্ভূতা, সেখানেই জ্ঞান, শ্রী, সিদ্ধি ও তেজ স্বভাবতই প্রকাশিত। তাই প্রতিমাতেও দেখি, দুর্গার সহিত সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্তিকেয়।

সমগ্র প্রতিমাখানিতেই একটি প্রচণ্ড সংগ্রামের ব্যঞ্জনা, অথচ উহা গভীর আধ্যাত্মিক দ্যোতনাময়। মহিষাসুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি—অপলক নেত্রে দেখিতেছে এক আশ্চর্য দেবীমূর্তি বিরাজিতা। 'স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।' দেবীর কান্তিতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত, পদভরে পৃথিবী অবনমিত। তাঁহার কিরীট আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, ধনুর জ্যা-ধ্বনিতে সমগ্র পাতাল বুঝি সংক্ষুব্ধ হইয়াছে—দশদিক্‌ব্যাপী তাঁহার ভুজপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত। সিংহবাহনা দেবী উদ্ধত মহিষাসুরকে পদদলিত করিয়া শূলাঘাতে তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিতেছেন। আর সেই সিংহও ভীষণ গর্জন সহ কেশরদাম প্রকম্পিত করিয়া দেবারি অসুরের শরীর হইতে প্রাণকে চয়ন করিয়া বাহিরে আনিতে নিরত। একটি অসামান্য ভাবব্যঞ্জক দৃশ্য! শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ইহার বর্ণনার ভাষাও কী অতুলনীয়ঃ

'স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ।
শরীরেভ্যঃ অমর-অরীণাম্ অসূন্ ইব বিচিন্বতি॥'

*

পুরাণে বর্ণিত আখ্যানকে নিছক উপন্যাস হিসাবেই দেখিলে, উহার ঘটনাচিত্রকে যুগ যুগ ধরিয়া পূজার বেদীতে স্থাপনা করিয়া এত সমারোহের ব্যবস্থা কেন? ইহার পশ্চাতে যে গূঢ় কারণটি রহিয়াছে তাহাই চিন্তনীয়—উহাই আমাদের এবম্বিধ পূজা-রীতির তাৎপর্য। একটু ভাবিয়া দেখিলে, সমগ্র পূজার গভীর রূপটি আমাদিগকে সসম্ভ্রম বিস্ময়ে অভিভূত করিবে নিশ্চয়ই।

অসুর বলিতে কোন হিংস্র জীব বিশেষকে নির্দেশ করাই পুরাণকারের অভিপ্রায় নহে। 'অসু' শব্দে শরীরগত প্রাণকে বুঝায়। এই 'অসু'তে বা প্রাণেই সম্ভোগসুখ যাহার,—অর্থাৎ, দেহ-ভোগেই যে আসক্ত সে-ই প্রকৃত অর্থে অসুর। আসুর প্রকৃতির লক্ষণ বিচারহীন প্রবৃত্তিপরায়ণতা বা ভোগে সদা উন্মুক্তদ্বার। অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দেবস্বভাব-বিপরীত গুণগুলিই আসুরী পরিচয়। অর্থাৎ, অহঙ্কারী, দর্পী, ক্রোধী, কামী, লোভী—যথার্থ অসুরের পরিচায়ক রূপ ইহাই। মহিষ হইতেছে তম বা অজ্ঞানের প্রতিরূপ। দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী-প্রতিমায় পূজা তাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের এক সুগভীর ভাবকে ব্যক্ত করে। জীবন মানেই তো দেবাসুরের সংগ্রাম।

আত্মাশক্তি মহামায়া, যাঁহাকে আমরা মা বলিয়া ডাকি, তিনি হইতেছেন সকল দৈবীশক্তির ঘনীভূতা বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা হইলে, অর্থাৎ যে-জীবনে তিনি প্রকাশিত, সেই জীবনই এই দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী। সরল কথায় আমাদের ঈশ্বরবিমুখ বৃত্তিগুলিই আসুর বৃত্তি। দেবশক্তির বিকাশের দ্বারা ঐ বৃত্তিগুলিকে দমনই বাস্তবিক পক্ষে অসুর-নিধন,—মহিষাসুরমর্দিনীর পূজার তাৎপর্য এখানেই। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই দেব ও অসুর এই বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে—ব্যষ্টি-জীবনে যেমন, সমষ্টি বা সমাজ-জীবনেও তেমনই।

মহিষাসুর-দলনের যে চিত্রটি আমরা স্মরণ করিলাম, তাহাতে দেবীর বাহন সিংহকে দেখিয়াছি অসুর-শরীর হইতে প্রাণকে যেন চয়ন করিতেছে। 'শরীরেভ্যঃ অসূন্ বিচিন্বতি ইব'।

জীব যখন তাহার দেহাত্মভাবের প্রতি হিংসান্বিত—অর্থাৎ, দেহ-সর্বস্বতার বিলয় ঘটাইয়া দেবত্বকে উদ্বোধিত করিতে বদ্ধপরিকর, তথনই সে সিংহ-পদবাচ্য। শ্রীদুর্গার বাহন হইবার যোগ্যতা অর্জন তথনই তাহার হইয়া থাকে,—জননীর পদস্পর্শে তখনই সেই জীবন ধন্য ও কৃতকৃতার্থ। প্রাণের চয়ন বলে ইহাকেই,—ইহাই আমাদের দুর্গাপূজার মর্মকথা।

উল্লিখিত চণ্ডীর শ্লোকে আরও দেখিয়াছি, অসুরের প্রাণ-চয়নকারী সিংহ মহা উল্লাসে ভীষণ গর্জনশীল 'মহানাদমুৎসৃজন্'—এবং প্রবল বিক্রমে তাহার কেশরাশি কম্পমান—'ধূতকেশরঃ'। বড় দ্যোতনাময় বর্ণনা—যুগপৎ উল্লাস ও তেজ। আসুরিক বৃত্তিনিচয়ের মূলোৎপাটনে যে উল্লাস উহার কি আর তুলনা আছে? সেই সঙ্গে একই কালে প্রবল পুরুষকার বা বিক্রম না থাকিলে ঐ ভীষণ প্রবৃত্তির বেগকে প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহার?

মাতৃচরণ-স্পর্শে ধন্য জীব সিংহবিক্রমে মহা উল্লাসে—ভোগলোলুপপ্রবৃত্তি অসুরকে দমন করিতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠুক,—শুধু নিজ ব্যক্তিগত জীবনে নহে, তাহার সমাজ-জীবনেও সর্বপ্রকার আসুর শক্তির বিরুদ্ধে সে প্রবল পুরুষকার সহায়ে জাগিয়া উঠুক,—শারদীয়া মহাপূজার দেবীমণ্ডপে এই শিক্ষাই যেন মূর্তিমতী হইয়া দণ্ডায়মানা আমাদের সম্মুখে। সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণনা-লাভই দুর্গাপূজার প্রকৃত আনন্দ,—আনন্দময়ীর যথার্থ বোধন।

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

RAMAKRISHNA MATH
BELUR P. O., HOWRAH DIST,
Dated the 3/3/1917

স্নেহভাজনেষু—

মানদা তোমার চিঠি পড়িলাম। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমার নিকট হতে দীক্ষা পাইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। জগৎকে কৃপা করিবার জন্য তাঁর মানব দেহ ধারণ। ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করিতেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রম স্থাপনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা" শ্রীশ্রীপ্রভুবাক্য। কেবল বাক্য নয় প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যদি মানুষ হতে পার তবে টাকার অভাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিষ্কাম নিস্বার্থ সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করবার চেষ্টা কর। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরই "জীবের মোহান্ধকার ঘুচাইবার" শক্তি এক তাঁহারই। হীনের হীন তুমি আমি। ভগবানের কৃপায় কেমন করে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচিবে তাহারই চেষ্টা করা দরকার। আমি তাঁর দাস তাঁর সন্তান এইটি উপলব্ধি করবার জন্য যে কর্ম্ম তাহা বন্ধনের জন্য নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা বন্দনা রোদন নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপালাভ হয়। পবিত্রময় প্রীতিসম্পন্ন ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যাক তোমাদের জীবন। দেহটা দেবমন্দিরে পরিণত কর।

শ্রীশ্রী-গুরু-পদ
ভরসা

RAMKRISHNA MATH,
BELUR P. O., HOWRAH DIST.,

THE RAMKRISHNA MATH

Dated the 2/3/1917

স্নেহ-ভাজনেষু—

মাধবের তোমার চিঠি পাইলাম। পূজনীয় তারক মহারাজ নিকট হতে দীক্ষা পাইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। ঠাকুরের কৃপায় হইবার জন্য তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ। ভাবছ আশ্রম স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রম স্থাপনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "ভক্ত হৃদয়ং ভগবানের বৈঠকখানা" তাহা প্রভুর বাক্য। কেবল বাক্য নয় প্রত্যক্ষ বাক্য। যদি মানুষ হতে চাও তবে তাঁহার সন্তান হবে কেন? কেবল স্বার্থের জন্য সাধুর চিন্তা উচিত নয়। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন ও আরাধনা করলে শিব হবে। তেমার দৃষ্টি শক্তি ঈশ্বরেরই "জীবের সেবাস্থঃ বেহু দুর্গাই তাই" আঁখি এক তাঁহারই।

জীবনের হীন তুমি আমি। ভগবানের-
কৃপায় যেমন হবে-আমাদের-মোহান্ধ-
-কার দূরীভূত-অহংকারই বেড়ীগুলো ভেঙ্গে দূর হবে।
আমি তাঁর দাস তাঁর সন্তান এইটি উপলব্ধি
করতে হবে একথা যে শুধু আমার বন্ধুদের
জন্য নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা আবেদন
নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপা লাভ হয়।
পবিত্রময় প্রীতি সম্বন্ধ ভরা আমার
পূর্ণ-হয়ে যায় আমাদের জীবন।
দেহটা-দেব মন্দিরে পরিণত হবে।
সার্থক-জীবন যে যে লোকে অর্জন
হয়ে যায়-ইহাই শ্রেষ্ঠ-সুফল। আর
এতে-তুমিও জানিবে-না যে আমি
প্রভুর বড়-আদর-ছিল। আমি আমার
অভিমানই অবিদ্যা-মোহ। প্রভুর-
কৃপা লাভে-মোহ-কাটিয়ে দেও।
প্রভু ভক্তদের পায়ে আত্মনিবেদন-
দিচ্ছিলে।
২। আজ কুমারকে বিশেষ করে-পড়াশুনা
দেখে-বলিবে। অবিনাশ সাথী সাথীদের
সহায় হবে। সে বালক অনেক-বুঝিবে

দিতেন মুক্ত - হলেই তত্ত্ব - হয় না। তবে প্রকাশে
তাহার নাই। অনুভব হলেই হয় না তখন।
তত্ত্ব - ভক্তি কি চড়ুকাটি যাচ্ছে দিন?
ঈশ্বর - বস্তু - কি কেবল মানবেই প্রকাশিত?
শিক্ষার কি আধুনিক বিজ্ঞানীদের
জন্য মানুষের জন্য প্রত্যেক জন্য যে
শিক্ষা - লেখা পুঁথিতে। আর ঈশ্বর
মানুষের জন্য আত্ম - প্রকাশ জন্য আছে
মনুষ্যত্ব উপলব্ধি যে শিক্ষা তাহার
পুঁথিতে। ইহার মতন মতন পড়িও
এ মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও।
ঈশ্বর হইতে আসিয়া থাকিতে পারে
ধরে - আর - বসে থাকে কোন মতেই
থাকিতে নাই। এ তোমাদেরই কাজ
জানিও।
আর - মেদিনী - পুর ঘুরে ঘুরে এসো তাহলে
আর কিছু লিখতে - পারি নাই।
কিছু তর নাই সব - কিছু করিয়া
দিতেন। তোমার আমার ভালবাসা
ও আশীর্বাদ - জানিও। আমার
আর কথা নাই। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমা [illegible]

শ্রীসুভাষ দাশ-
গুপ্ত

মঠ
[illegible] -
মুর্শিদাবাদ -

স্নেহভাজনেষু—

তোমার সরল-লেখার পত্র-খানা সময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

যখন প্রথম দেখেছি 'পরিচয়' হতে তার - একটি সমাজের 'প্রথম প্রশ্নটি' চিত্ত বন্ধু নিত্য সংবাদ।

তোমার অসংখ্য - উদ্দেশের - পাবে ক্রমে ক্রমে উহারই পাবে - শান্তি তৃপ্তি মুক্তি। যখন এক - মন দৃঢ় হবে তখন নিত্য মুক্ত অবস্থা স্থূল - দেহটা - অবস্থা পূর্ণ ধাম।

এক - শুদ্ধ প্রাণ - মন দেবে - যখন - যার তার তিনিই সব মন বুদ্ধি দিয়ে [illegible] ঢাকে দেখাচ্ছেন, সংসার - তুমিই সবকিছু উহাদের সর্বদা দূর - করতে - হবে। এক - মাত্র ধ্যান তাঁর [illegible] দূর - করতে - হবে কেউ নহে। ক্রমে ক্রমে [illegible] হবে তুমি [illegible] ধ্যানে মন ডুবে - যাবে, [illegible] ধ্যানের সময় [illegible] [illegible]।

ক্রমে [illegible] [illegible]।

আমার [illegible] [illegible] আমার সাধনাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের কোন [illegible]? [illegible] [illegible] মানুষের [illegible] জানিবে। ইতি

তোমার [illegible] [illegible] জানিবে।

শুভার্থী

প্রেমেশানন্দ।

আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক হয়ে যাক্—ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে তুমিও জানিবে না যে আমি একটা বড় কাজ কচ্চি। আমি আমার অভিমানই অবিদ্যামোহ। প্রভুর কৃপালাভে মোড় ফিরিয়ে দাও। দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে।

২। সনৎ কুমারকে বিশেষ করে পড়াশুনা কত্তে বলিবে; অধ্যয়নে সাধ্য সাধনের সহায় হবে। সে বালক তাকে বুঝিয়ে দিবেন মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না, ভাব প্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক হলেই হয় না বাবা। ভাবভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে ধন? ধর্ম্ম কর্ম্ম কি ছেলেমানষি ব্যাপার। শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার জন্য মানের জন্য অর্থের জন্য যে শিক্ষা সেটা কুশিক্ষা। আর ধর্ম্মলাভের জন্য শাস্ত্রপাঠের জন্য শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা তাহা সুশিক্ষা। ইহা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩। মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও। ইচ্ছা হইলে আসিয়া থাকিতে পার, তবে আজকাল অনেক লোক মঠে তাই থাকিবার কষ্ট। এ তোমাদেরই স্থান জানিবে।

আজ মেদিনীপুর যাত্রার ইচ্ছা সেজন্য অধিক লিখিতে পারিলাম না। কিছু ভয় নাই সব ঠাকুর করিয়া দিবেন। তোমরা আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমরা আছি মন্দ নয়।

ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

বেলুড় মঠ,
বুধবার

স্নেহভাজনেষু—

শ্রীমান মানদা তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

যারা ভগবৎ পথের পথিক হতে চায় তারাই আমাদের পরম আত্মীয় চিরবন্ধু নিত্য সহচর।

তোমরা অসংকোচে ঠাকুরের নাম করে যাও উহাতেই পাবে শান্তি ভক্তি মুক্তি। যারা শ্রীশ্রীমার কৃপা পেয়েছে তারা নিত্য মুক্ত তারাই শুদ্ধ পবিত্র তারাই পুণ্যবান।

শ্রীশ্রীপ্রভুপদে মন রেখে কাজ করে যাও তিনিই সৎ মন বুদ্ধি দিয়া ঠিক পথে চালাইবেন। সংশয় বুদ্ধিই সয়তান উহাকে সর্ব্বদা দূর কত্তে হবে। শ্রীশ্রীমার নামে তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে দেও তাড়া। রাম নামে ভূত পালায় ঠাকুরের নামে সয়তান কাম-ক্রোধ পালাবে।

আমরা ভাল আছি। সামের শনিবারে ভক্তেরা টাঙ্গাইলের নিকট ঘারিণ্ডা নামক পল্লীতে নে যাবার চেষ্টা কচ্চে। নিরাকার ঈশ্বর ভক্তের জন্য সাকার হন। ভক্ত ভগবানকেই টানে মানুষের কোন কথা? তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্রমালা

পত্র তিনখানির প্রাপক শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণ অবহিত আছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল অদর্শনের পরে তাঁর সংসার-বিরাগী যুবক ভক্তগণ তীব্র সাধন-তপস্যায় ডুবে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর ভগবদ্‌ব্যাকুল ঐ তরুণদের অনেকেই তখন পরিব্রাজকরূপে পাহাড়ে-জঙ্গলে ও তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণরত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে বালযোগী গঙ্গাধরও শ্রীগুরুদত্ত গৈরিকমাত্র সম্বল নিয়ে বরাহনগর মঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। পরিব্রাজক গঙ্গাধরের সঙ্গে কাশীধামে সেইকালে তদানীন্তনের সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী জমিদার এবং শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্র মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়—উভয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রমদাবাবু তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধায় ও সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীনরেন্দ্র (শ্রীমৎ স্বামীজী) প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের প্রতি প্রমদাবাবুর সহানুভূতি ও সহায়তার কথা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। স্বামী অখণ্ডানন্দজী (গঙ্গাধর)-ই ছিলেন এই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রারম্ভিক সূত্র। প্রমদাবাবুকে লেখা পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দজীর তৎকালীন পত্রগুলি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। পত্রগুলিতে প্রাপকের ঠিকানা লিপিবদ্ধ রয়েছে: Sj Promoda Das Mitra
Chowkhamba, Benares City.

শ্রী বাহ গুরু

হরিদ্বার
March, 1887

মহারাজজী দণ্ডবৎ,

মূর্খ আমি পত্র লিখিতে কিরূপে হয়—তাহাও জানি না। আপনার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য দেখিয়া গত কল্য এখানে পৌছিয়াছি। অযোধ্যা স্থানটি অতি সুন্দর—বসতি ছোট। এখানে দাস্যভাবের আধিক্য বেশ আছে। এখানকার রঘুনাথ দাসজীর ছাউনীটি অতি সুন্দর, এখানে নিত্য ৩।৪ শত মূর্তির (সাধুর) সেবা হয়। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই জাপক এবং ২।৪টি দীনহীন 'বিরক্ত' ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উদাসী বাবা মাধোদাসজীরও দেখা পাইয়াছিলাম, ইঁহার অবস্থা অতি বৃদ্ধ। সরযূ তীরে জানকীবর শরণ নামে এক মহাত্মার নিকট ৪ রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। ইঁহার স্বভাব অতি সুন্দর এবং প্রেমিক। যেখানে ভক্তির কথা সেখানে ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে জ্ঞানের কথা সেখানে জ্ঞানী অতি বিরল, কাশীতে অনেক মঠে ইহা দেখিয়াছি।

অযোধ্যা হইতে লখ্‌নৌয়ে আসিয়া শুনিলাম, শাণ্ডিলা হইতে নৈমিষারণ্য যাইতে হয়। শাণ্ডিলায় আসিয়া শুনিলাম—সীতাপুর হইতে সুবিধা হইত; কিন্তু কি করি ঈশ্বরেচ্ছায় আসিয়াছি এই ভাবিয়া ঐখান হইতে হত্যাহরণ হইয়া নৈমিষারণ্য পৌছিলাম। নৈমিষারণ্যটি একটি বৃহৎ আঁব বাগান, পূর্ব্বে যে স্থানটি অরণ্যময় ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রাচীন ২।৪টি সুড়ঙ্গ এবং একটি প্রকাণ্ড মহাবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সময় এস্থান দেখিতে বড় সুন্দর, সকল গাছগুলিই নব মুকুলিত হওয়াতে অতি মনোহর শোভা হইয়াছে, এখানে গোমতী নদী প্রবাহিত আছেন।

নৈমিষারণ্য হইতে মিশ্রিতে আসিয়া শুনিলাম কেশববাবু এখানকার সকল পণ্ডিতদের আমাকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন, এখানকার পণ্ডিত আমাকে সীতাপুর পাঠাইয়া দিলেন, এখানে আসিয়া ইঁহার দর্শনে অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। ইঁহার গুণের কথা আর কি লিখিব। আর কত যত্ন কত ভক্তি তাহা লেখা যায় না, এখানে আপনার এক পত্র পাইলাম, আমাকে কি এইরূপ করিয়া পত্র লিখিতে হয়? আমি আপনার দাসানুদাসেরও



স্বামী অখণ্ডানন্দ



শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র

উপযুক্ত নই। কোন অন্ধকে—"তোমার দিব্য চক্ষু" বলিলে তাহার যেরূপ ভাব হয় আমারও পত্রখানি পড়িয়া সেইরূপ হইয়াছিল; কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন যেন পত্রের লিখিত গুণগুলির উপার্জ্জন করিতে পারি। আমি মূর্খ পাগল, কি লিখিতেছি কিছুই জানি না, আপনাকে পত্র লিখি এমন শক্তি আমার নাই, কিন্তু ইহাতেও যেন আপনার সঙ্গ অনুভব করিতেছি। আপনার প্রত্যেক গুণ-লাভ করিতে আমার কতজন্ম যাইবে তাহা বলিতে পারি না। আপনার গুণ কীর্ত্তন করি এমন শক্তি আমার নাই। স্বামীজিকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন, এবং দাসানুদাসের প্রতি যেন কৃপা রাখেন। এখনও বদ্রীনারায়ণ যাত্রার বিশদিন আছে, এ কয়দিন হৃষীকেশে থাকিবার ইচ্ছা আছে। আশীর্ব্বাদ করুন শীঘ্রই যেন আপনাদের দর্শনলাভ করিতে পারি। এ দাসকে মনে রাখিবেন দাসের কোটি কোটি প্রণাম জানিবেন। আপনার দাসানুদাস

গঙ্গাদাস

আর একটি কথা—বলিতে পারি না—যদি সুবিধা হয়ত পাঠাইবেন—আমাদের কলিকাতার মঠে মহাদেবের কীর্ত্তনের জন্য একটি ডমরুর অভাব হইয়াছে, কাশীতে ভাল পাওয়া যায়, যদি সুবিধা হয়ত ডাকযোগে পাঠাইবেন। আপনার কাছে আবদার করিতে পারি—ডমরু বিশ্বনাথের আরতির সময় যেমন বাজায়।

এই ঠিকানা :—মহারাজজী নরেন্দ্রনাথ,
কলিকাতা বরাহনগর আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা লাইব্রেরী, প্রামাণিক ঘাট রোড।
হরিদ্বার তীর্থটি পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত—এখানে গঙ্গাজীর অতি সুন্দর দৃশ্য।

(২)

শ্রীশ্রী গুরু দেবো জয়তি

হরিদ্বার
২৬শে মার্চ্চ ১৮৮৭

পূজনীয় মহাশয়েষু নিবেদন মিদং

আমাদের প্রণাম জানিবেন। আপনার প্রেরিত ২ ছড়া মালা প্রাপ্ত হইয়া অতি প্রীত হইলাম। মিরাটের পত্রে আমার স্মরণ হয় আপনি ভগবদ্ভক্ত কয়েকটি উপদেশ বাক্য লিখিয়াছিলেন। পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎ সেবার গুরুতর ভার লওয়া হইয়াছে। অতএব যাহাতে আমি তাঁহার সেবায় সতত নিযুক্ত থাকি এবং সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারি তজ্জন্য আপনি আমায় সাবধান করিয়াছেন। আমিও সেজন্য আপনার নিকট উপকৃত হইয়াছি।

পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক যদ্যপি তদনুষ্ঠানে কোন অংশে ত্রুটি হয়ত পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করার ফল কি? অর্থাৎ পিতামাতার সেবাই উচিত, ইহাই ধর্ম্ম,—বোধ হয় ইহাই আপনার পত্রের অভিপ্রায়, ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে। সে অনেক দিনের কথা আমার ভাল মনে নাই—অথবা আপনার পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে ভুলিয়াছি। সে যাহা হউক পিতামাতার সেবা সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য আছে—"পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব" ইত্যাদির অর্থ—তাঁহারা দেবতা, আমার সংসার হইতে মুক্ত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করুন। তাঁহারা আমার ঈশ্বরলাভের প্রধান সহায় হউন।

কয়াধু প্রহ্লাদকে, মদালসা তাঁহার পুত্রগণকে এবং ধ্রুবমাতা ধ্রুবকে যেমন উপদেশ করিয়া

তাঁহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই পিতৃদেব মাতৃদেবী আমাকেও সেই প্রহ্লাদ ও ধ্রুব সেবিত পদের সেবায় নিযুক্ত করুন। যত্তপি মাতৃ-পিতৃদেব পুত্রকে নানাপ্রকারে সংসারে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন ও কেবল সাংসারিক কার্যেই নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা সন্তানের কল্যাণ ও হিতসাধন করিলেন? যদি তাঁহারা নিয়তই এরূপ চেষ্টা করেন ও মুমুক্ষু পুত্র কি তাঁহাদের উপদেশ সংসারেই রত হইবেন? প্রহ্লাদ কি পিতৃ আজ্ঞায় হরির উপাসনা হইতে বিরত হইয়াছিলেন? হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে স্বধর্মে আনিবার জন্য কত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ কি পিতার বাধ্য হইয়া স্বধর্মে বিমুখ হইয়াছিলেন?

আহা! হিরণ্যকশিপু পুত্রকে স্বধর্মচ্যুত করিবার জন্য কত যন্ত্রণা কত পীড়ন করিলেন, কিন্তু ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার সেই দয়াময় হরি ভিন্ন কিছু জানিলেন না। কোথাও পিতা পুত্রকে সদুপদেশ দিয়া ত্রাণ করেন, এখানে প্রহ্লাদ মায়ামুগ্ধ পিতাকে ত্রাণ করিলেন।

ধ্রুব, মাতার উপদেশে পদ্মপলাশলোচন হরির অন্বেষণে বনে বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনিও মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া হরিকে প্রাপ্ত হন নাই। মদালসা স্বয়ং পুত্রগণকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। পুত্রগণকে শৈশবকালেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। পুত্রগণ মায়ামুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছিলেন। এখানেও রানী মদালসা রাজার কথায় সংসারে ছিলেন না।

অতএব যিনি আমাকে প্রকৃত ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন—যিনি আমায় এই মায়াময় সংসার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি আমার মাতৃদেব-পিতৃদেব আচার্যদেব, তিনিই আমার সুহৃদ বন্ধুদেব, আমার সর্বস্বধন, আমি একান্তই তাঁহার শরণাগত। তিনিই আমার সেব্য, একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া দুর্বল শিশু যদি এককালীন সে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তথাপি তিনিই তাহার একমাত্র শরণ্য, তিনিই দুর্বলের বল, অভয়দাতা, রক্ষা কর্তা; ভ্রান্ত জীবের তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, আর আশ্রয় নাই, সেই শ্রীচরণ ভিন্ন আর তাহার কোন সেব্য নাই, তিনি ভিন্ন আর কে তাহার ভ্রম প্রমাদ দূর করিবে।

"শতবার পড়ি ভুলে, শতবার লহ কোলে—কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন।"—শত অপরাধ শত দোষ হইলে তিনিই তাহা সংশোধন করিবেন। অতএব শত ধর্ম কর্ম ত্যাগ. কেবলমাত্র তাঁহার সেবার অনুষ্ঠানই ধর্ম, যত্তপি সেই ধর্মের অনুষ্ঠানে কিছু অঙ্গবৈগুণ্য হয়ত তাহাতে কোন প্রত্যবায় নাই, কারণ ভ্রম প্রমাদ এ সকলই তাঁহার শ্রীচরণে।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। / স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥" —ইতি ভগবদ্‌বাক্যম্।—সর্বাঙ্গীন সন্ন্যাসানুষ্ঠানে না হইলেও সংসারধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্বে পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র ঈশ্বর সেবাতেই নিযুক্ত করিতেন; পুত্রও পিতামাতার আজ্ঞাপালনে তৎপর হইতেন, তৎকালে পিতামাতা পুত্রকে কেবল মাত্র ধর্মানুষ্ঠানেই রত করিতেন। আমার বোধ হয় মায়া হইতে রক্ষা করিবার জন্যই অতি বাল্যকালে পিতামাতা পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিতেন, কারণ তাহা হইলে তাহার হৃদয় মায়ায় মুগ্ধ হইত না, কেবল ভগবানে ভক্তি করিলেই সকলকে ভক্তি করা হইল। তাঁহার সেবা করিলেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের সেবা হইল। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি আপনাকে লিখি এমন কিছু জানি না। তবে বালকের ন্যায় কত কি লিখিলাম। আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন।

আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার বীর হৃদয় পাই। কত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে থাকিয়া আপনি অবিচলিত চিত্তে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের চরণ ধ্যান করেন, আমাকেও কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে ভগবদ্‌বাক্য স্মরণ করাইবেন, ইতি—

আজ সন্ধ্যা হইল, এখানে কয়েকদিন হইতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কাশীতে কেমন হল লিখিবেন। "দাস গঙ্গাধর" (আপনি আমাকে এই নামেই লিখিবেন)

(৩)

দেরাদুন,

মহারাজজী দণ্ডবৎ,　　৬ই এপ্রিল, ১৮৮৭

গতকল্য হৃষীকেশ হইতে এখানে পৌছিয়াছি। হৃষীকেশের বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম, যত স্থান দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সাধনোপযুক্ত স্থান আর দেখি নাই। আহা! কি স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাহা লিখিতে পারি না। কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এস্থান থাকিবার উপযুক্ত থাকে। বর্ষার কয়মাস জলময় হইয়া একটি রোগের উৎপত্তি হয়, এজন্য কয়মাস এখানে কিছুই থাকে না। রাজারা ৫টি ছত্র সাধুদের জন্য করিয়া দিয়াছেন। সাধুরা ঐ কয়টি ছত্রে মাধুকরী করিয়া থাকেন, এখানে মা গঙ্গার কি নির্ম্মল জল, দেখিলে ভক্তি হয়, আর বড় হজ্‌মি।

গঙ্গোত্রীর পথ এখান হইতে অতি সুগম, সেইজন্যই এখানে আসিয়াছি। গঙ্গোত্রী হইতে বদ্রীনারায়ণ যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। দেরাদুন একটি সহর, এখানে ইংরাজের বাস। আপনার চরণে দাসের কোটি কোটি প্রণাম। সদাই আশীর্ব্বাদ করিবেন।　　ইতি

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী গঙ্গাধর

স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্　　শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

শ্রীমান্ যোগেশ,　　২৩.৭.৩৮

তোমার ১৫ই জুলাই তারিখের চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ও শ্রীমান্ হরিমোহন মঙ্গলমত ওখানে গিয়াছ জানিলাম। ওখানকার আশ্রমস্থ সকলের মঙ্গল সংবাদেও সুখী হইলাম। আমার শরীর পূর্ব্ববৎ একরূপই চলিয়া যাইতেছে।

জপ মনে মনে করিতে পারিলে খুবই ভাল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় তাহা প্রায়ই সম্ভব হয় না। দীর্ঘদিন অভ্যাস করিলে ক্রমে সম্ভব হয়। মনে মনে না করিয়া যদি ঠোঁট্ নেড়ে করিলে মনস্থির করা সুবিধা হয় তবে জপ ঠোঁট্ নেড়েই করিতে পার। জপের সঙ্গে ২ ঠাকুর ও মাঠাকুরাণীর মূর্ত্তি চিন্তা করিও, তাহা হইলে সহজে মনস্থির হইবে।

কোন বিষয়ে তন্ময় হইয়া চিন্তা করার নাম ধ্যান। দীর্ঘদিন অভ্যাস না করিলে কোন বিষয়ে তন্ময় হওয়া যায় না ও চিত্তও স্থির হয় না। সুতরাং যেরূপ বলিয়া দিয়াছি সেভাবে কিছুদিন অভ্যাস কর, পরে দেখিতে পাইবে এই সব সংশয় নিজ হইতেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু বহুদিন ব্যাপী অভ্যাস করিতে হইবে।

মঠের অপরাপর সংবাদ সব কুশল। তোমাদের সংবাদ মাঝে ২ জানালে সুখী হইব। হরিমোহনকে এই চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইও। তোমরা আমার ভালবাসা ও শুভাশীর্ব্বাদ জানিও।

ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শুদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে

স্বামী অশেষানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ কৃপাধন্য স্বামী অশেষানন্দ বেলুড় মঠের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী—বর্তমানে আমেরিকাস্থ পোর্টল্যান্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ। গত ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৩ তারিখে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারে তিনি যে স্মৃতি-প্রসঙ্গ করেছিলেন তারই কিছু অংশ বাংলায় অনূদিত এখানে। প্রসঙ্গটি ইংল্যান্ডের বাকিংহামশায়রস্থ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের মুখপত্র 'Vedanta For East & West' জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত। অনুবাদক : স্বামী চৈতন্যানন্দ।

বন্ধুগণ,

আমি আমার অন্তরের কথা খুলেই বলছি যে, প্রিয় ভাই স্বামী পবিত্রানন্দের অভাব দারুণভাবে অনুভব করছি,—যেমন, আপনাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও অন্ধকারের মাঝে আলোর অভাবের মতো তাঁর অনুপস্থিতিকে বোধ করছেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। আমরা দুজন একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর শ্রীচরণতলে বসতাম। আমি স্বামী পবিত্রানন্দকে দেখেছি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে তর্ক করতে আর তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতেন। তখন আমি ভাবতাম, "কে এই সাহসী ছেলে, যে বেদান্তসিংহ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে তর্ক করতে পারছে?" পরে স্বামী অখিলানন্দের মাধ্যমে আমি তাকে জেনেছিলাম।

স্বামী অখিলানন্দ এবং আমি একই কলেজে পড়াশুনা করতাম। তিনি আমার থেকে এক বছরের বড় ছিলেন। তিনিই আমাকে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমরা তাঁকে দর্শন করতে যেতাম এবং আমাদের শ্রদ্ধা তাঁকে নিবেদন করতাম। একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকজন ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতে চাই কিনা। আমি স্বামী অখিলানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি যাবেন কিনা। তিনি বললেন, "একজন প্রাচীন সাধুর সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে। আমি যেতে পারব না, তুমি বরং যাও। আমি তো মাকে দর্শন করেছি, কিন্তু তুমি এখনও করনি—তোমার পক্ষে এটা মহা সৌভাগ্য।"

বলরাম বসুর বাড়ি থেকে উদ্বোধন দশ-পনের মিনিটের হাঁটা পথ। আমি উদ্বোধনের অফিস-ঘরে বসেছিলাম, তখন স্বামী ধীরানন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "খোকা, তোমাকে আমি বলরাম বসুর বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। আচ্ছা, তোমার দায়িত্ব কে নেবেন?" ঐ সময় আমি পড়ছিলাম কান্ট, হেগেল এবং আমার প্রিয় দার্শনিক প্লেটো, যাঁকে আমি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম—তাঁদের বই। অ্যারিস্টটলকেও তাঁর বিচার প্রণালীর জন্য পছন্দ করতাম, কিন্তু প্লেটোকে শ্রদ্ধা করতাম তাঁর অতীন্দ্রিয় আদর্শের জন্য। স্বামী ধীরানন্দজীকে স্পষ্ট বলেছিলাম যে, আমি হচ্ছি ইয়াঙ্কি ছোকরাদের মতো জেদী ও একরোখা স্বভাবের। সেন্ট পল কলেজে বাইবেল পড়া সে-সময় বাধ্যতামূলক ছিল বলে পড়েছি, কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমি ভগবদ্গীতা পড়িনি। স্বামী ধীরানন্দজী নীরবে সব শুনছিলেন এবং শেষে বললেন, "তুমি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছুই জান না। আধ্যাত্মিক জীবনে একজন পথপ্রদর্শক থাকা দরকার, যিনি তোমাকে প্রদীপ ধরে পথে আলো দেখাবেন। ধর, তুমি একটি গুহা-মন্দিরে

যাবে, যেখানে সব অন্ধকার। যদি তুমি একা চলতে থাক, দেওয়ালে তোমার মাথা ঠোক্কর খাবে। যদি তুমি একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে নিতে পার, যিনি আলো দেখাবেন, তাহলে তুমি অবাধে বিগ্রহকে দর্শন করে তৃপ্ত হবে।" আমি স্বামী ধীরানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, অনুগ্রহ করে খুলে বলুন।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি বলতে চাচ্ছি যে, মা উপরে আছেন,—তোমার উচিত তাঁর কাছে গিয়ে কৃপা প্রার্থনা করা—যাতে তিনি তোমাকে দীক্ষা প্রদান করেন।"

সেটি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সময় শ্রীশ্রীমা সাধারণের কাছে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে বিশদ জানা যায়, এমন কোন জীবনী তখন পাওয়া যেত না এবং তাঁর কোন ফটোও প্রচারিত ছিল না। শ্রীশ্রীমা যখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গিনীদের বসবাসের সুবিধার জন্য স্বামী সারদানন্দজী উদ্বোধনের বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। অফিস ঘরটি—যেখানে আমি বসেছিলাম সেটি ঐ বাড়ির নিচের তলায়। উপরতলায় ছিল ঠাকুরঘর এবং সেই ঘরেই শ্রীশ্রীমা থাকতেন। মেয়েদের শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার অনুমতি ছিল প্রতিদিন, কিন্তু পুরুষদের জন্য কেবল মঙ্গলবার আর শনিবার নির্দিষ্ট ছিল।

রাসবিহারী মহারাজ (তখন ব্রহ্মচারী) শ্রীশ্রীমাকে উদ্বোধন ও জয়রামবাটীতে সেবা করতেন। তিনি অফিসঘরে যেখানে আমি বসেছিলাম সেখানে এসে বললেন, "যাঁরা মাকে দর্শন করতে চান তাঁরা আমার সঙ্গে আসুন।" তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কথা না বলতে কেবল চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে। সুতরাং আমি তাঁকে অনুসরণ করে মায়ের সামনে গেলাম। মায়ের সারা শরীরে তখন কাপড় জড়ানো ছিল। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম মাত্র করেই নিচে নেমে গিয়েছিলাম। স্বামী ধীরানন্দজী আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মাকে প্রার্থনা জানিয়েছ তোমাকে কৃপা করে মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার জন্য?" আমি উত্তরে বললাম, "না মহারাজ, আমাকে কথা বলতে অনুমতি দেওয়া হয়নি।" তখন তিনি ডেকে বললেন, "রাসবিহারী, এই ছেলেটিকে তুমি মায়ের কাছে নিয়ে যাও। মাকে নিবেদন কর যে, এই ছেলেটি মহারাজের কাছে যায় এবং তিনি যেন একে কৃপা করেন।" রাসবিহারী মহারাজ একটু গোঁড়া প্রকৃতির ছিলেন, এটা স্বামী ধীরানন্দজী জানতেন, তাই তিনি আমার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবেই বলে দিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সম্রান্ত পরিবারের, কলেজে পড়ি ইত্যাদি। সুতরাং আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের জন্য আর একবার অনুমতি পেয়ে গেলাম। এবার কিন্তু মায়ের সর্বাঙ্গ তেমন কাপড়ে ঢাকা ছিল না।

শ্রীশ্রীমা আমাকে বললেন, "কেন বাবা, তুমি তো রাখালের কাছে যাও; রাখালই তো তোমাকে দীক্ষা দিতে পারে। সে দেওয়ার অধিকারীও বটে,—তবে আমার কাছে কেন চাচ্ছ?" আমার সৌভাগ্য হল কথা বলার। বললাম, "মা, যদি আপনিই আমাকে কৃপা করেন, আমি মনে করব আমার মহা সুকৃতি। এটা আমার কাছে ভগবৎ-অনুগ্রহ বলে মনে হবে—আমার পরম ভাগ্য।" তখন শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ চুপ থেকে সম্মতি জানালেন, "আচ্ছা, তুমি দুদিন পরে এস। গঙ্গায় স্নান করে, সকালে কিছু না খেয়ে নিচের অফিসঘরে এসে বসবে; সেখানে অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ আমি না ডাকি। আমি ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষার জন্য তোমাকে উপরে ডেকে আনতে কাউকে পাঠাব।"

যখন নিচে এসে, স্বামী ধীরানন্দজীকে বললাম, শ্রীশ্রীমা কি বলেছেন—তিনি ভীষণ খুশি হলেন যেন আমার চেয়েও তাঁর আনন্দ বেশি। ঐ দিন পর্যন্ত আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, দীক্ষার মাধ্যমে আমি এক মহৎ-আশ্রয় লাভ করব। আমার কাছে এই দীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবটিই ছিল অত্যন্ত আকস্মিক। তখন আমার বয়স ছিল বছর সতেরো এবং আমি দীক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমি এটা ঠিক বুঝে নিয়েছিলাম যে, শ্রীশ্রীমা আমাকে অনুভব করাতে চেয়েছিলেন,—আমি অচেনা হলেও তিনি আমার খুব নিকটের, কত আপন! সত্যি বলতে কি, তখনও পর্যন্ত আমি ভাবিনি যে, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং জগজ্জননী। মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দজীই পরে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা যেন তাঁর সমস্ত শক্তি চেপে রাখতেন। আমি কেবল অনুভব করতাম যে, তিনি খুব দয়াময়ী, পরম স্নেহময়ী,—তাঁর অপরিসীম করুণা —কিন্তু তিনি যে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মনুষ্যরূপ ধারণ করে এসেছেন, তা ভাবিনি একটুও।

আমি পরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাতের খবর স্বামী অখিলানন্দকে বললাম। দীক্ষাগ্রহণের অর্থ কি বা আমার কি করণীয় অথবা এর জন্য কেমন করে প্রস্তুত হতে হবে,—সে-সব কিছুই আমি জানি না,—তাঁকে সব বললাম। তিনি বললেন যে, চিন্তার কারণ নেই, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামী অখিলানন্দ ও আমি কলেজ স্ট্রীট বাজারে গেলাম। কিছু ফল, মিষ্টি, ফুল এবং একখানি লালপেড়ে কাপড় কিনেছিলাম গুরু পূজার জন্য। বেশ উদ্বেগের মধ্যেই সেদিন রাত কাটালাম। স্বামী অখিলানন্দের কাছে শুনেছিলাম যে, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয় একটি পবিত্র শব্দের দ্বারা,—যাকে বলে মন্ত্র। তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন' দীক্ষার সময় গুরু যে মন্ত্রই দেবেন তা গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রের জন্য শিষ্য গুরুকে ফরমায়েশ করবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি একভাবে আমার ইষ্ট সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম। আশঙ্কা হল, শ্রীশ্রীমা যদি সেটি পরিবর্তন করে দেন, তাহলে আমি কি করব? আমি তো তখন চুপচাপ থাকতে পারব না,—মনের কথা ব্যক্ত করতেই হবে। মাকে বলতেই হবে, "মা, আমার এই ইষ্ট পছন্দ!" এইসব চিন্তায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, রাত্রে তাই ঘুমাতে পারিনি।

পরের দিন সকালে স্বামী অখিলানন্দ ও আমি গঙ্গায় স্নান করে, উদ্বোধন অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যথা সময়ে ডাক আসতেই আমি উপরে গেলাম। শ্রীশ্রীমা নিজে পূজা করলেন, কিন্তু প্রথমেই আমাকে ধ্যান করতে বলেননি। তারপর তিনি আমাকে যেই মন্ত্র দিলেন, অমনি তা যেন আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, "মা অবশ্যই দেবী, তিনি আমার মনের কথাটি জানেন।" এইভাবেই আমি ধন্য হয়েছিলাম। অতঃপর মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে প্রসাদ পাবে তো?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "মা, আমি পুরো দিনের জন্য ছুটি নিয়ে আসিনি, কেবল একবেলার ছুটি নিয়ে এসেছি।" সুতরাং শ্রীশ্রীমা আমাকে কিছু ফল ও মিষ্টি প্রসাদ হাতে দিলেন—আমিও নিচে নেমে এলাম।

অনেকে প্রশ্ন করেন, "এই দীক্ষা জিনিসটি কি?" শ্রীশ্রীমা তাতে বলতেন, "শিষ্যের জন্য আমার যা কিছু করণীয় আমি তা দীক্ষার সময় করে থাকি।" যাঁরা আমাদের মঠের প্রবীণ সাধুদের কাছে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, মন্ত্রের মধ্যে গুরুশক্তি নিহিত থাকে। পুনঃ পুনঃ মন্ত্র জপের দ্বারা গুরুর সেই আধ্যাত্মিক

রূপের প্রকাশ হয়। এটা আমাদের বিশ্বাস যে, সদ্গুরু আমাদের যে মন্ত্র দেন,—তার শক্তি অমোঘ। জগজ্জননী স্বয়ং যখন মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূতা হয়ে মুমুক্ষু ভগবদ্জিজ্ঞাসুকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন, তখন তার শক্তি কি আপনারা ভাবতে পারেন ?

রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) দেখলেন যে, আমি দীক্ষার পর জপমালা গ্রহণ করিনি। তিনি বললেন, "মা তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তোমার মালা নেই।" আমি বললাম, "আপনি কি অনুগ্রহ করে মালা পেতে সাহায্য করতে পারেন ?" তিনি রাজী হলেন এই শর্তে যে, তাঁকে মালা কেনার টাকাটা আমি দিয়ে দেব। যাহোক, আমি তাঁকে কিছু টাকা দিলাম এবং তিনি দুদিন পরে আমাকে আসতে বললেন, এবং আরও জানালেন তখন শ্রীশ্রীমা জপের মালাটি শোধন করে দেবেন। দুদিন পরে ফিরে আসতে তিনি আমাকে বললেন যে, আমার জন্য মালার প্রত্যেকটি দানা খাঁটি কিনা তা তিনি পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি দানাগুলি ঠিক কিনা কি করে পরীক্ষা করলেন ? আমরা মানুষকে পরীক্ষা করি, কিন্তু মালার দানাকে কেমন করে পরখ করা চলে ?" তখন তিনি পরীক্ষার প্রণালীটি বললেন, "তুমি জলের পাত্রে একটা রুদ্রাক্ষের দানা ছেড়ে দাও, যদি এটা জলে ডুবে যায়, তাহলে দানাটি খাঁটি বলে বিবেচিত হবে, আর যদি সেটা জলের উপর ভাসতে থাকে, তবে বুঝতে হবে দানাটি অন্য কিছুর।" এর পর আমি জপের মালাটি নিয়ে উপরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম। মা তখন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কি করে মালায় জপ করতে হয় এবং আরও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে ইষ্টের চিন্তা ও ধ্যান করতে হয়।

শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে ঐ শুভদিনে যা পেয়েছিলাম তা ধারণার উপযোগী বোধশক্তি পেয়েছিলাম অনেক পরে—স্বামী সারদানন্দজীর কাছ থেকে,—অর্থাৎ যখন মার কৃপায় আমি স্বামী সারদানন্দজীর সেবক নিযুক্ত হয়েছিলাম —যখন তিনি আমাকে দিয়ে চিঠিপত্র লেখাতেন—যে-সব চিঠিতে থাকত তাঁর নিজ শিষ্যদের প্রতি পারমার্থিক উপদেশ। যদি কোন শিষ্য মন্ত্র স্মরণ করতে না পারত, তাহলে তিনি নিজের হাতে ঐ চিঠি লিখতেন। সেগুলি ছাড়া আমি তাঁর অন্যান্য নির্দেশপূর্ণ চিঠি সবই লিখতাম। একদিন স্বামী সারদানন্দজীর ধ্যানের পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে, প্রণাম করে নিবেদন করলাম, "মহারাজ, মা আমাকে অতি সাধারণভাবেই সাধনোপদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে সকাল-সন্ধ্যায় কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র জপ করতে কিংবা বিশেষ দিনেও কিছু করতে বলেননি। তিনি আমার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি দেখিয়ে দেননি। মহারাজ, আমার ইচ্ছা হয় কোন নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালী জানতে। আপনি অনুগ্রহ করে কি আমাকে অতিরিক্ত কিছু বলে দেবেন ?" তাতে স্বামী সারদানন্দজী বললেন, "তুমি একটি আস্ত বোকা। মা হচ্ছেন সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই সব সাধন-পদ্ধতি ও প্রণালী দিয়ে থাকেন সাধারণ গুরুরা, কিন্তু জগন্মাতা তা দেন না। মা তোমাকে যা বলে দিয়েছেন, জানবে তা আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ কথা। তুমি মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে জপ করে চল, ইষ্টের ধ্যান এবং চিন্তা কর। যখন ঈশ্বরদর্শনের জন্য যথার্থ ব্যাকুল হবে—তখন তোমার মনই জানতে পারবে—তখন তোমার মন তাঁতেই ডুবে যাবে এবং তোমার প্রার্থনাও পূর্ণ হবে। তুমি কি বলতে চাও, মা যা দিয়েছেন তার সঙ্গে আমি আরও কিছু যোগ করে দেই ? আরে আমিও তাঁর কৃপাতেই এখানে।" স্বামী সারদানন্দজী সেদিন আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন যে, শ্রীশ্রীমা একজন সাধিকা মানবী নন। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ—ব্রহ্মেরই ক্রিয়ামূর্তি। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি অভেদ, ঠিক তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা আধ্যাত্মিক ভাবে অভিন্ন, —যা আমাদের বুদ্ধির অতীত, বিচারের অগম্য। মা ছিলেন সরল পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রতিমা— স্বয়ংই পবিত্রতা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলন ও কিছু কঠিনপ্রশ্ন

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

প্রবন্ধকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশ্রুত ঐতিহাসিক,—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো এবং দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর অব্ হিস্ট্রি। খ্যাতনামা ইতিহাস-গ্রন্থকার। সম্প্রতি গঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পরিষদের তিনি কর্মসচিব।

প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ১৯৮৩-র ২০ অক্টোবর হায়দ্রাবাদের রামকৃষ্ণ মিশনে 'কমিটি ফর কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব্ দি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভমেন্ট'-এর উদ্যোগে প্রথম তিনদিন ব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, শিক্ষা ও ভাবধারার সমীক্ষা, তার সার্বিক প্রভাব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুক্তিবাদী পর্যালোচনার যে-প্রচেষ্টার শুরু হয়েছিল তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল হায়দ্রাবাদের ঐ সম্মেলন ও আলোচনাচক্র। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা অতীব সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রসারে মিশনের সন্ন্যাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য বা অন্য যাঁরা এই কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের প্রতি স্নেহ ও শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থহীন। হায়দ্রাবাদের পর বোম্বাই-এর রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী মুমুক্ষানন্দের নেতৃত্বে ও পরে কেরলের এরনাকুলামে ভারতীয় বিদ্যাভবনের সম্পাদক খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক ডাঃ শ্রীকুমারের নেতৃত্বে যে সম্মেলন ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও অনুরূপ সুব্যবস্থা, আতিথেয়তা ও উষ্ণ অভ্যর্থনা সমাগত সকলেই পেয়েছেন। বাংলার বাইরে অন্যান্য রাজ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গেও এই আন্তর্জাতিক কমিটির উদ্যোগ ও সহযোগিতায় কয়েকটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজার পূর্বেই পাটনায়, এবং পূজার পরেই এলাহাবাদে, তারপর মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবেন্দ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে সম্মেলন ও আলোচনাচক্রের কর্মসূচী রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা সংস্থা ও বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান থেকে কমিটির সহযোগিতায় আলোচনা-সভা করার জন্য আমন্ত্রণ আসছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, 'কমিটি ফর কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব্ দি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভমেন্ট' অল্পকালের মধ্যেই এক আন্তর্জাতিক কমিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মূল সভাপতি হয়েছেন খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম। সহ-সভাপতিদের অন্যতম হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সের সদস্য ও সুপরিচিত পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ ই. পি. চেলিশেভ এবং চীন প্রজাতন্ত্রের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা দক্ষিণ এশিয়া বিশারদ হুয়াং চিং জুয়ান। ব্যাসাম চেলিশেভ, ও হুয়াং চিং জুয়ান—তিনজনেই সানন্দে কমিটির উদ্দেশ্য ও কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। চেলিশেভ ও হুয়াং চিং জুয়ান উভয়েই সুস্পষ্টভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, শুধু বর্তমান ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের জরুরী প্রয়োজন আছে। ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্র-পত্রিকায় উভয়ের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। উদ্বোধন পত্রিকায় মূল চিঠি দুটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা সম্বন্ধে রাশিয়া, চীন সমেত বহির্বিশ্বে

এই গভীর আগ্রহের প্রকাশ আমাদের কাছে অবশ্যই বিশেষ আনন্দ এবং উৎসাহের কারণ। কমিটির প্রচেষ্টার ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সম্বন্ধে নতুন করে যে সমীক্ষা শুরু হয়েছে সে বিষয়ে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-ছাত্র-যুব সমাজ এবং অন্য শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়েছে তাতে আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ লাভেরও যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এই আত্ম-সন্তুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করার ও বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কম্প্রিহেনসিভ কমিটির কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত শুধুমাত্র তাঁরাই এক কঠিন বাস্তব বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছেন তাই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন, যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণ-অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য মনে করেন, তাঁদের সকলকেই সমবেতভাবে এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও ভারতের সাধারণ মানুষকে নিদ্রিত দৈত্য (Sleeping Leviathan) বলে বর্ণনা করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন যে, এই দৈত্যের ঘুম ভাঙলে সারা বিশ্ব আলোড়িত হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সারদা মিশনের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীদের নিরলস সাধনা ও প্রচেষ্টা, ইন্সটিটিউট অব্ কালচার, কম্প্রিহেনসিভ কমিটি, যুবসম্মেলন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে গঠিত বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উদ্যোগের ফলে সারা দেশে যুবসমাজের মধ্যে এই দুই অনন্ত ঐতিহাসিক পুরুষ সম্বন্ধে নতুন করে জানার ও বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। সেইসঙ্গে মনে নানান প্রশ্ন জাগছে। বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী যুবমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কোন কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ দুজনেই তাই চেয়েছিলেন। যাচাই করে গ্রহণ করলে সহজে বর্জন করার আশঙ্কা থাকে না। বর্তমানের যুবসমাজ বহু প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারেন। গত এক বছরের বিভিন্ন সমাবেশ, সম্মেলন ও আলোচনা-সভার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, যুব ও ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ মানুষ গভীর প্রত্যাশা নিয়ে নতুন মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস ও পথনির্দেশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

হায়দ্রাবাদের প্রথম সম্মেলন ও আলোচনা-চক্রের অভিজ্ঞতার কথা বলি। প্রথম দিনের সাধারণ অধিবেশনে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল। মিশনের মূল হলঘরে প্রায় বারশো জন বসতে পারে। কিন্তু সেদিন হলঘরের চারিদিকে মেজেতে আরও প্রায় তিনশো মানুষ কোনক্রমে নিজেদের স্থান করে নিয়ে অধীর আগ্রহে বক্তৃতা শুনেছিল। হলের বাইরে সাগ্রহে দাঁড়িয়েছিল আরও কয়েক শত মানুষ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার ওপর বিভিন্ন ভাষণ সেদিন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সভার পর ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম-চারী এবং পাটনার খোদা বক্স লাইব্রেরির অধিকর্তা আমাকে সোৎসাহে বলেছিলেন, "ডঃ বসু, এই রকম সম্মেলন উত্তর ভারতে করতে পারেন? দক্ষিণে এই জাতীয় সভা, আলোচনাচক্রের অবশ্যই সার্থকতা আছে। কিন্তু অশান্ত, উত্তেজিত হিংসাত্মক ঘটনায় রক্তাক্ত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে এই ভাবান্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অনুগ্রহ করে এই বিষয়ে একটু চিন্তা করবেন। প্রয়োজনে আমরা সবরকম সহযোগিতা করব।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, খোদা বক্স লাইব্রেরির অধিকর্তা হলেন ধর্মে

মুসলমান। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নতুন তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারেও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

পরের দিনের আর এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে হায়দ্রাবাদে বড় রকমের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছিল। তখনও তার জের চলছিল। বিকালে চা-পানের বিরতির সময় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ছাত্র আমাদের ঘিরে ধরে প্রশ্ন শুরু করল। মূল প্রশ্ন হল হায়দ্রাবাদ তথা ভারতবর্ষের নানাস্থানে মাঝে মাঝেই যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয় তার অবসান ও প্রতিরোধে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তাধারা কতখানি কাজে লাগতে পারে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডঃ স্বভাব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি আমাদের সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, ভারতে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিবিধের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখের জীবনাদর্শ কথায় ও কাজে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ও সর্বধর্মসমন্বয়ের সবচেয়ে সুদৃঢ় ভিত্ স্থাপন করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আর একদিন একটি ছাত্র প্রশ্ন করেছিল যে, ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা ছিল। কিন্তু তাহলে ভারতে অহিংস আন্দোলনের পিছনেও স্বামীজীর আদর্শ অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল তা বলা যায় কি করে? আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, সহিংস, অহিংস, সহযোগ, অসহযোগ ইত্যাদি যে কোন মতাদর্শ বা আন্দোলনই হোক না কেন, সব কিছুরই মূলে ছিল স্বামীজীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব। কেননা প্রতিটি আন্দোলনের মূল কথা হল স্বদেশপ্রেম, জাতিগঠন, জাতীয় অগ্রগতি ও স্বাধিকার লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প। স্বামীজীর জীবন ও বাণী ঐ সব কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্যতম উৎসমুখরূপে কাজ করেছিল।

বোম্বাই-এর আলোচনাচক্রে ও যুবসম্মেলনে বহু প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্নের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। একজন প্রশ্ন করেছিল, "আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা বলছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী ও অন্যান্য মনীষী, চিন্তানায়কদের কথাও বলেছেন। তাঁরা সবাই অবশ্যই নমস্য। কিন্তু বলতে পারেন তাঁদের আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করলে আমরা ঠকে যাব না কি? চতুর্দিকে দুর্নীতি, অন্যায় ও আদর্শহীনতার জয়যাত্রা চলেছে। এই পরিবেশে আদর্শ ও আদর্শবাদীর স্থান কোথায়? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবানুরাগীর বাঁচার সম্ভাবনা কতটুকু? কেন আমরা নির্বোধের মতো ঐ আদর্শ জীবনে পালন করব?" কঠোর, নগ্ন সত্য। আমরা সাধ্যমত বুঝিয়েছিলাম যে, আদর্শের মৃত্যু মানে মানুষের মৃত্যু। মানবিকতার মৃত্যু। বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, মহম্মদ, রামানুজ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—কেউই সেই বিচারে সফল হননি। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ বা নানকের আদর্শ ও ধর্মে দীক্ষিত হয়েও অনেকে যেভাবে অত্যাচার করেছে, রক্তপাত করেছে ও অন্যায় করেছে তার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে। তবুও তাঁরা জন্মেছিলেন, এবং তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষা কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী বলেই আমরা আজও নিজেদের "মানুষ" বলার অধিকার হারাইনি। পশু ও মানুষে এখনও প্রভেদ রয়েছে। জানি না এই উত্তর সংশয় দূর করতে পেরেছিল কিনা। না পারাই সম্ভব।

কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তথা ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মূল কথাটি অন্তরে গ্রহণ করেছেন তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।

আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন, "ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল বা মর্মকথা কি? এই জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় করায় হিন্দুধর্মের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?" প্রশ্নটি ছোট। কিন্তু এর উত্তর দিতে হলে সুবিস্তৃত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। প্রয়োজন বহু ভ্রান্তধারণা, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও অপপ্রচারের অবসান ঘটানো। সংক্ষেপে এইটুকু প্রশ্নকর্তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, ভারতীয় জাতি মহাসমুদ্রের কথা স্বামীজী বলেছিলেন। ভারতকে তুলনা করেছিলেন "এক মানবিকতার মহাসমুদ্রের" (An Ocean of Humanity) সঙ্গে। হিন্দুধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন অদ্বৈত মতবাদ বা জীবনবেদের কথা। স্বামীজীর অতুলনীয় ভাষায় এ সেই ধর্ম যা কোন মানুষকে প্রচার করে না, সকল মানুষকে সমান সুযোগ দেয় নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশের। সাম্য, সমান অধিকার, সমদৃষ্টি, মানব কল্যাণের এবং মহামিলনের এমন ব্যাখ্যা মানব ইতিহাসে দুর্লভ।

হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাইতে যে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল কেরলে, এর্নাকুলামেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাইতে অধিবেশন চলেছিল তিনদিন ধরে। এর্নাকুলামে আলোচনা-চক্র হয়েছিল দুদিন। কিন্তু অধিবেশন শুরু হত সকাল নটায়। শেষ হত প্রায় রাত আটটায়। তারপরও ঘরোয়াভাবে আলাপ-আলোচনার জের চলত আরও প্রায় এক ঘণ্টা। অর্থাৎ স্বল্প বিরতি দিয়ে প্রায় বার ঘণ্টা ধরে চলেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। সমবেত প্রায় দুশো অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের মধ্যে কখনও ক্লান্তি লক্ষ্য করিনি। এ এক অপূর্ব, প্রায় অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। স্থানীয় সংবাদপত্র-পত্রিকায় এই আলোচনা-সভার কথা যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, দুদিন ধরে প্রথম পৃষ্ঠায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা আমরা পশ্চিমবঙ্গে কল্পনাও করতে পারি না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামের ও ভাবাদর্শের যে আবেদন আছে, সম্মোহনী শক্তি আছে তা অন্য রাজ্যের সম্মেলন ও আলোচনা-চক্রে যোগদান না করলে উপলব্ধি করতে পারতাম না। কিন্তু সবকটি স্থানেই একটি প্রশ্ন বা বিতর্ক প্রায়ই উঠেছে বিভিন্ন ভাবে ও প্রসঙ্গে। অনেকেই আমাদের বলেছেন যে, সম্মেলনে ও আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করে তাঁরা লাভবান হয়েছেন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ও অনুভূতি নিয়ে তাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনকে দেখতে শিখেছেন। এই আদর্শ ও ভাবধারাকে রূপায়িত করার জন্য অন্তরে এক তাগিদ অনুভব করছেন। আমরা কি তাঁদের পরামর্শ দিতে পারি যে কিভাবে তাঁরা এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। আর একদল যুবক-যুবতী আরও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "অনেক কথা অনেক আলোচনা তো হল। এবার কি হবে? আমরা কাজ চাই। শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে চাই না। আপনারা সর্বভারতীয় কোন কর্মসূচী গ্রহণ করুন। আমাদের কাজ দিন।" যুবমানসে এই উত্তেজনা, উন্মাদনা দেখে একদিকে যেমন আনন্দ হয়েছে, মনে আশা জেগেছে, তেমনি আশঙ্কাও হয়েছে। যুবশক্তিকে, যুবসমাজের আদর্শবোধ ও প্রত্যাশাকে আমরা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ঐ দুর্বার স্রোতকে সঠিক পথে পরিচালিত করার, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের কই? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ তথা ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের

উজ্জীবন সম্বন্ধে যাঁরা উদ্বিগ্ন তাঁদের সকলকেই আজ এই সমস্যা ও পথনির্দেশের কথা গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব যুগের প্রয়োজনেই হয়েছিল। সেই প্রয়োজন কিন্তু আজ ফুরিয়ে যায়নি। বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন উঠছে কিভাবে আমরা বাস্তব সমস্যার সমাধানে এই ভাবধারাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। স্বামীজী এক হাজার যুবক চেয়েছিলেন যারা মানুষের কল্যাণে দেশের স্বার্থে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বহু সহস্র ভারতীয় যুবক-যুবতী সেই আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত আছে যদি স্বামীজীর আহ্বান তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু মূল সমস্যা হল যে, যুবসমাজ সেই ডাকে সাড়া দিলে দেশের শাসকরা, বুদ্ধিজীবীরা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ণধাররা বিব্রত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন কিনা।

স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ

ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম অভিঘাতে ভারতবর্ষের স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের মনে সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের বীজ-বপন ঘটিয়া গিয়াছে। জীবনের সহিত যোগ হারাইবার ফলে ভারতবাসীরা কোন-মতে আপন সংস্কৃতির অচলায়তনে নিজেদের মাত্র আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেও তাহার মূল্য সম্বন্ধে আর মোটেই সচেতন ছিল না। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার করিয়া সব জিনিস যাচাই করিয়া লইবার যে প্রবণতার তরঙ্গ আসিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বতটে আঘাত করিল, তাহাতে বহুদিনের সযত্নে লালিত ভাব-সৌধগুলিতে বিরাট ফাটল দেখা দিল। ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে—সর্বত্রই সন্দেহের ঘুণ ধরিয়া ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষিত মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিল। স্বামী বিবেকানন্দও সেই সন্দিগ্ধ ও জিজ্ঞাসু মানুষেরই প্রতিনিধি, যাঁহার মধ্যে আকুল প্রশ্ন ও বিপুল সংশয়। মূলতঃ ধর্মের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা লইয়াই তিনি নানাস্থানে অস্থির পরিক্রমার পর একদিন দক্ষিণেশ্বরে মুখোমুখি হইয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের। ঈশ্বর একটি কাল্পনিক বিষয়, না প্রত্যক্ষ অনুভব-সিদ্ধ বস্তু, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের উপরেই ধর্মের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সেই প্রশ্ন লইয়াই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে আঘাত করিলেন। কিন্তু সেই আঘাতে শুধু বিবেকানন্দের জীবনই নয়, ভারত-বর্ষের সংস্কৃতির জীবনে যেন এক নবজাগরণের সূচনা দেখা দিল। পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্লাবনে ভারত ভাসিয়া যাইবে, এই আশঙ্কা যে দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন অকস্মাৎ সেদিন দক্ষিণেশ্বরের তটে আসিয়া প্রতিহত হইল। কিন্তু সেই তরঙ্গাঘাত নিষ্ফল হইল না, তাহা ভারতবাসীর দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল, নিজের সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করিল, তাহার পুনর্মূল্যায়নে

তাহাকে ব্রতী করিল। সেইদিন হইতেই নবজাগরণের সূচনা এবং সেই নবজাগরণের ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ। সগরবংশের পুনরুজ্জীবনের জন্ত যেমন ভগীরথ অগ্রে অগ্রে শঙ্খধ্বনি করিয়া মন্দাকিনীর ধারাকে মর্ত্যভূমিতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তেমনই আর্যসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের ব্রহ্মঘোষ সহকারে বেদান্তের স্বচ্ছ জ্ঞানধারার পুনঃপ্রবর্তন।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টান ধর্মকে প্রতিহত করার জন্ত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন এবং সেই সূত্রে বেদান্তচর্চারও ভিত্তিস্থাপন করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু রামমোহনের এই প্রয়াস যেন একটি ক্ষীণ আত্ম-পক্ষ সমর্থনের গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, অর্থাৎ আমাদের ধর্মেও যে নিরীশ্বরবাদ আছে এবং পৌত্তলিকতাও একটি কুসংস্কারমাত্র, ইহা তিনি উপনিষদ্ অবলম্বনে শিক্ষিত মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু জনসাধারণ যে ধর্মকে ধরিয়া আছে এবং অনুসরণ করিয়া চলিতেছে তাহার কোন যৌক্তিকতা রামমোহন তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। মৃন্ময় পূজার পিছনে যে চিন্ময় উপলব্ধি নিহিত আছে, প্রতিমার প্রতীকের অন্তরালে যে সর্বব্যাপী সত্তার অভিব্যক্তি আছে তাহা রামমোহনের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয় নাই। তাহার ফলে হিন্দুধর্মের চূড়াটির অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনার সমুজ্জল রূপটি রামমোহন তুলিয়া ধরিলেও, তাহার মূল সৌধ বা ইমারতটির কোন সুরক্ষা বা সংস্কারের উপায় তিনি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় সাধনার শুষ্ক নিষ্প্রাণ অস্থিকে তাই তিনি বিসর্জন দিতেই চাহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্চারের নিষ্ফল প্রয়াস হইতে বিরতই ছিলেন। তাই রামমোহনের বিশিষ্ট অবদান সশ্রদ্ধ স্মরণে রাখিয়াও তাঁহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভগীরথরূপে চিহ্নিত করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অনুপ্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে এই পুনরুজ্জীবন কর্মটি সাধিত হইয়াছে,—তুচ্ছ পৌত্তলিকতা বলিয়া রামমোহন যাহা বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের পরম উপলব্ধির ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত হিন্দুধর্মের সমগ্র সৌধটি তাই স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক এইভাবে সুরক্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তিনি এই পুনরুজ্জীবনের যথার্থ ভগীরথ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এই পুনরুজ্জীবনে, নবজাগরণে স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতভাষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃত-ভাষার রত্নপেটিকাতেই সুরক্ষিত। স্বামীজী তাঁহার অভ্রান্ত দিব্যদৃষ্টি দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে নবজাগরণই বলি বা বিপ্লবই বলি, সাধিত হইতে পারে একমাত্র ধর্মের দ্বারা, তাই তিনি বলিয়াছেন: "ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্মভাবকে বিশেষরূপে জাগাইতে হইবে।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন: "কিরূপে উহা সাধিত হইবে?" স্বামীজী ইহার উত্তরে নিজের পরিকল্পনাটি তুলিয়া ধরিয়াছেন: "আমার সঙ্কল্প এই: প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্পলোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা।" এই প্রকাশ্যে বাহির করা বলিতে স্বামীজী বুঝিয়াছেন "সংস্কৃত শব্দের শতশত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির" করা। তাই বলিয়া তিনি সংস্কৃতভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়া শুধু লৌকিকভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তাহা জনসাধারণে প্রচার করিতে চাহেন

নাই কারণ তিনি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, "এই সংস্কৃতভাষা আমাদের গৌরবের বস্তু", যদিও সেই সঙ্গেই তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, "এই সংস্কৃতভাষার কাঠিন্যই এই সকল ভাবপ্রচারের এক মহান অন্তরায়।"

স্বামীজীর আশ্চর্য সমন্বয়ী দৃষ্টির পরিচয় এখানেই পাওয়া যায় যখন তিনি বলিতেছেন যে, "অবশ্যই চলিতভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে" এবং ইহাও বলিয়াছেন, "সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত-শিক্ষাও চলিবে, কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃতশব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে।" সংস্কৃতশব্দের এই মহিমা সম্বন্ধে স্বামীজী সচেতন ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী মহান আচার্যগণের, যেমন চৈতন্য, কবীর এমনকি বুদ্ধদেবেরও এই সংস্কৃতভাষাকে উপেক্ষার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তির প্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমনকি মহান বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন।" বুদ্ধদেব সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিবার ফলে তাঁহার ভাবধারা চতুর্দিকে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বামীজী বলিতেছেন যে, "সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল।"

স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে এমন এক দূরদর্শিতা পরিস্ফুট হইয়াছে, যাহার ফলে তিনি সংস্কৃতভাষার যথার্থ ভূমিকাটি যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত শুধু একটি ভাষামাত্র নহে, কিন্তু ইহা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জ্ঞানকে যথার্থ আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব সংস্কারে পরিণত করিতে হইলে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে, কারণ এই ভাষার মধ্যে যে গৌরববোধ আছে তাহা অন্য কোন ভাষাতেই নাই। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে স্বামীজী তাই বলিয়াছেন: "জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৌরববোধ ও সংস্কার জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না।" স্বামীজী আরও বলিতেছেন: "জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পারো, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই।" [ক্রমশঃ]

বুদ্ধচরিতঃ এডুইন আর্নল্ড ও গিরিশচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবালোকে বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীর্তি গবেষক।

ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বহির্ভারতের প্রথম ব্যাপক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে। বৌদ্ধধর্মই সর্বপ্রথম ভারতের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর চীন, জাপান, সিংহল, বালি, যবদ্বীপ—এক কথায় পূর্ব ও উত্তর এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই এশিয়া-বিজয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে ঘটেনি—যা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সাম্রাজ্য-বিস্তারের ক্ষেত্রে সাধারণত ঘটে থাকে।

বর্তমানে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধের সংখ্যা নামমাত্র। হিমালয়-সংলগ্ন কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু সমতলভূমিতে এই ধর্মীয় সম্প্রদায়টি রীতিমতো সংখ্যালঘু। বৌদ্ধের সংখ্যা যাই হোক না কেন বুদ্ধের অনুগামীর সংখ্যা কিন্তু বিপুল। বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে বুদ্ধ-অনুগামীই সর্বাধিক। যিনি যে ধর্মমতেই বিশ্বাস করুন না কেন, বুদ্ধ-অনুগামী হওয়ার পথে কোন অন্তরায় নেই, কারণ বুদ্ধ তাঁর ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার বদলে কতকগুলি পালনীয় নীতিকেই প্রতিষ্ঠা

করতে চেয়েছিলেন যেগুলি কোন না কোনভাবে সকল ধর্মমতেই গৃহীত। বুদ্ধ কোন নির্দিষ্ট দেবতাকে স্বীকার করেননি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও নীরব। স্বর্গ-নরকেও কোন আস্থা প্রকাশ করেননি, কারণ মৃত্যুর পর স্বর্গ নামক ঈপ্সিত কোন স্থানে গমনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষের অহং-বোধ জাগ্রত হয়—তা থেকেই তৃষ্ণা বা বাসনার উৎপত্তি। বুদ্ধের ধর্মের মূল কথা হল—জীবনে দুঃখ একটা মর্মান্তিক সত্য—সেই দুঃখের মূল তন্‌হা বা তৃষ্ণায়। তৃষ্ণাই মানুষের মধ্যে 'অহং'-বোধ জাগিয়ে তোলে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় 'অহং'-এর বিলুপ্তি, আত্মবিসর্জন। বৌদ্ধশাস্ত্রে কুশললাভের তিনটি উপায়—প্রথম বোধিচিত্তের উৎপত্তি, দ্বিতীয় আশয়শুদ্ধি এবং তৃতীয় অহং-বিসর্জন। জ্ঞানস্বরূপের অবরোধই বোধিচিত্তের উদ্বোধন ঘটায়। আশয়শুদ্ধি বলতে বোঝায় হিংসা প্রভৃতি দোষের নিরোধ এবং তার দ্বারা চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন। অহং ত্যাগ কেন? অহং বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়াশীল জগৎই একমাত্র বর্তমান। জীবন-মৃত্যু সত্য, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব নেই—সুতরাং অমরতা ভ্রমমাত্র। মানুষের স্বার্থপরতা এই 'অহং'-কে ভিত্তি করে।

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানকালের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেই সময় ভারতের ধর্মজগতে পুরোহিত-শক্তির প্রাধান্য। ধর্মগুরু ও পুরোহিতের পার্থক্যটি এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার। জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুরা মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে চান সত্যের আলোক—তাঁদের দক্ষিণা মানুষের সত্যজ্ঞান, অন্ধকার থেকে মুক্তি মাত্র। অপরপক্ষে পুরোহিতদের স্বার্থপরতা মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখতে চায়—তাদের উপর কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করে। মানুষের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে নানা রহস্যময় জটিল তত্ত্ব উপস্থিত করে। নানাবিধ যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে—পুরোহিতকুলকে খুশি করার জন্য প্রণাম ও প্রণামী—এমন কি তাঁদের চরণপ্রান্তে যথাসর্বস্ব দিয়ে সাধারণ মানুষ এক বিশ্বাসের জগতে আশ্রয়লাভ করে। ধর্মকে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে তুলেই পুরোহিতশ্রেণী লাভ করতেন মানুষের শ্রদ্ধা ও তাঁদের শোষণের অধিকার।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম এই কাল, এই মানসিকতা, ধর্মের এই নিষ্ঠুর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বুদ্ধ যাবতীয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনকে চূর্ণ করে নূতন ধর্মমতের কথা শোনালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "পুরোহিতদের কথামতো যদি একজন ঈশ্বর থাকেন তাহলে জগতে এত দুঃখ কেন? পৃথিবীর চারিদিকে দুঃখের প্রবাহ—আবার পুরোহিতদের কথা সত্য হলে পরলোকেও হাজার রকম শাস্তির ব্যবস্থা। সুতরাং ঈশ্বর পুরোহিতদের কল্পনামাত্র। জগতের এই অতলান্ত দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় আত্মবোধবিসর্জন।" দুঃখ নিরোধের আটটি উপায় নির্দেশ করলেন তিনি—সম্যক্ দৃষ্টি অর্থাৎ সত্যদর্শন এবং ভ্রমত্যাগ, সম্যক্ সঙ্কল্প অর্থাৎ সাধুসঙ্কল্প বা শুভ-ইচ্ছা, সম্যক্ বাক্ বা সত্যবাক্য কথন, সম্যক্ কর্মান্ত বা সদ্ব্যবহার অথবা কাম্য কর্ম পরিত্যাগ, সম্যক্ আজীব বা সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ, সম্যক্ ব্যায়াম বা ধ্যান ও যোগাদি, সম্যক্ স্মৃতি অর্থাৎ সত্যচিন্তা এবং সম্যক্ সমাধি।

বুদ্ধ-দর্শনে অহং-বোধের বিলুপ্তি এবং কর্মের জন্য কর্মের যে মহৎ আদর্শ তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের দ্রুত প্রসার ও প্রভাবের কারণ হল তার সর্বজনীনতা ও সর্বপ্রাণীর জন্য গভীর ভালবাসা। দীর্ঘকালের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ নিজের মহত্ত্ব

উপলব্ধির সুযোগ পেয়েছে এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি অপরিমিত করুণাই বুদ্ধকে সকল মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙলা ভাষায় বুদ্ধ-চর্চার সূত্রপাত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, রমানাথ সরস্বতী, অঘোরনাথ গুপ্তর রচনা বাঙলাভাষীর কাছে বুদ্ধজীবন ও দর্শনকে সমধিক পরিচিত করে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এডুইন আর্নল্ডের বুদ্ধজীবন ও দর্শনভিত্তিক কাব্য 'লাইট অব এশিয়া' প্রকাশিত হয়ে পাশ্চাত্যজগতে বিপুল সমাদর লাভ করে। এই কাব্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য-জগতের অনেকেই বুদ্ধ ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এই কাব্য পাঠ করে। আর্নল্ড প্রধানত 'ললিত বিস্তর' থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন—কোথাও কোথাও তা আক্ষরিক অনুবাদ। ভূমিকায় তিনি আশা প্রকাশ করেছেন,"The time may come, I hope, when this book and my 'Indian Song of Songs' and 'Indian Idylls' will preserve the memory of one who loved India and the Indian people." তাঁর সে প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকেনি। বাঙলা সাহিত্যে আর্নল্ডের কাব্যের প্রভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে। ১৮৮৫ সেপ্টেম্বরে অভিনীত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক—যা তিনি আর্নল্ডকে উৎসর্গ করে লিখেছেন, "আপনার জগদ্বিখ্যাত 'লাইট অব এশিয়া' অবলম্বন করে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।" ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' 'লাইট অব এশিয়া' অবলম্বন করেই রচিত।

এডুইন আর্নল্ড লিখেছিলেন কাব্য আর গিরিশচন্দ্র লিখেছেন নাটক। কাব্য ও নাটকের মধ্যে প্রকরণগত পার্থক্য আছে। কাব্যে সকল বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা সম্ভব—মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুযোগও যথেষ্ট, কিন্তু নাটকে সে সুযোগ সঙ্কুচিত কারণ সাধারণভাবে নাটকে ঐক্য রক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। জীবনী নাটকে স্থান-কাল-ঘটনা ঐক্য সর্বত্র রক্ষা করা সম্ভব না হলেও ঘটনাসূত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করে তোলা প্রয়োজন। তাই নাটকে কাব্যের বা জীবনের সমগ্র ঘটনাবলীকে দৃশ্যায়িত করা সম্ভব হয় না। এই গ্রহণ-বর্জনের উপর নাট্যকারের কৃতিত্ব ও নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। 'লাইট অব এশিয়া'য় বর্ণিত যাবতীয় ঘটনা দৃশ্যায়িত করলে নাটক দীর্ঘায়ত, সংযোগহীন এবং শ্লথগতি হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। অথচ প্রয়োজনীয় দৃশ্যবর্জন নাটকের বক্তব্য পরিস্ফুটনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসাবে নাটকের একটি দৃশ্যের উল্লেখ করি। বুদ্ধের বৈরাগ্যগ্রহণের পটভূমিকা পূর্ব-নির্মিত্তের ঘটনাগুলি নাটকের পক্ষে আবশ্যিক। আর্নল্ড বুদ্ধের সম্মুখে বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, মৃত ও ভিক্ষুকে উপস্থিত করেছেন পর পর চারদিনে। প্রথম দিনে মানবজীবনে জরার প্রভাব দর্শনের পর সিদ্ধার্থের মানস বৈরাগ্য বিকশিত করেছেন পরবর্তী রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দর্শন পর্যন্ত। এইভাবে বিস্তৃত হয়েছে চারদিনের কাহিনী। গিরিশচন্দ্র জরাগ্রস্ত, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষুকে দেখিয়েছেন একটি নগরভ্রমণ দৃশ্যে, কারণ চারটি স্বতন্ত্র দৃশ্যে কাহিনী বিস্তৃত হলে নাটকের গতি ব্যাহত হত। চারটি দর্শনের মধ্যবর্তী সময়টুকু নাট্যকার ব্যবহার করে-ছেন সারথি ছন্দকের সঙ্গে সিদ্ধার্থের সংলাপে—মানসিক অবস্থা উদ্ঘাটনে। আবার গিরিশের সৃষ্ট চরিত্র নালক ও শ্রীকালদেবের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিষ্ণুর বুদ্ধরূপে অবতরণের সংবাদ নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। নাটকে বিভিন্ন রসের উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে। দর্শকের জন্যই মাঝে মাঝে হাস্যরস সৃষ্টির দ্বারা বৈচিত্র্য সম্পাদন

দরকার। সুতরাং 'লাইট অব এশিয়া'র যার সম্ভাবনামাত্র নেই সেই 'রিলিফ' দৃশ্যও নাটকে সংযোজিত হয়েছে।

এইসব বাহ্যিক পরিবর্তন ছাড়াও এই নাটকে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটেছে যা একান্তভাবে নাট্যকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত এবং এইগুলির গুরুত্বই সমধিক। নাট্যকারের কাল, নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নাটকের বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাট্যসাহিত্যে প্রবলভাবে আত্ম-প্রকাশ করেন তখন সাহিত্যে হিন্দু-পুনরুজ্জীবন-বাদের ভরা কোটাল। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকেই আমাদের পাশ্চাত্যমুখী মন ক্রমশঃ দেশীয় ঐতিহ্যমুখী হতে থাকে এবং হিন্দু-পুনরুজ্জীবন চেতনা সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছে বাঙলা সাহিত্য এদিক থেকে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যেমন সেই শক্তিতে বেগ সঞ্চার করেছে তেমনি তাঁর অসীম মানবতাবোধ, অন্য ধর্মমত সম্পর্কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সমন্বয়চেতনা এক নতুন ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে। ফলে সমগ্র সমাজেই নবচেতনা প্রসারিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র রাম-কৃষ্ণের কাছে আশ্রয়লাভ করেছেন আবার দর্শকের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাও তাঁর সুবিদিত। সেই পটভূমিকায় যখন তিনি 'বুদ্ধদেব চরিত' রচনা করেছেন তখন তা 'লাইট অব এশিয়া' অবলম্বনে রচিত হলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ হলেও তা 'লাইট অব এশিয়া'র নাট্যরূপে পর্যবসিত হয়নি। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী বক্তব্য নিয়ন্ত্রিত করেছে। সূচনা অংশের দিকে দেখা যাক। বুদ্ধ ইতিপূর্বে একাধিকবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর নবজন্মের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন আর্নল্ড:

Thus came he to be born again
for men
And our Lord Buddha, waiting
in the sky
Came for our sake, the five sure
signs of birth
So that the Devas knew the sign
and said
Buddha will go again to help
the world.

এখানে বুদ্ধেরই পুনর্জন্মের কথা, অবতার-বাদকে সমর্থন করে না। হিন্দুমতে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণু। জয়দেব বর্ণিত দশাবতার অন্যতম বুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণু।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং,
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,—জয় জগদীশ হরে

গিরিশচন্দ্র ভূমিকা অংশে অনুসরণ করেছেন জয়দেবকে। সূচনায় দৃশ্যটি গোলোকের, সেখানে লীলাকমল হস্তে বিষ্ণু আসীন—সম্মুখে করজোড়ে মূর্তিমতী দয়া নিবেদন করছেন:

হৃদিপদ্ম হতে প্রভু সৃজিলে আমারে
সৃষ্টিকর্তা সনাতন।···
এতদিন ছিল না যন্ত্রণা
এবে প্রভু দারুণ তাড়না।···
যে ব্রাহ্মণ করিতে স্থাপন
বার বার কলেবর করেছ ধারণ
হৃদয়ে যাহার বিকাশ আমার
বিরোধী তাহারা সবে।
নরে দেয় যুক্তি, আছে শাস্ত্রের উক্তি
দেবভক্তি-বলিদানে!
নিত্য দেবার্চনে
মরে কোটি কোটি প্রাণী···
ধর্মছলে জীবের সংহার···
নিষ্ঠুর ব্যাভার প্রচার ধরণীতলে।

বিষ্ণুর আশ্বাসবাণী :

জানি সতি,
বসুমতী তাপিতা নরের তাপে।
চিন্তা কর দূর
ধরি পুনঃ নরের আকার
নরসহ করিব বিহার…
অবতীর্ণ হব আমি।
দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী পরে
যাহে হিংসা ত্যজে পন্থাহীন নরে।

হিন্দুশাস্ত্রসম্মত অবতারবাদ এবং জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের প্রভাব এই দৃশ্যে বিষ্ণুর সংলাপের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

প্রলয় পয়োধিজলে সৃষ্টি আবরিত
প্রলয় গর্জনে প্রলয় তরঙ্গ উঠে
লয়কারী বহে মহানীর।…
মহাজলে খেলি কুতূহলে
ধরি ভীম মৎস্য কলেবর
আলোড়িত প্রলয় সাগর…
প্রলয়ে উপেক্ষা করি
মীন দেহে করি, শুভে, বেদের উদ্ধার

এইভাবে বিষ্ণুর নয়টি অবতরণ বর্ণিত হয়েছে, তাঁর নিজের উক্তিতে। বিষ্ণুর আত্মকথনে গিরিশের অদ্বৈতবাদী চিন্তার পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত :

একা আমি, নাহি অন্য জন ;
ব্যোম, সমীরণ, সলিল, স্থল
আমিই সকল
মায়ারূপে নানারূপে করি কেলি।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান
আমি মনপ্রাণ, আমি দয়া,
আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত, আমিই ঈশ্বর
বাসনায় হের চরাচর।
অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম আমি
বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে।

বুদ্ধজীবনী ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে জানা যায়, তথাগত বুদ্ধের জন্মের পূর্বে তিনি পাঁচশত বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কপিলাবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থরূপে তাঁর শেষ জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও নির্বাণ। আর্নল্ড এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও হিন্দু অবতারবাদ সেখানে অনুপস্থিত। যে বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বিশ্বাস পোষণ করেননি তিনিই গিরিশনাটকে পৌরাণিক দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে বৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত করার জন্য স্বয়ং মহাদেব মর্ত্যধামে নেমে এসেছেন, বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত ও সন্ন্যাসীর বেশ ধরে। সুতরাং 'বুদ্ধদেব চরিত' সাধারণ জীবনীনাটক নয়—প্রচ্ছন্ন পৌরাণিক নাটকও। [ক্রমশঃ]

…বুদ্ধ। পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই। সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন : বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ



ভগবানলাভের তাৎপর্য

স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। গত ৪ জুন, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসামের হোজাই রামকৃষ্ণ আশ্রমে ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন,—প্রবন্ধটি তারই অনুলিপি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। আমরাও প্রায়শঃ ঈশ্বরলাভ, ভগবানলাভ কথাটা বলি। তার মানে তিনি আমাদের কাছে লব্ধ নন, তাঁকে লাভ করতে হবে। তার উপায় হিসাবে শাস্ত্রের বা গুরু-নির্দেশিত পথের অনুসরণ করতে হবে। শাস্ত্র বলছেন, ভগবানের নামগুণগান ভক্তিলাভের একটি উপায়। ভাগবতে (১১।২।৪০) আছে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

—ভগবানের নামকীর্তন ব্রত বলে যে ব্যক্তি গ্রহণ করেছে তার নাম করতে করতে নামে অনুরাগ জন্মায়। সেই অনুরাগের ফলে তার অন্তর গলে যায়। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে হাসে কাঁদে নাচে গায়, লোকে কি ভাববে তার অপেক্ষা রাখে না।

ঠাকুরও বলেছেন, ভগবানের নামগুণকীর্তন ভক্তিলাভের একটি উপায়। তিনি আরও বলেছেন, তার দ্বারা বন্ধনমুক্তি হয়। কিন্তু কি করে হয়? যদি কোন এক বস্তু দূরে থাকে তার নামকীর্তন করলেই সেই বস্তু আমাদের হাতের মধ্যে এসে যাবে? তা তো হয় না। তাহলে ভগবানের গুণকীর্তন করলেই তিনি আমাদের কাছে এসে যাবেন কেমন করে? আর তাঁকে পাওয়াই বা কেমন করে হয়? যিনি সর্বব্যাপী, আমাদের অন্তরে বাইরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁকে তো আমরা সর্বদা পেয়েই আছি। গীতায় আছে—'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।'—এ জগতে স্থাবর জঙ্গম এমন কোন বস্তু নেই যা আমি ছাড়া। 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্' —ঐ আত্মা সর্বত্র, সর্ববস্তুতে। তা ভগবান যদি আমাদের ভিতরে থাকেন, বাইরেও থাকেন, সর্বত্র যদি ওতপ্রোত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে আর আমরা লাভ করব কি? যে বস্তু নেই তাকে পাওয়াই তো লাভ করা। অতএব আমরা কথায় কথায় যে বলি ঈশ্বরলাভ, ভগবানলাভ, কিন্তু কথাটার তাৎপর্য আমরা হয়তো ভাল করে ভেবে দেখি না, ভাবি না, ভগবানলাভ করা মানে কি? এই প্রশ্নটি আমাদের প্রত্যেকের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। কাকে বলে ভগবানলাভ করা? কে কাকে লাভ করছে, কেমন করে করছে? ভগবান বস্তুটি কি? প্রশ্নগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জড়িত।

ভগবানের অবস্থান কি কোন সুদূর স্বর্গলোকে? গোলোক বৈকুণ্ঠ শিবলোক কি সুরলোকে গিয়ে তাঁকে পেতে হবে? সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। যা সুদূর তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি স্পষ্ট এবং সঠিক হয়? যেমন, দূর থেকে চাঁদ দেখে আমরা মুগ্ধ হই, তার সৌন্দর্য বর্ণনায় কবিরা উচ্ছ্বসিত; সুন্দর মুখের উপমা চাঁদ। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে গিয়ে কোন সৌন্দর্যের সন্ধান পাননি। তাঁরা বলছেন, তার চেয়ে পৃথিবী অনেক সুন্দর। তৃণ তরুলতা পশুপক্ষী কিছু নেই সেখানে, একেবারে মরুভূমি। কবিরা কল্পনা করেন চাঁদ থেকে সুধা বর্ষণ হচ্ছে। কোথায় সুধা, কোথায় কি?

এক বিন্দু জলও নেই। এইরকম দূর থেকে আমরা যে জিনিসের কল্পনা করি তার সম্বন্ধে জ্ঞান অস্পষ্ট থাকে। ভগবানলাভও আমাদের কাছে ঐরকম বস্তু নয় কি? আলেয়ার মতো—যত কাছে এগিয়ে যাওয়া যাবে, তত দূরে সরে যাবে? এ-প্রশ্ন শুধু অবিশ্বাসীর নয়, বিশ্বাসী লোকের মনকেও মাঝে মাঝে নাড়া দেয়। তাই এ-সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল।

প্রথমে চিন্তা করে দেখা যাক অবতার বা ভগবান মানে কি? ভগ মানে ঐশ্বর্য—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীং গণা॥
(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৪)

—প্রভুত্ব বীর্য যশ সৌন্দর্য জ্ঞান বৈরাগ্য আদি সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যিনি তিনিই ভগবান। ভগবান সম্পর্কে রামানুজের বর্ণনা অতি সুন্দর—'অশেষ-কল্যাণগুণসম্পন্নঃ নিখিলহেয়গুণবর্জিতঃ'—সমস্ত কল্যাণগুণ যেখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, অবগুণের লেশমাত্র নেই—তিনিই ভগবান। ভগবান সম্পর্কে মানুষের এই কল্পনা। এ-ভগবানকে কে বিচার করবে, কে জানবে যে তিনি ভগবান? ভক্ত বিচার করবে। কেমন করে? তার হৃদয় দিয়ে। তার হৃদয় একটি দর্পণ; সেই দর্পণে সর্বব্যাপী তত্ত্ব শুদ্ধ মনোজ্ঞরূপে প্রতিফলিত হবেন। ভক্ত তার মন দিয়ে, অন্তঃকরণ দিয়ে তাঁকে অনুভব করবে। যাঁরা অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন, শ্লোকের পর শ্লোকে, পাতার পর পাতায় তাঁর বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করি। আমাদের এই ধারণা যে পরিস্ফুট, পরিষ্কার, তা নয়। ভগবান আমাদের অন্তরে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছেন, ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে একটি পূর্ণ বস্তু নন, ক্রমশঃ প্রকাশমান বস্তু। যত হৃদয় শুদ্ধ হবে, সেই শুদ্ধ হৃদয়ে তত ভগবানের শুদ্ধ রূপের ধারণা হবে, তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবেন। আমাদের ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে, ভগবান পরিবর্তিত হচ্ছেন না। স্বামীজী বলছেন, যদি আমরা এখান থেকে সূর্যের একটা ছবি নিই, আবার প্রতি হাজার মাইলের ব্যবধানে এক একটি করে ছবি নিই, তাহলে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন ভিন্ন হবে। সব ছবিই সূর্যের, কিন্তু কোনটা নিখুঁত নয়। নিঁখুত না হবার কারণ, যে-যন্ত্র দিয়ে ছবি তুলছি, তার শক্তি সীমিত। তাই সূর্যের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় ছবিগুলি বদলে যায়। সূর্য অপরিণামী তা আমরা গোড়াতেই ধরে নিয়েছি। তার পরিবর্তন হয় না, আমরা যে তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছি তার কারণ আমাদের দেখার শক্তির পরিবর্তন ঘটছে। ঠিক এই রকম যত আমরা ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর দিকে এগোব তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা বদলে যাবে।

আমাদের হৃদয়মুকুরে ভগবানের যে প্রতিচ্ছবি আমরা ধারণা করছি সেই প্রতিচ্ছবির ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ যখন তাঁকে ধারণা করে তার মানবিক বুদ্ধিমতো ধারণা করে। অসীম অনন্ত নির্বিশেষ নিরাকার নির্গুণ এ-কথাগুলির ধারণা মানুষ করতে পারে না, সে কখনও এমন বস্তু দেখেনি। মানুষের দৃষ্টি সীমিত। কল্পনা আর একটু দূরে যায়, কিন্তু তাও সীমিত। ভগবান সীমিত নন। তাই তাঁকে যখন সর্বব্যাপী অনন্ত ইত্যাদি বলি তার মানে আমাদের মন বুদ্ধি তা অতিক্রম করে যায়। মন দিয়ে যাকে ধারণা করা যায় না, তাকে বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধারণা করা সম্ভব নয়। স্বামীজী বলছেন, 'দর্ব্যা বিধর্ত্তুম্ ইব যানি জগৎ

বিধাত্রীম্।'—সমগ্র জগতের যিনি ধাত্রী আমরা সেই জগজ্জননীকে শিশুর মতো ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করছি। ঐ দুটি ছোট হাতই যে শিশুর সম্বল, তাই দিয়ে সে মাকে ধরতে গেলে দোষ দেওয়া যায় না। ভক্তও তেমনি বুদ্ধির অগম্য যে ভগবান, তাঁকে সে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে ছোট দুটি অপুষ্ট দুর্বল হাত দিয়ে ধরতে যায়। এ প্রয়াস নিষ্ফল তবু হাস্যকর বলা যায় কি?

তাহলে ভগবানকে আমরা কি করে জানব? তার উত্তরে সাধুরা বলেন, 'চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তার বোধের সীমানা।' মানুষের বুদ্ধিতে কোন তত্ত্ব যতটুকু প্রতিভাত হয় ততটুকুই সে বুঝতে পারে। সমগ্র ভগবানকে আমরা বুঝতে পারব, ধরে ফেলব—এরকম কোন দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের থেকে লাভ নেই, আমরা তাঁকে ধরতে পারব না। তাঁর সম্পর্কে কোন সর্ববাদিসম্মত ধারণাও নেই। যেহেতু মন ভিন্ন ভিন্ন, ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের দেবতা তেত্রিশ কোটি, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের জন্য একটি করে দেবতা হলে আমি খুশি হব। দেবতা মানে পূর্ণতার আদর্শ। আমার পূর্ণতার আদর্শ যেখানে রূপ নিয়েছে সেটি আমার দেবতা।

আরও একটি কথা ভাববার। ভগবানকে পেয়ে আমার কি লাভ হবে? আমি কি অনন্ত জীবন পাব? 'অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব' (কঠোপনিষদ্, ১।১।২৭)—জীবন যত দীর্ঘই হোক অনন্তকালের তুলনায় বিন্দুমাত্র। কেউ ৭০।৮০ কি ১০০ বছর বাঁচব। তারপর? তাহলে ভগবানকে পেয়ে আমাদের কি সিদ্ধিলাভ হবে? আমরা এরকম ভাবি বা বলি তার কারণ আমরা ভগবানলাভ বলতে মনে করি কোন অলৌকিক শক্তিলাভ করব। কিন্তু ভগবানলাভ একটা অদ্ভুত কিছু জিনিস নয়। সেটি আমারই একটি পরিবর্তিত অবস্থা। ভগবান সম্পর্কে মানুষের যা শ্রেষ্ঠ ধারণা, সেই ধারণাটি চিন্তা করতে করতে সে যখন সেই রূপেতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলে ভগবানলাভ। ভগবানলাভ মানে বাইরে থেকে কোন একটা জিনিস পাওয়া নয়। তিনি আমাদের অন্তরেই রয়েছেন, অথচ তাঁকে ধরতে পারছি না আমাদের রাগদ্বেষ কামনাবাসনাদির জন্য, আমাদের অশুদ্ধি সংকীর্ণতার জন্য। এগুলিই আমাদের চিত্তমুকুরকে মলিন করে রেখেছে। এই মুকুরটি যখন শুদ্ধ হবে তখন তাতে ভগবানের শুদ্ধরূপ প্রতিফলিত হবে। ঠাকুরের কথা, শুদ্ধ মন যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তাই। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তারই উচ্চস্তরের রূপ শুদ্ধ বুদ্ধি। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে, আমাদের ভিতরকার এই মলিনতা অপবিত্রতা নিঃশেষে দূর হয়ে গেলে তিনি আর আমি কোন পার্থক্য থাকবে না। 'তখন আমার "আমি" থাকবে না কেবল তিনিই থাকবেন'—ঠাকুর এইভাবে বলেছেন। ভগবান যেমন অসীম আমাদের হৃদয়টি যা এখন ক্ষুদ্র 'আমি'-র দ্বারা খণ্ডিত সেই হৃদয়টিও অসীম—'যাবান্ এব বহিরাকাশঃ তাবান্ এব অন্তরাকাশঃ'—এই বাহ্য আকাশ যত বড় অন্তরাকাশও তত বড়। এই 'আমি' যা আমাকে ক্ষুদ্র করে রেখেছে, ভগবান থেকে পৃথক করে রেখেছে, জন্মমৃত্যুর অধীন নশ্বর করে রেখেছে সেই 'আমি'টি যখন চলে যাবে তখনই ভগবান লাভ হবে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' উপনিষদ্ (কঠ, ২।১।১৫) বলছেন—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥

—নির্মল জল যেমন নির্মল জলরাশিতে পড়লে একরসত্ব প্রাপ্ত হয় একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও তেমনি পরমাত্মায় একীভূত হয়

এখন পৃথক আছি কেন? যে আমি আমার মলিনতা দিয়ে ঘেরা এতটুকু বিন্দু সেই বিন্দু সিন্ধুতে মিলিত হতে পারছে না। মলিনতাটা দূর হয়ে গেলে সে সিন্ধুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাবে। পরিবর্তন হতে হতে যখন আর পরিবর্তন করবার অর্থাৎ কোন অশুদ্ধিকে বাদ দেবার থাকবে না, পূর্ণশুদ্ধ হব তখন আমাদের ভগবানলাভ হয়েছে বলব। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন—'উপগম্য আসনং চিন্তনম্'—এরই নাম উপাসনা। তাঁর কাছে গিয়ে অর্থাৎ তাঁর স্বরূপকে কল্পনা করে তাঁকে চিন্তা করা। চিন্তা করতে করতে যে জীব ক্ষুদ্র সে অনন্ত হয়ে যাবে, যে অপবিত্র সে পবিত্র হয়ে যাবে। ঠাকুর যেমন বলেছেন, 'আরশুলা কুমোরে পোকাকে চিন্তা করতে করতে কুমোরে পোকাই হয়ে যায়।' স্বামীজীও বলেছেন, 'ভূত চিন্তা করতে করতে ভূত হয়ে যায়, আর ভগবান চিন্তা করতে করতে ভগবান হয়ে যাবে।' এইজন্য শাস্ত্র বলেছেন, সব সময় তাঁর চিন্তা কর, তাঁর নাম কর—সর্বদা তাঁকে মনের ভিতরে ধরে রাখ। জপ ধ্যান যতরকম সাধনা শাস্ত্রে বলেছে, যে কোন ধর্মে যত সাধনের কথা বলা আছে সবই এই।

এইভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরিণামে কি হবে, ভেবে লাভ নেই। শেষের কথাটা তুমি আগে কি করে ধারণা করবে? কোথায় গিয়ে চলার বিরাম হবে তা তুমিও জান না, যাঁরা তোমাকে বলছেন তাঁরাও জানেন না। শাস্ত্র প্রত্যেকের জন্য একটা পথ নির্দেশ করেছেন। সেই পথটা পরিষ্কার করে দেখ, তারপর যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখান থেকেই এক পা এক পা করে চলতে থাক। 'চরৈবেতি' শাস্ত্র বলছেন, এগিয়ে চল। চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে দেখবে আর চলার দরকার নেই, যা পাবার সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে, অপ্রাপ্ত কিছু নেই। চলার শেষ সেখানেই। সেটি কোথায়? না, তোমার আত্মায়। সেই তোমার আত্মাকে তুমি ভগবান বল, দেবতা বল, যা ইচ্ছা বল। সব ধর্মই বলছে ভগবানকে হৃদয়ে দেখ, সেখানেই তাঁকে পাবে। অনেকে বলেন, অত করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? এক লাফে কৈলাসের চূড়ায় উঠতে পারি না কিন্তু যেখানে আছি সেখান থেকে একটা পা কি বাড়াতে পারি না? ঠাকুর বলছেন, ছাদে উঠতে হবে, সিঁড়িগুলোর প্রত্যেক ধাপে পা দিয়ে তবে তো ছাদে যাব। যেখানে আছি সেখান থেকে এক পা বাড়ালাম তারপর আর এক পা। এমনি করে ক্রমশঃ তাঁর দিকে এগিয়ে যাব। আর এগিয়ে যাচ্ছি কিনা তা বুঝবার উপায় কি, কষ্টিপাথর কি, ভাগবত (১১.২।৪২) তা বলছেন—

> ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
> রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
> প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
> স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

—একজন হয়তো দু-তিনদিন ধরে খেতে পায়নি, এই অনাহারের জন্য তার খিদের কষ্ট আছে, মনে অসন্তোষ আছে, শরীরে দুর্বল বোধ হওয়া আছে। তাকে খেতে দিলে সে যখন একটু একটু করে খাচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাস খেতে খেতে তার খিদের কষ্ট দূর হচ্ছে, মনের অসন্তোষ কেটে যাচ্ছে এবং সে শরীরে বল পাচ্ছে। এই তিনটি একসঙ্গেই হয়, একটি একটি করে হয় না। এইরকম ভগবানের যারা শরণাগত হয় তাদের শরণাগতি যে পরিমাণে সেই অনুসারে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এবং ভগবান ছাড়া অন্য জিনিসের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, আর ভগবান সম্বন্ধে তার বিশ্বাস, ধারণা স্পষ্টতর হয়। এই জিনিসটি আমাদের মনে রাখতে হবে। অনেক সময়ে

আমরা ভগবানের নামে কেঁদে আকুল হই, কিন্তু সেই চোখের জল যদি আমাদের মনের মলিনতা ধুয়ে না দেয়, স্বভাবকে না বদলায়, যদি আমাদের অন্তরকে পবিত্র না করে, আচরণকে শুদ্ধ না করে, তাহলে এগুলি অনর্থক বলে বুঝতে হবে। চোখের জল দিয়ে হয়তো একটা প্রশান্ত মহাসাগর সৃষ্টি করব, কিন্তু আমরা যা আছি তাই-ই থাকব। অপরকে বিচার করা নয়, নিজেকেই বিচার করে দেখতে হবে। যখন দেখব আমার ভগবানের জন্য যেমন চোখের জল পড়ছে, বিষয়ের জন্যও সেই রকম চোখের জল পড়ছে, তাহলে বুঝতে হবে এই চোখের জল ভগবানের জন্য নয়। প্রকৃত ভগবানকে ভালবাসলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি সেই পরিমাণে কমে যাবে। ঠাকুর বলছেন, যে পূর্বদিকে যত এগোবে সে পশ্চিম থেকে তত দূরে যাবে। আমরা ভগবানের দিকে যত এগোব ততই আমাদের অধোগামী বৃত্তিগুলি কমে যাবে, মন শুদ্ধ হবে, অশুভ কোনও চিন্তা উঠবে না। যার তা হয়েছে তার দ্বারা কারও অকল্যাণ হবে না, জগতের পক্ষে সে আশীর্বাদস্বরূপ হবে। ভগবানকে আমরা যেভাবে কল্পনা করি আমাদের ভিতর ধীরে ধীরে সেই গুণগুলি বাড়বে। এরই নাম ভগবানলাভ।

একজন স্বামীজীকে একখানা ছবি দেখিয়ে বলছেন, বলুন তো ইনি অবতার কিনা? স্বামীজী একটু হেসে বললেন, বাবা, একটু ভাল করে খেও। না খেয়ে খেয়ে তোমার মাথাটা শুকিয়ে গেছে। ছবি দেখে বলতে হবে তিনি অবতার কি না? কি দেখে বলব? চরিত্র দেখে বলব, জীবন দেখে বলব। তিনি কত শুদ্ধ পবিত্র, তাঁর জীবনের দ্বারা কত লোকের কল্যাণ হল, এইগুলি হল মাপকাঠি, দেখবার জিনিস। ঠাকুর বলছেন, ও তো তোমরা করবে না, কেবল অবতার, অবতার করে আমাকে বাড়াবে। পরিহাস করে বলছেন, এরা অবতারের কি বোঝে? কেউ থিয়েটার করে, কেউ ডাক্তার। অবতার বলায় ঠাকুর প্রসন্ন হননি। বলেছেন, আগে হৃদয়-মুকুরকে শুদ্ধ কর, তারপর তার উপর যে পূর্ণ আদর্শের প্রতিফলন হবে, তাকে বলবে ভগবান। আর তারই যেখানে মানুষের ভিতরে অভিব্যক্তি, তাকে বলবে অবতার।

ঠাকুরকে যে আমরা অবতার বলি তার মানে কি? তাঁর দাড়ি আছে বলে? হাতখানা এমনি করে রেখেছেন বলে? না, ঐরকম রোগে শীর্ণ হয়েছেন, কত কষ্ট ভোগ করেছেন সেজন্য তিনি অবতার? আমাদের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর জন্ম হল, মৃত্যু হল, রোগযন্ত্রণা ভোগ হল, শোকে কষ্ট পেলেন। অবতার হলে যদি এই কষ্ট, তাহলে সে অবতার দিয়ে কি কাজ হবে? আমরা কি সেই অবতারের চিন্তা করে রোগ শোক জরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারব? পারব না। তার কারণ, অবতার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে কলহ করি, তোমার ভগবান সত্য, না আমার ভগবান সত্য? কালী বড়, না কৃষ্ণ বড়? শিব বড়, না বিষ্ণু বড়? কৃষ্ণ মানেও বুঝি না কালী মানেও বুঝি না। কতকগুলি কল্পনা নিয়ে বিবাদ করি। বিভিন্ন দেবতার উপাসক সকলেই তাদের দেবতাকে পরমেশ্বর বলছে। পরম মানে শ্রেষ্ঠ। যদি একাধিক হয় তাহলে পরমেশ্বর হতে পারে না। কাজেই পরমেশ্বর যখন বলছি, তার মানে আমি যা ধারণা করেছি তারই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ যা সেই তাঁকেই বলছি। আর একজনও তাঁরই কথা বলছে। মুকুরগুলি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সেই মুকুরগুলিতে যার ছবি পড়ছে সেই বস্তুটি এক। যেমন আগে বলেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে সূর্যের ছবি নিলে বিভিন্ন রকম দেখব। ঠিক সেইরকম একই পরমেশ্বর তাঁকে

আমাদের বিভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টি, বিভিন্ন ঐতিহ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেখি। এতে কোনও দোষ নেই, এটাই স্বাভাবিক।

আমি যখন আমার আদর্শকে আমার মনের মধ্যে একটা ধারণা করতে চেষ্টা করি, সেই আদর্শকে না পাওয়া পর্যন্ত সেটি কল্পনা। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি সেই আদর্শতে যখন পরিণত হয়ে গেলাম, তখন সেটি আর কল্পনা রইল না, সেটি বাস্তব। সবচেয়ে বড় বাস্তব সেইটিই, যার আর কখনও পরিবর্তন হবে না। কাজেই কল্পনা যদি শুদ্ধ কল্পনা হয় তাহলে সেই কল্পনা মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এইটিই হল কল্পনার সার্থকতা। আমরা যতই নিচ হই না কেন, যতই অধঃপতিত হই না কেন প্রত্যেকেরই একটা কল্পনা, একটা আদর্শ আছে, যে আদর্শকে আমরা শুদ্ধ করতে করতে আদর্শেরও পরিবর্তন হচ্ছে, আমারও পরিবর্তন হচ্ছে। ভাগবতে আছে যে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বনের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। খুঁজতে খুঁজতে বললেন, সখি, এখানে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণগন্ধ মানে ভগবানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো নয়, সেখানে আস্বাদন আছে, অনুভব আছে। হতে পারে অনুভব অস্পষ্ট তবু সেই অনুভব শক্তি প্রেরণা দেবে, লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যদি আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাই, লক্ষ্যকে ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে থাকি, তাহলে আমি যতই অপবিত্র হই না কেন, আমার ধারণা যতই অসম্পূর্ণ হোক ক্রমশঃ তা সম্পূর্ণ হতে বাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত চরম আদর্শে পৌঁছব।

ঠাকুর বলেছেন, বিভিন্ন মত পথ গিয়ে এক লক্ষ্যেতে পৌঁছবে। অনেক সময় মন্তব্য করা হয়, ঠাকুর কি সব মত দেখেছেন, সব পথ দিয়ে চলেছেন? কিন্তু হাঁড়িতে যে ভাত হয়, তার সবগুলিই কি টিপে দেখতে হয় সিদ্ধ হয়েছে কি না? বিভিন্ন জনের কতকগুলি অনুভবের ভিতর দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত আমরা করি সে সিদ্ধান্তটি কি হাস্যকর? ঠাকুর তাঁর অনুভবের ভিতর দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, আমরা মনকে যত শুদ্ধ করব, মন সেই শুদ্ধতর বস্তুকে ধারণা করতে পারবে। বিজ্ঞানও এইরকম কথা বলে। বৈজ্ঞানিক যখন গবেষণা করেন তখন নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন প্রবণতা যেন গবেষণাকে ব্যাহত না করে। আমাদের শাস্ত্র বলেন, ভগবানকে যখন চিন্তা করবে রাগদ্বেষশূন্য হয়ে চিন্তা করবে। রাগদ্বেষ-শূন্য হওয়া মানে মনের মলিনতা না থাকা, আমরা যেমন যেমন ভগবানের পথে যাব তেমন তেমন তাঁর সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে। অন্য কথায় বলতে গেলে আমাদের অন্তর শুদ্ধ হবে। সেই শুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিফলন হবে। যীশুখ্রীষ্ট এক জায়গায় বলেছেন, যতক্ষণ না তুমি তোমার ভগবানের মতো শুদ্ধ হবে ততক্ষণ তাঁকে দেখতে পাবে না। এ-কথা সত্যই; আমরা ভগবানকে তখনই দেখব যখন আমরা তাঁর মতো শুদ্ধ হব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অভিজ্ঞতা নিজ জীবনের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে তা এত স্পষ্ট করেছেন যে, আমরা চিন্তা করলে অনায়াসে বুঝতে পারব। তবে সকলেই যে চিন্তা করবে বা করতে পারে তা নয়, তবু যার যেমন সাধ্য করবে এবং তা না করলেও যারা চিন্তাশীল তারা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়।

আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে উপাসনা করব, আমরা ভাবব তাঁর শুদ্ধি, পবিত্রতা, তাঁর সর্ব-বাসনাশূন্যতা, ত্যাগময় জীবন, ভগবানের ভাবেতে তন্ময়তা। এইগুলি সব ভাবতে হবে। এইগুলি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ। এইজন্য তাঁর চরিত্র যত আলোচনা করব, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তত শুদ্ধ হবে; ফলে আমাদের চলার পথটা বুঝতে

পারব। কিন্তু যদি তাঁর নাম করি আবার যেমন খুশি জীবনযাপন করি, তাহলে নিজেকে বঞ্চনা করা হবে, লক্ষ্যের দিকে যাওয়া হবেই না। বাজেই সতর্ক হয়ে থাকতে হবে এবং যতটুকু আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পারি তাঁকে জানবার চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুরও বলেছেন, যাকে ভক্তি করবি তাকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি? স্বামীজী তাঁকে শুদ্ধ, পবিত্র, করুণার মূর্তি বলেছেন। এই-রকমভাবে তাঁকে জানব, ভাবব। ভাবতে ভাবতে আমাদের ভিতর সেইরকম বাসনামুক্তি, জীবের প্রতি করুণা, একাত্মতাবোধ এইগুলি সব হবে। এ-সব হলে ভগবানের দিকে এগোচ্ছি বুঝতে পারব আর তার জন্তেই নামকীর্তনাদি। কিন্তু নাম যখন করব তখন নাম আর নামী অভিন্ন, নামের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রয়েছেন এ-কথা যেন মনে রাখি এবং নাম করার পরে প্রতি পদে যেন আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। ঠাকুর বলেছেন, এত নাম করে আর বলে পাপী। আমরা বার বার ভগবানের নাম করছি আর বলছি পাপী। তার মানে ভগবানের নাম আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করতে পারছে না। তাহলে আর কিসে শুদ্ধ হব? এজন্ম ভগবানের নাম যখন করব তখন তাঁর স্বরূপকে ভাবব যতটা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে এবং ভাবতে ভাবতে একদিন সেই আরশুলা কুমোরে পোকা হয়ে যাবে। এ-কথা মনে রাখতে হবে, আমরা তাঁকে চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে যাব, আমাদের এই 'আমি' নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই শুভদিন আমাদের সকলের জীবনে আসুক—এই প্রার্থনা করি।

'নমো নমো নমো গৌরী'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার সাক্রামেণ্টো বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর। নবমী পূজার সকাল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভবনাথ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। নানা ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতেছে।

"দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ঐ ঘরে একটু গল্প করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা। নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। তাঁহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন; সমাধিস্থ!

"ভবনাথ গান গাহিতেছেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না। ইত্যাদি।

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাহিতেছেন—

কখন কি রঙ্গে থাক মা, ইত্যাদি

ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—

বলরে শ্রীদুর্গা নাম।
(ওরে আমার আমার আমার মন রে)।
নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণি!
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি। ইত্যাদি।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৭।২)

'নমো নমো নমো গৌরী' গানটিতে ৩৪টি লাইন

আছে—বেশ লম্বা গান, স্তোত্রও বলা যাইতে পারে। এই গানটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এত প্রিয় ছিল কেন? কেননা, তাঁহার নিজের জীবন-সাধনা, ভাব এবং শিক্ষা পুরাপুরি না হইলেও অনেকটা বিশেষভাবে এই গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গানটি গাহিয়াই তিনি তাঁহার অনেক কথা যেন ভক্তদের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিতেছেন।

১। জগন্মাতার উপর একান্ত শরণাগতি

ঠাকুর বলিতেন, তিনি কি পাতানো মা? তিনি যে আপনার মা। তাঁর উপর আবদার চলে, জোর চলে। এই আবদার দিয়াই গানটি আরম্ভ। ওগো মা পর্বত-কন্যা গৌরী, তুমিই আবার বৈকুণ্ঠেশ্বরী নারায়ণী—আমি তোমার একান্ত শরণাগত সন্তান, বড় দুঃখী আমি। আমার মতো দুঃখীর উপর তোমার কৃপা যদি বর্ষিত হয় তবেই তো তোমার মহামাতৃত্বের গুণ বুঝিতে পারিব।

আমি যেখানেই থাকি না কেন নিশিদিন মন যেন তোমার রাঙা চরণে থাকে, কৃপা করিয়া এই হতভাগ্যের প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে মা। তোমার অনুগ্রহ ছাড়া কি তোমাতে মন রাখা যায়?

যদি বল, যাও যাও অমন জ্বালাতন করো না, আমার ত্রিভুবন মণ্ডলে কত কাজ তা কি জান না? একটি ব্যক্তির কাঁদুনি শুনিবার সময় কি আছে আমার? তাহার উত্তরে বলি, মা তুমি যদি অমন কথা বল তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব? কাহার কাছে যাইব? মা ছাড়া সন্তানের অন্য কোন্ আশ্রয় আছে? তাহা ছাড়া সুধামাখা মাতৃনাম আর কার আছে? অজস্র নামের মধ্যে 'মা' নামটিই যে সবচেয়ে মিষ্ট।

না মা, 'যাও যাও' বলিলে চলিবে না। যদি বল ছাড়ো ছাড়ো, তোমার ওই বিকৃত ক্লিষ্ট বদন আর দেখিতে চাই না, তাহা হইলে মা, আমি রূপ বদলাইব। হতভাগ্য মনুষ্যদেহ বদলাইয়া অচেতন নূপুর দেহ পরিগ্রহ করিব। তুমি তখন তোমার চরণে আশ্রয় দিবে। তুমি যখন চলা-ফেরা করিবে, শিবের কাছে বসিবে, আমি তখন 'জয় শিব' 'জয় শিব' বলিয়া বাজিতে থাকিব। মনুষ্য-চেতনা নাই বা রহিল। তোমার পাদস্পর্শ তো লাভ হইবে। উহা যে পরম সৌভাগ্য।[১]

২। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। অনন্ত-রূপিণী মা

ব্রহ্ম ও শক্তিতে যে ভেদ নাই ইহা কত ভাবেই না ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে কত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, স্বয়ং তোতাপুরীর সহিত এই লইয়া বাদবিচার করিয়াছেন। অবশেষে একটি দৈবী ঘটনা ঘটাইয়া তোতাপুরীকে ইহা

---

১ নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণি!
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি ॥১
যেখানে-সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে।
নিশিদিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে ॥৬
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে
সুধামাখা তারা নাম মা আর কার আছে ?॥৮
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব ॥৯
যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে।—
জয় শিব জয় শিব বলে বাজিব চরণে ॥১০

মানিতে বাধ্য করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-পাঠকের ইহা অবিদিত নাই। ঠাকুর বলিতেন, ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন তখন তিনি সগুণ। তাঁহাকেই তিনি 'মা' বলেন। সেই মা আবার অনন্তরূপিণী। তাঁহার ইতি করা যায় না। কত রূপেই না ঠাকুর জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। 'নমো নমো নমো' গানটির এই ভাবের ব্যঞ্জক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিশ্চিতই ঠাকুরকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল।[২]

৩। যোগমায়ার শক্তিতে অবতারলীলা

একবার হৃদয়ের সঙ্গে কামারপুকুরে এবং শিওড়ে অবস্থানকালে ঠাকুর নিকটস্থ শ্যামবাজার পল্লীতে গিয়াছিলেন। সেখানে দলে দলে লোক কীর্তন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। দিবারাত্র এই ব্যাপার। ঠাকুরের স্নানাহার বিশ্রামের সময় নাই। সময় নাই অসময় নাই লোক আসিতেছে। কেন আসিয়াছ, কি চাও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না। কে যেন এখানে আমাদের টেনে এনেছে। পুরুষ, নারী, বালক, বালিকা ছোট বড় সব শ্রেণীর জনতা।

ঠাকুর বলিতেন, ঐখানেই যোগমায়ার আকর্ষণ কি তাহা বুঝিয়াছিলেন। যোগমায়া ভেল্কি লাগিয়ে দেন। তাঁহারই শক্তিতে অবতার-লীলার অসম্ভাব্য ঘটনাগুলি ঘটে।[৩]

৪। মায়ের পাবন নাম

ভগবানের নাম-গুণগান করা রূপ ভক্তি-যোগের অন্যতম সাধনাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুব জোর দিতেন। কত ভক্তকে এই সহজ সরল সাধনার উপযোগিতার কথা বার বার বলিতেছেন ইহা আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বহু স্থানে দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের নানা ভাব, নাম ও রূপের ঘনীভূত প্রকাশ ঠাকুরের নিকট তাঁহার 'মা'। 'মা'কে মানা তাই তাঁহার কাছে আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রকাণ্ড ধাপ বলিয়া মনে হইত। কেশবচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্তগণ ঠাকুরের নিকট কিছুদিন আনাগোনা করিয়া তিনি 'মা' বলিতে কি বুঝেন তাহা যখন উপলব্ধি করিলেন এবং নিজদের ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার মধ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাব সংযুক্ত করিলেন তখন ঠাকুর বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের লেখক ও গীতিকার শ্রীত্রৈলোক্য সেন শ্রীভগবানের মাতৃভাবের কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর খুব পছন্দ করিতেন। 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি' এই গানটি শুনিতে শুনিতে তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ার বর্ণনা কথামৃতে আছে।

নরেন্দ্রনাথের মা-কালীকে মানা এবং ঠাকুরের তাঁহাকে 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখানো এবং নরেন্দ্রের সারারাত্রি ঐ গান গাহিয়া মত্ত হওয়ার ঘটনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

---

২ তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ॥২
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাঁশী।
ভুলালি শিবের মন মা হয়ে এলোকেশী ॥৩
দশ মহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার।
কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার ॥৪
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ॥১৫

৩ যশোদা পূজিয়েছিল মা জবা বিল্বদলে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ॥৫

শ্রীরামকৃষ্ণের মা সাকারা আবার নিরাকারা। 'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।/ সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে।' শ্রীরামপ্রসাদের 'মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে' গানটির শেষ লাইন দুটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণের কথা। মায়ের তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধির অগম্য। ঠাকুর বলিতেন, শাস্ত্র শুধু আভাস দেয় মাত্র। মা যে কি তাহা মায়ের উপর নির্ভর করিলে তিনিই যথাকালে বুঝাইয়া দেন। অতএব কর্তব্য মায়ের নাম চিন্তা করিয়া যাওয়া। ব্যাকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিবার চেষ্টা করা।[৪]

৫। ভক্তের ভক্তিডোরে মা বাঁধা

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রিয় গান—'শ্যামা মা কি কল করেছে'। প্রত্যেক মানুষ মায়ের হাতের বিচিত্র কল। মা নিজে চৈতন্যরূপিণী হইয়া মানুষের মধ্যে বসিয়া মানুষকে ঘুরাইতেছেন। অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। জন্মের পর জন্ম সুখ-দুঃখ চক্রে ঘুরপাক খায়। ক্বচিৎ কেহ মাকে আবিষ্কার করে।

'যে কলে জেনেছে তারে,
কল হতে হবে না তারে,
কোনো কলের ভক্তি ডোরে
আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।'
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৬।১)

ভক্তির ডোরে মাকে বাঁধিয়া ফেলা যায় এই প্রসঙ্গটি ঠাকুর বার বার বলিতেন। তখন মা নিজে যেন ভক্তের পুতুল হইয়া যান। শ্রীরামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঠাকুর আরও কত দৃষ্টান্ত দিতেন।

আলোচ্যমান গানটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে জগজ্জননীর প্রতি ভক্তের কতকগুলি অদ্ভুত আবদার বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে হৃদয় অভিভূত হয়।

মা, মৃত্যু যখন আসিবে তখন উহা যেন তোমা হইতেই আসিয়াছে এইটি বুঝিতে দিও। একটি আবদার—আমি মৎস্য হইয়া জলে সাঁতার কাটিব, তুমি মৎস্য-শিকারী পাখি হইয়া আকাশে উড়িবে এবং আমাকে তুলিয়া লইবে। তোমার নখাঘাতে প্রাণত্যাগ বড় ভাগ্যের কথা। উহার ফলে তোমার শাশ্বত পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিব।[৫]

---

৪ যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা বলে ডাকে ॥৭
দুর্গা দুর্গা বলে, যেবা পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায় ॥১৭

৫ চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায় ॥১১
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে ॥১২
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী।
কৃপা করে দিও মা গো রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥১৩
পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী।
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী ॥১৪
গোলোকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী ॥১৬

কিছু ভাবনা, কিছু কথা

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

'পদ্মশ্রী' বিভূষিতা প্রবীণা লেখিকা—জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র, লীলা, সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিতা।

ক্রমশই যেন আমরা বড় দুঃখী হয়ে যাচ্ছি। অনেক অভাব অভিযোগ দৈন্য দারিদ্র্যের মধ্যেও আমাদের কোথাও যেন একটি আনন্দের সঞ্চয় ছিল। সেই সঞ্চয়টুকুকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। দিনে দিনে নিরানন্দের শিকার হয়ে চলেছি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিনগুলি শুরুই হয় একটা গভীর হতাশার অন্ধকার দিয়ে।

সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই মন বিষণ্ণতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কাগজের পাতা ওল্টানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন চোখের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মিছিল।

অথবা 'এগিয়ে' চলে না, একই জায়গায় একটা পঙ্কিল আবর্তে পাক খেতে থাকে!···যেন তার থেকে আর উদ্ধার নেই তার। একই 'দুঃস্বপ্ন' নিয়েই আবার আগামীকাল এসে দাঁড়াতে হবে। সকলেই জানি সেই আবর্তটি হচ্ছে, এ যুগের উত্তরোত্তর বেড়ে চলা লোভ। লোভই সব পাপের মূল। সেই লোভ পাপ অনাচার অবিচার, আদর্শহীন উন্মাদনা, সীমাহীন দুর্নীতি, লজ্জাহীন ক্ষমতালোলুপতা, আর ক্ষমতার মদমত্ততা, এবং পরিণাম-চিন্তাহীন, শুভবোধহীন আত্মবিশ্বাসহীন নেতৃত্ব।

নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাস আর শুভবোধ থাকলে, যুগ এমন বল্গা ছাড়া ঘোড়ার মতো যথেচ্ছ গতি নিত না। নিতে পারত না।

অতএব আমরা যারা নেহাতই জনসাধারণ, যাদের দাম শুধুমাত্র একটি 'ভোট', যাদের একমাত্র প্রার্থনা একটু শান্ত হাওয়া, একটু শৃঙ্খলার ছন্দ, চাওয়াটা খুব বেশি হলে কিছু কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা, তাদের মধ্যে বেড়েই চলেছে হতাশা আর বিষণ্ণতা। কোথাও নেই এ ক্টু আশা আশ্বাসের আলোক-কণিকা।

নতুন সকাল নতুন কিছুই দিতে পারে না অধিক ভয়াবহতা, আর অধিকতর অনিশ্চয়তা ছাড়া। নিরানন্দের ভারের ওপর প্রতিদিনের দৈনিক সংবাদগুলি আরও নিরানন্দের ভার চাপিয়ে চলে। দুঃখ বাড়ায়।

সমাজবদ্ধ মনের চিরকালীন বিশ্বাস, ধারণা সত্যবোধ মূল্যবোধ—এগুলির তো আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, সরে গেছে পায়ের তলার মাটি। তাই দৈনন্দিন জীবনের অভিধান থেকে চিরকালীন শব্দগুলোও দাঁড়াবার জায়গা হারিয়ে ক্রমশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

একদা, 'দিনে দুপুরে ডাকাতি' কথাটা ছিল প্রায় 'বিনামেঘে বজ্রের' মতোই অতর্কিত আতঙ্কের। এখন দিনদুপুরটাই ডাকাতির পক্ষে প্রশস্ত সময়। খুন, জখম, ছিনতাই, ধোলাই, পিটিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা, ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা, সবই সংঘটিত হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে। জনাকীর্ণ রাজ-রাস্তার মাঝখানে।

মানবিকতার এই ধ্বংসদৃশ্যে আজ জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় দর্শক। প্রশাসন নিষ্ক্রিয় দর্শক, 'সত্যের প্রহরী' পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক। 'আমাদের কিছু করার নেই।'

কী করে থাকবে?

টুঁ শব্দটি করলেই তো খুনের মুখ ঘুরে দাঁড়াবে।

জনসাধারণ তো হাতে হাতেই খুন হবে। পুলিশের 'ভবিষ্যৎটি' খুন হবে, আর প্রশাসনের

সাজানো দাবার ঘুঁটিগুলি খুন হবে।

তবে? কে চায় বোকামি করে খুন হতে?

অতএব নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকাই নিরাপদ।

স্মরণাতীতকালে নয়, স্মরণকালের মধ্যেই 'খুন' শব্দটা ছিল একটা গা-শিউরোনো শব্দ। 'নরহত্যা'টা নিতান্তই 'নারকীয়'। সে-সব শৌখিন মনোবিলাসের কথা এযুগে আর ওঠে না।

'শয়ে শয়ে' নয়, হাজারে হাজারে 'হত্যা' 'আত্মহত্যা,' 'আত্মহত্যার নামে চালানো হত্যা,' চলে চলেছে—অবাধে, অব্যাহত ধারায়। তার সঙ্গে চলেছে 'তদন্ত' আর বিচারের নামে এক পরিচিত প্রহসন।

অন্দর থেকে সদরে টেনে নিয়ে আসা হয় গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূর 'অস্বাভাবিক মৃত্যু' রহস্যটিকে। দু-পাঁচ-দশ বছর ধরে চলে ওই 'তদন্তের' নাট্যলীলা, অতঃপর রায়! 'হ্যাঁ, ঘটনাটি আত্মহত্যাই।'

অথবা 'উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া গেল না।'

আর কী করা?

খুন করলে ফাঁসি হয়। অপরাধ করলে সাজা হয়। এসব সেকেলে কুসংস্কার যখন উঠেই গেছে, তখন অপরাধের নায়করা নিজেদের 'হীরো' মনে করে অকুতোভয়ে চরে বেড়াবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

দেখতে দেখতে—চোখ অ-কাতর।

সইতে সইতে গা পাথর।

'মানুষের নাম যে মহাশয়', এযুগ তার বড় সুন্দর প্রমাণ দিয়ে চলেছে।

বাস্তবিকই আমাদের সহনশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখতে দেখতে আমরা নিজেরাই মোহিত হয়ে যাই।

কবে নাকি 'এক পয়সা' ট্রাম ভাড়া বাড়ায় দেশে বিপ্লব এসে যেতে বসেছিল। কে জানে সে কোন্ দেশ!

অবশ্যই এদেশ নয়।

এদেশ আলাদা।

বড় ধৈর্যশীল সর্বংসহা এই দেশ!

এদেশে—মূল্যবৃদ্ধির মা-বাপ নেই? না থাকলে নেই। কী করা যাবে? 'কারো কিছু করার নেই।' কে বাড়াচ্ছে, কেন বাড়াচ্ছে, সেই বাড়বৃদ্ধিতে কার গায়ে শাঁস বাড়ছে। অত ধান্ধায় কে যাবে বাবা! পাচ্ছ এই ঢের!

যা পাচ্ছ না, তার জন্যেও তো ষোলো-আনার জায়গায় আঠারো আনা ধরে দিতে হচ্ছে, হবে। 'বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকারে ডুবে পড়ে আছ? টেলিফোনের রিসিভারখানা ঘরসাজানো খেলনা? তাতে কী? মাশুলটা বাড়িয়ে যেও।'

তাই যাচ্ছি। কারণ আমাদের কিছু করার নেই।

একদা জাতির পিতা জাতিকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'গ্রামে ফিরে যাও—' অবাধ্য আমরা সে আদেশ মানিনি। আজ পৌরপিতারা সে আদেশ অনুসরণ করে গ্রামকেই ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের কাছে। ফিরে এসেছে সুতোনুটি-গোবিন্দপুর, খানাডোবা জল জঞ্জাল, এবড়ো খেবড়ো।

অবশ্য খাজনাটা শহরে সাইজেরই আছে, বরঞ্চ সাইজ বাড়ছে।

বাড়ছে? দিতে হবে। উপায় কী? আমাদের ভূমিকা যে 'মহাশয়ের'। অতএব কিছু করার নেই।

ঘরে বাইরে, সমাজে সংসারে, আমাদের হাত-পা এক অমোঘ অদৃশ্য শেকলে বাঁধা। কোথাও কিছু করার নেই আমাদের।

একেবারে ব্যক্তিগত জীবনেই কি—আজ

নিজ চিন্তা-চেতনার ভূমিতে স্থির থাকবার উপায় আছে আমার?

আমি যদি ভাবি 'আমার বাড়ির দুর্বল শিশুটিকে বছর দুই বয়স না হতেই পিটিয়ে স্কুলে পাঠাব না, খেলুক কিছুদিন। স্বাস্থ্যটা গড়ে তুলুক।' আমার সে ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। এখন থেকে স্কুলের সীট্ দখল করে না বসলে, ভবিষ্যতে শহরের সমস্ত স্কুলের দরজাই ওর মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাবে।

অতএব চুলোয় যাক আমার ভাবনা, আর বেচারার স্বাস্থ্য, ভোর সকালে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে পিটোতে পিটোতে চালান করো 'আন্টিদের' ঘরে।

আমার সংকল্প 'সাদা' রাস্তা ছাড়া চলা হবে না। হবে না? তাহলে অনিবার্য প্রয়োজনের সময়ও জীবনদায়ী ওষুধটি থেকে, ট্রেনের টিকিটটি পর্যন্ত আমার নাগালের বাইরে বসে থাকবে। অতএব মরণ-বাঁচনের সময় 'কালোপথ' ছাড়া গতি নেই।

উপায় কী?

করার কিছুতো নেই।

বড়জোর আমরা শুধু বিষণ্ণ হয়ে উঠতে পারি! দুঃখী হয়ে যেতে পারি।

*

কিন্তু সত্যিই কি আমাদের কিছুই করার নেই?

বহিরঙ্গের ওই দুঃস্বপ্নের মিছিলের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, একবার একান্তই নিজের 'ঘরে' একটু চোখ ফেলে দেখলে, কী হয়? সেখানে কী আছে, কী নেই বোঝবার চেষ্টা করার বোধহয় কিছু দরকার আছে।

বহিরঙ্গের এই অনিবার্য দুঃখের বোঝার ওপর কিছু কিছু (হয়তো বা অনেক কিছুই) দুঃখ কি আমাদের নিজেদের সৃষ্ট নয়?

'সন্তোষ'কে যদি আমরা আমাদের চিত্তজগৎ থেকে নির্বাসন দিই, গাছের যে ডালটার ফল আমার নাগালের মধ্যে, তাকে তুচ্ছবোধ করে, যদি অনবরতই মগডালের ফলটির জন্যে লাফাই ঝাঁপাই করি, কিছুটা দুঃখ আসবে বৈকি।

আমি অবশ্য তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কথাই বলছি। যে সমাজটিই আমাদের 'সমাজের' সত্যকার মেরুদণ্ড! যেখান থেকে উঠে আসছেন শিল্পী সংস্কৃতিবান কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা।

মধ্যবিত্ত। তবু ধ্যান ধারণা লক্ষ্য থাকে উচ্চবিত্তদের দিকে।

একথা বলব না যে উচ্চ আশা থাকবে না।

কিন্তু সেই উচ্চ আশার পিছনে, রেসের ঘোড়ার মতো নিজেকে ছুটিয়ে মেরে তার বদলে আমরা কী পাই? কতটুকু পাই। 'সন্তোষ' নামক দুর্লভ বস্তুটিকে পণ ধরেই তো এই জুয়া খেলায় নামা।

কাজেই হয়তো কখন কখন আমাদের একটা ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখিও হতে হয়। বললে ভুল হবে না, আমাদের অতি উচ্চ আশার প্রধান মাধ্যম, আমাদের ছেলেমেয়েরা। তারাই তো মা-বাপের গৌরবের জয়পতাকা! তবে তাদের নিয়েই লেগে পড়তে হবে। বলছি না যে, 'আমার ছেলেটি মেয়েটি, সবসেরা হোক' এই চাওয়াটি মা-বাপের পক্ষে অন্যায়। চাওয়াটি তো থাকবেই। কিন্তু মুশকিল ঘটে তখনই, যখন সেই চাওয়াটিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে, 'চাহিদা'।

চাহিদা হচ্ছে, 'তোমায় বাপু সেরা হতেই হবে।'

মা-বাপ যেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক অলিখিত চুক্তিতে নামেন, 'ছাখো বাপু তোমার জন্যে আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত করছি দেখছ তো? তুমিও তোমার সর্বসাধ্য প্রয়োগ করে আমাদের "মুখ রাখবে"।'

অতএব 'হাট হাট ঘোড়া হাট!' ছপটি মেরে মেরে দৌড় করাও।

খেলা-ধূলো বন্ধ। ডাইনে বাঁয়ে মাস্টার। 'খোকা তুমি আমাদের মুখ রেখো।'

আর কোন কিছু শেখার দরকার নেই খোকার। 'দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ,নম্রতা ভদ্রতা, সভ্যতা ভব্যতা,' কিছু না। 'তুমি আমাদের মারো ধর খিঁচোও, যা খুশি কর, বাবা, শুধু রেজাল্টটি ভাল করো।'

'আমার মাথায় ঢুকছে না বাবা।'

ঢুকবে। ঢুকবে। বল তো আর একজন টিউটার দেখি।

বাবা! তুমি যদি রোজ একবাক্স করে সাবান মাখো, মার মতন ফর্সা হবে?

(হ্যাঁ, বলেছিল একটা ছেলে।)

আহত বাবা মুখ কালো করে বলেছিলেন, কোথা থেকে এসব কুশিক্ষা পাচ্ছ? তোমার রেজাল্ট খারাপ হওয়া মানেই আমার মাথা কাটা যাওয়া, সেটা ভেবে দেখেছ?

কিন্তু বাবা তো বলেন মাত্র দু-চারবার। যতক্ষণ বাড়ি থাকেন। আর মা?

শয়নে স্বপনে, চলনে বলনে, খেতে শুতে অহরহ বলে চলেন-না, 'রেজাল্ট খারাপ করলে, আমার গলায় দড়ি দিতে হবে, সেটা মনে রাখিস।'

ছেলের রেজাল্ট খারাপের বিপরীতে মা গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না।

প্রতিঘরেই এমনটি হচ্ছে তা বলছি না। তবে যাঁরা যত উচ্চবিত্ত, তাঁদের আশা তত উচ্চ।

এই চাহিদার চাপ বেশির ভাগই স্কুলের গণ্ডি পার হবার কালেই।

'মনে রেখো এই মার্কশীটের ওপরই তোমার ভবিষ্যৎ।'

কিশোর মন বড় সুকুমার। আবার হয় তো একটু উল্টোপাল্টাও। এই চাহিদার চাপ তাকে বিভ্রান্ত করে।

কখন কখন এমন ভারাক্রান্ত করে তোলে যে, 'যদি খারাপ হয়' এই আশঙ্কায় দড়িটা নিজের গলাতেই দিয়ে বসে। এই ভয়াবহ পরিণতির দৃষ্টান্ত তো প্রায় প্রায় চোখে পড়ছেই।

মেয়েদের ব্যাপারে তো আরও এককাঠি বাড়া। তাদের শুধু স্কুল কলেজের রেজাল্টটি ভাল করতে পারলেই কাজ মিটে যাবে না। তাকে সর্ববিদ্যাপটিয়সী হতে হবে। তাকে নাচ শিখতে হবে, গান শিখতে হবে, সাঁতার শিখতে হবে, ছবি আঁকা শিখতে হবে, হয়তো বা সূচী-শিল্পটাও শিখতে হবে।

জীবনের অন্য কোন শিক্ষা হোক না হোক চৌকস্‌টি হওয়াই চাই! তবে তার সঙ্গে পরীক্ষার রেজাল্টটিও ভাল হওয়া চাই।

বেশ ভাল করলেও, বলা হবে, 'আমি অবশ্য আরও একটু ভালর আশা করেছিলাম।'

দুঃখ বেদনা, দুরন্ত একটা অভিমান কোন ক্ষেত্রে তাকেও হয়তো সর্বনাশা পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এরা হয়তো মা-বাপের একমাত্র সন্তান। সেটাই স্বাভাবিক। লক্ষ্মীছাড়াদের ঘরে 'পাঁচ-সাতটা' থাকতে পারে, থাকেও। লক্ষ্মীমন্তদের ঘরে প্রায়শই ওই 'একটি মাত্রই।'

খবরের কাগজই এ খবর আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়, সুকুমার সুন্দর একটি মুখের ছবির সঙ্গে। দেখলে হাহাকার আসে।

অভিমান আর অহেতুক একটা লজ্জায় ছেলেটা মেয়েটা হয়তো তার মা-বাপের 'একমাত্র সন্তানকে' হত্যা করে বসে। কারণ তাকে শেখানো হয়নি 'জীবন কত মহান সম্ভাবনাময়, জীবনের মূল্য কী?' শেখানো হয়েছে শুধু জীবনের মূল্য 'মার্কশীট'।

ভয় হয়, দেশে এই ধরনের ঘটনা কয়েকটি ঘটতে থাকলে সমাজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তার প্রবণতা দেখা দেবে কিনা।

অকল্পনীয় মর্মান্তিক এই দুঃখকে আমরা যেন ডেকে না আনি। এ নিয়ে বোধহয় ভাববার দরকার আছে এখানে কি বলা যাবে, 'করার কিছু নেই ?'

আর রয়েছে ভাবনার একটা বিরাট বিষয়। নিত্যদিন দেশে যার জন্য শত শত প্রাণ বলি পড়ছে। যার জন্য আজকের সমাজ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, ক্লেদাক্ত।

বলছি পণপ্রথার কথা যে প্রথা দেশে একাল সেকাল চিরকাল ধরে সমাজের বুকে—জাঁতা হয়ে রয়ে আছে। শুধু 'বসে আছে' নয়, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আইন একে জব্দ করতে পেরে উঠছে না, আন্দোলন আর আলোচনা এর একটু কোণও খসাতে পেরে উঠছে না, 'নারীজাগরণ' 'নারী-মুক্তি' শব্দটা এর কাছে অর্থহীন। কারো কোন শুভবুদ্ধি, কারো কোন চেষ্টা, এর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত বসাতে পারছে না।

'পণপ্রথা' তার প্রবল শক্তি নিয়ে—অপ্রতিহত প্রতাপে সমাজের বুকে নৃত্য করে চলেছে।

ঘরে ঘরে যতই পণপ্রথার শোচনীয় পরিণাম দেখা যাচ্ছে, ততই যেন তার দাপট বেড়ে চলেছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই কুৎসিত কুপ্রথা তার বিস্তৃতি ঘটিয়েই চলেছে।

কিছুকাল আগেও দেশে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবস্থাটা ছিল উল্টো। পাত্র-পক্ষকেই অর্থের বিনিময়ে কন্যা সংগ্রহ করতে হত। ক্রমশই সে প্রথার রূপান্তর ঘটছে। ধনী ঘরে এখন নাকি একটি বিয়ে বাবদ পণের লক্ষ্যমাত্রা লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে!

অতি উচ্চ শিক্ষিত ঘরেও এই মলিন কুৎসিত অমার্জিত সেকেলে প্রথাটির সগৌরব প্রবেশাধিকার। তখন হয়তো শৌখিন করে বলা হয় 'যৌতুক'। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই কুপ্রথার বলি।

আধুনিক যুগে আমরা আমাদের সমাজ জীবনের অনেক কুপ্রথা, কুসংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়ে 'পশ্চিমের জানলা' খুলে অনেক আলো বাতাসের স্বাদ গ্রহণ করছি। হয়তো বা ওই কু-দের বিদায় করতে চোখে কানে না দেখে কিছু সু-কেও বিসর্জন দিয়ে বসছি, কিন্তু আশ্চর্য, এই অগাধ মূঢ়তার জঞ্জালটিকে ঘরের মধ্যে ভরে রেখে সযত্নে লালন করে চলেছি।

এর মর্মান্তিক শোচনীয় পরিণামের দিকে তাকিয়ে দেখছি না। এই জঞ্জাল দিনে দিনে সমাজজীবন, তথা পারিবারিক জীবনকে পঙ্কিল করে তুলছে।

আজকের মেয়েরা এত শিক্ষিত, এত কৃতবিদ্য, হয়ে চলেছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের পুরুষের চেয়ে আজ আর কম নয়, 'নারী স্বাধীনতা' তো তার একটা জয়গানের ধ্বনি, তবু দেশের এই সমগ্র নারীশক্তি পেরে উঠছে না এই জঞ্জালকে সাফ করে ফেলতে!

কিন্তু কেন পারছে না? কেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ল-ইয়ার, পি. এইচ. ডি., প্রফেসর মেয়েরাও অনায়াসে এর শিকারের সামিল হচ্ছে!

এই নিরুপায়তার মূল কোথায়?

আমাদের এই নিতান্ত পারিবারিক জীবনের এই অন্ধ সমস্যার জন্যে কাকে দোষ দেব? আমরা কি এখানে 'পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা', 'প্রশাসনের ঔদাসীন্য' অথবা 'সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য' বা 'বেকার সমস্যার' দোহাই দিয়ে রেহাই পাব? অনায়াসে হাত-পা ছেড়ে বলে উঠতে পারব, 'করবার কিছু নেই!'

এখানে—

যা কিছু করবার দায়িত্ব তো আমাদের নিজেদেরই।

যদি তলিয়ে ভেবে দেখা যায়, এর মূল উৎস আবিষ্কার করা শক্ত হয় না। মূল উৎস লোভ। একান্তভাবেই কেবলমাত্র 'লোভ'।

অবশ্য জগতের সমস্ত পাপ আর অনাচারের মূল উৎস ওই তৃতীয় রিপুটিই। স্বর্ণলোভ, সাম্রাজ্য-লোভ, নারীলোভ, ক্ষমতার লোভ, যশলোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ, এই লোভের ঘোড়ায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে জগৎকে। সেখানে সত্যিই হয়তো আমাদের করবার কিছু নেই।

কিন্তু এখানে আছে বলবার।

এখানেও মা-বাপের অন্যায় উচ্চ আশাই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী।

'হত্যা বা আত্মহত্যার' ঘটনার বিবরণে তো বেশির ভাগই দেখা যায়, মা-বাপ 'প্রতিশ্রুতি' মতো পণ দিতে না পারায়, বৌয়ের ওপর অত্যাচার শুরু হয়।

কিন্তু কেন এই প্রতিশ্রুতি? কেন সাধ্যের অতিরিক্ত পাত্রের দিকে হাত বাড়ানো?

কেন দীন দরিদ্র ঘরেও মেয়েকে ছোট্ট থেকে 'সোনার টোপর মাথায়' দেওয়া বর আসার স্বপ্ন দেখানো?

মনে হয়, তাকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা ভাল যে, 'বাছা ঘর-সংসার সোনার টোপর সকলের জন্যে নয়। মনকে প্রস্তুত কর, খেটে পিটে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়াতে হবে।'

এ ভাষণ যদি নিরক্ষর চাষীবাসী গ্রামের মেয়েদের জন্যে, তো বিদুষী শহরবাসিনীদের জন্যে কথা 'বুঝতে চেষ্টা কর "আত্মসম্মান" বস্তুটি কী? "প্রেস্টিজ" কাকে বলে? কোনমতে জোগাড় করে ফেলা একটি সোনার চাঁদ বর?'

না, তেমন কথা তাকে শেখানো হয় না। বরং বলা হয়, 'তুমি একখানি রত্ন হয়ে ওঠো; আকাশের চাঁদটি পেড়ে এনে তোমার হাতে তুলে দেব বাছা। তার জন্যে আমাকে সর্বস্বান্ত হতে হয় তাও ভাল।'

মেয়েরা অতএব চাঁদের স্বপ্ন দেখে।

এই মোহ থেকে মুক্তি না ঘটলে কোন শুভর আশা নেই।

বাইরে থেকে আলোচনা আন্দোলন করে কিছু হয় না। নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেও কিছু হবে না। যতক্ষণ না ভিতর থেকে আসে প্রতিবাদের দৃঢ়তা। যতক্ষণ না ছেলেরাও অনুধাবন করতে পারে বিয়েটা কেবলমাত্র পাত্রীপক্ষেরই দায় নয়, তাদেরও দরকার।

কারণ অপরপক্ষ থেকে শুভবুদ্ধির সাড়া ওঠার আশাটা অলীক। যেখানে তৃতীয় রিপুর প্রভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে শুভবুদ্ধিকে।

নিরক্ষর গ্রামবাসীর ঘরে একটি 'ছেলে' মানেই একটি ভালুক। তা সে যেমন ছেলেই হোক। সকলেই জানি গ্রামে আজ দারিদ্র্য-সীমার নিচের মানুষরাও মেয়ের বিয়েয় দু-পাঁচ হাজার টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়। তাদের সমগ্র সংসারের সারা বছরের 'পেটের ভাত' শেষ ধান-জমিটুকুও বিক্রী করে মেয়ে পার করতে হয়।

আবার শিক্ষিত কৃতবিদ্য পাত্রের মা-বাপ জেনে বুঝে বসে আছেন, অর্ধেক রাজত্ব এবং একটি পরমা সুন্দরী রাজকন্যাকে আহরণ করে ফেলার চাবিকাঠিটি তাঁদের মুঠোর মধ্যে।

তাই যে অভাগা দেশে হাজারে একটা 'সুন্দরী মেয়ে'ও দুর্লভ, সে দেশে প্রতিনিয়তই, জাতপাত গণগোত্র মিলিয়ে 'পরমাসুন্দরীর' বায়না।

দিনের পর দিন খবরের কাগজে 'পাত্রী-চাই'য়ের কলমে এই নির্লজ্জ বায়নার নমুনা আমরা দেখে চলেছি।

এসবই পুরনো কথা, জানা কথা। কিন্তু 'নিরন্নের তো প্রতিক্ষণই অন্নচিন্তা।'

অপ্রতিরোধ্য সমস্যা, তার পুরনো চেহারা নিয়ে আজও সমাজের বুকে পুঁতে বসে আছে।

যুগে যুগে যুগের কত পরিবর্তন হল, হচ্ছে। সমাজের সর্বত্র আমূল পরিবর্তন হয়েছে, আরও হতে চলেছে। আমাদের কী পারিবারিক জীবন, কী সামাজিক জীবন প্রায় সর্ববিধ পুরনো চেহারা পাল্টে ফেলছে। কিন্তু এই এক অনড় অচল অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর আর পরিবর্তন হচ্ছে না। সেই দৃষ্টিভঙ্গীটি হচ্ছে বিয়েটার দরকার পাত্রী-পক্ষের, পাত্রপক্ষের নয়।

তাই এত বায়না, বায়নাক্কা।

তাই আজও 'জীবনে প্রতিষ্ঠিত' মেয়েরাও নিজেকে নিয়ে ঘাড় গুঁজে 'কনে' দেখাতে বসে বা বসতে বাধ্য হয়।

ব্যতিক্রম কি নেই? অবশ্যই আছে।

প্রেমবিবাহও অধিকতরই চালু হচ্ছে। তবে এখনও আমাদের মনোভঙ্গীতে—'স্বাধীন বিয়ের' বর কনেকে মা-বাপের বিরূপতায় ঘর ছাড়তে হয়। পাত্রের মা-বাপ ঘোষণা করেন, 'ও বৌ ঘরে তুলব না।' আর পাত্রীর বাবা ঘোষণা করেন, 'এতই যখন স্বাধীন হয়েছ, চরে খাওগে।'

অবশ্য আবার বহু ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রী বিয়ের বিবাহিতা মেয়েকে আবার গুছিয়ে গাছিয়ে কনে সাজিয়ে,বাবা কন্যা সম্প্রদান করে, যৌতুকের বন্যা বহান। পাত্র অবলীলায় সোনার টোপর মাথায় দিয়ে বরাসনে বসে মন্ত্র পড়ে শ্বশুরের হাত থেকে মেয়েটিকে, এবং তার সঙ্গে দানসামগ্রী বরাভরণ 'ইত্যাদি প্রভৃতি' বাগিয়ে পরমানন্দে বাসরে গিয়ে বসেন।

এ প্রহসন তো রীতিমতোই চালু এখন।

এই নাটকের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে যদি ভাবতে চেষ্টা করি, বুঝতে পারা যায় না কি, মেয়েদের মধ্যেই রয়েছে সেই চিরন্তন লোভ, বস্ত্রপুঞ্জের লোভ, বস্ত্রালঙ্কারের লোভ, আদরের লোভ। এই মোহের ফাঁদ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই।

যদি বলা যায় পণ প্রথার প্রধান আসামী মেয়েরাই, খুব কি ভুল করা হবে? পণের দাবিতে পাত্রের মা-বোন যতটা নির্লজ্জ, বাপ-ভাই বোধহয় ততটা নির্লজ্জ নয়।

আবার পণের ঘাটতিতে শাশুড়ী ননদ বধূ-নির্যাতনে যতটা হিংস্র আর নিষ্ঠুরতায় তৎপর, ততটা অবশ্যই শ্বশুর-ভাসুর নয়। অবশ্য মা-বোনের সহায়ক হয়ে থাকেন স্বয়ং পতি দেবতাটিও। কাজেই সহজেই বৌকে পুড়িয়ে মারা, পিটিয়ে মারা, ডুবিয়ে মারা, বিষ খাইয়ে মারা, গলাটিপে মারা, বুকে বাঁশ ডলে মারা ইত্যাদি হত্যার বহুবিধ পদ্ধতি আয়ত্ত করা যায়।

দেশে প্রতিনিয়তই এ ঘটনা ঘটছে, আমরা দেখছি শুনছি, 'আহা' করছি, বিষণ্ণ হচ্ছি এইমাত্র।

কিন্তু কী করে এই পাপপ্রথা সমাজ থেকে দূর হবে,—একথা তো আমাদেরই ভেবে বার করতে হবে।

আশ্চর্য। কী অদ্ভুত একটা অন্যায় ব্যবস্থা চালু হয়ে চলেছে তিনকাল ধরে। এর পিছনে—শাস্ত্রের অনুশাসনের দোহাই নেই, সমাজপতিদের রক্তচক্ষুর শাসন নেই। লোকভয় (বরং বিপরীতই) রাজ্যভয়, ধর্মভয় এমন কোন সংস্কারের দোহাই-ই নেই, যে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে একটা কু-প্রথার দাসত্ব করে যেতে হবে। একদা অনেক ব্যাপারে যা হয়ে এসেছে। এখন তো সব থেকেই মুক্ত।

অথচ এক সর্বনাশা লোভের দায়ে নিরুপায়ের কায় বাঁধা পড়ে আছি আমরা।

আর ব্যাপারটা ক্রমশই অনভিজাত ঘর থেকে অভিজাত ঘরে উঠে আসছে।

আজ সমাজের প্রতিটি স্তর থেকেই কি এ প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, 'কেন চিরদিন টিঁকে থাকবে এই কু-প্রথা?' 'কেন পারব না আমরা এটা দূর করতে?' 'এটা তো সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের হাতে?'

কিন্তু উঠছে কই সে প্রশ্ন?

এত কোটি লোকে সমৃদ্ধ দেশ, এত শিক্ষা সভ্যতার বড়াই, এত আইন, আর আইন-রক্ষক, তবু সবাই আমরা চোখের সামনে এক নারকীয় নাটকের নীরব দর্শকের ভূমিকায় হতাশ নিঃশ্বাস ফেলছি।

আর ক্রমশই আমরা 'আনন্দ' হারিয়ে নিরানন্দের শিকার হয়ে যাচ্ছি।

নিরুপায়তাই তো নিরানন্দের আকর।

'কা হি সা দেবী মহামায়া'

স্বামী কেদারানন্দ
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী।

'ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ব্রবীতি।'—হে ভগবন্, যাঁকে আপনি মহামায়া বলছেন তিনি কে? কিই বা তাঁর স্বরূপ? কিই বা তাঁর কার্য? মেধা ঋষিকে এই প্রশ্ন করছেন রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই হচ্ছে প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মহামায়াতত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে সুরথ ও সমাধির প্রশ্নসহ শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে।

কথিত আছে, পুরাকালে দ্বিতীয় মনু স্বরোচিষের অধিকার সময়ে (মন্বন্তরে) চৈত্রবংশজাত সুরথ নামক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হন। তিনি প্রজাদের নিজের পুত্রের ন্যায় যথারীতি পালন করতেন; তবুও অমাত্যগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর শত্রু যবন নরপতিদের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হন এবং পরে দুষ্ট ও বলবান্ অমাত্যগণ তাঁর রাজ্য ও সৈন্যাদি অধিকার করে। তখন রাজা সুরথ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মৃগয়া করার ছলে রাজ্য পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। বনমধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শান্ত পরিবেশযুক্ত মেধা ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেই আশ্রম অঙ্গনে বসে বসে তিনি বিষণ্ণচিত্তে নষ্টরাজ্য, সৈন্য ও পরিবারগণের জন্য দুঃখের সঙ্গে তাদের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে সেখানে সমাধি নামক বৈশ্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তিনিও তাঁর স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-পরিজন ও অমাত্যগণ দ্বারা বঞ্চিত, বর্জিত ও পরিত্যক্ত। এ সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতি নির্দয় না হয়ে আসক্তিবশতঃ তাদেরই জন্য অতিশয় আকর্ষণ অনুভব করলেন। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি পরস্পর মিলিত হয়ে নিজেদের হৃতরাজ্য, সম্পদ ও পরিবারবর্গের প্রতি মমতা ও আকর্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং দুজনেই বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, কেন তাঁদের মন হৃতরাজ্য, পরিবারবর্গ প্রভৃতির প্রতি মোহ ও মমতাযুক্ত, যদিও তাঁরা তাদের নিকট থেকে বিরুদ্ধ ব্যবহারই পেয়েছেন। এর কোন উত্তর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁরা পেলেন না, তখন তাঁরা এর সদুত্তর লাভের জন্য আশ্রমবাসী ব্রহ্মবিদ্বর মেধা ঋষির নিকট উপস্থিত হয়ে, তাঁকে যথারীতি সম্ভাষণ করে তাঁদের মনোগত প্রশ্নের সদুত্তর প্রার্থনা করলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন যে, স্ত্রীপুত্র-রাজ্যসম্পদাদি বিষয়ে দোষ দেখেও বিবেকহীন ব্যক্তির ন্যায় কেন তাঁরা তাদের প্রতি মমতাযুক্ত ও মোহযুক্ত।

এই প্রশ্নে তখন মেধা ঋষি বললেন যে, হে রাজন্, হে বৈশ্যবর, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ সংসারের স্থিতি কারণের জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভগবতী মহামায়াই তাঁর মায়ারূপ আবরণ ও বিপক্ষশক্তি দ্বারা সংসারের সকল জীবকে মোহরূপ গর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষেপ করেন। তিনি আরও বললেন—

> জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
> বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
>
> —শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৫

অর্থাৎ, সাধারণ জীবের কি কথা—সেই দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকী অর্থাৎ যাঁরা সংসারের সৎ ও অসৎ এবং নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রতি সর্বদা বিচারশীল সেই ব্যক্তিগণেরও

চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন।

এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই মহামায়ার মমতা ও মোহরূপ মায়া থেকে কি মুক্তির কোন উপায় নেই? থাকলে কিই বা তার উপায়? এই মহামায়ার স্বরূপই বা কি? কিই বা তাঁর কার্য? এর উত্তরে চণ্ডী আদি-শাস্ত্র বলছেন, সেই মহামায়া অব্যক্ত এবং তিনি পরমেশশক্তি বা ঈশ্বরশক্তি। রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে এই মহামায়াকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মই বলা হয়েছে—"ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।" বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন এক ও অভেদ তেমন ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভেদ। আরও বলছেন—"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।" এই ব্রহ্মশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার ও জন্মলীলাদি কার্য করেন। তিনিই জীবের বন্ধন ও মুক্তির হেতুস্বরূপ। তিনিই আবার উপাসকের নিকট ভক্তের নিকট দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হয়ে সাধককে তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। দেবীভাগবতে (৫।৮।৫৮—৫৯) মহামায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়েছে—

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে॥
তথৈষা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ॥

অর্থাৎ, "নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোক-রঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য-সম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন।"

দেবী ভগবতী মহামায়ার স্বরূপ ও কার্য সম্বন্ধে কালিকাপুরাণ (১—৪) বলছেন—

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥
পূর্বাতিপূর্বসংস্কারসঙ্ঘাতেন নিয়োজ্য চ।
অহরাদৌ ততো মোহ-মমত্ব-জ্ঞানসংশয়ম্॥
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্॥
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী॥

অর্থাৎ "মাতৃগর্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিশু প্রসূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র যিনি তাহাকে নিরন্তর জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করিয়া অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও ব্যসনাসক্ত করেন, সেই জগদীশ্বরীই এই কারণে মহামায়া নামে অভিহিতা।"

এখন প্রশ্ন হল যে, দেবী ভগবতী জগদীশ্বরী মহামায়া যে জীবকে বার বার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংসাররূপ মোহ-আবর্তে ও মমতাগর্তে নিক্ষেপ করছেন তার থেকে মুক্তির কি উপায়? এর উত্তরে মেধা ঋষি বলছেন, মুক্তির উপায় আছে। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির প্রশ্নে মেধা ঋষি বললেন যে, সেই দেবী ভগবতী মহামায়াই সংসাররূপ মোহ-মমতা থেকে মুক্তির হেতুস্বরূপা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সনাতনী পরাশক্তি। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা, আবার তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল দেবতার ঈশ্বরী। তিনিই সৎ ও অসৎ, চৈতন্য ও জড়ের হেতুস্বরূপা ব্রহ্মশক্তি—সমগ্র চরাচর বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তু ও ভাবের আধার ও আধেয় স্বরূপ। তিনি প্রসন্ন হলেই মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং

ভবতি মুক্তয়ে।' (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৭)

অতঃপর মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে দেবী ভগবতী মহামায়া সম্বন্ধে আরও বললেন যে, সেই দেবী জন্ম-মরণরহিতা হয়েও বার বার জগতে আবির্ভূতা হয়ে সংসারকে রক্ষা করেন। তখন তিনি পুরাকালে দেবী মহামায়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ ধারণ করে কিভাবে মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্য বা অসুরদের বধ করে পৃথিবীতে অসুরভাবের নাশ করে দৈবভাবের স্থাপনা করেছিলেন তার ইতিবৃত্ত বললেন। মেধা ঋষি আরও বললেন, ভবিষ্যতে যখন যখন দানবকুলের প্রাধান্যবশতঃ জগতে বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখন তখনই সেই দেবী মহামায়া আবির্ভূতা হয়ে দেবশত্রু অসুরদের বিনাশ করে জগতে শান্তি ও দেবভাবের স্থাপনা করবেন।

বস্তুতঃ বহির্জগতের এই দেবাসুরের সংগ্রাম আমাদের চিরাচরিত অন্তর-জগতেরই সংগ্রাম—যেখানে দেবতারূপী সুবৃত্তির সঙ্গে অসুররূপী কুবৃত্তির অবিরাম সংগ্রাম চলছে। মানুষ যদি কাম, ক্রোধ, লোভ আদি আসুরিক কুপ্রবৃত্তি-গুলিকে দমন করে শম, দমাদি দৈবীপ্রবৃত্তিগুলি সহায়ে পরাশক্তিস্বরূপিণী, জ্ঞান-ভক্তিপ্রদায়িনী বরাভয়া আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরণাপন্ন হয়, তাহলে তাঁর কৃপায় সে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপের উপলব্ধিতে কৃতকৃতার্থ হতে পারে।

তাই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে মেধা ঋষি বললেন যে, মায়ামুগ্ধ জীব যদি নিষ্কামভাবে সেই ব্রহ্মশক্তি মহামায়াকে আরাধনা করে সেই দেবী মহামায়া সাধককে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। আর যদি কেউ সকামভাবে অর্থাৎ সংসার ভোগ-রূপ বাসনা নিয়ে তাঁর আরাধনা করে তাঁকে পরিতুষ্ট করে, তবে সেই দেবী সেই ভোগাকাঙ্ক্ষী সাধককেও ভোগের উপযোগী সম্পদ দিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। জন্মরহিতা সেই সনাতনী দেবী মহামায়া সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে (ব্রহ্মাণী) প্রকাশিতা হন, স্থিতিকালে স্থিতিশক্তি-রূপে (বৈষ্ণবী) পালন করেন আবার প্রলয়-কালে সংহাররূপ (শিবানী) ধারণ করেন। তিনিই সুসময়ে লক্ষ্মীরূপে সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি দান করেন। তিনিই আবার দুঃসময়ে অলক্ষ্মীরূপে মহামারী, প্রলয়, দুঃখ-দারিদ্র্যাদি দ্বারা বিনাশ করেন।

পরিশেষে মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে বললেন যে, সেই ভগবতী মহামায়াই পূর্ব পূর্ব বিবেক-অভিমানী অহংকারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন, অনুরূপ অপর অবিবেকিগণকে বর্তমানে তাই করছেন এবং ভবিষ্যতেও তেমনই করবেন। অতঃপর তিনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে এই মহামোহ, মমত্ব ও অহংকারের প্রভাব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় জানালেন সেই পরমেশ্বরী মহামায়ারই আশ্রয় লওয়া, সর্বান্তঃকরণে তাঁরই শরণাগত হওয়া। সেই দেবী ভগবতী মহামায়ার শরণ নিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় অর্থাৎ মঙ্গল ও সমৃদ্ধি প্রদান করেন এবং তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী সাধককে নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির অধিকারী করেন। মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে বললেন যে, সেই নিখিল বিশ্বের ধাত্রী দেবী পরমেশ্বরীই আমাদের মোহ ও মমতাচ্ছন্ন করেছেন, তোমরা তাঁর শরণাগত হও। কারণ শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ সাধন। অহংকারশূন্য হয়ে তাঁর শরণ নিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তিপ্রদান করেন।

অতঃপর মেধা ঋষির উপদেশ অনুযায়ী রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দূরে নদীতীরে গমন করলেন এবং ভগবতী মহামায়ার মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি (দুর্গা-দেবী) নির্মাণ করলেন। তাঁরা কখন নিরাহারী

বা অল্পাহারী ও ব্রতপরায়ণ হয়ে সমাহিতচিত্তে পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, হোম ও রক্তসিক্ত বলি দিয়ে সেই দেবী মহামায়ার আরাধনায় রত হলেন। পর পর তিন বৎসর সংযতচিত্তে এইরূপ তপস্যার পর দেবী ভগবতী জগদম্বা চণ্ডিকা সাক্ষাৎভাবে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং রাজা সুরথকে তাঁর হৃতরাজ্য পুনঃ উদ্ধার যাতে হয় সেই বর দিলেন (রাজা সুরথ এই বরই দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন)। অতঃপর দেবী মহামায়া বৈশ্য সমাধিকে স্ত্রীপুত্রধনদেহাদিতে আসক্তিনাশক মোক্ষধর্মী তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বর প্রদান করলেন (বৈশ্য সমাধি এইরূপ বরই প্রার্থনা করেছিলেন)।

উপরের রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির আখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেবী ভগবতী মহামায়াই সংসারাসক্তিরূপ মোহ ও মমতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়,—আবার যিনি পরমা-শক্তিস্বরূপা নিখিল চরাচর বিশ্বের অধীশ্বরী সর্বশক্তিময়ী জগন্মাতা। আবার শরণাগত ভক্তের নিকট স্নেহপূর্ণা জননী। সুতরাং তাঁরই শরণ গ্রহণ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কারণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই—অন্তরে বাইরে জীব-জগতে অণু-পরমাণুতে তিনিই ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিতা। তিনিই একমাত্র বিরাজিতা রয়েছেন তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও শক্তি নিয়ে, অনন্ত জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-শক্তিরূপে।

তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না ; নিবিড় আঁধার ; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক'রছিলেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ-বাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় ; রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটীতে নরহস্তের কোমর-বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।...মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা ; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়িঃ কিছু অপ্রকাশিত তথ্য

ডক্টর অরুণকুমার বিশ্বাস

অধ্যাপক, কানপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট্‌ অব্‌ টেকনলজি। ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস, সাম্যবাদ, বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গবেষক।

১

খেতড়ির রাজা অজিত সিং (১৮৬১—১৯০১) তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন লাভ করেন আবু পাহাড়ে ৪ জুন ১৮৯১ তারিখে। তারপর দশ বৎসর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শুধু এক মধুর কাহিনীই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিচ্ছেদও বটে। স্বামীজীর জীবনী-আলেখ্যতে এই সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার তিনটি মূল্যবান পুস্তক: 'খেতড়ি কা ইতিহাস' (১৯২৭), 'খেতড়ি নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' (১৯২৭) এবং 'আদর্শ নরেশ' (১৯৪০) পুনর্মুদ্রিত হয়নি এবং সহজ-লভ্যও নয়। বেণীশঙ্কর শর্মা তাঁর 'Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২) গ্রন্থে অনেক চাঞ্চল্যকর নূতন তথ্য উপস্থাপিত করলেও ঝাবরমলজী এবং মহেন্দ্রনাথ দত্তের সংগৃহীত পুরানো তথ্য একত্র করে তাঁর গবেষণাবস্তু উপস্থাপিত করে উঠতে পারেননি।

বর্তমান লেখকের রচিত এবং অধুনা প্রকাশিত 'Khetri in the Ramakrishna Movement' (প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুআরি এবং মার্চ ১৯৮৪) প্রবন্ধে স্বামীজী ও খেতড়ি সম্বন্ধে কিছু নূতন আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে সমস্ত দলিল এবং তথ্য সন্নিবেশিত করা যায়নি। এই প্রসঙ্গে কিছু অপ্রকাশিত অথবা স্বল্পজ্ঞাত দলিল এবং তথ্য বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

২

ভক্তি-সঙ্গীত বিশেষ করে হিন্দী ভজন স্বামীজীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। তিনটি হিন্দী ভজন স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে বিশেষ করে তাঁর প্রথম খেতড়িবাস (৭ অগস্ট—২৭ অক্টোবর, ১৮৯১)-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রথম গানটি হল 'নর্তকী-গীত' এবং সুরদাস-রচিত 'প্রভু মেরে অগুণে চিত না ধরো'। এই গানটি স্বামীজীর মনের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সুবিদিত এবং বিশদভাবে আলোচিত।[১,২,৩] কোথায়, কবে এবং কখন স্বামীজী এই গানটি শোনেন সে সম্পর্কে বর্তমান লেখকের সুচিন্তিত মতামত অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।[৪] স্বামীজী যে খেতড়িতে প্রথমবার অবস্থানের সময় গানটি শুনেছিলেন তার মূল্যবান প্রমাণ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের লেখা 'স্বামীজীর গানের খাতা' প্রবন্ধে[৫] পাওয়া যায়। স্বামীজী তাঁর গানের খাতাটি মাদ্রাজে ফেলে যান—দ্বিতীয়বার খেতড়ি গমন এবং প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, প্রথম ভাগ, ১৩২৬, নূতন সংস্করণ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ২৫৫

২ বিবেকানন্দ-চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ৩০৯—১০

৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭—০৮

৪ প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুআরি ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৭৬

৫ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৮২, পৃষ্ঠা ৪৫০ এবং ৪৫৩

পূর্বে এবং এই গানের খাতার ১০ম পৃষ্ঠায় স্বামীজীর নিজের হাতে লেখা গানটি পাওয়া যায়। অতএব স্বামীজী গানটি দ্বিতীয়বার খেতড়ি গমনের সময় জয়পুরে শোনেন এইরূপ সংশয়[১,৩] একেবারেই ভিত্তিহীন।

সুরদাসের এই বিখ্যাত ভজনটি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তর পাঠভেদ লক্ষিত হয়।[১,২,৩,৬] তাই স্বামীজী ঠিক কি বাণীতে গানটি শুনেছিলেন অথবা মনে রেখেছিলেন এই কৌতূহল স্বাভাবিক। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত স্বামীজীর গানের খাতার ১০ম পৃষ্ঠার চিত্র (facsimile) পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়া গেল। স্বামীজীর হাতের লেখা যতটা পড়া যায় (পেন্সিলে লেখা খুবই অস্পষ্ট হয়ে গেছে) তার অনুলিপি উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

প্রভু মেরে অগুণে[৭] চিত না ধরো/সমদরশি নাম তুঁহারো একই ব্রহ্ম করো।[৮] (কয়ো ?)/এক লোহা পূজা মে রহত হ্যায় এক ঘর বত্তিক[৯] পরো/ পারশকো মন্দে[১০] নাই কাঞ্চন করেন দেয়[১১] (ত ?) খর্‌য়ো[১২]/এক নদী এক নালী কহায়ে[১৩] ময়রো[১৪] নীর ভরো/যায় মিলে—গঙ্গাজল জাহি দুই[১৫]—একই রূপ ধরো।[১৬, ১৭]

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ লিখেছেন[৪] যে, স্বামীজীর গানের খাতার "১০ম পৃষ্ঠায় দুটি গান : 'প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো' এবং 'জয় জয় বিজয়'।" আসলে ঐ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় গানটির আরম্ভ 'দয়ানিধে তেরি গতি লখি না পরে'। এই পঙ্‌ক্তি এবং পরবর্তী পঙ্‌ক্তিটিকে হয়তো স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কোন তৃতীয় গানের অংশ অথবা প্রথম গানের শেষাংশ বলে মনে করেছিলেন। যাই হোক, বিখ্যাত এই ভজনটি

৬ ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর (সংগ্রহকর্তা শ্রীবিয়োগী হরিজী) পাতা ৮৮। গানটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—সুরদাসজী—বিনয় ; রাগ নট। স্বামীজী কি সুরে গানটি শোনেন তা বর্তমান লেখকের জানা নেই।

৭ পাঠান্তরে 'অওগুণ' বা 'অবগুণ' (=দোষ) —হে আমার প্রভু, তুমি আমার দোষের কথা মনে গেঁথে রেখো না।

৮ পাঠান্তরে[৩] 'অব মোহি পার করো' তোমার নাম সমদর্শী, তুমি আমাকে পার করো।

৯ 'বত্তিক'=বধিক=ব্যাধ বা শিকারী, যার ঘরে লোহা আর এক (অস্ত্র) রূপে আছে।

১০ পরশমণির সংশয় নেই। ১১ পাঠান্তরে[১,২] 'পারশকে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহু এক কাঞ্চন করো'—পরশমণি পূজার লোহা এবং ব্যাধের লোহার মধ্যে প্রভেদ করে না—দুটোকেই খাঁটি সোনা করে দেয়—স্বামীজীর লিখিত/শ্রুত পদটি রাজস্থানী হিন্দী অনুযায়ী। ১২ খর্‌য়ো=খাঁটি। ১৩ এর উপরে স্বামীজীর হাতে লেখা 'They say'—তাহারা বলে—একটি নদী আর একটি ময়লা জলে ভরা নালী। ১৪ ময়রো=ময়লা। ১৫ স্বামীজী 'দুই' কথাটি তলায় লিখেছেন—তীর-চিহ্ন দিয়ে সংযোগের নিশানা।

১৬ পাঠান্তরে ২, ৩, ৬ :

"এক নদিয়া ইক নার কহাবত, মৈলো হি নীর ভরো,
জব দোউ মিলি এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।"

—নদী আর নালীর ময়লা জল একসঙ্গে মিলে গিয়ে সুরসুরী (=দেবতাদের নদী) বা গঙ্গা নাম ধারণ করে।

১৭ স্বামীজী গানটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তি[১,২] লেখেননি :

"এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।"

26

১০

স্বামীজীর গানের খাতার দশম পৃষ্ঠা। পৃঃ ৫৪৩

সুরদাস[১৮]-রচিত এবং সুদীর্ঘ দশম পৃষ্ঠায়, স্বামীজী যতটুকু লিখেছেন তা হল :

(এ) দয়ানিধে তেরি গতি লখি না পরে
ধর্ম অধর্ম, অধর্ম ধর্ম করি—অকরণ করণ করে
জয় অরু বিজয় পাপ কহ কীনো ব্রাহ্মণ শাপ
দিবায়ো
অসুর যোনি দীনী তাউপর ধরম উছেহ করায়ো॥
পিতা বচন ছণ্ডে সো পাপী সো প্রহ্লাদৈ কিনো
তিনকে হেতু খম্ভতে প্রগটে নরহরি রূপ যো লীনো
দ্বিজকুল পতিত অজামিল বিষয়ী গণিকা প্রীতি
বড়াই...[১৯]

দশম পৃষ্ঠায় লিখিত প্রথম গানটির অর্থ, তাৎপর্য ও স্বামীজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে[১-৩], কিন্তু দ্বিতীয় গানটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়নি। প্রথমে দ্বিতীয় গানটির সরল ভাবার্থ দেওয়া যাক :

হে দয়ানিধি, তোমার গতি বোঝা ভার। ধর্মাধর্মে কোন ভেদাভেদ না করে তুমি অকারণ কার্য কর, জয় আর বিজয় এমন কি পাপ করেছিল যে তাদের তুমি ব্রহ্মশাপ দেওয়ালে? তাদের অসুরযোনি জন্ম দিয়ে তুমি ধর্মের উচ্ছেদ করালে। পিতার বচন লঙ্ঘন করা পাপ, যে পাপ প্রহ্লাদ করেছিল। সেই প্রহ্লাদের জন্য তুমি নরহরি রূপ ধরে থাম থেকে প্রকট হলে। দ্বিজকুলের কলঙ্ক অজামিল ঘোর বিষয়ী এবং গণিকাসক্ত থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে নিজ পুত্র নারায়ণকে ডেকে 'নারায়ণ' নাম করার জন্য মুক্তি পেল।... যোগীরা মুক্তি পাবার জন্য অনেক পরিশ্রম করেন, কিন্তু অসুর তোমার বিরোধিতা করেই মুক্তি পায়। তোমার মহিমা অকথনীয় এইরূপ বলা হয়—সুরদাস আর কি গাইবে!

এই গানটি স্বামীজী খুব সম্ভবত খেতড়িতেই শোনেন এবং গাইতে শেখেন, কারণ, খেতড়ি-বাসের পরে জুনাগড় ভ্রমণের সময় স্বামীজীকে ঐ গানটি গাইতে শোনা যায়। গানটি পরিব্রাজক স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। সুরদাসের মতন স্বামীজীর মনেও 'নিঠুর দরদী' 'দয়ানিধি' ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ অভিমান ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন তিনি অনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বড় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

"এই সময় (রাজপুতানা ভ্রমণের সময়) স্বামীজীর মনের ভাব বড়ই বিষাদপূর্ণ ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বা কি হইল। কেবলমাত্র পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান এই না। কিছুই ত পাইলাম না, দেহরক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র।...বুদ্ধদেবের বিষাদভাবের সহিত স্বামীজীর এই সময়কার জীবনের বিষাদভাবের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে, স্বামীজী এই সময় যে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও এইরূপ বিষাদ ও গভীর খেদোক্তি পূর্ণ ছিল।"[২০]

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি-কথায় পাই যে, "স্বামীজী যখন জুনাগড়ে, তখন (সুবিখ্যাত ও

---

১৮ ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর (সংগ্রহকর্তা—শ্রীবিয়োগী হরিজী) ১০৯ নং পৃষ্ঠায় গানটির সম্পূর্ণ লিপি পাওয়া যাবে। এই ভজনটি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে : সুরদাসজী—প্রকীর্ণ; রাগ ধনাশ্রী।

১৯ গানটির আরও ২টি পঙ্‌ক্তি আছে। শেষ দুটি হল :
"মুক্তি হেতু যোগী বহু শ্রম করৈ, অসুর বিরোধে পাবৈ।
অকথিত কথিত তুমহারী মহিমা, সুরদাস কহ গাবৈ॥"

২০ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ১৯০—৯১

হৃদয়বান বৈদ্য) (ঝণ্ডু) ভটজীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। সেইখানে স্বামীজীর মুখে 'দয়ানিধি তেরী গতি লখি না পরে' এই গানটি শুনিয়া ভটজী কাঁদিয়াছিলেন।"[২১]

"কাঠিয়াওয়াড়ে ভ্রমণ করিবার সময় একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বামীজী মূলজীর (জনৈক ব্রাহ্মণ গায়ক) মুখে ভক্তকবি সুরদাসজীর 'দয়ানিধে তেরী গতি লখি না পরে', 'প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো' প্রভৃতি গান, বিশেষতঃ সকালে 'শশধর তিলক ভাল, গঙ্গা জটাপর' গানটি শুনিতে ভালবাসিতেন।"[২২]

স্বামীজীর প্রিয় তৃতীয় হিন্দী ভজনটি রচনা করেছেন তাঁর শিষ্য স্বয়ং খেতড়ির রাজা অজিত সিং। রচনাটি সহজলভ্য নয়[২৩] বলে সম্পূর্ণভাবে নিচে উদ্ধৃত হল :

বিন (উন) বিন মোহি কুঁ কছু ন সুহাবৈ,
তরফত চিত অতি হী অকুলাবৈ ॥ ২

এ রী ! সখী হমরে পীতম কৌ,
জায় কোঈ য়হ বাত সুনাবৈ।
য়হ জীবন ছীজত হৈ ছন ছন,
বীত গয়ে পর ফির নহীঁ আবৈ।
বিন বিন…॥ ৬

বহুত কাল বীতে আবন কে,
গিনত-গিনত জিয়রা ঘবরাবৈ।
হায়, দঈ অখিয়াঁ তরসত হৈঁ,
বিরহ বিপত নিত মোহি জরাবৈ।
বিন বিন…॥ ১০

মরণ ন দেত আস মিলবে কী,
জীবন ছিন বিন (উন) বিন নহিঁ ভাবৈ।
সুধ বুধ সব হী ভুল গয়ী রী
য়হ দুখ তো অব সহ্যো ন জাবৈ।
বিন বিন…॥ ১৪

মতলব কো গরজী জগ সারো,
অরজী মোরী কৌন সুনাবৈ।
তন মন জীতি রীতি সব করিকৈ,
ভজিহৌঁ রাম কাম বনি আবৈ।
বিন বিন…॥ ১৮

হে জগদীশ ঈশ বিশ্বম্ভর
তুম বিন য়হ দুখ কৌন মিটাবৈ।
করো কৃপা করুণানিধি মো পৈ,
মিলে পিয়া জিয় হরষ ন মাবৈ।
বিন বিন… ॥ ২২

জ্ঞানী য়াহি জ্ঞান করি দেখৈ,
রসিক য়াহি রস পচ্ছ লগাবৈ।
যোগ ভোগ গতি দোয় এক করি,
সুমতি অজিত পদ সহজ বতাবৈ।
বিন বিন…॥ ২৬

গানটির সরল ভাবার্থ এইরূপ[২৪] :

তাঁর বিরহে আমার কিছুই ভাল লাগে না, প্রাণ অতি ব্যাকুল। সখি, আমার সেই প্রিয়জন কোথায় যে তাঁকে গিয়ে আমার মনের কথা বলবে। তাঁকে ছাড়া আমার যৌবন বৃথা যায়, তাঁর দর্শনের জন্য আমার দুই আঁখি তৃষিত। যদিও আমার এই জীবনের উপর আর কোন মোহ নেই, তবুও যদি তিনি দেখা দেন—এই আশা আমাকে মরতেও দিচ্ছে না।

এই সংসার অতি স্বার্থপর—কে আমার হৃদয়ের ব্যথা তাঁকে গিয়ে জানাবে। রামনামই একমাত্র ভরসা। হে জগদীশ, হে বিশ্বম্ভর, তুমি ছাড়া

২১ স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ১০০

২২ ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬ ২৩ আদর্শ নরেশ—ঝাবরমল শর্মা, ১৯৪০, পৃষ্ঠা ৮১—৮২

২৪ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভজন দুটির ভাবার্থ উদ্ধারে আই. আই. টি. কানপুরের শ্রীমতী বীণা শুক্লা এবং শ্রীমতী সুলেখা বিশ্বাস বর্তমান লেখককে সাহায্য করেছেন।

আর কে আমার দুঃখ মেটাবে। তুমি আমায় কৃপা কর।

জ্ঞানী তাঁকে জ্ঞানস্বরূপ দেখে, আর রসিক ভাবে তিনি রসস্বরূপ। অজিত বলে যে যোগ ও ভোগের সংমিশ্রণে—অর্থাৎ সাধনার সঙ্গে রস (বা প্রেম) যুক্ত হলে—ঈশ্বরলাভ সহজসাধ্য হবে।

গানটি কিভাবে রচিত হয় তা অন্যত্র[২৫] বলা হয়েছে। এই ভজনটি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি নিজে গাইতেনও। এই প্রসঙ্গে ঝাবরমল শর্মার 'খেতড়ি-নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' পুস্তকের প্রস্তাবনায় (পৃষ্ঠা ৪—৫) স্বামী অখণ্ডানন্দ ২৭.৯.১৯২৭ তারিখে লেখেন :

"ওয়ে (রাজা অজিত সিং) অচ্ছে কবি থে ঔর উনকা হৃদয় প্রেম-পুরিত থা। উনকে রচিত এক মধুর পদকী য়াদ্ মুঝে অভীতক বনী হুঈ হৈ। পদকী টেক্ (ধুয়া বা আখর) থী 'বিন বিন মোকুঁ কছু ন সুহাবৈ। তড়ফত জিয় অতি হী অকুলাবৈ' —ইস্ পদকী সমাপ্তিমেঁ থা—'মরণ ন দেত আস মিলবেকী' বস,ইস্ শেষ পঙ্‌ক্তিকে ভাবকী প্রশংসা করতে সময় পদ গাতে হুয়ে স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ মগন হো যাতে থে।[২৬] য়হ এক হী পদ রাজাজীকে প্রেম-পূর্ণ ভাবুক হৃদয়কা প্রকৃষ্ট পরিচায়ক হৈ।"

রাজা অজিত সিং-এর কবি ও সঙ্গীত-প্রতিভা এবং খেতড়ির অন্যান্য সঙ্গীত কলাবিদদের সঙ্গে স্বামীজীর সাঙ্গীতিক যোগসূত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অন্যত্র প্রাপ্তব্য[২৭]।

৩

প্রবন্ধের এই তৃতীয় অংশে স্বামীজী ও খেতড়ি সংক্রান্ত কিছু অপ্রকাশিত দলিল পরিবেশন করছি। স্বাধীনতার পরে যখন দেশীয় রাজ্য-গুলিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন খেতড়ির রাজ্যের কিছু সরকারী দলিল, রোজনামচা এবং স্বামীজী, রাজা অজিত সিং, মোতিলাল নেহেরু, মুন্সী জগমোহন লাল ইত্যাদি লিখিত পত্রাবলী পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার সংগ্রহে আসে। এই কাগজপত্রের কিছু অংশ ঝাবরমল-সংগ্রহ হিসাবে নয়া দিল্লীর Nehru Memorial Museum & Library-তে সংরক্ষিত আছে[২৮]। বেণীশঙ্কর শর্মা এই কাগজপত্রের অধিকাংশ তাঁর মূল্যবান পুস্তকে[২৯] ব্যবহার করলেও, কিছু দলিলের প্রতিলিপি (facsimile) তাঁর পুস্তকে পাওয়া যায় না ; এমনকি কিছু দলিলের উল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেননি। এতাবৎ অপ্রকাশিত প্রতিলিপি (facsimile)-গুলি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার জন্য বর্তমান লেখক নেহেরু স্মারক পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ এবং ঝাবরমলজীর দৌহিত্র

২৫ প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১২৬

২৬ ভাবানুবাদ : স্বামীজী গানটির যে পঙ্‌ক্তির (শেষ পঙ্‌ক্তি নয়) ভাবের বিশেষ প্রশংসা করতেন তা হল : 'যদি তিনি দেখা দেন্—এই আশা আমাকে মরতেও দিচ্ছে না।' গানটি গাইতে গাইতে স্বামীজী মগ্ন হয়ে যেতেন।

২৭ আদর্শ নরেশ—ঝাবরমল শর্মা, ৫ম অধ্যায়; প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১২৪—২৬

২৮ বর্তমান লেখক লক্ষ্য করেছেন যে, স্বামীজীর পত্রের মূল (original)গুলি রোজনামচা এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মূল এই সংগ্রহে আপাতত নেই। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

২৯ Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter of His Life—Beni Shankar Sharma, 2nd Edition (1982)

শ্রীঅরবিন্দ শর্মার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

স্বামীজী তখন মাদ্রাজে—প্রথমবার আমেরিকা (চিকাগো ধর্মসভা) যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন —সম্পূর্ণ অর্থসাহায্য জোটেনি। তাঁর প্রিয়শিষ্য রাজা অজিত সিং গুরুর আশীর্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করেছেন, এবং তাঁর সচিব মুন্সী জগমোহন-লালকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছেন যাতে স্বামীজী দ্বিতীয়বার খেতড়ি এসে নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করেন। স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করছেন জেনে রাজা অজিত সিং জগমোহন-লালকে যে চিঠি লেখেন (১১ এপ্রিল, ১৮৯৩) তার বয়ান (text) পূর্বে প্রকাশিত[৩০] হলেও, হাতে-লেখা চিঠিটির আংশিক প্রতিলিপি (facsimile) এই প্রথম উপস্থাপিত করা হচ্ছে। ১২ সেন্টিমিটার × ১৬ সেন্টিমিটার মাপের দুটি কাগজ সমানভাবে মুড়ে (fold করে) এই চিঠি হাতে লেখা হয়েছে—অর্থাৎ আটটি পৃষ্ঠা বা surface-এর মাপ প্রায় ৬×৮ সেন্টিমিটার। ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৮ম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া গেল। এই চিঠি থেকে জানা যায় যে, স্বামীজী পশ্চিমে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—প্রয়োজন হলে পায়ে হেঁটে আফগানিস্তান হয়ে যাবেন—কিছু দক্ষিণী রাজা টাকা দিতে গড়িমসি করছেন—শিষ্য অজিত সিং যে করে হোক গুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবেন এবং 'shall never show the cloven foot'। রাজার হস্তাক্ষর-সম্বলিত এই চিঠিটি একটি অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল।

আমেরিকা যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীজী ভারতবর্ষে যত চিঠি লিখেছেন তার বেশির ভাগই মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং অজিত সিং-কে উদ্দেশ করে। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "এই সময় খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সহিত স্বামীজীর সর্বদা চিঠি লেখা চলিত।" চিঠিগুলির মূল অথবা মর্মার্থ আলমবাজার মঠে পাঠানো হত। "পত্রগুলি অধিক হওয়ায় কথিত আছে সেগুলি পুড়াইয়া ফেলা হয়। সে পত্রগুলি পাইবার আর কোন আশা নাই।"[৩১] স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, আমেরিকা থেকে লেখা স্বামীজীর প্রথম চিঠি আলাসিঙ্গার উদ্দেশে (২০ অগস্ট, ১৮৯৩) :

"জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে পৌছিলাম—কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌছিলাম। তথায় আন্দাজ বারো দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক বিরাট ব্যাপার…।"[৩২] স্বামীজী Vancouver পৌছান ২৫ জুলাই এবং Chicago পৌছান ।[৩৩] 'আন্দাজ বারো দিন' অজ্ঞাত ভ্রাম্যমাণ অর্থসংকটে ক্লিষ্ট সন্ন্যাসী হিসাবে স্বামীজী চিকাগো মেলার 'বিরাট ব্যাপার' দেখেছেন।

চিকাগো থেকে বোষ্টনে যাওয়ার আগে মেলা থেকে রাজা অজিত সিংকে পাঠানো greeting card-ই সম্ভবত স্বামীজীর আমেরিকায় পৌছে লেখা প্রথম চিঠি। এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ঝাবরমল-সংগ্রহ থেকে, অথচ কোনও কারণে বেণীশঙ্করজী এই বিষয়ে নীরব। পূর্বে অজ্ঞাত

৩০ Ibid, 71—73

৩১ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬—৩৭

৩২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ৩৬০

৩৩ Life of Swami Vivekananda—Eastern and Western Disciples, Vol. 1, 1979, p. 399

এবং অপ্রকাশিত এই মূল্যবান দলিল সর্বপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। Greeting Card-এর একদিকে Columbian Exposition-এর ছবি এবং স্বামীজীর হাতে লেখা আশীর্বাদ ও শুভকামনা। এক সেণ্ট পোস্টাল কার্ডের অপর দিকে স্বামীজীর হাতে লেখা খেতড়ি-রাজের ঠিকানা। চিকাগো ডাকঘরের ছাপের তারিখ ১২ অগস্ট—অনুমান করা যায় বোস্টন যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী এই কার্ডটি পোস্ট করেছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর চিড়াবা হয়ে এই কার্ডটি খেতড়ি পৌঁছয় ১৪ সেপ্টেম্বর।

সর্বশেষ যে দলিলটির কথা উপস্থাপিত করে বর্তমান প্রবন্ধটির উপসংহার টানছি তার উল্লেখ বেণীশঙ্করজী করেছেন[৩৪], কিন্তু প্রতিলিপি (facsimile) এই প্রথম প্রকাশিত হল। চিকাগোয় স্বামীজীর বিশ্বখ্যাতি লাভের (১৮৯৩) অব্যবহিত পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে ১১ মার্চ, ১৮৯৪। মঠের 'জননী' সদৃশ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণেশ্বরের এই উৎসবের জন্য আবেদন / আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন খেতড়ি-রাজকে। ঐ সঙ্গে তিনি মুন্সী জগমোহনলালকে ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ তারিখের চিঠি লেখেন[৩৫] যার অংশবিশেষ রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ঐ অংশটির বাংলা ভাবানুবাদ জানিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটির উপর যবনিকা টানছি :

"আমরা খুবই আনন্দিত হব যদি আপনারা দয়া করে আসেন এবং এই শুভ উৎসবে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

"আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা আপনারা একবার এসে দেখুন যে, ঐ শুভদিনে কি অলৌকিক কাণ্ড সব ঘটে। যে স্বর্গোদ্যানে (দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে) ভগবান বাস করতেন সেই পুণ্যস্থানে কলকাতা থেকে হাজার হাজার ভদ্রসন্তান আসবেন এবং প্রভুর নামগানে সংসারের সব দুঃখ ভুলে গিয়ে বিমল আনন্দলাভ করবেন। 'মহতো মহীয়ান্' সেই তাঁরই মহিমাকীর্তনে তাঁরা মুখরিত হয়ে উঠবেন। এক কথায় বাগানের উৎসব স্থানটি এক অপূর্ব দিব্যশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সাধারণ চক্ষুর অগোচর হলেও ঠাকুর সকল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে দিব্যানন্দ ও শান্তি প্রদান করবেন। এমন মহান দৃশ্য দেখতে এবং অনুভূতি লাভ করতে কি আপনারা আসবেন না ?"

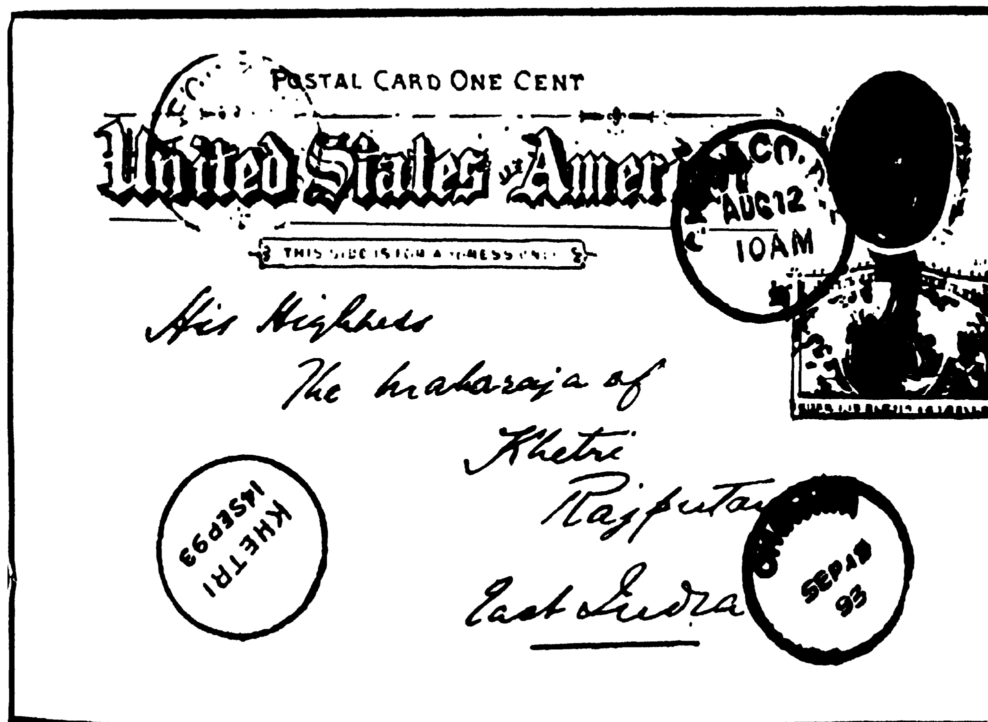
রাজা অজিত সিং, মুন্সী জগমোহনলাল প্রমুখ খেতড়ির ভক্তগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত এই আধ্যাত্মিক আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের স্মৃতি অবিস্মরণীয় ও অমর।

---

৩৪ Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter of His Life—Beni Shankar Sharma, p. 181

৩৫ Ibid, pp. 178—80





স্বামীজী-প্রেরিত Greeting Card

To His Highness The Maharaja
of Khettri in Rajputana.

Your Highness,

The Birthday Anniversary of
**Lord RAMKRISHNA PARAM-
HANSA DEVA** *will be celebrated on
Sunday the 11th March 1894 at
Rani Rashmony's* **Kali-bari
Dakshineswar.** *Your presence
and co-operation solicited.*

BARANAGAR MAT.
Alumbazar, 24 Pergs, Bengal.
The 9th. February, 1894.

Disciples.

P.S. Spontaneous remittance to support this great cause will be thankfully received by the undersigned.
Ramkrishnananda.

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রেরিত আমন্ত্রণলিপি

পৃঃ ৫৫

স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা

ডক্টর চিত্রা দেব

গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ-রচয়িত্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা—আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে যশস্বিনী। প্রাচীন পুরাণ ও পুঁথি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর গবেষণার মুখ্য পরিধি। অনুবাদ সাহিত্যেও সুখ্যাতা। সম্প্রতি বাংলা নারীজাগরণের বৃহত্তর ইতিহাস-গবেষণায় নিরতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্টা।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ও বিরল ঘটনারূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই বীর সন্ন্যাসী শিল্পসৃষ্টির গূঢ় এষণা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি, তবু স্বল্পাবকাশে নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় যৎসামান্য বাংলা রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য যে অনন্ত সম্ভাবনার সূত্র রেখে গিয়েছেন তার তুলনা হয় না। কথাটি আপাত অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বাংলা গদ্য ভাষাকে বিশেষ করে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের সর্বস্তরে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন আজ সে পথটিই বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ততম রাজপথে পরিণত হয়েছে। এ পথে তাঁর পূর্বে আর কেউ অকৃত্রিম পৌরুষ ও অসাধারণ বলিষ্ঠতার স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারেননি। অথচ বাংলা ভাষা বা সাহিত্যচর্চা স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। এক-দিকে বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্মৈষণাকে জড় জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করে আধুনিক বিশ্ববাসীকে নতুন এবং সার্থক পথ দেখাবার অক্লান্ত চেষ্টা, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিত সমন্বয়বাদী সনাতন হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং বৈদান্তিক অধ্যাত্ম চেতনার সমন্বয়সূত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনধারাকে গ্রথিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী কিভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তা জানবার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। স্বামীজীকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়, প্রচুর লিখতেও হয়েছে ইংরেজীতে। নিয়মিত বাংলা অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় বা সুযোগ তিনি পাননি। শুধু 'উদ্বোধনে'র প্রয়োজনের তাগিদে ও প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখার সময় তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করতেন। সংখ্যাগণনায় মাত্র পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কয়েকটি কবিতা ও কিছু চিঠিপত্র ছাড়া তাঁর লেখা বাংলায় আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বল্প সীমার মধ্যেই স্বামীজীর শৌর্যদীপ্ত ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তাই নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়, 'স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।'[১]

বাংলা ভাষা ও স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার বিগত তিন চার শতক ধরে (১৬শ শতাব্দী থেকে) দৈনন্দিন কাজকর্ম-ব্যবসা-বাণিজ্য-হিসাব দলিল-দস্তাবেজ-চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে হলেও উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্য তার যথার্থ রূপটি খুঁজে পায়নি। গদ্যের একটি নিজস্ব রূপ আছে 'যা মূলতঃ চিন্তাবাহী যার অন্বয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করে।'[২] বাংলা গদ্যের এই যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে

১ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: উনিশবিশ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য', পৃঃ ১০৫
২ ঐ : ঐ 'বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৪১

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের হাতে। তিনি শুধু বাংলা গদ্যের সহজ শ্রীটিকেই আবিষ্কার করেননি, সেই সঙ্গে চল্‌তি গদ্যভাষাতেও সাহিত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা গদ্যের দুটি রীতি প্রায় প্রথম থেকেই চলে আসছে—একটি সংস্কৃতানুসারী সাধু-ভাষা, অন্যটি কথ্যভাষাশ্রয়ী চলিত ভাষা। দুটিতেই সাহিত্যচর্চা শুরু হয় স্বামীজীর জন্মেরও আগে। বিভিন্ন মনীষীর গবেষণা ও অনুশীলনের মধ্যে সাধুভাষা পরিণতরূপ লাভ করলেও চল্‌তি ভাষা তখনও পূর্ণতা পায়নি। সাহিত্যে চলিত ভাষা কতখানি মৌখিক বা কথ্যপ্রয়োগের অনুসারী হবে এবং কতখানি পরিশীলিত হবে তা নিয়েও বিদ্বৎসমাজে বিতর্কের সীমা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলা গদ্যের এই ভাঙা-গড়ার কাজ শেষ হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যের একটি বাঁধা পথ প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা, মধুসূদনের কাব্য ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। স্বামীজীর জীবনীকারেরা জানিয়েছেন শুধু শাস্ত্র ও দর্শন নয়, সমসাময়িক নাটক-নভেল-মাসিকপত্র, সংবাদপত্র ও সাময়িক রচনাও তাঁকে আকৃষ্ট করত।[৩] তাঁর মধ্যমভ্রাতাও স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী"-র কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি তামাশার কথা হইলেই তিনি সধবার একাদশীর কোন বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। নীলদর্পণ হইতেও মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন।'[৪] পরবর্তী কালেও স্বামীজীর রচনায় 'সধবার একাদশী'র উদ্ধৃতি চোখে পড়ে, যেমন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' 'ব্যাতন না জানলে বোত্র অবোত্র বুঝবো ক্যাম্‌নে ?' স্বামীজীর সামনে সাধু ও চলিতের উভয়রূপই বর্তমান ছিল। তাঁর রচনায় রাবীন্দ্রিক প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত না হলেও তিনি যে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, অপরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলো-চনাতেও বিশেষভাবে উৎসাহিত হতেন তারও নিদর্শন আছে।[৫] বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রূপ ও তার শক্তি সম্বন্ধে যে আগ্রহ ও প্রশ্ন তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যপাঠের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল পরবর্তী কালের সাহিত্যচর্চার মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটল। সাধু ও চলিত উভয় ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা থাকলেও স্বামীজী কলকাতার ভাষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা সাহিত্যকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

বাংলা ভাষার চলিতরূপ

বাংলা সাহিত্যজগতে গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় চলিত ভাষা জন্মলাভ করেছে। বাস্তবিকপক্ষে কোন লিখিত প্রমাণ না থাকলেও চলিত ভাষাকে সাধুভাষারও পূর্ববর্তী বলা চলে, কারণ এ ভাষার প্রকৃত স্থান জনসাধারণের মুখে। বাঙালী যখন কাব্য ও পাঁচালী চর্চায় রত ছিল তখনও সে নিশ্চয় কথা বলত এবং সে ভাষা ছিল চলিত বা কথ্য ভাষা। প্রাত্যহিক কথ্য ভাষাই সাহিত্যে চলিত ভাষার রূপ নিয়েছে। চলমান জীবনের বহতা ধারাই তার প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু। তাই অনেক সময় দেখা গেছে সাহিত্যিক ভাষা-রূপে স্থায়িত্বের মর্যাদালাভ করলেই চলিত ভাষায় জড়ত্ব আসে এবং মৃত্যু ঘটে। তখন নতুন করে

---

৩ প্রমথনাথ বসু : স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৫০

৪ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬২—১৬৬

৫ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ২৭

আবার চলিত ভাষার অনুসন্ধান করতে হয়। শোনা গেছে, বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষা জনসাধারণের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে পালিকে কেউই নিজের ভাষা বলে গ্রহণ করেনি। একটা কৃত্রিম ভাষারূপেই পালি দূরে সরে রইল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। প্রথম থেকেই চলিত ভাষা অকৃত্রিম প্রাণাবেগে পূর্ণ ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের রীতি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সময় সাধুভাষার কাঠামোতে চল্‌তি ইতর গ্রাম্য শব্দ ও বাক্যরীতিকেও স্থান দিয়েছিলেন। পরে কয়েকজন মনীষীর রচনার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে এ ভাষা বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে।

সচেতনভাবে চলিত ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা)। সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা চলিত ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। চলিত ভাষার তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গীর অসামান্য শক্তি এই দুই লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সরল স্ত্রীপাঠ্য বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্য 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এরও মাধ্যম ছিল চলিত ভাষা। প্যারীচাঁদ একেবারে মৌখিক ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' না লিখলেও তিনি সাধুভাষার সঙ্গে কলকাতার চল্‌তি বুলির সাহায্য নিয়ে উপন্যাসটি রচনা করেন। এদিক থেকে তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উত্তরসূরী বলা যায়। বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাক। আমরা হানা ক্যাথারিন্স ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', লালবিহারী দে-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' কিংবা উইলিয়াম কেরীর গদ্য রচনাগুলিকে এ প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিয়েছি; কারণ এগুলি আমাদের মূল বিষয়ে পৌছতে বিশেষ সাহায্য করে না।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার উদাহরণ—'কেমন এখন হইল। যেমন মতি তেমনি গতি। ভাতারের গরবে ভুঁয়ে পা পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে? আয় দেখসিয়া, কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল।' (প্রবোধ চন্দ্রিকা) প্যারীচাঁদ লিখছেন, 'বাঞ্ছারাম বাবু তেড়ে আসিয়া বলিলেন, —গোলমাল করিয়া শ্রাদ্ধ ভণ্ডুল করিলে পরে বুঝ্‌ব—একেবারে বড় আদালতে এক শমন আনব —এ কী ছেলের হাতের পিটে?—বক্রেশ্বর বলেন তা বইকি আর যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি তো সামান্য ছেলে নন, তিনি পরেশ পাথর।··· অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিল, "কার শ্রাদ্ধ কে করে খোলা কেটে বামুন মরে" এই বেলা সরে পড়া শ্রেয়—ছবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারান যাবে?' (আলালের ঘরের দুলাল)

এখানে সাধু ও চলিতের মিশ্রণে ভাষা অনেক সহজবোধ্য হয়েছে। আধুনিক বিচারে এই ধরনের বাক্যবিন্যাস গুরুচণ্ডালীদুষ্ট এবং স্পষ্টতই শ্রুতিকটু। কিন্তু প্রাক্‌রবীন্দ্রপর্বে কেউই এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। এমনকি নাট্যকারেরাও নয়। স্বামীজীর অনেক রচনায় এই মিশ্রণ চোখে পড়ে, তবে সে রীতি স্বতন্ত্র, কখন কিছুটা ইচ্ছাকৃত, কোথাও বা অন্যমনস্কতাবশত।[৬]

কলকাতার মৌখিক ভাষা যাবতীয় বিকৃতিসহ

৬ 'ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়, তাই তোদের বলি দেখে শুনে দিতে।'—'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন) ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩

প্রথম সাহিত্যে স্থান পেল কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে। হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে তিনি সেযুগের কলকাতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। চাবুক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার চল্‌তি বুলিকে, 'তিনি যেন পণ করেছিলেন, "মুখের কথা যা জিভ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তা ভালোমন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, গ্রাম্য নাগরিক—যাইহোক না কেন তিনি ব্যবহার করবেন।"'[৭] সাহিত্যে মৌখিক ভাষার প্রয়োগ কষ্টকর, হুতোম সেই কষ্টসাধ্য কাজই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেযুগের তুলনায় আশ্চর্য সচেতনতা নিয়ে তিনি এই নকশা রচনা করেছিলেন—কোথাও সাধু চলিতের মিশ্রণ ঘটেনি।

জনমানসে 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আলোড়ন জাগিয়েছিল প্রধানতঃ ভাষার গুণে। কিন্তু সাহিত্যজগতে প্রতিনিধিমূলক ভাষা রূপে এদের ভূমিকা খুব বেশি নয়। মধুসূদন 'আলালী ভাষা' এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোমী ভাষা'য় কোন সৌন্দর্য খুঁজে পাননি। নবসৃষ্ট এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আলালী ভাষা ও হুতোমী ভাষা সমাদর লাভ করতে থাকে নাটক ও প্রহসনের সংলাপের মধ্যে। নাটকের সংলাপই প্রাণ। সংলাপের ভাষায় চল্‌তি বাগভঙ্গী না থাকলে তাতে প্রাণ-সঞ্চার হয় না। তাই নাটকে মুখের ভাষাই প্রাধান্য পায়। এমনকি যে মধুসূদন আলালী ভাষাকে 'The language of fisherman' বলেছিলেন তিনিও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুখানি রচনার সময় আলালী ভাষাকেই গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সুললিত ও সংস্কৃত অনুসারী তৎসম শব্দপ্রধান ভাষার পাশে পাশে এভাবে চলিত ভাষাও একটি স্থান অধিকার করল। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় Calcutta Review পত্রিকায় চলিত ভাষার স্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বকর্মে তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন।[৮] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেননি। সরল ভাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁর মতে, 'যিনি যত বলুন, লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।'[৯] তবু মৌখিক ভাষা বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রাণাবেগপূর্ণ সার্বজনীনতা নিয়ে আবির্ভূত হল আরও কিছুদিন পরে।

কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্য

কলকাতার ভাষা কোন স্বতন্ত্র ভাষা নয়, কলকাতা অঞ্চলের অধিবাসীদের মৌখিক ভাষাকেই কলকাতার ভাষা বলা হয়, চলিত ভাষার সঙ্গে এর পার্থক্য সামান্যই। সাহিত্যের ভাষা বা লেখ্য ভাষার একটা বাঁধা রীতি থাকে, মুখের ভাষায় তা থাকে না। তাই অঞ্চলভেদে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা গড়ে ওঠে। পুরুলিয়া থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত লেখ্য ভাষার নিয়ম এক হলেও কথ্য ভাষার মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নেই। একজন মেদিনীপুরবাসীর কাছে চট্টগ্রামের ভাষা চীনা ভাষার মতোই দুর্বোধ্য, চট্টগ্রামের লোকের কাছেও মেদিনীপুরের ভাষা তথৈবচ। সুতরাং একেবারে মৌখিক ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি কিছুটা অসুবিধাজনক। লণ্ডনের কথিত উপভাষাও একই কারণে ইংরেজ লেখকরা গ্রহণ করেননি। কলকাতার ককনির মতো সেখানেও উচ্চারণের

৭ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৪৩২
৮ ঐ : উনিশ বিশ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য,' পৃঃ ১৪৪
৯ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্কিম রচনাবলী (সংসদ), পৃঃ ৩৭৩

বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন হাসিফ্ (house-wife), টুপনী (two penny), টুয়েভ (two have) ইত্যাদি লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কলকাতায়ও এরকম নিজস্ব কিছু উচ্চারণ আছে। সাধারণতঃ আমরা চলিত ভাষা বলতে বুঝি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘু প্রয়োগ। অর্থাৎ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদকে একটু ছেঁটে কেটে ছোট-খাটো করলেই তা চলিত ভাষায় পরিণত হয় যেমন 'তাঁহাদের' পরিবর্তে 'তাঁদের', 'তাহার' পরিবর্তে 'তার', 'বলিলেন'-এর পরিবর্তে 'বললেন', 'যাইব'-র পরিবর্তে 'যাব', 'শুইয়াছিল'-র পরিবর্তে 'শুয়েছিল' ইত্যাদি। আসলে কিন্তু তা নয়। চলিত ভাষায় চল্তি জীবনের বাগবৈশিষ্ট্য, শব্দ, বাক্য এমনকি বক্তার প্রকাশভঙ্গী পর্যন্ত—তার সবটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠলে তাকে সার্থক চলিত ভাষা বলা যায়। কোন কোন প্রবাদে এই বৈশিষ্ট্য আছে,

'বাছার আমার কিবা রূপ—
ঘুঁটের ছাইয়ের নৈবিদ্যি খেংরা কাটির ধূপ।'

কিংবা

'যার জন্যে করলুম যো
সেই বলে পৈথানে শো।'

প্রভৃতি মেয়েলি প্রবাদে বক্তার ভাবভঙ্গী, ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর, ইঙ্গিতময় কটাক্ষ যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং নিহিতার্থের তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে না। চলিত ভাষায় এই লক্ষণটিই হচ্ছে প্রাণের লক্ষণ। এই চলিত ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে আঞ্চলিক ভাষা ও বাচনভঙ্গী। সেভাষা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়, হতেও পারে না। শেষে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয় কলকাতার ভাষাকে চলিত ভাষা রূপে গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল কলকাতার নিজস্ব ভাষা এখন আর কিছু নেই। 'সুতানুটি-গোবিন্দপুরের আমলে যে ভাষা লোকে বলত তা অনেকটা আজকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের ভাষার মতো বলে অনুমান করা যায়।'[১০] কলকাতার আদি নিবাসীদের ভাষা কি ছিল একবার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর মতে, 'কলিকাতার কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিকতা নাই। খাচ্চি, যাচ্চি, নিচ্চি, গেলুম, খেলুম ইহা কলকাতার ভাষা নহে। যাহারা কলিকাতার আদি নিবাসী অর্থাৎ তিলি তাম্বুলী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতি তাহাদের এ ভাষা নহে। ইহা ত্রিবেণী ও আন্দুলমৌরীর ভাষার খিচুড়ী মাত্র। এ ভাষা বা প্রাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা নহে, বরং উহাকে সাম্প্রদায়িক ভাষা বলিতে পারি। কেন না উহা বিলাত-ফেরতা বাবুদের এবং পিরালী বাবুদের ভাষা। উহাতে যশোরের আমেজ আছে, দক্ষিণ জয়নগর-মজিলপুরের ঢং আছে। আর পিরালী বাড়ির ভঙ্গীও আছে। এমন "জগাখিচুড়ী" চলে না।'[১১] অন্যত্রও তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্র-বিরোধিতায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে না থাকলে তিনি অনুসন্ধান করলে দেখতে পেতেন সাহিত্যে কলকাতার ভাষাকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর অনেক আগে বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কোন প্রাদেশিকতা যাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। তাছাড়া, তিলি-তাম্বুলী-তন্তুবায়ের ভাষার অনুশীলন কোনদিন কোন বিদ্বৎসমাজ করে না, রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী করেননি, স্বামীজীও না—কলকাতার ভাষার সহজ-বোধ্যতা ও সজীবতাই তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল।

---

১০ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: 'কলকাতার ভাষা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭৬

১১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বৈঠকী', সাহিত্য, ভাদ্র ১৩২৯ (১৯২২)

অষ্টাদশ শতক থেকেই নানা কারণে কলকাতা গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। আদিতে কলকাতা সুতানুটি-গোবিন্দপুর সংলগ্ন গ্রাম হলেও পরবর্তী কালে কলকাতা বৃহত্তম মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য বাণিজ্যিক ও অন্যান্য নানা কারণে কলকাতা অন্যান্য নগর অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে এবং সেখানে নানাদেশের নানাবর্ণের জনসমাগম হতে থাকে। ইংরেজরা যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে তখন শাসন-বিভাগ পুনর্গঠিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। এদেশের যেসব ব্যক্তি সরকারী পদ লাভ করেন তাঁরাও এসে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করলেন। তার ফলে কলকাতা বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাসস্থান হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন তখনকার কলকাতাকে বর্তমানে 'উত্তর কলকাতা' বলা হয়। উত্তর কলকাতার মিউনিসিপ্যাল বিভাগীয় ছয়-এর পল্লী বাংলার বহু মনীষীর আবাসস্থল এবং নতুন কৃষ্টির বিবর্তনে 'বাংলার এথেন্স নগরী' রূপে পরিচিত হয়েছিল।[১২] এসময় থেকেই কলকাতার ভাষা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ডক্টর অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি যথার্থ ছবি এঁকেছেন, 'উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্য সভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশী জনমণ্ডলী —যাঁরা কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরা-ফেরা করতেন নানা স্বার্থসন্ধানে, তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্য-কামী সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল।...উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার সাধ্বস-প্রবেশ ঘটল।'[১৩] সুতরাং দীর্ঘকাল ধরে সাধুভাষা সমগ্র বাঙালী-মানসকে যেভাবে এক-সূত্রে বেঁধে রেখেছিল কলকাতার মুখের ভাষাও সেই যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হল। অন্য কোন উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে যা কখনই সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণে কলকাতার ভাষারও পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, প্রথমে "সাথে" শব্দটা পূর্ববঙ্গীয় সংলাপে শোনা যেত, কলকাতা অঞ্চলে বলা হত 'সঙ্গে'। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক "সঙ্গে" কথাটা "সাথে"র কাছে হার মেনে আসছে।'[১৪] এভাবে কলকাতার ভাষা সর্ব-জনীনতা লাভ করেছে। উনিশ শতকের মনীষীরাও কলকাতার ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে আবিষ্কার করলেন এবং সাহিত্যে প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যের পরিধি অনেকখানি প্রসারিত করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অসাধারণ ধীশক্তির দ্বারা সহজেই কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম তিনিই এই ভাষাকে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, 'বাংলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।'[১৫] সংশয়হীন দৃঢ়তা নিয়ে তিনি আরও জানালেন, 'পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্

১২ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬৫
১৩ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: উনিশ বিশ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য', পৃঃ ১৪২
১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলা ভাষা পরিচয়, পৃঃ ১৪৭
১৫ 'বাঙ্গালাভাষা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫—৩৬

ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত কলকেতার ভাষাই চলবে।'[১৬] যুক্তি দিয়ে স্বামীজী বললেন, 'কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সেকথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।'[১৭]

স্বামীজীর উক্তি আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যে সেদিন (১৯০১) অভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেকথা বোঝা যায় আরও দশ-বারো বছর পরে, যেদিন প্রমথ চৌধুরী বললেন, 'আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল প্রদেশেরই বাঙালী ভদ্রলোকের মুখের ভাষা প্রায় একই রকম হয়ে এসেছে। প্রভেদ যা আছে সে শুধু টানটুনের। লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণদেশী ভাষা, যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত সমাজেরও মুখের ভাষার ঐক্যসাধন করছে। ...আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে।'[১৮] প্রমথ চৌধুরী একথা বলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথও কলকাতার ভাষার সার্বজনীন আবেদন উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং এর যৌক্তিকতা বিচার করে বলেছিলেন, 'সমস্ত বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে, তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে।...সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে ছাঁদে ক্রমশঃ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতেই কলিকাতা আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।'[১৯] ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন। আরও কয়েক বছর পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, 'যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।'[২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কলকাতার ভাষার সর্বজনীনতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি পড়েছিল। তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতার ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বামীজীর মতো বলতে

১৬, ১৭ 'বাঙ্গালা ভাষা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫—৩৬

১৮ প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', পৃঃ ৩১৮

১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ভাষার কথা', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড (শতবার্ষিক সংস্করণ), পৃঃ ২১০

২০ ঐ : বাংলা ভাষা পরিচয়, পৃ : ৪৭

পারেননি 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না।'[২১] বরং তাঁরা চেয়েছিলেন কিছুটা পরিশীলিত কলকাতার ভাষাকে, যার অঙ্গে কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা শহরে 'ককনি' ভাষার ছাপ নেই। খাস কলকাতার ভাষার অশালীন ও বিকৃত উচ্চারণ তাঁরা বর্জন করতেই চেয়েছিলেন। স্বামীজীও অশালীন ভাষাকে গ্রহণ করেননি তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি লেখার ভাষায় রাখতে চেয়েছেন ভাবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে। যেমন, 'হাত চুবড়ে সপাসপ ডাল ভাত খাই' কিংবা 'এ ছুঁৎছাঁতের স্যাটার কাছে আমাদের দিশি ছুঁৎছাঁৎ কোথায় লাগে'। এখানে 'চুবড়ে' ও 'স্যাটা' শব্দ ভাব প্রকাশে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথও ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দ বাছাইকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন,'রামপ্রসাদ বলেছেন: আমি করি দুখের বড়াই। "বড়াই" বর্গের অনেক ভারি ভারি বর্গের কথা ছিল: গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু দুঃখকেই বড়ো করে নিয়েছি বলবার জন্যে অমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলা ভাষায় নেই।'[২২] এই নিতান্ত সহজ অথচ শক্তিশালী শব্দসন্ধানের জন্যই স্বামীজী কলকাতার ভাষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর আগে জীবনের সবরকম অনুভূতিকেই চল্‌তি ভাষায় প্রকাশ করার কথা কেউ ভাবেননি।[২৩] জীবনের সর্বস্তরে কলকাতার ভাষা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে অত্যন্ত যুগোপযোগী পথের সন্ধান দিলেন।

উনিশ শতকের রচনায় কলকাতার ভাষা

কলকাতার চল্‌তি ভাষায় সাহিত্যচর্চার চেষ্টা স্বামীজীর আবির্ভাবেরও আগে শুরু হয়েছে। স্বামীজী যখন 'উদ্বোধনে'র জন্য বাংলায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন তার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লেখা হয়। তবুও স্বামীজী এই ভাষায় এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন যা পূর্বে ছিল না। এই বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য স্বামীজীর পূর্ববর্তী ও সমকালীন লেখকবৃন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কলকাতাবাসীর মৌখিক ভাষা সর্বজনীনতা লাভ করলেও এই ভাষায় অপর প্রদেশের ভাষার অবাধ মিশ্রণ যেমন ঘটেছে তেমনি কিছু বিকৃতিও স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ বিকৃতিগুলি সযত্নে বর্জন করতে চান। বিকৃতি সর্বদাই বর্জনীয় সেজন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু স্বামীজী অশ্লীল ও শ্রুতিকটু শব্দ বর্জন করলেও সর্বত্র কলকাতার ভাষাবৈশিষ্ট্যকে বর্জন করেননি বরং ভাবপ্রকাশের সহায়ক রূপে গ্রহণ করেছিলেন একথা আগেই বলেছি। কলকাতার মৌখিক ঢং যেমন, কলকাতা>কলকেতা, আম>আঁব, বিয়ে>বে, লিচু>নিচু এসবও তাঁর লেখায় অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

প্রধানতঃ ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করার

২১ 'বাঙ্গালা ভাষা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫
২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলাভাষা পরিচয়, পৃঃ ৫৭
২৩ ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ: বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৮

জন্তেই প্রথম যুগের লেখকেরা কলকাতার ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র সহজ-বোধ্যতার জন্তেই চলিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সাধু চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা মিশিয়ে একটি মিশ্র ভাষা তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর মতে সেটিই ছিল ভবিষ্যতের আদর্শ ভাষা।[২৪] প্রথম প্রকাশের পরে 'আলালের ঘরের দুলাল' জনচিত্তে সাড়া জাগাতে পেরেছিল।

'আর বামুন, তুই যদি হ য ব র ল শিথাইতে আমার নিকট আর আসবি ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায়শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব। কিন্তু বাবার কাছে গিয়া এ কথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারঝিঁ ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে।'[২৫] এখানে চলিত ভাষা প্রাধান্য পেলেও ক্রিয়া পদগুলিতে সাধু প্রয়োগই বেশি যেমন—শিথাইতে, ফেলিয়া দিয়া, ঘুচাইয়া দিব, ঝাড়িব, খুলিতে হইবে প্রভৃতির সঙ্গে বল্লে, ভাবছিস, এগারঝিঁ, নোয়া শব্দ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আলালী ভাষা পুরোপুরি কলকাতার ভাষা হয়ে ওঠেনি, এমনকি চলিত ভাষাও নয়, তবে কলকাতার ভাষা থেকে তিনি বহু শব্দ ও বাগবৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করেছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের পরে সময়ের দিক থেকে এর পরেই লেখা হয় মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। আলালী ভাষা মধুসূদনের ভাল না লাগলেও প্রহসন রচনার সময় তিনি ঐ ভাষায় শক্তিকে অস্বীকার করেননি। কারণ শাণিত ব্যঙ্গে সমাজকে কশাঘাতে জর্জরিত করতে হলে আগ্রৎ ভাষার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মুখের ভাষার জোরালো ভাবকে তিনি প্রহসনের মধ্যে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করলেন,

'আঃ কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল। কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কী? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম। এখন করি কি? হেঁ ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল আসান আসচে, ওর পিছনে আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি'[২৬]— এ ভাষা আলালী ভাষার থেকে খুব পৃথক নয়, বরং সমগোত্রীয়। সুতরাং মাইকেল নাটকের ক্ষেত্রে যে আলালী ভাষা বা কলকাতার চলিত ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর লেখাতেও 'দেকতো না', 'খুঁজবো গা', 'রোঁদ ফিরতে বেরুয়েচে', 'কলকেতায়', 'দেখিইচো', 'ঘুমুচ্চিস', 'মুড়ো খ্যাংরা দে বিষ ঝাড়বো' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যা একান্তভাবে কলকাতার আদিভাষা রূপেই পরিচিত। [ক্রমশঃ]

২৪ 'আমার প্রবর্তিত এই রচনা পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে'—নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি, পৃঃ ৮২—৮৩

২৫ প্যারীচাঁদ মিত্র : 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদ রচনাবলী (মণ্ডল), পৃঃ ৭

২৬ মাইকেল মধুসূদন দত্ত : 'একেই কি বলে সভ্যতা', মধুসূদন রচনাবলী (সংসদ), পৃঃ ২৪৫

কবিতা

আপনারে নিবেদন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখনি মূর্তি লভে।
মাধবী নিজেরে দেয় রূপে গন্ধে বর্ণমহিমায়,
নিজেরে সুন্দর ক'রে পায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ বৈশাখ
১৩৩০

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের নিজ হস্তাক্ষরে লিখিত অপ্রকাশিত এই কবিতাটি শ্রীমতী নিবেদিতা বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত। লক্ষণীয় যে কবি স্বয়ং কবিতাটির কোন নামকরণ করেননি। কিন্তু আমরা পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে কবিতাটি 'নিবেদন' নামে প্রকাশ করলাম।

নিবেদন

আপনারে নিবেদন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখনি মূর্তি লভে।
মাধবী নিজেরে দেয় রূপে গন্ধে বর্ণমহিমায়
নিজেরে সুন্দর ক'রে পায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ বৈশাখ
১৩৩০

শান্তিনিকেতন

দিব্য শ্রুতি

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক : শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

'Divine Hearing'-এর অনুবাদ। অনুবাদক পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অন্তেবাসী—
চিন্তাশীল লেখক ও কবি।

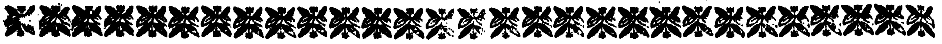
সব শব্দ, সমস্ত মুখের কথা আজ হয়ে উঠেছে তোমারই
কণ্ঠস্বর···সঙ্গীত, বজ্রের ধ্বনি আর পাখির কাকলি, এজীবনের
সুখদুঃখময় সমস্ত কোলাহল, মানুষের কণ্ঠের সুরেলা স্বর আর তার
বাণী।
সাগরের হাসির বিপুল আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আকাশের নীরব
বুকে ডানামেলে উড়ে যাওয়া প্লেনের খুশির ডাক, এই মাটির
কোলে মোটরগাড়ির আরও বেগে এগিয়ে চলার বিজয় সঙ্গীত,
যন্ত্রের অনিচ্ছুক ক্লান্তিকর গুঞ্জন।
বাতাসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত সাইরেনের গর্জন—যেন
শূন্যের বুকের বাঁশী নিয়ে আসে কোন্ সুদূরের আহ্বান আর
রহস্যকে···জাগে সূর্যকরোজ্জ্বল দেশের আর সাগর পারের স্মৃতি—
এখন এ সমস্তই হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য সুর—লহরী আর
তোমারই মূল স্বরূপ···
অলক্ষিতে আসে অন্ধ হৃদয়পথে এক গোপন
সুসঙ্গতি···আজ সবই হয়ে উঠেছে কী সুন্দর—তুমি
আছ বলেই···

খণ্ড খণ্ড নয়, অখণ্ড উত্তরণ

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

নেহেরু-পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী। কলিকাতা সিটি কলেজের বাঙলা
বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক।

সকলেই আলোতে এসে প্রত্যক্ষ হতে চায়,
অন্ধকারে একাত্ম হতে চায় কয়জন।
সকলেই পর্বতের মাথায় উঠতে চায়,
পর্বত হতে চায় কয়জন।
সকলেই উজিয়ে উঠতে চায়, বা
ভাঁটিতে ভাসতে চায়—
প্রবাহ হতে চায় কয়জন।
সকলেই কাদা থেকে সরে থাকতে চায়,
কিংবা কাদা দিয়ে পুতুল গড়তে চায়,
কিন্তু কাদা মাটি হয়ে থাকতে চায় কয়জন।
তুমি আলো থেকে অন্ধকারে একাত্ম হও,
পাদদেশ থেকে পর্বত হও,
উৎস থেকে সঙ্গম হও,
পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হও।



শরত

'বৈভব'

শরত সূর্য ঝলমল করে
নির্মল আকাশে
স্বচ্ছ শিশির টলমল করে
চঞ্চল বাতাসে।

শুভ্র মেঘেরা খলখল ক'রে
হাল্কা হাসিতে ভাসে
পাগল নদী যে কলকল ক'রে
চলে সাগরের পাশে।

বরষাসিক্ত সাধনার পারে
শরতের পরশে
প্রকৃতি আজিকে পূর্ণ যেন রে
সার্থক হরষে।

মহা আবির্ভাব ঃ উদ্বোধন

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

রবীন্দ্র-পুরস্কারে অলংকৃতা বঙ্গভারতীর প্রবীণা সেবিকাদের অন্যতমা। কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের যশস্বিনী লেখিকা।

মহা-যুগ-বাণী বুকে আঁকি আবির্ভূত উদ্বোধন
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বর কর রে বরণ।
যুগ যুগ কবি ঋষি মুনিজন অন্তর সম্পদ
'শৃণ্বন্তু' বেদাহং বাণীময় বিশ্ব উপনিষদ্।
রাজর্ষি জনক। হরি-ভক্তি-প্রাণ দেবর্ষি নারদ।
বুদ্ধ খ্রীষ্ট চারিপীঠাচার্য শঙ্কর মহম্মদ
তুলসী কবীর মীরা সুরদাস চৈতন্য নানক।
'যত মত তত পথ' জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি কর্মপথের সাধক
পক্ষ-মাস-ক্ষীণতনু আবির্ভূত উদ্বোধন জাগাতে জগত।
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
মহাবাণী বক্ষে ধরি চিরন্তন যুগ যুগ ধন
উদ্বোধিতে বিশ্ব মহাযুগ
উদ্বোধন বিশ্বের শরণ।

দেবতা পূজা

ডক্টর মায়াধর মানসিংহ

অনুবাদক : শ্রীসুধাংশুশেখর রায়

প্রয়াত ডক্টর মায়াধর মানসিংহ ওড়িয়া সাহিত্যে সর্বকীর্তি প্রাবন্ধিক ও কবি। তাঁর মূলে ওড়িয়া কবিতা 'দেব-পূজা'কে অনুবাদ করেছেন ওড়িষ্যার ভদ্রকস্থ চারম্পা কলেজের অধ্যক্ষ—যিনি ওড়িয়া এবং বাঙলা উভয় সাহিত্যক্ষেত্রেই যশস্বী।

শুদ্ধ, পূত হয়ে পুরোহিত
কার পূজা কর হে মন্দিরে ?
সৃষ্টি যাঁর উদার আলোক
থাকেন কি তিনি অন্ধকারে ?
অন্ধকারে মুদ্রিত নয়নে
দেখিবার কেন এ প্রয়াস ?
চক্ষু মেলি দেখহে আলোকে
কি সুন্দর তাঁহার প্রকাশ !
অন্তর হইতে অন্তরীক্ষ—
সর্বব্যাপী যে ভুবনেশ্বর
ক্ষুদ্র, রুগ্ন অন্ধকার গেহে
কেন তাঁর আরাধনা কর ?
দেখ দেখ পশ্চাতে সম্মুখে
শত শত নরনারায়ণ ;
ইহাদের পেছনে ফেলিয়া
দেবতারে লভিবে ব্রাহ্মণ ?
দেবতারে ছুঁতে ভয় কর ;
তাই তাঁরে রাখিয়া বাহিরে
কর তুমি কার আরাধনা
মন্দিরের তুচ্ছ অন্ধকারে ?
কে বলে এ পুণ্য ? এ যে পাপ,
সেই পাপে মূক যে দেবতা ;
যত কর পূজা বা আরতি,
তিনি কভু না কহেন কথা।

এই পাপে এই দেশ হতে
দেবতার ঘটেছে প্রয়াণ ;
আজ তাই দেউলে দেউলে
বিরাজিত কাষ্ঠ ও পাষাণ।
কাঠ-পাথরের পূজা ছেড়ে
পূজা কর জীবন্ত দেবতা,
আঁখি হতে অশ্রু যার বহে
শুনিলে মধুর একটি কথা।
আরতি ও মন্ত্রপাঠ থাক,
মন্দিরের বাহিরে দেবতা
হাত পেতে রয়েছেন ওই,
দাও তাঁরে সেবা ও মমতা।
দেব-ভোগ নিরন্নেরে দাও,
দেব-সেবা দাও মানবেরে ;
দেবতার পুণ্য দরশন
কর মানবের ঘরে ঘরে।
যে পূজাতে হবেন বাঙ্ময়
অতি ত্বরা মূক ভগবান ;
শোনা যাবে প্রতি প্রতিবেশি-
কণ্ঠে ঈশ্বরের প্রেমগান।
এস ভক্ত, এস পুরোহিত
যেওনা হে আর অন্ধকারে ;
বিধাতার বিমল আলোকে
খুঁজে পাবে মূর্ত বিধাতারে।

আনন্দ

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কবি—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ কালচারের সঙ্গে যুক্ত।

প্রত্যেক মানুষ আনন্দ খুঁজছে।
আনন্দ কোথায়?
প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের ছোঁয়া না থাকলে
মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে!
প্রত্যেক মানুষ আনন্দ খুঁজছে:
আনন্দ কোথায়?
হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখেছি
কিছু লোক স্তব্ধ হয়ে দেখছে—
আপন মনে হাসছে—কারও চোখে জল।
বিরাটের কাছে নত হওয়ার আনন্দ।
সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে অনন্তের ডাক শোনে।
যে-মানুষের মধ্যে সমুদ্রের গভীরতা আছে,
হিমালয়ের স্তব্ধতা,
তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ।

এদের দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি,
ধীরে ধীরে মনের সমুদ্রে ভেলা ভাসাই।
মনের মধ্যে যে দ্বীপটা লুকোনো আছে,
যে-দ্বীপ তারার মালায় সাজানো,
যে-দ্বীপে কেবল বাতাস কথা বলে,
চাঁদ আলো দেয়—
আমি সেই দ্বীপে চলে যাই।
কিছুক্ষণ কাটিয়ে জীবনের বৃত্তে ফিরে আসি।
প্রশ্ন শুনি—এত আনন্দ কোথায় পেলে?

শুধু তোমারই

শ্রীসুনীল বসু

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি—'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত।

তোমার সঙ্গে আজকাল দেখাসাক্ষাৎ-ই হয় না
এ-জন্য মনের গভীরে একটা তীব্র দুঃখবোধ সবসময় টের পাই
সময় চলে যাচ্ছে হাজাররকম অপ্রয়োজনীয় কাজে
আমি জড়ানো,—প্যাঁচানো, এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়
কোনোদিন বেরিয়ে এসে একটু তোমার কাছে যাব, একটু বসব—
তা আর হয় না

আমি কি বদলে গিয়েছি, বদলে যাচ্ছি, তালপুকুরে
যেন কতদিন ডুব দিই না, গভীর মাঝরাত্রে
কতদিন জোছ্‌নার রুপোলি রোঁয়া মেখে স্নান করে উঠি না
কতদিন কড়ি-পাথরের মতো তোমার মেঘের বাড়ির দিকে
একদৃষ্টে ফিরে তাকাবার সময় পাই না—

আমাকে ভুলে যেও না, ভুল বুঝো না, আমি তোমারই আছি
হাওয়ায় অবশ্য গন্ধ টের পাই, জলে চাঁদের নৌক দুললেই
বুঝতে পারি তুমি আসছ, চোখে জল এলেই,
বুঝতে পারি, তুমি ডাকছ

যেদিন ব্যথায় একটু শীত-শীত করে, জ্বর-জ্বর ভাব হয়,
আচ্ছন্নতা আসে, আমি বুঝতে পারি, এ তোমার
জোয়ার ফুলে উঠছে, তোমার ছোঁয়া লাগছে

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি তোমার ; যেখানেই যেভাবেই
আমি থাকি, আমি শুধু তোমার, তোমারই।



বোধন

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ কবি ।

নিদ্রারূপে মহামায়া
        বিরাজেন যে বিশ্বময়,
কালরাত্রি মহারাত্রি
        মোহরাত্রি চণ্ডী তাঁরে কয় ।
    যদি বুঝি বলতে বোধন
    পূজা নিতে তাঁর জাগরণ,
সুপ্তি থেকে জাগিয়ে তোলা
        কভু সহজসাধ্য নয়,
ভুবনজোড়া কোলাহলে
        যাঁর নিদ্রার নাহি লয় ।

চৈতন্যময়ী যোগমায়া
        থাকেন সদা যোগে লীনা,
জাগানো তাঁরে পূজার তরে
        সম্ভবে না সাধন বিনা ।
    নিজেরা থেকে তন্দ্রামগন
    মোহঘুমে ঢুলছে নয়ন,
কেমনে ভাবি মিলবে এবে
        মার বোধনের পরিচয় ?
নিজেরা আগে উঠলে জেগে,
        জাগরণ মার তবে হয় ।

তবেই মহাষষ্ঠীসাঁঝে
        বিল্ববৃক্ষে মায়ের বোধন
হয় সার্থক, হয় সত্য
        পূজার শুভ উদ্বোধন ।
    বিল্বপত্রের তিনটি দলে
    তিন দেবের আসন মেলে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সেথা রন,
        সুসাধিতে সৃষ্টি স্থিতি লয়
সদা তাঁরা উন্মুখ থাকেন
        ঘোষিতে বৃত্তরূপার জয় ।

বৃত্তরূপা আর কেহ নয়,
        মহামায়া শক্তি তাঁরে বলি,
তাঁর দয়াতে মোক্ষপথে
        চলি সকল বাধা ঠেলি ।
    মায়ের জাগার সাথে সাথে
    আজ বোধনের দিন হতে
সজাগ যেন সদাই থাকি
        দূরে ফেলে মোহনিদ্রা ভয়,
চেতনচিত্ত সব দশাতে
        কিবা সৃষ্টি কিবা স্থিতি লয় ।

স্বখাত সলিলে

শ্রীআনন্দ বাগচী

খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক ও সংবাদ-সাহিত্যিক—বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের বাঙলা ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিযুক্ত।

গালে স্তোকবাক্য যেন সাবানের ফেনা, নিচে ক্ষুর
হাতের মুঠোর মধ্যে আইন যেভাবে ধরা থাকে
দ্রুতশ্চল ক্ষুরধার, উল্টো পাল্টা যখন যেমন,
তারপর প্রসাধন, সুগন্ধি তরলে ভেজে মুখ
চুল-চেরা বিচারের মতো ব্যস্ত রঙীন চিরুনী ;
সংসার এভাবে চলছে অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে,
আয়নায় নজরবন্দী : ঘুরে ফিরে নিজেকেই দেখা।

কুলকুচো করার পর অগভীর জলে মুখ ডোবে
ভাসান ছবির মতো : জলরঙা প্রতিকৃতি কাঁপে,
ক্ষুদ্রতা এখন এমনি পরিপার্শ্ব লুব্ধ হাতে ছোঁয়া,
আত্মরতি ঘুরে ঘুরে দিনরজনীর জপমালা,
ঈশ্বর বিশ্বাসে আছে, নিঃশ্বাসে আসেনি।
মন্দিরে ঠেকাই মাথা, বটতলার মসৃণ পাথরে
আজন্মের ভাষা শুধু—দাও, দাও! কৃতঘ্ন ভিক্ষুক
বড় সাহেবের সামনে কচলানো উচ্ছিষ্ট দুই হাত
কপালে ঠেকাই ধূর্ত পূজোর বেদীর সামনে গিয়ে॥

কেন এ সংশয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

শিক্ষাব্রতী, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গীতিকার।

যখন বিষণ্ন মন আচ্ছন্ন সংশয়ে,
আলো খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হতাশা-জর্জর ;
মুক্তি চাই—অন্তরে কী ব্যাকুল পিপাসা :
'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে'—
বার বার মনে মনে এই মন্ত্র জপে ;
তখন তোমার দূত আলোকবর্তিকা
হাতে নিয়ে আসে, বলে, 'কেন দীর্ঘশ্বাস ?
আঁধার থাকুক্, আলো রয়েছে, দুচোখ
মেলে তুই দেখ্ আর কান পেতে শোন্,
সেই অনাহত ধ্বনি চির আনন্দের
বাজে নিত্য—দূরে ফেল্ সকল সংশয়,
মুছে ফেল্ বেদনার সব আঁখিজল।
এই স্নিগ্ধ আলো আর এ আনন্দধ্বনি
সাথী হোক্ তোর ওই সম্মুখের পথে।'

উদ্বোধনের জন্য

বেগম সুফিয়া কামাল

বাংলাদেশের যশস্বিনী কবি।

গিরিশীর্ষ লঙ্ঘি যায় সৎ কৃতীর সুউচ্চ শিখর
মহাকাল সবিস্ময়ে দাঁড়ায়ে নিথর
যুগ যুগ ধরি
হেরিছে সে কর্মধারা শত ধারে ঝরি
বহিয়া আসিছে সিন্ধু হয়ে
মানুষের সাধনায় সেবার করুণা-ধারা লয়ে।
যুগস্রষ্টা মহাপ্রাণ মানুষেরা আসে
অন্ধকার উদ্ভাসিয়া মানস আকাশে
আলোকের রশ্মি করে দান
তমসা বিদীর্ণ করি জাগে মহাপ্রাণ।
দ্বেষ, হিংসা, কলুষের আবর্ত মন্থিয়া
সাম্য, সেবা, সত্য যাহা উঠে উদ্ভাসিয়া
মর্তে সেই মানবেরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে
উপেক্ষিত, অনাদৃত মানুষের হৃদয়ের কাছে।
নিত্য নিত্য তাঁহাদের স্মরণের নব উদ্বোধন
বিস্মৃতি নির্মোক হতে হয় উন্মোচন
জগতে প্রকাশে মহিমায়
মানব কল্যাণ মন্ত্র সত্যের দীক্ষায়।

বিবেক-বার্তা

শেখ সদরউদ্দীন

প্রধান শিক্ষক, প্যানিহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ,—সুপরিচিত কবি ও গীতিকার।

অন্ধকারের বক্ষ ভেদি পূর্বাকাশে সূর্যোদয়—
বসুন্ধরা আলো করে এল দেখি জ্যোতির্ময়।
আলোয় আলোয় পূর্ণ হল এই ধরণীর সকল ভূমি,
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভা নিয়ে হে, বীর-বিবেক, এলে তুমি।

তুমি এলে মহাতেজে ধুয়ে দিতে মনের কালি—
প্রাণের জরা-শুষ্ক পাতায় দিলে তুমি আগুন জ্বালি।
সেই আগুনে পুড়ে গেল মনের জমাট যত গ্লানি—
নতুন যুগের ধর্ম-মতের বার্তা তব দিলে আনি।

কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, সমান হেথা সকল জীব—
বিশ্ব-প্রাণের মাঝখানেতে বসে আছেন মহান্ শিব।
বিশ্ব-পিতার মহিমাতে নানান্ জাতি-ধর্ম ভেদ,
শিক্ষা দিলে সমন্বয়ের মুছে দিয়ে মনের ক্লেদ।

হানাহানি-ভেদাভেদে দুর্বল হয় জাতি-দেশ,
তাইতো তুমি চেয়েছিলে ভুলুক মানুষ দ্বন্দ্ব-দ্বেষ।
বর্ণ-বিচার, ধর্ম-ভেদে মানুষ অনেক ছোট হয়—
এই বাণীরই আলোকপাতে তোমার প্রাণের সূর্যোদয়।

হিংসা-ভরা পৃথিবীতে আজকে ধরায় শান্তি নাই—
তোমার অমর বাণী নিয়ে আজকে আমরা বাঁচতে চাই।
তোমার শান্তি-শুভেচ্ছা-প্রেম দিক্-বিদিকে আবার ছুটুক,
মহাজীবনের উদ্বোধনে এ ধরণী বেঁচে উঠুক।

যদি একবার

ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ

কবি, লেখক এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, দিল্লী, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রাক্তন অধ্যাপক—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।

অন্য এক দিগন্তে সূর্য অস্ত গেল।
জীবনের অর্ধেক ভাগ করে দাও দান।
নক্ষত্র মালায় এখনি পরিস্ফুট হবে তাঁর রূপ
শত-শত জ্যোতির্লোক উন্মীলিত করে।
ধারণা করতে চেষ্টা করো, হও বিনম্র
কে তুমি··· কোথা থেকে উন্মেষ।
পাঠ নাও বৃক্ষের কাছে—ক্ষমাশীল
শাখা-প্রশাখায় মেলে আছে পাতা, বাণীর মঞ্জরী।
কোন্ উৎস থেকে শক্তি—কক্ষপথে আবর্তন কল্প-কল্প ধরে :
তবুও বিচ্যুতি নেই···সম্পূর্ণ হার্মনি।
উপলব্ধি করো···
ভুল করেছ বারম্বার—হয়েছ পরাভূত।
অনুতাপ কোরো না, পরিশুদ্ধ হও :
যদি একবার দাঁড়াতে পারো
ভয়াল সুন্দরের সামনে।

সমাধির প্রজ্ঞাদেহ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইন্‌স্টিট্যুট ফর্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

সুরথ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হৃতরাজ্যধন,
স্বজন লাঞ্ছিত হয়ে ভ্রমে তপোবন—
মেধস্ মুনির বাস। সমাধি বণিক্
পুত্রদার-প্রিয়জন-পীড়িত পথিক
মিলিলা সুরথসনে মেধাতপোবনে।
যদ্যপি বঞ্চিত দোঁহে সদা চিন্তে মনে
প্রিয়জন-যোগক্ষেম। বিস্মিত অপার
জিজ্ঞাসিলা মেধসেরে কারণ ইহার।

"মহামায়া প্রভাবেতে বদ্ধ মুক্ত হয়
বাঞ্ছাদাত্রী মহাদেবী"—মহামুনি কয়।
বিধিমতে দেবীপূজা করি সমাধান,—
ক্ষত্রিয় চাহিলা রাজ্য,—বৈশ্য দিব্যজ্ঞান।
সমাধির শ্রেয়ঃ বুদ্ধি! বলিহারি যাই।
মহামায়া! কৃপা করি দেহ মোরে তা-ই।

সেই মন ঃ রামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

হাওড়া নরসিংহ দত্ত মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক—কবি ও প্রাবন্ধিক।

দুর্গম বন্ধুর পথ এবার সমাপ্ত হবে
সীমাহীন দিগন্তের তীরে
আকাশের ছায়াপথ তলে—
শুধু মন্ত্র—শুধু গান উদার অমল,
নাহিক বন্ধন, আছে শুধু আমন্ত্রণ
নীরবে ছড়ানো ;
আছে শুধু তৃণে তৃণে
মমতা জড়ানো ;
সেই মন—রামকৃষ্ণ—
সে আমার পুণ্য তীর্থভূমি।

*

সেই মনে পৃথিবীকে ভালো লাগে, আরো ভালো,
ভালো লাগে সভ্যতার অজস্র ফসলে
তোমার দৃষ্টির আলো,
ভালো লাগে প্রকৃতি—ছবির ভীড়ে—
ছড়ানো তোমার সেই ভালবাসা—অপরূপ।

*

তুমি আমার—হে আমার!
যখন সমুদ্র-স্বাদে গলে যায় সকালের রোদ
তরঙ্গ-দোলা অশ্বারোহী যেন,
নীল-সাদা-সবুজের রং ছুঁয়ে ছুঁয়ে
প্রসারিত অন্তহীন বিপুল উল্লাস—
তখন আমায় ডাকো।
আমার ডানায় বাজে সমুদ্রের ধ্বনি
হে অনন্ত, হে সমুদ্র, হে রামকৃষ্ণ।



উত্তরাধিকার

অধ্যাপিকা অপর্ণা রায়
ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ।

সুকোমল দুটি পায়ে
নাহি জানি কত ব্যথা সয়ে
যাত্রা তব দক্ষিণেশ্বরে,
অন্তরে জাগ্রত দৃঢ় পণ
জেনে বুঝে নেব আমি
সত্য কি অমুস্থ মোর
দেবতাত্মা স্বামী।
ভয়াল প্রান্তর মাঝে
একাকিনী দাঁড়িয়ে অভয়া,
   সঙ্গিগণ ফেলে চলে গেছে
নাই মনে কোন ক্ষোভ,
   বিদ্বেষের ছায়া।
ডাকাতের হাতে নয়
একান্ত আপন কার হাতে
সেই মহালগ্নটি কুড়ায়ে
   মহাকাল জপমালে গাঁথে।
চারিহাত সিঁড়ির চাতালে
কেটেছে কেমনে সারাদিন
দিবস যামিনী ঘিরে ঘিরে
ক্লান্তিহীন নিবেদিত সেবা
হয়ে গেছে বুঝি মূল্যহীন
দেহ-মন-প্রাণের প্রার্থনা
তারকনাথের পদতলে
অপ্রকট-লীলা সাক্ষী তবু,
   শ্রীপ্রভুদেবের,
অসহায় নয়নের জলে।

পরিধানে শতছিন্ন বাস
নুন জোটে নাই শাক-ভাতে
পরনিন্দারুচি প্রতিবেশী
কত ছিদ্র দেখেছে তোমাতে।
সহস্র বিপদ-শোক-তাপে
পরিবৃতা জগতের মাতা
ধরায় আনিলে নব নব
   জীবনের অমিয় বারতা।
নীরবেই তুলে দিলে
সে অমৃত অকৃপণ হাতে,
অন্তহীন শুভাশিস্ সাথে,
খুলে দিলে দ্বার।
ক্ষমা প্রেম বীর্য, তপস্যার
নহে আর কাতর প্রার্থনা
জীবনের পথ কর
   কুসুমে রচনা।
হানুক আঁধার রাত
বজ্র বিদ্যুতের অসিখানি
গ্রাসুক কালিমা সিন্ধু
পরাভব কোথাও না মানি।
আত্মসুখ তুচ্ছ করি
   সংগ্রামী জীবনে,
অন্তরে আনন্দলোক
   ধরা দিক প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
দিশাহারা পথভ্রান্ত নই
জেনেছি যে মাতৃপরিচয়



বাহিরে নিঃসীম ঘন কালো
মনের আলোক জ্যোতির্ময়।
তবে তাই জ্বেলে রেখো
অনির্বাণ হোমশিখা সম
নিজ হাতে, হে জননী মম।

আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু
অবহেলে হয়ে যাব পার
লভি ওই মহাজীবনের
শতাব্দীর উত্তরাধিকার।

মাতৃমন্দির—জয়রামবাটী

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

'মায়ের বাড়ী'—দুটি কথা তুলনা যার নাই
'মায়ের বাড়ী'— সে যে সবার বুক জুড়াবার ঠাঁই
স্বর্গ কোথাও আছে কি না জানিনে তো ভাই
ধরার মাঝে 'স্বরগ সুখ' হেথায় সদা পাই।

আমোদরের শীতল জলে মায়ের স্নেহরস
বৃক্ষছায়া অঙ্গ জুড়ায়,—দেয় যে মার পরশ
শস্যভরা শ্যামল ক্ষেত্র,—মায়ের স্নেহাঞ্চল
নীলাকাশে হেরি মায়ের দৃষ্টি সুকোমল।
(স্নেহ ভরা দিঠি মায়ের—সুনীল অম্বর।)

'মায়ের ছেলের' সেবা সাধু করেন হাস্যমুখে
গৃহী-ত্যাগী ভেদ কি কভু মায়ের কাছে থাকে?
মহাযোগী 'সারদানন্দ'—মায়ের ছেলে তিনি
'আমজাদ'ও সেই মায়ের ছেলে,—সত্য এ কাহিনী।

'মায়ের ছেলে'—সবার হেথা একটি পরিচয়
মূর্খ-জ্ঞানী, নিঃস্ব-ধনী,—বিভেদ হল লয়,
মায়ের ছেলে জেনে মোরা আনন্দেতে রই
'মা আছেন মোর'—এ বিশ্বাসে হই সবে নির্ভয়।

দেবব্রত

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ-গবেষক। সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (ছয় খণ্ডে), 'নিবেদিতা লোকমাতা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসে এক মহান পুরুষ, মহাপুরুষ বলাই উচিত, অপেক্ষাকৃত অন্তরালবর্তী থেকে গেছেন—তিনি দেবব্রত বসু। তার একটা কারণ তিনি আলিপুর মামলায় খালাস পেয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন—পরবর্তী জীবন সন্ন্যাসীর। সে জীবনেও অবশ্য তিনি খ্যাতনামা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, কিন্তু বিপ্লবী নন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দেবব্রতর পথান্তর নিয়ে প্রখর সমালোচনা তেমন হয়নি—যা হয়েছে অরবিন্দর ধর্ম-প্রস্থান নিয়ে। এমন হবার অন্যতম কারণ—তিনি দলের প্রধান নেতা নন, অপরকে সরাসরি চালিত করতেন না। আরও অধিক কারণ—তিনি মুরারিপুকুরের বোমার বাগানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। ঐ সকল ব্যাপার যখন ঘটছিল তার কিছু আগে থেকেই তাঁর মত-পথের পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার, উভয়েই সেকথা জানিয়েছেন।

"[মুরারিপুকুর] বাগানে কাজকর্ম যখন আরম্ভ হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেবব্রতর তখন বাগানের কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু ছিল না। কিন্তু তাহার মনটা তীর্থস্থানের সাধু দেখিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজকর্ম তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।" [উপেন্দ্রনাথ, 'নির্বাসিতের আত্মকথা']

"দেবব্রত পূর্বে আদিপর্বে কেবল বিপ্লবতন্ত্র প্রচারেরই যুগে আমাদের দলের সাথী ছিল বটে কিন্তু ইদানীং সাধনভজন তাহার জীবনের সবকিছু ভরিয়া ফেলায়, সে আমাদের দানবে-কাণ্ডের চণ্ডলীলায় থাকে নাই।" ['বারীন্দ্রকুমারের আত্মকাহিনী']

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতিপর্বে কিন্তু দেবব্রতর মূল্যবান ভূমিকা। সে ভূমিকা প্রধানত প্রচারকের। প্রচারক বলতে (ক) লেখক-প্রচারক, এবং (খ) কর্মী-প্রচারক দুই-ই বুঝতে হবে।

এই দুই ভূমিকার কথা বলার আগে দেবব্রতর ব্যক্তিচরিত্র ও তার মহিমার কথা স্মরণ করে নেওয়া যায়। সকল সাক্ষ্যেই দেখা যায়, সে-মহিমা অপরিমেয়। দেবব্রতর সন্ন্যাসজীবনে মায়াবতী আশ্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দ)। এই গম্ভীরাত্মা সংবৃতবাক সন্ন্যাসীকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কথা বলার সময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে দেখেছি। সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানন্দ ১৯১২—১৩ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধনের সম্পাদক, তারপরে ১৯১৮, ২০ এপ্রিল তারিখে অকালমৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদক ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি। এই সমস্ত সময়ে তিনি ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির উচ্চাঙ্গের প্রবক্তা, তাঁর বাংলা ও ইংরেজী রচনা সমাদৃত (বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের সাধনা')[১] তাঁর দেহান্তের পরে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায়

১ Swami Gambhirananda, *History of the Ramakrishna Math and Mission* (1957), p. 220

প্রকাশিত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এক রচনায় তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক রচনার মৌলিকতা উদ্‌ঘাটিত[২]—কিন্তু সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানন্দ নন, পূর্বাশ্রমের দেবব্রত বসুই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ('সতীর্থ বিপ্লবী সম্পর্কে', ২৬.১২. ১৯৬১) দেবব্রতর প্রথম জীবন সম্বন্ধে জানিয়েছেন, হুগলী জেলায় তাঁদের আদি বাড়ি, পিতা কলকাতায় গ্রে স্ট্রীটে থাকতেন, তাঁদের ব্রাহ্ম-পরিবার, ব্রাহ্ম-সমাজের এক অনুষ্ঠানে গায়ক হিসাবে দেবব্রতকে ভূপেন্দ্রের প্রথম দর্শন, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী আখড়ায় সাক্ষাতের পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও সম্প্রীতির সূচনা, ঐ সময়ে তিনি বি-এ পাস করেছেন, 'যেমন বিদ্বান তেমনি বুদ্ধিমান', কিছুদিন মন্মথ চাটুজ্যের টাউন স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন, সাংবাদিকতাও করেছেন কিছুদিন বিপিন পালের নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায়।

বৈপ্লবিক সংগঠনের এক পর্বে দেবব্রত মুখ্য নেতা ছিলেন, একথা তাঁর সহকর্মীদের মুখে উচ্চারিত হলেও, বিস্ময়ের কথা, কার্যত তা বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে। অরবিন্দর বাংলায় আসার আগে গোষ্ঠীনেতা দেবব্রতই ছিলেন তা তাঁর সহকর্মী ভূপেন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকায় পূর্বোক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন। আমরা জেনেছি, মফঃস্বল শাখা সমিতি থেকে কলকাতায় কেউ এলে প্রথমে দেবব্রতর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হত, তিনি প্রয়োজন বুঝলে প্রেসিডেন্ট পি. মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতেন। "সম্ভবত ১৯০৪ সালে বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনিই ছিলেন কেন্দ্র।" ভূপেন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন, বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য বাংলার বিপ্লবী দল ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করে। যুগান্তর পত্রিকা আরম্ভের আগেই সে কাজ হয়, এবং দেবব্রতই প্রথম উড়িষ্যায় তা শুরু করেন।[৩]

দলে দেবব্রতর এমনই গুরুত্ব ছিল যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক বিখ্যাত নেতার পত্র নিয়ে যখন এক ব্যক্তি বাংলায় এসে সভাপতি পি. মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন পরবর্তী কার্যক্রমের ব্যাপারে "ঐ বৎসরের কাশীতে কংগ্রেসের সময়ে [ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন] আমাদের তরফ হইতে দেবব্রত বসু তাঁহাদের দলের নেতার সহিত কার্যের আলাপ করেন।"[৪]

এই পর্বে দেবব্রতই ছিলেন দলের প্রধান তাত্ত্বিক নেতা যাঁকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের মতো বুদ্ধিজীবী মানুষদের সংশয়ী প্রশ্নের উত্তর দিতে হত, বিশেষত যখন স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের কথা উঠত। দেবব্রতর মুখে এঁরা শুনেছিলেন,

২ Dhan Gopal Mukherji, *Swami Prajnananda—An Appreciation*, *Prabuddha Bharat*, Dec. 1918

৩ "স্বদেশী যুগের শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯০৬—০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের সমিতি বঙ্গের বাহিরে বিস্তৃতিলাভ করে। বাংলার বৈপ্লবিক হাওয়া উড়িষ্যায় গিয়া বিশেষভাবে লাগে। দেবব্রত বসুই সর্বপ্রথমে উড়িষ্যায় কার্য আরম্ভ করেন, তৎপরে বারীন্দ্র ও অন্যান্যরা, এবং আমিও সে-প্রদেশে তিনবার যাই। উড়িষ্যায় দলে-দলে বাঙালী (উড়িষ্যাবাসী বাঙালী), উড়িয়াভাষী যুবকের দল, মাস্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার, বড়-বড় মঠের মোহান্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন।" ['অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (১৯২৬ সং, যা বাজেয়াপ্ত হয়), পৃঃ ৭৩—৭৪]

ভূপেন্দ্রনাথ অবশ্য জানিয়েছেন, এই বিপ্লবের ভাব উড়িষ্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৪ ঐ, পৃঃ ৮১—৮২

মস্তিষ্কশালী নেতারা অর্থাৎ ব্যারিস্টারের দল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, এমন কি দক্ষিণাপথ থেকে আগত অরবিন্দ ঘোষও রাজতন্ত্রবাদী। বাংলার ছোকরারা যেহেতু 'রাজা-ফাজা' মানতে গররাজি, তাই তাদের জন্য সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তবে ভারতের অন্যান্য স্থানের জন্য রাজতন্ত্র, কেননা সেখানকার লোকেরা রাজা ছাড়া কিছুতে বিশ্বাসী নয়।[৫]

ভূপেন্দ্রনাথের লেখায়, তিনি ও দেবব্রত ইত্যাদির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতভেদের কথা, বাংলার নানাস্থানের, বিহারের বিভিন্ন জায়গায়ও, বৈপ্লবিক সংযোগের ইতস্তত সংবাদ আছে। সেই লেখায় দেখি, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেবব্রতর মতভেদের কারণ যতীন্দ্রনাথের কল্পিত চরিত্রদোষ নয় (বারীন্দ্রকুমার যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন)—যতীন্দ্রনাথের হামবড়াইভরা নেতৃত্ব।[৬]

অরবিন্দর বাংলায় আগমনের পূর্বে দেবব্রতই যে দলের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় চরিত্র তা বারীন্দ্রকুমারও স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার যতদূর স্মরণ হয়—বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার এসে দেবব্রতকেই আগে খুঁজে বার করি।"[৭]

দেবব্রতর বাড়ি বিপ্লবীদের মিলনস্থল ছিল, এবং কেন্দ্রের অফিসও দেবব্রতর বাড়ির নিকটেই ভাড়াবাড়িতেই স্থাপন করা হয়, সেখান থেকে ভবানীমন্দির ছাপা হয়। বিপ্লবী দলে দেবব্রতর আগমন এর আগেই হয়েছিল এবং তাঁর চরিত্র ও প্রতিভা সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করেছিল বলেই বারীন্দ্রের দ্বিতীয় আড্ডার স্বাভাবিক নেতা তিনি হয়ে উঠেছিলেন, যাঁর বিষয়ে বারীন্দ্র বলেছেন—"আমাদের পরবর্তী আড্ডার প্রধান কেন্দ্রী।"[৮]

বৈপ্লবিক প্রয়োজনে দেবব্রতর সঙ্গে নানা

---

৫ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম,' (নবভারত, সং ১৯৮৩), পৃঃ ২৯—৩০

৬ ঐ, পৃঃ ১২১—২৩

৭ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অগ্নিযুগ (১ম), (১৯৪৮), পৃঃ ১৩১

৮ বারীন্দ্রের দেবব্রত-বর্ণনা এই প্রকার :

"যখন আমাদের সার্কুলার রোড-কেন্দ্রে ফাটল ধরে এলো—তখন আড্ডাটি মন্দ জমেনি। আমাদের পরবর্তী আড্ডার প্রধান কেন্দ্রী দেবব্রত বসুও তখন এসে জুটে গেছেন।···দেবব্রত স্থূলকায় বিরাট-দেহ গম্ভীর অথচ সুরসিক মানুষটি। তখনকার গ্রাজুয়েট হলেও পড়াশোনায় ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বিশেষত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রে ছিল অপূর্ব দখল। সোনার চশমা চোখে একমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মানুষের বক্তব্যটি শোনবার ধৈর্যটি ছিল তাঁর দেখবার জিনিস। প্রতিপক্ষের সব বক্তব্য শুনে তারপর তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্ক দিয়ে যখন তা খণ্ডন করতে বসতেন —তখন আর তার উপর কথা চলত না। তর্কে ধৈর্য কখনও হারাতেন না, উত্তেজনায় অধীর হতে কখনও তাঁকে দেখি নাই। সবাই না জানলেও আমি জানতাম, দেবব্রত ছিলেন অসাধারণ যোগী ও সাধক।···দেবব্রতর ভগিনী সুধীরা ছিলেন ভাইটির মতো মহামনা তেজস্বী মেয়ে।" ['অগ্নিযুগ', পৃঃ ৭৯]

সুধীরার বিপ্লবে অনুরাগ সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, কটকে প্রচারের জন্য "দেবব্রত ও তাঁহার ভগিনী সুধীরা অগ্রণী হইলেন।" [আনন্দবাজার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ]।

নলিনীকান্ত গুপ্তও লিখেছেন, "তাঁর ভগিনী সুধীরাও আমাদের সুপরিচিতা ছিলেন, কারণ মেয়ে হলেও তিনি ছিলেন তাঁর ভাইয়ের সহকারী অর্থাৎ বিপ্লবী কর্মী।" ['স্মৃতির পাতা', পৃঃ ৭৮]

সুধীরা নিবেদিতা বিদ্যালয়ে নিবেদিতার সহকারিণী ছিলেন। নিবেদিতার দেহান্তের পরে বিদ্যালয়ের গুরুভার তিনি বহন করেছেন। শ্রীমা সারদাদেবীর তিনি একান্ত স্নেহপাত্রী। ট্রেন থেকে খোলা দরজা দিয়ে পড়ে গিয়ে এঁর অকালে মৃত্যু হয়।

স্থানে ভ্রমণের বিবরণ যেমন ভূপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তেমনি ভবানীমন্দিরের স্থান সংগ্রহের জন্য মধ্য-ভারতের অরণ্যে-পর্বতে ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদিও তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, এই ভ্রমণকালে দেবব্রত ধর্মভাবনায় ব্যাকুল ছিলেন।[৯] স্বয়ং অরবিন্দও দেবব্রতর সঙ্গে বিপ্লবকারণে দেশভ্রমণ করেছেন।[১০]

অরবিন্দ ও দেবব্রতর নেতৃত্বকে কার্যত সম-পর্যায়ে স্থাপন করে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন :

"নিজের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে উপযুক্ততর লোক পেলে আমরা তখন সহজেই সানন্দমনে তাকে আসন ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতাম। দেবব্রত এইভাবেই নিজ গুণেই আমাদের উপর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু কি অরবিন্দ আর কি দেবব্রত —কারও চাপ বা চালনা পীড়াদায়ক অসহনীয় ছিল না। নিরহঙ্কার শিবতুল্য এই মানুষ-দুটি শান্ত ও মৌন গাম্ভীর্যে আমাদের মাঝে হিমাচল-শিখরের মতো বসে থাকতেন। আমরা তাঁদের আড়ালে কাজ করতাম অন্তরের পাগল প্রেরণায় ; নেতা দিতেন নির্দেশ সহাস্য অন্তরঙ্গতায়, যতটুকু একান্ত দরকার ততটুকুই। কাজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার কৌশল তাঁরা জানতেন।" [অগ্নিযুগ, পৃঃ ৮৭]

বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনে নেতৃত্ব ছাড়া দেবব্রত, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সহযোগিতায় আর যে এক কাজ করেছেন, তা বাংলা ও ভারতে উগ্র বিপ্লববাদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রবর্তক এবং প্রথম পর্যায়ে দুই প্রধান লেখকের একজন। যুগান্তর পত্রিকা চার ব্যক্তি শুরু করেন—বারীন্দ্রকুমার, দেবব্রত, ভূপেন্দ্রনাথ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য। পি. মিত্রের 'গোপনে ধীরে চলো' নীতির বিরুদ্ধে 'খোলাখুলি ফেটে পড়ো' নীতির বিদ্রোহের ফল যুগান্তর। বারীন্দ্র লিখেছেন :

"১৯০৬ সালের গোড়ায় পি. মিত্র মহাশয়ের লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে আমাদের অরুচি ধরে এলো। আমি ও দেবব্রত দেখলাম—এ পন্থায় দাগা বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগোবে না। দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্মকথা বোঝানো দরকার। এতদিন দু'দশজন গুপ্ত প্রচারকের দ্বারা জনে-জনে যে-ভাব সঞ্চারিত করা হচ্ছিল—সে উপায়েও দ্রুত দেশের মন নূতন বিপ্লবতন্ত্রের অনুকূল করে শীঘ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নূতন পন্থা, নূতন ভাব, নূতন মন্ত্রের চাই উপযোগী বাহন—তার বাণীপত্র।" [ঐ, ১৪২—৪৩]

২৭ নং কানাইলাল ধর লেনে যুগান্তর অফিস। "দেবব্রত ও আমার লেখা সম্বল করেই [বারীন্দ্র লিখেছেন] প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রেসে গেল।··· যথাসময়ে পিলে-চমকানো কাগজের প্রথম সংখ্যা বাহির হল, আর ইংরাজ-রাজ্য ধ্বংসের খোলা আবেদন নিয়ে আমাদের মফঃস্বলের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে কর্মীদের মারফত বিক্রীর জন্য পাঠানো হল।" [ঐ, ১৪৭] "১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় আমি ও দেবব্রত বসুই ছিলাম [বারীন্দ্র আরও জানিয়েছেন] যুগান্তরের প্রধান লেখক। আমাদের দু'জনের এবং আরও দুই একজন

---

৯ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (উপেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ১৩৫৭), পৃঃ ৭—৯

১০ "স্বদেশী আন্দোলনের আগে দেবব্রত আর আমি দেশভ্রমণে বের হই দেশের লোকের কি রকম অবস্থা জানতে। আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল কলা। দেবব্রত ছিল খুব মিষ্ট-ভাষী, সহজে অন্যদের দলে টানতে পারত।" ['শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' (নীরদবরণ সংকলিত, ১৯৬১), পৃঃ ১৭৫]

মফঃস্বলের লেখকের লেখা সম্বল করে যুগান্তরের অগ্নিবর্ষী সংখ্যাগুলি আদি পর্বে রূপ নিয়েছিল।" [ঐ, ১৫১]

বারীন্দ্রকুমারের লেখা অবশ্যই অগ্নিবর্ষী ছিল; কিছুদিন পরে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উত্তপ্ত লেখা লিখেছেন, ভূপেন্দ্রনাথের লেখায় উগ্র সমাজ-তত্ত্ব, ও 'কাঁচা সিডিশন' থাকত তাও ধরে নেওয়া যায়—কিন্তু নানাসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে দেখি—লেখক হিসাবে দেবব্রতই সর্বাধিক প্রশংসাপ্রাপ্ত তাঁর অন্যতম ছদ্মনাম 'যোগা-ক্ষ্যাপা'। অন্যনামে লিখতেন কিনা জানি না। নলিনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, "যুগান্তরে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তাঁর [দেবব্রতর] ও উপেনদার লেখা। তাঁর মন ছিল ধ্যানী চিন্তাশীলের মন—তাঁর চিন্তা ছিল বৈচিত্র্যময়, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ এবং অন্তরদৃষ্টিও আন্তর অনুভূতি সম্পন্ন।"[১১] এহেন জ্ঞানভূয়িষ্ঠ বস্তু কিন্তু কম ধ্বংসকারী ছিল না, বোধ হয় জ্ঞান-বারুদে ভরা ছিল বলেই তরল উত্তেজক লেখা অপেক্ষা বিদারণক্ষমতা তার অধিক ছিল। বারীন্দ্রকুমার বলেছেন, যুগান্তরের স্তম্ভে তাঁর ও দেবব্রতর লেখা 'পাঠকদের প্রাণে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল।' অনেকের কাছেই তা ছিল মরণ-নেশা। বারীন্দ্রকুমার সে-ধরনের কিছু লেখার নমুনা উদ্ধার করেছেনও।[১২]

এই পর্বের বিপ্লব আন্দোলন সংক্রান্ত সকল গোয়েন্দা-নথিতে বা সরকারী কাগজপত্রে যুগান্তর পত্রিকা এবং তার থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দুই রচনা সংকলন—'মুক্তি কোন্ পথে' ও 'বর্তমান রণনীতি'-র মারাত্মক প্রভাবের কথা বলা আছে। দৃষ্টান্ত ১৯১৮ সিডিশন কমিটি (রাউলাট কমিটি) রিপোর্টে একাধিক বিপ্লবীর স্বীকারোক্তি উৎকলিত হয়েছে, যাঁরা বলেছেন, যুগান্তর পড়েই বিপ্লবের পথে এসেছেন। যুগান্তরের দ্রুত-বর্ধিত জনপ্রিয়তার কথাও ঐ রিপোর্টে আছে। যুগান্তরের কিছু রচনাংশ উদ্ধৃত করার পরে সে-সব সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যও এতে উদ্ধৃত আছে: "এদের মধ্যে আছে বৃটিশ জাতি সম্বন্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা, প্রতি ছত্রে বিপ্লবের নিঃশ্বাস, এবং বিপ্লব কিভাবে সাধন করা যাবে তার নির্দেশ। দেশের লোকের মধ্যে ঐ ভাব প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্য

১১ নলিনীকান্ত গুপ্ত, 'স্মৃতির পাতা' (২য় সং, ১৩৮১), পৃঃ ৭৭

১২ বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন:

"যুগান্তরের সেই অগ্ন্যুদ্গারী লেখার অনুপম ভাষা ও টংকার কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ...১১ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখের সংখ্যায় যে-প্রবন্ধ ছিল তার শিরোনামা হচ্ছে—'এসো অরাজকতা'। তাতে লেখা ছিল—'অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে—সুতরাং সেই অরাজকতার আহ্বান করি—ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব।'...এই লেখাগুলিই হচ্ছে প্রমাণ, যুগান্তর কি খোলাখুলিভাবে নগ্ন বিপ্লবের কথা দেশকে বলত। ২৬ অগস্টের সংখ্যায় যোগা-ক্ষ্যাপার চিঠি বের হয়। তাতে ছিল—কত সহজে দেশে বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনতা রক্ষা করে বিস্ফোরক তৈরী করা যায়। বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে ১২ অগস্টের (১৯০৭) যুগান্তর লিখেছিল: 'আর এক উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। [সৈন্যদের ভাঙিয়ে তা করা যায় ইত্যাদি] ...সম্পাদক ভায়া, আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে-হাজারে বিক্রী হচ্ছে। যদি অন্তত হপ্তায় ১৫০০ বিকোয় তাহলে মাসে ৬০,০০০ লোক তা পড়েছে। এই ষাটহাজার পাঠককে আমি গুটিকতক কথা বলার লোভ সামলাতে না পেরে অকালে এই লেখনী ধারণ করেছি। আমি পাগল, অধাতস্থ ও হুজুগে মানুষ। আমার আনন্দের পাত্র উপচে ভরে ওঠে যখন আমি চারিদিকে অরাজকতা দেখি নামতে, তখন আর অন্ধ মূক হয়ে থাকতে পারিনে। চারিদিকে লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি—যেন ভাবী গেরিলা-যোদ্ধার দল অর্ধলুণ্ঠনে

কোনো কুৎসা বা কৌশল বাদ থাকেনি, ভাবপ্রবণ যুবকদের মনকে টানবার জন্যও তাই করা হয়েছে।”[১৩]

এই ভয়ানক পত্রিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক রচনাগুলির প্রধানাংশের সঙ্গে যদি দেবব্রত বসুর যোগ থাকে, তাহলে বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসে গণ্য স্থান তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

দেবব্রতর রচনাগুলিতে কি বিবেকানন্দের চিন্তার প্রতিধ্বনি ছিল? অংশত ছিলই—যথা, বিবেকানন্দ যেখানে ভয়ঙ্করের উপাসনা করতে বলেছেন। নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের প্রতিধ্বনিও আছে। কিন্তু দেবব্রত (বা অন্যেরা) যদি স্বামীজীর চিন্তাকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে নিজের ভাবেই তা করেছেন। পরবর্তী কালে মনে হয়, তিনি ঐ আকারে স্বামীজীর চিন্তার ব্যবহার সমর্থন করতে পারেননি। ১৯১৫—১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনাকালে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয়ের মধ্যে (যেগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে, সরকারের এই অভিযোগের খণ্ডনে লিখিত হয়) সম্ভবত তার পরিচয় আছে। যুগান্তরে কিছুদিন লেখার পরে দেবব্রত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নবশক্তিতে যোগদান করেন এবং নবশক্তি বন্ধ হয়ে গেলে একান্ত ধ্যানভজনে নিয়োজিত থাকেন একথা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। এঁর মতে ১৯০৮ মে মাসের গোড়ায় যখন এঁরা মাণিকতলা বোমার আসামী হিসাবে জেলে গেলেন এবং 'চলমান পর্বতবৎ' দেবব্রতকেও গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছিল, তার প্রায় এক বৎসর আগে থেকে দেবব্রত যুগান্তরের সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন।[১৪] একথা সত্য হলে, দেবব্রত এক বছরের কিছু বেশি সময় যুগান্তরের প্রধান লেখক

লেগে গেছে আর আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ভ হয়ে গেছে ঐ লুটতরাজের আকারে।...হে লুণ্ঠন, আমি তোমায় পূজা করি, আজ আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুষ্পে কীটের মতো গুপ্ত থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় করে আনছিলে। এখন এসো, সর্বত্র জাগিয়ে তোলো ক্ষাত্র-বীর্য মানুষের বুকে। তুমি সেদিন আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ভারতবাসী যেদিন আবার তোমাকে স্মরণ ও পূজা করবে সেইদিন তুমি আনবে তাদের সশস্ত্র করার অর্থ, তুমি আনবে রণকৌশলের শিক্ষা। সেইজন্য আমি তোমার পূজা করি।" [অগ্নিযুগ, পৃঃ ১৫৬—৫৭]

এই গ্রন্থের অন্যত্র [পৃঃ ১৬৮] বারীন্দ্রকুমার জানিয়েছেন, 'এসো অরাজকতা' লেখাটি যোগা-ক্ষ্যাপা অর্থাৎ দেবব্রতর রচনা।

বারীন্দ্রকুমার কর্তৃক উপরে উদ্ধৃত যুগান্তরের লেখাগুলি মূল থেকে সংগৃহীত নয়—ওগুলি রাউলাট কমিটি কর্তৃক উদ্ধৃত যুগান্তরের ইংরেজী অনুবাদের পুনশ্চ বঙ্গানুবাদ। তবে যেহেতু বারীন্দ্রকুমার তা করেছেন তাই তার মধ্যে মূলের ভাব ও রস কিছুটা রয়ে গেছে। ঐ রচনাগুলির জন্যই যুগান্তরের বিরুদ্ধে মামলা হয়। বারীন্দ্রকুমারের সাক্ষ্য অনুযায়ী এগুলি দেবব্রতর রচনা। এর দ্বারাই যুগান্তরে দেবব্রতর ভূমিকার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

১৩ Sedition Committee Report, New Age edition, (1973), pp. 20—22

দেবব্রতের রচনার প্রভাব সম্বন্ধে চন্দননগরের বিপ্লবীদলের নেতা মতিলাল রায় লিখেছেন:

"যুগান্তর কাগজ পড়িয়া স্বাধীনতার আগুন মর্মে-মর্মে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দেবব্রত বসুর বিদ্যুল্লেখনী হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ ছুটাইত। যোগা-ক্ষ্যাপার চিঠি আমাদের মনে আলোড়ন তুলিত। 'ভাবের অমর বীর্য' নামক প্রবন্ধটি আজিও চিত্তক্ষেত্র হইতে মুছিতে পারি নাই। নব তান্ত্রিকের দল বাংলা বুঝি ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইংরাজ গভর্নমেণ্টের শাসন অতি শীঘ্রই শেষ হইবে মনে হইল।" [মতিলাল রায়, 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' (১৯৫৭), পৃঃ ২১—২২]

১৪ উপেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৯

ছিলেন (যুগান্তর, ১৯০৬ মার্চ মাসে আরম্ভ হয় বলে অনুমান)। অর্থাৎ দেবব্রতর অন্তর্দেশে কিছুদিনের মধ্যেই অন্য বিবেকানন্দের (এবং রামকৃষ্ণের) পদধ্বনি বাজতে শুরু হয়েছিল। প্রথমাবধি তিনি ধর্মপরায়ণ, সেই ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবকর্ম সহাবস্থান করেছিল, কিন্তু ক্রমেই ধর্ম বিপ্লবকে সরিয়ে দিয়েছিল। ভবানীমন্দিরের ঠাঁই খোঁজার জন্য যখন তিনি ভারতভ্রমণ করছেন তখন সাধুসন্ধানে তাঁর অধিক আগ্রহের কথা উপেন্দ্রনাথ বলেছেন, আগেই জানিয়েছি। তাঁর অধ্যাত্ম চরিত্রের শুদ্ধতার কথা উপেন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমার উভয়েই বলেছেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীব সুন্দরী যুবতী আত্মীয়া যখন কানাকানির বস্তু হয়েছিলেন, তখন সেই দাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে আতঙ্কিত বারীন্দ্রকুমার চিত্তাকর্ষক সরলতার সঙ্গে লিখেছেন, "আমরা, এক দেবব্রত ছাড়া আর কেহই জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম দ্রোণ ছিলাম না।" [অগ্নিযুগ, পৃঃ ৮৩]

দেবব্রতকে কে একান্ত ধর্মপথে টান দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে দুই বিপ্লবীর বক্তব্যে পার্থক্য আছে। ভূপেন্দ্রনাথের মতে, "জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাস করিয়া ধ্যান-ধারণার দিকে দেবব্রতর মতি যায় এবং উহারই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।" [আনন্দবাজারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ]

একথা কিন্তু গ্রাহ্য নয়, কারণ উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্বাবধি দেবব্রতর ধর্মপিপাসার যথেষ্ট বিবরণ দিয়েছেন, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির রচনাতেও এই বিষয়ে দেবব্রতর অরবিন্দ-অনুসরণের কোন ইঙ্গিত নেই। এঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, ভূপেন্দ্রনাথ যা ছিলেন না। অপরপক্ষে আর এক প্রত্যক্ষদর্শী হেমচন্দ্র কানুনগো ঠিক বিপরীত কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, অরবিন্দর ধর্মভাব বেড়ে যায় দেবব্রতর প্রভাবে। কেবল ধর্মবিষয়ে নয়, বৈপ্লবিক ব্যাপারেও অরবিন্দ ও অরবিন্দগোষ্ঠীর উপরে তিনি দেবব্রতর প্রভাবের কথা বলেছেন 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' (১৯২৮) গ্রন্থে এ-বিষয়ে অনেক মন্তব্য আছে। অরবিন্দর কাছে তিনি কলকাতার অন্যতম নেতা দেবব্রত বসুর তারিফ শুনেছেন, যিনি নাকি বিপ্লব বিষয়ে সুপণ্ডিত; দেবব্রতর সঙ্গে আলাপে হেমচন্দ্র 'মুগ্ধ' হয়েছিলেন; "তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, সকল সময়ে মৃদু হাসি, সুন্দর দাঁতগুলি আর তাঁর অমায়িক ভাব ইত্যাদি মিলে শ্রোতার মনকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলত; তাঁর চেহারাখানি বেশ লম্বা-চওড়া ও ভারি সম্ভ্রমসূচক ছিল; চাহনি অতি স্নিগ্ধ ও হিপ্নোটাইজিং"; "ইনি ক-বাবু [অরবিন্দ] ও সেই সময়ের অন্য তিনজন প্রধান নেতার সহকারী ছিলেন বটে, কিন্তু সকলের উপর প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করতেন, এবং অনেকের উপর করেও ছিলেন।" [পৃঃ ৩০—৩১] "দেবব্রতবাবুর নিজের কোনো দল ছিল না বটে কিন্তু তিনি সকল দলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। [পৃঃ ৭৫]

হেমচন্দ্র কানুনগো বিপ্লবীদলে ঢুকলেও খাঁটি বাস্তববাদী। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিতান্ত বিতৃষ্ণা। তেমন মানুষকেও দেবব্রত ব্যক্তিত্ব দ্বারা মুগ্ধ করেছিলেন, এটা সামান্য কথা নয়। হেমচন্দ্র ভুল করে মনে করেছিলেন, দেবব্রত ভবানীমন্দিরের লেখক। এমন ভুলের কারণ, লেখক কে, তা অধিকাংশের কাছে গোপন ছিল, আর বাহ্যত দেখা গিয়েছিল, এই ব্যাপারে দেবব্রত অতি উৎসাহী এবং তিনি রচনায় দক্ষ। ভ্রান্তির মূলে দেবব্রতর প্রতীয়মান নেতৃত্ব সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের ধারণা।

হেমচন্দ্র অবশ্য দেবব্রতকে ক্ষমা করেননি—যেহেতু রাজনীতিতে ধর্ম ও অলৌকিকতা আমদানি করেছেন। উপেন্দ্রনাথের বর্ণনায় দেখেছি, জেলে দেবব্রত যখন ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন তখন হেমচন্দ্র ব্যঙ্গের ছড়া কাটছেন সে সম্বন্ধে। ঠিক করে



মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গৃহীত চিত্র।

মাঝের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক থেকে): স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী অতুলানন্দ।

ভূমিতে আসীন: সর্ববামে স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) এবং সর্বদক্ষিণে স্বামী আত্মবোধানন্দ।



স্বামী প্রজ্ঞানন্দ



বাউল

শিল্পী ঃ শ্রীবিশ্বরূপ বসু

হোক, ভুল করে হোক, তাঁর মনে হয়েছিল, রাজনীতির ক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র করে তোলার ফন্দী অরবিন্দর মাথায় দেবব্রতই ঢোকান (অন্যসূত্রে অবশ্য এ-ব্যাপারে অরবিন্দকে গৌরবহারা করার সমর্থন পাই না)—এই মনে হওয়ার মূলে, পুনশ্চ বলছি, দেবব্রতর ব্যক্তিত্ব ও অধ্যাত্মশক্তির প্রচণ্ড প্রভাব। হেমচন্দ্রের রচনাংশ উপস্থিত করা যাক :

"বারীন বাংলাদেশ ছেড়ে বরোদায় তার সেজদার কাছে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল দেবব্রতবাবুর প্রভাব। অর্থাৎ দেবব্রতবাবুর এ-ধারণা হয়েছিল যে, এদেশের লোককে কোনো-ভাবে সোজাসুজি অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয়। যে-ভাবের দ্বারা এদেশে মজ্জায় মজ্জায় জরে রয়েছে সেই ভাবের আবরণে মোড়াই করে দেশ উদ্ধারের বা বিপ্লবের ভাব দেশের লোকের মনে, জিলেটিন দিয়ে মোড়া কুইনিনের পিল গিলিয়ে দেওয়ার মতো ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই আবরণটি হল ধর্ম।

"ক-বাবু কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে সিক্রেট সোসাইটি গঠনের অসুবিধা দেখে অন্যত্র গিয়ে-ছিলেন। তিনিও দেবব্রতবাবুর প্রভাব এড়াতে পারেননি। কোনো বিষয়ে প্রথমে যে-ধারণা কোনোরকমে তাঁর মনে আসত, তা তিনি বড় সহজে ছাড়তেন না। এখন সিক্রেট সোসাইটির কাজে ধর্মকে উপায়স্বরূপ নিয়োগ করবার জন্য মালমসলা সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন।" [পৃঃ ৪০]

"অন্য নেতাদের মধ্যে দেবব্রতবাবু বিশেষ করে আগে হতে ধর্মচর্চা করছিলেন। ভারত যে ধর্মের দেশ, ধর্মের ভেতর দিয়ে ব্যতীত কোনো নতুন ভাব এদেশ গ্রহণ করতে পারে না, এ-ধারণা আমাদের দেশে খুব সাধারণ হলেও, ক-বাবুকে কিন্তু অনেকদিন থেকে তা ধরাতে চেষ্টা করছিলেন দেবব্রতবাবু। সিদ্ধযোগী, সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে দেবব্রতবাবুর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তার থেকেও বেশি ছিল তাঁর অন্যকে বিশ্বাস করাবার শক্তি।

"ক-বাবু স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের বিফল-তাতে নিজের কিংবা সহনেতা বা সহকারী নেতাদের ত্রুটি নিশ্চয় দেখতে পাননি। কাজেই তাঁর পক্ষে ধরে নেওয়া সহজ হয়েছিল যে, এদেশবাসীকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কোনোপ্রকার লৌকিক শক্তির কর্ম নয়। অথচ এদেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াবার ইচ্ছাটা তাঁর ছিল পুরোপুরি। মনের যখন এইরকম অবস্থা তখন দেবব্রতবাবুর তথাকথিত সিদ্ধযোগীদের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও নির্ভর করা ছাড়া ক-বাবুর গত্যন্তর ছিল না।...

"খুঁজে নিতে পারলে [সত্যানন্দের মতো] এমন অলৌকিককর্মা সিদ্ধপুরুষ পাওয়া যায়, ক-বাবুকে এ-ধারণা সম্ভবত দেবব্রতবাবুই করিয়ে দিয়েছিলেন। দেবব্রতবাবুর কাছে এমন সাধু-সন্ন্যাসীর কথা অনেকবার শুনেছি।" [পৃঃ ৫৮—৫৯, ৬০]

রাজনীতিতে ধর্মসঞ্চার, বা অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধুদের প্রতি আসক্তির ব্যাপারে অরবিন্দর উপর দেবব্রতর একান্ত প্রভাব বিষয়ে বিশ্বাস করতে আমরা আগ্রহী নই, কিন্তু এইসব বিবরণ থেকে বোঝা যায়, বৈপ্লবিক বা অবৈপ্লবিক, যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক দেবব্রতর উপর ধর্মের গভীর প্রভাব ছিল এবং তা তিনি অপরের উপর সঞ্চারিত করতে পারতেন, এমন যে, অন্তত একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মনে হয়েছিল—তিনি অরবিন্দকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে সমর্থ। দেবব্রত সম্বন্ধে এই পর্বের যেসব বিবরণ পাচ্ছি, তাদের থেকে তিনটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে—জ্ঞান, ধ্যান এবং গান। দেবব্রতকে জ্ঞানীপুরুষ বলে অনেকেই

উল্লেখ করেছেন (ভূপেন্দ্রনাথ পর্যন্ত), তা আগেই দেখেছি। তাঁর ধ্যানলীনতার বর্ণনা বারীন্দ্রকুমার দিয়েছেন, উপেন্দ্রনাথ ও নলিনীকান্তের লেখাতেও সে চিত্র আছে।[১৫] এখানে যেহেতু মুখ্য আলোচ্য দেবব্রতর দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিকতা, তাই গান তাঁর নিজের কোন্ হৃদয়কে উন্মোচন করত এবং অন্যের হৃদয়ে কোন্ সুরের আগুন ছড়িয়ে দিত, তার কিছু তথ্য দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব

ভূপেন্দ্রনাথ আনন্দবাজারের পূর্বোক্ত রচনায় দেবব্রতর দুটি গান উৎকলন করেছেন। তার একটি—"এসো কে কেঁদেছ নীরবে? মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে, সে মুখ উজ্জ্বল করিবে"—"বহুল প্রচারিত কিন্তু অনেকেই জানে না যে উহা দেবব্রতর রচনা।...দেবব্রত মাতৃভূমিকে কিরূপ নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন, এই সমস্ত সঙ্গীত তাহার প্রমাণ।" ভূপেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, দেবব্রত যেমন সুকণ্ঠ তেমনি "সঙ্গীত রচনায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।" দেবব্রতর স্বরচিত সঙ্গীত শ্রবণের এক স্মৃতিচিত্র এই :

"একবার রঘুনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তিনি বিপ্লব প্রচার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা যাইতেছিলেন। রাত্রিকাল, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। তাঁহারা গঙ্গার মধ্য দিয়া ষ্টিমারে যাইতেছেন। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ের সংবাদে সকলেই এই সময়ে উল্লসিত। দেবব্রত স্বরচিত গান ধরিলেন—

দে মা অসি।
সন্তানে অক্ষম ভেবে, বল আর কত স'বে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
দে মা অসি।
আদিতে যে-রূপে গো মা আর্যভূমে দাঁড়ালি
দাঁড়াগো মা বাধাবিঘ্ন নাশিতে মা করালী,
নিজসত্য রাখিবারে ডাকি মা আজি তোরে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
গাণ্ডীব রচেছিলি যে হাতে মা অতীতে
শৃঙ্খল কিঙ্কিণী আজি বাজে গো মা সে হাতে
সন্তানের শিরাতে শোণিত একবিন্দু থাকিতে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
গুরু গুরু দূরে ঐ রণবাদ্য বাজিছে,
মহাকাল ইঙ্গিতে গো মা রণক্ষেত্রে ডাকিছে,
কাল-ই ঐ রণমাঝে নবযুগে নবসাজে
বাজিছে রুধির পূত ভারতে পশি।
দে মা অসি।

গাহিতে গাহিতে দেবব্রতর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।"

আর একটি স্মৃতিচিত্র উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আলিপুর জেলের কথা।—

"সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত, কয়জনই বেশ গাহিতে পারিত। কিন্তু দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ—বড় একটা গাহিত না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল।

১৫ "[জেলে] দেবব্রত সকালে উঠিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া সেই-যে অচল প্রতিষ্ঠ হইয়া বসিত, বেলা দশটা পর্যন্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার বেলা চার-পাঁচটা পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা গীতা বা ভাগবত পড়িত। তাহার সময় এইরূপেই কাটিয়া যাইত।" [উপেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২]

" 'আকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ' ছিলেন তিনি—অর্থাৎ দীর্ঘায়ত পুরুষ—এবং প্রায়ই আসন করে বসে থাকতেন নিঃশব্দে অন্তর্মুখী হয়ে; মাঝে মাঝে জেগে উঠে বিতরণ করতেন আশপাশের লোকদের কাছে তাঁর চিন্তাজগতের বা অন্তর্জগতের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত কিছু কিছু।" [নলিনীকান্ত, পৃঃ ৭৭—৭৮]

ভারতব্যাপী একটা বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা রচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্তচিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গান বা পদ্য কস্মিনকালেও আমার বড়-একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতর সেই গানটির দুই-এক ছত্র আজও মনে গাঁথিয়া আছে—

"উঠিয়া দাঁড়াল জননী!
কোটি কোটি সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল।...
রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অঞ্জলি,
বীর-রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

"গানটা শুনিতে শুনিতে মানসচক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিলাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসংঘ বরাভয়করার সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া-বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল আমরা যেন সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা ভয় মৃত্যু, আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" [পৃঃ ২২]

বিবেকানন্দের রক্তপুষ্প হাতে নিয়ে দেবব্রত একদিন রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কয়েক বছর তারই উন্মাদনায় কাটিয়েছিলেন। সেইসময়ে ধীরে-ধীরে আর একটি পুষ্প, তাও বিবেকানন্দেরই, শুভ্র শ্বেতপদ্ম, তাঁর হৃদয়ক্ষেত্রে দল মেলছিল। ফলে কুরুক্ষেত্রের মহারথের মহাপ্রস্থান হল হিমালয়ে, সত্যই, কারণ বিবেকানন্দের ধ্যানের হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমই স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সর্বশেষ সাধনক্ষেত্র। জীবনের অন্তিমপর্ব—শেষদুটি মাস কেটেছিল কলকাতায়—পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে 'মায়ের বাড়ী'তে, যেখানে তিনি মহাসমাধিমগ্ন হন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে। তারিখ ছিল ২০ এপ্রিল, ১৯১৮। 'উদ্বোধন' (বৈশাখ, ১৩২৪) পত্রিকায় তাঁর মহাপ্রয়াণ সংবাদ প্রকাশিত হল,—উপসংহারে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয়েছিল: "তাঁহার এই অকালে দেহত্যাগে মিশন এবং সর্বসাধারণ কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম।"

শিক্ষা নিয়ে দু-একটি কথা

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কলিকাতা 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারে'র সচিব। মিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে সংযুক্ত বিশিষ্ট প্রবীণ সন্ন্যাসী।

প্রত্যেক দেশের যেমন প্রয়োজন, তেমন তার শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত। সব দেশের প্রয়োজন এক নয়, তাই শিক্ষাব্যবস্থাও এক হতে পারে না। প্রত্যেক দেশকে ভেবে-চিন্তে বের করতে হবে কোন্ শিক্ষাব্যবস্থা তার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। এ বিষয়ে সে কোন দেশকে অনুকরণ করতে পারে না, করলে ফল ভালর চেয়ে মন্দ হতে পারে। ঠিক তাই ঘটেছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে অনেক শিক্ষা-কমিশন বসেছে। তাঁরা যেসব ব্যবস্থার অনুমোদন করেছেন, তার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের অনুকরণে। ফলে এগুলি আমাদের দেশের পক্ষে ভাল কিছু করতে পারেনি, অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে মাত্র। অবশ্য দোষ সম্পূর্ণ কমিশনগুলির নয়। তাঁরা যা বলেছেন, তা সরকার পুরোপুরি কার্যকরী করেননি বা করতে পারেননি।

শিক্ষা-কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। এই ভিত্তি যদি শক্ত না হয়, তাহলে সমস্ত কাঠামো দুর্বল হয়ে যায়। আমাদের দেশে অনেক বি. এ., এম. এ. পাশ ছেলেমেয়ে আছে যারা শুদ্ধ মাতৃভাষায় একখানা চিঠি লিখতে পারে না। তার কারণ তাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে

হয়নি। তারা ডিগ্রি পেয়েছে সত্য, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে শুধু মাতৃভাষা নয়, কোন কিছুই তারা ভালভাবে শেখেনি। তারা যদি বেকার থাকে, তাহলে আশ্চর্য কি?

আজ নিরক্ষরতা আমাদের দেশের কলঙ্ক। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও আমাদের দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে কেন? কেউ যদি প্রাইমারি স্কুলগুলির চেহারা একবার দেখেন, তাহলে বুঝবেন কেন। গ্রামের সবচেয়ে যে-বাড়িটি জীর্ণ, সেইটি আমাদের প্রাইমারি স্কুল। তার আশেপাশে আবর্জনা, ভিতরেও আবর্জনা। আসবাবপত্রের মধ্যে সম্বল হয়তো একখানা চেয়ার, হয়তো তার হাতল ভাঙা। ব্ল্যাকবোর্ড একখানা থাকতে পারে, নাও পারে। থাকলেও তাতে খড়ির দাগ পড়ে না। হয়তো ভাঙা এক আলমারি আছে এক কোণে, তার তালা নেই। আলমারির মধ্যে স্কুলের কিছু খাতা-পত্র আছে, একটা ম্যাপও থাকতে পারে। সবগুলির অবস্থা জীর্ণ। স্কুল বসবার কথা সকাল দশটায়। যদি এগারোটায় কেউ সেখানে যান, দেখবেন তখনও শিক্ষকরা আসেননি। ছেলে-মেয়েরাও সবাই আসেনি, দু-একজন করে আসছে। অবশ্য খাতায় যাদের নাম লেখা আছে, তাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগও রোজ আসে না। একদিন এল তো দুদিন এল না। এভাবে দু-একবছর কাটিয়ে শেষে স্কুলে আসা একেবারে বন্ধ করে দিল। হয়তো তারা বর্ণপরিচয় শিখেছিল, নিজের নামটাও কোনরকমে লিখতে পারত, কিন্তু লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকায় শেষে তাও ভুলে গেল। আমাদের দেশের নিরক্ষরদের মধ্যে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

যাহোক দেরিতে হলেও শেষপর্যন্ত শিক্ষকরা এলেন। ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ খুব সোরগোল করছিল, এখন একেবারে চুপ। দু-একজনের কান্নার শব্দ শোনা যেতে পারে, কারণ হয় কেউ তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে অথবা প্রধান শিক্ষক আসবার পথে তার চিৎকার শুনেছেন। যদি তিনজন শিক্ষক স্কুলের জন্যে ধার্য হয়ে থাকেন, দেখা যাবে মাত্র দুজন আছেন, একজনও থাকতে পারেন। যাঁরা আসেননি, হয়তো তাঁরা ছুটিতে আছেন অথবা জায়গাটা তাঁদের পছন্দ নয়, তাই কাজে যোগ দেননি। তাঁরা বোর্ডে ধরাধরি করছেন যাতে মনের মতো জায়গায় যেতে পারেন। মনের মতো জায়গা মানে বাড়ির কাছে, অথবা যেখানে প্রচুর ট্যুইশনি পাওয়া যাবে। হয়তো তাঁরা মনের মতো জায়গা পেয়েও যাবেন, কারণ তাঁদের খুঁটির জোর আছে অর্থাৎ তাঁরা শিক্ষক-সমিতির উৎসাহী কর্মী। তাঁদের সাত খুন মাপ!

আজকাল সকল স্তরের শিক্ষকদের বেতন বেশ বাড়ানো হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতনও বেশ বেড়েছে। তবু হয়তো যে স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরা কামনা করেন, তা ঐ বেতনে সম্ভব নয়। তাই তাঁদের অন্যভাবেও কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। যাঁরা নিজের গ্রামের স্কুলে কাজ করেন, তাঁরা হয়তো ছোটখাট একটা ব্যবসা চালান অথবা নিজের কিছু জায়গা-জমি আছে, তাতে চাষবাস করেন। তিনি গ্রাম-পঞ্চায়েত বা অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভ্য হতে পারেন, এমন কি রাজ্যবিধানসভার সভ্যও হতে পারেন। এসব পদে থাকলে যে কিছু আর্থিক সুবিধা লাভ হয়, তা বলা বাহুল্য। যাঁরা এসব পদ নিয়ে আছেন, তাঁরা কতটা শিক্ষকতা করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। তবে সবাই তো এসব দায়িত্বভার কাঁধে নেননি। তাঁরা হয়তো চাষবাস বা ব্যবসা নিয়েই আছেন। কিছু ট্যুইশনিও হয়তো করেন। গ্রামে অবশ্য ট্যুইশনি বেশি পাওয়া যায় না, পেলেও খুব অর্থকরী নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: গ্রামের

এইসব শিক্ষকরা ছাত্রদের কতটা পড়ান এবং কিভাবে পড়ান। এক ঘণ্টা দেরিতে তাঁরা স্কুলে এলেন, কিন্তু এসেই কি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াতে শুরু করলেন? দেখা যাবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কিছু গল্পগুজব করলেন, তারপর নিজের নিজের ক্লাসে গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ানোর পরেই তাঁদের ঝিমুনি এসে গেল। তখন হয়তো একটা অঙ্ক করতে, না হয় একটা রচনা লিখতে বলে তাঁরা চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ছেলেমেয়েরা তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত যাতে না হয় সে বিষয়ে খুব সযত্ন! নিদ্রার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকরা হুকার দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলছেন যাতে তারা বেচাল কিছু না করে, বা বড়জোর তাদের দু-একজনের অঙ্ক বা রচনা সংশোধন করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবে তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়ে 'বাড়িতে পড়া তৈরি করে নিস্' বলে সেদিনকার মতো ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিলেন। বাস্তবিক ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই বাবা-মাকে গোড়া থেকেই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভর করতে হয়। বাবা-মা নিজেরা যদি বেশ শিক্ষিত হন, তাহলে তাঁরাই হয়তো ছেলেমেয়েদের পড়াবেন। কিন্তু যদি বাবা-মা ধনী না হন বা নিজেরা ছেলেমেয়েদের পড়াতে না পারেন, তাহলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কতদূর এগুবে, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। এসব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া প্রাথমিক স্তরেই শেষ হয়। এরাই পরে নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এদের মধ্যে এক অংশ হয়তো মাধ্যমিক স্তরেও প্রবেশ করে। হয়তো দু-একবছর স্কুলে যাতায়াতও করে, কিন্তু আনন্দ পায় না, উৎসাহ পায় না। হয়তো দরিদ্র বলে বেতন দিতে পারে না, বই কিনতেও পারে না। বাবা-মাও হয়তো বাড়ির কাজের জন্য আর তাদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী নন। জীবনের কয়েকটি বছর তাদের অনর্থক নষ্ট হল। এদের ভিতর থেকেও দু-চারজন ছিটকে বেরিয়ে যায়—তারা মাধ্যমিক স্তর শেষ করে এবং হয়তো ভালভাবেই করে। এ-কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব।

এবার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার কি হাল একটু বিবেচনা করা যাক্। সমস্ত শিক্ষা-কাঠামোর মেরুদণ্ড হচ্ছে মাধ্যমিক স্তর। শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই। এই স্তরেই অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেষ করে বলে অন্যান্য দেশে এই স্তরের শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা এমন হবে যাতে ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষা শেষ করেই কাজে ঢুকে যেতে পারে। তা সম্ভব হয় যদি পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা হাতের কাজ কিছু শেখে। আমাদের দেশেও হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু তা যে কি হাস্যকর, তা যাঁরা এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন। অথচ পরীক্ষায় কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা হাতের কাজে অনেক নম্বর পায়। শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরে হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা অনেকদিন থেকে হয়ে আসছে, কিন্তু সব বৃথা। অন্যান্য দেশে ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে-পড়তেই কিছু অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করে। বাড়িতে কাজ করেও বাবা-মায়ের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে নেয়। বাবা-মাও হাসিমুখে পয়সা দেন, কারণ তাঁরা চান ছেলেমেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। ছেলেমেয়েরাও যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত। তাদের বাবা-মা বড়লোক হতে পারেন, তা বলে তারা কোন কায়িক পরিশ্রম করতে অপমান বোধ করে না। আমাদের দেশ কিন্তু একেবারে বিপরীত। কেউ কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না। চাষী-ঘরের ছেলেও যদি একবার স্কুলে গেল, তাহলে সেও চাষের কাজ

করতে লজ্জা বোধ করবে। একবার একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে আমার কাছে কাজের জন্তে আসে। ট্রাউজার্স পরা, হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা। পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে খুব বড় এক চাষীর ছেলে। তার বাবা অনেক জমির মালিক। আমি তাকে বললাম: 'তুমি কোন্ দুঃখে চাকরি করবে, তোমাদের এত জায়গা-জমি, তুমি তাই দেখাশোনা কর না।' সে বললে: 'বাবা তো তাই বলছেন, কিন্তু দেখুন লেখাপড়া শিখে জলে ভেজা আর রোদে পোড়া আর সম্ভব নয়।' আমি ভাবলাম না জানি সে কতদূর পড়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'তুমি কতদূর পড়েছ?' সে বললে: 'ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত।' এ থেকে বোঝা যায় কায়িক শ্রমকে আমরা কোন্ দৃষ্টিতে দেখি।

কিন্তু কেন এমন হল? এর জন্তে খানিকটা দায়ী বাবা-মা, তবে বেশি দায়ী শিক্ষাব্যবস্থা। মাধ্যমিক স্তরে এমন কিছু শেখানো হয় না যাতে হাত-পা নাড়তে হয়। শুধু বই পড়, আর মুখস্থ কর। কিন্তু বই-পড়াও কি ভালভাবে হয়? প্রাথমিক স্কুলগুলির যে অবস্থা মাধ্যমিক স্কুলগুলিরও সেই অবস্থা। স্কুলবাড়ি যেদিন তৈরি হয়েছে, সেই-দিন থেকে তাতে ঝাঁট পড়েনি, ধোয়া-পোঁছা হয়নি, রং দেওয়া হয়নি। স্কুলবাড়ির চত্বরে আগাছা, নানারকমের আবর্জনা। প্রাথমিক স্কুলের মতো এখানেও শিক্ষকরা ঠিক সময়ে আসেন না, এলেও গল্প-গুজব করে অনেকটা সময় কাটান। তাঁদের কার কিরকম যোগ্যতা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তাঁরাও প্রচুর ট্যুইশনি করেন, না হলে ব্যবসা বা কৃষিকর্ম। তার উপর রাজনীতি। শিক্ষকতা কোনরকমে দায়সারা। ছাত্রেরাও এক এক করে প্রত্যেক বছর স্কুল ছাড়তে শুরু করে। শেষপর্যন্ত যারা টিঁকে থাকল, তারা হয় ধনী ঘরের ছেলে, না হলে খুব মেধাবী। এসব স্কুল থেকেও মাঝে মাঝে ভাল ছাত্র বেরোয়। কৃতিত্ব তাদের, না শিক্ষকদের বলা শক্ত। তবে সব শিক্ষকই যে অযোগ্য বা কর্তব্যে অমনোযোগী একথা বললে ভুল বলা হবে। গ্রামের স্কুলগুলিতেও কিছু শিক্ষক থাকতে পারেন যাঁরা যোগ্যতায় বা কর্তব্যপালনে কারও চেয়ে কম নন। মেধাবী ছাত্র পেলে তাঁরা তাদের গড়ে তুলতে উৎসাহী হন এবং সেইসব ছাত্রও পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্ব দেখায়। এসব হয়তো ব্যতিক্রম, তবু আনন্দের বিষয়।

এবার কলেজ-শিক্ষার কথা বলি। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর যারা কলেজে ঢোকে, তাদের অধিকাংশই কলেজে পড়ার অযোগ্য। শিক্ষার যেটুকু মূলধন থাকলে কলেজে পড়ার যোগ্যতা হয়, তা তাদের নেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই স্তরেই তারা বিশেষ কিছু শিখতে পারেনি—যে-কারণেই হোক; তবু তারা কলেজে আসে কারণ তাদের আর কিছু করার নেই। মাধ্যমিক স্তরে যদি কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেত, তাহলে হয়তো তারা কলেজে না ঢুকে কোন বৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করত। পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলে যারা পড়াশোনা করে, তাদের অধিকাংশই কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়ে। তারা যদি স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞান শিখতে পারত, তাহলে হয়তো কলেজে না ঢুকে সরাসরি খেত-খামারে নেমে যেত। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গো-মহিষ পালন, হাঁস-মুরগির চাষ, মৌমাছির চাষ, কিংবা কৃষি-কর্মে যেসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়, তার তৈরি বা মেরামত ইত্যাদি শিক্ষা যদি পেত, তাহলে কোন অবস্থাতেই তাদের বেকারত্ব ঘটত না। কিছু না কিছু কাজ তারা জুটিয়ে নিতে পারত। চাকরি নয়, স্বাধীন ব্যবসার কথা বলছি। যার নিজের জমি আছে, সে কোন্ দুঃখে চাকরি করবে? অনেকের অবশ্য নিজস্ব জমি নেই, তবু কৃষিবিদ্যা যে শিখেছে, সে নানাভাবে গ্রামের

কৃষকদের সাহায্য করতে পারে এবং তার বুদ্ধি-পরামর্শ পয়সা দিয়ে সবাই নিতে এগিয়ে আসবে। আজকাল ফার্ম ম্যানেজমেন্ট বলে একটা কথা উঠেছে। অর্থাৎ কোন্ জমির সদ্ব্যবহার কিভাবে হবে, কি-কি ফসল কোন্ সময়ে তোলা যেতে পারে, কোন্ ফসলে বেশি পয়সা পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান। তার সঙ্গে কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বীজ-সার এবং সেচ সম্বন্ধে জ্ঞান। জমির মাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান। স্কুলে এসব বিষয় শিখে এলে, সে আজকের দিনে কৃষকদের কাছে অতি আদরের পাত্র হত। দুঃখের বিষয়, সে স্কুলে এসব কিছুই শেখেনি। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি যা শিখেছে, তা তার দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। এগুলিও সে শিখেছে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। অথচ ঐ বিদ্যা নিয়েই সে কলেজে ঢুকেছে। আগেই বলেছি—কলেজে ঢুকেছে কারণ তার আর কিছু করার নেই। কলেজে ঢুকেছে—যদি কোনরকমে একটা ডিগ্রি পেয়ে কাজ পেয়ে যায়। অন্ততঃ কলেজে পড়ছে বলে সমাজে তো তার মান-মর্যাদা একটু বাড়বে! সে ডিগ্রি পেলেও যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। দেখা যাবে সে পরীক্ষায় পাশ করেছে বটে, এখন সে স্নাতক, কিন্তু তার জ্ঞানের মান এমন কিছু বাড়েনি। হয়তো এই ছাত্র বা ছাত্রীই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে। না ঢুকে কি করবে? একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছিলেন—এ যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুম, ট্রেন যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। কাজ পাচ্ছি না, কাজেই পড়া চালিয়ে যাই।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি চেহারা তা একটু দেখা যাক। এককথায়—পেছনে ফেলে আসা সেই পাঠশালার চেহারা। অতিরঞ্জিত শোনাবে, কিন্তু রূঢ় সত্য। পার্থক্য আছে, পার্থক্য বাড়ির জলুসে। হয়তো বিরাট বিরাট বাড়ি, বেশ কয়েকটি, কিন্তু অযত্নের ফলে দৈন্য-অবস্থা। আর নামাবলীর মতো তাদের সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক বাণী। যেমন বাইরে, তেমন ভেতরেও দেখা যাবে মলিনতা, কদর্যতা! সব স্বেচ্ছাকৃত। মেঝেতে কখনও ঝাঁট পড়ে না। অথচ দেখা যাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঝাড়ুদার আছে। লোক আছে, অর্থ আছে, তবে কিসের অভাব? বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন চিঠি লিখলে হয়তো উত্তর পেতে দু-মাস লেগে যাবে। পরীক্ষার ফল বেরোতে এক বছর লেগে যায়। অধ্যাপকেরা প্রায়ই ক্লাসে আসেন না, এলেও পড়ান না। কার বুকের পাটা আছে যে, প্রশ্ন করে—যদি না পড়াবেন তাহলে বেতন নেন কেন? তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁরা সকলের খবরদারি করে বেড়ান, তাঁদের খবরদারি আবার কে করবে? ভোটের জোরে তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। হয়তো দেখা যাবে ছাত্রদের এবং অশিক্ষক কর্মীদের একটা বড় অংশ তাঁদের পেছনে। অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে পড়তে নয়, তাদের আর কিছু করার নেই বলে। প্রথমে কলেজে, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা রাজনীতির স্বাদ পায়। তারা কোন না কোন দলে ঢুকে পড়ে। এতদিন তাদের দিন কাটত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। দলে ঢোকার পর তাদের অনেক সমাদর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার খানিকটা গলার জোরে, খানিকটা গায়ের জোরে নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে এগোতেই থাকে। হঠাৎ হয়তো তারা একদিন এম. এ. পাশ করে ফেলল এবং এম. এ. ছাপ থাকাতে কোন স্কুলে, এমনকি কলেজেও কাজ পেয়ে গেল। 'হঠাৎ' বলছি, কারণ পাশ করার মতো তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি নেই, তবু তারা পাশ করে গেল দেখতে পাওয়া যায়। কি করে গেল এইটিই বিস্ময়।

পরে যে তারা চাকরিও পায়, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এখন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত। যেখানে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেখানে কাজ পেতে আপনার আদৌ অসুবিধে হবে না। সেখানে কাজ করতে করতে ঐ দলেরই অনুগ্রহে আপনি পি. এইচ. ডি. হবেন, আরও কত কি হবেন। এই ডিগ্রিগুলি থাকলে আপনার সুবিধে, কারণ তাহলে প্রশাসনে ভাল একটা পদ আপনি পেতে পারেন। শিক্ষক হিসেবে আপনার যোগ্যতা কি, তা আপনি নিজে ভাল করে জানেন, ছাত্ররা অবশ্য আরও ভাল করে জানে। তা জানুক, আপনার তো শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা উদ্দেশ্য নয়। আপনার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা, প্রশাসনিক ক্ষমতায় ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আর নিজের রাজনৈতিক দলের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। তা আপনি ভাল-ভাবেই করতে পারবেন।

আমাদের দেশে এখন শিক্ষা-খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আজকাল পরিসংখ্যান-বিদ্‌রা দেশের অগ্রগতির হিসাব করেন কোন্ খাতে কত ব্যয় হয়, তা দিয়ে। এদিক থেকে দেখলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের খুব উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি হচ্ছে? একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব কি হচ্ছে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য যদি জ্ঞানার্জন হয়, তাহলে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শুধু ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু দেখি না। অথচ কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে শিক্ষার নামে এই প্রহসনের খাতে। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে দরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব উচ্চমানের করা। তাহলে সবচেয়ে লাভ হবে এই যে, আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হবে। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে আমাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে হবে। শুধু বই-পড়া বিদ্যা নয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের পাঠ্যসূচীর আমূল সংস্কার করা দরকার। আমরা অনেক কিছু শেখাই, কিন্তু কোনটাই ভালভাবে শেখাই না। অন্যান্য দেশে দেখি মাধ্যমিক স্তরে জ্ঞানের ব্যাপ্তি হয়তো নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা যা শিখেছে ভালভাবেই শিখেছে। আমরা উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করি, তা কমিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে বেশি অর্থ ব্যয় করা উচিত। আর এ দুই স্তরের পাঠ্যসূচী একেবারে ঢেলে সাজানো উচিত। এই পরিবর্তন হবে দেশের যেমন প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের দেশে পল্লী ও শহরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। এ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। পল্লীর ছেলেমেয়েরা কৃষি শিখতে পারে, কিন্তু শহরের ছেলেমেয়েরা পারে না। তাদের অন্যরকমের হাতের কাজ শেখাতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বাড়ির শিক্ষার ত্রুটির কথা উল্লেখ না করে পারি না। নানাকারণে আমরা কায়িক পরিশ্রম করাকে দুর্ভাগ্য মনে করি। এ মনোভাব আমাদের পালটাতে হবে। ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা বাড়িতে সব রকমের কাজ করতে প্রস্তুত হোক—এইভাবে তাদের গড়ে তুলতে হবে। যে পড়াশোনা করে সে আর কিছুই করবে না, এ ব্যবস্থা এ যুগে অচল। বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা কারণে গৃহকর্মের জন্যে বাইরের লোক রাখা আজ অধিকাংশ গৃহস্থের পক্ষে সাধ্যাতীত হতে চলেছে। বাড়ির সবাই এই কাজ ভাগ করে করবে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। অন্ততঃ কায়িক পরিশ্রমকে ঘৃণা করবে না—এ মনোভাব যেন থাকে। তেমনই স্কুলের ভেতর-বার পরিচ্ছন্ন রাখা,

ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো, স্কুলবাড়ি ও আসবাব-পত্র মেরামত করা—এসব কাজেও ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নেওয়া উচিত। তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে প্রয়োজন হলে পারিশ্রমিকও দেওয়া উচিত।

শিক্ষার ত্রুটির কথা অনেক বলেছি, কিন্তু যা বলিনি তা আরও গুরুতর। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, ব্যবহার কিরকম? তাঁদের মধ্যে কয়জন সৎ? কয়জন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে জানেন বা করেন? কয়জন কর্তব্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমী, সমাজ ও জাতির জন্যে স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, দুর্বলের উপর অত্যাচার করেন না, কয়জনকে বলতে পারি আমাদের গৌরব? দুঃখের বিষয়, এখন শিক্ষা মানে শুধু পরীক্ষা-পাশ, ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট। শিক্ষার সঙ্গে চরিত্র গঠন বা মানবিক গুণের কোন সম্পর্ক নেই। তাই শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই বেশি পাপ। তাঁদের তুলনায় অশিক্ষিত মানুষ অনেক সৎ ও সরল। কোন্ জাত বড় হতে পারে যদি তার শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়? আজ দেশের সমস্ত সমস্যার মূলে শিক্ষার ব্যর্থতা।

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। দেশে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা আদর্শ চরিত্রের মানুষ। তাঁদের সংখ্যা হয়তো কম, কিন্তু তাঁরা যে-কোন দেশের গৌরব। তেমনই বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যা আদর্শস্থল। সেখানে নিয়মশৃংখলা আছে, শিক্ষকরা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও কর্তব্যনিষ্ঠ, ছাত্র-ছাত্রীরাও বাধ্য, বিনয়ী ও পরিশ্রমী। দেখা যাবে, এসব প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী। এর কারণ, যাঁরা এগুলির পরিচালক তাঁরা আদর্শনিষ্ঠ। এইসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক সব পরীক্ষায় উচ্চ আসনগুলি দখল করে। তারা যে-কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। দুঃখের বিষয়, এসব ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ বিদেশে চলে যায়—ভাগ্যান্বেষণে। দেশের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। যারা দেশে থেকে যায়, তারা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির শীর্ষস্থানীয়। বিদ্যাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবল—সবদিক থেকেই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমকক্ষ। কিন্তু তাহলে কি শিক্ষার ফল এই দাঁড়াবে যে, মুষ্টিমেয় লোকে যোগ্যতার বলে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবে, আর বাকি কোটি কোটি লোক মূঢ় ও অক্ষম হয়ে থাকবে? একেই কি বলে গণতন্ত্র? গণতন্ত্র মানে সমান সুযোগ। এই তথাকথিত সমান সুযোগের অর্থ কি, তা একবার ভেবে দেখুন। আপনি স্কুলে পড়েছেন, আমিও পড়েছি। আপনার স্কুলে ভালভাবে পড়াশোনা হয়েছে। আমার স্কুলে কিছুই হয়নি। তেমনই কলেজে, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের উভয়েরই একই সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল তফাত! আপনি যে-কোন বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত, আমার সেই জায়গায় প্রবেশের অধিকারও নেই। এরই নাম কি গণতন্ত্র? এই শিক্ষাব্যবস্থা কি এক নিষ্ঠুর পরিহাস নয়?

মরমিয়াবাদের মর্মবাণী

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১

মরমিয়াবাদের প্রকৃত স্বরূপ জানেন মরমী আর মর্মজ্ঞ। এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। যা মূলতঃ অনির্বচনীয়, ভাষা তাকে কিভাবে প্রকাশ করবে? মরমিয়া অভিজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে নীরবতা; তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে, শব্দ ও বুদ্ধি তার সন্ধান পায় না: 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (২।৯)। ইংরেজী ভাষায় যাকে 'mysticism' বলা হয় সেটি mystes-শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেটি গ্রীক্ muein-ক্রিয়াপদ থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ 'নীরব থাকা'। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, ঈশ্বর ও প্রকৃত সত্যের যে-জ্ঞান তা ইন্দ্রিয়জ নয় কিংবা বুদ্ধিনির্ভর নয়, তা অন্তরে অনুভূত ও স্বজ্ঞালব্ধ—এটাই মরমিয়াবাদ। বুদ্ধি-অনুসারে মরমিয়া ভাবের বিচার করতে যাওয়া মূঢ়তা। 'মহাভারতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে: 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' (১।১।১৮)। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মরমিয়াবাদের অনেক সমালোচক বিভ্রান্ত হয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মনে করেন, তাঁদের ধর্মের কিছু কিছু তত্ত্বকে মরমীরা উপেক্ষা করেছেন। মরমীদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলেন। মরমীয়াবাদের যাঁরা বিরোধী তাঁদের বক্তব্য জি. কে. চেস্টার্টনের মন্তব্যে পাওয়া যায় যেটা কিছুটা পরিহাসবিজড়িত: 'Mysticism begins in mist, centres in "I", and ends in schism'. অর্থাৎ, মরমিয়াবাদের শুরুতে কুহেলি, কেন্দ্রবিন্দুতে 'আমি', এবং বিভেদে সমাপ্তি। এ-মত স্পষ্টতই অত্যুক্তি, তা ছাড়া এটা যেটুকু প্রযোজ্য সেটা ছদ্ম-মরমিয়াবাদ সম্পর্কে, সত্য-মরমিয়াবাদ সম্পর্কে নয়।

উইলিয়ম্ জেম্স্ তাঁর 'দ্য ভ্যারাইটিজ্ অফ্ রেলিজিয়স্ এক্সপিরিয়েন্স'-গ্রন্থে মরমিয়া-অনুভূতির চারটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে, অনির্বচনীয়ত্ব। তিনি মনে করেন, এ-অনুভূতি শুধু ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা যায়, কিংবা উপমার সাহায্যে বর্ণিত হয়। ঈভ্‌লিন্ আণ্ডারহিল্ তাঁর 'Mysticism'-গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন: 'Where the philosopher guesses and argues, the mystic lives and looks.' (১৯৬০ সংস্করণ, পৃঃ ২৪)। জেম্স্ যে-দ্বিতীয় লক্ষণটির কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে noetic quality বা বোধগম্যতা। শেষ দুটি লক্ষণ হচ্ছে ক্ষণস্থায়িত্ব এবং অক্রিয়ত্ব। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই যখন খুশি এবং যেভাবে খুশি মরমিয়া অনুভূতি সৃষ্টি করা যায় না বা স্থায়ী করা যায় না। এদিক থেকে দেখলে কবির কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে মরমীর অনুভূতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শেলি তাঁর 'কাব্যের স্বপক্ষে' প্রবন্ধে তাই বলেছেন:

'কাব্য যুক্তিতর্কের মতো নয়, যে-শক্তি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা চলে। "আমি কাব্য রচনা করব", এ-কথা কোন লোকে বলতে পারে না। কবি-সার্বভৌমও তা বলতে পারেন না; কারণ সৃষ্টির সময় মনের অবস্থা নির্বাণোন্মুখ অঙ্গারের মতো। কোন অদৃশ্য প্রভাব দমকা বাতাসের মতো তাকে ক্ষণ-দীপ্তিতে জাগিয়ে

দেয়। এ-শক্তি অন্তর থেকে জাগে, ফুলের বিকাশের সঙ্গে তার রঙ যেমন ম্লান হয়, বদলে যায়; আর আমাদের প্রকৃতির চেতন-অংশগুলি তার আসা-যাওয়ার কোন খবর রাখে না। এই প্রভাব তার মৌলিক শুদ্ধতা ও শক্তি নিয়ে যদি স্থায়ী হতে পারত তা হলে তার ফল কত বিরাট হত সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়; কিন্তু রচনার যখন সূত্রপাত হয় তার পূর্বেই প্রেরণার ক্ষয় আরম্ভ হয়ে যায়, আর বিশ্ববাসীর গোচরে আনা হয়েছে যে সব কাব্য তার মধ্যে যা সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিও বোধ হয় কবির মনের মূল কল্পনার ক্ষীণ ছায়া মাত্র।'

শেলির মতো মহান্ মরমী কবি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা লিখেছেন, তাই মরমিয়াবাদ-প্রসঙ্গে এই পঙ্‌ক্তিগুলি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মরমিয়া অনুভূতি ও কাব্যসৃষ্টি, এই দুইয়ের মূলেই রয়েছে অলৌকিকত্ব। আর মরমী কবি যখন মরমিয়া কাব্য রচনা করেন, তখন এই অলৌকিকত্ব এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে, 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যরসের আস্বাদনকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'-রূপে বর্ণনা করেছেন (৩।৩৪)। বৈদান্তিকের কথাও মনে পড়বে: 'রসো বৈ সঃ'।

২

মরমিয়া অনুভূতি স্পষ্টতই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। ওয়র্ডসোয়র্থের ভাষায় বলা যায়, 'unborrowed from the eye'। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে:

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের
বাহিরে,
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে।'

বাইরের আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে যখন আমরা অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পারি, তখনই হয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থে:

'কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমূরতি
ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত;
কিবা বিজলি চমকে সে-রূপ
আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি "কোটি শশী-বিনিন্দিত" কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর-দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে—

হৃদি কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে,
অপরূপ প্রিয়-দর্শন!

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য। শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন।' (আনন্দ সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃঃ ২৬)।

এই 'অপরূপ প্রিয়-দর্শন' চর্মচক্ষুতে সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন 'প্রেম নয়নে'র। প্রেম নয়নের এই অভিজ্ঞতা শুধু মরমী সাধকের পক্ষেই সম্ভব। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন মর্মমরমী, তাই এ-অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর পক্ষে সহজলভ্য। তাই তিনি বহুবার 'মহানন্দে' ভাসতে পেরেছেন, যে-অবস্থা সম্বন্ধে ওয়র্ডসোয়র্থ তাঁর 'Tintern Abbey'-কবিতায় লিখেছেন:

While with an eye made quiet
by the power

Of harmony, and the deep power
of joy
We see into the life of things.

এই 'অন্তর্দৃষ্টি' ভাবসমাহিত রামকৃষ্ণের কাছে খুব স্বাভাবিকভাবে এসেছে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী'-কাব্যগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের পঞ্চম সর্গে লিখেছেন: 'And only the spirit's vision is wholly true'. এই আত্মার আলোকেই আমরা নিরীক্ষণ করি সেই গোপন দিব্য দ্যুতি ঋগ্বেদে যাকে বলা হয়েছে 'গূঢ়ং জ্যোতিঃ' (৮।৭৬।৪)। মরমী সাধকের আলোকপিপাসা চিরন্তন। তাই তাঁর প্রার্থনা বৈদিক সূক্তের পঙ্‌ক্তিতে উচ্চারিত:

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

তাই তিনি যিনি 'আলোর আলো', যিনি 'আলোর আলোকময়' করে দ্যুলোক ভূলোক প্লাবিত করে আসেন, তাঁকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল। যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং বলেছেন: 'I am the light of the world; he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life'. (জন্-লিখিত সুসমাচার, ৮।১২)। জ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখার জন্য আর্তি সাধককে মরমিয়া অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে-অনুভূতি আসে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির মতো, যেমন এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে 'মেটাফিজিক্যাল্' কবি হেন্‌রি ভনের জীবনে:

I saw Eternity the other night
Like a great Ring of pure and
endless light,
All calm, as it was bright.
('The world')

আমাদের চণ্ডীদাসের কবিতাতেও এ-আর্তি বাণীরূপ পেয়েছে:

(আমার) বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর-দুয়ারে খোলা;
(তোরা) নিসাড় হইয়া আয় না, সজনি!
আঁধার পেরিয়ে আলা।

প্লেটোর 'রিপাব্‌লিকে' যে-গুহার বিশ্ববিশ্রুত বর্ণনা আছে সেখানেও আলোকের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেই বর্ণনা সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ মন্তব্য করেছেন যে, এটি হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞান ও বাস্তবের চেয়ে অধিকতর সত্য ও বাস্তবতর কিছুতে যে-বিশ্বাস সে-সম্বন্ধে এক কালজয়ী উক্তি' ('মিস্টিসিজ্‌ম্ অ্যাণ্ড লজিক্', ১৯৭৪ সংস্করণ, পৃঃ ১১)। এই প্রসঙ্গে প্লটিনাসের উক্তিও মনে পড়ে: 'হঠাৎ আলোর ঝলকে যখন আত্মা ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন আমরা ভাবতে পারি যে, আমাদের সত্যিকারের দেখা হল; কারণ এই আলো আসছে যিনি মহান্ পুরুষ তাঁর কাছ থেকে এবং তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ' (Enneads, VI, 7)। দান্তের 'পারাদিসো'র ত্রিংশ সর্গও স্মর্তব্য যেখানে চোখ-ধাঁধানো আলোকের ঝলক কবিকে আবৃত করেছে এবং তিনি এমন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন যা কোন কিছুতেই নির্বাপিত করতে পারে না। তাঁর চোখের সামনে ভাসমান আলোকের স্রোতস্বিনী, যা থেকে বেরিয়ে আসছে অফুরন্ত প্রাণবন্ত স্ফুলিঙ্গ। বিয়াত্রিচের কাছ থেকে দান্তে জানতে পারবেন যে, যিনি আলোকস্বরূপ এটা তাঁর ছায়ারূপ। আলোকের স্রোতস্বিনী গিয়ে মিশবে জ্যোতিঃ-সমুদ্রে। পরে অবশ্য এই সামগ্রিক সামুদ্রিক অভিজ্ঞতার সৌভাগ্যও দান্তে অর্জন করবেন। মরমিয়া সাধক যিনি তিনি এই আলোক-সাগর-তীর্থ-পথের যাত্রী। এই তীর্থ-সলিলে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, মরমীর একমাত্র সাধনা যাতে তাঁর আমি-রূপ লবণের পুতুল সচ্চিদানন্দ রূপ জ্যোতিঃ-সমুদ্রে গলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্প

ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী

বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশ্বভারতী। হিন্দী, বাঙলা, অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার সুখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক।

বাঙলা সাহিত্যে বাক্‌শিল্পীর অভাব নেই। তবে সংযত বাক্‌শিল্পীর নিতান্তই অভাব। সে অভাব বহুলাংশে পূর্ণ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যেমন সংযত তাঁর জীবন, জীবনকাল এবং ব্যক্তিত্ব, তেমনি সংযত তাঁর বাক্‌নির্মিতি। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে লেখনী ধারণ না করেও সাহিত্য-সৃজন এবং ভাষার শিল্পায়নে বিস্ময়কর প্রেরণা এবং উপকরণ জুগিয়েছেন। বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দানও প্রায় অনুরূপ। প্রায় বলছি এই কারণে যে, স্বামীজী, স্বল্প হলেও আমাদের জন্য কিছু লিখে গেছেন। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ১৮৯৩—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত এবং পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২) 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৬), 'ভাববার কথা' (১৯০৭) এবং 'পত্রাবলী' (১৯০৫—২৫) প্রভৃতি গ্রন্থ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তার মধ্যে 'বর্তমান ভারত' সাধুগদ্যে এবং 'ভাববার কথা'র কিয়দংশ সহ বাকি গ্রন্থ কয়টি চলিত ভাষায় লেখা। এ যেন স্বামীজীর প্রত্যাশাতীত দান।

ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—(১) যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।

(২) সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।[1]

সাহিত্যের আদর্শ ভাষা সম্পর্কে বিবেকানন্দও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর মতে—

(১) ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

(২) চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।[2]

দেখা যাচ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ ও মানবজাতির উন্নতিবিধান সম্ভব এবং তা হতে পারে সহজ-সরল-সর্বজনবোধ্য ভাষার সাহায্যে—এ বিষয়ে দুই চিন্তানায়ক-ই অভিন্নমত। উপরন্তু ভাষাকে উন্নতির প্রধান উপায় ও লক্ষণরূপে এবং চলিত ভাষার শিল্পনৈপুণ্যের কথা অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে স্বীয় ভাষা-চিন্তা, ভাষা-শিল্পবোধ এবং দেশ ও জাতির মঙ্গলের মৌলিকতা দেখিয়েছেন

১ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ।

২ 'বাঙ্গালা ভাষা' ভাববার কথা।

বিবেকানন্দ। যার বিবিধ বিচিত্র স্বীকরণ এবং সার্থক প্রয়োগে সুসমৃদ্ধ আজকের বাঙলা সাহিত্য। আজকের বাঙলা ভাষা বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচেতনা এবং আশীর্বাদে ঋদ্ধ।

আমরা জানি—'বড় কঠিন সাধনা যার বড় সহজ সুর।' স্বামীজীর বাক্‌শিল্প অতি সহজ সুরের উপর গড়ে উঠেছে। তার স্বরূপ ও সুবিধাটুকু আমাদের সুপরিচিত, কিন্তু তার জন্য স্বামীজীর 'বড় কঠিন সাধনা'টি আমাদের অলক্ষ্যেই থেকে গেছে। এই সাধনাই তাঁর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুগ ও সমাজের চাহিদার সুন্দর এবং সার্থক সমন্বয়-সাধন করে তাঁর বাক্‌শিল্প নির্মাণ করেছে। এই বাক্‌-শিল্পের প্রথম ও প্রধান কথা ভাষার প্রসাদ গুণ। অর্থাৎ মনের আলো। লেখকের মন থেকে ওই আলো বিষয়ের উপর ঠিকরে পড়ে তাকে উজ্জ্বল করে তোলে। ভাষা সরল ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় জীবনের শক্তি-সামর্থ্য অভিরুচি-প্রয়োজন এবং উত্থান-পতনের সঙ্গে ভাষার নিগূঢ় সম্পর্ক। জাতীয় বল ও উৎকর্ষ বাড়লে ভাষারও শক্তি ও উৎকর্ষ বাড়ে। আবার ভাষা সমৃদ্ধ হলে জাতীয় জীবনেও সমৃদ্ধি আসে। সুতরাং ভাষার উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের সুদিনের দ্যোতক।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এইরূপ সুদিন এসেছিল। বিভিন্ন বিচিত্র এবং অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব-মণ্ডলীর আবির্ভাবে বাংলার আকাশ-বাতাস গমগম করছিল। সেই মণ্ডলীর একটি অনুপম ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর রচিত সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং ভাষা নৈয়ায়িকের। কিন্তু সে ভাষা শিল্পরসে টলমল; কারণ তা শিল্পীর ভাষা। যা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত তাঁর নিজস্ব। দেশ-নায়কের দৃপ্ত তেজ, অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং বিস্ময়কর কর্মক্ষমতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। ভাবের অনায়াস সংক্ষিপ্ত ও সুষ্ঠু প্রকাশই বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্পের মহৎ গুণ। তাতে ঘটেছে—বাঙালীর বাক্‌ছন্দ, মুখের ভাষার ইডিয়ম, দেশী-বিদেশী, তৎসম-তদ্ভব শব্দ, ক্রিয়া ও সর্বনামের চলিত রূপের প্রয়োগ। অসমাপিকা ক্রিয়ার অসদ্ভাব এবং মাঝে মাঝে ক্রিয়ার লোপ এবং সুচিন্তিত ও সংযতভাবে বিশেষণ ব্যবহার—যাতে নানা রঙের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে—ভাব ও ভাষাকে 'শিল্প-শোভার সার' করে তুলেছে। বিশেষণ ও অলংকার বিরলতায় তাঁর ভাষা ভারহীন। ছোট ছোট বাক্য, উপবাক্যের সমবায়ে অনুচ্ছেদ রচনায় আশাতীত সংযম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর বাক্‌-প্রবাহ চটুল-চপল অতি দ্রুতগতিতে পাঠকের হৃদয়ে সোজাসুজি অনুভূতি জাগায়। অচিরে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত করে তোলে সেই হৃদয়দেশ। এখানেই স্বামীজীর বাক্‌শিল্পের অনন্যতা ও আধুনিকতা। সুতরাং আধুনিক বাঙলা গদ্য সাহিত্যের চলিত ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী স্বামী বিবেকানন্দ-ই। তাঁর বাক্‌শিল্পের শক্তি, সুষমা, প্রাঞ্জলতা, উপযোগিতা এবং আধুনিকতা ধ্বনিত হয়েছে চলিত ভাষার সমর্থনে তাঁর এই অভিমতটিতে—

> "ও ভাষার যেমন জোর যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে; তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই; এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"…(ভাববার কথা : 'বাঙ্গালা ভাষা')

স্বয়ং বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্প এই ইস্পাতের বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। তা যেমন নমনীয় তেমনি শাণিত, সাবলীল ও লঘুগতি। যখন যেমন চেয়েছেন তাকে দুমড়ে-মুচড়ে তেমনি কাজে

লাগিয়েছেন। অম্ল-মধুর-সহাস্য রসিকতা ও বাক্-ছন্দে তাঁর শব্দবিন্যাস ও বাক্যসজ্জা অভূতপূর্ব শিল্পসিদ্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যাশিত বাঙলা চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর এই অভিমত তাঁর ভাষা সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। উপদেশ নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত না হয়ে স্বয়ং তার সমুজ্জ্বল নিদর্শনও দিয়ে গেছেন। এখানেই তিনি অনন্য। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি একাধারে তাঁর অতুলনীয় বাক্‌শিল্প এবং বাগ্‌বিস্তার অদ্বিতীয় স্মারক। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল বাক্‌শিল্পী-ই নন, বাগ্‌বিদ্‌ও।

সিদ্ধ বাক্‌শিল্পী বিবেকানন্দের উদার ও বাছ-বিচারহীন শব্দচয়ন নানা স্তরে নানাভাবে তার প্রয়োগ, আবশ্যক ও অভিরুচিমতো অভিনব অর্থে তার ব্যবহারে যে সাহিত্যিক চলিত ভাষা গড়ে ওঠে তা অবলীলায় গুরু ও লঘু-রচনায় সর্বত্র সমান সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি প্রথম দিকে স্বামীজী গুরু-চিন্তানুসারী দীর্ঘবাক্যের মন্থরগতি গুরুগম্ভীর শব্দের ঝংকারে মুখরিত সাধু-ভাষায় লিখতেন। 'বর্তমান ভারতে' এরূপ ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কোথাও কোথাও হ্রস্ববাক্য হৃদয়ের আবেগে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে করতে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে—এমনও দেখা যায়। সুতরাং সাধু গদ্যেও তাঁর অধিকার এবং ব্যক্তিত্বের জাদুক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি—জনতার মুখের শব্দ, হ্রস্ব ক্রিয়া-পদ, বিদেশী শব্দে পুষ্ট আটপৌরে ভাষা, ইডিয়ম ও পরিহাস-মাখা মন্তব্য তথাকথিত চলিত রীতিতে অভিনবতা এবং সাহিত্যিক যোগ্যতা এনে দিয়েছে। উদারচিত্ততা, সংস্কারমুক্তি এবং মহা-প্রাণতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি-ই তার উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। এ-গ্রন্থেই কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অনায়াস ধ্বনিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে যা বর্ণিত বস্তুকে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে চলিত গদ্যকেই গুরু-অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায়, নৈয়ায়িক বিচার-বিশ্লেষণের সার্থক বাহনরূপে পেয়ে, আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভাষা আটপৌরে কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর ঋজুভাবে দণ্ডায়মান। কোথাও বা ইতর-ভদ্র সকলের মুখের ভাষার আদর্শ নিয়ে দূরের এবং গুরুগম্ভীর বক্তব্যকেও অবলীলাক্রমে অতিপরিচিত কাছের বস্তু করে তুলেছে লেখকের বাক্‌শিল্প। 'ভাববার কথা'য় মুখের ভাষার বিশেষ টান ও উচ্চারণ-শৈলীর আধুনিকতা বাঙলা গদ্যকে নবীন রূপ-রস-শক্তি ও সার্থকতায় মণ্ডিত করে তুলেছে। তেমনটি আর কোথাও পাওয়া গেল না। তবে পরবর্তী বাঙলা গদ্য সাহিত্য রচয়িতাগণ ভাষার শক্তি-সুষমা অনুধাবন এবং বিচিত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামীজীর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও ঋণী সেকথা বলাই বাহুল্য। বর্তমানের বাঙলা কথা-সাহিত্যের ভাষা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্পের ধারক এবং বাহক। সব-শেষে বিবেকানন্দের ব্যবহৃত এবং হয়তো সৃষ্টও ইডিয়মের উল্লেখ করা যেতে পারে।—"হাত চুবয়ে সপাসপ দাল ভাত খাই; বিরহের জ্বালায় হাসেন হোসেন করেন; পা কেটে চৌচাক্‌লা; হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে; মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ; জ্ঞান জিনিসটা এমন নয় যে, 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বে' বলে জাগিয়ে দেওয়া যাবে; সাহেবিতে কাজ নেই নেটিভ কব্‌লো; হনুমানের সি-সিক্‌নেস হয়েছিল কিনা"—ইত্যাদি। এগুলি যেমন বাংলার হাট-মাঠ-ঘাট থেকে আহৃত, তেমনি স্বামীজীর সৃষ্টিও।

কাবেরীর উৎস-'মণ্ডলে'

স্বামী নিরাময়ানন্দ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ—'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'র অধ্যক্ষ।

'তাহলে তুই এখানেই থেকে যাবি?'

পিতার প্রশ্নের উত্তরে কাবেরী তাঁর বিশাল বক্ষে তার ছোট্ট মুখটি লুকিয়ে, বেণীটি নাড়িয়ে জানালো, 'হুঁ'।

মুনির কাছে বাক্যবদ্ধ রাজা সজল চক্ষে চাইলেন মুনির দিকে—মুনিও সিক্ত নয়নে চাইলেন একবার রাজার দিকে—পরক্ষণেই পিতার বক্ষোলগ্ন কাবেরীর দিকে।

দুই পিতৃহৃদয়ের বিগলিত ধারার সঙ্গমে নতুন জন্ম হ'ল কাবেরীর—দাক্ষিণাত্যের মহাতীর্থ ভাগমণ্ডলে!

এই নির্জন পবিত্র পর্বতের শিখরমণ্ডলে রাজা এসেছিলেন ভাগমণ্ডলের মুনি ভাগণ্ডাকে দর্শন করতে। সঙ্গে এনেছিলেন বালিকা কন্যা কাবেরীকে। সে দেখতে চেয়েছে বন, পর্বত, নদী। সে তো এখানে এসেই এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। বন উপবন ফুল ফল সব কিছুর সঙ্গে এক হয়ে গেছে, ছোট্ট ঝরনা-ধারায় পা ডুবিয়ে খেলছে, পাখিকে ডাকছে, হরিণশিশুকে জড়িয়ে ধরছে—সব কিছু যেন তার কত দিনের পরিচিত। তার আগমনে যেন এ স্থান জেগে উঠেছে।

ওদিকে রাজা ও মুনি কথা বলছেন—দেশের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। হঠাৎ রাজা বলে ফেললেন, আপনার কি চাই বলুন। আপনাকে কিছু দিয়ে আমার যাত্রা সফল করতে চাই।

প্রাণ-চঞ্চল কাবেরীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মুনি বললেন, 'আমার তো কিছুই চাই না, অভাব কিছুই নেই। তবে একান্তই যদি দিতে চান—তো ঐ কন্যাটিকে দিন।'

রাজা একটু চমকে উঠে সামলে নিলেন নিজেকে। রাজা তিনি, মুনিকে কথা দিয়েছেন। তাঁর প্রাণপ্রিয়া কন্যাটিকে মুনির কাছে রেখে শূন্যহৃদয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

ওদিকে কাবেরী দিনে দিনে বড় হ'তে লাগলো—বন হরিণীর মতো আনন্দ-উচ্ছল—সারা দিন একা একা ঘুরে বেড়ায় বনে বনে, খেলা করে জল-ছলছল ছোট ছোট ঝরনার সঙ্গে—সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে মুনির কাছে—কত গল্প শোনে—ইতিহাস পুরাণের—মানুষের দেবতার অসুরের।

কাবেরী বড় হচ্ছে দিনে দিনে, যৌবনের জোয়ার আসে আসে; ঋষি চিন্তিত! কি করবেন এখন এই মেয়েকে নিয়ে? কার হাতে দিয়ে যাবেন এই কন্যারত্ন? উপযুক্ত পাত্র কোথা? রাজার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন? সে কি ক'রে হয়? এখন তো তাঁরই দায়িত্ব উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা! এখনই—কারণ তিনি তো আর চিরজীবী নন্!

এরূপ ভাবছেন—এমন সময় একদিন ভাগমণ্ডলের আশ্রমে এসে উপস্থিত বিন্ধ্যদর্পহারী অগস্ত্যমুনি। আর্য সভ্যতা ও কৃষ্টি বিস্তারের ব্রত গ্রহণ ক'রে আসছিলেন দাক্ষিণাত্যে, পথে বাধা বিন্ধ্যপর্বত। মুনি তাকে বললেন, প্রণাম কর; অবাধ্য উদ্ধত বিন্ধ্য মাথা উঁচু ক'রে রইল, পথ দেবে না। অবশেষে নতমস্তকে মুনিকে প্রণাম করলে মুনি বললেন, যতদিন না ফিরে আসি এইভাবেই থাকো!

যুবক অগস্ত্য এসে উপস্থিত ভাগমণ্ডলের ভাগণ্ডামুনির আশ্রমে, বিচক্ষণ মুনি লক্ষ্য করেছেন দুজনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ! বুঝলেন

কাবেরীকে পাত্রস্থ করার সময় সমুপস্থিত। 'শুভস্য শীঘ্রম্'—আমি আর কতদিন!

অগস্ত্য তাঁর মানসীকে পেয়েছেন; কিন্তু কাবেরী? কাবেরী এখনও দেখছে তার ভাবী জীবনসঙ্গীকে। জানিয়ে দিল তাকে: অত ঘুরে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। তাহলে আমিও এখানে স্থির হয়ে থাকব না, আমিও চলে যাব নানা দেশের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে।

অগস্ত্য বিনীত কণ্ঠে জানালেন: আমার যে একটা জীবনব্রত আছে—আর্যকৃষ্টির বিস্তার।

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল: আমারও আছে!

অগস্ত্য আবার নীচু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: কি তোমার জীবনব্রত? সেটা তো আমার জানা দরকার।

কাবেরীর উত্তর প্রস্তুত ছিল: কৃষির বিস্তার!

অগস্ত্যের প্রশ্ন: তার মানে?

কাবেরী এবার হেসে উঠল, বললে: এতবড় মুনি হয়ে এই ছোট্ট দুটি কথার মানে জিজ্ঞাসা করছেন? শুধু কৃষ্টির বিস্তার ক'রে কি হবে? তার আগে চাই কৃষির বিস্তার; মানুষ খেয়ে শক্ত সবল হ'লে তবেই তো কৃষ্টির উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। আমি শুষ্ক ভূমিতে জলধারা নিয়ে যাব, পিপাসুর কণ্ঠে জল দেবো—ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন দেবো, এই আমার জীবনব্রত।

অগস্ত্য খুব সন্তুষ্ট হলেন, বললেন: এই তো আমার সহধর্মিণীর কথা! এমন একজনকেই তো আমি খুঁজছিলাম এতদিন ধরে। যিনি আমার জীবনের পরিপূরক। সত্যি তো চাই অন্নময়ের সাথে মনোময়ের মিলন, অন্নময়ের ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে মনোময়ের সৌধ।

*

বিবাহ হয়ে গেল—খুব রাজকীয় ধুমধামে তো নয়ই, তবে আর্যকৃষ্টির মূল অনুষ্ঠানগুলি নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিছুদিন কাটলো বেশ আনন্দে, তার পর এল বিদায়ের পালা! প্রথম চলে গেলেন বৃদ্ধ মুনি ভাগণ্ডা অগস্ত্যকে আশ্রমের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে। কন্যা কাবেরীকে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন প্রাণ ভরে—'সার্থক হও, সফল হও তোমাদের মিলিত জীবনব্রতে।'

আরো কিছুদিন কেটে গেল। অগস্ত্যের গতিশীল মন আর পারছে না এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে; এ যেন বন্দী-জীবন! একদিন তিনি কাবেরীকে বলেই ফেললেন: 'এবার কিছুদিন ঘুরে আসি!'

'তার পর?'

'তারপর শিগ্‌গির ফিরে আসব।'

'ফিরে এসে যদি আমাকে দেখতে না পাও।'

'না, না ও কথা কেন বলছ! আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব, কাছেই কোথায় যাবো—একটু তপস্যা ক'রব।—ওই যে জলপ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে—তারই কাছে তপস্যা ক'রব।

'এখানে আশ্রমে কি তপস্যা হচ্ছে না? কেউ কি তোমার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে?

'না, তা নয়—তবে মাঝে নির্জনে গোপনে তপস্যা করলে শক্তি বাড়ে! শক্তি প্রয়োজন—এটা তো স্বীকার কর!'

'সবই স্বীকার করি, তিনদিনের জন্য যাবে। তার বেশী হয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে প'ড়ব। তবে তিনদিনের মধ্যে নয়।'

অগস্ত্য জানতেন কাবেরীর জলময় রূপ। তাই তাঁর দুটি শিষ্যকে বলে গেলেন, সাবধানে কাবেরীকে রাখবে, যদি দেখ এখান থেকে কোন জলধারা বেরিয়ে নেমে যাচ্ছে,—তবে বাধা দেবে, —বাঁধ দেবে—জল যেন না বেরিয়ে চলে যায়। তিনদিন পর্যন্ত সব ঠিক চলল। চতুর্থ দিন সকালে দেখা গেল একটি সুতোর মতো জলস্রোত ক্রমাগতই বেরিয়ে আসছে পাষাণের বক্ষ ভেদ ক'রে!

শিষ্যদের সন্দেহ হ'ল—এই বুঝি কাবেরী চলে যাচ্ছে! তারা মাটির বাঁধ, বালির বাঁধ, পাথরের বেড়, কত কি দিল, যত বেলা বাড়ে—জলও তত বাড়ে, ক্রমশ নামছে—স্তরে স্তরে—আর বাঁধ (বেরী বা বেলি) মানছে না। শিষ্যেরা তখন গুরুদেবকে স্মরণ করছে। এমন সময় অগস্ত্য এসে হাজির! ব্যাপারটা সব বুঝে ফেলেছেন—কাবেরী নদীরূপ ধরে চলে যাচ্ছে—যাই হোক তিনি তাঁর কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে দিতেই কাবেরী স্বরূপেই তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে হাসতে লাগলো।

তখন দুজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, আমাদের দুজনের অর্ধাংশ হরপার্বতীর মতো এখানে চির-মিলিত থাকবে, বাকী অর্ধাংশ দিয়ে উভয়ের জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হবে। একজন যাবে পাহাড় থেকে জলপ্রবাহ নিয়ে সমতলে কৃষির সহায়তা করতে, আর একজন যাবে—গিরি-বন-মরু সর্বত্র কৃষ্টির বার্তা নিয়ে। এইভাবেই গড়ে উঠবে মানুষের একটি পরিপূর্ণ জীবন, এইভাবেই রচিত হবে সত্য সমৃদ্ধ একটি মনুষ্যসমাজ!

কাবেরী-ভাগমণ্ডলে অগস্ত্য-কাবেরীর মিলিত-মূর্তি আজও এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমগ্র সমাজের কল্যাণকর্ম করতে হ'লে তা বিচ্ছিন্নভাবে, এককভাবে করলে হবে না, সম্মিলিতভাবে করতে হবে। নিজের অনেক খেয়াল-খুশি ত্যাগ করতে হবে, বিভিন্ন ভাবকেও সঙ্গে নিতে হবে, মনে রাখতে হবে এই দার্শনিক সত্য: যা কিছু বিপরীত বলে মনে হয়, আসলে পরিপূরক—পরিপূর্ণতার সহায়ক।

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

মেডিকেল এন্‌টামলজির প্রধান অধ্যাপক এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, স্কুল অব্‌ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা। বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও পর্বতারোহণ-বিশেষজ্ঞ।

আমরা যতটা হতাশ হই, আসলে ততটুকু না হলেও চলে, ভাবছিলাম সেদিন সন্ধ্যায় দমদম বিমানবন্দরে এসে। এত পরিচিত লোকের হাসি-মুখ দেখে, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় সিক্ত হতে হতে। এর থেকে বড় পাওনা আর কি আছে? বিদেশ যাবার আগেই সব কিছু যেন উশুল হয়ে গেল।

তবে, বাধার দেওয়াল তো একটা দুটো ছিল না, কম কঠিনও ছিল না। একা পারতাম কি সেগুলো সরাতে? আজ যাঁরা এসেছেন দমদমে এবং আরও শুভানুধ্যায়ী যাঁরা আসেননি, তাঁদের মিলিত উদ্যম ও প্রচেষ্টার ফল আমার এই বিদেশ যাওয়া—বলা যেতে পারে ধরে-বেঁধেই আমাকে পাঠানো হচ্ছে।

অথচ আজ সকালেও ঠিক ছিল না, টিকিট কাটা হয়ে গেলেও সত্যিই যাওয়া হবে কিনা প্যারিস—ম্যালেরিয়া নিয়ে যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে—তাতে যোগ দিতে। সরকারী নানা নিয়মকানুন এবং তার ব্যাখ্যা কত যে কঠিন—এক একজনের কাছে এক এক রকম এক এক সময়ে। প্রায় কাকভোরে হতাশায় ভেঙে পড়ে গেছিলাম শ্রদ্ধেয় স্বামী অভজানন্দজীর কাছে। তিনি কয়েকটা পরামর্শ দিলেন। পিপলস রিলিফ কমিটির শান্ত, ধরতে গেলে জোর করে, ধরে নিয়ে গেলেন আমাকে মহাকরণে—দেখা করলাম স্বাস্থ্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীসুকোমল সেন-এর সঙ্গে। তাঁর কাছে পেলাম সবুজ সঙ্কেত, নির্দেশ-

নামা তো সরকার দিয়েই দিয়েছেন!

মেঘ কাটল। চোখের সামনে আলো, আশা, আনন্দ, জয়। মনের ভাব কিভাবে সঠিক বলি? বিমানে বসার আগেই মন উড়ে চলে গেছে সে-সব দেশে, আর শুধু আমার একার নয়, যাঁরা এসেছেন আমাকে বিদায় দিতে, সকলেরই। বিদায় বেলায় লেগে থাকে, জেগে থাকে কিছু বেদনা। কিন্তু এই বেদনার বুক জুড়ে আবার কেমন যেন একটা অব্যক্ত আনন্দ।

দমদম থেকে আকাশে উড়লাম বেশ একটু দেরি করে, রাত ৯ টায়। হতাশার রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি দেখছি। সোজা সাগরপাড়ি দিলে ছিল আলাদা কথা। বোম্বাই-এ বিমান বদল করতে হবে। ওখানে কী হয় আবার কে জানে! ভরসা, প্যারিসে আর একটা শারীর-বিদ্যা সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন দুজন বাঙালী বিজ্ঞানী—ডঃ মাইতি ও ডঃ সরকার।

সত্যিই তাই। ওঁরা না থাকলে গুলিয়ে যেত। দৌড়ঝাঁপ কমই করতে হল, তেমন কিছু নয়। পাশপোর্ট দেখানো হল, বিদেশী মুদ্রা আরও কয়েক টুকরো পাওয়া গেল। এসব তো মামুলী। ভুলে গুবলেট করে ফেলছিলাম আরেকটা জায়গায়। সঙ্গে কলেজের যে দামী ক্যামেরাটা ছিল, সেটা পাশপোর্টে লিখিয়ে নিতে ভুলেই গেছিলাম, ডঃ সরকার ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন! না হলে ফেরার সময় ঝামেলায় পড়তে হত।

বোম্বাই থেকে আকাশপথে সাগরপাড়ি শুরু হল বলতে গেলে ভোর রাতে—৪টার সময়। যেতে হবে বুঝি ৪০০০ মাইলেরও বেশি পথ।

ভারতীয় বিমান। আরামদায়ক। যেন ভারতেই আছি। রাতে বোম্বাই আসার পথেই একগাদা খাইয়েছে—মুর্গীর মাংস, পোলাও, রুটি, আইসক্রিম, দইবড়া, আচার, কফি। আবার বোম্বাই-এ বিমানে উঠতে না উঠতেই সকাল হতে না হতেই সকালের খাবার—ডিমভাজা, আলুভাজা, মাংসের রোল, চিজ, মাখন, রুটি, দই, কফি। খেয়ে, টি. ভি. দেখে, ঘুমিয়ে সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। রোমের বিমানবন্দরে নামলাম যখন, ঘড়িতে ৮টা ৫ মিনিট। আমাদের সময়ের চার ঘণ্টা আগে কিন্তু।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রোম বিমানবন্দর খুব বড়ও নয়। সাজানো গোছানোও নয় তেমন। বরং কেমন যেন শ্রীহীন লাগল। এদের রঙ পছন্দটা অনেকটা পাকিস্তানী ধরনের—সবুজের উপর মোহটা মাত্রাতিরিক্ত মনে হয় বিমান-গুলোতে, বিমানবন্দরের নানা জায়গায়, দেওয়ালে, কপাটে সবুজের ছোপ, এমনকি বর্ষাতিগুলোও সবুজ।

ঘণ্টা দুই পরে ছাড়বে বিমান। আমরা বৃষ্টি মাথায় নামলাম, ছোট গাড়িতে করে বিমানবন্দরেই গেলাম একটা জায়গায়, যেখানে কর ছাড়া জিনিসপত্র কেনাকাটা করা যায়। বেশ ভাল টি. ভি. হাতে নিয়ে ঘোরা যায়, দাম ৪০০০ টাকা। দাম কমটা কোথায়, বুঝলাম না।

১০টায় ছাড়ল উড়োজাহাজ রোম থেকে। রোম ছাড়তে কেমন যেন ইচ্ছা করছিল না। কত পুরানো শহর, কত প্রাচীন সভ্যতা! তবে রোমের সেদিন আর নেই! ইউরোপে থেকেও রোম যেন ইউরোপের নয়!

হয়তো আমার ভাবনাটা আঁচ করেছিলেন ডঃ মাইতি। উনি আগে রোমে একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে এসেছিলেন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। বললেন তাঁর দুরদৃষ্টের কথা। রোমে তাঁর টাকাকড়ি সব কিছু পকেটমার হয়ে গেছিল, কী করে পাস-পোর্টটাই শুধু তাঁর পকেটে পড়ে ছিল। গেলেন তিনি পুলিশের কাছে—থানায়। সেখানে যা দেখলেন, তাতে তো তাঁর চোখ ছানাবড়া!

ইউরোপের নানা জায়গার অনেক তা-বড় তা-বড় সাহেব মেম ডঃ মাইতির মতো সব হারানোর শোকে মাটিতে শুয়ে হাপুস কাঁদছে। ডঃ মাইতির শোকে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ল তা দেখে। ইউরোপের অনেক বড় বড় শহরের মতো রোমও মাফিয়া চক্রের একটা বড় কেন্দ্র।

গল্প শুনতে শুনতে বিমানে এসে গেল আবার দিনের মূল খাবার—ভেড়ার মাংস, পোলাও, লঙ্কার তরকারি, পরিজ, চা। খেতে খেতে আলাপ হল বিমানের এক কর্মী মীর্জা বেগ-এর সঙ্গে। সুপুরুষ। হায়দ্রাবাদের ছেলে। ১৩ বছর কাজ করছে। সারা দুনিয়া ঘুরেছে। ভারতীয় যাত্রী দেখলেই আলাপ জমায়, কে কোথায় কী কাজে যায়, খোঁজ নেয়। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এসে গেল প্যারিস। "রোখো রোখো" বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল, আবার যদি নির্দিষ্ট জায়গায় না থেমেই ছেড়ে চলে যায়, কলকাতার ভীড়-ভর্তি বাস-ট্রামের মতো! আরও একটা বিচিত্র অনুভূতি হয় গাড়ি-ঘোড়ায় চাপলে, অন্ততঃ আমার। নামার জায়গায় এসে মনে হয়, না নামলেও তো হত, আর একটু গেলেও তো চলত!

তা হবার নয়। ১১টা ২৫। পা রাখলাম প্যারিসের হিলটন ওর্লি' বিমানবন্দরে। দমদম থেকে সময় লেগেছে কতটুকু আর? সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা। বোম্বাই থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টা। এত কাছে! ঐ যে বলে, রাতের খাবার খেয়েছি দমদমের আকাশে, পরের দিনের খাবার রোম থেকে প্যারিসের পথে। কত কত যোজন দূর মনে হয়েছিল যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ প্যারিস, তুমি এত কাছে?

২

যদিও প্যারিসের আরেক প্রান্তের অতি আধুনিক ডি গল বিমানবন্দরের তুলনায় এটি ছোট, তাহলেও খুব ব্যস্ত, জনাকীর্ণ এই ওর্লি বিমানবন্দর। যান-জনস্রোত বইছে। করণীয় ছিল অনেক কিছু। নিজের জিনিস বলতে শুধু একটা ডাকব্যাকের ছোট ন্যাকড়ার সুটকেশ—সেটা ছাড়ানো, ডলার ভাঙিয়ে ফ্রাঁ নেওয়া, এগুলো চুকে গেল। তাড়াতাড়িই। আসলে তিনজন বাঙালী একসঙ্গে আছি বলে প্যারিসটাকে প্যারিস বলে যেন মনেই হচ্ছে না, যেন বাংলাতেই আছি। আবহাওয়াও ফুরফুরে, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ আজ, শীত নেই কিছুই।

বাসটা নতুন নাকি? যেটাতে চড়ে চলেছি বিমানবন্দর থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে? নিশ্চয়ই নয়, তবে নতুনের মতো। ঝকঝকে তকতকে। আর কী আরাম! ভীড় নেই। ভাড়া তবে খুব বেশি, গোটা ত্রিশ টাকা, তা হোক। বাসে উঠতেই বাসের দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। আগেই টিকিট নিতে হল। চালক-কণ্ডাকটর দুয়ে মিলে এক। ছবির মতো সাজানো এত সুন্দর শহর খুব কমই আছে। আর ঐতিহ্য! শিল্পে-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে ফরাসীদের গর্ব বাঙালীর মতোই আকাশছোঁয়া।

চড়তে হবে এবার পাতালরেলে। টিকিট তো কাটলাম। তারপর গেট যতই ঠেলি, কিছুতেই খোলে না। যিনি টিকিট দিলেন, তাঁর কাছে গেলাম। মহিলা মনে মনে নিশ্চয়ই খুব হেসেছেন, মুখ দেখে বোঝা গেল না। বললেন, আর সবাই টিকিটটা গেটের উপরে রেখে যেরকম করে পাঞ্চ করাচ্ছে, সেরকম করালেই গেট খুলবে। চোখ খুলল। তিন বাঙালী প্যারিসের পাতালরেলে ঢুকলাম। সুবিধা একটা। একবার টিকিট কেটে যতবার খুশি যেখানে সেখানে ঘোরা যায় পাতাল থেকে উঠে না আসা অবধি।

বাস্তিল দুর্গ, ল্যুভর মিউজিয়াম সব যাওয়া যায় পাতালরেল দিয়ে। ঘোরাঘুরি কিছু করলাম

আমরা। ছাড়াছাড়ি হবে অচিরেই। প্যারিস থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে আল্প্স্-এর কোলে একটি মনোরম লেকের ধারে এ্যানেসি শহরে আমাদের বিজ্ঞানসভা বসবে। ডঃ মাইতি ও ডঃ সরকার যাবেন প্যারিস থেকে প্রায় অতটাই দূরে অন্যদিকে নিস বলে আরেকটা জায়গায়, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অতুলনীয়। তবে ট্রেন ছাড়বে প্যারিসের একই স্টেশন গ্যারে ডি লিঁয় থেকে।

আমার ট্রেন বিকাল ৫টা পনেরোয়। একটা অসুবিধা বোধ করছি সবাই, দাড়ি কাটা হয়নি। কোথাও যে স্টেশনে দাড়ি কাটব, তার উপায়ও নেই। বাথরুম যেতে গেলে তিনটাকা দিতে হবে। তো, ট্রেনে যেতে যদি জল তেষ্টা লাগে? কিনলাম এক বোতল লাইম ওয়াটার। বোতলে জলও বিক্রি হয়। তাড়াতাড়িতে খুঁজে পেলাম না বলেই লাইম ওয়াটার নিলাম। পরে কাজ দিয়েছিল খুবই।

ডঃ মাইতিদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল বলেই বোধ হয় একটু ভয় ভয় ভাব এবার। ট্রেন চেনা, কামরা খোঁজাটাও কেমন ঝামেলার বলে বোধ হচ্ছিল। এগিয়ে এল একটি আলবানিয়ার ছেলে। বয়স কম। বোধ হয় কোন শ্রমিক। ভাল ইংরেজীও জানে না। ফরাসী আমিও বুঝি না, তবু দরদ দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন দেখিয়ে কামরাতে উঠিয়ে দিল, ট্রেন ছাড়ার সময় তখন হয়ে এসেছে।

টি. জি. ভি. ট্রেন। এ-নাকি পৃথিবীর সব থেকে দ্রুতগামী ট্রেন। ঘণ্টায় গতি ১৬২ মাইল। পড়ন্ত বিকেল। আলো থাকবে রাত সাড়ে সাতটা অবধি। বড় বড় কাচের জানলা, সীমিত যাত্রী। আরামদায়ক গদী-আঁটা বসবার জায়গা। সামনে টেবিল, লেখা যায়, খাওয়া যায়। চা গরম নেই। হকার নেই। তবে রেলের লোকের কাছ থেকে কফি, লেমনেড, টফি এসব কিনতে পারা যায়। নীল উর্দি পরা মেয়ে চেকার টিকিট দেখে গেলেন। প্যারিস ছাড়িয়ে কত তাড়াতাড়ি কতদূরে চলে এসেছি। দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি মাঠ-ঘাট নদী, পথ, স্টেশন, শহর,—মানুষ প্রকৃতিকে এখানে বশ মানিয়েছে। সবকিছু সাজানো। অপরিচ্ছন্নতা নেই, দীনতা নেই। ভাঙা বাড়ি, বস্তি চোখে পড়েনি। অর্থনীতির দিক দিয়ে ফ্রান্স অনেকখানি স্বয়ম্ভর।

তবু—তবু প্যারিসের কিছু স্মৃতি ভুলতে পারি না। পাতালরেলের ভিতর হারমোনিয়াম বাজিয়ে তরুণ যুবককে ভিক্ষা করতে দেখেছি। একটা স্টেশনে ঢোকার পথে একজন অনেক কিছু লিখেছে, এঁকেছে, বসে আছে তার পাশে ভিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে—কলকাতার রাজপথেও দেখা যায় এ-দৃশ্য। সবথেকে দ্রুতগামী ট্রেন নিঃশব্দেই যাচ্ছিল—দুলছিলও না এতটুকু—তবু একটা হৃদয়বিদারী গানের রেশ লেগেছিল কানে, যা শুনেছিলাম প্যারিসে পাতালরেলের ভিতর :

"Do you really want to hate me,
Do you really want to make me cry!"

গাইছিল পাতালরেলে যেতে যেতে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে, মানসিক ভারসাম্য ছিল না বুঝি তার—পায়ে লাগানো ছিল বরফের উপর স্কি করার চাকা, বিকৃত ছিল সুর, তার গলার স্বরও কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল হৃদয় নিংড়ানো কান্নায় ভেজা। এই কান্নাই কাঁদছে হয়তো সেখানকার অধিকাংশ যুবক-যুবতী। কে জানে? কে জানে কেন? কিসের জন্যে? কিসের জন্যে এ-কান্না?

[ক্রমশঃ]



রামায়ণী ঃ নিবেদন

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বিশ্রুত শিল্পী অসিতকুমার হালদার চিত্রাংকন ও ভাস্কর্য ছাড়াও সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্য এবং কাব্যকলাতেও সমান বিদগ্ধ ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারের কবি-প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং প্রেরণাও যুগিয়েছেন। কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙলা কাব্যানুবাদ এবং বেশ কিছু বাঙলা কবিতা ও সাহিত্যগ্রন্থ তাঁর অসাধারণ মনীষার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইংরেজীতেও তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু অনেকেই এখনও জানেন না যে, তিনি আদি কবি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণেরও ভাবানুবাদ সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন—নিজেই যাঁর নাম দিয়েছিলেন 'রামায়ণী'। তিনি ঐ 'রামায়ণী'র প্রারম্ভে যে 'নিবেদন' রচনা করেছেন—এখানে মাত্র সেই অংশটুকুই প্রকাশিত হচ্ছে। শিল্পী-কন্যা শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার অকুণ্ঠ সৌজন্যে এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে।

রামায়ণ, মহাভারত যে পৃথিবীর যে-কোন মহাকাব্যের মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করতে পারে তা দার্শনিক-কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা একবাক্যে বলে গেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন: "যে-দেশে এই দুই কাব্য মুখে মুখে আপামর-সাধারণ কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত সকলেই জানে, সে-দেশকে অশিক্ষিত দেশ বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়।" এই দুই কাব্যে লোকহিতকর সকল তথ্যই নিহিত আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রামায়ণী কথার ভূমিকায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়ড্ ছিল।...আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কিনা, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ, মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকী রাখে নাই।" রবীন্দ্রনাথ আরও দেখিয়েছেন:

"দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ-কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। ...মানুষ বলিয়াই রাম-চরিত্র মহিমান্বিত।"

মূল রামায়ণে দেখা যায়, রাম নারায়ণের চারি অংশের এক অংশ হয়েও জন্মালেন মানুষরূপে। রাবণ একজন রাক্ষস। মানুষ রাম যেমন ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, সাধু, শত্রুমিত্রে সমদর্শী আর:

গম্ভীর সাগর হেন, ধৈর্যে হিমাচল
বীর্যে বিষ্ণু শশী হেন সৌম্য সুদর্শন—
ক্রোধে তিনি কালাগ্নির প্রায়
ক্ষমাতে ধরণী
দানেতে কুবের
ধর্মতুল্য সত্যের নিষ্ঠায়;

রাবণ ঠিক তার বিপরীত অপগুণে আকীর্ণ। একমাত্র বাইবেলোক্ত শয়তানের সঙ্গেই তার তুলনা





হতে পারে। শয়তানের সঙ্গে কেবল প্রভেদ এই যে, দশানন রাবণ মহাপণ্ডিত হয়েও শয়তানে পরিণত হলেন বিধাতাকে তপে তুষ্ট করে এবং তাঁরই বরে।

সৃষ্টিকর্তা সর্বগুণাতীত; তাঁতে পাপ বা অপাপ বর্তমান থেকেও বর্তায় না,—তিনি তারও অতীত থাকেন। সেই অপাপবিদ্ধ সৃষ্টিকর্তা সকলকে যেমন সৃষ্টি করলেন, তেমনি এই রাবণকেও সৃষ্টি করলেন। তাছাড়া সে আবার তাঁরই নিকট বরলাভ করে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের হাতে অবধ্য রইল। সে নিজে তাতে এরূপ ক্ষমতাপ্রমত্ত হয়ে উঠল যে, মানুষকে আর সে গ্রাহ্যই করল না, আর তাই মানুষের হাতেও অবধ্য রইবার জন্য বিধাতা পুরুষের নিকট ইচ্ছা প্রকাশও করল না। এই দুর্বৃত্ত ভাবল—সে এত প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে গেছে যে, ক্ষুদ্র মানুষকে সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু প্রকারান্তরে ব্রহ্মা অল্পশক্তিবিশিষ্ট নশ্বর মানুষের হাতে প্রবল-প্রতাপ রাবণ-নিধনের ক্ষমতা অর্পণ করে মানুষকেই বড় করলেন। এখন রূপকভাবে বিষয়টি দেখলে দেখা যাবে, মানুষকে রাবণরূপী ভীষণ ইন্দ্রিয়বাসনার পাপপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে বিধাতাপুরুষ দেখিয়েছেন যে, মানুষই একমাত্র তার এই শত্রুকে জয় করতে পারে এবং সেই কারণেই সে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাবণ পৃথিবীতে এসে দেব, ঋষি, যক্ষরক্ষকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তার অত্যাচারে নিপীড়িত দেবগণের অনুরোধে সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু মানুষের রূপে চার অংশে জন্মালেন, রাবণ-নিধনের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা করতে।

মানুষ সৃষ্টির কণা-অংশমাত্র এবং নারায়ণ সৃষ্টির বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে আছেন। তাঁর সকল সদ্‌গুণই ঐশীগুণ এবং বিশেষভাবে রামের মধ্যে এই ঐশী অংশ অধিক রইল। মানুষের মধ্যেই যে বহুগুণসম্পন্ন নারায়ণ জন্মান মানুষকে যুগে যুগে ত্রাণ করার জন্য, সেই কথাই তপোবনবাসী বৈদিকযুগের ঋষি তপস্বী বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বিশদভাবে দেখিয়েছেন।

গোড়াতেই আছে বাল্মীকি রামায়ণ লেখার জন্য ঐশী-প্রেরণা পেলেন। কেলিরত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্তৃক নিহত দেখে করুণায় বিগলিত এবং শোকগ্রস্ত হয়ে তিনি সহসা বলে উঠলেন :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্!

"রে নিষাদ!
ক্রৌঞ্চ মিথুনমাঝে
কামাতুর ছিল যবে
যে হেতুরে তুই একটিরে তার
করেছিস বধ
রহিবি বঞ্চিত পেতে চিরতরে প্রতিষ্ঠা-সম্পদ!"

এই শ্লোক থেকে প্রথম উৎপন্ন সমান অক্ষরবিশিষ্ট চরণবদ্ধ তন্ত্রীলয়ে গীতযোগ্য তাঁর





বাক্যকে 'শ্লোক' বা কবিতার ছন্দ বলা হল। প্রথম শ্লোকবদ্ধ কবিতা রচনা ভারতবর্ষে এইভাবে দয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত হল। এই করুণাই ঐশী-প্রেরণা এবং এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে দেবভাব আনে। কি ইসাহি, কি মুসলিম, কি টোডা, কি গারো—সভ্য অসভ্য পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই এই ব্যথাভরা ভগবৎ-প্রেরণা জাগতে পারে। যে-মানুষের মধ্যে এই অপূর্ব ঐশী-প্রেরণা প্রবল সেই মানুষকেই ভগবানের অংশ বলা হয় এবং বাল্মীকি সেই ভগবৎ-অংশকেই মানুষ-রামের মধ্যে রামায়ণে দেখিয়েছেন। তাই মানুষের কাছে রামায়ণ এত সত্য এবং চিত্তকে অধিকার করেছে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার মতো। এর মধ্যে প্রমাদগুণানুসন্ধিৎসু কোন ব্যক্তিরই স্থান নেই। ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি বেদ-বেদান্তের সকল তথ্যই অবগত ছিলেন। এবং তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতেন:

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ (কেনোপনিষদ্, ২।২)

অর্থাৎ, আমি মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জেনেছি; আমি যে তাঁকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে। 'আমি যে তাঁকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে'—এই বাক্যের অর্থ আমাদের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন।

সেই অবিদিত ব্রহ্মকে সাধারণের সামনে ধরে দিতে এই রামায়ণীগাথা বাল্মীকি রচনা করেছিলেন।

বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে লোকশিক্ষা, ধর্মজ্ঞান কর্তব্যপরায়ণতার সকল উপদেশই দিয়ে গেছেন গল্পের ছলে। রামায়ণ পাঠ করতে গিয়ে তাই দেখি: রাম তাঁর পূজ্যপাদ পিতা দশরথ সমীপে আগমনকালে দূর থেকে তাঁকে দেখে দণ্ডবৎ হলেন এবং নিকটে এসে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তখন দশরথ পুত্রের হাত ধরে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শিরঘ্রাণ করে তাঁকে আবার নিজের পাশে আসনে বসালেন। এই বর্ণনার মধ্যে আমরা পেলাম পিতাপুত্রের মধুর শোভন অভ্যর্থনার একটি আদর্শ। পুনরায় অযোধ্যাকাণ্ডে একস্থানে দেখছি: রাম লক্ষ্মণকে উপদেশ দিচ্ছেন—"আমরা জনপূর্ণ বা নির্জন বনে যেরূপ স্থানেই থাকি না কেন, সর্বাগ্রে তুমি থাকবে, সীতা মাঝখানে এবং আমি সবার পশ্চাতে যাব।" অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গে আছে: গুহরাজের সঙ্গে মিলনের পর ভাগিরথীতীরে নৌকা পার হবার কালে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন—"সীতাকে আগে নৌকায় বসাবে, পরে তুমি উঠবে এবং আমি সব শেষে উঠব।" একস্থানে আরও আছে: রাম লক্ষ্মণকে বলছেন—"ভাই লক্ষ্মণ, আজ থেকে আলস্য ত্যাগ করতে হবে; অলক্ত সীতাকে দিতে হবে এবং লক্ত রক্ষা করতে হবে।" এ থেকে আমরা বেশ বুঝি যে স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানোর প্রথা ইউরোপের সভ্যতার আমদানির ফলে ইদানীং হয়নি,—পূর্বকালেও তা ছিল। এছাড়াও রামের কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গে আছে: রাম সুমন্ত্র সারথিকে অযোধ্যায় ফেরার কালে বলেছিলেন—"অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পূজনীয় পিতা মহারাজ দশরথকে





আমার প্রণাম দেবে, আর অন্তঃপুরে পুরনারীদের নমস্কার ও কুশলমঙ্গল জানাবে।" পরিশেষে বিশেষ করে বললেন :

"মাতারে আমার জানায়ে প্রণাম
শুভবার্তা দিয়া কহিও তাঁহারে
ধর্মপথে হেথা আমি রয়েছি অটল।
তুমি দেবি! ধর্মশীলা!
পিতার চরণ মানিবে দেবতা হেন
অন্য মাতাদের প্রতি মান অভিমান যেন
রাখিও না মনে।
পিতা হতে কৈকেয়ীদেবীরে
কোনমতে ভাবিও না ন্যূন বলি তুমি।
রাজধর্ম মানি, নৃপ ভরতে সদাই—
রাজযোগ্য করো সমাদর।
নৃপগণ বয়োজ্যেষ্ঠ যদিও না হন
তবু তাঁরা মাননীয়।"

এর মধ্যে রামের ঔদার্যের বিশেষ পরিচয় বাল্মীকি দিলেন। রাম তাঁর জননীকে নারীসুলভ চঞ্চলতা ও দুর্বলতাজনিত কার্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এরূপ কথা সুমন্ত্রকে দিয়ে তাঁর নিকট বলে পাঠালেন। ছেলে উপযুক্ত হলে মাকে সাদরে এরূপ কথা জানাতে পারে এবং সেটাকে প্রগল্‌ভতা (বা উচিতবাগীশগিরি) বলা যায় না। এইরূপ বহু ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে নরনারীর কর্তব্যজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ বাল্মীকির রামায়ণে নিহিত আছে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন উপদেশই শুধু কর্তব্য নির্ধারণের জন্য শুষ্কভাবে দিলে লোক-সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় না। উপকথা বা আখ্যান অবলম্বন করে মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন করলে তবে সকলের মনের মধ্যে চিরদিনের জন্য স্থান পায়। মহামুনি বাল্মীকি এই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করেই রামচরিতমানস রচনা করে গেছেন রামের চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে অন্যান্য বহু আখ্যানযোগে, যা এখন ভারতবর্ষের অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত এবং যুগে যুগে দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে মানুষকে মনুষ্যত্ব দিচ্ছে। তাই আমাদের দেশে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ দেবমানবের আবির্ভাব। আবার রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রভৃতি নরচন্দ্রমারও অভাব নেই।

বাল্মীকির রামায়ণে যে কেবলমাত্র লোকশিক্ষামূলক উপদেশই আছে তাও নয়। তাছাড়াও কাব্যরচনার সম্পদের দিক যে সর্বাংশে এদেশের সাহিত্যের আদর্শ-স্থল অধিকার করে আছে তার কথাও বলা দরকার। ভারতবর্ষের এই প্রথম শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্যের মধ্যে পরবর্তী কালের কবিরা





যে কি কি রস পাবেন তার ইঙ্গিতও মহাকবি বাল্মীকি নিজেই দিয়ে গেছেন রামায়ণে :

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্ ।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ ।
বীরাদিভিঃ রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥

অর্থাৎ, পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যে সম লয়ে গানের যোগ্য এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক প্রভৃতি রস সমন্বিত এই কাব্য তাঁরা গাইলেন। এ বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই অপূর্ব মহাকাব্য তাঁর পরবর্তী কালের সকল কবিরাই পাঠ করেছেন এবং ভাস, ভবভূতি, কালিদাস এই রামায়ণ থেকে প্রচুর শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আমরা এখন কেবল মহাকবি কালিদাসের দুটি কাব্যের মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণের যা অনুরণন অনুভব করেছি তারই কথা বলব। (বাল্মীকি ও কালিদাস—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৫৬ দ্রষ্টব্য)

উত্তরপ্রদেশের তুলসীদাস এবং বাংলার কৃত্তিবাসের মতো সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই রামায়ণের রচনা করেছেন সে-সব দেশের কবিরা নতুন রূপ দিয়ে। গল্পাংশের মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে এবং নীতি-চরিত্র প্রভৃতির যে-সব বিশ্লেষণ বাল্মীকির রামায়ণে আছে তারই রসপরিবেশন প্রাদেশিক কবিরা করেছেন নিজে নিজের দেশের ভাষায়। তাঞ্জোর অধিপতি রঘুনাথের সভার বিদুষী রমণীদের মধ্যে এক কবি মধুরবাণী রামায়ণ তেলেগু ভাষায় রচনা করেন। তাঁর রামায়ণের দেড় হাজার শ্লোক মাত্র এখন পাওয়া যায়। মল্লী একজন দাক্ষিণাত্যবাসিনী বিদুষী। তিনি আগাগোড়া রামায়ণ রচনা করেন।

আমার এই পদ্যানুবাদ সম্বন্ধে কেবল একটি কথা বলার আছে যে, মহাকবি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য মুখ্য বিষয়গুলি যথাসম্ভব সঠিক অনুবাদ করার চেষ্টা হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন মূল কাব্যের ভাব-রস অমিল প্রবহমান মুক্তক ছন্দে কতটা পরিবেশন করতে পেরেছি তা সুধী পাঠক বিচার করবেন।

পরিশেষে অনেক প্রাচীন কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি :

সদূষণাপি নির্দোষা
স-খরাপি সুকোমলা
নমস্তস্মৈ কৃতা যেন
রম্যা রামায়ণী কথা।

অর্থাৎ, দূষণ থাকা (অর্থাৎ রাবণের চর দূষণ থাকা) সত্ত্বেও নির্দোষ এবং খর (অর্থাৎ রাবণের চর খর থাকা সত্ত্বেও) সুকোমল এমন যে রম্য রামায়ণী কথা, তার রচয়িতাকে নমস্কার।

খর আছে তবু যাহা রহে সুকোমল
দূষণ থাকিতে দোষ না ঘটেছে যার।
হেন রামায়ণী কথা রম্য সুবিমল
যাঁহার রচনা তাঁরে করি নমস্কার ॥



শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন

অবনীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত বর্ষীয়ান শিল্পী। শিল্পাচার্য নন্দলালের সর্বপ্রথম ছাত্রচতুষ্টয়ের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথেরও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য-ধন্য।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ অগস্ট, জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁর জন্ম হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ, তখনকার কলকাতার অভিজাত সমাজের চালচলন, শিক্ষাদীক্ষা—এই সব মিলে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। যুগধর্ম সেই যুগের মানুষকে প্রভাবিত করে, আবার সেই যুগের মানুষ তার যুগের ধর্মকে সৃষ্টি করে। একে অন্যের পরিপূরক। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মহান শিল্পী। শিল্প বিষয়ে জ্ঞান তাঁর খুব গভীর ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি অথচ পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য তাঁর কোথাও ছিল না। হাসি তামাশায়, কৌতুকে, গল্পে আনন্দিত-মজলিসী লোক ছিলেন। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, লোকও বদলেছে। বর্তমানে অবনীন্দ্রনাথের মতো লোক পাওয়া বড় বিরল। তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ যাদের হয়েছিল, হাসিতে, গল্পে, সরস কথায় মুগ্ধ না হয়ে থাকার তাঁদের উপায় ছিল না। বাংলা সাহিত্যেও তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। ছোট ছেলেদের জন্য তাঁর লিখিত শকুন্তলা, রাজকাহিনী, ভূতপত্‌রীর দেশ, বুড়ো-আংলা, নালক ইত্যাদি পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা ছিল সে-কথার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে," ইত্যাদি। আর্টের আত্ম-উপলব্ধির নিদর্শন বর্তমান কালে ভারতের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। দেশের এই শিল্প-জাগরণের পশ্চাতে এমন একজন প্রতিভাবান শিল্পীর অবদান রয়ে গেছে যাঁকে বর্তমান ভারতীয় শিল্প-জগতে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অতীত কালে মর্ত্যে গঙ্গাকে এনে সগর বংশকে উদ্ধার করেছিলেন ভগীরথ; তেমনি প্রাণহীন ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ভারত শিল্প-জগতে অবনীন্দ্রনাথের অবদানের কথা ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। একদিকে শিল্পকলা সৃষ্টি করেছেন অন্যদিকে দেশের বিদগ্ধ সমাজের মানসিকতাকে শিল্প-ভাবনায় উদ্বোধিত করেছেন লিখনের দ্বারা। তাঁকে তুলি ও কলম দুই এক সঙ্গে চালাতে হয়েছিল। স্রোতস্বিনীর ধারা শৈবালের দ্বারা অনেক সময়ে অবরুদ্ধ হয়, তেমনি ভারতীয় শিল্প-ধারার গতিপথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল রাজপুত, মুঘল, কাংড়া ঘরানার চিত্রকলার পরবর্তী কালে। অবনীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে নূতন করে পুনঃপ্রবর্তিত করেছিলেন।

শিল্পীরূপে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতির প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্পীর মনকে প্রভাবিত করেছিল। স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায় বিদেশী প্রভাব হতে মুক্ত হওয়ার সংকল্প নিয়ে দেশের কৃষ্টিকে, সভ্যতাকে আদর্শ রেখে শিল্পসৃষ্টির কাজে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তারই নিদর্শন আমরা দেখতে পাই শিল্পীর অঙ্কিত "ভারতমাতা" চিত্রটিতে। কিন্তু এই আন্দোলনের সীমিত গণ্ডি

অল্প কালের মধ্যেই অতিক্রম করে বৃহত্তর রূপ-সৃষ্টির জগতে তিনি গিয়ে পৌঁছেছিলেন। আত্ম-প্রকাশের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাই অপরের অনুকরণ বা প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্যদের উপদেশ দিতেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিলে আমাকে একটি পত্র লিখে এ বিষয়ে কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের একবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি লিখে-ছিলেন: "আমি তো তোমাদের সামনেই সেদিন নন্দলালকে সাবধান করেছি জানো, ঐ অজন্তার মুখেই চলো আর গ্রীস, জাপান বা চীনের দিকেই চলো সে পরের রাস্তা ধরে চলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। অন্যের বন্দরে আমার জাহাজ কেন ভেড়াব, আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দর রয়েছে যখন। একলা চলা ছাড়া উপায় নেই আমাদের কারো, নিজের ফসল নিজের নৌকো বোঝাই করে নিজের বন্দরে গিয়ে নামলেন এর চেয়ে আর ভাল গতি ও মুক্তি নেই artist-এর, আমার নৌকোয় তোমার স্থান নেই, তোমার নৌকোয় আমার স্থান নেই—'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' এই গান গেয়ে সব আর্টিস্টকেই চলতে হয়েছে চিরকাল একলা একলা, রূপের রাজত্বের বন্দরে বন্দরে এই একই গান চিরকাল গেয়ে চললো সবাই।" এই পত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর নিজের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সেই আদর্শটির প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প-সাধনায় শিল্পীকে তার শিল্পসৃষ্টির দ্বারা যে-পথ ধরে চলতে হয়, সেই পথের সে একাই যাত্রী। সাধনার পথে দল বেঁধে চলা সম্ভব নয়, তাতে অভিষ্ট লাভের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সমধর্মী সহযাত্রীকে নিজ পথ-চলার অভিজ্ঞতায় হয়তো সহায়তা করা যায়, কিন্তু যেখানে রূপসৃষ্টির দ্বারা পরম আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় নূতন নূতন পথের সন্ধান করে সাধক শিল্পী এগিয়ে চলেছে তখন সেখানে সে সম্পূর্ণ একা। রূপসৃষ্টির কাছে শিল্পী যখন ধ্যানস্থ তখন তার নিজের সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বহিঃপ্রকৃতির যথার্থ রূপ, ভাব-কল্পনা এগুলি মিলে প্রেরণা যোগাতে থাকে তার অন্তরে। এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন স্থান নেই। শিল্পসৃষ্টির উৎস বা প্রেরণার স্থল শিল্পীর অন্তরের মধ্যেই নিহিত। প্রত্যেক শিল্পীই তার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অপর শিল্পীদের থেকে পৃথক, তাই তাদের শিল্প-কলা সৃষ্টিতে এত বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা।

শিল্পশাস্ত্র ও শিল্পীর মধ্যে কি সম্বন্ধ এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের মতামত জানতে হলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকে একালের উপযোগী করে শিল্পরসিকদের অবগতির জন্য "ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ" নামে বইটি লিখেছেন। আবার তিনিই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রানী-বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদে থাকাকালীন ত্রিশটি বক্তৃতামালা লিখেছেন যা শিল্প-জগতে অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠ বলে সকলেই স্বীকৃতি দান করেছেন। তবু কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির চেয়ে শিল্পশাস্ত্রকে তিনি প্রাধান্য দিতে রাজি নন। তিনি বলেছেন: "শিল্প ব্যাখ্যার কাজে হয়তো শিল্পশাস্ত্রের মূল্য আছে, কিন্তু শিল্প রচনায় অল্পই সাহায্য করে। শিল্পশাস্ত্র খুবই গভীর, তার চেয়েও গভীর হল শিল্প, শিল্পীর মন তার চেয়ে আরও গভীর যার মধ্যে বহির্জগৎ তলিয়ে রয়েছে।"

দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিতে আরামকেদারায় বসে ভোরবেলাতেই ছবি আঁকার কাজে হাত দিতেন। রঙ গোলার জন্য একটি জলপাত্রে পরিষ্কার জল, রঙের পেলেট, আর ছোট বড় নানা আকারের তুলি তাঁর পাশে সাজানো থাকত। একদিন সকালের দিকে নিবিষ্ট মনে ছবি এঁকে চলেছেন, তারই মধ্যে ভৃত্য

বাড়ির ভিতর থেকে তাঁর জলখাবার নিয়ে এল। টোস্ট করা রুটি, মাখন, জ্যাম ও চা খাওয়া হয়ে গেলে পান এল, তারপরে আলবোলায় তামাক দিয়ে ভৃত্যটি তখনকার মতো প্রস্থান করল। শিল্পী পান চিবুচ্ছেন, আলবোলার লম্বা নলের মুখটি নিজের মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছেন আর মনের আনন্দে ছবিতে রঙ লাগাচ্ছেন। তাঁর ছবি আঁকা দেখতে ভাল লাগে, তাই চুপটি করে পাশের বেঞ্চিতে বসে আছি। মাঝে মাঝে দু-চারটা কথা বলেন। হঠাৎ মুখ থেকে কিছু পানের পিক ছবির উপরে পড়ে যায়। এই না দেখে আমি তো আঁতকে উঠেছি ছবিটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। লক্ষ্য করলাম অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত হননি। প্রথমটায় একটু থেমেই তারপরে নিজের গায়ের পাঞ্জাবীর হাতাটি দিয়ে ধীরে ধীরে পানের পিকটিকে মুছে দিলেন। বাঁ-হাতে ছবিটিকে একটু দূরে ধরে দেখতে লাগলেন। তারপরে হঠাৎ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন: "দেখ, আমি কত কষ্ট করে ছবিতে যে ইফেক্ট (effect) আনবার চেষ্টা করছিলাম সেটা কত সহজে এসে গেছে।" এই বলেই হাতের তুলি দিয়ে পেলেট থেকে রঙ নিয়ে ছবিতে এখানে-ওখানে টাচ্ (touch) দিয়ে হাতের থেকে ছবিটিকে নামিয়ে দিয়ে বললেন—"এবার ফিনিশ (finish) হল।" যা ভয় করছিলাম তার ঠিক উল্টোই হল। দেখলাম ছবিটি সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। শিল্পী এইভাবেই খুশির খেয়ালে ছবি আঁকেন।

সকালের দিকে দক্ষিণ-বারান্দায় বসে অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন, পাশের কাঠের বেঞ্চিতে বসে তাঁর আঁকা দেখছিলাম। ছবি আঁকার মাঝে মাঝে তিনি দু-একটা কথাও বলছিলেন। এমন সময় ছবিটাকে একপাশে রেখে নিকটের কাঠের দেরাজ থেকে একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে আমাকে দেখিয়ে বললেন: "জান, এটা আমার গুরুস্থানীয় হেভেল সাহেবের দেওয়া। তিনি একদিন আমাকে কলকাতা মিউজিয়ামে ভারতীয় চিত্রশালায় নিয়ে রাজপুত, মুঘল, কাংড়া ঘরানার ছবিগুলি দেখাচ্ছিলেন। মুঘল চিত্রের একটি সারসপাখির ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন কি অপূর্ব কাজ, কাছে গিয়ে ভাল করে দেখ—এই বলেই পকেট থেকে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি বের করে আমার হাতে দিলেন। সারসপাখির ছবিটাকে যখন এই গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখলাম তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম প্রাচীনকালের আঁকিয়ে শিল্পীর দক্ষতা দেখে। সূক্ষ্ম তুলির কাজ ও রঙের বাহার দেখে সেদিন ভারতীয় চিত্রশিল্পের গুণের বিষয়ে যেন আমার তৃতীয় নয়নের উন্মেষ হয়েছিল। এর পূর্বে ভারতীয় শিল্পকে এত ভাল করে দেখিনি এবং বোঝবারও চেষ্টা করিনি। হেভেল সাহেব ভারতীয় শিল্পের প্রতি অত্যন্ত দরদী ছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলা ও কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রতি তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। ভারতের বাইরের জগতে ভারতীয় শিল্পকে জানাবার জন্য তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পুস্তকও লিখে গেছেন। এই সব কারণে হেভেলের প্রদত্ত এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি যত্ন করে আমি রেখেছি।" আমি হাতে নিয়ে সেটাকে দেখে তাঁকে ফেরত দিলাম। তিনি আবার কাঠের দেরাজে ঢুকিয়ে রাখলেন।

বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দাটি ছিল শিল্পীদের তীর্থস্থান। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী ও তাঁর গুণমুগ্ধদের আকর্ষণের মধ্যমণি। কেউ-বা আসেন নিজেদের আঁকা ছবি দেখিয়ে তাঁর মতামত জানতে, কেউ-বা আসেন শিল্পবিষয়ে তাঁর উক্তি শুনতে, আবার কেউ-বা আসেন শিল্পবিষয়ে নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে। শিল্প-সাধনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, চোখ বুজে তার সাধনা নয়, চোখ খুলেই তার সাধনা। এই প্রসঙ্গে ছোট একটি ঘটনার

কথা বলেছিলেন। তাঁর রবিকাকার প্রেরণায় একদিন বাড়ির তেতলার ছাদের উপরে গিয়ে ভোরের দিকে পূর্বমুখী হয়ে চুপটি করে চোখ বুজে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলেন। অনভ্যাসবশতঃ হঠাৎ চোখ খুলে গেলে তিনি দেখতে পেলেন পূর্বাকাশে নব-অরুণোদয়ের কি অপূর্ব রঙের খেলা, তখনই আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন, মনে মনে এই কথা বলে "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে-রূপের বিকাশ তাকে দেখ, চোখ খুলে তোমার সাধনা, চোখ বুজে নয়। যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, শিল্পীর ধ্যান চোখ চেয়ে। সাধনার লক্ষ্য যে পরম সুন্দর দেবতা, যাঁর সৌন্দর্যের প্রকাশ এই জগৎ জুড়ে রয়েছে তাঁর উপলব্ধি অন্তরে কেমন করে ধারণা করব যদি না চোখ মন খুলে তাঁকে দেখি, তাঁকে না উপলব্ধি করি।" শিল্পাচার্যের জীবন-দর্শন এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অপর আরেকটি ঘটনায় কলা-ভবনের একজন ছাত্র অবনীন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে কতগুলি শিল্পবিষয়ে ভাল বইয়ের নাম জানতে চেয়েছিল যা পড়ে শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ছাত্রটির মনে আত্মপ্রত্যয় ছিল সে আর্টের সম্বন্ধে বেশ কিছু জানে বলে। তার কথায় অবনীন্দ্রনাথ সে আমেজ পেয়েছিলেন। তেমনটি বইয়ের নাম বাতলে দিতে গিয়ে শিল্পাচার্য বলেছিলেন, বইটির মাত্র দুইটি পাতা, একটি সবুজ, অপরটি নীল। এই দুইটি পাতার বই ভালভাবে পড়তে জানলে অন্য বই পড়ার আর প্রয়োজন হবে না। ছাত্রটি এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ইঙ্গিতবাক্যে সেদিন সন্তুষ্ট হয়েছিল কিনা সেকথা জানা নেই। শিল্পাচার্যর শিল্পবিষয়ে গভীর মননশীলতা ও শিল্পরসজ্ঞানের ইঙ্গিত এখানেও ব্যক্ত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি শিল্পরসে, শিল্প-অনুভূতির আনন্দে উদ্বুদ্ধ। তিনি যে ধরনের ছবি এঁকেছেন তাকে ভারতীয় চিত্ররূপে গণ্য করা হলেও তাকে তাঁর পূর্ববর্তী ভারতীয় কোন চিত্র গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না। তাঁর নিজস্ব ঢঙে অঙ্কিত তাঁর চিত্রগুলি। তিনি চোখ দিয়ে, মন দিয়ে, ভালবেসে যা দেখেছেন, নিজের মনে যে ভাবকে পোষণ করেছেন তারই প্রকাশ তাঁর চিত্রগুলিতে দেখতে পাই। বাস্তব, অবাস্তবের অপরূপ সমন্বয় তাঁর চিত্রকে সৌন্দর্যদান করেছে। তাঁর কোন স্কেচ্-বই আমরা দেখিনি। তবে কি করে স্টাডি (study) করতেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, হয়তো তাঁর মন এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার জন্য এমন ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন যা দেখতে ভাল লাগত, যার থেকে আনন্দ পেতেন তাই মনের মধ্যে ধরা পড়ে যেত। এই সংক্রান্তে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলে মনে হল, কোন একটা কিছুর ভাবনায় যেন তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে আছে। তাঁর নিজের বিশেষ ভঙ্গীতে হাত-মাথা নেড়ে বললেন: "জান, আমার ক্রাইস্টকে আমি চীৎপুর রাস্তায় গতকাল ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, চেহারাটা যেন সত্যিই ক্রাইস্টের মতো।" তার পরদিন প্রাতে একটু বেলা করে গিয়ে দেখি শিল্পাচার্য নিজের আঁকার জায়গায় বসে নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছেন। ধীরে ধীরে পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখেই আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন—"এই দেখ আমার ক্রাইস্ট।" দেখতে পেলাম ইতিমধ্যেই ছবিটার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে, সুন্দর একটি ক্রাইস্টের ছবি। কোন এক সময়ে প্রবাসী পত্রিকাতে ছবিটি ছাপানো হয়েছিল। ছবিটা দেখে ভেবেছিলাম, কে সেই অজ্ঞাতনামা সৌভাগ্যবান পুরুষটি সেই চিৎপুর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল যাকে দেখে শিল্পী ক্রাইস্টের প্রেরণা পেয়েছিলেন। চিৎপুরের সেই দিনকার ক্রাইস্টের প্রেরণাদাতা পথচারী মডেলটি বোধহয় জানতেই পারল না যে একজন কৃতী

শিল্পীর তুলিকায় তাঁর আকারটি অঙ্কিত হয়ে রইল। অবনীন্দ্রনাথ লোকটিকে স্টাডি করতে চিৎপুরের রাস্তায় স্কেচ্-খাতা হাতে নিয়ে ছুটে যাননি, কিন্তু এক পলকে যা দেখলেন তাতেই তাঁর সব দেখা হয়ে গিয়েছিল।

একবার কলকাতার কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন : "অবনবাবু, আপনি তো নন্দলাল, অসিতকুমারের মতো বড় বড় আর্টিস্ট তৈরি করেছেন, তাজমহল তৈরি করতে পারবেন?" তার উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "দেখুন, কেউ কাউকে আর্টিস্ট বানাতে পারে না, তারা শিল্পী হয়েই আমার কাছে এসেছিল, আমি শুধু ঠিক পথটা বাতলে দিয়েছিলাম। তাজমহল গড়ার কথা বলছেন, হ্যাঁ আমি তাজমহল গড়তে পারি, কিন্তু তাজমহল চাইবার মতো সাহজাহান বাদশা কোথায়? যদি সাহজাহান বাদশাকে পাই তবে তাজমহল আমি ঠিকই গড়ে দেব।" ঠিক কথাটিই তিনি সেদিন বলেছিলেন, দেশের শিল্প অনেক সময় গড়ে ওঠে যদি দেশে তার চাহিদা থাকে।

ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের স্টুডিও (Studio) বলতে যা বোঝায় অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথের সেই ধরনের স্টুডিও কখনও ছিল না। ঐ দক্ষিণের বারান্দাই ছিল তাঁদের স্টুডিও, শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় এখানে বসেই বরাবর ছবি এঁকেছেন, আবার গল্পও করেছেন। এইখানে কিউরিয়ো ব্যবসায়ীরা তাদের নানা রকমের পুরাতন পুতুল, প্রাচীন চিত্রাদি, বিচিত্র রকমের কারুশিল্প নিয়ে হাজির হত। কোন কিছু যদি পছন্দ হত তার মধ্যে তবে হয়তো কিনে নিতেন। কখনও বা কার্পেট ব্যবসায়ী এসে হাজির হত, এমনি করে অনেক বিচিত্র রকমের ব্যবসায়ীরা এসে দেখা দিত। অনেক গুণী বিদেশী, বিদেশী শিল্পী এই দক্ষিণের বারান্দায় এসে আলাপ করে যেতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাপানের মনীষী ও শিক্ষাবিদ্ কাকোজু ওকাকুরা, বিখ্যাত শিল্পী টাইকান, হিশিদা, আরাইমান যাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি ওয়াস্ পদ্ধতিতে চিত্র-অঙ্কন প্রবর্তন করেছিলেন। বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গেও এই দক্ষিণের বারান্দায়ই প্রথম তাঁর পরিচয় হয়। আনন্দ কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে কিছু-দিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

এই মহান শিল্পীকে কখন প্রথম দেখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সেকথার একটু উল্লেখ করছি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যখন পড়তাম তখন সেই অল্প বয়সেই বাঁশী ভাল বাজাতাম। যদিও কখনও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সামনে বাঁশী বাজাইনি তবু তিনি জানতেন আমি বাঁশী বাজাই। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতে এসেছেন হোম রুল সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য। তিনি কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে দেখা করবেন। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন্দ্রনাথ দে ইত্যাদি আরও শিল্পীদের চিত্রাদি নিয়ে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গুরুদেব কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে টেলিগ্রাম করলেন শীঘ্র বাঁশী নিয়ে আমাকে কলকাতায় যাবার জন্য। সেখানে পৌঁছে তার পরদিন সকালের দিকে বিচিত্রাভবনে ঢুকে দেখি বড় হলঘরটিতে সুন্দর করে প্রদর্শনীর জন্য ছবি-গুলি সাজানো হয়েছে। সেই প্রদর্শনীতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের বিখ্যাত বড় ছবি 'পথের সাথী'টি ছিল। একটি পুরুষ সাঁওতাল বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, তার সঙ্গী একটি সাঁওতাল রমণী। ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "সুরেনকে বলেছিলাম

ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডে (Background-এ) সোনালী রঙ লাগিয়ে দিতে যাতে শান্তিনিকেতনের রোদের দীপ্তির আভাস আসে।" তাঁরা ঘুরে ঘুরে ছবিগুলি দেখছিলেন। সেই প্রদর্শনীর ঘরে আমি প্রথম অবনীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম। পরের দিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব দেখা করতে আসেন। তাঁকে বাঁশী বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম।

কলকাতায় প্রতি ডিসেম্বর মাসে সমবায় ম্যান্সন নামে বৃহৎ ভবনের একটি অংশে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী হত। কলাভবন প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে। উক্ত প্রদর্শনীতে দেওয়ার পূর্বে কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আঁকা ছবিগুলি কলকাতায় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখানো হত। ভোরবেলা চিৎপুর রাস্তা হয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে ছবি সহ যখন অগ্রসর হতাম তখন বাড়ির নিকটে পৌছেই প্রথমে চোখে পড়ত বাড়ির নিচতলায় প্রবেশ-পথের গাড়িবারান্দায় অতিপুষ্ট শয়নরত একটি ভেড়া ও বিরাট ভুঁড়িওয়ালা বলিষ্ঠ এক পশ্চিমা দরোয়ান। তারপরে একটু এগিয়ে দোতলায় ওঠার সুন্দর কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় পৌছলে মোহিত-করা খাম্বিরা তামাকের খোশবায় নাকে আসত। অবনীন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম বাড়িটার দোতলার বসবার ঘরে শিল্প সম্ভারেও ভারতীয় ধরনের আসবাবপত্রে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। দেওয়ালের গায়ে ছোট-বড় বহু রঙিন চিত্রাদি টাঙানো রয়েছে দেখলেই মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ চিত্রগুলিই অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথের ও নন্দলালের দ্বারা অঙ্কিত। তবে ভাল ভাল প্রাচীন রাজপুত, মুঘল ও কাংড়া ঘরানার চিত্রসকল এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। দোতলার প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশি-ভাবে তিনটি পৃথক আরামকেদারায় তিন ভাই, জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, মেজো সমরেন্দ্রনাথ, এবং কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এক একটি করে আলবোলা নিয়ে বসে তামাক খেতেন আর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ছবি আঁকতেন, গল্প করতেন, মেজো ভ্রাতা শিল্প সমঝদার ও সমালোচকের স্থান গ্রহণ করতেন। যেমন মহান শিল্পী তেমনি বড় মজলিসী ব্যক্তিও তাঁরা তিনজনেই ছিলেন। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের আঁকা নূতন ছবিগুলি নিয়ে যখন ওঁদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতাম তখন ছবিগুলি দেখবার জন্য কি আগ্রহই না তাঁদের তিন ভায়ের মধ্যে দেখেছি। কাড়াকাড়ি করে ছবি-গুলি দেখতেন এবং ছবির নাম, তার মূল্য দুইই তাঁরাই নির্ধারিত করে দিতেন। ছবিগুলির দোষগুণ বলে দিতেন, কিন্তু তার সঙ্গে থাকত তাঁদের অকৃত্রিম গভীর দরদ আর মমত্তবোধ। তাঁদের দেখা হয়ে গেলে ছবিগুলি নিয়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টসের ভবনে পৌছে দিয়ে আসতাম। এইভাবেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হওয়ার প্রথম সূত্রপাত হয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনের পিছন প্রাঙ্গণে বিরাট একটি প্যাণ্ডেল তৈরি হল, এখানে প্রথমে প্রকাশ্য জলসা বর্ষামঙ্গল গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এস্রাজ বাজাবার জন্য সঙ্গীতদল-ভুক্ত হয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছি। প্রতিদিন সকালের দিকে গানের মহড়া হয়ে যাবার পরে কিছু সময় পাওয়া যেত, তখন অবনবাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছবি আঁকা দেখতাম তাঁর পাশের একটি কাঠের বেঞ্চিতে বসে। তিনি ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটা গল্প এবং ছবির সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলতেন। কলকাতায় সাধারণ মঞ্চে তারপর থেকে কয়েক বছর অন্তর



শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ
১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর আচার্য পদে থাকাকালীন
শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মন কৃত স্কেচ্‌



'ঘোড়ার পিঠে 'Don Quixote'
অবনীন্দ্রনাথের কাটুমকুটুম



'বাউল'
অবনীন্দ্রনাথের কাটুমকুটুম

[শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সৌজন্যে।]

বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, বিসর্জন নাট্যাদি অভিনীত হয়। প্রতিবারেই এই সব অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের দলে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতাম। তখন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম।

বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, বিসর্জন নাট্যের সব মহড়াই অবনবাবুদের বসবার ঘরের পাশে একটি বড় হলঘরে প্রাতে বা সন্ধ্যায় হত। মহড়ার সময়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন ও নির্দেশ দিতেন। সঙ্গীত পরিচালনা করতেন দীনেন্দ্রনাথ। সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ভীমরাও শাস্ত্রী পাখোয়াজ, বাঁয়াতবলা বাজাতেন। এস্রাজ বাজাতাম আমি। অবনীন্দ্রনাথও তাঁর এস্রাজ নিয়ে আমাদের পাশে বসে বাজনায় যোগ দিতেন। গগনবাবু, সমরবাবু, আরও ঠাকুরবাড়ির কেউ কেউ তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন। ভীমরাও শাস্ত্রীকে আমরা পণ্ডিতজী বলে ডাকতাম। পাখোয়াজ বাজাবার সময়ে পণ্ডিতজীর জলে আটা-মাখানো একটি ঢেলার প্রয়োজন হত। পাখোয়াজের একটি দিকে আটা ঢেলার কিছুটা লাগিয়ে বাকীটা পাশে রেখে দিতেন। অবনবাবু তার থেকে কিছু মাখানো আটা নিয়ে ছোট্ট একটি মানুষ তৈরি করে এস্রাজের ছড়ের মাথায় বসিয়ে এস্রাজ বাজাতে লাগলেন। তাই না দেখে কেউ কেউ মুচকি হাসাহাসি করছিল। তারা গুরুদেবের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, কিন্তু তিনি এদের হাসির উৎসটি কোথায় সেটা ধরতে পারছিলেন না, তার কারণ অবনবাবু আমাদের আড়ালে বসে এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানী চোখের ভাব দেখেই তাড়াতাড়ি অবনবাবু ছড়ের মাথার আটার মানুষটিকে লুকিয়ে ফেললেন। আরেকটি গীতোৎসবের মহড়ার কথা মনে পড়ছে। সন্ধ্যাকালে ঐ একই বড় হলঘরে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে মহড়া চলছে। পূর্বের মতো শিল্পী ভ্রাতৃত্রয় সেই সন্ধ্যায়ও উপস্থিত। গানবাজনা নৃত্য খুব জমে উঠেছে। "ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে, বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে", গানটি যখন গাওয়া হচ্ছে, সুরে, তালে আমাদের সকলকেই বাদল বাতাসের মতো মাতিয়ে তুলেছিল, হঠাৎ দেখা গেল লম্বা জোব্বা পরিহিত সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র পরস্পরের হাত ধরা-ধরি করে উঠে মিলনের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করতে শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং উপস্থিত আমরা সকলেই এই শিল্পীদের নৃত্যকে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছিলাম। সে দৃশ্য যেন আজও চোখের সামনে ভেসে আছে। আরেকটি নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। "নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে", গানটির সঙ্গে নটরাজ সেজে একজনকে নৃত্য করতে হবে। কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র বাসুদেবকে নটরাজের নৃত্য করবার জন্য নির্বাচিত করা হয়। বাসুদেব ছিল দক্ষিণ-ভারতীয়, গায়ের রঙ কালো, দেহের গঠনটি এবং চেহারা বেশ সুন্দর। যেদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীত নৃত্য অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা সেদিন বিকালের দিকে রঙ্গমঞ্চের গ্রীনরুমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলেই ব্যস্ত নিজেদের রূপসজ্জার কাজে। এখন সমস্যা দেখা দিল বাসুদেবকে নিয়ে। তার কালো গায়ের রঙকে কিভাবে ঢাকা যায়। সেখানে নন্দলালবাবু, সুরেনবাবু ও অবনবাবু উপস্থিত। কেউ কেউ বললেন, সাদা রঙ লাগাবার জন্য, আবার কেউ বললেন পাউডার লাগাতে, অবনবাবু এই সব কথা শুনে বললেন: "এই সবের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু কিছু গেরিমাটী (yellow ochre) রঙ নিয়ে এস।" রঙ এলে তাই নিয়ে অবনবাবু বাসুদেবের দেহের উঁচু, উঁচু স্থানগুলিতে একটু একটু করে সামান্য প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। রঙ্গমঞ্চে যখন

"নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ"—গানটির সঙ্গে বাসুদেব নৃত্য করতে লাগল তখন মনে হল যেন ব্রঞ্জের তৈরি নটরাজ নৃত্য করছে, দর্শকরা সেদিনকার জীবন্ত ব্রঞ্জের নটরাজের নৃত্য দেখে অবাক ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-বারান্দার প্রান্তে যে লোহার রেলিং ছিল তার একটি কোণে জাপানী পদ্ধতিতে খর্ব-করা একটি তেঁতুল গাছ ও একটি নেবুর গাছ সুন্দর চীনামাটির দুটি ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত ছিল। তেঁতুল গাছটিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স অনেক হয়েছে, তার সমস্ত ছালটা বুড়ো গাছের মতো ফাটা ফাটা হয়ে আছে। নেবু গাছটির চেহারাও সেই একই প্রকার। দেখলাম নেবু গাছে বেশ ছোট ছোট হলদে রঙের অনেকগুলি পাকা নেবু ধরে আছে। অবনবাবু আমাকে বললেন: "একটি নেবু খেয়ে দেখবে?" হাত পাতলাম নেবু নেবার জন্য। একটি নেবু পেড়ে দিলেন। মুখে দিয়ে দেখি খর্বকায় নেবুর মধ্যে তার টকরস এমনি ঘনত্বপ্রাপ্ত হয়েছে যে, কার সাধ্য তাকে গলাধঃকরণ করে।

জোড়াসাঁকোয় এসেছি গানের দলের সঙ্গে। গানের মহড়ার শেষে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা দেখব, একটু আলাপ করব এই ভেবে সকালের দিকে ওঁদের বাড়িতে ঢুকে দোতলার দক্ষিণের বারান্দার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম অবনবাবু উঁচু গলায় বলছেন: "আমারই নিজের আঁকা ছবি, এখন দেশে ফেরত আসলে বোম্বেতে পাঁচশত টাকা কাস্টমস দাবী করছে।" বারান্দায় উপস্থিত হয়ে দেখি, শিল্পীর সামনে মেঝের উপর কাগজের একটি মোড়ক খোলা পড়ে আছে, আর তার মধ্যে একটা ছোট ছবি। অবনবাবু আমাকে দেখে আবার বললেন: "দেখতো, এইটি আমারই আঁকা ছবি, বিলেতের একটি চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলাম, যখন দেশে ফেরত এল তখন বোম্বের কাস্টমস পাঁচশত টাকা দাবী করেছিল, অনেক কষ্টে ছবিটাকে ফেরত পাওয়া গেছে। এ ছবিটাকে আর ঘরে রাখব না, তোমাকে দিয়ে দিলুম।" আমি তো আনন্দে ছবিটাকে গ্রহণ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ছবির পেছনে একটু লিখে দিন যে আপনি আমাকে উপহার দিচ্ছেন বলে। তখনই লিখে দিলেন। আমার সংগ্রহে এই ছবিটি একটি অতি মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইল। ছবিটির নামটি হল Uma, daughter of Himalaya। শিল্পাচার্য নন্দলালকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা উমার একটি সুন্দর ছবি উপহার দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বলেছিলেন: "নন্দ, আমার উমাকে তোমাকে উপহার দিলাম, তাকে যত্নে রেখো।" নন্দলাল এই উমার ছবিটির মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ করেননি, তার সামনে প্রতিদিন ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পূজার শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। এই চিত্রটি অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির অন্যতম। আমাকে যে উমার চিত্র উপহার দিয়েছিলেন তারই পরবর্তী রূপান্তর হল নন্দলালকে উপহার দেওয়া উমার চিত্রটি। দুটি চিত্রের মধ্যে কতগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র-প্রীতির সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে বলতে হয়, তাঁর মতো স্নেহশীল, কল্যাণকামী গুরু পাওয়া খুবই দুষ্কর। ছাত্রদের সুখসুবিধা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সর্বদা খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের অন্যতম একজন শিল্পীর একবার ক্ষয় রোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবনীন্দ্রনাথ নিজ ব্যয়ে কলকাতার তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ গণনাথ সেনের দ্বারা অসুস্থ শিল্পীর চিকিৎসার এবং পুরীতে গিয়ে কিছুকালের জন্য বাস করবার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলাভবনের প্রথম যুগের একজন শিল্পী ছাত্রেরও এই রোগের আশঙ্কা দেখা দিলে তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। লেডি হেরিংহামের সঙ্গে

নন্দলাল, অসিতকুমার এবং আরও কয়েকজন শিল্পী যখন অজন্তা গুহার দেওয়ালচিত্রের নকল করার কাজে অজন্তায় গিয়েছিলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে পার্শেল করে ডাল চাল, আলু ইত্যাদি পাঠাতেন। অজন্তা গুহার চারপাশের অবস্থা তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল, সেখানে কোন আহার্য পাওয়া সম্ভব হত না। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের চিত্র-প্রদর্শনীতে শিল্পী-ছাত্রদের ছবি বিক্রি করিয়ে ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করবার ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। তিনি ছিলেন ছাত্রদের নিকটে স্নেহশীল গুরু ও পিতার ন্যায়। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস স্থাপিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়। এখানকার চিত্র-প্রদর্শনীর বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, তখনকার দিনে ভারতে এমন রুচিপূর্ণ সর্বভারতীয় বৃহৎ চিত্রপ্রদর্শনী আর কোথাও হত না। এখানে অবনীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলিই প্রাধান্য লাভ করত। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন কর, শৈলেন দে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ক্ষিতীন মজুমদার এবং আরও অনেক ভাল ভাল শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেত। ছবিগুলির মূল্য পঁচাত্তর টাকা থেকে শুরু করে দু-শ টাকার উর্ধ্বে উঠত না। বর্তমান বাজারে হয়তো সেই সব ছবির জন্য লোকে অনায়াসে হাজার টাকা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না। ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করতেন বড়লাট অথবা বাংলার গভর্নর। কোন কোন রাজা, মহারাজারা, আর কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেই সময়ে উপস্থিত থাকতেন। প্রদর্শনী খোলা থাকত একমাস ধরে। প্রতিদিন বিকালের দিকে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অনেক শিল্পী ও শিল্পরসিক প্রদর্শনীর ঘরে এসে উপস্থিত হতেন। ছবি দেখা, ছবির বিষয়ে আলোচনা করা, গল্প ঠাট্টায় বেশ আসর জমে উঠত। একদিন এমনি-ভাবে যখন আসর বেশ জমে উঠেছে তখন এক ভদ্রলোক মুখে সিগারেট নিয়ে যেই না দেশলাইয়ের কাঠিতে আগুন ধরিয়েছেন অমনি অবনীন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন : "Full of Spirit, সাবধান", এই চীৎকারে সকলেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন "Full of Spirit"-এর লোক, পানদোষে অভ্যস্ত। যিনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছিলেন তাঁর ঠিক পাশে চঞ্চলবাবু বসেছিলেন। অবনীন্দ্র-নাথের ভয় হয়েছিল যদি সেই আগুন Spirit-এ ধরে যায় তাই চীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন। প্রথমে কেউ বুঝতে না পারলেও পরে যখন কৌতুকটি বুঝতে পারলেন তখন উপস্থিত সকলেই হেসে অস্থির হয়েছিলেন। এইভাবে গল্প, ঠাট্টায় রাত প্রায় আটটা বেজে যেত।

কলাভবন প্রতিষ্ঠা হবার পরে শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম পদার্পণ করেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে। আম্রকুঞ্জে কারমাইকেল বেদীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সকল আশ্রমবাসীর উপস্থিতিতে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ একটি অতি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর অপূর্ব ভাষায় বলেছিলেন যে, তিনি একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরে তিনি এগিয়ে চলেছেন, পিছনে চলেছেন তাঁর শিষ্যের দল—নন্দলাল, অসিতকুমার, ভেঙ্কাটাপ্পা আরও অনেকে। তারপর সেই পাহাড়ের একটি বাঁক পার হলেন, তখন পিছনে ফিরে দেখেন শিষ্যের দল তাঁকে আর কেউ অনুসরণ করছে না। তখন তিনি শিল্পের পথে একাই এগোতে হবে, একাই চলতে

হবে বলে এই কথাটি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন। সাধনার পথে একাই চলতে হয়। ভাষণের শেষের দিকে তাঁর শিষ্যদের নিকটে গুরুদক্ষিণা দাবী করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন: "আমার গুরুদক্ষিণা কোথায়? আমি তোমাদের কাছ হতে কোন মূল্যবান সম্পদ অথবা কোন প্রকার অর্থ পেতে চাই না, কিন্তু আমি চাই একটি সামান্য জিনিস, সেটি হচ্ছে একটি মাটির পুতুল যার নক্শা তোমরা করবে। সেই পুতুল দেশের শিশুদের রাঙা কচি কচি হাতে আমি যেন তুলে দিতে পারি যা দিয়ে খেলা করে ঐ শিশুরা আনন্দিত হতে পারবে।"

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে ১৯৪২-এর ১ জানুআরি থেকে ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চার বৎসর অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আচার্য পদে ছিলেন। তখন তিনি উত্তরায়ণের উদয়ন গৃহে বাস করতেন। সকালের দিকে প্রায়ই কলাভবনে গিয়ে শিল্পী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পারিবেষ্টিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে গল্প বলে আর্টের বিষয়ে আলোচনা করে বেশ আনন্দের সঙ্গে দিনগুলি অতিবাহিত করতেন। মনে যখন খুশি ধরত তখন কাটুমকুটুম তৈরি করা, কখনও বা ছোট ছোট রঙিন ছবি আঁকতেন। তাঁকে দেখে মনে হত বেশ প্রাণপ্রাচুর্যে হাসি-খুশি, কৌতুকে তখন মন ভরপুর।

মানুষের আচরণ, চালচলন, কথা বলা-কওয়ার সঙ্গে তার কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যেমনটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তেমনটি অন্য কিছুতে ধরা পড়ে না। বিশেষ করে রূপকারদের বেলায় একথা আরও বেশি সত্য। শিল্পীর শিল্প রচনায়, চিত্রে তার সত্তার ও ব্যক্তিত্বের আভাস প্রতিফলিত হয়। এর থেকে শিল্পী নিজেকে কখনও লুকিয়ে রাখতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে একটা হেঁয়ালি ও রূপকের ছোঁয়া থাকত। কথার উচ্ছলতার সঙ্গে ভাব-প্রকাশকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতেন হাত, মাথা নেড়ে। সামান্য কথাকেও বলবার গুণে শ্রোতার মনে অবাক ও আনন্দ এনে দিতে পারতেন, অত্যন্ত সুবক্তা ও ভাষায় রূপক সৃষ্টিতে পটু ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আমরা প্রকৃতির মধ্যে বাস করি, কলকাতায় তিনি কেমনভাবে বাস করেন সেকথা একবার বলতে গিয়ে বলেছিলেন: "এই দক্ষিণের বারান্দায় বসে সামনের ভাঙা আকাশে কখন শরৎ, বসন্ত, বর্ষা আসে তা দেখতে পাই।" তাঁর চিত্রের বিষয়নির্বাচনে অপরিসীম কল্পনা ছিল প্রধান সহায়। তাই দক্ষিণের বারান্দায় বসে আরব্য-রজনী গল্পের এবং ওমার খৈয়ামের ছবি এঁকেছেন যা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের নিদর্শনরূপে গণ্য হয়েছে। শিশু সাহিত্যও তিনি লিখেছেন। সাহিত্যে রূপকথার যে স্থান, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর তৈরি কাটুমকুটুমেরও একই স্থান। অতি তুচ্ছ পদার্থ শিল্পীর জাদুকরী হাতের স্পর্শ পেয়ে রূপকথার জগতের উপযুক্ত মানুষের, জীবজন্তুর আকার লাভ করে। শিল্পীর এ এক অপূর্ব রূপসৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা যেন সঙ্গীতের খেয়াল, ঠুংরীর আমেজ এনে দেয়, ক্লাসিক্যাল আর্টের চেয়ে রূপকের ও প্রাচীন শিল্পধারার প্রতি অরক্ষণশীল মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিকৃতি আঁকায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্যাস্টেল রঙ দিয়ে শান্তিনিকেতনের অনেকেরই প্রতিকৃতি একবার এঁকেছিলেন, তার মধ্যে জগদানন্দ রায়, নন্দলাল বসু, যমুনা সেন, নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর প্রতিকৃতিগুলি কাজের দিক থেকে অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রথম দেখেছিলাম, তার বত্রিশ বছর পরে ১৯৪৮

খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গঙ্গার বালিপুল ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির নিকটে অবস্থিত গুপ্তনিবাস নামক একটি সুন্দর বাগানওয়ালা ভাড়াবাড়িতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। এই দীর্ঘ বছরের মধ্যে তাঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন, অনেক উত্থান-পতন এসেছে। পৈতৃক বাড়ি জোড়াসাঁকো ত্যাগ করেছেন, সেই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দা আজ আর নেই, তার পরিবর্তে গুপ্তনিবাসের দোতলায় অতি সংকীর্ণ একটি বারান্দায় বন্ধুবিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি আরামকেদারায় একা বসে আছেন। জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দা শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আনাগোনায় একদিন শিল্পীদের তীর্থস্থানরূপে পরিণত হয়েছিল, আজ এখানে তার কিছুই নেই। জোড়াসাঁকোয় প্রথমে যখন তাঁকে দেখেছিলাম তখন তাঁর অবস্থা ছিল মধ্যগগনে রবির মতো। প্রতিভার দীপ্তিতে তাঁর সমস্তই ছিল উজ্জ্বল। কথা বলায়, হাসিতে, কৌতুকে, চিত্র অঙ্কনে, শিল্পবিষয়ে, লেখায়, প্রাণোচ্ছ্বাসের আবেগে তাঁর দেহ-মন ভরপুর। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে ভক্ত, বন্ধু-বান্ধববিহীন অবস্থায় যখন তাঁকে দেখলাম তখন অস্তগামী সূর্যের কথা মনে পড়ে গেল। গম্ভীর চেহারা, মাথার সামনের দিকে টাক আর পেছনের সুন্দর কোঁকড়ানো কালো চুলের পরিবর্তে অগোছালো একরাশ শুভ্র কেশ। তাঁকে দেখে মনের কোণে কেমন যেন একটা বিষাদের বেদনা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু তারই মধ্যে আবার একটু আনন্দ মনে জেগেছিল যখন তিনি সদ্যগড়া একটি কাটুমকুটুম দেখিয়ে আমাকে বললেন, "দেখতো কেমন হয়েছে?" বুঝতে পারলাম, শত অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যেও শিল্পরসসৃষ্টির আনন্দের থেকে বঞ্চিত হননি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এখনও শিল্পরসসৃষ্টির আনন্দকে সরস রাখতে পেরেছেন। এই গুণটি দেখেছিলাম আরেকজন মহান শিল্পী, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষপ্রান্তে তাঁর রোগশয্যায়। খুবই বৃদ্ধ, অসুস্থ কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগতের যা সুন্দর, যা আনন্দময় তার প্রতি সচেতন থাকার ক্ষমতা রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। সাধারণত মানুষকে দেখেছি যখন সে বৃদ্ধ হয় তখন তার দুর্বল দেহ-মন জগতের যা সুন্দর যা আনন্দময় তার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখায়। অবনীন্দ্রনাথের চরণদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিন গুপ্তনিবাস ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম, তারপর আর কখনও এই মহান গুরু শিল্পীকে দেখার সুযোগ হয়নি।

অপেক্ষায় আছি

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

সংবাদপত্র জগতে কীর্তিমান,—ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। আনন্দ-পুরস্কার এবং আনন্দবাজার অর্ধশতাব্দীপূর্তি বিশেষ পুরস্কারলাভে ধন্য লেখক। প্রবন্ধটি বিগত ২৬ জানুআরি ১৯৮৪, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ অতিথির ভাষণের অনুলিখিত রূপ।

ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে কিছু বলা? অসম্ভব। শুধু ভাবা যায়, তাও অনুভব যদি থাকে তবেই। সেই বলাটাকে লেখায় ঢালাই করা আরও শক্ত। তবু চেষ্টা করি। করে যাই।

তাঁদের কথা তাঁরাই বলাবেন ইচ্ছে হলে, যেমন বলিয়েছেন নির্বাচিত কত না যোগ্য বরেণ্য প্রবক্তাদের দিয়ে। আমাকে দিয়ে বলানো, তাঁদের ইচ্ছে না হলে বলাবেনই না, আমার বাচাল গলা আপনা থেকেই আটকে যাবে।

তাঁরা তো আছেনই, পাড়ে দাঁড়িয়ে, হাত একটু বাড়িয়ে, আমাদেরও একটু যাওয়া চাই। ওঁরা উন্মুখ ঝুঁকে আছেন, আমাদেরও মুখ তুলে তাকানো, হাত বাড়িয়ে হাত ধরা চাই। স্তন্য পরিপূর্ণ। তবু ঈষৎ লেহন, ওইটুকু সক্রিয়তা শিশুরও চাই, তবে তো মাতৃদুগ্ধের স্বাদ। অন্তত সেইটুকু তৎপরতা আবশ্যক, যেটুকু আছে ভিখিরিরও। ভিখিরি হয়তো চেয়েছে একটা সিকি, বড়জোর আধুলি। হাত পাতলে। সে

ভাবে, তিনি দিয়েছেন, আস্ত একটা টাকা। সে ভাবে, অন্ধকার কিনা! তাই যিনি দিলেন, তাঁরই ভুল। অন্ধকার—তাঁর? উহুঁ, আমাদের মনেই অন্ধকার। একটুখানি দিলে যে তাঁর কাছে অনেকখানি ফিরে মেলে, এই শাশ্বত পুরানো সত্যটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই কিনা! অন্তত আমার ছিল না। বছর কুড়ি আগেও এই লেখক ছিল নিরীশ্বরবাদী অহং-এ ভরপুর। সহসা একটা ব্যক্তিগত সংকট। আমার বন্ধু জ্যোতির্ময় বসু রায়কে বলি, আপনি তো একটা শান্ত বিশ্বাসের প্রশান্তি পেয়ে গেছেন। তার খানিক আমাকে দিন। নইলে জীবনকে ধারণ অর্থহীন।

তিনি দিলেন বইয়ের পর বই। কিছু পড়া ছিল, অনেক আবার ফিরে পড়া হল। যেন আদমুগ্ধ। সেই অনুভূতি নিয়ে কিছু লিখলামও। সাধু-মহারাজদের অনর্গল কৃপা পেলাম। পেতেই থাকলাম।

কত কম দিয়ে সেদিন কত বেশি পেয়েছিলাম আজ ভাবলেও লজ্জায় সিটিয়ে যাই। আবার গর্বেও ভরে উঠি।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে বারবার বেলুড় আর যোগোদ্যানেও গিয়েছি। ভরত মহারাজ বুকে টেনে নেন। আর ভূতেশানন্দ মহারাজ আমার স্বীকারোক্তি শোনেন। ক্যাথলিক কায়দায় নয়, স্নেহে, মমতায় পর্যবেক্ষণে। হয়তো পরীক্ষাতেও।

বেশ খানিকটা বদলেছি বইকি। চেহারাটাকে তো পারি না, বদলেছি আমার মনটাকে। যেমন 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি'—ইত্যাদি প্রার্থনা আর করি না। আগে বলতাম, বড় করো, ভাল করো, শান্তি দাও। আজকাল শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলি? 'তোমার যা ইচ্ছে যায়, তাই করো।'—এই বলে ভালমন্দ সুখ-দুঃখ মেশানো দিনের শেষে বিছানায় যাই। চোখ বুজে নিজস্ব একটা মন্ত্রই বলি। মন্ত্রটা কী, সেটা কাউকে বলতে নেই, শুধু এইটুকু বলি, সেটা সংস্কৃত নয়।

আম-মোক্তার নামা। তাঁকে। তাঁর লটারিতে আমার নামে যদি 'শান্তি' শব্দটা ওঠে, তবে পাব। নইলে 'আমারে করো তোমার বীণা' বলে গলা ভেঙে হাঁড়িচাঁচা করলেও একটা ধুলোমাখা তারও বাজবে না।

আরও বদলেছে। আমার মন। আগে ভাবতাম, এত দিলাম তবু ওরা নিতে পারল না কেন? আজ ভাবি, কে জানে আমিই হয়তো দিতে পারিনি। ক্ষমাহীন মনস্তত্ত্ব তার চেয়ে বড় একটা অক্ষমতাকেও তুলে ধরে। আমি, কে জানে, হয়তো অবচেতনে দিতেও চাইনি। তাও তো হতে পারে!

এখনও বারবার ফিরে ফিরে সেই আমি! সকল অহংকার চোখের জলে ডোবাবার সময় এখনও আসেনি।

আসবে, আসবেই। দরকার তাঁরও কি নেই? একটু আছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে যেমন পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, তেমনই যিনি পূর্ণ তাঁরও পরিপূর্ণতার জন্যে উপচার আয়োজনের প্রয়োজন।

ব্রহ্মের নাকি দরকার হয়েছিল। উপনিষদে আছে। সৃষ্টিতো সেইজন্যেই। আলোর পিপাসা ছিল সেমেটিক গড-এরও। তাই না তিনি বললেন, Let there be light! অমনি আলো হল।

আনন্দ, সুখ—ভাগীদার বা শরিক সঙ্গী না থাকলে জমে না। দুঃখের দিনেও নিমগ্ন থাকা সম্ভব। তবু কাউকে বললে যেন বুকের বাতাস হাল্কা হয়ে যায়। অন্য একজন, অন্তত একজনকে, পাওয়া চাই। তাই মহাপুরুষ অবতার যাঁরা, যুগে যুগে তাঁরা আসেন।

আমি যদি বলি গ্লানি ঘোচাতে যতটা, নিজস্ব নিঃসঙ্গতাকে মুছে দিতে ততটাই? তাঁরা আসেন

সপার্ষদ। কৃষ্ণ, যীশু—ভেবে দেখুন। রামেরও ভক্ত হনুমান ছাড়া লক্ষ্মণ ভাই ছিল। এবং সুগ্রীবও।

রামকৃষ্ণেরও নির্বাচিত কিছু পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁদের জন্য আকুলতাও। দক্ষিণেশ্বরের ছাদে 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়'—নাটকের সময় যে ফুরিয়ে এসেছে!

ঈশ্বর! মানব না কেন? আমাকে অচিন্ত্যবাবু একবার বলেন, এই যে বিশ্বজোড়া অহরহ ধাবমান এত গ্রহ গ্রহাণুপুঞ্জ, এত প্রাণ, তাদের পিছনে নিয়ামক কোনও কিছু কি নেই? এই বিজ্ঞানের যুগেও দুটো গাড়ির কলিশন আমরা ঠেকাতে পারি না। অথচ অগণ্য জ্যোতিঃপুঞ্জ একই সঙ্গে স্থিত আর ধাবিত যে মহাজগৎ, সেখানে কই স্মৃতি তো একটির সঙ্গে অন্যটির ঈষৎ সংঘর্ষের কথাও বলে না? সংঘর্ষ হয়ে থাকতে পারে দূর অতীতে, কোন কোন বিজ্ঞানী একথা বলেন বটে। প্রমাণ নয়, সে শুধু অনুমান। তাহলে একটা নিয়ম আছে নিশ্চয়ই। ঈশ্বর শব্দে যাদের বিরাগ তাদের যদি বলি ওই নিয়মই ঈশ্বর! ঈশ্বর না বলে তাঁকে "নিয়ম" বললেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বেশ, অত্যাধুনিক যুক্তিবাদীরা ঈশ্বর না বলে না হয় বলুন শুধু 'নিয়ম'। নামে তাঁর কিছু আসে যায় না।

এই যে এসেছি, এই যে আছি সবই নিয়তি বা নিয়ম। তবে কিসের বড়াই? কেউ কেউ বলতে পারেন, বলে থাকেনও বটে যে, এত কোটি কোটি গ্রহ-গ্রহাণুর মধ্যে একমাত্র এই সৌরজগতের পৃথিবীতেই কেন তাঁর অনুভব। উত্তরে বলতে চাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখি না। এই সৌরমণ্ডল ছায়াপথের শুধু একটা অংশ। এক মালিকের বহুতল বহুমহলা বাড়ি। তবু তিনি বিশেষ করে বাছাই করে নেন একটিমাত্র ঘরকে। সেখানেই তাঁর খোলাখুলি স্বস্তি। স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ। যদি বলি স্রষ্টার কাছে প্রিয় এই পৃথিবীটাও তাই! আবার মানুষের কথা। এত জীবজন্তু কীটাণুকীট তবু বিচারবুদ্ধি ন্যায়-অন্যায় বোধ, প্রজ্ঞা ইত্যাদি আর তো আমাদের জ্ঞাতসারে অন্য কোনও প্রজাতির নেই। যা দেবী সর্বভূতেষু সব ঠিক। তিনিই সব হয়েছেন জানি, তবু বেছে নিয়েছেন আমাদের। এই মানুষকে। তিনি নৈকট্যের তাগিদে নিজে এসে কাছের হয়েছেন, মানুষ কি কাছের তাঁকেও চিনবে না?

তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপারে নৌকার পাল ছিঁড়লে যদি মাঝি লাগে, গ্লানিতে যখন চারদিক ভরা তখন একজনকে চাই। তাঁকে প্রার্থনা, তাঁকেই কামনা। এই ছিনতাই রাহাজানির যুগে স্রেফ সামাজিক কারণে যখন শূন্যতা, তখন যদি যুক্তিবাদী মানুষরাই 'নেতা কই, নেতা নেই কেন, নেতা কবে' এইসব ভাবে, তবে অধর্মের মহামারীর দুর্যোগে একজন অবতারের কল্পনাও কি অন্ধ বিশ্বাস? কুসংস্কার? এই দুর্দশাগ্রস্ত মনুষ্যসমাজে তো নিশ্চয়ই নয়।

একজনকে নিতান্তই চাই। ওই খেইটা ধরেই অবিশ্বাসীদের বলি, ঈশ্বর যদি নাও থাকেন, তবু আমাদের গরজে, সুস্থ স্বাস্থ্যবান অস্তিত্বের স্বার্থে, তাঁর উপস্থিতি জরুরি। একান্তই।

এবার জরা ব্যাধি। যাঁরা মহামানব, অতিমানব, অবতার বলে অভিহিত তাঁদের অনেকেরই জন্মে কিন্তু একটা সাধারণত্ব পাই। যেমন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে, লালন গোপালয়ে। যেমন যীশুর জন্ম জাব ভর্তি আস্তাবলে। ব্যতিক্রম একটি কি দুটি। যেমন গৌতমবুদ্ধ। কিন্তু সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত রামকৃষ্ণ। সামান্য ঘরে জন্ম, সামান্য মানুষের মতোই শোক সন্তাপ, দারিদ্র্য—সমস্তই।

জন্মে আর জীবনে যেমন, প্রয়াণেও এঁদের প্রায় সবাই তাই। ডিপ্লোম্যাটিক ইম্যুনিটি বলে

একটা কথা আছে। এঁরা কিন্তু কোনও ডিভাইন ইম্যুইনিটি নেননি। কেউ ইহলোক থেকে চলে গেছেন ক্রুশে, কেউ ব্যাধের তীরে, কেউ বা গল-রোগে। অর্থাৎ প্রবেশ যেমন, প্রস্থানও তেমনই। যন্ত্রণায়। নতুবা আমরাই তো বলতাম যে ওঁরা রেশমী-বিলাসী, স্বার্থপর। গজদন্তমিনার-নিবাসী। বলতাম ওঁরা আমাদের নন। তাই, কী জন্মে কী তিরোধানে, এঁরা দেখিয়ে দিয়ে যান যে, তাঁরা আমাদের।

সাধারণ মানুষ হয়ে বাঁচার যে অভিজ্ঞতা সেইটুকু উপভোগ নয়, ভোগ করে যান। উদ্দেশ্য সাধারণ হয়ে সর্বসাধারণের উদ্ধার।

সব সয়েও, চৈতন্যদেবের মতো তৃণাদপি সুনীচ হয়েও, রামকৃষ্ণ 'মারভেল'। ঈশারউড বলেছিলেন 'ফেনোমেনন্'। আসলে আমাদের শব্দ—কী স্বদেশী কী বিদেশী যে কোনটাতেই তাঁকে ধরে না। ব্রহ্মের বর্ণনাই ভাবা যাক না। শাস্ত্রে কখন তাঁকে বলেছে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, কখন বা ন্যগ্রোধের ন্যায় বিশালকায়। বেড় মেলে না। রামকৃষ্ণও তাই।

ব্রহ্মের এই সনাক্তকরণে স্তম্ভিত হয়ে যাই। কিন্তু কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি যাঁর সম্বল, সেই মূলত গ্রামীণ পূজারী ব্রাহ্মণ অনায়াসে দ্বৈতাদ্বৈত সাকার নিরাকারের মীমাংসা করে দেন। ওঁদাবে? আমি তার চেয়ে বেশি মূল্য দিই তাঁর সারল্যকে।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? রামকৃষ্ণ বললেন, ধর জল। কোনটা ছোঁয়া যায়, কোনটার হাওয়ার আকার। দেখা যায় না, সব সময় টের পাওয়াও যায় না, কিন্তু বন্ধ হলে দমবন্ধ।

আবার বলি, 'মারভেল' 'মারভেল'! সেই উনিশ শতক যখন ফার্সী ইংরেজী সংস্কৃত জানা রামমোহন ক্রিশ্চিয়ানিটি দিয়ে থই পাচ্ছেন না, কোঁত, বেনথাম, মিল-এর ইকুইটারিয়ানিজ্‌ম দিয়ে বঙ্কিম যেকালে হিমসিম, আর টিকিতে সর্বৈব ইলেকট্রিসিটি ধরনের মতবাদী শশধর তর্কচূড়ামণি বা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখ যখন নব্য প্রজন্মের নিকট বিশ্বাস্যভাবে গৃহীত হচ্ছেন না, তখন দক্ষিণেশ্বরের এক ঈশ্বরোন্মাদ মানুষ সাকার-নিরাকারকে জলের উপমায় সব জলবৎ সরল-তরল করে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে ব্রাহ্ম-হিন্দু বিরোধ আর তেমন তিক্ত ছিল না। রইলই না বলা যায়। মেঘে মেঘে আমার বয়সও তে. ঢের হল, আমি ব্রাহ্ম-হিন্দু দ্বন্দ্বের চিহ্নমাত্র প্রত্যক্ষ করিনি। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথও কি করেছিলেন? করলে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজার মুখে কি শুনতে পেতাম, 'যখন চোখের জলে বুক ভেসে যায় ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু পরে: "ওগো সন্ন্যাসী আমাকে বাঁচাও না।"' সেই ছবির দিকে তাকিয়ে শীর্ণা দুঃখিনীর একটি আর্তস্বর বলে ওঠে, 'বল দাও ঠাকুর, মুক্তি দাও'।

আদি ব্রাহ্মসমাজের একদা-সচিব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নীরজার ঘরে রামমোহনের ছবি প্রলম্বিত করাই ছিল স্বাভাবিক। অথবা তিনি বুদ্ধ বা চৈতন্যের চিত্রও তো আনতে পারতেন, আনেননি। আনলেন একটি উদাস বিহ্বল মানুষকে। সেই মানুষ নীরজার চোখে দৈব হল।

তবে কি যে-রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, আর যে-রবীন্দ্রনাথ স্বয়মেব, তাঁরা বস্তুত ভিন্ন দুটি ব্যক্তি? রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে তাঁর কবিতাটিও মনে পড়ে। সেখানে তিনি দেশবিদেশের সকলের সঙ্গে তাঁর প্রণামটিও টেনে এনেছিলেন। হয়তো সিস্টার নিবেদিতা কোনও কালে সেতুবন্ধের কাজটুকু করে থাকবেন। রবীন্দ্রানুরাগী বলে আমার যৎকিঞ্চিৎ খ্যাতি বা অখ্যাতি। তবু এই কথাটাও রেকর্ডে নথিভুক্ত করতে চাই যে, ইংরেজীর জয়ধ্বনি তোলা উনিশ শতকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের তুল্য আর একজনও আবির্ভূত হননি। আর

একজন অদীক্ষিত আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনও আমাকে নিরালায় এই কথা বলেছেন।

ঠাকুর সব-ভোলা হলে হবে কী! কাজ ভাগ করে দিতে ভোলেননি। নিজে বললেন,—আর যা বলা হল না, তাই বলার জন্য তৈরি করে রেখে গেলেন স্বামীজীকে এবং ঘরছাড়া আর কিছু ঈশ্বর-পাগল অনুগামীকে।

এঁরাও প্রেরিত। এঁরাও পুরুষ। বিশেষত স্বামীজী। দৈব অলৌকিক প্রেরণা ছাড়া ঐ বাগ্মিতা, ঐ সাংগঠনিক মেধা ও পরিব্রজ্যার অক্লান্ত পরিশ্রম সম্ভব হত না।

কাউকে কাউকে তিনি আবার গৃহে সংসারেও রাখলেন। লেখার জন্য শ্রীমকে। বিদেশী বাক্যে আছে Ipse Dixit। যার কাছাকাছি ভারতীয় অনুবাদ 'স উবাচ'। সংসারের একটি স্তরে গিরিশচন্দ্রকেও রেখে দিলেন—লোকশিক্ষার জন্যে। নিরক্ষরপ্রায় আর গলরোগে আক্রান্ত হলেই বা কী? তাঁর অপার্থিব জ্ঞান টনটনে। এই জ্ঞান 'সম্ভবামি যুগে যুগে' কথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীমাকেও তো তিনি রেখে গেলেন আমাদেরই জন্য। তাঁকে দিলেন আমাদের মতো অগণিত সন্তান। জগৎ-সংসারের মা—সবার মা। তাঁর সংসারে থাকার কথা নয় তবুও তো আমাদেরই দায় দায়িত্বের সবটাই তাঁকে বহন করতে হয়। মিলটন শেক্সপিয়র সম্বন্ধে যা বলেন, তারই প্রতিধ্বনি করে আমিও মাকে বলি, 'Others abide our question, thou art free.' তাঁকে কোনও বর্ণনায় ধরা যায় না।

জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারের দায়ের অংশও কি মা বহন করেননি? উন্মাদ ভ্রাতৃবধূ। যেন তিনি নিজে বদ্ধ হলেন স্নেহমায়ায়—রাধি।

সেখান থেকেও তাঁকে মন ওঠাতে হল, কারণ তাঁর কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। একবার এলে যেতেও হয়। আসার চেয়ে যাওয়াটাই বেদনার।

কিন্তু তাঁর গ্রহণ? ঠাকুর যা বলেছেন তাই মেনে নিয়েছেন। এই স্বীকৃতি, এই অপ্রশ্ন অঙ্গীকারের তুলনা হয় না। সেখানে দেহ গৌণ, ক্ষীণ। নইলে দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানার ওই ছোট্ট ঘরটাতে তিনি নিজেকে কুলোতেন কী করে? আসলে সব কিছু ছাপিয়ে যেতেন কি না! তাই কত স্ফুট বাই কত স্ফুট এই হিসেবে তাঁকে ধরা যায় না। কিছুতেই কি ধরা যায়? ঠাকুর তবু সাক্ষর। প্রায় নিরক্ষরা মা কোথায় পেয়েছিলেন, 'নাহং, তুঁহু তুঁহু'—এই অশ্রুত ধ্বনি?

ঠাকুরকে একজন অনেক টাকা দিতে চাইলেন। তিনি তো টাকা ছুঁতে পারেন না; মাকে বললেন, 'তুমি নেবে?' আদেশ নয়, অনুরোধ, উপরোধ কিছু নয়, শুধু জিজ্ঞাসা। ওই চিহ্নই মার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিল, 'আমি নিলেও তো তোমার সেবাতেই লাগবে!' নেব না। শেষ কথাটা জিজ্ঞাসা নয়। সোজা কথা। যেন আকাশের নীলের মতো নির্মল আচ্ছাদন।

আর ঔদার্য? কিংবা করুণা? মাঝে মাঝে তাও যেন ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যায়। ঠাকুর যদি বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে থাকেন, মা তবে দিয়েছেন তারও বেশি। পতিতার জন্য ওকালতি—সন্তান-স্নেহ ছাড়া এটা আর কিছু না।

মার মুখেও শুনতে পাই পরমাশ্চর্য দার্শনিক বাণী। অথচ শিক্ষার যা প্রচলিত সংজ্ঞা সেই নিরিখে মা তো প্রায় নিরক্ষরা। অক্ষরে কী কাজ। ঠাকুর যতদিন স্থূল দেহে ছিলেন, মাকে প্রায় কেউ চাক্ষুষ দেখেনি। ঠাকুরের মর্ত্যলীলার অন্তিমপর্বে, মাঝে মাঝে তাঁর দেখা মেলে। আর ঠাকুরের দেহান্তের পর? একদিকে যেমন স্বামীজী, অন্যদিকে তেমনই শ্রীশ্রীমা সারদা। অসুস্থ তিনি, ক্লান্ত তিনি, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে শরৎ মহারাজ বাধা দিয়েছেন। আর সেই খবর

পেয়ে মা যেন খ্রীষ্টের স্বরে বলছেন, 'Sufferers come to me,—forbid them not. For of such is the kingdom of god.' আর শরৎ মহারাজ? তিনি বললেন, 'মা বলেছেন? তাহলে তো আর কথাই নেই!'

এই মা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘরের ব্যাপারে স্বামীজীর আপত্তি শুনে বলেছিলেন, 'নরেন ঠিকই বলেছে। তিনি তো অদ্বৈত।' আবার সেই মা যখন বেলুড়ে দুর্গোৎসবে উৎসাহী হন তখন স্বামীজী বলেন, 'মা বলেছেন? তবে তো আর কথাই নেই!' অর্থাৎ সর্বত্রই তিনি সুপ্রীম কোর্ট,—'ভয়েস সুপ্রীম'।

কিন্তু সর্বোপরি তিনি মা। খুকির গরমে কষ্ট হবে, তাই হাতপাখা বুনছেন! তখনকার বাগবাজারে। খুকি কে?—নিবেদিতা। আজ খুব চমকপ্রদ নাও লাগতে পারে,—কিন্তু সেদিন? শ্বেতাঙ্গিনী, বিদেশিনী। হলেনই বা। তবু তো মেয়ে। যখন অহিন্দুর ছায়া মাড়ানোও পাপ, তখন কলকাতার গলির গলিত ঘামে খুকির কষ্ট হবে ভাবছেন মা! তখন কোথায় সংস্কার, কোথায় গ্রামীণতা, কেবলই স্নেহ, কেবলই মা।

তাঁর সংস্কার ছিল বা না ছিল,—আমার ভাববার দরকার নেই। তিনি যে সকলের মা! আমি প্রসঙ্গত একটা ব্যক্তিগত কথা বলে রাখতে চাই। আমা হেন অধমের উপরে তাঁর নিশ্চিত আঁখিপাত আছে। নতুবা যেভাবে চলি, কবে আমি টুকরো টুকরো হয়ে যেতাম। এ যেন এয়ারপোর্টের চক্ষুষ্মান আলো। যার অপলক নজর। নতুবা উড়নচণ্ডী বিমান যেমন, আমিও তেমনই করে ভেঙেচুরে খানখান হতাম। হইনি যে তার কারণ সেই দৃষ্টিপাত। আর কার? মায়ের।

নিবেদিতার কথা যখন উঠলই তখন বলি, অনেক ভারতীয়র চেয়ে তিনি ঢের বেশি ভারতীয়। লক্ষবত পরিজ্ঞাত সকলের চেয়ে। প্লেগে সেবা, ধর্ম, শিক্ষা এসবতো আছেই। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনাতেও, আবার ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনেও ওই বিদেশিনী-স্বদেশিনী। মনে পড়ে অজন্তা ইত্যাদি! সেইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ আছে ওই সব পুরাকীর্তি মহলে তত নয়, যতটা 'ফুটফলস অব্ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'-তে। দেশোদ্ধারব্রতীদের উৎসাহ দেওয়া, সর্বত্রই নিবেদিতপ্রাণা তিনি। অথচ নিজেকে তিনি বর্ণে বর্ণে বর্ণনা করেছেন 'নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ অ্যাণ্ড বিবেকানন্দ' বলে।

স্বামীজী যদি 'সাইক্লোনিক,' তাহলে নিবেদিতা অন্যের স্নিগ্ধধারা। অথচ অপ্রতিরোধ্য উদ্দাম। আবার একই সঙ্গে নম্রও। শ্রীশ্রীমাকে একদিন ধ্যানমগ্না দেখে তিনিও ধ্যানে বসলেন। বসলেন—তবে পরে জানাচ্ছেন, 'আমি কী বোকা, মা! তোমার ধ্যানেই তো আমার ধ্যান মিলে যেতে পারতো, আমি আলাদা আসনে ভাবে নিমগ্ন হতে চাইলাম কেন? কী স্পর্ধা, দেখ মা!'

ফুল ঢের হল, এবার ফল। পুষ্পাঞ্জলির পরে ফল ফলাবার পালা। ঠাকুর আর মা, আর স্বামীজীর নাম নিয়ে বিশাল আশ্রম, আয়তন, সেবা শিক্ষার মিশন আজও দিগ্বিদিকে। আরও প্রসার চাই। তাঁদের পুণ্যস্মৃতিবাহী সংস্কার মন্দিরগুলো বনস্পতি হয়ে ছেয়ে ফেলুক আমাদের প্রাত্যহিকতার সমস্ত প্রান্ত। তবে যদি প্রকৃত বাঁচার ঠিক ঠিকানা পাই। আজ চারদিকে অট্টরোল, হট্টগোল, বিষাক্ত নিঃশ্বাস—জীবনের ন্যূনতম শর্তগুলোও যেন রুদ্ধকণ্ঠ। তাই আজই 'আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন ঠাকুরের, মায়ের, স্বামীজীর। যুদ্ধ ভয়ে আর্ত, মারণাস্ত্র নির্মাণে ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত এই বিশ্ব। আর্ত, প্রার্থনা—,আমাদের এই ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন ঘরে তোমরা আবার এসো। সাধনায়, যোগে, আমাদের সব সুখে-দুঃখে, ত্যাগে-বিয়োগে। এসো ঈশ্বরে-বিশ্বরে মানবিক ধর্মের প্রচারে—আর মানুষ যাতে "মানুষ" থাকে, আবার মানুষ "মানুষ" হয় সেই কর্মব্রতে।' তাই বলেছি শুধু সুরভিত অঞ্জলির ফুল নয়, এবার চাই ফল। আরও ফল।

রামকৃষ্ণের কথা স্মরণে এলেই আমরা যেন শুধু তাঁর ভাবসমাধির কথাই না ভাবি। রাম আর কৃষ্ণের যুগ্ম বিগ্রহ তিনি। প্রয়োজনে দৃপ্ত, আবার করুণায় উম্মদ পাথার!

অপেক্ষায় আছি। কবি বলেছেন, 'বসে আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী!' আমি বলি—বসে আছি হে, কবে বুঝিব তোমার বাণী। শুধু শুনব না, বুঝবও। আমার দুরাশা এইটুকু মাত্র। শুধু এই।

পথ ও পথিক

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক।
আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

জীবনে একটা কিছু ধরতে না পারলে বড় ফাঁকা, নির্জন, নিঃসঙ্গ। এখন প্রশ্ন হল, কী ধরা? কাকে ধরা? শেখভের 'বোরিং স্টোরি'র সেই নায়ককে মনে পড়ছে। মেডিসিনের বিখ্যাত অধ্যাপক। যৌবনে যখন ক্লাস নিতেন তখন ছাত্ররা উদগ্রীব হয়ে অধ্যাপকের প্রতিটি কথা শুনত। ক্লাসে পিন পড়ার শব্দ শোনা যেত। বক্তৃতার এমনই আকর্ষণ। অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী। একমাত্র সুন্দরী কন্যা। যশ, খ্যাতি, অর্থ, বিত্ত। অভাব নেই কোনও কিছুর। ধীরে ধীরে বয়েস বাড়ল। সংসার সরে গেল দূরে। অধ্যাপনায় জড়তা এল। ছাত্রদের ওপর আর সেই আকর্ষণী ক্ষমতা নেই। অধ্যাপকের জীবনের শেষ হাহাকার, 'আমি কী নিয়ে বাঁচব! কী ধরে বাঁচব! ধরার মতো একটা মজবুত বিশ্বাসও তৈরি করতে পারিনি।'

ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। ধর্মকর্ম! সাবেকী ব্যাপার। নিউক্লিয়ার যুগে অচল। ঠিক আছে, ধার্মিক হবারও প্রয়োজন নেই। যাহা চায় প্রাণ, তাই না হয় করা গেল। তারপর! সকলেই আমরা চলছি। চলার অভ্যাসেই চলা। আমাদের কৃতকর্মের ফসল তুলতে তুলতে সময়ও আসছে পিছু পিছু। গড়ে উঠছে ইতিহাস। শতাব্দীর অধ্যায়ে সব জমা পড়ছে। গৌরব, অগৌরব সবই তোলা থাকছে উত্তরকালের জন্যে। আমাদের হয়তো কোনও প্রশ্ন নেই! প্রয়োজন নেই জানার—যাচ্ছি কোথায়? একবারও ভাবব না, After follows before অথবা which is today, tomorrow will be yesterday; কিন্তু মানব-ধারায় যারা আমাদের পেছনে আসছে তারা যখন দেখবে অনুসরণের ফল হল, ওয়াইল্ডারনেসে মুক্তি, তখন মৃত্যুর পরেও চিত্রপটের গলায়, ফুলের বদলে জুতোর মালা ঝুলবে। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাক, বেঁচে থাকায় মনে হয় সকলেরই বিশ্বাস আছে। তা না হলে মরতে আমরা এত ভয় পাই কেন? বাঁচতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পরিবারের, প্রয়োজন সমাজের, প্রয়োজন সামাজিক শৃঙ্খলার। এ সবই হল জীবনের বাইরের ব্যাপার। এইবার পেট যেমন আহার চায়, দেহ যেমন পুষ্টি চায়, জিভ যেমন স্বাদ চায়, চোখ যেমন সুন্দর দৃশ্য দেখতে চায়, কান যেমন সুর খোঁজে, দেহ যেমন সুখ খোঁজে, মন তেমনি জানতে চায়। মনও আহার খোঁজে। শিক্ষা চাই, সংস্কৃতি চাই। ভোগের জন্যে চাই বিজ্ঞান। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বের বাসনা। এই স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বলেই সভ্যতার জন্ম। ঈশ্বর মন্দিরে নেই। তিনি আছেন আমাদের মনে। তাই সুন্দরের প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ! স্বত-উৎসারিত বাঃ উক্তি।

সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কার সবই মানুষের তৈরি। কিছু বাঁচার প্রয়োজনে, কিছু অন্তরের তাগিদে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কাজলের ঘরে এলে গায়ে একটু কালি লাগবেই। পৃথিবীতে এলে, সে যখন যে সময়েই আসি না কেন, বেঁচে থাকার একটা অভিজ্ঞতা হবেই। আর সেই অভিজ্ঞতা একটা জীবনদর্শন তৈরি করবে। কিছু একান্ত ব্যক্তিগত, পরিবেশ-নির্ভর, কিছু ইউনিভারসাল। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকায় আপামর অভিজ্ঞতা উদ্ভূত। যেমন আদি মানব,

হাজার হাজার বছর আগে, সেই ম্লান আলোর পৃথিবীতে বসে লিখলেন, যা লিখলেন তার ইংরেজী :

Sky and earth are everlasting,
Men must die
Old age is a thing of evil
Charge and die !

হাজার হাজার বছর পরে এই একই কথা, অন্য ভাষায়, অন্যভাবে লিখলেন কবীর, চলতি চাক্‌কি—আকাশ আর মাটি, এই জাঁতার মাঝখানে নিয়ত পেষাই হচ্ছে মানবরূপী শস্যদানা। আর এই পেষাইয়ের ফলেই নির্গত হচ্ছে জীবন-রস। 'যেতে হবে'—এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। যত দার্শনিকতা সবই এই 'যেতে হবে'র চিন্তা থেকে। আদি মানব লিখলেন :

The odor of death,
I discern the odor of death
In the front of my body.

আসামাত্রই মায়ার জালে জড়িয়ে পড়া। জীবনের প্রেমে আচ্ছন্ন হওয়া। জীবন যেমনই হোক, তাকে ভালবেসে নাকানি চোবানি খাওয়া। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মৃত্যু ছায়া ফেলে জীবনের মধ্য পর্বে। প্রথম দিকে নেশা। প্রথম দিকে ঘোর। মৃত্যুই মানুষকে দার্শনিক করে তোলে। জীবনের অসংলগ্নতা, স্বার্থপরতা, নীচতা ধুয়ে বের করে দেয়। জোহার সেই কারণে বলছেন, ধার্মিক কে ? Who are the pious ?

Those who consider each day
as their last on earth.

জীবনের প্রতিটি দিনকে ভাব আজই আমার শেষ দিন। কাল আমি থাকতেও পারি নাও পারি। আধুনিক মানুষ ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে বড় বিব্রত বোধ করেন। বিজ্ঞানী তাঁরা। ধর্ম না কী কুসংস্কার। বেশ তাই হোক। পরমেশ্বরকে না মানি, মৃত্যুকে তো মানতেই হয়। অহরহ চারপাশে ঘটছে। এই ছিল এই নেই। এত বড় সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। অরণ্যচারী মানুষ, বিজ্ঞান যাদের জীবনে আলো ফেলেনি, তারা মৃত্যুকে বললে, the Great River Man Death। বললে,

I feel no fear
When the Great River Man
Death speaks of.

কতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান। নিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীন একটি মাওরি কবিতায় কবি লিখছেন,

The tide of life glides swiftly past
And mingles all in one great
eddying foam.

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুন অবাক হয়ে দেখছেন :

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥

কবি নবীনচন্দ্রের অনুবাদ :

যথা নদীদের বহু অম্বুবেগ
সিন্ধু-অভিমুখী, প্রবেশে সাগরে,
তথা এই নরলোক বীরগণ
পশিছে জ্বলন্ত বদন নিকরে॥

পতঙ্গের মতো জীবন মৃত্যুর আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥

যেমতি প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গ
পশে দ্রুতবেগে মরিবার তরে,

পশিছে নাশার্থ তথা প্রাণিগণ
ক্রতবেগে তব বদন-বিবরে ॥

সভ্যতার উন্মেষকালের কবি লিখলেন :

Water does not refuse to dissolve
Even a large Crystal of Salt.

জীবনের দানা যত বড়ই হোক মৃত্যু-সাগরে লীন তাকে হতেই হবে। আর এই মৃত্যুই হল মানুষের শুভ কর্মপ্রেরণা। Each day the last day. যার আর পর নেই। যা করার আজই সারো। সব গোছগাছ কর। ভেতর সাফা করে ফেল। অহং ছেঁটে ফেল। In-action থেকে action-এ এস। অর্জুনের মতো গাণ্ডীব তুলে নাও হাতে,

আমি বৃদ্ধ কাল লোক-সংহারক,
লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত এখন।
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

অতএব উঠ! লভ তুমি যশ!

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

ভোগী, যোগী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ত্যাগী, আত্মসাৎকারী সকলেই ছুটছেন মৃত্যুর খোঁচায়। ওরে ছাদটা ঢালাই করে ফেল, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর, মামলার দিনটা ফেলুন। সেরে ফেল, সেরে ফেল।

Not twice this day
Inch time foot gem
This day will not come again
Each minute is worth a priceless gem.

যে দিন গেল, সে দিন আর ফিরবে না। সময়ের ইঞ্চি, ফুট, রত্ন বিশেষ। দিন যায় আর আসে না। প্রতিটি মিনিট এক একটি মূল্যবান রত্ন।

এ সবই তো মানুষের ভাবনা। মানুষেরই লেখনী-নিঃসৃত ভাব, ভাবনারাজি। কে ভাবছে? ভাবাচ্ছেই বা কে? ধ্বংসের শক্তি তো কম নয়, তাহলে গড়ে উঠছে কী করে! দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী নতুন হল কার হাতে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই সুন্দর গল্প—সাধু গিয়েছিলেন ভিক্ষা চাইতে। জমিদারের পেয়াদা পিটিয়ে অজ্ঞান করে পথে ফেলে দিলে। খবর পেয়ে অন্যান্য সাধুরা ছুটে এলেন। মুখে জলটল দেবার পর চেতনা এল। তখন সাধুরা জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমায় মেরেছে! প্রহৃত সন্ন্যাসীর উত্তর—যিনি এখন আমাকে জল দিচ্ছেন, সেবা করছেন, তিনিই আমাকে একটু আগে প্রহার করেছেন।

সেই ইজরায়েলী সন্ন্যাসীর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা স্মরণে আসছে। পর্যটনের পথে সেই রব্বি দেখলেন, এক বৃদ্ধ পথের পাশে একটি ক্যারব গাছের চারা রোপণ করছেন। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন, 'কত বছর পরে ফল দেবে?'

বৃদ্ধ বললেন, 'সত্তর বছর পরে।'

'সত্তর বছর? এত মেহনত করে গাছ পুঁতছেন, ফল খাবার জন্যে সত্তর বছর বাঁচবেন আপনি?' বৃদ্ধ বললেন, 'পৃথিবীতে আমি যখন প্রবেশ করলুম, কই পৃথিবীকে আমি শূন্য দেখিনি তো। আমার পিতা আমার জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। ফুল, ফল, বৃক্ষ। আমিও তাই করে রেখে যাচ্ছি। যারা আসছে আমার পেছনে তারা এর ফল ভোগ করবে।'

ঈশ্বরকে মানার প্রয়োজন নেই। ধর্ম বাতিল। নীতি—খাও, দাও আর ফুর্তি কর। কিন্তু কোথায়? এই পৃথিবীতেই নিশ্চয়। তাহলে বাসোপযোগী পৃথিবীর প্রয়োজন আছে। তাহলে অথর্ববেদের ঋষি কী খারাপ বলেছিলেন! অন্যায় কী বলেছিলেন?

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ

সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ। তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহং যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥

পৃথিবী শান্তি, অন্তরিক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জলসমূহ শান্তি, ওষধিসমূহ শান্তি, বনস্পতিগণ শান্তি, বিশ্বদেবগণ শান্তি, সমস্ত দেবতারা শান্তি, শান্তি, শান্তি। সেই সব শান্তি দ্বারা যা এখানে ঘোর, যা এখানে ক্রূর, যা এখানে পাপ তা আমরা শান্ত করি; তা শান্ত হোক, তা কল্যাণময় হোক, সমস্তই আমাদের শুভ হোক।

কে চায় অশান্তি, অরাজকতা, নীতিহীনতা! কে চায় পরিবার, সমাজ, দেশ খুলে খুলে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাক? প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক কে চায়! আমরা ভালবাসার পৃথিবীতে বাঁচতে চাই। যতই আমরা স্বার্থপর হই না কেন, পরিবারের বাইরে, সমাজ থেকে দূরে আমরা বাঁচতে পারব না। তা যদি পারা যেত তাহলে আমরা সকলেই সন্ন্যাসী হয়ে যেতুম। সেই অরণ্যের কাল থেকেই যূথবদ্ধ হবার চেতনা আমাদের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। সভ্যতার উন্মেষকালে আমাদের অরণ্যচারী পূর্বপুরুষগণ মানুষের শ্রেষ্ঠ আচরণবিধির যে নির্দেশ রেখে গেছে, তা আমরা ফেলে দিতে পারি। তবে দুঃখের সঙ্গে ফেলতে হবে। এই জেনে ফেলতে হবে, আমরা পথ ভুলেছি। কী ছিল সেই নির্দেশ:

১। সব সময় ভাল হওয়াই ভাল।

২। প্রেম ছাড়া জীবনে আর কী আছে?

৩। প্রাণ-সংহারে কী লাভ?

৪। অন্যের সাহায্যে আসার চেষ্টা কর

রব্বি জেরেমিয়া এই একই কথা বলেছিলেন দীর্ঘকাল পরে, আজ থেকে দীর্ঘকাল আগে:

সম্প্রদায়ের বিপদকালে কখনও বল না, 'আমি বাড়ি চললুম, খাই দাই, আমার আত্মা, তুমি শান্তিতে থাকো।' মানুষের ধর্ম হল অন্যের বিপদে সামিল হওয়া, যেমন মোজেস হতেন। বিপদে যে অংশ নিতে জানে, সে নিজের শান্তি সহজে খুঁজে পায়। সে-ই প্রকৃত মানব।

৫। নিজের স্ত্রীকে গালাগাল দিও না। দুর্ব্যবহার করো না। নারী জাতি বড় পবিত্র। স্বামীজী কী বলেছিলেন! চণ্ডী কী বলছেন, স্ত্রীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।

৬। সৎ কাজের প্রতিদান অন্যের ভালবাসা।

৭। শিশুদের প্রতি অন্যায় আচরণ করো না।

৮। জুয়া খেল না।

৯। অসহায় বৃদ্ধের সাহায্যে এগিয়ে এস।

১০। গৃহে অতিথির আগমন হলে সাধ্যানুযায়ী সৎকার করো। যে খাদ্য তাকে দিলে না, সেই খাদ্য গ্রহণে তোমার মৃত্যু হতে পারে।

১১। নিজের কাজের ফিরিস্তি দেবার সময় সাবধান। যা করনি তা করেছ বলে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করো না। অসত্যভাষণ তোমার মৃত্যুকে কাছে এগিয়ে আনতে পারে। সত্যই হল ধর্ম। সত্যই জীবন। যা করেছ তার চেয়ে কম বলাই ভাল। প্রবীণরা বলেন, সেই আচরণই প্রমাণ করবে, তুমি জ্ঞানী।

১২। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখো। তাহলে প্রেমের দুনিয়ায় বসবাস করতে পারবে।

১৩। বিবাহবন্ধনে একজনের সঙ্গেই আবদ্ধ হবে।

১৪। স্বামীকে মেজাজ দেখিও না। ভাল ব্যবহারের প্রতিদান ভাল ব্যবহার।

১৫ ভালবাসি, ভালবাসি, মুখে বললেই

সন্তানদের ভালবাসা হল না। আচরণে প্রকাশ কর।

১৬। লোকদেখানো ভালবাসায় ভালবাসা নেই। অন্তরে তা প্রকাশ কর।

১৭। জীবনের পথে চলতে চলতে সহযাত্রীদের সুখী করার চেষ্টা করো। কোন মহিলা-কে নির্জনে একা পেয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না। কোনও ক্ষতি করো না।

১৮। তোমার [মহিলা] উপস্থিতিতে পরিবারের কেউ অন্যের কাছে কিছু চাইলে, মনে করবে তোমার কাছেই চাইছেন। কিছু করার থাকলে বলার আগেই করে ফেল। বলার অপেক্ষায় থেক না।

অরণ্যের যুগ থেকে চড়া সভ্যতায় এসে আমরা সব শিখলুম, ভুলে গেলুম একটি জিনিস, একটি বিদ্যা চলে গেল আয়ত্তের বাইরে, সেটি হল বেঁচে থাকার সুস্থ কৌশল। বাঁচাটাই আমরা ভুলে গেলুম। সোশ্যালিজম, মার্কসিজম, ক্যাপিট্যালিজম, ইজমের ছড়াছড়ি, অথচ সুখী মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমছে। সংসার ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে। সুইট হোম নামেই। ভেতরে ধিকি ধিকি আগুন। বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিশু-অপরাধ-প্রবণতা, আত্মহত্যা, হত্যা, উন্মাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ মানুষই অস্বাভাবিক। নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক, লোভী। নড়বড়ে রাষ্ট্রযন্ত্র। একদিকে প্রবল ভোগের দুনিয়া, আর একদিকে সীমাহীন দুর্ভোগ। মাঝে মিথ্যা আশ্বাসের সমুদ্র। সেতু নেই। কথা আছে, কাজ নেই। ব্যস্ত দিন, ভয়াবহ রাত। ধ্বংসের ইঙ্গিত।

মহাভারতকার বলে গেছেন :

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
পুনঃ সংক্ষিপ্যতে সর্বং জগৎপ্রাপ্তে যুগক্ষয়ে ॥

প্রলয়কালে স্থাবর জঙ্গম সবই আবার লয় পাবে। যেমন ঋতু। আসার আগে জানান দেয়। সেই রকম যুগারম্ভও টের পাওয়া যায়। যুগশেষেরও লক্ষণ ফোটে।

যথর্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবাযুগাদিষু॥

আমরাও হয়তো যুগ-সন্ধিতে এসে পড়েছি। লক্ষণসমূহ বড় স্পষ্ট। সমস্ত বস্তু তার স্বধর্ম হারিয়ে ফেলেছে। বিভ্রান্তি বিস্রস্তি আমাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। সুখের চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলেছি। সবই আছে, নেই সুখ। দেহকে সুখে জরজর করে রাখলেও মন যদি সুখী না হয় তাহলে সুখ মায়ামৃগ হয়েই থাকে। ধম্মপদে গৌতম বুদ্ধ বলছেন, আজ আমরা যা, তা হয়েছে পূর্বের চিন্তা থেকে। What we are today comes from our thoughts of yesterday. আজকের চিন্তা তৈরি করবে আগামীকালের জীবন। মনই তৈরি করে জীবন। Our life is the creation of our mind.

আজকের মন দেখলে আগামীকালের জীবনের চেহারা কী দাঁড়াবে বোঝা যায়। আশঙ্কা হয়। এক 'যেন'-শিক্ষক বলেছিলেন, 'আমার বুকের কাছটা আগুনের মতো জলছে ; কিন্তু আমার চোখ দুটো শীতল, পোড়া ছাইয়ের মতো।' আধুনিক মানুষের জন্যে তিনি কিছু নির্দেশ রেখে গেছেন। আমরা পালন করে দেখতে পারি। হৃদয়ের জ্বালা জুড়োয় কী না! মৃত চোখে জীবনের জ্যোতি ফিরে আসে কী না।

॥ নির্দেশ ॥

প্রাতে একটি ধূপ জেলে সামান্য ধ্যান।

বিশ্রাম প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে।

নির্দিষ্ট সময়ে বারে বারে অল্প অল্প খাদ্য গ্রহণ।

গুরু আহার বর্জনীয়।

নিজের তৈরি নির্জনতায় বসবাস। মনে,

বনে, কোণে। সঙ্গেও নিঃসঙ্গ।

যা বলছি তার দিকে লক্ষ্য রাখা। যা বলছি তা পালন করা।

সুযোগ হাতছাড়া না করা। অথচ কিছু করার আগে দুবার চিন্তা করা।

অতীতের জন্যে অনুশোচনা নয়। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা।

বীরের মতো নির্ভীক অথচ শিশুর মতো প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

বিশ্রামের সময় এমন নিদ্রা, মনে হবে এই আমার শেষ নিদ্রা।

শয্যা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ। আর ফিরেও তাকাবে না, ছিন্ন পাদুকার মতো পরিত্যাগ।

একাল আমাদের সবই শেখাবে। ধন-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, শেখাবে না জীবন-বিজ্ঞান। সদ্গুরুর আশ্রয় ছাড়া এ শিক্ষা আসবে কোথা থেকে:

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও উইলিয়ামস্

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

প্রবীণ লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক।

ঈশ্বরপথের পথিকমাত্রই অনন্তভাবময় রামকৃষ্ণদেবের একান্ত আপনার জন। জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব ভক্ত—সকলেই। নিরাকার ব্রহ্মের সাধক, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টভক্ত—এঁরাও। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হল: 'সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; ...ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা টান থাকলেই হল ('কথামৃত', ৫।২।১)।' সাধকের অধিকার অনুযায়ী তিনি উপদেশ দিতেন, একথা ঠিক। কিন্তু নিজস্ব ভাব এবং বিশ্বাস কাউকে তিনি ত্যাগ করতে কদাচ বলতেন না, বরং সেই ভাবের সাধনায় যাতে সাধকের সিদ্ধি বা পরম উপলব্ধি হয়, সেই দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি গুরুত্ব দিতেন স্বধর্মে নিষ্ঠার উপর। সেই সঙ্গে সাধককে অপর ধর্মমত বা পথের ভুলত্রুটি দেখতে নিষেধ করতেন। বলতেন, ডগ্‌মাটিজ্‌ম্ বা মতুয়ার বুদ্ধি পরিহার করতে। ভগবান কী হতে পারেন আর কী হতে পারেন না, মানুষের সামান্য বুদ্ধিতে তা ধরা যায় না—এই ছিল তাঁর কথা। তিনি আরও বলতেন যে, বাক্যমনের অতীত যিনি, তাঁর স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে আগে তাঁকে দর্শন করতে হবে; ঈশ্বরদর্শন হলে তিনিই ভক্তকে জানিয়ে দেবেন তাঁর স্বরূপ। তাই সাধকের কাজ স্বধর্মে, আপন ভাব ও বিশ্বাসে স্থিত থেকে—অন্য ধর্মের অসম্পূর্ণতা অথবা ভ্রান্তি দেখার মানসিকতা পরিহার করে—ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকা বা তপস্যায় নিমগ্ন হওয়া।

সতত-ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রজ্ঞার আলোকশিখা থেকে ভক্তরা তাঁদের নিজের নিজের জ্ঞানদীপ জ্বালিয়ে নিয়েছেন। দীপ জ্বালানোর প্রক্রিয়াটি তিনিই দিয়েছেন সহজ করে। তাঁর উদার, সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী নানা মত ও পথের সাধককে আকৃষ্ট করেছে তাঁর প্রতি। শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ নিয়ে তাঁরা মানবজীবনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছেন। যাঁরা শরণ নিতে পেরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁরা দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তাঁরা দেখেছেন আপন আপন ইষ্টকে। মথুরবাবুর

দৃষ্টিপথে তিনি শিবকালীরূপে প্রকাশ পেয়েছেন, গৌরী-মার চোখে তিনি ছিলেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। কেশববাবু নববিধানের ভাবরূপে দেখেছেন তাঁকে, শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ চৈতন্যরূপে, শিখভক্তরা তাঁর মধ্যে দেখেছেন তাঁদের আরাধ্যকে। একাধিক খ্রীষ্টভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে পরম আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন। এই শেষোক্তদের অন্যতম সাধক উইলিয়ামস্ বা উইলিয়াম—শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যিনি দেখেন তাঁর ইষ্ট খ্রীষ্টকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও এই খ্রীষ্টভক্তের সম্পর্কের কাহিনীটির পুনর্নির্মাণ ও সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই সাধকের পূর্ণাঙ্গ অথবা সংক্ষিপ্ত কোনও জীবনচরিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। সম্ভবত নেই। কোনও দিন তা রচিত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখি না। জীবৎকালে তিনি ছিলেন, বলা যায়, লোকলোচনের অন্তরালে। সতত একাকী স্থিত, যতচিত্তাত্মা—তিনি তাঁর মানব-জীবন সার্থক করেছেন। সেই সার্থকতার সম্পূর্ণ কাহিনীটি আমরা পেলাম না, পাঠক হিসাবে আমাদের দুঃখ সেইখানেই। যাই হোক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে তাঁর সম্পর্কে কিছু সংবাদ আছে। আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাই নিয়েই। সেই তথ্য পরিমাণে যথেষ্ট না হলেও তার মূল্য এবং তাৎপর্য অপরিসীম।

উইলিয়ামস্ বা উইলিয়াম সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদের প্রধান উৎস 'মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতা-বলী' গ্রন্থ। এছাড়া কিছু সংবাদ দিয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য়, সত্যচরণ মিত্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থে, দুর্গাপুরী দেবী 'গৌরীমা'র জীবনচরিতে। স্বামী সারদানন্দ-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই খ্রীষ্ট সাধকের একটি বিশেষ উল্লেখ আছে—যেখানে তিনি জানিয়েছেন উক্ত সাধক কী-দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতেন। অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তেও একটি বিবরণ আছে—মনে হয়, সেটি রামচন্দ্রের একটি বক্তৃতায় পরিবেশিত সংবাদেরই কাব্যরূপ।

স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ উভয়েই এই খ্রীষ্ট সাধকের নাম উইলিয়মস্ বা উইলিয়ামস্ (Williams) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কথামৃতের প্রথমভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত যে-জীবনচরিত আছে সেখানে শ্রী-ম খ্রীষ্টভক্তটির উল্লেখে ওই নামই (উইলিয়ামস্) ব্যবহার করেছেন। রামচন্দ্র দত্ত, সত্যচরণ মিত্র এবং দুর্গা-পুরী দেবী নামটি লিখেছেন যথাক্রমে উইলিয়ম, উইলিএম এবং উইলিয়াম (William)। উইলিয়ামস্ (Williams) ও উইলিয়াম (William)—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি তাঁর প্রকৃত নাম আজ তা নিরূপণ করা কঠিন। তা ছাড়া শুধু উইলিয়ামস্ বা উইলিয়াম একটি সম্পূর্ণ নাম হওয়া সম্ভব নয়, আগে বা পরে আরও একটি অভিধা বা পদবী দরকার মনে হয়। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নামটির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। যাই হোক আমাদের সুবিধার জন্য অতঃপর এখানেই খ্রীষ্ট-ভক্তকে উইলিয়ামস্ রূপে উল্লেখ করা হবে।

উইলিয়ামসের জাতিপরিচয় কী? সত্যচরণ মিত্র তাঁকে 'ইংরাজ' বলেছেন, দুর্গাপুরী দেবীও বলেছেন 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহেব ভক্ত'। মনে রাখা দরকার, উইলিয়ামসের সঙ্গে এঁদের কারও চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি। বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে সারদানন্দজী তাঁকে শুধু 'খৃষ্টান-ধর্মাবলম্বী' রূপে অভিহিত করেছেন, আলাদা করে তাঁর জাতিপরিচয় দেননি। স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। 'স্মৃতিকথা'য় তিনি উইলিয়ামস্‌কে কেবলমাত্র খ্রীষ্টভক্ত বলেছেন, তবে আর একজায়গায় বলেছেন

'ভারতবর্ষীয় খৃষ্টোপাসক' (দ্রঃ 'স্বামী ত্রিগুণাতীত' প্রবন্ধ, উদ্বোধন, ৩৫।৯)। এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য অখণ্ডানন্দজীর দ্বিতীয় বর্ণনা সমর্থন করে। রামচন্দ্রের সাক্ষ্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য; তিনি একাধিকবার উইলিয়ামসকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপও করেছেন। তিনি মোটামুটি স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন উইলিয়ামসের—জানিয়েছেন উইলিয়ামস্ ছিলেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী, দুই পুরুষে প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ সম্ভূত খ্রীষ্টান, অর্থাৎ দেশীয় খ্রীষ্টান ('মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী', ২।১৬)।

এখন প্রশ্ন: শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের মিলনের সূত্র কী? এই প্রশ্নের বিচারে প্রথমেই লক্ষণীয় এই যে, রামচন্দ্র দত্তের বিবরণ অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল কেদারবাবুর সাহচর্যে—অর্থাৎ কেদারবাবু তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত করেন ('বক্তৃতাবলী', প্রাগুক্ত)। এই কেদারবাবু হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্রাহ্মভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। উইলিয়ামস্ ছিলেন কেদারবাবুর বন্ধু। 'বন্ধু' শব্দটি রামচন্দ্র স্পষ্ট না বলে থাকলেও তাঁর বর্ণনা থেকে সেটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দুর্গাপুরী দেবীর বিবরণে আছে 'ঠাকুরের ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিত মিষ্টার উইলিয়াম···' (গৌরীমা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৩)। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'স্বামী প্রেমানন্দের কথোপকথন' অধ্যায়ে দেখি, কলকাতায় আসার আগে কেদারবাবু লাহোরে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন (প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৫)। এই কয়েকটি তথ্য মিলিয়ে দেখলে সিদ্ধান্ত করা যায়, উইলিয়ামস্ ছিলেন লাহোরের অধিবাসী এবং সেখানেই কেদারবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় তথা বন্ধুত্ব হয়। উভয়ে ছিলেন ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল—এইখানেই তাঁদের বন্ধুত্বের ভূমিটি অনুমান করে নেওয়া যায়। প্রেমানন্দজীর কথোপকথনে দেখি, ভগবানলাভের জন্য ব্যাকুল কেদারবাবু লাহোরে থাকতে বুঝেছেন, 'এদেশে কিছু হবে না, বাঙলা দেশে যাই।' অতঃপর তিনি সুযোগমতো কলকাতার পথে যাত্রা করেন। ট্রেনে আসবার পথেই বালী স্টেশনে তিনি নেমে পড়েন এবং সোজা চলে যান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রাগুক্ত)। এমন হতে পারে, লাহোরে থাকতেই কেদারবাবু 'ইনডিয়ান মিরর' আদি পত্রিকার মাধ্যমে এবং/অথবা অন্যান্য সূত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছিলেন এবং তাঁকে দর্শনের জন্য বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রধানত সেই কারণেই হয়তো ব্যস্ত হয়েছিলেন কলকাতায় আসার জন্য। এই পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে উইলিয়ামসের সঙ্গে তাঁর কিছু আলোচনাও হয়ে থাকা সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেদারনাথ উপস্থিত হয়েছেন সম্ভবত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে—অর্থাৎ সেই সময়ে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর চিহ্নিত ভক্তবৃন্দ একে একে আসতে আরম্ভ করেছেন। লাহোর থেকে কেদারবাবুর কলকাতা-যাত্রায় উইলিয়ামস্ কি তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন? প্রেমানন্দজীর উল্লিখিত স্মৃতিচারণ পড়লে মনে হয়, কেদারবাবু একাই এসেছিলেন। উইলিয়ামস্, অতএব, এসেছেন পরে। রামচন্দ্র দত্ত বলেছেন, 'উইলিয়ম প্রভুর নাম শুনিয়া কলিকাতায় আসেন ('বক্তৃতাবলী', প্রাগুক্ত)।' কেদারবাবু কলকাতায় আসার পর উইলিয়ামসের সঙ্গে তাঁর পত্রযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভে ধন্য, কেদারনাথ চিঠিতে উইলিয়ামসকে জানিয়ে থাকতে পারেন আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর সেই পরম লাভের কথা, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশদ পরিচয়ও দিয়ে থাকতে

পায়েন। এইখানেই প্রভুর নামশ্রবণের রহস্যটি খুঁজে নেওয়া যায়। মনে হয়, কেদারবাবুর পরামর্শে অথবা তাঁর পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্চর্য ঈশ্বর-একাত্মতা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা জেনে উইলিয়ামস্ অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসেন এবং বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন। কেদারবাবু প্রকৃত বন্ধুর কাজ করলেন উইলিয়ামস্‌কে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমীপে এনে দিয়ে।

শুদ্ধচিত্ত ভক্তকে ভগবান কাছে টেনে নেন যেমন করে চুম্বক আকর্ষণ করে মালিন্যমুক্ত লৌহ-খণ্ডকে। এই উপমা শ্রীশ্রীঠাকুরই দিয়েছেন। অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণও এমন করেই কাছে টেনে নিতেন শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরানুরাগীদের। উইলিয়ামস্ তারই একটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত। তবু ব্যবহারিক দিক দিয়ে যোগাযোগ কাউকে ঘটিয়ে দিতে হয়। এক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনীয় কাজটি করেছিলেন কেদারনাথ।

এখন প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্তের মুখ থেকে শোনা যাক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে খ্রীষ্টভক্তটির প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী ('বক্তৃতাবলী', প্রাগুক্ত):

'[কলিকাতায় আসিয়া উইলিয়ম] ভাল দিন দেখিয়া প্রভুকে দর্শন করিবেন এবং গুড ফ্রাইডে নিকটবর্তী ভাবিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। গুড ফ্রাইডের দিনে বেলা দুই প্রহরের সময় একজন স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত ব্যক্তিকে কেদারবাবুর সহিত আসিতে দেখিয়া আমরা উইলিয়ম বলিয়া বুঝিলাম এবং অতি দ্রুত-পদে প্রভুকে যাইয়া জ্ঞাপন করিলাম। প্রভু উইলিয়মের নাম শ্রবণমাত্রে বৎসহারা গাভীর ন্যায় উইলিয়মের নিকটই ছুটিয়া আসিলেন। উইলিয়ম নগ্নপদে মস্তকাবনত করিয়া বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভু নিকটে আসিবামাত্র অমনি চরণচুম্বনপূর্ব্বক নয়নবারির দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া দিলেন। সেদিনের কাহিনী কি বলিব! ...ভাবরাজ্যের অমিয় প্রেমের খেলায় কি অদ্ভুত রহস্য তাহাও দর্শন করিলাম। প্রভু আমার উইলিয়মকে লইয়া ভাবে বিভোর এবং তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক আপন গৃহে লইয়া যাইয়া সম্মুখে উপবেশন করাইলেন। উইলিয়ম কোন কথা কহিলেন না। কেবল কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে দুই দিন আসিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর উইলিয়ম প্রভুকেই খৃষ্টরূপে দর্শন করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্যপ্রদেশের নিভৃত গিরি-গুহাবাসী হইয়া যাইলেন।'

উক্ত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, উইলিয়ামসের নাম শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রীষ্টভক্তটির প্রতি স্নেহ-প্রেমের আতিশয্যে স্থির থাকতে পারছেন না। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র উইলিয়ামস্ মুগ্ধ—অভিভূত তাঁর প্রেমস্নিগ্ধ আচরণে। শ্রীশ্রীঠাকুর চিনেছেন ভক্তকে; আর যিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেবেন, উন্নীত করে দেবেন তাঁকে ইষ্টলাভের পথে সেই প্রভুকেও চিনে নিয়েছেন উইলিয়ামস্। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি উইলিয়ামস্ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর আরাধ্য খ্রীষ্টকে দর্শন করেছিলেন? অনুরূপ একটি অনুভূতি তাঁর হয়ে থাকা বিচিত্র নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণচুম্বনের যে-ঘটনাটি রামচন্দ্র দত্তের অপরূপ বর্ণনায় ছবির মতো ফুটে উঠেছে, সেটি, বোঝাই যায়, উইলিয়ামসের দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্ত। অন্তরের অনুভূতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী বামদেবানন্দের একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য ('স্বামী ত্রিগুণাতীত', উদ্বোধন, ৩৫।৯)। উইলিয়ামস্ প্রথম সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে কী-চোখে দেখেছিলেন সে-বিষয়ে প্রবন্ধটি আলোকপাত করেছে। স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী অখণ্ডানন্দের আজমীরে অব-স্থানকালে (সম্ভবত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে)

উভয়ের সঙ্গে কীভাবে উইলিয়ামসের দেখা হয় সেই প্রসঙ্গের পর লেখক অখণ্ডানন্দজীর একটি বিবৃতি উদ্ধার করেছেন। সেখানে আছে: 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবামাত্র তিনি [উইলিয়ামস্] যিশুখৃষ্টের ভাবে বিহ্বল হন এবং তাঁহাতে খৃষ্টের সত্তা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হন। ঠাকুরও তাঁহাকে ভালবাসিয়া নিজের কাছে বসান।'

প্রথম সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-উইলিয়ামসের মধ্যে যে-আত্মীয়তাবোধ প্রকাশ পেয়েছে সেটি সামান্য পার্থিব ঘটনা নয়, অধ্যাত্মজগতের বা ভাবরাজ্যের বস্তু। এক্ষেত্রে পরস্পরের প্রেমে ভাষার ব্যবধান কোনও বাধা হয় না, আবার সেই প্রেমের প্রকৃষ্ট প্রকাশও ভাষার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখি প্রভু এবং ভক্ত উভয়েই অনেকক্ষণ নির্বাক! বদ্ধাঞ্জলি ভক্ত উইলিয়ামস্ শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন—যেন শরণাগতির একটি মূর্তি। পরে তাঁদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছে—সম্ভবত হিন্দী ভাষায় (শ্রীশ্রীঠাকুর কথ্য হিন্দী ভালই জানতেন এবং পাঞ্জাব প্রদেশের উইলিয়ামস্ যে বাংলা জানতেন না সেটুকু সহজেই ধরে নেওয়া যায়)।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে উভয়ের ভাববিনিময়ের একটি অপূর্ব আলেখ্য উপহার দিয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য়। ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের কয়েক বছর পরে (সম্ভবত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) অখণ্ডানন্দজী তাঁর পরিব্রাজক-জীবনে উইলিয়ামসের মুখ থেকে শুনেছিলেন আজমীরে। সাধক উইলিয়ামস্‌ও তখন হয়তো পরিব্রাজকরূপেই সেখানে অবস্থান করছিলেন। যাই হোক, উইলিয়ামস্-বর্ণিত ঘটনাটি অখণ্ডানন্দজী উক্ত ভক্তের জবানিতে প্রকাশ করেছেন এইভাবে (১৩৪৩, পৃ: ৬৫-৬৬):

'আমি যেদিন ঠাকুরকে প্রথম দেখতে যাই, ঠাকুর বসবার জন্ত আমাকে একখানি মাদুর পেতে দিলেন এবং নিজে আর একখানি মাদুর পাতিয়ে বসে বললেন, "দেখ, এক আঙুল ফাঁক রাখলুম (দুইখানি মাদুরের মধ্যে)।" আমি বললাম, "উভয়ের মাদুরে এক আঙুল ফাঁক রহিল বটে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে সে ব্যবধান রহিল না।"'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমের এক সূত্রে তাঁরা বাঁধা। শুধু তা-ই নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁরা এক—বহির্জগতের কোনও নিয়ম বা অনুশাসন সেখানে বিভেদ রচনা করতে পারে না। এই পরম তত্ত্বেরই উচ্চারণ উইলিয়ামসের সংলাপে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি প্রথম দিনেই পেয়েছেন প্রভুরূপে, প্রিয়রূপে, পরমধনরূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণে রামচন্দ্র বলেছেন: 'প্রভু তাঁহাকে দুইদিন আসিবার আজ্ঞা করিলেন।' একই বিষয়ে আর একটি বক্তৃতায় তিনি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন: 'উইলিয়মকে রামকৃষ্ণদেব··· কহিলেন যে অত চিন্তিত হইতেছ কেন? আর দুই দিন আসিলে তোমার মনোসাধ পূর্ণ হইবে ('বক্তৃতাবলী', ২।১২, পৃ: ১৩১)।' অর্থাৎ প্রথম দিন ছাড়া আরও দুইদিন তাঁকে আসতে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অতএব উইলিয়ামস্ অন্তত তিনদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, এটি অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর পক্ষে আরও অধিক বার এসে থাকাও সম্ভব।

সত্যচরণ মিত্র তাঁর গ্রন্থে উইলিয়ামস্ প্রসঙ্গে যে-সংবাদ পরিবেশন করেছেন সেটি মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত। তাঁর বিবরণে আছে:

'উইলিএম···রামকৃষ্ণকে সেলাম করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের যীশু কত অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন; আপনি কিছু অলৌকিক

দেখাইতে পারেন? তাহাতে রামকৃষ্ণ একটু হাসিয়া কহিলেন "সে কথা পরে যা হয় হবে—তুমি একবার দূর হতে আমার কালীমাকে দেখে এস।" উইলিএম কালীবাড়ির বাহিরে জুতা রাখিয়া যেই কালীমন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন অমনি কালীমূর্ত্তিস্থলে যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র সাহেব এক আশ্চর্য্যরসপূর্ণ ভক্তি-ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। তারপর কালীকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাছে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণ আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেমন? তোর যীশুখ্রীষ্ট যে, আমার কালীও সে দেখলি তো?" ইংরাজ যুবা তখন রামকৃষ্ণের দুই পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন! প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন।" রামকৃষ্ণ ইহাকে কোন "নাম" সাধন করিতে দিলেন। এই ইংরাজ যুবা এখন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনে পার্ব্বতীয় প্রদেশে রামকৃষ্ণের উপদেশানুসারে সাধন করিতেছেন, ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', ১৩০৪, পৃঃ ১৪৬)।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—যিনি কোনও ভক্তের ভাবে আঘাত করতেন না, প্রথম সাক্ষাতেই যিনি সম্ভবত উইলিয়ামসের মনোজগতে খ্রীষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, ধর্মনির্বিশেষে ভক্তজনের আশ্রয় সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেন মূর্তিপূজা-বিরোধী ভক্তকে কালীমন্দিরে পাঠালেন? উপরে বর্ণিত অংশে আমরা লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টভক্তটি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই আদেশ মেনেও নিয়েছিলেন। হয়তো তাঁরই প্রভাবে। এইখানে আমাদের স্মরণ করতে হবে—যে-কথা আগেই বলেছি—শ্রীরামকৃষ্ণ সাধককে তাঁর স্বধর্মে যেমন স্থিত থাকতে বলতেন তেমনই তাঁকে নিষেধ করতেন মতুয়ার বুদ্ধি আঁকড়ে থাকতে। অন্যের ধর্ম-বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ এমন ধারণা পোষণ করতে তিনি সকলকেই বারণ করতেন। এই বিষয়টির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপরিমণ্ডলের অন্তর্ভূত হওয়ার পূর্বে তথা তাঁর সংস্পর্শে আসার আগে উইলিয়ামস্ ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টান। হিন্দু দেবদেবীকে তিনি তখন ঘৃণার চোখে দেখতেন। এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র উইলিয়ামসের একটি স্বীকারোক্তিও প্রকাশ করেছেন। সেখানে উইলিয়ামস্ বলছেন: 'এখন সময় সময় মনে হয় যে কত কুকর্ম্মই করিয়াছি। কি করিব আমাদের শিক্ষাই ছিল দেবদেবীর ঘৃণা করা। কিন্তু কি সৌভাগ্যে আমরা প্রভুর কৃপা-কণা লাভ করিয়া নবজীবন পাইয়াছি ('বক্তৃতাবলী', ২।১৬, পৃঃ ৩৮৯—৯০)।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, উইলিয়ামসের পূর্বসংস্কারজনিত সংকীর্ণতার ভাবটি দূরীকরণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর খ্রীষ্টভক্তকে কালীমন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে খ্রীষ্ট আর কালী এক। আশ্চর্য দর্শনের মাধ্যমে সেই উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। সেইদিন থেকে উইলিয়ামসের মনে কালীমূর্তি সম্পর্কে লেশমাত্র বিদ্বেষভাব তো ছিলই না, বরং কালীর মধ্যে তিনি তাঁর খ্রীষ্টকেই সর্বদা দেখতে পেতেন। এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন রামচন্দ্র ('বক্তৃতা-বলী', প্রাগুক্ত)। তিনি বলেছেন: 'একদা উইলিয়মের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমি ঠন্‌ঠনের সিদ্ধেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হই। …খৃষ্টান উইলিয়ম আনন্দময়ীর সমক্ষে আসিয়া মস্তকাবনত পূর্ব্বক সেলাম করিলেন। আমি আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমাদের মৃন্ময়ী-দেবীকে সেলাম করিলেন কেন?" তিনি পরম পুলকে কহিলেন "আমার খৃষ্টকে দর্শন করিলাম।" অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন যে, "ভাই আর কি আমার পূর্ব্বভাব আছে? প্রভু রামকৃষ্ণ

তৎসমুদয় চূর্ণ করিয়া নবজীবন দিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিতাম না, পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাইতাম না এক্ষণে তাঁহার প্রসাদে [তাহা] দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি।"'

উদ্ধৃত অংশে 'পূর্ব্বভাব চূর্ণ' করে দেওয়ার যে-কথা আছে সেখানে অবশ্যই বুঝতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর খ্রীষ্টভক্তের পরমত-অসহিষ্ণুতার পূর্বভাবটি চূর্ণ করে দিয়েছেন। এমন কথা যেন আমরা স্বপ্নেও ভেবে না বসি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর খ্রীষ্টভক্তকে হিন্দু বানিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত, তিনি তাঁর খ্রীষ্টভক্তকে করে তুলেছিলেন আরও উন্নত, উদার খ্রীষ্টান। সাধকের সিদ্ধির পথটি করে দিয়েছিলেন প্রশস্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কালীমূর্তিতে উইলিয়ামসের ইষ্টদর্শনের অনুভূতি এবং তাঁর এই দিব্য উদার-ভাব যে আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল সে-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন দুর্গাপুরী দেবী ('গৌরীমা', পৃঃ ১০৩)। তিনি লিখেছেন: 'ঠাকুর তাঁহাকে [মিষ্টার উইলিয়ামকে] বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া গৌরীমাকে দর্শন করিতে বলেন। তদনুযায়ী উইলিয়াম সাহেব একদা বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরীমা সম্মুখে আসিলে উইলিয়াম ভাবাবিষ্ট অবস্থায় "মাদার মেরী, মাদার মেরী" বলিতে বলিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং "ভগবানে আমার ভক্তি হউক" এই প্রার্থনা জানাইলেন। গৌরীমা তাঁহাকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ জানাইয়া প্রসাদ দিলেন। উইলিয়াম সাহেব প্রসাদকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে উইলিয়ামসের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং তাঁর সাধনে অগ্রগতির কয়েকটি প্রধান স্তর বা পর্যায় আমরা লক্ষ্য করি। সেই কয়েকটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এইভাবে দেওয়া যেতে পারে।

এক, শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমবার দর্শন করেই তাঁর মধ্যে উইলিয়ামস্ খ্রীষ্টের সত্তা অনুভব করে মুগ্ধ, ভাবাবিষ্ট হয়েছেন। দুই, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাক্ষাতের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ উইলিয়ামসের চিত্তের প্রসারতা ঘটিয়ে দিয়েছেন। মা-কালীর মূর্তিতে উইলিয়ামসের ইষ্টদর্শন হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন খ্রীষ্ট আর কালী অভিন্ন (ক্রমে এই উদার দিব্যভাব সম্প্রসারিত)। তিন, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁর কাতর আবেদন: 'প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন!' এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উইলিয়ামস্ শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করেছেন। চার, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে একটি 'নাম' সাধন করতে দিয়েছেন (সত্যচরণ মিত্রের বিবরণে এই কথা আছে—যা আগেই উদ্ধার করা হয়েছে; অখণ্ডানন্দজীর 'স্মৃতিকথা'য় বলা হয়েছে শ্রীরাম-কৃষ্ণের কাছে উইলিয়ামসের 'বিশেষভাবে ধর্ম-প্রেরণা' লাভের কথা)। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিশেষ সাধন-উপদেশ গুরুশিষ্য ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়। তবে মনে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর উইলিয়ামস্‌কে এমন কোনও 'নাম' দিয়েছিলেন, যা, তাঁর খ্রীষ্টভক্তের একান্ত প্রিয়, প্রাণের বস্তু। পাঁচ, পরবর্তী পর্যায়ে উইলিয়ামসের নির্জনে সাধন—যে-সাধনে, আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়।

উইলিয়ামসের নির্জনে সাধনা বা তপস্যার বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে। কিন্তু তপস্যার স্থানটির স্পষ্ট নির্দেশ কোথাও নেই। কোন্ সনে তিনি দেহত্যাগ করেন তাও আমাদের অজ্ঞাত। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গ' পঞ্চম ভাগে (১৩২৫) লিখেছেন: 'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, এই ব্যক্তি…সংসার ত্যাগ করিয়া… তপস্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন (পৃঃ ১৯৮)।' এই বিবৃতি অনুযায়ী বাংলা ১৩২৫ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে তাঁর দেহত্যাগ হয়ে থাকা সম্ভব।

প্রাণবন্ত মন্দির

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সাহিত্য আকাদেমী ও রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত বর্ষীয়ান সাহিত্যসেবী।

এই কদিন আগে আর একবার হরিদ্বারে গিয়েছিলাম—চারিদিকে অগণিত আখড়া, আস্তানা বা আশ্রম দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল—এই যে বড় বড় সাধু মহাত্মারা এই সব আখড়া-আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেছেন—কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সার্থকতার কথা ভেবে?

এসব আখড়া-নির্মাণে কম পয়সা খরচ হয়নি, লক্ষ লক্ষ টাকা। নিয়মিত কিছু লোক বাস করে এসব জায়গায়, সাধু ও গৃহস্থ কর্মী সবই—তাদের খরচ চালাবার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু জমা টাকার ব্যবস্থা আছে, অথবা নিয়মিত দান—সেও তো কম নয়। ভক্ত বা চেলাদের কাছ থেকেই এ টাকা ওঠে। যাঁকে উপলক্ষ করে এত টাকা তাঁরা দিচ্ছেন—তিনি নিশ্চয়ই উচ্চকোটির সাধক। অনেকেই সিদ্ধ সাধক বলে পরিচিত, প্রচারিত।

আমি সাধারণ গোলা মানুষ, মূর্খই এসব বিষয়ে—তবু 'সম্রাটের নতুন পোশাক' গল্পের সেই অবোধ বালকের মতো—অবোধের দুঃসাহসেই কটা খোলাখুলি প্রশ্ন তুলতে বসেছি। যার পাণ্ডিত্য আছে তার অমর্যাদার ভয় আছে, আমার ভয় কিসের?

তপস্বীর সন্ন্যাসীর সিদ্ধিলাভ বলতে আমরা বুঝি—ইষ্টের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে—এক হয়ে যাওয়া। নির্বিকল্প সমাধি লাভ—এই তো? মানে মোটামুটি কথা। পণ্ডিতরা এক্ষেত্রে অনেক রকম যুক্তিতর্ক ও বিচারের অবতারণা করতে পারেন, কিন্তু স্থূল কথাটা এই নয় কি?

সেখানে পৌঁছলে সব সাংসারিকতা ভুলে যাবার কথা, এক আশ্চর্য শান্তি—ঈশ্বরের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া—অমৃত সাগরে ডুবে যাওয়া। তারপর আর কথা কি? ঠাকুরের ভাষায়,—কলসি যখন ভরে তখনই ভক্‌ভক্ শব্দ করে। ভরে গেলেই আর শব্দ থাকে না, সব চুপ। এঁরা সেই আনন্দলোক থেকে ফিরে আসবেন কেন?

প্রচারের জন্য? যে আশ্চর্য নিধি, ঐশ্বর্য তাঁরা পেয়েছেন তার স্বাদ অপরকে পাওয়াবার জন্য আকুলতা? তার ভাগ দেওয়ার জন্য? কিন্তু সে কারণে আখড়া প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন? কিছু চেলা-শাগরেদ হয়,—না হলে এসব চলবেই বা কি ভাবে? তাতে কতটুকু প্রচার হয়? বড় বড় মহাত্মার নামে বিরাট ফলক কি প্রাচীর-বিজ্ঞাপন! অথচ উঁকি মেরে যা দেখলাম—খাঁ খাঁ করছে বেশির ভাগই। যেসব মহাত্মারা স্বর্গীয় হয়েছেন তাঁদের কথা ছেড়েই দিন, যেসব খ্যাতনামা সাধু এখনও জীবিত, তাঁরা যখন এই সব আশ্রমে আসেন, তখন হয়তো একটু সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা কী ভজন কীর্তন হয়—কিন্তু তারপর ভোঁ ভাঁ। বেতনভুক্ পূজারীরা নিয়মমতো পূজাদি করেন—কর্মচারীরা দেখাশোনা করেন,—নিজেদের আহারের প্রয়োজনে দেব-বিগ্রহের সামনে একটু ভোগও দেওয়া হয়!—নিস্তরঙ্গ নীরস জীবনযাত্রা কয়েকটি প্রাণীর!

আমি একবার এক বহুখ্যাত মহাত্মার এক মন্দির-প্রতিষ্ঠায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। অসংখ্য ভক্ত—ছোট বড় মাঝারি। (আয় অনুসারে সেখানে প্রতিপত্তি, সেই হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ করছি) কে 'বাবা'র কত প্রিয় তা প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ততার সীমা নেই—বেশ সমারোহ ব্যাপার। ওখানে এক শিষ্যকে প্রশ্ন করলাম, 'এত দূরে এই নির্জনস্থানে এত অর্থব্যয় করে এই ধরনের মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?'

তিনি সগর্বে বললেন, 'প্রচার! সদ্ধর্ম প্রচার,

মানুষকে সৎপথে আনার চেষ্টা। জানেন, আমাদের চুয়ান্নটা শাখা আছে সারা ভারতে!'

চুপ করে গেলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, প্রতিষ্ঠার পূজা শেষ হলেই 'বাবা' হিমালয়ে যাবেন, সেখান থেকে কন্যাকুমারী, তারপর উজ্জয়িনী—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভাল মানুষের মতো প্রশ্ন করলাম, 'এখানে কতজন থাকবেন?' উত্তর এল, 'কী-বা আর! একজন পূজারী, ভোগরাঁধার লোক একটি, আর একটি ভৃত্য!'

'তাহলে সদ্ধর্ম প্রচারটা কে করবে? কাদের কাছে করবে? এমন মন্দির আর মঠ তো এখানে বোধ হয় চার-পাঁচশ আছে, খুঁজে খুঁজে এখানে কেউ আসবে ঐ মাইনে-করা পূজারীর আরতি দেখতে?'

'না। মানে "বাবা" যখন আসবেন—'

'বাবা তো জঙ্গলে গেলেও হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে। তার জন্য এত মন্দির আশ্রম আড্ডা করার কি দরকার ছিল, এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে? শিষ্যদের সকলকেই সন্তানবৎ দেখার কথা গুরুর, কিন্তু এইসব খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য অপেক্ষাকৃত ধনী শিষ্যদের প্রতিই মনোযোগ বেশি দিতে হয় না কি? এই তো কালই দেখলাম, সর্বত্যাগী মহাত্মা এক অশিক্ষিত রূঢ়ভাষী ব্যবসায়ী চেলার মাথায় হাত বুলিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরের কথা বলছেন,—তিনিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—একমাসের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে!'

সেই সাধু এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। আর এক সন্ন্যাসিনী, যাঁকে লক্ষ লক্ষ লোক সাক্ষাৎ দেবী বলে মানে—তিনিও সারা ভারতময় অগণিত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইদানীংতম একটি ইমারতে নাকি আঠারো লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, বিক্রি করতে গেলে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাম পাওয়া যাবে। মাতাজীর এক একটি অনুষ্ঠানে দুলক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়!

এসব টাকা ভক্তরাই দেয়, হয়তো সাগ্রহেই দেয়। অবশ্য একথা হয়তো ঠিক যে, এর একটি কপর্দকও এইসব মহাত্মা কি মাতাজীদের নিজেদের সম্ভোগে লাগে না।—তবুও কি 'সক্ষম' ধনী শিষ্যদের প্রতিই একটু বেশি স্নেহ প্রদর্শন করতে হয় না? অন্তত ইচ্ছাও প্রকাশ করতে হয় না কি মুখ ফুটে?

এসব মন্দির-আস্তানা-আখড়াগুলিকে কেন্দ্র করে এই যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ সম্পত্তি সংগৃহীত হচ্ছে, এর পরিণাম কি?

সে পরিণাম এ বয়সে অনেক দেখেছি বৈকি, এখনও দেখছি।

তবু এই পার্থিব প্রতিষ্ঠার আগ্রহ কেন?

ঠাকুর রামকৃষ্ণও বনে কি পর্বতে নির্জনে চলে যাননি সত্য কথা, কিন্তু তেমনি তিনি ইমারত প্রতিষ্ঠা করার জন্য কারও কাছে হাত পাতেননি। তাঁর কাছে সেকালেই যে অগণিত ভক্ত আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিতে পারতেন। স্বয়ং মথুরবাবুই তো ছিলেন। কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি শুধু তাঁর বার্তাবাহী ত্যাগী সন্তান কয়টিকেই উপযুক্তভাবে গড়ে দিয়ে চলে গেছেন, তাঁদেরই ওপর নিজ-ভাব সংরক্ষণ ও প্রচারের সব ভার ন্যস্ত করে। সারা জগৎ তা জানে—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-তরঙ্গ পৃথিবী-ব্যাপ্ত আজ।

যীশুখ্রীষ্টও ঐ বারোটি শিষ্য তৈরি করে লোকচক্ষু থেকে বিদায় নিয়েছেন।

বুদ্ধও কঠিন তপস্যা করেছেন। মানব-কল্যাণের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, গাছতলায় প্রান্তরে থেকেছেন,—সঙ্ঘ-গঠন করেছেন,—এই তো শুনেছি।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব চব্বিশ বছর নীলাচলে ছিলেন, খুব কষ্ট করেই ছিলেন, একখানি সংকীর্ণ ঘরে। বহুভক্ত তাঁর—স্বয়ং দেশের রাজা তাঁর

পদানত—তবু তিনি হাত পাতেননি কারও কাছে।

হজরত মহম্মদও কতকগুলি শিষ্য তৈরি করে গেছেন, তাঁরা এবং পরবর্তী সাধকরা ইসলাম প্রচার করেছেন প্রাণপাত করে—সম্পত্তি বা সম্পদ সংগ্রহে মন দেননি, তাই না?

বছর কতক আগে উত্তরকাশীতে অবধূত রামানন্দকে দেখতে গিয়েছিলাম। নিচু স্লেট পাথরের চালা, ঘরে কোন আসবাব নেই, একটি তক্তার ওপর বসে আছেন, নির্বাক, প্রায় উলঙ্গ সাধু। অন্তত দেড়শ বছর বয়স—এখনও কেউ হাতে ধরে নিয়ে গেলে ঘণ্টা আটেক বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান তপস্যা করেন। কেউ খাবার দিয়ে গেলে খান, নইলে কাউকে বলেন না, ভিক্ষাতেও যান না। কোন মঠ করেননি, মন্দির করেননি, কাউকে চেলা বানাননি।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মদত্ত ছিলেন এলাহাবাদের বিচারপতি, সহসা এক আঘাতে সংসার-ত্যাগী হয়েছিলেন। উত্তরকাশীতেই, গঙ্গার অপর পারে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আকণ্ঠ জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করতেন। গঙ্গার পারেই একটি পর্ণকুটির বানিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তরা, সেখানে রাত্রিবাস করতেন। গঙ্গাতীরে একটি পাত্রে সারাদিন ধরে যেসব খাদ্য জমা হত সন্ধ্যায় জল থেকে উঠে তার মধ্য থেকে কিছু কিছু খেতেন, বাকী জলেই দিয়ে চলে যেতেন।

কেদারে দেখেছি ফলাহারী বাবাকে—যখন সমস্ত তুষারে ঢেকে গেছে তখনও পর্যন্ত নগ্নদেহে বরফের ওপরই শান্ত সমাহিত হয়ে বসে আছেন। দেখেছি বদরীনারায়ণ মন্দিরের ওপর এক গুহায় এক সাধুকে—বাঙালী শরীর,—যিনি শুধু মাত্র চা খেয়ে জীবনধারণ করতেন, তাও দুগ্ধ বিরহিত—রাস-পূর্ণিমা থেকে অক্ষয় তৃতীয়া একা সেই তুষারে ঢাকা নাটমন্দিরে বাস করতেন। এঁদের মুখের কথা খসালেই লক্ষ লক্ষ টাকা এসে যেত। কিন্তু এঁরা তা খসাননি, অমৃতে যিনি ডুবে আছেন—তিনি এই অসার প্রচার-প্রতিষ্ঠা চাইবেন কেন?

চিরকালই জ্ঞানী মহাপুরুষরা ত্যাগের আদর্শ নিজেরা অনুসরণ করেছেন—অন্যদের কাছেও সেই আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছেন। তাঁদের জীবনযাপনই ছিল তাঁদের আশ্চর্য প্রচার-রীতি। বিরাট বিরাট মন্দির-ইমারত এবং আখড়া-দল-সংস্থা ইত্যাদি বিস্তর তৈরি করে, ঐ-সবের মাধ্যমে 'সদ্ধর্ম-প্রচার' করার ব্যাপারে তাঁরা সকলেই ছিলেন মহা উদাসীন। তাঁদের জীবনগুলিই ছিল এক একটি সুসংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান, প্রাণবন্ত মন্দির—যেখানে সর্বশ্রেণীর মানুষ আশ্রয় পায়, জুড়ায়, ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধ করে।

কলাইঘাটায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

খ্যাতনামা সংবাদ-সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক—'যুগান্তর' পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট।

ঐতিহ্যের সুবর্ণপুরী নদীয়া জেলাতেই আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমাজের দলিত ও পতিত শ্রেণীর অসহায় মানুষ সেদিন নামগানের মাধ্যমে এক মহামুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। ভারতের সমাজবিপ্লব তথা ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তাই এক বিস্ময়কর অধ্যায়। আগামী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সারা পৃথিবী সেই অবতার পুরুষের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের পাঁচশত বছর পূর্তি উৎসব পালন করবে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে।

মানুষের মুক্তির জন্য শ্রীচৈতন্য যে অম্লান প্রেম-প্রবাহের ধারা নদীয়ার বুকে প্রথম সঞ্চারিত করেছিলেন—সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবধানে সেই নদীয়াতেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র ভগবানের নামে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র এবং সেবাধর্ম মহাব্রতের সূচনা করেছিলেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ততটা গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়নি—প্রামাণ্য গ্রন্থে অতি সঙ্কোচে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি দু-তিনটি ছত্রের আড়ালে নিতান্ত অসহায়ভাবে আত্মগোপন করে আছে।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহর প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্যের জীবন-প্রবাহকে সাক্ষী রেখে আজও সংকট এবং সংশয়ের মধ্যে প্রাণসম্পদে বেঁচে আছে। এই শহরের গা-ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে চলেছে অশান্ত চূর্ণী নদী। চূর্ণী নদীর কলকল শব্দে যদি কোন ভাষা থাকত, তাহলে প্রাচীন এবং অতি-আধুনিক জীবনযাত্রার ধারক রাণাঘাট শহরের মানুষ এই চূর্ণীর তীরে বসেই শুনতে পেতেন এক বিস্ময়কর সত্যাগ্রহের কাহিনী, জানতে পারতেন ক্ষুধার্ত ও আর্ত মানুষের দুঃখে এক মহাজীবনের অশ্রুসজল বেদনার কথা।

রাণাঘাট স্টেশনে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ সরণি ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে জাতীয় সড়কের মুখোমুখি হতে হবে। এই জাতীয় সড়ক ধরে ডানদিকে কয়েক কদম অগ্রসর হলেই চূর্ণী নদীর উপর সেতুটা দেখা যাবে। সেতুটা পেরিয়ে তাঁতশিল্পের গর্বিত সাম্রাজ্য রামনগর—আঁইশতলার দিকে চলতে চলতে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা পাওয়া যাবে। সেই আঁকাবাঁকা পথ ধরেই উৎসুক মানুষ পৌঁছে যাবেন কলাইঘাটা। আর এ-পথে না গিয়ে যদি তাড়াতাড়ি যেতে চান, তাহলে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে শহরটাকে পিছনে ফেলে সোজা এগিয়ে চলুন মহকুমা হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালকে বাঁয়ে রেখে কয়েক পা হাঁটলেই শহরের মায়া কাটিয়ে গ্রামের সজীব গন্ধ পাওয়া যাবে। তারপর পাকা রাস্তা একসময় হারিয়ে যায়, কাঁচা রাস্তা এসে মিশে যায় নদীর নরম মাটিতে। সেখানেই খেয়াঘাট। খেয়া পেরিয়ে ওপারে কলাইঘাটা।

শোনা যায় লর্ড ক্লাইভ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে মুর্শিদাবাদের দিকে সসৈন্যে এগিয়ে চলার পথে চূর্ণী নদীর তীরে এসে একরাত্রির জন্য তাঁবু ফেলেছিলেন। সেই থেকে লোকে জায়গাটাকে বলত ক্লাইভঘাটা। তারপর কখন কিভাবে সেই ক্লাইভ-ঘাটা আজকের কলাইঘাটায় রূপান্তরিত হল, তা নিয়ে ভাষাবিদ্‌রা গবেষণা করতে পারেন।

চূর্ণী নদী আর এক বিশাল অক্ষয় বটগাছকে সাক্ষী রেখে কলাইঘাটা আজও মানুষের কাছে এক অদম্য আকর্ষণ। নদীয়া জেলার এই এলাকাটা ছিল রানী রাসমণির জমিদারি। নদীর ঘাট থেকে কাঁচা রাস্তা আর ঝোপ-জঙ্গল ডিঙিয়ে গ্রামের ভিতরে গিয়ে ঢুকলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে রানী রাসমণির কুঠিবাড়ি—যা কালের করাল গ্রাসে আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত। গ্রামের সাধারণ মানুষ জানে সেই কুঠিবাড়ির পরিচয়, আর জানে, এখানে এই কলাইঘাটায় একদিন এসেছিলেন এক প্রেমের ঠাকুর, যিনি মানুষের দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন, মানুষের দুঃখনিবারণে জমিদারের বিরুদ্ধে অক্লেশে করেছিলেন সত্যাগ্রহ এবং সবশেষে ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে তিনদিন তিনরাত এই কলাইঘাটাতেই বাস করেছিলেন, তাইতো কলাইঘাটার মাটি পবিত্র, কলাইঘাটা তীর্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা জানেন, রানী রাসমণি যেমন প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসও তাঁর 'বাবা'র মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন এক মহাপুরুষকে। তাই মথুরবাবু ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর বিরাট শক্তির সন্ধানও পেয়েছিলেন।

সময়টা সম্ভবত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক শীতকাল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে, এ সম্পর্কে কোন অভ্রান্ত তথ্যপ্রমাণ হাতের কাছে খুঁজে পাইনি, তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এরকম ধারণাই হয়েছে যে, ঘটনাটা ১৮৬৯-এর আগে সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে

পরে আরও দু-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করব—তাতেই আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে।

সেবার মথুরবাবু খবর পেলেন, নদীয়া জেলায় তাঁদের জমিদারি এলাকায় পরপর দুবছর খরা হয়েছে, মাঠের ফসল মাঠেই পুড়ে ছাই। প্রজারা চরম অভাবের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তাই খাজনা দিতে পারছে না। এই ঘটনা থেকেও মনে হয়, সময়টা ১৮৬৭ বা ৬৮-র মধ্যেই হবে, কারণ নদীয়ার প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা গেছে, ওই সময়েই ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি মানুষকে দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল।

এমন দুঃসংবাদ পেয়ে মথুরবাবু ঠিক করলেন, তিনি নিজেই যাবেন জমিদারিতে, নিজেই দেখতে চান, কেন প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। নৌকা (বজরা) করে গঙ্গা দিয়ে গিয়ে চুর্ণীতে ঢুকবেন। তারপর কলাইঘাটার কুঠিবাড়িতে গিয়ে উঠবেন।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকেও সঙ্গে নিলেন। আগেও এরকম নিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য, 'বাবা' দুদিন বেড়িয়ে আসবেন।

পাইক বরকন্দাজ লোকলস্কর নিয়ে মথুরবাবুর বজরা এসে একসময় ভিড়ল কলাইঘাটার ঘাটে। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে খবর রটে গিয়েছিল যে, জমিদার আসছেন। তাই নদীর ধারে প্রজারা এসে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করল। দূর দূর গ্রাম থেকে সকলেই এসেছে জমিদারকে দেখতে, এবং তাদের দুর্দশা জমিদারকে দেখাতে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় সাধারণ মানুষ জানে না, তখন তাঁর পরিচয় : তিনি দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বিরাট মন্দিরের পূজারী।

বংশ পরম্পরায় কলাইঘাটার মানুষ সেদিনের সেই ঘটনার কথা জেনে এসেছে। তাঁদের কাছ থেকেই সেদিনের বর্ণনা আমি শুনেছি।

বজরা এসে কলাইঘাটায় ভিড়ল। জমিদার নামলেন পাইক-বরকন্দাজ পরিবৃত হয়ে। এগিয়ে চললেন তিনি কুঠিবাড়ির দিকে। সমস্ত মানুষ তাকিয়ে আছেন সেদিকে। কারোর খেয়ালই নেই, সকলের অলক্ষ্যে বজরা থেকে নেমে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন নদীর তীরে দাঁড়ানো সারি সারি কঙ্কালসার মানুষের দিকে। মথুরবাবু এগিয়ে গেছেন বেশ কিছুটা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ নদীর নরম মাটিতে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছেন দুর্ভিক্ষের গুহা থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা সহস্র মানুষকে। তাঁর দুচোখে জলের ধারা—চূর্ণীর উত্তাল তরঙ্গ তখন কলকল শব্দে প্রবাহিত।

একসময় দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি মথুরবাবুর কাছে। পিছন থেকে ডাকলেন তিনি —মথুরবাবু ফিরে তাকালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : এরা কারা ? ওই যে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে বস্ত্রহীন, অন্নহীন রুক্ষ কঙ্কালসার মানুষ—ওরা কারা ?

মথুরবাবু উত্তর দিলেন : ওরা আমার প্রজা।

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বিস্ময় : এরাই তোমার প্রজা ? তুমি এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবে ? কিন্তু এরা নিজেরাই যে খেতে পায় না।

নদীর নরম মাটির বুকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে কঠিন হলেন তিনি। ক্ষুধার্ত মানুষের পয়সা দিয়ে যে ভবতারিণীর পূজা হয়—সেখানে তিনি আর পূজারী থাকতে রাজি নন। অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বার্থে সেদিন তিনি সত্যাগ্রহী—স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে জোর করে যদি খাজনা আদায় করা হয়, তাহলে তিনি আর ফিরে যাবেন না দক্ষিণেশ্বরে। আজীবন থাকবেন তিনি এই ক্ষুধার্ত দেবতার সংসারে।

সেদিন যাঁদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল—তাঁদেরই বংশধররা আজও কলাইঘাটায় আছেন। "কথামৃত" বা "লীলা-প্রসঙ্গ" তাঁরা পড়েননি—কিন্তু সর্দার বংশসম্ভূত সেই "বুনো" পরিবারগুলি জানে এই পরম করুণাঘন মানুষের দেবতাটিকে—যিনি তাঁদের দুঃখে কেঁদেছিলেন, তাঁদের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, গ্রামের প্রবীণ মানুষের মুখ থেকে যে কাহিনী শুনেছি, সেই একই কাহিনী পড়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী শিবানন্দের পত্রে। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁকে এক পত্র লিখেছিলেন, "উদ্বোধনে"র শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে সেই পত্রের কিছুটা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত।

শিবানন্দজী লিখেছেন: "ক্রমাগত দুই বৎসর জমিতে ফসল না হওয়ায় প্রজাগণ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। প্রজাগণের অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ আকৃতি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় গভীর দুঃখে অভিভূত হইল। তিনি মথুরবাবুকে ডাকাইয়া হতভাগ্য প্রজাদের খাজনা মাপ করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতে ও বস্ত্র দান করিতে অনুরোধ করিলেন। মথুরবাবু বলিলেন, 'বাবা, আপনি জানেন না পৃথিবীতে কত অধিক দুঃখ ক্লেশ আছে! তাই বলে প্রজাদের খাজনা মাপ করা যায় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'মথুর, তোমার নিকট জগন্মাতার ধনসম্পদ গচ্ছিত আছে বইত নয়। ইহারা জগন্মাতার প্রজা; জগদম্বার অর্থ ইহাদের দুঃখদূরীকরণার্থ ব্যয়িত হউক। ইহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহাদের সাহায্য করিবে না? তোমাকে নিশ্চিতই ইহাদের সাহায্য করিতে হইবে।' মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সুতরাং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।"

রামকৃষ্ণ-সন্তান এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয়ভাই শিবানন্দ মহারাজ উক্ত চিঠিতে রাণাঘাটের ঘটনাটি উল্লেখ করেই দেওঘরের সন্নিহিত এলাকার একই ধরনের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। দুটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর মথুরবাবুকে দিয়ে জীবসেবার ব্রত পালন করিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীদর্শনে যাচ্ছিলেন, পথে দেওঘরের সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ পেলেন, বললেন, "যে পর্যন্ত ইহাদের দুঃখ দূর না হইবে সে পর্যন্ত আমি ইহাদের সঙ্গে এখানেই বাস করিব, এ স্থান ছাড়িয়া যাইব না।" শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু সেবাব্রত পালন করেন।

রাণাঘাট ও দেওঘরের ঘটনা দুটির মধ্যে প্রথম কোন্‌টি? শিবানন্দজী তাঁর পত্রে দেওঘরের ঘটনাকে "দ্বিতীয়" ঘটনা বলেই উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: "আমি তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) শ্রীমুখ হইতে এই দুই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।" "বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়" জীবনপাত করার জন্য যাঁরা সেদিন দক্ষিণেশ্বরের মহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনধন করে সমবেত হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ত্যাগী সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্যই সম্ভবত ওই দুটি ঘটনার কথা নিজেই তাঁদের কাছে বলেছিলেন।

কলাইঘাটার এই ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ উল্লেখ আমরা স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ"-এ দেখতে পাই, দেখতে পাই স্বামী তেজসানন্দের "রামকৃষ্ণ জীবনী প্রসঙ্গে"ও। স্বামী তেজসানন্দ বলেছেন: "ওই গ্রামটির নাম যে কলাইঘাটা, সেটা ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় বলে-ছিলেন।" স্বামী সারদানন্দজী "লীলাপ্রসঙ্গে" লিখেছেন: একই সঙ্গে দেওঘর ও "রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁর জমিদারিভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময় বেড়াইতে যাইয়া গ্রামবাসীদের দুর্দশ

দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণা আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।"

দেওঘরের ঘটনা যদি "দ্বিতীয় ঘটনা" হয়, তাহলে রাণাঘাটের ঘটনা নিশ্চিতভাবেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে। কারণ, "রামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা" (২য়) গ্রন্থে (পৃ: ১৪৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: "ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের মধ্যভাগে (ইং ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮) ঠাকুর তীর্থযাত্রা করিলেন।" ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন মথুর এবং জগদম্বা দাসী। এই সময়েই দেওঘরের ঘটনা। দেওঘরের পর যে রাণাঘাটের ঘটনা নয়, সেটা আরেকটা কারণেও মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরেজী ১৮৬৮-তে কিংবা বাংলা ১২৭৪ সনে তীর্থদর্শনে গেলেন, ফিরে এলেন ১২৭৫ সনে। তার পর ১২৭৭ সনে নবদ্বীপ গেলেন। আর ১২৭৮ সনে মথুরবাবু দেহত্যাগ করলেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর আগে এই সময়ের মধ্যে যে তিনি রাণাঘাট গিয়েছিলেন, তেমন প্রমাণ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যু হলে বাংলা ১২৭৬ সনে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুর সঙ্গে জমিদারিতে গিয়েছিলেন—কিন্তু সেটা যে রাণাঘাট, তেমন কোন উল্লেখ পাইনি।

এখানে আরেকটি ঘটনার কথাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কলাইঘাটায় যে নরনারায়ণ সেবার ব্রত পালন করেন, সেটা কেশবচন্দ্র সেনকেও প্রভাবিত করে এবং এই কলাইঘাটাতেই পরবর্তী কালে "নরপূজা" প্রসঙ্গ নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং কেশবচন্দ্র সেন আলোচনাও করেন। এক্ষেত্রে আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" অনুসরণ করতে পারি (পৃ: ৯৫), যেখানে তিনি লিখেছেন:

"১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী (বিজয়কৃষ্ণ) তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবার কেশববাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটা উৎসব হয়। ঐখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাহ্মের সহিত সেদিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্বে কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎভাবে আমার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে নরপূজার আন্দোলন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল।"

এই বিবরণ থেকেও এমন সিদ্ধান্তে আসা অসঙ্গত হবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ততপক্ষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক সময় রাণাঘাটে গিয়েছিলেন এবং নরপূজার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন—যে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তী কালে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে বিশ্বের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে।

রাণাঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ এবং দরিদ্র দেবতার পূজা—এই দুটি ঘটনাকে সামনে রেখে রাণাঘাট শহরে একদল যুবকের ঐকান্তিক প্রেমে গড়ে উঠেছে "শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ স্মারক সমিতি"। বহুদিনের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদার্পণের স্থানটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেখানে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী একটি প্রস্তর ফলকও প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতি বছর পালন করা হয় রামকৃষ্ণ উৎসব। রাণাঘাট শহরে স্থাপিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি। মোট কথা, রাণাঘাটকে কেন্দ্র করে নদীয়ায় আজ নতুন আবেগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের তরঙ্গ জনজীবনে সৃষ্টি করেছে আলোড়ন।

তাওয়াং বৌদ্ধবিহার

স্বামী প্রভাকরানন্দ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে কর্মনিরত সন্ন্যাসী।

২৯ এপ্রিল ১৯৮৪। অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। আমরা ছিলাম ইটানগরে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র—হসপিটালে। রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটালের স্বামীজীরাই আমাদের জন্য সবরকম ব্যবস্থাদি করেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের প্রাচীন, ঐতিহ্যপূর্ণ তাওয়াং বৌদ্ধবিহারটি দর্শন করি। দলে আমরা চারজন, স্বামী স্থিতাত্মানন্দজী ও আমি, এবং ইটানগর থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন বিমোক্ষানন্দজী ও কৃষ্ণরূপানন্দজী।

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে—সারথি বীর বাহাদুর—নেপালের অধিবাসী, এখানে সরকারী চাকরি করে। পথের বিচিত্র বর্ণনা সব তার মুখেই শুনছিলাম—সেও অনর্গল বলে চলছিল। ইটানগর থেকে বেরিয়ে আসামে ঢুকতে হয়,—তেজপুরকে অনেক বামে রেখে আবার অরুণাচল-প্রদেশে প্রবেশ করি। প্রথমরাত্রি চারদোয়ার, দ্বিতীয়রাত্রি বমডিলায় কাটিয়ে তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার আগে পৌছাই তাওয়াং। অস্বাভাবিক চড়াই উতরাই, ভাঙাচোরা ও ধ্বস্নামা বিপজ্জনক ৫৫০ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে সকলেই ক্লান্ত, অবসন্ন। তবুও আনন্দের ব্যাপার এই, ছোট্ট শহর তাওয়াং-এর বিশিষ্ট অধিবাসী থেকে শুরু করে সাধারণ লোকেরাও আসছেন—নিচ (সমতলভূমি) থেকে আসা 'হিন্দুলামাদের' দেখতে। আমরা অভিভূত! তাঁরাও পরম উৎসাহে কত কথাই বলেন! নোনতা চা ও বিস্কুট খাওয়ালেন, খাপসমেত দাও (তরোয়াল বিশেষ) উপহার দিলেন, এটা এদিককার বিশেষ সম্মানের।

৩১ এপ্রিল। সরকারী অতিথি-ভবনের ঘরের মধ্যে পাইন কাঠ জেলে বসতে হয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—বাইরে শন্‌শন্ করে হিমপ্রবাহ বইছে, বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে, কখন কখন বৃষ্টি থামলেই পেঁজা তুলোর মতো বরফ উড়ে এসে পড়ছে বন্ধ কাচের জানলাতে। কম্বল মুড়ি দিয়ে চার সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছি। দৃষ্টি সবারই বাইরের দিকে—কাচের শার্সি ভেদ করে দূরে—বহু দূরে।

ঊর্ধ্বে তুষারমৌলি পর্বতমালা—যেন ঘনীভূত ধ্যান! নিম্নে—বহুনিম্নে কল্লোলময়ী নির্ঝরিণী—নিরন্তর কর্মের প্রতীক। প্রবহমান তাওয়াংচু নদীও দৃষ্টির বাইরে নয়।

মাঝে তাওয়াং উপত্যকা—চিরহরিৎ বনানী-মণ্ডিত। রডোডেনড্রনের সমারোহ—যেন বিরাটের পূজায় বর্ণাঢ্য পুষ্পার্ঘ সাজানো হয়েছে। সবুজ উপত্যকার ফাঁকে ফাঁকে মনুষ্যবসতি—মোন্‌পা উপজাতীয়দের ঘরবাড়ি। অরুণাচলপ্রদেশের এই কামেঙ্ জেলার অধিবাসীদের একটি বিশিষ্ট উপজাতি হচ্ছে মোন্‌পা। কামেঙ্ জেলার বেশ খানিক অংশ ভুটান ও তিব্বতের মাঝখানটায়—জেলার বড় শহর বমডিলা। এখানকার সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় পুণ্যস্থান তাওয়াং বৌদ্ধবিহার—যার উল্লেখ আগেই করেছি—আর যে-উদ্দেশ্যে আমাদের এই যাত্রা। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল—পর্বতশীর্ষে সুবিশাল দুর্গের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের উপলক্ষিত সেই বিহার।

১ মে, যখন ঘুম ভাঙল ঘড়িতে তখন ৩-৪০ মিঃ। আশ্চর্য হলাম কাচের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে ভোরের আলো-আঁধারি দেখে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেই তাড়াতাড়ি উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পুব আকাশে নবারুণের রক্তিমাভ—পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে আকাশ। পাহাড়ের গায়ে, জমে থাকা বরফের ওপর সূর্যকিরণ নানা রঙের প্রতিফলন করছে। সার্থক নাম অরুণাচল-প্রদেশ! ভারতের পূর্বসীমান্ত এ রাজ্য। অনেক আগেই সূর্য ওঠে এখানে। আমি ও বিমোক্ষানন্দজী বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। রৌদ্রে ছোট্ট শহর ঝলমল্ করছে, কিন্তু কোথাও একটি প্রাণের চিহ্ন নেই। যেন রূপকথার স্বপ্নপুরী। আসলে পাহাড় মাত্রই দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে লোকেরা। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ। বাকীরা সূর্য-চন্দ্রের—এদের ভাষায় দনিপোলোর উপাসক; অন্য ধর্মাবলম্বীও কিছু আছে। জীবনযাত্রা এখানকার কৃষিনির্ভর। দারিদ্র্য প্রচণ্ড—তবুও এদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সকলে মহা-খুশিতেই দিন কাটাচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থ এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অঢেল, কিন্তু দুর্গমতার জন্য সাধারণের দুরতিক্রম্য। পশ্চিম কামেঙ্ জেলার শেষপ্রান্তে ভূটান ও তিব্বত সীমান্তে পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল, ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে অসম্ভব, বেত ও পশমের শিল্পকর্ম আছে। আমরা আসার পথে দুর্গম সেলা-পাশ অতিক্রম করে এসেছি, উচ্চতা প্রায় ১৪ হাজার ফুট, শূন্যের নিচে তাপমাত্রা, ঝিরঝির করে বরফ পড়ছিল তখন, গাড়ির বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব—বিশেষত আমাদের মতো সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদে,—তবুও আমরা ভারতীয় জওয়ানদের প্রতিষ্ঠিত, কাছেই একটা শিবমন্দিরে গিয়ে দর্শন, প্রণাম ও স্তবাদি করে এলাম। কয়েকজন জওয়ান তাঁদের অস্থায়ী আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। এ সমস্ত অঞ্চল সেনাবাহিনীর জওয়ানে পরিপূর্ণ। স্থানীয় অধিবাসীর চাইতে সেনাবাহিনীর লোকসংখ্যাই যেন বেশি মনে হল, কত কষ্টের মধ্যে তাঁদের থাকতে হচ্ছে! দেশের জন্য তাঁদের এই আত্মত্যাগ কয়জন ভারতবাসী জানেন! অধিকাংশ দিন 'টিন-ফুড' খেয়ে থাকতে হয়। যখন অবিরত বরফ পড়তে থাকে—কেরোসিনের ফায়ার প্লেসকে আঁকড়ে বিনিদ্র রাত কাটান। জনহীন ঐ পর্বতশিখরে তখন কেবল বরফ আর বরফ—গাড়িও চলে না। পায়ে হেঁটে চড়াই উৎরাই করে duty বদল হয়। এই অঞ্চলে ভারত সরকারের সতর্কতা এত বেশি কেন? কয়েকজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল,—১৯৬২-তে চীন এই পথেই ভারতে ঢুকে পড়েছিল বমডিলা পর্যন্ত। পরে অবশ্য তারা স্বেচ্ছায় ফিরে গিয়েছিল। তাওয়াং, এর সন্নিকটে একটি রাস্তাকে স্থানীয় লোকেরা এখন 'চীনা রাস্তা' বলে; কারণ রাস্তাটি নাকি ওরাই করেছিল এক-মাসের মধ্যে। এখন অবশ্য ঐ অঞ্চলে যাওয়া নিষেধ।

মিঃ জ্যাকব দক্ষিণের লোক, তাওয়াং-এ সপরিবারে থাকেন, সরকারী অফিসার। তিনি আমাদের সঙ্গী। বীরবাহাদুর তার জিপে করে সকলকে নিয়ে চক্কর দিতে দিতে পাহাড়ের ১০ হাজার ফুট উঁচুতে—বিরাট উচ্চ দুর্গ-প্রাকার-বেষ্টিত প্রাচীন তাওয়াং গোম্পার সম্মুখফটকে উপস্থিত করল। গুম্ফা বা গুফা শব্দেরই আঞ্চলিক উচ্চারণ—গোম্পা (Gompa)। আমরা প্রধান ফটকে ঢোকার পূর্বে দেখলাম—ডানদিকে গোম্পা প্রাচীরের পিছনে কয়েক হাজার ফিট গভীর খাদ। বামপার্শ্বে পিছনে ঢাল পথ রয়েছে—সেই ঢাল পথ বেয়ে আমাদের চক্কর দিয়েছে। চতুর্দিকে উঁচু উঁচু পাইন গাছ। প্রধান ফটকের কাছে দুটি 'ভ্যারাইটি স্টোর' চোখে পড়ে। একটি দোকান থেকে কিছু পূজার সামগ্রী—ধূপ, শ্বেতশুভ্র শিফন্ (গজ কাপড়ের টুকরোর মতো দেখতে) ইত্যাদি কেনা হল। এখানকার দেবতার পূজাতে ঐ-সব

লাগে। ইতিমধ্যে লামা থুপ্‌টেন গম্বু এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এই লামা এখানকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ইনি সারনাথ মহা-বিদ্যালয়ের স্নাতক, ইংরেজী ও হিন্দী বলতে পারেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী। তিব্বতী ভাষা ও মোন্‌পা ভাষায় এখানে কথাবার্তা হয়ে থাকে। গোম্পার প্রধান লামা (Abbot) রিম্পুজী তখন উপস্থিত ছিলেন না,—লামা থুপ্‌টেন গম্বু আমাদের নিয়ে চলেন ভেতরে, ইনি ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটালের সঙ্গে পরিচিত। আমরা অতিথি, তার উপর হিন্দু সন্ন্যাসী—তাই আমাদের খুব খাতির সাদর আপ্যায়ন।

সম্মানিত চতুর্দশ দলাইলামাও সম্প্রতি ইটানগরে একটি গোম্পা প্রতিষ্ঠাকালে রামকৃষ্ণ মিশনের হসপিটাল পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধভিক্ষুদের দিয়ে আবার সমাজসেবামূলক কাজ আরম্ভ করতে চান—সেই ইচ্ছাও তিনি সেখানে প্রকাশ করেছিলেন। মাননীয় দলাইলামা তিব্বত থেকে চলে আসার পরে এই তাওয়াং গোম্পা এবং বমডিলা গোম্পায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি দিরাং গোম্পা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান দলাইলামা বেলুড় মঠেও গিয়েছিলেন—তখন তাঁর সঙ্গে মাননীয় পাঞ্চেন্‌লামাও ছিলেন। লামা থুপ্‌টেন গম্বুর সঙ্গে আমরা গোম্পাভ্যন্তরে সব ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছি। রিম্পুজীর সচিব আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান, প্রধান ফটকের উপরে যে ঘরগুলি—সপরিবারে তিনি সেখানেই থাকেন। এঁর স্ত্রী 'ভ্যারাইটি স্টোরে'র একটির পরিচালিকা। এঁরা শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির।

স্থানীয় অধিবাসী ও লামারা গোম্পার প্রধানকে অর্থাৎ রিম্পুজীকে অবতারের মতো মানেন। অবতার লামারা নাকি বাল্যকালেই পূর্বজন্মের কথা বলেন,—তাঁদের চাল-চলন, লক্ষণাদি দেখে দলাইলামা ঠিক করেন কোন্ রিম্পুজী কোন্ স্তরের। বলাবাহুল্য, এঁদের বিশ্বাস দলাইলামারা স্বয়ং বুদ্ধের অবতারস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ তথাগতেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। এঁদের ধারণা—একজন দলাইলামা জন্ম নেওয়ার পর, আগের দলাইলামা শরীর ত্যাগ করেন। শুধু ভক্তদের খুঁজে বার করতে হবে কোথায় তিনি জন্ম নিলেন। জন্মের পরই সেই দলাইলামা তাঁর স্বভাবে, কথায় আধ্যাত্মিক ভাবধারায়, পূর্বস্মৃতিচারণে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লক্ষণে, ভক্তদের জানিয়ে দেন,—তিনি এসেছেন। তখনই সেই বালককে বিশেষ পূজা অর্চনা সহকারে সসম্মানে তিব্বতের লাসার প্রধান মঠে অধিষ্ঠিত করা হয়।

কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেই ডানদিকে নবিস লামাদের বিদ্যালয়,—সেখানে তারা স্লেট-পেন্সিল নিয়ে পড়াশোনা করছে। দেখলাম, ভিক্ষুরা পড়াচ্ছেন সবই তিব্বতী ভাষায়। আমরা বাচ্চা লামাগুলিকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি পড়ছ?' লাজুক শিশুরা যা করে থাকে,—লজ্জায় স্লেট দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। উপরে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়,—বৌদ্ধদর্শন, বিচার, অনুশাসন এবং হিন্দী, ইংরেজী ইত্যাদি পড়ানো হয়। আরও বেশি পড়ার মেধা থাকলে তাঁকে, তিব্বতে কিংবা সারনাথে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এই বিহারটিতে যত লামা আছেন তাঁদের অধিকাংশই তিব্বতী ও স্থানীয় মোন্‌পা,—আসাম ও অরুণাচলপ্রদেশের লোকও অল্প কয়েকজন আছেন। এঁদের রীতিনীতির অনেক খবর আমরা সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এখানে।

তিন সন্তানের জনক-জননী তাঁদের মধ্যম পুত্রকে গোম্পাতে পাঠাবেন,—এটাই সামাজিক প্রথা ছিল এঁদের। প্রাচীন লামারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিতেন। কারণ ঐ গোম্পায় যোগদান ছিল আবশ্যিক। এই নিয়ম কোন পরিবার না

মানলে তাঁদের একহাজার টাকা জরিমানা এবং অন্যান্য উপঢৌকন দিতে হত। লামারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সব আদায় করতেন। গ্রামের বাড়িতে পূজা-অর্চা এবং রোগ সারানো, ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানও লামারা করতেন। এ সমস্ত অঞ্চল তখন তিব্বতের লাসা বৌদ্ধ-বিহারের ধর্মীয় শাসনাধীন ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে, এই কর-আদায় প্রথা নিষিদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে অমনভাবে সন্তানকে গোম্পায় পাঠানোর বাধ্যবাধকতাও শিথিল হয়। অবশ্য অনেক মা-বাপ স্বেচ্ছায় তাঁদের সন্তানকে ধর্মবিহারে দিয়ে আসেন। ঐ সময় জাফরান রঙের আলখাল্লা এবং কিছু অর্থও অধ্যক্ষের কাছে দিতে হয়। মাথা মুণ্ডন করিয়ে জাফরান রঙের পোশাক পরিয়ে সেই নবাগতকে সমবেত লামাদের সামনে এনে ঘোষণা করা হয় যে, ছেলেটি নবিস হিসাবে সঙ্ঘে স্বীকৃত হল। এই উপলক্ষে লামাদের ভোজনাদির খরচও ঐ নবাগত ছেলের পিতা-মাতাকে বহন করতে হয়, নবিসের বৌদ্ধ দীক্ষা ও নতুন নামকরণ হয়। এরপর গোম্পার বিদ্যালয়ে নবিসের পড়াশোনা আরম্ভ হয়। এই কালে তাকে একজন অভিভাবক লামা বা ভিক্ষুর অধীনস্থ থাকতে হয়। লামারা অবশ্যই বালব্রহ্মচারী হবে। তবে ব্যতিক্রমও আছে। মৃতদার বা স্ত্রী পরিত্যাগ করে এসেও বৌদ্ধসংঘে যোগদান করতে পারে কিন্তু এই লামাদের অন্য নামে অভিহিত করা হয়।

গোম্পার বাসস্থান ব্যবস্থাগুলিও আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। বাঁদিকে সারি সারি বড় ঘর উপর থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে। ঘরগুলি লম্বা—'ডারমিটরি' (dormitory) ধরনের,—ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ৫।৬টি নবিসের জন্য একফুট উঁচু করা পাঁচফুট ছফুটের মোটা তক্তা—তার উপর ছুটি করে তিব্বতী মোটা কম্বল। থালা মগ, কিছু বইপত্র রয়েছে। ঐ ঘরের মাঝেই ওদের রান্নার ব্যবস্থা। তাতে রান্নাও হয়, ঘরও গরম থাকে। ঘরে তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক লামার আসনটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বড়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা আসবাবাদি খুব একটা পরিচ্ছন্ন নয়, সম্ভবত শীতের দেশ বলে এরূপ। শৌচাদির জন্য গোম্পার বাইরে ব্যবস্থা—ভিতরে কিছু নেই। ঘরগুলির পাটাতন সব কাঠের; দেওয়াল পাথরের। উপরের ছাউনিও শ্লেট-পাথরের। সবই পুরানো-জরাজীর্ণ, মেরামতাদির দায়িত্ব সরকারের। গোম্পায় এইরকম ৬৫টি ঘরে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী ও ভিক্ষুলামা বাস করেন। এছাড়াও প্রাচীন লামারা অন্যত্র পৃথক ভাবে থাকেন। রিম্পচীর জন্য অবশ্য হলঘরের উপরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তাঁর রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা, দপ্তর, একান্ত সচিবের ঘর, সবই সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো, আমরা সেই অফিস ঘরে বসেই নকশা করা সুন্দর তিব্বতী বড় কাপে চা ও বিস্কুট খেয়েছিলাম। সমস্ত দপ্তর বা অফিস ঘর জুড়ে বহু মার্বেল মূর্তি ও ছবি সাজানো—ওদের দেব-দেবী। ঘরের মেঝে গোটা কার্পেটে মোড়া, বেতের চেয়ারগুলিতে গদি দেওয়া, চায়ের পুরানো গাছের গোড়াগুলির চারটি ডাল রেখে সুন্দর করে কেটে নিয়ে তাতে কাঠ বসিয়ে টিপয় করা হয়েছে; তার উপর টেলিফোনও রাখা আছে। সর্বত্র সুরুচির ছাপ। আমরা ঢোকার আগেই ঘরটিকে গরম রাখার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কথায় কথায় জানা গেল, একটি শিক্ষার্থী ৫ বছর বয়সে যোগদান করার পর ২৫ বছর বয়সের মধ্যে তার শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষানবিস কাল ২০ বছর। এরপর সে ভিক্ষু পদবাচ্য হয়, তখন তাকে ২৫৩টি প্রতিজ্ঞা বা অনুশাসন মেনে চলতে হয়। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গৃহস্থ-ঘরে পূজার্চনার কাজ, কাঠ সংগ্রহ,

রেশন সংগ্রহ এবং গোম্পার যাবতীয় কর্ম ঐ ভিক্ষুকে করতে হয়।

প্রতিদিন ভোরে শয্যাত্যাগের জন্য সংকেত জানানো হয় ড্রাম ও শিঙ্গা বাজিয়ে। ৪টার মধ্যে সকলকে প্রস্তুত হয়ে পূজা-পাঠ ও অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে হয়। তিব্বতী ক্যালেণ্ডারের ৮ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত ১২ দিন বাইরে বা গোম্পার ভিতরে কোন কাজকর্ম থাকে না;—তখন কেবল দফায় দফায় বড় হলঘরে সমবেত হওয়া, বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি থেকে পাঠ গান,—আর নানারকম তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চলে। চালের মণ্ড থেকে তৈরি ছোট ছোট অজস্র দানা (কমপক্ষে ১০ কোটি) তৈরি করে সেগুলি নিবেদিত হয় অসংখ্য দেবতার উদ্দেশে। বাটিতে করে জলও দেওয়া হয় দেব-দেবীদের জন্য; মাঝে মাঝে লবণ ও মাখন মেশানো চা এবং চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একরকম সুরুয়া (soup) সবাই মিলে পান করে। ডমরু, ড্রাম, শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠানের সময় ও কার্যকলাপ সূচিত হয়। মানুষের হাড় দিয়ে শিঙ্গা বানায় এরা। এই পূজা-নুষ্ঠানাদিতে এ্যানেরা অর্থাৎ মেয়ে লামারা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাঁদের আলাদা গোম্পা থেকে একত্রে এসে যোগ দেন। এই সব অনুষ্ঠানে কোন গৃহস্থ যোগ দিতে পারেন না।

আবার তাদের ঐ তিব্বতী-পঞ্জিকার মাসের ২০ তারিখ থেকে পরের মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত ১৮ দিন সকালের যে পূজানুষ্ঠান হয় তাতে কিন্তু বাইরের লোক—গৃহস্থরাও সকলে যোগ দিতে পারেন। সারা গোম্পা এই সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে। লামারা প্রত্যহ সকালে, দুপুরে ও রাত্রে যথাবিধি আহারাদি করেন। খাদ্যাখাদ্য বিচার মোটেই নেই,—তবে মাদকদ্রব্য, ধূমপান নিষিদ্ধ। প্রত্যেকের পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্র থাকলেও প্রার্থনা-চক্র (prayer wheel) ঘুরিয়ে সকল কাজের মাঝে 'উ মণিপেমে উ' মন্ত্র সবাইকেই জপ করতে হয়। 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ', মন্ত্রই বিকৃত হয়ে ঐ উচ্চারণে এসে ঠেকেছে।

বড় হলঘরে রক্ষিত বহুবিধ দেব-দেবীর মূর্তির পিছনে আছেন ২৬ ফুট উঁচু এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি। আর রয়েছে দেওয়াল জুড়ে দলাইলামা এবং দশদিকপাল, ক্ষিতিগর্ভ, ললিতবজ্র, অমোঘবজ্র, পদ্মবজ্র ইত্যাদির মূর্তি। হলের ভিতরে প্রবেশ করে লক্ষ্য করা গেল,—একটি বিশেষ মূর্তিকে বেশ যত্ন সহকারে গোপনীয়ভাবে রাখা রয়েছে—সবটাই প্রায় কাপড়ে ঢাকা। ধূপ ইত্যাদি দিয়ে সকলেই সেখানে শ্রদ্ধা জানায়—আমরাও যথারীতি তাই জানালাম। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, মূর্তিটি প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-মূর্তি—এঁরা বলেন 'নিংমেচান্ পালডান লামো' (Ningmeckan Paldan Lhamo)। গোম্পার রক্ষাকর্ত্রী দেবীই নাকি ঐরূপে ক্রীড়ারতা,—কিন্তু পাছে কেউ তাঁকে দর্শন করে মনে কোন বিকার অনুভব করে, তাই মূর্তিটিকে অমন ঢেকে রাখার ব্যবস্থা। পাপদৃষ্টিতে দর্শনের ফল অতি ভয়ঙ্কর,—এদের এই বিশ্বাস। এই দেবীর প্রভাবেই নাকি লামাদের উপর কোন অশুভ প্রকোপ পড়তে পারে না। অতঃপর বিভিন্ন বেদিতে স্থাপিত অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয় বুদ্ধ, আকাশগর্ভ, সামন্তভদ্র, বজ্রপানি, মঞ্জুশ্রী, সর্বনির্বাণ ইত্যাদি আরও বহু দেবতার মূর্তির দর্শন হল।

বড় হলঘরটিতে প্রায় পাঁচশত লামা বসে পূজানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা আছে। উপরে উঠে বিরাট বুদ্ধমূর্তির কমনীয় মুখমণ্ডল দর্শন করে আমাদের তৃপ্তি হয়েছিল। মেরা লামার একটি রিলিফ দেখলাম—ইনিই এই গোম্পার প্রতিষ্ঠাতা। ১৬০০ খ্রীঃ থেকে ১৬৮০ খ্রীঃ মধ্যে এই দুর্গসদৃশ গোম্পাটির নির্মাণ শেষ হয়। শুনলাম এখানে নাকি প্রায় আড়াই শতাধিক গৃহ

রয়েছে, যাতে পাঁচশতের অধিক লামা থাকতে পারেন। দুর্গের মতো কেন? জিজ্ঞাসা করাতে জেনেছিলাম, সেকালে ভূটানের ডুগ্‌পা উপজাতির লোকেরা বহুবার এই গোম্পা অধিকারের চেষ্টা করেছে। আত্মরক্ষার জন্ম তাই এমন দুর্গসদৃশ ব্যবস্থা।

তাওয়াং আজ বৌদ্ধ জগতের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তাওয়াং গোম্পা বা লামা-মঠটি ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এই গোম্পার লামারা তথা সমগ্র মোন্‌পা উপজাতি মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাওয়াং নামটির উদ্ভব সম্পর্কে অনেক রকম প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনীটি এই রকম:

অনেক কাল আগের কথা। মেরা লামারও আগে, প্রথম দলাইলামার একজন শিষ্য এদিকে এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ঘোড়া থেকে না নেমে পারেননি। ঠিক যে-জায়গাটিতে বর্তমান গোম্পা, ঐখানেই তিনি অত্যন্ত আবিষ্ট চিত্তে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। স্থানীয় ভাষায় 'তা' মানে—ঘোড়া, আর 'ওয়াং'-এর অর্থ আশীর্বাদ। সেই থেকেই নাকি এই জায়গাটি 'তাওয়াং' নামে পরিচিত হয়,—ঘোড়ায় চড়ে এসে সেই লামা স্থানটিকে আশীর্বাদপূত করেছিলেন, এই যেন নামের ভাবার্থ।

বাইরে বিরাট মাঠের মাঝে প্রায় ৯০ ফুট উঁচু স্তম্ভ এবং তাতে মন্ত্র লেখা সব পতাকা উড়ছে, জিজ্ঞাসা করে জানলাম ঐগুলি শুভ সংকেতের নিশানা। ঐ সমস্ত মন্ত্রের হাওয়া যেদিকে বয়ে যাবে সেদিককার অশুভ বার্তা দূরীভূত হবে। এই পতাকা-তলে এঁদের বড় বড় উৎসবাদি—মুখোশ-নৃত্য, গীতবাদ্য প্রভৃতি হয়।

এবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সাধারণ খাদ্যভাণ্ডার এবং সাধারণ রান্নাঘরের পাশ দিয়ে গ্রন্থাগারের দিকে। গ্রন্থাগারটি দ্বিতলে। এখানে লামাদের বসে পাঠ করার মতো লম্বা উঁচু বেদী করা আছে। গ্রন্থ রেখে পড়ার মতো এক লাইনে উঁচু, আর বসার জায়গায় মোটা কম্বল পাতা। থরে থরে সব হাতে লেখা পুঁথিপত্র সাজানো। এখানে বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি বইএর সংখ্যা ৮৫০। ১০৩ খানা প্রাচীন পুঁথি নাকি সোনার জলে লেখা এবং সেগুলি প্রকাশ্যে রাখা হয় না,—তালাবদ্ধ রাখে। অবশ্য আমাদের অনেক অনুরোধে, এক-খানা অমন পুঁথি তাঁরা খুলে দেখালেন। এই গ্রন্থাগার-কক্ষের এক প্রান্তে বিচিত্র সব বাদ্যযন্ত্র সুরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকেই এগুলি প্রয়োজন মতো বাজানো হয়। বারান্দায় একজন ড্রাম বাজিয়ে কিছু পড়ছিলেন, আমরা যেতে তিনি পড়া বন্ধ করলেন। হিন্দীতে বললাম, আপনি পড়তে থাকুন, তিনি কেবল হাসলেন।

তিব্বতী ভাবধারায় গঠিত এই জাতীয় গোম্পার লামারা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী,—আবার তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড করে থাকেন, ভূত-প্রেত-অপ-দেবতাকেও মানেন। তিব্বতের লাসা বৌদ্ধ-বিহারের অধীনস্থ যে সকল গোম্পা ভারতে বিদ্যমান, তার মোট লামা সংখ্যা নাকি প্রায় ছয় হাজারের কাছাকাছি। লামাদের মৃত্যুর পর তাঁদের শরীর দাহ করা হয় এবং ভস্ম ও অস্থি সংরক্ষিত থাকে। গৃহস্থদের কোনরূপ দুরারোগ্য ব্যাধি হলে বা ভূত-প্রেতাদির প্রকোপে পড়লে এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ লামা করণীয় বিধান দেন। তদনুযায়ী পূজা ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করা হয়। মৃত্যুর পর এই সব লামাই ঠিক করেন গৃহস্থের মৃতদেহ, মাটিতে প্রোথিত হবে অথবা ১০৮ টুকরো করে নদীর জলের মাছকে খাওয়ানো হবে। ওঁদের বিশ্বাস, যে খুব অপরাধী বা ব্যাধিগ্রস্ত, তার দেহ মাছ প্রভৃতি জীব ভক্ষণ

করলে পরলোকে সে পুণ্যলাভ করবে, সুখী হবে। মাটিতে পুঁতলে অসংখ্য কীট সেই দেহ ভক্ষণ করলে নাকি আরও পুণ্য হবে।

কোন কোন লামা তাঁদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসানুসারে নির্জন স্থানে কঠোর তপস্যাদিও করেন,—কোন পাহাড়ে বা গিরিগুহায়। পরিচিত কেউ গিয়ে তাঁর জন্য রান্না-করা খাদ্য রেখে আসেন তাঁর আসনের বাইরে। আবার কোন লামাকে কেবল চাল-ডাল বা কাঁচা জিনিস দিয়ে আসা হয়। তাঁরা নিজেরাই রান্না করে খান। দিনান্তে একবার মাত্র খান এঁরা। আবার একদল লামা পরিব্রাজক জীবন যাপন করেন। তীর্থ-ভ্রমণাদির কালে নিজস্ব খরচ প্রত্যেক লামাকে সংগ্রহ করে নিতে হয়। গোম্পার প্রধান লামার অনুমতি নিয়ে কোন কোন প্রাচীন লামা গ্রামে বা দূর দেশে দীক্ষাদি দিয়ে থাকেন—গোম্পা প্রতিষ্ঠাদিও করে থাকেন। কোন লামা আদর্শ-চ্যুত হলে যদি সংঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন তাঁকে ক্ষমা করা হয়। তিনি তখন সমবেত লামাদের চা পানে আপ্যায়িত করেন এবং নির্ধারিত জরিমানা প্রদান করে প্রকাশ্যে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সমগ্র বৌদ্ধ গোম্পাটি পরিদর্শন সেরে বেরিয়ে আসার মুখে প্রধান ফটকের কাছে একটি অপূর্ব দৃশ্য আমাদের সকলকেই বিমুগ্ধ করেছিল। দেখলাম, একটি ঘরের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত মোন্‌পা রমণী তাঁর বালিকা কন্যাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে, আর মহিলাটিকে জড়িয়ে ধরে একটি বছর পাঁচেক বয়সের লামা। শিশু লামাটির মুণ্ডিত মস্তক—পীত বসন। ভাষা বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু তাঁদের যে অনেক আবেগময় কথাবার্তা চলছিল, তা বেশ বুঝলাম। মহিলার মুখে-চোখে আভিজাত্য—স্নেহ-করুণায় স্নিগ্ধ দীপ্তি তাঁর চাহনিতে। শিশু লামাটিকে তিনিও যেন কিছু বলছিলেন বা উপদেশ দিচ্ছিলেন। সঙ্গী প্রদর্শক থুপ্‌টেন গম্বুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—মাত্র কিছুদিন আগে এই মোন্‌পা ছেলেটি সংঘে যোগ দিয়েছে,—তার মা-বোন দেখা করতে এসেছেন। দূর থেকে উভয় পক্ষের আলাপাদি শুনে এবং তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল না কেউ শোকার্ত, অভিভূত বা দুঃখিত। ঐ মাতা-পুত্রের সংলাপের বিন্দু-বিসর্গও আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু একটা স্বর্গীয় দ্যোতনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম আমরা, একথা সত্য। দপ্‌ করে মনে পড়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় আদর্শ—ভারত-সংস্কৃতির নিত্য-সমুজ্জ্বল জননী-চিত্র মদালসার কথা। জননী মদালসা তাঁর শিশু পুত্রদের দোলনায় দোল দিতে দিতে আত্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করতেন, সুললিত গানে ও ছড়ায়। মায়ের শিক্ষার প্রভাবে পুত্ররাও সকলে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষলাভে ধন্য হয়েছিলেন। অবশ্য সেখানে মা স্বয়ং ছিলেন মহা বিদুষী ব্রহ্মবাদিনী, আর সন্তানরাও সকলে উচ্চাধিকার নিয়েই মাতৃক্রোড়ে এসেছিলেন। আর এখানে সেই মোন্‌পা উপজাতীয় মা এবং তাঁর পুত্র ঐ শিশু লামা নিতান্তই তাঁদের ধর্মীয় শাসন ও সামাজিক সংস্কারের কঠোর আনুগত্যের বশেই এই পবিত্র গোম্পার আবেষ্টনীতে এসে পড়েছেন! নিঃসন্দেহে ভিন্নতর পটভূমি, স্বতন্ত্র প্রেরণা,—তথাপি বাহ্যতঃ ঐ দৃশ্যটি আমাদের কাছে খুবই উদ্দীপনাকর ছিল।

আমরা হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম গোম্পাবাসীদের—ওঁরাও সমবেত ভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। লক্ষ্য করলাম, শিশু লামা এবং তাঁর মা-ভগিনীও আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। যেন আমাদের উদ্দেশে। তাঁরাও তাঁদের অন্তর উজাড় করে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানালেন। আমরা ফিরে চললাম। সঞ্চয় করে নিলাম—অনেক শিক্ষা, অঢেল স্মৃতি।



তাওয়াং বৌদ্ধবিহার (পাহাড়ের উপরে)



বামডিলা গোম্‌পা

১৯৬২-তে মাননীয় দলাইলামা কিছুদিন এখানে ছিলেন



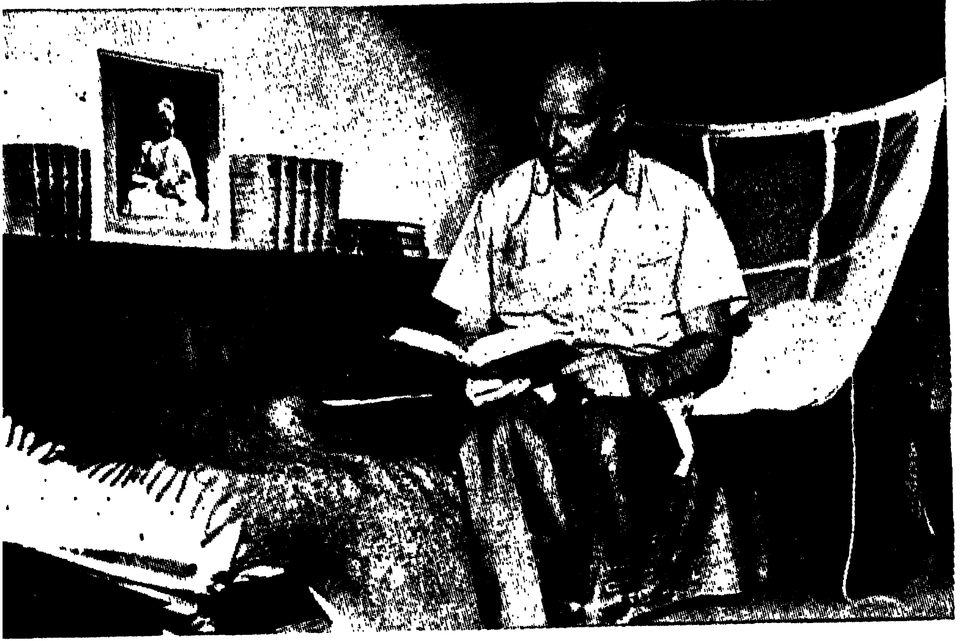
ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হস্‌পিট্যালে

মাননীয় দলাইলামা



সম্প্রতি দলাইলামা-প্রতিষ্ঠিত

দিরাং গোম্‌পা



রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট্ অব কালচারের অতিথি-ভবনে আপন কক্ষে অধ্যাপক চেলিশেভ্

সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ কালচারে কর্মনিরত সন্ন্যাসী।

১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসেছিলেন অধ্যাপক ডঃ ই. পি. চেলিশেভ। অধ্যাপক চেলিশেভ সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ভারততত্ত্ববিদ্‌। বেশ কিছুকাল আগে তিনি ছিলেন মস্কোর ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ এশিয়ান স্টাডিস-এর অধিকর্তা। সমসাময়িক ভারতীয়, বিশেষতঃ হিন্দী সাহিত্য বিষয়ে তিনি একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। বহু বছর তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস-এ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। বর্তমানে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স আকাডেমীর অ্যাসোসিয়েট-মেম্বার, সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়নের সদস্য, সোভিয়েত শান্তি কমিটির সভ্য এবং সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী পরিষদের সহ-সভাপতি। অধ্যাপক চেলিশেভ জওহরলাল নেহরু শান্তি পুরস্কারেও সম্মানিত। মোট কথা অধ্যাপক চেলিশেভ বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য ও কৃষ্টি জগতের একজন প্রধান পুরুষ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের একটি বিশেষ প্রিয় ক্ষেত্র স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর বছর কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম'-এ স্বামীজী সম্পর্কে অধ্যাপক চেলিশেভের একটি অসাধারণ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ আছে। গত তিরিশ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়াতে বিবেকানন্দ-চর্চা এবং বিবেকানন্দ-গবেষণার প্রসারের কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। শুনেছিলাম বর্তমানে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের জন্য ভারতে এসেছেন।

কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ কালচারের আন্তর্জাতিক অতিথিভবনে তাঁর সঙ্গে যেদিন দেখা হল সেদিন ছিল নভেম্বরের শেষ দিন। সেটাই অবশ্য আমার প্রথম দেখা নয় তাঁর সঙ্গে। তবে স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সেই প্রথম গেলাম তাঁর কাছে।

সকাল নটা। ঘরে একাই বসেছিলেন তিনি। হাতে একখানা বই—পড়ছিলেন। সদা হাস্যময় মানুষটি আমাকে দেখেই উচ্ছল হয়ে উঠলেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হিন্দীতে বললেন : 'আসুন, আসুন। নমস্কার।' এর আগে দেখেছি, অধ্যাপক চেলিশেভ চোস্ত হিন্দীতে অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন। বললাম : কি পড়ছিলেন? হাতের বইটি পাশে রেখে বললেন : "'ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ইট্‌স সিক্রেট।'" এটা বিবেকানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস-এর দ্বিতীয় খণ্ড। বিবেকানন্দের লেখা আমার খুব প্রিয়। খুব ভাল লাগে পড়তে। আপনি আমাকে বিবেকানন্দের একটি ছোট মূর্তি যোগাড় করে দিতে পারেন? শুনেছি কলকাতায় নাকি ঐরকম মূর্তি পাওয়া যায়। মস্কোতে আমার ঘরে টেবিলে মূর্তিটি রাখব।' আমি বললাম : চেষ্টা করব যোগাড় করতে। তারপর বললাম : অধ্যাপক চেলিশেভ, আপনি বলছিলেন বিবেকানন্দের লেখা আপনার খুব ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ডঃ চেলিশেভের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর : 'নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন। বিবেকানন্দের লেখা শুধু যে আমারই ভাল লাগে তাই নয়, সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন যাঁরা

বিবেকানন্দকে ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তাঁর লেখা। আর মানুষের প্রতি কী গভীর দরদ! প্রায় নব্বই বছরের পুরানো হলেও তাঁর লেখা আজও সমান তেজোদীপ্ত, সমানভাবে প্রেরণাপ্রদ। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশবাসীর মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে। আমরা মনে করি, বিবেকানন্দের চিন্তা, তাঁর আদর্শ, তাঁর রচনা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।'

প্রশ্ন করলাম: কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী, ধর্মের জগতের মানুষ। মার্কসবাদী হয়েও তাঁর প্রতি আপনার এবং আপনার দেশের মানুষদের এই আকর্ষণ, আপনার এখানকার মার্কসবাদী বন্ধুদের অনেককে অবাক করবে না?

ডঃ চেলিশেভ আমার মুখ থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন: 'আমাকে এদেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার যে-সব মার্কসবাদী বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাবশতঃ বিবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধর্মীয় সংগঠক হিসেবে ধরে নিয়ে বসে আছেন। বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি খুব ভালভাবে পড়েছি এবং তার উপর পড়েছি তাঁর কয়েকখানা প্রামাণিক জীবনী। তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, বিবেকানন্দকে যদি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারক হিসেবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে একটা বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান "প্রফেট"। তিনি ছিলেন মৌলিক ভাবনাসম্পন্ন একজন চিন্তানায়ক, স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিনাশ চাইতেন সামাজিক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন সকল রকম শোষণের—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। সর্বপ্রকার বিশেষ অধিকার ও সুবিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি। সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ তাই এত জনপ্রিয়। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সর্বহারাদের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রবাদী বলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শোষণ-মুক্ত, শ্রেণীহীন সচ্ছল এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার। অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন হাতিয়ার হিসেবে।' আমি সংশোধন করে বললাম: হাতিয়ার নয়, ভিত্তি হিসেবে। ডঃ চেলিশেভ বললেন: 'মার্কসীয় পরিভাষায় দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। সে যাই হোক, এই নীতির সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। লক্ষ্য যদি এক হয়, তাহলে মতের ভিন্নতা আপত্তির কারণ হতে পারে না। দেশ কাল অবস্থা ভেদে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর ভারতবর্ষ? তার মাটিতেই তো ধর্ম। তাই বিবেকানন্দের মতো বিচক্ষণ সমাজনায়ক যদি ধর্মকে ভিত্তি করে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত মানুষদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তাতে দোষ

কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায় ?'

প্রশ্ন : কিন্তু যাঁরা দোষ দেখেন, বিরোধ খুঁজে পান ?

উত্তর : 'সেটা যাঁরা দেখেন, তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। তাঁরা বোঝেন না তথাকথিত যে-ধর্মকে মার্কস-লেনিন নিন্দা করেছেন, তাকে তো বিবেকানন্দও নিন্দা করেছেন। সেটা হল ধর্মের নামে, অর্থাৎ ধর্ম বলে যা চলে তা—প্রীস্টক্র্যাফ্‌ট—পুরোহিততন্ত্র। সেটা তো সত্যিই শোষণের হাতিয়ার—কি ভারতবর্ষে, কি অন্য দেশে। বিবেকানন্দ যাকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন তা হল মানবতাবাদ, মানুষের প্রতি দরদ, মানুষের প্রতি ভালবাসা। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল গভীর মানবপ্রেম।'

প্রশ্ন : সেকথা ঠিক। তবে এগুলির সঙ্গে 'ধর্ম' বলতে বিবেকানন্দ বুঝিয়েছিলেন মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যের বিকাশকে—যাকে কখন তিনি বলেছেন ডিভিনিটি—দেবত্ব, কখন বলেছেন স্পিরিচুয়ালিটি—আধ্যাত্মিকতা।

অধ্যাপক চেলিশেভ : 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। আমি তো আগেই বলেছি, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—আধ্যাত্মিকতার দেশ। মার্কসবাদী হিসেবে আমি মনে করি, যে কোন দেশের বাস্তব পরিস্থিতির চেহারা একজন কম্যুনিস্টের যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে তা অনুধাবন করা উচিত। একজন প্রকৃত কম্যুনিস্টের বোঝা উচিত, তথাকথিত ধর্ম যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে।'

এই সময় মার্কসীয় মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে একজন সাংবাদিক আসেন অধ্যাপক চেলিশেভের সাক্ষাৎকার নিতে—যা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল। চেলিশেভ তাঁকে বসতে বললেন। তারপর বললেন : 'আসলে ধর্মের দুটো দিক আছে—একটা ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক দিকটিই বেছে নিয়েছিলেন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিভেদ বাড়িয়ে তোলে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, বিবেকানন্দের চিন্তা ও পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। তাই বিবেকানন্দকে এবং তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা প্রচলিত অর্থে নিছক ধর্মনেতা মাত্র বলে ভাবি না। বিশ্লেষণ-ধর্মী কোন গবেষকের কাছেই তাঁদের সেভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। তাঁরা যে-সব ধর্ম-উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন পরিণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতাবাদী চিন্তাবিদের মতের কোন অমিল নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না", "যার হেথায় নেই, তার হোতায়ও নেই" আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন : "আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না যে-ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে" বলছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো", বলছেন, "জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম।" কোন দেশের কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরুর মুখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শুনেছে ? আমার মনে হয়, মার্কসীয় ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি। বিবেকানন্দের "কালী দি মাদার" কবিতায় কালীর যে কালনৃত্য কল্পনা যেখানে কালীর তাণ্ডব নৃত্যের প্রত্যেক পদাঘাতে সৃষ্টি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার তাৎপর্য হচ্ছে, পুরানো সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার আবির্ভাবকে আহ্বান জানাচ্ছেন বিবেকানন্দ। কালীর নৃত্য ঐ প্রক্রিয়ার প্রতীক। বিবেকানন্দের "অ্যারাইজ অ্যাণ্ড অ্যাওয়েক" বাণী শ্রমজীবী মানুষদের জাগরণের মন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বলি, রাশিয়ার অনেক সাম্প্রতিক কবি বিবেকানন্দের এই বাণীকে অবলম্বন করে একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। বিবেকানন্দ রাশিয়ায় না গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের পটভূমি তৈরি এবং সেখানকার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সামাজিক কাঠামোয় আসছে এক বিরাট পরিবর্তন আর সে পরিবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়া থেকেই। বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সে-কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত জনগণ তাই বিবেকানন্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান। বিবেকানন্দ তাই তাদের বড় কাছের মানুষ।

'বিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনাকে আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন এবং অবস্থার সঙ্গে উপযোগী করে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। তাঁর বেদান্তের নাম দিয়েছিলেন তিনি "প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত"। কম্যুনিস্টরা বেদান্তের অতীন্দ্রিয়বাদকে বুঝতে পারেন না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্তের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাযুজ্যই আছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শন ও বাণীর তাৎপর্য সম্পর্কে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। তাতে আমার বিবেকানন্দ-চর্চা ও গবেষণা প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

'বিবেকানন্দকে একদল ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী বলে চিহ্নিত করেন, আর একদল বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তাঁকে মার্কসবাদী আখ্যা দেন। আমার মতে, স্বামী বিবেকানন্দ এর কোনটাই নন। মার্কসের দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে পরিচয় থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজদার্শনিকদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে। শ্রমজীবী মানুষের জাগরণের ব্যাখ্যা তিনি তাঁর নিজের মতো করেই দিয়েছেন, সমাজের ব্যাখ্যাও তাঁর নিজস্ব। সামাজিক সমস্যা সমাধানের যে-সব সূত্র তিনি দিয়েছেন সেগুলি আমাদের মতে ভাববাদী (idealistic)। সে-সব বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন সেভাবে কোন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ভাবেননি বা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁর ধর্মের মধ্যে ভাববাদী যে-অংশটুকু তার সমর্থকও আমরা নই ঠিকই, কিন্তু তাকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকারও আমরা করি না। কারণ একথা আমি আগেই বলেছি, দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মের ভাববাদ যদি তাঁর দেশের মানুষকে কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অস্বীকার করব কি করে? আসল কথা হল মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, সমাজের কল্যাণ

এবং অবহেলিতের উত্থান। সেখানেই মার্কস ও বিবেকানন্দ উভয়েই একই ভাবনায় শরিক, সেখানেই তাঁদের মিলনসূত্র।'

প্রশ্ন করলাম : বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে আপনার ধারণার কথা আগে দু-একবার উল্লিখিত হলেও তাঁর সম্পর্কে আপনার বা আপনাদের ধারণা একটু বিশদভাবে বলবেন কি?

উত্তর : 'দেখুন, বিবেকানন্দ-চর্চা এবং গবেষণার কাজে তাঁর গুরুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কারণ রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নকেই তো বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই রামকৃষ্ণদেবও আমার এবং আমার দেশবাসীর কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বাণী বস্তুতঃ অভিন্ন। বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় মানবসভ্যতা যখন চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পথ আজ সবচেয়ে কার্যকরী সমাধানের সূত্রটি উপস্থাপন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বোম্বার স্কোয়াড্রনের একজন নেভিগেটিং অফিসার। যুদ্ধের বিভীষিকা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শুরু হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে তা সহস্রগুণ মারাত্মক হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু সোভিয়েত দেশেই অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। এরই অভিজ্ঞতা থেকে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আজ বিশ্বব্যাপী চলছে শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সমর্থনে আন্দোলন, মিছিল। শান্তি, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী। সেই বাণীই আজকের বিপন্ন পৃথিবীতে বাঁচার পথ দেখাতে পারে। আমি মনে করি, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যে-ভাবে বিশ্বকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। সমকালীন ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে তাঁদের বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে তার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি। ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে ঐ ভাবাদর্শকে বোঝার জন্যে আজ সোভিয়েত রাশিয়ায় বহু গবেষক ও চিন্তাশীল মানুষ রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে বিবেকানন্দ-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমার ভাবতে গর্ব হয় যে, আমার দেশে এই চর্চায় আমি অন্যতম পুরোধার ভূমিকা পালন করতে পেরেছি। আমি মনে করি, আমাদের এই কাজ সমগ্র মানবজাতির সেবাস্বরূপ। আমি আনন্দিত যে, সম্প্রতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চা সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পর্ষদ সংগঠিত হয়েছে আমাকে তার অন্যতম সহ-সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে। শুনেছি চীনেও এখন বিবেকানন্দ-চর্চা আরম্ভ হয়েছে। এ সংবাদে আমি খুশি। আমার চীনা কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা বিবেকানন্দ সম্পর্কে কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান হতে পারে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চায় আন্তর্জাতিক পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড: এ. এল. ব্যাসমের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তিনি অবশ্য কম্যুনিস্ট নন, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও এ-ব্যাপারে মত-বিনিময়ে আমরা আগ্রহী। শুধু এঁরাই নন, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যাঁরা এবিষয়ে চর্চা করতে আগ্রহী তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমরা কাজ করতে চাই। এ-সম্পর্কে আমার এক্ষুণি কয়েকজনের কথা মনে পড়ছে, যেমন (পূর্ব) বার্লিনের হামবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভি. মবগেনরথ, বুলগেরিয়ার সোফিয়া সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক এন. জোরোবভ, হাঙ্গেরীর বুডাপেস্ট

সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক জে. হারমাতা এবং মঙ্গোলিয়ার উলান বতর সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক ডামডিন্সুরেন। এঁরা অবশ্য সকলেই সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ এবং আমারও বিশেষ পরিচিত। আমার পুত্রবধূ ইরিনা চেলিশেভও বিবেকানন্দ-চর্চায় বিশেষ আগ্রহী। বর্তমানে সে যে-বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত তার বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকবেন বিবেকানন্দ। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ-গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা সামনের সারিতে আছেন অধ্যাপক এ. পি. স্তাচুক-দানিলচুক এবং অধ্যাপক আর. রাইবাকভ তাঁদের অন্যতম। আশা করি, আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার উত্তরোত্তর বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

'সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে বার বার আমার মনে হয়েছে, ভারতীয় সাহিত্য সাধকদের বিবেকানন্দ বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। হিন্দী-লেখকদের মধ্যে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা), সুমিত্রানন্দন পন্থ এবং প্রেমচাঁদ, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুল ইসলামের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। বিবেকানন্দের তেজস্বিতা, গতিশীলতা এবং মানুষের প্রতি আলাময় মমতা তাঁর সমকালের এবং পরবর্তী সময়ের সাহিত্য-শিল্পীদের আকর্ষণ করেছিল। বিবেকানন্দের চেতনার সব স্তর জুড়ে ছিল মানুষ,—তাঁর ঈশ্বরও ঐ মানুষের মধ্যে। তিনি বলতেন: "আমার ঈশ্বর কোন দূর গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসী নয়, অজ্ঞতাবশতঃ যাকে আমরা মানুষ বলি সে-ই আমার ঈশ্বর।" মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তিনি একটি মর্যাদা, নিজের ভাগ্যকে নিজের শক্তিতে গড়ে তোলার প্রেরণা আর দুঃখ-বেদনাকে উপেক্ষা করার সংকল্প।'

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলেন, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ খ্রীষ্টীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। আপনি এ-সম্পর্কে কি মনে করেন?

উত্তর: 'আমার গবেষণা এবিষয়ে আমাকে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আমার মতে, বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় মতাদর্শের কোন মিলই নেই। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। খ্রীষ্টীয় মতাদর্শ মানুষকে কর্মহীনতার দিকে নিয়ে যায়, মানুষকে ভগবানের করুণাপ্রার্থী ভিক্ষুকে পরিণত করে। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মানুষকে কর্মের জোয়ারে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, লড়াই করতে প্রেরণা যোগায়। বিবেকানন্দ তাঁর মানবতাবাদের ধারণায় মানুষের মর্যাদাকেই উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন। সেই চিন্তার মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচেতনাই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি তাঁর ধর্মচেতনা অথবা মানবতাবাদের চিন্তা-ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে এবং সেই আদর্শকে তিনি দেশের সেবায় ব্যবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে যখন ভারতের জনগণের মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের মানবতাবাদ তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নিজেদের মর্যাদা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে সচেতন করেছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের ঐক্যের ব্যগ্র বাসনাই বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের সেই ঐক্যের ধারণা ভাববাদী হলেও তা ছিল তাঁর সামগ্রিক চিন্তাদর্শের মূল কথা এবং তার যৌক্তিকতা এবং অপরিহার্যতায় ছিল তাঁর গভীর বলিষ্ঠ বিশ্বাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করতেই হবে। শুধু স্বাধীনতা

সংগ্রাম নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তার প্রক্রিয়াকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ। সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে রামমোহন রায় অথবা মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে নতুন ভারত গড়ার স্থপতি হিসেবে বিবেকানন্দের অবদান বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে।'

কথাগুলি বলার পর অধ্যাপক চেলিশেভ সহসা জিজ্ঞাসা করেন: 'আচ্ছা, বিবেকানন্দ বিবাহ করেননি কেন?' আমি বললাম: কারণ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। অধ্যাপক চেলিশেভ: 'কিন্তু খ্রীষ্টান ফাদাররা তো করেন।'

আমি: সে আপনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মযাজকদের কথা বলছেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট-মতে সন্ন্যাসের প্রচলন নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না।

অধ্যাপক চেলিশেভ: 'কিন্তু ভারতবর্ষেও তো দেখেছি অনেক সন্ন্যাসী বিবাহিত।'

আমি: ভারতবর্ষে সেরকম কোন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় আছে বলে আমি জানি না। তবে বিবাহিত ব্যক্তি পরে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন—এমন হতে পারে। তখন বিবাহিত স্ত্রীও জননীসদৃশা তাঁর কাছে। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসের ঐতিহ্যে সন্ন্যাস এবং বিবাহ এক সঙ্গে চলতে পারে না। সন্ন্যাসীর কাছে নারী মাত্রই জননী। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ঐতিহ্যকেই বহন করেছেন।

শেষের কথাগুলি শুনে যেন চমকে উঠলেন অধ্যাপক চেলিশেভ। বললেন: 'ধন্যবাদ। আমার জানা ছিল না। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলেও এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম।'

অধ্যাপক চেলিশেভকে এর পর আমার শেষ প্রশ্নটি করলাম: বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনার আগ্রহের সূচনা হয় কখন থেকে?

হাসতে হাসতে অধ্যাপক বললেন: 'সে এক ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি বিষয় খুব আলোচিত হতে থাকে। তা হল ভারত অল্প দিনের ভিতর স্বাধীনতা লাভ করতে চলেছে। তখন থেকেই ভারত সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে থাকে। অনেকেই তখন ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশুনো করতে শুরু করেন। ঐ অনেকের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমার আগ্রহের বিষয় ছিল ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য। ঐ বিষয়ে কিছু লেখালেখিও করতে শুরু করেছিলাম। ঐ সময়েই ভারতের জাতীয় জাগরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, বিশেষতঃ বিবেকানন্দের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কিছু তথ্য আমার গোচরে আসে। ইতিপূর্বে রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দের জীবনী আমি পড়েছিলাম। একটা ধারণা ছিল। এর কিছুদিন পরে—ইতিমধ্যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে—১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি এসেছিলাম দিল্লীতে। সেই আমার প্রথম ভারতে আসা। আমি এসেছিলাম সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের অন্যতম হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে। দিল্লীতেই বসেছিল সেই সম্মেলন। আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তেজনা প্রশমন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুস্থ সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্রটি তুলে ধরা ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সেবারের সেই আসাই আমাকে নিয়ে এসেছিল বিবেকানন্দের কাছে এবং তাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণের কাছে—যাঁরা বিশ্বসম্প্রীতি ও বিশ্বমৈত্রীর ক্ষেত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আশ্চর্য এই প্রতীকী

যোগাযোগ। তার পরের কাহিনী আমি "স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম"-এ বিস্তারিত লিখেছি। খুব সংক্ষেপে এইটুকুই আজ বলছি: '১৯৫৬-র শরৎকালের একদিন। ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত কন্যা-কুমারীতে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। প্রস্তরময় সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে—যেখানে তিন-সমুদ্র এসে মিলিত হয়েছে, সেখানে একটা জায়গায় পরম সৌভাগ্যবশে দেখেছিলাম এক অপূর্ব অবিস্মরণীয় দৃশ্য—একটি নতুন দিনের আবির্ভাব। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত প্রভাত সূর্যের প্রথম কিরণগুলি ত্রিসমুদ্র-সঙ্গমে কন্যাকুমারী-মন্দিরের গম্বুজাকৃতি চূড়া এবং স্তম্ভশ্রেণীকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল। দক্ষিণে শ-দুই মিটার দূরে রয়েছে একটি নির্জন শিলাখণ্ড যার উপর এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। "ঐ হল বিবেকানন্দ শিলা"—কে একজন যুবক বলে উঠেছিল। যুবকটি দাঁড়িয়ে ছিল আমার কাছেই। বলেই চলল সে—"ঐ সেই শিলা যেখানে স্বামী ভারত ছেড়ে দূর বিদেশে যাত্রার আগে তিনদিন কাটিয়ে ছিলেন।" আমি তাকে বললাম: "ঐ দ্বীপখণ্ডটিতে যেতে কি যে ইচ্ছে হচ্ছে আমার!" যুবক জবাব দিয়েছিল: "একটু অপেক্ষা করুন,—আমি জেলেদের কাছ থেকে একটা ডিঙি নিয়ে আসছি।"

'কিন্তু বিবেকানন্দ-শিলায় যাবার ইচ্ছা আমার এতই তীব্র হয়েছিল যে, ঐ যুবকের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার ছিল না। সাঁতার দিয়ে শিলায় যাব স্থির করলাম। যখন অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছি তখন পিছনে তাকিয়ে দেখি একটি জেলে ডিঙি। তার উপর যুবকটি দাঁড়িয়ে। সে চীৎকার করে কিছু বলছিল আর হাত নাড়ছিল। কিন্তু বাতাসের গতি তার কথাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উল্টো দিকে। তার সঙ্কেতের অর্থও আমার বোধগম্য হয়নি। যা হোক, আমরা প্রায় একই সময়ে সেই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। এবং পাথরের খাঁজ ধরে ধরে শিলার চূড়ায় উঠেছিলাম।

'আমার ঐ নতুন বন্ধুটি একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর নিজে বসে আমাকেও বলে: "বসুন এখানে, আর ভাবুন তাঁর কথা যিনি আমাদের নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছেন।" আমি তার নির্দেশ পালন করেছিলাম। ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের নির্ঘোষ ছাড়া আর কোন শব্দই সেখানে ছিল না।...

'বিবেকানন্দ সম্পর্কে যা-কিছু পড়েছিলাম সব ঐ সময়ে আমার মনে পড়তে লাগল। রবীন্দ্র-নাথের সেই কথা—যদি কেউ ভারতবর্ষকে জানতে চায় তাকে বিবেকানন্দ পড়তেই হবে; বিবেকানন্দ যুবকদের মধ্যে জাগিয়েছেন মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ও ভক্তিময়তার প্রেরণা, অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। বাস্তবিকই তাই। বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি পড়েছি—একবার নয়, বার বার, আর প্রত্যেকবার সেগুলির মধ্যে এমন নতুন কিছু পেয়েছি যা ভারতবর্ষকে গভীরভাবে বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে—সাহায্য করেছে ধারণায় আনতে তার দর্শন ও জীবনদর্শনের রূপ, তার জনগণের অতীত ও বর্তমানের আচার-আচরণ এবং তাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

'হয়তো এখানেই—ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় এই নির্জন শিলাখণ্ডে বসে বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছিলেন: শৌর্যের সূর্যোদয় হয়েছে; আমার মাতৃভূমি জাগরিত হবেনই; কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ভারতবর্ষ আর কোনদিন নিদ্রিত হবে না।

'আমি তাঁর জীবনের কথা সেই থেকেই ভাবতে লাগলাম—সূচনা সেদিন থেকেই।'

শিল্পী অসিতহালদারকে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি

শ্রীগৌতম হালদার

তরুণ কৃতবিদ্য এঞ্জিনিয়র,—প্রখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-অলঙ্করণের কাজে চারজন ভারতীয় শিল্পী লণ্ডনে গিয়েছিলেন। এঁরা হলেন, শান্তিনিকেতনের শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, শ্রীসুধাংশু রায়চৌধুরী, লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীললিতমোহন সেন এবং দিল্লীর শ্রীরণদা উকীল। রয়েল কলেজ অব্ আর্টসের অধ্যক্ষ উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ছিলেন তাঁদের প্রধান উপদেষ্টা। শিল্পী অসিত-কুমার হালদার ঐ কাজের প্রসঙ্গে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ লেখাটি পড়ে এবং অসিতকুমারের আরও কোন প্রশ্নের উত্তরে সক্ষোভে যে পত্রটি লেখেন, এখানে সেটি প্রকাশিত হচ্ছে। স্মরণ থাকা দরকার, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন ছবি আঁকায় মেতেছেন। এই মূল্যবান পত্রটিতে আমরা পাই এক স্বদেশপ্রেমী স্বাধীনচেতা মনীষী শিল্পীর অন্তরের অন্তরতম কথা, যা নির্ভীক অপ্রিয়, অত্যন্ত তেজোদ্দীপক স্বাদেশিকতার প্রেরণাদায়ক। রবীন্দ্রনাথের পত্রটি অংশত প্রকাশিত হয়েছিল অসিতকুমারের 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ' রচনায় 'উত্তরা'র কার্তিক ১৩৫৯ সংখ্যায়। পারিবারিক সম্পর্কে অসিতকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাতি। পত্রশেষে "রবিদাদা" স্বাক্ষর লক্ষণীয়। মূল পত্রখানি এই :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অসিত, ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজের সঙ্গে আমার এমন সম্বন্ধ নেই যাতে করে তাঁকে আমি কোনো বিষয়ে কারো জন্যে অনুরোধ করতে পারি। এই জন্যে যোগেশবাবুর আবেদনে আমার সমর্থন যোগ করতে পারলুম না। তাঁর অভিজ্ঞানপত্রে যাঁদের প্রশংসাবাক্য আছে তাঁদের নাম তাঁর পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য করবে।

আমাদের ছাত্রেরা ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাপ-মারা হয়ে আসে এ আমার কিছুতেই ভালো লাগে না। তার ফল হবে এই যে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভা থাকে সেটার উপরে দাগ দিয়ে দেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। আমাদের আর্ট রোটেনস্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আস্তাকুড়েই স্থান পাবার যোগ্য। ব্রিটিশ ইস্কুলমাস্টারের ছাত্রগিরি তো করচিই—সেই ইস্কুলের বাইরে একটা বড়ো আঙিনা আছে যেখানে আমাদের ছুটি—সেইখানেই আমাদের ভারতীর দরবার—সেখানে তিনি যার ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই হয় ধন্য। সাউথ্ কেন্সিংটন স্কুল অফ আর্টসের ফোঁটায় গৌরব নেই—বরঞ্চ তাতে আমাদের সরস্বতীর অমর্য্যাদা করা হয়। এই সব ছাত্রদের খুব সম্ভব নিজের শক্তি আছে কিন্তু ইতিহাসে চিরদিনের মতো লেখা থাকবে যে তারা ইংরেজ গুরু মশায়ের চেলা—এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগৌরব। অর্থের লোভে আর্টিস্ট্ যদি নিজের দৈবী শক্তির অসম্মান করতে সম্মত হয় তাহলে তার উপরে কখনোই ভারতীর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ পড়বে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

রবিদাদা

রাজনীতি নয়—জীবননীতি

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

লেখক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ধন্য,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রবীন্দ্র-অধ্যাপক, টেগোর রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের সভাপতি, রবীন্দ্রপুরস্কার, আনন্দপুরস্কারে এবং শরৎপুরস্কারে সম্মানিত মনস্বী প্রবীণ সাহিত্য-সাধক। গত বছর পীড়িতাবস্থায় তিনি স্বামী অভজানন্দকে একটি পত্র লিখেছিলেন কোন বিশেষ উপলক্ষে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশগুলি উহ্য রেখে পত্রটি এখানে প্রকাশিত হল।

Lake Gardens
Calcutta-45
Date 8th March, 1983

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

স্বামীজী মহারাজ, আপনার ২১.২ তারিখের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। আপাতত ঠাকুর ও মায়ের আশীর্বাদে সুস্থ আছি। কিছুকাল হলো হাঁটুর ব্যথায় ভুগছিলাম। সম্প্রতি তা নিরাময় হয়েছে।...

বর্তমান আদর্শ বিভ্রান্তির যুগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে যথার্থ প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের বর্তিকা দেশের সম্মুখে ধরে রেখেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এযুগের রাজনৈতিক আদর্শ—'এক মত, এক পথ'। ঠাকুরের আদর্শ—'যত মত, তত পথ'। এখন এই দুই আদর্শের মধ্যে স্বভাবতই বিরোধ। এই কারণেই মিশন-পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলি সম্বন্ধে বিশেষ রাজনৈতিক দলের এত বিদ্বেষ। আপনারা প্রত্যক্ষত রাজনীতি না করেও মহৎ অর্থে রাজনৈতিক কর্তব্য সমাপন করছেন। বস্তুত, আপনাদের এই কাজকে রাজনীতি বলাই উচিত নয়; ইহা জীবননীতি। দেশে এখনও যাঁরা বোদ্ধা লোক আছেন, তাঁরা আপনাদের কাজের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম। আপনারা যে আদর্শবর্তিকা ধরে আছেন, তা স্বয়ং ঠাকুর-কর্তৃক প্রজ্জ্বালিত, কাজেই তা কখনো নিভে যাবে, এমন আশঙ্কা নেই। কিন্তু, 'এক মত, এক পথ'-ওয়ালারা যথাসাধ্য বাধা সৃষ্টি করছে ও করবে। তবে ঠাকুরের কৃপায় আপনারা অকুতোভয়। দেশের লোকও আপনাদের পিছনে সহায় আছে। অধিক আর কী লিখবো? আমার মতো সামান্য পদাতিকও আপনাদের অনুগামী।...

আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জ্ঞাপন করছি। ইতি,

ঠাকুরের শরণাগত ভবদীয়,
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মহামাঈ-তলা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ
অধ্যাপক, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কণ্ডাকটার হেঁকে গেল—'মহামাঈ-তলা'। বছর কুড়ি আগে সেই প্রথম নাম শোনা। দুপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। আকাশজোড়া অন্ধকার। দু-চারটে জোনাকি উড়ে সে অন্ধকার গাঢ়তর করেছে। দু-একজনের ওঠা-নামা। বাস ছেড়ে দিল। বুঝলাম 'মহামাই'—উচ্চারণের ঝোঁকে 'মহামাঈ'-তে পরিণত।

যেতে যেতে শুনলাম—একদা প্রবাহিণী গঙ্গার পাশে এইখানটিতে আড্ডা ছিল হন্তারক দস্যু-দের। এমন কত পথিক এখানে বলি হয়ে গেছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে আচমকা ফাঁসে। শুধু রাতে নয়, চারদিকে নিবিড় বনের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথটিতে দিনের বেলায়ও চলত অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠন। সে-সব অশ্রু ও বেদনা-ঝরানো অর্থ ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী কোন মহামায়া, খড়্গ-মুণ্ডধরা সেই জননীকে যারা প্রণাম করে জয়যাত্রায় বেরুত—তাদেরই 'মহামাঈ'র জয়ধ্বনি এই শূন্য অন্ধকারে আজও ঘোষিত—'মহামাঈ-তলা'।

দিন যায়। মানুষ-জন, ঘর-বাড়ি, উদ্বাস্তপল্লী, কল-কারখানায় চারদিকে সে অরণ্যকে ঢেকে ফেলেছে। একদিকে বাসস্ট্যাণ্ড, আর একদিকে ঘনবসতি। কিন্তু এখনও নাম 'মহামাঈ-তলা'। একটু দূরে ক্ষীণতোয়া গঙ্গার ওপারে আছে দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির। একদা বিশালবক্ষে মা গঙ্গা যখন বয়ে যেতেন এ পথের খুব কাছ দিয়ে, তার স্বাক্ষর এখনও অসংখ্য মন্দিরে, স্নানের ঘাটে, ওপারের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে—হয়তো সে যুগেরই স্মৃতি। কিন্তু মহামাঈ-তলা এপারে—সেখানে এখন পুরানো 'থান' বা মন্দিরের জায়গায় নতুন মন্দির গড়ে উঠেছে। নতুন কালের নতুন ভক্তদল তারা আর 'ডাকাত' নয়—এপার ওপার বাংলায় নতুন প্রজন্ম।

বাইরের অরণ্য মুছে যায়, মানুষের মন থেকে বেরিয়ে-আসা ঈর্ষ্যা, ভয়, হিংসা ধীরে ধীরে লোকারণ্যে নরবলি দিতে থাকে। কুড়ি বছর পরে রাতের অন্ধকারে ওই মহামাঈ-তলার কাছেই বাসভর্তি লোকের মধ্যে আর্ত কিশোরের কণ্ঠ শোনা গেল—'বাঁচাও বাঁচাও'। সবাই চেয়ে দেখছে। কেউ নড়ছে না। পনেরো-ষোলো বছরের একটি কিশোরকে চার-পাঁচজন হিংস্র দানব ঘিরে ধরেছে—তুলে নিয়ে যাবে। একটু পরেই ফাঁকা মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে অথবা সকলের সামনে বাসের মধ্যেই শেষ করে দেবে। চার-পাঁচটি ছুরি বা ভোজালি উদ্যত। ত্রাসে সকলের কণ্ঠ রুদ্ধ। এমন ঘটনা চোখের সামনে দেখেও সকলে মুহূর্তে জড় পদার্থে পরিণত।

ঠিক সেই সময় কম্পিত এক বৃদ্ধের কণ্ঠ শোনা গেল—'কে তোমাকে নিয়ে যাবে? আমরা আছি না? বাসসুদ্ধ লোক!' বলে তিনি চারদিকে চাইলেন। সেই আধময়লা পাঞ্জাবি-পরা বাজারের থলে হাতে বৃদ্ধের কোন অস্ত্র নেই, ছাতি-লাঠি কিছু নয়, শুধু দীপ্ত দুটি চোখে আগুন তুলে আছে উদ্যত হত্যাকারীদের দিকে।

হঠাৎ পিছন থেকে আর এক যুবক উঠে দাঁড়াল। সেও বলল: 'আমরা আছি না?' তারপর সামনে থেকে আর একজন বলল: 'আমরা আছি—কিচ্ছু ভেবো না।' সমস্ত বাস না না না—এই না-এর তুমুল শব্দে ভরে গেল।

আর মুহূর্তে গুণ্ডা বা ডাকাত বা রাজনৈতিক পাণ্ডা—সেই বীরের দল তীব্রবেগে ছুটে-চলা বাস থেকে লাফিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এক মিনিট পরে কণ্ডাকটার 'মহামাঈ-তলা' বলে ঘোষণা করল।

মনে মনে প্রণাম করলাম দেবী মহামায়াকে—মৃত্যু ও জীবন যাঁর দৃষ্টিপলকে একটু আগে উদ্ভাসিত দেখেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ

ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং কলা ও বাণিজ্য শাখার সচিব। বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কলকাতার মানুষ। জব চার্নকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, যে কলকাতা একদিন ছিল গ্রাম, পরবর্তী যুগে এক বিরাট শিল্পনগরী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর তিনখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে যে ভবিষ্যতে নগরীর সূচনা হয়েছিল বিবেকানন্দের জন্মের সময়েই সেই নগরী ধীরে ধীরে মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং সেই অর্থে বিবেকানন্দের জন্ম মহানগরী কলকাতায়, শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ কলেজে। একজন নগর-সচেতন মানুষ প্রকৃত অর্থে নাগরিক মিসেস ওলিবুলকে ১০ ফেব্রুআরি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক চিঠিতে গ্রাম-বাংলার একটি শিল্প সৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছেন। চিঠিতে লিখেছেন : "আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায় আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও নাম বাংলো।"

তিনি আরও বললেন : "প্রাচীনকালে কোনো ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম। তবে এখনো যে-কটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও।" সুতরাং এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, উত্তর কলকাতার বনেদি অঞ্চলের মানুষ, যাঁর অধীত বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও দর্শন, তাঁর মধ্যে এই লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি, গ্রাম-বাংলার লোকশিল্পের প্রতি, সামগ্রিকভাবে দেশজ ও গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এত আকর্ষণ ও অনুরাগ কি করে সম্ভব হল। আসলে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর এ-পথেরও দিশারী। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ-স্বরূপ। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চিরায়ত বাণী-গুলিকে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা ও বিচিত্র উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি সরল কথায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাই স্বাভাবিক কারণেই লোকায়ত গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দও লোকসংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি নিজেকে, বরঞ্চ বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

দেশের যুবকদের প্রতি স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠের সেই আহ্বান : "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়··· যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষ-গণের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই মানবপ্রেম, স্বদেশা-নুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, ক্ষুধার্তকে অন্নদানের স্পৃহা, শিক্ষা দ্বারা সর্ব-সাধারণের উন্নতির প্রচেষ্টা এ সমস্ত কিছুর মূলে

আছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণেরই লোকায়ত শিক্ষা-রীতির প্রভাব, যা তাঁকে অসাধারণভাবে মানব-সুহৃদ্ করে তুলেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি অন্ধকারে ভরা ভারতবর্ষের সমস্তকিছুকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন। আর এইভাবেই তিনি লোকায়ত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে।

'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-প্রসূত নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের লোকায়ত ঐতিহ্যটি সামগ্রিকভাবে স্বামীজীর চোখে ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষ কি ব্যাপক বিশাল বিচিত্র ও গভীর স্বামীজীর কথায়:

"সত্যই এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়ত সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ-বানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোনো স্থানে খুঁড়িলে মিলিবে। হ্রদবাসী বা নদীতীর-বাসীরা নিশ্চয় কোনোকালে এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্র-সজ্জাকারী, তৎসহ বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনো নানা অঞ্চলে দেখা যাইবে। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয় দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মিলিত। পারসিক, গ্রীক, ইহুদি, হুন, চীন, সীথিয়ান—অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল দি, যাহারা এখনো একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই সকল বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানব-সমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, নিয়ে ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া, আবার শান্ত হইতেছে। ইহাই ভারত-বর্ষের ইতিহাস।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ: শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২)

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মূলে যে অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল ভীল সাঁওতাল ইত্যাদি আষ্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান একথা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সমস্ত ভারত পর্যটন করে ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির মর্মমূলটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট ছিল। ভগিনী ক্রিস্টিন লিখেছেন:

"আমি মনে করি, আমাদের ভারত-প্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন স্বামীজীকে India শব্দটি তাঁর সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়। তাতে ছিল—ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা—ভালবাসা। কোন বিরাট গ্রন্থও এইভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। যে-ই তা শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তখন ভারতের সবকিছুই তার আগ্রহের বস্তু; তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম ধারণা, শাস্ত্রাদি—সবকিছু জীবন্ত।" (রেমিনিসেন্স, পৃঃ ১৫৭—৫৮)

ভগিনী নিবেদিতাও একটি প্রবন্ধে স্বামীজীর চারিত্রিক বিশেষত্ব বুঝতে গিয়ে লিখেছিলেন :

"দু-পয়সার ডাকটিকিট, সস্তার রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে—এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। ভারতের কোন মৌল ঐক্য থাকলেই তবে ঐ জিনিসগুলি তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে—তার ফলে যে ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, গভীর ও ব্যাপক।" (The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work—হিন্দু পত্রিকা; ২৭ জুলাই ১৯০২)

স্বামী বিবেকানন্দের এই লোকপ্রীতি ও লোক-সাধারণ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, লোকশিক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, লোকাচারের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ—এ সমস্ত কিছুই যে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা ভগিনী নিবেদিতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে সার্থকভাবে ধরা পড়েছে।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার রূপটি স্বামীজী ভারত পর্যটনকালে কিভাবে অবলোকন করেছিলেন তার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় নিবেদিতার অন্য একটি রচনার মধ্যে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের কৃষি, কৃষক, কৃষকের জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে যুক্ত তা স্বামীজী কী গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাও নিবেদিতার ভাষায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

"আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত-খামার, গ্রাম ও সমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময়ে তাদের সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে যে-ধরনের প্রবল প্রগাঢ় তদ্গত ভাল-বাসার রূপ দেখেছি, এমনটি আর কখনও দেখিনি। এইখানে তিনি অবাধে নিজ দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিরূপে তাগে জমি চাষ হয়, বুঝিয়ে দিতেন, কিংবা কৃষক গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করতেন, খুঁটিনাটি পর্যন্ত বাদ যেত না—যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য সারারাত উনুনে খিচুড়ি ফুটত, ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, তাঁর নিজের পরিব্রাজক-জীবনের স্মৃতিই এই সব বর্ণনা-কালে তাঁর নয়নকে উজ্জ্বল এবং কণ্ঠকে ভাবাবেগে কম্পিত করে তুলত। আমি সাধুদের কাছে শুনেছি, দরিদ্র কৃষকের কুটীরে যেমন অতিথি-সেবা হয়, এমনটি আর কোথাও নয়। সত্য বটে যে, কৃষকপত্নীর পক্ষে বিচালি ছাড়া শুতে দেবার জন্য অন্য কোন শয্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, কুটীরের বাইরের দিকে মাটির চালার আশ্রয়ই তিনি মাথা গোঁজার জন্য দিতে পারতেন—সেই নারীই আবার বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিজে শুতে যাবার আগে, চুপিচুপি একটি দাঁতন ও এক বাটি দুধ এমন এক জায়গায় রেখে যেতেন যাতে অতিথি ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে পান এবং তৃপ্তিভরে সে জায়গা থেকে চলে যেতে পারেন।" (ঐ, পৃঃ ৩১—৩২)

নিবেদিতার চোখে স্বামীজীর এই সকল বিশ্লেষণ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, স্বামীজীর দেখা ভারতবর্ষ কেবল স্বপ্ন ও স্মৃতির ভারতবর্ষ নয়, একেবারে পায়ে হেঁটে গ্রাম-ভারতের জমির আলের ওপর দিয়ে কৃষকের কুটীরের পাশ দিয়ে, কখনও বা চাষবাসের কাজ দেখতে দেখতে, কখনও কৃষক রমণীর কুটীরে গৃহস্থালীর কাহিনী শুনতে শুনতে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা ভারতবর্ষ। একমাত্র স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনেই লোকায়ত ভারতবর্ষের গ্রাম-

জীবনকে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি সেখানকার মানুষকে ভালবেসেছিলেন। প্রকৃত দরিদ্র ভারতবর্ষ কি, চণ্ডাল ভারতবর্ষ কি, মূর্খ ভারতবর্ষ কি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অভিশাপ কোথায় লুকিয়ে আছে—দারিদ্র্যে অস্পৃশ্যতায় অজ্ঞান অন্ধকারে তার পরিচয় লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন চিঠিতে লিখছেন অচ্ছুৎদের সম্বন্ধে; তাদের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন। তদানীন্তন ভারতবাসীর সংস্কার, কুসংস্কার, অত্যাচার ব্যভিচার সমস্ত কিছু স্বামীজীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের চিঠিতে তিনি ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে বলছেন "মহা দ'ক সামনে: সাবধান! ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস্।" (পত্রাবলী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৩)।

পদব্রজে ভারত পর্যটনের ফলস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধি আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও স্বামীজী যে ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে তার মূল আত্মাটিকে, তার স্বরূপটিকে বাস্তবরূপে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সর্বোপরি আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, এটা আজ সমস্ত ভারতবাসীর অনুধাবন করা দরকার।

ভারতবর্ষের অধোগতির যে কারণ স্বামীজী বিশ্লেষণ করেছেন একান্তভাবেই তা বাস্তব গবেষণা-প্রসূত। আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য বিবেকানন্দ সোচ্চারে বলেছেন যে, যুগ যুগ সঞ্চিত মানুষের অপমান-অবজ্ঞা-লাঞ্ছনা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, শোষণ আর অত্যাচার, ধর্মীয় আচারের ছলে নষ্টামি ও ব্যভিচার, ক্ষমতাশীলদের সুচতুর শোষণ—নারীজাতিকে হেয় জ্ঞান ইত্যাদি—ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ। তাই সমস্ত ভারত পর্যটনশেষে তিনি তৎকালীন সমাজের যে চিত্রখানি এঁকেছিলেন তা বাস্তবিকই মর্মস্পর্শী। রোষ-দৃপ্ত কিন্তু বেদনামথিত ভাষায় যখন তিনি বলেন:

"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!" (ঐ, পৃঃ ১৫৫) তখন লোকায়ত ভারতবর্ষের অধঃ-পতিত ও অন্তঃসারশূন্য রূপটি আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্মম সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: "সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাসা, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।" (ঐ, পৃঃ ৩৭৪)

তাঁর এই আদর্শের সামনে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে অবলম্বন করেই এই ভারত আবার জাগ্রত হবে—এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন। তাই স্বামীজীর আহ্বান বাণী: "যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।" (ঐ, পৃঃ ৩৭২)

কিভাবে নতুন ভারতবর্ষ তৈরি হবে, কিভাবে দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা দূর হবে, অস্পৃশ্যতা অন্ধতা দেশ থেকে মুছে যাবে তার উপায়ও স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে চিকাগো থেকে স্বামীজী তাঁর ভারত-উন্নয়নের স্বপ্নকে কিভাবে সার্থক করা যায়, বাস্তবায়িত করা যায় সে সম্পর্কে লিখছেন: "দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে— ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।" (ঐ, পৃ: ১৫৬)

এর প্রতিকারকল্পে সন্ন্যাসী হিসাবে কি করা কর্তব্য এবং এখনই বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যে যে নেমে পড়া উচিত এবং তার দ্বারা কিভাবে লোকায়ত ভারতবর্ষের কিছুটা মঙ্গলসাধন হতে পারে সে-সম্পর্কেও স্বামীজী বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করছেন:

"মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্ কাম করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা।" (ঐ, পৃ: ১৫৬)

স্বামীজী ভারত পর্যটনের মধ্য দিয়ে যে লোকায়ত ভারতবর্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন তাতে তিনি মনে করতেন যে, চণ্ডালের বিদ্যা-শিক্ষার যত প্রয়োজন ব্রাহ্মণের তত নয়। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক হয়, চণ্ডালের ক্ষেত্রে দশজনের আবশ্যক হবে। এ অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের লোকায়ত মানুষ ও জীবন পর্যালোচনা করে তিনি এই মহৎ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন: "The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God." (ঐ, পৃ: ৩৭৩)

লোকায়ত ভারত পর্যটনে স্বামীজীর অনন্ত মহিমা এখানেই যে, তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন, আগামী দিনের দরিদ্রনিপীড়িত অজ্ঞ মানুষেরাই হবে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য আরাধ্য—মানুষের সেবাই হবে ভগবানের আরাধনা।

যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্ত-বুদ্ধি পরপদদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর-নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশী নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মদালসা

স্বামী চৈতন্যানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকায় সহায়ক।

পুরাণে বহু মহীয়সী নারীর কথা আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের এইরকম এক মহীয়সী নারী মদালসা আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হিন্দুর একটি চিরন্তন আদর্শের প্রতিমূর্তি তিনি। একাধারে সাধ্বী স্ত্রী এবং কল্যাণময়ী জননীরূপে তিনি হিন্দু-ভারতে চিরস্মরণীয়া। স্বয়ং ব্রহ্মবাদিনী হয়েও তাঁর জ্ঞানের মহিমাকে বাইরে জাহির না করে তিনি স্বামীর আজ্ঞাধীনা বিশ্বস্ত সহধর্মিণী এবং শিক্ষাদাত্রী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননী ছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে তাঁর জায়া ও মাতা এই দুটি রূপেরই অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে :

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসা একদিন উদ্যানমধ্যে আনন্দে বিহার করছিলেন। এমন সময় বজ্রকেতু দানবের পুত্র দুরাত্মা পাতালকেতু তমোময়ী মায়া বিস্তার করে মদালসাকে বিবাহ করার জন্য অপহরণ করে নিয়ে যায় পাতালে দানব-রাজপ্রাসাদে। তাঁর সখী বিন্ধ্যবানের কন্যা এবং মৃত পুষ্করমালীর স্ত্রী কুণ্ডলা তীর্থ-দর্শনাভিলাষে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি দেখেন সখী মদালসা একটি কক্ষে বন্দিনী হয়ে শোকে মুহ্যমানা। পাতালকেতু তাঁকে বিবাহ করার জন্য একটি তিথি ঠিক করেছে। এই তিথি সন্নিকট দেখে মদালসা ভীত হয়ে আত্মবিসর্জন করতে গেলেন। সেই সময় গোমাতা সুরভি তাঁকে প্রাণবিসর্জন দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন : 'কল্যাণি! তুমি আত্মবিসর্জন করো না। এই দানব তোমাকে বিবাহ করতে পারবে না। এই দুরাত্মা পাতাল-কেতু যখন মর্ত্যে যাবে তখন তাকে যে-ব্যক্তি শরবিদ্ধ করবেন তিনিই হবেন তোমার স্বামী। অতএব তুমি ভয় পেয়ে আত্মবিসর্জন করো না।' সুরভির কথায় মদালসা আশ্বস্ত হলেন।

আগামী কাল নির্ধারিত সেই বিবাহের তিথি। মদালসা গভীর উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। সখী কুণ্ডলা কক্ষের বাইরে এসে দেখতে লাগলেন সত্যি সত্যি কোন ব্যক্তি দুরাত্মাকে শরবিদ্ধ করেছেন কিনা। এই সময় কুণ্ডলার সঙ্গে বীর ঋতধ্বজের দেখা হল।

ঋতধ্বজ পিতা রাজা শত্রুজিতের আদেশে, গালবমুনির আশ্রমকে জন্তুজানোয়ারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। দানবরাই নানা ছদ্মবেশে ঐসব উৎপীড়নাদি চালাত। সেই সময় পাতালকেতু শূকরের মূর্তি ধারণ করে আশ্রমবাসীদের যাগযজ্ঞে বিঘ্ন করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ঋতধ্বজ তাকে অর্ধচন্দ্রবাণে বিদ্ধ করেন। সে দ্রুতবেগে পাহাড়-পর্বত-বনজঙ্গল ঘুরে হঠাৎ একটি গর্ত দিয়ে পাতালে প্রবেশ করল। ঋতধ্বজও গালবমুনি-প্রদত্ত মর্ত্য-পাতাল-আকাশে গমনকারী কুবলয় নামে অশ্বে চড়ে তাকে অনুসরণ করেন। ঋতধ্বজ কুবলয়ে চড়ে বেড়ানোর জন্য কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন। যাই হোক, তিনি পাতালে প্রবেশ করে বিরাট রাজপ্রাসাদ ছাড়া কোন জনমানবকে দেখতে পেলেন না। তিনি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিগোচর হল মদালসার সখী কুণ্ডলাকে। তিনি তাঁকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কুণ্ডলা কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে প্রাসাদের উপরতলায় একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজকুমার ঋতধ্বজও তাঁকে অনুসরণ করে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে অপরূপ সুন্দরী মদালসাকে দেখতে পেলেন। মদালসাও তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি মূর্ছা গেলেন। ঋতধ্বজ কুণ্ডলাকে মূর্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কুণ্ডলা বললেন : 'হে

প্রভো! আপনাকে দর্শনাবধি এবং আপনার মনোহর বাক্যশ্রবণে আমার সখী মদালসা আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। কিন্তু যিনি পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করবেন, তিনিই তাঁর স্বামী হবেন। কিন্তু আপনি সেই ব্যক্তি কিনা সখী জানেন না। আপনি যদি সেই ব্যক্তি না হন তাহলে তাঁকে সারাজীবন দুঃখভোগ করতে হবে—এই ভেবেই তিনি মূর্ছা গেছেন।'

ঋতধ্বজের পরিচয় জেনে মদালসা ও সখী কুণ্ডলা খুশি হলেন। তারপর কুণ্ডলা মদালসার সঙ্গে ঋতধ্বজের বিধিমতে বিবাহ দিলেন এবং নববরবধূর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কালে রাজকুমার ঋতধ্বজকে বললেন: 'হে অরিন্দম! আপনাকে কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা। তবু বলছি, কারণ সখীর স্নেহে আকৃষ্ট হয়ে কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। স্ত্রীকে রক্ষা এবং ভরণপোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হলে ধর্ম, অর্থ ও কাম তিনটি লাভ হয়। যখন উভয়েই পরস্পরের বশানুগত হয় তখনই ধর্ম, অর্থ ও কাম —এই তিনটিরই মিলন ঘটে। কারণ এই ত্রিবর্গ দাম্পত্যকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করে অবস্থিত।'

এই সময় দানবরা জানতে পারল যে, রাজকন্যা মদালসাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন দানবরা পাতালকেতুর নেতৃত্বে ঋতধ্বজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। বীর ঋতধ্বজ হাসতে হাসতে অবলীলায় দৈত্যদের সমূলে বিনাশ করে, স্ত্রী মদালসাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন এবং পিতামাতাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। পিতামাতা খুশি হয়ে পুত্র ও নববধূকে সাদরে বরণ করে নিলেন এবং তাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। নববধূ মদালসাও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে স্বামিসঙ্গে আনন্দে রাজপ্রাসাদে দিনযাপন করতে লাগলেন।

*

আবার দৈত্যদের উৎপাতে মুনিঋষিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এই সংবাদ শুনে রাজা শত্রুজিৎ পুত্র ঋতধ্বজকে তাঁদের আশ্রমরক্ষার্থে পাঠিয়ে দিলেন। ঋতধ্বজ সেখানে গিয়ে তাঁদের বিঘ্নসকল দূর করতে লাগলেন। এই সময় পাতালকেতুর ছোট ভাই তালকেতু প্রতিহিংসা গ্রহণ করার জন্য এক মুনিরূপ ধারণ করে যমুনাতীরে আশ্রম করে বাস করছিল। একদিন ঋতধ্বজ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে দানব তালকেতুর আশ্রমে গেলেন। তখন মুনিরূপধারী তালকেতু যজ্ঞাভিলাষী হয়ে ঋতধ্বজের কাছে তার কর্ণের কুণ্ডলটি প্রার্থনা করল—যজ্ঞে দক্ষিণাপ্রদানের উদ্দেশ্যেই যেন মুনির ঐ ভিক্ষা চাওয়া! আরও নিবেদন করল যে, বরুণদেবকে স্তবে সন্তুষ্ট করার জন্য সে জলমধ্যে প্রবেশ করবে—যতক্ষণ সে না ফিরে আসে ততক্ষণ ঋতধ্বজ যেন আশ্রমটি পাহারা দেন। ঋতধ্বজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্ণের কুণ্ডলটি ছদ্মবেশী দানবকে দান করলেন এবং তার আশ্রমও পাহারা দিতে সম্মত হলেন। তখন সে খুশি হয়ে জলে প্রবেশ করল।

এদিকে তালকেতু কিছুক্ষণ পর জল থেকে উঠে সেইরকম মুনির ছদ্মবেশে সোজা রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকুমার ঋতধ্বজের পিতাকে সংবাদ দিল: 'আমার আশ্রমের নিকট তপস্বীদের রক্ষায় নিযুক্ত কুবলয়াশ্বের অশ্বটিকে দুষ্ট অসুররা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে এবং তাঁকেও সেখানে হত্যা করেছে। তিনি মারা যাওয়ার সময় এই কুণ্ডলটি আমাকে প্রদান করেছেন। বনমধ্যে শূদ্র তাপসগণ তাঁর মৃতদেহ অগ্নিসংযোগে সৎকার করেছে।' তারপর ছদ্মবেশী তালকেতু রাজা শত্রুজিৎকে কুণ্ডলটি দিয়ে বলল: 'আমি তপস্বী। এই কুণ্ডল নিয়ে আমি কী করব!' দানব অতঃপর চলে গেল। এদিকে এই দুঃসংবাদে ঋতধ্বজের পিতামাতা-আত্মীয়স্বজন গভীর শোকসাগরে

নিমগ্ন হলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন। আর পতিব্রতা পতিগতপ্রাণা মদালসা স্বামিনিধনের সংবাদ এবং তাঁর কর্ণের কুণ্ডলটি দর্শনমাত্র প্রাণত্যাগ করলেন। স্বামিবিহনে সংসার তাঁর কাছে দুর্বিবহ! মদালসার প্রাণত্যাগে রাজপ্রাসাদের সকলে আরও গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কিঞ্চিৎ শোক উপশম হলে রাজা শত্রুজিৎ পুত্রবধূ মদালসার দেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সৎকার করেন এবং পুত্রের উদ্দেশেও উদকাঞ্জলি দান করলেন।

ওদিকে তালকেতু রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসেই নদীতে নেমে পড়ল এবং যেন এক্ষুনি জল থেকে প্রথম উঠে আসছে এমন ভান করে, আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়ে রাজনন্দন কুবলয়াশ্বকে এত সময় ধরে আশ্রম পাহারা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে থাকে। কুবলয়াশ্বও সরল মনে ছদ্মবেশী মুনিকে প্রণাম করে পিতামাতা এবং স্ত্রী মদালসাকে দর্শনাভিলাষে দ্রুত রাজপ্রাসাদে গমন করলেন। পিতামাতা-আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁকে এমনভাবে ফিরে পেয়ে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবলেন পুত্রকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে দেব-কৃপায়। তারপর পিতা শত্রুজিৎ ঋতধ্বজকে দুঃখের সঙ্গে মদালসার প্রাণত্যাগের কথা বললেন। শুনে ঋতধ্বজ সাধ্বী পত্নী মদালসার শোকে নিদারুণ কাতর হয়ে পড়লেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আর কোন নারীকে বিবাহ করবেন না। স্ত্রী মদালসার চিন্তায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন।

নাগাধিপতি অশ্বতরের দুই পুত্রের বন্ধু ঋতধ্বজ। পুত্রদ্বয়ের কাছ থেকে মদালসার দেহত্যাগের দুঃসংবাদ শুনে—শোকবিহ্বল ঋতধ্বজের শান্তি প্রদানের জন্য তিনি মদালসার পুনরুজ্জীবন কামনায় দুশ্চর তপস্যায় রত হলেন এবং দেবী সরস্বতীর স্তব করতে থাকলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সরস্বতী অশ্বতর ও তাঁর ভ্রাতাকে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের শ্রেষ্ঠ গায়ক হওয়ার বর প্রদান করলেন। শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়ে তাঁরা হিমালয়ে গিয়ে সঙ্গীতে মহেশ্বরকে তুষ্ট করলেন। প্রীত হয়ে মহেশ্বর তাঁদের বর দিতে চাইলে অশ্বতর বর প্রার্থনা করেন: 'কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা জীবন বিসর্জন করেছেন। তিনি যে বয়সে দেহত্যাগ করেছেন, সেই বয়সেই আমার কন্যা হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করুন। পূর্বে তাঁর যেরূপ কান্তি বিদ্যমান ছিল, সেইরকমই যেন তাঁর কান্তি হয় এবং তিনি যেন জাতিস্মরা, পূর্ববৎ যোগিনী ও যোগজননী হয়ে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।' মহেশ্বর 'তথাস্তু' বলে বর প্রদান করলেন এবং বলে দিলেন কিভাবে মদালসার পুনরায় জন্ম হবে। তাঁরা কৃতার্থ হয়ে পাতালে চলে গেলেন। অশ্বতর মহেশ্বরের নির্দেশানুযায়ী শ্রাদ্ধের পিণ্ডের মধ্যমভাগ ভোজন করে ধ্যান করতে করতে শ্বাসত্যাগ করা মাত্র মদালসার পুনরায় উদ্ভব হয়। তিনি তাঁকে রাজপুরীতে লুকিয়ে রাখেন এবং পুত্রদ্বয়কে বলেন তাঁদের বন্ধু ঋতধ্বজকে পাতালে নিয়ে আসার জন্য। পুত্রদ্বয় একদিন মর্ত্যে গিয়ে বন্ধু ঋতধ্বজকে পিতা অশ্বতরের কাছে নিয়ে আসেন। ঋতধ্বজকে নাগাধিরাজ অশ্বতর পরম আদর-যত্নসহকারে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর ঋতধ্বজের প্রিয়তমা স্ত্রী মদালসাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন। ঋতধ্বজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তখন নাগাধিরাজ মদালসাকে কিভাবে পুনর্জীবিত করেছেন তা আনুপূর্বিক সমস্তই তাঁকে বললেন এবং মদালসাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। ঋতধ্বজ রাজপ্রাসাদে ফেরার জন্য সেই অদ্ভুত অশ্বের স্মরণমাত্রই সে এসে উপস্থিত হল। মদালসাকে নিয়ে তিনি তখন অশ্বতরকে প্রণাম এবং বন্ধুদ্বয়কে আলিঙ্গনাদি করে হৃষ্টচিত্তে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মদালসাসহ ঋতধ্বজ রাজপ্রাসাদে ফিরে আসাতে রাজপুরী আবার আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। মদালসাকে পুনঃপ্রাপ্তির ঘটনা ঋতধ্বজ পিতামাতাকে সব বললেন। ঘটনা শুনে পুরবাসিগণ আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। আর এদিকে তাঁকে নিয়ে ঋতধ্বজ আনন্দে গিরিনির্ঝরে নদীপুলিনে, মনোহর বন ও উপবনে বিহার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে রাজা শত্রুজিতের মৃত্যু হলে রাজ্যভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

মদালসা পুনর্জীবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবাদিনী হয়েছিলেন। তাঁর কাছে সংসারের সুখভোগ তখন অতি তুচ্ছ। তবু তিনি স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর সঙ্গে নানাস্থানে যেতেন,—আনন্দ-আহ্লাদ করছিলেন। যথাকালে তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তান জন্মাল। ঋতধ্বজ নবজাত পুত্রের নামকরণ করেন বিক্রান্ত, তাই শুনে মদালসা হেসে ওঠেন,—কিছু বলেন না। মদালসা শিশুপুত্রকে প্রথম থেকেই আত্মবোধ জাগরণের জন্য শিক্ষা দিতে লাগলেন। যখন শিশুপুত্র কাঁদছে, তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দোলনায় দোল দিতে দিতে কথাচ্ছলে বলছেন:

'রে পুত্র! তুমি শুদ্ধ, তুমি নামহীন, অধুনা কল্পনামাত্র সহায়ে তোমার নামকরণ হয়েছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক জেনো। অতএব এই দেহ যেরূপ তোমার নয়, তুমিও সেরূপ এই দেহের নও, তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? অথবা তুমি কাঁদছ না, ঐ শব্দ রাজকুমারকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হচ্ছে। নানাপ্রকার ভৌতিক গুণ ও অগুণ সকল তোমার ইন্দ্রিয়সমূহে বিকল্পিত হয়েছে। অতি দুর্বল ভূতসকল যেমন ভূতসহায়ে অন্ন বারিবর্ষণাদি দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে থাকে, তোমার সে প্রকার বৃদ্ধি বা ক্ষয় কিছুই নেই। তোমার এই দেহ আচ্ছাদনমাত্র; এ শীর্ণ হয়ে যাবে, সেজন্য তুমি মোহে অভিভূত হয়ো না। ইত্যাদি।'

এইভাবে রাজমহিষী মদালসা খেলাচ্ছলে কথাবার্তায় নির্মলাত্মা শিশুপুত্রকে আত্মবোধ প্রদান করতে লাগলেন। শিশুপুত্র বিক্রান্তও ধীরে ধীরে যেমন পিতার কাছ থেকে বল ও বুদ্ধি পেল, তেমনি মাতার কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করে বর্ধিত হতে লাগল। জননীর কাছে আজন্ম আত্মজ্ঞানের বিষয় উপদেশ শুনে শুনে পুত্র বিক্রান্তের জ্ঞানের উদয় হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই সংসারের প্রতি মমতা বিদূরিত হওয়ায় গার্হস্থ্যধর্মে তার আর স্পৃহা রইল না।

কিছুকাল পরে মদালসার দ্বিতীয় পুত্র হল। ঋতধ্বজ এই পুত্রের নাম রাখলেন সুবাহু। নাম শুনে মদালসা এবারেও হেসে ওঠেন। শিশুকাল থেকে তাকেও লালন-পালনের মধ্য দিয়ে মা মদালসা আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন এবং শিশুও মাতার শিক্ষায় বড় হয়ে সংসারধর্মে উদাসীন হয়ে ওঠে। মদালসার তৃতীয় পুত্র হল। এবার রাজা ঋতধ্বজ পুত্রের নামকরণ করলেন শত্রুমর্দন। পুত্রের এই নাম শুনেও রানী মদালসা জোরে হেসে উঠেছিলেন। তাকেও জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করলেন মদালসা। অবশেষে তাঁর চতুর্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করল। এবারও রাজা পুত্রের নামকরণ করতে গেলেন, কিন্তু মদালসার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি হাসছেন। তখন রাজা ঋতধ্বজ জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে মদালসে! আমি নামকরণ করলেই তুমি হাস কেন? আমার তো মনে হয় রাজপুত্রের যেরকম নাম হওয়া উচিত সেরকম নামকরণ করেছি। তোমার বিবেচনায় যদি তা ভাল না হয়ে থাকে তাহলে তুমি এই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখ।' মদালসা বললেন: 'হে মহারাজ! আপনার আদেশ পালন করা আমার সর্বথা কর্তব্য। সুতরাং আপনার ইচ্ছানুযায়ী এই

পুত্রের নামকরণ করছি—অলর্ক (পাগলা কুকুর)। এই নামেই সে ধরাতলে খ্যাতিলাভ করবে। আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রের মহাবুদ্ধি হবে।' পুত্রের এই অসম্বদ্ধ নাম শুনে রাজা হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে মদালসে! এই নামের অর্থ কি?' উত্তরে মদালসা বললেন: 'হে রাজন্! নামকরণ লোকাচার ও কল্পনামাত্র। নাম রাখতে হয় বলে একটি রাখলাম। আর আপনি যে-সকল নাম রেখেছেন তারও কোন অর্থ নেই। কারণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে, আত্মা সর্বব্যাপী। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়াকে ক্রান্তি বলে। আত্মা সর্বগত সর্বব্যাপী ও দেহের ঈশ্বর, তাই তাঁর গতি সম্ভব নয়। এই জন্যই "বিক্রান্ত" নামের কোন অর্থ নেই। হে মহারাজ! আপনি যে দ্বিতীয় পুত্রের নাম "সুবাহু" রেখেছেন তারও কোন অর্থ নেই, কারণ আত্মা সর্বপ্রকার অবয়বহীন। আর তৃতীয় পুত্রের নাম তো অসম্বদ্ধ। কারণ, আত্মা সকল শরীরেই বিরাজিত, সুতরাং তাঁর আবার শত্রু-মিত্র কি? ভূত দ্বারা ভূতগণ মর্দিত হয়। যিনি অবয়বহীন তাঁর আবার মর্দন কি করে সম্ভব? আত্মা দ্বেষশূন্য, তাঁর আবার অরি কে? কি করেই বা মর্দন করবেন? অতএব আমি যে অলর্ক নাম রেখেছি, তা কি প্রকারে অর্থহীন আপনার কাছে?' রানী মদালসার এই কথা শুনে রাজা ঋতধ্বজ বললেন: 'তোমার সকল কথাই সত্য।' অতঃপর মদালসা চতুর্থ পুত্র অলর্ককে আত্মবোধের উপদেশ দিতে উদ্যত হলে, রাজা বাধা দিয়ে বললেন: 'এই পুত্রকে তুমি জ্ঞানের উপদেশ দিও না। একে নিবৃত্তিমার্গের শিক্ষা দিও না। আমার কথা শোনা যদি তুমি কর্তব্য বলে মনে কর, তাহলে একটি পুত্রকে অন্ততঃ প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষা দাও। তা না হলে যে আমাদের বংশ রক্ষা হবে না, পিতৃপুরুষরাও পিণ্ডদান থেকে বঞ্চিত হবেন।' রাজার অনুরোধে পতিব্রতা মদালসা পুত্র অলর্ককে শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষাই দিতে লাগলেন: 'পুত্র! বড় হও। মিত্রগণের উপকার করে, শত্রুকুলের বিনাশ করে আমার পতিকে আনন্দিত কর। হে পুত্র! তুমি ধন্য, কারণ তুমি নিঃশত্রু হয়ে বহুকাল পৃথিবী পালন করবে। তোমার পালনের গুণে লোকে সুখী হবে, তাতে তোমার ধর্মসঞ্চয় হবে এবং পরিশেষে তুমি অমরত্ব লাভ করবে।'

জননী মদালসা এইভাবে সস্নেহ লালনে ও শিক্ষায় পুত্র অলর্ককে বড় করে তুললেন। অলর্ক একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করল: 'মাতঃ! ঐহিক ও পারত্রিক—এই উভয়ের লৌকিক সুখের জন্য আমার কি করা প্রয়োজন?' মদালসা পুত্রকে বললেন: 'বৎস! রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে ধর্মানুসারে প্রজারঞ্জন করাই নরপতির প্রথম কর্তব্য। শত্রুগণ উৎকোচাদি দ্বারা অমাত্যগণকে দূষিত করেছে কিনা, সযত্নে তা দেখা নরপতির কর্তব্য। হে পুত্র! প্রথমে রিপুগণকে জয় করা দরকার, তা না হলে শত্রুকে পরাভূত করা যায় না। রাজাদের পতনের কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ—এরাই রাজাদের প্রধান শত্রু। অতএব তুমি রিপু জয় করে রাজ্য শাসন কর। শত্রুর সম্মুখে শরভের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করা রাজার কর্তব্য। তিনি শূলিকার ন্যায় শত্রুকে একেবারেই ধ্বংস করবেন। কিন্তু বন্ধকী যেরূপ পরপুরুষের চিত্তবিনোদন করে, নরপতিও সেইরূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করবেন। যিনি এইভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন তিনি ইহলোকে পরম সুখলাভ করে, অন্তিমকালে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করে থাকেন।' এইভাবে জননী মদালসা বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের বিষয়ে বিশদভাবে পুত্র অলর্ককে শিক্ষা দিলেন।

জননী মদালসা গার্হস্থ্য আশ্রম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষা দিয়ে পুত্র অলর্ককে বিধানানুসারে বিবাহ দিলেন এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। কালবশে মদালসা ও রাজা ঋতধ্বজ বৃদ্ধ হলেন। একদিন তাঁরা বাণপ্রস্থ জীবনযাপনের জন্য বনে গমন করেন। যাওয়ার সময় মদালসা পুত্রকে তাঁর হাতের একটি অঙ্গুরীয় খুলে দিয়ে বললেন: 'পুত্র! যখন তুমি রাজ্য শাসন করতে করতে প্রিয়-বন্ধুর বিয়োগজনিত কিংবা শত্রু বা অর্থক্ষয়জনিত দুঃসহ দুঃখের মধ্যে পড়বে তখন অঙ্গুরীয়ের মধ্যে একটি আদেশ-পত্র আছে তা পাঠ করবে

জননী মদালসা কর্তৃক সংসারজীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে রাজা অলর্ক ধর্মানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে প্রজাপালন করতে লাগলেন। অতঃপর একদিন সুবাহু নামে তাঁর যে ভ্রাতা ছিলেন যিনি পূর্বেই বনবাসী হয়েছিলেন—তিনি শুনলেন অলর্ক সুখভোগে প্রমত্ত হয়ে পড়েছে। সুবাহু ভ্রাতা অলর্ককে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারের জন্য শত্রু কাশীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং তাঁকে হীনশক্তি করে দিলেন। শত্রু কর্তৃক প্রপীড়িত হয়ে তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন। তাঁর তখন মাতা মদালসার দেওয়া অঙ্গুরীয়ের কথা মনে পড়ে যায়। এতদিন গুহ্যাচারে রক্ষিত সেই অঙ্গুরীয়ের মধ্যে যে আদেশ-পত্রটি ছিল তিনি তখন তা বের করে বার বার পড়তে লাগলেন: 'সর্বান্তঃকরণে সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। যদি সঙ্গ ত্যাগ না করতে পার, তবে সাধুগণের সঙ্গ করাই কর্তব্য। কারণ, সাধুসঙ্গই পরম ওষুধস্বরূপ। সর্বান্তঃকরণে কাম ত্যাগ করাই উচিত। যদি তা না করতে পার তবে মুক্তি কামনা করবে, কেননা তাই মহৌষধ।' এইভাবে পাঠ করার ফলে তাঁর মনে উদয় হল—মোক্ষ-কামনাই কল্যাণলাভের উপায় এবং সৎসঙ্গই সেই মুমুক্ষা-সাধনের কারণ। তাই তিনি সাধুসঙ্গের আশায় মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের নিকট গমন করেন। তাঁর কাছ থেকে যোগ, আত্মার স্বরূপ কি, মন শরীর ও সুখ-দুঃখের প্রকৃতি কি তা ভালভাবে জেনে রাজা অলর্ক অহংকারমুক্ত এবং জাগতিক সমস্ত বিষয় থেকে আসক্তিশূন্য হন। তিনি নিজ ভ্রাতাকে ও কাশীরাজকে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে তিনি আনন্দে রাজবৈভব পরিত্যাগ করে চিরশান্তির আশায় বনে গমন করেন।

জননী মদালসা যেভাবে তাঁর সন্তানগণকে শৈশব থেকেই আত্মোপদেশ প্রদান সহ মানুষ করে তুলেছেন, ভারতের চিরন্তন আদর্শ তা-ই। সন্তানকে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের পূর্বে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং সে-দায়িত্ব সর্বাগ্রে মাতার। মাতার স্নেহ-ভালবাসা সন্তানের উপর যেভাবে দৃঢ় ছাপ ফেলতে পারে, তা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মাতা যেভাবে শিশুকাল থেকে সন্তানকে শিক্ষা দেবেন সেইভাবেই তার চরিত্র গঠিত হবে।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ঐতিহাসিক নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি

শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে বহুদিন বাস করেছেন—সেখানেই পঞ্চতপা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলমবাজার থেকে মঠ উঠে আসে সর্বপ্রথম এই বাগানবাড়িতেই। স্বামীজীরও বহু স্মৃতি জড়িত এবং সঙ্ঘের ইতিহাসে বহু ঘটনা সমন্বিত এই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িটি ও তৎসংলগ্ন কিছু জমি অবশেষে গত ২০ অগস্ট বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নতুন শাখাকেন্দ্র

গত ৪ জুন ১৯৮৪, পুনের বিবেকানন্দ সোসাইটি বেলুড় মঠের অন্যতম শাখাকেন্দ্র রূপে গৃহীত হয়েছে। অতঃপর এই নতুন শাখাকেন্দ্রটির নাম হয়েছে 'রামকৃষ্ণ মঠ, পুনে'। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন স্বামী ভৌমানন্দ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৮৪-র পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় **পুরুলিয়া** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের মধ্য থেকে ১ম, ৪র্থ, ৮ম ও ১৭শ, **নরেন্দ্রপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে ৬ষ্ঠ, ১১শ ও ১৬শ এবং **বরানগর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

এই বছর উত্তরপ্রদেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হাই-স্কুল পরীক্ষায় **কানপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে ২য় ও ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেছে।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠস্থ শিল্পায়তন—জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল থেকে 'জুনিয়ার ডিপ্লোমা' পাঠক্রমে ১৯৮৪-র পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৯ম ও ১০ম স্থান লাভ করেছে এবং এই স্কুল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক কারিগরি (টেক্‌নিক্যাল স্ট্রীম) পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম এবং ১০ম স্থানও অধিকার করেছে।

ভিত্তি স্থাপন

গত ১৯ অগস্ট, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির অফিস-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

হীরকজয়ন্তী উৎসব

দিনাজপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ থেকে ১২ অগস্ট হীরকজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং তিনি উৎসবের সমাপ্তি-ভাষণও দেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্মসম্মেলন ছিল আকর্ষণীয় এবং এতে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন

সালেম রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলনের একটি আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাদুরাই গান্ধীগ্রামের রুরাল ইনস্টিট্যুটের উপাচার্য ডঃ আরাম এবং পৌরোহিত্য করেন শ্রী টি. এস. অবিনাশিলিঙ্গম্‌। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই সম্মেলনে

যোগদান করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা।

উদ্বোধন-সংবাদ

২৫ অগস্ট স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' প্রতি রবিবার স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও গীতা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামী অজজানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারের স্বামী তথাগতানন্দ 'সারদানন্দ হলে' দুই দিন ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী মেধানন্দ (দিনেশ মহারাজ) গত ১৬ অগস্ট, বেলা ১১টায় মস্তিষ্কে ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত হয়ে পাটনার 'কুর্জি হোলি ফেমিলি হসপিটালে' দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর। গত ১১ অগস্ট তিনি মোরাবাদি (রাঁচি) থেকে পাটনা আশ্রমে যান ছাপড়ায় একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের পথে। পথেই তাঁর জ্বর জ্বর ভাব হয়। রাত্রে পাটনা আশ্রমে ফেরার পরও তাঁর গায়ে জ্বর ছিল। আশ্রমে দুদিন চিকিৎসান্তে রোগ নির্ণীত হয়—মস্তিষ্কে ম্যালেরিয়া। এবং সেই অনুসারে যথাবিধি চিকিৎসাও শুরু হয়। ১৫ অগস্ট অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে পাটনার উল্লিখিত হাসপাতালের ইন্‌টেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সকল রকম চিকিৎসা সত্ত্বেও পরের দিন তিনি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শান্ত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

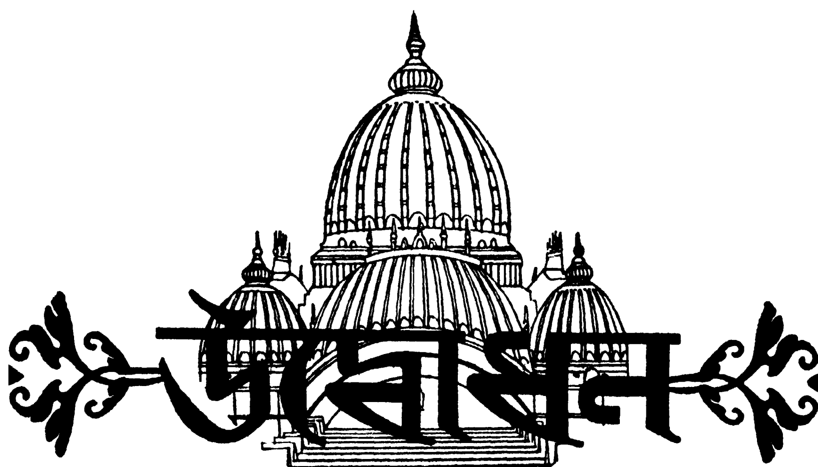
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় সারদাপীঠে যোগদান করেন। ১৯৭৪-এ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সারদাপীঠের কর্মী থাকার পর তিনি মোরাবাদি আশ্রমের কর্মী হয়ে সঙ্ঘের সেবা করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ, অকৃত্রিম ও উৎসর্গীকৃত কর্মী। মিষ্ট অমায়িক ও বিনয়-নম্র ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

*

স্বামী নীলকণ্ঠানন্দ (কৃষ্ণন্ মহারাজ) গত ২০ অগস্ট রাত ১১-৪৫ মিনিটে ৭১ বছর বয়সে ত্রিচুড় আশ্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের একাংশ রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। ৮ অগস্ট সামান্যভাবে এই রোগে তিনি আক্রান্ত হন এবং আশ্রমের চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। অবস্থার একটু উন্নতিও হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ২০ অগস্ট রাত ১১-৩০ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের বড় একটি অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় এবং কিছু পরেই তাঁর দেহান্ত হয়।

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত তিনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আলেপ্পি আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪০-এ তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। আলেপ্পি আশ্রম ছাড়া তিনি সালেম, কালিকট, তিরুভল্লা এবং বেলুড়মঠে বিভিন্ন সময়ে কর্মী হয়ে সঙ্ঘের সেবা করেন। ১৯৪৩ থেকে শেষদিন পর্যন্ত তিনি ত্রিচুড় আশ্রমে ছিলেন। সাধুজীবনের নিষ্ঠা, সরল জীবনযাপন, অদ্ভুত কর্মক্ষমতা ও সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

উপরি-উক্ত সন্ন্যাসিদ্বয়ের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।



৮৬তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] [কার্তিক, ১৩৯১

দিব্য বাণী

এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনালোচনায় আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই দেখিতে পাইব, ইনি দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা ধর্মবিশেষের সম্পত্তি নহেন। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই একদিন শান্তিলাভের জন্য ইঁহার উদারমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।...এশিয়ার ধর্মবিবাদ, ইউরোপের ধর্মহীনতা ও ধর্মবিদ্বেষ সমস্তই ধীর স্থির পদসঞ্চারে শনৈঃ শনৈঃ তিরোহিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব শান্তির রাজ্য স্থাপন করিবে। দেখিতেছ না, ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর হইতে ঐ কার্য কত দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে? দেখিতেছ না, কিরূপে গুরুগতপ্রাণ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে ঠাকুরের ভাব প্রবেশলাভ করিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই চিন্তাজগতে কি যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যতই চলিয়া যাইবে ততই এ অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল ধর্মের ভিতর, সকল সমাজের ভিতর, আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিবে। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? অদৃষ্টপূর্ব তপস্যা ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক তেজোদ্দীপ্ত এ ভাবরাশির সীমা কে উল্লঙ্ঘন করিবে? যে সকল যন্ত্র সহায়ে উহা বর্তমানে প্রসারিত হইতেছে, সে সকল ভগ্ন হইবে, কোথা হইতে ইহা প্রথম উত্থিত হইল তাহাও হয়তো বহুকাল পরে অনেকে ধরিতে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এ অনন্ত-মহিমোজ্জ্বল ভাবময় ঠাকুরের স্নিগ্ধোদ্দীপ্ত ভাবরাশি হৃদয়ে যত্নে পোষণ করিয়া তাঁহারই ছাঁচে জীবন গঠিত করিয়া পৃথিবীর সকলকেই একদিন ধন্য হইতে হইবে নিশ্চয়।

—স্বামী সারদানন্দ

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১১—১২]



কথাপ্রসঙ্গে

বিজয়ার সম্ভাষণ ও প্রার্থনা

দুর্গোৎসবের পরে বিজয়া। যে আনন্দ-ধারা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় আসিল ও বিলীন হইল, তাহারই রেশ চলিতেছে এখনও। আনন্দময়ী মা আসিয়াছিলেন কোথা হইতে,—চলিয়াও-বা গেলেন কোথায়? অসীম কাল-গগনে তাঁহার এই আবির্ভাব ও অন্তর্ধান মানবের কাছে চিররহস্য, কিন্তু নিত্য অনুভূত। দুঃখ-দুর্দশা ভুলিয়া, দল-মত বিস্মৃত হইয়া নারী-পুরুষ যুবা-বৃদ্ধ সকলেই আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছিল—দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে বরণ করিতে, মায়েরই নামে আয়োজিত বিচিত্র সব অনুষ্ঠান-সূচিতে অংশ লইতে। পূজাবসানে মণ্ডপগুলি নিষ্প্রদীপ হইলেও অন্ধকারের মালিন্য জমাট বাঁধে নাই এখনও,—ধূপ-ধুনার সুরভিতে আর ভরিয়া না থাকিলেও একেবারে নিঃশেষে উহা মিলাইয়া যায় নাই। বরং জননীর আগমন-স্মৃতিতে সকলে অভিভূত—পরস্পর পরস্পরকে একই মায়ের সন্তানবোধে নূতনভাবে সাদরে আপ্যায়ন করিতে তৎপর। বিজয়ার পরিবেশ এইরূপই।

বিজয়া হইতেছে বিজয়োৎসব। অসুর-সংহারিণী দুর্গার দুর্বার কৃপা-প্রতাপে অসুর-নিধন সম্পন্ন হইলে দেবতারা সানন্দে পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধরত সৈন্যগণের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন। স্বর্গের দেবতারা মনুষ্যকুলের ঋষিগণের সহিত সম্মিলিত কণ্ঠে সেদিন দেবী জগদম্বার স্তবগান করিয়াছিলেন—নৃত্য-বন্দনাদিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। 'প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ।' তেজোময়ী জননীর অমোঘ করুণায় বলীয়ান্ জীব অসুরশক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে কৃতোদ্যম হইলে এইরূপ বিজয়াশীর্বাদ চিরকালই তাহার মস্তকে বর্ষিত হইয়া থাকে,—বিজয়ার তাৎপর্য যেন ইহাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হইতে এই রকমই জানা যায়। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডেও দেখা যায়, দেবী মহামায়ার বরপুষ্ট রাঘবেন্দ্র রাম লঙ্কায় রাক্ষস-নিধন পর্ব সমাপ্ত করিলে তাঁহার অনুগত অনুচরবর্গ 'হৃষ্টা বিজয়েন' মহানন্দে পুনঃ পুনঃ শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি সহকারে আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছিলেন। সর্বলোকভয়ঙ্কর রাবণের বধে বানর সৈন্যগণের হর্ষের অবধি ছিল না।

'আবিবেশ মহান্ হর্ষো দেবানাং চারণৈঃ সহ।
রাবণে নিহতে রৌদ্রে সর্বলোকভয়ঙ্করে ॥'

দেবত্বের জয় এবং অসুরত্বের পরাজয়, ইহাই বিজয়ার মর্মকথা।

এই বিজয়াকে স্মরণ করিয়া আমরাও অনুপ্রেরণা পাইতে চেষ্টা করি—যেন জগদম্বার শক্তিতে আমরাও পারি নিজ নিজ অন্তরের ও বাহিরের অসুরবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে এবং বিজয়ের কৃতার্থতায় পরস্পরকে অভিনন্দন জানাইতে। বিজয়-গৌরবে অহঙ্কৃত না হইয়া নম্র চিত্তে, বিনত

গিয়ে আমরাও মহাশক্তিময়ী জননীর কাছে প্রার্থনা করি: সেই দেবী চণ্ডিকা অখিল জগতের পরিপালনের উদ্দেশ্যে—সর্বপ্রকার অশুভ-ভয়কে পরাভূত করিতে আমাদের সুমতি দিন।

'সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়।
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥'

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষী সকলকেই আমাদের বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। বিজয়ার প্রকৃত তাৎপর্যকে স্মৃতিতে রাখিয়াই আমরা এই সম্ভাষণ জানাইতেছি। সকল রকম অশুভ-ভয়কে প্রতিরোধ করিবার মতো আত্মশক্তি আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হউক দুর্গতিহারিণীর কৃপায়—ইহাও ঐকান্তিক প্রার্থনা এই বিজয়া উপলক্ষে।

বিবেকানন্দ-তৃষ্ণা

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ তাঁহার অমর গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের উপসংহারে লিখিয়াছেন:

'ফুল ফুটিল। দেশদেশান্তরের মধুপকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। রবিকরস্পর্শে নিজ হৃদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া ফুল্লকমল তাহাদের পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করিতে কৃপণতা করিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্পর্শমাত্রহীন ভারতপ্রচলিত কুসংস্কারখ্যাত ধর্মভাবে গঠিতজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত আস্বাদ জগৎ পূর্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? যে মহান্ ধর্মশক্তি তিনি সঞ্চিত করিয়া শিষ্যবর্গে সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্মকে জ্বলন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং সর্ব ধর্মমতের অন্তরে এক অপরিবর্তনীয় জীবন্ত সনাতন-ধর্ম-স্রোত প্রবাহিত দেখিতেছে—সে শক্তির অভিনয় জগৎ পূর্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে? পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ুসঞ্চরণের ন্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্মনসগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে—এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে?… হে মানব, ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উচ্চাসন যে কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা নির্ণয়ে যদি সক্ষম হইয়া থাক, ত বল; আমরা কিন্তু ঐ বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, নির্জীব ভারত তাঁহার পদস্পর্শে সমধিক পবিত্র ও জাগ্রত হইয়াছে এবং জগতের গৌরব ও আশার স্থল অধিকার করিয়াছে—তাঁহার মনুষ্য-মূর্তি পরিগ্রহ করায় নর ও দেবকুলের পূজ্য হইয়াছে এবং যে শক্তির উদ্বোধন তাঁহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র লীলাভিনয়ের কেবল আরম্ভমাত্রই শ্রীবিবেকানন্দে জগৎ অনুভব করিয়াছে।'

ভাবকে ভাষায় রূপ দিবার জন্য এক বিশেষ বাক্‌শৈলী উপনিষদের ঋষিদের কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত লেখনীমুখেও অনেকটা যেন ঐরূপ রীতিই সুস্পষ্ট। অতি সূক্ষ্ম সত্য এখানে বাক্যগোচর হইয়াছে। সেই সূক্ষ্ম সত্যটি হইতেছে এই যে—এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত-তত্ত্বের দিকেই নিত্য ধাবমান, সকল মত ও পথের অন্তরে প্রবাহিত সনাতন ধর্ম-স্রোতের সুউচ্চ তরঙ্গ শীর্ষে সমুত্থিত যে জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ—আর সেই ভাস্বর শ্রীরামকৃষ্ণ-তরঙ্গই মানব-সমাজের বিস্তীর্ণ ব্যাপক বেলা-ভূমিতে আসিয়া লোকগ্রাহ্য হইয়াছে বিবেকানন্দ-পরিচয়ে। এক অখণ্ড অদ্বৈত সত্যই মানবের প্রয়োজনে মানবাকারে আবির্ভূত—একটি অভিন্ন সত্তারই দুই নাম ও দুই রূপ। স্বামী সারদানন্দ তাঁহার অসাধারণ মনন-তুলিকার সাহায্যে অপূর্ব-সুন্দর এই লেখচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যাহাতে একই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে এক-দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারা যায়।

উদ্বোধিত শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিরই বিচিত্র লীলাবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিবেকানন্দকে ভাবা চলে না,—অথবা, ঐ ধরনের প্রয়াসে অন্য আর যাহাই সাধিত হউক না কেন, বিবেকানন্দ-অনুশীলন অবশ্যই হয় না।

আজকাল বিবেকানন্দ-চর্চা খুবই হইতেছে। কেবল দেশে নহে, বিদেশেও। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামীজীর জীবন ও বাণীকে উপলব্ধি করার জন্য আকুলতা ক্রমেই বাড়িতেছে—বিবেকানন্দের ভাব-স্পন্দন বিশ্বের সর্বশ্রেণীর মানুষের হৃদয়কে আজ আলোড়িত করিতেছে। এই বিবেকানন্দ-তৃষ্ণা নিঃসন্দেহে একটি শুভ ইঙ্গিত। মানুষ মানুষরূপেই বাঁচিতে ইচ্ছুক,—তাই বুঝি তাহার সুপ্তচেতনা এতদিনে আবার জাগিয়া উঠিতেছে। দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ, বিশেষতঃ যুবসমাজ আন্তরিকভাবে চাহিতেছে একজন বলিষ্ঠ পথপ্রদর্শককে, যিনি পারিবেন বর্তমান বহুবিপরীত মতবাদের ধূলি-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তাহাদিগকে পথ চলায় সাহায্য করিতে—শান্তিতে বাঁচিবার উপায় বলিতে। সাম্প্রতিক কালের বিবেকানন্দ-অনুসন্ধিৎসার ক্রম-বর্ধমান গতি দেখিয়া ইহাই স্পষ্টতর হইতেছে।

এখন প্রশ্ন এই : এই অন্বেষণের লক্ষ্য যে-বিবেকানন্দ, তিনি কোন্ বিবেকানন্দ? ঘোর অমানিশার অন্তে দূর-দিগন্তে উদিত চন্দ্রকলাকে আমরা চন্দ্রমাই বলি—যদিও উহা পূর্ণচন্দ্রের কিঞ্চিৎ আভাস বা অংশমাত্র। অন্ধকারে পথহারা মানুষ চন্দ্রের কলাংশ মাত্র দেখিয়াই উৎফুল্ল হয়,—আবছায়া জ্যোৎস্নাতে পায়ে-চলা পথরেখাকে অস্পষ্টভাবেও দেখিতে পায় বলিয়া। কিন্তু পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ের সর্বভাসক আলোকের জন্য প্রতীক্ষা করে কয়জন? দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্না-লোকের জন্য দীর্ঘ পক্ষকাল ধৈর্যের প্রয়োজন রহিয়াছে,—ঐকান্তিক আলোক-তৃষ্ণার অপেক্ষা আছে। বিবেকানন্দ-প্রভারও পূর্ণ দীপ্তিকে জীবনে ধারণ করিতে অধিকতর মনন-চিন্তন ও অধ্যবসায়ের আবশ্যকতা আছে,—প্রবাধিত জিজ্ঞাসারও অপরিহার্যতা রহিয়াছে। নচেৎ বিবেকানন্দ-ভাবের কণিকামাত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইবে—অলোকসামান্য বিবেক-জ্যোতির স্পর্শ-লাভ আর ঘটিয়া উঠিবে না।

সমাজের মানুষ আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। অজস্র বৈষম্য আর বৈপরীত্য লইয়াই আধুনিক সমাজ-জীবন। মানুষ তাই পথ-বিভ্রান্ত—অযথা ঘুরিয়া মরিতেছে—থামিবারও উপায় নাই। স্বামীজীর বাণী হইতে বিচ্ছুরিত দুই-একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গকেই সে পথের মশাল করিয়া লইয়া চলিতে চাহিতেছে। বিবেকানন্দ-ভাবের প্রকৃত আলোকোল্লাস হইতে এই সকল পথিক চিরদিন বঞ্চিতই থাকিয়া যাইবে, যদি না উক্ত বিবেকানন্দ-সত্যের পূর্ণ রহস্য উপলব্ধির জন্য ইহারা আন্তরিক জিজ্ঞাসু হয়। বিবেকানন্দের পূর্ণরূপ তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ-সত্তায়—শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণপ্রকাশ বিবেকানন্দ-বিগ্রহে। সত্য ইহাই, বাকী বিচার সবই অংশ ও খণ্ড। উপনিষদের ঋষির ভাষায় বলিতে হইবে, 'একপাৎ বা এতৎ'—অনন্তের একাংশ মাত্র এই সকল বিতর্ক ও জিজ্ঞাসা।

বর্তমান যুগের মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সমাজ তথা সমাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে—রাজনীতির আবর্ত হইতে সে আর দূরে সরিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আবার ইহাও ঠিক যে, সকল প্রকার সমাজনীতির মূল সূত্র হইতেছে সাম্যবাদ,—একটি বহু উচ্চারিত ধ্বনি, সুকৃত বা বিকৃত যে-ভাবেই উহা ব্যাখ্যাত হউক না কেন। এই সমাজনীতি,—বা প্রচলিত সহজ অর্থে রাজনীতি, তাই একালের প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পথে ঘিরিয়া

রাখিয়াছে—প্রভাবিত করিতেছে। অতি স্বাভাবিক কারণেই 'সাম্য' বা 'সমত্ব' কথাটিও আজ একটি বহুকথিত এবং বহুঘোষিত সামাজিক নীতি—সাধারণ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। বিভেদ-বৈষম্যপীড়িত আধুনিক সমাজে 'সাম্য'-ই বোধ হয় সর্বাধিক অনুচিন্তনীয় বিষয়। ভেদ-জর্জর মানবের আজ প্রবল তৃষ্ণা সমত্বের জন্য। এককথায় সমাজতন্ত্রের মূল মন্ত্রই হইতেছে 'সাম্য'।

আলো-বাতাস-জল,—কিংবা অনেকের কাছে যেন সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মতোই এই সাম্যমূলক সমাজতন্ত্র। সমাজের স্ত্রী-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধ সকলেই সাম্যের জন্য কাতর—যেখানেই সাম্যের আওয়াজ শোনে সেখানেই তাহারা পাগল হইয়া ছুটিয়া মরে! 'সাম্য' তথা সমাজতন্ত্রের সমর্থক মাত্রই তাই সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত বরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়, রচনায় ও বাণীতে সাম্যেরই গৌরব-প্রকাশ,—এই সহজ কারণেই ইদানীংকালের মানুষ, বিশেষতঃ যুবগোষ্ঠী তাঁহাকে নূতনভাবে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছে—নবীনতর উৎসাহে স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা খুবই আশাপ্রদ সংবাদ, সন্দেহ নাই। এই বিবেকানন্দ-তৃষ্ণা আন্তরিক ও স্থায়ী হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি—সমাজের উভয় দিকেরই কল্যাণ সাধিত হইবে। তথাপি ইহার মধ্যে একটি বড় রকমের 'কিন্তু' আছে, তাহাও অসঙ্কোচে মানিয়া লওয়া উচিত। সেই 'কিন্তু'-টিকে বুঝিতে হইলে শান্ত চিত্তে সতর্ক মননের প্রয়োজন।

অতি-উৎসাহী আধুনিক বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের অনেকে তাঁহাকে বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্রী—শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী বলিয়া স্তুতি করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র, যেন নূতন এক সমাজতন্ত্রী মহান নেতাকে তাহারা স্বামীজীর মধ্যে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ এক অভিনব প্রচার-প্রবণতাও ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয়। আচার্য বা গুরু, শিক্ষক বা সুহৃদ্‌রূপে নহে,—একজন জনপ্রিয় সমাজ-নেতারূপেই ইহারা স্বামীজীকে দেখিতে ইচ্ছুক। বিবেকানন্দ-জীবনের ধ্যান-ধারণা, যোগ-ভক্তি, উপলব্ধি-অপরোক্ষ—তাঁহার আবির্ভাবের অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য লইয়া এই সকল নবীন অনুরাগী চিন্তিত নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্র অপেক্ষা জনগণের নায়ককেই ইহাদের বেশি পছন্দ। স্বামীজীর ধ্যানমূর্তি বা যোগস্থ রূপ নহে—তাঁহার ব্যক্তিত্বদ্যোতক নেতৃরূপই ইহাদের পক্ষে অধিক চিত্তাকর্ষক। এমনকি, স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও উপদেশাবলীর মধ্যেও ইহারা মাত্র লৌকিক বা সামাজিক কল্যাণকর উক্তিগুলিকেই নিজেদের মনোমত করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া উদ্ধৃত করে—সুবিধানুযায়ী প্রচারও করিয়া থাকে। ভাল কথা। 'যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।' গৃহস্থালির জন্য প্রয়োজনীয় জলও মহাজলাশয়ে মেলে বৈ কি! সামান্য স্নান-পান-বাসনমাজার কাজের জল অঢেল সঞ্চিত থাকে ঐ বৃহৎ জলাধারে। প্রতিদিনের জলাভাব সমুদ্রের দ্বারা অনায়াসেই মিটিয়া যায়,—ইহাতে আর বিচিত্র কি?

জীবনধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া জীবন মানেই ভোজন নহে—কেবল ভোজন-উদ্দেশ্যেই জীবন হইতে পারে না। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না' সত্য, কিন্তু ততোধিক সত্য হইতেছে,—নিছক পেট-ভরণের নাম ধর্ম নহে। ধর্ম তথা মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ আরও গভীর, ব্যাপক এবং দূরগামী। বিবেকানন্দের ভাবসমুদ্র হইতে কণ্ঠ ভিজাইবার উপযোগী জল দুই-চারি গণ্ডূষমাত্র সংগ্রহ করিয়াই যেন আমরা 'আহা মরি' বলিতে বলিতে থামিয়া না যাই!

বিবেকানন্দকে আমরা পাইতে চাই—

জীবনের সমূহ অভাব মিটাইতে—উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে। না,—বিবেকানন্দকে আমাদের জীবনরূপেই প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনধারণের সহায়ক তুই একটি উপকরণের উৎস হিসাবেই মাত্র নহে—জীবনকে সমগ্র-সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই তাঁহাকে আমাদের বড় দরকার। তাই আমাদের বিবেকানন্দ-চর্চাকেও আংশিক করিলে চলিবে না,—অনুশীলন করিতে হইবে

প্রথমেই বুঝা কর্তব্য—'সমাজ', 'সমাজতন্ত্র', 'সমাজনীতি' তথা 'সাম্য' ইত্যাদি আধুনিক পরিভাষাগুলি বিবেকানন্দ-বাণীতে কোন্ তাৎপর্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বামীজীর সংজ্ঞায়—

'অনেকগুলি ব্যক্তির একত্র নাম "সমষ্টি", এক-একটির নাম "ব্যষ্টি"। তুমি আমি "ব্যষ্টি", সমাজ "সমষ্টি"। ...যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্ডিভিজুয়ালিজম্।'

উল্লেখ বাহুল্য, উক্ত ইংরেজী 'সোশ্যালিজম্'-কেই দেশী ভাষায় সমাজতন্ত্র বলা হইয়া থাকে। সমাজ ও সমাজতন্ত্র—সমাজের জন্য আত্মবলি প্রভৃতি শব্দগুলি ইদানীংকালে সর্বজনসমাদৃত এবং সকলেরই প্রিয় আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শকে স্বামীজী কী দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা আধুনিক সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রসেবী কয়জন জানেন? শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে এক পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন :

'আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পারো বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? ...সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর। আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? ...যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে একহাতে চোখ মুচছে আর এক হাতে দান করছে, তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্ট-দেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

'অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য কথা কহা উচিত, তার আগে নয়।'

স্বামীজীর দৃষ্টিতে সমাজ-সেবার—সমাজের জন্য কথা কহিবার অধিকার কাহার, তাহা এখানে সুস্পষ্ট। উল্লিখিত 'একজন' যে আর কেহই নহেন—ঈশ্বর, তাহাও আর বুঝাইয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। স্বামীজীর সমাজ তথা সমাজতন্ত্রের আদর্শও পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশেষ,—উহা ধর্ম-ঈশ্বর-ভগবান হইতে বিযুক্ত কোন 'বাদ' নহে। কিন্তু আধুনিক পশ্চিমী ঢং-এর যে সমাজনীতি, উহা 'পলিটিক্স',—রাজনীতিরই নামান্তর। স্বামীজীর উক্তি সে-সম্পর্কেও অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট :

'সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা 'পলিটিক্স' বলে, তাহা কেবল...ভোগতারতম্য-সমুত্থিত অধিকারপ্রাপ্ত ও অধিকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম।'

আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন— '...ভোগাধিকার-তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।...ভোগাধিকারের সাম্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।'

পৃথিবীব্যাপী বর্তমান সামাজিক 'অনর্থ' এবং তার প্রতিবিধান সম্পর্কে স্বামীজীর অনুশাসন তাঁর উল্লিখিত বাণীতে সুব্যক্ত। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সকলের সম-অধিকার—সমান ভোগাধিকার, ইহাই সাম্য। আধুনিক সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রীরাও অবশ্য তাহাই বলিয়া থাকেন,—ভোগতারতম্য হইতেই বিশেষ অধিকারের জন্ম—আর উহাই হইতেছে জগতে পুঁজিবাদ ও শোষণ-প্রক্রিয়ার মূল কথা। সমাজে যাবতীয় বৈষম্যের হেতু এই মানবতা-বিরোধী বিশেষ-ভোগাধিকার। আবার ইহাও ধ্রুব সত্য যে স্বামীজীর সাম্য বা সমাজ-ভাবনা এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। তিনি মানুষের 'চাল-কলা বাঁধা'

-ভোগ সামর্থ্য বা বিষয়-সম্পত্তি অধিকারের সমত্বকেই লক্ষ্য করেন নাই,—তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন আরও গভীরে—মানুষের আত্মার একত্বে—জীবের প্রকৃত সাম্যে। তাঁহার সাম্যবাদের ক্ষেত্র কেবল মনুষ্যসমাজ-পর্যায়েই আবদ্ধ নহে—তাঁহার প্রসারিত সাম্যদৃষ্টি ব্যাপ্ত হইয়াছে নিখিল জীব-জগতে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া। উচ্চতম দেবতা ও মনুষ্য হইতে নিম্নতম তৃণ-কীট পর্যন্ত তিনি 'সম'-কে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন—সর্বানুস্যূত এক আত্মাকেই তিনি সর্বত্র অপরোক্ষ করিয়াছেন। তাই কুত্রাপি তিনি বিশেষ অধিকার স্বীকার করেন নাই,—বেদান্তের সম-অধিকারই তাঁহার উদ্‌ঘোষিত সত্য। বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন বা সাম্যবোধ অদ্বৈত বেদান্তেরই কর্মপরিণত রূপ—ব্রহ্মদৃষ্টিরই নামান্তর।

বিবেকানন্দের সমাজনীতি বা সাম্য নিছক একটি মত বা 'বাদ' নহে, উহা তাঁহার শ্রীগুরুপ্রদত্ত অত্যাশ্চর্য এক আধ্যাত্মিক সম্পদ, যাহা জগৎকে বিলাইবার জন্য তিনি শ্রীগুরুকর্তৃকই অঙ্গীকারবদ্ধ। বিবেকানন্দ-জীবনবৃত্তের দিকে ভাল করিয়া তাকাইলে, এই ঐতিহাসিক তত্ত্বটিকে বুঝিয়া লইতে এতটুকুও অসুবিধা হইবার কথা নহে। অনিন্দ্যসুন্দর সেই ঘটনাচিত্রটিকে এখানে একবার স্মরণ করা যাইতে পারে,—যেখানে বালক নরেন্দ্রনাথ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে 'জীবে দয়া নয়—শিব জ্ঞানে জীব সেবা' শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেদিন ঐ বালকের মুখে তাঁহার সঙ্গীরা শুনিয়াছিল:

'ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা হইলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে "শিবজ্ঞানে জীবের সেবা" করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।.. যাহা হউক ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।'

উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের সকল চিন্তায়, কর্মে ও বাণীতে উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষা—ব্যাবহারিক বেদান্তই প্রচারিত হইয়াছে। বিবেকানন্দোক্ত 'সাম্য' বা 'সমাজতন্ত্র'-ও এই বেদান্তপ্রযুক্তিরই এক রূপ—প্রয়োগ-রীতি। সমাজ-সম্পর্কিত কিংবা রাজনৈতিক কোন 'ইজ্‌ম্‌' বা 'বাদ'-এর অনুরূপ একটি মতবাদ ইহা মোটেই নহে। অধুনাশ্রুত 'সমাজতন্ত্র' বা 'সাম্যবাদ' প্রকৃত সাম্যের পথে একটি প্রাথমিক কথা হইলেও স্বামীজীর উপলব্ধ সাম্যকে বা বৈদান্তিক সমত্বকে আদৌ ব্যক্ত করিতে পারে না।

ইদানীং কেহ কেহ আবেগের বশে, স্বামীজীর একখানি চিঠির পংক্তিবিশেষের আংশিক উদ্ধৃতি প্রায় যত্র তত্র উল্লেখ করেন। সেখানে স্বামীজী নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী বলিয়া লিখিয়াছেন,—ইহাই অনেকের নিকট পরম সান্ত্বনাপ্রদ ও ভরসাজনক একটি বাণী, যাহা তাঁহাকে আধুনিক জনমানসে অতি উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে! 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' নামক বিশালায়তন দশ খণ্ড গ্রন্থের মধ্যে, ঐ একটি চিঠির মাত্র তিনটি পদই আধুনিকগণের চিত্তে কী বিপুল বিবেকানন্দ-অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। যদিও উহা খণ্ড

উক্তি,—স্বামীজীর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করে নাই।

স্বামীজী উল্লিখিত পত্রটি লিখিয়াছিলেন কুমারী মেরী হেলকে—যাঁহাকে তিনি কনিষ্ঠা ভগিনী-জ্ঞানে স্নেহ করিতেন। চিঠির তারিখ—১ নভেম্বর, ১৮৯৬। অনেক দিক হইতেই চিঠির বক্তব্য অত্যন্ত মানব, মানব-সমাজ, তথা মানবজীবনের রহস্য ও চরম আদর্শের প্রতি বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সরল স্বচ্ছ দৃষ্টিপাত চিঠি-খানিকে চুম্বকাকারে ব্যাবহারিক বেদান্তসারের রূপ প্রদান করিয়াছে। পত্রের প্রতি ছত্রে জগৎ ও সমাজ—উহাদের বিবর্তনধারা অতি আশ্চর্য সুন্দর-ভাবে বর্ণিত। সকল বিবর্তনধারার পরিসমাপ্তি সেই এক অবিভাজ্য ব্রহ্মেই,—পত্রের ইতি টানা হইয়াছে এই সত্য দিয়াই। তথাপি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, নব্য বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগিগণ পত্রোল্লিখিত অনেক জরুরী কথার মধ্যে 'আমি একজন সমাজতন্ত্রী (socialist)' স্বামীজীর এই উক্তিটিকেই মাত্র পরম যত্নে বাছিয়া লইয়াছেন! স্বামী বিবেকানন্দকে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রনেতার আসনে বসাইতে ইঁহারা গৌরব বোধ করেন। মেরী হেলকে লিখিত স্বামীজীর ঐ পত্রের অংশ বিশেষের সংক্ষিপ্ত উৎকলন এইরূপ:

'সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?

'প্রভৃত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতি-রোধ করতে পারবে না।...আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল"—এই হিসাবে।

'...জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত।

'এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক-একদিন আরাম করে নিতে দাও—তবে তারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগটুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয়সকল পরিহার করে ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।'

সমাজে এক নূতন সাড়া—নবজাগরণের আভাস, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া উত্থিত হইতেছে। তৃষিত যুবসমাজও সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ কিছু চাহিতেছে—তাহাদের শুষ্ক কণ্ঠে বিবেকানন্দ-অমৃত সিঞ্চিত হইলে দেশ ও জাতির সমূহ কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবেকা-নন্দকে তাঁহার নিজস্ব ভাবমূর্তিতে গ্রহণ করিতে না পারিলে বিপরীত ফললাভও হইতে পারে। লোকোত্তর মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গিয়া, তাঁহাদের ভাব ও শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ বা অংশতঃ বুঝিয়া এমন 'উল্টা সমঝিলি রাম' কাণ্ড অতীতে পৃথিবীতে ঘটিয়াছে অনেকবার। আমাদের তাই আজ সরল জিজ্ঞাসা,—যাঁহাকে লইয়া এত আলোড়ন জাগিতেছে—তিনি কে? শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-গঙ্গার বরিষ্ঠ বাহক 'নারায়ণং নরসখং' নরেন্দ্র বিবেকানন্দই তো?

জগদ্ধাত্রী-তত্ত্ব

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী।

শক্তিদেবতার বহুপ্রকার মূর্তির অন্যতম জগদ্ধাত্রী। তন্ত্রমতে জগতের মূল সত্তা আদ্যাশক্তি মহামায়া। এই আদ্যাশক্তি স্বরূপতঃ নিত্যা, নির্গুণা এবং নিরাকারা হলেও কখন কখন তিনি সগুণা সাকারা হন, জগজ্জননীর, জীব-জগতের আকার ধারণ করেন। আবির্ভূতা হন বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে। তাঁর এই আবির্ভাব কখন হয় 'দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থম্'—দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য, আবার কখন হয় 'সাধকানাং হিতার্থায়'—সাধকের হিতের জন্য, তাকে অনুগ্রহ করবার জন্য। 'অরূপা-রূপধারিণী' এই আদ্যাশক্তির বহুপ্রকার রূপধারণের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্রে, কীর্তিত হয়েছে তাঁর লীলা-মাহাত্ম্য। ঐ সকল গ্রন্থে আদ্যাশক্তির যেসব রূপের কথা রয়েছে সে-সব রূপের মধ্যে তাঁর দশমহাবিদ্যার দশবিধ রূপ—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ এই দশবিধ রূপ ছাড়াও আদ্যাশক্তির অসংখ্য প্রকার রূপধারণের দিব্য কাহিনী পুরাণ-তন্ত্রে বিদ্যমান। পুরাণ-তন্ত্রে বর্ণিত আদ্যাশক্তির অসংখ্য প্রকার রূপের মধ্যে জগদ্ধাত্রী বিশেষ একটি রূপ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যেমন রয়েছে দেবী দুর্গার নানা-রূপে অবতরণের কথা, কাত্যায়নীতন্ত্রে রয়েছে জগতের শান্তিবিধায়িনী ও পালনকর্ত্রী জগদ্ধাত্রীর কার্তিকী শুক্লা নবমী তিথিতে প্রকটিত হওয়ার দিব্য সংবাদ। দুর্গাকল্পেও আছে 'কার্তিকে শুক্লপক্ষেঽহ্নি ভৌমবারে জগৎপ্রসূঃ। সর্বদেবহিতার্থায় দুর্বৃত্তশমনায় চ॥ আবিরাসীৎ জগৎশান্ত্যৈ যুগাদৌ পরমেশ্বরী।'[১] পূজার বিধানেও রয়েছে 'কার্তিকেঽমলপক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমেঽহনি পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম্।'[২]

ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। কেনোপনিষদে কথিত উমা-হৈমবতী কর্তৃক বলগর্বী ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অহঙ্কার চূর্ণ করবার সুপ্রচলিত উপাখ্যানের অনুরূপ একটি উপাখ্যান রয়েছে কাত্যায়নীতন্ত্রে, ৭৬ পটলে, জগদ্ধাত্রী সম্বন্ধে। সেখানে আছে, একদা অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র এই চারজন দেবতা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে, ঈশ্বর মনে করে আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, দেবতা হলেও তাঁদের স্বতন্ত্র কোন শক্তি নেই। মহাশক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রীর শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান। মিথ্যাগর্বে গর্বিত দেবতাগণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য দেবী 'কোটিসূর্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্'—কোটি সূর্যের তেজসদৃশ এবং কোটিচন্দ্রের প্রভাসম দীপ্তি নিয়ে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হলেন। শক্তি পরীক্ষা করবার ছলে সম্মুখস্থ তৃণখণ্ডকে স্থানচ্যুত ও দগ্ধীভূত করতে বললেন। সর্বশক্তি প্রয়োগেও দেবতারা তাতে অসমর্থ হলেন। পরাজিত ও লাঞ্ছিত দেবতাগণের অহঙ্কার চূর্ণ হল। তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন, উপলব্ধি করলেন ব্রহ্মশক্তির শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান এবং 'কোটিসূর্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্' জ্যোতির্ময়ী ঐ দেবী যিনি 'তেজসস্তান্তর্হিতে তস্মিন্ চমৎকারা

১ শব্দকল্পদ্রুম্, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৮২—৮৪

২ কালবিবেক—শূলপাণি।

কলেবরে। মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্বালঙ্কার-ভূষিতা॥ চতুর্ভুজা মহাদেবী রক্তাম্বরধরা শুভা। বালার্কসদৃশীদেহা নাগযজ্ঞোপবীতিনী॥ ত্রিনেত্রা কোটিচন্দ্রাভা দেবর্ষিমুনিসেবিতা।'—সমস্ত তেজ-রাশিকে স্তিমিত করে কোটিচন্দ্রের প্রভাসদৃশ ও রক্তিমাভ অনিন্দ্যমূর্তি ধারণ করে আবির্ভূতা হয়েছেন, যিনি ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা মঙ্গলময়ী মহা-দেবীরূপে দেবর্ষি নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক অভিনন্দিতা, যিনি রক্তবস্ত্রপরিহিতা, সর্বালঙ্কার-ভূষিতা এবং নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী—তিনি স্বয়ং ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। সেই মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী সকল শক্তির আধার, সকলের শ্রেষ্ঠা, নমস্যা ও আরাধ্যা। 'দর্শয়ামাস দেবানামেবং রূপং জগন্ময়ী। ততস্তাং তুষ্টুবুর্দেবা জগদ্ধাত্রীং মহেশ্বরীম্'—দেবতারা দেবীর এবম্প্রকার রূপ দর্শন করে পরিতুষ্ট হয়ে প্রবৃত্ত হলেন জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর আরাধনায়।[৩] ভাব ও তত্ত্বের দিক দিয়ে কেনোপনিষদ্ এবং কাত্যায়নীতন্ত্রে বর্ণিত উপাখ্যান দুটি অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মশক্তি-স্বরূপিণীর শক্তিতেই দেবতারাও যে শক্তিমান এটি বোঝাবার জন্যই উপাখ্যান দুটির অবতারণা।

ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশরূপ তিন গুণের সমভাবের প্রকাশ যেমন কালীরূপের বৈশিষ্ট্য, তাঁর ধারণী ও পোষণী গুণের সমভাবের প্রকাশ জগদ্ধাত্রীরূপের বৈশিষ্ট্য। দেবীপুরাণে আছে, 'ধাত্রীমাতা সমাখ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে। ত্রয়াণাঞ্চৈব লোকানাং নাম ত্রৈলোক্যধাত্রিকা॥'[৪] 'যস্মাদ্ধারয়তে লোকান্ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ। ডুধাঞ ধারণে ধাতুস্তস্মাধাত্রী মাতা বুধৈঃ॥'[৫] ধাত্রী শব্দে জননী এবং যিনি ধারণ করেন। ধাত্রীমাতা যেরূপ সকলকে বক্ষে ধারণ করে পীযুষদানে পরিপালিত করেন, ভগবতী জগন্মাতাও সেরূপ নিখিল বিশ্বকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে সকলকে পরিপালিত করেন। ধা ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। ভগবতী নিখিল বিশ্বকে বক্ষে ধারণ করে পরিপালন করেন বলে মুনিগণ কর্তৃক তিনি ত্রৈলোক্যধাত্রিকা নামে খ্যাত। বলা বাহুল্য, ত্রৈলোক্যধাত্রিকা এবং জগদ্ধাত্রী অভিন্না এবং এই ত্রৈলোক্যধাত্রিকাই ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি জগদ্ধাত্রী। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর পরিতুষ্ট দেবতারা যে স্তবে দেবীকে বন্দনা করেছিলেন তাতে আছে, 'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ত্বং ধারয়সীতি বিশ্বম্'[৬]—তুমি বিশ্বেশ্বরী, তাই বিশ্বকে পালন কর; তুমি বিশ্বাত্মিকা, তাই বিশ্বকে ধারণ কর। লক্ষণীয়, এখানে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী অভিন্না, এক হয়ে গেছেন।

নিত্য পরিবর্তনশীল এই জগৎ। প্রতিমুহূর্তেই তার বিবর্তন-পরিবর্তন হচ্ছে। ভাঙা-গড়া চলছে অহর্নিশ, অনন্তকাল ধরে। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই ভাঙা-গড়ারূপ মহাবিপ্লবের মধ্যেও, বিবর্তন-পরিবর্তন সত্ত্বেও জগতের অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্যও লোপ পায় না,—বন্ধ হয় না তার গতি-শীলতা। কেন? এর কারণ কি? কারণ, নিয়ত-পরিবর্তনশীল এই জগতের পেছনে রয়েছে তার রক্ষণ ও পোষণের জন্য অচিন্তনীয়া মহাশক্তির অদ্ভুত এক খেলা। সতত পরিবর্তনশীল জগৎ সেই মহাশক্তির উপর বিধৃত—যিনি নিত্যা শাশ্বতী ও অপরিবর্তনীয়া। আর দেবী জগদ্ধাত্রীই সেই ধৃতিরূপিণী মহাশক্তি। জগদ্ধাত্রীরূপের এই তত্ত্বটি অতি সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট্ট একটি কথায়, তাঁর অননুকরণীয় প্রকাশভঙ্গিতে। তাঁর কথায়

৩ শব্দকল্পদ্রুম্, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৮২—৮৪ ৪ দেবীপুরাণ, ৩৭।২৯
৫ ঐ, ৩৭।৭৫ ৬ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৩৩

'ঈশ্বরীর রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎ ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়।'[৭]

ধ্যানে, সাধকের হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী 'সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং মহা-দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥ শঙ্খশার্ঙ্গসমাযুক্ত বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্। চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ দধতীং দক্ষিণে করে॥ রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥ ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনালমৃণালিনীম্। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে॥ প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥'—সিংহস্কন্ধসমারূঢ়া, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, চতুর্বাহুযুক্তা, নাগরূপ যজ্ঞ-উপবীতধারিণী। দেবীর বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ এবং শার্ঙ্গধনু, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পঞ্চবাণ ও চক্র। রক্ত-বস্ত্রপরিহিতা সেই ভবসুন্দরী প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় রক্তাভতন্বী। নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক তিনি নিত্য সেবিতা। তাঁর ত্রিবলীবলয়সমন্বিত নাভি মৃণালবিশিষ্ট পদ্মের ন্যায় অপূর্ব শোভায় শোভিত। সেই শিবগেহিনী রত্নদ্বীপস্বরূপ উচ্চ বেদিকায় স্থিত সিংহাসনে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর উপবিষ্টা।

ধ্যানমন্ত্রে যদিও দেবীর বাহ্যরূপের বর্ণনারই প্রাধান্য, স্বরূপগত তত্ত্বটিও তাতে সুস্পষ্ট। জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তির ধারণী ও পোষণী শক্তির প্রতীক। ধ্যানমন্ত্রে আছে দেবী 'বালার্কসদৃশীতনু'। 'অর্ক বা সূর্যই বিশ্বের পোষণকর্তা। পৃথিব্যাদি আবর্তনশীল গ্রহ-উপগ্রহদিগকে সূর্যই নিজের দিকে আকর্ষণ করে রেখেছেন—নিজ নিজ কক্ষে তাদিগকে ধরে রেখেছেন। দেবী জগদ্ধাত্রীর মধ্যেও ধারণী ও পোষণী শক্তির পরিচয় বিদ্যমান। তাই তাঁকে বলা হয়েছে "বালার্কসদৃশীতনু"। একই কারণে জগৎপালক বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-শার্ঙ্গধনু-আদি আয়ুধ দেবীর শ্রীকরে।'

'দেবী "নাগযজ্ঞোপবীতিনী"। নাগ বা সর্প যোগের পরিচায়ক। উপবীত ব্রহ্মণ্যশক্তির প্রতীক। দেবী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মময়ী; তিনি পরমা যোগিনী। মহাযোগবলেই ব্রহ্মময়ী ধরে আছেন এই নিখিল বিশ্বসংসারকে। এ জগদ্ধারণই জগদ্ধাত্রীর পরমা তপস্যা—তাঁর নিত্য লীলা, তাঁর নিত্য খেলা। জননীরূপে তিনিই বিশ্বপ্রসূতি, আবার ধাত্রীরূপে তিনিই বিশ্বধাত্রী।'

'দেবীর রক্তবস্ত্র ও রক্তবর্ণের মধ্যে, দেবীর সিংহাসনস্থ রক্তকমলে সেই রজোগুণেরই ছড়াছড়ি। রজোদীপ্ত বলেই জগদ্ধাত্রী মহা-শক্তিময়ী। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র, তাঁর বাহন—সকলই তাঁর শক্তিমত্তার ভাবটি আমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত করে দেয়। তবে দেবীর এই বীর্য সংহারের নয়। পরন্তু সমগ্র বিশ্বকে মহাসর্বনাশ থেকে রক্ষাপূর্বক তাকে আত্মসত্তায়—ঋতে এবং সত্যে সুস্থির করে রাখবার জন্য।'[৮]

ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও দেবীর বাহন সিংহের পদতলে একটি হস্তিমুণ্ড থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস, দেবী করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন। দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে 'মহিষা-সুরমর্দিনী' জগদ্ধাত্রীও সেরূপ 'করীন্দ্রাসুর-নিসূদিনী'। তত্ত্বের দিক দিয়ে দেবীর এই 'করীন্দ্রাসুর-নিসূদিনী' নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে-কোন সাধনায় মনকে সংযত করে বশে আনা সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের মন মত্ত করী, মত্ত মন-করীকে বশ করতে পারলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মন করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে

---

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, সমগ্র সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ; পৃঃ ৭৩

৮ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, স্বামী নির্মলানন্দ, শ্রীশ্রীপ্রণব মঠ, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৩—৪

জগদ্ধাত্রী উদয় হন।...সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ করে রেখেছে।'[৯] মত্ত মন-করীকে বশ করে সাধক-হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর প্রতিষ্ঠায়ই জগদ্ধাত্রী-সাধনার সার্থকতা, পূজার পরিসমাপ্তি।

ধ্যানমন্ত্রের ন্যায় স্তবমন্ত্রেও জগদ্ধাত্রীরূপের তত্ত্বটি অতি সুস্পষ্ট। স্তবে দেবীর স্বরূপগত তত্ত্ব বর্ণনায় তাঁকে 'আধারভূতা' 'শাক্তাচারপ্রিয়া' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। 'আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে। ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে। শাক্তাচার-প্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥' অর্থাৎ, 'হে জগদ্ধাত্রি, তুমি আধার ও আধেয়স্বরূপিণী, তুমি ধারণ-শক্তিরূপিণী এবং সর্বকর্মবিধাত্রী, তুমি সনাতনী, শাশ্বতধামরূপিণী ও অবিচলিতস্বভাবা—তোমায় নমস্কার। তুমিই শিব, তুমিই শক্তি; তুমি সমস্ত শক্তিতে অবস্থিতা এবং তুমিই শক্তি-রূপিণী; তুমি শাক্তোচিত আচারে সন্তুষ্টা হও; হে দেবী জগদ্ধাত্রি, তোমায় নমস্কার।'[১০] স্তবের প্রত্যেকটি বিশেষণই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। 'দেবী "আধারভূতা"। অর্থাৎ তিনিই এই বহুধা, বৈচিত্র্যময় বিশ্বের আধার বা অনন্যাশ্রয়। আবার বিশ্বাতীত স্বরূপে তিনিই একা, অদ্বিতীয়া, তাই তিনি আধেয়া। তিনি ধৃতি শক্তির প্রভাবে বিশ্ব ধারণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ধৃতিরূপা। সংসারের 'ধুর' বা ভারলোকস্থিতির দায়িত্ব বহন করেন, তাই দেবীর এক নাম ধুরন্ধরা। এভাবে সমগ্র বিশ্বের রক্ষণ, পালন, পোষণ, বর্ধনের গুরু-দায়িত্ব পালন করেও তিনি অনবসন্না, অবিকারা। তাই তিনি ধ্রুবা, তিনি ধীরা। দেবী নিত্যা, তাঁর বিধানও সনাতন, তাঁর শরণাগত যাঁরা তাঁদের ক্ষয়, ভয়, বিনাশ নেই, তাই তাঁকে বলা হয় ধ্রুবপদা।

'দেবীশক্তিস্থা, শক্তিবিগ্রহা, শাক্তাচারপ্রিয়া কেন? যে বিশ্বমহাশক্তি নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণীভূতা, দেবী জগদ্ধাত্রীর সত্তা বা স্থিতি তারই উপর, তাই তিনি শক্তিস্থা। দেবীর রক্তাম্বর, রক্তবর্ণ চক্রাদি আয়ুধ এবং বাহন সিংহ প্রভৃতির ভিতরও মহাশক্তির মহাপ্রকাশ। মায়ের মূর্তিভাবনায় এসব শক্তিচিহ্ন রয়েছে, এজন্য তিনি শক্তিবিগ্রহা। তিনি আপন শক্তিপ্রভাবে সমস্ত বিশ্বজগতের গুরুভার নিত্যকালের জন্য ধারণ করে আছেন, তাই তিনি শাক্তাচারপ্রিয়া।'[১১]

দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী স্বরূপতঃ অভিন্না। তাঁদের বিভিন্ন প্রণাম ও স্তবাদিমন্ত্রে উহা সুস্পষ্ট। যেমন চণ্ডীতে দেবতারা তাঁকে 'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ত্বং ধারয়সীতি বিশ্বম্'[১২]—তুমি বিশ্বেশ্বরী, তাই বিশ্বকে পালন কর; তুমি বিশ্বাত্মিকা, তাই বিশ্বকে ধারণ কর—ইত্যাদি বলে স্তব করলেন। আরও বলা হয়েছে, 'দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ'[১৩]—তিনিই দুর্গা, ভগবতী, ভদ্রা, যিনি এই জগৎকে ধারণ করে আছেন। এখানেও দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী একেবারে এক হয়ে গেছেন। মহিষাসুর বধের পর দেবতারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্য দেবীর যে স্তব করেছিলেন তাতে তাঁরা দেবীকে জগদ্ধাত্রীরূপেই —'জগতাং ধাত্রীং'—অবগত হয়েছিলেন। 'এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ। অর্চিতা জগতাং ধাত্রীং তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥'[১৪]

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, সমগ্র সংস্করণ, পৃঃ ৭৩
১০ স্তবকুসুমাঞ্জলি, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৩—৩৪
১১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, স্বামী নির্মলানন্দ, শ্রীশ্রীপ্রণব মঠ, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৫
১২ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৩৩ ১৩ ঐ, ৫।১৬
১৪ ঐ, ৪।২৯

অপরপক্ষে জগদ্ধাত্রীর প্রণামমন্ত্রে তাঁকে দুর্গা বলেই সম্বোধন করা হয়েছে। 'জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে। জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি। সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥—হে দুর্গে, তুমি জয়বিধায়িনী ও জগতের আনন্দস্বরূপিণী। জগতে একমাত্র তুমিই প্রকৃষ্টরূপে পূজিতা ও তুমি সর্বব্যাপিনী,—তোমার জয় হোক, হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় নমস্কার। হে জগদ্ধাত্রি, তুমি দয়াস্বরূপা, কৃপাদৃষ্টিস্বরূপা, করুণাময়ী, দুঃখবিনাশিনী, সর্ববিঘ্নবিনাশিনী; হে দুর্গে, তোমায় নমস্কার।'[১৫]

পূজার রীতিতেও দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর অভিন্নতা লক্ষণীয়। জগদ্ধাত্রী পূজায় দুর্গা পূজার রীতিই মুখ্যত: অনুসরণীয়। 'জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গা পূজারই সংক্ষিপ্ত রূপ। দেবীমূর্তি দুর্গা প্রতিমার আদর্শে নির্মিত, পার্থক্য কেবল দেবীর দশবাহুর স্থলে চতুর্বাহু। মহিষাসুরের অন্তর্ধান, দেবী উপবিষ্টা, লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থলে জয়া ও বিজয়া—কার্তিক গণেশের অনুপস্থিতি। পূজার রীতি দুর্গা পূজার মতোই। কেবল ষষ্ঠ্যাদি কল্প, নবপত্রিকা স্থাপন ও বোধন হয় না। নবমী তিথিতে একই দিনে দুর্গা পূজার রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।'[১৬] তাই এই পূজা যেন দুর্গা পূজারই সংক্ষিপ্ত একটি আকার, ক্ষুদ্র সংস্করণ।

পণ্ডিতদের অনুমান জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। 'কিম্বদন্তী অনুসারে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেছিলেন। বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, সেই সময় দুর্গাপূজার কাল উত্তীর্ণ। নৌকা থেকেই ঢাকের বাদ্য শুনে মহারাজ জানতে পারেন যে, সেদিন বিজয়া দশমী। সেই বৎসর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতে না পারায় দুঃখে কাতর হওয়ায় দেবী দুর্গা তাঁকে জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা দিয়ে একমাস পরে কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্ট দেবী প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে ধুমধাম সহকারে কার্তিকের শুক্লা নবমীতে পূজা করেছিলেন।...মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা করে এই দেবীর অর্চনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের সুহৃদ্ চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে জাঁকজমক সহকারে জগদ্ধাত্রীপূজা করেছিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এখনও কৃষ্ণনগরে এবং চন্দননগরে সাড়ম্বরে সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।'[১৭]

জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা-কাল এবং প্রবর্তক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি যাই থাকুক না কেন, যে সাধক অনন্যচিত্ত হয়ে ইহকাল-পরকালের সর্বপ্রকার চাওয়া-পাওয়াকে উপেক্ষা করে নির্মল নিষ্কাম প্রীতিতে ধৃতিরূপিণী জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে মন-প্রাণ নিবিষ্ট করতে পারেন, তাঁর হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। এখানেই তাঁর পূজার সার্থকতা। সাধনার পরিসমাপ্তি।

---

১৫ স্তবকুসুমাঞ্জলি, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৪,৩৩৭

১৬ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ৩য় পর্ব, ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩২

১৭ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ৩য় পর্ব, ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৯—৩০ এবং ৩৩২

স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ

ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

জাতির উন্নতি তাহার সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেহেতু সংস্কৃত-ভাষার মণিমঞ্জুষায় নিবদ্ধ, সেইজন্য স্বামীজী এই ভাষার সর্বস্তরে ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলনের দ্বারা সংস্কৃতির মানকে উন্নত করিতে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: "জনসাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর, যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন জনসাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই।" আজিকার দিনে শিক্ষার মাধ্যম এবং নানা ভাষার বাদবিসম্বাদের মধ্যে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির যথার্থ দিঙ্‌নির্ণয়ে স্বামীজীর এই গভীর চিন্তা-প্রসূত উপরোক্ত মন্তব্যগুলি সকলেরই বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। আমরা অনেক সময় শিক্ষাকে সর্বসাধারণের সহজলভ্য করিবার অত্যাগ্রহে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্ব শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি এবং তাহার ফলে যে মূল ভাষা হইতে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলি নিঃসৃত হইয়াছে—সেই সংস্কৃতভাষাকে সমূলে উচ্ছেদ বা নির্মূল করিতেও আগ্রহী হইয়াছি।

শিক্ষার মাধ্যমের অবনমন নহে, উন্নয়নের দ্বারাই যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে তাহাদের উপরে তুলিতে হইবে। স্বামীজী যেন তাঁহার অভ্রান্ত দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে চতুর্দিকে অশান্তির দাবানল ছড়াইয়া পড়িবে এবং "নানা ভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃই আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে।" ইহার প্রতিকারের একমাত্র অব্যর্থ উপায় তিনি নির্দেশ করিয়াছেন: "নিম্নজাতীয় ব্যক্তিদের বলিতেছি—তোমাদের অবস্থার উন্নতি করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা।... জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণ-স্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা"—"ভারতে সংস্কৃতভাষা ও মর্যাদা সমার্থক।"

স্বামীজীর এই গভীর উক্তির মধ্যেই বোঝা যায় যে দেশের পুনরুজ্জীবনে সংস্কৃতভাষার কি বিশিষ্ট ভূমিকা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা তিনি যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ববর্তী রাজা রামমোহন প্রভৃতিরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই রামমোহন প্রভৃতিরা সংস্কৃতকে উপেক্ষা করিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও তাঁহার প্রবর্তনের দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন। অথচ একটু লক্ষ্য করিলেই স্বামীজীর উক্তির অভ্রান্ত সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। নবজাগরণের যে তরঙ্গ আমাদের আঘাত করিল তাহাতে আত্মসচেতন হইয়া আমাদের প্রথম দৃষ্টি পড়িল নিজেদেরই অনন্ত সম্পদের প্রতি, যাহা আমাদের এতদিন অনাদরে ও অবহেলায় সংস্কৃতভাষার মঞ্জুষায় সুরক্ষিত হইয়া ছিল। বিপুল উদ্যম ও উৎসাহে আবার নূতন করিয়া তাহার চর্চা আরম্ভ হইল, অবশ্য প্রধানতঃ ইংরেজশাসকদেরই প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হইল এবং যে সব বরেণ্য মনীষী বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের পথিকৃৎ —যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন,

রামেন্দ্রসুন্দর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই সংস্কৃতভাষা গভীর ও ব্যাপক অনুশীলনের দ্বারাই বাঙলাভাষাকেও স্বকীয়-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেন এবং ইহার ফলে জাতির মধ্যে এক আশ্চর্য মর্যাদা-বোধও ফুটিয়া উঠিল।

সংস্কৃতভাষার এই ভূমিকা অন্য কোন ভাষার দ্বারা পালিত হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহাও স্বামীজী যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছেন: "এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা সমস্যার) একমাত্র সমাধান।" অনেকে মনে করিতে পারেন যে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়া সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে তাহাদের না হয় সমৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ দেশের ভাষাগুলির তো তাহাতে কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু স্বামীজী সে সম্বন্ধেও যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে "দ্রাবিড় ভাষাসকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণে বাস্তবক্ষেত্রে উহারা প্রায় সংস্কৃতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দিনের পর দিন নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে।"

স্বামীজী এইভাবে কি ভাষা সমস্যার সমাধানে, কি জাতীয় পুনরুজ্জীবনে, কি ঐক্য বিধানে সংস্কৃতের অপরিহার্য ভূমিকাকে অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শুধু নির্দেশমাত্র নহে নিজজীবনেও একান্ত আগ্রহের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম সহকারে তিনি এই ভাষা অনুশীলন করিয়াছিলেন। এবং সেই ভাষাতে অসাধারণ দক্ষতাও লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচিত সংস্কৃতভাষায় লিখিত নানা স্তোত্রে ও পত্রে। তাঁহার সংস্কৃতরচনা সংখ্যায় বা কলেবরে যৎসামান্য হইলেও সেইটুকুর মধ্যেই তাঁহার এই ভাষাতে অসামান্য দক্ষতার সাক্ষ্য উৎকীর্ণ হইয়া আছে। তিনি পাণিনি ব্যাকরণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাহা আয়ত্ত না করিলে যে সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা যায় না, তাহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি একটি পত্রে তাঁহার বন্ধু প্রমদাবাবুকে লিখিয়াছিলেন: "পাণিনি-কৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক।"

প্রাচীনকালেও সেইজন্য ছয়টি বেদাঙ্গের প্রসঙ্গে ব্যাকরণকেই মুখ্যস্থান দেওয়া হইয়াছে, "মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্"—এই উক্তির মধ্যেও ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়। বেদচর্চার পুনঃ প্রবর্তনই স্বামীজীর মুখ্য লক্ষ্য হইলেও তিনি ইহা জানিতেন যে ব্যাকরণই তাহাতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করার পর ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের তিনি নিজেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বেদ উপনিষদাদি এবং সেই সঙ্গে পাণিনির ব্যাকরণও সযত্নে পড়াইয়াছেন।

সংস্কৃতের প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্ত্বেও স্বামীজী ইহার অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। পরবর্তী কালে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী ও কবিগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য এবং রাজন্যবর্গকে চমৎকৃত করিয়া কিছু আশু লাভ ও যশের লোভে যে কৃত্রিম সংস্কৃত রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন স্বামীজী তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন। এ বিষয়ে তাঁহার তীব্র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য সকলেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "সংস্কৃতের দিকে দেখ দিকি। 'ব্রাহ্মণের' সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর 'মীমাংসা ভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখ, শেষ—

আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীনকালের সংস্কৃত দেখ। এখুনিই বুঝতে পারবে যে যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপরে, সেকি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ করে—'রাজা আসীৎ' !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !!—ও সব মরার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল।"

দেশে সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনের জন্য আজ যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও স্বামীজীর উপরোক্ত তীব্র মন্তব্যগুলি স্মরণে রাখিয়াই ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে এবং তখনই সংস্কৃতের যথার্থ মহিমা সমস্ত কৃত্রিমতার আবরণমুক্ত হইয়া সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবে। সেই মহিমার সম্বন্ধেও স্বামীজী তাঁহার অপরূপ ভাষায় সচেতন করিয়া গিয়াছেন: "এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌর-বিজ্ঞান প্রভৃতি সবকিছুই যেন কবিকল্পনার পুষ্প-বেদীতে স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম সংস্কৃত বা পূর্ণাঙ্গ ভাষা।"

স্বামীজীর নিজস্ব রচনাবলী প্রধানতঃ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ হইলেও এই পূর্ণাঙ্গ ভাষাতেও তিনি যে উদাত্ত আহ্বান তাঁহার অনুগত শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎবাসীকে শুনাইয়া গিয়াছেন তাহা যেন মন্ত্রের মতোই দিব্যস্পন্দনে স্পন্দিত এবং সকলের হৃদয়-মন্দিরে উৎকীর্ণ করিয়া রাখার মতো। আমরা স্বামীজীর সেই সংস্কৃত রচনাটুকু উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি যাহাতে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে স্বামীজী সংস্কৃতের কোন্ জীবন্ত প্রতিমাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন:

"যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য শ্রী১০৮ রামকৃষ্ণং আবির্ভবিতুম্ তব হৃদয়োদ্দেশে, যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্তং আবিষ্কৃতমহাশৌর্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যক যতিষ্যসে। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ ন কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরা ভবত, সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নম্। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রহগ্রস্তান্। শৃণুত অথৈতেষাং হৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদম্। অগ্রগা ভবত, অগ্রগা, হে বীরা, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থেঃ সর্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি।"

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ।

● ভ্রম সংশোধন ●

'উদ্বোধন' জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১-সংখ্যার ৩০৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে নিচ থেকে চতুর্থ-পঞ্চম লাইনে 'ডাঃ বিপিন বসু'-র স্থলে পড়তে হবে 'ডাঃ বিপিন ঘোষ'।

উল্লেখ্য যে, এই ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ কৃষ্ণময়ীর মাতুল পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে আত্মীয় এবং স্মৃতি-প্রবন্ধের লেখিকা শ্রীমতী উমাশশী বসুর পারিবারিক সম্পর্কে দাদামশায়। ডাঃ ঘোষের অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে গিয়া বলরাম-ভবনে 'ভগবান' শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির ঘটনা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে বর্ণিত।

বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র

ডক্টর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

[ভাদ্র, ১৩৭১ সংখ্যার পর]

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত মীমাংসার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। মীমাংসা বা বিচারের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে—ব্রাহ্মণগ্রন্থের মীমাংসামূলক অংশগুলির মধ্যেই সেই পদ্ধতির সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। পরবর্তী কালে সর্ববিধ শাস্ত্রীয় বিচারের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হত। শাস্ত্রকারগণ এক এক বিষয়ের মীমাংসার জন্য যে অধিকরণ রচনা করতেন, তার পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অবয়ব তাঁরা নির্দেশ করে গেছেন, যেগুলি একটি কারিকায় সংকলিত হয়েছে। সে কারিকাটি হচ্ছে—

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরঃ।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥"

শাস্ত্রীয় বিচারের প্রথম অংশটির নাম—'বিষয়' অর্থাৎ, বিচার্য বিষয় বা topic of discussion। দ্বিতীয় অবয়বটির নাম—'বিশয়' বা 'সংশয়'। কেননা, কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত থাকতে পারে, যার ফলে নিরপেক্ষ জিজ্ঞাসুর মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এবং এই সন্দেহই সকল জিজ্ঞাসার মূল। সন্দেহ নিরসনের জন্যই বিচারের অবতারণা করা হয়ে থাকে, নানা যুক্তি-তর্কের উপস্থাপনা করা হয়ে থাকে। যদি কোন বিষয় সম্পর্কে কারও মনে কোন সংশয়ের উদ্রেক না হয়, তবে বিষয়ের সম্যগ্ জ্ঞানলাভের জন্য কোনও আগ্রহও জন্মাতে পারে না। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ অতি স্পষ্টভাবেই বলেছেন: "নান্দিগ্ধে হ্যর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ততে ন নির্ণীতে।" 'ন্যায়সূত্র'-কার মহর্ষি গৌতমও তাই বলেছেন: "যত্র সন্দেহস্তত্রৈবমুত্তরোত্তর প্রসঙ্গঃ।" সংশয়ের অবতারণার পর বিকল্পিত মতগুলির মধ্যে যেটি বা যেগুলি কোন এক বিশেষ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় বলে স্বীকৃত নয়, সেগুলির পক্ষে প্রতিবাদিগণের অনুকূল যুক্তি উপস্থাপনা করা হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় 'পূর্বপক্ষ'। অনন্তর 'পূর্বপক্ষ' খণ্ডনের জন্য প্রকৃত শাস্ত্রের দৃষ্টিতে যে যুক্তিবিন্যাস, তাকে 'উত্তরপক্ষ' বলে অভিহিত করা হয়। এবং সব শেষে নির্ণয় বা সিদ্ধান্তটি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এক একটি অধিকরণের এই পাঁচটি করে অবয়ব স্বীকৃত হয়ে থাকে। মহর্ষি জৈমিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের অন্তর্গত কর্মকাণ্ডে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ মূলতঃ যজ্ঞসম্বন্ধীয় মীমাংসাগুলির উপর নির্ভর করেই তাঁর দ্বাদশাধ্যায়ী 'পূর্বমীমাংসা'-সূত্র রচনা করেন। জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের প্রথম সূত্র 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'-র সঙ্গে 'ব্রাহ্মণ' এবং 'কল্পসূত্রের' "অথাতোঽশ্চেতিপুরুষাণাং মীমাংসা" (শতপথব্রাহ্মণ ৮.৭.৪.১২), "অথাতঃ প্রয়াণস্যৈব মীমাংসা" (বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ৬,৯ এবং ১০, ১৭), "অথাত আপ্রীণামেব মীমাংসা" (ঐ ১০, ১১), প্রভৃতি বাক্যের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করার যোগ্য।[৫]

৪

আরণ্যক ও উপনিষদ্ বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহেরই অন্তিম দুই ভাগ—তাই উপনিষদ্‌কে বলা হয়ে থাকে বেদান্ত। আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরূপতা

৫ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসা-সূত্রের অন্তর্গত সূত্র-সংখ্যা প্রায় ২৭০০ এবং এগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে প্রায় ১০০০টি অধিকরণে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

আমরা লক্ষ্য করে থাকি। বৈদিক যজ্ঞের পুত্র-পশু-হিরণ্যাদি ফল ক্ষয়িষ্ণু, সুতরাং যোগক্ষেম যা জীবনের রক্ষা ও উপচয়ের দিক দিয়ে তার উপযোগিতা থাকলেও আত্যন্তিক, অক্ষয় শান্তি তার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। বৈদিক কর্মানুষ্ঠান অবিদ্যামূলক এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানই বিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা পরস্পর অত্যন্ত-বিলক্ষণ, এদের ফলও অত্যন্ত ভিন্ন। অবিদ্যা সংসাররূপ বন্ধের কারণ, আর বিদ্যা অমৃতত্ব বা মোক্ষের জনক। একদিকে সংসার, প্রেয়ঃ, অবিদ্যা; অপরদিকে মোক্ষ, শ্রেয়ঃ এবং বিদ্যা। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার সংবাদের মধ্য দিয়ে এই দুই মার্গের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্য জগতের প্রতি আসক্তিই সকল বন্ধনের মূল; তাই স্বভাবতই বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের বৃত্তি আমাদের অন্তরতম প্রত্যগাত্মার অভিমুখী করাই আত্মসাক্ষাৎকাররূপ বিদ্যা অর্জনের প্রধান উপায়। এইভাবে ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডে—যেখানে যজ্ঞেরই ছিল একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আরণ্যক ও উপনিষদ্রূপ জ্ঞানকাণ্ডে তার পরিবর্তে আত্মতত্ত্বকেই সকল জিজ্ঞাসার কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আত্মা, ঈশ্বর, জীব, জগৎ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, জন্ম, মৃত্যু, কর্মফল, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি অতি গহন দার্শনিক জিজ্ঞাসাই উপনিষদে গুরুশিষ্যগণের পরস্পর সংবাদ, নানা উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উৎসারিত হয়েছে। বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে নানা বিসংবাদ লক্ষিত হতে পারে বটে। কিন্তু যাঁরা শ্রুতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে স্বীকার করে থাকেন, এবং যাঁদের দৃষ্টিতে উপনিষদ্ই 'শ্রুতিশিরম্' রূপে প্রতিভাত, তাঁরা কখনও উপনিষদের কোন বাক্যকেই 'অপ্রমাণ' বা ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে পারেন না। যে যে অংশের সঙ্গে আপন সিদ্ধান্তের সংগতি সম্ভব শুধু সেই সেই অংশেরই প্রামাণ্য স্বীকার করা এবং অবশিষ্ট অংশকে ভ্রান্ত ও অপ্রমাণ বলে উড়িয়ে দেওয়া—ঔপনিষদ-ব্রহ্মবাদীদের কাছে এই পদ্ধতি কখনও গ্রহণীয় হতে পারে না। যেমন লোকায়তিক বা চার্বাকপন্থীরা বেদকে 'ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ' বলে বিদ্রূপ করে থাকে বটে, অথচ নিজেদের 'ভূতচৈতন্যবাদ' সিদ্ধান্তের প্রামাণ্যস্থাপনের জন্য, এর বেদমূলক তত্ত্ব প্রদর্শন করবার জন্য প্রয়োজনের তাগিদে 'বৃহদারণ্যক উপনিষদের' অন্তর্গত মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ থেকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিকে প্রমাণরূপে উদ্ধার করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় বেদের সামগ্রিকভাবে প্রামাণ্য স্বীকার করে থাকেন। তাই উপনিষদের আপাতবিরোধী উক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় স্থাপনের জন্য তাঁরা সততই তৎপর। বেদের তাৎপর্য নির্ধারণ কিভাবে করা সম্ভব, আপাত-বিসংবাদী উক্তিসমূহের মধ্যে কিভাবে অবিরোধ প্রদর্শন করতে হবে, সে সম্বন্ধে তাঁরা কয়েকটি উপায় নির্দেশ করে থাকেন, যেগুলি একটি কারিকায় সংগৃহীত হয়েছে। সেটি হল :

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসো পূর্ণতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।"*

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস বা অসকৃৎ আবৃত্তি, অপূর্বতা বা অভিনবত্ব, (অর্থাৎ প্রমাণান্তরের অগোচরত্ব) ফল বা প্রয়োজন, অর্থবাদ বা প্রশস্তি এবং উপপত্তি বা যুক্তি—এই কয়টির দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য বা অভিপ্রেত অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে আরুণি এবং শ্বেতকেতুর সংলাপের

* Quoted in the Sarvadarsan-Samgraha (Purnaprajna-darsana) and ascribed to the Brhat-Samhita.

সাহায্যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করা হয়েছে। প্রারম্ভেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ হয়েছে। (ছা. ৬.২.১) উপসংহারে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" (ছা. ৬.৮.৭) এই উক্তিতে তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইভাবে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদনেই এই উপদেশের তাৎপর্যনির্ণয়ের পক্ষে অনুকূল। এই অধ্যায়েই 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যটির নয়বার আবৃত্তি বা অভ্যাস দেখা যায়। এর দ্বারাও জীবব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদনেই যে এই অধ্যায়ের তাৎপর্য তা নিঃসংশয়ে অবধারিত হয়ে থাকে। এই উপদেশের অপূর্বত্বও আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক ; কেননা, অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারাই সেই ঐক্যপ্রতিপাদন সম্ভব নয়। অপি চ আত্মৈক্য উপলব্ধির ফল বা প্রয়োজনও এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে কীর্তিত হয়েছে : "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য। (ছা. ৬.১৪.২)—এই বাক্যের সাহায্যে।

আত্মৈকত্ববিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের অভেদোপলব্ধিরূপ সৎসম্পত্তি বা 'মোক্ষ' সাধিত হয়ে থাকে, তা স্পষ্টভাবেই এখানে কীর্তিত হয়েছে। "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ—যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ (ছা. ৬.১.৩) ইত্যাদি বাক্যে আত্মৈকত্ববিজ্ঞানের অর্থবাদ বা প্রশস্তি নিবদ্ধ হয়েছে। এবং "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছা. ৬. ১.৪) প্রভৃতি উদাহরণের সাহায্যে উপক্রমে প্রতিজ্ঞাত আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিষ্ঠার উপযোগী উপপত্তি বা যুক্তিও উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, 'একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ',—যুক্তিশূন্য কেবলমাত্র কোনও প্রতিজ্ঞাবাক্যের সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। [ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা

ডক্টর চিত্রা দেব

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্যারীচাঁদ ও মধুসূদনের পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতার নিজস্ব ভাষায় লিখলেন, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)।[২১] বাস্তবিকপক্ষে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' অন্যান্য রচনার তুলনায় অভিনব। লেখক কোথাও সাধু-চলিত মিশিয়ে লেখেননি ; শুধু তাই নয়, বানানেও মৌখিক বিকৃতিগুলিকে অনুসরণ করেছেন। আমরা মুখে বলি—ক্যামন, কত্তে, আচেন, গ্যাল, বন্দ,—কিন্তু লেখার সময় লিখি—কেমন, করতে, আছেন, গেল, বন্ধ ইত্যাদি। হুতোম তা করেননি। তাঁর মুখের ভাষা লেখার ভাষা প্রায় এক—ব্যঙ্গের চাবুক এই ভাষাতেই ঝলসে ওঠে।

'আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য বড় ধূম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা

২১ কেউ কেউ মনে করেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র লেখক কালীপ্রসন্ন নন, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভুবনচন্দ্র 'নিশাচর' ছদ্মনামে 'সমাজ কুচিত্র' লিখেছিলেন, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' তাঁর লেখা হলে এ গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন ছিল না।

তার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁকে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না।'[২৮]

হুতোমী ভাষাতেও সাধু ভাষার কয়েকটি শব্দ চোখে পড়ে, যেমন,—চক্ষু, মুদ্রিত, মহারাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ, বিধিপূর্বক প্রভৃতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে আছে কলকাতার মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্যটি। মনে হয়, স্বামীজী যে কলকাতার ভাষার ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন সে এই প্রাণবন্ত ভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্যের জন্যই। যাঁরা কলকাতার ভাষার বিকৃতিটুকুকেই বড় করে দেখেছিলেন স্বামীজী তাঁদের দলভুক্ত নন, তিনি এর অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে অসামান্য ধীশক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

হুতোম দেখেছিলেন তৎকালীন কলকাতার লোকের কুঅভ্যাস শোধরাতে গেলে ঝাঁজালো ভাষা চাই। সেই প্রয়োজন হুতোমী ভাষা মেটাতে পেরেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমী ভাষার শক্তিকে স্বীকার করেননি।[২৯] কিন্তু হুতোমের নিজের ভাষায় 'হুতোমের নকশা বঙ্গসাহিত্যে নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি'।[৩০] আমাদেরও তাই মনে হয়।

হুতোমী ভাষা সেকালে অনেককেই কলকাতার সমাজচিত্র অঙ্কনে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় হুতোমের ছদ্মবেশী কালীপ্রসন্নকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' (১৮৬৩)। এছাড়াও কয়েকটি নকশাজাতীয় গ্রন্থ এসময় লেখা হল। যেমন, ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুশুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫); রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের 'আপমানের নকশা: পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৮৬৫), চুনিলাল মিত্রের 'কলিকাতার লুকোচুরি' (১৮৬৯), হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতার হাটহদ্দ' (১৮৬৯), কেদারনাথ দত্তের 'সচিত্র গুলজারনগর' (১৮৭১), অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজ রহস্য' (১৮৭২) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লেখা হয়।

দেখা যাচ্ছে, কলকাতার ভাষা দুটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্য লাভ করে এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমটি হল নাটকের সংলাপে,—দ্বিতীয়টি হল সামাজিক নকশা ও প্রহসন জাতীয় রচনায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কথা আগেই বলেছি। স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় এই প্রহসনটির বহু সংলাপ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্বামীজীর সমসাময়িক গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর নাটকে উত্তর কলকাতার ভাষা প্রাধান্য লাভ করে। গিরিশচন্দ্র বাগবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন; তাই তাঁর রচনায় ঐ অঞ্চলের ভাষার বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের উক্তি, 'মা তুমি মাতালের পিত্তেস কর? জোচ্চোরের পিত্তেস কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস কর? এমন পিত্তেস রেখ না;'—বারবার 'পিত্তেস' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি সংলাপে যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছেন তা বিশেষভাবে উত্তর কলকাতার উচ্চারণ-প্রসূত। গিরিশচন্দ্রের রচনায়

---

২৮ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', পৃঃ ১২

২৯ 'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই, হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতাশূন্য।'—বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্কিম রচনাবলী (মণ্ডল), পৃঃ ১৮৩

৩০ হুতোম প্যাঁচার নকশা 'দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা', পৃঃ ১৮

এ ধরনের আরও বহু শব্দ আছে,—বেলকোপনা, বেইমশাই, নক্ককে মিন্সে,—চিকিচ্ছে, দাদার ঠেঙে শোনা, তোয়ের, চাকুমুড়ী কর, ঠেঁয়ে, হক্কের টাকা ডোব্বার নয় ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' কিংবা অমৃতলাল বসুর নাটকে কলকাতার ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগ চোখে পড়ে। দু-একটি উপন্যাসের ভাষাও ক্রমশঃ সরল হয়ে আসছিল তবে এসব ক্ষেত্রে কলকাতার ভাষা সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হয়নি, হয়েছে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত করে। শিবনাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্রনাথ বসুর উপন্যাস সম্বন্ধে একথা বলা চলে। এ সময় দু-একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল, রঙ্গ-ব্যঙ্গ পরিবেশনই যাদের লক্ষ্য, তারাও সাধু মিশ্রিত কথ্য ভাষা ব্যবহার করত। এদের মধ্যে 'বসন্তক' পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। অমৃতলাল বসুর নাটকে বরং কলকাতার ভাষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—

'কি রাধে আর যে আমার সঙ্গে কতা-টতা কচ্চিস নি। বলিছিলি আমি একটা বে থা কল্লে তুই আমার বউকে কত যত্ন করবি। ছেলেপুলে মানুষ করবি। এখন কি বলিস।'

এই 'খাস দখল' নাটক ছাড়াও অমৃতলালের স্মৃতিকথায় ও অন্যান্য আরও দু-একটি বঙ্গনারীর স্মৃতিকথায় কলকাতার ভাষার লিখিত রূপ চোখে পড়ে। তবে এসব স্মৃতিকথা আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পরে। ব্যাপকভাবে কলকাতার ভাষায় সাহিত্যচর্চা না হলেও মনীষীদের অনেকেই এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা রচনায় মনোযোগী হন উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে। তাঁকে নিয়েই আমরা এই কালসীমার সমাপ্তি নির্দেশ করতে পারি। তিনি অতি সহজ বাংলায় মুখের ভাষার মতো সাবলীলভাবে প্রবন্ধ রচনা করলেন এবং প্রমাণ করলেন চলিত ভাষায় শুধু চলিত ভাষা কেন কলকাতার ভাষাতেও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা সম্ভব, বিশুদ্ধ কৌতুকরসে পূর্ণ সন্ন্যাসীর ভ্রমণ কাহিনী রচনা করা সম্ভব—

'আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাঁধায়। একের নম্বর—কুঁড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তারপর নানা কাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ ক'রে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া করো তো, মনে ক'রো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—'রাম' হৃদয়ে ব'লে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুঁড়েমি।'[৩১] আমাদের মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার সঙ্গে 'পরিব্রাজকে'র ভাষার বিশেষ পার্থক্য নেই। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই আমরা আধুনিক বাংলা ভাষাকে যথাযথরূপে পেয়ে গেলুম স্বামীজীর রচনার মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, স্বামীজীর বাংলা সাহিত্যচর্চার বহুদিন আগেই কলকাতার ভাষা বাংলা সাহিত্যে বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। তাহলে স্বামীজীর রচনার বৈশিষ্ট্য কি? সাম্প্রতিককালের এক সমালোচকের মতে, 'সাহিত্যের এই রীতির (চলিত ভাষার ভিত) প্রথম সূচনা করলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ—তাকে শ্রী ও মর্যাদা দিলেন

৩১ পরিব্রাজক, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), পৃঃ ৫৯

স্বামী বিবেকানন্দ।'[৩২] কিন্তু স্বামীজী কালীপ্রসন্নের ভাষার ভিতের ওপরে ইমারত গড়েছেন বলে মনে হয় না। বরং বলা চলে, 'তিনি আপন ব্যক্তিত্বগুণে এবং সহজ প্রেরণাবশেই তাঁর নিজস্ব রীতির প্রবর্তক—অর্থাৎ গদ্যরীতিতে তিনি মার্জিত কালীপ্রসন্ন নন।'[৩৩] কিন্তু স্বামীজীর নিজস্ব রীতিটি কি?

সাহিত্যে কলকাতার ভাষার ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও সে ভাষা উনিশ শতকে সাধুভাষার সমমর্যাদা পায়নি। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কলকাতার ভাষায় সাহিত্য চর্চাও সম্ভব ছিল না। রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রধান নকশা জাতীয় রচনা ও নাটকেই এ ভাষার ব্যবহার হত কিন্তু কোন গভীর মননধর্মী রচনা কলকাতার ভাষায় লেখা হত না। হুতোমী ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায় না। সম্ভবতঃ স্বামীজীর আগে কেউ মননশীল প্রবন্ধ লেখার সময় এ কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেননি। তাই বলব, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ সকলেই চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'কিন্তু সর্ব কর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোন বাঙালী সাহিত্যিক বলেননি।'[৩৪] তিনি যে-কোন চিন্তার ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা—সর্বত্রই অবলীলায় কলকাতার ভাষা ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর মতামত দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, 'চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো এ সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর?'[৩৫] যা স্বাভাবিক তার সঙ্গে কৃত্রিম পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না। আটপৌরে ভাষার তীক্ষ্ণতা সাধু-ভাষার গদাই-লস্করি চালে দুর্লভ। স্বামীজীর ভাষায় 'ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'[৩৬] স্বামীজীর নিজের লেখাতেও ভাষার এই শাণিত দীপ্তি চোখে পড়ে, বাংলা সাহিত্যে যার তুলনা মেলে না।

দ্বিতীয়তঃ, বলা চলে স্বামীজী এই ভাষায় তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছিলেন। যে ওজস্বিতা সাধু ভাষায় বর্তমান, কলকাতার ভাষায় তার একান্ত অভাব ছিল। স্বামীজীর পূর্ব পর্যন্ত এ ভাষা শুধু স্ত্রীলোকের ভাষা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাষা—অর্থাৎ এ ভাষা চেহারার প্রতিচ্ছবি, মুখভঙ্গির বিকৃতিটুকু ধরে রাখতে পারত, চরিত্রের ওজস্বিতা, মানবিক ব্যক্তিত্বপ্রকাশে সক্ষম হয়নি। কিন্তু স্বামীজী যখন বললেন,—

'তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু

৩২ ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, পৃঃ ২২৫

৩৩ ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র: বিবেকানন্দের সাহিত্য ও ধর্মচিন্তা, পৃঃ ১৪০

৩৪ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: উনিশ বিশ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য', পৃঃ ১৪৩—১৪৪

৩৫-৩৬ 'বাঙ্গালা ভাষা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী (উদ্বোধন) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫

দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।'[৩৭] তখন সমস্ত রচনাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ এসে পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই আশ্চর্য প্রাণবন্ত ভাষাভঙ্গীর জন্য অন্য কোন বাঙালী লেখকের কাছে ঋণী ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঠিকই, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ নাট্যকারের রচনা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল সেকথাও সত্য তবু তিনি বাংলা ভাষার এই অপূর্ব ভাব-ভঙ্গীটি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে। পরমহংসদেবের বাণী ও উপদেশপূর্ণ 'কথামৃত' পড়লে দেখা যায় হুগলী জেলার গ্রাম্য টান মেশানো তাঁর সরল অনতিমার্জিত বাণীতে মিশে আছে এক অত্যাশ্চর্য রসপ্রবাহ।

'একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছলো এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব!'[৩৮] কিংবা,

'বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো; না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেইখানেই খুঁড়বে তবে ত জল পাবে।'[৩৯]

এই দুটি উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হল, প্রথমতঃ উপমার আশ্চর্য সুপ্রয়োগ এবং সেই মৌলিক উপলব্ধির সজীবতা। দ্বিতীয়তঃ, চল্‌তি ভাষার মাধ্যমে শাস্ত্রের গূঢ়তম সত্যকে প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং তৃতীয়তঃ, সহজ রসজ্ঞানে সুপটুতা।[৪০] স্বামীজী ঠাকুরের এই বাগ্‌বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেন। যদিও উভয়ের মুখের ভাষা এক অঞ্চলের ছিল না তবুও তিনি তাঁর শিষ্যকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে ব'লে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।'[৪১] বাংলা ভাষাকে নতুন ছাঁচে নতুন করে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সাহিত্যিকদের ভাষা তাঁর ভাল লাগেনি, 'এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশি verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষায় বেশি জোর হয়।'[৪২] বাংলা ভাষায় তেজস্বিতার অভাব অনুভব করে স্বামীজী তার প্রতিকার করার চেষ্টা করেছিলেন নানাভাবে। ভাষার গঠনরীতি সম্বন্ধেও তাঁর নিজস্ব মতামত লক্ষণীয়,—

'ভাষার ভেতর verb (ক্রিয়াপদ)-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস?—ঐরূপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক

৩৭ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ঐ পৃঃ ১৫১ ৩৮—৩৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

৪০ ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ : বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৫০

৪১—৪২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন) ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩—৯৪

ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেইজন্য বাঙলা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহার, চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।[৪৩]

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল কিন্তু প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষার ভাব ও রূপ সম্বন্ধে স্বামীজী, কত ভেবেছিলেন এটি তারই একটি উদাহরণ। 'বর্তমান ভারতে'র ভাষাও তার অন্যতম পরিচয়। শিষ্যকে আরও বলেছিলেন, 'বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব।'[৪৪]

স্বামীজী শিষ্যকে একথা বলেছিলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। মনে হয়, এসময়ে কিছু-দিন ধরেই তিনি বাংলা ভাষার কথা ভাবছিলেন কারণ 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চিন্তা তাঁকে ভাষা সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছিল। এর কিছুদিন আগে (১৮৯১) তিনি 'হিন্দুধর্ম কি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন[৪৫] এবং পরিচিতদের অভিমত শোনেন, 'কটমট বাঙলা হয়েছে'। 'হিন্দুধর্ম কি'র ভাষা তৎসম শব্দবহুল সাধুভাষা, দুর্বোধ্য নয় কিন্তু নিঃসন্দেহে কঠিন এবং 'বর্তমান ভারতে'র সমগোত্রীয়। 'বর্তমান ভারত' প্রকাশের সময়েও (মার্চ ১৮৯৮) অনেকে অভিযোগ করেছিলেন, 'উহার ভাষা অতি জটিল ও দুর্বোধ্য' বলে।[৪৬] স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন, '...গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই "বর্তমান ভারতের" আলোচ্য বিষয়। ইহার ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস-সংঘটিত নভেল নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।'[৪৭] কিন্তু স্বামীজী হতাশ হননি বা গৃহী লোকের 'কুঁয়ো খোঁড়া'র মতো হাল ছাড়েননি। তিনি জানতেন, 'বেদ-বেদান্তের উচ্চ-উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং ঠাকুরের ভাব সব্বাইকে দেবার জন্য 'বাংলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে।' আর সেজন্য সাধারণের বোধগম্য একটি সহজ অথচ জোরালো ভাষা তৈরি করে নিতে হবে তাঁকেই।

স্বামীজীর চেষ্টার ফসল দেখা গেল আরও কিছুদিন পরে ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি 'ভাববার কথা' প্রকাশের সময় (উদ্বোধন—১৩০৬ শ্রাবণ—১৫) থেকে। এরপর তিনি আর সাধু ভাষায় লেখেননি, সব কিছুই লিখেছিলেন চলিত ভাষায়।[৪৮] এই চলিত ভাষা স্বামীজীর কথায় 'কলকেতার ভাষা'। তাই কলকাতার লোকের বাক্‌রীতি ও উচ্চারণ প্রবণতা ধরা পড়েছে স্বামীজীর কলমে, 'নিচু' হয়েছে 'নিচু', 'আম' হয়েছে 'আঁব', 'লখিন্দর' হয়েছে 'নকিন্দর'। সেই

৪৩—৪৪ ঐ, পৃঃ ৯৩—৯৪

৪৫ পরে যেটি 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে 'ভাববার কথা'য় স্থান পায়।

৪৬—৪৭ বর্তমান ভারতের ভূমিকা, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২০

৪৮ ডক্টর আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার : চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, পৃঃ ২২০

সঙ্গে এমন অজস্র তৎসম শব্দের পরিবর্তিত রূপ ছড়িয়ে আছে যা প্রাত্যহিক কথাবার্তায় আমরা প্রতিনিয়তই বলি—বৈরিগ্যি, যুগ্যি, পুষ্যি, গেরস্ত, বদ্দি, আদ্দেক, খদ্দের, মোচ্ছব, রোদ্দুর, সাধ্যি, নিশ্চিন্তি, মাগনি, পুত্তুর, পিন্ডি, ভাগ্যি, রাজ্যি, বিচ্ছে, বে প্রভৃতি।

তিনি যখন লেখেন 'গপ্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে', 'আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর', 'নিশ্চিন্তি হয়ে মরব' কিংবা 'এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ের বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন' তখন ভাষা হয়ে ওঠে প্রকৃতই ভাবের বাহন। আগেই বলেছি, ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ বাছাইয়ের কাজ সহজ নয়। কালে কালে ভাষার শব্দভাণ্ডার ক্রমশই সমৃদ্ধ হয় কিন্তু যথা-শব্দ নির্বাচন করার সময় দেখা যায় মুখের ভাষাটিই সুপ্রযুক্ত হয়েছে কারণ মুখের ভাষাই জীবন্ত। এখানে 'গপ্প মারা' শব্দ দুটি যে ভাব প্রকাশ করেছে 'গল্প করা'র মধ্যে তা কখনই ফুটত না। স্বামীজী আমাদের ভাষার জন্য যথা-শব্দ অনুসন্ধান করেছিলেন কলকাতার ভাষার মধ্যে। তাই ক্রিয়াপদে 'চ্চ' ও 'উ'-র ব্যবহার খুব বেশি চোখে পড়ে; যেমন—যাচ্চি, কচ্চি, ভিজুচ্চি, কচ্চে, ঘুমুচ্চে, যাচ্চেন, চিবুচ্চে, নিচ্চে, বেড়াচ্চে, তাড়াচ্চে, দৌড়ুচ্চে, পেলুম, ছুটলুম, ভাবলুম, ডিঙুলুম, এলুম, ঠাওরালুম, গিয়েছিলুম, বেরুক, ভিজুনো প্রভৃতি।

সাধারণত আমরা সাধু ও চলিতের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করি ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তীকরণের মধ্য দিয়ে —'যাইতেছি' থেকে 'যাচ্ছি' 'পাইলাম' থেকে 'পেলাম' কিন্তু স্বামীজী এভাবে ক্রিয়াকে ছেঁটে-ছুঁটে তাকে চলিতে রূপান্তরিত করেননি, তার বিশিষ্টতাকেও রক্ষা করেছেন।

'লেকচার করে বেড়াচ্চি।'

'তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি।'

'বাংলাদেশ আর বড় এগুচ্চেন না ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত।'

'তাঁদের সঙ্গে এগুপেছুই কচ্চে।'

প্রসঙ্গত, মনে রাখতে হবে, আজ এই ভাষা ব্যবহার আমাদের চোখে বিচিত্র বলে মনে না হলেও ঊনবিংশ শতকে এটি ছিল অচিন্তনীয় ঘটনা—তখনও প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে চলিত ভাষার ওকালতি শুরু করেননি, রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষা চর্চায় অব্যাহত। সেই সময় 'উদ্বোধন' পত্রিকার নতুন ভাব ও ভাষা সকলকেই চমকে দিয়েছিল। স্বামীজীও যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েননি তা নয়। বিশেষ করে 'পরিব্রাজক' '"উদ্বোধনে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়।'[৪৯] এই বিরূপতা যে কতখানি তা বোঝা যায় অন্য একটি ছোট ঘটনার সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের কাছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রশংসা শুনে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এসেছিলেন কুমুদবন্ধু সেনের কাছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটির সন্ধানে। কুমুদবন্ধু সেন বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গ-সাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?'[৫০] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা বহু অনুরোধেও যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়তে

---

৪৯ স্বামী প্রেমঘনানন্দ: 'স্বামিজীর বাংলা রচনা', উদ্বোধন ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃঃ ৮৫

৫০ কুমুদবন্ধু সেন: 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা,' উদ্বোধন, মাঘ ১৩৫৪, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা

চাননি তা হয়তো 'পরিব্রাজকে'র অত্যাধুনিক ভাষারীতির জন্যই। স্বামী প্রেমঘনানন্দের মতে, 'দেশের অবস্থা বিবেচনা করে হয়তো সেজন্যই স্বামীজী তাঁর পরবর্তী "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সংস্কৃতমূলক করেছিলেন।'[৫১] কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষা কঠিন বা তৎসম শব্দে পূর্ণ নয়, শুধু তার ক্রিয়াপদে কলকাতার মৌখিক উচ্চারণ নেই, আছে আধুনিক চলিত ভাষার লিখিত রূপ ; যেমন—ঢুকছে, দাঁড়িয়েছে, আছে ইত্যাদি। মুখের ভাষাও কম নেই—'সে আটঘাট তোমার বন্ধ', 'গালাগালির চোটে অস্থির', 'জাতিধর্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন,' 'এ বুদ্ধিটি আগাপাস্তলা ভুল, মাপ করো অন্ন-দর্শীর কথা', 'ইদিক উদিকে', 'দৌড়ুচ্ছে', 'বাকি-গুলো খালি "ভেড়িয়া-ধসান" বই তো নয়', 'তাঁওতায় ভুলো না', 'হিঁদু', 'আমাদের বলবুদ্ধি ভরসা—তিন পেরুলেই ফরসা', 'এ সংসার দেখ্ তোর না দেখ্ মোর', 'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব কি দিবি তা বল্', 'মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ—এ জাতের কি ভালরে বাপু', 'নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ি', 'নিজের কোলে ঝোল টানছেন', 'নতুন তো শিখেছ কচুপোড়া খালি বাক্যি চচ্চড়ি' ইত্যাদিকে কোনভাবেই 'কঠিন' বা 'সংস্কৃতমূলক' বলা চলে না। এমনও হতে পারে, প্রতিকূল অবস্থায় স্বামীজী ক্রিয়াপদ-গুলিকে মাঝে মাঝে কলকাতাই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন কিন্তু মূল ভাষা-বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেননি। করতে চাননিও। কারণ খাঁটি বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি লুকিয়ে আছে মুখের ভাষাতেই, এ নিয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। মনে-মুখে এক হলে ভাষা অকৃত্রিম জোরালো ও সরল হতে বাধ্য। স্বামীজী মুখের ভাষা, চিন্তার ভাষা ও লেখার ভাষাকে এক করেছিলেন।

এবার দেখা যাক, কলকাতার ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করবার সময় স্বামীজী কি ধরনের শব্দ বেশি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। খাস বাংলার শব্দকে দ্বিগুণ করে বা ঈষৎ বদলে নিয়ে ভাষাকে অর্থবান করে তোলার কৌশলটি পুরনো, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে। অনুপ্রাসের গাঁট বাঁধার কাজে অনুকার শব্দগুলোর জুড়ি নেই, 'আধুনিক বাংলা ভাষার এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।'[৫২] স্বামীজীর রচনায় এর প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মতো। যেমন—কবিতা-ফবিতা, পাদ্রী-ফাদ্রী, হল্-ফল্, কুটনো-ফুটনো, বেদনা-ফেদনা, টাকা-ফাকা, পুজো-ফুজো, ব্যারাম-ফ্যারাম, মতে-ফতে, মুখ্যু-ফুখ্যু রাজা-ফাজা, মিশনরী-ফিশনরী, ব্যাম-ফ্যাম, মঠ-ফঠ, ঈশ্বর-ফিশ্বর, প্রচার-ফ্রচার, সমাজ-ফমাজ, লেকচার-ফেকচার, সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী, ঘণ্টা-ফণ্টা, রাঁধুনি-ফাঁদুনি, চক্কর-ফক্কর, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, পুলিশ-ফুলিশ, ডাক্তার-ফাক্তার, লিখতে-ফিকতে, ইলোরা ফিলোরা, বর্মা-ফর্মা, রুশ-ফুশ, গুরু-ফুরু, মজুমদার-ফজুমদার, আজগুবি-ফাজগুবি, জায়গা-ফায়গা, ভীড়-ফীড়, আইন-ফাইন, কায়েত-ফায়েত ও হুঁকো-ফুঁকো। অর্থহীন জোড়া শব্দটি 'ফ' দিয়ে শুরু করার প্রবণতা স্বামীজীর বেশি ছিল। অনুমানে বুঝতে অসুবিধে হয় না কথা বলবার সময়েও তিনি শব্দগুলি এভাবে ব্যবহার করতেন। এজাতীয় আরও বহু অনুকার শব্দ রয়েছে ; যেমন—প্রসাদটা-আসটা, বুদ্ধি-শুদ্ধি, কাজ-টাজ, ভগবান-টগবান,

---

৫১ স্বামী প্রেমঘনানন্দ : 'স্বামিজীর বাংলা রচনা', উদ্বোধন ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৪ : পৃঃ ৮৫

৫২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৬

হেঁজি-পেঁজি, বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, চেষ্টা-বেষ্টা, ধর্ম-টর্ম, দরজা-টরজা, বুঝি-সুঝি, ফিল্টার-মিল্টার, মালসিসর-আলসিসর, বিস্তে-সাম্ভি, বাল্মীকি-আল্মীকি, বুড়ি-টুড়ি, বই-টই, ভায়-মায়, উপাধি-টুপাধি, পুঁটি-পাটা, টুপি-টাপার মতো অনুগামী শব্দের সংখ্যাও কম নেই—গালচে-ভুলচে, গরীব-গুরবো, পাপী তাপী, উড়ে পুড়ে, আতু পুতু প্রভৃতি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীজী প্রয়োজনীয় শব্দ তৈরি করে নিতেন। বিশেষ করে বিশেষণের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন শব্দ গ্রহণের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। 'বেড়াল চোখো', 'লম্বাই চৌড়াই,' 'ছাগুলে বুদ্ধি' কি 'চাটগেঁয়ে মাঝি' হয়তো দুর্লভ নয় কিন্তু 'বরফান দেশ,' 'গঙ্গাসাগুরে ডিঙি', 'কোন্নগুরে মেঘ', 'কলকেত্তাই চাকর', চীনি যুদ্ধজাহাজ', বাঘা তাল্‌কো, মেয়েমান্‌ষী চেহারা নিশ্চয় অভিনবত্ব সঞ্চার করে। 'ছাগুলে বুদ্ধি'র সাদৃশ্যে স্বামীজী তৈরি করেছেন—মেছো বুদ্ধি, কেতো বুদ্ধি; আলু থেকে আলুয়ো বুদ্ধি, কপি থেকে 'কোপো বুদ্ধি'।

ক্রিয়ার ব্যবহারেও বৈচিত্র্য আছে। যেমন—'ধূমক্ষেত্র মাচাচ্ছে'। 'মাচানো' কথাটা হিন্দীতেই শোনা যায় বেশি। স্বামীজী বহুবার ব্যবহার করেছেন—'হুজুক মাচিয়ে দিক,' 'মাচাতে হবে,' 'মোচে গিয়েছিল' ইত্যাদি। এমনি আছে 'বকা' শব্দের ব্যবহার—'খালি বকা মারছ', 'মাথা বকাস না', 'বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের মতো কেবা মজবুত', 'আমিও খানিক বকবাদ ত্যাগ করেছি'। অন্যান্য বাক্যগঠনও লক্ষ্য করার মতো—'আমাদের দেশে মড়াকে চেতানো', 'প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা', 'চব্যচুষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা', 'বসে ফুঁকতে যত পারো'; 'হাত চুবড়ে সপাসপ ডালভাত খাই,' 'সকলের ঘাড়ে গড়িয়ে দাও', 'ভাত সাপড়ান,' 'বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়,' 'মেলা কলকজা মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্তি করে'। শেষের দুটি শব্দ না-পারকতা ও লোপাপত্তি-র ব্যবহার দুর্লভ বলা চলে। ইকারান্ত শব্দের প্রতিও স্বামীজীর প্রবণতা বেশি। তাঁর লেখায় 'গরম' হয়েছে 'গরমি', 'কম' হয়েছে 'কমি'। 'আমাদের সকল কাজে বৈরিগ্যি' বললে 'বৈরাগ্য' নতুন অর্থে 'কুঁড়েমি' বোঝায়।

উত্তর কলকাতার কিছু কিছু নিজস্ব শব্দ স্বামীজীর রচনায় মেলে। এদের খোঁজ মেলে গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের নাটকেও। সঠিক অর্থ জানা না গেলেও দেখা যায় ভাবপ্রকাশে এদের ক্ষমতা অসীম—ব্যাগত্তা, বোজলা, বেল-কোমো, বেভোল, হুড়দঙ্গুলে, আদাড়ে, ছাল, পাতকো প্রভৃতিকে এদের অন্তর্গত বলা চলে।

একই মন্তব্য করা চলে idiom বা phrase ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। স্বামীজী এগুলি ব্যবহার করতেন ঠিক প্রবাদের মতো বা উপমার মতো। কোনগুলি যে তাঁর পূর্বে ব্যবহৃত হত আর কোনগুলির স্রষ্টা তিনি স্বয়ং আজ আর জানবার উপায় নেই।—

'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' দিয়ে আমাকে অনেকে ঠাট্টা করছে

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'

এত গ্রামে গ্রামে কি 'ভেরেণ্ডা ভাজলে' নাকি

'কথা কানে হাঁটে'

আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বে' বলে জাগিয়ে দিলেই হল

'খালি কথায় ধর্ম হয় না' গুরুদেব বলতেন

ইংরেজের 'ওলবাটা মুখ'

'এঁড়ে লাগা' ছেলের বড় অযত্ন

আমার এখন 'পোয়া বারো'

এদের মেয়েদের দেখে আমার 'আক্কেল গুড়ুম'

এমনি 'গোবেড়েন' দিলে

'সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে'
'ভুঁড়িনাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন'
'হাঁকোচ-হাঁকোচ' গরুর গাড়ি

দীনা হীনা ভাবকে 'কুলোর বাতাস' দিয়ে বিদায় কর দিকি'

মনে অনেক জিনিস আসে তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে 'তিল থেকে তাল' হয়ে দাঁড়ায়, 'গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়'।

'দেখ্ তোর না দেখ্ মোর'
'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'
'নিজের কোলে ঝোল টানছেন'
বৌদ্ধ বন্ধুরা চটে যাও যাবে, 'ঘরের ভাত বেশি করে খাবে'

প্রভৃতি অজস্র প্রবচন স্বামীজীর রচনায় ছড়িয়ে আছে। আজ আর এদের কলকাতার ভাষা বা বাগ্‌বৈশিষ্ট্য বলে আলাদা করা যায় না কিন্তু স্বামীজীর সমসাময়িক কালে বাংলা ভাষায় এই জাতীয় বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্য বা সাবলীলতা কিছুই ছিল না। সম্ভবত সেজন্যই স্বামীজী 'পরিব্রাজকে'র ভাষা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বদলে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষাই আধুনিক লিখিত বাংলা ভাষার আদর্শ। কলকাতাবাসী ভদ্রসমাজের মুখের ভাষার সঙ্গেও তার পার্থক্য নেই। একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

'প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চারদিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রুনাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু "উল্টা সমঝ্‌লি রাম" হ'ল; ওরা—ইউরোপীয়রা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা-উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগ-সুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, "নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্" গাচ্ছি, আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপী। আর যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা॥'[৫৩]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার দূরত্ব নেই, সাধু ভাষারও না। এ ভাষা একই সঙ্গে মনের ও মননের ভাষা। রবীন্দ্রনাথ চলিতভাষার স্বপক্ষে রায় দেন অনেক পরে কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম ও উদার দৃষ্টি আর পূর্বপশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।'[৫৪]

বস্তুতঃ স্বামীজী-পরিকল্পিত ভাষার ভিতের ওপরই আধুনিক বাংলাভাষার ইমারত গড়ে উঠেছে, প্রমথ চৌধুরীর সযত্ন অনুশীলিত চলিত ভাষার ওপরে নয়। সে ভাষার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়ে, তার চাকচিক্যে মন মুগ্ধ হলেও তাতে মনের কথা কওয়া যায় না। আপামর

৫৩ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩

৫৪ কুমুদবন্ধু সেন: 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা', উদ্বোধন, মাঘ ১৩৫৪, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা

জনসাধারণের কাছে সে ভাষার আবেদন পৌঁছয়নি। একথা প্রমথ চৌধুরী নিজেও অনুভব করেছিলেন শেষজীবনে। একবার তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়কে বলেছিলেন, 'আমি যে কথ্যভাষায় লিখেছি সেটা কাদের কথ্যভাষা? শিক্ষিত স্তরের। কিন্তু তারাই কি সারাদেশ? সাধারণের কথ্যভাষা আমার লেখনীতে ফোটেনি। আমার এ ভাষাও কৃত্রিম।'[৫৫] কিন্তু স্বামীজীর ভাষায় কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী নানারকম শব্দ মিশিয়ে বৈঠকী ভাষা ও আটপৌরে ভাষার গ্রন্থিবন্ধন করেছিলেন। বাংলাভাষায় এই মিশ্রণ অভূতপূর্ব প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছিল। স্বামীজী বাংলাভাষা নিয়ে এই পরিকল্পনা বা চিন্তাভাবনা করেছিলেন বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা করবার জন্য নয়, ব্যক্তিগত কোন লাভ বা সম্মানলাভের জন্যও নয়, করেছিলেন তাঁর গুরুদেবের ভাব ও আদর্শকে ভদ্রেতর সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। সেজন্যই তাঁর পরিকল্পিত 'কলকেতার ভাষা' দীর্ঘদিন ধরে লেখার ভাষায় পরিণত হলেও তাতে জড়ত্ব আসেনি, অকৃত্রিম জীবনরসে পুষ্ট হয়ে ক্রমেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

৫৫ অন্নদাশঙ্কর রায়: 'প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র ও আমি', জিজ্ঞাসা, ৫ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৯১, পৃ: ১৬

জননী এসো

শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায়
আনন্দবাজার পত্রিকায় সংযুক্ত কবি ও লেখিকা।

রাখীবন্ধন দিনে বাঁধা হয় রাখী
দ্বিতীয়ায় বোন দেয় ভাইটিকে ফোঁটা
এমনও তো উৎসব আছে কিছু কিছু
যেখানে মিলিত হয় পরিবার গোটা

তেমনই এ পার্বণ শরতের দিনে
কাশ আর শিউলিতে তোলে হিল্লোল
মধুর কন্যা রূপে শারদা আসেন
এ পৃথিবী তাঁকে দেয় পেতে তার কোল

গর্জন ঘাম তেলে গড়া মূর্তির
দু' চোখেই বীর ভাব তবুও কি দয়া
করুণায় করুণায় ছল ছল করে
যখনই এগিয়ে আসে বিদায় বিজয়া

ফিরে যাওয়া আর এই পুনরাগমন
চিরদিন চিরকাল চলে বারবার
আমরা দুহাত তুলে প্রার্থনা করি
বছর ঘুরলে এসো জননী আবার

কবি ভবভূতি ও উত্তর-রামচরিত

শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী
প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যের লেখক।

সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজাত কাব্য ও নাটকাদি রচনা করে যাঁরা মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, ভবভূতি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। ভবভূতি মূলতঃ নাট্যকার ; কিন্তু কবি হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব সর্ববাদিসম্মত। তাঁর রচনায় প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ সুলভ। 'উত্তর-রামচরিত' ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। রচনাটি তাঁর যুগপৎ নাট্যশক্তি এবং কাব্যপ্রতিভার এক সার্থক প্রতিনিধি।

বৈদিক সাহিত্যে ভবভূতির অধিকার ছিল সুগভীর। তাঁর চেতনার মধ্যে ছিল বৈদিক সমাজের আদর্শ ও পবিত্রতার একটি সহজ অনুভূতি। এই অনুভূতি তাঁর প্রতিটি নাট্য রচনায় পরোক্ষভাবে পরিব্যাপ্ত।

ভবভূতির শিল্পকৃতির মূলে রয়েছে, বলিষ্ঠ ভাষা, বর্ণনকুশলতা এবং একান্ত সমাজ-সচেতনতা। নাটক রচনায় ক্ষেত্রে তিনি একজন সুদক্ষ চিত্রকর। বাক্য বিন্যাসের বর্ণচ্ছটায় এবং বুদ্ধির অপূর্ব কৌশলে এমন সার্থক চরিত্র চিত্রণ অপর কোন নাট্যকারের রচনায় দুর্লভ। সমস্ত চিত্রগুলি সৌষ্ঠবপূর্ণ এবং চিরন্তন। আবার ভবভূতি যখন কবি, তাঁর সহজাত ভাবানুভূতি, অলঙ্কার-সম্মত সৌন্দর্যসৃষ্টির অভিনব প্রয়াস, চিত্তগ্রাহী ভাষা এবং সর্বোপরি বর্ণনকুশলতা—স্বভাবতই পাঠকের মনে বিস্ময় এবং অভিনবতা সৃষ্টি করে।

দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ দেশের মধ্যবর্তী পদ্মপুর নগরে মহাকবি ভবভূতির জন্ম। বর্তমানে এই অঞ্চলটি অরণ্যময়। একসময় পদ্মপুর নগরে কিছু ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁরা ছিলেন যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী কাশ্যপ গোত্রজ ব্রাহ্মণ। তাঁদের সম্প্রদায়গত উপাধি ছিল, 'উদুম্বর'। কবির পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতা জাতুকর্ণী।

ভবভূতির পিতামহ ভট্টগোপাল বাজপেয় একসময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে লোকসমাজে 'মহাশিব' আখ্যায় সম্মানিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ সম্পাদন হলে তাঁর নাম হয়েছিল, 'পূজ্য মহাশিব ভট্টগোপাল'। ভট্টগোপালের পূর্বপুরুষেরা সকলেই ছিলেন বেদবেত্তা। ভবভূতি নিজেও একজন বেদজ্ঞ ছিলেন। সুপণ্ডিত A. B. Keith কৃত 'Bhababhuti and the Vedas' গ্রন্থে একথার সমর্থন আছে।

'মহাবীর চরিত' গ্রন্থে কবি আত্মচরিত প্রসঙ্গে লিখেছেন—'তদামুষ্যায়ণস্য তত্র ভবতো বাজপেয় যাজিনো মহকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্ট-গোপালস্য পৌত্র—পবিত্রকীর্তেঃ নীলকণ্ঠস্য আত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতির্ণাম জাতু-কর্ণী পুত্রঃ...' শ্লোকটি অনুধাবন করলে জানা যায়, ভবভূতি থেকে তাঁর পঞ্চম পূর্বপুরুষের নাম 'মহাকবি'। তবে কবির 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধি বংশগত নয়। এই উপাধি এক অলঙ্কারস্বরূপ। অল্প বয়সে সংস্কৃত রচনায় পারদর্শিতার জন্য তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজ কর্তৃক কবি 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধিতে অলংকৃত হয়েছিলেন। উত্তরকালে স্বরচিত তিনটি নাটকেই—যথা 'মহাবীর চরিত', 'মালতী মাধব' এবং 'উত্তর-রামচরিত'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন,—'শ্রীকণ্ঠ-পদলাঞ্ছনঃ ভবভূতির্ণাম'। তাছাড়া ভবভূতির জীবনী পর্যালোচনা করলে জানা যায়, বংশগত শাস্ত্রানুশীলন এবং নিজের অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যবসায় গুণে তিনি অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বাল্যকালে তাঁর শিক্ষা-গুরু ছিলেন জ্ঞাননিধি,—তৎকালীন যুগের এক

অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ। আচার্য জ্ঞাননিধির কাছে ভবভূতি বিভিন্ন শাস্ত্র; যথা—তর্ক, ব্যাকরণ, সাংখ্য, যোগদর্শন, মীমাংসা ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তিনি একটি শ্লোক রচনা করে 'ভবভূতি' নাম প্রাপ্ত হন। নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে এরূপ অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়:

'তপস্বীকাং গতেঽবস্থামিতি স্মেরাণনাবিব।
গিরি জায়াঃ স্তনোবন্দে ভবভূতি সিতাননৌ॥'

ভবভূতির জীবনী নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভাণ্ডারকার (R. G. Bhandarkar) এবং বেলভেলকর (S. K. Belvelkar)। ভাণ্ডারকারের মতে ভবভূতির জন্মস্থান নাগপুর অঞ্চলের চন্দা নগরের কাছাকাছি কোন একটি স্থানে ['Somewhere near Chanda in the Nagpur territories where there are still many families of Mahrati Desastha Brahmins of the Black Yajurveda with Apastamba for their Sutras'—"Malati madhava" : By R. G. Bhandarkar] কিন্তু এরূপ অনুমানের যথার্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে; কারণ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি তাঁর 'মহাবীর-চরিত' নাটকে লিখেছেন: 'অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিৎ তৈত্তিরীয়নঃ উদুম্বরনামানঃ ব্রহ্মবাদিনঃ কাশ্যপাশ্চরণ-গুরবঃ পতিতপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃত ব্রতাঃ সোমপায়িনঃ উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি।' উপরোক্ত শ্লোকে 'চন্দা' নগরের কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া একমাত্র ভাণ্ডারকার ব্যতীত অন্য কোন পুরাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক ভবভূতির জন্মস্থান, নাগপুর অঞ্চলের 'চন্দা' নগরের নিকটবর্তী বলে অভিমত প্রকাশ করেননি। উপরন্তু বিষয়টির সত্যতা প্রতিপাদনার্থে ভাণ্ডারকার তেমন কোন প্রামাণিক তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেননি। সুতরাং এমন একটি অভিমত নেহাৎই অনুমাননির্ভর।

ভবভূতির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। স্বরচিত কোন গ্রন্থে কবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে উল্লেখ নেই। সুতরাং তাঁর কাল নির্ণয় সম্পর্কে সকল তথ্যই অনুমাননির্ভর। 'History of Sanskrit Literature'-এর গ্রন্থকার সুপণ্ডিত Winternitz (M. Winternitz) ভবভূতির সময়কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করে তিনি লিখেছেন,—'He is certainly later than Kalidasa, with whose writings he is familiar—and apparently also than Bana, who does not mention him. The earliest writer to eulogise Bhababhuti (besides Vakpatiraja) is Rajsekhara, and the earliest work in which anonymous quotations from his works occur is the "Kavyalankara" of Vamana; both these references set the lower limit of his date at the last quarter of the 8th Century." [History of Sanskrit literature/M. Winternitz]

কোন কোন পুরাতাত্ত্বিক আবার ভবভূতির রচনায় দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করে তাঁকে বানভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতি সাহিত্যকারের (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) সমকালীন বলে নির্দেশ করেছেন। কেউ আবার অভিমত প্রকাশ করেছেন, তিনি শঙ্করাচার্যের পূর্বসূরী (আনুমানিক ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)। অনেকে কবির 'উত্তর-রামচরিত' পাঠ করে তাঁকে কালিদাসের সমসাময়িক বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অবশ্য এর পশ্চাতে একটি প্রবাদ কাহিনী আছে।

কাহিনীটি হল,—ভবভূতি 'উত্তর-রামচরিত' রচনা শেষ করে মহাকবি কালিদাসের কাছে ঐ নাটকটি সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কালিদাস তখন চতুরঙ্গ খেলায় মত্ত। তবু তিনি কবিকে নাট্য রচনাটি উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে বলেন। রচনাটি সম্পূর্ণ শুনে কালিদাস সন্তুষ্ট হন এবং প্রশংসা করেন। কিন্তু সেইসঙ্গে একটি মন্তব্য করে বলেন,—'১।২৭ শ্লোকের চতুর্থ ধরনে একটি অনুস্বার অধিক হয়েছে।' ভবভূতি কালিদাসের মন্তব্যটি মেনে নিয়ে তাঁর উপদেশমতো 'রাত্রিরেবং' স্থলে 'রাত্রিরেব' লেখেন ; যথা,—

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসক্তি যোগা-
দবিরলিতক পোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিল পরিরম্ভ ব্যাপৃতৈকৈক দোষ্ণ
রবিদিতগত যামা রাত্রিরেব (রাত্রিরেবং স্থলে)
ব্যরংসীত ॥'

[উত্তর-রামচরিত। প্রথমোঽঙ্ক ॥ ২৭ ॥]

কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা মেনে নিতে অনেকেই অপারগ এবং সেইহেতু তাঁরা ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক বলে স্বীকার করেন না। …'রাজতরঙ্গিনী' রচয়িতা কবি কল্‌হনের মতে, ভবভূতি কনৌজেশ্বর যশোবর্মনের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি ও বাকপতি দুজনেই যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন। বাকপতি তাঁর 'গৌরবহো' গ্রন্থে যশোবর্মনের প্রশস্তি গেয়েছেন। 'গৌরবহো' রচনাটি পণ্ডিতদের মতে, ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এই সূত্র ধরে শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ বিমানচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থে ভবভূতির আবির্ভাবকাল ৭ম খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বা ৮ম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ফেলা চলে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, বাকপতি রাজের মতো ভবভূতি তাঁর কোন রচনায় নিজেকে কোন নরপতির সভাকবি বলে উল্লেখ করেননি। এমন কি কোন নরপতির পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে কোন তথ্যই রেখে যাননি। যাইহোক এক্ষেত্রে কবি কল্‌হনের ঐতিহাসিকোচিত তথ্যগুলি ভিত্তি করে ভবভূতির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কবি কল্‌হন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী' কাব্যে উল্লেখ করেছেন,—ভবভূতি বাকপতির মতোই কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মনের সভাকবি রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন :

কবি বাকপতিরাজ শ্রীভবভূত্যাদি সেবিতং।
জিতো যযৌ যশোবর্মা গুণস্তুতি বন্দিতাম্॥

[রাজতরঙ্গিনী / ৪।১৪৪]

যশোবর্মনের রাজত্বকাল আনুমানিক, ৭০০—৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ [ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র দত্তের মতে যশোবর্মার রাজত্বকাল, ৭০০—৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ; কিন্তু Lassen-এর মতে, ৬৯৫—৭৩০]। বাকপতি রচিত গৌরবহোর রচনাকাল ও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে। সুতরাং ভবভূতির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ বলেই স্থির করা যেতে পারে।

'রাজতরঙ্গিনী' একটি ঐতিহাসিক কাব্য। কাব্যটির রচনাকাল, ১১০০খ্রীঃ। রচনাকার কবি কল্‌হন ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে তিনি 'রাজতরঙ্গিনী' রচনা করেছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে এই রচনাটি একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, 'কাব্যালঙ্কার সূত্র বৃত্তি' রচয়িতা বামন তাঁর ঐ গ্রন্থে ভবভূতির কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে বামন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। এই তথ্যটি প্রামাণিক বলে মেনে নিলে, ভবভূতিকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।

ভবভূতির কৌলিক ধর্ম সম্পর্কে সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। কবি এই প্রসঙ্গে সবিশেষ তথ্য

রেখে যাননি। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা রয়েছে। 'মহাবীর-চরিত' নাটকে তিনি ব্রহ্মার বন্দনা করেছেন। 'মালতী মাধব' নাটকে শিব, সূর্য এবং গণেশের প্রশস্তি আছে। 'উত্তর-রামচরিত' গ্রন্থে সরস্বতীর প্রশস্তি বাণীবদ্ধ হয়েছে। তবে ভবভূতির পূর্বপুরুষেরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মবাদী। সম্ভবত তিনিও ব্রহ্মবাদী। কিন্তু ব্রহ্মবাদী হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ভবভূতির শৈবানুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'ভবভূতি' নামকরণের ব্যাপারে শিবচরণাবিন্দের প্রতি কবির ব্যক্তিমনের নিভৃত আকুতি সত্যরূপে অভিব্যক্তি পেয়েছে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম 'শ্রীকণ্ঠ' হলেও তিনি ভবভূতি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। 'ভব' অর্থে শিব এবং 'ভূতি' অর্থে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য বা বিভূতি। তাছাড়া উজ্জয়িনীতে অবস্থান কালে ভবভূতি উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতা দেবতাকে সম্বোধন করেছিলেন, 'কলিপ্রিয়নাথ' নামে। মহাকালের সেই বিরাট মন্দির আজও বিরাজমান। শুধু তাই নয়, উজ্জয়িনীর শিবমন্দিরকে তিনি 'মহাকাল নিকেতন' ও 'মহাকাল বপু' নামে অভিহিত করেছিলেন। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মবাদী হলেও শৈব ধর্মের প্রতি ভবভূতির অনুরাগ ছিল প্রবল। ভবভূতি সম্পর্কে বিদগ্ধ পুরাতাত্ত্বিক M. Winternitz-এর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য,—'Bhababhuti was also a little he won as a poet blessed with luck or the holy ashes (Bhuti) of Siva (Bhaba).'

'উত্তর-রামচরিত' ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। এই রচনাটির জন্যই কবির সুখ্যাতি। অন্যান্য রচনা এখানে গৌণ। উত্তর-রামচরিত কবির পরিণত বয়সের রচনা। নাট্য রচনাটি কবির পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর আপন সঙ্গে সর্বত্র বহন করছে।

'উত্তর-রামচরিত' নাট্যরচনাটি কবির 'মহাবীর-চরিত'-এর পরবর্তী অংশ। নাট্যকাহিনী সপ্ত অংশে বিভক্ত। কবি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে তাঁর প্রথম নাট্যকাব্য মহাবীর-চরিতের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এই কাব্যে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে বাল্মীকির অনুগমন করেছেন। ভবভূতির দ্বিতীয় নাটক 'মালতী মাধব' একটি মৌলিক রচনা। 'উত্তর-রামচরিত' তাঁর তৃতীয় রচনা। এখানেও তিনি বাল্মীকির অনুগমন করেছেন। তবে এই নাটকের জনপ্রিয়তা কবির জীবৎকালে নানা কারণে সুদূরপ্রসারী হতে পারেনি। তার মধ্যে একটি কারণ হল, রাম কথার আংশিক পরিবর্তন। তৎকালীন জনসমাজ কাহিনীর এই আবর্তনটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। কিন্তু তাই বলে নাটকটির অপরাপর গুণবৈশিষ্ট্যকে তারা অস্বীকার করেনি। বলা বাহুল্য এই নাটকের প্রকাশভঙ্গী ভবভূতির অন্য দুটি নাটকের তুলনায় নিঃসংশয়িত। রাম কল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন করে কবি 'উত্তর-রামচরিত' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রচনায় এক মহাকাব্যিক সুর ধ্বনিত। সেই সুর অতি করুণ। করুণ রস চিত্রণে ভবভূতির সাহিত্যগত উৎকর্ষ প্রায় তুলনারহিত। নাট্যকলা বিচারে—কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের পরই ভবভূতির উত্তর-রামচরিতের স্থান। অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুশাসনে নাটকটি 'বিপ্রলম্ভ করুণাখ্য' এবং আদি রসাশ্রিত ['প্রাচীন চিত্র' / রাম সহায় বেদান্তশাস্ত্রী]। পণ্ডিতদের বিচারে এই রচনাটি ভবভূতির নবোন্মেষিণী প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

করুণ রসকে আকৃতি দিয়ে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ভবভূতি অনন্য। একমাত্র তাঁর কাব্যেই এই দক্ষতা সুপরিলক্ষিত ['…এতৎকৃত কারণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা']। তবে নাট্যশিল্পী হিসেবে ভবভূতি কালিদাস এবং ভাস অপেক্ষা উচ্চতর নয়। আখ্যানবস্তু গড়ে তোলার ব্যাপারে

তাঁর তেমন নৈপুণ্য চোখে পড়ে না। কিন্তু রস বিচারে তিনি যে অদ্বিতীয়, সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই।

'উত্তর-রামচরিত' নাটকে ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র ছায়াপাত ঘটেছে। এমনকি কালিদাসও তাঁর শকুন্তলা রচনায় ভাসের অনুকরণ করেছেন। অবশ্য এই ঋণ তাঁদের সুনাম ও সুখ্যাতির পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করে না বা তাঁদের রচনার মৌলিকতায় আঘাত করে না।

উত্তর-রামচরিতের তৃতীয় অঙ্কের নাম, 'ছায়া অঙ্ক'। কবি এখানে ছায়া সীতার একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এ এক অদ্ভুত কল্পনা। শম্বুক বধচ্ছলে শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে এসেছেন। এই নির্জন অরণ্যে তিনি মর্মে মর্মে সীতার অভাব অনুভব করছেন। তাই ছায়া সীতার প্রয়োজন হয়েছে। ভাগীরথী কর্তৃক সীতা এরূপ বর-প্রাপ্তা হয়েছিলেন যে, তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না; অথচ তিনি সকলকে দেখতে পাবেন। যাই হোক 'ছায়া সীতা' এখানে কোন ছায়া নন; অনেকস্থলেই তিনি কায়া সীতার কাজ করেছেন। আবেগপ্রবণ কবি আবেগাতিশয্যে ছায়া সীতাকে মাঝে মাঝে কায়া সীতারূপে উপস্থাপিত করেছেন। সেইজন্য অনেক স্থলে অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে। যাই হোক, এস্থলে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই 'ছায়া অঙ্ক' কবির নিজস্ব কল্পনা নয়। তাঁর পূর্বসূরী ভাসকে তিনি অনুসরণ করেছেন। ভাস-কৃত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে অনুরূপ একটি 'অঙ্ক' আছে (৫ম অঙ্ক)। সেই অঙ্কটির নাম, 'স্বপ্ন অঙ্ক'। সেখানেও একটি করুণ দৃশ্যের ছায়াপাত ঘটেছে।

ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত' অনুধাবন করলে বৈদিক আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। বেদপাঠ, দীক্ষাগ্রহণ, অতিথি সৎকার, গোদান, মাঙ্গলিক কার্যকলাপ, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি বৈদিক সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ভবভূতি স্বল্প রেখায় অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। এই সমাজচিত্রগুলি সকলই বিধিসম্মত এবং ধর্মোপেত। কিভাবে বৈদিক আচরণগুলি প্রতিপাদন করতে হয়, সেই সম্পর্কেও কবি নানা সূচনা দিয়েছেন। অবশ্য এই ব্যাপারে তিনি বৈদিকগ্রন্থ; যথা—উপনিষদ্, ধর্মসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি হতে নানা উপদেশ ও নির্দেশ সংগ্রহ করেছেন এবং স্বীয় রচনায় এক আদর্শ বৈদিক সমাজের রূপকল্পনা তুলে ধরেছেন। তান্ত্রিক ক্রিয়াদির ভীষণ নীতিভ্রষ্টতা এবং হিংসাপরায়ণতা থেকে জনসাধারণকে বিরত থেকে বৈদিক সমাজের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার প্রতি আকৃষ্ট হতে প্রচ্ছন্ন উপদেশ দিয়েছেন। এর জন্য তিনি ঘটনা দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে উত্তর-রামচরিতে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ভবভূতি প্রকৃতই সনাতন আর্য-ধর্মেরই অনুরাগী।

বৈদিক সাহিত্যে ভবভূতির অধিকার ছিল সুগভীর। তাঁর চেতনার মধ্যে ছিল বৈদিক সমাজের আদর্শ ও পবিত্রতার একটি সহজ অনুভূতি। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান ছিল সর্বজনবিদিত। রচনার ছত্রে ছত্রে আলঙ্কারিক বিদগ্ধতা তাঁর দুরবগাহ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। সাহিত্য-সাধনায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং ধ্যানতন্ময়। সাহিত্য-জীবনে তাঁর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। কিন্তু কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কবি পথ চলেছেন দীর্ঘদিন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-সাধনা সফল হয়েছিল। সাহিত্যকে নিত্যকালের রসলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। আজও পাঠকচিত্তে তাঁর কবিস্মৃতি বরণীয় হয়ে আছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

ত্রিশূলী তীর্থ রূপকুণ্ড

শ্রীনিশীথকুমার পাল
তরুণ পর্বতাভিযান-বিশেষজ্ঞ।

হিমালয়ের আহ্বান রহস্যের আহ্বান। হিমালয়ের ডাক অজানার ডাক। হিমালয়ের শিখরশ্রেণীর চিরতুষারমণ্ডিত রূপ বিস্ময়কর ও বিহ্বলকর। অরণ্যানীবেষ্টিত ছায়াঘন নিভৃত নির্জন উপত্যকাগুলো যেন স্বপ্ন-জগৎ। অনন্ত উদার আকাশের নিচে রূপমুগ্ধ মানুষ কি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। তাই ছুটে চলে দুর্গম বন্ধুর পথ পেরিয়ে,—পৌঁছাতে পারে না —কিন্তু তবুও তার চলার বিরাম নেই। অসমসাহসিক মানুষের বিচিত্র উদ্যমে দেবতাত্মা হিমালয়ের হৃদয় বুঝি বিগলিত হয়—অন্তরীক্ষে ধ্বনিত হয় অভয়মন্ত্র 'চরৈবেতি'…

হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে আমরাও এগিয়ে গিয়েছি তার কাছে বার বার। গড়ে তুলেছি গুটি কয়েক হিমালয় প্রেমিকদের নিয়ে সংগঠন—'আলপাইন ট্রেকার্স।' আমরা সাতজন অভিযাত্রী বেরিয়ে পড়েছি গাড়োয়াল-কুমায়ুনের রহস্যময় কিংবদন্তীতে ভরা রূপকুণ্ডের উদ্দেশে। দুর্গাপুরের অজয়দা, সুব্রত, রজত এবং অণ্ডালের দীপঙ্কর, অশোকদা, রামশঙ্কর ও আমি, দলের এই কয়েকজন সদস্য ১৪ সেপ্টেম্বর (১৯৮৩) বেরিয়ে পড়লাম ত্রিশূলী তীর্থের পথে।

কুমায়ুন-হিমালয়ের অন্যতম প্রবেশ-পথ হলদোয়ানী। সরাসরি লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত ব্রড গেজ লাইন, তারপর মিটার গেজ লাইন দিয়ে কাঠ-গোদাম পর্যন্ত যাওয়া যায়। হলদোয়ানীতে পৌঁছালাম ১৫ সেপ্টেম্বর ভোরবেলায়। এখানে K. M. O. U. Co.-এর বাস পাওয়া যায় এবং সরাসরি গোয়ালদাম পৌঁছানো যায়। সময় নেয় দশ ঘণ্টা। আমরা চলেছি ভাওয়ালী-আলমোড়া-বৈজনাথ হয়ে গোয়ালদাম, কোশী নদীকে ডান দিকে রেখে পিচ-ঢালা পথে এগিয়ে চলেছি। মাথার ওপর ছোট্ট ছোট্ট টুকরা মেঘের আনাগোনা। সন্ধ্যের সময় গোয়ালদামে পৌঁছালাম। প্রকৃতির কোলে সুন্দর-শান্ত একটি ছোট্ট জনপদ, উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট। গোয়াল-দামে আছে দুটি বন-বিশ্রামগৃহ। আর আছে পাইনের ছায়াঘেরা পর্যটন বাংলো। যদিও ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের অনুমতি-পত্র আমাদের সাথে নেই, তবুও ফরেস্ট রেস্ট হাউসের একটা কামরা রাত কাটাবার জন্য পেলাম। রাতে মুষলধারে বৃষ্টি এল। এই বৃষ্টি এ পথের সর্বদা সঙ্গী। ভাবছিলাম রূপকুণ্ডের কথা। এই রহস্যময় রূপকুণ্ডের আবিষ্কর্তা ফরেস্টার মাধোয়াল সিং। হ্রদের ধারে পড়ে থাকা মৃতদেহের অস্থি আজও জগতের বিস্ময়। এদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা কাহিনী—কত রকম মতবাদ।

১৭ সেপ্টেম্বর, ভোর ৭টায় নন্দাদেবীর নাম নিয়ে পদযাত্রা শুরু হল। আজই আমাদের লোহার জং পাস্ যাবার ইচ্ছে। দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার, আকাশ মেঘে ঢাকা। কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারদিক, গোয়ালদাম থেকে কেবল ১১ কি. মি.। পথের বেশির ভাগ অংশ উতরাই। পাথর কেটে বানানো হয়েছে পাকদণ্ডী পথ। গত রাতের বৃষ্টিতে পুরো পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। একটানা উতরাই ভেঙে পিণ্ডার গঙ্গার তীরে চিরিংগা গ্রামে উপস্থিত হলাম। এখানে আমাদের সঙ্গী পিণ্ডার গঙ্গা। এর উৎপত্তি নন্দাখাত ও নন্দাকোটের মধ্যবর্তী পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে। তারপর, তার উচ্ছল জলরাশি তীব্রবেগে ধাবমান কর্ণ-প্রয়াগের উদ্দেশে, যেখানে অলকানন্দার নীলাভ জল মিলিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

পাইনের ছায়াঘেরা পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। সামনে ছোট্ট গ্রাম নন্দাকেশরী। উচ্চতা ৪৫০০ ফুট, এখান থেকে দেবল মাত্র তিন কিলো-মিটার।

কোয়েলগঙ্গা ও পিণ্ডার গঙ্গার সঙ্গমস্থলে দেবল গ্রাম অবস্থিত। সমৃদ্ধ গ্রাম। ৪৪২৫ ফুট উচ্চতার এই গ্রামে হোটেল, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস সবই আছে। দেবল থেকে পিণ্ডার গঙ্গার তীর বরাবর একটি পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে পিণ্ডার হিমবাহের পথে মাতিগ্রামে। আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার পথ চলা শুরু করলাম। সুন্দর রাস্তা, যেমন চওড়া, তেমন সমতল। তবে বৃষ্টির জন্য পথের অধিকাংশ অংশ পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত, সতর্কভাবে এগোতে হচ্ছে। বগড়িগড় পৌঁছালাম দুপুর ২টার সময়। উচ্চতা ৬,৬০০ ফুট। দুটি চায়ের দোকান ও কিছু ঘর নিয়ে এই গ্রাম। পাশে বয়ে চলেছে কোয়েলগঙ্গা। এখান থেকে পাহাড়ের ওপর মান্দোলী গ্রাম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো লাগছে বাড়ি, ঘর, খেত ও খামার। বিকেল চারটের সময় মান্দোলী গ্রাম ও পাঁচটার সময় লোহার জং পাসের মাথায় এসে পৌঁছালাম। উচ্চতা ৮০০০ ফুট। এই উচ্চতাতেও একটি নূতন টুরিস্ট বাংলো গড়ে উঠেছে। সেখানেই রাতের আশ্রয় পেলাম। বাংলোর পাশেই রয়েছে দেবী নন্দার মন্দির। অশান্তির নায়ক দৈত্য লোহার জংকে দেবী নন্দা এখানেই বধ করে দেবতার রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ লোহার জঙের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে দেবী নন্দার মন্দির স্থাপন করে আরাধনার ব্যবস্থা করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর সকালে দেবী নন্দাকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওয়ান গ্রামের উদ্দেশে। দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। আমাদের এই অভিযানে ওয়ান গ্রাম পর্যন্ত কোন পোর্টার নেওয়া হয়নি। নিজেরাই রাস্তা ঠিক করে মালপত্র বহন করে চলেছি, লোহার জং থেকে ওয়ান গ্রামে যাবার দুটো রাস্তা আছে। প্রথম পথ বেগম গ্রাম হয়ে খপলুতাল (১০,০০০ ফুট)। গভীর জঙ্গলে ঘেরা পিচ্ছিল পথ। সেখান থেকে পাহাড়ের শীর্ষদেশে সুদৃশ্য হ্রদ। সেখান থেকে আরও ৩ কিলোমিটার গেলে বিগনতালে (১১,০০০ ফুট) পৌঁছানো যায়। সেখান থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তিন কিলোমিটার চড়াই ভাঙলে পৌঁছানো যাবে ব্রহ্মতালে (১১,২০০ ফুট)। সেখান থেকে লাল নিংড়া (১৩,০০০ ফুট) পাহাড় পেরিয়ে তিলবুড়ি বুগিয়ালের মালভূমি পেরিয়ে একটানা উতরাই পথ ওয়ান পর্যন্ত। দ্বিতীয় পথ লোহার জং থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওয়ান গ্রামে গিয়েছে। আমরা দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করছি। লোহার জং পাস্ ছাড়বার পর একটানা উতরাই। এক পাশে আকাশ স্পর্শ করা কঠিন পাথরের দেওয়াল আর অপর পাশে গভীর খাদ, ঘন জঙ্গল। অনেক জায়গাতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না, পথের কিছু অংশ ধ্বসে ভেঙে যাওয়াতে ৫০০ ফুট চড়াই ভেঙে ওপরে উঠে রাস্তা করে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে ওয়ান গ্রাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোয়েল নদীর উপর কাঠের পুল পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ওয়ান গ্রামে। রূপকুণ্ডের পথে এটাই শেষ গ্রাম তথা মনুষ্য-বসতি। এখানে একটি মাত্র চায়ের দোকান ও একটি মাত্র মুদির দোকান আছে। সুতরাং টুকিটাকি খাবার ইত্যাদি এখান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যাতুরাপানি নদী পার হয়ে চড়াই পথ শেষ হয়েছে ওয়ান টুরিস্ট বাংলো ভবনের আঙিনায়। পাশেই রয়েছে বন-বিশ্রামগৃহ।

১৯ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা প্রকৃতি-জননী আমাদের এক সুন্দর আবহাওয়া উপহার দিলেন।

প্রতি রাতের মতো গত রাতের বৃষ্টির কথা এই আবহাওয়াতে চিন্তা করা যায় না। তবে পাহাড়ে সবই সম্ভব। পথ পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আঁকা-বাঁকা সবুজ কার্পেটে মোড়া রণকধারে। মুখ তুলে চাইতেই ত্রিশূল শিখর আমাদের দেখা দেয়। মাথার উপর রেশমী আলোর পরশ। রণকধার থেকে বৈদিনী গঙ্গা পর্যন্ত একটানা উতরাই। পথের দু-পাশ রডোডেনড্রন গাছে ভর্তি হয়ে রয়েছে আর ফুটে রয়েছে অসংখ্য নাম-না-জানা ফুল। বৈদিনী গঙ্গা পার হয়ে একটানা কঠিন চড়াই। ঘন জঙ্গলে আবৃত এই পথ। কোথাও পথের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। সূর্যের আলো প্রবেশ করতে না পারার জন্য আবহাওয়া স্যাঁতসেতে। জোঁকের উপদ্রব খুব। চড়াই ভেঙে পাহাড়কে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া বৈদিনী বুগিয়ালে (১২,৫০০ ফুট) এসে পৌঁছালাম। ওয়ান থেকে দূরত্ব ১২ কিলো-মিটার, কিন্তু গোটাটাই চড়াই। বিরাট বুগিয়ালে ইতস্ততঃ ভেড়ার পাল চড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের ডাকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য দেখতে পাচ্ছি না। নির্জন প্রকৃতির কোলে রয়েছে মাত্র দুটি কাঠের কেবিন। উত্তরে রয়েছে একটি কুণ্ড, নাম বৈদিনীকুণ্ড। তার নীলাভ জলে নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলের প্রতিবিম্ব পড়ে। পাশেই সিংহবাহিনীর মন্দির ও পাথরের তৈরি ধর্মশালা। যাহোক, কাঠের কেবিনেই রাতের জন্য আশ্রয় নেওয়া হল।

২০ সেপ্টেম্বর ঘুম ভাঙে বৈদিনী বুগিয়ালে, আবহাওয়ার লক্ষণ ভাল না। সামনের গগন-চুম্বী হিমালয়ের শৈল শিখরমালা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। সকাল আটটার সময় বেরিয়ে পড়ি। ডানদিকের ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকি। নিচে দেখা যায় বৈদিনী বুগিয়ালের কাঠের কেবিন আর ভেড়ার পাল। ঘণ্টাখানেক যাবার পর হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কুয়াশায় সব ঢাকা। কিন্তু থামতে পারছি না, থামলেই ঠাণ্ডাতে জমে যাবার সম্ভাবনা। পাথর নাচুনীতে পৌঁছালাম সকাল সাড়ে নটার সময়। এখানে কিংবদন্তী শোনা যায়, প্রাচীন কালে এক উচ্ছৃঙ্খল রাজা তীর্থ করতে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন সুন্দরী নর্তকীদের। রাতে এখানে তাঁবু ফেলে নর্তকীদের নাচে-গানে ও আমোদে ডুবে যান রাজা। কিন্তু সেই রাতে নেমে এল প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, তুষারপাত ও বজ্রপাত। রাজা মূর্ছিত হয়ে স্বপ্ন দেখেন, কে-একজন তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যদি বাঁচতে হয় তবে এখনই নর্তকীদের সরিয়ে ফেলতে। ভোর হতেই রাজা সৈন্যদের আদেশ দিলেন নর্তকীদের জ্যান্ত কবর দিতে। তারপর, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ হতভাগিনী নর্তকী-দের ভাগ্যে জুটেছিল মৃত্যুর গভীর শীতল আশ্রয়। তারপর কত দিন, মাস, বছর, যুগ গড়িয়েছে,—সেই হতভাগিনীরা পাথর হয়ে রয়ে গেছে পাথর নাচুনীতে।

পাথর নাচুনীতে থামলাম না। এগিয়ে চলেছি কৈলুবিনায়কের পথে। বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে, পথের পাশে বেগুনি একোনাইট ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। ঠিক দুপুর এগারোটাতে চড়াইয়ের মাথায় কৈলুবিনায়কে (১৪,০০০ ফুট) পৌঁছে গেলাম। এক ফালি সমতল—সেখানে দেখলাম অধিষ্ঠিত রয়েছেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি পথের দ্বার আগলে রেখেছেন। দেবভূমি পৌঁছাবার আগে যাত্রীরা কে কি ত্যাগ করেছেন, সব দেখে তারপর প্রবেশের অনুমতি দেন। নেই কোন মন্দির, আছে উন্মুক্ত আকাশ। মূর্তির উচ্চতা দু-ফুট, মূর্তির পেছনে নন্দাঘুন্টি শিখর। পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে এসেছে ক্ষীণ জলধারা। স্থানীয়

নাম কৈলুগঙ্গা। জলধারাকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলেছি বগুয়াবাসার পথে। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে বগুয়াবাসা (১৪, ৫০০ ফুট) পৌঁছে গেলাম। স্লেট-পাথর সাজিয়ে স্বামী প্রণবানন্দজী সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি ধর্মশালা। তবে ক্যাম্পিং মাঠ পেতে হলে যেতে হবে হুনিয়াথরে। দুপুরের আশ্রয় নিলাম বগুয়াবাসাতে। সবাই আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছি, আগুন জালিয়ে শরীর গরম করার চেষ্টা করছি। আবহাওয়ার অবনতি অব্যাহত রয়েছে, তবে মুষলধারে বৃষ্টির যতি পড়েছে। বিগত কয়েকদিনের আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে, আমরা ঐদিন বেলা আড়াইটে নাগাদ রূপকুণ্ডের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

পাথরের ওপর দিয়ে রাস্তা, বৃষ্টির জন্য বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম রানী-কি-স্লেড়ায়। পথের আশে-পাশে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত স্লেট পাথরের রাজত্ব। এখানেও এক কাহিনী—কনৌজ-রাজ যশদয়াল চলেছেন বড়ি নন্দজাত উৎসবে যোগ দিতে। সমস্ত রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে তাঁবু ফেলেছেন রূপকুণ্ডের তীরে হুনিয়াথরে। রানী বল্লভা আনন্দে বিভোর। কিন্তু তিনি যেন তাঁর দ্বিতীয় সত্তার আগমন বাণী শুনতে পাচ্ছেন। তৈরি হল স্লেট-পাথরের প্রসবাগার। রানী প্রসব করলেন এক সুন্দর শিশু। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপ পালটাতে শুরু করল। শুরু হল তুষার-ঝড়, আশ্রয়হীন তীর্থযাত্রীর কোলাহল মুহূর্তের মধ্যে চাপা পড়ল হুনিয়াথর তুষার-প্রাঙ্গণের নিচে। শান্ত প্রকৃতি তাঁর দেবালয় কলুষিত করার প্রতি-শোধ নিলেন। হুনিয়াথর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। পথ দুর্গম। পাহাড়ের গা ঘুরে পথ চিরিনাগ চড়াইয়ের তলায় থেমে যায়। ৮০ ফুটের খাড়া দেওয়াল। অতিক্রম করি সেই দেওয়াল। দেখা দেয় ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি ও গাড়োয়াল হিমালয়ের অসংখ্য শৃঙ্গ। চড়াইয়ের পর চড়াই ভেঙে তিনটি বরফের প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। অবশেষে বিকেল সাড়ে চারটের শেষ চড়াই পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম রহস্যময় রূপকুণ্ডে (১৬,৩০০ ফুট)। শ খানেক ফুট নিচে নীলাভ জল ঢাকা কুণ্ড। তার উপর হালকা বরফের চাদর। আমাদের স্বপ্ন, পরিশ্রম ও পথ চলা আজ সার্থক। পাথর ডিঙিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলেছি। ডানদিকে রয়েছে জিউনার গলি গিরিবর্ত্ম। এই গিরিবর্ত্মের ওপারে শিলি সমুদ্র এবং সেখান থেকে হোমকুণ্ড ও রোন্টি স্যাডেল পৌঁছানো যায়। এবারে আমরা ঐ দিকে যাব না, তবে আগামী দিনে যাবার ইচ্ছে রাখি। আমরা কিন্তু কোন মৃতদেহের অস্থি দেখতে পাইনি, কেবল একটি ছাড়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ বিশেষ অস্থিটি রাখা হয়েছে কেবল অভিযাত্রীদের দেখানোর জন্য। ঐতিহাসিক কুণ্ড দেখে আমরা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। রূপ-কুণ্ড আবিষ্কারের পরে একে বিশদভাবে জানার জন্য বহু অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সদস্য স্বামী প্রণবানন্দ ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহুবার রূপকুণ্ড অঞ্চলে অভিযান চালান। ওয়ান গ্রামে এক সঙ্গে দু-তিন মাস থেকে রূপকুণ্ড সম্পর্কিত ব্যালাড সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া তিনি রূপকুণ্ডের তীর থেকে অনেক নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় রূপকুণ্ডের ওপর পাতলা বরফের স্তর ভেঙে নৌকা নামিয়েছিলেন। তারই রিপোর্ট থেকে জানা যায় রূপকুণ্ডের আকৃতি কতকটা ডিমের মতো; ব্যাস ১৫০ ফুট এবং দীর্ঘতম অংশের ব্যাস ২৫০ ফুট। এর তীর ধরে কিছুটা উঠলে পাওয়া যাবে নন্দাকিনী উপত্যকায় নামবার উপযুক্ত গিরিপথ জিউনার গলি। এই গিরিবর্ত্ম থেকে সর্বদা পাথর গড়িয়ে পড়ছে রূপকুণ্ডের





উপরে : হিমালয়ের বিস্ময়—ব্রহ্মকমল পাওয়া যায় ১৪,০০০ ফুট উপরে।

নিচে : রহস্যঘেরা রূপকুণ্ডে নীলাভ বরফের সর।

তীরে। উপকূলবর্তী সর্বোচ্চ পর্বত চালানিয়া কোট (১৬,৫৮৬ ফুট)। রূপকুণ্ড থেকে উৎপত্তি হয় রূপগঙ্গা নামক ছোট নদীর। তাঁর ধারণা রূপকুণ্ডের তীরে পড়ে থাকা মানুষের মৃতদেহগুলো দুর্যোগহত তীর্থযাত্রীদের। কোন তীর্থযাত্রীরা হোমকুণ্ডে যাত্রায় আসেন এবং পথে পড়ে রূপকুণ্ড। জিউনারগলি গিরিবর্ত্ম পার হয়ে যাবার সময় তুষার ঝড়ের কবলে তীর্থযাত্রীরা আক্রান্ত হন। সেখান থেকে তিনশ ফুট গড়িয়ে রূপকুণ্ডের তীরে দেহগুলো নেমে আসে। রূপকুণ্ড রহস্য সম্পর্কে প্রণবানন্দজীর মতবাদকে মেনে নিয়েছেন ভারতের নৃতত্ত্ববিভাগ। পরবর্তী কালে লক্ষ্ণৌর অধ্যাপক ডি. এন. মজুমদারের সংগৃহীত নিদর্শনগুলো রূপকুণ্ডের রহস্যের ওপর অনেকখানি আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে।

বহুদিন ধরে আসছি দেবতাত্মা হিমালয়কে প্রণাম জানাতে। সেই সুবাদে এবারেও এসেছি রূপকুণ্ডে। সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে দেখে গেলাম রূপকুণ্ডকে। সন্ধ্যে নামছে হিমালয়ের বুকে। ছোট্ট ছোট্ট টুকরা মেঘ অন্ধকারের আবর্তে ডুবে যাচ্ছে। ফিরে চলেছি বগুয়াবাসাতে। পথের দু-পাশে ফুটে থাকা ব্রহ্মকমল ও হেমকমল যেন আমাদের বিদায় জানাচ্ছে। আসা, আসা, আসা, হয়ে গেল আসা। এবার ফেরার পালা।

আহ্বান

শ্রীমতী চিত্রা বসু

লেখিকা ও কবি।

বহু দূর থেকে ভেসে আসে মহা ঐকতান
পৃথিবীর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
সমুদ্রবেলায় কি তারই প্রতিধ্বনি শুন্‌ছি
যখন নিস্তব্ধ রাতের প্রহরে
দিগন্তের নিভন্ত আলোয়
শুধু তুমি আমি একা ?

সে সঙ্গীত, তোমার আমার মিলন গাঁথায়
এত উদ্‌গ্রীব কেন ?
আমাকে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে যায়
বিশ্ব-পারাবারের তীরে,
যেখানে তোমার আমার দেখা হবে।

অশান্ত তরঙ্গ কেন আছড়ে পড়ে
অনন্ত সাগর বেলায়
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলা নিয়ে ?
প্রার্থিত ঈশ্বর, তোমার আমার যোগ
সে কি তবে মিলিয়ে যাবে দূরে ?

সমালোচনা

বিবেকচূড়ামণিঃ —শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য রচিত। অনুবাদক : স্বামী বেদান্তানন্দ। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ অ্যাভিন্যু, পাটনা—৮০০০০৪। পরিবেশক : অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৪। পৃষ্ঠা—২+৩৮৩, মূল্য : পনের টাকা।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপর গড়ে উঠেছে বেদান্ত-দর্শন—উপনিষদের শিক্ষাই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রের উপর আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যাই ভারতীয় জীবনকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে। আচার্য শঙ্করের রচিত 'বিবেকচূড়ামণিঃ' অদ্বৈত-বেদান্তের প্রকরণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই গ্রন্থে বেদান্তের মূল তত্ত্বসমূহ সুমধুর সহজবোধ্য কবিতায় বিবৃত হয়েছে। মূল গ্রন্থটি সংস্কৃতভাষায় রচিত।

অদ্বৈতবেদান্তের মূলকথা—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মই আত্মা; তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। তিনি এক এবং অবিকারী হয়েও এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। নামরূপাত্মক জগৎ তাঁরই প্রকাশ। যে শক্তিসহায়ে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই নাম মায়া। সৃষ্টির এই বহুত্ব ও বৈচিত্র্য সত্য নয়—রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত মিথ্যা। এই ভ্রম অজ্ঞান থেকে জাত। এই অজ্ঞানই 'অবিদ্যা'। জীব যতক্ষণ এই দৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলে মনে করে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে স্রষ্টারূপে দেখে। কিন্তু যখন অজ্ঞান দূর হয়ে তার জ্ঞান হয়—এই জগৎ প্রাতিভাসিকমাত্র, এর প্রকৃত সত্তা নেই, তখন তার কাছে ব্রহ্মই সব, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। যে গুণ অবলম্বন করে তিনি বিশ্ব-সৃষ্টি করেছেন, সেই গুণযুক্ত ব্রহ্মই, ঈশ্বর—মতে 'সগুণ ব্রহ্ম'। জগৎকে মিথ্যা বলে ধারণা হলে যে ব্রহ্ম থাকেন, তিনিই 'নির্গুণ ব্রহ্ম'। অবিদ্যা দূর হলে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য শমদমাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম, বিষয়ে অনাসক্তি, জগতের অনিত্যতাবোধ এবং মুক্তির জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা প্রয়োজন। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ থাকে না। তখনই জীব বলতে পারে 'সোঽহম্'—আমিই ব্রহ্ম।

'বিবেকচূড়ামণিঃ' গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয়তার কথা আচার্য শঙ্কর গ্রন্থটির ৫৭৮ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন—"ইত্যাচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্। নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে॥"—মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের সহজে উপলব্ধির জন্য গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তররীতি অবলম্বনে এই 'আত্মজ্ঞানশাস্ত্র' রচিত হল। রচয়িতা এই গ্রন্থপাঠের অধিকারী কে,—তাও নির্দেশ করেছেন (৫৭৯ সংখ্যক শ্লোকে)—যে সকল মুক্তিকামী সাধক শ্রুতিকথিত সাধনসমূহদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হয়েছেন, যাঁরা সংসারসুখে বিরত, শান্তচিত্ত এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রীতিমান্, তাঁরা এই হিতজনক উপদেশ অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করুন। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্ম ছাড়া নামরূপাত্মক জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব-প্রতিপাদন—এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থটিতে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, ব্রহ্মতত্ত্ব-উপলব্ধির পথনির্দেশ আছে। মানবদেহেই মুক্তিলাভ সম্ভব—মুমুক্ষু সাধক গুরূপদিষ্ট পথে সাধনসহায়ে জীবন্মুক্ত হতে পারেন। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন যোগ্য অধিকারী সাধক ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মহাবাক্য শ্রবণের পর আত্মানুভূতির জন্য সচেষ্ট হন; ভেদ-জ্ঞান রহিত হলে অজ্ঞানের বিনাশ ঘটে—শুদ্ধ-জ্ঞানের দ্বারা আত্মানুভূতি ঘটে। আত্মানুভূতিতে অপার সুখ। ব্রহ্মদর্শনের পর জগৎ লুপ্ত হয়—ভেদরহিত স্বস্বরূপে সদানন্দরূপে অবস্থিতি। এই গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়, শ্রবণ, মনন ও

নিদিধ্যাসন, সমাধি, সমাধিকালে ধ্যানের বিধি, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের আচরণ প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

বেদান্তদর্শনের সরস কিন্তু অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশের জন্ম অপরিহার্য সোপান এই বিবেক-চূড়ামণিঃ গ্রন্থ। অথচ গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে। গ্রন্থটির টীকাটিপ্পনিও পাওয়া যায় না। অধুনা প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থটির বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী বেদান্তানন্দজী। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী ধীরেশানন্দজীর আগ্রহে স্বামী বেদান্তানন্দজী এই দুরূহ অনুবাদ-কার্যে ব্রতী হন। প্রথমেই প্রশংসা করতে হয়—অনুবাদ মূলানুসারী, যথার্থ ও সাবলীল হয়েছে। স্থানবিশেষে অনুবাদকের ব্যাখ্যাসদৃশ মন্তব্য তত্ত্ব-বোধে সহায়ক হয়েছে। অনুবাদক শুধু অনুবাদই করেননি,—ঈশ, কেন, কঠ ইত্যাদি উপনিষদ্‌ ও গীতা থেকে সমার্থক মন্ত্র ও শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—ফলে ব্যাখ্যার কাজটা উদ্ধৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। এই কর্মে অনুবাদকের 'স্বাধ্যায়কর্ম' সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুবাদকের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুসম্পন্ন ও সফল হয়েছে বলা যেতে পারে। প্রবীণ অনুবাদক বহু পরিশ্রম স্বীকার করেছেন,—আমাদের বিশ্বাস, সেই সঙ্গে উত্তম বিষয়বস্তুর চর্চায় তিনি প্রভূত আনন্দলাভও করেছেন। অনুবাদ সাবলীল হওয়ায় সাধারণ পাঠকও শ্লোকার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত 'নির্ঘণ্ট'টির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে।

গ্রন্থটির পরিমার্জন প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলার আছে। গ্রন্থে বেশ কিছু ছাপার ভুল বড় পীড়াদায়ক, অবশ্য শেষে 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজিত হয়েছে। তা হলেও পরবর্তী সংস্করণে শুদ্ধ শব্দ ঠিক ঠিক স্থানে দেখা যাবে আশা করতে পারি আমরা। এই ধরনের গ্রন্থের সূচীপত্র যদিও নির্মাণ করা কঠিন, তবুও মোটামুটি একটি সূচীপত্র দেওয়া যেতে পারত। গ্রন্থটির মুখবন্ধে অনুবাদকের বক্তব্য আছে,—কিন্তু পৃথক্‌ভাবে আত্ম-তত্ত্ববিষয়ে একটি সরল ও বিস্তৃত ভূমিকা দেওয়া হলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে খুবই উপকারক হত। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের অবশ্যপাঠ্য এই গ্রন্থ। গৃহস্থগণও এই গ্রন্থপাঠে চিত্তশুদ্ধির উপায় খুঁজে পাবেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী
বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, হাওড়া

বিপ্লবের প্রতীক শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী
—জীবন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ অভয় পাবলিকেশনস্‌, ৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯। পৃঃ ৪+১৪১, মূল্য ঃ পনের টাকা।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী সম্বন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: এক, জীবনচরিত; দুই, স্মৃতিকথা। উভয় প্রকরণের এইসব গ্রন্থে তাঁর দিব্য তথা দেবী-মানবী রূপটি প্রতিভাত। আলোচ্য বইটি এই দিক দিয়ে একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। এখানে লেখক তাঁর জীবনচরিত বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। শ্রীশ্রীমায়ের দেবীরূপ নয়, লেখক তাঁর মধ্যে দেখেছেন অসাধারণ এক মানবীকে এবং পাঠকদের দেখাতে চেয়েছেন তাঁর সেই রূপটি। লেখকের চোখে শ্রীশ্রীমা যেন 'বিপ্লবের প্রতীক'—তাঁর চিন্তাধারায়, আচরণে, কর্মে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর অনন্য জীবনের মূল্যায়নের প্রয়াস আলোচ্য গ্রন্থে।

সাতটি পরিচ্ছেদে লেখকের বক্তব্য নানা উদাহরণ ও উদ্ধৃতি-সহ বিস্তারিত। প্রথম পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে শ্রীশ্রীমায়ের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী তিনটিতে তাঁকে দেখানো

হয়েছে যথাক্রমে ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী, ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারক রূপে। বাকি তিন পরিচ্ছেদের বিষয়ঃ 'শ্রীশ্রীমা ও নারীমুক্তি', 'মায়ের আধুনিকতা' এবং 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রীশ্রীমায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা'। তথ্যের সংগ্রহ ও সমাবেশে লেখকের পরিশ্রমী প্রয়াস অবশ্যই লক্ষ্য করবার মতো। বইটির কোথাও কোথাও, বিশেষত শেষ পরিচ্ছেদে, এমন কিছু সংবাদ লভ্য যা সম্ভবত অনেকেরই অজানা। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে সযত্নে সন্নিবিষ্ট উল্লেখসূচী, অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের নিকট যা অত্যন্ত মূল্যবান। এক কথায় গবেষণাধর্মী গ্রন্থের বাহ্যিক যেসব গুণ থাকা দরকার এই বইয়ে তার অধিকাংশই বর্তমান। একটি গবেষণাকর্ম কিন্তু তখনই সার্থক হয়ে উঠতে পারে যখন তার ভিত্তিমূলের স্থাপনা হয় সুদৃঢ়। দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে সেই ভিত্তিমূল মনে হয় দুর্বল। বস্তুত লেখকের মূল প্রস্তাব তথা প্রতিপাদ্যটি বিভ্রান্তিকর। বেদান্তদর্শনের পরিভাষায় বলা যায়, লেখক শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ অর্থাৎ তাঁর ভগবৎসত্তার উপর একটি 'আবরণ' স্থাপন করেছেন, লেখকের দৃষ্টিতে তাই ঘটেছে 'বিক্ষেপ'। ফলে তাঁর বিচার হয়ে উঠেছে ভ্রমাত্মক।

'বিপ্লব' শব্দের আভিধানিক অর্থ: আমূল পরিবর্তন, বিদ্রোহ, বিনাশ (দ্রঃ চলন্তিকা)। আর প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শব্দটির মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ: বিনাশের মধ্য দিয়ে যে-পরিবর্তন সূচিত হয় এমন আমূল পরিবর্তন। এই অর্থ মনে রেখে বলা যায়, দয়াপ্রেমজ্ঞানস্বরূপা শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রের উপর বিপ্লবমনস্কতার মাত্রা আরোপ করা অসঙ্গত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো শ্রীশ্রীমাও কিছু ভাঙতে অথবা ভাঙবার ডাক দিতে আসেননি—না ধর্মের কাঠামো, না সমাজের, না দেশের পরাধীনতার শৃংখল। এসেছিলেন এক কথায় মানুষকে 'মানহুঁস' হবার পথ দেখাতে, তাকে পূর্ণ করতে।

'ধর্মসংস্কারক শ্রীশ্রীমা' প্রসঙ্গে লেখক আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বিধবার নিয়ম-আচার মেনে চলেননি। ইচ্ছা সত্ত্বেও কেন তিনি সর্বাংশে এ-ব্যাপারে সেকালের রীতি অনুযায়ী চলতে পারেননি, সেকথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সেই আচরণের মধ্যে লেখক 'বৈপ্লবিক' লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন; আর 'আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সূত্রপাত' দেখেছেন তাঁর সহজ, সরল, উদার পূজা পদ্ধতির মধ্যে। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো শ্রীশ্রীমাও গুরুত্ব দিয়েছেন ধর্মের সারবস্তুর উপর—যা হল ভগবানলাভ, ভগবানের সঙ্গে অন্তরের যোগস্থাপন। ধর্মের সংস্কার নয়, ধর্মের সেই সারবস্তু সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে দেওয়াই ছিল তাঁদের কাজ।

সমাজ সংস্কারক রূপে শ্রীশ্রীমাকে চিহ্নিত করাও অর্থহীন। জাতি বিচারের ক্ষেত্রে অথবা যে-কোনও ক্ষেত্রে কোনও রকম সংকীর্ণতা তাঁর মনঃপূত ছিল না নিঃসন্দেহে। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে, সাধারণভাবে তিনি লোকাচার, দেশাচার, যথাসম্ভব মেনেই চলতেন। শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তিনি তাঁদের সকলেরই মা—পার্থিব অর্থে আবার আধ্যাত্মিক অর্থেও। জগন্মাতৃত্ববোধে এবং সেই কারণে সমত্বজ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠিতা—তাই স্বামী সারদানন্দ আর আমজাদকে দেখেছেন সমদৃষ্টিতে। একই কারণে মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন ধার্মিক-অধার্মিক পাপী-তাপী, সমাজে অপাঙক্তেয় সকলকে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে। সমাজ-সংস্কারের প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তাঁর মাতৃত্ব-বিকাশের (অথবা জগন্মাতৃত্ববোধের) সূচনা বলা

যেতে পারে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই পর্বের কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। সেখানে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশও তিনি পালন করতে অক্ষম। কেন? কারণ মা-ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারেন না, প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না শরণার্থীকে। লেখক এখানে তাঁকে দেখছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী হিসাবে! এ নিতান্তই খণ্ডিত, ভ্রমাত্মক দর্শন।

'শ্রীশ্রীমা ও নারীমুক্তি' এই প্রসঙ্গে লেখক যা বলেছেন তা বহুলাংশে যথার্থ। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হোক, তারা স্বাবলম্বী হোক, সমাজের বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠুক—এই ধরনের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন। এতে প্রমাণ হয়, তিনি তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন; প্রমাণ হয় তাঁর দূরদর্শিতার, প্রখর বাস্তববোধের, উদারতার, প্রগতিশীল মনোভাবের। প্রগতিশীলতা আর বিপ্লব কিন্তু সমার্থক নয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা কতখানি জিজ্ঞাসু ছিলেন আমাদের জানা নেই। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতি অবশ্যই ছিল—কারণ তিনি যে সকলেরই মা। তাঁর কথা: 'কে স্বদেশী, কে বিদেশী তা আমি কি জানি! সবাই আমার কাছে সমান, সবাই আমার ছেলে। মা বলে কাছে এসে দাঁড়ালে সবাইকে আমি আশীর্বাদ করি।' আমরা জানি, ইংরাজদেরও শ্রীশ্রীমা দেখতেন সন্তানজ্ঞানে। তাই বিলাতী বস্ত্র বর্জনের দিনেও তিনি তাঁর ভাইঝিদের পছন্দ মতো বিলাতী বস্ত্র কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে কুণ্ঠিত হননি। আবার নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর পুলিসের অত্যাচারের বৃত্তান্ত শুনে তিনি বিচলিত হয়েছেন, বলেছেন: 'এ যদি কোম্পানির আদেশ হয় তবে আর বেশীদিন নয়।' এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সে যাই হোক, বিপ্লববাদের সমর্থক হিসাবে শ্রীশ্রীমাকে চিহ্নিত করা কষ্টকল্পনা।

লেখকের মূল প্রতিপাদ্য এবং বহুলাংশে তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, লেখক শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব ঘটনা তুলে ধরেছেন, উদ্ধার করেছেন তাঁর যেসব উক্তি, সেইসব অংশ নতুন করে পড়তে সকলেরই ভাল লাগবে। এইসব উপলক্ষ করে পাঠক সুযোগ পাবেন তাঁর স্মরণ-মননের। বইটির একটি সার্থকতা এইখানে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যসত্তার বিষয়ে কিছু না বললেও এই অসামান্য চরিত্র বিশ্লেষণে লেখক তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাবটি সতত রক্ষা করেছেন। তাঁর রচনাভঙ্গী স্বচ্ছন্দ। সুন্দর। সুন্দর বইটির প্রচ্ছদপটও।

—শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট্‌ অব কালচা

● রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন যুব-সম্মেলন ●

বিজ্ঞপ্তি

পরিস্থিতি অনুকূল বিবেচিত না হওয়ায় বেলুড় মঠে নির্ধারিত যুব-সম্মেলন ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-৭০০০২৯ অথবা বেলুড় মঠ, হাওড়া অথবা নিকটবর্তী মঠ ও মিশন শাখা।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ছাত্রাবাসের সুবর্ণজয়ন্তী

মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরে রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হস্টেলের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গত ১১ সেপ্টেম্বর, একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ভূতেশানন্দজী তাতে সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী তপস্যানন্দজী একটি স্মরণিকাগ্রন্থ প্রকাশের সূচনা করেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে স্বামী অভেদানন্দজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয় যথাক্রমে ১৯ ও ২৫ সেপ্টেম্বর।

২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 'সারদানন্দ হলে' 'স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ' এই পর্যায়ে আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পরে 'সারদানন্দ হলে' প্রতি রবিবার স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও গীতা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামী অজজানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী শ্রবণানন্দ (গৌরগোপাল মহারাজ) গত ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ৫-১০ মিনিটে ডায়াবেটিস ও তৎসহ বৃক্কের কার্য ব্যাহত হওয়ায় ৫৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ডায়াবেটিস রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য একাধিকবার সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলেন। শেষবার ভর্তি হয়েছিলেন ১৭ অগস্ট, ১৯৮৪।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় গুরুর কাছেই সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি অধিকাংশকাল সারগাছি আশ্রমাধীন বহরমপুর কেন্দ্রের ছাত্রাবাস এবং গ্রন্থাগার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। সরল এবং অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

স্বামী ধ্যানানন্দ (মণীন্দ্র মহারাজ)-কে গত ১৫ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক অবস্থায়—বেলুড়ে গঙ্গার একটি ঘাটের নিকট জলমগ্ন ও প্রাণহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে তাঁর মৃতদেহ তুলে এনে বেলুড় মঠে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। শারীরিক নানা ব্যাধিতে তিনি দীর্ঘকাল ভুগছিলেন এবং এর জন্য তিনি যথানিয়ম ওষুধ ও পথ্যাদি গ্রহণ করছিলেন। গত দুই বৎসর তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন এবং যথাশক্তি লেখাপড়ার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষালাভ করে তিনি মিশনের দিল্লী কেন্দ্রে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগদান করেন। পরে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে তিনি সন্ন্যাসলাভ করেন। নিউ দিল্লী ছাড়া, বৃন্দাবন, বেলুড় মঠ, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচার এবং শেষে বাগবাজার মঠে তিনি বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত থেকেছেন।

১৯৭৪ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত আট বৎসর তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তথা বেদান্ত সাহিত্যে তিনি সুখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। অনাড়ম্বর ও কঠোর সাধু জীবনের জন্য তিনি অনেকেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার অজস্র পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে তিনি স্মরণীয় থাকবেন দীর্ঘকাল।

লোকান্তরিত এই সন্ন্যাসিদ্বয়ের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

যুব-সম্মেলন

গত ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ রাণাঘাট রবীন্দ্র-ভবনে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব্ কালচারের বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল-এর সহযোগিতায় আয়োজিত নদীয়া জেলা স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সংগঠক ছিল রাণাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণপদার্পণস্মারক সমিতি। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাতশো যুবক এবং ছুশো বয়স্ক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশিবচন্দ্র পাল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহ মজুমদার। সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ' ও 'আজকের যুবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের তাৎপর্য'। প্রথম অধিবেশনে প্রথমোক্ত বিষয় সম্পর্কে ভাষণ দেন ডঃ নিমাইসাধন বসু এবং অধিবেশনের সভাপতি স্বামী অজজানন্দ মানবতাবাদী স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। এছাড়া ভাষণ দেন স্বামী শিবরূপানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'আজকের যুবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের তাৎপর্য' বিশ্লেষণ করে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণে যুবকদের আহ্বান জানান। সম্মেলন পরিচালনা করেন সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী।

বিবেকানন্দ সোসাইটির ৮৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও ৯১-তম চিকাগো দিবস

গত ২৩ অগস্ট ১৯৮৪, বিবেকানন্দ সোসাইটির (কলিকাতা) ৮৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ (নিউ ইয়র্ক) এবং ডঃ নিমাইসাধন বসু।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সোসাইটি ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার ৯১-তম বার্ষিক স্মরণোৎসবে "চিকাগো বক্তৃতা ও তার প্রভাব" বিষয়ে স্বামী নিরাময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১—২৭ সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় ও নিকটবর্তী অঞ্চলে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলির বিশ্লেষণ করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শিক্ষাব্রতী ও চিরকুমার **পূর্ণচন্দ্র রায়** গত ৩১ অগস্ট ১৯৮৪ তারিখে ব্রাহ্মমুহূর্তে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। স্বামী নির্বেদানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই নির্দেশে তিনি ঝাড়গ্রামের অনগ্রসর পল্লীঅঞ্চলে শিক্ষাকর্মে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরে তিনি নিরলসভাবে ঐ অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তার ও জনসেবা মূলক কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন। লালগড় শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়, লালগড় বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। বেলুড় মঠ পরিচালিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্বর্গাশ্রম'—যা 'লালগড় কুঠিয়া' নামে পরিচিত, তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পূর্ণবাবুর উপরই ন্যস্ত ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **উমেশচন্দ্র ঘোষ** গত ২০ জুন ১৯৮৪ গভীর রাত্রে তাঁর সিঁথির ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বৎসর।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য **গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ২৮ অগস্ট ১৯৮৪, মঙ্গলবার, সকাল ১০টায় পরলোকগমন করেন।

প্রয়াত তিন ভক্তের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।
* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

উদ্বোধন

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা ● ভাদ্র, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৮৪—৩৯৫)

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

MY MASTER
Price : Rs. 1.60

THOUGHTS ON VEDANTA
(Seventeenth Edition)
Price : Rs. 2.25

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3.80

RELIGION OF LOVE (12th Ed.)
Price : Rs. 5.00

CHRIST THE MESSENGER
(Eighth Edition)
Price : Rs. 1.25

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4.25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3.00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1.80

VEDANTA PHILOSOPHY (9th Ed.)
Page 63, Price : Rs. 3.00

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
(13th Ed.)
Price : Rs. 15.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA

Price : Rs. 3.50 (Cloth)
Rs. 2.50 (Ordinary)

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial) (Fourth Edition)

BY SWAMI VISHWASHRAYANANDA

Price : Rs. 6.50

BOOK ON VEDANTA

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA

Price : Re. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১লা ভাদ্র। (১৩০৭ সাল) [১৩শ সংখ্যা

কোন্ পথে যাই ?

(ভিক্ষু দেবী দাস লিখিত।)

[২১৮ পৃষ্ঠার পর।

ক্রমশঃ এই শান্তিসুখ ভাঙ্গিতে লাগিল, তৎপরিবর্ত্তে আর এক আনন্দে মন মাতিতে লাগিল। দলে দলে যাত্রী আসিতেছে, সাধু দলে দলে আসিতেছেন—কত সম্প্রদায়,—শৈব, শাক্ত, বৈদান্তিক, উদাসী, রামাৎ, নিমাৎ, দশনামী—কত নাম করিব ? সব মনে নাই, আর মনে রাখিয়াই বা কি হবে ? সব দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। সাধুগণের বিরাট সম্মিলন—কত বিভিন্ন ভাব, তবু একত্র সম্মিলন। পরিচিত সাধুতে সাধুতে দেখা হইতেছে—আনন্দতরঙ্গ উথলিতেছে। ভক্তে ভক্তে মিলিত হইয়া প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন—জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে দিবানিশি উন্মত্ত বিচার—কোথাও কোন শান্ত মহাপুরুষ ধ্যানে মগ্ন। কোথাও কোন সাধু অপর সাধু সকলকে, কেহ বা কাঙ্গালিগণকেও খাওয়াইতেছেন—মহাসমারোহে ভাণ্ডারা চলিতেছে। দর্শকবৃন্দ কেহ যাইয়া সাধুগণের চরণবন্দনা করিতেছেন, কেহ বা তাঁহাদের নিকট গিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ বা শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেছেন। আমি ও যোগেন্দ্র (রামানুজী সাধুটী আমার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া, আমাকে পিতৃদত্ত নামেই পরিচয় দিয়াছিলেন) ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যোগেন্দ্রের অনেকের সঙ্গে মিলন হইল। যোগেন্দ্র অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। আমিও আজ এ সাধু, কাল ও সাধুর সঙ্গে আনন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ একজন বাঙ্গালীসাধু আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "কি যোগেন, এটী সঙ্গে কে ? চেলা বানাইয়াছ না কি ? যোগেন্দ্র পশ্চাৎ চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে ও, শিবোঽহং ভায়া যে। তা বেশ হইয়াছে, তোমার সঙ্গে মিলন হইল—অনেক দিন পরে। চল, আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে।" শুনিলাম, দুজনে পুরাতন বন্ধু। আমরা তিনজন তারপর এক সঙ্গে রহিলাম। কিন্তু, একটী বড় নূতন ব্যাপার দেখিলাম। আমার যোগেন্দ্র-ভায়ার আর সে ভাব নাই। তিনি 'শিবোঽহং' ভায়ার সহিত (যোগেন্দ্র এই নামেই সর্ব্বদা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন, আমিও তাঁহাকে এই নামে আখ্যাত করিলাম) রাত্রিদিন জ্ঞান ভক্তি লইয়া বিচার করিতেন—সে বিচারের বিরাম নাই। উহার আদি নাই, অন্ত নাই। আমারও এ বিষয়ে মহা কৌতূহল, আমিও দিনরাত্রি জাগিয়া ঐ বিচার শুনিতাম। ঐ বিচারের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি যতদূর স্মরণ হইতেছে, পাঠকবর্গকে দিতে ইচ্ছা করি।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, জ্ঞানীরা বলেন, এক দ্রব্য ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, সবই মায়া ; তবে সাধন-ভজন, উপাসনা, ক্রিয়াকাণ্ডের অবসর কোথায় ?

শিবোঽহং। জ্ঞানীরা বলেন, এক অদ্বিতীয় বস্তুই আছেন বটে, তবে যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ উপাস্য-উপাসক ভাব, সাধন-ভজন ইত্যাদি সবই থাকিতে পারে।

ভাদ্র, ১৩৯১ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

(কার্তিক, ১৩৯১, পৃঃ ৭২১)

যো। কিন্তু জগৎ মায়া বলিলে এবং সাধন-ভজনকে মায়া বলিয়া জানিলে, সাধন-ভজনে প্রবৃত্তি থাকিবে না। বেদাদি শাস্ত্রও ত মায়া বলিতে হইবে।

শি। তা বই কি, শাস্ত্রাদি সবই অবিদ্যার অন্তর্গত।

যো। তবে আবার কি করিয়া বলা হয়, শ্রুতিবাক্য তত্ত্বমস্যাদি শ্রবণে জ্ঞান লাভ হইবে? যাহা মায়া, তাহা দ্বারা জ্ঞান,—এ অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। আরও, যে গুরু তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, তিনিও মায়ার অন্তর্গত। তাঁহার যদি মায়া চলিয়া গিয়া থাকে, তবে শিষ্যে উপদেশ অসম্ভব; আর মায়া থাকিলে, সে উপদেশে জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

শি। জ্ঞানলাভ হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না, যেমন কুম্ভকারের চক্র একবার ঘুরাইয়া দিয়া নিরস্ত হইলেও, তাহার বেগ থাকে, অথবা যেমন ভয়জনক কোন স্বপ্ন দেখিয়া পরে জাগরিত হইলেও, তজ্জনিত কম্পনাদি বিলক্ষণ থাকে।

যো। জ্ঞান যদি প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবারণে সমর্থ না হইল, তবে আর সে জ্ঞানের শক্তি কি? জ্ঞানই যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তবে আর কোন্ জ্ঞান দ্বারা এই প্রারব্ধ ক্ষয় করিবে?

শি। এই প্রারব্ধ, ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়। আর বাস্তবিক জ্ঞানী প্রারব্ধ ভোগ করেন না। অপরে তাঁহাকে দেখে—তিনি প্রারব্ধ ভোগ করিতেছেন; তাঁহার জ্ঞানে কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মদর্শন করেন।

যো। তোমাদের ঐ এক কথা। এ সব প্রত্যক্ষের বিরোধী গাঁজাখুরীতে কে বিশ্বাস করিবে বল? তোমাদের এ সব ফাঁকি দিবার যুক্তি। আচ্ছা বল দেখি, তা যেন হইল, কিন্তু অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তবিক সম্ভব কি না? গভীর ব্রহ্মানুভূতির সময়েও কি আমি ব্রহ্ম অনুভব করিতেছি বলিয়া, একটা সূক্ষ্ম বোধ থাকে না। যতই অদ্বৈতজ্ঞান হউক না কেন, একটু দ্বৈত-ভাব তাহার মধ্যে থাকিয়াই যাইবে। অদ্বৈত ও দ্বৈতবিজ্ঞান উভয়ই জড়িত থাকিবে। তা না হইলে, শুধু নিছক অদ্বৈত জ্ঞান কি, তাহা ত কিছুই বুঝা যায় না, মানুষের ধারণা হয় না, হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। ভগবান ও মানুষে যে অনতিক্রমণীয় প্রভেদ আছে, তাহা ঘোচা একেবারে অসম্ভব।

শি। তোমার তর্ক আপাততঃ খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইলেও, অনায়াসেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। দেখ, যখন সাধনার গতি ক্রমশঃ অদ্বৈতের দিকে—তুমিও স্বীকার করিতেছ, তখন এই গতি যে এক সময়ে বন্ধ থাকিবে, তাহা কোন্ যুক্তিতে সিদ্ধান্ত করিবে?

যো। আচ্ছা, তোমরা যুক্তি যুক্তি করিয়াই ত পাগল, কিন্তু তোমরা জীবনের সারভাব যে প্রেমভক্তি, তাহার বিষয় কি করিয়া থাক?

শি। (হাস্য করিয়া) তোমার প্রেম, ভক্তি, কবিত্ব, সব অবিদ্যার অন্তর্গত। যতক্ষণ অবিদ্যা, ততক্ষণ সে সকল সত্য। অবিদ্যা চলিয়া গিয়া জ্ঞানোদয় হইলে, উহাদের প্রয়োজন নাই।

যো। ঐ কথায়ই ত তোমাদের উপর চটিয়া যাইতে হয়। ভক্তি প্রেম সবই অবিদ্যার অন্তর্গত, তবে বিদ্যার অন্তর্গত আর কি? যদি কিছু জ্ঞান থাকে, তাহা এই ভক্তি প্রেম। এই ভক্তিই সার জ্ঞান। তোমরা বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ব্যতীত কিছুই নও। তোমাদের মায়াবাদ

বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত। আর, তোমরা একটা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় কিম্ভূতকিমাকার পুরুষ ব্রহ্মনামে খাড়া করিয়াছ, যাহার সহিত জীবের কোনরূপ সম্বন্ধ অসম্ভব। তোমাদের মতে জীব ক্রমশঃ নাস্তিকই হইয়া যাইতেছে; ও তোমাদের মত—একটা উঁচুদরের অহংকার মাত্র। আমিই সব,—এ আর কি? —মহাস্বার্থপরতা। জীব বাস্তবিক পরস্পর ভিন্ন, একজন আর একজনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, একজন আর একজনের ভালবাসায় উন্মত্ত হইবে;—এসব ভেদভাব ব্যতীত অসম্ভব। তোমরা অসংখ্যকল্যাণগুণরাশির আধার সগুণ ঈশ্বরকে নির্গুণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ করিয়াছ, তোমরা ঈশ্বর জীবের অভেদ ভাব কল্পনা করিয়া, উপাসনা ও সাধনার ভিত্তি উঠাইয়া দিয়া মহা অহঙ্কারের প্ররোচক হইয়াছ; আর জীবে জীবে প্রভেদ উড়াইয়া মহা স্বার্থপরতার সৃষ্টি করিয়াছ; আর জগতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া সকল ব্যক্তির পক্ষে নিরুদ্যম, অলস ও পাপরত হইবার প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছ।

শি। আর তোমরা কি করিয়াছ? তোমাদের সগুণ ঈশ্বর একটা তোমাদেরই মত মন-বিশিষ্ট, তোমাদেরই মত গুণবিশিষ্ট, খুব না হয় একটা বড় জীবমাত্র। তোমরা তাঁহার পার্শ্বে জগৎ ও জীবকে স্থাপন করিয়া, তাঁহার অনন্তত্বের খণ্ডন করিয়াছ—তাঁহাকে একটা সাকার দেবতামাত্র করিয়া তুলিয়াছ। তোমরা জীবে জীবে ভেদ করিয়া জগতে দ্বেষবুদ্ধি, অভিমান, আত্মম্ভরিতার সূচনা করিয়া রাখিয়াছ। তোমাদের মতে অমুক অবতার—সকলে তাঁহার চরণে দাস হইয়া থাকুক। তোমাদের কেহ বা সাঙ্গোপাঙ্গ, অর্থাৎ সকলে তাঁহার চরণে পূজা দিক। আবার কাহারও কাহারও মতে এমত জীব আছে, যাহারা নিত্যবদ্ধ, তাহার আর কোন উপায় নাই। মোটকথা, তোমাদের মত—'আমাদের পদলেহন কর। আমাদের কৃপা হইলে তোমাদের কিছু উন্নতি হইবে। কিন্তু তোমরা কখন আমার সদৃশ হইতে পারিবে না।' তোমাদের ঈশ্বরও তাই বলেন—'আমায় পূজা কর, ভোগ দাও, আমার ইচ্ছা হইলে, আমি তোমাদিগকে কৃপা করিব, কিন্তু কেহই কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না; চিরকালই আমি তোমাদের শাস্তা।' আর জগৎকে সত্য বলিয়া, তোমরা বৈরাগ্যের পথ একেবারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তোমাদের মতে বৈকুণ্ঠেও খাজাগজা আদি ভোগ আছে। তবে তোমরা এই ভোগটাকে একটু সূক্ষ্ম করিয়া চিন্ময় ভোগ নাম দিয়াছ। 'চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।' যেখানে চিৎ, সেখানে আবার নাম ধাম কি? এ যে সোনার পাথর বাটী। মোটকথা, তোমাদের ভোগবাসনা প্রবল। সেইটী ছাড়িতে পারিবে না বলিয়াই, তোমাদের নির্ব্বাণে এত ভয়।

যো। আর, তোমাদের 'শিবোঽহং' বলিলেই বাস্, সব হইয়া গেল—আর ভজনের কষ্ট নাই, যাহা ইচ্ছা করিলেই হৈল—যথেচ্ছাচার।

শি। আচ্ছা যাক্, আর কবির লড়ায়ে কায নাই। তুমি একটু ভাবিয়া দেখ দেখি, ভক্তিটা কি। তুমি তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ বা জ্ঞানের মাহাত্ম্য, বুঝিতে পারিবে। ভক্তি সাধনের প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভাবে থাকে বটে—আমি হীন, জড়, পাপাত্মা, মন্দবুদ্ধি ও নিরানন্দ, আর আমার উপাস্য দেবতা মহান্, চেতন, পুণ্যময়, মহাজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, তিনি আমায় কৃপা করুন। কিন্তু এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে কি পরিবর্ত্তন হয় দেখ। তুমি কি এইরূপ হীন থাকিবার

(কার্ত্তিক, ১৩১১, পৃঃ ৭২৩)

জন্যই উপাসনা কর, অথবা তোমার উপাস্য দেবতার মত মহান্ হইবার জন্য উপাসনা কর ? উপাস্য দেবতার এই মহান্ গুণ তোমায় আকর্ষণ করে কেন ? না—তোমার ভিতর ঐরূপ হইবার আন্তরিক প্রার্থনা আছে বলিয়া। এই প্রার্থনা আবার হওয়া তখনি সম্ভব, যদি তোমার ভিতরে গূঢ়রূপে এই মহত্ত্বের ভাব নিহিত থাকে। ক্রমশঃ ভক্তের এইরূপ বুদ্ধির বিকাশ হয়—আমি প্রভুর দাস। ইহার অর্থ কি ? অর্থ—আমি সংসারের দাস নহি। এখানে 'দাসত্বের ভাব' লক্ষ্য নহে। তোমরা এইখানেই ভুল কর। তোমরা মনে কর, দাসত্ব-ভাবই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, প্রভু একজন স্বাধীন মুক্তস্বভাব পুরুষ। তাঁহার দাস কে হইতে পারে ?—যে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন ও মুক্তস্বভাব। ক্রমশঃ সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি ভাবরূপে এই ভাব উন্নত হইয়া হইয়া, শেষে সেই গোপীদের—যেমন ভাগবতে পাওয়া যায়—'আমি কৃষ্ণ' হইয়া যায়। এই শেষ পরিণতি। আর দেখ তোমাদের মতেও পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা না হইলে পূর্ণভক্তি—পরাভক্তি হয় না। তা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতাতে কি স্বতন্ত্র 'অহংভাব' থাকিতে পারে ? 'আমি কিছু নই, তুমিই সব', এই ভাবই যাহাদের সাধন, তাহারা কিরূপে আবার অহং রাখিয়া দেয়, কিরূপেই বা জীবকে স্বতন্ত্র ভাবে,—ইহা আমার ধারণায়ই আসে না। আর তোমরা জগৎকে সত্য বল, কিন্তু বল দেখি, তোমরাই আবার জগৎ অনিত্য বলিয়া জগতের সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া ভগবৎ প্রেমে মাতিতে উপদেশ দাও কি না ? পূর্ণ বৈরাগ্যের অবস্থায় জগৎকে মায়া বলিতে বল দেখি, কি আপত্তি থাকিতে পারে ? তোমাদের এই সকল বিরোধ হয়,—তোমরা একেবারে মস্তিষ্কের চালনা ছাড়িয়া দিয়া, ভাব সাগরে আত্মহারা হইয়া যাও বলিয়া। তাই তোমরা গুরুপূজার নিকট, তাঁহার অমূল্য উপদেশ রাশি বলিদান দিতেও কুণ্ঠিত হও না। কিন্তু এটী মনে রাখ না যে, অবতার বা গুরুর উপাসনা অর্থে তাঁহার স্থূল জড় শরীরটির উপাসনা নহে, উপাসনা—সেই শরীরের ভিতর যে চৈতন্য খেলিতেছেন, যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য—তাঁর। তোমরা নিরাকার মানিতে চাও না, কিন্তু ভাবিয়া দেখ না, তোমাদের সাকারের মাহাত্ম্য ততটুকু, যতটুকু উহা সেই নিরাকার সত্তার প্রকাশক। চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, প্রভৃতির নাম রূপ ধাম লক্ষ্য নহে, চিৎই লক্ষ্য। এই চিতের অনুপ্রাণনেই নাম ধাম উজ্জ্বল—নাম ধামের এত মাহাত্ম্য। নতুবা তাহারা জড়। অতএব দেখ ভাবিয়া দেখিলে, তোমাদের ভক্তি জ্ঞানে আরোহণ করিবার, একটী সোপানমাত্র।

যো। সব স্বীকার করিলাম। কিন্তু আবার আমাকেও বলিতে দাও। একদিক দেখিলে চলিবে কেন ? তোমাদের উপদেশ কি ? না,—প্রথমে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইবে ; তবে, জ্ঞানের অধিকারী হইবে। এই সাধন চতুষ্টয়ের ভিতর—সগুণোপাসনা ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস—দুইটী প্রধান অঙ্গ। বাস্তবিক সেইগুলির সাধনায় ভক্তিরই সাধনা করা হয়। কার্য্যতঃ কিন্তু, তোমরা প্রথম হইতেই তত্ত্বমস্যাদি অদ্বৈতভাবাত্মক শ্রুতির শ্রবণ ও বিচার করিয়া থাক—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। কিন্তু যতই তুমি তত্ত্বমসি বল ও অভেদ ভাবিবার চেষ্টা কর, তোমার ভিতরে দ্বৈতভাবাত্মক ভক্তি রহিয়া যায়। তুমি মনে কর, আমি অদ্বৈত সাধনা করিতেছি ; কিন্তু বাস্তবিক তুমি ঘোর দ্বৈতবাদী। সাধারণতঃ যাহাকে লোকে দ্বৈতবাদী বলে, তাহার অপেক্ষাও হয়ত তুমি ঘোর দ্বৈতবাদী। তোমার শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তসূত্রের শারীরক ভাষ্যে অনেক স্থলে

জীবব্রহ্মের ভেদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তোমার সহিত ভক্তের প্রভেদ এই, তুমি লাফাইয়া যে জিনিষটা ধরিতে চাও, হয় ত যাকে ধরা একেবারেই অসম্ভব, ভক্ত তাহা ধীরে ধীরে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে লাভ করিতে যান। ভক্তও যে, একরূপ অদ্বৈত অবস্থা লাভ করে, তাহা আমি জানি, কিন্তু সে কিরূপ জান ?—একজন অনেক দিন মনিবের সেবা করিল। তাহার মনিব তাহার প্রতি এত প্রসন্ন হইলেন যে, তাহাকে তিনি নিজ সিংহাসনে জোর করিয়া বসাইয়া আর সকলকে বলিয়া দিলেন—'ইনি ও আমি এক, তোমরা ইঁহাকে ও আমাকে সমান দেখিবে।' তাই বলে, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,—অভেদ। কিন্তু ভক্ত সঙ্কুচিত হয়, সে চিরকাল আপনাকে ভক্ত বলিয়াই জানে। যে, সে ভক্তিরস আস্বাদন করিয়াছে—সে কি মুক্তি আদি প্রার্থনা করিতে পারে ? তোমাদের যাহাকে সোঽহং অবস্থা বল, তাহাও ক্ষণিক তন্ময় অবস্থা বই আর কিছুই নয়। অনেকে সোঽহং অভ্যাস করিতে পারেন, কিন্তু নিত্য ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রমাণাভাব। তোমাদের জ্ঞান, উচ্চদরের ভক্তি ব্যতীত, আর কিছুই নয়।

আমি ইঁহাদের তর্কের একটু নমুনা দিলাম। আরও কত বিষয় আলোচিত হইত, কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক বিচার উঠিত, তাহার সব কথা আমার মনেও নাই, আর বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার উপযোগিতাও নাই।

হিন্দু-সভা।

"হিন্দুসভার" আনুষ্ঠানিক সমিতির প্রথম অধিবেশনের দিন পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

সভাপতি—মহারাজ দ্বারভাঙ্গা।

(প্রাপ্ত।)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও মহোদয়গণ !

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ", স্বজাতি শ্রেয়ঃসাধনরূপ মহাধর্ম্মের সাধনার জন্য অভ্যুত্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই, প্রথমে ঔৎসুক্য পরিহার-পূর্ব্বক, সঙ্কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ঐকান্তিক তৎপরতাই অবলম্বনীয়, এই মহান্ সত্য উপদেশবাক্যটী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া গন্তব্য পথের অনুসরণ যতদিন আমরা করিতে পারিব, ততদিন আমাদের এই পবিত্র সম্মিলনের অভীপ্সিত ফললাভের আশা হইতে যে আমরা বঞ্চিত হইব না, ইহা স্থির।

আমাদের দেশের কেমন এক কুস্বভাব হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, কেহ কোন নূতন সৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিলেই, কতকগুলি বিজ্ঞতাভিমানী, বহুপ্রকার নিষ্ফল কার্য্যে হস্তক্ষেপ নিবন্ধন নৈরাশ্যক্লিষ্ট প্রাচীনকল্প ব্যক্তি, বলিয়া উঠেন যে—"এ কার্য্য কেন হইতেছে ? ইহাতে কোন ফলের আশা নাই, বরঞ্চ ইহা দ্বারা প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।" ইত্যাদি প্রস্তাবনাতেই যবনিকাপাত করিবার জন্য এই প্রকার বিসদৃশ চেষ্টায়, অনেক সময়ে সমাজের হিতসাধনার্থ সমুদ্যত অনেক উৎসাহশীল ব্যক্তির তীব্রকার্য্যকারী উৎসাহবহ্নিও নির্ব্বাণ হইয়া সমাজের উন্নতর পথের অন্ধকারকে যে আরও ঘনীভূত করে, তাহার সন্দেহ নাই।

(কার্ত্তিক, ১৩১১, পৃঃ ৭২৫)

সত্য বটে, আমাদের অভাগ্য-দোষে এবং অভীপ্সিত সামাজিক কেন্দ্রশক্তির সম্যক্ পরিচালনার অভাবে, আমরা অনেকবার অনেক আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যের আরম্ভ করিয়া পশ্চাতে বিফলমনোরথ হইয়াছি; কিন্তু, তাই বলিয়া যে, আমরা নৈরাশ্যে সকল কার্য্য বন্ধ করিয়া, হৃদয়ে বৈরাগ্যের লেশের আস্বাদন না করিয়াও, নিবৃত্তিসাগরে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বনাশকর সংন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? শাস্ত্রে বলে—

"ভূমৌ সঞ্জাতপাতানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।"

আরও দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পরিমাণে নিরাশ হইয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন করিতে গিয়া, কি শিক্ষিত সম্প্রদায়, কি অশিক্ষিত সম্প্রদায়, কেহই এ পর্য্যন্ত সে পরিমাণে নৈরাশ্য অনুভব করেন নাই। প্রত্যুত, এই প্রকার ধর্ম্মান্দোলনে প্রতিবারেই আমরা কিছু না কিছু আশাসঞ্চারক ফলও যে না পাইয়াছি, তাহাও বলিতে পারা যায় না। দূরে না যাইয়া, এই কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী, যাহা এই কলিকাতায় আমাদের নয়নের সম্মুখে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমাদের এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতের রাজধানীতে বহুতর শিক্ষিত হিন্দু সন্তান, সময় ও স্থান বিশেষে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে যেন একটু ইতস্ততঃ করিতেন; অনেক পাশ্চাত্যশিক্ষিত হিন্দু সন্তান, সংবাদপত্র বা বক্তৃতার সাহায্যে, প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্মের অসারতা, হিন্দুশিক্ষার অসম্পূর্ণতা, ও হিন্দু দর্শনাদির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদনে বিশেষ উদ্যম করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বিবেচনা করিয়াছেন; এবং তাৎকালিক সমাজের চক্ষে বহুমানপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। এই ত গেল ২৫ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। এখনকার অবস্থা, কিন্তু, সে প্রকার নহে। প্রায়ই পথে ঘাটে বিচরণ কালে, সম্মুখে বা পার্শ্বেপতিত দেবমন্দির বিলোকন করিয়া অবনতমস্তকে, অঞ্জলিবদ্ধকরে ভক্তিভাবে নমস্কার করিতে করিতে, গন্তব্যপথের অনুসরণতৎপর শিক্ষিত হিন্দুযুবকবৃন্দকে বিলোকন করিয়া, বিমল আনন্দ অনুভব করেন নাই, এমন কোন ব্যক্তি বোধ হয় এ সভাতে উপস্থিত হন নাই।

সংবাদপত্র মহলে দৃষ্টিক্ষেপ করুন—এ কালকার দেশীয় পরিচালিত প্রায় সকল সংবাদপত্রই, হিন্দুর প্রাচীন সৌভাগ্যকথা জগৎকে প্রতিক্ষণ জানাইয়া, তাহার কল্পনাময় পুনরুদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া, একমুখে, এক প্রাণের আবেশে, হিন্দুর বেদ, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর জ্যোতিষ, হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদের সারবত্তার বিজয়দুন্দুভির ঘোরধ্বনিতে, হিন্দু সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতেছে। আমি গৌরবের সহিত বলিতে পারি, এক্ষণে এমন শিক্ষিত হিন্দু সন্তান অতি অল্পই আছেন, যিনি জগতের সমক্ষে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে, হৃদয়ে বিলক্ষণ শ্লাঘার অনুভব না করিয়া থাকেন। আজ কাল, রামকৃষ্ণের নাম শুনিলে, বড় একটা কেহই অন্ধ সংস্কারের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভ্রুকুটি করেন না। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্ ঋষিগণের নাম শুনিলে, এক্ষণে শিক্ষিত হিন্দু সন্তান, সক্রেটিস্, কম্‌টি, প্লেটো, স্পেন্‌সার, মার্টিনো প্রভৃতির অবিসম্বাদিত মনোরাজ্যের একমাত্রত্রই;

নিবন্ধন অলৌকিক প্রতিভার প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন না। এই সকল জাতীয় মঙ্গলের আশাজনক সূচনা দেখিয়া, কোন্ হিন্দু সন্তানের শরীর রোমাঞ্চিত না হয়?—নয়নে চির আকাঙ্ক্ষিত আনন্দময় অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব না হয়?

এই সকল দেখিয়া আশার উদয় হয়। যেন বোধহয়, হিন্দু ধর্ম্মের 'সারাণে ভাঁটার' প্রথম স্রোতে, আবার জোয়ার দেখা দিয়াছে। যে ধর্ম্মের ঐকান্তিক অবলম্বনে, ভারত সভ্যজগতের একমাত্র তীর্থক্ষেত্র হইয়াছিল, যে ধর্ম্মের শীতল শান্তিময় ছায়ায় নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতে করিতে মহনীয়চরিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চতুর্ব্বর্গফলের আস্বাদন করিয়া, জগতের জ্ঞানপিপাসী মহাত্মাগণকেও অকাতরে তাহার আস্বাদন করাইয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অমর হইয়া গিয়াছেন, যাহার উন্নতি ও অবনতির সহিত একসূত্রে হিন্দুসমাজের উন্নতি ও অবনতি চিরদিনের জন্য বাঁধা আছে,—সেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পরম আদরের ধন, হিন্দুসমাজের সর্ব্বস্ব, হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের এমন সুন্দর পূর্ব্বরূপ দেখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, স্বজাতিদ্রোহের দুরপনেয় পাপভার যে মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বহু শতাব্দী, বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায়ের ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়াও যে, এই হিন্দুসমাজ, এখনও পৃথিবীতে, এক মাত্র হিন্দুধর্ম্মের বলে আপনার সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, অদৃশ্য ভাবে নিজ জীবনী-শক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ রহিয়াছে, ইহা কি দেখিবার, ভাবিবার ও শিখিবার বস্তু নহে? ইতিহাস কি বলিতে পারে যে, হিন্দুর ন্যায় হতভাগ্য কোন্ মনুষ্যসমাজ, এত শত বৎসরের বৈদেশিক আধিন্য বহিতে বহিতে, এমন করে আপনার জাতীয় সমাজের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে? কখনই না। হিন্দুস্থানের ইতিহাসের পত্র ব্যতিরেকে, অন্য কোন দেশের ঐতিহাসিক পত্রে, এই অলৌকিক রক্ষণশীল সমাজের বিস্ময়কর জীবনী শক্তির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বা হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমাদের বহুপুণ্যের বলে, আমরা ইংরাজ জাতির আশ্রয় পাইয়াছি। ইতিহাসে প্রথিত আছে, এবং বর্ত্তমান কালে প্রত্যক্ষও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজ ন্যায়পরায়ণ, আশ্রিত প্রতিপালক, গুণের আদরকারী, দুর্ব্বলের রক্ষাকর্ত্তা এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাতন্ত্র্যের অকপট পরিপোষক। এই প্রকার সর্ব্বগুণোপেত মহাপ্রতাপশালী রাজার ভুবনব্যাপিশান্তির ঐকান্তিক সংস্থাপক শাসনদণ্ডের ভীমপ্রতাপে, ভারতবর্ষ আজ শান্তির শীতল ছায়ায় বাস করিতে পাইয়া, ধীরে ধীরে নব জীবন লাভ করিয়া, অভ্যুদয়ের উচ্চতম শিখরের দিকে অতর্কিতভাবে অগ্রসর হইতেছে। শান্তি-বিমলবারি সেকেই ধর্ম্মের মহাদ্রুম জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। ভারতব্যাপী এই বিশাল শান্তির গৌরবের দিনে, হিন্দুধর্ম্ম আবার যে নব জীবন লাভ করিবে না—তাহা কে বলিতে পারে?

হিন্দু সন্তান! বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলনের অসাময়িক কুহকে পড়িয়া, তোমাদের উপকারের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত মহাপ্রতাপশালী, ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের মনে অকারণ অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া, স্বজাতির অভ্যুদয়ের পথে, দুরপনেয় কণ্টকের আরোপ করিতেছ। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র নিদান, শাসিত ও শাসক সম্প্রদায়ের তুল্য উপকারক আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের, চিরাভিলষিত অভ্যুদয়ের এমন দুর্লভ সুযোগ হাতে পাইয়া, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক,

(কার্ত্তিক, ১৩১১, পৃঃ ৭২৭)

কাল্পনিক অভ্যুদয়ের প্রয়াসে রাজনীতির কণ্টকাবৃত বর্ত্ম অবলম্বন করা, কোন প্রকারেই সমর্থন করা যাইতে পারে না।

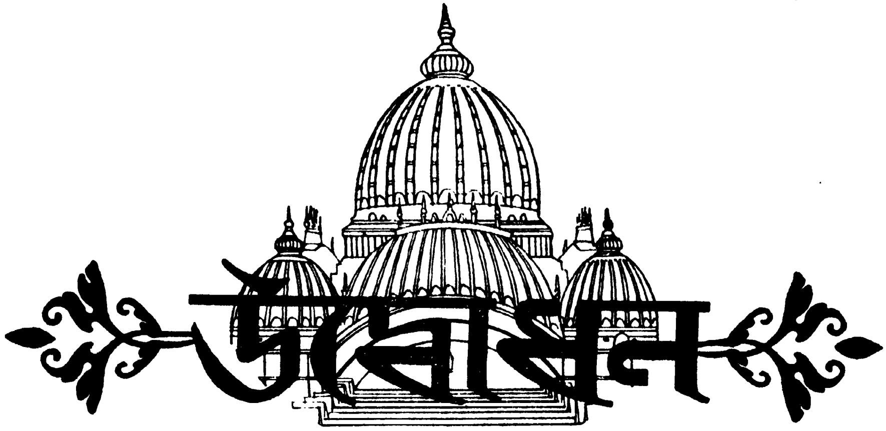
এস, ভারতের সমগ্র হিন্দু সন্তান! এস, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবহ্নিকে চিরকালের জন্য ভারতমহাসাগরের অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, ভারতের অনুরক্ত এবং অনন্যশরণ প্রজাবৃন্দের জাতীয় ধর্ম্মের অপক্ষপাতে রক্ষাকারিণী মহারাণীর ধর্ম্মময় শাসনের অবশ্যম্ভাবিফলস্বরূপ এই মহা সুযোগে, হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য, আবার আমরা সকলে এক হই। ভারতের সমগ্র হিন্দু সন্তানকে এক অচ্ছেদ্য ধর্ম্মময় একতাগুণে আবদ্ধ করিয়া,পাশব বলের প্রয়োগে যাহা পাওয়া যায় না সেই অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়সরূপ অমৃতময় মহাফলের আস্বাদন করিয়া, জীবন সার্থক করিবার জন্য, আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সেবিত মহাধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে আমাদের পরাঙ্মুখতা আর ত ভাল দেখায় না।

কেন, বল দেখি, ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমরা বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে যাই। ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস কি সুস্পষ্টভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে না যে, হিন্দু-জাতির ধর্ম্মই জীবন? হিন্দুধর্ম্মই হিন্দুসমাজশরীরের মেরুদণ্ড। এই ধর্ম্মের বল ভাঙ্গিয়া গেলে, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয়। যে জাতির ধর্ম্ম ব্যতিরেকে একটি কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না, ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইলে যাহাদের সামাজিক বিশৃঙ্খলতা সর্ব্বতোমুখী হইয়া পড়ে, তাহাদের সকল প্রকার জাতীয় উন্নতি, ধর্মের সংরক্ষণ ও পোষণের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে,—এই বিশ্বাসকে মূল ভিত্তি করিয়া, আমরা অদ্য এই হিন্দুধর্ম্ম সভা স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ভগবান হৃদয়ে বল দিবেন—আশা করি, সেই বলে কোন না কোন দিনে, আমাদের ধর্ম্মময় সমাজের ভাগ্যাকাশে সুখের শশধর আবার উদিত হইয়া, জগতের শান্তিসুধা বর্ষণ করিবে; —অমাবস্যা ঘোর রজনীর প্রভাত হইবে না, একথা কে বলিতে পারে?

এই "হিন্দুসভার" কার্য্যপ্রণালী ও রীতিনীতির বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, ইহার একমাত্র লক্ষ্য হিন্দুধর্ম্মের বিষয় একটু অনুশীলন আবশ্যক বিবেচনায়, আপাততঃ সেই দিকেই অগ্রসর হইতে হইতেছে।

আমার বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় দুরবগাহ অলৌকিক বিষয়ের সমালোচনা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য আর নাই। এক্ষণে জগতে যে কয়টী প্রধান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহাদের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বৈসাদৃশ্য এত বেশী যে, তাহাতে ঐ সকল ধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া ইহার অনুশীলন একান্ত অসম্ভব। ইতিহাসে যাহার আদির পরিচয় নাই, মনুষ্যজাতিবিশেষের অভ্যুদয় বা পতনের সহিত যে ধর্ম্ম উদিত বা বিলুপ্ত হয় না, বৌদ্ধ, জৈন, মহম্মদীয়, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ শত্রুতায় যাহা কম্পিত হয় না, অসংখ্য অসংখ্য অলৌকিক অনুষ্ঠান ও অচিন্ত্য অভাবনীয় বিস্ময়াবহ বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়ানিচয়রূপ শাখাপ্রশাখায় দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত, যে মহান্ ধর্ম্মদ্রুমের বিশাল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া, সনক, সনন্দ, নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিল, গৌতম প্রভৃতি ত্রিজগৎপূজ্য মনীষিশ্রেষ্ঠগণ, অবিচলিত বিশ্বাসে অলৌকিক কার্য্যনিবহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, আত্মার অমর্ত্ত্যতা অনুভব করিয়া গিয়াছেন,—সেই মহান্ বিরাট পুরুষের ন্যায় বিশ্বতোব্যাপী সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রণিধান করিলে, কোন্ চিন্তাশীল ভাবুকের হৃদয় অলৌকিক বিস্ময়রসে আপ্লুত না হয়?

(৮৬তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৭২৮)



৮৬তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা   অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

দিব্য বাণী

পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হয়—ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টি মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ করিতেছে। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত···। এইরূপ আমারও নিজস্ব ভাব থাকিতে পারে, আমি অপরকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদি তাঁহারা কোন যুক্তি চান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে পারি না। এই জন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধা দেখা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলিতে চায়, 'এই সব ধর্ম তো দেখছি কতকগুলো মত মাত্র, এগুলোর সত্যাসত্য বিচারের কোন মানদণ্ড নেই, যার যা খুশি সে তাই প্রচার করতে ব্যস্ত।' এ-সব সত্ত্বেও ধর্মবিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে—উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণা-সমূহের নিয়ামক। ঐগুলির ভিত্তি পর্যন্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

['স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', প্রথম খণ্ড, (প্রথম সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২১১—১২]





কথাপ্রসঙ্গে

মহীয়সী ইন্দিরা

ভাষা রুদ্ধ হইতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর ইহলোকে নাই। গত ৩১ অক্টোবর (১৯৮৪) নিজের বাসভবনে, যাহাদের উপর দৈহিক নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত ছিল, উহাদেরই মধ্যে দুইজন বিশ্বাসঘাতকের হাত হইতে ষোলটি গুলির আঘাত বক্ষে লইয়া তিনি ভারত-মাতার মৃত্তিকা-অঙ্কে চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন। আর মাত্র কুড়ি দিন পরে ১৯ নভেম্বর তিনি ৬৮তম জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিতেন সারা বিশ্ববাসীর। ষোল বৎসর ব্যাপী তিনি এই বিশাল রাষ্ট্র-তরণীর হাল দৃঢ়-হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন—বহুতর দুর্যোগ-ঝঞ্ঝাকে ঠেলিয়া তিনি অপূর্ব কুশলতার সঙ্গে ইহাকে চালনা করিতেছিলেন শান্তি ও স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে। এই কালের মধ্যে দেশের নানা অংশে হিংস্র বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নানা অজুহাতে ও ছলে পুনঃ পুনঃ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি প্রতিবারেই অতুলনীয় বিচক্ষণতা সহকারে এবং অপরিসীম ধৈর্য ও সহানুভূতি লইয়া দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে অক্ষত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ষোল বৎসরের সুদক্ষ সহৃদয় দেশসেবার বিনিময়ে তিনি বক্ষ পাতিয়া লইয়া গেলেন আপন দেশবাসীর হাত হইতে উৎক্ষিপ্ত ষোলটি গুলি! ইহা অপেক্ষাও মর্মান্তিক ইতিহাস আর কি হইতে পারে? এ-হেন বর্বর কাণ্ড—সর্বোপরি নারী-নিধনরূপ মহাপাতকের ফলে সমগ্র জাতির উপর যে অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাঘাত আসন্ন, তাহারই ভয়াবহতা চিন্তা করিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। ইতিহাস হইতে শিক্ষা লইবার মতো বোধ-সামর্থ্য দানবের থাকে না—নর-পশুদেরও নাই। শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে যিনি সোচ্চারে বলিতে পারিয়াছিলেন: 'আমি গর্বিত হইব যদি আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের সেবায় লাগে। আমি নিশ্চিত যে আমার প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত দেশের ধান গম জোয়ারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আনয়ন করিবে সবুজ স্বর্ণপ্রভার হাসি,—কলে কারখানায় ও যন্ত্রে সঞ্চার করিবে দ্রুতি গতি-শক্তি—দেশকে করিবে সুসমৃদ্ধ।'—তিনি নিঃসন্দেহে মহীয়সী—বিপুল আত্মশক্তির অধিকারিণী—প্রকৃত অর্থেই জনগণ-অধিনেত্রী।

যাঁহার অসাধারণ তেজস্বতী এবং উজ্জ্বল প্রাণময়ী মূর্তি দেখিয়া সারা বিশ্ব আজ বিমুগ্ধ, তাঁহার অতীতের শৈশব-চিত্রটিকে এক্ষণে একবার স্মরণ করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে,—এই জীবনটির বিকাশ অতি স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে, যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে সুবিশাল মহাতরুর আবির্ভাব ঘটে নৈসর্গিক বিধানেই।

এলাহাবাদের অভিজাত নেহরু-পরিবারের সেদিনের সেই আদরিণী প্রিয়দর্শিনী শিশুকন্যাটি—উচ্ছল আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া যে অপর সকলকেও উদ্বেল করিয়া তুলিত, সেই ক্রীড়াময়ী

বালিকাটিকে দেখিয়া তখন কেহ কি অনুমান করিতে পারিতেন, তাহার উত্তরজীবনের রূপ-রেখাকে? তদানীন্তন অন্ততঃ একজনের দৃষ্টি কিন্তু এড়ায় নাই—তিনি ঐ অঙ্কুরটিকে দেখিয়াই উহার বিরাট সম্ভাবনাকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মায়ের কোলের কাছে শিশু ইন্দু! কিন্তু এত চঞ্চল যে মায়ের বাহুবেষ্টনে কিছুতেই আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছিল না! বার বার মায়ের হাত ছাড়াইয়া লইয়া সম্মুখে ইতস্ততঃ ছুটিয়া যাইতেছে—দুই হাত তুলিয়া নানা অঙ্গ-ভঙ্গিতে নৃত্যে-ছন্দে উপস্থিত সকলকেই ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। মা কমলা কন্যার চপলতায় অস্থির হইয়া বারে বারেই তাহাকে কাছে টানিয়া আনিতেছেন, শান্ত সংযত রাখিতে হিমসিম খাইতেছেন। নৃত্য-চঞ্চলা শিশুটিকে কিন্তু সামলাইয়া রাখা অসম্ভব হইতেছিল। ঐ সমাবেশে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে আসীন ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও। পূজ্যপাদ মহারাজের গম্ভীর প্রসন্ন মুখে ঐ-কালে মন্তব্য শুনা গিয়াছিল: 'মেয়েটিকে কেহ বাধা দিও না। আপন খেয়ালে তাহাকে ঘোরাফেরা করিতে দাও। তাহার মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা—কালে সে বিরাট হইয়া উঠিবে।' ব্রহ্মবিদের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দূর ভবিষ্যতের ভারত-নেত্রীর ছবিখানি বুঝি সেই দিনই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল! ইন্দিরার উত্তরজীবনে আত্মদর্শী সন্ন্যাসীর সেদিনের ঐ উক্তি বাস্তবিকই অমোঘ আশীর্বাদরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দিরা ভারতের প্রধান মন্ত্রী—সর্বলোকপ্রিয় জননেত্রী, শান্তি সাম্য ও নিরপেক্ষতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু তাঁহার সকল পরিচয়ের অন্তরালে যে অনবদ্য প্রাণসূত্রটি বিদ্যমান—তাঁহার সকল প্রেরণার উৎস সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরক্তির সংবাদ কয়জনেই বা রাখেন? আশৈশব মাতৃক্রোড় হইতেই তিনি সেই ভাবালোকে লালিতা ও বর্ধিতা। পিতামহী স্বরূপরানী ও পিতামহ মতিলালের আদরে-আহ্লাদে এবং পিতা জওহরলালের সস্নেহ শিক্ষাধারায় ইন্দু ঐ-ভাবেই বড় হইয়া উঠিয়াছেন। যদিও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ঐ বিশেষ বাতায়নটিকে তিনি লোকদৃষ্টির অগোচরে রাখিবার উদ্দেশ্যে সযত্নে রুদ্ধ রাখিতেই চাহিতেন,—তথাপি ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলে কখন কখন উহা উন্মুক্তও করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবালোক ইন্দিরাকে স্পর্শ করিয়াছিল জীবনের অঙ্কুরাবস্থাতেই। ১৯২৭—২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) যখন কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা তখন প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে তাঁহার দর্শন মানসে যাইতেন,—বালিকা ইন্দুও পিতা-মাতার সহিত মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহাশিস্-লাভের সুযোগ তখন হইতেই প্রভূত পাইয়াছেন। উল্লেখ্য যে শ্রীমতী কমলা নেহরু পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজের বিশেষ কৃপাধন্যা ছিলেন। পরে বেলুড় মঠেও ইন্দিরা তাঁহার পিতামহী কিংবা জননীর সঙ্গে বহুবার আসিয়াছেন—যাহার উজ্জ্বল স্মৃতি তিনি তাঁহার পরিণত জীবনেও কদাপি দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। মাত্র কিছুকাল পূর্বেও শৈশব স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি একখানি বাংলা শিশু-পত্রিকায় লিখিয়াছেন: 'মায়ের কাছে থাকতে কলকাতায় এলাম।…মা আর আমি দু'জনে রামকৃষ্ণ মঠেতে অনেক সময় কাটাতাম। গঙ্গার ধারে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এক নতুন জগৎ আমার সামনে খুলে যেত।' বয়স ছিল তখন ষোল বৎসর।

পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশন তথা বেলুড় মঠের সহিত তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁহাদের জীবনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা তিনি বহুস্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। পতি-বিয়োগের পরে শোক-সন্তপ্তা ইন্দিরা শান্তি ও সান্ত্বনার প্রত্যাশায় কোথাও কাহারও নিকটে যান নাই,—গিয়াছিলেন কিছুকাল নিরালা জীবনযাপনের জন্য বেলুড় মঠেরই অন্তর্গত কিষেণপুরস্থ এক নিভৃত আশ্রম-কুটীরে। ঐ-কালের আশ্রম-জীবনে তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় লক্ষণীয় ছিল গীতা এবং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনালোচনা পাঠ ও প্রার্থনা। পরে প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্বভার মস্তকে লইয়াও তাঁহার অন্তর্জীবনের এই প্রেরণা-সূত্রটিকে তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নাই। আদর্শ-নিষ্ঠার ইহাও এক অনন্যসাধারণ নজির। কোন উপলক্ষে কলিকাতায় অবস্থান হইলে কিংবা যাতায়াতের পথে স্বল্পকালের জন্যও এখানে যাত্রা বিরতি ঘটিলে, প্রধান মন্ত্রীর অজস্র কর্মব্যাপৃতির মধ্যেও কিছুক্ষণের জন্য তিনি বেলুড় মঠে আসিতেনই, অথবা কোন প্রকারে যোগাযোগ করিতেন। ইহা ছিল তাঁহার চিরাচরিত নীতিস্বরূপ। মঠের প্রবীণতম সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) তাঁহাকে আশৈশব স্নেহ করেন—তাই ব্যক্তিগত জীবনের সকল সমস্যায়, সুদিনে দুর্দিনে ইন্দিরাকে আমরা দেখিয়াছি তাঁহারই কাছে ছুটিয়া আসিতে। এমন কি বিনা বাক্যে—নীরবে মৌন ভাষাতেও অন্তরের কথা নিবেদন করিতে ইন্দিরাকে দেখা গিয়াছে এই নবতিপর বৃদ্ধ সাধুর সকাশে। তিনি মঠে আসিতেন নিতান্তই ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম তৃষ্ণা মিটাইতে, অন্তরের ভার লাঘব করিতে,—সেখানে অন্য কোন বিষয়ালাপ করিতে তাঁহাকে কেহ কখনও শুনেন নাই। স্বামী অভয়ানন্দজীও তাঁহার কল্যাণীয়া ইন্দুর আন্তর শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই তো মাত্র কয়েক দিন আগেও ইন্দিরা দিল্লী হইতে সোজা বেলুড় মঠে আসিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া গিয়াছেন। ইহজীবনে তাঁহার শেষ মঠ-দর্শন সেইদিনই, স্বামী অভয়ানন্দজীর সহিত সেই অন্তিম সাক্ষাৎকার!

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কর্মধারার প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। তাঁহার দৃষ্টিতে যে ভারতবর্ষের চিত্র সমুজ্জ্বল থাকিত, উহা সর্বাংশেই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানের ভারত। ইন্দিরার **'Eternal India'** গ্রন্থের পৃষ্ঠায় সেই পরিচয় আরও সুপরিস্ফুট।

এই বিশাল দেশ, যেখানে বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি, সেখানে তাহার প্রধান মন্ত্রীকেও সকল সময় সকল মানুষ সমান চক্ষে দেখিবে না—সমান বিচারে বুঝিতে পারিবে না। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হইবার নহে যে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নায়িকা বা প্রধানমন্ত্রী হইয়াও ইন্দিরা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন যে, প্রশংসায় বা নিন্দায় সর্বাবস্থায় তিনি দেশের সাধারণ মানুষেরই। তাই তো তাঁহার বিয়োগে সাধারণ মানুষেরও এমন শোকার্ত ক্রন্দন প্রত্যক্ষ করা গেল! রাজনৈতিক আবর্তে থাকিয়াও তিনি প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না—ইহা খাঁটি সত্য। তাঁহাতে এমন কিছু দুর্লভ গুণের বিকাশ ছিল, যাহা রাজনৈতিক জগতে একান্তই অমিল। বজ্রাদপি কঠোর মূর্তির অন্তরালে কুসুমাদপি কোমলতার এমন সহাবস্থান রাজনীতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বৈ কি! তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা—জননীসুলভ স্নেহ-দৃষ্টি, সেবিকা-সুলভ মমতা ভারতের কোন্ দিককে না স্পর্শ করিয়াছে? ধর্ম-সংস্কৃতি-শিক্ষা-শিল্প-প্রযুক্তি—

আবার অর্থনীতি-দেশরক্ষা-প্রশাসন-গণতন্ত্রের উজ্জীবন—প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁহাকে দিশারীরূপে আমরা দেখিয়াছি।

ঘাতকের নিষ্ঠুর হস্ত তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে ঠিক, কিন্তু কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে ইন্দিরা চির আয়ুষ্মতী। ইন্দিরার দেহ নিহত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার আত্মার নিধন হয় নাই, হইবারও নহে। সমগ্র ভারত তথা বিশ্ববাসীর সহিত আমরাও ভগবৎপদে বিলীন সেই অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

'মা, আমায় মানুষ কর'

দেশে সম্প্রতি যে নিদারুণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহাতে কেবল ভারত নহে, বিশ্বের মানুষ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন। সকলেই জানেন বিপর্যয় যাহা প্রকট হইয়াছে, উহা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে,—মনুষ্য-সমাজের একাংশের দীর্ঘকাল পরিপোষিত মূঢ়তা ও পাশবিক সংস্কারের বীভৎস পরিণতি। আমরা কোনরূপ সমাজনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে যাইতেছি না—সুযোগ্য ব্যক্তিরা তাহা করিবেন, করিতেছেনও। সমাজের সকল স্তরের মানুষ আজ শোকে ক্রোধে বেদনায় ক্ষোভে স্তম্ভিত ও শঙ্কিত। প্রতিদিনের সংবাদ-মাধ্যমগুলিতেই উহার প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করিতেছি। চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেকেই ভাবিয়া আকুল হইতেছেন, মনুষ্য-সভ্যতার এই সংকটকে কোন্ উপায়ে কাটাইয়া উঠা চলে,—এই আসুরিক অভ্যুত্থানকে কী ভাবে প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিবিধানসূচক নানা পন্থা উদ্ভাবিত হইতেছে—বহুরকম পরামর্শ ও প্রস্তাব সংবাদপত্র মাধ্যমে প্রচারিত হইতেছে। এক শ্রেণীর সমাজ-হিতৈষী এমনও বলিতেছেন যে, ধর্মই মানুষকে অন্ধ করিয়া তুলিতেছে, অতএব পরীক্ষামূলকভাবে আগামী দশ বৎসরের জন্য সকল প্রকার ধর্মস্থানগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের প্রয়োজনই বা কী? এইরূপ আরও নানা ধরনের সমাজ-ভাবনা সাধারণ মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় সকল কিছু লইয়াই বিচিত্র সব প্রশ্ন!

সুবিশাল এক বনস্পতি প্রান্তরের মাঝে দণ্ডায়মান রহিয়াছে—কতকাল ধরিয়া তাহা কে জানে? অজস্র পথিককে সে আশ্রয় দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে। রৌদ্র-বৃষ্টিতে ঝড়-ঝঞ্ঝায় শ্রান্ত পথ-হারা জনের অবাধ এবং নিরাপদ ঠাঁই এই বৃক্ষ-তলটি। অগণিত পক্ষিকুলের নিশ্চিন্ত নীড়,—আরও কত জীবের নিরায়াস বিশ্রাম ও ভরসাস্থল এই বৃহদায়তন বটবৃক্ষ। অনিকেত সাধুসন্তেরও একান্ত নিকেতন এই সুপ্রাচীন তরুমূল।

বটবৃক্ষটির এই পরিচয়গুলি সর্বজনবিদিত। তাহার প্রতিষ্ঠিত মহিমার মূলেও এই কারণগুলিই বিদ্যমান। তথাপি ইহাও কি সত্য নহে যে, ঐ মহাতরুকে দস্যু-তস্কর-লম্পটগণও তাহাদের প্রয়োজনে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে ঘাঁটি হিসাবে—অপহৃত বামাল লুকাইবার আড়ালরূপে, নিরীহ পথচারী কিংবা শান্ত সাধুর ভানে আত্ম-গোপনের পরম অবলম্বনভাবে? সনাতন বটবৃক্ষটি কিন্তু সর্বাবস্থায় নির্বিকার সাক্ষী।

উক্ত অপব্যবহারগুলিকেই মাত্র লক্ষ্য করিয়া অমন বৃহৎ বনস্পতিকে সমাজের পক্ষে অহিতকর জ্ঞানে উহার মূলোৎপাটনে উদ্যোগী হওয়া নিশ্চয়ই অপ্রকৃতিস্থতার পরিচায়ক। ঐ-সকল অপব্যবহারের

প্রতিবিধান খুঁজিতে হইবে সমাজের অন্যত্র। অশুভের প্রতিকার শুভের বিনাশের দ্বারা হয় না। বরং শুভ শক্তিকে সর্বতোভাবে আরও উদ্বোধিত করিয়া সর্বজনের জাগ্রত দৃষ্টিপথে আনিয়া উহা সংসাধিত হইতে পারে।

ধর্ম মানুষের সামাজিক ও তথা অন্তর্জীবনের একটি চিরন্তন বিশ্রাম-কেন্দ্র—অশান্ত সংসারের মাঝে একটি সুনিশ্চিত লক্ষ্যবিন্দু—দুস্তর জীবন-প্রান্তরের মধ্যস্থলে স্থিত এক সর্বাশ্রয় মহীরুহ। ধর্মেরও অপপ্রয়োগ হইয়া থাকে—অপব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। উহারও প্রতিবিধান চিন্তা অবশ্যই করিতে হইবে,—কিন্তু নিশ্চয়ই ধর্মহীন হইয়া নহে, ধর্মস্থানগুলির উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াও নহে।

ধর্মকে যাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কিংবা মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহাদের অপকর্মের দায় ধর্মের হইতে যাইবে কেন? দায়িত্ব তাহাদেরই নিজস্ব। পথের ধারে আলোক-স্তম্ভটি দাঁড়াইয়া থাকে পথিককে অন্ধকারে পথ দেখাইতে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সহায়তা করিতে। কিন্তু ঐ একই আলোকে দুষ্কৃতকারীও দ্রুত পলাইবার পথ চিনিয়া লয়—তাহাতে আলোকের অথবা পথের দোষ হইবে কি কারণে? যদি ঐরূপ আরোপিত অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া মানুষের চলার পথকে অবরুদ্ধ এবং আলোক-স্তম্ভকে উচ্ছেদ করা হয়, তাহাতে সর্বসাধারণের পথ চলাই বিঘ্ন-সঙ্কুল হইবে—কুকর্মী সমাজদ্রোহী-দের বিন্দুমাত্রও ক্ষয়ক্ষতি হইবে না। দুর্জনের ছলের অভাব কদাপি হয় না। ধর্ম তথা ধর্মীয় সকল কিছুকে বর্জনের পরিকল্পনাও মানবের স্বাভাবিক প্রাণ-প্রবাহকে নিরুদ্ধ করিবার এক উদ্ভট ও অবাস্তব মানসিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ধর্ম বলিতে লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, প্রকৃত অর্থে তাহা ধর্ম নহে, উহা ধর্মের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ মত বা পথ। এই মত লইয়াই সকলে উন্মাদ—যত বিবাদ। পথেই যত ভেদ। লক্ষ্য এক হইলেও মতের কোলাহল আর পথের গোলযোগ মানুষকে ধর্ম হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দিতেছে, নিচে নামাইয়া লইয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এখানেই। ধর্ম-ত্যাগ অর্থ স্বভাব-বর্জন, পরিচয়-হানি। অগ্নির ধর্ম তেজ ও জ্যোতিঃ,—যদি সেই ধর্মই না থাকে তবে নিস্তেজ নিষ্প্রভ অগ্নির আর অগ্নিত্ব থাকিবে কি? উহার স্বকীয় পরিচয় তখন কী হইবে? মানুষেরও পরিচায়ক ধর্ম আছে, যাহা লইয়া তাহার মনুষ্যত্ব, যাহা তাহাকে অন্য সকল প্রাণী হইতে স্বতন্ত্রতা প্রদান করিয়াছে, যাহার অভাবে সে নিছক একটি জীবমাত্র,—মানুষ নহে। আমাদের শাস্ত্র-পুরাণাদি বলেন—সাম্য, সংযম, অমাৎসর্য, ক্ষমা, বিনয়, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, আর্যত্ব, ধৃতি, দয়া ও অহিংসা—এই ত্রয়োদশটি গুণ হইতেছে মনুষ্য-ধর্ম। সুপ্রতিষ্ঠিত মনুষ্য-সমাজ এই ত্রয়োদশটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত হইবে। ধর্মভিত্তিক সমাজ বলে ইহাকেই। আমাদের জানা নাই, বিশ্বের কোন ধর্মমত বা ধর্মপ্রবর্তক এই ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে—কিংবা কোন বিপরীত কথা বলিয়াছেন।

মত বা বৈচিত্র্য আছে—থাকিবেও। কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। ধর্মমতের প্রকাশে ও প্রচারে ভিন্নতা আছে,—পথেরও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান না হইতে পারে,—তথাপি সকল মত ও পথের গম্য একই আদর্শ। প্রচলিত ধর্মমতগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্যের কোন বৈসাদৃশ্য নাই,—কিন্তু বিতণ্ডার অন্ত নাই মতাবলম্বীদের স্ব স্ব চিন্তায় ও আচরণে। ইহাই সাম্প্রতিককালে মানবসমাজকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে,—

সাধারণ মানুষকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিতেছে!

বৈদিক বা অবৈদিক সকল ধর্মের মূল সুর অভিন্ন—কেহই মানুষকে মনুষ্যত্ব বিসর্জনে উপদেশ করেন নাই, বরং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনের উপায়ই নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, ইসলাম, খ্রীষ্টান, জৈন, পারসী, কনফুসীয় প্রভৃতি বিশ্বের প্রধান ধর্মমতগুলির মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচার-তারতম্য আছে মানিয়া লইয়াও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে, বিভিন্ন ধর্মমতের বক্তব্য প্রায় সমান। সম্প্রতি শিখধর্মের আদর্শ লইয়া সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তিকর কথার সৃষ্টি হইয়াছে—যাহার পরিণতিতে মর্মান্তিক কাণ্ডও সব ঘটিয়া যাইতেছে। এখানে তাই স্পষ্টই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধর্মের চিরন্তন মৌল আদর্শ শিখধর্মেও সমান স্বীকৃত। একজন শিখের জীবন হইবে একাধারে বিনয় ও বীরত্বের সমাহার। কিন্তু বীরত্বের প্রকাশ ঘটিবে সত্য ও আদর্শের রক্ষণে,—পরমত-অসহিষ্ণুতায় কিংবা কোনপ্রকার পাশব বৃত্তি চরিতার্থতায় নহে। শিখধর্মের মুখ্য শাস্ত্র, অর্থাৎ শিখগুরু-গণের বাণী-সঙ্কলন 'গ্রন্থ সাহেব' হইতে জানা যায় যে, শিখধর্মে সমস্ত রকম ভেদ ও বৈষম্যকে সর্বতোভাবে পরিহারের সুস্পষ্ট নির্দেশই গুরুগণ দিয়াছেন। শ্রীনানক-প্রমুখ শিখগুরুদের জীবনে অন্য ধর্মের প্রতি উদারভাব ব্যক্ত হইয়াছে। গুরু নানক পুনঃ পুনঃ শিখাইয়াছেন—জেহোবা, যীশু, আল্লাহ এবং ঈশ্বর বা হরি—এক ভগবানেরই বিভিন্ন নাম। বিভিন্ন সময়ে শিখদের অস্ত্রধারণের সংবাদ এবং নানা উপলক্ষে তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সতর্ক অনুধাবন করিলে ইহাও জানা যাইবে যে, ঐ-সকলেরও মূলে ছিল গভীর আদর্শানুরাগের বা ধর্ম-নিষ্ঠারই দ্যোতনা। সম্প্রদায়-বিশেষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখগণ অভ্যুত্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব শিখগণ অনুমোদন করেন নাই—প্রচারও করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ মাত্র শিখধর্মের উল্লেখ করা হইলেও,—সংক্ষেপে ইহাই বলা হইতেছে যে, কেবল শিখ ধর্ম কেন, পৃথিবীর সকল ধর্মের শাখাতে শান্তি ও উদারতার উপদেশই রহিয়াছে, কোথাও কোন ধর্মে মানুষকে হিংস্র প্রাণীতে রূপান্তরিত হইবার শিক্ষা প্রদান করা হয় নাই।

প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে 'ধর্ম' মানবজীবনের পূর্ণতালাভের উপায়। কেবলমাত্র মোক্ষের জন্যই নহে, সাংসারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে তাই 'ধর্ম' অপরিহার্য। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, সংযম, অপরিগ্রহ ইত্যাদি সদাচার বা চরিত্র-গুণগুলি মানুষকে শান্তির সংসার গড়িতে, কল্যাণময় সমাজ-সংগঠন করিতে এবং আদর্শ রাষ্ট্র নির্মাণে একান্তই অপরিহার্য, ঐ-গুলি সব ধর্মেরই অঙ্গ,—ধর্মলক্ষণ মাত্র। ঐ-সব গুণের অনুপস্থিতিতেই মানুষ হইয়া উঠে চরিত্রহীন, সমাজবিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী। পরিবারে সমাজে ও রাষ্ট্রে সে তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়—নিজের কাছেও বটে, পরিজন-প্রতিবেশী সকলের কাছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ যে ধর্ম-বিসর্জন নহে, ইহাই আজ ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য হইতেছে—কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাত থাকিবে না, সকল ধর্মমতকেই রাষ্ট্রে সমান মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং সর্বোপরি ধর্মের আসন সর্ব-প্রযত্নে রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। নিজ নিজ ধর্মমত অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের সমান সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকিবে। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিককে ধর্মত্যাগী নাস্তিক হইতে হইবে,—এইরূপ চিন্তা অবান্তর ও অর্থহীন।

'নিরপেক্ষ' কথায় বর্জন বুঝায় না,—বুঝায় 'পক্ষপাতশূন্যতা',—উহার তাৎপর্যার্থ 'স্বতন্ত্র', 'ন্যায্য'। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই ইংরেজী 'মাই হেড্' (my head) কথার প্রকৃত অর্থ 'আমার মাথা' যেরূপ নিরীহ বালকের বোধ-বিপর্যয়ের ফলে 'স্কুলেতে মাষ্টার মশায়ের মাথা', 'বাড়িতে বাবার মাথা' প্রভৃতি বিচিত্র অর্থে রূপান্তরিত হইয়া এক কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল,—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ধর্মহীন করিয়া তুলিবার মতো অমূলক ভাবনাও ঐরূপ বুদ্ধি-বিপর্যয় ছাড়া কিছু নহে। যদি ইংরেজী 'সেকিউল্যার' (secular) পদের ভাবার্থকেই মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে রাষ্ট্রনীতিকে কোন বিশেষ ধর্মীয় মতাদর্শ হইতে মুক্ত বা স্বতন্ত্র রাখা, ইহাই ঐ 'সেকিউল্যার' নীতির তাৎপর্য।

মনে পড়িতেছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একদা এই প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন :

'This did not mean that they (Indians) were to be irreligious or a nation of atheists. A secular state only meant that every individual in it was free to profess any faith he chose'.

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন—ধর্মনিরপেক্ষতায় বুঝিতে হইবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। ইহার অর্থ, বিভিন্ন ধর্মমতকে সমান স্বীকৃতি এবং কোনপ্রকার মতান্ধতা বা অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। আমরা ধর্মহীন হইব না—আবার আমাদের কোনপ্রকার ধর্মান্ধতাও থাকিবে না। 'Secularism means the adoption of scientific spirit. It means the absence of religious arrogance or dogmatism, an attitude of impartiality so far as different religions are concerned, equality of opportunity for all religions and no dogmatizing for any one religion...It does not mean that we would be non-religious or dogmatically religious.'

কিন্তু হায়! আমাদের আশঙ্কা হইতেছে সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ বুঝি বা নিদারুণ ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ধর্ম ও ধর্মস্থানগুলিই যত অশান্তি ও বিবাদের মূলে! ধর্মবর্জনই অতএব সুস্থ নাগরিকের পক্ষে গ্রহণীয় আদর্শ! ইহা নিছক একটি ভ্রান্তি নহে,—সর্বনাশা মারাত্মক অসুস্থতা।

ধর্মের নাম লইয়া যাহারা বিভেদ-বিশৃঙ্খলা-বৈষম্যের বিষ ছড়াইতেছে—হিংসার তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নহে,—কোন শাস্ত্র বা ধর্মগুরুকেই ইহারা অনুসরণ করে না! ডাকাতরাও কালী পূজা করে, এই কারণে মা-কালীকে ও কালী-মন্দিরকে কেহ কখনও ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এমন আজব সংবাদও শোনা যায় না। দুর্বৃত্তেরা ধর্মের জিগির তুলিয়া নানা কুকাণ্ড করিতেছে, তাই বলিয়া সকলকেই ধর্মবিরোধী হইতে হইবে—ধর্মস্থানগুলিকে নিষিদ্ধ করিবার মনোভাব পোষণ করিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অর্থহীন ভীরুতা—বুদ্ধির বিভ্রম। মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম মানুষের জন্য,—মানুষকে 'মানুষ' রূপেই গড়িয়া উঠিবার উদ্দেশ্য। আবার মানুষই উপলব্ধি করিতে সক্ষম—'মানুষ' হইবার প্রয়োজন কতখানি, গুরুত্ব কীরূপ. ঈশ্বর আমাদের সকলকে শুভ বুদ্ধি দিন, ধর্মবোধ জাগ্রত করুন—সকল প্রকার ভীরুতা দূর করুন।

যুগনায়ক স্বামীজীও এই প্রার্থনা-মন্ত্রই জাতির কর্ণে দিয়া গিয়াছেন। বলিতে শিখাইয়াছেন : 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' এই প্রার্থনাই আমাদের ধর্ম—ধর্মের সাধন ও ধর্মের লক্ষ্য। মানুষ কি পারিবে তাহার এই ধর্মকে ত্যাগ করিতে—তাহার মনুষ্যত্ব- বিকাশের চিরন্তন উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিতে?

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্রমালা

শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত

(আশ্বিন, ১৩৯১ সংখ্যার পর)

(৪)

শ্রীনগর

২৭শে ফাল্গুন

প্রণাম পত্র [10-3-90]

পূজনীয়েষু—বহুকাল বাদে আজ আমি আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া আমাকে ভাগ্যবান মনে করি। আপনার শুভ সংবাদে যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। আমি এখানে ছিলাম না, এখান হইতে ৮/১০ ক্রোশ দূরে ক্ষীর ভবানী নামে একটি তীর্থ আছে, তথায় গিয়া ৮/১০ দিন ছিলাম। সে জন্য গত কল্য সন্ধ্যার সময় এখানে পৌছিয়া আপনার পত্র পাইলাম। কাল আমার কাছে লিখিবার কিছু না থাকায় লিখিতে পারি নাই, বিলম্বের আর কোন কারণ নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। দাস আপনার লিখিত আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া চির বাধিত হইল।

কিছুই জানি না যাহা আপনাকে লিখি। ভাই শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনাথের এক পত্র পাইয়াছিলাম, শারীরিক মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্রের আজও কোন উত্তর সংবাদ পাই নাই। বরাহনগর মঠ হইতে এখানে ২/৩ খানি পত্র পাইয়াছিলাম। তাঁহারা সকলে বেশ ভাল আছেন। মঠে গত ১০ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীগুরুদেবের মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার এখনও কোন সম্বাদ পাই নাই।

আমার যাত্রার কথা বিশেষ কি লিখিব। আপনি সব জানেন ৺বদরীকেদার দর্শন করিয়া সেই বৎসরই তিব্বতে পৌছিয়াছিলাম। কিন্তু ৺কৈলাস মানসসরোবরে পৌছিতে পারি নাই। ৺বদরীনাথেই ফিরিয়া আসি, এবং ৺বদরীনাথে পথ (পট ?) বন্ধ করিয়া ও-বৎসর হরিদ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলাম। তথায় ২/৪ দিন বাস করিয়া আবার বদরীকাশ্রমাভিমুখে যাত্রা করি। ৺বদরীনাথের পথ (পট) খুলিতে পৌছিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বৎসর তিব্বতের ৺কৈলাস মানস-সরোবর দর্শন করিয়া শীতকালে আসিয়া বদরীপ্রদেশেই ছিলাম।

মানসসরোবর একটি বৃহৎ সরোবর, উহার চারি পার্শ্বে ৮টি বৌদ্ধ মঠ আছে। মঠগুলিতে লামাদের ও নানা দেবতার বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। কৈলাস পর্ব্বতের চারি পার্শ্বেও ঐরূপ ৬টি মঠ আছে। মঠস্থ লামাদিগকে কয়েকটি বৌদ্ধ নিয়মের বশীভূত থাকিতে হয়। তাহার ব্যতিক্রম হইলেই দণ্ড করিয়া মঠ হইতে বাহির করিয়া দেয়। আর মঠে থাকিবার অধিকার থাকে না। এখানে একটি কক্ষে—তিব্বতের লামা—যাঁহারা অধিক উন্নত—মঠের বিচার ইঁহারাই করেন। তবে আর এক শ্রেণী 'ডাবা প্রবর্ত্তক' বলে ইহাদের মধ্যেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, অনেককে গৃহস্থ হইতে দেখিয়াছি।

লামারা অধিকাংশই পূজাপাঠ করেন। তিব্বতে অধিক লোকই এইরূপ হয়। অধিক আর কি লিখিব, আপনি সব জানেন। তিব্বতে ভয়ানক শীত। দেশ অত্যন্ত গম্ভীর।

এ বৎসর ৺বদরীকেদার যাত্রা অতিশয় আনন্দে হইয়াছিল। আপনি বোধ হয় জানেন, আমাদের ভাই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীতারকনাথ বাবাজীর দর্শন শ্রীনগরে পাই। সেখান হইতে একত্রে যাত্রা করিয়াছিলাম। তাঁহারই মুখে সকল সম্বাদ পাই।

৺বদরীনাথে তিনি আমাকে তিব্বত যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু আমি না শুনিয়া তিব্বতে যাত্রা করি, তিনি আলমোড়ায় যাত্রা করেন। তাহার [পর] তিব্বত হইতে এখানে পৌছিয়াছি, আজ প্রায় ২ মাস হইয়া থাকিবে। আর সব আপনি শুনিয়া থাকিবেন। আর বিশেষ কি যাত্রা করিয়াছি, যাহা আপনাকে লিখিব।

আমাকে সদা আশীর্ব্বাদ করিবেন, আপনাকে লিখিব এমন কিছু জানি না, কিছুই জানি না। ভাই মহাশয় নরেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া শীঘ্র তাঁহারই চরণে পৌছিবার ইচ্ছা করিয়াছি। যদি শ্রীশ্রীগুরুদেব করেন ত শীঘ্রই আমাদিগের মঠে পৌছিব। এখানে কয়েকদিন বর্ষা হইয়া যাওয়ায় আজ অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। আর কি লিখিব। আমার অসংখ্য প্রণাম, আমাদিগের ভাই যাহাকে লিখিবেন এবং দেখিবেন (তাহাকেই)—দাসের অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন। আমার কুশল, আপনার কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন। ইতি দাস-গঙ্গাধর।

P. S. ক্ষীরভবানীতে যাওয়ায় আপনার পত্র এত বিলম্বে পাইলাম, নচেৎ এত দিনে আপনি আমার প্রণাম পাইতেন। দেখুন, এখানে একদিন কোন কাগজে আপনার নাম দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। আপনাদের কুশল লিখিবেন।

(৫)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

Srinagar
(10-4-90)

পূজনীয় শ্রীযুক্ত মহাশয় চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম।—

কল্য অপরাহ্ণে আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। শ্রীনরেন্দ্র বাবাজীরও একখানি পত্র পাইলাম।—কিছুদিনের জন্য এখন গাজীপুরে থাকিবেন। তাঁহার কোমরের বেদনার জন্য সম্প্রতি পর্ব্বতারোহণ ঘটিল না। লিখিয়াছেন Lumbago বাত হইয়াছে, আরোগ্য হইলে যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন। আমাকে আসিতে লিখিয়াছেন, শীঘ্রই পৌছিবার ইচ্ছা আছে। আজকাল এখানে বড় বর্ষা হইতেছে, কোথাও চলিবার সুবিধা নাই, শীত এখনও খুব।

আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে এমন কিছু বিশেষ নাই যে আপনাকে লিখি। যতদূর পারি প্রকাশ করিব। শীঘ্রই আপনাদের দিকে আসিয়া স্বমুখে শুনাইব।

নূতন নূতন পবিত্র তীর্থের দর্শনমাত্রেই মনে যেরূপ হয় তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। তিব্বতে পৌছিয়া—যথার্থই বড় গম্ভীর ও শান্ত, সে সকল পর্ব্বতের এবং সরোবরের দর্শন পাইয়া আপনাকে ভুলিয়াছিলাম। অত্যন্ত অপূর্ব্ব আনন্দ···আর কি হইবে? তিব্বতে কিছু বিশেষ দেখিলাম—কারণ সে সকল অবস্থার মধ্যেও কিছু care আসিত না। আর এখনও আমার সেখানে যাইতে বড় ইচ্ছা করে। সে স্থানের এমনি মাহাত্ম্য যে কিছু কালের জন্য তথায় না বসিয়া গেলে কিছুই বলিতে পারি না, বড় ইচ্ছা রহিল। আমার অস্বাস্থ্য কিছুই হয় নাই। বরং আনন্দের সহিত সকল সহ্য করিলাম। আমার ছেলেমানুষী ক্ষমা করিবেন। তিব্বতে ইংরাজের চর সন্দেহে স্থানে স্থানে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহারা মারিতে উদ্যত, পরে সাধু জানিয়া বিশেষ সৎকার করিয়াছিল।

আমি আপনার এক এক পত্রে উপদেশ পাই। বাস্তবিক আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেছি না, সবিশেষ সাক্ষাৎ হইলে হইবে। আক্ষেপের বিষয়, আমি কিছুই জানি না। অতএব

আপনাকে অধিক লেখা বাহুল্য। আমাদের পক্ষে শীতপ্রধান দেশ অনুকূল বোধ হয়। এক্ষণে আমাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হইবার বড় ইচ্ছা আছে, তৎপরে যেরূপ হয়।

আপনি কি মনে করেন—আমি আপনা হইতে অধিক জ্ঞাত? কখনই না। বলিতে পারি না অল্প কালের মধ্যেই সব ব্যতীত হইবে। আর কোন চিন্তা নাই। ভাই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কোথাও বসিয়া যাইব। আমি যাহা লিখিয়াছিলাম বোধ হয় আপনার পূরণ কিছুই হইল না, ক্ষমা করিবেন। ভ্রমণে চিত্তের অবস্থা স্থির থাকে, কিন্তু যে কেবল দেশ কালের সৌন্দর্য্যের জন্য ভ্রমণ করে তাহার বোধ হয় সপ্ত ভুবন ভ্রমণ করিয়াও চিত্ত স্থির হইবার নহে। তাহা আপনি জানেন।

তিব্বত দর্শনে মনে এক অপূর্ব্ব ভাব হইয়াছিল—অত্যন্ত গম্ভীর। তিব্বতই প্রকৃত উত্তরাখণ্ড। কোন প্রকার জীবের উপদ্রবশূন্য এমন সুন্দর স্থান আর কোথাও দেখি নাই। কেবল বৌদ্ধ Monasteries (মঠ)। তাহাতে যাঁহারা থাকেন সদা পূজা পাঠে ব্যতীত করেন, নম্র ধার্ম্মিক। আমাকে বড় প্রীতি করিয়াছিলেন।

অনেক দিন হইল বরাহনগরের কোন পত্র পাই নাই। 'বিশ্বনাথ চরণকো ধ্যায়ো মন লায়ী'—এ কথাটি বড় সুন্দর, এ আপনি জানেন। স্থানে স্থানে ভ্রমণ এক ভাবেই ছিল। হিমালয় যাহাদের আলয় মনে করিয়াছিলাম, তাহাদের সে সকল পবিত্র স্থান সত্যই তপস্যার জন্য। বিশেষতঃ ৺বদরীকাশ্রম পুণ্যতীর্থ, আরামের জন্য বড় স্থির—বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থান। ভূমি সেই আছে, নাই সে উদ্ধব।

আমি আশা করি আপনিই কৃপা করিয়া আমাকে কিছু লিখিবেন। সত্যই বলিতেছি মহাশয় যেরূপ ইচ্ছা লিখিবেন। আমরা মহাশয়ের আশায় আছি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কিছু জানি না। এ দাসকে ক্ষমা করিবেন। আমার যাহা মনে আসিতেছে তাই লিখিতেছি। এরূপ লেখায় আপনি তৃপ্ত নন। কি করি, আমি যে কিছু জানি না। বস্তুতঃ আপনাকে লিখি—তিব্বতে ক্রমাগত ভ্রমণের উপযুক্ত নয়—শীতের biting কি বলিব! অতএব যেথায় আপনাদের ন্যায় সজ্জন আছেন সেই সকল স্থানই ভ্রমণযোগ্য। আপনার নিকট সকল বিষয় বৃত্তান্ত লিখিব। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" সেই 'ইসাক্' বলি দিতে যেদিন সক্ষম হইব সেই দিন Jehova Lord প্রসন্ন হইবেন।

চাতুর্ম্মাস্য এখানে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। আমি যথার্থই কিছু জানি না। কি লিখিতে কি লিখিব। শ্রীনরেন্দ্র বাবাজীর ৩ খানি পত্র পাইয়াছি। তাই সিদ্ধান্ত, অন্য গতি নাই। নিশ্চিত—সার ধর্ম্ম নির্ব্বাসনা। সে সকল আপনি জানেন। আপনি কি কলিকাতায় গিয়াছিলেন? শ্রীশ্রীগুরুদেব সদা উপদেশ করিতেছেন—তদনুযায়ী কর্ত্তব্য। কিমধিকমিতি, নিবেদনমিতি। আপনার চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম, সকল ভক্তবৃন্দের চরণে দাসের অসংখ্য প্রণাম। এক্ষণে weather ভাল দেখিলেই পাঞ্জাব হইয়া ফিরিব। অতএব নমস্কার—যাহা লিখিবার আপনি লিখিবেন। কৃপা করিয়া সবিশেষ লিখিবেন। ইতি—

দাস-গঙ্গাধর

লিখিতে কিছু নাই, সামর্থ্য নাই। আপনার কুশল শীঘ্র দিবেন। আমায় আশীর্ব্বাদ শীঘ্র দিবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন হিন্দী ও ইংরেজী ভাষণ থেকে বিশিষ্ট সংবাদ-সাহিত্যিক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত এই নিবন্ধটি আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে উদ্বোধন, মাঘ ১৩৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তারই পুনর্মুদ্রণ।

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন তথা বাণী ও রচনার সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখনই এর সূত্রপাত ঘটেছিল। আমার মা-বাবা দুজনেরই, বিশেষ করে আমার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল মিশনের সঙ্গে। আর আমি সত্যি করেই বলতে পারি যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র পরিবারকেই প্রেরণা দিয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক কাজে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও।

অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আমার অনুরাগের কারণ শুধু ব্যক্তিগত নিশ্চয়ই নয়। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারে এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের অবিরাম প্রয়াস আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশ চিন্তাধারায়, দর্শনে এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আমরা বিদেশে এমনকি দেশের জনগণের সব অংশের সামনে এই সমৃদ্ধিকে ঠিক-ঠিক ভাবে প্রক্ষেপ করতে পারিনি। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। মিশনের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি যে চমৎকার কাজ করেছেন ও করছেন তাতে আমাদের ওই অভাব কতকটা পূরণ হয়েছে।

॥ ২ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য মহান নেতারা আমাদের শিখিয়েছেন যে, সমস্ত বড় ও ভাল গুণ আমাদের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হওয়া চাই। অন্যরা আমাদের পথ দেখাতে পারেন কিন্তু তা অনুসরণ করবার বা না করবার দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রতিটি পৃষ্ঠা, তাঁর প্রতিটি উক্তি আমাদের প্রেরণা দান করে। স্বামীজী আমাদের দেন—সাহস, শক্তি, আত্মনির্ভরতা এবং বিশ্বাস। এই তো সেই জিনিস যার প্রয়োজন ভারতের ছিল এবং যার প্রয়োজন ভারতের আজও আছে। স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমরা সত্যই এক মহান সংস্কৃতি এবং এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সেই সঙ্গে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের জাতীয় ব্যাধি। নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের জাতিকে কীভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ত্ব শুধু তাঁর বিরাট বৌদ্ধিক শক্তি ও বিচারেই আবদ্ধ নয়, তাঁর হৃদয়ের অসীম প্রেমেও প্রসারিত। মানুষের কল্যাণের জন্য কী তীব্র, জ্বলন্ত সংরাগই না প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবন ও বাণীতে। স্বামীজীর এই মঙ্গলকামনা সমগ্র ভারতের জন্য তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের জন্যও। আর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর বিশেষ ক্ষমতা এইখানে যে, আধুনিক বিশ্বে যে সমস্ত শক্তি সক্রিয় তিনি সেগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে সজাগ ছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সেই সময়ে স্বামীজী কীভাবে আজকের সমস্যাগুলি তাঁর মানসনেত্রে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পেরেছিলেন, আজকের নানা ধারার ঘাত-প্রতিঘাত ধরতে পেরেছিলেন!

স্বামীজী প্রচার করেছিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্ব। আজ সবজাতির মধ্যে এইটিই হল সবচেয়ে

শক্তিশালী ধ্বনি ও ভাবধারা। কিন্তু এখানেও শক্তি আসা চাই মানুষের নিজের ভিতর থেকে।

স্বামীজী একটি শব্দ বার-বার ব্যবহার করেছেন তাঁর ভাষণগুলিতে। শব্দটি হল 'অভীঃ', নির্ভীকতা। স্বামীজীর জীবনের ছোট একটি ঘটনা, যা তিনি নিজেই বলেছিলেন—এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। তিনি তখন পরিব্রাজক হয়ে ভারত পর্যটন করছেন। এক সময় একদিন একপাল বানর তাঁর পিছু নিল। তিনি যত জোরে চলেন তারাও তত জোরে তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি দৌড়ান, তারাও দৌড়ায়। এমন সময় এক বৃদ্ধ সাধু দূর থেকে চিৎকার করে বললেন তাঁকে, 'থামো। জানোয়ারগুলোর সামনে রুখে দাঁড়াও।' তিনি তাই করলে বানরগুলি পালিয়ে গেল। ঘটনাটির উল্লেখ করে স্বামীজী বলতেন যে, এইভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। পালালে চলবে না।—জগতের অধিকাংশ সমস্যা সম্পর্কেই তাঁর এই শিক্ষা প্রযোজ্য। যদি কেউ মনে করে যে, কোন সমস্যা তার পক্ষে বড্ড বেশি বড় এবং সে ওই সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচবে তাহলে সে ভুল করবে। সেই সমস্যা তাকে ক্রমশ আরও বেশি করে চেপে ধরবে এবং শেষে পিষে ফেলবে। বরং সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যার সামনে রুখে দাঁড়ালে তার সমাধানের একটা সুযোগ পাওয়া যায়। একজন যদি সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তাহলেই বা কী? পরে আর একজন তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও ভালোভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

॥ ৩ ॥

প্রগতি ও আধুনিকতার কথা আমরা প্রায়ই শুনি ও বলি। প্রগতি বলতে আমি বুঝি মানব-ব্যক্তিত্বের গভীরতা ও বিকাশসাধন—ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই। এর জন্য অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও সামাজিক বাধাগুলি নিশ্চয়ই অপসারিত হওয়া উচিত। এগুলি দূর করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দেখতে হবে যে, বস্তুগত জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করতে গিয়ে আমরা যেন কোনভাবে মানবব্যক্তিত্বকে আহত না করি বা মানুষ যেন তার সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষ যেন একই সঙ্গে তার সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় শরিক হয় এবং তার আত্মিক বিকাশসাধনেও তৎপর হয়। আধুনিকতা মানে নিশ্চয়ই শুধু হালের কিছু সুযোগসুবিধা ভোগ বা জিনিসপত্র ব্যবহার, কিছু ফ্যাশানে গা-ঢেলে দেওয়া বা অধিক সচ্ছল দেশগুলির 'হনুকরণ' নয়। কাজেই শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দূর করলেই জাতি বড় হবে না। আত্মিক দারিদ্র্যও দূর করা দরকার। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছে আমরা মূল্যবান পথনির্দেশ পাব।

জানি উপরোক্ত দুটি কাজ (বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি) একত্রে করা সহজ নয়। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতা—তা সে পুঁজিবাদী ধরনেরই হোক বা কমিউনিস্ট ধরনেরই হোক (যাকে পূর্বের বলা হলেও আসলে যা পশ্চিমেরই) তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ নিজের সঙ্গে নিজের শান্তি স্থাপন করতে না পারলে বিশ্বের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। তবু আমার মনে হয় দুইয়ের সমন্বয় সম্ভব। আমার আরও মনে হয় যে, ভারত সেই পথ খুঁজে পাবে। যদিও ভারত বা কারও পক্ষে তা খুঁজে পাওয়া সহজ বলে আমি মনে করি না।

সব যাত্রাপথেই পায়ের নিচে কাঁটা ও পাথর থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের সব মহান সংস্কারকের পায়ের নিচেও কাঁটা ও পাথর ছিল। কিন্তু তাঁরা সেদিক দৃকপাত করেননি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল উর্ধ্বে—আলোকের দিকে, স্বামীজীর এবং তাঁদের সেই দৃষ্টি থেকেই আমরা দিশা পাব। বুঝতে পারব অতীতকে এবং এগিয়ে যেতে পারব ভবিষ্যতের দিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[ভাদ্র, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

॥ ১১ ॥

গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাবের বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা। গান্ধী-সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারি-রূপে স্বীকৃত, মনীষী ও সাধক আচার্য বিনোবা ভাবে সেবা-দর্শনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপরে স্বামীজীর প্রভাবের বিষয়ে লিখেছেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ে বিবেকানন্দের বিশেষ দান হইল—তিনি অদ্বৈতের সহিত দরিদ্র-নারায়ণকে যুক্ত করিলেন। দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি বিবেকানন্দের বিশেষ সৃষ্টি।...দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি লোকমান্য তিলকের নিকট খুবই প্রিয় ছিল এবং বিবেকানন্দের পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন, আর মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতের প্রতি গৃহে বহন করিয়া লইয়া যান এবং ইহার অনুসরণে গঠনমূলক কাজ শুরু করেন।"[১]

গান্ধী-দর্শনে বিশেষজ্ঞ, গান্ধীজীর এককালীন প্রাইভেট সেক্রেটারি, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু হরিজন আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের বিষয়ে বলেছেন :

"গান্ধীজী প্রায় ৪০ বৎসর পরে তাঁহার অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলনে স্বামীজীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের বাস্তব সুপারিশসমূহ বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও সকল জাতিকেই সমপর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াসী ছিলেন, যে-শূদ্রগণ কায়িক পরিশ্রমে মানবজাতির সেবা করে তাহাদের উপর তিনি দেবত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, কায়িক পরিশ্রমে সমভাবে সকল জাতিই অংশগ্রহণ করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইবে।"[২]

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গান্ধীজীর উপরে একাধিক বিষয়ে স্বামীজীর প্রভাবের কথা বলেছেন, তার মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রসঙ্গও এসেছে :

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তার ভিত্তিগঠনে বিবেকানন্দের প্রভাবই সম্ভবতঃ সর্বাধিক শক্তিশালী। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ও শিক্ষার মধ্যে বহু সমধর্মী জিনিস পাওয়া যাবে—তাদের কতকগুলি এমনকি বাইরের আকারের দিক দিয়েও প্রায় এক। ঈশ্বরমুখী ধর্মগুলির ভাবৈক্য, তাদের নিঃস্বার্থ ফলাকাঙ্ক্ষাহীন মানবসেবাকে—যা ঈশ্বরসেবারই নামান্তর—চরম মূল্যদান, সর্বপ্রকার দাসত্ব ও বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ভয় সংগ্রাম, সকলের প্রতি ভালবাসা, শত্রুর প্রতিও—এইগুলি হল স্বামীজী ও মহাত্মাজীর মধ্যে মূলগত যে-সব প্রত্যয়ে ঐক্য ছিল, তাদের কয়েকটি। বিবেকানন্দ ভয়হীন, স্বার্থবোধহীন সেবার যে-আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা যেন মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উভয়েই দরিদ্রনারায়ণের পূজারী ; মানবসেবার দ্বারা ঈশ্বরসেবা করা হয়, এই কথায় তাঁরা বিশ্বাস

১ বিশ্ববিবেক, ১৯৬

২ নির্মলকুমার বসু, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজসংস্কার।' (স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, ২য় সং), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃঃ ২৩৭

করতেন; উভয়েই কুসংস্কার ও ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন; এবং তাঁরা নিজ-দেশবাসীর মধ্যে আত্মমর্যাদার ভাব, ও সুমহৎ ভবিষ্যতে বিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তোলায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।…এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতের সামাজিক ভাবনার অংশে বিবেকানন্দের শিক্ষা ও বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।"[৩]

গান্ধীজীর সহকর্মী বা ভক্তদের লেখায় এই জাতীয় বক্তব্য অনেকই আছে। কুমারাপ্পা বা কৃপালনীর লেখাতে তা পাই। গান্ধীজীর আমেরিকান জীবনীকার ভিনসেণ্ট শীনের গান্ধী-জীবনীতে (**Lead, Kindly Light**) দীর্ঘ স্থান নিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত আছে। গান্ধীজীর সেক্রেটারি এবং তাঁর উৎকৃষ্ট জীবনীকাররূপে সুখ্যাত প্যারেলাল এই প্রসঙ্গে উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেছেন। গান্ধীজীর অত্যন্ত অনুরক্ত এই লেখক বিস্ময়কর উদারতার সঙ্গে গান্ধীজীর উপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবের রূপ দেখিয়েছেন।[৪] তাঁর রচনা থেকে আমরা দেখি, গান্ধীজীর ব্যক্তিজীবনে বিবেকানন্দ অপেক্ষা রামকৃষ্ণের প্রভাব অধিক, আর সামাজিক চিন্তায় বিবেকানন্দের প্রভাবই প্রবল, যদিও সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মতভেদের অবকাশও যথেষ্ট ছিল। [গান্ধীজীর নিজের রচনা থেকে তার রূপ ইতিমধ্যে আমরা যথেষ্টই দেখিয়ে এসেছি।]

প্যারেলাল তাঁর গান্ধী-জীবনীর আদিপর্বে, পূর্বসূরী বিষয়ক অধ্যায়ে[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে লিখেছেন, "তিনি ছিলেন জনগণের মানুষ, এসেছিলেন জনগণের মধ্য হতেই; তাঁর পাণ্ডিত্যের ভড়ং ছিল না, কিন্তু তিনি বিরাট অধ্যাত্ম-প্রতিভা, যাঁদের আবির্ভাব যুগে-যুগে ভারতে হয়েছে।" এই রামকৃষ্ণের কাছে জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা, ধার্মিক নাস্তিক সবাই

৩ প্রবুদ্ধ ভারত, মে, ১৯৬৩

৪ উদারস্বভাব প্যারেলাল কিন্তু নিজ আদর্শ পুরুষের প্রতি ভক্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে অন্যদের উপর কিছু অবিচার করেছেন। যেমন, ভারতের গণ-দারিদ্র্য প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন, "এক্ষেত্রে দক্ষিণেশ্বরের ঋষির প্রতিবিধায়ক সিদ্ধান্ত ভিক্ষাদান ও বদান্যতার বাইরে যায়নি, এবং তাঁর শিষ্য নিরতিশয় সরলপ্রাণে ভেবেছিলেন—আমেরিকার খয়রাতি দান বোধ হয় সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে।" [**Mahatma Gandhi, The Early Phase p. 707**]

একেবারে 'সীতা কার বাবা' সিদ্ধান্ত—প্যারেলালের!! অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টলস্টয়পন্থী গান্ধীজীর চরকা-দর্শনকে সমুচ্চে স্থাপন করবার উগ্র উৎসাহে প্যারেলাল যন্ত্রশিল্পায়ন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চিন্তার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন, যদিও তা বিস্মরণের বিষয় ছিল না। কারণ ঐ বিষয়ে অশোকানন্দের প্রচণ্ড লেখার জবাব উত্তর গান্ধীজীকে দিতে হয়েছিল। প্যারেলাল জানেননি বা জানার চেষ্টা করেননি—স্বামীজী আমেরিকা থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন এদেশে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করবার জন্যই, যা কৃষিজীবী পরাধীন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আয়ের পথ খুলে দেবে। আর দক্ষিণেশ্বরের ঋষি দান-ধ্যানের জন্য অপরকে প্রণোদিত মাঝে মাঝে করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্যাপারটা মোটেই 'চ্যারিটি'-শ্লোগান নয়, তার সামাজিক তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক, যার উপলব্ধিতে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে জনচেতনা সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সকলই প্যারেলালের জানা ছিল, একটু পরেই তা আমরা দেখব, কিন্তু কোন একটি বিশেষ বক্তব্যকে সজোরে স্থাপন করতে গিয়ে তিনি ভারসাম্য হারিয়েছিলেন।

৫ **Pyarelal, Mahatma Gandhi (Vol. I), The Early Phase, (1965), pp. 79—109**

আসত হৃদয়ক্ষতের উপশমের জন্য। তাঁর গভীর দৃষ্টি তাদের অন্তর ভেদ করত অধ্যাত্ম আলোক-শিখা বিস্তার করে। "কাউকেই তিনি ফিরিয়ে দিতেন না, সকলকেই দিতেন সহানুভূতির স্পর্শ, জ্ঞানের জ্যোতি এবং 'সেই অপূর্ব আত্মার শক্তি' যার বিষয়ে বলা হয়েছে—যখন তিনি শব্দমাত্র উচ্চারণ করেননি তখনো সেই শক্তি আগন্তুকদের হৃদয়কে 'ব্যাঘ্রের তেজে' আক্রমণ করে অধিকার করে রাখত দিনের পর দিন।" চিরন্তন অগ্নি-জ্বলিত রামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় চেতনা সর্বদাই পরমে নিমজ্জিত। সেই রামকৃষ্ণের কাম-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ প্যারেলাল করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে রামকৃষ্ণের কামগন্ধহীন সম্পর্কের প্রতাপান্বিত বিজয়ী রূপের কথা বলার পরে প্যারেলাল লিখেছেন, "রামকৃষ্ণের এই জীবন-রূপ তাঁর পরবর্তীকালে আগত আর এক পুরুষের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাঁচে ঢেলে তৈরি করে দিয়েছিল—গান্ধীজীর জীবনকে—যদিও তিনি ভিন্ন পথে ঐ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। গান্ধীজী আবার ঐ আদর্শকে সারা দেশের, দেশের বাইরেও, বিভিন্ন আশ্রমের সহস্র-সহস্র নামহীন বীর ও বীরাঙ্গনাদের সামনে উপহার দিয়েছিলেন। এঁরাই ভারতের অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তর্মগুলী গঠন করেছিলেন। 'মা' সারদামণি, যিনি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র জগতে বিরাজিতা ছিলেন, তিনি, পরবর্তীকালে গান্ধী-আশ্রমে বিরাজিতা 'বা' [অর্থাৎ মা] কস্তুরবাঈয়ের পূর্বরূপ।" "শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে অনেকেই ব্রহ্মচর্যের গৌরবঘোষণা করেছেন, তার পূর্ণ রূপায়ণে অধ্যাত্মশক্তির কোন্ অসীম বিকাশ সম্ভব, তার কথাও। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম গৃহীর পক্ষেও, গৃহজীবনের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা রক্ষা করেও, কিভাবে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে এই আদর্শ প্রচণ্ড ক্রিয়াশীল পরিবর্তনকারী শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল; তা বহুজনের জীবনে নীরবে অজ্ঞাতে প্রবেশ করেছে; এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুতে সঞ্চারিত হয়েও তা অব্যবহিত পরবর্তী যুগে নূতন এক আবহ ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। উনিশ ও বিশের দশকে ভারতে যে অসাধারণ অহিংস গণজাগরণ ঘটে তার মূলে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।"

রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবনে রূপায়িত ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে এতদিন সাধারণভাবে ব্যক্তি-গত ধর্মজীবনের বস্তু বলেই বিবেচনা করা হয়েছে —গান্ধীজীর মধ্য দিয়ে তা ভারতের অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোন্ ভিত্তি-ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেদিকে প্যারেলাল উপযুক্তভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রভাবিত ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল—কিন্তু সেখানে দাম্পত্য-সম্পর্কের স্বীকৃতি সাধারণভাবে ছিল না। বিপজ্জনক অনিশ্চিত জীবনযাপনের কালে বিপ্লবীরা বিবাহবন্ধনে নিজেদের জড়াতে চাননি, অথচ আত্মশাসনের প্রয়োজন ছিল সবিশেষ, তাই বিবেকানন্দের আদর্শকেই তাঁরা নিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণের সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সমন্বয়, বৃথা তর্কে বিতৃষ্ণা, ঈশ্বরকে ভালবাসার দ্বারা মানুষকে সর্বোত্তম ভালবাসা, আত্মশুদ্ধি, এবং শুদ্ধচিত্তে জগৎসেবা, কর্মের পূর্বে ঈশ্বরপ্রেম-লাভের প্রয়োজনীয়তার ঘোষণা, ব্যক্তিমুক্তির স্বার্থত্যাগের নির্দেশ, প্যারেলাল এই সকল বিষয়ে গান্ধীজীর অনুগামিতার কথা জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ চাইতেন, "আমাদের এমন তীব্র অন্তর্জীবন যাপন করতে হবে যাতে পরম সত্য সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। তার থেকে সত্যের অগণিত আলোকশিখা নির্গত হবে। এসো,

মানবসমাজে আমরা ঈশ্বর-নামক পর্বতকে উত্তোলন করে তুলি।...সেই উত্থিত পর্বত থেকে মানবসমাজের উপর আলোক ও করুণার ধারা অবিরাম নেমে আসবে।" প্যারেলাল বললেন, "এখানে আমরা সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন এক মনোভাব পেলাম। গান্ধীজী সমাজ-উন্নয়নের জন্য যখন গণআন্দোলন আরম্ভ করেছেন তখন মনস্বিতা বা বুদ্ধিচাতুর্যযুক্ত মানুষকে যন্ত্র-হিসাবে বাছেননি, বেছেছিলেন পবিত্র মানুষকে, তপস্বী মানুষকে। তিনি বলেছিলেন, 'সামাজিক বা রাজনৈতিক, যে-কোন কাজেই আত্মশুদ্ধি উপায় ও লক্ষ্য, দুইই। সর্বকর্মের সাফল্যের চাবিকাটি তাতে আছে।' এর থেকে রাজনীতির অধ্যাত্মকরণ সহজ ও স্বাভাবিক পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

গান্ধীজীর অন্তর্জীবনে ও অন্তর্দর্শনে রাম-কৃষ্ণের প্রভাবের রূপ নির্ণয়ের পরে প্যারেলাল স্বামীজী প্রসঙ্গে এসেছেন। স্বামীজীর আমেরিকা ভ্রমণের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে লিখেছেন, "তিনি আমেরিকা থেকে ভারতের অর্থনৈতিক ও নৈতিক [?] পুনরুজ্জীবনের জন্য যে-অর্থলাভের আশা করেছিলেন, সেই অর্থ তিনি আনতে পারেননি। কিন্তু আরও মূল্যবান বস্তু এনেছিলেন। এনেছিলেন—ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের সচেতন সহানুভূতি, কয়েকজন অনুরক্ত পাশ্চাত্য শিষ্য, এবং ভারতের ভবিষ্যৎ ও মর্যাদা সম্বন্ধে অধিকতর আস্থা ও আত্মবিশ্বাস। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ কোন্ মহাদান দিতে পারে সেই বোধ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, অর্জন করে-ছিলেন তাঁর মাতৃভূমির জন্য বিশ্বের শ্রদ্ধা।" ভারতবর্ষে এসে স্বামীজী তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন তিনটি জিনিস—এক, বিশ্বাস—যা ভিতরের ব্রহ্মকে জাগরিত করে; দুই, ত্যাগ—যা পৃথিবী টলিয়ে দেবার শক্তি দেয়; তিন, সাহস—যা নির্ভয়ে সত্য ঘোষণা করতে পারে। এই রিক্থ দ্বারা সম্পন্ন গান্ধীজী যখন তাঁর অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছিলেন, এ হল 'ধর্মযুদ্ধ', 'আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লব আনতে চাই', তখন তাঁর মন্তব্য বহু অনবহিত সমালোচনার সৃষ্টি করে। প্যারেলাল বিবেকা-নন্দের ভাবচিন্তার আবহে ব্যাপারটিকে স্থাপন করে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন :

"ধর্ম বলতে গান্ধীজী কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম বোঝেননি, ধর্মের সর্বজনীন বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যা ভারতের চিন্তা প্রণালীর মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত। বিবেকানন্দের বহু কীর্তির মধ্যে ধর্মের এই সর্বজনীন রূপের পুনরাবিষ্কার-রূপ কীর্তি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিবেকানন্দের ধারণায়, ধর্ম তার মূল স্বরূপে 'সার্বভৌম চৈতন্য' ছাড়া কিছু নয়। 'ভবিষ্যতের ধর্মধারণা, এই পৃথিবীতে যা-কিছু বর্তমান, যা মহান ও মঙ্গলকর, সমস্তকেই আলিঙ্গন করবে, এবং তার মধ্যে পরবর্তী বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা থাকবে।' যে-পর্যন্ত না ধর্মধারণাগুলি এই সর্বজনীনতার পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে সে পর্যন্ত ধর্মের চরিতার্থতা ঘটবেই না।"

প্যারেলাল অতঃপর বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্মধারণার উৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ করেছেন, জড়-বাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের সতর্কবাণী উৎকলন করেছেন, বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয়ী আদর্শের মহৎ রূপ দেখিয়েছেন, এবং তাঁর অদ্বৈতবাদ কিভাবে সর্বমতপথের মিলনভূমি হতে পারে তার বিবরণ দিয়েছেন। অদ্বৈতবাদের মহিমা প্যারেলাল স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, গান্ধীজী ঐ অদ্বৈতকে সত্য বস্তুরূপে গ্রহণ করলেও অদ্বৈতের সর্বোচ্চ মহিমা ঘোষণার মধ্যে নব বন্ধনের সম্ভাবনা আছে, তাও মনে করতে চেয়েছেন। প্যারেলাল কিন্তু অতঃপর তাঁর এই

অতি উদারনৈতিক ভাবনাকে পরিহার করেছেন, কেননা গান্ধীজীর মত-পথের উপস্থাপনাকালে তাঁর রচনা কেবল এক-প্রণালীতেই প্রবাহিত হয়েছে।

সে যাই হোক, বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ কিভাবে গান্ধীজীর মধ্য দিয়ে ভারতের উদার অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক জাতীয়তা সৃষ্টি করেছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তি স্পষ্ট ও দৃঢ় :

"অদ্বৈতবাদ কেবল সাম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মের মিলনভূমি রচনা করেনি, বিবেকানন্দ যে-ভাবে তার প্রচার করেছেন তদনুযায়ী তা বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনভূমিও তৈরি করেছিল। পরিবর্তমান পৃথিবীতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজ ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবার জন্য এ-বস্তুর প্রয়োজন ভারতের ছিল। সমাজের শুভ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব-বোধের অধ্যাত্মভাবায়নের উপর—বেদান্তের সর্বজনীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, সার্বভৌমিক উদারতা এবং আশাবাদিতা তার নৈতিক ভিত্তি রচনা করেছে। গান্ধীজী একেই পৃথিবীর উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত ভারতের বিশেষ জীবনাদর্শ মনে করেছেন।"

প্যারেলাল বলেছেন, বিবেকানন্দের পূর্বে ভারতের সামাজিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। "কিন্তু ভারতের তেত্রিশ কোটি লোককে বহু শতাব্দীর অসাড় অচৈতন্য অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলা, তাদের বহু প্রাচীন মন্দ আচার ও কুসংস্কার দূর করা, জাতীয় মুক্তির জন্য সংগঠিত প্রয়াসে তাদের সম্মিলিত করার মতো ঐক্যচেতনা দান করা—এ সকলের জন্য এমন চালক-শক্তি ও কর্মযন্ত্র প্রয়োজন ছিল যার রূপ পূর্ববর্তী নেতারা জানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি এবং বিবেকানন্দ কর্তৃক তার প্রয়োগ-সূত্র রচনা, এই নব জীবনগতির ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।" গান্ধীজী এই ভিত্তিকে অবলম্বন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পরীক্ষা ও উপলব্ধিভিত্তিক ধর্মের সঙ্গে গান্ধীজীর ধর্মবোধের তুলনা করে প্যারেলাল বলেছেন, "ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সরাসরি যাচাই করার পদ্ধতি প্রবর্তন করে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভাষায়, 'আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞান'-এর ভিত্তিস্থাপন করেন।··· ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর এই পরীক্ষাপদ্ধতি গান্ধীজীর 'সত্যের পরীক্ষার' পূর্বসূরী। সর্বধর্মের মধ্যেই সত্য বর্তমান—শ্রীরামকৃষ্ণের এই মতের প্রতিধ্বনি দেখা যায় গান্ধীজীর 'সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা'-র মধ্যে। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কচকচি ও কূটতর্ক নিষ্কর্মা পণ্ডিতদেরই কাজ—শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিতৃষ্ণা গান্ধীজীর ক্ষেত্রে সকল প্রকার ধর্মান্তরকরণের চেষ্টাকে অধার্মিক বলে তাঁর ধিক্কারে রূপ নিয়েছে।"

ঈশ্বর কাল্পনিক বস্তু নন, একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য, গান্ধীজীর কাছেও তাই, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেছেন, ধর্ম সত্য অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়—গান্ধীজী তা প্রায় রামকৃষ্ণের ভাষাতেই ঘোষণা করেছেন—এও প্যারেলাল জানিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, সর্বোচ্চ মানুষেরা মৌনের মানুষ, তাঁদের চিন্তা সমস্ত ব্যবধান ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ে—এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উক্তির বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেবার পরে প্যারেলাল বলেছেন, এই বস্তুই গান্ধী-দর্শনে "সত্তার শক্তিকে কর্মপ্রণালীরূপে গ্রহণ করার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।"

"রামকৃষ্ণের উপলব্ধির রহস্য হয়ত হারিয়ে যেত যদিনা সে সকলকে সংহত বৈজ্ঞানিক ভাষায়, সমকালীন পৃথিবীর পক্ষে বোধগম্য আকারে, যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিতে, কেউ স্থাপন করতে পারতেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তিনি কেবল তাঁর আচার্যের ভাবাত্মক চিন্তাকে কর্ম-বর্ম পরান নি, ঐ ভাবরাজির সঙ্গে নিজের

বিশালকায় মনস্বিতাকে যুক্ত করে তিনি সমকালীন পৃথিবীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাকার; সেই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে, সেতুনির্মাতা হয়ে উঠেছিলেন; এবং তাঁর রচনা একদিকে টলস্টয় অন্যদিকে গান্ধীজীকে প্রভাবিত করেছিল।" এইসব কথার পরে প্যারেলাল আরও অগ্রসর হয়েছেন। "প্রাণকাড়া প্রবচন রচনায় সিদ্ধ-প্রতিভা" বিবেকানন্দের "দরিদ্রনারায়ণ" শব্দটি "প্রথম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করেন কলকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্যদলের সেবাকর্ম-নীতির ঘোষণায়; পরে এই শব্দটি ভারতের অহিংস সংগ্রামের কালে সংকেত-বাণী হয়ে দাঁড়ায় যখন গান্ধীজী ভারতের সাত হাজার গ্রামের পুনরুজ্জীবনের ধর্মযুদ্ধকালে পতাকার উপর শব্দটি লিখে নিয়েছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর উক্তিসমূহের মধ্যে "বিস্ময়কর ঐক্য" দৃষ্টান্তযোগে দেখাবার পরে প্যারেলাল বলেছেন, এটা বিস্ময়কর ঠেকবে না যদি মনে রাখি, তাঁরা একই উৎসবারি গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজী রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন, বিবেকানন্দ তা করেন নি, এটা গান্ধীজীর অনুগামী হিসাবে প্যারেলাল অপছন্দ করেছিলেন, এবং অহিংসা, আমিষাহার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল (স্বয়ং গান্ধীজীর আপত্তির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আমরা আগে করে এসেছি), কিন্তু এইসব আপত্তি তাঁর বিপুল উৎসাহিত সমাদরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। বিবেকানন্দের প্রভাবেই যে ভারতবর্ষে অগণ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারীর মধ্যে নির্ভয় সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গড়ে উঠেছে অজস্র আশ্রম, সেবাসমিতি, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—এই ঐতিহাসিক সত্যের স্বীকৃতি তাঁর রচনায় আছে—আরও গভীর স্বীকৃতি আছে যখন তিনি ভারতীয় ইতিহাসে বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের পাশে ত্রাণকর্তা হিসাবে বিবেকানন্দকে স্থাপন করেছেন:

"ভারতীয় ইতিহাসের দুই সংকটকালে অদ্বৈত-বাদ ভারতের রক্ষায় এগিয়ে আসে। ভারতবর্ষ যখন অতি জঘন্য ধরনের জড়বাদে পরিবেষ্টিত হয়েছিল তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। পুনশ্চ যখন 'শাসকশ্রেণীর দুর্নীতিতে ও অবনত-শ্রেণীর কুসংস্কারে' ভারতের প্রাণধারা বিশুষ্ক তখন শঙ্করাচার্য যুক্তিভিত্তিক জীবনদর্শন হিসাবে বেদান্তবাণীর পুনঃপ্রচার করে নবজীবন দান করেছিলেন। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে বেদান্তের গতিশীলতা মন্দীভূত হয়ে তা শুষ্ক দর্শনের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিবেকানন্দ তাকে তর্ক বিচারের মরুবালু থেকে তুলে এনে অসীম সম্ভাবনাময় কর্মনীতিতে পরিণত করেছেন।"

[ক্রমশঃ]

- দাম্ভিকতা দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে বলো : এগুলি তোমার সাজেনা, এগুলি তোমার সাজেনা।
- ঈশ্বর-উপলব্ধির সহায়ক যে-কোন সম্প্রদায়কেই স্বাগত জানাও। ঈশ্বরানুভূতিই ধর্ম।
- পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরত্ব—এই তিনের সমষ্টিতেই মানুষ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[আশ্বিন, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

৩

আমার গণনায় কিছু ভুল ছিল। সব দেশের, বা একটা দেশের সব জায়গার রীতিনীতি এক নয়, এটা অতখানি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। জানতাম, ট্রেন পৌঁছাবে অ্যানেসিতে রাত ১১টা ৩ মিনিটে। তবু রাতের ট্রেনই বেছেছি, কারণ সারা বিকেল ধরে ট্রেনে বসে ফ্রান্সের ভূ-প্রকৃতি দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। রাতে অ্যানেসিতে নেমে হোটেল খোঁজার ইচ্ছাও মনে ছিল না। কারণ মাঝরাতে স্টেশন থেকে কত-দূরে কোথায় হোটেল, সেটা খোঁজার অসুবিধা। ভেবেছিলাম, স্টেশনে সম্মেলনের কোন কর্তা-ব্যক্তিরা থাকবেন। ভুলটা সেখানেই, কেউ ছিলেন না। রাত যেন নিঝুম। নামল ২।৪ জন লোক। গা ছমছমই করছিল। একদম ফাঁকা স্টেশন। অন্য একটা ভরসা ছিল—স্টেশনের বিশ্রামাগারে থাকা যাবে রাতটা। কিন্তু বোধ হয় এই স্টেশনের নিয়ম আলাদা—বিশ্রামাগার একদম বন্ধ করে দেওয়া হল। স্টেশন কর্তৃপক্ষকে জানালাম আমার অবস্থা। বললাম, কোথায় কী কারণে এসেছি। ওদের কেউ বুঝলই না। শুধু আইনের কথাই শোনাল। এক ভদ্রলোকের ডিউটি শেষ হয়েছিল, বাড়ি ফিরছিলেন, তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে আমি যেতে পারি, রাতটা কাটাতে পারি তাঁর বাসায়, সকালে খুঁজে নিতে পারি আমার হোটেল। বিদেশ বিভুঁই, আর ঐ ব্যবহার, কী মনে করে ভদ্রলোককে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান জানালাম।

উনি স্টেশনের বাইরে দু-একটা জায়গা দেখালেন। উপরে একটা ছাউনির মতো ছিল। নিচে একটা বসার বেঞ্চি—বড়সড়। তাতেই শুয়ে পড়লাম।

রাত বাড়তে শীত টের পেলাম। চারিদিক নীরব নিথর। দূরের, কাছের, পথের,—বাড়ির আলোগুলো জ্বলছে। শীত সইতে পারা গেল না। স্টেশনের সাবওয়েতে নেমে এলাম। দেখলাম আমার মতো আরও একজন অতিথি আছে, বেড়াতে বেরিয়েছে, হিচ হাইক, এই অবধি এসে রাতটা কাটিয়ে দেবে এইভাবে সাবওয়েতে।

ভোর হল। তাড়াতাড়িই ভোর হয়। স্টেশনের লাগোয়া বাথরুমে দাড়িটাড়িও কাটলাম। এখন নিজেকে অনেকটা পরিষ্কার মনে হল। রোদ উঠল। ঝলমলে রোদ। ভেসে উঠল তাতে ছবির মতো অপরূপ অ্যানেসি শহরটা। ছোট পাহাড়ী শহর—আলপস্-এর কোলে। একটি হ্রদের ধারে। বাড়িঘর সাজানো। ময়লা নেই, পথ সাফ্সুফ। নিকানো যেন।

যে জন্যে অ্যানেসিতে এসেছি—এখানে বসছে এবার ম্যালেরিয়া ও ব্যাবেসিওসিস দুটি অসুখের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৯—২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩। হাতে পুরো একটা দিন আছে। আগামী কাল থেকে সম্মেলন শুরু।

মনে হচ্ছিল একেবারে কোন স্বপ্নের দেশ। আলাদা ধাঁচ, ধরন। আমাদের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। এটা ছোট একটা পাহাড়ী শহর, পাড়াগাঁ বললেই হয়, তাহলেও আধুনিক জীবনের সবরকম সরঞ্জাম রয়েছে। স্টেশনটা দোতলা, এসকালেটর লাগানো। বেশির ভাগ স্টেশনেই রয়েছে এসকালেটর। আছে ইলেকট্রিক আলো, আধুনিক স্যানিটারি ব্যবস্থা। পথে লালবাতি

নীলবাতির সঙ্কেত জলছে ইলেকট্রনিক্সে। শহরের পথঘাটের মতো বাড়ি, বাস, ট্রেন সবই ঝকঝকে তকতকে। নোংরা কোথাও চোখে পড়ল না। এবং সমৃদ্ধ শহর। ভাঙাচোরা বাড়ি, ঘিঞ্জি, বস্তি এসব দেখিনি।

ফরাসী ভাষা জানি না। এখানকার সাধারণ লোক ইংরেজীও বুঝি জানে না। দু-চারটে ফরাসী শব্দ শিখে এসেছি তার মধ্যে দুটো হল—"পারলে আংলে?" মানে, ইংরেজী জানো কি?

কেউ যদি বলেন ইংরেজী জানি, তখন তাঁর কাছে জানতে চাই সম্মেলনের জায়গাটি কোথায়? ছোট শহর হলেও কয়েকজন বলতে পারলেন না। একজন যা পথ বললেন, তাতে মনে হল জায়গাটা স্টেশনের খুব কাছে। হাতে তো একটা বাক্স ন্যাকড়ার, আর কাঁধে একটা ব্যাগ। তাই নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। "পারলে আংলে" বলতে বলতে এসে পৌছালাম ৪৫ মিনিটের মধ্যেই 'বন লিউ'-এ যেখানে হবে সম্মেলন।

'বন লিউ' আসলে চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা একটা বিরাট বড় বাড়ি—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি ছাড়াও আছে দোকানপাট। হোটেল। রেস্ট্রেন্ট। দু-একটা ছবির প্রদর্শনীও চলছে দেখলাম। হ্যাঁ, অনেকগুলো পতাকা উড়ছে পতপত করে ভারতসহ নানা দেশের—একদিকে একটা বাহারী কাপড়ে লেখাও রয়েছে সম্মেলন হচ্ছে কাল থেকে। তবে লোকজন তেমন দেখলাম না। ব্রাজিল-এর এক ভেটারিনারি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল। উনিও খুঁজছিলেন কোন্ হোটেলে ওঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

কাছের হোটেল হলে সুবিধা হয়। দেখলাম আমার নাম আছে হোটেল নোভেল-এ। একটু দূরে। ব্রাজিল-এর ডাক্তারের হোটেলটা কাছে। ওটার নামও হোটেল-ডি-নোভেল। প্রায় একই। আগে তো ভেবেছিলাম, ওটাই আমার হোটেল। গিয়ে ভুল ভাঙল। পথে নামলাম। তার আগে হোটেল থেকে টেলিফোন করে দেওয়া হয়েছিল একটা ট্যাক্সিকে। মিনিট পনেরোর মধ্যে এল ট্যাক্সি। হোটেল নোভেল-এ পৌছালাম মিনিট দশেকের মধ্যেই। আমাদের টাকায় লাগল ৩৫ টাকা ভাড়া। ট্যাক্সির চালক নিজে উঠবার সময় দরজা খুলে দিয়েছিলেন, নামবার সময়ও। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছাপানো কাগজ দিলেন, কত ভাড়া নিলেন তার, মোট দুটোও নামিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ জানালাম।

তিনতলায় একলা একটি ঘরে। দুধসাদা দেওয়াল এবং বিছানা। লিফ্‌টে উঠতে হয়। সিঁড়ি নেই। একবার তো ভুল করে একদম নিচে নামলাম—সেখানে হোটেলের সব আসবাবে ভর্তি। হোটেলের ঢোকবার পথটা দোতলায় আর কি!

চটজলদি আলাপ হয়ে গেল পাশের ঘরের ডঃ এস মোজেম্বির সঙ্গে।

এখন আছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পশু চিকিৎসা বিভাগে। আসলে নিগ্রো মালাওয়ের ছেলে। তরুণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চোখে আরও বড় হবার স্বপ্ন। দেশে ফিরে যাবার কথাই বলছেন, ভুলতে পারছেন না দেশকে। আমাকে তো দাদা বলে ফেললেন। এরপর আমরা এক-সঙ্গেই বেরুতাম, চলাফেরা করতাম, পাশাপাশি বসতাম সম্মেলনের ঘরে বা ভোজ খাবার টেবিলে। পরে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আমার একটা খুব বড় উপকারও করেছিলেন তিনি। সময় এলে সেটা বলব।

এই যে পথে হঠাৎ আলাপ, পরিচয়, প্রীতি ও বন্ধুত্ব—এর দাম কত তার পরিমাপ কে করবে? দাদা বললেও ডঃ মোজেম্বি আমাকে আগলে আগলে চলতেন, কায়দা কানুন বলে দিতেন, পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতেন, নিয়ে আসতেন হোটেলে,

আলাপ করিয়ে দিতেন তাঁর শ্বেতাঙ্গ প্রফেসর ও নিগ্রো ভাইদের সঙ্গে। বিদেশী কেতা শেখাতেন।

হোটেল ভাড়া দিনে দুশো টাকার মতো। সস্তাই বলতে হবে। এই সুবিধাটা দিচ্ছে সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা এসেছেন, শুধু তাঁদেরই। না হলে ডবল।

সকালের খাবার, ছোট হাজরি বা ব্রেক-ফাস্ট—সেটাও খুব দামী। ৪০ টাকার মতো। তবে পেট ভরে যায়। আসলে দুপুরের খাবার খুব একটা বেশি কিছু খায় না এরা বড় একটা। হয়তো মাংসের পুর দেওয়া গোল পাকানো পাউরুটি—হটডগ আর এক কাপ কফি! তা কফির দামই তো ৪।৫ টাকা পড়ে যায়!

আসলে ভারতীয় টাকা হিসাবে ভাবলে এটা হবেই। আর বুক খচখচ করবেই বেশি খরচ করছি—এই ভেবে। কিন্তু ধরুন আমেরিকার কথা। ভারতীয় ১০।১২ টাকার সমান ১ ডলার। কাজেই ৫০০ ডলার যদি নিয়ে যাই সেখানে, তাহলে আমার এটা ভাবলে চলবেনা যে আমার কাছে ৫০০০ টাকা আছে। ভাবতে হবে ৫০০ টাকা নিয়ে গেছি।

যাবার আগে আরেকটা জিনিস শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। যার জন্যে আমার প্রথম প্রথম বেশ সুবিধাই হয়েছিল। সঙ্গে ছিল কিছু চিঁড়ে, কফি আর চিনি। সব জায়গাতেই তো গরম জল পাওয়া যায় ইউরোপ-আমেরিকায় হোটেলগুলোতে। কফি তৈরি করে নিতে এক মিনিট লাগত। আর চিঁড়েও খুব কাজ দিয়েছে আগের দিকে। তবে, পরে আর দরকার হয়নি—ফেরতই এসেছিল। শুধু ওই খাবারগুলোই নয়। কাপড়কাচার গুঁড়ো সাবানও কিছু নিয়ে গেছিলাম। তাও কাজে এসেছিল। এসব ছোটখাট খরচ না বাঁচালে বিদেশে চলে না। ইউরোপে এবং আমেরিকায় জীবনযাত্রা খুবই ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। শুনেছি ১৫ বছর আগে সপ্তাহে ৫ পাউণ্ড (৭৫ টাকার মতো) ভাড়ায় লণ্ডনে ঘরভাড়া পাওয়া যেত। এখন সেটা স্বপ্ন!

৪

ফরাসীদের সঙ্গে বাঙালীদের অনেক বিষয়ে মিল। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প চারুকলা ভালবাসে দুটি জাতিই, জমিয়ে বৈঠক বসায় নিজেদের মধ্যে, জাতি হিসাবে নিজেকে নিয়ে গর্বের অন্ত নেই, বুদ্ধিতে, বিদ্যাবত্তায়, শৌর্যে, এমনকি হাস্য-পরিহাসে এবং রহস্য আলাপে। তবে সম্মেলনে গিয়ে প্রথম দিনেই দুটি জাতির আরও কিছু কিছু একতা নজরে পড়ল, যেগুলো ঠিক জানা ছিল না।

শুরুতেই মাইক্রোফোনের গণ্ডগোল। সারা পৃথিবীর প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি এসেছে। ভারত থেকে শুধু আমার একারই গবেষণাপত্র রয়েছে। আর একজন এসেছেন ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ থেকে পরিদর্শক হিসাবে। আরও দু-চারজন ভারতীয় এসেছেন, তবে তাঁরা আমেরিকা বা দূরপ্রাচ্যের প্রতিনিধি হয়ে। মাইক্রোফোনের এই গাফিলতির জন্যে কেউই তৈরি ছিলাম না। সম্মেলন চলাকালীন প্রতিনিধিদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থাটা সম্মেলন কর্তৃপক্ষই করেছেন। বাঙালীর মতো ভোজনরসিক ফরাসীরাও, তার থেকে বেশি অবশ্য পানরসিক। সে যাই হোক, দুপুরের খাবার পর অধিবেশন বসার কথা ছিল ২টোয়, শুরু হল বেশ কিছু দেরিতে—২টো ১০-এ, একেবারে বাঙালী সংস্করণ এসব।

অধিবেশনের ভাষা ছিল দুটো—ফরাসী ও ইংরেজী। তার জন্যে কানে লাগানো যন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল—দেখতে অনেকটা হেডফোনের মতো, তার সঙ্গে তার, সুইচ এসব জোড়া। [ক্রমশঃ]

বুদ্ধচরিতঃ এডুইন আর্নল্ড ও গিরিশচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[আশ্বিন, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

গিরিশনাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে বুদ্ধের মানবপ্রেম ও অহিংসা—সেই তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির মূলকথা। পিতার কাছে সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগ অনুমতি প্রার্থনায় সঙ্কল্প প্রকাশিত হয়েছে

এ দুর্গতি দেখিতে না পারি আর
জীবকুল করিব নিস্তার
বিকাশিব জ্ঞানালোক
অজ্ঞানতিমির নাশি।

এ প্রার্থনা 'লাইট অব এশিয়া' বহির্ভূত—সেখানে বুদ্ধের সংসার ত্যাগের উদ্দেশ্য দুঃখের কারণ নির্ণয় এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ। রামদাস সেন রচিত—'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে দেখি, সিদ্ধার্থ যখন পিতৃসমীপে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন তখন শুদ্ধোধন তাঁকে নানা ঐশ্বর্যের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তুমি আমার কাছে কি বর চাও বল—আমি সমস্তই দিব—যাহা চাহিবে তাহাই দিব, অন্যথা করিব না।"

প্রত্যুত্তরে সিদ্ধার্থ প্রার্থনা করলেন চারটি বর —(১) জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, অভিভূত না করে এবং শুভ্রবর্ণ যৌবন যেন অনন্তকাল নিমিত্ত স্থির থাকে। (২) আমি নীরোগ থাকতে ইচ্ছা করি—কোনকালে যেন আমার ব্যাধি না হয়। (৩) অপরিমিত আয়ু প্রার্থনা করি, অমরত্ব বাঞ্ছা করি, কখনও যেন আমার মৃত্যু না হয়। (৪) আমি অতুল সম্পত্তি ইচ্ছা করি। সে সম্পত্তি যেন অন্যের অতুল্য হইয়া চিরস্থায়িনী হয়। কোনও কালে যেন তাহাতে বিপত্তি না হয়।"

এই প্রার্থনায় সিদ্ধার্থের মনে পূর্বনিমিত্তগুলিই সক্রিয়। গিরিশচন্দ্রের সিদ্ধার্থের প্রার্থনায় প্রাধান্য পেয়েছে জাগতিক দুঃখবোধ জনিত সঙ্কল্প 'পারি যদি জগতের দুর্গতি হরিব'।

আর্নল্ডের গ্রন্থের সঙ্গে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গানে, যেখানে গিরিশের ব্যক্তিজীবন উদ্ঘাটিত হয়েছে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজবধূ গোপার সঙ্গে উপবনে নৃত্যগীত উপভোগ করছেন। উপস্থিত গায়ক-গায়িকাদের সংগীত নৃত্যে যখন সকলেই নিমগ্ন তখন সিদ্ধার্থ শুনেছেন অলক্ষ্যচারী দেবতাগণের আত্মউদ্বোধক সংগীত। আর্নল্ডের ভাষায়:

We are the voices of wandering wind
Which moan for rest and rest can never find
Lo ! as the wind is, so is mortal life
A moan, a sigh, a sob, a storm, a strife.

এই অংশের অনুবাদ করেছেন গিরিশচন্দ্র দেববালাদের কণ্ঠসংগীতে :

জুড়াইতে চাই, কোথা জুড়াই
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই—
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই

আর্নল্ড যেখানে নশ্বর ও দুঃখময় মানবজীবনের বেদনার কথা স্মরণ করিয়ে সিদ্ধার্থের মধ্যে বৈরাগ্য সঞ্চার করতে চেয়েছেন গিরিশচন্দ্র সেখানে যেন নিজের ব্যক্তিজীবনের বেদনা ও অস্থিরতাকেই উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন। আত্মনিমগ্ন গিরিশের আন্তরিকতা সংগীতটিকে অতিরিক্ত তাৎপর্যে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

মূল সংগীতের শেষ দুটি স্তবক 'লাইট অব এশিয়া'য় :

But thou art to save, thine hour is nigh!
The sad world waiteth in its misery,
The blind world stumbleth on its round of pain.
Rise, Maya's Child! Wake! Slumber not again.
So sigh we passing over the silver string
To thee who Knowest not yet of earthly things
So say we; mocking, as we pass away
These lovely shadows wherewith thou dost play.

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল
কে জানে কেমন কি খেলা হল!
প্রবাহের বারি—রহিতে না পারি
যাই যাই কোথা—কূল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন
কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন?
যে আছ চেতন ঘুমায়ো না আর
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।

আর্নল্ডের গানে এই শরণাগতি অনুপস্থিত। জগতের সত্যপরিচয় উদ্ঘাটন করে বুদ্ধের অন্তরে বৈরাগ্য সঞ্চারই 'লাইট অব এশিয়া'র গানের লক্ষ্য, অপরপক্ষে গিরিশের গানে উদ্ঘাটিত হয়েছে সংসার-তাপ-দগ্ধ এক মানবাত্মার ক্রন্দন ও শরণাগতি। গিরিশ লব্ধ গুরুর পদাশ্রয়ে নিজের নিজের বিশ্বাস ও ভক্তিকেই উৎসারিত করেছেন।

'লাইট অব এশিয়া'য় সম্পূর্ণ গানটি সংযোজিত হয়েছে প্রমোদ কাননে নৃত্যগীত উপভোগরত সিদ্ধার্থ-গোপা ও অন্যান্য নরনারীর সমক্ষে। গানটি শুনেছেন একমাত্র সিদ্ধার্থ—অন্যের কাছে তা অশ্রুত। গিরিশ গানটি সংযোজিত করেছেন তিনটি স্তরে। দুটি স্তরে দেববালারা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন নাটকের চরিত্ররূপে। প্রথম স্তরে গানটি গীত হবার পর সিদ্ধার্থের কণ্ঠে শুনি :

(গোপার প্রতি) আহা প্রিয়ে কি মধুর গান
হর্ষ শোক সনে, মিলে প্রাণে প্রাণে
নব ভাব বিকাশে হৃদয়ে।

দ্বিতীয় অংশ গীত হওয়ার পর সিদ্ধার্থ বলেছেন :

কতদূর, কতদূর বিস্তার মেদিনী?
বদ্ধ আছি প্রমোদ ভবনে
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ বাহিরে।

তৃতীয় বা শেষ অংশটি গীত হয়েছে একমাত্র সিদ্ধার্থের উপস্থিতিতে—শূন্যচারিণী দেববালাগণের কণ্ঠে। এই অংশটি যেন সিদ্ধার্থের কামনাই সংগীতে রূপান্তরিত। সেই কামনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নাট্যকারেরই আকূতি।

বুদ্ধের অহিংসা, করুণা ও মৈত্রীই 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটকের কেন্দ্রীয় ভাব। বিম্বিসারের পূজাগৃহে উপস্থিতির আগে নাটকে একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে—সেখানে রাখাল-বালকের সঙ্গে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ এবং কথোপকথনের মধ্যে এই ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ বালককে প্রশ্ন করেছেন :

কেন তব বিরস বদন
শ্রমজল ঝরে ঝর ঝর
কি কারণ……
কথা কও
কেন তব চক্ষে বহে ধারা?

রাখাল—রাজার কি হুকুম হয়েছে জান? আমি গরীব ছাগল চরিয়ে খাই—আমার সব ছাগলগুলি তাঁকে দিতে হবে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে

পৌঁছতে পারি ভাল, না হলে আমার গর্দান যাবে। তাঁর বাড়ি পূজো—বলি দেবেন।…লাখ ছাগল বলি না দিলে তাঁর পূজা হবে না।

সিদ্ধার্থের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল ; লক্ষ প্রাণী বধ ? চল আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অতঃপর সেই বালকের সঙ্গে পুত্রহীন বিম্বিসারের যজ্ঞগৃহে সিদ্ধার্থের উপস্থিতি। পূজাগৃহে কালীমূর্তির উপস্থাপনা নাট্যকারের স্বকীয় পরিকল্পনা। বাংলাদেশে কালীমূর্তির সম্মুখে বলিদানের প্রচলিত রীতিটিই নাট্যকার গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় একই ঘটনা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনয়ের পাঁচবছর পরে প্রকাশিত তাঁর 'বিসর্জন' নাটকে। অপুত্রক গোবিন্দসিংহ-গুণবতীর পুত্রকামনায় কালীমূর্তির কাছে বলি প্রদানের জন্য অপর্ণার ছাগশিশু অপহরণ, পূজাগৃহে অপর্ণার উপস্থিতি এবং বলি-প্রদত্ত ছাগশিশুর জন্য অশ্রুপাত ইত্যাদি। 'বুদ্ধদেব-চরিতে'র ঘটনাসংস্থানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে 'বিসর্জনে' অপর্ণার অশ্রুপাতে গোবিন্দমাণিক্যের আকস্মিক পরিবর্তন এবং বলিবন্ধের আদেশ অন্য চরিত্রগুলির উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করেনি—বরং অন্য চরিত্রগুলি, এমন কি গুণবতীর সঙ্গেও রাজার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য করেছে—তিনি রাজকীয় শক্তির জোরেই সব বিরোধিতা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন। অপর পক্ষে সিদ্ধার্থের আবেদনে যুক্তির সঙ্গে মানবিক আবেদনের সংযোগ বিম্বিসারের রাজাদেশের পটভূমিকা এবং পরবর্তী ঘটনার স্বাভাবিকতা রক্ষা করেছে :

করি পুত্রের কামনা
কর জগন্মাতা উপাসনা
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী।
জগন্মাতা
পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি।…
যদি নৃপ কৃপা নাহি কর
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?
নির্দয় যে জন
দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি।…
মহাশয় জানিহ নিশ্চয়
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে
প্রাণদানে নাহিক শকতি
তবে কেন কর প্রাণনাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।…
কিন্তু যদি বলি বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী
দেহ মোরে বলিদান
বধ রাজা আমার জীবন
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।…
নরনাথ, কল্যাণ হইবে
পুত্র কোলে পাবে
এড়াইবে জীব হিংসা দায়।

এই করুণাঘন বুদ্ধমূর্তির প্রতিষ্ঠাই 'বুদ্ধদেব চরিত' রচনার মূল উদ্দেশ্য। জ্ঞানী বুদ্ধ নয়—প্রেমিক বুদ্ধই গিরিশ নাটকের নায়ক। বিম্বিসারের কাছে আত্মপরিচয় দানেও বুদ্ধের এই পরিচয় পরিস্ফুট :

শুন নরপতি,
হেরি জীবের দুর্গতি
আসিয়াছি জ্ঞান অন্বেষণে…
করো আশীর্বাদ
যেন পুরে মনোসাধ
পারি যেন হরিবারে জীবের সন্তাপ।

চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ বা শেষ দৃশ্যে সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভ। গিরিশচন্দ্র মূল বুদ্ধ কাহিনীতে ফিরেছেন এবং আর্নল্ডকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। এই দৃশ্যে নবজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের আনন্দিত সংলাপে নবলব্ধ বোধির স্বরূপ

উচ্চারিত হয়েছে :

পঞ্চভূত হয়ে সম্মিলন
জীবজ্ঞান করিছে সৃজন
জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব
বেদনা সন্তান তার।
সে তৃষ্ণায় যত কর পান
না হয় নির্বাণ
বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা আহুতি প্রদানে।
সযতনে জ্ঞানী করে তৃষ্ণা দূর ;
কর্মফলে সুখদুঃখ ভোগ
কর্মগত ভোগ সহে ধৈর্যে বাঁধি প্রাণ
নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত
ক্রমে তার হয় কর্মনাশ।
কর্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার ;
নির্বিকার উপাধিবিহীন
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়
দেবের দুর্লভ অতুল বৈভব
জরা মৃত্যুহীন
নির্বাণ রতন করে লাভ।

তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দস্যুদের উপর বুদ্ধের অহিংসাধর্মের প্রভাববিস্তার কাহিনী এবং কাশ্যপের সঙ্গে আলোচনায় বলিদানের অযৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য বুদ্ধজীবনের কাহিনী—শুদ্ধোধন ও গোপার সঙ্গে পুনর্মিলন, বুদ্ধের নিকট তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং পুত্র রাহুলের পিতৃধনপ্রাপ্তির কাহিনীও সংযোজিত হয়েছে শেষাংশে। তবে আর্নল্ড-বর্ণিত বুদ্ধজীবনের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গিরিশ বর্জন করেছেন এবং রাহুল, গোপা সমেত বুদ্ধের শিষ্যগণের দেশে দেশে ধর্মপ্রচারের সঙ্কল্পে নাটক পরিসমাপ্ত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র বুদ্ধকাহিনীকে বিকৃত করেননি—বুদ্ধের মহাজ্ঞানের সারমর্ম, বুদ্ধের মূল লক্ষ্য যে নির্বাণলাভ, সংক্ষেপে হলেও, যথাযথভাবেই বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন ধর্মের সত্যস্বরূপকে যেভাবে আবিষ্কার করেছে নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। জীবপ্রেমিক, করুণাসাগর, অহিংসামন্ত্রের উদ্গাতা বুদ্ধদেবই গিরিশের হৃদয় অধিকার করে আছেন। প্রসঙ্গত গিরিশচন্দ্রের বৌদ্ধধর্মভিত্তিক আর একটি নাটক 'অশোক'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। 'অশোক'-এ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গিরিশ-চিন্তার পরিচয় আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশে দেখি, হিমালয়-কন্দরস্থ বৌদ্ধআশ্রমে অকস্মাৎ প্রকৃতির ভাবান্তর বৌদ্ধভিক্ষুদের বিচলিত করেছে। উপগুপ্ত তাঁদের আশ্বস্ত করে দুর্নিমিত্তের কারণ বর্ণনা করেছেন :

"ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অবগত হয়েছি··· অচিরে যিনি পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হবেন, যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের পাত্র, অশোক নামে পুরুষপ্রবরকে মার ছলনা করবে।···অবিদ্যাপুত্র মারের স্বভাব অমঙ্গলসাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি প্রেমে। প্রেমই জগতের ভিত্তি। সেই প্রেমে অমঙ্গল হতে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত হয়।···মারের প্রলোভনের অস্ত্র —শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বাসনাপ্রভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসে মানবদেহ গঠিত। এ নিমিত্ত মানব···রূপরসাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়।···সেই প্রতারণাজনিত ঘোর অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়ায় যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। ক্রমে তার উপলব্ধি জন্মে যে, নির্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার তাড়নায় পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই, বাসনা বর্জনপূর্বক নির্বাণপন্থা অবলম্বন করে।···মার কর্তৃক প্রলোভিত হয়ে বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাস্পদ ভূপাল অচিরে নির্বাণলুব্ধচিত্ত হবেন।···আমরা যাতে জগতের মঙ্গলকার্যে বিরত থাকি সেই উপদেশ প্রদান করতেই মার এখানে আসছে।"

উপগুপ্ত মারকে বিতাড়িত করে অশোককে

"নির্বাণলুব্ধচিত্ত" করে তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে উপগুপ্তের উপদেশ : "যতদিন ধরণী অধর্মে না পরিপূর্ণ হবে ততদিন বৌদ্ধধর্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্মের সারমর্ম 'অহিংসা—সর্বভূতে আত্মজ্ঞান'। এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্মের লক্ষ্য—জগৎ-প্রেমে আত্মবিসর্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রচার হতে পারে কিন্তু যে ধর্ম ধর্মের এই সারমর্ম বর্জিত—সে ধর্ম ধর্ম নয়।"

পরিশেষে উপগুপ্ত তাঁর শিষ্যদের উৎসাহিত করেছেন জগৎ-ব্যাপী 'অহিংসা পরম ধর্ম' প্রচারে—নির্বাণলাভে নয়। 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকেও বৌদ্ধধর্মের এই বক্তব্যটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। নির্বাণলাভের চেয়ে আত্মভাববর্জিত মানবহিতৈষণার আদর্শকেই তিনি বুদ্ধজীবন ও ধর্মের সারমর্মরূপে উপস্থাপিত করেছেন, তাই মৈত্রী ও কল্যাণের প্রতীক, অহিংসামন্ত্রের উদ্গাতা ভগবান বুদ্ধই এই নাটকে সমুজ্জ্বল।

'চৈতন্যলীলা' যেমন বাঙালী সমাজে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করেছিল, 'বুদ্ধদেব-চরিত'ও তেমনি কিছু সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন গিরিশজীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, "৺শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বে এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেই বৎসর হইতেই তিনি তাঁহার বাটীতে ৺পূজার বলি বন্ধ করেন এবং বলির নিমিত্ত সদ্য-ক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়া দেন।"

এই নাটকের আবেদন সম্পর্কে একটি সংবাদ পাই অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়েরই কাছে। সেকালের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সদ্যসন্তানহারা চিকিৎসক 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এক সদ্যসন্তানহারা জননী বুদ্ধের আদেশে যে গৃহে কখনও মৃত্যু প্রবেশ করেনি সেই গৃহ থেকে কৃষ্ণতিল সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে বুদ্ধের কাছে নিবেদন করেছে :

"করিলাম অনেক সন্ধান
নাহি হেন স্থান!
প্রতি গৃহে প্রত্যেক কুটীরে
জিজ্ঞাসিনু জনে জনে
কেহ কভু মরে নাই যথা
নাহিক আবাস হেন।"

উত্তরে সিদ্ধার্থ বলেছেন :

"জেন সতি, কাল বলবান—
মৃত্যু হস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায়।"

বেদনার্ত স্ত্রীলোকটির উত্তর :

"পিতা, তব উপদেশে
ধৈর্যের বন্ধন দিব প্রাণে
আসি নাই পুত্র আশে
আসিয়াছি তব দরশনে
কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার।

শেষকথাগুলি শোনামাত্র চিকিৎসকটির রুদ্ধ শোকধারা প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হল। পরে তিনি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, "আপনি এই প্রাণের কথা কেমন করিয়া বাহির করিলেন? আমার এই দারুণ পুত্রশোকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়াছেন, অনেকরকম করিয়া বুঝাইয়াছেন কিন্তু 'নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার'—আমার প্রাণের এ কথা তো কেহ বুঝিতে পারে নাই।"

গিরিশচন্দ্র বুদ্ধজীবনের কাহিনী-উপাদান সংগ্রহ করেছেন এডুইন আর্নল্ডের রচনা থেকে কিন্তু বুদ্ধের জীবনভাষ্য রচনায় ও মানবজীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রস্ফুটনে তাঁর মৌলিকতা নাটকটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।*

---

* সহায়ক গ্রন্থ : স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী ; রবিদাস সেনের 'বুদ্ধদেব' ; 'লাইট অব এশিয়া' ; অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র'।

মানব মুক্তি—কোন্ পথে

শ্রীসুনীল সেনগুপ্ত
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা।

এক অদ্ভুত বিশ্বাসহীনতার যুগে আমরা বাস করছি। আমরা কেউ কারুর উপর আস্থা রাখতে পারছি না। ব্যক্তি ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না। সেখানে পুরোপুরি আমরা ডারউইনের মতবাদ মেনে জীবনসংগ্রামের প্রতিমুহূর্তের প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী। একে অপরকে ডিঙিয়ে কি করে আগেভাগে আরও কিছু ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করতে পারা যায় প্রতিমুহূর্তে সেই ধ্যান-জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করে না। সুযোগ পেলেই স্বার্থান্বেষীরা জাতপাত আর তথাকথিত ধর্মের লড়াই শুরু করে দেয়। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে না। যুদ্ধ যদি অবশ্যম্ভাবী হয় একদিন, তবে কে আগে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে তার জন্য চলছে প্রতিমুহূর্তের প্রস্তুতি। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি দুটি যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত। প্রত্যেক শিবিরেরই দাবী তারাই পাণ্ডবপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ অন্যায়-যুদ্ধের উস্কানিদাতা কৌরবদল। দুই যুধ্যমান শিবিরের মারণাস্ত্রের বহর দেখে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকেও যতদূর সম্ভব আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তৎপর হতে হয়। অথচ মজার কথা হল আণবিক যুদ্ধ যদি হয় তবে বিজেতা আর বিজিত বলে কেউ থাকবে না। গোটা পৃথিবীটাই তার এতদিনের সভ্যতাসহ অবলুপ্ত হবে। বড় ছোট প্রায় সব রাষ্ট্রেরই বাজেটের একটা সিংহভাগ বরাদ্দ করে রাখতে হয় প্রতিরক্ষা খাতে। অথচ তৃতীয় বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি লোক আজও অর্ধাহারে কি অনাহারে দিন কাটায়।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক দূরত্ব মুছে গেছে। গোটা পৃথিবীটা একটা চক্কর মেরে আসতে একালের জাম্বোজেট বিমানের একদিনও সময় লাগবে না।

এই অর্থে আজ আমরা এক পৃথিবীতে বাস করছি। অথচ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বৈষম্য আজও কি অপরিসীম। কেবল কি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈষম্য? সামাজিক কাঠামোয় মানুষে মানুষে বিভেদ আর বৈষম্যের অন্ত নেই। ধনী দরিদ্র, শোষক শোষিত, সুবিধাভোগী সুবিধাবঞ্চিত, শিক্ষিত অশিক্ষিত,—এমনি সব নানা শ্রেণীতে মনুষ্যসমাজ বিভক্ত। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ আর বিদ্বেষের সম্পর্ক। সেই কতকাল আগে সম্ভবতঃ ভিক্টর হুগো বলেছিলেন—আমরা এখনও মানুষ হইনি, মনুষ্যপদ-প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। আজও আমাদের সেই প্রার্থিপদ ঘুচল না।

অথচ মানবতার কথা, সার্বিক মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে মানুষের সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন তো মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই দেখে আসছে।

মানবতাবাদের কথা বললেই আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা প্রথমেই পাশ্চাত্যের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত। মানবতাবাদের উন্মেষে পাশ্চাত্যের অবদান ও তার আজকের চেহারাটার উপর তাই একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব তখন যীশুখ্রীষ্টের মহান ধর্মকে আশ্রয় করে ইউরোপ তার রাজনীতি অর্থনীতি স্থির করছে। ধর্মকে আশ্রয় করেই রাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলা হল। খ্রীষ্টধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বে চার্চ এল। রাজাকেও তখন চার্চের নির্দেশের কাছে মাথা নোয়াতে

হচ্ছে। চার্চের সঙ্গে রাজার বিরোধের সূত্রপাত হল। কালে একই খ্রীষ্টধর্ম—যার মূলকথা সার্বিক মানবপ্রেম, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন—সেই ধর্মের মুখপাত্ররূপে এক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব সমস্ত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা মানতে চাইলেন না। প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক দুই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল। দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ একসময় সর্বনাশা যুদ্ধ ডেকে নিয়ে এল। সে যুদ্ধ চলল থেকে থেকে একটানা ত্রিশ বছর ধরে। ধর্মভিত্তিক মনুষ্যপ্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদের উপর এ ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হল।

মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হল। বস্তুজগতের রহস্যের দ্বার এক এক করে মানুষের কাছে উন্মুক্ত হতে লাগল। বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে উঠল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দানকে গ্রহণ করে মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিধানের স্বপ্ন দেখলেন যুক্তিবাদী মননশীল মানুষেরা। মানুষের পৃথিবীকেই স্বর্গ বানাবার কথা তাঁরা বললেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান রিপাবলিক আদর্শকে ভিত্তি করে যে মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির পথে সেই মানবতাবাদের ব্যাপ্তি ঘটল। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ইউরোপ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করল। বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে স্বর্গের ঈশ্বরের স্থলে মানুষ এল।

দুশবছরের উপর ধরে বিজ্ঞান-ভিত্তিক মানবতাবাদের অব্যাহত গতির ধারা থমকে দাঁড়াল প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে। মধ্যযুগে ত্রিশ বছরের যুদ্ধে ঈশ্বরে বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ এসে মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিটা নড়বড়ে করে দিল। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মানবতাবাদ বড় রকমের ধাক্কা খেল। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে জার্মানীতে হিটলারের একনায়কত্বে নাজিবাদ কায়েম হল। ওদিকে ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদ ভিত গাড়ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হল।

ধ্বংসের বিভীষিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধকে বহু যোজন অতিক্রম করে গেল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার না করে মানুষের ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হল। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে দুরপনেয় কলংকের কালিমা লেপন করে হিরোসিমাতে আণবিক বোমা পড়ল। আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস আগেই চলে গিয়েছিল এবং বিজ্ঞানই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষের উপর বিশ্বাসও অবলুপ্ত হল। মানুষ নিজেকে ঈশ্বর-সৃষ্ট না ভেবে দানব-সৃষ্ট বলে ভাবতে শুরু করল। ধর্ম, নীতিবোধ অর্থহীন প্রলাপ বলে উপেক্ষিত হল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি সত্তরের দশকের গোড়ায় বললেন,—"আজ আমরা সমস্ত মনুষ্যজাতিকে সঙ্গতভাবেই দোষারোপ করতে পারি নৈতিকতার দৈন্যের জন্য। যখন প্রযুক্তিবিদ্যা জোরকদমে এগিয়ে চলেছে তখন মানুষের নৈতিকতা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে মনুষ্য-সমাজে নৈতিকতার দৈন্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।" জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে স্বরূপ-বিরোধিতার পথে বাইরের উপকরণে ঠাসা নিছক ভোগমুখী জীবনে আজ ইউরোপ আমেরিকার ধনীদেশগুলিতেও মানুষের জীবনে নৈরাশ্য আর অশান্তির অভিশাপ। এই ভোগ-সর্বস্ব জীবনদর্শনের অনৈতিকতার ঢেউ আজ এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকেও প্রতিমুহূর্তে কলুষিত করছে। মানবতাবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরাও এই পরিবেশে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আর যেন আস্থা রাখতে পারছেন না। সর্বত্র একটা হতাশার পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে। সর্বোপরি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মাথার উপর

ঝুলছে আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকার খাঁড়া।

ভয়শূন্য নতুন পৃথিবীর সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে, মানুষের সার্থক মুক্তি কোন্ পথে আসবে—সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষের মনে আজ এই প্রশ্ন। শিল্পবিপ্লবের পথে শ্রমিক-শ্রেণীর উপর যে শোষণ শুরু হল তার প্রতিকারের পথ খুঁজতে মনীষী কার্ল মার্কস শ্রেণীসংগ্রামের পথে প্রোলেতারিয়েৎ বা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। এই পথেই একদিন পুরোপুরি শোষণমুক্ত কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখলেন। মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লেনিন রুশিয়ায় জারশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লব আনলেন। রুশ বিপ্লব পৃথিবীর সমস্ত শোষিত মানুষের মনে নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা নিয়ে এল। চীনে মাও-সে-তুংয়ের নেতৃত্বে বিপ্লবের পথে কমিউনিস্ট দল ক্ষমতা দখল করল। ইউরোপের আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হল। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার নিঃসন্দেহে উন্নতি হলেও মানুষের সার্বিক মুক্তি কিন্তু এল না। সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ায় আজ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষেরা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য ক্রমশঃই সোচ্চার হয়ে উঠছেন। নতুনরূপে সেখানে সুবিধাভোগী শ্রেণী, যেমন ব্যুরোক্রাসির অস্তিত্বের কথা স্বয়ং ক্রুশ্চভকেও স্বীকার করতে হয়েছিল। সমাজজীবনে দুর্নীতি ও চারিত্রিক বিচ্যুতি নিয়েও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এবং পার্টিগুলিকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শোনা যায়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা গড়ে উঠলেও টিঁকল না। দুই বৃহৎ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সীমানা বরাবর এখন মোতায়েন থাকে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত মহাসতর্ক সামরিক বাহিনী। মার্ক্সীয় নীতিও পারল না পৃথিবীকে ভয়শূন্য করতে।

মানবমুক্তি তাহলে আসবে কোন্ পথে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনৈতিক ব্যবহারে শঙ্কিত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্ বার্ট্রাণ্ড রাসেল বললেন, "কি উপায় অবলম্বনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাবে বিজ্ঞান মানুষকে সেই উপায়ের সন্ধান দিতে পারে মাত্র। যেকথা বিজ্ঞান বলতে পারে না তা হল কেন একটি বিশেষ লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে হবে অন্য আর একটিকে পরিহার করে।" রাসেলের মতে উপায় সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যতই উন্মেষ ঘটছে লক্ষ্য সম্বন্ধে বুদ্ধির দীনতা ততই প্রকট হচ্ছে। উপায় এবং লক্ষ্য এ দুয়ের জ্ঞানের সমতা না ঘটাতে পারলে মানুষের সভ্যতা ধ্বংসের পথে চলবে। বিজ্ঞানী ও মনীষী আইনস্টাইন বললেন,—"বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে জড়-প্রকৃতির ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে যা আছে বা ঘটছে সেই জ্ঞান, যা হওয়া উচিত সেই বিষয়ক জ্ঞানের দুয়ারকে সরাসরি খুলে দেয় না।" আইনস্টাইনের মতে জীবনের এই ঔচিত্যবোধের উৎসসন্ধানে যেতে হবে ধর্মের কাছে। সুস্পষ্টভাবে আইনস্টাইন বললেন,—"ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান খোঁড়া, আবার বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ধর্ম অন্ধ।" ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর 'সার্ভাইভিং দি ফিউচার' গ্রন্থে আরও বললেন,—"বিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রযুক্তিবিদ্যা বিরাট শক্তিশালী ও কার্যকরী সব যন্ত্র তৈরী করছে। অথচ এই সমস্ত যন্ত্রকে ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্যে ব্যবহার করার জন্য যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বা মানসিকতা কিংবা সততার প্রয়োজন তা আজও আমরা আহরণ করতে পারিনি। ফলে আমরা সঙ্গত কারণেই আজ শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার সৃষ্ট এইসব যন্ত্রপাতি আমরা নিজেদের ধ্বংসের কাজেই হয়তো ব্যবহার করব। আজ

মনুষ্যসমাজে আর একজন সক্রেটিসের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

আধুনিক কালের এই সক্রেটিসের ভূমিকা কে গ্রহণ করবেন? এই শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশ্বের আর এক মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁর রচিত বিবেকানন্দ জীবনীগ্রন্থের সমাপ্তি টানলেন রোলাঁ এই বলে, —"অন্যেরা যখন নিজেদের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন, বিবেকানন্দ সমস্ত মনুষ্যজাতির উদ্দেশ্যে বলেন…আমার ইউরোপের সাথীগণ, আমি তোমাদের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে উত্থিত আগামী দিনের ধ্বনি শুনিয়েছি, যে ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে এশিয়া থেকে।…তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। সে আমাদের জন্য কাজ করছে। আমরা তার জন্য কাজ করছি। মানবাত্মার দুই অংশ হল এশিয়া ও ইউরোপ। মানুষ এখনও পূর্ণ হয়ে ওঠেনি, একদিন সে হবে।" মনুষ্যজাতির উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দের এই বাণী, যা নববৈদান্তিক মানবতাবাদ বলে খ্যাত, তার মূল কথা বা বৈশিষ্ট্যের দিকে একবার চোখ বোলালেই মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁর এই উক্তির সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এই:

এক—মানুষের সামাজিক, আর্থিক, এবং আত্মিক,—এককথায় সার্বিক মুক্তিই এই নব বৈদান্তিক মানবতাবাদের লক্ষ্য।

দুই—বিবেকানন্দের ধ্যান স্বর্গে বিচরণকারী কোন দেবতা নয়। তাঁর ধ্যানের বিষয়বস্তু এই ধরাতলে বিচরণকারী মানুষরূপধারী ঈশ্বর। মানুষের সেবাতেই ভগবানের পূজা।

তিন—যে মানুষকে ঘিরে বিবেকানন্দ তাঁর নববৈদান্তিক মানবতাবাদকে প্রচার করলেন সে মানুষ পূর্ণতার পথযাত্রী অনন্ত সম্ভাবনার অধিকারী। সসীম দেহে অসীম চৈতন্যের প্রতিভূ। তাঁর জীবচেতনায় সুপ্ত রয়েছে ব্রহ্মচেতনা।

বিবেকানন্দের এই নববৈদান্তিক আদর্শ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ মানবতাবাদ। কোন কুসংস্কার, গোঁড়ামী, বা অন্ধবিশ্বাসের ঠাঁই নেই এতে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীয় জীবন-সাধনায় পরীক্ষানিরীক্ষা করে যে সর্বকালীন ধর্ম ও সমন্বয়কে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই পরীক্ষিত আধ্যাত্মিক সত্যকে ভিত্তি করেই বিবেকানন্দের এই মানব-সেবার নীতি—ব্যবহারিক বেদান্ত ধর্ম। বিজ্ঞানী-বৈদান্তিক বিবেকানন্দের মতে দুচোখ খোলা রেখে বস্তু-জগতের রহস্য আবিষ্কারের সাধনাকে বলে 'সায়েন্স' বা বিজ্ঞান। আর অন্তর্জগতের অসীম রহস্যের উদ্‌ঘাটনের সাধনাকে,—যে সাধনার পথে অন্নময় সত্তা থেকে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় সত্তা ছাড়িয়ে একদিন আনন্দময় সত্তাকেও উত্তরণ করে মানুষকে তার স্ব-স্বরূপে বা ব্রহ্মত্বে উন্নীত করে,—তাকেই বলা হয় বেদ। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় ধর্ম মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র এই অনন্ত সম্ভাবনার উপলব্ধির মাধ্যমেই মানুষে মানুষে বিভেদ, বৈষম্য, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসার অবসান ঘটতে পারে। জীববোধের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ববোধে বা আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ মানুষ সমস্ত অন্তর দিয়ে বলতে পারে "এ বিশ্ব আমার, আমি এই বিশ্বের।"

এই পূর্ণ মানুষের হাতেই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিচালন-ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কেবল সেক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কার সৃষ্টি ও সভ্যতা ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত হবে। মানুষ তখন ভয়শূন্য হয়ে বিজ্ঞানের সহায়তায় জড়প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উদার মুক্তির আনন্দ-স্বাদ লাভ করবে। বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক যে মানবতাবাদের স্বপ্ন এ পৃথিবীর মানুষ এতদিন ধরে দেখে আসছে তার সার্থক রূপায়ণ হবে সেদিনই। এই পূর্ণতার সাধনাই একালের মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে পরিগণিত হোক।

প্রার্থনা

শ্রীমতী গৌরী রায় চৌধুরী
শিক্ষিকা এবং কবি।

মাগো! আমায় দাও সাজিয়ে
কোলের শিশুর বেশে—
তোর গলাটি জড়িয়ে ধরি দুলে দুলে হেসে!
চারদিকে মোর পাগল যত
জড়িয়ে ধরে জালের মতো,
ছাড়াতে যাই যতই, তারা
ধরে আবার এসে—
তোর দু-বাহু বাড়িয়ে দে মা,
ধর মা ভালবেসে!

জ্ঞানী আমি বড় আমি আর সবারই মতো,
দায়-দায়িত্ব কর্মভারের বোঝা বয়ে শত;
হাঁপিয়ে ওঠে এ-প্রাণ আমার,
ছট্‌ফটিয়ে উঠি আবার,
মরীচিকা হোস্‌নে গো-মা
স্বর্গ-দেবীর মতো—
আয়-মা, আমার প্রাণের সাজে,
আসল মায়ের মতো!

দীপ জ্বালিয়ে বসে আছি প্রাণের দেউল 'পরে,
আয় মা আমার মাটির ঘরে, হৃদয় দুয়ার ধ'রে;
ব্যাকুলতা ভরা প্রাণে,
মন্ত্র-তন্ত্র নাহি মানে,
আকুল হিয়ার ব্যগ্রতা মোর
উথাল তোরই তরে—
এইটুকুনি নিয়েই মাগো
আয় মা বুকটি জুড়ে!

সাজতে চাই না জ্ঞানী আমি,
অহংকারকে কাড়ো—
বড় আমি চাই না হতে,
নকল সাজটি হরো!
'বড়ো' নামের কঠিন কথা,
বাজায় বুকে বড়ই ব্যথা—
অভিমানের সাজটি আমার
খুলে তুমি ধর,
তোমার কোলের গন্ধ মেখে
চাই যে হতে বড়ো!

দুনিয়াটা স্বেচ্ছাচারী! কেউ মানে না কাকে—
তুই তো গো-মা, জ্ঞান হরেছিস্
অবিশ্বাসীর ঝাঁকে!
আড়ালে তুই হাসিস্ ব'সে,
মরছে ওরা আপন দোষে,
ডেকে নে মা কোলে তুলে
ফুটিয়ে মহিমাকে—
আঁধার জগৎ, অন্ধ ওরা,
ভুলেছে তাই মা-কে!

'দিক্-বসনী' তুই যে গো-মা,
অন্ধ আমি, তাই—
দেউল ধরে কেঁদে ফিরি,
মা-যে দেখি নাই!
জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে ধরা—
দে-মা দেখা মা-এর পারা,
স্বর্গবাসিনি! ভালবাসায়
আয় তোরে ভোলাই—
তোর নামে মা মুক্তি কিনে
আয় গো ভেসে যাই॥

সুখী হও

(অষ্টাবক্র সংহিতা হইতে)

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

দেহকে পৃথক্ রাখি, আত্মায় বিশ্রাম যদি লভ
এখনই সুখ শান্তি, বন্ধমুক্তি হইবে সম্ভব। ১।৪

জাতি বা আশ্রম নাই, ইন্দ্রিয়ের অগোচর তুমি
নিঃসঙ্গ নিরাকার, বিশ্বসাক্ষী নিত্য-সুখ ভূমি। ১।৫

আমি কর্তা এই বুদ্ধি ক্রূর কাল সর্পের দংশন
সুখী হও 'কর্তা নই'—জ্ঞান সুধা করিয়া সেবন। ১।৮

বিশুদ্ধ চৈতন্য আমি—এই বোধ অগ্নির সমান
অজ্ঞান-গহন দহি নাশে শোক করে সুখ দান। ১।৯

যাহাতে ভাসিছে বিশ্ব রজ্জুতে যেমন সর্প দেখি
তুমি সেই পরানন্দ চৈতন্যস্বরূপ রহ সুখী। ১।১০

দেহ-অভিমান পাশে বদ্ধ আছ বহুকাল ধরি
সুখী হও জ্ঞান খড়্গে সেই পাশ বৎস ছিন্ন করি। ১।১৪

যদি দেহং পৃথক্কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥১-৪
ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥ ১-৫
অহং কর্তেত্যহংমানমহা কৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহংকর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥ ১-৮
একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব॥ ১-৯
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দপরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখং চর॥ ১-১০
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব॥ ১-১৪

বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন জীবনদর্শন ঃ একটি নূতন বেদান্ত

ডক্টর এ. পি. ন্যাচুক-দানিলচুক

সোভিয়েত রাশিয়ায় বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ—মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। সম্প্রতি ভারতসফররত ডঃ দানিলচুক গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪ বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে সুন্দর বাংলায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, বর্তমান নিবন্ধটি তারই সংক্ষেপিত রূপ।

আমায় আমন্ত্রণের জন্য আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে এখানে কথা বলতে আগ্রহী, কারণ ব্যক্তিগতভাবে ভারতবর্ষকে ভালবাসি, বিশেষ করে বলতে পারি আমি বিবেকানন্দ-ভক্ত। তাছাড়া আমি সারাজীবন ধরে রবীন্দ্র-চর্চা করছি। ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বিবেকানন্দ আর রামকৃষ্ণদেবের মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের উপর রুশ ভাষায় একটি বই পড়ি, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ, তা ছিল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগে। সেই সময় থেকে ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথের গোরা, গীতাঞ্জলি কিছুটা পড়ি, সেই সময়ে ঠিক করি বাংলা শিখব। কেন আমি বাংলা ভাষা শিখেছি? বিশেষ কারণঃ আমি বাল্যকাল থেকে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ মূল বাংলায় অনেক ভাল লিখেছেন। কোন অনুবাদে কোন শিল্পীর ঠিক রস-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় না।

এখন আমি বলব কেন আমাদের দেশে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজন মনীষীর প্রতি এত আগ্রহ রয়েছে। এটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কি রকম? আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে বহু যুগ ধরে একটা টান ছিল। এর প্রমাণ যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে এসেছেন একজন রুশ, নিকেতিন। উনি বাণিজ্য করবার জন্য আসেননি। উনি জ্ঞান লাভের জন্য, কিছু খবর নেওয়ার জন্য এসেছিলেন। রুশরা সব সময়ে এবং এখনও মনে করে ভারতবর্ষ গোড়া থেকেই একটি আধ্যাত্মিক দেশ; সেজন্য ভারতবর্ষের প্রতি সব সময়ে একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। তারপর অনেকেই বোধ হয় শুনেছেন যে কলকাতায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর একজন রুশ এসেছিলেন, গ্যাবাস্কিন। তিনি প্রথমে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্থানী চর্চা শুরু করেছিলেন। এমন কি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে কিছু অনুবাদ বাংলা থেকে রুশীতে করেছিলেন। পরে উনি দেশে ফিরে গিয়ে প্রথমে লণ্ডনে হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন। তখন ছিল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছে ওঁর একটি বই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ওপরে প্রথম বই 'ইণ্ডিয়া' বেরল। আর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছে ভগবদ্গীতার প্রথম অনুবাদ, অবশ্য ইংরেজী থেকে। আর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছে 'শকুন্তলম্'-এর প্রথম অনুবাদ।

নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন আমাদের মহান কবি পুশ্‌কিনের নাম। পুশ্‌কিনের সমসাময়িক এক ঐতিহাসিক কবি ছিলেন কালামজী। কালামজী যে অনুবাদ করেছেন এবং একটি ছোট ভূমিকা লিখেছেন, তাতে লিখেছেন—"কেবল ইউরোপের মানুষই সৃজনশীল মনের অধিকারী নন। পৃথিবীর যে কোন দেশেই এই সৃষ্টিশীল মনের দেখা পাওয়া যেতে পারে—মানুষ সর্বত্রই মানুষ—সর্বত্রই তার অন্তঃকরণ সংবেদনশীল।"

সংস্কৃত ভাষায় রচিত কালিদাসের 'শকুন্তলম্' নাটক পড়তে পড়তে ঠিক এই কথাটিই আমার মনে এল। এই নাটকে আমরা পাই ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর চরম উৎকর্ষ। বসন্ত কালের প্রশান্ত সন্ধ্যার মতো অনির্বচনীয়, স্নিগ্ধ স্নেহসুধা এবং অনুকরণীয় আশ্চর্য প্রকৃতি, এক কথায় একটি মহৎ শিল্প সৃষ্টি। তাছাড়া শকুন্তলা প্রাচীন ভারতের জনজীবনের একটি ছবি—একটি সৌন্দর্যময়ী আলেখ্য। যেমন আমরা পাই হোমারের মহাকাব্যে প্রাচীন গ্রীসের চিত্র। আমার কাছে কালিদাসের মাহাত্ম্য হোমারের মাহাত্ম্যের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। হোমার এবং কালিদাস দুজনেই প্রকৃতির হাত থেকে তুলি আহরণ করে জগৎ ও জীবনের ছবি এঁকেছেন।

ঐ সময়ে ঋগ্বেদ থেকে একটি অংশ, মহাভারত, রামায়ণ, তারপর ভগবদ্গীতার অনেক নতুন অনুবাদ সংস্কৃত থেকে বেরিয়েছে। আর বিশেষত প্রচার হয়েছে সংস্কৃত ও পালি ভাষার জ্ঞান। আমাদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, মিনায়েলের শিষ্য—ভারতবর্ষে ওঁর নাম খুব সুপরিচিত, সর্বস্কয়। সর্বস্কয় একটি কথা বলেছেন, যা আপনাদের বুঝিয়ে দেবে আমাদের একটি পদ্ধতি। কারণ ঐ সময় কজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যাঁরা মনে করেন যে, এসব সংস্কৃত ভাষা আর ভারতীয় সংস্কৃতি শুধুমাত্র ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চর্চা করা যায়। সর্বস্কয় নিজে ভারতবর্ষে আসেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এবং এখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন। ওঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। পরে উনি রুশ ও ইংরেজী ভাষায় গবেষণামূলক অনেক বই লিখেছেন। কিন্তু প্রথমে উনি নিজে পাশ্চাত্য দেশে অর্থাৎ বিলেত ও জার্মানীতে সংস্কৃত চর্চা করতে গিয়েছিলেন, কারণ সংস্কৃত চর্চা জার্মানীতে খুব উচ্চ ধরনের ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষেই উনি বিশেষভাবে জেনেছেন এবং এই উপলক্ষে এক প্রবন্ধে লিখেছেন—"ইউরোপের বেশ কিছু বিজ্ঞানী ভারতীয় পণ্ডিতদের জ্ঞান-চর্চার পদ্ধতিকে তাচ্ছিল্য করে নিজেদের প্রভূত ক্ষতি করেছেন।"

তারপর এল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—বিবেকানন্দের আমেরিকায় যাত্রা। বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগোতে প্রথম বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁর অনেক বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। অবিলম্বে রুশ দেশে কিছু কিছু বক্তৃতার অনুবাদ করা হল। টলস্টয়ের ডায়েরীতে পাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উনি লিখেছেন যে বিবেকানন্দের রাজযোগ চমৎকার গ্রন্থ।

১৯০৯, '১০, '১১, '১২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের রাজযোগ, ভক্তিযোগ বেরিয়েছে রুশ ভাষায়। আমি বাল্যকালে রোমাঁ রোলাঁর বই-এর রুশ অনুবাদ পড়েছি, পরে ইংরেজী পেলাম। আর বিবেকানন্দের বাণী শুধু রাশিয়াতে নয়, সারা বিশ্বে প্রচারিত। রামকৃষ্ণদেবের প্রতিও মানুষের শ্রদ্ধা ছিল। তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-র অনুবাদ হল রুশ ভাষায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের একটু পরে। বিবেকানন্দের মহান বাণীও রুশদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং আর একটা কথা, বিবেকানন্দের রচনাতেই আসল ভারতের কথা আমরা পাই। যাঁরা আগে ভারতীয় দর্শন প্রচার করেছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষকে পুরোপুরি ঠিক প্রচার করেননি যা আমার ও অনেকের ধারণা। কিন্তু বিবেকানন্দের রচনায় প্রকৃত ভারতীয় দর্শনের সন্ধান পাই।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, যোগশাস্ত্রের প্রতি সারা পৃথিবীতে, রুশ দেশেও এখনও খুব আগ্রহ আছে। রাজযোগের প্রতিও আগ্রহ রয়েছে উচ্চ শিক্ষিতদের। আগেও আমাদের দেশে বিবেকানন্দের বইয়ের খুব চাহিদা ছিল

বিশেষভাবে তাঁর রাজযোগের, যেখানে পতঞ্জলির সূত্র অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ আছে। আর একটা কারণ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গ্রীক খ্রীষ্টান ধর্ম। কিন্তু এই খ্রীষ্ট ধর্মের কয়েকটি অংশ ঐ সময়ে রাশিয়ানদের প্রগতির খুব পরিপন্থী ছিল। যেমন উক্ত মতানুযায়ী মানুষের ভিতরে গোড়া থেকে একটি আদি পাপ আছে, এটা মানুষকে দুর্বল করে। অথচ বিবেকানন্দের বাণী সবসময়ে মানুষকে জানায় যে, মানুষের ভিতরে পরমাত্মা আছে ও এটাই মানুষকে বিশেষ শক্তি দেয়, একটি বিশেষ উৎসাহ দেয়। আমি নিজে বলতে পারি যে, যখন কোন দুঃখ মনে আসে, বিবেকানন্দের বই পড়ে কিছুটা আশা আসে, উৎসাহ জাগে। কিন্তু খ্রীষ্ট-ধর্মগ্রন্থ পড়লে তা হয় না। খ্রীষ্ট ধর্মের বাণী—'সব সহ্য করা উচিত', এটা মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। এই কারণে অনেকের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি একটু হতাশ মনোভাব ছিল সেই সময়। বিবেকানন্দ আসেন তাঁর নূতন বাণী নিয়ে। বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভারতীয় চিন্তাবিদ্ যেমন রাশিয়াতে তেমনি জার্মানী ও ফরাসী দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিবেকানন্দ-প্রচারিত নব বেদান্তে আমরা পাই আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি। বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এত অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে জানাব!

পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আসেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি খুব আগ্রহ শুধু রাশিয়াতে নয়, সারা পৃথিবীতে রয়েছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজের আগে ম্যাকমিলানের প্রকাশিত গীতাঞ্জলির অনুবাদ বেরিয়েছে রাশিয়ায়, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে অনুবাদ করেছেন একজন রুশ সাংবাদিক গিয়োর্কি। উনি লণ্ডনে ঐ সময়ে বাস করতেন, রাশিয়ার এক পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন এবং উনি ওঁর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের চারণ কবি, ভালবাসার চারণ কবি, মহাবিশ্বদর্শনের আনন্দের কবি। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কবি ও বিশ্বকবি। তাঁর কাব্য তাঁর ভাবধারা আমাদের কাছেও সহজে বোধগম্য। রবীন্দ্রনাথের নিজের সুরে রচিত গানগুলি, লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে, গ্রামে গঞ্জে গাওয়া হচ্ছে।" পরিশেষে লেখক লিখেছিলেন—"পৃথিবী যেন এক অন্ধকূপ, সেই অন্ধকূপের বাইরে আছে সুন্দর এক জগৎ, যেখানে এখন প্রভাতের আলো, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে এই অনুভূতি হয়।" বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন জীবন-দর্শন, একটি নূতন বেদান্ত আর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন জীবনের রস। কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রধান ভূমিকা নিশ্চয়ই একজন কবি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ এত বড় বিশ্বকবি, তাঁর শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ওঁর প্রতি আমার আগ্রহের কারণ। লেনিন আমাদের টলস্টয়ের ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে উনি বলেছেন এ-কথাও যে, টলস্টয় আমাদের জাতীয় সম্পদ। টলস্টয় তাঁর শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বে বড়। রবীন্দ্রনাথও তাই। পরে রবীন্দ্রনাথের যেসব রচনা ঐ সময়ে লণ্ডনে ইংরেজীতে বের হল, তা অবিলম্বে রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

সবশেষে বলি, এখনও রাশিয়াতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রচর্চা হচ্ছে। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শিক্ষা

ডক্টর জগদিন্দ্র মণ্ডল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

অন্ধজনে দেহ আলো। কি করে আলো দেবে? অন্ধ যে সে তো পৃথিবীর রূপ দেখতে পায় না। সে তো দেখতে পায় না রামধনুরঙ—নীল আকাশের দ্যুতি; আকাশের তারাদের মিটিমিটি চাওয়া। তবু অন্ধজন কি একেবারেই অন্ধ? চর্মচক্ষু না থাকলেও সে কি চক্ষুষ্মান হতে পারে না? চোখের মধ্য দিয়ে না দেখে সে কি মনের মধ্য দিয়ে দেখতে পায় না? বুঝতে পারে না? তার অনুভব অনুভূতি অন্য চিহ্ন, অন্য লিপি-খামে মনের দোরে পৌঁছে যায় না? সেই চিহ্নের জগতেই অন্ধজন মনের ভাষা খুঁজে নেয়, জগৎকে জানে। বোধের ভূমি যদি উষর না হয়, একটি ইন্দ্রিয়ের বিরূপতা জগৎকে জানায়, জগৎকে বোঝায় বাধা হয় না। কিন্তু যদি বোধের ভূমি, অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকাণ্ডে বিকলতা থাকে, মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় জন্ম-সূত্রেই অপ্রতুলতা বা বিকলতা থেকে যায়, তাহলে জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন চক্ষু, কর্ণ ঠিক থাকলেও কোন কিছু সঠিক বোধে দীপ্ত হয় না। চোখ দিয়ে দেখবে শুধু, কান দিয়ে শুনবে শুধু—কিন্তু কিছু সঠিক বোধে ধরা দেবে না। জানার সীমারেখার বাইরে সে বস্তু থেকে যাবে।

জড়বুদ্ধিগ্রস্ত এমনি বহু শিশু—যাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সুস্থ থাকা সত্ত্বেও বোধের জগতে বিরাট ফাঁক থেকে যায়, কেননা তাদের মস্তিষ্ক, বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্ক দুর্বল ও ক্ষীণ।

এই দুর্বলতা কেন হয়? মস্তিষ্কের এই বিকলতা কেন? জড়বুদ্ধিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা কত? জড়বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে, মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞায় কাদের বলা হবে? জড়বুদ্ধিদের আমরা কী ভাবে সমাজের সঙ্গে একাত্ম করে তুলে তাদের জীবনকে সীমিত সার্থকতায় ভরে তুলতে পারব? এইসব প্রশ্ন আজ বৈজ্ঞানিকদের ভাবিয়ে তুলেছে—পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটন করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্কের (I.Q.) মাপকাঠিতেই জড়বুদ্ধিদের চিহ্নিত করা হয়। কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জড়-বুদ্ধিগ্রস্তদের মধ্যে যেটা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়, তার মধ্যে আছে—নূতন নূতন পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতার অভাব, কোন কিছু দেখে বা শুনে তাকে সঠিকভাবে বুঝার ক্ষমতার অভাব, কতকগুলি সমিল ঘটনা বা বস্তু থেকে একটা সাধারণ ধারণা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতার অভাব (generalisation), এককথায় বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতার অভাব, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষমতার অভাব। প্রত্যক্ষণ, স্মরণ-মননের ক্ষমতা কম থাকাকেই আমরা বুদ্ধির অভাব বলে বুঝে থাকি। এই বুদ্ধি-শক্তি জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিককে বুঝতে ও তার সঙ্গে অভিযোজনে সহায়তা করে। এই বুদ্ধির পীঠস্থান শারীরিক দিক থেকে মস্তিষ্ক, বিশেষভাবে গুরুমস্তিষ্ক। ইন্দ্রিয়-আহৃত ও স্নায়ুবাহিত তাড়ন প্রবাহ (impulse) মস্তিষ্কে পৌঁছুলে সেখানে যে আন্দোলন ও উদ্দীপনের সৃষ্টি করে তার বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের মধ্য দিয়েই সেই বস্তু বা ব্যক্তি বা অবস্থার অর্থ প্রস্ফুটিত হয়। এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার পীঠস্থান হল গুরুমস্তিষ্ক। এর ক্ষমতা, পুষ্টতা ও ক্ষীণতার উপর নির্ভর করবে বোধ ও বুদ্ধিশক্তির সীমারেখা।

সকলের বুদ্ধি সমান নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক বণ্টন রীতি অনুযায়ী দেখা যায় বেশির ভাগ ব্যক্তির বুদ্ধি স্বাভাবিক, অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ব্যক্তির বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে বেশি, আবার সেই আনুপাতিক কিছু সংখ্যক ব্যক্তির বুদ্ধি স্বাভাবিক থেকে কম ও বেশ কম। এই বেশ কম বুদ্ধির ব্যক্তিদের আমরা বলে থাকি জড়বুদ্ধিগ্রস্ত।

১৮৯৪ থেকে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জড়-বুদ্ধিগ্রস্ত ব্যক্তি একশ জনের মধ্যে কতজন হতে পারে এ নিয়ে অনেক সমীক্ষা হয়েছে—এইসব সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে ওয়ালিন দেখিয়েছেন যে, শতকরা পাঁচ থেকে ১৩ জন জড়বুদ্ধিগ্রস্ত হতে পারে। এই তারতম্যের কারণ হিসাবে বুদ্ধ্যঙ্কের মাপকাঠিতে জড়বুদ্ধির সীমারেখা ধরার হেরফেরকে অনেক সময় ধরা হয়েছে। ফারবার ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সমীক্ষায় (আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশের) দেখিয়েছেন যে, মোটামুটি-ভাবে শতকরা দুই থেকে তিনজন ব্যক্তি জড়বুদ্ধিগ্রস্ত।

কেবলমাত্র বুদ্ধ্যঙ্কের মানদণ্ডে জড়বুদ্ধিদের সনাক্ত করাকে এখন অনেকেই প্রশ্ন করছেন। শতকরা তিনজন জড়বুদ্ধিগ্রস্ত এটা ধরে নেওয়াটা ঠিক নয়। বুদ্ধ্যঙ্ক ও মানিয়ে চলার ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় ও সমতা, এ বিষয়টি নির্ধারণ খুব সহজ নয়। সত্তরের নিচে বুদ্ধ্যঙ্কের ক্ষেত্রে যদিও দেখা যায় মানিয়ে চলার ক্ষমতার সঙ্গে একটা সহগতি আছে, কিন্তু বুদ্ধ্যঙ্ক যখন উপরের দিকে থাকে তখন মানিয়ে চলার ক্ষমতাও যে সেই আনুপাতিক হবে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কারণে এ বিষয়ে আরও গবেষণা হচ্ছে এবং কেবল বুদ্ধ্যঙ্কের মাপকাঠিতে 'জড়বুদ্ধিগ্রস্ত' ব্যক্তিদের সনাক্ত করার বিষয়টিকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে জড়বুদ্ধিদের আবেগ জীবন, ব্যক্তিত্বের সমীক্ষা, অভিযোজন ক্ষমতা, গতি ও সঞ্চালনক্রিয়া, জি. এস. আর. জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষালব্ধ মাপকাঠি—এই সবকিছুর মানের সহগতি নির্ণয় করে নূতনভাবে জড়বুদ্ধি-গ্রস্তদের সঠিকভাবে সনাক্ত করার প্রচেষ্টা চলেছে। জৈব-রাসায়নিক কারণে যে জড়বুদ্ধিতা দেখা যায় তা যদি শৈশবেই পরীক্ষা করে ধরা পড়ে তাহলে তা নিরাময়ও করা যায়। কাজেই জড়বুদ্ধিদের পুনর্বাসনের জন্য ও তাদের যতটা সম্ভব সমাজী-করণ ও সমাজের কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য দুটি দিকে দৃকপাত করা দরকার। প্রথমটি হল সঠিকভাবে ও ঠিক সময়ে তাদের সনাক্ত করা। দ্বিতীয়টি তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা।

জড়বুদ্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকে কেবল-মাত্র পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। শিক্ষাকে বৃহত্তর অর্থে দেখতে হবে, সার্বিক বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষাকে দেখতে হবে। জড়বুদ্ধিদের অনেক সমস্যা। তারা যে বিমূর্ত চিন্তা কম করতে পারে, পড়তে, লিখতে ও সাধারণ মানের অঙ্ক কষতেও হিমসিম খায়—এ সমস্যা তো রয়েছেই, এছাড়া সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে, আবেগ সুস্থির আত্মনির্ভর জীবন-যাপনেও কমবেশি অক্ষমতা থেকে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জড়বুদ্ধিদের শিক্ষার যে দিকটিতে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার সেটি হল তাদের জীবনধারণে যতটা সম্ভব স্ব-নির্ভর করে তোলা। যেমন প্রথমেই শেখাতে হবে নিজে নিজে স্নান করা, নিজে নিজে খাওয়া, নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ গুছিয়ে রাখা ও নিজে নিজে পরতে শেখা। এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই অক্ষরজ্ঞান, লিখতে শেখা ও অঙ্ক শেখার মহড়া চলতে থাকবে। জীবিকার জন্য, তাদের সীমিত বুদ্ধির মধ্যেই কোন কারিগরি বিদ্যায় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, স্বাভাবিক বুদ্ধির ছেলে-মেয়েদের যেমনভাবে, যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়—জড়বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কী ধারায় পরিবর্তন হবে—এ নিয়ে বহু মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে সংহত ও সমন্বিত শিক্ষাধারার প্রবর্তনই বর্তমানে জড়বুদ্ধিদের জন্য স্বীকৃত হয়েছে। কার্ল গ্রূনেয়াল্ড, ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংহত শিক্ষার জন্য কতকগুলি স্তর বিন্যাসের কথা ভেবেছেন, এর প্রথম স্তর হল জড়বুদ্ধিদের চিহ্নিত করা, উপলক্ষণ-গুলির বিশ্লেষণ ও শ্রেণীকরণের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করা। এই চিহ্নিতকরণের জন্য বুদ্ধ্যঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে জৈব-রাসায়নিক, গতীয় (**motor**), সমাজে মানিয়ে চলার ক্ষমতা (**adaptability**), জি. এস. আর. (**Galvanic Skin Response**), প্রতিক্রিয়া কাল (**reaction time**), প্রত্যক্ষণ-ক্ষমতা (**perceptual skill**), ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা প্রভৃতির পরিমাপ করতে হবে। এই সব পরিমাপ-বৈশিষ্ট্যের সহগতি বিশ্লেষণ করে জড়বুদ্ধিদের চিহ্নিত করা হবে ও তাদের শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। এই শ্রেণীবিন্যাসের মধ্য দিয়ে কোন্ জড়বুদ্ধির কোন্ দিকে বিশেষ অসুবিধা রয়েছে সেগুলি নির্দিষ্ট করে, সে উপলক্ষণগুলি বিশেষ যত্ন নিয়ে দূর করার চেষ্টা করা হবে। তা ছাড়া বুদ্ধ্যঙ্কের মাপকাঠিতে শ্রেণীকরণের মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে জড়-বুদ্ধিদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাবে—সামান্য জড়বুদ্ধি (**mild**), মোটামুটিভাবে জড়-বুদ্ধি (**moderate**), অত্যন্ত জড়বুদ্ধি (**severely retarded**)—এই শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষার ব্যবস্থাপনারও হেরফের হবে।

জড়বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে বিশেষ পদ্ধতি ও বিশেষ ব্যবস্থাপনার স্তরটিকে শিক্ষা-ধারার দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ বিশেষীকরণের স্তর বলে অভিহিত করা হয় (**specialisation**)। এই স্তরটিতে অভীক্ষালব্ধ ফলের পরিপ্রেক্ষিতে কার কোন্ দিকে বিশেষ কমতি রয়েছে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

তৃতীয় বিন্যাসে রয়েছে পৃথকীকরণের (**differentiation**) স্তর। জড়বুদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী এদের আলাদা করে সেইভাবে শিক্ষার ধারা ঠিক করা হয় ও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শেষ স্তর হল বিকেন্দ্রীকরণ—অর্থাৎ প্রত্যেক জড়বুদ্ধি শিশুর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যারা জড়বুদ্ধি নয় তাদের জন্য যে ধরনের শিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করা হয়—তার সঙ্গে জড়বুদ্ধি শিশুদের মিলিয়ে দিয়ে একটি সমন্বিত শিক্ষাধারার প্রবর্তন করা।

সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থায় একই সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণীতে জড়বুদ্ধিদের আলাদা করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে—জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শিক্ষার সঙ্গে, সাধারণ শিক্ষাধারাকে যতটা সম্ভব সমন্বিত করাই হল এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। বাবা-মার কাছেও মনে হবে যে, আমার ছেলে যদিও জড়বুদ্ধি, তবু সে সবাই যে বিদ্যালয়ে পড়ে, সেই বিদ্যালয়েই পড়ছে এবং এর ফলে তার ছেলে যে অস্বাভাবিক, এই পীড়াদায়ক বোধ থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকতে পারে। এতে করে স্বাভাবিক ও সাধারণ ছাত্ররাও জড়-বুদ্ধিগ্রস্ত ছাত্রদের সম্বন্ধে, তাদের অসুবিধা সম্বন্ধে জানতে পারে। প্রায়শই কতকগুলি অন্ধ সংস্কার ও একপেশে ধারণা এই সব জড়-বুদ্ধিদের সম্পর্কে থাকে, যার ফলে সাধারণ শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জড়বুদ্ধিদের মানবিক সাধারণ সম্পর্কটুকু তৈরি হয় না। এই সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ ও জড়বুদ্ধি শিশুদের

স্বাভাবিক মেলামেশার ফলে, জড়বুদ্ধি শিশুদের হীনমন্যতা অনেকাংশে লাঘব হবে। অন্যদিকে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরও জড়বুদ্ধিদের সম্বন্ধে অনেক সহনশীলতা দেখা যাবে।

বঙ্গদেশে জড়বুদ্ধিদের জন্য এই সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে—কিন্তু এখনও এটা একটা আন্দোলনে পরিণত হয়নি। সরকারী উদ্যোগ এখনও এদিকে যথাযথ নয়।

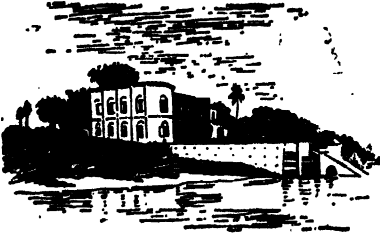
অল্প জড়বুদ্ধি ও মোটামুটিভাবে জড়বুদ্ধিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমে দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে স্থান পাবে—একটি হল মোটামুটি অঙ্ক শেখা, পড়তে শেখা ও লিখতে শেখা—অন্যটি হল আত্মনির্ভর হওয়ার শিক্ষা, অর্থাৎ নিজে নিজে পোশাক পরা, তার যত্ন করা, নিজে নিজে খাওয়া, নিজের কাজ নিজে করে উঠতে পারার শিক্ষা। এর জন্য বিশেষভাবে দেখতে হবে তাদের পেশী সঞ্চালন বা গতিক্রিয়ায় সংহতি আনয়নের অভ্যাস সৃষ্টির দিকে। এর জন্য প্রত্যক্ষণে সুস্পষ্টতা, প্রাথমিক বিচার ও বস্তুর ধর্ম অনুযায়ী পৃথকীকরণের ক্ষমতা, গতিক্রিয়া ও পেশীসঞ্চালন ক্রিয়ার সাবলীলতাকে আয়ত্তীকরণে সহায়তা করা। পাঠক্রমে ও শিক্ষার ধারায় এই দিকগুলি জড়বুদ্ধির জন্য বিশেষভাবে স্থান পাবে। সাধারণ ছাত্রদের শিক্ষাধারায় এই বিষয়গুলির দিকে প্রথমদিকে অর্থাৎ নার্সারী ও প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া হয়—কিন্তু জড়-বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষাধারায় স্থান পায়। এই দুই শ্রেণীর জড়-বুদ্ধিদের, তাদের সীমিত বুদ্ধি অনুযায়ী কোন জীবিকার উপযোগী করে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা যেতে পারে। এদের জন্য কর্মস্থানেই (on the job training) বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অল্প জড়বুদ্ধি ও মোটামুটিভাবে জড়বুদ্ধিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-পথে প্রধান বাধা হল যে, এরা কোন বিষয়ে সহজে মনঃসংযোগ করতে পারে না, কোন বিষয়ে শিখতেও তাদের সময় অনেক বেশি নেয় কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করার জন্য যদি শিক্ষা-উদ্দীপকের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, সুস্পষ্টতা থাকে ও বহুবার সেই উদ্দীপক তাদের সামনে আনা হয় তাহলে ধীরে ধীরে তাদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং অনেকটা সময় নিয়ে বার বার তাদের শেখাবার চেষ্টা করলে তারা শিখতে পারে এবং এটা মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষার বিষয়টি বহুবার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে একবার যদি তারা আয়ত্ত করতে পারে তাহলে সেটা তারা সহজে ভোলে না এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মতোই তারা তা ধরে রাখতে পারে।

এই সব পরীক্ষা ও সমীক্ষা থেকে এটা আজ আস্থা নিয়ে বলা যায় যে, জড়বুদ্ধি শিশুরা সমাজের বোঝা না হয়ে, তারা যথার্থভাবে সমাজের কিছু কিছু কর্মজীবনের অঙ্গীভূত হতে পারে। এদের জীবনও কুসুমিত হতে পারে—এদের জীবনকেও সীমিত সার্থকতায় ভরে দেওয়া যেতে পারে।

ভারতবর্ষে লোকে আমায় সাধারণের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা না দেওয়ার জন্য বলে, কিন্তু আমি বলি যে, একটি শিশুকেও এই জিনিসটি বুঝিয়ে দিতে পারি। উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলির শিক্ষা একেবারে প্রথম হইতেই দেওয়া উচিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

সাম্য

দরিদ্র। অতি দরিদ্র স্বামী এবং স্ত্রী। ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী। মাত্র দুজনের সংসার।

ব্রাহ্মণ বিদ্বান, নাম দানরুচি। দানরুচির মন বিদ্যার আলোয় বিধৌত, ধর্মে মার্জিত।

দানরুচির মন অন্য সুরে বাঁধা। সংসারে আছেন, থাকতে হবে তাই আছেন।

দুটি প্রাণীর সংসার। বিষয়রস নয়, মন মজেছে অন্য রসে। তাই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনেই জীবন চালান।

সংসার চলে, জীবন চলে। দানরুচি পত্নী-সঙ্গে ধর্ম করেন, তপ করেন। ভাগীরথীর মন্দ মন্দ হাওয়ায় দিনগুলি আস্তে আস্তে অতি সংগোপনে ভেসে যায়।

দানরুচি ও তদীয় পত্নী। প্রত্যহ হোম করেন। অতিথি সেবা করেন। তারপর দিনের ষষ্ঠভাগে আহার করেন নিজেরা।

সহজব্রতে দিনগুলি সহজে কেটে যেত। অতিথি আসত। প্রায় প্রত্যহই আসত। কিন্তু ফিরত না কদাপি।

দানরুচি ব্রাহ্মণ, ব্রতপরায়ণ। মনে বিদ্যার আলো। দানরুচি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে থাকলেন। উজ্জ্বলতা থেকে ক্রমে উপজাত হল তেজ। তেজে তেজে দানরুচি অগ্নিকে অতিক্রম করলেন, এমনকি সূর্যকেও।

জ্যোতির্ময় দানরুচি। অগ্নি প্রসন্ন হলেন। দেবতার প্রসন্নতা পুষ্প হল। বর্ষিত হল দানরুচির শিরে।

একটি দিন। দুর্দিন। দিবসের ষষ্ঠভাগ অতিক্রান্ত হল। অতিথি এল না কোন। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতকেও দানরুচি উপেক্ষা করলেন। সন্ধান করে ফিরলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ মিলল না কোন অতিথির।

দিন শেষ হল। সূর্য পাটে বসল। অতিথি এল না কোন। পশ্চিম আকাশ বেদনায় লাল হল। অতিথি এল না কোন।

উপবাসে দানরুচি ক্লান্ত। এমন ছন্নছাড়া দিন! মনে বিষাদ। দানরুচি বাসুদেবকে স্মরণ করতে থাকলেন।

পতি উপবাসী, পত্নীও তাই। পতির ব্রত পত্নীরও ব্রত। পতি ও পত্নী। মাত্র দুজন। দুজনেই বিষন্ন, উপবাসে খিন্ন।

বাইরে শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ। পথ শূন্য। অতিথি এল না কোন।

অগ্নি দেখলেন। বুঝলেন। অবশেষে তিনি দর্শন দিলেন। চণ্ডাল বেশে কদর্য আকার নিয়ে অগ্নি দানরুচিকে দেখা দিলেন।

দানরুচি দেখলেন গাছের তলে শীতার্ত এক চণ্ডাল। আরও কাছে এলেন। শীত, অথচ শরীরে আবরণ নেই কোন। শত শত ব্রণে সর্ব-শরীর তার কণ্টকিত। পুঁজরক্ত গড়িয়ে পড়ছে,

শুকিয়ে মামড়ি পড়েছে। বীভৎস কুৎসিত এক চণ্ডাল।

দানরুচি দেখতে থাকলেন। আরও এগিয়ে এলেন। মনে অসীম মমতা। নয়নে তারই ছায়া। মুখে তারই প্রতিধ্বনি : আহা, আহা!

দানরুচি আগুন জ্বাললেন। অতি সত্বর জ্বাললেন। শীত কিঞ্চিৎ নিবারিত হল। পীড়িত লোকটি যেন প্রাণ পেল।

দানরুচি বললেন : আসুন। আমার গৃহে আসুন। অন্নগ্রহণ করবেন। আসুন।

লোকটি বলল : জাতিতে অতি নীচ। কুৎসিত। এখানেই অন্ন দিন। কাকপক্ষীকেও যেমন দেন তেমনই দিন। গ্রহণ করি।

দানরুচি বললেন : আমি জাত মানি না। জাতে কি আসে যায়! সবার মধ্যেই তো রয়েছেন সেই ভগবান। সৃষ্টির সব কিছুতেই তো তিনি। অতএব চলুন। কুৎসিত অকুৎসিত বলে আসলে কিছু নেই। অতএব চলুন। আমাকে কৃতার্থ করুন।

চণ্ডাল হৃষ্ট হল। দানরুচির গৃহে এল। দানরুচিও যথাবিধি অতিথির পূজা করলেন।

চণ্ডাল-শরীর অন্তর্হিত হল। নির্গত হলেন স্বয়ং অগ্নি। দানরুচির সম্মুখে প্রসন্ন অগ্নিদেব।

অগ্নি বর দিলেন : সাম্যবোধে উদ্দীপ্ত তোমার চিত্ত। মোহ নাশ হয়েছে, পাপ ক্ষয় হয়েছে। অতএব তোমার গতি হোক। মোক্ষই তোমার পুরস্কার।

[শিবপুরাণ অবলম্বনে]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'যেমন করে পারবি, গুরুর কাছে যাবি'

অতীতের বেলুড় মঠ তথা ঠাকুর-স্বামীজীর সাক্ষাৎ সন্তানগণের স্মৃতি কখনও পুরাতন হয় না —আশা, উদ্দীপনা ও প্রেরণায় ঘটনাচিত্রগুলি চিরনবীন। শ্রদ্ধায় ও আন্তরিকতায় ছোট ছোট কথাও কী অপূর্ব প্রাণবন্ত! মূর্তিমান জ্ঞান-ভক্তি ও বিশ্বাস-বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে বুঝি এমনটাই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। তাই তো দেখি শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জীবনসন্ধ্যাতে এসেও সেই পুরাতন স্মৃতিচারণ করতে কত উৎসাহিত। তিনি বলেন :

সে সময় মঠে গেলেই সর্বাগ্রে পূজ্য মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল; কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ। এই জ্ঞান মহারাজের ঘর ছিল অবারিত দ্বার। অনেকক্ষণ সেখানে বসে থাকতেও ভাল লাগত। তিনি নানারূপে আমাদের ব্যস্ত রাখতেন। কখনও ছবি আঁকতে বলতেন, কখনও নানা গল্প করতেন। তাঁর রহস্য করা স্বভাব ছিল। সেখানে খানিকক্ষণ আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারতাম। অবশ্য তাঁর রাশভারী মেজাজের জন্য আমাদের হাসিও কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না। তাঁর ঘরের পাশেই থাকতেন ঠাকুরের শিষ্য খোকা মহারাজ। তাঁকে দেখতে পেতাম, —জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে খুব ফষ্টিনাষ্টি করতেন, আবার কখনও তুমুল তর্ক জুড়ে দিতেন। অমন নানাভাবে তাঁকে দেখেছি, কিন্তু কাছে কখনই তিনি যেতে দিতেন না। কাছে যাবার চেষ্টা করলে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়তেন। কখনও বলতেন, "আমার খারাপ রোগ আছে, ছোঁয়াচে। দূরে থাক্।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের ছয় জন সন্ন্যাসী শিষ্যকে চোখে

দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সকলেই গম্ভীর এবং কাছে যেতে সমীহ হত;—একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন এই খোকা মহারাজ—স্বামী সুবোধানন্দজী। তাঁকে দেখে মনে হত যেন আমাদেরই মতো এক মানুষ, কিন্তু খুব আমুদে, সদা আনন্দময় পুরুষ। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা কখনও হয়নি; তবু তিনি যে আমার সামনে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে কথা বলতেন,—মনে করতাম সেটাই ছিল তাঁর অসীম কৃপা। কারন বেশির ভাগ আগন্তুকের কাছে, তিনি পাশে থেকেও দর্শন পর্যন্ত দিতেন না।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমার বয়স তখন প্রায় ২১ বছর। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দর্শন হচ্ছে না—তিনি তখন দারুণ অসুস্থ। মন বড়ই খারাপ। জ্ঞান মহারাজ ইঙ্গিত করে জানালেন—"ভিতর দিকের সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যা।" গেলাম, সিঁড়ির উপরে উঠে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কিন্তু একজন সেবক সাধু আমাকে চলে যেতে বললেন। তাঁর কথায় বড় অভিমান হয়েছিল। নিচে নেমে এসে আবার জ্ঞান মহারাজের ঘরে গোঁজ হয়ে বসে রইলাম। জ্ঞান মহারাজ ব্যাপারটা অনুমান করেছিলেন। আমাকে বকুনি দিয়ে আবার উপরে যেতে আদেশ করলেন। তীব্র শ্লেষ সহকারে বললেন, "চলে যেতে বলেছে। ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে তো দেয়নি। তারা কি করবে? তারা তাদের করছে। তুই তোর ডিউটি করবি। তা নয়, আবার 'অভিমান' হয়েছে।" তারপর একটু যেন ক্রোধের স্বরে বললেন, "যা! আবার যা! বারে বারে যাবি। বলবি তাদের, 'আমি দূর থেকে প্রণাম করেই চলে যাব, কাছে যাব না।' যেমন করে পারবি গুরুর কাছে যাবি। তাতে আবার মান আর অপমান!"

ভাবলুম তাই তো। আমি সেবকদের উপর বিরক্ত হচ্ছি কেন? তাঁরা তো গুরু-সেবা করছেন। আমিই বাইরে থেকে এসে উৎপাত করছি। জ্ঞান মহারাজ আমার কল্যাণ চান বলেই তিরস্কার-ছলে মহোপকার করলেন।

আবার গেলাম। এবার সিঁড়ি ওঠার দরজা বন্ধ। ফিরে এসে বললাম। জ্ঞান মহারাজ ইঙ্গিত করলেন, "পাশের ঘরের ভিতর দিয়ে যা।" সেখানে খোকা মহারাজের শয্যা পাতা আছে। ইতিমধ্যে তিনি তক্তাপোষ থেকে নেমে ঘরের বাইরে কোথাও গেছেন। ওখানে উপস্থিত অন্য একজন সন্ন্যাসী আমাকে ইঙ্গিত করলেন, "লাফিয়ে চলে যাও।" আমি কিন্তু খোকা মহারাজের আসন ডিঙিয়ে যাব কি করে? এই ভেবে দাঁড়িয়েই রইলুম। ঐ সাধু আমাকে জানালেন—"সবাই যায়। তুমিও যাও।" তখন মনে মনে খোকা মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর আসনকে ডিঙিয়ে একেবারে সিঁড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বলতে গেলে সেদিন খোকা মহারাজেরই কৃপায় আমার শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দর্শনলাভ সম্ভবপর হয়েছিল। সেই-দিনের কথা স্মরণ করে আজও পরমশ্রদ্ধাভরে পূজনীয় খোকা মহারাজকে প্রণাম জানাই। তার সঙ্গে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান মহারাজকেও প্রণাম করি বার বার।

জ্ঞান-বিজ্ঞান

মানুষের চতুর্থ পরিবেশ—মহাকাশ

জল, স্থল ও বাতাস—মানুষের এই তিনটি পরিবেশের কথা আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করি, কিন্তু এদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে মহাকাশ। এ চারটির একটির ঘটনাবলী অন্যকে প্রভাবান্বিত করে, তা সে এখনই হোক বা সুদূর ভবিষ্যতে হোক। সেজন্য মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে চারটি পরিবেশেরই সুস্থ অবস্থা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই ৯৪টি দেশের প্রতিনিধি-বর্গ ১৯৮২-র অগস্ট মাসে ভিয়েনাতে আলোচনায় বসেছিলেন।

মাত্র ২৫ বছর আগে মহাকাশকে নিয়ে কর্ম-তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে ২,৪০০ যানে প্রায় ১৪,০০০টি মনুষ্যকৃত সামগ্রী সেখানে প্রেরিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৯০০০ সামগ্রী ধ্বংস পেয়েছে অথবা নামানো হয়েছে। বাকি ৫০০০ এখনও কক্ষপথে থাকলেও তাদের ৪০০০টি সামগ্রীর বা কৃত্রিম উপগ্রহের কর্মকাল শেষ হয়ে গেছে। বাকি ১০০০ এর মধ্যে আছে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি যারা আবহাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে, বিরাট ঝড় বা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস জানাচ্ছে, নানা দেশের অস্ত্র-কারখানার খবর নিচ্ছে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্য করছে। শেষোক্তদের মধ্যেই আছে ভারতীয়-ভাস্করণ ও ইন্‌সাট (INSAT)। এগুলি ছাড়া মহাকাশে আছে অসংখ্য অজানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু যাদের সম্পূর্ণ সন্ধান পাওয়া কঠিন।

মনে হয় ভবিষ্যতে মহাকাশকে মানুষের কাজে আরও বেশি ব্যবহার করা যাবে। এই সম্ভাবনা-গুলির একটি হচ্ছে, সেখানে সৌরশক্তিসংগ্রহের কারখানা স্থাপন এবং সেই কারখানা হতে সংগৃহীত শক্তিকে মর্ত্যে আনয়ন। এর জন্য যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন তা অজানা নয়, তবে ব্যাপারটি বিরাট এবং এতে খরচও পড়বে প্রচুর। অন্য একটি প্রকল্প, চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহপুঞ্জ হতে খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ। আর একটি প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে—যে সব সামগ্রী পৃথিবীতে রাখা সম্ভব নয় বা নিরাপদ নয়, সেগুলি মহাকাশে সঞ্চিত করে রাখা।

মহাকাশে কর্মতৎপরতার কয়েকটি বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে যথেষ্ট। তাদের একটি হচ্ছে, সেখানে প্রেরিত দ্রব্যগুলির কোন একটির আকস্মিক পতনের ফলে অন্য কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষতিসাধন। অবশ্য মহাকাশে অবস্থিত সামগ্রী-গুলির তাড়াতাড়ি পতনের চিন্তা এখনও করা হচ্ছে না। যেগুলি এক হাজার কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে আছে, তারা এক হাজার বছর পর্যন্ত থাকতে পারবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তারা যখন ১০০—১৬০ কিলোমিটার দূরত্ব সীমায় নেমে আসবে, তখন বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে উত্তপ্ত হয়ে অধিকাংশই বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে—সামান্য অংশই তখন ভূখণ্ডে পড়ার আশঙ্কা। আর একটি ভয়, কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহণকালে বায়ু-মণ্ডলের স্ট্রাটোসফিয়ার (stratosphere) অঞ্চলে, 'ওজোন' (Ozone) গ্যাসের পরিমাণ কমে যাওয়া। তা ছাড়া সম্ভাব্য বিপদ—চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহ থেকে নূতন ধরনের জীবাণু আসা। অবশ্য এখনও পর্যন্ত চন্দ্রে বা মার্স-এ জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি।

বর্তমানে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশি বিপদের কথা ভাবছেন, আকাশে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের দিক থেকে। এর দ্বারা সেখানে দূষিত আণবিক বাষ্প বহু বৎসর পর্যন্ত থেকে যাবে,

যা ক্রমে সারা বিশ্বের চারিধারে ছড়িয়ে যাবে এবং কৃত্রিম উপগ্রহগুলির ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলিকে বিকল করে দেবে। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী এরকম বিস্ফোরণ ঘটানো নিষিদ্ধ, তবুও কেউ যাতে ঐ চুক্তি ভঙ্গ না করে, সেটাও দেখা দরকার। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি যে-স্থান হতে নিক্ষিপ্ত হয় সেখানকার আবহাওয়া দূষিত হয় বলে, লোকালয় থেকে বহুদূরে স্থানগুলি নির্বাচিত হয়। আপাততঃ দুটি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা খুব কম—দশ বৎসরে একটি হতে পারে।

আমাদের আন্তরিক কামনা হবে, মহাকাশ যেন কেবলমাত্র মানুষের শান্তি ও কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়। ১৯৮২-র জেনেভা চুক্তিতেও এটাই স্বীকৃত হয়েছে।

["Science Information Notes", Ind. Nat. Science Academy, April 1984 থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।]

দেশ-বিদেশ

থাই-সংস্কৃতি

থাইল্যাণ্ড, আগের নাম শ্যাম (দেশ)। এর সাংস্কৃতিক রূপরেখার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় ভারতীয় ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, সামাজিক রীতিনীতি, মন, মেজাজ ও মানসিকতা। লোকেরা সরল। সহজেই বাড়িয়ে দেয় বন্ধুত্বের হাত। জানতে চায় অতিথিকে, জানাতে চায় নিজেদের, অতীত দিনগুলি যেন এখনও বাঙ্ময়। এবং এ সংস্কৃতি মূলত গ্রামভিত্তিক। জীবনের ছোঁয়া লাগা। প্রাণবন্ত,—কৃত্রিম নয়। এর পাশাপাশি অবশ্য আছে আধুনিক নগরজীবনের হাতছানি, লাভ, লোভ, অপসংস্কৃতি। একটা দ্বন্দ্ব চলছে এখন মনে হয় থাই জাতির মনে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় এই যে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া, এটা সাময়িক কিনা কালই তা বিচার করবে।

থাই-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ধর্ম। বৌদ্ধ-ধর্মের প্লাবনে দেশ ভাসলেও মন্দিরে এবং আচার-আচরণে সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতা—যা সাম্রাজ্যবিস্তার করতে যায়নি—গিয়েছিল সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় করতে, তার ছোঁয়া এখনও অম্লান।

সন্ন্যাসগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত মহা-সমারোহে। বের হত শোভাযাত্রা। হাতীর পিঠে থাকতেন নবীন ভিক্ষুরা। রাজপ্রতিনিধি, নানা ধরনের বাজনা। পুরানো সন্ন্যাসীরা চলতেন মিছিল করে। শ্রদ্ধা জানাত পুরবাসী।

বাদ্যযন্ত্রও অনেকটা ভারতীয় ধরনের। ঢাক বাজত। কাঁসর ঝুলত বাঁশে, দুজন বইত কাঁধে, বাজাত দুজন লোকে।

নাচগান এদের প্রাণ। পরে নানা রঙীন পোশাক। থাই মেয়েদের বড় সুন্দর দেখায় ঐ পোশাকে। হাতের সব আঙুলগুলোতে বড় বড় কৃত্রিম নখ লাগায়। রঙ সোনালী, মনে হয় সোনার নখ। অনেক মেয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে দলে দলে ভাগ হয়ে নাচে। নাচে নখগুলোও আঙুলে আঙুলে। কখনও বা ছেলে-মেয়ে মিলেমিশে। কখনও বা দুহাতের সব আঙুলে গোঁজে কাঠিতে লাগানো লাল ফুল, কেউ কেউ

নাচের ভঙ্গীতে সাজিতে ফুল ভরে নিয়ে আসে, ছড়ায় চারিদিকে। আরেক ধরনের থাই গ্রাম্য-নাচও খুবই উপভোগ্য। গানের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নাচে ছেলেমেয়েরা। নানা বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁয়া তবলার সংস্করণও দেখা যায়। বাঁয়াটা বিরাট লম্বা, নিচের দিকটা। এই নাচে স্বদেশী বিদেশী সকলকে আহ্বান জানায় তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে। আরেক ধরনের অদ্ভুত নাচ হল বাঁশ নাচ। দুটো করে লম্বা বাঁশ মাটিতে রাখে। দুপাশে বসে ছেলে ও মেয়ে ঐ বাঁশ বাজাতে থাকে নানাভাবে উঠিয়ে নামিয়ে, সামনে পিছনে বাঁশের ঠোকাঠুকির শব্দে নতুন এক ব্যঞ্জনা তৈরি হয়—একধরনের নতুন ঐকতান সঙ্গীতের রেশ—এরপর আসে নানা সাজে সেজে ছেলেমেয়ের দল। আগের ওরা বাঁশ বাজিয়ে তাল দিয়েই চলে। বাজাতে বাজাতে বাঁশ তো নড়ছে, দ্রুত তালে। তারই ফাঁক দিয়ে পা তুলে তাল রেখে নাচে ছেলেমেয়েরা—যেন বাঁশের নদী পেরুচ্ছে, নানাভাবে রাখে বাঁশগুলো মাটিতে—সমান্তরালভাবে, আড়াআড়ি, বাঁশ বাজায়—দোলায়, ওঠায় নামায়, তারই ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তাল রেখে নেচে চলে।

আমাদের দেশের মতো মোরগযুদ্ধও ওদের ওখানে খুব চালু। বাজনা বাজবে পিছনে এ সময়েও। যার যার মোরগ, দল বেঁধে আসে। দুটো দল। নিজের নিজের মোরগকে লড়াই-এর সময় উৎসাহ দেয়। আবার প্রতিপক্ষও কখনসখন পরস্পরের প্রতি অঙ্গভঙ্গী করে, এমনকি লাঠিও চালায়।

আগের কালের আত্মরক্ষার নানা প্রক্রিয়া এখনও দেখানো হয়। ছিল বাঁশের ছোট লাঠি, বল্লম, সড়কি, কাঠ দিয়ে তৈরি ঢাল, লাঠিতে গুপ্তি লাগিয়ে যুদ্ধের সময় নানা কায়দায় ছিনিয়ে নেওয়া হত অপরের হাতিয়ার। কাঠের একরকম বাজুবন্ধ খুবই কাজের। কায়দা করে লাথি মেরে লাঠি বা সড়কিওয়ালা লোককে ফেলে দেওয়া যায় এরকম বাজুবন্ধের ঘায়ে, কেড়ে নেওয়া যায় লাঠি সড়কি, কাঠের বর্মে মুচড়ে দেওয়া যায় প্রতিপক্ষের পা। আর একটি অদ্ভুত রীতি ছিল হয় তো—ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যুদ্ধ—তরবারি নিয়ে। বীরাঙ্গনা ছিল ওরাও—আত্ম-রক্ষায় মেয়েরাও পিছু-পা ছিল না, বোঝা যায়। লড়াই-এ হারানো কঠিনও ছিল রণরঙ্গিণীকে। থাই মুষ্টিযুদ্ধেও কতকগুলো অদ্ভুত নিয়মকানুন আছে। প্রতিবার মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হবার আগে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়। ওদের মাথা ও বুক জল দিয়ে মালিশ করে দেওয়া হয়। মুষ্টিযুদ্ধে শুধু হাতই নয়, পাও সমান চলে, হাঁটু বা কনুই দিয়ে মারা, লাঠি চালানো এগুলোও বিধিসম্মত। এবং সব সময় বাজনা বাজে পিছন দিকে, যোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে।

বিবাহ উৎসবও অনেকটা ভারতীয় ধাঁচের। আখের গাছ রাখা হয় পুঁতে বিয়েবাড়ির দোর-গোড়ায়। বরকনের শোভাযাত্রা বেরোয়। পিছনে কুলোতে এবং আরও নানা পাত্রে বয়ে নিয়ে চলে পুরনারী এবং পুরুষরা নারকেল, অন্য ফল, খাবার প্রভৃতি। মন্দিরে যায় প্রথমে। তারপর বাড়িতে। পুরোহিত, গুরুজন, বন্ধুরা আশীর্বাদ করে একে একে। দুজনের মাথা মালা দিয়ে জোড়া হয়। এর পর একটা পাটাতনে বরকনে গুড়ি হয়ে হাত বাড়িয়ে বসে। তখন চলে আদর আপ্যায়ন।

সমালোচনা

Helen Keller's Reflections—Victoria Hugo, Ph. D. Published by: Ramakrishna Mission, Narendrapur, 24 Parganas (W. B.), pp. 6+138. Price: Rs. 10·00.

হেলেন কেলার (১৮৮০—১৯৬৮) এ-শতাব্দীর মহীয়সী মহিলাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। প্রতিবন্ধীর সমস্ত প্রতিবন্ধকতা জয় করে তিনি নিজের জীবনে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা তো এনেছিলেনই, নিজের সমগ্র জীবন প্রতিবন্ধীদের সেবায় উৎসর্গ করে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। প্রবল ও সৎ ইচ্ছাশক্তির কাছে কোন বাধাই যে দুর্লঙ্ঘ্য হয় না, এ-সত্যও এই মার্কিন নারী নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গান্ধীজীর মতো, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

দু বছর বয়সে হেলেন দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর সঙ্গিনী ও সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রী অ্যান্ সালিভ্যান মেসি তাঁকে পড়তে, লিখতে ও কথা বলতে শেখান। তাঁর এত উন্নতি হয় যে, তিনি র‍্যাড্ক্লিফ্ কলেজের স্নাতক-পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি রচনা, ভাষণ ও দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে লোকসেবায়, বিশেষত প্রতিবন্ধীদের সেবায়, আত্মনিয়োগ করেন। অ্যানের মৃত্যুর পর পলি টম্সন্ হেলেনের সঙ্গিনী ও সহায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকার সঙ্গে এঁদের সকলেরই পরিচয় ছিল; তিনি তাঁর নাতিদীর্ঘ রচনায় হেলেনের জীবনের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মর্মস্পর্শী আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির স্বামী তথাগতানন্দ একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে যথার্থই বলেছেন, হেলেন কেলারের কীর্তিকলাপ যত মহৎই হোক না কেন যেটা মহত্তর সেটা হচ্ছে তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি। গ্রন্থের শেষে হেলেনের কয়েকটি বাণী চয়ন করে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে: *'Believe in yourself and trust in God'*.

গ্রন্থটি খানিকটা দ্রুততার মধ্যে লেখা বলে পাঠকের মনে হবে, কারণ কোন কোন স্থানে ভাষার দুর্বলতা, বিন্যাসের অসঙ্গতি ও পুনরুক্তি-দোষ চোখে পড়ে। মুদ্রণ-প্রমাদের আতিশয্যও পীড়াদায়ক। তবে সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে লেখিকার সদুদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা।

সাহিত্যশ্রী—ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী। প্রকাশক: ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী, ৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য: ২৫·০০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে সুপণ্ডিত লেখক বাংলা অলঙ্কার ও ছন্দ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে সরল ও সুখপাঠ্য আলোচনা করেছেন। এটি প্রধানত স্নাতক-শ্রেণীর সম্মানিক ও বিকল্প পাঠক্রম অনুসারে রচিত হলেও সাধারণ পাঠক এটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মতোই যুগপৎ আনন্দিত ও উপকৃত হবেন। গ্রন্থকার সব আলোচনায়ই সহজ থেকে কঠিন—এই ক্রমবিন্যাস-পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন, ফলে অগ্রসর ও অনগ্রসর সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য পুস্তকটি খুবই উপযোগী হয়েছে। সুনির্বাচিত উদাহরণের প্রাচুর্যও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনবোধে তিনি স্বরচিত দৃষ্টান্তও যোগ করেছেন। ছন্দ ও অলঙ্কারের রাজ্যে যাঁরা সফর করবেন তাঁদের জন্য 'সাহিত্যশ্রী' "দিশারী লণ্ঠনের" কাজ করবে। স্থানাভাবে গ্রন্থের সাহিত্যের ইতিহাস অংশটি ঈষৎ সঙ্কুচিত। মাত্র পনেরটি পঙ্ক্তিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও পাঁচটি ছোট অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের নাটক-

নাটিকা আলোচিত হয়েছে; বলা বাহুল্য, এ-আলোচনা সন্তোষজনক হয়নি। তবে সাহিত্য-ইতিহাসের কোন কোন অংশে লেখক তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতির সংযোগ ঘটানোতে আলোচনার উপযোগিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। মুদ্রণপ্রমাদের আতিশয্য গ্রন্থটির সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে; আশা করি এগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হবে। সেটিতে সমালোচনা-পদ্ধতি, সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস এবং একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জীও সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনাবলী—শ্রীব্রহ্মপদ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৫/১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২। (১৯৮৪), পৃষ্ঠা ক—চ+২৯০; মূল্য: ২০.০০ টাকা।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান গৃহী-শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' এবং 'সাধু নাগমহাশয়' সাধারণ পাঠক সমাজে, বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগী পাঠককুলে, ইতি-মধ্যেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে এতদিন খুব কম পাঠকেরই সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', 'সাধু নাগমহাশয়' এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী' ভিন্ন শরচ্চন্দ্রের আর কোন রচনাই এতদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, অথবা হলেও স্বল্পকালের মধ্যে লোকলোচনের বাইরে চলে গিয়েছে। অথচ, এই সব রচনার, বিশেষত বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলির, সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং দার্শনিক মূল্য কম নয়। শরচ্চন্দ্রের কৃতী বংশধরগণ, বিশেষত তাঁর দৌহিত্রী শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসীদের সহযোগিতায় এই সব দুষ্প্রাপ্য রচনার পুনরুদ্ধার ও পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমেই শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর (১৮৬৮—১৯৪২) একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী পরিবেশন ও তাঁর সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন করেছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী। পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে পুত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক চক্রবর্তী নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই জীবনী রচনার কাজ হাতে নিয়েছেন। স্বামীজীর দেহরক্ষার (১৯০২) পরবর্তী কালে শরচ্চন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জানতে পারলে আমরা অবশ্য সুখী হতাম। সম্ভবত এ বিষয়ে লিখিত প্রামাণিক তথ্যের অভাব এবং লেখকের অতিকথন দোষে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অন্তরায় হয়েছে। পৃষ্ঠা ৬-এ উল্লিখিত শরচ্চন্দ্রের ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বৎসরটি—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ—কি ঠিক? এর আগের পৃষ্ঠাতেই তাঁর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি. এ. পরীক্ষায় বসতে পাঁচ বৎসর বিলম্ব হল কেন (বি. এ.—১৮৮৮) সে বিষয়েও লেখক কোন আলোকপাত করেননি। শরচ্চন্দ্রের গুরুর মতো তাঁরও একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি গ্রন্থমধ্যে স্থান পেলে ভাল হত।

এর পরে শরচ্চন্দ্র রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাষ্ট স্তবমালা', 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত', 'শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্গীত', 'শ্রীশ্রীদেবী সঙ্গীত', 'শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত', বাংলায় লেখা তাঁর নানা বিষয়ক কবিতা ও 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত অধুনালুপ্ত প্রবন্ধাবলী স্থান পেয়েছে। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', 'সাধু নাগমহাশয়' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী' বিশেষ কারণে এই গ্রন্থে

স্থান পায়নি। শরচ্চন্দ্র রচিত বেদান্তের 'বিবেকভাষ্য'ও এখনও পাণ্ডুলিপির আকারেই রয়ে গেছে। শরচ্চন্দ্রের এই সব উৎকৃষ্ট রচনাগুলি বর্তমান গ্রন্থে স্থান না পাওয়ায় সাধারণ পাঠকের কাছে এর আকর্ষণ অবশ্যই কিছুটা কমে যাবে।

শরচ্চন্দ্রের সংস্কৃত স্তোত্রগুলি সুললিত ছন্দে রচিত এবং মূলত ভক্তিরসাত্মক, যদিও স্থানে স্থানে আদিরসের প্রকাশও দেখা যায় (পৃঃ ৮১ ও ৮৩ দ্রষ্টব্য)। তাঁর বাংলা কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে রচিত। এগুলির মধ্যে 'কে তুমি', 'স্বামীজীর প্রতি', 'সেদিন', 'মৃত্যু', 'লীলা', ও 'নাসদীয় সূক্ত' শীর্ষক কবিতাগুলি সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে। তাঁর 'শ্মশানকালী' কবিতাটির উপর স্বামীজীর **'Kali the Mother'** কবিতার প্রভাব সুপরিস্ফুট। শরচ্চন্দ্রের রচিত বাংলা প্রবন্ধগুলিই এই রচনাবলীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বলে বর্তমান সমালোচকের কাছে মনে হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'গুরু কে', 'পাপ-পুণ্য', 'আশ্চর্য সমন্বয়', 'বেদান্তে কাহার অধিকার', 'গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী' এবং 'দুইটি বন্ধু' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধগুলি স্বামীজীর ভাবধারায় সিঞ্চিত এবং তাঁরই মতের অনুগামী। তবে শরচ্চন্দ্রের লেখায় মুন্সিয়ানাও যথেষ্ট রয়েছে। বইটির নানা স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট, কিন্তু তাতে রচনার ভাবগ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ভবিষ্যতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় প্রকাশককে এ বিষয়ে আরও সতর্ক থাকতে হবে। গ্রন্থের সূচনায় সন্নিবিষ্ট পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দের 'শুভেচ্ছাবাণী' এবং স্বামী নিরাময়ানন্দের 'ভূমিকা' অবশ্যই এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

—ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Ancient Bihar : Her contribution to religion and civilisation. Published by Ramakrishna Mission Ashrama, Patna-800004. pp. 151+2+2 pages of photographs, price: Rs. 10·00.

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, যে জাতির নিজস্ব ইতিহাস বলতে কিছু নেই, তার এই পৃথিবীতে কিছুই নেই। জাতীয় ইতিহাস সেই জাতিকে গভীর অধঃপতন হতে নিয়ন্ত্রিত রাখে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শুধু যে আমাদের গর্বের বস্তু ও আলোকবর্তিকা তা নয়, সমগ্র প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসস্বরূপ। ভারতের সেই কালের গৌরবময় ঐতিহ্যের কত বৃহৎ অংশ যে বিহারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইটিই আলোচিত হয়েছে এই স্মরণিকা পুস্তকে।

ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ না হলেও বাল্যকালে ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে মগধ, মিথিলা, বৈশালী, বিক্রমশীলা, বোধগয়া, জনক, বুদ্ধ, মহাবীর, বিম্বিসার, হিউয়েন সাং প্রভৃতি নামগুলির সহিত অনেকেই পরিচিত; কিন্তু এদের কেন্দ্র করে যে সব ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ঘটেছিল তা সবই হয়েছিল এই বিহারপ্রদেশ এলাকায়। এ সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সচেতন নই,—এমন কি শ্রীরামগতপ্রাণা জননী সীতাদেবী যে বিহারেরই কন্যা, একথাটাও বুঝি অনেকের মনে থাকে না। এই পুস্তকের বিভিন্ন লেখায় বেদ-উপনিষদ্-পুরাণের যুগ হতে আরম্ভ করে, মুসলমান শাসন পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

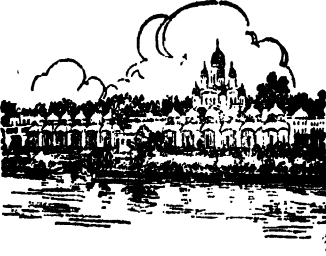
যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুনির্বাচিত বাণী গ্রন্থারম্ভেই মুদ্রিত। প্রকাশক হিসাবে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব স্বামী বেদান্তানন্দের সুচিন্তিত একটি প্রাক্কথন ছাড়া বইটিতে এগারটি

পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ আছে যার লেখকগণ সেই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। "বিদেহ জনকের সময়ে মিথিলা" নামক প্রথম প্রবন্ধে ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী জনক-রাজার সময়ে মিথিলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রচলিত ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। "হিন্দুদের মিলনক্ষেত্র গয়া" প্রবন্ধে ডক্টর বিজয়কুমার ঠাকুর, আর্যদের আগমনের পূর্বে গয়ায় প্রচলিত রীতিনীতি হতে আরম্ভ করে কিভাবে এই স্থান বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার পরেও পিতৃশ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ও বিষ্ণুপূজার কেন্দ্র হয়ে উঠল, তার একটি কৌতূহলী বর্ণনা দিয়েছেন। ডক্টর উপেন্দ্র-ঠাকুরের "বোধগয়া, যেখানে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হলেন" প্রবন্ধটি বুদ্ধদেবের জীবনীসমৃদ্ধ এবং কিভাবে এটি গুপ্ত ও পালরাজাদের সাহায্যে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠল, তার ইতিহাস। "রাজগীরের বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম" প্রবন্ধে শ্রী কে. সি. জৈন দেখিয়েছেন যে, বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে রাজগীর মগধের রাজধানী ছিল এবং মহাবীর ও বুদ্ধদেব বহুবার এখানে এসেছিলেন ও বাস করেছিলেন। ডক্টর কমলেশ্বরপ্রসাদ "রাজগীরে ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম" প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের এখানে বসবাসের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রী ডি. এস. মুখোপাধ্যায় তাঁর "বৈশালী—তার ইতিহাসের গতিপথে তীর্থযাত্রা" প্রবন্ধে বৈশালী রাজ্যের ঘটনা পরম্পরা পর্যালোচনা করেছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী "বিক্রমশীলা বিদ্যালয় একটি কৃষ্টিবিকীর্ণকারী কেন্দ্র" প্রবন্ধে প্রধানতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সহিত তার সাদৃশ্য এবং এখান হতে অতীশের তিব্বতযাত্রা বর্ণনা করে, এই কেন্দ্রটির ধ্বংসের কারণগুলি আলোচনা করেছেন। "বিহারে পাবাপুরীর জৈনতীর্থ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকত্ব এবং প্রকৃত পাবা" প্রবন্ধে মহাবীরের নির্বাণের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ডক্টর রাজেন্দ্র রাম। ডক্টর যোগেন্দ্র মিশ্র "ওদন্তপুরী বিহার" প্রবন্ধে এর প্রকৃত স্থান নির্ণয় করে দেখিয়েছেন যে, অতীশ এটিরও অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বক্তিয়ার খিলজী এটিকে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ মনে করে এই বিহারটি আক্রমণ করেছিলেন। "নালন্দা ঃ শিক্ষা ও কৃষ্টির কেন্দ্র" প্রবন্ধে শ্রীনাসিম আকতার এই শিক্ষা-কেন্দ্রটি কিভাবে বড় হল (এতে ১০,০০০ ভিক্ষু, যার মধ্যে ১৫১০ জন শিক্ষক ছিলেন!), কি কি বিষয়ে এবং কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হত তার বিস্তৃত বিবরণী দিয়েছেন। "এশিয়াতে ধর্ম সভ্যতাসৃষ্টির মূল শক্তি" প্রবন্ধে স্বামী সোমেশ্বরানন্দ দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যে উৎপাদনের উপায়ই সমাজের ভিত্তি, কিন্তু প্রাচ্যে সমাজের ভিত্তি হল ধর্ম। প্রবন্ধে সামাজিক রীতিনীতিতে ভারতের সহিত চীনদেশের অনেক সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গল্পের মতোই পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। প্রত্যেক প্রবন্ধই নির্দেশিকাসমৃদ্ধ। বিক্রমশীলার মূর্তিগুলির ফটোগ্রাফ দুই পৃষ্ঠায় আছে। এতগুলি বিষয় একটি পুস্তকে আলোচিত হওয়ার জন্য পুস্তকটি সকল জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরই পড়া বাঞ্ছনীয় এবং এটি শিক্ষাকেন্দ্র ও লাইব্রেরীতে নির্দেশিকা-গ্রন্থ হিসাবে রাখার যোগ্য।

মুদ্রণের ত্রুটিগুলি এমন সুন্দর একখানি পুস্তকে বড়ই পীড়াদায়ক। প্রচ্ছদ চিত্তাকর্ষক। পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার
ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ডিরেক্টর, স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এই বৎসরও যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১ থেকে ৪ অক্টোবর)। মহাষ্টমীর দিন বিকালে কয়েক পসলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি এবং নবমীর দিন সকালে একবার বর্ষণ ছাড়া পূজার কয়দিনই মোটামুটি সুন্দর আবহাওয়া ছিল এবং প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। পূজার তিনদিনই সমাগত ভক্তগণকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতেও প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে :

আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, গৌহাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জী), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

ঢাকা (বাংলাদেশ) কেন্দ্রে দুর্গাপূজার কয়দিনই, বিশেষ করে কুমারী পূজার সময়, বিপুল জনসমাবেশ হয়। অষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশামসুল হুদা চৌধুরী ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ সফিয়া খাতুন, আলজেরিয়া ও নেপালের রাষ্ট্রদূত এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার পূজা মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

পুনকুন্নম্ (ত্রিচুর) বিবেকানন্দ বিজ্ঞান-ভবনের নবনির্মিত দোতলা গৃহের উদ্বোধন করেন গত ৫ সেপ্টেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

শিক্ষিকার সম্মান

গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল এবং মডেল প্রাইমারী স্কুল, ত্যাগরাজনগরের এই দুটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাদ্বয় রাজ্য সরকার কর্তৃক আদর্শ শিক্ষিকা বলে সম্মানিতা হয়েছেন। গত ৫ সেপ্টেম্বর তাঁরা পুরস্কার লাভ করেছেন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ : হাওড়া, হুগলী, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং ২৪ পরগনা—এই দশটি জেলায় ব্যাপক ত্রাণকার্য অব্যাহত আছে। নিচে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল :

(ক) হাওড়া জেলার আমতা ২নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত আমরাগুড়ি অঞ্চলের ১১টি গ্রামের ১৬৪৫টি বন্যাপীড়িত পরিবারের মধ্যে ৮৬৩ শাড়ি, ৬৮৪ ধুতি, ৯৮ লুঙ্গি এবং ১২৭৫ সেট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা প্যাণ্ট বিতরণ করা হয়।

(খ) হুগলি গোঘাট ব্লকের কামারপুকুর অঞ্চলে ৩০০টি বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে ১৫০ শাড়ি, ১৫০ ধুতি ও ৩০০ জামা কামারপুকুর কেন্দ্রের মাধ্যমে বিতরিত হয়।

(গ) মালদা হরিশ্চন্দ্রপুর (১ ও ২ নং) এবং রতুয়া ব্লকের ৯২টি গ্রামে বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৭১১৮টি পরিবারের মধ্যে ৬৭৩৩ শাড়ি,

৪৩৬৯ ধুতি, ২৩০৮ লুঙ্গি, ২৪৭৭ সেট ছেলে-মেয়েদের পোশাক এবং ৮৯টি পশমের কম্বল বিতরণ করা হয়। ২৪ অক্টোবর ১৯৮৪ এখানকার ত্রাণকার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(ঘ) পশ্চিম দিনাজপুর তপন থানার ৫টি অঞ্চলের ৪২টি বন্যাগ্রস্ত গ্রামের ১২৫০ জন প্রান্তিক চাষীকে গম ও সরিষার বীজ এবং জমির সার বিতরণ করা হয়।

(ঙ) কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা এবং সদর মহকুমার ৬টি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ১৫টি বন্যা-কবলিত গ্রামের ২৪০০ পরিবারের দুর্গত অবস্থার ব্যাপক নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যার্তদের পুনর্বাসনকল্পে বস্ত্রাদি, কৃষিজাত দ্রব্য এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

(চ) ডায়না, ডিমা ও কালাজনি নদীর সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার এবং নাগরাকাটা ব্লকের ১২টি গ্রামের ১২১৪টি পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ১১০৮ ধুতি ও ১০৬ শাড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

(ছ) বীরভূম জেলার সিংঘি অঞ্চলের ভীষণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যাপীড়িতদের খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্রাদি এবং অত্যাবশ্যক গৃহস্থালী দ্রব্য বিতরণ করার পর ৭ খানি গ্রাম থেকে নির্বাচিত ৫৩টি পরিবারকে 'নিজের বাড়ি নিজে কর' প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

(জ) বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় অধিকতর পরিমাণে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ঝ) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ্ কালচার, গোলপার্ক, দক্ষিণ কলিকাতার নিম্নাঞ্চলগুলিতে এবং ২৪ পরগনার লক্ষ্মীপুরে ৫৮৭ খানি বয়স্কদের পোশাক, ২০০ সেট ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, ১৫০টি চাদর এবং ১২৩টি পশমের সোয়েটার পুনর্বার বিতরণ করেছেন।

বিহার বন্যাত্রাণ: কোশি নদীর গতি-পরিবর্তনের জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সহর্ষ জেলার নওহাট্টা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ২৫টি গ্রামের ৪৫০০ পরিবারের মধ্যে ৫০০০ শাড়ি এবং ৫০০০ ধুতি বিতরিত হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য মন্দাপম্ শিবির থেকে ৪৩ শাড়ি, ৪২০ লুঙ্গি, ৪৩ জামা এবং ১১২৫ ব্যবহৃত পোশাক বিতরণ করা হয়। তাছাড়া সকালে ৭৮১৮ জন ছাত্র এবং শিশুদের খাবার দেওয়া হয়।

সৌরাষ্ট্রে বন্যার্তদের পুনর্বাসন: রাজ-কোট রামকৃষ্ণ আশ্রম জুনাগড় জেলায় অর্থনৈতিক সাহায্য এবং গৃহনির্মাণ কার্য অব্যাহত রেখেছেন। গত ১৯ অক্টোবর গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী বি. কে. নেহেরু আনন্দপুর মীভাসা গ্রামে একটি নবনির্মিত বহুমুখী আবাসন, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন।

বালগেরিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়াতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

'শান্তি: পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা'—এই বিষয়ে বালগেরিয়ার লেখক-সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২৩ থেকে ২৫ অক্টোবর উনপঞ্চাশটি দেশের দুশ প্রথিতযশা লেখকদের নিয়ে সোফিয়াতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ্ কালচারের সচিব স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর আলোচনা সেখানে প্রশংসিত হয়। পরে তিনি

সোফিয়া দূরদর্শনে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত সায়েন্স আকাদেমীর আমন্ত্রণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ২৬ অক্টোবর মস্কোতে যান। সেখানে উক্ত সংস্থাদ্বয়ের আয়োজিত সভায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের পটভূমিকায় 'ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য'—বিষয়ে ভাষণ দেন। সোফিয়া, মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি অঞ্চলের বহু প্রসিদ্ধ সংস্থা ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান তিনি পরিদর্শন করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আকস্মিক প্রয়াণে সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি বক্তৃতা-সূচী বাতিল করে ৭ নভেম্বর ভারতে ফিরে এসেছেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

৬ কার্তিক (২৩ অক্টোবর) মঙ্গলবার মায়ের বাড়ীতে সারারাত্রিব্যাপী এক গম্ভীর ভাবদ্যোতক পরিবেশে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ এবং ২১ কার্তিক (৫ ও ৭ নভেম্বর) যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী এবং শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: পূজাবকাশের পরে পুনরায় সারদানন্দ হলে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে প্রতি রবিবার স্বামী নিরাময়ানন্দ গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামী অজজানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ: (নরোত্তম মহারাজ) গত ২৬ নভেম্বর, বেলা ২-৩৫ মিনিটে আকস্মিক হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। সকাল ৯টা থেকে সহসা তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করতে থাকেন—যথারীতি চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বুকে ঐ ব্যথা অনুভবের আগে পর্যন্ত তিনি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজীর (খোকা মহারাজের) কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ঢাকা মঠেই যোগদান করেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজের) নিকট তিনি ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন যথাক্রমে ১৯২৯ এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। ঢাকা ছাড়াও তিনি দিল্লী, কনখল, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, বালিয়াটি, সোনার গাঁও প্রভৃতি কেন্দ্রে সেবা-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সরল অমায়িক ও অনাড়ম্বর জীবনের " তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

লোকান্তরে স্বামী নিরাময়ানন্দ

'উদ্বোধন'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশের ঠিক প্রাক্কালে এক মর্মান্তিক সংবাদ বহন করতে হচ্ছে। 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'—বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ, তথা উদ্বোধন কার্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ এবং পত্রিকার সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ (বিভূতি মহারাজ) সহসা হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে গত ২৬ নভেম্বর রাত্রি ৮-৩৫ মিনিটে বোম্বে নানাবতী হাসপাতালে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর।

মিশনের বোম্বে আশ্রমের হীরক জয়ন্তী উৎসবে যোগদানের জন্য মাত্র ২০ নভেম্বর তিনি বিমানযোগে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে বিমানেই রোগাক্রমণের সূচনা হয়। বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেন। প্রথমে তাঁকে মিশনের চিকিৎসালয়ে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হয়। পরে সেখানকার অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শানুযায়ী ২২ নভেম্বর তাঁকে নানাবতী হাসপাতালের ইন্‌টেন্‌সিভ্ কারডিঅ্যাক্ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ফিরিয়ে আনতে বাইরে থেকে 'পেস্ মেকার' যন্ত্রও বুকে বসানো হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতি রোধ করা সম্ভবপর হচ্ছিল না মোটেই। বিশিষ্ট চিকিৎসকমণ্ডলীর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর জীবনরক্ষা সম্ভবপর হল না। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ তাঁরা বলেছেন—তীব্র ধরণের ফুসফুসীয় শোথ—'অ্যাকিউট্ পালমন্যারি ইডীম্যা' (acute pulmonary Oedema)।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, সারগাছি আশ্রম এবং কলিকাতাস্থ বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ কলেজজীবনেই। সারগাছি আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের পুণ্য সান্নিধি এবং তাঁর ব্যক্তিগত সেবাদির সৌভাগ্য তিনি সেই ছাত্রাবস্থাতেই লাভ করেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্মৃতি-কথা'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কাজে শ্রুতলিপিকারের ভূমিকা তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় সুকৃতি। পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজই তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সারগাছিতে। ছাত্র হিসাবেও তিনি কৃতী ছিলেন। ফলিত গণিত শাস্ত্রে এম্-এস্-সি অধ্যয়নরত অবস্থাতেই অন্তরের বৈরাগ্য তীব্রতর হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে গৃহত্যাগী হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যাপীঠে আনুষ্ঠানিক অর্থেই তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। অতঃপর শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বেলুড়ে সারদাপীঠস্থ বিদ্যামন্দিরে বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মনিরত থেকেছেন। মনসাদ্বীপ, চেরাপুঞ্জি, আসানসোল, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান, বোম্বে প্রভৃতি মিশন বা মঠ কেন্দ্রগুলিতেও নানা সময়ে তিনি ভারপ্রাপ্ত সচিব বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তবে তাঁর কর্ম-জীবনের অধিকাংশ ব্যাপৃত ছিল 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তথা উদ্বোধন কার্যালয়ে। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ এবং 'মায়ের বাড়ী'র অধ্যক্ষরূপে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ছিলেন। পরে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইতে তিনি পুনরায় 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে আসেন



শ্রীমৎ স্বামী নিরাময়ানন্দ

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ এবং বর্তমান নিয়মানুক্রমে উদ্বোধন পত্রিকারও সম্পাদকরূপে। জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত তিনি উল্লিখিত দায়িত্বভার বহন করেছেন।

স্বামী নিরাময়ানন্দের সাহিত্যপ্রতিভা সুবিদিত। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও কবিত্ব ছিল তাঁর স্বভাব-ধর্ম। 'বৈভব' ছদ্মনামে প্রকাশিত কবিতাগুলি উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকার স্মৃতিতে চির অম্লান থাকবে। বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখার সংখ্যা প্রচুর। দর্শন-সাহিত্য-কাব্যপ্রীতি এবং তার সঙ্গে প্রকৃতিগত সহজ অনাবিল কৌতুকপ্রিয়তা তাঁকে সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় করেছিল। তাঁর ছাত্রবাৎসল্য ও অমায়িক বন্ধুপ্রীতি ছিল দৃষ্টান্তস্থানীয়।

যুগাচার্য স্বামীজীর আবির্ভাব-শতাব্দী উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' সুবৃহৎ দশখণ্ড গ্রন্থের সম্পাদনার মুখ্য দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল স্বামী নিরাময়ানন্দের উপরেই। দুইখণ্ডে প্রকাশ্যমান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থেরও ভার তাঁর হাতে অর্পিত ছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বহু পুস্তকই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত। তাঁর স্বরচিত বেশ কয়েকখানি পুস্তক বহুল প্রচারিত। 'শ্রীশ্রীমা সারদা', 'ছোটদের বিবেকানন্দ', 'স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি সঞ্চয়' প্রভৃতি পুস্তকগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে সুলেখক, সুকবি এবং সুবক্তা রূপে খ্যাত ছিলেন। দুর্গম তীর্থপর্যটন এবং হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ তাঁর নিরাসক্ত পরিব্রাজক জীবনেরই সাক্ষ্য দেয়।

স্বামী নিরাময়ানন্দের তিরোধানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যক্ষেত্রের একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিকে, সঙ্ঘের একজন প্রবীণ অথচ সকলেরই সহমর্মী বন্ধুকে, অগণিত অনুরাগী জনের অতি শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয় সুহৃদকে আমরা হারালাম। তাঁর অনাড়ম্বর সরল বৈরাগ্যপ্রবণ জীবন ছোট-বড় সকলকেই অনায়াসে মুগ্ধ করত। যাঁরা ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছেন তাঁরা তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন—একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় বলে ভালবাসতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁর দেহ-বিমুক্ত আত্মা নিত্যকালের জন্য দিব্য আনন্দে মগ্ন থাকবে, এটাই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিবিধ সংবাদ

নিবেদিতা শিল্প-পুরস্কার

গত ৫ অগস্ট ১৯৮৪ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বাগীশ্বরী অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গো-পাধ্যায়কে নিবেদিতা শিল্প-পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এই সঙ্গে বসে-আঁকো প্রতিযোগিতারও পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত "আমাদের নিবেদিতা" গ্রন্থের স্বত্ব থেকে যা তিনি আশ্রমকে দান করেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ এবং পুরস্কার বিতরণ করেন আশ্রমসচিব শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

উৎসব

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১১ ও ১২ অগস্ট দুইদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন কাটিহার, মালদহ ও সারগাছি আশ্রমের সন্ন্যাসিগণ।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্থানীয় ৫টি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল —'বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুবসমাজ'। গত ১৫ অগস্ট ১৯৮৪ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী

গত ২৮.১০.১৯৮৪ **বিবেকানন্দ সোসাইটিতে** ভগিনী নিবেদিতার ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণার সভানেতৃত্বে 'নিবেদিতা ও তাঁর ভারতসেবা' পর্যায়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী দীপ্তি ঘোষ, অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী রাইকমল দাশগুপ্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উপর আলোচনা করেন। স্বামী নিরাময়ানন্দজী রচিত 'নিবেদিতা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন শ্রীমতী শুভা বসু।

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের মহিলা শাখা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার ১১৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা।

পাঠচক্র ও ধর্মালোচনা

গত ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ১৯৮৪ স্যাণ্ডেলের বিল আঞ্চলিক বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী মেধসানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও আজকের সমাজ', 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রসঙ্গে স্বামীজী', 'ধর্ম ও রাজনীতি' ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

গত অক্টোবর মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে স্বামী দিব্যানন্দের উপস্থিতিতে যথাক্রমে গোবিন্দকাটী, যোগেশগঞ্জ ও কনকনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন স্থানীয় শিক্ষক ও ছাত্ররা।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য **শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার** গত ১১ সেপ্টেম্বর ৮৮ বৎসর বয়সে জামসেদপুরে দেহত্যাগ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দের পূতসঙ্গ ও আশীর্বাদলাভ তাঁর জীবনের অসাধারণ গৌরব। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সরিষা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকতা ছাড়াও আসাম ও বাংলাদেশে বিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্বভারতী পত্রিকার সহ-সম্পাদনা প্রভৃতি নানাবিধ কর্মে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী সন্তান ভাই ভূপতির মন্ত্রশিষ্য **শ্রীনবকুমার সাহা** গত ৩ অক্টোবর শারদীয়া মহানবমীর দিন সকাল ৭-৪৫ মিনিটে কলিকাতার বাগবাজারে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও আশীর্বাদলাভে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অধিকাংশ পার্ষদদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার অসাধারণ সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছিলেন। কাশীধামে শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দের প্রত্যক্ষ সেবা এবং শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দের সাহচর্যে বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থাদি পর্যটন নবকুমার বাবুর জীবনে বিশেষ উল্লেখ্য অধ্যায়। কিছুকাল তিনি সারগাছিতে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ঘনিষ্ঠ সঙ্গে বাস করার সুযোগও পেয়েছিলেন। কথামৃতকার শ্রীম—মাস্টার মহাশয়ের নিকটেও তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্তা আজীবন ধর্মনিষ্ঠ ও সেবাপরায়ণা **শ্রীমতী কুন্তলাসুন্দরী বসু রায়** গত ১২ অক্টোবর ৯০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। তাঁর স্বামী প্রয়াত শ্রীজগৎনাথ বসু রায়ও ছিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের চরণাশ্রিত।

প্রয়াত তিন ভক্তের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে অনন্ত শান্তি লাভ করুক—এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।



৮৬তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯১



শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

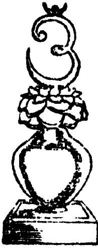
১১ই শ্রাবণ
১নং মুখার্জী লেন,
বাগবাজার

কল্যাণীয়াসু

মা তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পথ হারাবে কেন? পথ পাবার জন্যেই ত এখানে আসা। যখন মনে অশান্তি আসে ৺ঠাকুরকে খুব ডাকিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরাণী





কথাপ্রসঙ্গে

'তোমাদের একজন মা আছেন'

মনে পড়িতেছে সেই চিরন্তন কাহিনীটিকে, যাহাতে আমাদের জ্বালাময় জীবনের ছবিটি বড় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে,—যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতির পথ-রেখাটিও সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে। প্রজাবৎসল আদর্শ নৃপতি সুরথ। কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তাঁহাকেও নিজ রাজ্য ও আপন পরিজন হারাইতে হইয়াছিল। দূষিত সংসার-পরিবেশে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি মৃগয়ার ছলে একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। সমৃদ্ধ সুরম্য নগর অপেক্ষা শ্বাপদাকীর্ণ গভীর অরণ্যই তাঁহার প্রাণধারণের উপযোগী বোধ হইয়াছিল।

না, বনেও তিনি পূর্ণ শান্তি পাইতেছিলেন না —সেখানেও তাঁহাকে চিন্তা-জ্বালায় দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। সংসারের মমতা তাঁহার মনকে পশ্চাতে টানিতেছিল—স্বজন-বান্ধব অমাত্য-ভৃত্য প্রভৃতির মঙ্গলামঙ্গল ভাবনা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। 'সোঽচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টমানসঃ।' অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় এক আগন্তুককে ঐ বনস্থলীতে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও তাঁহাকে সান্ত্বনাদাতারূপে পান নাই; —পাইয়াছিলেন একজন সমব্যথীরূপে।

আগন্তুক ব্যক্তির পরিচয়—একজন ধনাঢ্য বৈশ্য, নাম—সমাধি। কিন্তু তিনিও বিষাদ-কাতর ও মলিনশ্রী ছিলেন। উদাস মন লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সমাধিও সেই অরণ্য-পরিবেশেই যেন কথঞ্চিৎ জুড়াইতে পারিয়াছিলেন।

রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আপনি কে, কেনই-বা এই গহন বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,—আপনাকে এমন শোকাকুল ও দুর্মনা দেখাইতেছে কী কারণে?' 'সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে।'

বিত্তবান বৈশ্যেরও হৃদয় তখন সংসারের আঘাতে অপমানে ক্ষতবিক্ষত। আপন স্ত্রী-পুত্র এবং আত্মীয়গণ ধনলোভে, নানা অসাধু উপায়ে তাঁহাকে গৃহহারা হইতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু হায়, বনবাসী হইয়াও স্ত্রী-পুত্র-স্বজনদের শুভাশুভ সংবাদ কিছু না জানিয়া সমাধি উৎকণ্ঠায় কাঁদিয়া ফিরিতেছিলেন। আক্ষেপ করিতেছিলেন—মনকে কেন কঠিন করিতে পারিতেছিলেন না। 'করোমি কিং যন্ন মনস্তেষু অপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্।'

অকস্মাৎ সৌভাগ্যক্রমে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি অরণ্য মধ্যে অবস্থিত শ্রীমৎ মেধা ঋষির আশ্রমে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। সংসারক্লিষ্ট রাজা ও বৈশ্য উভয়েই মুনিবরকে প্রণাম-সম্ভাষণাদি করিয়া আপন আপন মনোব্যথা নিবেদন করেন। কাতর কণ্ঠে অকপটে ইহাও জানাইয়াছিলেন—'বিষয়াসক্তির দোষ ভালভাবে জানিয়া শুনিয়াও আমাদের চিত্ত মমতায় জড়াইয়া রহিয়াছে।' 'দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ'—মেধা মুনির নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইয়াছিলেন তাঁহারা।

মেধা ঋষি আর্ত নৃপতি ও বৈশ্যকে নানাভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন

তাহার নিষ্কর্ষ হইতেছে: জীব মায়াধীন। সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবেই জীব মোহ-গর্তে এবং মমতাবর্তে বার বার নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানীদের মনকেও দেবী মহামায়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। তাঁহার সৃষ্টি লইয়া তিনি এইভাবেই ক্রীড়া করিয়া চলিয়াছেন। তথাপি ইহাও সত্য যে, 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' তিনি প্রসন্না হইলে জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বয়ং-ই বরদা হইয়া থাকেন। তিনি যেমন সংসার-ক্রীড়াময়ী, আবার ঠিক তেমনই মোক্ষ-প্রদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সনাতনী—ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী।

অতঃপর মেধা ঋষি উভয়কেই সেই দেবী মহামায়ার 'যৎ-স্বভাবা', 'যৎ-স্বরূপা', 'যৎ-উদ্ভবা' ইত্যাদি তত্ত্ব সবিস্তার শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং উপদেশ দিয়াছিলেন সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হইতে। সংসারে শান্তিলাভের পথ ইহাই—সংসারের পারে পরমা শান্তি বা মোক্ষের উপায়ও এই-ই। 'তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্ ।/ আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥'

শ্রদ্ধান্বিত রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মেধা মুনির উপদেশ শিরোধার্য করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন সহ দেবী মহামায়ার আরাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। জগদম্বাও তাঁহাদের ভক্তিতে তুষ্টা হইয়া উভয়কেই যথাযোগ্য বরপ্রদান করিয়াছিলেন। রাজা সুরথ শত্রুবিনাশপূর্বক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের শক্তি প্রার্থনা করিয়া তাহাই পাইয়াছিলেন। কিন্তু সংসার-বিরক্ত বৈশ্য সংসারকে পুনরায় ফিরিয়া পাইতে অভিলাষী ছিলেন না—তিনি উহা হইতে অব্যাহতি বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। মহামায়াও তাঁহার অভিলষিত বরদানে কার্পণ্য দেখান নাই। সস্নেহে বলিয়াছিলেন—'মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানই তোমার লাভ হইবে।' 'সংসিদ্ধৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।'

সুরথ ও সমাধি দুইটি প্রতীক চরিত্র—যন্ত্রণা-কাতর উদ্‌ভ্রান্ত আমাদেরই জীবনের রূপক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত এই কাহিনীটি তাই পুরাতন কিন্তু চিরায়ত। যুগপৎ সংসার-বন্ধন ও সংসার হইতে মুক্তির পথ ইহাতে রঞ্জিত রহিয়াছে চির-কালের মানুষের জন্য। কিন্তু মেধা ঋষি-উপদিষ্ট দেবী মহামায়ার স্বরূপ ও তত্ত্ব উপলব্ধি করা এই জটিল সংসারের মাঝে অতি কঠিন প্রয়াস—তাঁহার প্রসন্নতা-বিধান ততোধিক দুস্তর সাধন। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের তাই একটি নিদারুণ হাহাকার—আদ্যাশক্তি মহামায়াকে দুরধিগম্যা দোর্দণ্ড তেজোময়ী রূপে নহে, একান্তভাবে নিজের করিয়া নিকটে পাইবার আকাঙ্ক্ষায়। জগজ্জননীকে সে আপন গর্ভধারিণী জননীর বেশেই পাইতে ব্যাকুল। আর্ত মানবের আকুল তৃষ্ণা অবশেষে মিটিয়াছে—এই ধরণীর মাটিতেই আদ্যাশক্তির স্থূল আবির্ভাবকে সে চর্মচক্ষেই দেখিয়াছে—তাঁহাকে 'মা' ডাকিয়া তাপিত প্রাণকে শীতল করিতে সুযোগ পাইয়াছে।

পুরাণের সুরথ ও সমাধিকে সংসার ছাড়িয়া দূরে—অতি দূরে নিবিড় অরণ্যে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, আত্ম-সমীক্ষার সুযোগ খুঁজিতে। ইদানীন্তনের সুরথ-সমাধিরা কিন্তু গৃহকেই অরণ্য করিয়া তুলিয়া রুদ্ধশ্বাসে দিনপাত করিয়া থাকেন—অশেষ যন্ত্রণায় জর্জর হন। পৌরাণিক সেই অরণ্যের মধ্যে দৃষ্টিগোচর ছিল 'মুনি-শিষ্য-উপশোভিতম্' একটি আনন্দ-নীড়—মেধা ঋষির আশ্রম। ঋষির সান্নিধ্যও তাই অনায়াসলভ্য ছিল স্বজনত্যাগী সুরথ-সমাধির পক্ষে। কিন্তু এখন? আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিতেছে—সুরথ-সমাধিদের করুণ হাহাধ্বনিতে: 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই ?/ কোথা হতে আসি, কোথা

ভেসে যাই।' পুরাকালে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, অধুনাতনের ঘটনাবলী তাই অনেক কারণেই স্বতন্ত্র। জগন্মাতাকে রক্ত-মাংসের শরীর ধরিয়া নিখুঁত ঘরের 'মা'-টি সাজিয়া আমাদের মাটির ঘরে আসিতেই হইয়াছিল—পথহারা সন্তানদের নিজেরই পানে টানিয়া লইতে! সন্তানের রুচি ও যোগ্যতা ভেদে ভোগৈশ্বর্য দিয়াছেন, দিতেছেনও,—আবার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানও প্রদান করিয়াছেন, করিয়া থাকেনও। যেমন, অতীতে সুরথকে প্রবৃত্তির পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাধিকে বর দিয়াছিলেন সংসার-নিবৃত্তিজনক বৈরাগ্য ও জ্ঞান।

শ্রীশ্রীমা সারদা—আবির্ভূতা 'বিদ্যা পরমা'। 'মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী' সারদা—আবার তিনিই 'সংসার-বন্ধনহেতুঃ'—পরমর্ষিগণ তাঁহাকেই জানিয়াছেন 'সর্বেশ্বরেশ্বরী' রূপে।

অনেক সন্তান পথ হারাইয়া, হতাশ হইয়া জননী সকাশে অভিমানে খেদে গ্লানিতে ও অনুতাপ-জ্বালায় কত কি জানাইয়াছে! অভয়া জননী কিন্তু পুরাকালের ভাষায় একটিবারও বলেন নাই—পথ ফিরিয়া পাইতে দুশ্চর তপস্যার প্রয়োজন, কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনার্থ নিঃসঙ্গতা সাধন আবশ্যক। বরং তিনি অপূর্ব স্নেহ-তীক্ষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন,—'পথ হারাবে কেন? পথ পাবার জন্তই তো এখানে আসা। যখন মনে অশান্তি আসে ঠাকুরকে খুব ডাকিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে।' সহজ সরল অব্যর্থ পথ-নির্দেশ! অবিশ্বাসের কৃষ্ণান্ধকার কাটাইয়া পথিককে প্রবল আত্মবিশ্বাসের আলোকিত রাজ-পথে তুলিয়া দিতে সুনিপুণা এই মা।

সর্বানুভূ মা। সন্তানের ব্যথা-বেদনার অনু-ভূতিতেই তিনি অনুক্ষণ জাগ্রতা। স্খলিত-পথ অখ্যাত এক আশ্রিত জন হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া অন্তরের সকল গরল মাতৃপদে ঢালিয়া দিয়াছেন সুদীর্ঘ পত্র-মাধ্যমে। সেই উত্তপ্ত গরলে পত্রের পৃষ্ঠাগুলিও যেন স্পর্শের যোগ্য ছিল না। মাকে যিনি পত্র পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, তিনি সেই ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রটি হাতে লইয়া উহার মাত্র দুই এক ছত্র পড়িয়াই আতঙ্কে ও লজ্জায় পুনরায় উহাকে খামে ভরিয়া সরাইয়া রাখেন—মায়ের দৃষ্টির আড়ালে! 'সর্বতোঽক্ষি' যিনি তাঁহার দৃষ্টি কোন্ দিকে নাই? তাই অদৃশ্য অগোচর সেই পত্রটিরও প্রতি ছত্র অতি স্বাভাবিক অনায়াস-গোচর ছিল তাঁহার কাছে। তথাপি জানিতে চাহিয়াছিলেন—'ওখানা পড়লে না কেন?' হতচকিত সেবক সভয়ে উত্তর দিয়াছিল যে উহা পড়িবার সাধ্য তাহার নাই। চিরকল্যাণময়ী জননীর মুখে তৎক্ষণাৎ উচ্চারিত হইয়াছিল—'বুঝেছি,—পড়তে হবে না। তাকে এ-রকম চিঠি লিখতে বারণ করে দাও।...আর লিখে দাও—আগে ছিলে রাহুগ্রস্ত চাঁদ, এখন ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছ—পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণ! ভাবনা কিসের? ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন।'

সংসারের সকল মানুষই যাত্রী। কিন্তু আলোকের যাত্রী আর কয়জন? মৃত্যুর দ্বারা পশ্চান্ধাবিত মানুষ যে-পথে চলিয়াছে, সাধারণ চক্ষে তাহার সম্মুখে শুধু আছে নিয়তির অন্ধকার। পথের ক্ষীণ আলোটুকুও যাহার নিভিয়া গিয়াছে, সম্মুখের সেই অন্ধকার যে তাহার পক্ষে আরও গাঢ়, অনেক বেশি দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এমনই এক রাত্রি-অন্ধকারের যাত্রি-দম্পতি—তাহাদের একমাত্র সন্তানের বিয়োগ-শোকে দিশাহারা হইয়া মাতৃ-পদে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুতাড়িত উহারা ছুটিয়া আসিয়াছিল একেবারে শ্মশানভূমি হইতে। সন্তানহারা মহিলাটি শোকে উন্মাদিনী! উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে

আসিয়া বিলুণ্ঠিত হইয়াছে বটে—কিন্তু ইতঃপূর্বে সে কদাপি মাকে দুই চোখে দেখে নাই, মাতৃ-মহিমার পরিচয়ও কিছু পায় নাই। শ্মশানের অবিন্যস্ত মলিন বেশ সহ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পবিত্রতাস্বরূপিণীর চরণস্পর্শে লৌকিক বাধা এবং পরিসেবিকাগণের ঘোর আপত্তি কিন্তু ঐ শোক-পাগলিনীকে নিরস্ত করিতে পারে নাই,—কারণ সাক্ষাৎক্লেশহারিণী মহামায়ার আকর্ষণ দুর্নিবার! শ্রীশ্রীমা সারদার উক্তি: 'এমন দুঃখের সময় আমার কাছে আসবে না তো কোথায় যাবে?' শোক-বিমূঢ়া সেই নারী, মায়ের চরণে পড়িয়া মাত্র একটি মিনতিই বারে বারে জানাইয়াছে—সংসারে সে কি লইয়া এখন থাকিবে, কেমন করিয়া বাঁচিবে, জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিবে কিরূপে? শ্রীশ্রীমা তাঁহার অপার্থিব স্নেহে করুণায় ঐ প্রপন্না কন্যার বক্ষের জ্বালাকে চিরদিনের জন্যই জুড়াইয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু কোন তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া নহে, অথবা গূঢ় কোন ক্রিয়া-কৌশল সাহায্যেও নহে। শান্তিদায়িনী মা তাঁহার মেয়েকে শান্তি দিয়াছিলেন, একান্ত স্বকীয় রীতিতে—নিজ অমৃত-সঞ্চারিণী কারুণ্য শক্তিতে। নিকটবর্তী সেবককে ডাকাইয়া তাহার নিকট হইতে নিজের একখানি ছবি চাহিয়া লইয়া, মেয়েটির হাতে দিয়া আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিয়া দিয়াছিলেন মাত্র: 'রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এই ছবিকে প্রণাম করবে। দেখবে ধীরে ধীরে তোমার মন শান্ত হয়ে আসবে।'

দুঃখ-জ্বালা-হতাশায় ভরা ইহ সংসার চিরকাল একইরূপ। ইহা লইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া কালাতিবাহন নিরর্থক। বরং ঐ-সকল অশান্তি ও নিরাশার মাঝে জীবনের সর্বোচ্চ ঐশ্বর্য আহরণের সুযোগও যে প্রভূত রহিয়াছে—এই সত্যটিকে উপলব্ধি করিতে ও জীবনে প্রয়োগ করিতে মনোযোগী হওয়াই শ্রেয়ঃ। জীবনের পথ বড়ই বন্ধুর, অত্যন্ত ক্ষুরধার, গভীর তমসাকীর্ণ। তাই এখানে পথ ভুলিবার, লক্ষ্য হারাইবার আশঙ্কাও পদে পদে। তথাপি ইহাও ততোধিক সত্য যে প্রতি পদেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মাতৃপদের চিহ্ন। দৃষ্টি-শক্তি থাকিলে, সন্ধান মিলিয়া থাকে ঠিকই। সকল পথেই মা, পথ জুড়িয়াই মা—পথের অবসানেও মা। অতএব পথ হারাইব কেন? আমাদের মা আছেন,—এবং তিনি আছেন বলিয়াই ভরসা রাখি, পথ আমরা পাইবই। প্রাচীন সুরথ-সমাধিকে অনেক অশ্রুজল ফেলিতে হইয়াছে, বনে বনে ঘুরিতে হইয়াছে, কঠোর আরাধনা করিতে হইয়াছে। আমাদের জন্য কিন্তু মা এবার স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া, নিজে আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছেন! বলিতেছেন—'কখনো কি অনুভব করনি যে আমি আছি তোমাদের সাথে সাথে? আর কেউ না থাকে থাক্, তোমাদের একজন মা আছেন…।'

ভয়ঙ্কর আঘাত: একটি চরম শিক্ষা

বিজ্ঞানের অপব্যবহার এবং মানুষের সীমাহীন লোভ সমাজকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে, তাহার এক ভয়ঙ্কর নজির রাখিয়া গেল ভূপাল। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে সম্প্রতি যে মহা-প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়াছে মানবেতিহাসে উহার তুলনা নাই। শুধু স্মরণীয় হইতে পারে হিরোসিমার সেই ঐতিহাসিক মানবনিধন-ঘটনা। একটি কার-খানার বিষ-বাষ্পের প্রতিক্রিয়ায় রাত্রিতে ঘুমন্ত মহানগরীর দুই সহস্রেরও বেশি মানুষ চিরনিদ্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে,—বিশ সহস্রেরও অধিক নারী-শিশু-পুরুষ আচ্ছন্ন অবস্থায় হাসপাতালে শুইয়া মরণের সহিত যুঝিয়াছেন অনেকদিন।

রাজপথে এবং নগরীর অলিতে গলিতে অজস্র পশুপক্ষীর মৃতদেহ এবং অসংখ্য শব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বেশ কয়েকদিন ধরিয়া। দৃষ্টিহীন, বধির, চেতনাহীন অর্ধমৃত নর-নারীর সংখ্যা শেষ অবধি কোন্ অঙ্কে গিয়া পৌছিবে—বা, উহাদের গতি কী হইবে, তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

বৈজ্ঞানিক যুগের চরম উৎকর্ষের মধ্যাহ্নকালে, অসহায় মানুষ একটু নির্বিষ বাতাসের জন্য ইতস্ততঃ ছুটিয়া মরিতেছে,—এই মর্মান্তিক দৃশ্য পৌরাণিক যুগের প্রলয়কাণ্ডের চিত্রগুলিকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। বিগত ৩ ডিসেম্বর, মহানগরী ভূপালে সংঘটিত রাত্রির শেষ প্রহরের বিভীষিকা ইহাই।

যে কারখানার উদ্গীর্ণ বিষ-বাষ্প হইতে এই নরঘাতী প্রলয় ঘটিল, সেখানে পোকামাকড় মারিবার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উহা একটি বহুজাতিক মূলধনপুষ্ট বিশ্ববিশ্রুত সংস্থা। সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাহাদের কীটনাশক উদ্যোগটি শেষ পর্যন্ত এইরূপ জীবনাশক মহোদ্যোগে পরিণত হওয়াতে আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁহারা ইহাকে নিতান্তই একটি দুর্ঘটনা কিংবা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার বলিয়া সমবেদনা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি দ্বারা কাহারও প্রজ্বলিত শোকাগ্নিতে এক বিন্দুও সান্ত্বনার বারি সিঞ্চিত হয় নাই,—হইবার কথাও নহে।

অনিয়ন্ত্রিত ভোগ-স্পৃহা, মাত্রাতিরিক্ত লোভ এবং নিদারুণ সুখ-লোলুপতা বিজ্ঞানকে ক্রমাগতই প্ররোচিত করিতেছে অপপ্রয়োগের পথে। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বর্তমান পৃথিবীকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া মানুষ আতঙ্কিত। ভারতবর্ষেও কিছু ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। অন্ধ অনুকরণবিলাসী নবীন ভারত বুঝি সর্বনাশের দিকেই সবেগে ধাবমান,—ভূপাল যেন এই চরম শিক্ষাই দিয়া গেল। ভাবী গুরুতর বিপর্যয়ের হৃদয়বিদারক সঙ্কেত ইহা।

ধরিত্রী জননী তাঁহার সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভার আপন বক্ষে স্বতই বহন করিতেছেন। কিন্তু প্রতিজনের লোভ ও ভোগের ইন্ধন সরবরাহের মতো অঢেল পুণ্য উহা অবশ্যই নহে। গান্ধীজির একটি খেদোক্তি এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হইতেছে। তিনি একদা বলিয়াছিলেন—'The Earth has enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed'. বাস্তবিকই বাঁচিবার জন্য প্রয়োজন যতখানি, আমাদের লোভ তাহাপেক্ষা অনেক বেশি। তাই বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগানো হইতেছে,—যেন-তেন উপায়ে আরও আরও ভোগ-পণ্য যাহাতে আমরা ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি নিজেরাই। প্রকৃতির আনুকূল্যের জন্য এতটুকুও ধৈর্য নাই আমাদের,—দৃষ্টি নাই কাহারও ক্ষয়-ক্ষতির দিকে,—অপেক্ষা নাই বিধাতার আশীর্বাদ-প্রত্যাশার।

বাঁচিবার জন্য কৃষির প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু সাড়ম্বর ভোগ-বিলাসই যদি হয় বাঁচিবার উদ্দেশ্য, তবে সমৃদ্ধি-সঞ্চয়েরও সীমা রক্ষা করা অসম্ভব হইবেই। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তখন মানুষকে বহুবিধ বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত কর্মোদ্যমে লিপ্ত হইতে হয়, যাহার অবধারিত ফলশ্রুতি হইতেছে অশান্তি,—এমন কি আত্মহনন। অধিক ব্যাখ্যা বাহুল্য এ-বিষয়ে। জমিতে অতিরিক্ত ফসল ফলাইবার উচ্চাশায়, কৃষি-সমৃদ্ধির অপরিসীম কামনায়, সবুজ বিপ্লবের উদ্দাম উন্মত্ততায় এবং ভোগের মাত্রাহীন লোভে যাহা যাহা ঘটানো হইতেছে, সেই বাস্তব চিত্রগুলি উদ্বেগজনক নয় কি? ফসলের পরিমাণ-প্রাচুর্যে, সবুজের

সমারোহে, অর্থনীতির পরিস্ফীতিতে ক্ষুধাতুর মানুষ তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু অন্য দিকে জমি ও ফসলের পারস্পরিক প্রকৃতিগত সম্বন্ধ-সূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা নিজ স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে জমি ও ফসলের সহিত মানুষেরও যে একটি আত্মিক ও পরমহিতকর সম্পর্ক, সৃষ্টির সেই উষাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, ক্রমে তাহাও বিপর্যস্ত এখন। পরস্পরের একটি সূক্ষ্ম আত্মীয়তার কারণেই, আদান-প্রদানমূলক একটি সুশৃঙ্খল বিধি-ব্যবস্থা প্রকৃতির স্বভাবে বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। যেমন, জমি হইতে ফসল তুলিয়া লওয়ার পরে, পরিত্যক্ত গুচ্ছ শিকড়াংশই গোময়াদি জৈব সারসহযোগে, বৎসরান্তে জমিকে পুনরায় উৎপাদনোপযোগী শক্তি প্রদান করিয়া থাকে—জমির অপচিত শক্তিকে পূরণ করিয়া তোলে। সেই সঙ্গে নিয়মিত বর্ষণ ও পর্যাপ্ত সেচের জল যুক্ত হইলে ঐ জমিতে সোনার ফসল আপনিই ফলিয়া থাকে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস,—এই প্রাকৃতিক নিয়মে আধুনিক মানুষ আর ভরসা রাখে না। ধৈর্যহীন লোভাতুর মানুষ বিজ্ঞানের কৌশলকে প্রযুক্ত করিয়া নানা বিকৃত পন্থায় জমির ফলন বাড়াইবার জন্য প্রবলভাবে উদ্যমী হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে রাসায়নিক সার জমিকে অধিক উর্বরা করিতেছে, পক্ষান্তরে ঐ সার এবং আনুষঙ্গিক অনুপান স্বরূপ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থগুলি মাটির সহজাত ও সহজীবন কীট-অনুকীটের বংশধারাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃতির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! বিশেষজ্ঞরা সকলেই বলেন, ঐ কীট-সমাজই নাকি জমির উর্বরাশক্তির সংরক্ষক ও পরিপোষক। বিজ্ঞানের নির্বিচার প্রয়োগ তাই অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ভার-সাম্যকে বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। কেবলমাত্র কৃষিতেই নহে—অন্যান্য দিকেও। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কীটনাশক রাসায়নিক প্রকল্পটি যে ভয়ানক আঘাত আমাদিগকে দিয়া গেল, উহা কি আমাদের জন্য একটি চরম শিক্ষাও রাখিয়া যায় নাই?

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রতিবৎসর এই তৃতীয় বিশ্বে মাত্র কীটনাশক রাসায়নিকের বিষক্রিয়াতে দশ সহস্র মানুষ মৃত্যু বরণ করে এবং কয়েক লক্ষ মানুষ শারীরিক বিপর্যয়ের শিকার হইয়া থাকে। ততোধিক ভয়াবহ সংবাদ—বৎসরে উৎপন্ন তিন শত পাঁচ টনেরও অধিক পরিমাণ ঐ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মানুষের বাঁচিবার পরিবেশকে দূষিত করিতেছে—বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া। যাহার ফলে ক্যান্সার, জন্মগত বিকৃতি, বন্ধ্যাত্ব, দৃষ্টিহীনতা এবং আরও বহুবিধ দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্রমপ্রসার ঘটিতেছে। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে উক্ত কীটনাশক পদার্থ এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ভূপালের মর্মান্তিক মৃত্যু-মিছিল কি আমাদের বিজ্ঞানী, গবেষক ও রাষ্ট্রপরিচালকদের সচেতন করিয়া তুলিবে না? রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং বিশ্বের বিজ্ঞানী-গোষ্ঠীর কাছে ঠিক এই আবেদনই জানাইয়াছেন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও সতেজ ভাষায়। সদ্য সমাপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৭২তম অধিবেশনে দেশের ও বিদেশের সমাগত চারি সহস্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে সম্বোধন করিয়া রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন:

'আপনারা ক্ষমতাধরদের বুঝাইয়া বলুন যে বিজ্ঞানের শক্তি উন্নয়নের জন্য—মানব-কল্যাণের জন্য,—ধ্বংসের জন্য নহে। বিজ্ঞানের অপব্যবহারের এক চূড়ান্ত নজির হইল ভূপাল।…এই দুর্ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, পরিবেশ ও মানুষের জীবন-রক্ষায় সার্বিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,

সরকারের এবং বিজ্ঞানীদের পক্ষে কত জরুরী।'

তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আরও জানাইয়াছেন: 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি যে অনুপাতে হইয়াছে, মানুষের প্রজ্ঞা সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। তাই মানব-সভ্যতা আজ এক বিশ্বজোড়া বিপর্যয়ের শঙ্কায় মুহ্যমান।...লাগাম ছাড়া প্রযুক্তি-বিজ্ঞান মানুষকে ক্রমেই নিচের দিকে টানিতেছে—মানুষ হইয়া উঠিতেছে যন্ত্র-দাস,—সে ভুলিতে বসিয়াছে মানবাত্মার মূল্যবোধ। বিজ্ঞানীদের আজ অগ্রগামী হইতে হইবে। বিজ্ঞানের মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে মঙ্গলবোধ। আর সেই পথেই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিবে অচ্ছেদ্য সেতু। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ পরস্পর বিরোধী নহে, বরং পরস্পরের পরিপূরক।'

ভূপাল! আধুনিক সভ্যতাভিমানী মানবের মহান শিক্ষক ভূপাল!! ভূপাল তর্জনী-সংকেতে বুঝি জানাইয়া দিল, জড়বিজ্ঞানের যথেচ্ছ প্রয়োগের দ্বারা ভোগ-চরিতার্থতার যে বিপুল সমারোহ চলিতেছে, যদি ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে আগামী কালের পারমাণবিক যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন হইবে না,—দেশের আকাশে বাতাসে, জলে-মাটিতে, ধূমে-ধূলিতে প্রচ্ছন্ন বেশে যে ধ্বংসের দূত প্রস্তুত রহিয়াছে, ইতিমধ্যে সে-ই নীরবে স্ব-কার্য সমাধা করিয়া যাইবে।

...আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও-সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং—এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বললেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ।...

...তবে সে 'এক' কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান (Science)।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীমতী বিয়াত্রিসকে লেখা]

মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন 'অরূপ'।

কলিকাতা
১৫. ৫. ২৫

কল্যাণীয়া বিয়াত্রিস,

তোমার ৯ জুলাইয়ের পত্র যথাসময়েই পেয়েছি। তুমি এক দুরূহ প্রশ্ন করেছ। আমি নিজেকে একজন সর্বজ্ঞ বলে মনে করি না, তবুও তোমার প্রশ্নের উত্তরে যে দু-একটি কথা লিখছি তা আমার ধারণামাত্র। তুমি তোমার নিজ ভাবানুযায়ী এগুলি পুরোপুরি অথবা অংশতঃ গ্রহণ কিংবা বর্জন, যা খুশি করতে পার।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রমুখ অবতারদের কথা যে-সমস্ত পুরাণে আলোচিত, তাতে বলা হয়েছে, এই দেবমানবগণ ও তাঁদের পার্ষদবর্গ সকলে যেন এক এক বিশেষ পরিবারভুক্ত এবং প্রত্যেক পরিবারের রয়েছে নিজস্ব আদর্শ ছাঁচ বা বৈশিষ্ট্য। যেমন ধর বুদ্ধ বা যীশুর পরিকরবর্গের থেকে একটা সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে রাম ও তাঁর পার্ষদদের। আর বিশেষ পরিবারের একজন যখন তাঁর জীবনের পূর্ণাবস্থাতে একাত্ম হয়ে যান সেই দেবমানবের সত্তায়,—যিনি ঐ পরিবারের মূল উৎস,—তখনই হয় তাঁর সার্থক অভ্যুদয়। কালে ঐ অবস্থা থেকেই তিনি উপনীত হন নির্বিশেষ অবস্থায়।

বর্তমান যুগের দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরূপ এক বিশেষ ভাব বা পরিবারের উৎসস্বরূপ, যাঁর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পূর্বগ ভাবসমূহের সমন্বয়। এই কারণে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর শিষ্যদের সূক্ষ্ম পূর্বরূপ অর্থাৎ পূর্বে তাঁরা কোন্ বিশেষ ভাবধারার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তা স্পষ্টই দেখতে পেতেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি চিনে নিতে পারতেন কে কোন্ বিশেষ ভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এমনিভাবে তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আগমন ঘটেছে অখণ্ডের ঘর থেকে, দেবলোকেরও ওপারে—এককথায় সর্বপ্রকার দ্বৈতের উর্ধ্বে ছিল তাঁর অবস্থান। এমনিভাবেই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি কৃষ্ণসখারূপে দেখেছিলেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনুভূতি তাঁর হয়েছিল। এই সব পরিকর, পূর্ব পূর্ব যুগে যাঁরা বিভিন্ন ভাবধারার বাহক ছিলেন, বর্তমান যুগাবতারের সঙ্গী হয়ে তাঁরা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন আরও উন্নততর অবস্থায়,—যেখান থেকে তাঁরা অনায়াসেই অদ্বৈতানুভূতির রাজ্যে পৌঁছেছেন।

জানিনা সবকথা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলাম কিনা, তবে মনে হয় গভীর-ভাবে চিন্তা করলে কিছু ধারণা তোমাদের হবে।

আমার এই যুক্তি তোমাদের কার কেমন লাগে, জানার আগ্রহ রইল। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। সকলে সস্নেহ আশীর্বাদ জেনো।

চিরস্নেহাবদ্ধ
সারদানন্দ

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। গত ৩ জানুআরি ১৯৮২, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের বাল্যজীবনের সঙ্গে আমরা আদৌ পরিচিত নই। যতটুকু তাঁকে দেখেছি, তা হল তাঁর জীবনের প্রায় শেষের দিক। প্রবল আধ্যাত্মিক জীবনের পিপাসা নিয়ে যৌবনে ঠাকুরের সংস্পর্শে তিনি যখন এসেছেন এবং তাঁর চরণপ্রান্তে থেকে যে-সব সাধনা করেছেন, তার অধিকাংশই সকলের অজ্ঞাত। কারণ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আত্মজীবনী কিছু লেখেননি। যাঁরা তাঁর কথা লিখেছেন তাঁরা পাঁচজনের কাছ থেকে শুনে একটি চিত্র দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁদের ঘটেনি। তবে এইটুকু বুঝতে পারি যে, ধর্মজীবনের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল, তার দ্বারাই আবাল্য তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

শরৎ মহারাজের শরীর ছিল দৃঢ়, বলিষ্ঠ, একটু স্থূল। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে তিনি যে সবচেয়ে বলবান ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কাছ থেকে সাক্ষাৎ এটি শুনেছি। প্রচুর শক্তি ছিল দেহের কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে পাওয়া যেত না, কারণ তাঁর স্বভাব অতিশয় নম্র ছিল। তবে একটি পরিচয় পাওয়া যেত যে, যখন বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়,—তখন যে-সব কাজে দৈহিক শক্তির দরকার যেমন হাণ্ডা, কড়া মাজা, তাতে তিনি সব সময় এগিয়ে যেতেন। চাকর-বাকর তখন ছিল না, নিজেরাই সব করতেন। যা শক্তি ছিল তা এইভাবেই ব্যবহার করতেন। আর একেবারে নিরহঙ্কার। অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ,—যাতে মানুষের বলের পরিচয় পাওয়া যায়, তার দিক দিয়েও যেতেন না। আর একটি জিনিস অখণ্ডানন্দ মহারাজের কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি অত্যন্ত সেবাপরায়ণ ছিলেন। গুরু-ভাইদের কারো অসুখ হলে তাঁর পাশে থেকে সব সময় তাঁর সেবা-শুশ্রূষা নিখুঁতভাবে করতেন। একাজে তাঁর মতো নিপুণতা আর কারো ছিল না এবং এই সেবার কাজে নিজের সবরকম অস্বাচ্ছন্দ্য অসুবিধা সহ্য করতেন। পরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসে যখন সাধনজীবন আরম্ভ করেছেন, তখনও সেই সেবাপরায়ণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুর যেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন, সেই বিশেষ দিনে ঠাকুরের ভিতর এক দিব্যভাবের প্রকাশ হয়েছিল। তাই দেখে ভক্তেরা যখন অভিভূত হয়ে সকলে পরস্পরকে ডাকছেন ঠাকুরের কাছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করবার জন্য, সকলেই যখন ঐ নিয়ে মত্ত, তখন ঠাকুরের সেবক শরৎ এবং শশী, অর্থাৎ পরে যাঁরা স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—দুজনে ঠাকুরের বিছানাপত্র পরিষ্কার করা, রোদে দেওয়া, ঘর ঝাড়া এই সব নিয়ে ব্যস্ত। কারণ ঠাকুর তখন শয্যাশায়ী। সেদিন সামান্য ভাল বোধ করায় একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন, এই অবকাশে সেবক দুজন তাঁর ঘরটিকে গুছিয়ে রাখছেন। ওদিকে ভক্তেরা ডাকাডাকি করছেন, কিন্তু তাঁরা সেদিকে কর্ণপাত করলেন না। ভাবলেন, যাঁরা ঠাকুরের আশীর্বাদ চান তাঁরা যান, আমরা বরং এই সুযোগে তাঁর সেবার কাজ খানিকটা এগিয়ে নিই। এর থেকে বোঝা যায় যে, সেবার ভাব তাঁদের কত প্রবল—যার জন্য সামনে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির একটা দুর্লভ লগ্ন এসেছে, হয়তো-বা ক্ষণস্থায়ী,—তবুও সেই সেবার

কাজেই তাঁরা ব্যাপৃত থাকলেন,—সেবা ফেলে ঠাকুরের কাছে গেলেন না। এটি সেবাপরায়ণতা ও ঐকান্তিকতার একটি বড় পরীক্ষা। নিঃস্বার্থ ভক্ত ভগবানের সেবা ছাড়া মুক্তি পর্যন্ত চান না। ভাগবতের সেই শ্লোকটি মনে পড়ে—'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। / দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥' ভক্তিশাস্ত্রের মতে যে বিভিন্ন প্রকারের মুক্তির কথা আছে,—ভগবানের সঙ্গে এক লোকে বাস, তাঁর মতো ঐশ্বর্যশালী হওয়া, তাঁর মতো রূপধারী হওয়া, ভগবানের অঙ্গরূপে পরিণত হওয়া—এগুলি দিলেও ভক্তরা গ্রহণ করেন না—যদি না ভগবানের সেবাকার্যে কিছু সুবিধা হয়। সেবার জন্য তাঁরা সব করতে পারেন, কিন্তু নিছক মুক্তির প্রত্যাশী তাঁরা নন। চরম আধ্যাত্মিক আনন্দও তাঁদের কাম্য নয়। সেবকদের এই নিস্পৃহ সেবার দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

বরানগর মঠে যখন সকলে ছিলেন সহায়-সম্পদহীন হয়ে, কোনদিন খাবার জুটত, কোনদিন বা জুটত না, সেই সময় যখন সকলে ধ্যান-ভজনে মগ্ন হয়ে থাকতেন তখন কেউ অসুস্থ হলে, শরৎ মহারাজ সর্বদাই থাকতেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে। পরেও যখন ঠাকুরের সন্তানেরা তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় তীর্থাদিতে এবং প্রসিদ্ধ সব সাধন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখনও তাঁর এই সেবার ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই সময় হৃষীকেশ, বা অন্যত্র ঠাকুরের কোন সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে শরৎ মহারাজ নিজের সাধন-ভজনকে উপেক্ষা করে তাঁর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। পরিব্রাজক-জীবনের কথা কখন কখন তিনি নিজের মুখে আমাদের বলেছেন। একবার বলেছিলেন, 'এক কাপড়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরেছি।' কোথাও কোথাও খুব শীতের জায়গাতেও এরকম একবস্ত্রে ঘোরা, কঠোর তপশ্চর্যা—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই—সেই অবস্থায়ও তাঁর সেবার ভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি।

যখন ঠাকুরের পদপ্রান্তে রয়েছেন,—তখন ঠাকুর একদিন শরৎ মহারাজের কোলে গিয়ে বসে বললেন, 'দেখলুম ও আমার ভার সইতে পারবে কি না।' বিশ্বম্ভরের ভার! যাকে তিনি সইবার শক্তি দেন সে-ই সইতে পারে, অপরে নয়। যখন তিনি স্থূলদেহ বিলয়ের পর সঙ্ঘদেহে বিরাজ করছেন সেই সঙ্ঘমূর্তি ঠাকুরের ভারও যথাসময়ে শরৎ মহারাজকে বইতে হয়েছিল। যখন সঙ্ঘের কাজে স্বামীজী তাঁকে পাশ্চাত্যদেশে—ইংলণ্ডে ও পরে আমেরিকায় পাঠালেন, স্বামীজীর আজ্ঞাবহরূপে তিনি গেলেন। আবার স্বামীজী তাঁকে ডেকে নিলেন ভারতের কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে এলেন এদেশে কাজ করবার জন্য। স্বামীজী তাঁর স্কন্ধে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব তুলে দিলেন। ঠাকুরের কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। যীশুখ্রীষ্ট সেণ্ট পিটারকে বলেছিলেন, **'I SHALL BUILD MY CHURCH ON THIS ROCK'.** দৃঢ়ভিত্তি এই পাহাড়ের উপরে আমার **CHURCH** বা ধর্ম-সঙ্ঘ গঠন করব। ঠাকুরের নির্দিষ্ট ভার ন্যস্ত হল শরৎচন্দ্রের উপর।

আমরা যখন তাঁকে সেই সঙ্ঘ-সম্পাদক রূপে দেখেছি—তখন দেখেছি সঙ্ঘের নেতা-রূপে তিনি কি রকম নির্লিপ্তভাবে কাজ করতেন। তার দৃষ্টান্ত বহু জায়গায় বহু সাধুর মুখেও আমরা শুনেছি। কোন জায়গায় কোন গোলমাল হচ্ছে, দুই দলে পরস্পর বিরোধ হচ্ছে, একজন আর একজনের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি স্থিরভাবে সমস্ত

কথা শুনে গেলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। অভিযোগকারীর হয়তো মনে হল, তার কথা কি তবে সব বৃথাই হল? বললেন, 'মহারাজ আপনাকে সব বললাম আপনি তো কিছু বলছেন না?' শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন, 'তোমার কথা তো শুনলাম বাপু, এখন অপর পক্ষের কথাও তো শুনতে হবে। কাজেই তার আগে তোমাকে কি বলব?' আমরা যখন দেখেছি তাঁকে,—শুধু সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়েই তিনি ছিলেন —তা নয়। ভক্তমণ্ডলী—বিশেষ করে যারা নিতান্ত অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যাদের দেখবার কেউ নেই, যারা সংসারে অবহেলিত, তাদের ভারও তাঁকে বইতে হত।

স্বামী যোগানন্দ মায়ের ভার বইতে পারতেন,—প্রথমে তিনিই মায়ের সেবক ছিলেন। স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর সেই ভার শরৎ মহারাজের উপর পড়ে। এক জায়গায় মা বলছেন, 'আমার ভার বওয়া সোজা নয়। এক যোগীন পারত আর শরৎ পারে।' একজন বলছেন, 'মা,—মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পারেন না?' বললেন, 'না, ও পারে না। ওর ভাব আলাদা।' তা মায়ের ভার মানে সাধারণ ভার নয়, তাঁর বিরাট সংসার, এই সবার সব ভার। শরৎ মহারাজ নিপুণভাবে মায়ের সেবা করেছেন, যখন তিনি জয়রামবাটীতে আছেন তখনও, যখন তিনি কলকাতায় আছেন তখনও—সব সময় অবিচলিত চিত্তে তিনি মায়ের ভার বহন করেছেন। কি নিষ্ঠা, দূরদৃষ্টির সঙ্গে তিনি সেই সেবা করেছেন এটা দেখবার জিনিস ছিল। মায়ের কাছে যারা আসত তারা সকলেই ভক্ত ছিল না। হয়তো মায়ের সঙ্গে কারো সাংসারিক সম্পর্ক ছিল, কেউ বা অসহায় অবস্থায় এসে মায়ের আশ্রয়ে রয়েছে—এই রকম। তাদেরও প্রত্যেকের ভার শরৎ মহারাজ নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর নিজের মুখের কথা: 'কামারপুকুর, জয়রামবাটীর কুকুর শেয়ালও আমাদের নমস্ত'। আর মায়ের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—তাদের তো কথাই নেই। এর জন্য তাঁকে কি না করতে হয়েছে? সেবা করা মানে শুধু বিধিব্যবস্থা বা অর্থসংগ্রহ করে চালানো নয়, সবরকম দায় দায়িত্ব পালন। কোথায় মায়ের কোন ভাই কি উপদ্রব করছে, কোথায় জমি জায়গার কিছু গোলমাল হচ্ছে, সব তাঁকে সামলাতে হচ্ছে, সব দিকে দৃষ্টি রেখে চালাতে হচ্ছে। মায়ের এই সেবার কাজে নিজের যত অসুবিধাই হোক, তিনি তাতে কখনও বিব্রত বোধ করেননি। মা তাঁর স্থূলদেহ সংবরণ করবার পরও মায়ের সেই বিশাল সংসারের ভার বহনের দায়িত্ব শরৎ মহারাজের স্কন্ধে রয়ে গেল। পরেও সেই একই অবস্থা ছিল। যারা সংসারে আবর্জনাস্বরূপ তারা সর্বদাই শরৎ মহারাজের কাছে কৃপার পাত্র। শুধু কৃপা নয়, তাদের জন্য কত দরদ!

দেনা করে তিনি মায়ের বাড়ি করেছেন। তখন অর্থাভাব, এমন কোন ধনী ভক্ত ছিল না যে মায়ের জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে সক্ষম। অথচ মায়ের জন্য একটি বাড়ি করা একান্ত দরকার এবং বাড়িটি হবে গঙ্গার অদূরবর্তী স্থানে। কারণ মা গঙ্গা থেকে দূরে থাকতে পারতেন না। প্রথমে বাড়ি ভাড়া করে মাকে আনা হত। কিন্তু বেশি ভাড়া দেবার বা বরাবরের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করে রাখবার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া মা সর্বদা থাকতেন না, যখন আসতেন তখন বাড়ি পাওয়া যাবে কোথায়? বাগবাজার, ঘুষুরি, বেলুড় নানা জায়গায় মাকে এনে রাখতে হয়েছে। শরৎ মহারাজ ভাবলেন, এরকম করে চলবে না, মায়ের জন্য একখানি বাড়ি করতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? অতিকষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ

করে এবং বেশির ভাগ ধার করে মায়ের বাড়ি আরম্ভ হল। তখনকার দিনে ধার পাওয়াও সহজ ছিল না, ভক্তদের কাছ থেকেই পেতে হত এবং সে দায়িত্ব তখনকার দিনে সাধুদের পক্ষে দুর্বহ ছিল। যাঁদের নিজেদেরই চাল চুলোর ঠিক নেই—তাঁরা দেনা করবেন কোন্ সাহসে,—কে শোধ দেবে? আর ধারই বা দেবে কে তাঁদের? শরৎ মহারাজের ব্যক্তিত্ব ছিল, আন্তরিকতা ছিল, ভক্তদের উপরে তাঁর প্রভাব ছিল। কাজেই দেনা করে তিনি মায়ের বাড়ি করলেন এবং সেই দেনা শোধ করবার জন্য তাঁকে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখনকার মতো অবস্থা তখন ছিল না। ভক্ত ছিল কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, উচ্চ মধ্যবিত্ত খুব কম। কাজেই তাদের সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। তখনকার দিনে হয়তো দশ বারো হাজার টাকায় একটা বাড়ি হয়ে যেত কিন্তু তা-ও তখন কল্পনাতীত ছিল। যাঁরা উদ্বোধনে গিয়েছেন তাঁরা দেখেছেন বাড়িতে ঢুকে বাঁ হাতে একটি ছোট্ট ঘর আছে। সেটি-ই তাঁর বসবার ঘর ছিল। ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং উদ্বোধনের জন্য লেখাও ওখানেই হত। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁকে বর্ণনা করেছেন, গণেশ ঠাকুরের মতো, স্থূলদেহ, স্থির, ধীর, অল্পভাষী।

তাঁর অমূল্য অবদান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। তিনি বলছেন যে, এটি লেখার উদ্দেশ্য বই-এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে মায়ের বাড়ির দেনা মিটবে। ঐ ছোট্ট ঘরখানিতে হাটের মাঝে বসেই তাঁর এত গভীর সুচিন্তিত গ্রন্থরচনা! ছোট একটি ডেস্ক থাকত। সেখানে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লেখা সব কাজ চলত। একটা নির্জন জায়গাও ছিল না যেখানে স্থিরভাবে বসে লেখাপড়ার কাজ করা যায়। কত বুড়োবুড়ি, কত পাগল সেখানে সব জড় হয়েছে, সকলের দিকে তাঁর দৃষ্টি। সাধু অথবা গৃহী আর্ত, দুঃখী, বেদনাতুর হয়ে যে-ই তাঁর কাছে এসেছে সে কখনও তাঁর কৃপাদৃষ্টি না পেয়ে ফিরে যায়নি। সকলেরই অন্তর ভরে যেত তাঁর কাছে সান্ত্বনা পেয়ে। এমন ধীর স্থির, নীরব সহানুভূতির সঙ্গে তিনি তাদের সব দুঃখ বেদনার কথা শুনতেন যে, তাতেই তাদের দুঃখের ভার হালকা হয়ে যেত। প্রত্যেকের প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি। দিনের পর দিন এই দৃশ্য সেখানে দেখা যেত। আমাদের মতো অল্পবয়সীদের ও সব কথা ভাল লাগত না। আমরা গিয়েছি ঠাকুরের কথা শুনতে, কিন্তু সে সব কথা না হয়ে হয়তো কেবল সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথাই চলছে।

আবার অল্পবয়সী যারা যেত তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তিনি উদাসীন থাকতেন না। তাই মাঝে মাঝে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে একজন প্রাচীন সাধুকে তিনি কাছে ডাকতেন। তিনি পূর্ব জীবনে ডাক্তার ছিলেন, তাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকতেন,—'ডাক্তার আসবে নাকি?' তাঁর মন ভাল থাকলে বলতেন, 'হ্যাঁ মহারাজ যাচ্ছি।' আর তা না হলে বলতেন, 'মহারাজ, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।' তিনি এলে কথার মোড় ফিরিয়ে দিতেন। সাংসারিক দুঃখবেদনার কথা হচ্ছিল, তিনি এসে সৎপ্রসঙ্গ তুলতেন। পরে বোঝা গিয়েছে যে তাঁর সহানুভূতি কেবল যারা ধর্মপিপাসু তাদেরই প্রতি নয়, যারা দুঃখকষ্ট বেদনায় জ্বলে-পুড়ে মরছে তাদের জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদত। সুতরাং তাদের জন্য যথেষ্ট সময় দিতেন। এই জিনিসটি আমরা অনেক পরে বুঝেছি। তখন কিন্তু বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া যে পাগলের দলকে তিনি পুষে রেখেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর কত সহানুভূতি, কত বেদনা! একদিন বলছেন, 'ওরে ঐ বুড়িটার বোধ হয় বাই বেড়েছে, ও কিছু

খাচ্ছে না, ওর জন্য একটু ওষুধ এনে দে।' এমনি করে কতকগুলি অনাহূত ব্যক্তি আসত, তারা উদ্বোধনে খেত আর পাগলামি করত। তাদের ভিতরেও কোথায় কোন্ বুড়ি খাচ্ছে না সেদিকেও দৃষ্টি আছে। একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন পরে তাঁর মাথার বিকৃতি হয়েছিল, একটা বিরাট পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভাবতেন তিনি সেখানকার দারোয়ান। এইরকম এক একজন এক একরকম।

এই ঘটনাটি সকলেই জানেন। একজন ভক্ত মাকে দর্শন করতে যাবেন, কিন্তু মায়ের শরীর অসুস্থ। দোতলায় যাবার পাথর বাঁধানো সিঁড়ির সামনে শরৎ মহারাজ তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছেন। স্থূল শরীর, প্রায় সমস্ত সিঁড়িটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মায়ের কাছে এখন যাওয়া চলবে না, কিন্তু ভক্তটি মাকে দেখবার জন্য এত আগ্রহী যে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠে মাকে দর্শন করতে গেলেন। তারপর মনে হয়েছে, তাই তো মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে চলে এসে কি অন্যায় করেছি! ফিরে এসে ক্ষমা চাওয়াতে তিনি বললেন, 'বাপু তোমার যেমন মাকে দর্শন করবার আগ্রহ, আমারও যেন এরকম হয়।' তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এইরকম মায়ের সেবাতে তাঁর নিজের অভিমান কোথাও প্রকাশ পায়নি।

সেবার ব্যাপারে সকলের জন্য তাঁর সমান আগ্রহ। বুড়িদের যা কিছু সম্পত্তি হয়তো দু-চারখানা গয়না, কিছু টাকা, কোথায় রাখবে? বাড়িতে কারো উপর ভরসা নেই তাই তারা এসে শরৎ মহারাজের কাছে গচ্ছিত রাখত। তিনি সেগুলি পুটলী বেঁধে নাম লিখে লিখে একটি আয়রন সেফের ভিতরে রেখে দিতেন। আর যখন তাঁর স্ট্রোক্ হয়েছিল তার আগের দিন একজন সাধুকে ডেকে বললেন, 'এই আলমারিতে যা রয়েছে দেখে নাও, এগুলি যার যার জিনিস তারা যেন ঠিক ঠিক পায় তা দেখো।' তার পরের দিনই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল, স্ট্রোক্ হল। তবে শেষদিন পর্যন্ত এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। পাত্রাপাত্র নির্বিচারে সকলকে এইভাবে আশ্রয় দেওয়া, এই নিয়ে বেলুড়মঠে কোন কোন সাধু অভিযোগ করেছেন, 'মহারাজ, আপনি এসব কতকগুলো দুষ্টু লোককে আশ্রয় দিয়েছেন।' শরৎ মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমিও জানি যে ওরা সহানুভূতির অযোগ্য, কিন্তু আমি যদি ওদের স্থান না দিই তাহলে ওরা যাবে কোথায়? ওদের তো আর কোন জায়গা নেই।' সুতরাং সেখানে তাদের আশ্রয় অক্ষয় রইল। এইভাবে যাদের কোথাও স্থান নেই, তাঁর কাছে তাদের স্থান আছে। তারা তাঁকেও যে খুব সম্মান করে চলত সব সময় তা নয়। অপরিমেয় স্নেহ পেয়েছে, কিন্তু তবুও তারা তাঁর স্নেহের উপযুক্ত হতে পারেনি। তিনি কেবল দেবার জন্য এসেছেন, কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা রাখতেন না।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে: একজন নবাগত ভক্ত এসে বলছেন, 'আমি এখানে সাধুসঙ্গ করতে এসেছি।' মহারাজ বলছেন, 'দেখ ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঠাকুর, চাকর, বামুন, কর্মচারী অনেকেই থাকত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁর সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু তাদের জীবনের তো বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সুতরাং সাধুর কাছে গেলেই যে সাধুসঙ্গ হয় তা নয়।' আগন্তুক সংসার ত্যাগ করতে চায় বলায়, শরৎ মহারাজ বললেন, 'বাপু তুমি তো সংসার ত্যাগ করবে, আমি কিন্তু এখনও পারিনি।' বলে বলছেন, 'দেখনা কত জড়িয়ে আছি।' ভাব হচ্ছে এই, সংসার মানে কেবল স্ত্রীপুত্রাদি পরিবৃত থাকা নয়, দেহটাই সংসার। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ

এর চাহিদা মানুষকে মেটাতে হবেই। কাজেই বলছেন, 'আমি সংসার ত্যাগ করতে পারিনি।' শরীরের পোষণের জন্য তাকে শীত-তাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য সবই করতে হয়। তা যদি হয় তাহলে সংসার ত্যাগটা হল কোন্‌খানে? অর্থাৎ ভাব এই যে, সংসার বাইবে নয় মনে। মনে যদি সংসার থাকে বাইরে সংসার ত্যাগ করে কোন লাভ নেই। আর মনে যদি সংসার না থাকে তাহলে বাইরের সংসার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা তাঁর নিস্পৃহতার পরিচয় দেয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর নতুন মঠাধ্যক্ষ নির্বাচন হবে। কেউ কেউ বললেন যে, শরৎ মহারাজ তো ভার নিলে পারেন, কার্যতঃ তাঁর উপরই তো এই ভার এতদিন ন্যস্ত রয়েছে। তিনি বললেন, 'বাপু, স্বামীজী আমাকে সেক্রেটারী করে গিয়েছেন, আমি সেক্রেটারীই থাকব। আমি প্রেসিডেণ্ট হতে চাই না।'

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। শিবানন্দ মহারাজের শরৎ মহারাজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই এই সঙ্ঘকে উপযুক্তভাবে চালাতে পারবেন। তার পরিচয় আমরা অনেকক্ষেত্রেই পেয়েছি। সাধারণ একটি ঘটনা—সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে একদিন প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরীমা মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, 'মহারাজ, আমরা সারদেশ্বরী আশ্রমের সাহায্যের জন্য একটা আবেদন করব। তাতে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা সকলে সই করবে, আপনারও নাম তাতে থাকুক আমরা চাই।' তিনি বললেন, 'দেখ, আমার নাম দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যদি বলেন তো দিও।' অর্থাৎ এসব ব্যাপারে তাঁর নামটা দেওয়া হবে কিনা, সে সিদ্ধান্তের ভারও শরৎ মহারাজের উপরে দেওয়া। সঙ্ঘ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। কথা উঠল যে, যাঁরা বৃদ্ধ তাঁদের উপরে আর ভরসা রাখা যায় না, এখন তাঁদের সকলেরই শরীর অসমর্থ হয়ে পড়ছে। কাজেই নতুন কয়েক জনকে এখন এই সঙ্ঘের দায়িত্ব নিতে হবে। সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মঠ ও মিশনের প্রথম কন্‌ভেনশন্ হল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। অনেকেরই সে সময় দারুণ আপত্তি যে, আমরা নতুন পরিচালক চাই না। আমরা যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এতদিন কাজ করে এলাম তাঁদেরই অধীনে থাকতে চাই। যখন এরূপ আলোচনা চলছে, সে সময় শরৎ মহারাজ সাধুদের একটি সভা আহ্বান করে জানালেন, 'এই যে পরিবর্তন আমরা করতে চাইছি তার কারণ আমাদের অবর্তমানেও সঙ্ঘের কাজ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। তাই একটি নতুন পরিচালকবর্গ তৈরি করে রেখে যেতে চাই যারা ভবিষ্যতে সঙ্ঘের পরিচালনভার নেবার জন্য তৈরি হতে পারে। তাঁর অভিপ্রায় বুঝে সঙ্ঘ এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি মেনে নিল। একটি কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি করে তাদের উপর কাজ চালাবার ভার দেওয়া হল।

যেদিন থেকে তিনি কার্যভার ঐ ওয়ার্কিং কমিটির হাতে দিলেন সেদিন থেকে একেবারে নির্লিপ্ত। তারপর থেকে সেই অক্লান্ত কর্মী স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, কোনদিন তাঁর মাথায় যেন কোন দায়িত্ব ছিল না, এইরকমভাবে নিজেকে একেবারে জপ-ধ্যানে ডুবিয়ে দিলেন। তারপর থেকে সেই ভাব, সেই **mood** তাঁর শেষ পর্যন্ত রইল। কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি সংক্ষেপে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সঙ্ঘের কাজে সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করতেন না। তখন যেন তাঁর দক্ষিণেশ্বরের সাধন-ভজনের জীবন ফিরে এল। এমন ধ্যান-জপে ডুবে থাকতেন যে, বিশেষ

প্রয়োজন ছাড়া কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে সংকোচ বোধ করতেন। সেই সময় তাঁর দিনচর্যা এইরকম ছিল। সকালে গঙ্গাস্নান করে এসে জপ-ধ্যান করতেন, দুটো আড়াইটে অবধি ঐভাবে কেটে যেত। তারপর খাওয়া, বিশ্রাম, সমাগত ভক্তদের সঙ্গে কথা বলা, কাজের বিষয়ে আর কোন চিন্তা নেই।

একদিনের ঘটনা এইরূপ: একদিন শরৎ মহারাজ বাগবাজার থেকে নৌকা করে মঠে যাচ্ছিলেন (তখন কলকাতা থেকে নৌকা করে বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরে যেতে হত) এমন সময় ঝড় উঠল। নৌকা ডোবে ডোবে এমনি অবস্থা। তিনি কিন্তু স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন নৌকার ভিতরে। সহযাত্রী ছিলেন ডাঃ কাঞ্জী-লাল। তিনি সক্রোধে কলকেটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বললেন, 'নৌকা ডুবছে আর আপনি বসে বসে তামাক খাচ্ছেন!' তারপর ঝড় কেটে গেল, নৌকা এসে পাড়ে ভিড়ল। তখন বললেন, 'আমি তো বসে তামাক খাচ্ছিলাম, তোমরা তো কেবল হৈচৈ করছিলে, তাতে কি নৌকা বাঁচত?' ঐ ঝড় যেমন তাঁকে চঞ্চল করতে পারেনি, তেমনি সঙ্ঘের উপর দিয়েও যে-সব ঝড় তখন বয়ে গিয়েছে তিনি তাতেও কখনও বিচলিত হননি।

স্থির অচঞ্চল সঙ্ঘনেতা। চিরকাল সঙ্ঘের বোঝা বয়েছেন, কিন্তু তিনি যে কষ্ট করে বোঝা বইছেন, একথা তাঁকে দেখে বোঝা যেত না। সম্মানে-অসম্মানে, সম্পদে-বিপদে, কোন অবস্থাতেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। এইটি ছিল তাঁর চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই পরবর্তী কালে স্বামী প্রেমেশানন্দ গানেতে বলেছেন: 'শরৎ সুধীর শান্ত যেন গণনাথ'—গণেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছেন, চঞ্চলতা নেই, কোন তরঙ্গ তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না। অথচ এই স্থির অচঞ্চল ব্যক্তিটি এতবড় সঙ্ঘের নিয়ন্তা। কে দেখলে বুঝবে যে এতবড় বিরাট কাজ ইনি করছেন! আসল কথা হচ্ছে এই যে, যাঁরা এরকম বিরাট পুরুষ তাঁরা নিজেদের বিরাটত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না। যারা দূর থেকে দেখে তারা ভাবে, 'কি বিরাট ব্যক্তিত্ব!' একদিনের একটি ঘটনা বলে শেষ করি।

শরৎ মহারাজের জন্মতিথি। আমাদের সকলের খুব ইচ্ছা আজকের দিনে তাঁকে সবাই ফুল দিয়ে পূজা করব। কিন্তু এমন গম্ভীর হয়ে বসে আছেন কার সাধ্য যে প্রথমে গিয়ে তাঁর সেই গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে। আমাদের সবার ইচ্ছা, কিন্তু দূরে অপেক্ষা করছি কে আরম্ভ করবে, প্রথম ঝাপটাটা কে সইবে? এমন সময় ভক্তদের বাড়ি থেকে আগত একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখা গেল। সাধুরা তাকে শিখিয়ে দিলেন, 'যা, এই ফুলটা মহারাজের পায়ে দিয়ে প্রণাম করে আয়।' মেয়েটি গিয়ে দিব্যি ফুল দিয়ে প্রণাম করল। দেখা গেল তাঁর সেই গাম্ভীর্যটা কমে গিয়েছে। তখন আমরা সব সাহস করে এগোলাম। উনি বুঝতে পারলেন যে, এটা কৌশল করে করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ গাম্ভীর্যের আবরণের ভিতরে কি অদ্ভুত কোমলতা, কি স্নেহপরায়ণতা, সকলের প্রতি কি সহানুভূতি ছিল। ঐ আবরণ ভেদ করে যারা তাঁর কাছে পৌছেছে তারাই এটি বুঝতে পেরেছে। এই স্নেহের ভাব একমাত্র মায়ের ভিতরে কতকটা পাওয়া যায় অন্যের কাছে নয়, তাও 'কতকটা' বলছি। একবার আমার নিজের জীবনেই হয়েছে। তাঁর কাছে গিয়েছি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে, গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বলছেন, 'সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমরা কি চিরকাল থাকব?' একটু পরেই

আবার বুঝিয়ে বলছেন, 'বাবা, সব প্রশ্নের উত্তর নিজের ভিতর থেকে পাওয়ার চেষ্টা করবে। জেনো, সর্বদা অপরের উপর নির্ভর করলে নিজের ভিতর থেকে উত্তর পাবে না। আর আমরা তো চিরকাল থাকব না।' যেন আমাদের প্রস্তুত করবার জন্য বলছেন, আমাদের সব সময় তাঁর দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের আশ্রয়রূপে তাঁর দিকে চেয়ে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মনির্ভর করতে চাইছেন। বুঝলাম এইজন্য বিশেষ করে চাইছেন যে, তাঁদের লীলা সম্বরণ করার আর বেশিদিন বাকী নেই।

তাইতো বলি, বাইরের গুরু যিনি তিনি ভিতরের গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্বের পরিপূর্ণতা। আজকের শুভদিনে এই পুণ্য স্মৃতিচারণ-প্রসঙ্গে আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাই যে, তাঁদের জীবন যেন আমাদের চলার পথে সব সময় আলোকবর্তিকার কাজ করে। আমরা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁদের আশ্বাসবাণীর উপর ভরসা করে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের উপর সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে।

নহবত

ডক্টর বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা, বিহারীলাল কলেজ, কলিকাতা।

কত ভাগ্যবান তুমি, নহবত!
　শত তপস্যার ধনকে
　　পেয়েছ তুমি অন্তরে তোমার।
তোমার বুকেই ঘটেছে তাঁর
　　ধ্যান, জাগরণ ও শয়ন।
তোমারই পুণ্য প্রকোষ্ঠে
　　হয়েছে মায়ের কর্ম সমাপন।
কত পুণ্য প্রভাতে তোমারই দুয়ারে
　　পড়েছে ঠাকুরের পদধূলি।
কোন্ সাধনার ফলে, এ গৌরব পেলে,
　　বল মোরে বল, হে মহৎ,
কত ভাগ্যবান তুমি নহবত।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ১২ ॥

দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর জীবন ও শিক্ষার ঘনিষ্ঠ চর্চা যিনি করেছেন, এবং এঁদের বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন সেই বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী লেখক রোমাঁ রোলাঁ তাঁর গ্রন্থে ও প্রবন্ধে গান্ধীজীর উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা বলেছেন। ১৯৩১ ডিসেম্বরে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপের বিবরণ দিয়ে রোলাঁ তাঁর আমেরিকান বন্ধুকে যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন, তার মধ্যে এক জায়গায় সত্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণার সঙ্গে বিবেকানন্দের মনোভাবের ঐক্যের কথা বলেছিলেন। রোলাঁ 'সত্য' সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণার বিষয়ে লেখেন—ঈশ্বর বলতে তিনি কী বোঝেন, এ-বিষয়ে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন: "হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যেসব গুণারোপ করা হয়েছে, তার মধ্যে 'সত্য'কে ঈশ্বরের আসল স্বরূপ-নির্দেশক বলে তিনি যুবক বয়সেই মনে করেছিলেন। পূর্বে গান্ধীজী 'ঈশ্বর সত্যস্বরূপ'—এমন বিশ্বাস করতেন; দুবছর আগে (১৯২৯) তাঁর ধারণা হয়—'সত্যই ঈশ্বরস্বরূপ'—কারণ 'নাস্তিকরাও সত্যের শক্তিতে অবিশ্বাস করে না; সত্য আবিষ্কারের বাসনায় নাস্তিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করে না, এবং সেদিক থেকে তারা সঙ্গত কাজই করে।' গান্ধীজীর ধর্মীয় ধারণার এই 'সাহস ও স্বাধীনতার' প্রশংসা করার পরে রোলাঁ বলেছেন, "বিবেকানন্দের মধ্যেও আমি এই গুণ লক্ষ্য করেছি।"[১]

ভারতীয় মহাজাতি গঠনে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে রোলাঁ পরবর্তী কালের উপরে তাঁর প্রভাবের প্রসঙ্গও তুলেছেন:

"বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত শতেক জাতি লইয়া গঠিত একটি মহাজাতির ঐক্যের

---

১ সত্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দের নির্ভয় মনোভাব ধর্মের ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। অনবদ্য ভাষায় নিবেদিতা লিখেছিলেন—পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের যা সত্যে ভীত নয়—বিবেকানন্দ তা দিয়েছিলেন। সত্যের জন্য বিবেকানন্দের অনন্ত যন্ত্রণা ও যন্ত্রণাময় উক্তির সবিশেষ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলেও কয়েক লাইন উদ্ধৃত না করে পারছি না।—

"যে-ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাবৃত, আর যিনি তাহা করেন না, তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী। আমি সত্যকে একটা অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ক্ষয়কারী পদার্থের সঙ্গে তুলনা করি। উহা যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়।··· আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টমুখে আপস করিতে পারি না, তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু কি করিব—পারি না। সারাজীবন তাহার জন্য ভুগিয়াছি, কিন্তু পারি নাই।··· ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না।···'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধন নশ্বর, নাম ও যশ নশ্বর; এমন কি পর্বতও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়—একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী।' হে সত্যরূপী ঈশ্বর! তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও! ···'হে সন্ন্যাসিন্! তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করিয়া, শত্রুমিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো।' এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিরাগী হইলাম—'ইহলোক ও পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম।' হে সত্য, একমাত্র তুমিই পথপ্রদর্শক হও।" [**Complete Works Of Swami Vivekananda, Vol. V, (Birth Centenary Edition 1963), Page 71**]

মূর্ত প্রকাশ বিবেকানন্দ। ঐ মহাজাতির মধ্যে প্রত্যেকটি জাতি আবার বহু বর্ণে ও উপবর্ণে বিভক্ত ছিল। রুগ্ন ব্যক্তির রক্ত যেমন অতীব তরল থাকে, ঘনীভূত হয় না, তেমনি ছিল ঐ সকল জাতি। বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল— কর্মে ও চিন্তায় ঐ জাতিগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা। তিনি কেবল যুক্তি দিয়া ভারতের ঐক্যকে প্রমাণ করেন নাই, তিনি আলোকের চকিত উল্লাসের মধ্য দিয়া ঐ ঐক্যকে ভারতের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতেই নিহিত ছিল তাঁহার মহত্বের অধিকার। চিত্তাকর্ষক এবং উদ্দীপনাময় শব্দকে চিত্তের চুল্লীতে পিটাইয়া পুড়াইয়া গড়িয়া তুলিবার একটি প্রতিভা তাঁহার ছিল—ঐ সকল শব্দ হাজার হাজার মানুষের হৃদয় ভেদ করিয়া পৌঁছিত। তাঁহার একটি বিখ্যাত কথা, যাহা সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে রেখাপাত করিত, তাহা হইল—'দরিদ্রনারায়ণ'। 'যে একমাত্র ভগবান আছেন, যে একমাত্র ভগবানে আমি বিশ্বাস করি, তিনি হলেন সকল জাতির দুঃখী ভগবান, দরিদ্র ভগবান।' সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, ভারতের ভাগ্যকে বিবেকানন্দ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।…

"ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) স্বরাজ্যদল যখন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে জয়লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা সমাজসেবার জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া তাহার নাম দিলেন—'দরিদ্রনারায়ণ-সূচী।' ঐ হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি পুনরায় গান্ধীজী গ্রহণ করেন এবং সেগুলিকে তিনি অবিরাম ব্যবহার করিতে থাকেন। একই সঙ্গে ধর্মীয় ধারণার সহিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সেবাকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হইয়াছিল। 'তিনি সেবাকে এক দিব্য জ্যোতি দিয়া ঘিরিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাহাকে ধর্মের মহিমা দিয়াছিলেন।' বিবেকানন্দের এই ভাবটি ভারতের কল্পনাকে পাইয়া বসিয়াছিল। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, অগ্নিকাণ্ডে ও মহামারীতে সাহায্যদান, সেবাসমিতি ও সেবাশ্রম সমস্ত দেশময় হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অথচ ত্রিশ বৎসর পূর্বে দেশে উহা একরকম অজ্ঞাতই ছিল।"

রোমাঁ রোলাঁর এই কথাগুলি স্বীকার করেছিলেন গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও জীবনীকার প্যারেলাল, তা অল্প পূর্বে আমরা দেখেছি।

রোলাঁ অনবদ্য ভাবে ও ভাষায় ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের রূপ উন্মোচন করেছেন :

"এই 'মহত্তর ভারত', এই নূতনতর ভারত—যাহার বিকাশের কথা রাজনীতিকরা ও পণ্ডিতরা উটপাখির মতো আমাদের নিকট এতদিন লুকাইয়া আসিয়াছেন, এবং যাহার বিস্ময়কর প্রভাব এখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—রামকৃষ্ণের আত্মায় তাহা পরিপূর্ণ। পরমহংসের, এবং যে-বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, উভয়ের যুগল নক্ষত্র বর্তমান ভারতকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতেছে। তাঁহাদের উষ্ণজ্যোতি ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে ময়ানের মতো কাজ করিয়া তাহাকে উর্বর করিতেছে। ভারতের বর্তমান নেতারা—মনীষীদের রাজা, কবিদের রাজা, ও মহাত্মা—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—ঐ রাজহংস ও ঈগলের যুগ্ম নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত, কুসুমিত ও ফলভারাক্রান্ত হইয়াছেন অরবিন্দ ও গান্ধী প্রকাশ্যে একথা স্বীকারও করিয়াছেন।"

ধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে গান্ধীজী কিভাবে গ্রহণ করেছেন সে-বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার পরে রোলাঁ বলেছেন, মানবজাতির পক্ষে প্রত্যেক ধর্মের বাঁচবার অধিকার মেনে না নিলে পরিত্রাণ

নেই। গান্ধীজী তাকে মেনেছিলেন। "'প্রত্যেক ধর্মের বাঁচিবার সমান অধিকার আছে ; প্রতিবেশী যাহাকে শ্রদ্ধা করে তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার সমান দায়িত্বও প্রত্যেক মানুষের।'—আমার মতে গান্ধীজী যখন অকপটভাবে এই কথাগুলি বলিতেছেন তখন তিনি নিজেকে রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন।… গান্ধী-প্রদত্ত ঐ মহান শিক্ষা—ঐ শিক্ষা বিবেকানন্দ, অধিকতরভাবে রামকৃষ্ণ, দিয়া গিয়াছেন।"

বিবেকানন্দ-জীবনীর উপসংহারে—বিবেকানন্দ ও গান্ধীর প্রতিভা ও চরিত্রগত ঐক্য-পার্থক্যের মূল কথা অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে রোলাঁ প্রকাশ করেছেন :

"কিন্তু গান্ধী ও বিবেকানন্দের মধ্যে এই পার্থক্য চিরদিন থাকিবে—বিবেকানন্দ বিরাট মনীষী, আর মনীষা গান্ধীর সামান্যতমও ছিল না। তাই বিবেকানন্দ, গান্ধীর মতো, নিজেকে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা উভয়ে সমস্ত ধর্মের সত্যতা স্বীকার করিলেও বিবেকানন্দ তাহাকে তাঁহার মতবাদের ও শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি অকপটভাবে সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য তাহার কিরণমালার উত্তাপ বড় একটা কমাইতে পারে না।…নায়কত্বের পদ ত্যাগ করিবার অধিকার সকলের থাকে না। বিবেকানন্দের মতো লোকেরা এমন কি যখন নিজের উদ্দেশ্যেও কিছু বলিয়া থাকেন তখন তাহা সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা চুপি চুপি কিছু বলিতে চাহিলেও পারেন না, আর বিবেকানন্দ তো তাহা চাহেন নাই। আকাশ পূর্ণ করিবার জন্যই এই মহা কণ্ঠধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবীই ছিল ইহার রণনযন্ত্র। বিবেকানন্দের রীতি গান্ধী হইতে স্বতন্ত্র। গান্ধীর স্বাভাবিক আদর্শ তাঁহার স্বভাবের অনুপাতে সহজ, সঙ্গত, পরিমিত ও সাধারণ। রাজনীতির মতোই ধর্মেও শুভেচ্ছা প্রণোদিত মানুষদের লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে ছিল তাঁহার মনের প্রবণতা। অপরদিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ সম্রাটের মতো প্রতিভাত। তাঁহার লক্ষ্য ছিল—স্বাতন্ত্র্যযুক্ত অথচ সমমর্যাদা-সম্পন্ন আধ্যাত্মিক অধিরাজ্যগুলিকে 'একের' অধীনে সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা। তিনি যে-কর্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইয়াছিল।"[২]

॥ ১৩ ॥

আগেই বলেছি, স্বামীজী হয়তো মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে নামে জানতেন। দূর আফ্রিকায় একজন ভারতীয় অপরিসীম বীরত্ব দেখাচ্ছেন—সে সংবাদে আনন্দ বোধ করাই তো বিবেকানন্দের সবচেয়ে আনন্দের কাজ। তা ছাড়াও, আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা বিষয়ে তাঁর মনোযোগের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি পত্রে। ১৮৯৭, ২৭ ডিসেম্বর তিনি শিবানন্দ-স্বামীকে যে-পত্র লেখেন[৩] তার তাৎপর্যের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পত্রটি এই :

"মাদ্রাজে থাকতে বোম্বে গিরগাঁওয়ের যে মিঃ শেতলুরের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তিনি আফ্রিকাতে যে-সকল ভারতীয় বাসিন্দা রয়েছে, তাদের আধ্যাত্মিক অভাব

২ রোমাঁ রোলাঁ, 'বিবেকানন্দের জীবন' (১৩৬০), (ঋষি দাস অনূদিত) ২৫৮—৫৯, ২৬০—৬১ ; ২৮০—৮২।

৩ Complete Works Of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Birth Centenary Edition 1963, Page 440

দূরীকরণের জন্য কাহাকেও পাঠাতে লিখেছেন। অবশ্য তিনিই মনোনীত ব্যক্তিকে আফ্রিকায় পাঠাবেন, এবং আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন।

"কাজটি আপাততঃ খুব সহজ কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ মানুষের কাজ। আপনি জানেন, ওখানকার শ্বেতকায়রা প্রবাসী ভারতীয়দের একেবারেই পছন্দ করে না। তাই সেখানকার কাজ হচ্ছে—ভারতীয়দের তত্ত্বাবধান করা, সেইসঙ্গে এমনভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখা যাতে সংঘাত আরও বেড়ে না যায়। **কোন আশু ফললাভের আশা নেই। কিন্তু পরিণামে দেখা যাবে, এ-পর্যন্ত ভারতের হিতের জন্য যত কাজ করা হয়েছে, সে সকলের চেয়ে এতে বেশি উপকার হবে।** আমার ইচ্ছা, আপনি এক্ষেত্রে ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখুন। যদি রাজী থাকেন, তাহলে এই পত্রের উল্লেখ করে শেতলুরকে আপনার সম্মতি জানাবেন—এবং আরও খবর চেয়ে পাঠাবেন।"

এই চিঠি স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়, স্বামীজী আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি সেখানকার আন্দোলনের মুখ্য ভারতীয় নেতার কার্যকলাপের বিষয়েও অবহিত ছিলেন, তাও ধরে নেওয়া যায়। লক্ষণীয়, স্বামীজী আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ধীরতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজনের উপরে জোর দিয়েছেন। ঐ দুটি জিনিস গান্ধীজী যথেষ্ট দেখিয়েছিলেন, এবং মনে হয়, গান্ধীনীতির প্রতি স্বামীজীর সমর্থন ছিল। বিবেকানন্দ, ভারতের ক্ষেত্রে শাসকদের সঙ্গে ব্যবহারে সর্বাবস্থায় ধীরতার পক্ষপাতী ছিলেন মনে হয় না, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা যেহেতু প্রবাসী, তাদের অবস্থান সেখানকার ইউরোপীয় শাসক শুধু নয়, কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের অভিরুচির উপরও বহুলাংশে নির্ভরশীল—তাই যাতে হঠকারিতা না ঘটে, এমন কি ভয়ানক কোন বিদ্রোহও নয়, যার শুভ ভবিষ্যৎ নেই—সে বিষয়ে সম্ভবতঃ সতর্ক ছিলেন। যাইহোক, এই চিঠির মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক অংশ আছে: স্বামীজী বলেছেন: দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ পরিণামে ভারতের পক্ষে এতাবৎ-কৃত সকল কাজের মধ্যে সবচেয়ে কল্যাণকর দাঁড়াবে। স্বামীজী একথা বলতে পারলেন কি করে? সমসাময়িক অবস্থার বিচার করে? কিন্তু গান্ধীজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন: ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তাঁর কথা অল্পস্বল্প শুনেছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দেও কলকাতা কংগ্রেসে তিনি গুরুত্ব পাননি। একথা ঠিক যে, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, আফ্রিকার ভারতীয়রা প্রধানতঃ ঐ সব অংশেরই অধিবাসী, সুতরাং তিনি আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, এবং পূর্বোক্ত পত্রে যে-শেতলুরের উল্লেখ করেছেন তিনি তিলকের আইনজীবী বন্ধু এবং স্বামীজীরও বন্ধু—তাঁর কাছ থেকে স্বামীজী আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যার সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ পেতে পারেন, অবশ্যই পেয়েছিলেন—কিন্তু তাহলেও স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর কারণ যথাযথ ব্যাখ্যাও হয় না। ঐ কথাগুলি কি তিনি এই ভেবে বলেছিলেন—বাইরের আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতে প্রতিহত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করবে? স্বামীজী কি ভেবেছিলেন—ভারতে যে-ধরনের নিরেট শাসন বর্তমান, ভারতবাসীরা দীর্ঘদিনের কূপ-মণ্ডূকতার কারণে যেভাবে আশা-ভরসা ও স্বাধীন দৃষ্টি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে, তাতে তাদের পক্ষে অবিলম্বে কোন ব্যাপক আন্দোলন করা

সম্ভব হবে না ; অপরদিকে, বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের জন্য আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে আন্দোলনে সমর্থ, যা ভারতবাসীদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারে! এসব কথা বলা যায় আমরা জানি, কিন্তু এও জানি, ঐ রহস্যময় উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যা একটিই—এটি আর একটি বিবেকানন্দীয় ভবিষ্যদ্বাণী যা সফল হয়েছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার রণক্ষেত্র থেকে ভারতবর্ষ একদিন সত্যই তার স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিনব অস্ত্র পেয়েছিল, যা একযুগে অভূতপূর্ব গণজাগরণ সম্ভব করেছিল।

পুরনো কথায় ফিরে যাচ্ছি প্রসঙ্গশেষে। আমরা মনে করি, গান্ধীজী যদি সত্যই স্বামীজীর সামনে দাঁড়াতে পারতেন তাহলে স্বামীজী নিশ্চয় গান্ধীজীর মধ্যে ভারতের মুক্তির আয়োজনকে চিনে নিতে পারতেন—নিশ্চয়ই।

এবং স্বামীজী গান্ধীজীকে দেখেছিলেনও—তাঁর দীপ্ত চর্মচক্ষের চেয়ে দীপ্ততর ধ্যাননেত্রে। তারপর যা লিখেছেন তার থেকে গান্ধী-বিষয়ে অব্যর্থ রচনা সম্ভব নয় :

"তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

বিবেকানন্দের বাণীই গান্ধীর জীবন।

মায়ের কৃপা

শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্ত
সহ-গ্রন্থাগারিক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব্ কালচার, কলিকাতা।

জ্যোৎস্নার আলো সাধারণভাবে সকলের গোচর হলেও স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণের লাবণ্য উপলব্ধি হয় তখনই, যখন তাকে প্রতিফলিত দেখি কোন স্বচ্ছ আধারে। অহেতুক কৃপার কথা আমরা শুনি জানি অনেকেই, কিন্তু যখন কোন বিশেষ পাত্রে তার প্রতিফলন হয়, তখন তার সেই অনিন্দ্য প্রকাশরূপটি সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট করে। শ্রীশ্রীমায়ের সর্বপ্লাবী স্নেহ-করুণার কথা আজ আর কারও অজানা নেই। তথাপি আধার-বিশেষে সম্পাতিত সেই করুণা-কিরণ কী অপরূপ মহিমান্বিতরূপে প্রকাশ পায়, তা ভাষায় বুঝানো চলে না। এমনই দুটি জীবন-পাত্রকে আমরা এই স্মৃতি-প্রবন্ধের পৃষ্ঠায় নিয়ে আসতে চাই, যেখানে মায়ের অহেতুক কৃপার রশ্মিকে নিরন্তর প্রতিফলিত দেখা যেত। সাধারণ গৃহী ছিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁদের ইহ-জীবনের প্রতিটি আনাচ-কানাচ আলোকিত ছিল শ্রীশ্রীমা সারদারই অপার্থিব স্নেহ-চন্দ্রিমায়।

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত আর তাঁর সহধর্মিণী ইন্দুবালা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সন্তান ছিলেন। বিনোদেশ্বর, ইন্দুবালার আদিনিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকাজেলার কলমা গ্রামে। জীবনের আরম্ভপর্ব থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা কিভাবে তাঁদের উপরে বর্ষিত হয়েছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আগে বলা দরকার।

ইন্দুবালার বাল্যকাল (বিয়ের আগে পর্যন্ত) কলকাতাতেই কাটে। বিনোদেশ্বরেরও ছাত্র-জীবনের শেষপর্ব কলকাতাতে অতিবাহিত হয়। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) হতে বি. এ. পাশ করে আইন পড়তে

শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়া আর অগ্রসর হয়নি। কলকাতার এই ছাত্রজীবন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়। আত্মীয় ব্রাহ্ম অধ্যাপক পরেশচন্দ্র সেনের গৃহে থেকে পড়াশুনার ফলে ছাত্রজীবনে বিনোদেশ্বর ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। সেই সূত্রে তৎকালীন বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। যৌবনে যাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেন তাঁদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু এবং সিস্টার নিবেদিতার নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সেসময়ে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে "আমার সোনার বাংলা" গানের স্মৃতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর মনে উজ্জ্বল ছিল। পারিবারিক অর্থাভাবে ইতিমধ্যেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়ে যায়। ব্রাহ্ম-বয়েজ স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।

এদিকে নিবেদিতার বক্তৃতা ছাত্র বিনোদেশ্বরকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণেই অগ্রজপ্রতিম মাখনচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় বেলুড় মঠে যাতায়াত আরম্ভ হয়। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যদের প্রভাব ধীরে ধীরে তাঁর ওপরে বিস্তার লাভ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতিও অন্য-দিকে মোড় নিতে থাকে। ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের অজস্র স্নেহলাভে তিনি ধন্য হন। এভাবে ক্রমশঃ তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণভাব-ধারার দ্বারা কেন্দ্রীভূত ও পরিচালিত হতে থাকে। সংসারজীবনে থাকা সত্ত্বেও জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বিনোদেশ্বর এই আদর্শের কেন্দ্রে অবিচল ছিলেন।

আনুমানিক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়িতে তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। এই দীক্ষার দিনটি এবং শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা নেওয়া সংক্রান্ত সকল ব্যাপারটি তিনি মন্ত্রগুপ্তির মতোই গোপন রেখেছেন। যেমন মন্ত্র, তেমনই মন্ত্রদাতা —এই দুয়ের ব্যাপারেই তিনি চিরকাল নীরব। মহামূল্য রত্নরূপে এসব তাঁর অন্তরতমস্থানে গোপন থেকে গেছে। অথচ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের প্রসঙ্গে তিনি সর্বদা সরব ও বাঙ্ময়। উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীশ্রীমাকে বিনোদেশ্বর বেশ কয়েকবার দর্শন করেন। জয়রামবাটীতে গিয়েও শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করেন। চিঠিপত্রের মাধ্যমেও যোগা-যোগ রেখেছিলেন। একমাত্র শিশুসন্তানের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকবিহ্বলা স্ত্রী ইন্দুবালাকে তিনি কিভাবে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয়ে নিয়ে আসেন এবং শ্রীশ্রীমা কেমন করে সেই শোক-তাপিতা মেয়েটিকে অহেতুক অপরিমেয় ভালবাসায় শান্ত করেন সেকথা যথাসময়ে এই প্রবন্ধেই আলোচনা করা যাবে। সে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। শ্রীশ্রীমা সারদা কেমন করে ব্রাহ্ম অনুরাগী বিনোদেশ্বরের সমগ্র জীবনধারার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, সেটি অনুধাবন করতে গিয়ে তখনকার যুগ ও সমাজের কথা একটু বলা ভাল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাব-সংঘর্ষে সমাজ-মানসে এক আলোড়ন এনে দেয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও তার প্রভাব প্রবল ছিল। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি বিরূপতা এবং "ইয়ং বেঙ্গল" নামে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত এক যুবসমাজ। সে যুগে

এর নাম প্রগতি। অন্যদিকে কিছু অন্ধতা ও কুসংস্কারের নাম হিন্দুধর্ম। রামমোহন, কেশব সেন প্রমুখ সংস্কারকগণ কুসংস্কারের জঞ্জাল অপসারিত করে বাঙালীর জীবনস্রোতকে নূতন খাতে চালাতে সচেষ্ট হন। সেদিক থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থানে ব্রাহ্মচিন্তাবিদ্গণের ভূমিকা ঐতিহাসিক। কিন্তু তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাঁচে ভারতীয় জনমানসকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন বলে বৃহত্তর গণমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ছাত্র বিনোদেশ্বরও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আধুনিকতার মোহ তাঁকেও গ্রাস করে। এমনই এক সন্ধিক্ষণে বিনোদেশ্বর সারদাদেবীর দর্শন পান। শ্রীশ্রীমা সারদা পল্লীগ্রামের একটি সাধারণ মেয়ে। অথচ তিনি বিনোদেশ্বরের হৃদয়ে বসে গ্রামের সকলরকম অন্ধকার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার প্রেরণা ও শক্তি জোগাতে থাকেন। তিনি সকলপ্রকার কুসংস্কার, চিত্তের জড়তা, দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে বিনোদেশ্বরকে মুক্ত করে যথার্থ মানবিকতার সন্ধান দিলেন। মানুষের মধ্যেই দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা—এই সার সত্য বিনোদেশ্বরের অনুভূতিতে এল। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, মানুষের মুক্তি মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসায় ; কর্মত্যাগে নয়—সাধুকর্মের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগে। তাই কর্মজীবনের প্রারম্ভেই জীবনের আদর্শ স্থির হয়ে যায়।

কলকাতার আলোকপ্রাপ্ত বিদ্বজ্জন, আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অনুকূল পরিবেশ, শহরের স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সকলরকম প্রলোভনের মোহমুক্ত হয়ে বিনোদেশ্বর স্বগ্রামে ফিরে আসেন। আর সেদিন হতে নিজ পরিবারে ও সমাজের মধ্যে আপন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর এই ত্যাগস্বীকার—গ্রামদেশের মানুষের জীবনের জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবলে আজও আমাদের মন বিস্ময়ে চমকিত হয়। সর্বোপরি রয়েছে নিজ পরিবারের অর্থাভাব। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবকের পক্ষে এ সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাতে। তিনি যেন আপন পুত্রের জীবনের হালটি শক্তহাতে ধরে রয়েছিলেন। তাই বিনোদেশ্বর পেরেছেন সব্যসাচীর মতো দুইহাতে গ্রামদেশের সকল অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। একদিকে অশিক্ষা, অন্ধকার, অপরদিকে অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, কুসংস্কার—এর মধ্যে থেকে সমগ্রভাবে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করা তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য ছিল।

ইতিমধ্যে বিনোদেশ্বর এবং ইন্দুবালা একবার তাঁদের প্রথম শিশুসন্তানটিকে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনমানসে কলকাতা আসেন। সময়টা সম্ভবত বাংলা ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাস। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিকভাবে অল্প কয়েকদিনের অসুস্থতায় শিশুসন্তানটি মারা যায়। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বিশেষতঃ ইন্দুবালা এই আঘাতে একেবারে ভেঙে পড়েন। তখন তাঁর বয়স অল্প। তাতে প্রথম সন্তানের মৃত্যুর আঘাত। এই আঘাতে আত্মসম্বরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অসহায় বিনোদেশ্বর শোকার্ত ইন্দুবালাকে একেবারে শ্মশান থেকে সোজা উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীমাকে ইন্দুবালার এই প্রথম দর্শন। "করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে—/সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,/ এনেছ তোমারি দুয়ারে॥" (বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত ইন্দুবালার সুমিষ্ট গলায় এই গানটি শোনা গিয়েছে।) মায়ের কাছে এসে এবং মাকে দেখেই তিনি চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন। যন্ত্রণা, বেদনা সব

মায়ের কাছে নিবেদন করেন। মুখে তাঁর প্রশ্ন—কেমন করে দিন কাটবে? কি নিয়ে তিনি থাকবেন? এমন সময় শোনা গেল গোলাপ-মা-র অভিযোগ—"তুমি কেমন মেয়ে গা—এ সময় কি মাকে ছুঁতে আছে?" শোকার্ত মেয়েটি একথা শুনে লজ্জায়, অভিমানে, অপরাধবোধে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠস্বর—"এমন দুঃখের সময় আমার কাছে আসবে না তো কোথায় যাবে?" ইন্দুবালা জীবনের আরম্ভপর্বেই শুনলেন শ্রীশ্রীমায়ের অভয় ঘোষণা। জানলেন—মা সব সময়ের মা। মা সকলের মা। মা একান্ত আপনার মা। পেলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয়। তিনি সন্তানের অগোচরে সন্তানকে চিরদিনের মতো কোলে তুলে নিলেন। শ্রীশ্রীমা ইন্দুবালার সব কথা শুনলেন। বললেন—"এখন তোমার মন শোকে অস্থির। এখন দীক্ষা হবে না। পরে হবে।"—ইন্দুবালার মন শান্ত হয় না। নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না। বারে বারে সেই এক প্রশ্ন—"আপনি আমায় বলে দিন, আমি কি নিয়ে কেমন করে থাকব?"—সদ্য সন্তানহারার এই আর্ত স্বর শ্রীশ্রীমার মনকে স্পর্শ করে। তাই একজন সেবককে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, শ্রীশ্রীমার নিজের কোন ফটো তাঁর কাছে আছে কিনা। একথার উত্তরে সেবক নেই বলাতে মা ভাল করে তাঁকে খুঁজে দেখতে বলেন। একটু পরে সেবক জানালেন—এক ভক্তের অনুরোধ-ক্রমে একটি ছবি পূর্বব্যবস্থামতো তার জন্য নির্দিষ্ট আছে। ভক্তটি পরদিনই সে ছবি নিতে আসবেন। শ্রীশ্রীমা সেবককে নির্দেশ দিলেন—"ছবিখানা তুমি এই মেয়েটিকে দাও। কাল যার আসবার কথা তাকে বললেই হবে পরে এসে নিয়ে যেতে। আজ ছবিখানা এর জন্যে নিয়ে এস। সেই বাঙাল দেশ, কতদূরে এ থাকে!" জননী সারদা নিজের হাতে তাঁর নিজের ছবি এই শোকাতুরা মেয়েকে দিয়ে বললেন—"রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এই ছবিকে একটিবার প্রণাম করো। দেখবে ধীরে ধীরে তোমার মন শান্ত হয়ে আসবে। পরে মন শান্ত হলে দীক্ষা হবে।"

প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই ইন্দুবালা শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের অভয় আশ্বাসবাণীই শুধু শুনলেন না,—এমন কিছুও সেদিন পেলেন, যা জীবনের পরম সম্পদ হয়ে রইল। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে নিজেকে দিয়ে ইন্দুবালার সমগ্র জীবনের চির-সঙ্গিনী হয়ে রইলেন। দুঃখিনী ইন্দুবালা আজ পরম ধনে ধনী, যে-ধন অবিনশ্বর। অবশ্য সেই মুহূর্তে ইন্দুবালার সেটি অনুধাবন করবার মতো অবস্থা ছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই।

পরদিন বিনোদেশ্বর ইন্দুবালাকে নিয়ে আবার এসেছেন শ্রীশ্রীমায়ের উদ্বোধনের বাড়িতে। এখনও তিনি সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারেননি। মা গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। ইন্দুবালাকে সঙ্গে যেতে বললেন। ইন্দুবালা স্নান সেরে এসেছেন, তদুপরি গঙ্গা নাইতে একটু লজ্জাবোধও আছে। তাই মায়ের সঙ্গে গেলেন না। ঠাকুরঘরের সামনে বসে থাকলেন স্থির নিস্পন্দ হয়ে। কিন্তু চিত্ত অস্থির। চোখে জলের ধারা। মা গঙ্গাস্নান সেরে ফিরলেন। ছাদে যাচ্ছেন। ইন্দুবালাকে সঙ্গে যেতে বললেন। ইন্দুবালা অচল। মা বললেন—"চুল ভিজে থাকলে অসুখ করবে যে!" যেন নানাপ্রসঙ্গ দিয়ে মেয়ের অভিমান দূর করতে চাইছেন। মা ছাদ থেকে নেমে এলেন। এবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ হবে, তাই মা ঠাকুরঘরে গেলেন। ভোগ অন্তে ভক্তদের প্রসাদ নেবার পালা। ছেলে ভক্তদের ব্যবস্থা আগে। মেয়ে ভক্ত অল্প। মেয়ে ভক্তেরা ঠাকুরঘরের সামনের ঘরে বসলেন। প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। সবাই প্রসাদ পাচ্ছেন। ইন্দুবালা কিন্তু স্থির। তাঁর হাত নড়ে না। তিনি ভাবছেন,—মা যদি নিজের

থালা থেকে তুলে একটু প্রসাদ দেন! মুখে উচ্চারণ করার দরকার হল না। অন্তরের কথা অন্তর্যামীর কাছে পৌঁছে গেল। মা নিজের থালা থেকে একটু প্রসাদ শোকার্ত অভিমানী সন্তানকে তুলে দিলেন। ইন্দুবালার ইচ্ছা পূর্ণ হল। তাঁর অন্তঃকরণ যেন সহসা ভরে উঠল। তিনি মাত্র সেই প্রসাদটুকুই খেলেন। আর কিছু খাওয়ার মতো অবস্থা তাঁর সেদিন ছিল না। অথচ ভাবছেন, মায়ের বাড়ীর প্রসাদী অন্ন সব না খেয়ে ওঠার অপরাধের কথা। সেই ভাবনা তাঁকে পীড়িত করছে। তিনি ভাবতে চেষ্টা করছেন—মায়ের তো কিছু অজানা নেই, কাজেই আজকের অক্ষমতা তিনি বুঝবেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের মুখে শোনা গেল—"এ কি সহ্য করা যায়, সদ্য এমন হয়েছে!"

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে নিজ পরিবারের অপর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে ইন্দুবালা উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বলা হয়েছে, বিনোদেশ্বরের দীক্ষা আগেই হয়েছিল। এছাড়া আরও কয়েকবার উদ্বোধনের বাড়িতে এসে ইন্দুবালা শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও স্নেহলাভে ধন্য হয়ে থাকেন। আরেকবার মা তাঁকে নিজ হাতে নিজের মাথার চুল দিয়েছিলেন চিরুনি থেকে। এইভাবে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ইন্দুবালার জীবন ধন্য হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের ফটোপ্রাপ্তির ঘটনা ইন্দুবালার জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেন এই কৃপালাভের ঘটনা তাঁর বাকী জীবনের নিয়ামক শক্তি হয়েছিল। দীর্ঘ জীবনকালের সুখে-দুঃখে, সম্পদে-সংকটে যে কোন অবস্থাতেই এই স্মৃতি তাঁর কাছে কদাপি ম্লান হয়নি। প্রতিদিনের জীবনে সেই প্রথমদর্শনে প্রাপ্ত কৃপা-সম্পদ তাঁর উপলব্ধিতে সত্য হয়ে উঠেছে। ছবি বা ফটো হিসাবে তিনি দেখতেন না, সত্যিকারের শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহসান্নিধ্যই তিনি পেতেন এটির মাধ্যমে। এ বস্তু তাঁর জীবনের প্রতিদিনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী এবং আক্ষরিক অর্থে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল। বিয়ের আগে ইন্দুবালা ব্রাহ্মভাবাপন্ন পরিবারে শহরে এবং অতি আদরে প্রতিপালিত হলেও, বিবাহোত্তর জীবনে গ্রামদেশের বিরাট পরিবারের অর্থাভাবের মধ্যেও নিজ জীবনকে ও নিজের চারপাশকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এ যেন শ্রীশ্রীমা তাঁকে নূতন রূপে রূপান্তরিত করেছেন বলেই সম্ভব হয়েছে। সাধারণ একজন শিক্ষকের স্ত্রী। কিন্তু প্রতিদিন তাঁর গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মায়ের সেবা এবং পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী মা কালীর সেবার সঙ্গে সাধু সেবা ও অতিথি সেবারও বিরাম ছিল না। শিক্ষক স্বামীর তরুণ ছাত্রদের কাছে এ বাড়ি একটি আশ্রয়স্থল ছিল। কারণ ছাত্রসমাজের কাছে বিনোদেশ্বর একদিকে যেমন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, অপরদিকে, আবার তাদের প্রিয় বন্ধু ও জীবন-পথের পথ-নির্দেশক। কাজেই আজীবন বিনোদেশ্বরের গৃহের দ্বার ছাত্রদের জন্য অবারিত রয়েছে। স্বভাবমাধুর্য ও বন্ধুবাৎসল্যের কারণে তাঁর গৃহ অতিথিহীন থাকত না। কিন্তু কোন অবস্থাই ইন্দুবালার কাছে প্রতিকূল নয়, সকল পরিস্থিতিতেই শ্রীশ্রীমায়ের সর্বক্ষণের সাহচর্য তাঁকে জীবনের লক্ষ্যে স্থির রেখেছে। জীবনের চির-সাথী শ্রীশ্রীমা সকল অবস্থায় তাঁকে হাত ধরে জীবনপথে চালিত করেছেন। পতিগৃহের অভাব, অনটন, গ্রাম্য পরিবেশ, বহু আশ্রিতজন ও পরি-জনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলেও তিনি ছিলেন শান্ত, স্নিগ্ধ ও স্বতন্ত্র। কারণ তিনি যে পেয়েছেন ঐশ্বরিক সম্পদ, যাঁর নাম 'সারদা'। এই সারদা ইন্দুবালার অন্তরকে ভরপুর করে রেখেছিলেন বলেই বাইরের জগতের মলিনতা

বাইরেই থাকত, তাঁর মনে দাগ কাটতে পারেনি। আজকের আত্মকেন্দ্রিক জগতের কাছে এও "যেন এক আশ্চর্য বিস্ময়।" তাই তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মধুর কণ্ঠে অন্যান্য নানা গানের সঙ্গে এই গানটি বিশেষ করে শোনা যেত—

"করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে
যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে—এনেছ তোমারি
দুয়ারে।"

অপরদিকে বিনোদেশ্বরের কণ্ঠে শোনা যেত তাঁর স্বরচিত গান—

"মায়ের শ্রীপদ ভুলো না ভুলো না।
ওরে মূঢ় মন পেয়ে এ রতন হেলায় খেলায়
ছেড়ো না ছেড়ো না॥
জান কি মন মায়ের করুণা, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি
পেয়ে কৃপা কণা ;
তাঁহারি ইচ্ছায় মূক বেদ গায়, ব্রহ্মজ্ঞান পায়
আশ্রিত যে জনা॥"

এখানে আবার আমরা একটু আগের কথায় ফিরে যাই। বিনোদেশ্বর স্বগ্রামে ফিরে এসে প্রথমেই কলমা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অন্যতম সংগঠক শিক্ষকরূপে কাজ আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই নবীন যুবকদের গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রসমাজ ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, দেশের সম্পদ। শিক্ষাই দেশের কুসংস্কার, অজ্ঞতাকে দূর করে আলোর সন্ধান দেয়। তার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারাকে সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে না পারলে, মানুষ মনুষ্যত্বকে ফিরে পাবে না। আর সেই মনুষ্যত্বকে ফিরে পাওয়ার জন্যে বিবেকানন্দের ভাবের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে জনসাধারণের মাঝে। এই ব্যাপারে বেলুড় মঠের সাধুদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যেতে থাকেন। কাজ করতে করতে বুঝতে পারেন, একাজে একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত না হলে সুষ্ঠুভাবে কাজ হওয়া সম্ভব নয়। অবশেষে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মে, মঙ্গলবার, বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে বেলুড় মঠের পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ কলমাতে আগমন করেন এবং কলমায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি ও কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে অপর উদ্যোক্তা ছিলেন বিনোদেশ্বরের অগ্রজপ্রতিম কলমা গ্রামের জমিদার শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত। তদবধি স্কুল এবং সেবা সমিতিকে কেন্দ্র করে নিজের সকল অসুবিধা তুচ্ছ করে বিনোদেশ্বর অর্ধশতাব্দীকাল সমগ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের জনহিতকর কাজে আপন প্রচেষ্টা ও সামর্থ্য সর্বতোভাবে নিযুক্ত করেন। অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং সমগ্রভাবে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য ছিল।

কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির কার্যপ্রণালী নিয়ে বিনোদেশ্বর বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ-সন্তানদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রেমানন্দ এক চিঠিতে তাঁকে লিখেছেন—"তোমার পত্র পাঠে সকল অবগত হইয়া তারকদা ও হরিভায়াকে শুনাইয়াছি। তোমার কার্যে তাঁহারা অতিশয় খুসী আছেন। তুমি তাঁহাদের অন্তরের আশীর্বাদ জানিবে। ভগবান তোমায় বল দিন, শক্তি দিন ও প্রভুর পদে তোমার মন মগ্ন হউক এই মাত্র প্রার্থনা। কৃষিজীবী লোকদের আপনার ভাই ভেবে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে, তাহলে দেখবে তারা তোমার গোলাম হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি শ্রীস্বামীজীর শিক্ষামত নিজেকে তাহাদেরই সেবক জানিতে চেষ্টা করিও। এই চেষ্টার নাম তপস্যা।" ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ স্বামী

সুবোধানন্দ মহারাজ কলমা আশ্রমে শুভাগমন করেন এবং প্রায় এক সপ্তাহ তথায় অবস্থান করেন। এরপরে ১৯২৭-এ কলমা রামকৃষ্ণ আশ্রমে বিক্রমপুর রামকৃষ্ণ ভক্তসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীস্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গে মঠের পনের জন সন্ন্যাসী উপস্থিত থেকে ভক্তদের উৎসাহিত করেন। বিক্রমপুর-বাসী বহু ভক্ত সেবার ওই সম্মেলনে যোগদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবা ও কর্মযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিনোদেশ্বর যথার্থই তাঁর স্বভূমিকে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য থেকে বহুলাংশে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে তাঁর পরিচালনায় বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষাধিক টাকার ত্রাণ ও সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়। কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি ছিল এই বিরাট সেবাকার্যের কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট কর্মিবৃন্দ এ সময়ে তাঁর গৃহেই আপ্যায়িত হতেন। প্রতি বছরেই বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে কলমা শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে যে ভক্ত-সমাবেশের ব্যবস্থা হয়ে থাকত, তাতে বেলুড় মঠের অনেক সাধু উপস্থিত থেকে সে উৎসবানু-ষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতেন। বিনোদে-শ্বরের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে ওই অঞ্চলের অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের পরে অত্যন্ত প্রতি-কূল পরিবেশে বিনোদেশ্বর প্রায় একাকী দীর্ঘকাল স্বভূমিতে ন্যায় ও কল্যাণের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এই সময়ে তাঁর কণ্ঠে স্বরচিত আরেকখানি গান খুব শোনা যেত—

"মাগো, হাত বুলায়ে দিয়েছ গায়
প্রাণে তবু ব্যথা কেন—
ছুঁয়েছি ওই অভয় চরণ
দুঃখের ভয় মা তবু কেন?"

তাই তো দেখা যায় যে, মাতৃভক্ত বিনো-দেশ্বরকে বেলুড় মঠ হতে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ একসময় লিখছেন (১৯৩০)—"তোমার জীবনের গতি ও ইতিহাসের কথা যাহা লিখিয়াছ—তাহা কিছু নয়—তিনি কৃপাময়—তাঁর কৃপা কি কোন **condition** অপেক্ষা করে। তাঁর শক্তিতে, তাঁর ইচ্ছায় সবই সম্ভব হয়।…তুমি ঠিক লিখিয়াছ, শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসা তুমি শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের ভিতর দিয়া পাইয়াছ এবং আমাদের ভিতর দিয়াও তাহার প্রকাশ ততটা না হউক অনেকটা দেখিয়াছ। ক্রমে ক্রমে আমাদের ভিতরেও সেই ভালবাসা আরও প্রকাশ হইবে। তুমি শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসাই পাইয়াছ এবং বরাবর পাইবে। আমি খুব আশীর্বাদ করিতেছি।"—এভাবে বিনোদেশ্বর-ইন্দুবালার জীবন পর্যালোচনা করলে অনুভব করা যায় অথবা বুঝা যায় যে, এঁরা শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সন্তান। শ্রীশ্রীমা সারদার কৃপাতেই তাঁদের সুদীর্ঘ সংগ্রামবহুল জীবন যেন এক সুর, এক ছন্দে প্রবাহিত হয়। সে সুর, সে ছন্দের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা। শ্রীশ্রীমা সারদার কৃপাদৃষ্টিতে তাঁদের জীবন সার্থকতা পায়। প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের সাহচর্যের মধ্য দিয়ে বিনোদেশ্বর, ইন্দুবালা শ্রীশ্রীমায়ের কোলে চির-আশ্রয় লাভ করেন।

করুণাময় ঈশাবতার

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

সুপরিচিত প্রাবন্ধিক।

এক

শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন জীবনী বা স্মৃতিকথায় পাই যে, ঠাকুর অশুদ্ধচরিত্র লোকের দেওয়া কোন জিনিস খেতে পারতেন না, তাদের স্পর্শও সহ্য করতে পারতেন না। এমন কি সমাধিস্থ অবস্থায় অন্তরঙ্গ ভক্তদের সকলের স্পর্শ তাঁর কাছে প্রীতিকর হত না, 'হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) বা আর দু-একজন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তই কেবল সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁকে ধরে থাকতেন বা তাঁর পরিচর্যা করতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুরের এই বিশেষ ভাব বা অবস্থাটির কিছু কিছু বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। (কথামৃত, ২।৬।৪)

"কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর পতিতপাবন, তাহার সহিত অনেক পুরানো কথা কহিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন ত বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস ত?

"ভগবতী (ঈষৎ হাসিয়া)—তা' আর কি ক'রে বোল্‌বো?

"শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশী, বৃন্দাবন,—এ সব হয়েছে?

"ভগবতী (ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া)—তা' আর কি ক'রে বোল্‌বো? একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—বলিস কি রে?

"ভগবতী—হাঁ, নাম লেখা আছে, 'শ্রীমতী ভগবতী দাসী'।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(ঈষৎ হাসিয়া)—বেশ বেশ।

"এই সময়ে ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

"বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল—এখনও আছে! হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গাজল লইয়া সে স্থান ধুইতে লাগিলেন।"

বর্ণনাটির বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কথামৃতকার জীবন্ত ছবি এঁকে ঠাকুরের দিব্যভাবময় অবস্থা আর দাসী ভগবতীর প্রাকৃতজনোচিত বুদ্ধির সুবিপুল পার্থক্য পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

তবে পরের অনুচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য মহিমার পরিচয় আরও অনেক বেশি করে ফুটে উঠেছে।—

"দু' একটি ভক্ত যাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহারা অবাক্ ও স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জীবন্মৃতা হইয়া বসিয়া আছে। দয়াসিন্ধু পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করুণামাখা স্বরে বলিতেছেন, 'তোরা অমনি প্রণাম করবি।' এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন, 'একটু গান শোন্'।"

এই সূত্রেই অন্য একটি পটভূমিকায় একটি দৃশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকের অভিনয় দেখতে গেছেন। অভিনয় শেষ হলে গিরিশ যে ঘরে বসেন ঠাকুরকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সময়কার বর্ণনা। (কথামৃত, ৩।১১।৪)

"অভিনয়ান্তে গিরিশের উপদেশে নটীরা (actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাহারা দেখিয়া অবাক যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, 'মা থাক্ থাক্; মা থাক্ থাক্।' কথাগুলি করুণামাখা।

"তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন—'সবই তিনি, এক এক রূপে'।"

*

শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণের, শুধু তাঁরই বা কেন, যে কোন মহাপুরুষেরই আচরণের খুঁটিনাটি বিচার করা যায় না। তবে দাসী ভগবতীর বেলায় যেমন, সেকালের বারবনিতা অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রেও তেমনই তাঁর সীমাহীন করুণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ করুণার, এ কৃপাদৃষ্টির কারণ কী তা বিশ্লেষণও করা যায় না। তবে মনে হয়, যেখানে ভক্তি আন্তরিক সেখানেই তাঁর করুণাময় রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লৌকিক দৃষ্টিতে পাপপুণ্যের হিসেব খতিয়ে দেখেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের প্রায় বছর দশেক পরে তাঁর অধ্যাত্মসাধনভূমি দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে জনৈক ভদ্রলোক একটি পত্রে স্বামীজীকে লেখেন (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪)—"দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে।" এই অভিযোগ প্রসঙ্গে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন—

"বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।...

"যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God'. এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসী-ভাব মনেও স্থান দিবে না।"

দুই

ব্রাহ্মভক্তদের বা অন্য গৃহস্থ ভক্তদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের তাঁর কথার ন্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে নিতে বলতেন; কেননা, তিনি জানতেন, তাঁদের অন্তরে ষোল আনা বৈরাগ্যের ভাব আসেনি। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তদের উপদেশ দেবার সময় তিনি নিঃশর্ত বৈরাগ্যের কথাই বলেছেন। যীশু তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের যে উপদেশ দিয়েছেন তাও একান্তভাবে বৈরাগ্যসাধনেরই নির্দেশ। শৈলোপদেশ নামে

পরিচিত তাঁর ধর্মদেশনা (ম্যাথিউ ৫—৭) তার বিশেষ দৃষ্টান্ত। বৃথা আড়ম্বর, অনর্থক আত্মম্ভরিতা পরিহার করে ঈশ্বরে একান্ত শরণাগতির উপদেশ দিয়ে তিনি তাঁদের শুদ্ধসত্ত্ব হতে বলেছেন, কেন না পরমেশ সুবিশুদ্ধ পূর্ণস্বরূপ। তিনি নানাভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁদের কায়িক, বাচিক এমন কি মানসিক পাপ থেকে বিরত হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু পাপসঙ্গ পরিহার করার উপদেশ বার-বার দিলেও পাপীকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। প্রাচীন ইহুদী সমাজে বাহ্য দৃষ্টিতে পাপপুণ্য শুচি-অশুচি বিচার পুরোমাত্রায় করা হত। বিশেষত ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত ফ্যারিসীরা আচারসর্বস্ব ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। যীশুর অন্তর্ময় অধ্যাত্ম-সাধনার আদর্শ বোধগম্য না হওয়ায় তারা যীশুর বাহ্য আচরণের সমালোচনা করেছে।

একটি ঘটনা (লুক ৭)।—সাইমন নামে এক ফ্যারিসী যীশুকে তাঁর গৃহে ভোজের নিমন্ত্রণ করেছিল। তিনি যথাসময়ে সাইমনের গৃহে প্রবেশ করে ভোজের আসনে বসলেন। ঐ জন-পদেরই এক পাপাচারিণী নারী শুনেছিল যে যীশু সাইমনের গৃহে ভোজে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। সেও সেই গৃহে এসে যীশুর পিছন দিকে দাঁড়াল, ক্রমে নুয়ে পড়ে চোখের জলে তাঁর পা ভিজিয়ে দিল, কেশদাম দিয়ে তাঁর পা দুখানি মুছিয়ে দিয়ে বারবার চুম্বন করে বহুমূল্য সুরভিসার মাখিয়ে দিল।

সাইমন কিন্তু ভাবল, এই লোকটা যদি যথার্থই ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ হত, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারত কী ধরনের স্ত্রীলোক ওকে স্পর্শ করছে, জানতে পারত এ পাপে ডুবে আছে।

তার মানস চিন্তা অনুধাবন করে যীশু বললেন, "সাইমন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"

"বলে ফেলুন প্রভু।"

"এক পাওনাদারের দুজন দেনদার ছিল। তাদের মধ্যে একজন পাঁচশো ধারত, আর একজন ধারত পঞ্চাশ। যখন তাদের ধার শোধ করবার মতো কোন সংগতিই থাকল না, পাওনাদার তাদের ঋণ মকুব করল।—আচ্ছা, এই দুজনের মধ্যে কে তাকে বেশি ভালবাসবে?"

সাইমন বলল, "আমার মনে হয়, যার বেশি ঋণ মকুব করা হয়েছে সেই বেশি ভালবাসবে।"

"তোমার বিচারই ঠিক।"

এবার সেই নারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে যীশু সাইমনকে বললেন, "তুমি এই নারীকে দেখছ? আমি তোমার বাড়িতে এলাম, তুমি আমাকে পা ধোয়ার জন্য জল দাওনি; ও কিন্তু চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে, চুলের গোছা দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে। তুমি আমায় চুম্বন করে সাদরে অভ্যর্থনা করনি; ও কিন্তু আমি আসবার পর থেকেই আমার পা দুটোয় চুমো খেয়ে চলেছে। তুমি আমার মাথায় সুরভিসার দিয়ে সংবর্ধনা করনি; ও আমার পায়েই সুরভিসার মাখিয়ে দিয়েছে। কেননা ওর পাপ যে অনেক, আর তা ক্ষমা করা হয়েছে। তাই ওর এত ভাল-বাসা! যার অল্পই ক্ষমা করা হয় তার ভাল-বাসা কমই হয়।"

এই বলে তিনি সেই নারীকে বললেন, "তোমার পাপ মার্জনা করা হয়েছে। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে রক্ষা করেছে। যাও, শান্তিতে থাকো।"

আর সবাই কিন্তু গুজগুজ করতে লাগল—এ লোকটা পাপ ক্ষমা করবার কে?

তিন

পিটার অ্যাণ্ড্রু ভাই তথাকথিত ভদ্রলোক ছিলেন না, জেবেদীর দুই ছেলে জন আর জেমসও না। মাছ ধরা তাঁদের জীবিকা—যীশু তাঁদের মানুষধরা করতে চেয়েছিলেন। তবে এই সহজ

সরল জেলেদের ছেলে কটির জীবনে পাপের ছোঁয়াটুকু ছিল না। যীশু যখনই তাঁদের ডাক দিয়েছেন, তখনই তাঁরা সব ফেলে তাঁর অনুগামী হয়েছেন। (ম্যাথিউ ৪) একান্ত বিশ্বাস আর নির্ভরের জন্য যীশু তাঁদের অন্তরঙ্গ শিষ্য করে নিয়েছেন।

পাপীতাপীকেও তিনি দূরে সরিয়ে দেননি। তবে যিনি তাঁর চিহ্নিত সন্তান, তিনি তাঁর এক ডাকে সাড়া দিয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে এসেছেন। ম্যাথিউয়ের কথাই ধরা যাক না! (ম্যাথিউ ৯) তিনি বৃত্তিতে করসংগ্রাহক। সেকালে এ কাজ যারা করত তারা নীতির ধার ধারত না। সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করে ন্যায্য বা অন্যায্য উপায়ে অর্থ নিষ্কাশন করাই ছিল তাদের নিত্য কর্ম। ম্যাথিউ এ-হেন করসংগ্রাহকদের একজন। একদিন তিনি পথের ধারে কর আদায় করার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে ছিলেন। যীশু সে পথ দিয়ে যেতে যেতে তাঁর দিকে চাইলেন, বললেন, "আমার অনুসরণ কর।"

ম্যাথিউ উঠে পড়লেন, যীশুর পিছু পিছু চললেন। সব পড়ে রইল পিছনে।

যীশু যখন কোন বাড়িতে খেতে যেতেন, তখন পাপীতাপীদের অনেকেই তাঁর আর তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসে যেত। ফ্যারিসীরা তাই দেখে তাঁর শিষ্যদের বলল, "তোমাদের প্রভু পাপীতাপীদের সঙ্গে খায় কেন?" (ম্যাথিউ ৯)

যীশু শুনে বললেন, "যারা সুস্থ তাদের তো আর বৈদ্যের দরকার নেই। রোগীদেরই বৈদ্যকে দরকার। আমার এ কথার মানে ভাল করে বোঝোগে। আমি চাই করুণা, বলি নয়। আমি পাপীতাপীদের ডেকে নিতে এসেছি, ধার্মিকদের নয়।"

অবশ্যই যাদের অন্তরে গভীর বৈরাগ্য বীজাকারে আছে তারাই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পেরেছে। যারা মন্দ বৈরাগ্যবান অথবা যারা ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বশে তাঁর অনুবর্তী হতে চেয়েছে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। (লুক ৯)

যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চলেছেন, এমন সময় একজন এসে বলল, "আপনি যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার অনুগামী হব।

যীশু বললেন তাঁকে, "শিয়ালের গর্ত আছে; পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়—তাদেরও নীড় আছে। কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার জায়গা নেই।"

একজনকে তিনি নিজেই বললেন, "এস আমার সঙ্গে।

সে বলল, "ভগবন্, অনুমতি দিন, আগে আমার মৃত পিতাকে সমাধিস্থ করে আসি।"

যীশু বললেন, "যারা মৃত তাদেরই আপন মৃতকে সমাধিস্থ করতে দাও। চল তুমি, ঐশ স্বারাজ্য খ্যাপন করবে।"

আর একজন বলল, "ভগবন্, আমি আপনার অনুসরণ করবই। তবে আগে বাড়ি গিয়ে আমার স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে দিন।"

যীশু বললেন, "যে লাঙলে হাত দিয়ে পিছু ফিরে চায়, সে ভাগবত লোকের অধিকারী নয়।"

যার অন্তরের অন্তস্তলে ডাক পৌঁছেছে, অনুরাগরাগে যার মন রঙেছে সে বিচার করে না—যার টানে বেরিয়ে পড়ব তার ঘরদুয়ার আছে কিনা, পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ করতে হবে, অথবা আত্মীয়পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।

হাজার জপতপ ব্রত-উপবাস আচার-অনুষ্ঠান কর না কেন, বৈরাগ্য না হলে, ঈশ্বরে অনুরাগ

না হলে কিছুই কিছু নয়। আসক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তির অন্য উপায় নেই।

ধর্মাচারী এক পদস্থ পুরুষ যীশুকে প্রশ্ন করল, "মঙ্গলময় প্রভু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?" (লূক ১৮)

যীশু বললেন, "আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? মঙ্গলময় আর কেউ নয়, কেবল একজনই—তিনি ঈশ্বর। নীতিনির্দেশাবলী অবশ্যই তোমার জানা আছে—ব্যভিচার করো না, হনন করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, বাপ-মাকে শ্রদ্ধা করবে।"

সে বলল, "এ সব উপদেশ আমি তো প্রথম বয়স থেকেই মেনে আসছি।"

যীশু এ কথা শুনে বললেন তাকে, "এখনও পর্যন্ত তোমার শুধু একটি জিনিসের অভাব থেকে গেছে। তোমার যা কিছু আছে বেচে ফেল, যা পাবে গরীবদের বিলিয়ে দাও। তাহলেই তুমি স্বর্গধামে ঋদ্ধির অধিকারী হবে। এস, আমার অনুগামী হও।"

কিন্তু এ কথা শুনে সে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ল, কেননা অগাধ সম্পত্তি তার।

তার আচরণ দেখে যীশু বললেন, "যাদের ধনসম্পত্তি আছে তাদের পক্ষে ভাগবত লোকে প্রবেশ করা কত কঠিন! ধনবানের পক্ষে ঐশ ধামে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সূচের গর্তে ঢোকা অনেক সহজ।"

তাঁর শিষ্যরা এ কথা শুনে প্রশ্ন করল, "কারা তবে ত্রাণ পাবে?"

তিনি বললেন, "মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব শ্রীভগবানের পক্ষে তা সম্ভব।"

পিটার বলে উঠলেন, "দেখ, আমরা আমাদের সব কিছু ছেড়ে তোমার সঙ্গে এসেছি।"

যীশু বললেন শিষ্যমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে—"তোমাদের আমি নিশ্চয় করে বলছি, যে কেউ ভাগবত ধামের উদ্দেশে ঘরবাড়ি, পত্নী, ভাইদের, বাপ-মা আর সন্তানদের ত্যাগ করে এসেছে, সে-ই কালে বহুগুণ ফিরে পাবে, ভবিষ্যলোকে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।"

চার

ঈশ্বরলাভের জন্য সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়া সহজ নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রীভগবানের কৃপাই সম্বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তবে কৃপা হয়।" (কথামৃত, ১।১৩।৩)

এই ব্যাকুলতা ছিল বলেই জ্যাক্কেউস যীশুর কৃপা পেয়েছিলেন। (লূক ১৯)—জেরিকো শহরের মুখ্য করসংগ্রাহক জ্যাক্কেউস—বিত্তবান পুরুষ তিনি।

যীশু জেরিকো শহরে প্রবেশ করে রাজপথ দিয়ে চলেছিলেন—আশেপাশে শিষ্য, ভক্ত, কৌতূহলী দর্শক আর সহযাত্রীদের জনতা। জ্যাক্কেউস যীশুকে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন—কেমন তিনি, কেমন তিনি!

এদিকে আবার জ্যাক্কেউস মাথায় খাটো। ভিড়ের মধ্য দিয়ে যীশুকে দেখা সম্ভবপর নয়। তবে উপায়?

তিনি দৌড়ে খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে একটা বড় গাছে উঠলেন—এই পথ দিয়েই যীশু যাবেন।

যীশু যথাকালে এলেন সেখানে, উপরের দিকে তাকালেন, বললেন তাঁকে, "জ্যাক্কেউস, জলদি নেমে এস; আজ যে আমি তোমার বাড়ি থাকব।"

জ্যাকেউস যেন ঝাঁপ দিয়েই নেমে এলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যীশুকে বরণ করলেন।

ব্যাপার দেখে শুনে কয়েকজন কিন্তু জল্পনা করতে লাগল, "উনি একটা পাপীর সঙ্গে থাকবেন!"

করসংগ্রাহকরা প্রায়ই অসাধু। তাই এই মন্তব্য।

আর জ্যাকেউস সেখানেই দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে যীশুকে বলে চললেন, "শোন প্রভু শোন! আমার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ আমি গরীবদের দিই। যদি আমি অন্যায়ভাবে কারো কাছ থেকে কর আদায় করে ফেলি, তার চারগুণ ফিরিয়ে দিই।"

যীশু বললেন, "আজ তোমার আবাসে মহাত্রাণ এসেছে, কেননা তুমিও আব্রাহামের সন্ততি। যে হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বার করে ত্রাণ করবার জন্যই মানবপুত্রের আবির্ভাব।"

পাঁচ

যা হারিয়ে গিয়েছিল তা ফিরে পাওয়ার আনন্দের কথা যীশু নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। (লূক ১৫)—

"একজনের একশোটা ভেড়া ছিল, তার একটা হারিয়ে গেল। সে তখন বাকি নিরেনব্বুইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে ঐ একটিকেই খুঁজে বেড়াবে। যখন সেই হারানো ভেড়াটি খুঁজে পাবে, সে খুশির চোটে সেটাকে ঘাড়ের উপর তুলেই নিয়ে আসবে। বাড়ি ফিরে সে হারানো ভেড়া খুঁজে পাওয়ার কথা আনন্দ করে বলবে।

"তোমাদের বলছি আমি, যদি একজন পাপাচারী অনুতাপ করে, তাহলে, অনুতাপের প্রয়োজন নেই এমন নিরেনব্বুই জন ধর্মাচারীর জন্য যে আনন্দ হয়, স্বর্গলোকে তার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে।

"এক নারীর দশটি টাকা ছিল, তার একটি হারিয়ে গেল। সে তখন আলো জ্বেলে সারা বাড়ি ঝাঁট দিয়ে তন্ন তন্ন করে এদিক ওদিক খুঁজবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না টাকাটা খুঁজে পায়। টাকাটা খুঁজে পেয়ে সে খুশিতে ডগমগ হয়ে প্রতিবেশীদের বলে, 'দেখ আমার একটা টাকা হারিয়ে গিয়েছিল, খোঁজাখুঁজি করে পেয়ে গেছি সেটা।'—তোমাদের বলছি আমি, একটি পাপীর অনুতাপেও ঈশদূতদের অশেষ আনন্দ হয়।"

এরপর যীশু শুনিয়েছেন অমিতব্যয়ী পুত্রের কাহিনী।—

এক সম্পন্ন ভদ্রলোকের দুটি ছেলে ছিল। ছোট ছেলে একদিন তাঁকে বলল, "বাবা, তোমার সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে আমাকে দিয়ে দাও।"

তিনি তখন তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে তার অংশ তাকে দিয়ে দিলেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছোট ছেলে তার অংশ থেকে টাকাকড়ি গুছিয়ে নিয়ে দূর দেশে পাড়ি দিল। সেখানে সে অমিতাচারে টাকা নষ্ট করতে লাগল। যখন তার টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে, সে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অভাবের তাড়নায় সে ঐ দেশের এক গৃহপতির কাছে চাকরি নিল। তিনি তাকে শুয়োরের পালকে খাওয়াবার জন্য মাঠে পাঠালেন। সেখানে তাকে শুয়োরে যে খুদকুঁড়ো খায় তাই খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত; আর কেউ তাকে কিছু দিত না।

একটু ধাতস্থ হয়ে সে ভাবতে লাগল, "আমার বাবার চাকরবাকরদেরই কত বাড়তি খাবার থাকে আর এখানে আমি খিদেয় মরতে বসেছি। আমি আমার বাবার কাছে যাব, বলব তাঁকে—স্বর্গের বিরুদ্ধে আর তোমার সাক্ষাতেও আমি পাপ করেছি। আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। আমাকে তোমার একজন চাকরের মতো রাখ।"

সে তখন পিতৃগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করল। সে যখন কিছুটা দূরেই তখন তার বাপ তাকে দেখতে পেয়ে করুণায় আপ্লুত হয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন, তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন।

ছেলে বলল, "বাবা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, তোমার সাক্ষাতে পাপ করেছি। আমি আর তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য নই।"

বাপ কিন্তু তাঁর চাকরদের ডেকে বললেন, "শিগ্‌গির সেরা পোশাক নিয়ে এসে একে পরিয়ে দাও, হাতে একটি আংটি পরাও, পায়ে জুতো পরাও। আর পুরুষ্টু বাছুরটাকে কেটে ভোজের ব্যবস্থা কর—আমোদ-আহ্লাদ কর। কেননা আমার যে ছেলে মারাই গিয়েছিল সে আবার বেঁচে উঠেছে; যে হারিয়ে গিয়েছিল তাকে ফিরে পাওয়া গেছে।"

তারা তখন দিব্যি আমোদ-আহ্লাদ শুরু করে দিল।

ঐ ভদ্রলোকের বড় ছেলে তখন খেতে ছিল। খেতের কাজ সারা হলে সে যখন বাড়ি-মুখো হল তখন দূর থেকে নাচগানের শব্দ শুনতে পেল। চাকরদের একজনকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কী রে?"

চাকর বলল, "তোমার ভাই এসেছে। তাকে সুভালাভালি ফিরে পেয়েছে বলে তোমার বাপ মোটানো বাছুরটাকে মেরেছে।"

বড় ছেলে কিন্তু এমন চটে গেল যে বাড়ির ভিতর ঢুকলই না। বাপ তখন বেরিয়ে তাকে আদর করে ডাকতে লাগলেন।

ছেলে তখন বাপকে বলল, "এত বছর ধরে আমি তোমার জন্য খেটে মরছি, তুমি একদিনও আমাকে একটা মিষ্টি কথা বলনি। বাছুর তো দূরের কথা, তুমি আমাকে একটা ছাগলছানাও দাওনি, যাতে করে আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে পারি। আর তোমার ঐ সুপুত্তুর খারাপ মেয়েছেলেদের পিছনে তোমার রোজগার করা সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে, তুমি কিনা ওর জন্য মোটকা বাছুরটাকে মেরেছ!"

বাপ তখন বললেন, "বাছা আমার! তুমি তো চিরদিন আমারই আছ—আমার যা কিছু তা তো তোমারই! তোমার ভাই যে মারাই গিয়েছিল, বেঁচে উঠে ফিরে এসেছে—ও তো হারিয়েই গিয়েছিল, আবার ওকে ফিরে পাওয়া গেছে! তাই একটু আমোদ-আহ্লাদ করার কথা নয় কি?"

*

যীশু যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বা কাহিনী বলেছেন তার মর্মার্থ সুস্পষ্ট। তবুও মনে হয়, পতিতপাবন পাতকিশরণ আখ্যা সার্থক করবার জন্যই অবতার পুরুষের আবির্ভাব। লোকোত্তর চরিত্রের মহাপুরুষদের জীবনেও শরণাগত আর্তজনের প্রতি অহৈতুকী করুণা বিতরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

শ্রীশ্রীমাতৃপ্রসঙ্গ

স্বামী অশেষানন্দ

আমেরিকাস্থ পোর্টল্যান্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ– বেলুড় মঠের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী। ২৬ এপ্রিল, ১৯৮০, নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে প্রদত্ত ভাষণের শেষাংশ —মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন স্বামী চৈতন্যানন্দ।

কেউ যদি ঈশ্বরীয় সত্তার সংস্পর্শে আসতে ইচ্ছা করে, তবে তার জীবনটিকে পবিত্র করতে হবে, যেমনটি শ্রীশ্রীমা যাপন করেছিলেন—শান্ত পবিত্র জীবন। তিনি কেবল শান্ত ও গম্ভীর ছিলেন না,—তিনি তাঁর মনকে বিশ্বসত্তা বা চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন পরমাত্মায় সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীমা দীক্ষার মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করে দিতেন; তাঁর ছিল সেই ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তি যাতে *এটি* সম্ভব হয়েছিল। তাঁর জীবন ছিল নীরব এবং পবিত্র, কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতেই করুণা ও শান্তির একটি প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হত—স্থানটি বাস্তবিকই তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হত।

যদি আপনারা আমাকে প্রশ্ন করেন, শ্রীশ্রীমা কিসের প্রতিমূর্তি ছিলেন? আমি প্রথমেই বলব, তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যের আদর্শ মা ম্যাডন্না—চিরকুমারীর আদর্শ, চরম পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। অধিকন্তু তিনি শান্ত, পবিত্র জীবনযাপন করে সাংসারিক জীবনে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে গৃহীরও আদর্শ ছিলেন। তাঁর জীবনকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করে গৃহী ভক্তরাও অনুপ্রাণিত হতে পারেন এবং ভগবান-লাভও করতে পারেন। শ্রীশ্রীমা সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে একটা বিরাট সমন্বয়সাধন করেছিলেন এবং তাঁর বিষয়ী আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যখন থাকতেন তখনও তিনি গভীর আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ থাকতেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা মোক্ষের কথা চিন্তা করত না। তাঁর কাছে তারা চাইত অর্থ এবং তাদের নানা রকম সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানে সাহায্য। গৃহী ভক্তরা তাঁদের পথ চলায় বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকেই আলো পেতে পারেন। আমার মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সন্ন্যাসাদর্শের বিগ্রহ, যেহেতু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা-প্রদান প্রসঙ্গে আমরা তেমনই দেখতে পাই। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেখি প্রগাঢ় সরলতার আদর্শ। তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি এই সরলতা ও পবিত্রতার মূল্যবোধ। জীবনের মহান্ বস্তুগুলি অতি সরল। মায়ের যে ভালবাসা আমরা শিশুর মতো উপভোগ করি তাও খুবই সহজ সরল। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের অপরিসীম সরলতা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে এমন কিছু একটা সূক্ষ্ম জিনিস ছিল যার ফলে তাঁকে বোঝা খুব কঠিন ছিল। আমাদের ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে কিংবা অস্বাভাবিক কিছু একটা ভাবে চিন্তা করতেই আমরা অভ্যস্ত। যা কিছু সরল, তা আমাদের কাছে যেন অতি সাধারণ। যদি মন্ত্র দিয়ে বলা হয়, *এটি* মাথার চারদিকে তিনবার ঘুরাতে এবং এটা ওটা করতে, তাহলে আমাদের বিশ্বাস হয় যে, সত্যকারের কিছু একটা হল। কিন্তু যদি মন্ত্রটি সহজভাবে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা কি এর যথার্থ মূল্য বুঝতে পারি? শ্রীশ্রীমা ছিলেন আদর্শ গুরু। তাই তিনি সহজভাবেই আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন। তাঁর কৃপায় আমি এই সঙ্ঘে যোগদানের কথা ভাবতে পেরেছিলাম এবং ভক্তদের জন্য তাঁর কাজে আমিও যৎকিঞ্চিৎ অংশ নিতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমি খুব সামান্যই তাঁকে বুঝতে

পেরেছি। শ্রীশ্রীমাকে সত্যিকারের বুঝতে পেরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এবং তিনিই জানতেন মা কোন্ উচ্চ ভাবের প্রতিমূর্তি ছিলেন। সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ গোলাপ-মাকে তেমনি ভাবে বলেছিলেন, যেটি আমাকেও একদিন গোলাপ-মা কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন।

আমি সঙ্ঘে যোগদান করেছি শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির পর। আমার সুযোগ হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সেবা করার। এখন আমি বলতে পারি যে, তাঁদের সেবা করাও সহজ ছিল না। তাঁরা ঠিক একই রকম ছিলেন। একদিন আমি গোলাপ-মাকে বললাম, "আমি যদি মা স্থূলশরীরে থাকতেই সঙ্ঘে যোগদান করতাম, তাহলে তাঁর সেবা করতে পারতাম।" তখন গোলাপ-মা বললেন, "কার সাধ্য তাঁকে বুঝবার? আমি তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেছি, তবুও তাঁকে বুঝতে পারিনি।" অতঃপর তিনি সেই ঘটনাটি আমাকে বললেন: তিনি কারো কাছ থেকে শুনলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে শ্যামপুকুরে গিয়েছেন, কারণ শ্রীশ্রীমা খুব বেশি করে তাঁকে খাওয়াচ্ছিলেন, ফলে তাঁর অসুখ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে। যে মুহূর্তে এই কথা শুনলেন, তক্ষুণি তিনি সারাটা পথ হেঁটে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি ঠিক তুমি আমার সেবায় অসন্তুষ্ট এবং সেই কারণেই শ্যামপুকুরে এসেছ?" শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে বলেছে এই কথা?" তখন শ্রীশ্রীমা তাঁকে বললেন যে, এই সব তিনি শুনেছেন গোলাপের কাছ থেকে। "ব্রাহ্মণীকে আসতে দাও, আমি আচ্ছা করে তাকে শিক্ষা দেব।"—শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন। যখন তিনি রুষ্ট হতেন তাঁর কাছে তখন কেউ যেতে পারত না। গোলাপ-মা পরদিন এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "তুমি কি সত্যিই ঐ সব বলেছিলে? বলেছিলে? তাহলে যাও তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। যদি সে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে তোমার এখানে ঠাঁই হবে না।" তিনি আরও বললেন, "ও সারদা—সরস্বতী, যদিও নাম সারদা; ও স্বয়ং জগজ্জননী; জ্ঞানদায়িনী, মুক্তিদায়িনী। ও জ্ঞান দিতে এসেছে—সরস্বতী। ওর কৃপায় হৃদয় আলোকিত হয়।" সেদিন গোলাপ-মা আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি শ্যামপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সারাটা পথ কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে, শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে পড়ে বললেন, "মা, কৃপা করে আমাকে ক্ষমা কর। আমি এর-তার কাছ থেকে শুনেছিলাম, তাই তোমাকে বলেছিলাম। আমার বলা উচিত হয়নি। আমাকে ক্ষমা কর, ঠাকুর আমার উপর ভীষণ রাগ করেছেন। যদি তুমি ক্ষমা না কর ঠাকুর আমাকে আর তাঁকে দর্শন করারও অনুমতি দেবেন না।" তাঁর পিঠ চাপড়িয়ে শ্রীশ্রীমা বললেন, "ভুলে যাও, গোলাপ, ভুলে যাও। তুমি আমার মেয়ে; মা তার মেয়ের উপর রাগ করতে পারে না। তুমি ঠাকুরকে বল যে, আমি তোমার উপর খুব খুশি।" আপনারা দেখুন, গোলাপ-মা এত সরল এবং স্পষ্ট বক্তা ছিলেন যে, তাঁকে এই জন্য অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণই শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত দৈবী সত্তা ও শক্তির সম্বন্ধে গোলাপ-মায়ের চোখ একটু খুলে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবন ও অনুভূতির মাধ্যমে যে জ্ঞান বিতরণ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা বাস্তবিকই আমাদের ধারণা বা যুক্তিতর্কের বাইরে। এই জ্ঞানের স্বভাবই হচ্ছে মোহ-নিদ্রা ভাঙানো—আমাদের তর্কজাল ছিন্ন করা। শ্রীশ্রীমা ছিলেন তুরীয় উপলব্ধি সঞ্জাত প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি, যেখানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই,—এমন একটা অবস্থা যেখানে যুক্তি অযুক্তি

হয়ে পড়ে এবং আমরা অনুভব করতে পারি যে, যুক্তি দ্বারা সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। যুক্তি নির্দেশ করে বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য ছাড়াও স্থান, কাল ও নিমিত্তের তাৎপর্যকে। যুক্তির মাধ্যমে আমরা যা কিছু জানি বা বুঝি তা সবই বুদ্ধির দ্বারা রঞ্জিত। যতক্ষণ আমরা স্থান-কাল-নিমিত্তের জগতে বাস করি, ততক্ষণ আমাদের জ্ঞান কেবল আংশিক এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ের বাস্তব মূল্য সম্পর্কিত। তাকেই বলা হয় মায়া। এটা ঠিক অলীক নয়,—বলা চলে আপেক্ষিক। পাশ্চাত্য জগৎ দুটি ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছে: প্রথমটি ধর্ম এবং দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান। কিন্তু এগুলি অপরা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত—পরা জ্ঞান নয়, যা শ্রীশ্রীমার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবন ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বৈতরাজ্য অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর জীবনই প্রমাণ করে যে, মনুষ্যজীবনের অনুসন্ধেয় কি এবং তা কেমন করে লাভ করা যায়। যিশু, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের ন্যায় লোকগুরুরা আসেন আদর্শ জীবনযাপন করতে এবং ভগবৎ-অনুভূতি যে সত্য তা মানুষের কাছে প্রমাণ করেন।

আমাদেরই চেষ্টা করতে হবে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে—যা ঐ সব মহান্ জ্যোতিষ্করা তাঁদের জীবনের মাধ্যমে আমাদের দেখিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের মতো মহান্ গুরুরা আসেন সেই চরম জ্ঞান দান করতে যার সাহায্যে মরণ-সীমা লঙ্ঘন করা যায়,—দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করতে যাতে আমরা আমাদের স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। তাঁদের জীবন মানবজাতির কাছে পরম আশীর্বাদ। অতএব, আমি বিশ্বাস করি যে, যতক্ষণ আমি শ্রীশ্রীমায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করব এবং তিনি অসীম কৃপা করে আমাকে যে মহামন্ত্র দিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাসবান থাকব, ততক্ষণ তাঁর প্রদত্ত কর্মভারও আমি বহন করতে সক্ষম হব—অন্ততঃ তাতেই আমার কৃতার্থতা-বোধ আসবে। আপনারা দেখুন, মানুষ নিজে যদি তৃপ্ত না হয়, তাহলে অপরকে সে সত্যিকারের তৃপ্তি দিতে পারে না। কেবল দীপই পারে আলোক দিতে। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং জগজ্জননী হয়েও এই সংসারের মাঝে থেকে ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তির আলোক প্রদর্শন করেছিলেন জীবের কল্যাণের জন্য।

শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য চন্দ্রমোহন দত্তের কাছে একসময় আমি একটি ঘটনা শুনেছিলাম। আমি তখন উদ্বোধন কার্যালয়ে ম্যানেজারের সহকারী-রূপে কাজ করতাম এবং চন্দ্রবাবু বই-এর প্যাকেট বাঁধতেন। চন্দ্রবাবু স্নান করতে যাচ্ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে, যিনি পরবর্তী কালে আমাদের সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজী চন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তুমি তো মায়ের কাছে যাও,—তাঁর কাছে তুমি কি চাও?" উত্তরে চন্দ্রবাবু বললেন, "আমি তাঁর কাছে মিষ্টি প্রসাদ চাই।" তখন তিনি বললেন, "তুমি কি কেবল মায়ের কাছে প্রসাদ চাইতে এসেছ? এজন্যই কি কেবল এসেছ? মা মুক্তি-দায়িনী। তুমি তাঁর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তি চাও।" চন্দ্রবাবু বললেন, "আচ্ছা মহারাজ, আমি তাই চাইব।" সুতরাং তিনি উদ্বোধনে ফিরে এলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠে গোলাপ-মার ঘরের সামনে দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে গেলেন। শ্রীশ্রীমা তখন দুপুরের পূজা করছিলেন এবং নীরব ছিলেন; যেমন পূজাকালে নিয়ম। চন্দ্রবাবুকে দেখে মা ইসারায় জানতে চাইলেন, "বাবা, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?" চন্দ্রবাবু আমাদের বলেছিলেন, "আমার তখন হৃৎকম্প হচ্ছিল,—ভেবে এসেছিলাম যে, মায়ের কাছে জানাব 'মা, কৃপা করে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিন এবং তা যদি খুব বেশি হয়ে যায়, তাহলে

আমাকে মুক্তি দিন বা অন্ততঃ মোক্ষ দিন।' কিন্তু আমার মুখ দিয়ে তখন কোন কথাই বের হল না। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তখন। অগত্যা কোনরকমে বলে ফেললাম, 'প্রসাদ, মা।' শ্রীশ্রীমা তখন তাঁর খাটের নিচে ঢাকা প্রসাদের থালা দেখিয়ে দিলেন আমাকে প্রসাদ নেওয়ার জন্য।" চন্দ্রবাবু আরও বলেছিলেন যে, তিনি গোটাকতক রসগোল্লা, সন্দেশ ও চমচম নিয়েই সরে পড়েছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে পরে জানিয়েছিলেন, "আচ্ছা মহারাজ, আমি চাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু কিছু একটা ঘটে গেল,—আমি কিন্তু জানি না সেটা কি।" অতএব এটা শিখিয়ে দিলে হয় না; শিশু যেমন তার মায়ের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত আকুতি জানায়—মায়ার বন্ধন ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য সেরকমই হওয়া দরকার। তবে চন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীমায়ের খুব ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। আমি বিশ্বাস করি যে, অন্তিমকালে তিনি এই পার্থিব জগৎ থেকে মাতৃক্রোড়ে স্থান পেয়ে চির শান্তি লাভ করেছেন।

এই চন্দ্রবাবুর জন্যই আমি স্বামী সারদানন্দজীর এত অনুরাগী হতে পেরেছিলাম এবং নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম তাঁর সেবায়। একদিন চন্দ্রবাবু আমাকে জানালেন যে, তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে অতি আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, "মা, আমি তোমার সেবা করতে চাই।" এবং শ্রীশ্রীমা বললেন, "না বাবা, এখানে সরলা আছে,"—পরবর্তী কালে তিনি ভারতীপ্রাণা এবং সারদা মঠের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন। "তবে তুমি গিয়ে আমার ছেলে শরতের সেবা কর। যদি তুমি বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার সেবা করতে পার তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। যে-কেউই এইরকমভাবে শরতের সেবা করবে সে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।" এজন্যই আমিও তখন শরৎ মহারাজকে ছেড়ে কোথাও যেতে পছন্দ করতাম না। যতদিন সেই মহাপুরুষ সেবার সুযোগ দেবেন, ততদিনই আমি তাঁর কাছে কাছে থাকব—এই ছিল আমার ইচ্ছা। সাধুরা কুম্ভমেলায় যেতেন,—সেবার এলাহাবাদে মেলা হচ্ছে,—সেখানে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হবে। স্বামী সারদানন্দজী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কুম্ভমেলায় যেতে চাই কিনা। আমি বললাম, "মহারাজ, আমি এখানেই আনন্দে আছি, আর কোথাও যেতে চাই না।"

আমার কাছে স্বামী সারদানন্দজী ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মতো। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাতেই স্বামী সারদানন্দজী এবং আমার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং আমার মহা সৌভাগ্য যে, তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁকে সেবা করার। আমি যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম, তখন স্বামী সারদানন্দজী আমাকে খুব বকেছিলেন—অসাবধানতাবশতঃ দরজার চৌকাঠের কাছে জুতো খুলে রাখার জন্য। তারপর থেকেই আমি তাঁকে খুব ভয় করতাম এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। তবে আমি যখন ঠাকুরঘরে যেতাম তখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করতাম যাতে আমার মন থেকে এই ভয় দূর হয়ে যায়। তারপর একদিন হঠাৎ শরৎ মহারাজ আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আমার চিঠি লিখতে পারবে?" আমি বললাম, "পারব মহারাজ।" তিনি বললেন, "তবে একটা শর্তে, তুমি যা লিখবে তা এমনকি তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও প্রকাশ করবে না।" আমি বললাম, "মহারাজ, আমি যদি আপনার বিশ্বাসের অমর্যাদা করি, আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবেন।" আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছিলাম।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি চুপ করে থাকতাম। স্বামী সারদানন্দজীকে তাঁর অনেক শিষ্য একবার অভিযোগ করেছিলেন এবং তাঁকে নিজ হাতে চিঠি লেখার জন্য অনুনয় জানিয়েছিলেন। মহারাজ তাতে বলেছিলেন, "আমি এমন একজনকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছি, যে একটি শব্দও অন্যত্র প্রকাশ করবে না, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও না।" তখন আমি ভাবলাম, "আচ্ছা, এতখানি তিনি কি করে বললেন?" বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মায়।

শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী সারদানন্দজীর ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরা হিমালয়ের উচ্চতা থেকে নিচে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করেন—আমাদের গুরু ও দিশারীরূপে এবং আমাদের চালিত করেন, যাতে এই জীবনেই আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ হয়। বাস্তবিকই এটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন শ্রীশ্রীমায়ের ন্যায় আদর্শ গুরুর সম্বন্ধে কিছু বলা। আমি কেবল তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করেছি, তাঁর মুখকমল দর্শন করেছি, এবং তাঁর মুখোচ্চারিত বাণী শুনেছি। এখন কেবল সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি, মা কখন এসে আমাকে মায়ার জগৎ থেকে তুলে নিয়ে অনন্ত জ্যোতির রাজ্যে—চির-আলোকময়, চির-আনন্দ এবং সত্যের জগতে নিয়ে যাবেন।

প্রিয়তম ঈশ্বরের বিরহ-বেদনা মানব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যুক্তি দিয়ে বোঝা চলে না, শুধু ভক্ত-চিত্তে উপলব্ধ হয় মাত্র। আমরা অনেক কিছুকে ছেড়ে থাকতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসী হতে চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদের আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে। বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ আমি এই কথাই বলছি যে, এই জীবনে যদি কিছু আমি করে থাকি তা সবই সম্ভব হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাতে। অতএব আমি আপনাদের সবার কাছেই আহ্বান জানাচ্ছি—বিশ্বপ্রেমের আধুনিকতম প্রকাশ ও প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় এবং শ্রীশ্রীমায়ের অনুচিন্তনে, যিনি আপনাদেরও জননী এবং যিনি আপনাদের সকলকেই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করবেন—আপনারা যাই হন না কেন। তাঁরা আপনাদের চেতনাকে উদ্বোধিত করবেন, যেখান থেকে চরম সত্য উপলব্ধি করা যায়, যেখানে জ্ঞানসূর্য সদা জ্বল জ্বল করছে এবং মায়ার অন্ধকার চির বিলীন।

উদ্বোধন

শ্রীসতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য
নবাগত কবি।

উড়েছে নিশান গৌরীশৃঙ্গে
উমা মা আমার জেগেছে।
ধূলার ধরণী সন্তানে আজ
জননীর মনে পড়েছে॥
কত নিশি তুমি ঘুমহারা চোখে
ভেবেছ মোদের কথা
কত দুখ তুমি পেয়েছিলে মাগো
বুঝিয়া মোদের ব্যথা।
বেদনা মোদের বাজে তব বুকে
তাই বুঝি মনে পড়েছে॥
পুলক মগন ভুবন গগন
মা তুমি আসিবে বলে
তোমার স্নেহের পরশ লাগিয়া
মিলিয়াছি দলে দলে।
আমাদের মুখে ফুটাবারে হাসি
দুর্গতিহরা এসেছে॥

সন্ন্যাসীর স্মৃতি

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইন্‌স্টিটিউট ফর্‌ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, সাহিত্য প্রতিভা প্রভৃতি বাহ্য অলংকরণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়েও অনেকে বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হন। আর সেই অনুরাগভাজন যদি ত্যাগী হন—তবে অনুরক্তের জীবনকেও শ্রেয়ের পথে নিয়ে যেতে পারেন।

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমরা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এমন-ই কয়েকজন সন্ন্যাসীর পূত সঙ্গ-লাভে ধন্য হয়েছি। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পূজনীয় স্বামী নিরাময়ানন্দজী (বিভূতি মহারাজ) —আমাদের প্রিয় বিভূতিদা। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ আমাদের শোকাহত এবং অভিভাবকহীন করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহ আমাদের ঘিরে রেখেছিল। ইদানীং শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে, উদ্বোধন কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন এবং ঘনিষ্ঠতরভাবে মিলিত হবার সুযোগ হয়েছিল। সমসাময়িক বহু সমস্যা ধর্মীয়, সামাজিক,—সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট এবং আদর্শ-সংঘাত ঘটিত বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেতাম। আমাদের ন্যায় বহু ব্যক্তির সংশয়কে তিনি নিরসন করতেন, —আমাদের সিদ্ধান্তকে তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেই মনে করতাম—"চেক্ পাস্ হয়ে গেল!" তাঁর চিন্তার সঙ্গে নিজের চিন্তা মিলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। আমাদের চিত্তের এবং চিন্তার অভিভাবক আজকাল ক্রমশই দুর্লভ হয়ে আসছেন।

সন্ন্যাসীর বিয়োগে আক্ষেপ করতে নেই। কিন্তু বিভূতিদা আমাদের কাছে শুধু শিক্ষক সন্ন্যাসীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন আরও আপনার লোক। তাঁর স্নেহ আমাদের সমীহ ভাবকে কাটিয়ে তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি নিয়ে যেত। কোন ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হলে তাঁর আদর্শের প্রতিও আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই আসে। বহু 'চুম্বক' সাধুর এই স্নেহাকর্ষণে বহু কিশোর ও যুবচিত্ত কল্যাণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। স্নেহের আকর্ষণ-ই ধর্মজগতে বা শিক্ষা-জগতে প্রবেশের প্রথম সোপান। দেওঘর 'বিদ্যাপীঠের' শিক্ষক হিসাবেই তাঁর সঙ্গে বহু কিশোরের প্রথম পরিচয়। তাদের সবারই প্রিয় বিভূতিদা। শিক্ষকের প্রধান গুণ হল শিক্ষার্থীর মন-প্রাণকে আকর্ষণ করা। তারপর তাঁর পাণ্ডিত্য। বিভূতিদার দুই-ই ছিল। তাঁর মধ্যে একটা স্নেহাকর্ষণের শক্তি ছিল,—যার দ্বারা তিনি কিশোর মনকে আকৃষ্ট করতে পেরে-ছিলেন। সেই সব কিশোরদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েও তাঁর কাছে ছুটে আসত—পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে প্রকাশ করার জন্য। তাঁর স্নেহভাজনেরা চিরকালই তাঁর নির্দেশকে পথ চলার নিরাপদ রক্ষাকবচ বলে মনে করেছে। জীবনের উপর জীবনের কল্যাণ প্রভাব বিস্তারে বিভূতিদা ছিলেন সার্থক শিক্ষক। স্বামীজীর "জীবন দিয়ে জীবন-দীপ জ্বালানো"—আদর্শের একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর যারা ছাত্র হবার সৌভাগ্যলাভ করেছে তারা কখনও তাঁকে ভুলতে পারেনি।

বিভূতিদা ছিলেন জন্ম-কবি। তাঁর কৈশোর, যৌবন ও পরিণত বয়সের ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লেখা কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। উদ্বোধন পত্রিকায় এবং অন্যত্র স্বনামে এবং ছদ্মনামে তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কলেজ জীবনের পাঠ্য ছিল বিজ্ঞান। সুতরাং

তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক কাব্য সাহিত্য চর্চা একটি বিশেষ রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানের ক্লাসকেও তিনি সাহিত্যিক রসে সরস করে তুলতে পারতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের কাব্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে ছিলেন বিশেষ অনুপ্রেরণা। 'বৈভব' ছদ্মনামে তাঁর শেষ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এ বছরের পূজাসংখ্যা "উদ্বোধনে"। তাঁর বহু অপ্রকাশিত কবিতা আছে। তাঁর প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে বহু সাহিত্যিক গবেষক।

সন্ন্যাসীর ত্যাগ এবং স্বামীজী প্রবর্তিত সেবাদর্শ বিভূতিদার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে তিনি ছিলেন বরাবরই আপনভোলা—অতি সরল। পূর্বাশ্রমের পারিবারিক সম্ভ্রম ও বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য প্রচুর থাকা সত্বেও তিনি অতি অনাড়ম্বর—কঠোর জীবনই যাপন করে গেছেন। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাপারে উদাসীনতা ছিল তাঁর বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সন্ন্যাসিজীবনে এই তিতিক্ষা ভারতে চির শ্রদ্ধেয়।

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবাদির সুযোগ পাওয়াতে তাঁর অত্যাশ্চর্য ত্যাগ-তপস্যা ও সেবা ভাবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিভূতিদাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তী জীবনে সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি শ্বাপদ-সংকুল সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে ও সেবাকার্যে যে নিষ্ঠা ও ত্যাগ দেখিয়েছেন—তা অকল্পনীয়। এখন সুন্দরবন অঞ্চলের মনসাদ্বীপ অনেক সুগম। কিন্তু তখনকার দুর্গম পরিবেশে তাঁর সেবাকার্য শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রীগুরুর কৃপায় তিনি সেই নর-নারায়ণ সেবায় সিদ্ধ।

শিক্ষক, সেবক এবং পরিচালক হিসাবে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠ, বেলুড় বিদ্যামন্দির, মনসাদ্বীপ, চেরাপুঞ্জী, আসানসোল, কাঁকুড়গাছি, বোম্বে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী উদ্বোধন—সর্বত্রই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্ঘের আদেশকে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে যে-কোন সময়ে সঙ্ঘের যে-কোন কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সঙ্ঘের ত্যাগ ও সেবার ভাব যাতে সকল তরুণ ত্যাগী এবং গৃহী ভক্তের মধ্যে সজাগ থাকে সেই-ভাবে তিনি প্রিয়জনকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর নিজের আদর্শ জীবন এবং বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ যে-কোন মানুষকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট করত। সঙ্ঘের সেবায় তিনি নিজে যেমন যে-কোন কাজ করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন—তেমনি আশা করতেন তরুণ সেবকদের কাছ থেকেও।

উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষী বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে উদ্বোধন পত্রিকাকে জনপ্রিয় এবং দিক্‌দর্শক হিসাবে পরিণত করতে তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টাকে আমরা লক্ষ্য করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। "উদ্বোধন"কে সাধারণ মানুষ শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারেরই মুখপত্র মাত্র মনে করত। তাঁর সম্পাদনার ধারাবাহিকতা এই পত্রিকাকে আধুনিক জিজ্ঞাসার উত্তর ও সুষ্ঠু মতবাদে প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যম হয়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছে। অনেক সময় তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের অমিল হয়েছে,—তর্ক করেছি,—তিনি ক্ষুণ্ণ হননি। কখন কখন আমাদের অর্বাচীন বিদ্রোহীভাবকে,—আমাদের প্রতিবাদ ও প্রতিদৃষ্টান্তকে পুনর্বিচার করে নিজের মতকে কথঞ্চিৎ নরম ও সমন্বয়ধর্মী করেছেন,—অবশ্য মূল আদর্শকে কোনও ক্রমে ক্ষুণ্ণ না করেই!

স্বামী বিবেকানন্দের "বাণী ও রচনা"-র

প্রকাশে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে জানতেন এবং নিজেও অতিমানুষিক পরিশ্রম করতেন। প্রকাশনার কাজে, ছাপার সৌষ্ঠবে এবং ভ্রান্তি-শূন্যতার প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। উদ্বোধনের অন্যান্য গ্রন্থপ্রকাশে ও পুনর্মুদ্রণে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশের কাজে তিনি ব্রতী ছিলেন। এই কাজের সঙ্গে তিনি অনুগ্রহ করে আমাকেও সংশ্লিষ্ট করেছিলেন। দেখেছি,—কথামৃতের প্রতিটি শব্দ—বাক্য,—অনুচ্ছেদ,—কমা—দাঁড়ি বিষয়ে তিনি কি গভীর চিন্তা করতেন। তাঁর প্রারব্ধ এই কাজ তাঁর পন্থায় অগ্রসর হলে আমরা 'কথামৃতের' একটি আদর্শ সংস্করণ পাব এই ভরসা।

বর্তমান কলিকাতার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ স্থান ছিল। উদ্বোধনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বাংলার খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক ও গবেষকদের আকর্ষণ করেছেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্য প্রচারে এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহু ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সভায় ছিল তাঁর সাদর নিমন্ত্রণ।

বাগ্মী ও ধর্মব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর শাস্ত্রপাঠের আসরে ও ধর্মসভায় প্রচুর শ্রদ্ধাশীল শ্রোতার সমাবেশ হত। বহু প্রতিষ্ঠানেই তিনি পাঠ করতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর শেষ ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বামী সারদানন্দের ধারাবাহিকতা তাঁর মধ্যে মূর্ত ছিল। মাতৃহৃদয়ের কোমলতার স্পর্শ তাঁর কাছ থেকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই ধন্য হয়েছেন। ইদানীং তাঁর মধ্যে একটা বাহ্য কঠোরতার প্রাচীর লক্ষ্য করা যেত। আমরা সেই প্রাচীরে ছিদ্র করে অনধিকার প্রবেশ করে স্নেহরস লুণ্ঠন করেছি। তাই তাঁকে হারিয়ে আমরা অনাথ।

বিষয় ত্যাগে শান্তি

(কথামৃত অবলম্বনে)

শ্রীশান্তশীল দাশ

শিক্ষাব্রতী, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গীতিকার।

মাছ মুখে করে চিল এক উড়ে যায়,
অসংখ্য কাক তার পিছে পিছে ধায়।
চিল ওড়ে আর কাকগুলো ঘিরে থাকে
সে-মাছের লোভে,পায় না সে মাছটাকে।
সহসা কখন সেই মাছ গেল পড়ে,
কাকগুলো আর রইল না, গেল সরে।
চিল ভাবে, ওই মাছটার জন্যেই
কাকগুলো ছিল, এখন তো তারা নেই।

এ সংসারেও ধন মান খ্যাতি সব
আছে যতক্ষণ ততক্ষণই কলরব।
সরে গেলে তারা অশান্তি আর নাই,
নির্ভাবনায় তোমার নিকটে যাই।
কোন বন্ধন কোন বাধা নাই আর।
একমনে পূজি চরণ দুটি তোমার।

সমালোচনা

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ: শতবর্ষ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ—প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ সমিতি, ৭৫, বন্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯। পৃষ্ঠা ৮০। মূল্য: পাঁচ টাকা।

গ্রন্থটি প্রথম দর্শনে ক্ষীণকলেবর মনে হইয়াছে। বহু রামকৃষ্ণভক্তের পরমনমস্য, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট, প্রেমময় সন্ন্যাসিপ্রবর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের জন্মশতবর্ষস্মারক গ্রন্থ কিছু বৃহৎ হইলেই বোধ হয় সমীচীন হইত। ইহার কারণ, বোধ হয়, প্রকাশক কয়েক বৎসর পূর্বেই এই সম্পর্কে একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ "যোগক্ষেম" ভক্তবৃন্দের কাছে উপস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন।

তবু বলিতে হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ সমিতি এই গ্রন্থটি সম্পাদন করিয়া উপযুক্ত ক্ষণে বাহির করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

পুস্তকে মহারাজজীর জীবন-কথা প্রথমে ছোট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শেষে তাঁহার বাল্য-স্মৃতিজড়িত জন্মভূমি, মাতামহের গ্রাম, গুড়াপের কথা আছে। মধ্যে দুটি পত্র ও সাতটি স্মৃতিচারণ আছে। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারক প্রয়াত স্বামী পবিত্রানন্দের রচনাটি মহারাজজীর সাধক-জীবনের উপর সুন্দর রেখাপাত করিয়াছে। স্বামী সত্যানন্দের লেখাটি মহারাজজীর শেষ জীবনের উপর সুন্দর রশ্মিপাত।

শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদটি সুন্দর হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহারাজের সোনালি বর্ডার দেওয়া ছবিটি ভক্তদের উদ্দীপিত করিবে।

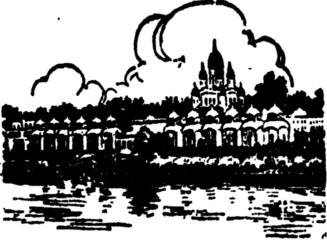
—শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, কেঁড়ে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির

গীতামৃতলহরী—শ্রীস্নেহলতা চৌধুরী। প্রকাশক: চৌধুরী, ১৮৭ বোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৭০০০৬৮। পৃঃ ৭+৩+২২৫। মূল্য: ১৬·০০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সুন্দর বাংলা পদ্যানুবাদ। বাংলাভাষায় গীতার বহু গদ্য ও পদ্যানুবাদ সংস্করণ আছে। অনুবাদিকা বিনয়ের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার এই অনুবাদ কার্যে 'স্বকীয়তা কিছুই নাই' এবং তিনি পূর্ব-প্রকাশিত বহু গীতানুবাদ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। অনুবাদিকার বৈষ্ণব বিনয় তাঁহার গুণেরই পরিচায়ক। অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিলেও তাঁহার অনুবাদের যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। প্রত্যেকটি শ্লোকের অনুবাদ মূলানুগ, যথাযথ অর্থবহ, পদ্যভঙ্গিম এবং সুখশ্রাব্য হইয়াছে। অনুবাদের ছন্দ পয়ার-প্রধান হইলেও বিভিন্ন অধ্যায়ে ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ অনুবাদকে এক শ্রুতিজনিত ক্লান্তি হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংক্ষেপে গদ্যে বিষয়-বস্তুর সূত্র ধরাইয়া দেওয়াতে অর্থবোধের সাহায্য হইয়াছে।

গ্রন্থটির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ অনবদ্য। গীতামৃতলহরী গীতা-সঙ্গীত-প্রবাহে একটি নূতন সুরসংযোজন।

—ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর
নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৩০ ডিসেম্বর রবিবার বিকাল ৩-৩০ মিনিটে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ সভাতে পরিবেশিত ১৯৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হল। মিশনের প্রতিষ্ঠানগুলির কতকগুলিতে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সমস্যা সত্ত্বেও উৎসর্গীকৃত কর্মীরা তাঁদের আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন এবং মিশনের নিষ্কাম সেবা ও তৎসঙ্গে বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত বিভিন্ন স্থানে শ্রমসাধ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন সেবা প্রকল্পগুলি অতি দৃঢ়ভাবে সুসম্পন্ন করেছেন।

এই সময়ের মধ্যে মিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সেবাকাজে মোট ৪৮,৮২,০৮৯ টাকা ব্যয় করেছেন। এই সেবাকাজ নিম্নলিখিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়:

(১) বন্যাত্রাণ—অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও ত্রিপুরা, (২) খরাত্রাণ—তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ, (৩) শরণার্থী ত্রাণ—তামিলনাড়ু, (৪) হাঙ্গামা-ত্রাণ—আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ, (৫) ঘূর্ণিবাত্যা ত্রাণ—পশ্চিমবঙ্গ, (৬) শীতকালীন ত্রাণ—পশ্চিমবঙ্গ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প—অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া মোট ৯,২০,৫৫৮ টাকার মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এই কালে গ্রামবাসীদের আর্থিক স্ব-নির্ভরতা প্রকল্পে পল্লীমঙ্গলের (সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন) নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার ব্যয়ের পরিমাণ ৭,৪৩,৫১৩ টাকা: এগ্রোইকনমিক সার্ভিস, কুটিরশিল্প, মৎস্য পালন, গোশালার উন্নয়ন (কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সাহায্য দান, অবিধিবৎ বিদ্যালয় পরিচালন এবং বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়। প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্যে "বিবেকানন্দ পল্লী সংস্থা" নামে একটি সংস্থা গঠন করেছে।

এই আলোচ্য বৎসরে রামকৃষ্ণ মিশনের কতকগুলি অতি লক্ষণীয় উন্নতির বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

চিঙ্গলপটে সাধুনিবাস ও অফিস গৃহ, কোয়েম্বাটোরে স্কুল-বাড়ি, ঢাকাতে (বাংলাদেশ) বিদ্যালয়-বাড়ির একতলা ও নিচের তলার কিছু অংশ, মনসাদ্বীপে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের বৃদ্ধিকরণ ও আরও একতলা সংযোজন, কলিকাতা ইনস্টিট্যুট অব কালচারে উপাসনা গৃহ ও তৎসংলগ্ন স্থানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির বিবরণ: উতকামণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগনা জেলার বড়িষাতে একটি নূতন কেন্দ্র আরম্ভ হয়েছে, ত্রিবান্দ্রমে হাসপাতালের ত্রিতলের সংযোজন উদ্বোধন করা হয়েছে।

এছাড়া, মিশন ৮টি হাসপাতাল ও ৬১টি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে ৪০,৭৩২ ও ৩৮,০০,৭০৩ জন রোগীকে সেবা করেছেন। ১১টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে প্রায় ৪,৯৬,৫৬৮ জন রোগীকে সেবা করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠও ৫টি হাসপাতাল, ১৮টি ও ৩টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে সেবা করেছেন যথাক্রমে ১৩,৮৯৬, ৬,৬১,৮৩৩ ও ২১,৮৭৯ জন রোগীকে।

মঠ ও মিশনের উপরে বর্ণিত চিকিৎসা বিভাগের মধ্যে ৩টি হাসপাতাল, ৩৮টি চিকিৎসালয় ও ১৪টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় গ্রামে ও পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। ঐসব অঞ্চলে বহু সংখ্যক আর্থিক উন্নতির প্রকল্পও কার্যে পরিণত করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা ৭৩০টি এবং ছাত্রসংখ্যা ১,০২,৮৩৬।

রামকৃষ্ণ মঠের ৬৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ৯,১৫৩।

মঠ ও মিশনের পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে ৫৯৯টি গ্রামাঞ্চলে ও পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত, যেখানে অসংখ্য লাইব্রেরী রয়েছে।

মঠ ও মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি বছর পরীক্ষার ফলাফল অত্যুৎকৃষ্ট। এই আলোচ্য বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের মাধ্যমিক এবং পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এইসব ও অন্যান্য পরীক্ষাগুলিতেও মঠ ও মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে অনেকগুলি স্থান দখল করেছে।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার কমিটি'র নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সমীক্ষার জন্য গঠিত কমিটি নানান স্থানে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার ও সম্মেলন সংগঠন করার প্রচেষ্টা করছেন।

মঠ ও মিশনের বিদেশে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি পূজা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক কার্য করে থাকেন।

বেলুড় মঠে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত দেশে ও বিদেশে মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭ ও ৭৪।

বেলুড় মঠে উৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৫ জানুআরি ১৯৮৫, শ্রীশ্রীমায়ের ১৩২তম আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয় এক প্রশান্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, হোম প্রভৃতি হয়। বহু সহস্র নরনারী এই আনন্দোৎসবে যোগদান করেন। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্ম-সভায় স্বামী বন্দনানন্দের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

বোম্বের হীরকজয়ন্তী উৎসব

বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের হীরকজয়ন্তী উৎসব গত ২২ থেকে ২৬ নভেম্বর ১৯৮৪, বিশেষ পূজা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে বোম্বের ওরলি এলাকায় নবনির্মিত ধর্মসভা-কক্ষ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ এবং পুস্তক বিক্রয়ের বিপণির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। একটি স্মারক-গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেন।

পুনে রামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্র

নবগৃহীত পুনে রামকৃষ্ণ মঠ শাখাকেন্দ্রটি ১ ডিসেম্বর ১৯৮৪, বহু ভক্ত, বন্ধু ও সাধু-ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ।

জাতীয় যুবদিবস

ভারত সরকার স্বামীজীর আবির্ভাবের ইংরেজী তারিখ ১২ জানুআরিকে বর্তমান বর্ষ থেকে প্রত্যেক বছর 'জাতীয় যুবদিবস'রূপে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারত সরকার মনে করেন, 'স্বামীজীর জীবন-দর্শন ও কর্মের আদর্শ ভারতীয় যুবসমাজের পক্ষে মহা অনুপ্রেরণার উৎস।' সংবাদ-সংস্থার সংবাদে প্রকাশিত যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১২ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত সাতদিনব্যাপী 'যুব-সপ্তাহ' পালনের জন্য প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব : পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩২তম আবির্ভাব-তিথি গত ২৯ পৌষ (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৪), শনিবার 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি হয়। ভোরে মঙ্গলারতির সময় থেকেই অগণিত ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণপ্রান্তে প্রণাম জানাতে আসতে থাকেন, চলে রাত ৯টা পর্যন্ত। সমস্ত দিন ধরে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে একটি আনন্দের ধারা বয়ে যায়। দুপুরে বহু ভক্ত নরনারী হাতে-হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' সকালে করুণাময়ী আশ্রমের ভক্তবৃন্দ ভজনগান করেন। তারপর শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ। সন্ধ্যারতির পর সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ লীলাসংকীর্তন পরিবেশন করেন।

শ্রীষ্টোৎসব : গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪, সোমবার উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' বিশেষ সমারোহে ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব প্রাক্‌সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর প্রতিকৃতির সামনে বাইবেল পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মজয়ন্তী : পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের ১২১তম জন্মজয়ন্তী 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে ১৩ পৌষ ১৩৯১ (২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৪) শুক্রবার সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, হোম, ভজনগান প্রভৃতি হয়। সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ। বেলুড় মঠ, কলিকাতা ও কলিকাতার পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে বহু সন্ন্যাসিব্রহ্মচারী স্বামী সারদানন্দজী মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করতে আসেন। বহু ভক্তও তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমাগত সকলকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পরে 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। ২৩ ডিসেম্বর, রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আলোচনা করেন স্বামী চৈতন্যানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী যাদবানন্দ (শ্রীনাথ মহারাজ) গত ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪, বেলা ১১-৩০ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৬২ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে শেস নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি নানারকম উপসর্গে ভুগছিলেন এবং বেশ কয়েকবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সারগাছি আশ্রম ছাড়াও তিনি পরে বাঁকুড়া,

উদ্বোধন, পুরী (মঠ ও মিশন), কাঁথি ও গদাধর আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গত তিন বছর ধরে কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একান্ত জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর অনাড়ম্বর সাধুজীবনের জন্য তিনি অনেকের প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে শান্তিলাভ করুক—এই আমাদের প্রার্থনা।

সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের প্রথম অধিবেশন ২৭ ও ২৮ অক্টোবর পাণ্ডু (আসাম) বিবেকানন্দ পাঠচক্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত দুই দিনের ভক্ত-সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী গহনানন্দ এবং পরিচালনা করেন স্বামী প্রভানন্দ। এই সম্মেলনে যোগদান করেন আসামের ঐ অঞ্চলের প্রায় ৫৬০ জন ভক্ত এবং মিশনের কেন্দ্রগুলি থেকে আগত সন্ন্যাসিগণ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শ্রীমতী অমিয়বালা রাহা** গত ৩ ডিসেম্বর (১৯৮৪) সোমবার, বেলা ১১-৫৫ মিনিটে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের তমলুকস্থ সরকারী আবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে তিনি দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করছিলেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় মনের সন্তোষ এবং অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎস্মৃতি তাঁর জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। স্মরণ-মনন এবং একান্ত ভগবৎ-নির্ভরতা তাঁকে সংসারের মাঝেও সদা নিরাসক্ত রেখেছিল। জীবনারাধ্য ইষ্টদেবের নাম ছাড়া শেষের দিকে তাঁর মুখে অন্য কোন কথা তেমন উচ্চারিত হয়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর। তাঁর স্বামী প্রয়াত শ্রীরামচন্দ্র রাহাও ছিলেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের দীক্ষিত সন্তান।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

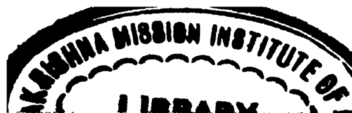
চীনা ভাষায় ভারতীয় মহাকাব্য

ভারতীয় ভাষায় বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় মহাকাব্য রামায়ণ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হচ্ছে। এ যাবৎ চীনা ভাষায় এই মহাকাব্যের অনুবাদ হয়েছে বলে জানা ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্ট চীনা পণ্ডিতমণ্ডলী বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই উক্ত মহাকাব্যের সাতটি কাণ্ড সম্পূর্ণ চীনা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ অনুবাদকার্যে সময় লেগেছে দশ বছর। এই মহাকাব্য ছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য বহু সাহিত্য অনুবাদ হয়েছে চীনা ভাষায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'হান' রাজত্বকালে চীনা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে এবং প্রাচীন চীনা সাহিত্যে এই মহাকাব্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বর্তমান চীনের তাও, তিব্বতী, মোঙ্গল প্রভৃতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষায়ও রামায়ণের উল্লেখ রয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন

এগরা (মেদিনীপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দিরে গত ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী মিলন মন্দির-প্রাঙ্গণে আনন্দোৎসব চলে। বিকালে ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী প্রেমরূপানন্দ এবং স্বামী আপ্তকামানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে যোগদান করেন প্রায় দু-হাজার নরনারী।



UDBODHAN
Phone : 55-2447

DECEMBER 1984

R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/NC-19

১/৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০০০৬

সম্পাদক—স্বামী নির্জরানন্দ সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী আত্মজ্ঞানন্দ